বুদ্ধদেব বসু

দশটি উপন্যাস

দশটি উপন্যাস

বুদ্ধদেব বসু



দশটি উপন্যাস

বুদ্ধদেব বসু

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০০৭৩

DASHTI UPANYAS (Ten Novels)
by BUDDHADEVA BOSE
Published By Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Rs. 300.00

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

দাম ৩০০ টাকা

ISBN 81-295-0296-8

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩
বর্ণ-সংস্থাপন : দিলীপ দে। লেজার অ্যান্ড গ্রাফিক্স
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্তমান সংকলন প্রসঙ্গে

আমাদের নস্টালজিয়ায় বুদ্ধদেব বসুর বহু উপন্যাস খেলা করে। তিনি থাকতে কত যত্নেই না প্রতিটি বই প্রকাশিত হতো। কোথায় গেল সেই চমৎকার বইগুলি? এ নিয়ে বহু পাঠকের ক্ষোভ অনেকদিনের। প্রতি বইমেলায় 'বিকল্পে'র স্টলে এসে বহু মানুষ আমাকে বারবার অনুরোধ করেছেন তাঁর উপন্যাসগুলি পুনঃপ্রকাশ করতে। কাজটি বৃহৎ, আমার মতো ক্ষুদ্র প্রকাশকের সামর্থ্যের বাইরে। তাই যখন দে'জ পাবলিশিং সংস্থার কর্ণধার অনুজপ্রতিম সুধাংশুশেখর দে বুদ্ধদেব বসুর 'উপন্যাস সমগ্র' করার বাসনা প্রকাশ করলেন, আমি শুধু খুশিই হইনি, পরম নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। সুধাংশুশেখরের মতো সৎ ও সংবেদনশীল ব্যক্তি-প্রকাশক আর কে আছেন?

'উপন্যাস সংগ্রহ' তৈরি হতে সময় লাগবে, তাই বুদ্ধদেব বসুর 'দশটি উপন্যাস' দিয়ে যাত্রা শুরু হলো। যে দশটি উপন্যাস এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে তার মধ্যে ন'টিই এখন আলাদা বই হিসেবে আর পাওয়া যায় না। তিরিশের দশকে রচিত *আমার বন্ধু* (১৯৩৩) ও *রূপালি পাখি* (১৯৩৪) থেকে শুরু করে চল্লিশ দশকের *বিশাখা* (১৯৪৬), পঞ্চাশ দশকের *মনের মতো মেয়ে* (১৯৫১), *মৌলিনাথ* (১৯৫২) *শেষ পাণ্ডুলিপি* (১৯৫৬) এবং ষাটের দশকে লেখা তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসের অন্যতম *রাত ভ'রে বৃষ্টি* (১৯৬৫), *গোলাপ কেন কালো* (১৯৬৫), *আয়নার মধ্যে একা* (১৯৬৫) ও বিপন্ন বিস্ময় (১৯৬৯) কালানুক্রমে স্থাপন করে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত রক্ষা করা হয়েছে।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত উপন্যাস *সাড়া* লিখে সাড়া ফেলেছিলেন আঠারো বছর বয়সে, সেই একই সময়ে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ *বন্দীর বন্দনা* তখন সারা বাংলাদেশ কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ১৯৩০-এ প্রকাশিত সাড়া থেকে শুরু করে তাঁর শেষ উপন্যাস *এক বৃদ্ধের ডায়েরি* (১৯৭০-তে প্রকাশিত) পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে তাঁর উপন্যাসের দু'টি সামান্য লক্ষণ উঠে আসে : এক, তাঁর ভাষার কাব্যময়তা ; দুই, চেতনাপ্রবাহের ধারায় মনোজগতের বিস্তার। কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত হতে যে জেহাদ কল্লোলের কবিদের ঘোষণা করতে হয়েছিল, দেখা যায় গদ্যের ক্ষেত্রে আদৌ তার প্রয়োজন হয়নি। তাঁদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা প্রথম গল্প ও উপন্যাস থেকেই সোচ্চার। বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রেও গদ্যে তাঁর নিজস্ব 'স্টাইল'—নতুন এবং ব্যতিক্রমী—নিতান্ত অপরিণত বয়সে লেখা 'রজনী হ'লো উতলা' থেকেই দুর্মরভাবে উপস্থিত। তাঁর গদ্য কবির গদ্য, কিন্তু শাণিত, উজ্জ্বল এবং ঋজু। তিনি কখনো ধোঁয়াশায় কথা বলেন না, তাঁর গদ্যের বৈশিষ্ট্যই তার প্রাঞ্জলতা। উপন্যাসে তিনি মানুষের মনের গল্প বলেন—মনস্তত্ত্বের জট ছাড়ান সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে : *মৌলিনাথ* বা *রাত ভ'রে বৃষ্টি*-র দাম্পত্য-জটিলতার ক্ষেত্রেও তা যতটা সত্য, নায়কের জবানীতে বলা একক কথনের অনন্য আখ্যান *গোলাপ কেন কালো*-র ক্ষেত্রেও তাই। আর *বিপন্ন বিস্ময়*-এর

একগুচ্ছ যৌবন-তাড়িত তরুণ-তরুণীর মনোজগতের উন্মোচন—সেই নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের তুলনা নেই। আমি জানি—কারণ আমরাই ষাটের দশকের সেই নায়ক-নায়িকা।

কখনো কখনো শুনেছি তাঁর লেখা নাকি দুরূহ—'শক্ত'। তাঁর গল্প-উপন্যাসের সৎ পাঠক কখনো এ অভিযোগ মানবেন না। আর শ্লীল-অশ্লীলের তর্ক এই সময়ে শিল্পের জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াই সমীচীন।

আশা করি নতুন প্রজন্মের পাঠক ব্যতিক্রমী ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব বসুকে আবিষ্কার করে সমিদ্ধ হবেন; আর আমাদের মতো বু.ব.র গদ্যে মজে থাকা পুরোনো পাঠকেরা তাঁর উপন্যাসগুলি ফিরে পড়ে আপ্লুত বোধ করবেন।

এই প্রাপ্তির জন্য সুধাংশুশেখরকে আবারও ধন্যবাদ দিই।

দময়ন্তী বসু সিং

সূচি

আমার বন্ধু (১৯৩৩) / ৯
রূপালি পাখি (১৯৩৪) / ৪৭
বিশাখা (১৯৪২) / ৮৯
মনের মতো মেয়ে (১৯৫১) / ১৩৩
মৌলিনাথ (১৯৫২) / ১৯৫
শেষ পাণ্ডুলিপি (১৯৫৬) / ২৭৫

আমার বন্ধু

হেরিডিটির রহস্য চিন্তা করলে বিস্ময়ে মুগ্ধ হ'য়ে যেতে হয় ; আমি যে লেখক হয়েছি, আমার জন্ম দিয়ে বিচার করতে গেলে এ-ঘটনা অত্যন্ত আশ্চর্য, প্রায় অস্বাভাবিক ঠেকে। কারণ, আমার পিতৃকুল ও মাতকুলে, যতদূর জানা যায়, কারোরই কোনো আর্টের প্রতি কোনোরকম উন্মুখতা ছিলো না। উভয় দিকেই, নিরেট মধ্যবিত্ততা থেকে আমি জাত। যতদূর জানা যায়। কিন্তু জানা কতদূরই বা যায়? যেখানে আমাদের জ্ঞান পৌঁছতে পারে না, সেই দূর অতীতে, শতাব্দীর পর শতাব্দী পশ্চাতে—আমার কোনো পূর্বপুরুষ হ'য়ে সেখানে আমি ছিলাম ; এবং সেই পূর্বপুরুষের হয়তো খানিকটা সৃষ্টিকারী ক্ষমতা ছিলো ; সেই ক্ষমতা ভ্রূণাবস্থায় ক্রোমোজোমদের অজ্ঞেয় বিন্যাসের ফলে আজ আমি পেয়েছি বহু শতাব্দী পর, সহস্র নর-নারীকে অতিক্রম ক'রে সেই ক্ষমতার বীজ যে কী ক'রে আমার মধ্যে সঞ্চারিত হ'লো, সৃষ্টির এই রহস্য—এমন যে আমাদের সর্বজ্ঞ বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান, তা এখনো উদ্ঘাটন করতে পারেনি। যে-সম্ভাবনা লাখে একও নয়, তা-ই পরিপূর্ণ হ'লো ; সাহিত্যিক ক্ষমতা নিয়ে আমি জন্মালাম।

অবশ্য সে-সম্বন্ধে সচেতন হ'তে জীবনেব অনেকগুলো বছর কেটে গিয়েছিলো। জ্ঞান হবার সঙ্গে-সঙ্গে কী ক'রে যেন আমার মনে এ-ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে গিয়েছিলো যে সাংঘাতিক একটা-কিছু হবার জন্য আমি উদ্দিষ্ট। কিন্তু সেই সাংঘাতিকত্ব যে সাহিত্যের দিকে হবে, তা উপলব্ধি করলাম সেদিন, যেদিন হঠাৎ ইংরেজি ভাষায় এক শোক-গাথা রচনা ক'রে ফেললাম। আমার বয়স তখন দশ ; নোয়াখালিতে ঠিক নদীর ধারে ভাবি সুন্দর একটা বাড়িতে আমরা থাকতাম। নদীর ধাবে বলছি—কিন্তু প্রথমে বাড়িটা ছিলো নদী থেকে মাইল খানেক দূর ; দেখতে-দেখতে মধ্যবর্তী মাটি অদৃশ্য হ'লো ; নদীটা ঘোড়ার মতো লাফাতে-লাফাতে বাড়ির দবজার কাছে এসে দাঁড়ালো। শেষে এমন সময এলো, যখন আব ও-বাড়িতে বাস করা যায় না ; নদীর হাতে বাড়িটি সমর্পণ ক'রে আমাদেব স'রে পড়তে হবে। ব্যাপারটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং শোকাবহ ব'লে আমার মনে বাজলো ; ঈশ্বরের রাজ্যে উচ্ছৃঙ্খল অবিচারের প্রথম দৃষ্টান্তে মর্মাহত হলাম। লিখলাম সেই বাড়িকে উদ্দেশ্য ক'রে ইংরেজিতে এক বিদায়-পদ্য। যথাসময়ে এবং যথাক্রমে সে-পদ্য হ'লো আবিষ্কৃত, পঠিত, আলোচিত ; আমার স্বজনবর্গ স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। আমার এই অসামান্য কীর্তিকে তাঁরা ঠিক বিশ্বাস করতে পাবলেন না ; বুঝে উঠতে পারলেন না, কী করবেন আমাকে নিয়ে। তাঁরা উল্লসিত হলেন, উদ্‌ভ্রান্ত হলেন, গর্বিত হলেন, সন্দিহান হলেন। মুহূর্তেব মধ্যে দশ বছরের বালক আমি বাড়ির মধ্যে প্রধানতম ব্যক্তি হ'য়ে উঠলাম, দেখতে না-দেখতে আমার কবি-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো সেই ছোটো শহরের সর্বত্র। নিজের সম্বন্ধে আমার ভীষণ উচ্চ ধারণার এমন একটা জলজ্যান্ত সমর্থন পেয়ে আমার মনটা বেশ খুশি হ'য়ে উঠলো।

আমার কবিকীর্তি যাতে ওখানেই ক্ষান্ত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমার এক আত্মীয় আমাকে উপহার দিলেন এক খাতা—হায়রে কালান্তক, মর্মান্তিক খাতা! অদম্য উৎসাহে ও অধ্যবসায়ে আমি লেগে গেলুম সেই খাতার শাদা পাতাগুলো কালির আঁচড়ে ভরাতে এবং সেই যে নেশা করলাম (কারণ, নেশা ছাড়া এটা আর কী?), আজ পর্যন্ত আমি তার দাসত্ব করছি ; সাধ্য নেই, তার সর্পিল, বিষাক্ত আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারি। বরং, যত দিন যাচ্ছে, এ-নেশা ততই কঠিন, ততই ভয়ানক হ'য়ে উঠছে। প্রথমে ছিলো, লিখতে ভালো লাগে ; তারপর হ'লো, না-লিখলেই খারাপ লাগে, এখন হয়েছে, লিখতে ভালো লাগে না, আবার না-লিখলেও খারাপ লাগে। নেশাখোরের এটা হচ্ছে চরম অবস্থা। মাতাল যে, একটা সময় আসে, যখন মদের কথা ভাবতেই তার ন্যক্কার আসে ; তবু, সন্ধে হ'লেই তার বোতল আর গেলাশ নিয়ে বসা চাই। তেমনি, লেখার কথা ভাবলে

আমার এখন মনের মধ্যে যন্ত্রণা হ'তে থাকে—কিন্তু উপায় নেই, তবু আমাকে বসতেই হয় কাগজ আর কলম নিয়ে ; এবং আত্ম-নিপীড়ন যত নিষ্ঠুর হয়, কোনো-এক বিকৃত উপায়ে মন তা-ই থেকেই উপভোগ নিংড়ে বের করে—উৎকট উপভোগ! কত উৎকট, বুঝতে পারি নেশার হাত থেকে মাঝে-মাঝে যখন প্রশান্ত বিরতি আসে। যদি কখনো প্রশান্ত বিরতি না আসতো! যদি আমাকে আদৌ এ-নেশা পেয়ে না বসতো! কিন্তু দেরি হ'য়ে গেছে ; বড্ড বেশি দেরি হ'য়ে গেছে ; এখন আর এ-সব আক্ষেপ করবার সময় নেই।

যা বলছিলাম, সেই খাতা ভরিয়ে তোলবার চেষ্টায় দারুণ উৎসাহে আমি আত্ম-নিয়োগ করলাম। মাইকেল মধুসূদনের মতো, গোড়ায় মাতৃভাষার প্রতি আমার তাচ্ছিল্যের সীমা ছিলো না ; পরিণত শৈশব পর্যন্ত ভালো ক'রে বাংলা শিখিনি। কিন্তু মধুসূদনের অনেক আগেই বিভাষায় সাহিত্যরচনার মূঢ়তা আমি উপলব্ধি করেছিলাম। ইংরেজিতে ঐ আমার প্রথম প্রচেষ্টা—এবং শেষ। আমার দ্বিতীয় প্রচেষ্টাই হ'লো বাংলায় ; তার বিষয়—এখনো আমার মনে আছে—ছিলো 'উষা'। পয়ারে, ত্রিপদীতে, মিলের পরে মিল দিয়ে দিয়ে, রোজ একটি দুটি ক'রে নিয়মিতরূপে আমার পদ্যরচনা চলতে লাগলো। ভেবে-ভেবে আমি সব কাব্যোপযোগী বিষয় বের করতাম। সন্ধ্যা, নদী, তারা, চন্দ্র, সূর্য, ফুল, শিশু—আমার কাব্য-ছাগশিশু সদ্য-উন্মেষিত দাঁত দিয়ে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু পরখ ক'রে-ক'রে দেখতে লাগলো। সৌভাগ্যবশত, বাল্যকালে আমাকে ইস্কুলে প'ড়ে সময় নষ্ট করতে হয়নি, প্রচুর সময় ছিলো আমার হাতে ; অবাধ, অক্ষুণ্ণ, দিন থেকে দিন প্রবলতর গতিতে পদ্যের পর পদ্য নিঃসৃত হ'তে লাগলো ; কয়েক মাসের মধ্যে খাতা উঠলো ভ'রে।

ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার হ'লো ; আমার সাহিত্যিক জীবনের সেটাই সবচেয়ে প্রধান ঘটনা ব'লে ধরা যেতে পারে। আমার আর-এক আত্মীয় আমাকে একখানা রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা উপহার দিলেন। (চারুবাবুর চয়নিকা—ছোটো সাইজের, ইন্ডিয়ান প্রেসের নিখুঁত ছাপার। হায় সেই অতীত স্বর্ণ-যুগ, দশজনের ভোট কুড়িয়ে যখন চয়নিকা তৈরি হ'তো না, যখন জাঁদরেল আকারে, ভীম ওজনে, যত্নহীন ছাপায়, এ-অ্যা-র উচ্চারণের পার্থক্য-চিহ্ন-বিভূষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যকেতাব চয়নিকা বেরুতো না!) সেই বই খুলে প্রথম পৃষ্ঠায় পড়লাম :

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিলো প্রাণের 'পর

আর সঙ্গে-সঙ্গে, আমার মনেও নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হ'লো। এক সকালবেলায়, দশ নম্বর সদর স্ট্রীটের বাড়ির ছাতে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখতে-দেখতে রবীন্দ্রনাথের পৃথিবীর মুখ থেকে পরদা উঠে গিয়েছিলো ; আমার পৃথিবীর মুখ থেকেও পরদা স'রে গেলো, জীবনে প্রথম যেদিন রবীন্দ্র-কাব্যের সংস্পর্শে এলাম। আমার চোখের সামনে সমস্ত সৃষ্টির এক আশ্চর্য রূপান্তর ঘটলো ; আকাশের রং, ঘাসের রং, মানুষের কথাবার্তা, হাসির শব্দ—সব যেন এক গভীরতর ইঙ্গিত নিয়ে আমার মনকে স্পর্শ করতে লাগলো। বদলে গেলো সমস্ত পৃথিবীর চেহারা ; বদলে গেলাম আমি।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিলো প্রাণের 'পর—

ভালো ক'রে বোঝাবার ক্ষমতা তখনো হয়নি , বিস্ময়ের, আনন্দের বন্যায় যা আমাকে তখন একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো, তা হচ্ছে কবিতার ছন্দ, তার ধ্বনি, সংগীত। উন্মাদনার মতো সেই সংগীত আমাকে অভিভূত করলো।

আনন্দময়ী মুরতি তোমার
কোন দেব তুমি আনিলে দিবা—
অমৃত-সরস তোমার পরশ,
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।

'পতিতা'র প্রকৃত বিষয়বস্তু না-বুঝেও এই সংগীতকে ঘিরে আমার বালক-মন অস্পষ্ট রহস্যের

ইন্দ্রজাল বুনে চললো ; আমার মনের মধ্যে তার অবিশ্রাম গুঞ্জন ; সেই সংগীতের অশরীরী সঞ্চরণে আমার দিন-রাত্রি মদির হ'য়ে উঠলো। গৃহের মধ্যে, পরিবারের মধ্যে আমি একা এক গোপন জীবন যাপন করতে আরম্ভ করলাম ; সুরের মায়াচক্রের মধ্যে স্বেচ্ছা-বন্দী, আমি ধন্য হলাম জীবনের প্রথম পূজার দেবতাকে আবিষ্কার ক'রে। চয়নিকা হ'য়ে উঠলো আমার কাছে একটা অফুরন্ত খনি ; এত ঐশ্বর্য একসঙ্গে পেয়ে আমি প্রথমে একেবারে দিশেহারা হ'য়ে গেলাম। সেই যে রবীন্দ্র-মোহে পড়লাম, তা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে নিতে অনেক, অনেকদিন কেটে গেলো। এখনো কি সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হ'তে পেরেছি? সন্দেহ হয়।

তখন—প্রথম চয়নিকা পড়বার পর—যা আরম্ভ হ'লো, সেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, সেই দাস্যময় অনুকরণ—ওঃ, তার তুলনা হয় না। যা-কিছু আগে লিখেছিলাম, সব যে রাবিশ, নিতান্ত ছেলেমানুষি, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ মনে রইলো না ; এগারো বছরের আমি মৃদু হাস্য ক'রে দশ বছরের আমির পিঠ চাপড়ালাম। সদ্য গিরি-গুহা-মুক্ত ঝরনার মতো উচ্ছ্বসিত উৎসাহে ছুটলো আমার রবীন্দ্র-জাগরিত কাব্যস্রোত। সমস্ত চয়নিকা বলতে গেলে গণ্ডুষে গিলে ফেললাম; তারপর বিপর্যস্ত, বিকৃত হ'য়ে সেই সব আমার কলমের মুখ দিয়ে বেরোতে লাগলো, শিশুর মুখ দিয়ে দুধ দিয়ে যেমন ছানা হ'য়ে বেরোয়। পড়লাম 'শুধু অকারণ পুলকে—' ; তৎক্ষণাৎ লিখে ফেললাম এই গোছের এক পদ্য :

আজি উজ্জ্বল আলোকে
আমার পরান আপনা হারায়ে
ছুটিছে ব্যাকুল পুলকে।

'বর্ষা-সন্ধ্যা' প'ড়ে হঠাৎ মেঘাক্রান্ত রক্তবর্ণ সূর্যাস্তের প্রেমে পড়ে গেলাম ; লিখলাম :

আজকে শুধু তোমার হাতের
মধুর পরশে,
হৃদয় আমার ফুলের মতো
ফুটবে হরষে।

ইত্যাদি, ইত্যাদি। এমনি অজস্র। যখনই যে কবিতা পড়তাম, আমার মনের অপরিণত পাকযন্ত্র থেকে তা ছানা হ'য়ে বেরোতোই। খাতার পর কবিতার খাতা ফেঁপে উঠতে লাগলো। তখন পর্যন্ত ভাবিনি, কবি ছাড়া আমি আর-কিছু হবো ; গদ্য জিনিশটা যে কষ্ট ক'রে কাগজের উপর কলম দিয়ে লেখবার উপযুক্ত, তা-ই আমি মনে করতাম না। কিন্তু এমন সময় আর-একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটলো। আমাদের পারিবারিক মহলে কয়েক দিনের ব্যবধানে পর-পর দুটো বিয়ে হ'য়ে গেলো। সেই ডবল বিয়ের উপলক্ষ্যে যত রাজ্যের বাংলা উপন্যাস আর গল্পের বই এসে পড়লো আমার হাতে ; আমার—কারণ, যে-মহিলাদের উদ্দেশে বইগুলো উপহৃত হয়েছিলো, সেগুলোব দিকে তাকাবার সময় তাঁদের ছিলো না—অন্তত তখন ছিলো না। বইগুলো আমি এক নিশ্বাসে প'ড়ে ফেললাম ; ঢকঢক ক'রে গিলে ফেললাম, বলা যায়। (প্রসঙ্গক্রমে, বাংলা কথাসাহিত্যে আমার যা-কিছু পাঠ, তার অনেকটাই সেই যাত্রায় হ'য়ে যায় ; যেটুকু বাকি ছিলো—স্কুলে থাকতে একবার অসুস্থ হ'য়ে মাস দুই রাঁচিতে কাটাতে বাধ্য হই—যেটুকু বাকি ছিলো, হিনুবাসী কেরানিদের লাইব্রেরির অনুগ্রহে তা শেষ ক'রে ফেলি।) বাংলা গল্পের একবার স্বাদ পেয়ে আমার মত বদলে গেলো ; আরম্ভ করলাম গদ্য লিখতে। আমার সরস্বতী তখন খাতার কারাগারে ছটফট করতে লাগলেন ; তাঁকে আরো প্রশস্ত ক্ষেত্র দেবার জন্য দরকার হ'লো এক হাতে লেখা মাসিকপত্র বার করা। সেই পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর বা লিপিকার ছিলাম আমি ; তার অন্তর্গত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ব্যঙ্গ-কৌতুক, সাহিত্য-সমালোচনা—বেশির ভাগ জিনিশ লিখতাম আমি ; এবং আমার মতো উৎসাহী পাঠকও তার আর ছিলো না। না—একজন ছিলো, যে আমার সম্পাদিত সেই মাসিকপত্র বোধহয় আমার চেয়েও বেশি উৎসাহ নিয়ে পড়তো ; কারণ প্রতি সংখ্যাতেই তার দুটো-একটা লেখা থাকতো, তার উপর কাগজের

প্রচ্ছদপটও হ'তো তার হাতের আঁকা। বস্তুত, মাসিক-পত্র পরিচালনায় সেই আমার প্রথম প্রচেষ্টায় সে ছিলো আমার সহকারী। তার নাম ছিলো তার জন্ম ও পারিপার্শ্বিকের পক্ষে একটু অসাধারণ—ভবভূতি। জজকোর্টের টাইপিস্ট তার বাবা বোধহয় কোনো এক প্রচণ্ড দুরাশার মুহূর্তে ছেলের এই নামকরণ ক'রে ফেলেছিলেন ; তারপর নিজের এই ভীষণ দুঃসাহসে নিজেই ভীত হ'য়ে প্রাঞ্জল, অভিমানহীন বিভু নামে ওকে ডাকতে আরম্ভ করেছিলেন। বিভু ব'লেই ওকে সবাই ডাকতো ;—কিন্তু, এমন যে ওর চমৎকার, জমকালো ভবভূতি নাম, যা কিনা ওর শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা যায়, তা অব্যবহারে লুপ্ত হ'য়ে থাকবে, আমি এই অবিচারের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই বিদ্রোহ করেছিলাম। আমার কান তখন থেকেই তৈরি হ'য়ে আসছিলো ; একটা ধ্বনিময় শব্দ পেলে আমি অস্পষ্টভাবে তাকে চিনতে পারতাম ; তাই আমি করলাম ওর নামের উদ্ধারসাধন।

ভবভূতির সেই ছেলেবেলার চেহারা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। কালো, রোগা-মতো এক ছেলে, মাথায় ছোটো-ছোটো চুল, মুখে এমন-কোনো বিশেষত্ব ছিলো না, যা উল্লেখ করা যায়। শুধু ওর চোখের দৃষ্টি ছিলো ভীত, অসহায় গোছের, একটু নির্বোধ, একটু করুণ। তখন অতটা লক্ষ্য করতাম না, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সব সময় ওকে একই বেশে দেখতাম ; পরনে নীল একটা হাফ-প্যান্ট, বেল্টের অনেকটা অংশ পিছন দিকে লেজের মতো ঝুলছে ; গায়ে খাকি একটা শার্ট। ওর পকেট-ভরতি থাকতো ছোটো-বড়ো নানা রকম মার্বেল ; মার্বেল খেলায় ও ছিলো নোয়াখালি শহরের চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু তা নিয়ে ওর এতটুকু গর্ব ছিলো না ; কোনো বিষয়ে গর্ব করবার ক্ষমতাই ছিলো না ওর। ও ছিলো সেই ধরনের মানুষ, জন্ম থেকেই যারা বিনীত, যারা আনত, নিজের ক্ষুদ্রতা-বোধকে যারা কোনো রকমেই কাটিয়ে উঠতে পাবে না, চায়ও না ; অগৌরবের তমিস্রায় লুপ্ত হ'য়ে থাকা যাদের সবচেয়ে বড়ো আকাঙ্ক্ষা মার্বেল খেলার শখ আমারও খুব ছিলো, কিন্তু ক্ষমতা ছিলো না, উপরন্তু, অক্ষমের অভিমান ছিলো। ভবভূতির সঙ্গে খেলতে গিয়ে বারে-বারেই আমি বিশ্রীরকম হেরে যেতুম ; যত হারতুম, ততই জেদ চ'ড়ে যেতো। কখনো-কখনো, আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে, ভবভূতি আমাকে ইচ্ছে ক'রে জিতিয়ে দেবার চেষ্টা করতো ; এবং সে-অপমান পরাজয়ের চেয়েও নিষ্ঠুর হ'য়ে আমার মনে লাগতো ; রাগ ক'রে আমি ওর সঙ্গে ঝগড়া করতুম। আমি আহত হয়েছি, এই আশঙ্কায় ওর চোখের দৃষ্টি আরো ভীত, আরো অসহায় হ'য়ে আসতো ; তখন যদি কেউ ওকে বলতো যে মার্বেল-নিক্ষেপে অমোঘ ওর আঙুল কেটে ফেললে আমি তুষ্ট হবো, ও বোধহয় অনায়াসে তা-ই করতে পারতো।

কারণ, ভবভূতি ছিলো আমার প্রথম ভক্ত পাঠক ; শুধু তা-ই নয়, আমার শিষ্য, আমার উপাসক! আমার দিগ্বিজয়ী সাহিত্যিক কীর্তির সামনে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে সম্ভ্রমে ও একেবারে আত্মহারা হ'য়ে পড়তো। আমার দুটো পদ্য কলকাতার মাসিক পত্রে ছাপা হয়েছে, সত্যি-সত্যি ছাপা হয়েছে! আমি দস্তুরমতো বড়োদের মতো বিছানায় শুয়ে মুখ বুজে ইংরেজি গল্পের বই পড়ি! ওঃ—ভবভূতির পূজা, তা ছিলো যেমন অযাচিত, তেমনি সম্পূর্ণ, নিঃসংশয়। শুধু ওর চোখে নয়, ওর পরিবারের চোখেও আমি ছিলুম ছোটোখাটো একটি দেবতা। ওর বাবা নিজে পড়াশুনোয় বেশিদূর এগোতে পারেননি ; ভবভূতিও ইস্কুলের পরীক্ষাগুলো অতি কষ্টে পাশ ক'রে যাচ্ছে মাত্র, তাও সব সময় করে না (অথচ, পড়াশুনোয় ও যে অবহেলা করে তা নয়, বরং রোজ সকাল-সন্ধ্যায় বইপত্র নিয়ে ব'সে অ্যাঁ-অ্যাঁ সুর ক'রে ঘাড় দুলিয়ে-দুলিয়ে পড়া মুখস্থ করে)। ওর বাবা, তাই, আমার সঙ্গে ওর বন্ধুতাকে একটা পরম শুভ ঘটনা ব'লে গ্রহণ করেছিলেন ; অনেক সময় আমাকে মুখ ফুটেও বলতেন : 'সবাই তোমার মতো হবে, তা তো আর আশা করা যায় না ; তবে তোমার সঙ্গে থেকে ছেলেটার যদি কিছু হয়! তুমি ওকে একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়ো।' আমি ফ্ল্যাটার্ড হতাম, লজ্জিত হতাম, একটু যে গর্ব অনুভব না করতাম, তা-ও নয়। ওদিকে ভবভূতি এ-কথায় লেশমাত্র অবমাননা বোধ করতো না ; বরং আমার বন্ধুতা-অধিকারের গৌরবে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করতো। আমি যে ওর বাড়ির লোকের কাছ থেকেই অতিরিক্ত সম্মান ও আদর পেতুম, তাতে ওর মনে

মুহূর্তের জন্য ঈর্ষার উদ্রেক হওয়া দূরে থাকে, ওর সমস্ত অন্তরাত্মা আনন্দে জ্বলজ্বল করতো। কারণ, ঈর্ষা আমরা তাদেরই শুধু করি, যাদের সমপদস্থ জ্ঞান করি। আমার পক্ষে ফোর্ড সাহেবের ঐশ্বর্য ঈর্ষা করা স্রেফ পাগলামি ; তেমনি, ভবভূতি আমাকে ওর চাইতে এতই উচ্চ স্তরের জীব ব'লে ভাবতো যে আমাকে ঈর্ষা করার কথা স্বপ্নেও ওর কখনো মনে হ'তে পারতো না। আমার চোখ-ধাঁধানো দীপ্তির মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেয়াই ছিলো ওর সর্বোচ্চ সুখ।

তাই ব'লে এ-কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে ওর সঙ্গে আমার বন্ধুতায় কোনোরকম ভেজাল ছিলো। ও ছিলো আমার একান্ত একনিষ্ঠ অনুচর, পার্শ্ববর্তী ছায়া, তা ঠিক ; কিন্তু তার চেয়েও বেশি সত্য এই যে আমি ওকে ভালোবাসতাম ; ওকে না-হ'লে কোনো কাজ আমার সম্পূর্ণ হ'তো না, মনের সব কথা বলতাম ওর কাছে। আমাদের ছিলো—যেমন শৈশবের সব বন্ধুতাই হ'য়ে থাকে—নিবিড়, অবিচ্ছেদ্য অন্তরঙ্গতা ; কোনোকালে পরস্পরের ছাড়াছাড়ি—তা যতই স্বল্পস্থায়ী, যতই সঘন-পত্র-ব্যবহারে বিকম্পিত হোক—কোনোকালে যে ছাড়াছাড়ি হবে, তা মনে করতেই প্রায় চোখে জল এসে যেতো। এ-বিষয়ে আমাদের কারো মনেই কোনো সন্দেহ ছিলো না যে মৃত্যু—সভয়ে, পবিত্র রুদ্ধস্বরে আমরা কথাটা উচ্চারণ করতাম—মৃত্যু পর্যন্ত আমরা বন্ধু থাকবো। ভবভূতিকে বলতাম ভবিষ্যতের জন্য আমার সমস্ত প্ল্যান ; শুনতে-শুনতে ওর চোখের ভীত, অসহায় ভাব কেটে গিয়ে তখনকার মতো সেখানে এক আশ্চর্য উজ্জ্বলতা ফুটে উঠতো ; বিহ্বল নিচু গলায় জিগেস করতো, 'তুই হাইকোর্টের জজ হবি—হ্যাঁ রে?'

তাচ্ছিল্যের স্বরে আমি বলতাম, 'তা তো হবোই।'

'হাইকোর্টের জজদের কী করতে হয়?'

সে-বিষয়ে আমার মনেও খুব স্পষ্ট ধারণা ছিলো না ; কিন্তু, আমার সাত পুরুষ যেন হাইকোর্টের জজিয়তি করেছে, এইভাবে আমি ব'লে দিতাম, 'বাঃ, তা আর কে না জানে।'

এই ব্যাখ্যাতেই তৃপ্ত হ'য়ে ভবভূতি জিগেস করতো, 'কত মাইনে পায় তারা?'

'ওঃ, ঢের!'

একটু ভেবে ভবভূতি বলতো, 'পাঁচ শো?'

'দূর বোকা!' আমি আমার কল্পনাকে উদ্দাম ক'রে ছেড়ে দিতাম, 'হাজার-হাজার টাকা।'

'সেই কাজ তুই করবি!' বিস্ময়ে, আনন্দে ওর চোখ যেন ফেটে পড়তো। মুহূর্তের এক ভগ্নাংশের জন্য সেখানে একটু সন্দেহের ছায়াপাতও হ'তো বোধহয়, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই সেই বিশ্বাসঘাতক সংশয়কে যেন দুই হাতে ঠেলে ও ব'লে উঠতো, 'করবি বইকি, নিশ্চয়ই জজিয়তি করবি তুই।' এমনভাবে বলতো যেন কাজটা ঠিক আমার উপযুক্তও নয়। সত্যি বলতে, নিজের উপর আমার যতটা বিশ্বাস ছিলো, আমার উপর ভবভূতির আস্থা ছিলো তার চেয়ে অনেক বেশি। শেষ পর্যন্ত, জজিয়তিটা আমার ফশকে যেতে পারেও বা, এ-রকম একটা সন্দেহের উদ্রেক তখনই আমার মাঝে-মাঝে হ'তো। সেই অনুসারে, আমি অন্য রকম প্ল্যান করতুম। কখনো বা বৈষয়িকতায় ক্লান্ত হ'য়ে সংকল্প করতাম, সন্নেসি হবো। কিন্তু নিয়ত-পরিবর্তনশীলতার মধ্যে একটা উদ্দেশ্য আমার স্থির ছিলো, আমার সাহিত্যের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কখনো ব্যত্যয় হয়নি। এবং ভবভূতির কাছে সেই সব আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা উজাড় ক'রে ঢেলে দেয়া—আমাদের বন্ধুতার তা-ই ছিলো উচ্চতম স্বর্গ। কত রবিবারের দুপুর মাসিকপত্র পরিচালনার উপলক্ষ্যে ভবিষ্যৎ-রচনার দীর্ঘ, গোপন গুঞ্জনে কেটে গেছে। আমার সেই পত্রিকার মলাটে নানা রঙের কালি দিয়ে বিচিত্র সব চিত্র কী আনন্দ আর কত কষ্ট নিয়েই ও যে আঁকতো! চিত্রকলা সম্বন্ধে আমার রুচি বিকশিত হ'তে তখনো দেরি ছিলো ; ও যা আঁকতো—আঁকাবাঁকা লতাপাতায় ঘেরা পত্রিকার ও আমার নাম—তা-ই তখন ভালো লাগতো আমার, আন্তরিক প্রশংসা করতুম। আমার প্রশংসায় ও চঞ্চল, উদ্‌ভ্রান্ত—অনেকটা আত্মহারা হ'য়ে পড়তো ; এলোমেলোভাবে বলতো, 'না, এটা কিছুই হয়নি : সামনের মাসেরটা আরো ভালো ক'রে এঁকে দেবো।' এখন বুঝতে পারছি, আমি যদি ওকে পর-পর ছবির ফরমাশ দিয়ে, দশটা

প্রত্যাখ্যান ক'রে, অনিচ্ছাসত্ত্বে একাদশটা গ্রহণ করতাম, যদি ছোটোখাটো একটি অত্যাচারীর মতো ওকে ব্যবহার করতাম, তাহ'লেই ও সবচেয়ে সুখী হ'তো।

ভবভূতির কার্যকলাপ ছবি আঁকাতেই সীমাবদ্ধ থাকতো—, ও-ও যে লিখতে পারে—এবং সে-লেখা, যে-মলাটটা ও এত যত্নে এঁকে দেয়, তার ভিতরে স্থান পেতেও পারে, এ-কথা ভাববার দুঃসাহস ওর কখনো হ'তো না, যদি না আমি ওর মাথায় তা ঢুকিয়ে দিতাম। আমার বালক-কালের সেই অবিবেচনার জন্য এখন মাঝে-মাঝে অনুতাপ হয়। যদি সে-জন্য না হ'তো, তাহ'লে ভবভূতি—হ্যাঁ, দুঃখ পেতো—কারণ পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে দুঃখের হাত থেকে নিস্তার নেই—কিন্তু এতটা হয়তো পেতো না। তাহ'লে সংসারের সাধারণ সুখেদুঃখে, আশায়, ব্যর্থতায় ও-ও ওর জীবন একরকম ক'রে কাটিয়ে দিতে পারতো—আর পাঁচজন যেমন কাটায়। কিন্তু অজ্ঞাতে বালক বয়সের অজ্ঞান খেলাচ্ছলে আমি যে-ভুল ক'রে ফেলেছিলাম, অনেক বছর পরে সেই ভুলের ফল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ক'রে স্তম্ভিত হ'তে হ'লো। সাধারণতার মসৃণ স্বর্গ থেকে ও ভ্রষ্ট হ'লো, তার বদলে লাভ করলো—কী? অপরিসীম হতাশা, তিক্ত, তিক্ত আত্ম-গ্লানি। সাহিত্যিক হবার দুর্বাসনা যদি ওর কখনো না হ'তো, তাহ'লে বিয়ে ক'রে, সন্তানোৎপাদন ক'রে, দীন, অজ্ঞাত অবস্থার আরামময় অন্ধকারে ও দিব্যি বসবাস করতে পারতো : এ-কথা স্বপ্নেও ওর মনে হ'তো না যে কারো চাইতে ও খারাপ আছে বা ভাগ্য ওর উপর কোনো অবিচার করছে। এই দুঃখের পৃথিবীতে একজন মানুষের অকাবণে অসুখী হবার মূলে ছিলাম আমি, আমার অপব্যয়িত জীবনের এটা অন্যতম কুকার্য।

যথাসময়ে ভবভূতি একদিন তার প্রথম সাহিত্যিক প্রচেষ্টা এনে আমাকে দেখিয়েছিলো—সে যে কত লজ্জায়, কত ভয়ে-ভয়ে, তা লক্ষ্য ক'রে তখনই আমি মনে-মনে হেসেছিলাম। ব্যাপারটা একটা পদ্য ; প'ড়ে আমি—খুব আন্তরিকভাবে নয়—বলেছিলাম, 'চমৎকার হয়েছে।' আমাব সেই প্রশংসায় ভবভূতি এমনই অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলো যে খানিকক্ষণ পর্যন্ত ভালো ক'রে কথা বলতে পারেনি। তারপব থেকে আমার মাসিক-পত্রের ও হ'যে উঠলো একজন নিয়মিত লেখক , ওর বাবা ছেলেব এই আকস্মিক সাহিত্যিক প্রতিভার উদ্দাম দেখে উল্লসিত হ'যে উঠলেন ; এবং আমাব মতো একজন তুখোড় ছেলেব সঙ্গলাভেব কিছু-না-কিছু ফল যে ফলবেই, এ-কথা চর্তুদিকে প্রচাব ক'রে বেড়াতে লাগলেন। ছেলেবেলায়, আর যা-ই হোক, সমালোচনার ক্ষমতা জন্মায না, কিছুদিনের মধ্যে ভবভূতিব পদ্য আমাব সত্যি-সত্যি ভালো লাগতে আরম্ভ করলো। অবশ্য আমাব নিজেব লেখার মতো নয়—পাগল! তা-ও কি কখনো হ'তে পারে?—কিন্তু ঠিক আমার পরেই ; শুধু আমার লেখার চেয়ে নিকৃষ্ট। এ-বিষয়ে আমার মতের সঙ্গে ভবভূতির বিলক্ষণ ঐক্য ছিলো ব'লে মনে হয়, কারণ যখনই আমি ওকে কোনো প্রশংসার কথা বলতুম, তখনই ও ব'লে উঠতো, 'তুমি যা লেখো, রামতনু, তুমি যা লেখো!' বা ঐ ধরনের অন্য কোনো কথা। যা-কিছু আমি লিখতুম, ও প'ড়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতো ; বলতো, 'তুমি যা-ই বলো, এ-রকম আমি কখনো লিখতে পারবো না।' আসলে, আমি করতাম রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি, আর ভবভূতি করতো আমার প্রতিধ্বনি। অনুকরণেব জন্য আমার চেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি ও খুঁজে পেলো না, এ থেকেই আমার বুঝতে পারা উচিত ছিলো যে সাহিত্যে ওর কিছু হবে না।

পুরো দু-বছর ভবভূতির সঙ্গে আনার চলেছিলো অবিচ্ছিন্ন বন্ধুতা ; এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে—ও-বয়সের পক্ষে যেটা আশ্চর্য—একদিনের জন্যও আমাদের ঝগড়া হয়নি। তার পরে এলো সেই সময়—ওঃ, অসহ্য, অসহ্য সময়—যখন আমাদের ছাড়াছাড়ি হ'তেই হবে। বীরের মতো হাসবার চেষ্টা ক'রে আমরা পবস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম , পরবর্তী জীবন একসঙ্গে কাটাবার বিস্তারিত প্ল্যান দু-জনের মধ্যে আবদ্ধ রইলো। একজনকে না-হ'লে কোনো কাজে, কোনো আনন্দে, কোনো সার্থকতায় আর-একজনের চলবে না, দু-জনের মনে-মনে এই রইলো গোপন, গম্ভীর প্রতিজ্ঞা।

কিন্তু ছেলেবেলাকার বন্ধুতা—তা গভীর হয়, অন্তরঙ্গ হয়, পারস্পরিক নিঃশেষিত আত্ম-সমর্পণে উচ্ছ্বসিত হয়, কিন্তু স্থায়ী হয় না, হ'তে পারে না, বয়স বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে তা ভেঙে পড়তে

বাধ্য। কারণ, শৈশবে আমাদের বিচার-বুদ্ধি হয় না ; কার সঙ্গে নিজের ঠিক মানাবে, তা বোঝবার ক্ষমতা হয় না ; তাছাড়া, মনটা থাকে নরম, হাতের কাছে যাকে পাওয়া যায়, তাকেই ভালো লাগে, মন তারই জন্য পাগল হ'য়ে ওঠে। খুব সহজেই তখন ভালোবাসা যায় ; মনটা ভালোবাসবার জন্য তৈরিই হ'য়ে থাকে, কোনো-একটা উপলক্ষ্য পেলেই হ'লো। যার চরিত্রের যেটা বিশেষত্ব, সেগুলো থাকে চাপা ; খোঁচা-খোঁচা হ'য়ে কোথাও কিছু ফুটে নেই ; দু-জনে মানুষ, তাই, অনায়াসে পরস্পরের মধ্যে মিশে যেতে পারে, কোনোখানে এতটুকু আটকায় না। কিন্তু যৌবনের সূচনার সঙ্গে-সঙ্গে—যখন আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বিকশিত হ'য়ে উঠতে থাকে—তখন দেখা যায়, বালক-কালের সব বন্ধুতাই ভুল হয়েছিলো, সদ্য-জাগ্রত প্রকৃত নিজত্বের আলোয় সেই সব পরম, পরম অন্তরঙ্গদের কী হাস্যকর, কী অসম্ভব মনে হয়! ভেবে অবাক লাগে, ওদের সঙ্গে কী ক'রে কখনো মিশতে পেরেছিলাম। এবং তাদের সম্বন্ধে শুধু এই আকাঙ্ক্ষা মনে জাগে—আর যেন কখনো তাদের সঙ্গে দেখা না হয়। কারণ, দেখা হ'লে ব্যাপারটা এমন বিশ্রী হয়—এমন অস্বস্তিকর। এমনকি, লজ্জাকর। লজ্জা হয়, পুরোনো বন্ধুতার মর্যাদা রাখতে পারছি না ব'লে ; এই স্বল্পবুদ্ধি, বাজে চালিয়াৎ গোছের ছোকরার সঙ্গে কখনো অন্তরঙ্গ ছিলুম, এ-কথা মনে ক'রে। (এবং এ-ধারণা পারস্পরিক, সন্দেহ নেই ; আমার 'বন্ধু'ও আমার সম্বন্ধে যা ভাবতে থাকে তা মোটেও সুশ্রাব্য নয়। না, এ-ধরনের পুনর্মিলন না-হওয়াই ভালো, না-হওয়াই ভালো। আমরা দু-জনে দু-দিক দিয়ে বেড়ে উঠেছি, আমাদের চরিত্রের জন্মগত বিবোধিতা এতদিনে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে ; বনিবনা অসম্ভব।) বন্ধুতা স্থাপন করবার সবচেয়ে ভালো সময় হচ্ছে প্রথম যৌবন ; যখন আত্মচেতনার উন্মেষ হয়, অথচ মনটা যখনও কঠিন হ'য়ে ওঠে না ; যখন আমাদের নির্বাচন করবার ক্ষমতা জন্মায়, অথচ হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলো তাদের মৌল সজীবতা, উন্মুখতা হারিয়ে ফেলে না। তখন পর্যন্ত নানারকম সাংসারিক সংঘাতের ফলে আমরা সাবধানী, সতর্ক হ'য়ে উঠি না ; নিজের চারদিকে নিরাপদ আড়াল রচনা করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকি না ; নিশ্চিন্ত আত্ম কেন্দ্রিকতার সমতলভূমি থেকে অন্তরঙ্গতার দুর্গম, বিপজ্জনক, উন্মুক্ত শিখরে আরোহণ করতে ভয় পাই না। সেই হচ্ছে বন্ধুতা করবার বয়স, জীবনের সেই মধুরতম সময় ; সেই সব বন্ধুতাই স্থায়ী হয়—যদি এই পৃথিবীর কোনো-কিছুকে স্থায়ী বলা যায়। সেই সময়ে স্থাপিত বন্ধুতা নিয়েই বাকি জীবন কাটাতে হয় ; পরবর্তী জীবনে আমরা সঙ্গী পাবো, সহকর্মী পাবো ; স্ত্রী, পরিজন, অনুচর—এ সমস্তই পাবো ; কিন্তু বন্ধু সেই পুরোনো যারা ছিলো, তারাই থাকবে, নয়তো আদৌ থাকবে না। একটা বয়স আছে, যার পরে আর নতুন বন্ধু করা যায় না। আমাদের মন তখন শক্ত হ'য়ে উঠেছে, সন্দিহান, আত্মরক্ষণশীল; কোনো পরিচয়ই তখন নিবিড়ভাবে পরিণত হ'তে পারে না ;—কাউকে খুব ভালো লাগে, প্রচুর মেলামেশা করি তার সঙ্গে ; কিন্তু একটা জায়গায় বাধা থেকেই যায়, সেখানে লেশমাত্র আক্রমণ হ'লে আমরা সমস্ত শক্তি দিয়ে তা রোধ করি। —হ'তে পারে, সচেতনভাবে নয়, কিন্তু রোধ করি, ভয়ে নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে ফেলি। প্রথম সূচনাতেই সে-সম্ভাবনাকে নষ্ট ক'রে দিই।

অনিবার্যরূপে, ভবভূতি আমার মন থেকে লুপ্ত হ'য়ে গেলো। আমি বড়ো হ'য়ে উঠলাম, পৃথিবীর দিগন্ত হঠাৎ বহু দূর অবধি বিস্তীর্ণ হ'য়ে পড়লো ; দক্ষিণ-পক্ব দ্রাক্ষার মতো, আমার নতুন যৌবনাক্রান্ত মনে রসভারাতুর বন্ধুতা ঘনীভূত হ'য়ে উঠলো। তখন কোথায় বা গেলো ভবভূতি—আর কোথায় তার হাস্যকর, অসম্ভব সব পদ্য! ওর সঙ্গে কখনো আবার দেখা হবে আশা করিনি ; কিন্তু ভাগ্যবিধাতার ইচ্ছে ছিলো অন্যরকম। ইন্টারমিডিয়েট পড়বার সময় আমার জীবনে আবার ভবভূতির উদয় হ'লো। বয়সে ও আমার বছর দু-একের বড়ো ছিলো ; দ্বিতীয় চেষ্টায় দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ ক'রে ভরতি হ'লো এসে ঠিক আমার বছরেই। আমাদের এত যত্নে তৈরি করা সব প্ল্যান কবে ভুণ্ডুল হ'য়ে, ধুলো হ'য়ে, উনপঞ্চাশ বায়ুতে মিলিয়ে গিয়েছিলো তা মনেও নেই ; কিন্তু আমাদের অলক্ষ্যে চলছিলো অদৃষ্টের প্ল্যানহীন, নিয়মহীন উচ্ছৃঙ্খলতা, তারই ফলে ভবভূতি আবার আমার সঙ্গে এসে জুটলো।

সত্যি কথাটা যদি বলতেই হয়, ভবভূতির মতো ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করাবার চেষ্টা শুধু যে অর্থহীন, তা নয়, একাধিকভাবে ক্ষতিকর। সাধারণের চেয়েও নিচু দরের মস্তিষ্কে উচ্চশিক্ষা প্রবেশ করাবার চেষ্টা—তা এতই নিষ্ফল যে তা হাসিরও উদ্রেক করে না। অথচ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা আমাদের দেশের কঠিনতম কুসংস্কারের অন্যতম। কত কষ্ট, কত কঠোর ত্যাগ স্বীকার ক'রে কোনো-কোনো বাপ-মা ছেলেকে (তাও এমন ছেলেকে যে-কোনোরকম শিক্ষা গ্রহণ করতে যে জন্ম থেকে অক্ষম) 'শিক্ষিত' করবার অদম্য প্রয়াসে গলদঘর্ম হ'য়ে যান, তা দেখলে মর্মাহত হ'তে হয়। শাদা যুক্তি দিয়ে বিচার করলে, ভবভূতিকে কলেজে ভরতি করানো তার বাবার পক্ষে সুবুদ্ধির অভাব ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না ; তাঁর একমাত্র কর্তব্য ছিলো, কোনো-একটা সুযোগ পাওয়ামাত্র তাকে যে-কোনো একটা কাজে ঢুকিয়ে দেয়া ; তাতে অর্থ ও সময় দুয়েরই ব্যয়সংকোচ হ'তো। কিন্তু এটাও কিছু কম সত্য নয় যে জীবনের দিকে সব সময় শাদা চোখে তাকানো যায় না, আশার মায়াবী আলো দৃষ্টিকে তোলে রঙিন ক'রে। ভবভূতির বাবার নিজের জীবনে যে-সব আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়েছিলো, তিনি আশা করেছিলেন, দুরাশা করেছিলেন, ছেলেকে দিয়ে সেগুলোর পরিপূর্ণতা সাধন করবেন। বিদ্যার উপর ভদ্রলোকের একটা অমানুষিক সম্ভ্রম ছিলো—সেটা কুসংস্কারেরই শামিল। ঢাকায় তাঁর এক পিসতুতো শালা ওকালতি করতেন, বেশ সচ্ছল তাঁর অবস্থা। তাঁর বাসায় থেকে ভবভূতি কলেজে পড়বে—এই রকম ব্যবস্থা হ'লো। পৃথিবীর পরিচালনায় যদি লেশমাত্র ন্যায়জ্ঞান থাকতো, তাহ'লে ওর বাবার আন্তরিক ইচ্ছার জোরেই ভবভূতি বিদ্যার্জনে কিছু-না-কিছু সক্ষম হ'তো। কিন্তু সত্যি-সত্যি ব্যাপার যেমন...

যা-ই হোক, আশাতীত, অবাঞ্ছিত, ভবভূতি আমার জীবনে পুনঃপ্রবেশ করলো। কলেজের দুর্বিষহ অবসরের ঘণ্টায় একদিন কমন-রুমে ব'সে পাঞ্চ পত্রিকার রসিকতা প'ড়ে হাসবার চেষ্টা করছি, এমন সময় অনুভব করলাম, উল্টো দিকের একটা চেয়ার থেকে একজনের দৃষ্টি বারে-বারেই আমার উপর নিবদ্ধ হচ্ছে। চোখ তুলতেই—মুহূর্তের জন্যও চিনতে না-পারা সম্ভব ছিলো না—আমার বন্ধু ভবভূতিকে দেখলাম। আমার মুখ দিয়ে অজান্তে বেরিয়ে গেলো, 'আরে!'

ভবভূতি উঠে এসে আমার পাশে বসলো। যখন দাঁড়ালো লক্ষ্য করলাম, লম্বায় ও অদ্ভুতরকম, অসংগতরকম বেড়েছে। কিন্তু ওর চোখে এখনো সেই অসহায়, কাতর দৃষ্টি ; তার উপর, প্রথম যৌবনোন্মেষের ফলে ওর চলাফেরায়, ধরন-ধারণে কেমন একটা অস্বস্তির ভাব, একটু বিসদৃশতা—নিজের সম্বন্ধে ও যেন অত্যধিকরূপে, কষ্টকররূপে সচেতন। ওর রোগা (কারণ রোগা ও প্রায় আগের মতোই আছে, লম্বা শরীর মূর্তিমান একটা অ্যাপলজির মতো—এমন বিনীত, সংকুচিত, সন্ত্রস্ত ; কোনো ভঙ্গিতে বা আচরণে পাছে কোনো অপরাধ ক'রে ফেলে, এই ভয় সব সময় ওকে হানা দিচ্ছে ; এবং ভয় পেয়ে ঠিক এমন সব কাণ্ড ক'রে ফেলেছে যেটা লোকচক্ষে প্রায় অপরাধেরই পর্যায়ে পড়ে। নাকের নিচে ওর গোঁফের রেখা বেশ স্পষ্ট, পুরু হ'য়েই ফুটে উঠেছে ; লক্ষ্য ক'রে দেখলে থুৎনিতে দু-এক গাছা দাড়িও চোখে পড়ে। মাথার চুল ঘাড় আর কান বেয়ে ঝুলে পড়েছে, তাতে যথেষ্ট তৈল-প্রয়োগান্তে টেরি কাটবার প্রশংসনীয় চেষ্টার চিহ্ন বিরাজমান। গায়ে একটা আধ-ময়লা ছিটের শার্ট ; তার গলার বোতামটা আটকানো, কিন্তু বুকেরটা অনুপস্থিত থেকে বক্ষোস্থলে সদ্য-বিকাশোন্মুখ রোমরাজির আভাস দিচ্ছে। না, একবার ওর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে মুহূর্তের জন্যও আমার পক্ষে ভুল করা সম্ভব ছিলো না।

ভবভূতি মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'তোমাকে দেখে কী যে খুশি হলাম, রামতনু—'

আমি—খুব সোৎসাহে নয়—বললাম, 'আমিও তা-ই!'

তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটলো। পাঞ্চ-এর একটা ছবির উপর দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ ক'রে আমি ভাবতে লাগলাম, এর পরে কী বলা যায়? কী বলা যায়? আমার কপাল ভালো, তখনই ঘণ্টা বাজলো। তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে আমি বললুম, 'একটা ক্লাশ আছে—আবার দেখা হবে।'

স্বীকার করবো, প্রথম থেকেই ভবভূতিকে আমি একটু দূরে-দূরে রাখবার চেষ্টা করেছিলাম। আভাসে-ইঙ্গিতে—এমনকি, অনেকটা স্পষ্টভাবে—তাকে বুঝতে দিয়েছিলাম যে তার আর আমার মধ্যে যে-স্বাভাবিক ব্যবধান গ'ড়ে উঠেছে, তা অতিক্রম করতে আমি ইচ্ছুক নই। অবশ্য অতিক্রম করা যে আমার পক্ষে সম্ভব হ'তো তা-ও নয় ; যদি চেষ্টা করতাম, তার ফল হ'তো আমার পক্ষে শুধু যন্ত্রণাদায়ক, এবং ভবভূতিও তাতে বিশেষ আরাম বোধ করতো না। সুতরাং প্রথম থেকেই আমি সাবধান হয়েছিলাম। যে-পরিচয়কে বেশি দূর যেতে দেবার ইচ্ছে আপনার নেই, তাকে প্রথম থেকেই নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, নয় তো একবার প্রশ্রয় দিয়ে ফেললে, পরে আর সামলানো যায় না। সূচনাতেই আমি রাশ টেনে দিয়েছিলাম, পরে যাতে বিপদে পড়তে না হয়। আমার কোনো দোষ ছিলো না ; ভবভূতিকেই বা কী দোষ দেবো? দোষ আমাদের মধ্যবর্তী সময়ের। ভবভূতির সঙ্গে আমার শেষ দেখা হবার পর হাওড়া পুলের নিচ দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে : অনিবার্যরূপে, আমরা পরস্পরের অনেক, অনেক দূরে স'রে এসেছি। সময় যেখানে তার অদৃশ্য হাত দিয়ে জীবনের ছবির রং বদলে দিয়ে যায়, আমরা সেখানে কী করতে পারি? ভবভূতির সঙ্গে আমার ভাসা-ভাসা আলাপের চাইতে বেশি কিছু সম্পর্ক থাকবে, সে-রকম কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না। যদি ছেলেবেলাকার বন্ধুতার খাতিরে, কর্তব্যবোধ থেকে, জোর ক'রে আমি ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে যেতাম, তাহ'লে যেটুকু হৃদ্যতা ওর সঙ্গে ছিলো, তাও বজায় থাকতো না ; একদিন বাধ্য হতাম পাকাপাকি রকম ঝগড়া করতে। কোনো সন্দেহ নেই, তার চেয়ে এ-ই ভালো হয়েছে—এই ঈষদুষ্ণ, উত্তেজনাহীন পরিচয়। আর, ভবভূতিও এর বেশি কিছু চায়নি, আশা করেনি . এর বেশি কিছু পেলেই ও বিব্রত হ'য়ে পড়তো। আমার প্রতি ওর বালক-কালের ভক্তি নতুন উৎসাহে জেগে উঠলো ; নিঃশব্দে, শান্তভাবে, অলক্ষ্যে ও আমার সঙ্গে যুক্ত করলো নিজেকে ; আঠার মতো আটকে রইলো। অবশ্য আমার তাতে কোনো ক্ষতি হ'তো না ; ভবভূতি ছিলো সেই জাতের মানুষ, যাদের উপস্থিতি স্বচ্ছন্দে ভুলে থাকা যায়। ও বিরক্ত করতো না, কাজে বাধা দিতো না , ও কাছে থাকলেও অনায়াসে নিজের কাজ বা অন্য কারো সঙ্গে গল্প করা যেতো ; নিজেকে লুপ্ত ক'রে দেবার ক্ষমতা ছিলো ওর অসাধারণ। তাছাড়া, কাছাকাছি ও বেশি থাকতোই না : ওর ভক্তিনিবেদন প্রধানত ছিলো দূর থেকে। কোনোদিক দিয়েই যে ভবভূতিতে বিশেষ কিছু এসে যেতো তা নয়।

সেই সময়ে সাহিত্যক্ষেত্রে আমি একটু-একটু পরিচিতি হ'তে আরম্ভ করেছি। এবং তা নিয়ে ভবভূতির কী উল্লাস ; ওর ম্লান মুখে, চোখের ভীত দৃষ্টিতে কী আশ্চর্য দীপ্তির বিদ্যুৎ-স্ফুরণ! ওর আনন্দ দেখে তখনকার মতো আমারও যেন একটু আনন্দ হ'তো—কোনো এক নব্য মাসিকপত্রের আমি নিয়মিত লেখক-শ্রেণীর অন্তর্ভূত হয়েছি, ভবভূতির চোখে এ যেন একটা দিগ্বিজয়ের মতো ব্যাপার। 'আমি জানতুম, আমি আগাগোড়াই জানতুম, রামতনু, যে তুমি মস্ত কিছু না-হ'য়ে যাবে না!' 'দেখেছো, রামতনু, এ-মাসের অরুণোদয় তোমার কবিতা সম্বন্ধে কী লিখেছে?' 'ক্ষণপ্রভার সাহিত্য-সমালোচনা পড়েছো? মাথাখারাপ না-হ'লে কেউ অমন গায়ে প'ড়ে ঝগড়া করে?' ভবভূতির স্তুতিতে কুণ্ঠা ছিলো না, শ্রান্তি ছিলো না, বিচারবোধ ছিলো না, মাত্রাজ্ঞান ছিলো না। আমার তৎকালীন সাহিত্যসৃষ্টির এই অতিরঞ্জিত, হাস্যকর মূল্যাকরণে প্রত্যেক মানুষের যে-মজ্জাগত ভ্যানিটি আছে, সেখানে আমারও যে একটু কণ্ডুয়ন না-হ'তো তা নয় ; কিন্তু তা হ'লেও ভবভূতির উচ্ছ্বাস শুনতে-শুনতে ক্লান্তিবোধ না-ক'রে পারতুম না। কারণ, ভবভূতির ছিলো সেই বিকৃত ক্ষমতা, যাতে নিজের প্রশংসার মতো প্রীতিকর বিষয়ও ওর মুখ থেকে শুনলে অসহ্য লাগতো। আমি অন্যমনস্ক হ'য়ে যেতুম, অন্যদিকে তাকিয়ে হাই চাপতুম, চেষ্টা করতুম প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে ; কিন্তু ভবভূতি তার করুণ, অসহায় ধরনে আঁকড়ে ধ'রে থাকতো, আঠার মতো আটকে থাকতো ; সাহিত্য প্রসঙ্গ থেকে ওকে স্খলিত করা সম্ভব হ'তো না। ও যেন আমার ভিতর দিয়ে ওর অপরিপূর্ণ—এবং অপূরণীয় খ্যাতি-লিপ্সাকে চরিতার্থ করতো ; পরোক্ষে, বিচিত্র সম্ভাবনায় উজ্জ্বল সাহিত্যিক জীবন বাঁচতো। তা-ই আমার মনে হয়েছিলো—অন্তত প্রথমটায়। কিন্তু কিছুদিন যেতেই টের পেলুম যে

ভবভূতির একটা নিজস্ব— হোক তা অতি গোপন, কৌমার্যের লজ্জা-জড়িত—উচ্চাকাঙ্ক্ষাও আছে। বাল্যকালে তার মনে যে-বীজ সঞ্চারিত হয়েছিলো— সে-অপরাধ আমার, আমার!—এখন পর্যন্ত কঠোর অধ্যবসায়ে সে তাকে লালন ক'রে এসেছে। একটু বিস্মিতই হ'লাম। সত্যি বলতে, ভবভূতির কাছ থেকে এতটা আশা করিনি।

কী কঠিন চেষ্টায় তার প্রবল লজ্জা জয় ক'রে ভবভূতি আমাকে তার ইদানীংকার কাব্য-প্রচেষ্টা দেখিয়েছিলো, তা আমি সহজেই বুঝতে পারি। অনেকক্ষণ ধ'রেই সে এ-কথা ও-কথায় ভূমিকার অবতারণা করছিলো। ব্যাপারটা তার পক্ষে একটু সহজ করবার জন্য আমিই বলেছিলাম, 'তুমি আজকাল আর লেখো না?'

'না—না, আমি আর কী লিখবো...না, আমি—হ্যাঁ, এই একটু-আধটু—' ভবভূতি এলোমেলোভাবে কথাটা অসমাপ্ত রাখলো।

তখন আমার বলা কর্তব্য হ'লো : 'আমাকে দু-একটা দেখালেও তো পারো।'

অনেক আগেই লক্ষ্য করেছিলুম, ভবভূতির জামার বুক-পকেট কাগজের তাড়ায় উঁচু হ'য়ে আছে। কাগজগুলো যে কী, তাও আমার বুঝতে বাকি ছিলো না। এইবার—শীতের সকালে লোকে যেমন ক'রে লোকে পুকুরে ঝাঁপ দেয়, তেমনি, চোখ-মুখ বুজে, দাঁতে দাঁত লাগিয়ে ভাবভূতি তার বুক-পকেটস্থ কাব্য-ভাণ্ডার আমার সামনে উজোড় ক'রে দিলে। আমি একটা পড়লাম, দুটো পড়লাম, তারপর বললাম, 'হুঁ'!

কাগজের দিকে তাকিয়েও আমি বুঝতে পারছিলাম, ভবভূতি রুদ্ধশ্বাসে, অনিমেষ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এইবার ঢোঁক গিলে ব'লে উঠলে, 'কেমন?'

আমি অম্লানমুখে—কারণ সেটাই সবচেয়ে সহজ ছিলো—বললাম, 'চমৎকাব লাগলো।'

'না—সত্যি বলো!' উৎকণ্ঠায়, আনন্দে ওর গলা কেঁপে গেলো।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, 'সত্যি বলছি।' সঙ্গে-সঙ্গে ভবভূতির সমস্ত মুখে-চোখে এমন এক আশ্চর্য রূপান্তর ঘটলো যে এই নির্লজ্জ মিথ্যাভাষণের জন্য নিজেকে আমি ধন্যবাদ দিলাম। এই দুঃখের সংসারে, তখন আমার মনে হয়েছিলো, এতখানি আনন্দ আনবাব ক্ষমতা যদি একটা মিথ্যার থাকে—কিন্তু আম্মার ভুল হয়েছিলো , তখনো বিচার কববার সময হয়নি।

তারপর থেকে ভবভূতি প্রায়ই আমাকে দেখাবার জন্য তার পদ্য নিয়ে আসতো—একটা নয়, দুটো নয় ; রাশি-রাশি, অজস্র—শরতের সকালে ঝ'রে-পড়া শেফালির মতো, বর্ষায় গ্রামের পুকুবে কচুরি-পানার মতো অগুনতি। রুল-টানা, মসৃণ কাগজে কোণবহুল হস্তাক্ষরে লেখা তার সব পদ্য—ও যে ধৈর্য ধ'রে অত লিখতে পারতো সেই জন্যেই ওকে প্রশংসা করতে হয়। শুধু অবিশ্রান্ত, অক্লান্ত লিখে যাবার ক্ষমতা যদি কাব্য-বিচারের একটা মান হ'তো, তাহ'লে ভবভূতির আসন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যেও অনেক উপরে প্রতিষ্ঠিত হ'তো, সন্দেহ নেই। ওর সঙ্গে আমার যখন ছাড়াছাড়ি হয়, তারপর থেকে এই ক-বছর ধ'রে ও অবিচলভাবে কবিতা লেখার চর্চা করেছে, এত লেখা ওর জমেছে—একদিন ও আমার কাছে স্বীকার ক'রে ফেললো—যে ছোটো একটা পোর্টম্যান্টো তাতে ভ'রে গেছে। মাঝে-মাঝে বের ক'রে নিজেই পড়েছে সেগুলো। অন্যকে পড়াবার ইচ্ছে যে ওর না ছিলো, তা নয় ; মানুষমাত্রেরই সে-ইচ্ছে হ'য়ে থাকে। সে-উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বার-বার কবিতা পাঠিয়েছে। বেশির ভাগ ফেরৎ এসেছে, কোনোখান থেকে বা ফেরৎও আসেনি। মোট কথা, এ-পর্যন্ত নিজের একটা লেখাও ছাপার অক্ষরে দেখতে পায়নি সে, কিন্তু তাতে কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না-হ'য়ে ও আরো লিখতে ব'সে গেছে। এমন অধ্যবসায়, এমন নিষ্ঠা বাঙালি জাতে বিরল।

1252

বাংলাদেশের সাময়িকপত্র সাধারণত পদ্য একটু চলনসই হ'লেই ছাপে, এবং তা দুটো কারণে। প্রথমত, তার জন্য অর্থমূল্য দিতে হয় না ; দ্বিতীয়ত, বাড়তি স্থানপূরণের উপায়-হিশেবে পদ্যের মতো আর-কিছু নেই। এই অবস্থাতেও, কোনো পত্রিকাই যখন ভবভূতির কোনো রচনাকেই স্থান

৩৫

দিতে রাজি হয়নি, এ থেকেই বোঝা যায়, ওর পদ্য কী শ্রেণীর। অবশ্য, ভবভূতির কাছে যা মনে হ'তো সম্পাদকদের অন্ধ অবিচার, তা নিয়ে ওর মনে একটু আক্ষেপ ছিলো। স্বভাবতই। সেটা পরিস্ফুট ছিলো না, কিন্তু টের পাওয়া যেতো। মাঝে-মাঝে ও আমাকে এই ধরনের প্রশ্ন জিগেস করতো, 'তোমার কি মনে হয়, রামতনু, আমার কোনো কবিতা ছাপা যেতে পারে?'

'আমাদের সাহিত্যের বর্তমান অবস্থায়,' গম্ভীরমুখে আমি হয়তো বলতুম, 'না।'

'না!' ভবভূতির মুখ শুকিয়ে যেতো।

'না। কারণ তোমার কবিতার মর্ম গ্রহণ করবার মতো সূক্ষ্ম রসবোধ এ-দেশে এখন পর্যন্ত খুব কম লোকেরই হয়েছে। কে বুঝবে তোমার লেখা? তুমি তো আর সাধারণ, জল-ভাত গোছের লেখক নও, যার লেখা যে-কোনো লোক পড়ামাত্র বুঝে ফেলতে পারে। বিশেষত, কাগজের সম্পাদকেরা—তাদের মাথায় কিছু আছে নাকি ভাবো? আমি যদি তুমি হতুম, আমি তো কক্ষনো কোথাও লেখা পাঠাতুম না। এত ভালো যে লেখে, তার আবার ভাবনা কী?'

'কাগজের সম্পাদকেরা,' আমার কথাগুলো উগ্র মদের মতো ভবভূতির সাহস বাড়িয়ে দিতো, 'একটু যেন কেমন—না? যে-সব লেখা আসে, হয়তো না-প'ড়েই বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেন? হয়তো বিশেষ কয়েকজন বন্ধু বা আত্মীয়ের বাইরে কারো লেখা নেনই না?'

'আর বোলো না ও-কথা। কাগজের আপিশের ব্যাপার সবই তো জানি! এক-এক জায়গায় এক-এক দল ঘোঁট পাকিয়ে ব'সে আছে—বাইরেব কাউকে ঢুকতে দিতে কি চায়!'

'হুঁ। আচ্ছা, তোমাব তো কোনো-কোনো কাগজে চেনা-শোনা আছে। তুমি চেষ্টা করলে পারো না- -'

'চেষ্টা! তোমাব কবিতার জন্য চেষ্টা করতে হবে কেন? সেটাই তো তোমার পক্ষে অপমান। লোকে তোমাকে লুফে নেবে, তোমাকে পায়ে ধ'রে সাধাসাধি করবে। তুমি তো আর দু-একদিনেব শস্তা খ্যাতিব জন্য হাত পাততে যাবে না। তুমি যা লিখছো, তা যে চিরকাল থাকবে। তখন—আজকাল যারা খুব আগড়ুম-বাগড়ুম করছে, কোথাও থাকবে তারা? সম্প্রতি, লেখা ছাপা হওয়া আর না-হওয়া— কী এসে যায় তাতে? তুমি যদি হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকো, তাহ'লেই বা তোমাকে আটকাবে কে? কালের বিচারে জয় তোমার হবেই।'

এ-সব কথা বলতাম , কিন্তু নিশ্চিত অমরত্বের আশ্বাসেও ভবভূতির মন সম্পূর্ণ সান্ত্বনা মানতো ব'লে মনে হ'তো না। আশুলভ্য খ্যাতির অসারতা সম্বন্ধে তাকে বোঝাতে বাকি রাখিনি : তবু মাসিকপত্রে কবিতা ছাপানোর লোভ সে কিছুতেই গোপন করতে পারতো না। আমার পরিচিত যা দু-একটা নব্য কাগজ তখন ছিলো, সেখানে তার লেখা পাঠাতে স্পষ্টভাবে কি প্রকারান্তরে একটু সুযোগ পেলেই আমাকে অনুরোধ করতে তার ভুল হ'তো না ; নানা অছিলায় আমি সে-সব এড়িয়ে যেতাম। শেষ পর্যন্ত—একবার কলেজ-ম্যাগাজিনের ভার ছিলো আমার উপর ; কলেজ-ম্যাগাজিনগুলোর যা হাল হ'য়ে থাকে, ভবভূতির পদ্যের মতো লেখাও তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না ; সুতরাং সেখানে অপরিবর্তিত, বিশুদ্ধ অবস্থায় দিলাম ওর এক পদ্য ঢুকিয়ে। (বদলাতে গেলে নতুন ক'রে লিখতে হ'তো তাই সে-চেষ্টাও করলাম না।) ভবভূতির সমস্ত জীবনের পর্বতপ্রমাণ সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে ঐ একটিমাত্র লেখা ছাপার অক্ষরে বিদ্যমান।

ভবভূতিকে আমি সত্যি-সত্যি বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে তার লেখা হচ্ছে সর্বোচ্চশ্রেণীর, এবং সেই জন্যই—যেমন চিরকাল হ'য়ে এসেছে—সাধারণের সমাদব পেতে তার দেরি হচ্ছে। তবে সেটা আসবে—অনিবার্যরূপে, যেদিনই এবং যে-ভাবেই হোক। এবং তখন—আজকের দিনের চাহিদা অনুসারে খেলো জিনিশ তৈরি ক'রে যারা নাম কিনেছে—কোথায় থাকবে তারা? মুখে প্রকাশ না-করলেও, এই ধারণা যে ওর মনে বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে, তা আমি বুঝতে পারতাম। আমার দিক থেকে এ-আচরণ অসংগত, অন্যায়—এমনকি, একটু হীন—মনে হ'তে পারে। ঠিকই, মাঝে-মাঝে সে-কথা মনে ক'রে আমার লজ্জা হয়, তার বেশি দুঃখ হয়। কিন্তু

তখন—ওকে নিয়ে মজা করবার জন্য যে আমি ও-সব কথা বলতুম, তা নয়। এ ছাড়া আর কোন কথা ব'লে ওকে সান্ত্বনা দেয়া যেতো? সত্যি কথা যেটা, সেটা বললে বড়ো বেশি নিষ্ঠুর হ'তো। খামকা একজন নিরীহ, নির্দোষ লোকের মনে কষ্ট দিয়ে সত্যবাদিতার গৌরবে উল্লসিত হওয়া—তাব আমি কোনো সার্থকতা দেখিনে। অবশ্য অতদূর না-গিয়ে মোলায়েম ক'বে বলা যেতো, ওকে বুঝিয়ে দেযা যেতো—কিন্তু মুখে আমি যা বলি, তা-ই একেবারে অক্ষরে-অক্ষরে বিশ্বাস ক'রে ফেলবে, ওব বুদ্ধি যে সত্যি-সত্যি এতই কম, তা আমি ধারণা করতে পারিনি। ও যে ও-সব কথা বিশ্বাস করতে পেবেছিলো, তাতেই প্রমাণ হয় যে-কোনো অবস্থাতেই ওর আত্মবঞ্চনার ক্ষমতা ছিলো অপরিসীম।

এখানে কয়েকটা বছর বাদ দিয়ে যাচ্ছি ; কারণ এই সময়ে ভবভূতি দ্বিতীয়বার আমার দিগন্ত থেকে অন্তর্হিত হলো। ইন্টারমিডিয়েট পাশ ক'রে আমি এসে ইউনিভার্সিটিতে ভরতি হলাম, আর ভবভূতি পবীক্ষায় ফেল ক'রে কোথায যে মিলিয়ে গেলো, তার আব কোনো হদিশ পাওয়া গেলো না। ভবভূতি এমন লোক নয়, যার অভাব কেউ কখনো অনুভব কবতে পাবে ; সুতবাং ওর হদিশ পাবার আমি কোনো চেষ্টাও করলাম না। চেষ্টা করলেও যে পেতাম, তা নয। ও অদৃশ্য হ'য়ে গেলো, স্রেফ অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। পাঁচ বছর পরে এক সন্ধ্যায় হ'লো ওব পুনরাবির্ভাব—কলকাতায এক বাস্-এর মাথায়। ক্লাইভ স্ট্রিটের মোড়ে আমার পাশে একজন এসে বসলো, টেব পেযেছিলুম ; কিন্তু আমি রাস্তা থেকে চোখ ফেবালুম না, বাস্-এ যেতে যেতে যে-কেউ আপনার পাশে এসে বসে, তাবই মুখের দিকে তাকাবাব কথা মনে হয না আপনাব। কিন্তু সেই পার্শ্ববতী ব্যক্তি যদি আপনাকে নাম ধ'রে ডাকে, আপনি চমকে ফিরে তাকান , এবং রীতিমতো একটা ধাক্কা খেযে ছিটকে পড়েন, যখন দেখতে পান, এমন একজন লোক আপনাব পাশে ব'সে আছে, এ-পৃথিবীতে যাব অস্তিত্ব সম্বন্ধে আপনি বছবেব পব বছব সম্পূর্ণ নিশ্চেতন ছিলেন।

ভবভূতিব গালে তিনদিনের দাড়ি, মুখে-চোখে আস্ত একটা দীর্ঘ দিনেব মস্তিষ্কহীন, যান্ত্রিক কাজের ক্লান্তি। তাব চুলের ভাগ-রেখা—লক্ষ্য কবলুম—এতদিনে সুস্পষ্ট ও দৃঢ় হয়েছে , ওব তৈলাক্ত, সুবিন্যস্ত মাথায় সারাদিন আপিশ করার পবেব একটি চুল এদিক-ওদিক নয। তাব মলিন শার্টেব বোতামগুলো এখন ঠিকই আছে। প্রায় তেমনি বোগা, পাঁচ বছব আগে তাকে যেমন দেখেছিলুম ; সমস্ত শরীরেব মধ্যে শুধু মুখের উপর সময়ের চিহ্ন পড়েছে—প্রথম যৌবনেব তীব্র আত্মসচেতনতা-প্রসূত অস্বস্তির ভাব কেটে গিয়ে এখন তা সাবালকতায স্বচ্ছন্দ, আশ্বস্থ হয়েছে। না—তারও বেশি : সে-মুখ পরিপক্ক, অত্যন্ত বেশি পরিপক্ক ; অকাল প্রৌঢ়ত্বেব ছায়ায সে-মুখ স্থবির, অনেকটা ব্যঞ্জনাহীন হ'য়ে পড়েছে। ওর চোখের ভীত, অসহায় দৃষ্টি এখন ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন।

পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে সাধারণ কুশল-জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হলাম। অনিচ্ছায়, ছাড়া-ছাড়া-ভাবে ও নিজের কথা বললে—অবশ্য বলবারই বা কী ছিলো ; ও যে এখন সওদাগবি আপিশেব কেরানি, ওকে দেখে তা বলবার জন্য শার্লক হোমস এব দরকাব হয় না। একবাব ইন্টারমিডিয়েট ফেল করে ওর পক্ষে আর দ্বিতীয় চেষ্টা করা সম্ভব হযনি ; ওকে শিক্ষাদান কবতে ওর বাবার এমন যে উৎসাহ, তা-ও মিইয়ে এসেছিলো। তিনি বাধ্য হয়েছিলেন এ-সত্যটা স্বীকাব কবতে যে—যতই না তিনি চেষ্টা করুন—তাঁর জীবনেব অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এ-ছেলেকে দিয়ে পূর্ণ হবাব নয়। অপ্রিয়, নিষ্ঠুর সত্য—কিন্তু এর হাত থেকে নিস্তার কোথায়? কত লোক তো নিতান্ত সাধারণ ঘবে জ'ন্মে পৃথিবীতে নাম রেখে যায়—তাঁব ছেলে কেন ও-বকম হ'লো না? কেন? কেন? আশায আকাঙ্ক্ষায় বিজড়িত মানুষ আমবা প্রশ্ন কবি —ব্যর্থতায়, বিদ্রোহে, অনুসন্ধিৎসায় প্রশ্ন করি · সমস্ত বিশ্ব নিরুত্তর। কেন যে তাঁর এত আশাব ছেলে—আব-কিছু না হোক, অন্তত কৃতবিদ্য, অর্থশালী হবে না, নিজের জীবনে ব্যর্থ সেই বৃদ্ধ এই প্রশ্নের কোনো উত্তরই খুঁজে পাননি। কিন্তু সত্যকে এড়ানো গেলো না, পুত্রের জন্য বিদ্যার অনুধাবনে তিনি ক্ষান্ত হলেন। ভবভূতির কপালে ভালো—ঠিক সময়ে তার একটা চাকরিও জুটে গেলো। ঢুকেছিলো পঁয়ত্রিশ টাকায় ; এখন হয়েছে চল্লিশ। গেলো বছব, ছেলেকে

তার চরম গৌরবে প্রতিষ্ঠিত দেখে ভবভূতির বাবা মারা গেছেন। এখন, বিধবা মা আর স্ত্রী-পুত্র নিয়ে (চাকরি পেয়েই ভবভূতি বিয়ে করেছিলো) ও দর্জিপাড়ায় বাড়ি ভাড়া ক'রে আছে। সংসারে দুঃখ-কষ্ট, আপদ-ঝঞ্ঝাট আমাদের সকলেরই আছে ; ওর ভাগ্যেও তার অংশ জুটেছে। ইচ্ছে করলে অবশ্য ওর জীবন নিয়ে ফেনিয়ে-ফেনিয়ে এক স্যাঁৎসেঁতে দুঃখের গাথা রচনা করা যায় ; কিন্তু সত্যি বলতে গেলে, ও বেশ সুখেই আছে ; ওর জীবনের উচ্চতম যা সম্ভাবনা, তা সফল হয়েছে ; ওর জন্যে বিশেষরূপে দুঃখ করবার কী কারণ থাকতে পারে। ভবভূতির জীবনে এর বেশি আর কী হ'তে পারতো?

তবু, ওর সৌভাগ্যে মুখ ফুটে ওকে ঠিক অভিনন্দন জানাতে পারলাম না। বরং, ওর পাশে ব'সে নিজের জন্য যেন লজ্জাবোধ করলাম। জীবনের ভারে নুয়ে-পড়া, ক্লান্ত, বিক্ষতযৌবন ওর পাশে আমার বেশের পরিচ্ছন্নতা, মনের প্রফুল্লতা, আমার সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা, নিশ্চিন্ত লঘুচিত্ত ভাব—সব যেন ভাঙ্গার, অত্যন্ত ভাল্গার—এমনকি, একটু অশ্লীল ব'লে মনে হ'তে লাগলো। ওর কথা শেষ হ'লে আর কী বলবো ভেবে না-পেয়ে পকেট থেকে সিগারেট বার ক'রে বললাম, 'খাও।'

'না, থাক।'

'খাও না?'

'খাই না তা নয়,—কিন্তু, এখন থাক।'

'বাঃ, নাও না।'

'আচ্ছা', একটু ইতস্তত ক'রে ভবভূতি বললে, 'দাও তবে একটা।' ঠোঁটের উপর দু-আঙুল চেপে শব্দ ক'রে সিগারেটে টান দিয়ে বললে, 'তুমি তো আজকাল রীতিমতো ফেমাস একজন—'

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিলুম—'কী যে বলো—যত সব বাজে!'

নীরবে আমার মুখে একটু তাকিয়ে থেকে ভবভূতি জিগেস করলে, 'সবসুদ্ধ ক-খানা বই হ'লো?'

যেন এটা মস্ত এক অপরাধের ব্যাপার, এইভাবে, অস্পষ্ট স্বরে আমি বললুম, 'এই—খান ছ'য়েক।'

'বেশ আছো, মনে হচ্ছে। —তা থাকবেই বা না কেন?'

'বেশ। হ্যাঁ, বেশই তো আছি।' কণ্ঠস্বরে আমি অত্যন্ত বেশি ব্যঙ্গের ভাব প্রকাশ ক'রে ফেললুম. 'চাকরি-চাকরি ক'রে পাগল হ'য়ে গেলুম, তবু কি জুটেছে একটা!'

'কেন, তোমার আমার চাকরির দরকার কী? বই লিখে টাকা পাও না?'

আমি কাঁধ-ঝাঁকুনি দিলুম।

'কোথায় যাচ্ছো এখন? চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে কোনো তরুণীর কাছে—' কথাটা মুখে এনে লজ্জায় লাল হ'লো ভবভূতি।

ওর অনুমান যে একেবারে ভুল হয়েছিলো, তা নয় ; মৃদু হেসে আমি চুপ ক'রে রইলুম। একটু পরে আমার পরিচ্ছন্ন বেশ, কেস-ভরতি সিগারেট, আমার সাহিত্যিক খ্যাতি, মুখের প্রশান্তি, আর এই সন্ধ্যায় কোনো অস্পষ্ট, রহস্য-অতিরঞ্জিত মেয়ে-বন্ধুর কাছে যাত্রার প্রায়শ্চিত্ত করবার চেষ্টায় আমি বললুম, 'বিয়ে ক'রে কেমন আছো?'

ভবভূতি আড়চোখে আমার মুখের দিকে তাকালো ; প্রশ্নটা যেন ঠিক বুঝতে পারলো না।

'যা-ই বলো,' প্রায়শ্চিত্তে স্থিরপ্রতিজ্ঞ, আমি আবার বললুম, 'স্ত্রী থাকলে জীবনের রংই বদলে যায়।'

ভবভূতি মুহূর্তকাল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর বললো, 'তুমি তা'হলে বিয়ে করোনি কেন?'

'করবো,' সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিলুম আমি। এ ছাড়া আর কোনো জবাব দেবার ছিলো না। আমি যদি বলতুম, বিয়ে করলে চলবে কী ক'রে—ক্লান্ত বিবর্ণ ভবভূতির পাশে, তার নিষ্প্রভ, অসহায় দৃষ্টির নিচে ব'সে সেটা নিছক বর্বরতা হ'তো। ওর দাম্পত্য জীবন ওরই চোখে রঙিন ক'রে তোলবার

জন্য আমার নিজেরই পরিণয়ে ঔৎসুক্য দেখানো ছাড়া উপায় ছিলো না। নিজের সুখিত্বে লজ্জিত, আমি চেষ্টা করতে লাগলুম ওকে ওর নিজের কাছে সুখী ব'লে উপস্থাপিত করতে। তাতে যেন আমারও খানিকটা নৈতিক সমর্থন হবে, খানিকটা লজ্জার ক্ষালন।

'তুমি বিয়ে করবে? কবে?'

'শিগগিরই,' একটুও দ্বিধা না-ক'রে আমি বললুম। বিবাহিত জীবনের পবিত্র আনন্দ সম্বন্ধে চেষ্টা করলুম মনকে ফেনিয়ে তুলতে। খেলাটা একটু মজারই লাগছিলো আমার।

একটু চুপ ক'রে থেকে নিচু গলায় কোনো গভীর, গোপন কথা জিগেস করবার ধবনে ভবভূতি বললো, 'কাকে?'

'আছে একজন।' আমার কণ্ঠস্বর, আমার বলবার ভঙ্গি ইঙ্গিত করলো একটা আবেগ-ঘন রোমান্সের প্রতি। ভবভূতি যা শুনতে চায়, প্রাণে ধ'রে তা না-ব'লে পাবলুম না।

'কে সে?' ভবভূতির ক্লান্তি-ধূসব, জীবন-বেখাঙ্কিত মুখ মুহূর্তের জন্য কৌতূহলে দীপ্ত হ'য়ে উঠলো।

'আছে', এ ছাড়া কী বলা যায় আমি ভেবে পেলুম না। দপ ক'রে নিবে গেলো ওব মুখ · অবৈধ কৌতূহল প্রকাশ ক'রে ফেলার জন্য ও যেন সমস্ত শরীর দিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা কবলো। মনে-মনে আমি বিব্রত হ'যে পড়লুম, দুঃখিত হলুম। তাড়াতাড়ি জিগেস কবলুম, 'তোমার স্ত্রী কেমন?'

'কেমন আবার।'

'কেমন দেখতে?'

'কী যেন।'

ওর কুণ্ঠা অপসরণ করবার চেষ্টায আমি বললুম, 'বেশ ভালো--না?'

'কী যেন,' ভবভূতি এইবার একটা অদ্ভুত কথা বললে, 'ভালো ক'বে তাকিযে দেখিনি।'

কথাটা হাতুড়ির বাড়ির মতো আমার মনের উপব এসে পড়লো। ভবভূতিকে প্রেমিকরূপে কল্পনা করা সোজা নয় ; হৃদয়াবেগের তীব্রতায় ও আলোড়িত, উন্মথিত হচ্ছে, এমনতর দুবাশা না-কববাব জন্য অসাধাবণ বিচক্ষণ হ'তে হয় না, কিন্তু তাই ব'লে এই! ভালো ক'বে তাকিয়ে দেখিনি। এই অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় উদাসীনতায়, মূঢ়তায়, আত্মার এই মৃতত্বে আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম। আব যা-ই হোক, যৌবনেব একটা স্বধর্ম তো আছে—পুঞ্জীভূত ব্যর্থতা, দিন থেকে দিনে নিরবচ্ছিন্ন আত্মবিলোপকারী দীনতা অতিক্রম ক'রে একটা জায়গায়, কোনো-একটা জায়গায় যৌবন নিশ্চয়ই ঝলসে উঠবে তলোযাবেব মতো দীপ্ত। আমি চেয়েছিলুম সেই জ্যোতির্লেখা উন্মোচন কবতে, প্রাত্যহিক তুচ্ছতা-বাশিতে শূন্যীকৃত এই ভবভূতির অন্তরের সেই গোপন মহলে প্রবেশ করতে, যেখানে কেবল তার যৌবনেরই জোবে সে রাজা। কিন্তু আমার ভুল হয়েছিলো : ভবভূতিব যৌবন—তা শুধু একটা ঐতিহাসিক তথ্য, তাব বেশি কিছু নয়। সে সেই দুর্ভাগাদের একজন, যাবা কখনো, কোনো-এক মুহূর্তের জন্যও জ্ব'লে ওঠে না, আন্দোলিত হ'য়ে ওঠে না ক্ষণিক বসন্তে—একবারের জন্যও অন্যায় করবার দেব-অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয় না, নিজেকে কল্পনা করে না দেবতা ব'লে। প্রথম যৌবনে ওকে আমি দেখেছিলুম ; সেই একটা সময়—সমস্ত স্বর্গ যখন মানুষের আত্মায় পুষ্পিত হ'য়ে ওঠে—তখনও ভবভূতি ওর দীনতার, নগণ্যতার স্তূপে আত্ম-অপসৃত। আমার বোঝা উচিত ছিলো, আঠারো বছর বয়সেও যে-মানুষ নিজেকে একবার ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ব'লে ভাবতে পারলো না, তার মতো দুর্ভাগা কেউ নেই।

কিন্তু তখনো আমার জানতে বাকি ছিলো যে যে-ভবভূতি তার স্ত্রীর দিকে কখনো ভালো ক'রে তাকিয়ে দ্যাখেনি, সে-ও—সে-ও কল্পনা করছে—অর্ধ-অচেতন নির্বুদ্ধিতাব আচ্ছাদনে ধিকিধিকি জ্বলছে তাব কল্পনা—স্বপ্ন দেখছে এক জ্যোতির্ময় অমরত্বের, সাহিত্য-অমরাবতীর কালাতীত, চিরন্তন দেবত্বের। কিন্তু তার মূলে যৌবনের প্রেরণা নেই, তা উৎসারিত নয় প্রাণশক্তির অদম্য আগ্রহ থেকে। তা একটা অবিচল, অন্ধ ধারণা—আত্মার একটা সর্বনেশে ক্ষয়রোগ ; ভবভূতির আত্মায় ব্যাধির

মতো তা হানা দিচ্ছে, তা তাকে পেয়ে বসেছে নির্মমভাবে, দিনের পর দিন তাকে জীর্ণ ক'রে নিচ্ছে নিজের মধ্যে।

কথাটায় অন্য রকম মোচড় দিয়ে আমি বললুম, 'যাকে ভালোবাসা যায় তাকে কি যথেষ্ট ক'রে দেখা যায় কখনো?'

ভবভূতি ফ্যালফ্যাল ক'রে সামনের আসনে উপবিষ্ট একটি লোকের ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। আমি ঈষৎ লজ্জিত বোধ করলুম কথাটা এমন অবান্তর, অসংগত শোনালো—স্থূল, রুচিহীন কোনো রসিকতার মতো।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটলো। তারপর বাস যখন বৌবাজার ঘুরে কলেজ স্ট্রিটে পড়েছে, ভবভূতি মৃদুস্বরে আরম্ভ করলো, 'আচ্ছা, বামতনু—' ব'লেই থেমে গেলো।

'কী, বলো!' আমি চোখে-মুখে যথাসাধ্য উৎসাহ ফুটিয়ে তুললুম।

'আচ্ছা, তোমার সঙ্গে--তোমার সঙ্গে তো অনেক পাব্লিশারের জানাশোনা আছে—না?'

চমকে উঠলুম। একটা উৎকট সন্দেহ আকস্মিক শ্বেত বিদ্যুতের মতো সমস্ত মন দীর্ণ ক'রে দিয়ে গেলো। এও কি সম্ভব? এও কি সম্ভব যে বাল্যকালের এক অসতর্ক মুহূর্তে যে-বিষ তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিলো—সে-জন্য দায়ী আমি, আমি!—এখনো তার দুষ্ক্রিয়া নিঃশেষ হ'য়ে যায়নি? এমনো কি হ'তে পারে যে তার এই দৈনিক আট ঘণ্টা, তার সমস্ত অবয়বের এই নীরব ক্লান্তি, মুখের আলোহীন ধূসরতা---এই সব কিছু সত্ত্বেও ভবভূতি এখনো—লেখে? যে-ভবভূতির তার স্ত্রীর মুখের দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখবার সময় হয় না?

'না-থেকে আর উপায় কী,' ওর প্রশ্নের উত্তরে আমি বললুম।

'তাহ'লে---তাহ'লে—আচ্ছা ধরো –' ভবভূতি দু-একবার চেষ্টার পরে কথাটা শেষ করবার আশা ছেড়ে দিলো।

আমি ওকে সাহায্য করলুম, 'কেন, তুমি কিছু লিখছো নাকি?'

'হ্যাঁ, লিখছি তো অনেকদিন ধ'রেই,' দ্রুত, রুদ্ধস্বরে, যেন নিজের সঙ্গে বাজি রেখে ভবভূতি বলতে লাগলো। 'এখন— তোমাকে পেলুম—তুমি যদি সময় ক'রে একটু দেখে দাও—'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

'তুমি বললে কেউ হয়তো একটা বই ছাপতে রাজিও হ'তে পারে?'

'সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে।' কথাটা নিছক সত্য, কিন্তু ব'লেই আমার অনুতাপ হ'লো। ভবভূতির হয়তো মনে হ'তে পারে, আমি তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছি, তাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করছি; পরের মুহূর্তেই, তাই, কৌতূহল প্রকাশ ক'রে বললাম, 'তোমার কোনো বই তৈরি আছে?'

'আছে।'

'কী---উপন্যাস?'

'হ্যাঁ, উপন্যাস। গল্পও আছে কতগুলো।'

'তোমার অনেক লেখা জমা আছে বুঝি?'

এই প্রশ্নের উত্তরে একটু লাল হ'য়ে, কোমরের উপর থেকে শরীরটাকে বাঁকিয়ে ভবভূতি বললো যে চার-পাঁচখানা বই হবার মতো গল্প আর খান ছয় উপন্যাস তার বাক্সে মজুত হ'য়ে আছে। এ থেকে অন্তত একটা সে প্রকাশ ক'রে দেখতে চায়। প্রথম বইয়ের জন্য সে এক পয়সাও চায় না, শুধু বই ছাপিয়ে দিলেই সে খুশি।

বজ্রাহত হ'য়ে আমি বললুম, 'সে কী! তুমি এত লিখেছো? সময় পাও কখন?'

'ইচ্ছে থাকলে আর সময়ের অভাব! আপিশ থেকে ফিরে রোজ ঘণ্টা দুই লিখি—শোবার আগে আবার অনেক রাত পর্যন্ত।'

'রোজ?'

'প্রায় রোজই।'

'কী ক'রে পারো? ক্লান্ত লাগে না?'

'তা লাগে বইকি, কিন্তু না-লিখেও পারি না যে।'

অকৃত্রিম মুগ্ধ বিস্ময়ে ভবভূতির মুখের দিকে তাকিয়ে আমি ব'লে উঠলাম, 'আশ্চর্য! আশ্চর্য ক্ষমতা তোমার!'

'আমার মনে হয় কী জানো, রামতনু', নিচু গলায়, যেন পবিত্র, গোপন কোনো কথা বলছে, এমনি ক'রে ভবভূতি বললো—তার ম্লান, ক্লান্ত চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো মুহূর্তের জন্য—'মনে হয়, আমি যা লিখি, বাংলাদেশে এখন তার পাঠক জোটা শক্ত হবে। কিন্তু আসবে—আমারও দিন আসবে। সেই কথা ভেবেই তো মুহূর্তের জন্য আমি লেখা বন্ধ রাখতে পারি না।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই।' ব'লে আমি উঠে দাঁড়ালাম ; আমার গন্তব্য স্থান এসে গিয়েছিলো।

'তাহ'লে'—একদিন তোমার ওখানে যাবো, কী বলো?'

'হ্যাঁ, যেয়ো। আমি ওকে আমার ঠিকানা দিলাম।

'সামনের রোববার—কেমন?'

'আচ্ছা।'

'কিন্তু আসবে—আমারও দিন আসবে।'—কথাগুলো আমার মনের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো। তাদের চিনতে পারলুম আমারই কথা ব'লে—অনেক বছর আগে, অসাবধানে, লঘুচিত্তে উচ্চারিত। কী হাস্যকর—ধূসর, গম্ভীর মুখে, ভুরু ঈষৎ উঁচু ক'রে, ডান হাতের দু-আঙুলে শূন্যে একটা টোকা মেরে ভবভূতি ও-কথা বলছে! না—ভবভূতির মুখে ও-স্পর্ধার কথা হাস্যকর পর্যন্ত নয়। তা নিয়ে তামাশা করা পর্যন্ত যায় না। আমি, তাহ'লে, ওকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়েছিলুম যে ওর সাহিত্য এতই মহৎ যে তার জন্য আমাদের দেশ এখনো তৈরি হ'তে পারেনি। ও যে সে-কথা শুধু বিশ্বাস করেছে তা নয়, এই দীর্ঘ বছরগুলি ধ'রে সে-ধারণাকে সযত্নে লালন করেছে নিজের মনে, সেই বিশ্বাসের জোরে লিখে ফেলেছে চার পাঁচখানা বই হবার মতো গল্প আর খান ছয়েক উপন্যাস! ঠাট্টা বোঝার এমন অপরিসীম অক্ষমতা যদি পৃথিবীতে সম্ভব, তাহ'লে আর হাসবো কোন মুখে? রবিবার সকালে ও যখন আসবে, ওর সঙ্গে যে-সব কথাবার্তা বলতে হবে, তা মনে ক'রে তখনই আমার মন-খারাপ হ'য়ে গেলো। সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে—এই ছেলেমানুষি খেলা কত আর ভালো লাগে। বয়স যখন কম ছিলো, এ থেকে একরকমের আমোদ পাওয়া যেতো, কিন্তু এখন তা কেবলই ক্লান্তিকর—আর এমন অর্থহীন। সবচেয়ে কি ভালো নয় ওকে মুখের উপর স্পষ্ট ক'রে বলা—কিন্তু কেন? কী দরকার?—পরমুহূর্তেই আমার মনে হ'লো—কী দরকার ওর মোহ ভেঙে দিয়ে? জীবনে এমনিতেই কি দুঃখের অভাব? চলুক না—যদি ওর একটু ভালো লাগে, যদি ও একটু সুখী হয়। আর যা-ই হোক, এতে তো কারো ক্ষতি হচ্ছে না কোনো।

তখন আমি ঐ রকম ভেবেছিলুম, কিন্তু পরে—ও-কথা মনে ক'রে তীব্র আত্ম-ধিককারে আমার সমস্ত মন বিষিয়ে উঠেছিলো। তখনো হয়তো সময় ছিলো, তখনো ভবভূতিকে বাঁচাতে পারতুম। আমিই পারতুম। কিন্তু আমি নিজেকে ছেড়ে দিলুম সেই ভালোমানুষির হাতে—কালান্তক দুর্বলতা।

রবিবার সকালে ভবভূতি যখন এলো, আমি তখনো বিছানায় শুয়ে। ঘড়ির হিশেবে ভদ্র ব্যক্তির শয্যাত্যাগের লগ্ন অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। আর ভবভূতি এতদূর থেকে চ'লে আসতে পারলো, আর আমার কিনা ঘুমই ভাঙেনি। রীতিমতো লজ্জিত হলুম। অত্যধিক হৃদ্যতার সুরে বললুম, 'আরে এসো, এসো।'

'তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলুম নাকি?'

'পাগল—ঘুম কখন ভেঙে গেছে' খামকা শুয়েছিলুম। —বোসো।'

ভবভূতি ব'সে একবার চারদিকে তাকিয়ে বললে, 'বাঃ, বেশ ঘরটি তোমার।'

'বাইরে থেকে দেখতে ভালোই,' ভবভূতির সামনে নিজেকে খর্ব করা আমার কর্তব্য মনে হ'লো, 'কিন্তু কত যে অসুবিধে এ-বাড়ির—' কথাটাকে একটা ইঙ্গিতময় অসমাপ্তিতে ফেলে রেখে আমি

জিগেস করলুম, 'তুমি চা খাও তো?'

'অভ্যেস নেই।'

'খাবে এক পেয়ালা।'

'না, থাক—আচ্ছা দাও।'

তুচ্ছতম কোনো কিছু গ্রহণ করতে ভবভূতির এই সংকোচ একটা লক্ষ্য করবার জিনিশ। সমস্ত জীবন ভ'রে বঞ্চিত, কিছুই ও সহজে নিতে পারে না। ও জানেই না চাইতে। পৃথিবীর সাধারণ জীবন সম্বন্ধে এককোঁটা মোহ নেই ওর। সাহিত্যিক খ্যাতির অমরত্বের উপর ন্যস্ত ওর চোখ, বর্তমান এবং পারিপার্শ্বিক জীবন থেকেও যে ওর কিছু প্রাপ্য আছে, এমন ধারণা ওর মনে স্থান পায়নি।

চা এলো। দুটো পেয়ালায় চা ঢেলে আমি অলসভাবে মুড়মুড়ে খবর-কাগজের ভাঁজ খুললুম। আমার চোখে ঘুমের নেশা তখনো কাটেনি, সেই দিকে তাকিয়ে ভবভূতি জিগেস করলো, 'কাল রাত জেগেছো বুঝি?'

'আমি একটু দেরি ক'রেই শুই।'

'নতুন কিছু লিখছো?'

সত্যি বলতে, আগের রাত্রে যে-কারণে রাত জেগেছিলাম সেটা সাহিত্যসৃষ্টি নয়। তবু মান বজায় রাখার জন্যে বললাম 'হ্যাঁ, একটা গল্প '

ভবভূতি একটু 'আড়ষ্টভাবে, কথাটা বলা উচিত হবে কি হবে না, যেন মনে-মনে এই বিচার করতে করতে জিগেস ক'রে ফেললো, 'কত পাও একটা গল্পের জন্য?'

'পাই!' নিজের অদৃষ্টের সম্বন্ধে আমার অভিযোগ অসাধারণ রকম তীব্র হ'য়ে উঠলো—'কত পাই তা মুখে আনা যায় না। আর তাও ঠিকমতো দ্যায় নাকি সবাই! আদায় করতে প্রাণান্ত!' বলতে-বলতে আমি চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলাম। 'তুমি খাচ্ছো না?'

ভবভূতি যেন আমার মুখের এই কথাটির জন্যই অপেক্ষা করছিলো . যেন বাধ্য হয়ে, নেহাৎই আমার কথাটা রাখবার জন্য, সে পেয়ালাটা তুলে নিয়ে নীরবে চা খেতে লাগলো। নীরবে বললুম এই অর্থে যে সে কোনো কথা বলছিলো না , কিন্তু তার ওষ্ঠাধর যখন পেয়ালার প্রান্তে সংযুক্ত হ'য়ে মুখের মধ্যে চা টেনে নিচ্ছিলো, সেই মুহূর্তে যতটা শব্দ উৎপন্ন হচ্ছিলো লোকেরা সাধারণত কথা বলতে অত আওয়াজ করে না। স্পষ্ট বুঝতে পারলুম ভবভূতি তার চা উপভোগ করছে। সশব্দে, সরবে বলা যায়, নিয়মিত, দীর্ঘ চুমুকের পর চুমুকে, ভবভূতি চা খেতে লাগলো। তার মুখে-চোখে একটা তন্ময়তা , চুমুক দেবার আগে সে পেয়ালার মধ্যে একবার গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিচ্ছে। যেন প্রত্যেক বার দেখে নিচ্ছে আর কতটা বাকি।

একটু পরে আমি বললাম, 'বাঃ, ডিম-টিম কিছু খেলে না?'

'ডিম?' ভবভূতি যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলো।

'খাও একটা,' নিজের অজান্তেই আমার বলার ধরনে আদেশের সুর ফুটে উঠলো। 'খাও না,' দ্বিতীয় বার, মোলায়েম, ক'রে আমি বললাম।

হাতের পেয়ালাটা টেবিলে নামিয়ে রেখে ভবভূতি ডিম খেলো এমনভাবে যেন কোনো কর্তব্য পালন করছে। খেতে খেতে একটি কথা বললে না। তারপর পেয়ালার বাকি চা তেমনি দীর্ঘ, সশব্দ চুমুকে চুমুকে শেষ করতে লাগলো। আমি খবর-কাগজের ছবি দেখছিলাম , শব্দ থামতেই বুঝলাম তার চা শেষ হয়েছে। চোখ তুলে বললাম, 'আর-একটু চা?'

'না, আর না।'

'নাও আর একটু,' ব'লে তাকে দ্বিতীয় বার প্রতিবাদের সময় না-দিয়েই তার পেয়ালা অর্ধেক ভ'রে দিলাম।' থাক--এতেই হবে,' মুহূর্তের জন্য তার মুখের চিরন্তন ধূসরতায় একটু আলো খেলে গেলো— 'যা-ই বলো, গরম-গরম চা খেলে লাগে বেশ।'

অবাক হলাম তাকে তার নিজের লেখার বাইরে কোনো বিষয়ে এমন স্পষ্ট মত প্রকাশ করতে

শুনে। অনভ্যস্ত স্নায়ুতন্ত্রে ট্যানিন-রস হঠাৎ একটু নেশার মতো সৃষ্টি করে : তারই ফল এটা। অনভ্যস্তের উপর ট্যানিনের প্রভাবও আশ্চর্য। ছেলেবেলায়, বাইরে, কোথাও ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি ক'রে লাল এবং গরম হ'য়ে হঠাৎ বাড়িতে ঢুকে প'ড়ে দেখেছি, সবাই চা খাচ্ছে। তাড়াতাড়ি মা-র পেয়ালা থেকে ঢকঢক ক'রে কয়েক চুমুক দিয়ে আবার দৌড়—পরিত্যক্ত, তখনো-অসমাপ্ত খেলার উদ্দেশে। কী ভালোই লাগতো সেই কয়েক চুমুক। এখনো মনে পড়ে। এখন বুঝতে পারছি, ট্যানিন-সঞ্চারে অতি ক্ষণিক—এবং অতি মধুর—একটু নেশা হ'তো তখন। হায়রে, এখন ব'সে-ব'সে কুঁদে-কুঁদে ছ-পেয়ালা চা গিললেও স্নায়ুগুলো সাড়া দেয় না, ক্লান্তি না-কেটে বরং আরো যেন ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি। এখন ঠিক সেটুকু নেশা—তেমনি মৃদু, তেমনি ক্ষণিক—করতে হ'লে—কত তার জন্য আয়োজন, কত অর্থব্যয়।

আমাকে আর-একবার পেয়ালা ভরতে দেখে ভবভূতি মন্তব্য করলে, 'তুমি যে বড্ড চা খাও দেখছি।'

'বিষপানে আত্মহত্যা!' আমি হেসে উঠলাম।

ভবভূতি সে হাসিতে যোগ দিলে না ; গম্ভীরমুখে বললে, 'চা কি সত্যি খুব ক্ষতি করে?'

'না, না, তেমন আর কী, তেমন আর কী—' তৎক্ষণাৎ বলতে হলো আমাকে। ভবভূতির সামনে কোনো হাস্যরসাত্মক কথা বলবার লোভ আমি এরপর থেকে সাবধানে সংবরণ করেছি।

সিগারেট ধরিয়ে আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম। ভবভূতি ক্ষীণ একটু হেসে বললে, 'তুমিই সুখে আছো, রামতনু!'

খবরের কাগজে চোখ নামিয়ে চুপ ক'রে রইলুম আমি। কী বলতে পারতাম? হ্যাঁ, সন্দেহ কী—ভবভূতির তুলনায়, সন্দেহ কী, আমি সুখে আছি। আমি যা বাড়ি-ভাড়া দিই, ওর তা এক মাসের উপার্জন। সিগারেটে আমি যত খরচ করি, সপরিবারে ওর খাওয়া খরচ ততটা হয় কিনা সন্দেহ। আমি স্বাধীন (মানে, এই বর্তমান যান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির পক্ষে যতটা স্বাধীন হওয়া সম্ভব)—অন্তত, আমি ইচ্ছে করলে যে-কোনোদিন সকাল থেকে দুপুর অবধি বাড়ি ব'সে গল্প ক'রে কাটিয়ে দিতে পারি, যে-কাজটা আজ করা উচিত সেটা আমার কাল করলেও চলে। আমার কোনো উপরিওলা নেই—বরং, যে-সম্মিলিত পাঠকপিণ্ড আমার উপরিওলা তাকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাইনে ব'লে তার অস্তিত্ব ভুলে থাকতে পারি। তাছাড়া, সবার উপর আমার কাছে সাহিত্যিক খ্যাতি, যার জন্যে সেই কবে থেকে কী ভয়ংকর, আত্মঘাতী চেষ্টায় ভবভূতি ম'রে যাচ্ছে। পৃথিবীতে যদি নিছক অধ্যবসায়, সততা, আন্তরিকতা, কঠিন, নিষ্করুণ নিষ্ঠার কোনো মূল্য থাকতো তাহ'লে ভবভূতির স্থান হ'তো চিরকালের শ্রেষ্ঠ কবিদের সঙ্গে। যদি এই বিশ্বের পরিচালনায় কোথাও বিন্দুমাত্র ন্যায়জ্ঞান থাকতো তাহ'লে এতদিন ধ'রে এত কষ্ট ক'রে, সংসারের এমন দারুণ প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে, অবিশ্বাস্য এক ধৈর্য-সহকারে, কল্পনাতীত অন্ধতায়—সে যে এতদিন ধ'রে এত রাশি-রাশি লিখতে পেরেছে, শুধু সেইজন্যেই তার নাম থাকতো অমর হ'য়ে। কিন্তু তা হবার নয়। ও-সব ভালো-ভালো নৈতিক গুণের কোনো মূল্য দেবে না এই পৃথিবী. .মূল্য দেবে সহজাত শক্তির, যাকে বলে ট্যালেন্ট, যা একান্তই প'ড়ে-পাওয়া, অনির্ণেয়, যার কোনো সংজ্ঞা আমরা দিতে পারি না, শুধু ফল দিয়ে যাকে চিনি। ব্যাপারটা শোচনীয় হ'তে পারে, কিন্তু সত্যি কথাটা এ-ই।

ভবভূতির মুখোমুখি ব'সে, সিগারেটের সুরভিত ধূম ফুসফুসের মধ্যে গ্রহণ করতে-করতে, উচ্চ সমাজের এক বিবাহের বর্ণনা পড়তে-পড়তে (কেন? কেন আমাকে জানতেই হবে অমুক জস্টিসের দৌহিত্রীকে বিয়ের সময়কার ম্যাজেন্টা রঙের শাড়িতে কেমন 'চার্মিং' দেখাচ্ছিলো—অমুক জস্টিসের দৌহিত্রী বিয়ে করুক কি গলায় দড়ি দিয়ে মরুক কি স্বাস্থ্য ভালো করার জন্য জর্মনির কোনো স্পা-তে যাক—আমার তাতে কী?), সকালবেলাকার উষ্ণ আলস্য পোহাতে-পোহাতে—আমার বন্ধুর তুলনায় নিজেকে আমার কেমন যেন ছোটো মনে হচ্ছিলো, একটু খেলো, জোলো। আ, আমার এই চায়ের পেয়ালা আর ছবিওলা কাগজ, রোদে উজ্জ্বল এই ঘর ভ'রে আলস্য-সৌরভ —কী

স্থূল, সাধারণ, অসহ্যরকম মধ্যবিত্ত, রীতিমতো পেতি-বুর্জোয়া! এই কি একজন আর্টিস্টের জীবন? আমি ম্যাক্সিম গর্কীর কথা ভাবলাম, বীঠোফেনের...আমার বন্ধু ভবভূতির কথা ভাবলাম। যা-ই বলো না কেন, কৃতিত্ব জিনিশটাই ভাল্গার, কোনো আত্মতৃপ্ত মানুষের মতো ন্যক্কারজনক দৃশ্য পৃথিবীতে কমই আছে। ব্যর্থতায় গৌরব আছে, ব্যর্থতা মহান। ব্যর্থতা রোমান্টিক, দৃশ্য হিশেবে জমকালো। কৃতীকে আমরা সম্মান করি, জয়মাল্য পরিয়ে দিই তার গলায়—কিন্তু মনে-মনে আমরা ভালোবাসি তাকেই, জীবন পণ ক'রে যে চেষ্টা করলো—চেষ্টা ক'রে পারলো না। আমাদের হৃদয়ের স্নেহে পরাজিতেরই স্থান। নেহাৎই কৃতী হওয়া—তার মূলগত সাধারণত্ব থেকে আমাদের মুখ ফেরাতে ইচ্ছে করে। বিজয়ী বীরকে বাহবা দিতে-দিতেও আমাদের মন তার ভাল্গারিটিতে অসুস্থ বোধ না-ক'রে পারে না।

শুধু যদি আমাদের জীবন নিখুঁত নৈতিক বিধান মেনেই চলতো, যদি প্রত্যেক মানুষ তার একনিষ্ঠ চেষ্টার পরিমাপেই সব সময় ফল লাভ করতো—যদি পৃথিবীর সমস্ত ব্যবস্থা এমন অসম্ভবরকম এলোমেলো, চিন্তাহীন না-হ'তো, তাহ'লে—তাহলে আমার এই আরাম, এই খ্যাতি, এই—যা-কিছু আজ ভবভূতি মুগ্ধ চোখে (কী ক্ষীণ, কী ভীরু, যে-ঈর্ষাটুকু তার দৃষ্টিকে মাঝে-মাঝে ঘোলা ক'রে তুলছে---প্রবলভাবে ঈর্ষা করাব শক্তিও তার নেই) তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছে, তা সবই যেতো তার কাছে। তা-ই উচিত ছিলো। আমি এ-সবেব জন্য কিছুই করিনি ; সত্যি বলতে অর্জন করিনি একে। সহজেই আমার কাছে এ-সব এসে গেছে, বড়ো বেশি সহজে। আমি কখনো কোনো কঠিন সাহিত্যব্রত গ্রহণ কবিনি, তিক্ত নিষ্ঠুর কোনো সংগ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে হয়নি আমাকে ; আমি কখনো অন্ধকাব রাত্রে একা ছটফট করতে-কবতে—যদি এই বিশ্বে কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতা থাকে তার কাছে নিজের ব্যর্থতা আর বিক্ষোভকে অঞ্জলিব মতো তুলে ধরিনি। তবু আমারই হ'লো। লোকে আমাকে কতদিন মনে রাখবে, কালস্রোতের কোন বিশেষ তরঙ্গের আঘাতে আমি ভেসে যাবো—সময়েব অসীমতাব মাপে বিচার করলে সেটা আপেক্ষিক ব্যাপার মাত্র। সবই যাবে, আমিও না-হয় গেলাম। কিন্তু আপাতত এটুকু তো পেলাম,—এই উজ্জ্বল কয়েকটা মুহূর্ত, সকালবেলাকার এই সুরভিত আলস্য আমার। এ-সত্য থেকে তো নিষ্কৃতি নেই যে আমি এটা পেয়ে গেলাম, আব—আর ভবভূতি তার আপিশেব ডেস্কে...। অথচ এর জন্য তেমন কোনো সচেতন চেষ্টা ছিলো না আমার, এর জন্য কোনো অসাধারণ দুঃখ আমাকে পেতে হয়নি। বরং, আমাব সমস্ত জীবন—ঠিক গোলাপেব বিছানা না-হ'লেও—অপেক্ষাকৃত সুখেই কেটেছে, খ্যাতি যেন আমার কাছে এসেছিলো গায়ে প'ড়ে, অনেক বন্ধুর ভালোবাসায় আমি ঐশ্বর্যবান। এদিকে ভবভূতি---কী তার জীবন, আর সেই সঙ্গে কী তার প্রতিজ্ঞা! ঘোবতর তামসিক এই নিরবচ্ছিন্ন দারিদ্র্য, আর তার মধ্যে তার অবিচল উন্মত্ত সংকল্প। যদি ব্রতগ্রহণ দিয়েই কথা, যদি দুঃখের দুরূহ মূল্যদান দিয়েই বিচার, তাহ'লে ভবভূতির সঙ্গে কার তুলনা? সুখী হ'তে, মন খুলে হাসতে ও যেন কখনো জানেইনি। ওর জন্ম, ওর শিক্ষা, ওর শৈশবের পারিপার্শ্বিক—তারপর আজ ওব এই কেরানিত্ব, স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে-না-দেখা বিবাহিত জীবন—প্রতি মুহূর্তে ও ভয়াবহ মূল্য দিয়ে আসছে। ঐ রকম জীবন যার, সে যে নিছক বেঁচে থাকার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারে, তা আমি কখনো কল্পনা করতে পারতুম না। আর ভবভূতি অক্লান্ত লিখে গেছে—অর্ধাহারে, রুগ্নদেহে নিজের প্রাণ বাজি রেখে লিখে গেছে, তবু সে হারলো। তবু সময়ের স্রোতে একটা আঁচড়ও সে কাটতে পারলো না। কেন এমন হয়? আমরা জানি না। কিছুই জানি না আমরা ; শুধু জানি যে এমনিই হয়।

বুঝতে পারছিলাম ভবভূতি আমার কিছু বলার জন্য অপেক্ষা করছে। তার হাতে খবর-কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট অনেক আগেই লক্ষ্য করেছিলাম। এখন কাজের কথা, তাহ'লে। হাতের সিগারেটটা ছাইদানের মধ্যে দুমড়ে রেখে জিগেস করলাম, 'তোমার লেখা কিছু এনেছো নাকি সঙ্গে?'

'এই একটা—'

'কই, দেখি' আমি ওকে লজ্জা কাটাতে সাহায্য করলাম।

ও প্যাকেটটা আমার হাতে দিলে। খুলে দেখলাম, বড়ো-বড়ো ছেলেমানষি হস্তাক্ষরে ফুলস্ক্যাপের তিন-শো বারো পৃষ্ঠায় এক উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি।

ভবভূতি বললে, 'পড়ে দেখো।'

'নিশ্চয়ই।' আমি অনায়াসে উচ্চারণ করলাম কথাটা, যদিও তখনই জানতুম যে শতবর্ষ পরমায়ু পেলেও ঐ পাণ্ডুলিপি আমি কখনোই পড়বো না।

'এ-বইটা, ভবভূতি বললে, 'আমার নিজের খুব ভালো লাগে না। কিন্তু সেইজন্যই এটা আনলুম। প্রকাশকদের হয়তো বা পছন্দ হ'তে পারে। তার উপর, তুমি যদি একটু বলো—'

'আমার যেটুকু সাধ্য, আমি করবো।' জেনে-শুনে আর-একটা মিথ্যে বলতে হ'লো। অবশ্য, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করলেও যদি ভবভূতির বই প্রকাশিত হবার লেশমাত্র সম্ভাবনা থাকতো, তাহলে, কোনো সন্দেহ নেই, আমি তা করতাম। কিন্তু ওর পাণ্ডুলিপির উপর একটু চোখ বুলিয়েই যা বুঝতে পেরেছিলাম, তাতে সে-পরিশ্রম বাঁচানোই আমার কাছে সবচেয়ে যুক্তিসংগত মনে হয়েছিলো।

'এ-বইটা যদি বেরোয়,' ভবভূতি বললে আর লোকে যদি নেয়, তাহ'লে আস্তে-আস্তে সত্যিকার ভালো বইগুলোও ..কী বলো? এ-ধরনের বই প'ড়ে তো অভ্যেস নেই লোকের ; সইয়ে-সইয়ে স্বাদ দেয়াই ভালো।'

ঠিক কথা! তক্ষুনি সায় দিলাম আমি। ভবভূতির মুখ থেকে এ-সব কথা শোনা প্রায় কষ্টকর হচ্ছিলো আমার পক্ষে। না, হাসাও যায় না ; হাসতেও কষ্ট হয়। ও ছিলো এমন মানুষ যার কোনো হিউমারের বালাই ছিলো না—আর সে-কথাই যদি ওঠে, অনেক-কিছুরই বালাই ছিল না ওর, বিধাতা ওকে তৈরি করেছিলেন ডিমের খোলার মতো শূন্য ক'রে। সব মানুষই কিছু একটা প্রতিভাবান হয় না ; কিন্তু কোনো মানুষের চরিত্র যে এমন একটানা-রকম বিবর্ণ, এমন ভীতিকর রকম লেপাপোঁছা, একেবারেই কোনো কোণখোঁচছাড়া হ'তে পারে, তা বিশ্বাস করা শক্ত। সংসারে, ঈশ্বর জানেন, মূঢ়তার অভাব নেই ; বরং, মূঢ়তার ভয়ংকর সর্বব্যাপিতার দৃশ্যে এক এক সময় বনবাসী হ'তে ইচ্ছে করে। ঈশ্বর জানেন, সংসারে মাছির মতো, সাপের মতো মানুষ চারদিকে কিলবিল করছে—এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে হাসি, যদি অবশ্য তাদের আক্রমণ কাটিয়ে উঠে জীবনশক্তি বজায় রাখতে পারার মতো ভাগ্যবান আমরা হই। কিন্তু ভবভূতির নির্বুদ্ধিতা এমনই ধরনের, যার সম্মুখীন হ'লে স্তম্ভিত হ'য়ে যেতে হয়, হাসিও আসে না। ও যেন ঈশ্বরের নিজের হাতের আঁকা ব্যঙ্গচিত্র ; সে-অতিরঞ্জন এতই মাত্রাহীন যে হাস্যরসের সীমানা উল্লঙ্ঘন ক'রে তা প্রায় ভয়াবহতার স্তরে গিয়ে পৌঁছয়। ওর যদি মাঝারিগোছের কি তার চেয়ে একটু নিম্ন স্তরেরও বুদ্ধি থাকতো, তাহ'লে ও বুঝতে পারতো ও কী করছে। লেখক হবার কোনোরকম যোগ্যতাই ওর ছিলো না—কিন্তু তা তো অনেক লোকেরই থাকে না। তেমনি, লিখতে তারা চেষ্টাও করে না। যেটা সত্যি শোকাবহ সেটা এই যে কাগজের উপর কতগুলো পর-পর সাজানো অক্ষর কত প্রাণহীন, কত অনিপুণ, কত শূন্যতাময় হ'লে তাকে আর লেখা বলে না, সে-জ্ঞানও ওর ছিলো না। আর সেটাই ওর কাল হলো। সত্যি-সত্যি ওর লেখা বাংলা মাসিকপত্রে ছাপাবারও অযোগ্য। আমি এখনো মাঝে-মাঝে ভাবি, যে-লেখা চোখ খোলা রেখে দু-মিনিট ধ'রেও পড়া যায় না তা ও দিনের পর দিন অক্লান্ত, বীভৎস অধ্যবসায়ে লিখে যেতে পারতো কেমন ক'রে। আর-সব বাদ দিয়ে, শুধু ঐ লিখে যেতে পারার জন্যই ওর প্রতি প্রশংসায় স্তব্ধ হ'য়ে যেতে হয়। বিধাতা সাধারণত একদিকের অভাব অন্য দিক দিয়ে পুষিয়ে দেন ; ভবভূতিরও ক্ষতিপূরণ হয়েছিলো—অতি-মানবিক ধৈর্যে, সংকল্পের সর্বগ্রাসী অবিচলতায়—যা প্রায় উন্মত্ততার মতো। অনুরূপ অবস্থায় যে-কোনো স্বাভাবিক, সুস্থ মানুষ বাল্যকাল অতিক্রম করবার সঙ্গে-সঙ্গেই সাহিত্যিক নেশা কাটিয়ে উঠে আরো বেশি অর্থোপার্জনে মনে দিতো—এবং সেদিকে হয়তো সফলও হ'তো। এতখানি সময় ও নিছক খাটুনি অর্থোপার্জনের চেষ্টায় প্রয়োগ করলে ভবভূতিও যে কিছু করতে না পারতো, তা জোর

ক'রে বলা যায় না। কিন্তু সেদিকে কোনো আকাঙ্ক্ষাই যেন ছিলো না ওর। ওর অবস্থা নিয়ে ও যে অখুশি, ওর কোনো কথায় কি আচরণে এমন আমার কখনো মনে হয়নি। এ-সব তুচ্ছ, পার্থিব বিষয় সে অনায়াসে অবহেলা করতে পারে। সে কী-রকম বাড়িতে থাকে, তাতে কী এসে যায়—অনেক ঊর্ধ্বে তার আসন, সে বিরাট স্রষ্টা, অমরত্বে তার দাবি। এখন না-হয় কেউ তাকে না-ই চিনলো, তার দিন আসবে। আসবেই। সেইজন্য, বিবেচনাশীল, সে প্রথমে তার অপেক্ষাকৃত বাজে লেখা বাঙালি পাঠককে উপহার দিতে চাচ্ছে—পরে, মূর্খ পাঠকদের একটু যখন গা-সহা হ'য়ে এসেছে, আস্তে-আস্তে তার সত্যিকার ভালো জিনিশগুলো বের করবে। ততদিন ভদ্রতার পাৎলা পলেস্তরার তলার বস্তির মতো অবস্থায় বসবাস করতে তার আপত্তি নেই।

'ঠিক কথা,' আমি আবার বললাম।

'হয়তো কারো ভালো লাগতেও পারে—কী বলো?'

'লাগতেই হবে!' আমি সজ্ঞানে পাপের উপর পাপ চাপাতে লাগলাম, 'কিন্তু প্রথমটায় জানোই তো—'

'হ্যাঁ, জানি। কিন্তু তুমি চেষ্টা করবে? চেষ্টা করবে তো?' ভবভূতির কণ্ঠস্বরে এমন মিনতির করুণতা ফুটে উঠলো যে ও যদি সত্যি চলনসই কিছু লিখে থাকতো, তাহ'লে সেই মুহূর্তে ওর প্রতি আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করতাম।

'আমার যেটুকু সাধ্য, নিশ্চয়ই করবো,' গম্ভীরভাবে জবাব দিলাম আমি।

মুহূর্তের জন্য ওর মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। আমি যখন বলেছি—তখন ওর বই বেরিয়ে গেছে বললেও দোষ হয় না। আমার কথায় কী গভীর বিশ্বাস ওর, কী একান্ত আত্মসমর্পণ! আমার মনের মধ্যে একবার মোচড় দিয়ে উঠলো। একবার মনে হ'লো বলি, সত্য কথাটা বলবার চেষ্টা করি, কিন্তু ওর মুখের সেই ক্ষণিক দীপ্তি দেখে বড়ো মায়া হ'লো। হায়রে মানুষের দুর্বলতা!

'তোমার নতুন কোনো বই বেরোচ্ছে না পুজোয়?' ভবভূতি জিগেস করলো।

'এই —দু-একটা—' তাচ্ছিল্যের সুরে জবাব দিলাম আমি, সংখ্যাটাকেও সাবধানে কমিয়ে বললাম।

'ইশ, অনেক তো বই হ'য়ে গেলো তোমার!'

'হ্যাঃ!' আমি হেসে উঠলাম, 'বইয়ের সংখ্যা অশ্লীলভাবে বেড়ে যাচ্ছে।'

'তুমিই তো আজকালকার দিনের—'

'যা বলেছো!' আমি তাকে কথাটা শেষ করতে দিলাম না, 'হাঁড়ি চড়াতে হবে, তাই আমার লেখা। ওকে কি আর লেখা বলে!'

'হ্যাঃ, তোমার আবার হাঁড়ি চড়াবার ভাবনা!' আমার কথাটায় যথেষ্ট সত্য ছিলো, কিন্তু ও সেটাকে সম্পূর্ণ বিনয় হিশেবে নিলে।

'সে-ভাবনা যাতে না থাকে, সেইজন্যেই তো—'

'টাকার জন্য লিখলে লেখা —একটু খারাপ হ'য়ে যাবার আশঙ্কা থাকে না?'

'শুধু কি তা-ই!' অসাধারণ উৎসাহ নিয়ে বলতে লাগলাম, 'যারা টাকা দিয়ে লেখা কেনে, তারা নানাভাবে অপমান করতেই ছাড়ে নাকি! তোমার তো সেটাই মস্ত সুবিধে,' আমার উৎসাহ মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে লাগলো, 'তুমি তো কারো কাছে প্রার্থী নও। তোমাকে হিংসে হয়, ভাবভূতি, তোমার মতো দুঃখ নেবার সাহস যদি আমার থাকতো!'

ভবভূতি মিটমিটে চোখে তাকালো। তাকে কোনো দুঃখ সম্বন্ধে খুব বেশি সচেতন মনে হ'লো না। আমি যে তাকে ঈর্ষা করি, এই রোমাঞ্চকর সংবাদেও তার মুখে কোনো ভাবের ব্যঞ্জনা ফুটলো না। আস্তে-আস্তে শুধু বললে, 'না, না, তুমি ভালো লেখো তাতে আর সন্দেহ কী।'

নাঃ, আর না। নিজের এই বিশ্রী কপটতায় নিজেরই ঘেন্না ধ'রে গেলো। একটা অপরাধের অস্বস্তিকর চেতনায় ভারি হ'য়ে উঠলো সমস্ত মন। এ আমি কী করছি? এ-রকমভাবে আর-কিছুদিন চললে ভবভূতি যে রীতিমতো বেসামাল হ'য়ে উঠবে। একদিন ওকে যে-নিষ্ঠুর আঘাত দিতে

হবে—অনিচ্ছায়, কিন্তু অনিবার্যরূপে—সে-কথা ভেবে অগ্রিম মন-খারাপ হ'য়ে গেলো।—কিন্তু ঈশ্বর আমার পক্ষে সেটা সহজ ক'রে দিয়েছিলেন।

কী বলবো ভাবছি এমন সময় আর-একজন এলো। সাহিত্যিক বন্ধু। ভবভূতির দিক থেকে মন সরিয়ে নেবার একটা উপলক্ষ্য পেয়ে কৃতজ্ঞ বোধ কবলাম। কিন্তু একটু পরেই ও উঠলো।

'কী, যাচ্ছো?'

'হ্যাঁ চলি এবার।'

আমি কোনোরকম মন্তব্য করলুম না ; আরো একটু বসতে বলার মৌখিক ভদ্রতাটুকু বাদ দিলুম। সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে আমার অনেক পেশাদারি আলাপ করবার ছিলো। উঠে গিয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলুম ওকে। দরজার বাইরে এসে ভবভূতি বললে, 'তাহ'লে আমি—আমি কয়েকদিন পরে এসে খোঁজ নিয়ে যাবো?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—আর তাছাড়া এমনিও যখন ইচ্ছে এসো না।' ভবভূতি যাবার জন্য উঠতেই আমার তাকে ভালো লাগতে আরম্ভ করেছিলো ; এখন, দরজার ধারে দাঁড়িয়ে তার প্রতি সহৃদয়তায় আমি যেন উন্মুখ হ'য়ে উঠলুম।

ফিরে আসতে, বন্ধুটি জিগেস করলে, 'কে হে এই লোকটি?'

'আমার এক বন্ধু।'

বন্ধুটি চেয়ারের পিঠে গা এলিয়ে দিয়ে হেসে উঠলো। 'তোমার বন্ধু! তোমার এ-রকম বন্ধু আছে জানতুম না তো।'

ভবভূতির অস্তিত্বের জন্য দায়ী ও ক্ষমাপ্রার্থী, আমি বললুম, 'ছেলেবেলার..'

টেবিলের উপর ভবভূতির পাণ্ডুলিপিটার উপর বন্ধুর চোখ পড়লো। বাঁকা হেসে বললে, 'কী, তোমার বন্ধু লেখা-টেকা কিছু দিয়ে গেলো বুঝি? এই কাগজের তাড়া—'

পাণ্ডুলিপিটা তাড়াতাড়ি তার নাগালের বাইরে সরিয়ে বললুম, 'ও কিছু না।' ব'লে অন্য কথা পাড়লুম।

দিন পনেরো পরে ভবভূতি যখন আবার এলো, আমি বললাম, 'আমাদের দেশের সব প্রকাশক—তাদের কি বুদ্ধিশুদ্ধি জ্ঞানগম্যি কিছু আছে নাকি? হাতের কাছে যে-কোনো বাণ্ডিল পায়, তা-ই ছাপে লেখক একটু নামজাদা হ'লেই হ'লো। নামজাদা!—' তীব্র অবজ্ঞার স্বরে আমি জুড়ে দিলুম, 'কী-সব লিখেই নাম করেন এক-একজন!'

ভবভূতির ক্লান্ত চোখ নিরাশায় আনত হ'য়ে এলো : 'হলো না তাহ'লে?'

'পাগল!' আমি রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠলুম, 'এটা তো জানো যে প্রচলিত ফ্যাশানের বিরুদ্ধে যে দাঁড়ায় তার পক্ষে আত্মপ্রতিষ্ঠা করা কত কঠিন! সাহিত্যেও—আর্টেও —সাময়িক-ভাবে এই ফ্যাশানের বিধানই চূড়ান্ত ; হাতে-হাতে যশ আর টাকা পাবার লোভ যাদের, তারা এই ফ্যাশানেরই দাসত্ব করে। কিন্তু তুমি তা করোনি, করতে পারো না। যদি পারতে, তাহ'লে তুমি আর তুমি থাকতে না। এ তো জানা কথা—তোমাকে চিনতে যে দেরি হবে এদের। আমাদের দেশের কথা ছেড়ে দাও ; লিটন স্ট্রেচির এমিনেন্ট ভিক্টরিয়ান্স ছাপাতে লন্ডনের কোনো প্রকাশক প্রথমে রাজি হয়নি, তা জানো?

স্ট্রেচির নাম শুনে ভবভূতির মুখে কোনো আলো ফুটলো না ; এমন কোনো প্রমাণ পেলুম না যে আমার কথা শুনে ওর মনটা আত্মগৌরবে উষ্ণ হ'য়ে উঠছে। একটু চুপ ক'রে থেকে ও নির্জীবস্বরে বললো, 'প্রথমেই তো আর নাম হয় না কারো। আজ যার নাম কেউ জানে না, হয়তো একখানা বই বেরোলেই—'

'নিশ্চয়ই!' সোৎসাহে সায় দিলুম আমি, 'নিশ্চয়ই! কিন্তু এ-ও বলি, ভবভূতি, তোমার পক্ষে এই আগ্রহ অশোভন হ'য়ে পড়ছে। এটা কেন বুঝতে পারছো না যে আগুন আর প্রতিভা কেউ চাপা দিয়ে রাখতে পারে না ; একদিন তা ফুটে বেরোবেই। আমার মতো লেখককে যা-কিছুর

জন্য ছুটোছুটি ক'রে মরতে হয়, তোমার কাছে সে-সব নিজে থেকে, গায়ে প'ড়ে আসবে। আর-কিছু করতে হবে না তোমাকে—চুপচাপ ব'সে থাকো,—দ্যাখো না কী হয়!'

'কিন্তু আমি যা লিখি,' ভবভূতি একটা খাঁটি কথা বললে, 'তা তো লোকের পড়া দরকার।'

'যথাসময়ে,' সংক্ষেপে, হেঁয়ালি-ধরনে আমি বললুম।

'হ্যাঁ, যথসময়ে,' গম্ভীর নিচু গলায় আমার কথাব প্রতিধ্বনি করলো ভবভূতি। 'তার এখনো দেরি থাকতে পারে, কিন্তু—'

ভবভূতি কথা শেষ করার ভাষা পেলো না ; আমি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলাম, 'নিশ্চয়ই!'

'কিন্তু যতদিন তা না আসে', সকুণ্ঠ, সলজ্জভাবে ভবভূতি বললে, 'একটু-একটু চেষ্টা করতেই বা দোষ কী? যাই বলো, আজকালকার জগতে কি আর প্রতিভার তেমন আদর আছে!'

'আজকালকাব জগতের কথা আর বোলো না! একটা সিগারেট খাও।'

'আমি ভাবছি তোমাকে আর-একটা লেখা দিয়ে যাবো। বলা যায় না—হঠাৎ কারো হয়তো খেয়াল হ'তে পারে—'

দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি ফেরৎ নিয়ে ভবভূতি আব-একটা দিয়ে গেলো। তৃতীয়টা ফেরৎ দেবার সময় আমি প্রকাশকদেব ভয়ংকর নির্বুদ্ধিতা এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অপ্রতিরোধ্য জয়যাত্রা সম্বন্ধে আরো জোরালো ভাষায় বক্তৃতা দিলুম। ঠিক সেই সময়ে, দুর্ভাগ্যবশত, ডাকযোগে এক মাসিকপত্র এসে উপস্থিত হলো : তাতে, দেখা গেলো, 'আধুনিক সাহিত্যে বামতনু' নামে এক প্রবন্ধ : আস্ত এক ফর্মা-ভরা, কোটেশন-বহুল আমাব এক উচ্ছ্বসিত স্তুতি। ভবভূতি লেখাটা খানিকক্ষণ উল্টে-পাল্টে দেখে চুপ ক'রে রইলো।

আমি হেসে বললুম, 'কী লিখেছে ইডিয়টচন্দ্র?'

প্রত্যুত্তরে ম্লান হেসে ভবভূতি বললে, 'তুমি একেবাবে দিগ্বিজয় ক'বে ফেলেছো, দেখছি।'

সশব্দে, আমি হেসে উঠলুম।—'আমি হচ্ছি ফ্যাশানের ঢেউয়ের উপরকার ফেনা, আজকের এই ক্ষণিক বোদ্দুরে ঝিকমিক করছি। হ'তে পারে, এই ঢেউ আরো একটু স্ফীত হবে ; আমার ঝিকিমিকি আরো একটু চোখ-ধাঁধানো হবে ; কিন্তু তারপব—এই ঢেউ যখন কেটে যাবে—কেটে যেতে বাধ্য —কোথায় থাকবো আমি তখন? সময়েব সমুদ্রে একটা বুদ্বুদ, মুহূর্তের একটা রঙিন রামধনু। আর তুমি? তুমি চিবস্থায়ী শিলাব মতো ; তোমাকে ঘিরে সময়ে অনেক জল চিবকাল ব'য়ে যাবে ; অসংখ্য ঢেউয়েব ওঠা-পড়াব মধ্যে স্থির, অক্ষয়, তুমি!'

আমার এ-সব কথায় ভবভূতির মন কোনো গভীব প্রেরণা পেয়েছিলো কিনা জানি না কিন্তু তারপরে কিছুকাল আর ওর দেখা পাইনি। ভয় করেছিলাম, ও হয়তো আবো কোনো পাণ্ডুলিপি আমার কাছে দিয়ে যাবে ; কিন্তু ওকে আর দেখতে না-পেয়ে ধারণা হ'লো শ্রেষ্ঠ সাহিত্য যে নিজেই নিজের পথ ক'রে নেয়, সে-বিষয়ে ওব মনে বিশ্বাস উৎপাদন করতে আমি সক্ষম হয়েছি। সময় ব'য়ে গেলো—আব আমি ভবভূতির অস্তিত্ব প্রায় বিস্মৃত হ'য়ে গেলুম। কেননা জীবন জটিল ও বহুমুখী এবং ভবভূতি এমন মানুষ নয় যার অনুপস্থিতি অনুভাব্য হ'তে পাবে। শেষটায়—হিশেব করলে দেখা যাবে প্রায় মাস চারেক পবে, কিন্তু জীবিকা-সংগ্রহের সর্বগ্রাসী চেষ্টায় যাকে ব্যাপৃত থাকতে হয়, তার কাছে তা অতটা সময় ব'লে মনে হয় না—একদিন ওর এক পোস্টকার্ড পেলুম : ও রোগে শয্যাগত , আমি কি একবার সময় ক'বে ওকে দেখে আসতে পারবো?

গেলাম ওকে দেখতে—গলির পর সরু গলি পার হ'য়ে ; পুরোনো, বনেদি কলকাতার শ্বাসরোধকারী, স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়ার ভিতর দিয়ে ; গায়ে-গা-লাগা, বিবর্ণ, সূর্যহীন অন্তঃপুর-সমন্বিত সব বাড়ির সারি পার হ'য়ে। দিনের বেলাতেই প্রায়-অন্ধকার এক বাই-লেনের ভিতর পাওয়া গেলো ভবভূতির বাড়ি। নিচের তলায়, রাস্তার উপব ওর দুটি ঘর : তারই মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত ভালো, সেখানে এক তক্তপোশে মলিন বিছানায় চাদরমুড়ি দিয়ে ভবভূতি শুয়ে আছে। ওকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। কোনোকালেই ও রোগা বই ছিলো না ; কিন্তু এখন যেন ওকে আর মানুষ

ব'লেই চেনা যায় না। মমির মতো শীর্ণ, নীরক্ত ওর মুখ ; কুয়োর মতো কোটরের নিচে ভারি, সবুজ জলের মতো মিটমিট করছে, চোখ দুটো ; চোখের নিচে গালে, কপালে ছোটো-ছোটো সব শিরাগুলো মোটা হ'য়ে ফুলে উঠেছে ; গালের উপর অনেকদিনের দাড়ি কোনো বিষাক্ত আগাছার মতো কুৎসিত। একবার তাকিয়েই উপলব্ধি করলাম, আমি এক মৃতদেহের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।

আমি যখন ঘরে ঢুকলুম, ভবভূতির স্ত্রী ওর শিয়রে ব'সে হাওয়া করছিলো ; আমাকে দেখেই সন্ত্রস্ত হ'য়ে ঘোমটা টেনে উঠে দাঁড়ালো। মুহূর্তের জন্য মেয়েটির চোখ আমার চোখে পড়লো ; তাতে কোনো লাবণ্য বা দীপ্তি নেই ; সে-মুখে একমাত্র যে-ভাবটি প্রকাশ পাচ্ছে তা হচ্ছে অমানুষিক সহনশীলতা, সে-মুখে লেখা আছে ভাগ্যের হাতে অন্ধ, নির্বোধ আত্মসমর্পণ। অনুমান করলুম, মেয়েটির বয়স আঠারো-উনিশ হবে, যে-বয়সটা মেয়েদের পক্ষে ঐশ্বর্যের মতো—কিন্তু এই কি তার রূপ! ভবভূতি এ-মুখের দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দ্যাখেনি ব'লে সেই মুহূর্তে ওকে খুব দোষ দিতে পারলুম না। তাকিয়ে দেখবার মতো, সত্যি, কিছু নেই। হঠাৎ আমার মনে হ'লো, এই মেয়ে যখন থান-কাপড় পরবে, হাত থেকে খুলে ফেলবে শাঁখা, মুছবে কপালের সিঁদুর, তখন ওকে যেন তা ভালোমতোই মানিয়ে যাবে ; বৈধব্যের কোনো কষ্ট অনুভব করবার ক্ষমতাও ওর নেই ; ওর জীবনের এই কুৎসিত, নিষ্ঠুর পরিসমাপ্তি অনায়াসে ও মেনে নেবে—মোটের উপর এখনকার চাইতে একটুও যে খারাপ থাকবে, তা নয়।

ভবভূতি ক্ষীণস্বরে বললে, 'বোসো।'

হঠাৎ, কী ভাবছিলাম তা টের পেয়ে নিজেই নিজেব কাছে লজ্জা পেলাম। ঘরের মধ্যে একটামাত্র চেয়ার ; সেটা টিনের, এবং তার উপর কতগুলো নোংরা কাপড় স্তূপীকৃত। সমস্ত ঘর এলোমেলো, বিশৃঙ্খল ; পানের ডিবে থেকে আরম্ভ ক'রে মুদি-খানার কাগজের ঠোঙা পর্যন্ত কাজের ও অকাজেব নানা-রকমের জিনিশ মেঝেময় ছড়ানো ; তারই মধ্যে এক উলঙ্গ শিশু হাত-পা ছড়িযে ব'সে কাল্পনিক এক সঙ্গীর কাছে ও ছাড়া অন্য সবার কাছে অর্থহীন কথা ব'লে যাচ্ছে।

বৌটি ময়লা কাপড়গুলো নামিয়ে চেয়ারটা আমাব কাছে এগিযে দিয়ে ঘর থেকে চ'লে গেলো। আমি জিগেস করলাম, 'কেমন আছো, ভবভূতি?'

ভবভূতি মাথা নাড়লো। —'ভালো না।'

'কী অসুখ?'

'জ্বর।'

'ক-দিন হ'লো?'

'আজ তেইশ দিন।'

'হুঁ' আমি একটু চুপ ক'রে রইলাম—'আপিশ?'

'একমাসের ছুটি পাওয়া গেছে, সামনের দশ তারিখে জয়ন করবার কথা। কিন্তু জ্বরটা কিছুতেই যে ছাড়ছে না। ভাবছি—আরো ছুটি চাইলে দেবে তো?'

আমি কোনো কথা বললাম না। ভবভূতির অন্তহীন ছুটি মঞ্জুর হ'য়ে আছে, তা বুঝতে পারলে আপিশের ছুটির কথা ভেবে ও বিচলিত হ'তো না।

কপাল পর্যন্ত ঘোমটায় ঢেকে ভবভূতির মা এলেন। তাঁর কাছ থেকে রোগের ও চিকিৎসার সব বিবরণ শোনা গেলো। অনেকদিন যাবৎই ভবভূতির খুশখুশে কাশি, বিকেলের দিকে সামান্য জ্বরও হয়। একাদশী আর পূর্ণিমা-অমাবস্যায় উপোস ক'রে ও সেটা কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা করেছে। কিছু ফল হয়নি। কাশিটা বরং দিনে-দিনে বেড়েই চলেছিলো। শরীরও অত্যন্ত দুর্বল, হাঁটতে কষ্ট হয়। শেষ পর্যন্ত শয্যা নিতে হ'লো। পাড়াতেই থাকেন এক কবিরাজ, আমার মনে হ'লো তাঁর সবচেয়ে বড়ো গুণ এই যে তিনি ভবভূতিদেরই দেশের লোক ; তাঁকে দিয়ে চিকিৎসা চলছে। তিনি বলেছেন, বিশেষ-কিছু নয় ; ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে, কাশির সঙ্গে যে-রক্তটা পড়ে, সেটা বেশি কাশতে গিয়ে গলায় চোট লাগে ব'লে। তাঁর নির্দেশ-অনুসারে চ্যবনপ্রাশ আর সকালে-বিকেলে

তুলসী-পাতা আর তালমিশ্রির অনুপান দিয়ে বড়ি খাওয়ানো হচ্ছে। কবিরাজটির হাত-যশ আছে ; ভগবানের ইচ্ছায় বাছা এখন শিগগির সেরে উঠলেই হয়।

ভবভূতির অসুখটা যে যক্ষ্মা, এবং যক্ষ্মার বেশ-একটু পরিণত অবস্থা, তা, এ-সব বিষয়ে যার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতাও আছে, সে একবার ওকে চোখে দেখেই বুঝতে পারে। টিউবার্কল বীজাণু যে ওকে আক্রমণ করবে, তাতে কিছুই আশ্চর্য হবার নেই ; বরং যে-সব অবস্থায় তা শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে বংশবৃদ্ধি করতে পারে, তার প্রত্যেকটি ভবভূতির মধ্যে সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। বলা যায়, যক্ষ্মার জন্য নিজেকে ও সযত্নে তৈরি করে রেখেছিলো—আয়োজনে কোথাও কোনো ত্রুটি রাখেনি। গলির মধ্যে স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার এই ঘর, অপ্রচুর, নিঃসার আহার, অত্যধিক পরিশ্রম—এতেও যদি ক্ষয়রোগ না হয় তো সেটা একটা মিরাকল। এখন যা অবস্থা, তাতে ভবভূতিকে মৃতের মধ্যে গণনা করলেও ক্ষতি নেই। অথচ, এখন পর্যন্ত চ্যবনপ্রাশের উপর নির্ভর ক'রে এরা সবাই নিশ্চিন্ত। কিন্তু মন্দই বা কী? তা-ই বা মন্দ কী? যে-কোনো অবস্থায়, ভবভূতি মরবেই ; স্ব-গ্রামিক কবিরাজের চিকিৎসা ওর এমন-কী আর ক্ষতি করতে পারবে? অন্তিম, ভয়ংকর উপলব্ধি একদিন তো অনিবার্যরূপেই আসবে—কেন তাকে অযথা এগিয়ে দেয়া? শিগগিরই সেরে উঠবে, এ-বিশ্বাসে যতদিন ওরা সুখে থাকতে পারে, থাক না। কী লাভ হবে ওদের জানিয়ে দিয়ে যে ভবভূতির ব্যাধিটা হচ্ছে যক্ষ্মা এবং ওর মৃত্যু আসন্ন? এ হচ্ছে গিয়ে বড়োলোকের রোগ ; অকৃপণভাবে অজস্র টাকা খরচ করতে না-পারলে সেরে ওঠার লেশমাত্র সম্ভাবনা নেই ; ভালোই তো, ওদের যদি ধারণা হয় যে ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে। কী হবে, আমি যদি একদিন ভালো ডাক্তার নিয়ে আসি? ডাক্তার এসেই তো বলবে, আশিটা ইনজেকশন দেয়া দরকার, তার একটার দামই হয়তো ভবভূতির একমাসের মাইনে। তখন? বলবে, গোপালপুর অন-সীতে নিয়ে যাও—তখন? খেতে বলবে ডিম, দুধ, মাখন, লুচি-মাংস, ফল—তখন? না, না, ডাক্তার না-ডাকাই ভালো ; কেন মিছিমিছি মন খারাপ করা? টাকার অভাবে, স্রেফ টাকার অভাবে একটা লোক মরতে বাধ্য হচ্ছে, এ-চিন্তা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত কারো কাছে অসহ্য, বাইরের লোকের কাছেও প্রীতিকর নয়। সেই প্রায়ান্ধকার, অপরিচ্ছন্ন ঘরে ব'সে ভবভূতির মা-র অজ্ঞান, স্নেহান্ধ, মিথ্যা-আশাবলম্বী কথা শুনতে-শুনতে আমার ভয়ানক মন খারাপ হ'য়ে গেলো। কয়েকদিনের মধ্যেই ভবভূতি যে-ভীষণ যন্ত্রণা পেয়ে-পেয়ে মরবে, সেই চিন্তায় আমি ভালো ক'রে নিশ্বাস নিতে পারছিলাম না। কিন্তু বৃথা চিন্তা ; আমি কী করতে পারি? কী ক্ষমতা আমার আছে?

সন্ধে হ'য়ে এলো। 'একটা আলো নিয়ে আসি,' ব'লে ভবভূতির মা ভিতরে গেলেন। হঠাৎ, ভবভূতির সঙ্গে একা ব'সে আমি কী-রকম দুর্বল হ'য়ে পড়লাম ; ওর দিক থেকে রইলাম মুখ ফিরিয়ে। বাচ্চাটিও কখন তার কাল্পনিক (কিন্তু যাকে আমরা বাস্তব বলি, তার চেয়ে কিছুমাত্র কম সত্য নয়) বন্ধুর সঙ্গে আলাপে ক্লান্ত হ'য়ে তার মা-র কাছে চ'লে গেছে ; স্তব্ধ ঘরে ব'সে ব'সে ভবভূতির দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনতে লাগলাম।

খানিক পরে ভবভূতি ডাকলো : 'রামতনু।'

আমি মুখ ফিরিয়ে তাকালাম।

'শোনো,' তৃতীয় ব্যক্তির অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ভবভূতি আমাকে বললো তার মনের কথা। 'অসুখটা ক'রে এমন বিশ্রী হ'লো ; নতুন একটা উপন্যাস লিখছিলাম—লিখতে পারলে শেষ হ'য়ে যেতো এতদিনে।'

আমি কণ্ঠস্বরে প্রফুল্লতা আনবার যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে বললাম, 'এমন আর তাড়া কী? সেরে উঠে তুমি অনেক উপন্যাস,' কথাটা আমার নিজের কানেই ঠাট্টার মতো শোনালো, 'শেষ করতে পারবে।'

'এ-বইটা খুব ভালো হচ্ছিলো ; আমার সবচেয়ে ভালো।'

'কী আশ্চর্য! আমি মিথ্যার উপর মিথ্যা জড়ো করতে লাগলাম, 'এখন আর তোমার কী হয়েছে?

সবে তো শুরু ; তোমার যা সবচেয়ে ভালো, এখনো তার অনেক দেরি আছে।'

ভবভূতির কোটরগ্রস্ত চোখে ক্ষণিকের আনন্দ চিকচিক ক'রে উঠলো। —'শুয়ে-শুয়ে প্রায়ই বইটার কথা ভাবি। এমন লিখতে ইচ্ছে করে!'

দিনব্যাপী আপিশের খাটুনির পরে বাড়ি ফিরে এসে আবার লেখা—বোধহয় এই তক্তপোশেই বুকের নিচে বালিশ চেপে উপুড় হ'য়ে শুয়ে—অবিশ্রান্ত লেখা—সে-লেখায় যশ নেই, অর্থ নেই, কোনোরকম পার্থিব লাভ নেই, বাইরে থেকে উৎসাহ নেই, তবু মুহূর্তের জন্য কিছুমাত্র দ'মে না-গিয়ে অনবরত লিখে যাওয়া—কী আশ্চর্য, কী ভয়ানক! হঠাৎ আমার মনে হ'লো, হয়তো এই লেখারই জন্য ভবভূতির অসুখটা করলো ; এত পরিশ্রমের উপযুক্ত স্বাস্থ্য নিয়ে ও তো জন্মায়নি। যদি ও সন্ধেবেলাটাও খোলা হাওয়ায় কাটাতো! যদি মরীয়া হ'য়ে আর্থিক উন্নতি ক'রে আর একটু ভালোভাবে থাকতে পারতো! কিন্তু—তখনই আমার আবার মনে হ'লো—এই ব্যাধির হাত থেকে কোনোরকমেই ওর নিস্তার ছিলো তা কে বলবে—ধনীরও তো অসুখ করে, ধনীও মরে—আর ভবভূতি তবু যা-হোক এইটুকু সান্ত্বনা নিয়ে মরতে পারবে যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে ওর সাহিত্যসৃষ্টি থাকবে অক্ষয় গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে ; ও নিজে অন্তত জেনে যাবে যে ওর জীবন একেবারে ব্যর্থ হয়নি।

কিন্তু সব জেনে-শুনেও মনকে একেবারে পাথর করা গেলো না—করতে হ'লো চিকিৎসার ভান। সে-ভান একদিক থেকে যেমন হাস্যকর, অন্যদিক থেকে তেমনি মর্মান্তিক। আমার পক্ষে তার মর্মান্তিকতা দ্বিগুণ : কেননা তা আমার এমনিতেই শূন্য হ'য়ে যেতে উৎসুক পকেটটাকে দ্রুততরবেগে শূন্যতর হ'তে সাহায্য করছিলো। দাক্ষিণ্যের প্রতি স্বাভাবিক কোনো উন্মুখতা আমার ছিলো না ; আর তাছাড়া ঐ বিলাসিতা বস্তুতই আমার সাধ্যের অতীত। আমাব নিজের অস্তিত্বই যাকে বলে গিয়ে হাত থেকে মুখে টলমলায়মান। যে-আমার কখনো কোনো শক্ত অসুখ করলে সোজা হাসপাতালে গিয়ে ওঠা ছাড়া উপায় থাকবে না, সেই আমাকেই এমন একজনের জন্য বাড়িতে লুকিয়ে ডাক্তারের ফীর ব্যবস্থা করতে হচ্ছে, যাকে, সত্যি বলতে, আমি ভালোওবাসিনে। ব্যাপাবটায় মনে-মনে একটু রাগও হ'লো, হাসিও পেলো। একেই বলে কপাল।

কলকাতায় ভবভূতির আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিলো না, জানতুম ; বাইরে কেউ আছে কিনা, খোঁজ নেবার মতো সময় ছিলো না—এবং এমনও সন্দেহ কবি যে খোঁজ নিলেও বিশেষ কিছু ফল হ'তো না। প্রত্যেকেই নিজের-নিজের জীবন নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে বিব্রত—অন্যের দিকে তাকাবার সময় কার আছে? তাছাড়া ভবভূতির পারবারিক ইতিবৃত্ত যতদূর জানতুম, ওর কোনো আত্মীয়ের যে ওর মৃত্যুর মুহূর্তে ওর কর্ণমূলে হরিনাম জপ ছাড়া (তাও খুব সোৎসাহে, উচ্চস্বরে নয়) আর কিছু করবার ক্ষমতা আছে, তা সম্ভব মনে হয়নি। আর তাছাড়া, আত্মীয় বলতে সাধারণত যাদের বোঝায় তারা হচ্ছে সেই শ্রেণীর জীব যারা আপনার মৃত্যুতে শোক করতে সব সময়ই এত বেশি প্রস্তুত হ'য়ে আছে যে সে-মৃত্যু নিবারণের উদ্দেশে কোনোরকমে চেষ্টা করবার খেয়াল তাদের হয় না।

সুতরাং আমাকেই পরদিন শহরের এক যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞকে নিয়ে যেতে হ'লো আমার বন্ধুকে দেখতে। রোগীর পরীক্ষা খুব সংক্ষিপ্ত হ'লো : পরীক্ষা করবার বিশেষ কিছু ছিলো না। ডাক্তার একটা প্রেস্কৃপশন লিখলেন, তারপর বেরোবার সময় ইঙ্গিত করলেন আমাকে। একটু সময় নিঃশব্দে তাঁর সঙ্গে হাঁটলুম। বাই-লেনে ডাক্তারের গাড়ি ঢোকেনি ; অপেক্ষাকৃত চওড়া গলিতেও সমস্ত জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। গাড়ির পা-দানিতে এক পা রেখে কোটের পকেট থেকে তিনি সোনার সিগারেট-কেস বের করলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'Clean case of tuberculosis'.

কথাটা শুনে রোমাঞ্চ হ'লো। যেন এ-খবরটা জানবার জন্যেই একটা গল্পের সম্পূর্ণ উপার্জন তাঁকে দক্ষিণা দিয়েছি। মুখে বললুম, 'তা জানি। এখন কী করতে হবে বলুন।'

এরপরে ডাক্তার সিগারেট ধরিয়ে কতগুলো পরিভাষাবহুল কথা বললেন। মুগ্ধ হ'য়ে আমি শুনতে

লাগলুম—এবং দেখতে লাগলুম। লোকটি বেঁটে, মোটা এবং গৌরবর্ণ। মাথার চুল জর্মানদের মতো ছোটো ক'রে ছাঁটা। ছোটো-ছোটো নীলচে চোখ ; ব্রশু একটুখানি গোঁফ। গাল দুটি আপেলের মতো টুকটুক করছে। নিখুঁত নখগুলো যেন রক্তে ফেটে পড়ছে। সব জড়িয়ে তাঁর পেশার জীবন্ত বিজ্ঞাপন। কথা বলতে-বলতে তাঁর বুকের সোনার চেন কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগলো ; স্ফীততর ও রক্তিমতর হ'য়ে উঠতে লাগলো তাঁর গণ্ডদেশ।

সব শুনে আমি বললুম, 'কিন্তু এখন কি কিছু করবার আছে?'

ডাক্তারবাবু গভীরভাবে মাথা নাড়লেন। ট্রিটমেন্ট অবিশ্যি করতে হবে—এ কোর্স অব ইনজেকশন টু বিগিন উইথ—তাতে কী রকম রেসপণ্ড করে সেটা দেখে নিয়ে তারপর—'

আমি তাড়াতাড়ি জিগেস করলুম, 'ইনজেকশন কি অনেকগুলো দিতে হবে?'

'সে-কথা এখন কী ক'রে বলি। কিন্তু,' ডাক্তারবাবু কথাটার গুরুত্ব স্ফুটতর করবার জন্য মোটা শাদা আঙুল দিয়ে তাঁর কোটের বোতামের উপর তিনবার টোকা দিলেন, 'কিন্তু সবার আগে দরকার এই বাড়ি ছেড়ে যাওয়া।' তিনি ঘোরতর অসমর্থনসূচক দৃষ্টিতে চারদিকে একবার তাকালেন, 'এ-রকম রাস্তার উপর এ-রকম বাড়িতে বাস করলে যক্ষ্মা না-হওয়াই যে আশ্চর্য।'

এ-কথার আমি কোনো জবাব দিলুম না। এ-রকম রাস্তা এবং তার উপর এ-রকম বাড়িতে থাকতে দেয়াই যে অন্যায়, কিন্তু যতদিন তা থাকে, কোনো-না-কোনো মানুষ সেখানে বাস করবেই, এই প্রসঙ্গ অবলম্বন ক'রে ডাক্তারবাবু সঙ্গে সমাজনৈতিক তত্ত্বালোচনায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব ছিলো না।

'হ্যাঁ,' ডাক্তারবাবুর প্রোটিন-পুষ্ট গণ্ডদেশে ঘামের ফোঁটা। চিকচিক করছিলো, রুমাল দিয়ে একবার মুখটা মুছে নিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, 'আসল কথা হচ্ছে এ-বাড়ি ছেড়ে যাওয়া, কলকাতার বাইরে যাওয়া। নয় তো, কথার সঙ্গে-সঙ্গে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লেন তিনি—'কিছুই এঁকে বাঁচাতে পারবে না—nothing on earth. Nothing on earth. গম্ভীর, এমনকি একটু ঝাঁকালো গলায় তিনি কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন। 'বাই দি ওয়ে, আপনি রোগীর কে হন?'

'আমি—আমি—এই রোগী আমার বন্ধু আরকি।'

'ও, ফ্রেণ্ড।' ডাক্তারবাবু একটু যেন সন্দিগ্ধচোখে আমার দিকে একবার তাকালেন, 'তা শিগগিরই ব্যবস্থা ক'রে ফেলুন। Lose no time গোপালপুর-অন-সী আজকাল খুব ভালো, ফ্রেশ জায়গা, বেশি রোগীর আমদানি হয়নি এখনো। আমার অনেক পেশেন্ট গোপালপুরে গিয়ে ভালো হয়েছে। I never recommend Puri. It had had too much of T.B. in its time. হ্যাঁ, গোপালপুর। বেশ ভালো দেখে একটা বাড়ি নেবেন একেবারে সমুদ্রের উপরে হওয়া চাই। Ozone. Ozone is an elixir. আমার মনে হচ্ছে আপনার বন্ধুর সেরে ওঠার চান্সই বেশি—এর চেয়ে খারাপ—এর চেয়ে অনেক খারাপ কেস আমি সারিয়েছি—bur lose no time. ঐ ওষুধটা আজ, কাল দু-দিন খাবে, তারপর পরশু থেকে ইনজেকশন—a course of ten to begin with—আর তার পরে—' বলতে-বলতে ডাক্তারবাবু গাড়িতে উঠে বসলেন। 'And make him feel happy in whatever way you can Nothing like happiness to cure consumption...আচ্ছা, কাল একবার এসে জানিয়ে যাবেন কেমন থাকে। বাড়িতে আমার আওয়ার্স হচ্ছে থ্রি টু ফাইভ ইন দি আফটারনুন।

আমি ফিরে যেতেই ভবভূতির মা—বিশেষ উদ্বিগ্নভাবে নয়—জিগেস করলেন, 'কী বললো ডাক্তার?'

আমি বললুম, 'আপনারা কিছুদিন না-হয় ওকে নিয়ে দেশে গিয়ে থাকুন, ডাক্তার বললে কিছুদিন খোলা হাওয়ায় থাকলেই সেরে যাবে।'

'দেশে গিয়ে কোথায় থাকবো, বাবা?' ভবভূতির মা যেন একটু বিরক্তই হলেন, 'বাড়ি-ঘরের যা অবস্থা। যদ্দিন না বিভুর চাকরি হয়েছিলো, ছিলুম আরকি কোনোরকমে। এখন আবার কে ফিরে যেতে চায় সেই সাপ-খোপ জঙ্গলের মধ্যে, বলো! তাছাড়া বয়স হয়েছে, কবে চোখ বুজি ঠিক

নেই, গঙ্গা ছেড়ে আমি যেতে পারবো না।'

তিনি যে-পুণ্যের লোভে ব'সে আছেন তা যে তাঁর পুত্রের কপালেই আগে জুটবে, সে-খবরটা গোপন ক'রে বললুম, 'ডাক্তার বলছিলো দেশে-গাঁয়ে গিয়ে কিছুদিন থাকলে—'

'ওঃ, রেখে দাও ডাক্তারদের কথা। অমন দুটো-চারটে বোলচাল না-ঝাড়লে ওদের ব্যবসা চলবে কেন? দেশে গিয়ে থাকো! এদিকে চাকরিটি যে মাথায় উঠবে, তার কী হবে শুনি? ডাক্তার দেবে চাকরি? খামকা তুমি ডাক্তার-ফাক্তার ডাকিয়ে অত হাঙ্গামা করতে গেলে। আমি কালই কালিঘাটে গিয়ে নৈবিদ্যি ফুল এনে দেবো ওর মাথায়—এখন শিগগির-শিগগির ও আবার চাকরিতে যেতে পারলেই হয়।'

কালিঘাটের ফুলই, তাহ'লে। তা-ই হোক। কালিঘাটের ফুল যতক্ষণ শান্তি দিতে পারছে, তা-ই বা মন্দ কী? আমি আমার সমস্ত বুদ্ধি নিয়ে তো তা পারি না।

তবু একেবারে ছেড়ে দেবার আগে, নেহাৎই নিজের স্বভাবের দোষে একবার যাদবপুরে চেষ্টা করলুম। সেখানে তিনটিমাত্র বিনিপয়সাব বিছানা, সেগুলো সারা বছরের মধ্যে একদিনের জন্যও ফাঁকা থাকে না। একজন রোগী মরবাব কি খালাশ পাবার সঙ্গে-সঙ্গেই আর-একজন জায়গা নেয় ; অনেকদিন আগে থেকেই দরখাস্তর তাড়া অপেক্ষা করতে থাকে। অসম্ভব। আর টাকা দিয়ে? সে আরো বেশি অসম্ভব।

এরপর আর-কিছু কববার রইলো না। বলা বাহুল্য, ডাক্তারের কাছে আমি আব গেলুম না, প্রেস্ক্রিপশন ছিঁড়ে ফেললুম, কেননা চিকিৎসা আরম্ভ কবা মানেই শেষ পর্যন্ত দেখা, আব তার মানেই টাকা—অগুনতি টাকা। অতএব আমার শূন্য পকেট এবং অপরাধী বিবেক নিয়ে ঘন-ঘন আসা-যাওয়া করতে লাগলুম—দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগলো। দিনের পব দিন, সেই স্যাঁৎসেঁতে, অন্ধকার একতলার ঘরে, একটু-একটু ক'রে, স্পষ্ট, প্রত্যক্ষভাবে ভবভূতি মরতে লাগলো। উপলব্ধি করলুম, ওর শরীরের আরামের চাইতে এখন আত্মার শান্তিব চেষ্টা কবাই অধিকতব সুবুদ্ধির কাজ।

শয্যাগত অবস্থায় প্রায় দু-মাস কেটে গেলো ওর। ছুটি আর টানা যায় না, ছাড়ানপত্র এলো আপিশ থেকে। ভবভূতিব মা শোকে আকুল হলেন। আমি তাঁকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা ক'রে বললুম যে ও একবার ভালো হ'য়ে উঠলে এমন অনেক চাকরি ইত্যাদি। বৌয়ের গায়ে সামান্য যা গয়না ছিলো, বিক্রি হ'তে লাগলো একে-একে। নিজের উপর স্রেফ ডাকাতি ক'রে আমি খুচরো এটা-ওটা চালাতে লাগলুম। কী আশ্চর্য, মনে-মনে আমি বললুম, ওর পরিবারকেও সর্বস্বান্ত না-ক'রে ও কি ছাড়বে না? এইবার শেষ হ'য়ে গেলেই তো পারে। ও ম'বে গেলে ওর পরিবারের কী অবস্থা হবে তা ভাববার মতো সাহস আমার কখনো হয়নি। সবটারই সীমা আছে।

একদিন ভবভূতি বললে, 'তোমার কী মনে হয়, রামতনু, আমি বাঁচবো না?'

'এ-সব বাজে কথা তোমার মাথায় কে ঢোকায় বলো না?' আমি হাসবার চেষ্টা কবলুম।

'না, না, লুকোচ্ছো কেন? আমি বুঝি, সবই বুঝি। আর বেশিদিন আমি নেই।' ভবভূতি চোখ বুজে একটু চুপ ক'রে রইলো। তারপর আস্তে-আস্তে বললো, 'কিন্তু, রামতনু, মববার আগে আমার একখানাও যদি বই বেরুতো!'

'সে-জন্যে তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? আগে ভালো হ'য়ে ওঠো, তারপর—'

'যদি ভালো না হই? মরবার পর আমার লেখার কী হবে আর না হবে তা তো আমি দেখতে পাবো না। তার আগে তুমি যে-কোনোরকম ক'রে একখানা বই কি বের ক'বে দিতে পারো না?' মুমূর্ষু দৃষ্টির সমস্ত ক্লান্ত করুণতা আমার মুখের উপর এসে নিবদ্ধ হ'লো।

চোখ সরিয়ে নিয়ে আমি বললুম, 'কী যে তুমি বলো তার ঠিক নেই। অবিশ্যি আমি আবারও চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি—'

'দ্যাখো না, দ্যাখো না একটু চেষ্টা ক'রে। এবার হয়তো হ'য়েও যেতে পারে। আমার একটা বইও যদি ছাপার অক্ষরে দেখতে পেতুম!' ভবভূতির গলা বুজে এলো—সে কি ম'রে যাবার দুঃখে,

নাকি বই ছাপা না-হবার জীবনব্যাপী হতাশায়? হয়তো নিছক শারীরিক ক্লান্তিতে, আর-কিছুই না।

'নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো। আপ্রাণ চেষ্টা করবো।'

ভান ক'রে বললুম না, মন থেকেই বললুম কথাটা। ওর কণ্ঠস্বরে যে-অপরিসীম মিনতি ছিলো তা প্রতিরোধ করা রক্তমাংসের পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

সেদিন ওর বাড়ি থেকে বেরোবার সময় হাতে ক'রে নিয়ে এলাম এক পাণ্ডুলিপি—ও নিজেই সেটা বেছে দিলে (ওর সমস্ত রচনাস্তূপ একটা ভাঙা ট্রাঙ্কের মধ্যে ঠাশা হ'য়ে ওর তক্তপোশেরই একপাশে থাকতো—ওর হাতের কাছে। এই রোগযন্ত্রণার মধ্যেও যখনই একটু সজীব বোধ করতো, সেগুলো দেখতো নাড়াচাড়া ক'রে)।

পরদিন গিয়ে আমি হাসিমুখেই বললুম, 'শুভ সংবাদ।'

'নিয়েছে?' ভবভূতির সমস্ত মুখে এক আশ্চর্য দীপ্তি ছড়িয়ে পড়লো। সেই মুহূর্তে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সার্থক মনে হ'লো আমার এতদিনকার নির্লজ্জ নিষ্ঠুর প্রতারণা। 'নিয়েছে?' প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করতে তার গলা একটু কেঁপে গেলো, 'কে নিলে?'

'ছোটো এক পাব্লিশর,' আমার সব উত্তর তৈরি ছিলো, 'এখন কিছু দিতে পারবে না, বললে —লাভের আদ্ধেক—'

'তা হোক, তা হোক! ভবভূতির জোরে-জোরে নিশ্বাস পড়ছে, দ্রুত, অনিয়মিত কথাগুলো দৌড়তে গিয়ে হোঁচট খেয়ে-খেয়ে বেরোচ্ছে তার মুখ থেকে—'লাভ আমি আশাও করিনে। ছাপছে?—তাহ'লে সত্যি ছাপছে ওরা? কবে বেরোবে?'

'এই, পুজোর আগেই,' অনায়াসে আমি বললুম কেননা ভবভূতি যে পুজো অবধি টিকবে, সে-রকম আশা করার বিশেষ কারণ ছিলো না।

তারপর এলো কয়েকটা মস্ত জল্পনার দিন—বাইরের চেহারা কেমন হবে, কী রঙের হবে মলাটের কাপড়, পিছনে সোনার জলে নাম লেখার চাল আজকাল আছে কি নেই, বইয়ের নাম আর পৃষ্ঠাসংখ্যা কোনখানটায় কী-রকম ক'রে বসালে একেবারে অভূতপূর্ব হয় ইত্যাদি, ইত্যাদি। তারপর বই বেরোলে পরে আমার কোন-কোন সাহিত্যিক বন্ধুকে দিয়ে কোন-কোন কাগজে রিভিউ করানো যায়, সমালোচনাগুলোর শ্রেষ্ঠাংশ চয়ন ক'রে কোনো কাগজে একটা বিনি-পয়সার বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করতে পারবো কিনা, প্রকাশকই বা কী-রকম ক'রে বিজ্ঞাপন দেবে—ইত্যাদি, ইত্যাদি। বইয়ের নামটা ঠিক হ'লো তো? একটা ভূমিকা লিখে দিলে কেমন হয়? অগ্রিম কতগুলো মতামত সংগ্রহ ক'রে জ্যাকেটের উপর ছেপে দিলে মন্দ হয় কী? আমি অবিশ্রান্ত পরামর্শ দিলুম, আশ্বাস দিলুম, প্রতিবাদ করলুম। বইখানা যে আমারই নামে উৎসর্গিত হবে, এই সম্মানও আমি গ্রহণ করলুম যথোচিত বিনয়ের সঙ্গে। এমনকি, উৎসর্গ-লিপিও আমার অজ্ঞাত রইলো না। ও আমাকে একদিন ছোট্ট এক টুকরো কাগজ দেখালে। তাতে লেখা :

'বঙ্গের সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক,
বহুদূরবিস্তারী যশের অধীশ্বর,
অতুলনীয় লেখনীর অধিকারী,
নিরহংকার, নির্মলচিত্ত,
স্নেহময়, হৃদয়বান
আমার শ্রেষ্ঠ
বন্ধু

শ্রীরামতনু মজুমদারকে

আমার এই দীন প্রচেষ্টা
উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলাম।'

এ-লিপি কখনো প্রকাশিত হ'লে গলায় দড়ি দিতে হ'তো ; সে-রকম সম্ভাবনা নেই ব'লেই ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম। মুখে বললাম, 'এত কী লেখবার দরকার ছিলো?'

'না, না,' ভবভূতি আকুলস্বরে ব'লে উঠলো, 'থাক, এই থাক। আরো কত লেখবার ইচ্ছে ছিলো—তুমি জানো না। এটা তুমি কালই দিয়ে এসো প্রকাশককে।'

এই কাগজের টুকরোটা এখনো আমার কাছে আছে। আমার বন্ধুর এই একমাত্র স্মৃতি। (উপন্যাসের সেই পাণ্ডুলিপিটা যথাসময়ে, অলক্ষিতে সেই শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছিলো, পৃথিবীর সব লুপ্ত, মৃত, জিনিশ শেষ পর্যন্ত যেখানে গিয়ে জড়ো হয়।) এই অদ্ভুত সাহিত্য-খণ্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনের মধ্যে কেমন একরকম কষ্ট হয় আমার। লেখা হিশেবে এটা নির্বুদ্ধিতার একটা দৃষ্টান্ত, কিন্তু এর আন্তরিকতায় সন্দেহ করবার উপায় নেই। কিন্তু শুধু আন্তরিকতার জোরেই যদি আর্টে পৌঁছনো যেতো তাহ'লে পৃথিবীর বেশির ভাগ প্রেমপত্র এমন অসম্ভবরকম ক্লান্তিকর হ'তো না। তবু হাস্যকররকম অতিরঞ্জিত, জমকালো, প্রায় বর্বর লেখার মধ্য দিয়ে ভবভূতি কিছু-একটা বলতে চেয়েছিলো—এটা ঠিক যে কিছু একটা বলতে চেয়েছিলো। 'আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু—' কথাটা এখন প্রায় ঠাট্টার মতো শোনায়। বোধহয় এটাই ভবভূতির শ্রেষ্ঠ বচনা।

যা-ই হোক, প্রতিদিন ওর কাছে ব'সে-ব'সে ওর মুদ্রাকরস্থ উপন্যাসের সমস্ত খুঁটিনাটি বৃত্তান্তের বিবৃতি দিয়ে যেতে লাগলুম। যে-আগ্রহ নিয়ে ও আমার কথাগুলো শুনতো তা রীতিমতো একটা দ্রষ্টব্য ব্যাপার ; অনুভূতির অমন প্রখরতা ওর মধ্যে সম্ভব তা আমি কখনো কল্পনা করিনি। প্রুফ আমিই দেখছি। তবে এখন বাংলাদেশে বই বেরোবার মরশুম—সব প্রেসেই দারুণ কাজের চাপ, আস্তে-আস্তে হচ্ছে। তবে হ'যে যাবে—পুজোর আগেই হ'য়ে যাবে। একেবারে বাঁধানো, ঝকঝকে, হট-প্রেসের ইস্ত্রি-করা আনকোরা বই ও হাতে পাবে—ওর নিজের বই। বিজ্ঞাপন যাবে সামনের মাস থেকে। শুনতে-শুনতে ভবভূতি মাঝে-মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলতো—দীর্ঘ পথের শেষ হ'লো ; এতদিনে, এতদিনে বুঝি সময় এলো তার। দেখতে পাচ্ছে সে চোখের সামনে রোদের সোনায় উদ্ভাসিত কোনো অদৃষ্টপূর্ব, আশ্চর্য শহরের মতো সাহিত্যিক যশের জ্যোতির্লোক। এ-কথা মনে ক'রে এখনো আমার তৃপ্তি হয় যে সেই শেষের ক-টা দিন আমি ওকে সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণরূপে সুখী করতে পেরেছিলাম। অমন সুখী জীবনে ও কখনো হয়নি। আর সেই আনন্দের উদ্দীপনায় ও যেন সত্যি-সত্যি ভালো হ'য়ে উঠতে লাগলো। যক্ষ্মা-সারাতে আনন্দের মতো কিছু নয়—বিশেষজ্ঞের এই কথার এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে চমৎকৃত হলুম। এক সময় আমার এমনও আশা হয়েছিলো যে শেষ পর্যন্ত—কে জানে, কিছুই বলা যায় না—ভবভূতি হয়তো সেরেও উঠতে পারে। ও-রকম নাকি অনেক হয়, শোনা গেছে।

বলা বাহুল্য, সে-মোহ বেশিদিন টিকলো না। যেন ওর শরীরের রোগটাই ক্লান্ত হ'যে একটু বিশ্রাম ক'রে নিচ্ছিলো, কয়েকদিন পরেই নির্দিষ্ট ও অনিবার্য দিকে মোড় নিলে। বুঝতে পারলুম, আমার বন্ধুর দিন ঘনিয়ে এসেছে। চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলুম ; আর-কিছু করবার ছিলো না।

তবু—মনে-মনে আমি বললুম—ও মরবে সুখী হ'য়ে, সেটাই বা কী কম? ওর এই সুখ থেকে আমি ওকে ভ্রষ্ট করতে যাবো কেন? না, আমি তা হ'তে দেবো না, হ'তে দেবো না। আর, কী সহজ ওকে সুখী করা—শুধু মুখের কয়েকটা কথা, কয়েকটা—লোকে বলবে—মিথ্যা কথা। মিথ্যা—কিন্তু ওর কাছে যদি তা-ই সত্য হ'য়ে উঠে থাকে, তাহ'লে তফাৎটা কোথায়? ও যদি মনে-মনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরে থাকে মৃত্যুহীন মহিমায়—তাহ'লে ওর দিক থেকে কোনো ফাঁক তো থাকলো না। আপনাদের সবচেয়ে কৃতী, সবচেয়ে যশস্বী যে বীর, তার নামের পাষাণ-লিখন—তা-ও যে একদিন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যাবে না তা কে বলবে? না, একই কথা। ভবভূতিও তার চরম চরিতার্থতার অংশ পেয়েছিলো বইকি—মৃত্যুর প্রান্তদেশে এসে। সে-ও তার জীবনকে জয় করতে পেরেছিলো—মৃত্যুর মুখোমুখি। ছিনিয়ে নিতে পেরেছিলো আনন্দের অংশ, তারও

এসেছিলো ক্ষণিক রঙিন দিন। স্বপ্ন? হ্যাঁ, স্বপ্নই তো ; কিন্তু স্বপ্ন সত্য নয় এ-কথা আপনাদের কে বললে? কল্পনাও একটা অভিজ্ঞতা : এবং অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতার চাইতে অনেক বেশি জীবন্ত, অনেক বেশি প্রখর। কেননা কল্পনাতেই চিরন্তনতা। বাস্তব সংকীর্ণ, ঘটনা ও সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ, বাস্তব অসম্পূর্ণ ; কল্পনা অসীম ও চিরন্তন। হ্যাঁ, স্বপ্ন। মনে করুন এই আমাদের জীবন—আমাদের সব কথা আর চিন্তা আর চেষ্টা—মনে করুন এ-সব কোনো বৃহত্তর সত্তার নিরবচ্ছিন্ন স্বপ্ন—তাহ'লে? এমন যদি হয় যে কোনো কালহীন, কালাতীত সত্তার ভাবনা দিয়ে এই বিশ্ব রচিত, তাহ'লে আমরা—যারা মাংসের দেয়ালের মধ্যে সময়ের শৃঙ্খলে বন্দী—আমরাই বা নিজেদের অনুপাতে, নিজেদের ভাবনা দিয়ে নিজস্ব, বিশ্ব সৃষ্টি করতে পারবো না কেন? কোন-এক স্তরে, আমাদের ভাবনাই সব কি নয়, আমরা যা ভাবতে পারি, আমরা কি তা-ই নই? এ-কথা ভেবে আমার তো ভালো লাগে যে ভবভূতি—জীবন যাকে দিয়েছিলো শুধু দীনতা আর গ্লানি—আর অতি ক্ষুদ্র, ধূলিময় সব দুঃখ, তার মৃত্যু হ'য়ে উঠেছিলো কল্পনায় জ্যোতির্ময়। যার জীবন ছিলো একটা অর্থহীন শূন্যতা, তার মৃত্যুর পথ সোনা-বসানো। সবদিক ভেবে দেখতে গেলে, সেটাই বা কম সৌভাগ্য কী। শেষ পর্যন্ত, হঠাৎ দেখতে যা মনে হ'তে পারতো অতি কুৎসিত প্রতারণা, তা-ই হ'য়ে উঠলো শ্রীময়। শেষ পর্যন্ত আমাকে আমার আচরণের জন্য অনুতাপ করতে হয়নি।

ভবভূতির মৃত্যুর কয়েকদিন আগে কলকাতার আকাশ ভ'রে শরৎ এসেছিলো। শাদা মেঘগুলোর দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলুম। কী সহজে ওরা ভেসে যায় আকাশের এক কোণ থেকে অন্য কোণে, কিন্তু মানুষের বাড়ি থেকে পা বাড়াতেই রেলভাড়া লাগে। সে-বছর আমার রেলভাড়ায় কমতি পড়েছিলো —পুজোর হিড়িকে যা-কিছু বাড়তি উপার্জন করেছিলুম, সব আমার বন্ধুর কৃপায় হাতে আসবার সঙ্গে-সঙ্গেই অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছিলো। পুজোর সময়টা কলকাতায় ব'সে-ব'সে ভাগ্যকে শাপ দিয়েছিলুম। বালক-কালের চিন্তাহীনতায় আমি আর ভবভূতি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা বন্ধু থাকবো। কবেই বা তা বলেছিলুম আর কবে ভুলে গিয়েছিলুম কিছুই মনে ছিলো না : কিন্তু ভাগ্য যে তা এমন বাঁকা অর্থে মনে ক'রে রাখবে তা কখনো ভাবতে পারিনি। কী দরকার ছিলো, কী দরকার ছিলো এ-সমস্তর? কিন্তু কেন যে আমাদের জীবনে ও-রকম না-হ'য়ে এ-রকম হয়, সেই রহস্যের কিছুই জানি না আমরা। আমরা শুধু দুঃখভোগ করতে পারি, শুধু প্রতিবাদ করতে পারি। কিন্তু ঘটনার জটিল জাল থেকে নিজেদের মুক্ত ক'রে নিতে পারি না কিছুতেই। ভবভূতির জন্য আমি কিছু অর্থ ব্যয় করছি, এতে আমার নিজেরই এক-একসময় অবাক লাগতো। এ আমি করছি কী? এর চেয়ে মূঢ় অপব্যয় আর কী হ'তে পারে? ভবভূতি যে মরবে এ তো নিশ্চিত—তাকে বাঁচানো আমার এই অত্যন্ত পরিমিত আয়ের তলানিটুকুর সাধ্য নয়। তাছাড়া, সত্যি বলতে, ভবভূতি এমন মানুষ নয় যে মরলে কি বাঁচলে খুব কিছু এসে যায়। মাঝখান থেকে আমি কেন নিজের উপর এই অত্যাচার করছি? ঈশ্বর জানেন, কী কষ্টসাধ্য, কী শীর্ণ আমার এই উপার্জন। নিজেরই কত ছোটোখাটো ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে বছরের পর বছর। আমার উপর এই দাক্ষিণ্যের ভার—এ যে রীতিমতো রসিকতা। যে-টাকা যাচ্ছে ভবভূতির চিকিৎসারূপ প্রহসনে (বলা বাহুল্য, বিশেষজ্ঞের বিধানের শতাংশও পালন করা সম্ভব হয়নি), তা দিয়ে আনাতোল ফ্রাঁসের পুরো সেট কেনা যেতো, বীঠোফেনের কোনো রেকর্ড, তা দিয়ে স্বাদ নিতে পারতুম কোনো দুর্লভ মদ্যের, কবিতার চরণের মতো যার নাম, সূর্যাস্তের আভার মতো যার রং, আর যাতে মশলার আর অন্ধকারের আর স্মৃতির গন্ধ। তা দিয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে দু-সপ্তাহ আলস্য উপভোগ ক'রে আসতে পারতুম। তা দিয়ে অনেক-কিছুই করা যেতো, যা দিয়ে আমার দরকার। হয়তো ও-সব আমাকে সাহায্য করতে পারতো একটি সুন্দর কবিতা লিখতে।

সবচেয়ে আমার যা খারাপ লেগেছে তা হচ্ছে ভবভূতির অর্ধস্ফুট, বিসদৃশভাবে উচ্চারিত কৃতজ্ঞতা। ওর অত্যন্ত আন্তরিক উচ্চারণেও কেমন যেন শ্রী ছিলো না। শুনতে অস্বস্তি লাগতো, কষ্ট হ'তো। সে-ই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়ো দুর্ভাগা, যে প্রকাশ করতে জানে না। তার অন্তরের

নিবিড়তম অনুভূতির কথাও কেউ শুনতে চাইবে না, সে ভালো ক'রে বলতে পারে না ব'লে। জীবনে প্রতি পদে আর্টের স্থান। আমরা স্বাভাবিকতা চাইনে, আমরা সু-অভিনয় চাই। আমরা কাঁচা মাল চাইনে, আমরা সৃষ্টি চাই। আমরা সত্যকে চাইনে, আমরা সুন্দরকে চাই। বর্নার্ড শ-র নাটকে অত্যন্ত ভালো, নানারকম নৈতিক গুণ-সংবলিত একজন মানুষকে মৃত্যুর মুখে ফেলে ডাক্তাররা তাকেই বাঁচানো স্থির করলেন যে দু-হাতে টাকা ধার নিয়ে আর ফেরৎ দেয় না, যে তার স্ত্রীকে বিয়ে পর্যন্ত করেনি। এমন মানুষের কথা সহজেই ভাবা যায়, যাকে ভবভূতির অবস্থায় দেখলে বাঁচাবার জন্য আমি পৃথিবী ওলোট-পালোট ক'রে ছাড়তুম। হয়তো তার আর-কোনোই গুণ থাকতো না ; শুধু শ-র চরিত্রের মতো ক'রে সে কথা বলতে পারতো। ভবভূতির জন্য আমি যদি কিছু ক'রে থাকি, ঈশ্বর জানেন তা ভালোবেসে করিনি : সুতরাং একাধিক অর্থে তা অপব্যয়। আর সেইজন্যেই ভবভূতির কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ আমার আরো বেশি অসহ্য লাগতো।

রোদে-ভ'রে-যাওয়া এক সকালবেলায় আমার যেন কিছুতেই আর কলকাতায় মন টিকছিলো না। কোথাও যেতে পারবো না মনে করতে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করছিলুম। ভবভূতির বিরুদ্ধে একটা ব্যক্তিগত আক্রোশ মনের মধ্যে মাঝে-মাঝে খোঁচা দিয়ে উঠছিলো। বাস্-এ চ'ড়ে ওর বাড়ির দিকে যেতে-যেতে ওর মুখ মনে পড়লো—ওর প্রেত-মুখ। কী ভয়ংকর সে-মুখ, তা যেন সেই মুহূর্তে, স্বচ্ছ-নীল সকালবেলার ভিতর দিয়ে যেতে-যেতে প্রথম উপলব্ধি করলুম। প্রায় মনে হ'লো ফিরে যাই। থাক, আজ থাক ; আজ ওর মুখোমুখি হ'তে পারবো না। আজকের এই সকালবেলায় নয়, আকাশ যখন নীলের গুঞ্জনে ভ'রে উঠলো। কিন্তু আমার উপর বিধাতার অভিশাপই এই যে আমি কখনো কোনো বিষয়ে চট ক'রে মনস্থির ক'রে উঠতে পারিনে। বাস্ এগিয়ে চললো ; নিছক অভ্যেসের জোরে ভবভূতির রাস্তার মোড়ে নেমে পড়লুম।

কিন্তু কী খারাপ, কী খারাপই আমার লাগছিলো আলোয় উজ্জীবিত, প্রাণ-চঞ্চল রাস্তা ছেড়ে আলোকহীন, আকাশহীন সেই গলিতে, শ্বাসরোধকারী, মৃত্যুময় সেই ঘরেব মধ্যে ঢুকতে। আ, জীবনে সময় এত কম, এত কম—তার মধ্যে এমন আশ্চর্য একটা সকালবেলা কি নষ্ট করতে হবে, রোগের শয্যাপার্শ্বে, মৃত্যুর নিশ্বাস-ঘন সেই অন্ধকার ঘরে—দারিদ্র্যের কঙ্কাল যেখানে প্রদর্শিত, জীবনের ক্ষীণ বুক-ধুকধুকানি যেখানে অতি কষ্টে কান পেতে শুনতে হয়?

যেন আমার মনের ভাবকে বিদ্রূপ ক'রে, আমি ঘরে ঢোকামাত্র ভবভূতি ব'লে উঠলো, 'এই তো তুমি এসেছো! আমি ঠিক জানতুম তুমি এখন আসবে।' হাসির চেষ্টায় ভবভূতির রোগশীর্ণ কুৎসিত মুখ আরো একটু বিকৃত হ'য়ে গেলো।

হাতে ছিলো এক ঠোঙা কাবুলি ফল, ওর মা-র হাতে সেটা দিয়ে এসে আমি ভবভূতির কাছে বসলুম। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে ও বল্লে, 'তুমি আমার জন্যে যা করলে, রামতনু—'

অসহ্য! তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ-পরিবর্তন করলুম, 'কেমন আছো আজ?'

'আর আছি!' ভবভূতি তা'র একখানা হাড়ময় হাত কপালের উপর তুলে দিলে।

'কাল রাত্রে ঘুমোতে পেরেছিলে?' আমি চেষ্টা করলুম আলাপটা এই সাধারণতার স্তরে আবদ্ধ রাখতে।

ভবভূতি মাথা নাড়লে। না, ঘুমোতে সে পারেনি। আজকাল প্রায়ই রাত্রে তার ঘুম হয় না। তাকিয়ে দেখলুম, তার চোখ দুটো কোটরের মধ্যে প্রায় অদৃশ্য হয়েছে। স্পষ্টত, ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে আর তার জীবনীশক্তি। যাক, বেশি দেরি নেই।

একটু পরে ও জিগেস করলে : 'বইয়ের কদ্দূর?'

'এই দ্যাখো না,' স্বয়ং সরস্বতী জবাবটা জুগিয়ে দিলেন আমার মুখে, 'কিছুর মধ্যে কিছু না, হঠাৎ প্রেসের মেশিন ভেঙে ব'সে আছে! আমি কাল গিয়ে প্রচণ্ড তাড়া দিয়ে এলুম। তুমি ও-সব কিছু ভেবো না—আগে সেরে ওঠে তো!'

'সেরে কি আর উঠবো কখনো।'

'কী যে বলো! ডাক্তার কী বলছে শুনেছো!'

ডাক্তার কী বলছে ভবভূতি সে-কথা জানতে চাইলো না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে-আস্তে বললে, 'আমার কিন্তু এক-এক সময় মনে হয়—'

'ওঃ, তোমার মনে হয়! ভারি বোঝো তুমি এ-সবের।'

'তাহ'লে—এখনো তাহ'লে আশা আছে?'

আমি হেসে উঠলুম।—'আর কয়েকটা দিন যাক না,' বুঝতে পারছিলুম ওর মন এরই মধ্যে একটু ভালো ক'রে দিতে সক্ষম হয়েছি ; উৎসাহিত হ'য়ে আমি স্থির করলুম, এখান থেকে যাবার আগে ওকে সম্পূর্ণরূপে সুখী করবো, 'কয়েকটা দিন যাক না,' আমি বললুম, 'তারপরেই পুরী। ডাক্তার অবশ্য বলেছিলো গোপালপুর, কিন্তু পুরীতে কতগুলো সুবিধে পাওয়া যাচ্ছে—পুরী গেলে তোমার অসুখ কোথায় থাকে, দ্যাখো না!'

'পুরী!' ভবভূতি বিহ্বলের মতো প্রতিধ্বনি করলে। আমার এই পরিকল্পনার কথা ও এই প্রথম শুনলো। ওটা ছিলো আমার হাতের শেষ রঙের তাস।

'একটা বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে, বুঝলে না,' উপস্থিত মুহূর্তের উদ্ভাবনাশক্তির উপর নির্ভর করে আমি বলতে লাগলুম, 'ভাড়া নামমাত্র দিতে হবে। যতদিন খুশি থাকো। একেবারে ভালো হ'য়ে উঠে তবে ফিরবে কলকাতায়।'

'কিন্তু', একটু চুপ ক'রে থেকে ভবভূতি বললে, 'আর-সব খরচ।'

'পুরীতে আবার খরচ কী? জলের মতো শস্তা সব। আর রেল-ভাড়া—সে একটা ব্যবস্থা হবে'খন।' কথাটা বলতে-বলতে এই পুজোর ছুটিতে আমার নিজের দুর্দশার কথা মনে পড়লো। হঠাৎ চুপ ক'রে গেলুম।

'সব ঠিক ক'রে ফেলেছো?' ভবভূতির অতি ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে একটু উৎসাহ যেন ফুটে উঠলো।

'হ্যাঁ, সব ঠিক!' তাড়াতাড়ি বলতে লাগলুম আমি। 'বাড়িটা একেবারে সমুদ্রের উপর—তুমি বারান্দায় শুয়ে থাকবে সবসময়—তা'তেই ভালো হ'য়ে উঠবে। ডাক্তার তো বলেইছেন ওজোনই জীবন। একটু সবল হ'য়ে উঠলে আস্তে-আস্তে—'

ভবভূতি যেন মনে-মনে ছবি দেখছিলো। হঠাৎ ব'লে উঠলো তা 'সমুদ্র আমি কখনো দেখিনি।'

একটু সবল হ'য়ে উঠলে, আমি ব'লে চললুম, 'একটু-একটু বেড়াতে পারবে ; আর একেবারে যখন সেরে উঠেছো তখন সমুদ্র-স্নান ক'রে নতুন মানুষ হ'য়ে ফিরে আসবে কলকাতায়। সমুদ্র-স্নান—তার মানে হচ্ছে শরীরটাকে ধোবা-বাড়ি থেকে কাচিয়ে আনা,' অন্য প্রসঙ্গে ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথের একটা উপমা চুরি ক'রে আমি কথা শেষ করলুম।

ভবভূতির চোখ বুজে এলো—'আ, যদি কখনো ভালো হ'য়ে উঠি, তাহ'লে নতুন ক'রে কত কিছুই আরম্ভ করতে পারবো! নতুন করে কত রকমের লেখা! যদি অনেক সময় থাকতো, যদি—' কথার মাঝখানে হঠাৎ থেমে গিয়ে ভবভূতি বললে, 'চাকরিটা গেলো!'

'ও-চাকরি তোমার গেছে, ভালোই হয়েছে। ও কি তোমার করবার মতো কাজ?' (সুখ, সুখ!—আমার প্রত্যেকটি কথা দুর্মূল্য ইনজেকশনের চাইতেও ফলপ্রদ হচ্ছিলো—আমি ওকে সুখে আচ্ছন্ন ক'রে দিলুম, মগ্ন ক'রে দিলুম।)' ও-চাকরি কি তুমি এমনিই বেশিদিন করতে পারতে—না কি তোমাকে করতেই হতো? একে-একে তোমার বইগুলো বেরুক না একবার—তারপর আর তোমাকে পায় কে?'

'আমি তো টাকার আশায় বই লিখিনি—'

'তোমার আশা করবার অপেক্ষাই থাকবে কিনা! টাকা একবার আসতে আরম্ভ করলে তা'কে আর থামায় কে!'

'এ-বইটা বেরোলে পরে', ভবভূতি কথাটাকে কার্যকারী ক্ষেত্রে নামিয়ে আনলে, 'হয়তো কোনো

বড়ো প্রকাশকের নজরে পড়তে পারে, যে টাকা দিয়ে আমার বই নেবে।'

'সে তো হ'লো বলে!' আমি অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের স্বরে বললুম, 'তোমাকে ঠেকিয়ে রাখবে এমন সাধ্য আছে কার?'

'লোকে বলে, যা সত্যি ভালো তার আদর এক সময়ে হয়ই।'

'না-হ'য়ে পারে?' আমি খেলায় মেতে গেলুম, 'এতদিন তুমি যে-কষ্ট করলে, তার কি কোনো প্রতিদান পাবে না? যে-ব্যর্থতা এতদিন ধ'রে প্রতি মুহূর্তে বহন করলে, তার মূল্য কি সুখে সৌভাগ্যে সার্থকতার দশগুণ ক'রে ফিরে পাবে না তুমি!'

'পাবো? তুমি ঠিক জানো, পাবো?'

মর্মান্তিক প্রশ্ন। অসম্ভব প্রশ্ন। চিরন্তন প্রশ্ন। এক-এক সময় ভাবি, যক্ষ্মার অন্তিম অবস্থার দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে, মৃত্যুর ভীষণ মূর্তির সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়েও ভবভূতি কি তার অনশ্বর সাহিত্যিক যশেব নব-জিরুসালেমের জ্যোতির্ময় স্বপ্নে মুগ্ধ হ'য়ে ছিলো? না কি কোনো এক মুহূর্তেব শীতল, শান্ত দৃষ্টিতে সে তার নিয়তিকে উপলব্ধি করেছিলো—এক কণা ধুলোর মতো সে তুচ্ছ, যাকে তার মৃত্যুর দু-দিন পরে কেউ আর মনে রাখবে না, পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে যার অভাব কেউ কখনোই অনুভব করবে না। জানবার উপায় নেই। তবে শেষ যেদিন ওকে দেখি, আমার একবার সন্দেহ হয়েছিলো যে আমি ওর জন্যে যে-মোহজাল তৈরি ক'রে দিয়েছিলুম, তা এইবার ছিন্ন হ'য়ে গেছে, হয়তো বা কোনোকালেই ও সত্যি-সত্যি সেটা বিশ্বাস করেনি। একটা কাশির কাৎরানি শেষ হ'য়ে যাবার পর ও শান্ত হ'য়ে অনেকক্ষণ শুয়েছিলো। ওর মুখের বিবর্ণতা কেটে গিয়ে—ক্ষয়রোগেব শেষ অবস্থার যা লক্ষণ—তা রক্তাভ হ'য়ে উঠেছে ; কোটরগত চোখে অস্বাভাবিক, তীক্ষ্ণ উজ্জ্বলতা ; হঠাৎ দেখলে মৃত্যুর এই প্রস্তাবনাকে সুন্দর স্বাস্থ্য ব'লে ভুল হয। অনেকক্ষণ ভবভূতি রইলো চুপ ক'রে, চোখ বুজে ; তারপব হঠাৎ সেই অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে নিচু, খুব নিচু গলায় কানে-কানে বলার মতো ক'রে জিগেস করলে, 'কথাটা কি সত্যি।'

'কী-কথা?'

'এই—আমার বই যে ছাপা হচ্ছে।'

আমার মুখে উত্তর জোগালো না ; আমার এতদিনের প্রতারণার প্রাসাদ যেন ভেঙে পড়লো। শেষ পর্যন্ত দেখবো ব'লেই শুরু করেছিলুম, কিন্তু মৃত্যু যখন এত কাছে থেকে মুখের দিকে তাকায তখন কি আর-কিছু বলবার থাকে!

কয়েক মুহূর্ত, ভবভূতির মৃত্যুময়, নির্নিমেষ দৃষ্টি আমার মুখের উপর অনুভব করলাম। তারপর আস্তে-আস্তে ও বললো, 'তবু—তবু তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।'

আমার মুখ দিয়ে বেরোলো, 'থাক, থাক, এখন আর অন্য কিছু ভেবো না, ভালো হ'য়ে ওঠবার চেষ্টা করো।'

'না, এখন আর আমার কোনো ভাবনা নেই', ভবভূতি হাসবার চেষ্টা করলো। 'তোমায় একটা কথা ব'লে যাই,' একটু চুপ ক'রে থেকে সে আবার বললো, 'আমি জানি, রামতনু, এতদিন আমি ভুল নিয়ে মেতে ছিলাম। যা-কিছু আমি লিখেছি, সব বাজে, সব রাবিশ। যাতে আমি ব্যথা না পাই, তুমি সেজন্য অনেক, অনেক চেষ্টা করেছো—কিন্তু কেন যে ও-সব পাগলামি করেছিলাম, এখন ভেবে নিজেরই অবাক লাগছে।'

সেই মুমূর্ষুর তীব্র দৃষ্টিতে আবিদ্ধ, আমার পক্ষে এ-সব কথার কোনোরকম প্রতিবাদ করা অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। যা-কিছু বলতে যাই, কে যেন মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে থামিয়ে দেয়। নীরবতায়, অসীম সময় থেকে খ'সে পড়তে লাগলো মুহূর্তের পর মুহূর্ত। তারপর, মৃত্যুর প্রান্তে এসে যক্ষ্মারোগীর মনে যে-প্রবল আকাঙ্ক্ষা নতুন ক'রে জেগে ওঠে, বোধহয় তারই প্রেরণায় ভবভূতি বলতে লাগলো, 'কিন্তু এখনো সময় আছে। আমার আজ কী মনে হচ্ছে জানো, মনে হচ্ছে আমি মরবো না। আমি সেরে উঠবো, শিগগিরই সেরে উঠবো, আর তারপর—তারপর আবার আব-

একবার —তুমি দেখে নিয়ো রামতনু, আমি লিখবো। সত্যি লিখবো। সত্যি-সত্যি এমন বই লিখবো—'

কিন্তু ভবভূতি তার সেই ভবিষ্যদ্বাণীর উচ্চারণ শেষ করতে পারলে না। এই উত্তেজনায় আবার তার কাশি উঠলো ; রক্তে বালিশ লাল হ'য়ে গেলো, তবু কাশি থামে না। আর সহ্য করতে না-পেরে আমি আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলাম। সেই রাত্রেই ভবভূতি মারা গেলো।

এ-জন্য অপেক্ষা ক'রেই ছিলুম ; তবু যখন মনে হ'লো যে ভবভূতি একেবারে নিঃশেষ, নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে, জলের রেখার মতো মুছে গেছে বিশ্বের মুখ থেকে, চিরন্তন সময়ের মধ্যে তার ক্ষুদ্রতম কণাও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, তখন কেমন একটু অবাক লাগলো। তার এত কষ্ট, এত চেষ্টা—তার এতদিনের দীর্ঘ সাধনায় আত্ম-অত্যাচার—সব নিষ্ফল, শূন্য হ'য়ে গেলো। একদিনের জন্যও কেউ তাকে মনে রাখবে না। বাংলাদেশে অনেক লেখক আসবে, লাভ করবে খ্যাতি, ডুবে যাবে বিস্মৃতির জলে তলিয়ে,—মাঝে-মাঝে দু-একজন থাকবে স্মরণীয় হ'য়ে, কিন্তু কেউ কখনো জানবে না যে ভবভূতি নামের কেউ-একজন কখনো লিখেছিলো, আশা করেছিলো, শেষ পর্যন্ত তার আশার যূপে বলি দিয়েছিলো, নিজের জীবন। এমন ভয়ংকর ত্যাগ কাকে কবে করতে শোনা গেছে? কিন্তু তাতে কী এসে যায়। কিসেই বা কী এসে যায়—এই ত্যাগে, এই আত্মবিনাশে, এই সাধনায়? ও-সবের কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত নয় এই পৃথিবী। পৃথিবী আর-কিছুই বোঝে না, বোঝে শুধু প্রতিভা। প্রতিভা যা দেয়—হ'তে পাবে মদের, কি তার চেয়েও তীব্র কোনো নেশার ঝোঁকে ; হ'তে পারে পেটের দায়ে ; হতে পারে কোনো স্ত্রীলোক কিংবা রাজাকে খুশি করার জন্য ; অবজ্ঞায়, অশ্রদ্ধায় ; শেষরাতে নাচ থেকে ফিরে পোশাক ছাড়তে-ছাড়তে ; কোনো এক বিকেলবেলায় ব'সে-ব'সে আর কিছু করবার নেই ব'লে ; নিজের উপর কি অন্য কারো উপর রাগ ক'রে ; প্রচলিত জনরুচির কিংবা কোনো নির্দিষ্ট উপরিওলার বিধান অনুসারে, অনুরুদ্ধ হ'য়ে, বাধ্য হ'য়ে, অনেক সময় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে—প্রতিভা যা দেয়, যা-কিছু ছড়িয়ে দেয় অবহেলায়, পৃথিবী তা-ই মাথা পেতে নেয়, তা-ই সযত্নে কুড়িয়ে-কাচিয়ে তার চিবকালের ভাণ্ডারে সঞ্চয় ক'রে রাখে। কিন্তু তাছাড়া—যতই অচঞ্চল হোক আপনার নিষ্ঠা, আন্তরিক হোক উদ্দেশ্য, যতই আপনি সৎ হোন, পরিশ্রমী হোন, যত দারুণ দুঃখই আপনি সহ্য করুন না কেন, পৃথিবী আপনার মুখের দিকে একবার ফিরে তাকাবে না। যে-সব ভালো-ভালো গুণের উপর মানুষের সামাজিক জীবনে এত জোর দেয়া হয়, জীবনের সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে তার একেবারেই অর্থ নেই।

তবু—তবু একবার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, এত ইচ্ছা, এত চেষ্টা, এমন একনিষ্ঠ অধ্যবসায়, উদ্দেশ্যের এই প্রাণান্তকর সততা —এর কি একেবারেই কোনো মূল্য নেই? ভাবতে ভালো লাগে, ভবভূতি তার ক্ষতিপূরণ পেয়েছে, অতীন্দ্রিয় কোনো সার্থকতা, পৃথিবী-অতীত কোনো পূর্ণতা— অন্য-কোনো জীবনে। মনে-মনে ব্রাউনিং আওড়াই : 'Not on the vulgar mass called "work" must sentence pass—' ; আর আমাদের নিজস্ব রবীন্দ্রনাথ ; 'জীবনে যত পূজা হ'লো না সারা' ইত্যাদি। কিন্তু মুহূর্তের জন্যও, মুহূর্তের জন্যও নিষ্ফলতাব এই মহিমায় যদি বিশ্বাস করতে পারতাম। এমন মোহ যদি কখনোই মনে স্থান দিতে পারতাম যে এখানে যা অসম্পূর্ণ, অকৃত, স্তূপীকৃত ভগ্নাংশ অন্য কোথাও, কোনো স্বর্গে, কোনো ঈশ্বরের চরণপ্রান্তে তা দীপ্ত হ'য়ে উঠছে নিটোল নিখুঁত পরিপূর্ণতায়!—কিন্তু আমরা যে জানি মৃত্যুই সর্বশেষ সমাপ্তি, আমরা যে জেনেছি জীবন নিয়ে নিয়তির উচ্ছৃঙ্খল খেয়ালিপনা—আমরা যে জানি যে অনেক-কিছুই আমরা জানি না। কেমন ক'রে ব্রাউনিং বা রবীন্দ্রনাথের মতো পরিতৃপ্ত প্রশান্তি নিয়ে আমরা বলতে পারি ...না, আমাদের সব ব্যর্থতার অনিবার্য প্রতিষেধক ও চিকিৎসারূপে ঈশ্বরকে ব্যবহার ক'রে, আমাদের সব ঋণের দায় কোনো প্রতিশ্রুত স্বর্গের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আমবা যে একবার নিশ্বাস ফেলবো সেটুকু উপায়, সেটুকু সান্ত্বনাও আমাদের নেই।

রূপালি পাখি

এক

বসন্তের সেই সকালবেলায় সে ঘুম থেকে উঠলো : আর উঠে দেখলো সে একা ; নিজেকে তার একা লাগছে।

এখন, চিরকাল এই নিঃসঙ্গতাকে সে ভয় করেছে। একটা ভীষণ আতঙ্ক : যদি কখনো তাকে সত্যি-সত্যি একা থাকতে হয়। আর আমাদের জীবনটা এমনি যে সব সময় হাতের কাছে মানুষ পাওয়া যায় না ; আব মানুষ যদি বা পাওয়া যায়, ঠিক মানুষকে পাওয়া যায় না ; আর এমনও যদি হয় যে ঠিক মানুষকেই পাওয়া গেলো, ঠিক সময় হয়-তো তখন নয়।

তবু, মানুষ নিয়েই আমরা বাঁচি। মানুষকে আমরা খুঁজি : মানুষকে ঘৃণা করি, মানুষকে ভালোবাসি। আর যদিও ঘৃণা জীবনেব অবিচ্ছেদ্য একটা অংশ, পূর্ণতার একটা অঙ্গ, এমন কি—তবু, ভালোবাসতে পারলেই ভালো।

আর তাই সে তার যৌবনের প্রথম থেকে নিজের চারদিকে টেনে এনেছিলো ছোট একটি বন্ধুর দল। তাদের সে টেনে নিয়েছিলো নিজের মধ্যে, সেই বন্ধুদের, এডিসনের বাতি যেমন বিদ্যুতের স্রোতকে টেনে নেয় নিজেব মধ্যে, তাবপব জ্বলে' ওঠে। সে-ও জ্বলে' উঠেছিলো , বন্ধুদের প্রাণেব শিখা নিয়েছিলো শোষণ কবে', বড় হ'য়ে উঠেছিলো নিজে। কেবল সঙ্গ-লিপ্সা, কেবল সময় কাটানোব তাগিদ—তাব চেয়ে অনেক বেশি এই বন্ধুতা। তার চেয়ে অনেক নিগূঢ়, অনেক জটিল—সত্তাব অন্ধকার মূলে তাব সঞ্চাব। সেই আগুনে, সেই উত্তাপে তাব জীবনের লালন। বন্ধুদের থেকে সে নিতো অকৃপণ, অপবিমিত স্রোতে---প্রায় নির্লজ্জভাবে। আর অবিশ্যি নিজেকে তার দিতেও হতো : কিছু না-ভেবে, কিছু বাকি না-রেখে।

ঠিক বলা হ'লো কী? কিন্তু যেটুকু সে বাকি রেখেছিলো, কোনো মানুষ তা অন্য-একজনকে দিতে পাবে না। সে ভয় কবতো—তার সত্তার সেই চেতনা-অতীত অন্ধকার, তাকেই সে ভয় করতো। কেননা সেখানেই নির্জনতা · আমাদের চরম নিঃসঙ্গতা সেখানেই। সে তা ভুলে' থাকতে চাইতো ; এমন ভান কবতো যেন তা নেই। অনেক, অনেকদিন পর্যন্ত।

কিন্তু সেই অন্ধকারেব দবজা কি খুলে গেলো আজ এই বসন্তের সকালবেলায়? কী আতঙ্ক! কী যন্ত্রণা!

মানুষ না-হ'লে বাঁচা যায় না, কেবল মানুষ নিয়েও বাঁচা যায় না। কোনো মানুষই সব সময় একরকম নয়। তা ছাড়া, ঘটনার সুতো চিবকাল এলোমেলো জাল বুনে যাচ্ছে, তা থেকে আমাদের নিষ্কৃতি নেই। যাকে যখন চাই, পাওয়া যায় না হয়-তো। তার চেয়েও খারাপ, যাকে যখন যে-রকম করে' চাই, তা পাইনে। মনেব অনেক বকম অবস্থা আছে ; তার উপর আমাদের হাত নেই। আছে ক্লান্তি। আছে উদাসীনতা। আছে ভয়ঙ্কর অবসাদ, সমস্ত সৌরজগতকে যা লুপ্ত করে' দিতে পারে। সুতরাং অন্য-কোনো আশ্রয় দরকার, নিজেব মধ্যে কোনো আশ্রয়।

কী তা হ'তে পারে? মানুষ কী করে' বাঁচে? কী করে' সময় কাটায়? মানুষ কী করে তার জীবন নিয়ে? যথেষ্ট পয়সা থাকলে, হঠাৎ মনে হ'তে পারে, এই ক্লান্তির সঙ্গে ভালোরকম একবাব যুদ্ধ করা যায়। বেড়ানো যায়। পড়া যায। ডুবে থাকা যায় সামাজিকতার আমোদে। একটু-আধটু মদেও ডোবা যায়—যদি নেহাৎই দবকাব হয়। অবসাদ দূর করতে একটা কক্‌টেলের মত কিছু নয়।

কিন্তু যখন আমবা এখান থেকে ওখানে যথেষ্ট ছুটোছুটি করলুম ; বিভিন্ন চেহারার, বিভিন্ন ঢঙের, বিভিন্ন রঙের যথেষ্ট মেয়ে পুরুষের সঙ্গে যথেষ্ট মাখামাখি করলুম ; যখন আমরা অজ্ঞান হ'য়ে না-পড়া

পর্যন্ত ককটেল খেলুম—তারপর কী? তারপর—ঠোঁটের উপর লেগে-থাকা ক্ষীণ বিস্বাদ, আর আবার সেই ক্লান্তি—আরো ভয়ানক, আরো বিশাল—কেননা এর পরে আর নতুন কিছু করবার নেই, এর পরে সেই একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি।

আর-একটা উপায় আছে। কাজ। যে-কাজ আমাদের বাঁধে, যে-কাজ আমাদের কিছু ভাববার সময় দেয় না। এমন মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে চিরকালই কম, যারা কেবল বসে'-বসে' পয়সা খরচ করে' জীবন কাটাতে পারে। বাকি সবাইকে কোনো-না-কোনো রকম কাজ করতে হয়। ভাগ্যিস করতে হয়। নয় তো মানুষ বাঁচতো কী করে'? কী করে' সহ্য করতো এই জীবন—এই শূন্যতার অর্থহীনতার অর্থহীন প্রসার?

কাজ আছে দু'রকমের। একটা সহজ, সরস, নিজের ইচ্ছায় সঞ্জাত, আনন্দে উদ্দীপিত। সে-কাজে কোনো ভার নেই, কোনো দায় নেই। পাখি যেমন করে' কাজ করে ; যে গাইতে পারে তার গলা দিয়ে যেমন সুর ফোটে। তা ফুটে ওঠে আমারই ভিতর থেকে, আবার নতুন করে' সৃষ্টি করে আমাকে। নিজের যতখানি তাতে দিই সেটা খোয়া যায় না ; সেটা ফিরে আসে নিজের মধ্যে, রূপান্তরিত, বিশুদ্ধ ; জমে' ওঠে বিশুদ্ধ রসের প্রেরণায়, আঙুরের নিটোল হৃদয়ের মত।

আজকালকার পৃথিবীতে এ-ধরনের কাজের ক্ষেত্র ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আসছে। যন্ত্র রয়েছে। রয়েছে বিরাট, দুর্বোধ্য অর্থনৈতিক সিস্‌টেম। একজনের আলাদা হ'য়ে কিছু করাটা লোকসান—ধনবৃদ্ধির দিক থেকে। একই উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক লোকের একযোগে কাজ করবার যে-সামঞ্জস্য, তারই জোরে তো সিস্‌টেম টিকে আছে। ধনস্ফীতিও হচ্ছে সন্দেহ নেই : কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করো সেটা এমন অসমান, মাত্রাহীন, ছন্দহীন কেন, সে আলাদা কথা।

যে-কাজ অন্যের জন্য, যে-কাজ নিছক জীবিকার জন্য, তাতে অভ্যাসের যান্ত্রিক অসাড়তা আসতে বাধ্য। তবু সেটা ভালো, কেননা, তাতে সময় কাটে। আর এই কাজও একটা নেশা হ'যে উঠতে পারে : আপনি কেবলই কাজ করে' যাচ্ছেন, কেন জানেন না ; কেবলই বাড়িয়ে যাচ্ছেন আপনার টাকা, কেন জানেন না। আজকালকার দিনে এ-ধবনের লোককেও প্রতিভা বলা হয়। হ্যাঁ, দানবীর প্রতিভা। কারণ মনের একরকম অসুস্থতা, বিকৃতি ছাড়া এ কিছু নয়। তবু, একটা কেন্দ্র তাবা পেয়েছে, একটা আশ্রয় ; ক্লান্তিকে তারা পরাস্ত করেছে ;.জীবনের সমস্যার সমাধান করেছে কোনো একরকম করে'। যদিও, হ'তে পারে, জীবনকে একেবারে অস্বীকার করে'ই তারা তা করতে পেরেছে।

মোটের উপর, কাজকে বাদ দেয়া যায় না, সেটা প্রয়োজন। আর তাই তাকেও তার কাজ খুঁজে নিতে হবে।

আমাদের এই বিরাট সিস্‌টেম প্রায় সব মানুষকেই শোষণ করে' নিয়েছে। মুক্তির রাস্তা আছে কেবল তাদের যারা বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক, যারা কবি, যারা শিল্পী। ঈশ্বর যদি সেদিক থেকে আপনাকে কিছু দিয়ে থাকেন, তাহ'লে আপনি চেষ্টা করতে পারেন এই পৃথিবীর মধ্যে থেকেও তাকে ফাঁকি দেবার।

আর তার ছিলো একটু লেখার সুড়সুড়ি—একটুখানি ক্ষমতা, এমন কি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সে-জন্য। সে-ই তো তার জীবনের শেষ দুর্গ।—অনাক্রমণীয়, আনন্দময়। সেখানে সে ভয় করে না একা হ'তে। তা-ই বা কেন—সেখানে সব চেয়ে কম সে একা : সমস্ত কথার আর সুখে-ফেটে-পড়া হাসির শব্দ সে-আনন্দ, সে-সম্পূর্ণতা তাকে দিতে পারে না, যা সে পায় একা ঘরে বসে' এক পাতা কবিতা পড়ে' কি—ঈশ্বর যদি দয়া করেন—কয়েক লাইন কবিতা লিখে। সেই নিঃসঙ্গতায় ধ্বনির আর স্বপ্নের আর ভাবনার ভিড়, সেখানকার নীরবতা বাণীময়।

কিন্তু তবু, নিজেকে মুখোমুখি সে দেখতে চাইতো না, দেখতে পারতো না কখনো। যেটা সত্যিকারের নিঃসঙ্গতা—তার সত্তার সেই অলক্ষ্য অন্ধকার স্রোত, তাকে সে ভয় করতো। তাকে চাপা দিয়ে রাখতে চাইতো সব সময়। তার দিনের জীবন—তার বন্ধুরা, তার হাসি আর গল্প—সব মিলে রচনা করেছে একটা আড়াল। তার সেই নিজেকে রেখেছে লুকিয়ে। অন্য আড়াল এই আর্ট, যা তাকে জড়িয়ে ধরেছে, যা তাকে ঢেকে রেখেছে, যা তাকে প্রায় দেবতার মত অনধিগম্য করে' তুলেছে। সে

ছিলো সুখী, নিজের সেই দূরত্বে, তপস্বীর মত নির্লিপ্ততায়। জীবনের এ-ই তো শেষ সীমা, সে তখন ভেবেছিলো।

এমনি করে' সে কাটিয়ে এসেছে অনেক, অনেকদিন। কখনো সে নিজেকে একা হ'তে দেয়নি। যখন সে একা, তখন সে লিখছে কি পড়ছে। এত ক্লান্ত হ'য়ে শুতে গেছে যে চোখ বোজবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। যদি কখনো ঘুম আসতে দেরি হয়েছে, উঠে আলো জ্বেলে শুয়ে-শুয়ে বই পড়েছে—যতক্ষণ ঘুমের ভারে বই খসে' না-পড়েছে হাত থেকে। তার বিভীষিকাকে সে সরিয়ে রেখেছে দু'হাতে ঠেলে ; নিজেকে কখনো একা থাকতে দেয়নি।

প্রথম যৌবনেই একটা জিনিস সে উপলব্ধি করেছিলো। তা এই যে আমাদের এই মানুষের জগতেই পরিবর্তন আর বিক্ষোভ আর অশান্তি : আর্ট চিরন্তন। মানুষের জগতেই দূরে চলে' যাওয়া আর কাছে আসা, ভালোবাসা আর ভুলে' যাওয়া ; কিন্তু আফ্রোদিতের দীর্ঘ, কালো চুল চিরকাল সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ের মত জড়িয়ে থাকবে ; চিরকাল ঝল্‌মল্‌ করবে হেলেনের বক্ষ গ্রীষ্ম-নিবিড় বনে পাকা আপেলের মত। আর সে তার অন্তরের চোখ ফেরালো আর্টের দিকে : আর সেই দীপ্তিতে পৃথিবী যেন মুছে গেলো। আমার জীবন হোক্‌ আর্টের মধ্যে ; মনে-মনে সে বললে। এ-জীবন মায়া—এ-কথা বলবার নতুন একটা ধরণ মাত্র।

যা-ই হোক্‌, সুখ সে পেয়েছিলো। বন্ধু : বই : মাঝে-মাঝে নিজেই একটু লেখা। সে একটা কাগজও বার করেছিলো। কাগজ বেশিদিন চলেনি, কিন্তু যে-ক'দিন ছিলো তাকে রেখেছিলো ভরে'।

সেই সময়ে, ঘুম-ভাঙা চোখে সকালবেলাকার আবছায়া আকাশের দিকে তাকিয়ে সে ভাবলে, সেই সময়েই আমি সব চেয়ে সুখী ছিলুম ; সে-সুখ আমি আর জানবো না।

কিন্তু সুখ অনেক রকমের আছে ; সুখের অনেক স্তর আছে। আমি কি সেই তখনকার সুখ নিয়ে এখন তৃপ্ত হ'তে পারবো? সে ভেবে দেখলে, আর সে অবাক হ'য়ে গেলো আবিষ্কার করে' যে সেই সুখ এখন আর সে চায় না। তাকে সে ছাড়িয়ে এসেছে, তাকে সে ফেলে এসেছে অনেক দূরে। কী চায় সে এখন?

আশ্চর্য, মানুষ কী-রকম বদলায়। পদে-পদে আমরা মোহ রচনা করি, আর মনে-মনে বলি, এটাই শেষ, এটাই চরম। কিন্তু একদিন কিছু হয়-তো ঘটে, কি ঘটেও না, আর সে-মোহ ভেঙে যায়, জীবন খোঁজে নতুন দিগন্ত। তখন দেখতে পাই, এতদিন যেটা ছিলো সেটা কুঁড়ি মাত্র ; তাকে ভেঙে দিয়ে, তা থেকে ফেটে বেরিয়ে আসছে এইবার সত্যিকারের ফুল। এমনি, চিরকাল। আবার গড়ে' ওঠে নতুন মোহ ; আবার তা ভেঙে যায় ; জীবন চিরকাল নিজেকে ছাড়িয়ে যায়। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত কিছুই শেষ নয়, কিছুই চরম নয়। কেবল পল্লবের পর পল্লবে ফুটে ওঠা : নিজেকে ঝরিয়ে দেয়া, আবার নতুন হ'য়ে ওঠা। জীবনে সুখ কি দুঃখ, ব্যর্থতা কি সাফল্য বলে কিছু নেই : কেবল আছে এই স্রোত। এই স্রোত, যা কোনোখানেই থামবে না, যা মিশে যাবে এক মৃত্যুর মহাসমুদ্রে।

কিন্তু হয়-তো জীবনে সার্থকতা আছে। এই স্রোত—তা তো চাকাব মত ঘুরে-ঘুরে মরে না ; একবার যেখানে ছিলো, সেখানে তো আর ফিরে আসে না। তা বয়ে' চলে, তা এগিয়ে চলে। হয়-তো তা আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—কোনো সার্থকতায়, পরিপূর্ণতায়। বার-বার এই ভেঙে পড়া, আর সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে বার-বার নতুন হ'য়ে ওঠার ভিতর দিয়ে হয়-তো আমরা পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠছি। জীবন তো গ্রামোফোনের রেকর্ড নয় যে বার-বার নিজের পুনরাবৃত্তি করবে। জীবনে দু'বার কখনো এক সুর বাজে না। যে-অভিজ্ঞতা দু'বছর আগে আমার এসেছিলো, তা আজ যদি আবার আসে, তা মোটেও এক জিনিস হবে না। কেননা আমি তো আর সে-আমি নেই।

হয়-তো, শেষ পর্যন্ত, নিঃসঙ্গতাতেই মানুষের চরম পূর্ণতা। হয়-তো—কিন্তু তা এত কঠিন, তাতে এত কষ্ট। এত শক্তি সে-জন্য প্রয়োজন যে মানুষের কাছ থেকে তা আশা করা অন্যায়। কেবল ঈশ্বর একা, আর-কেউ নয়, কেবল ঈশ্বর একা হ'তে পারেন। আমরা যখন বলি, একা থাকতে চাই, তার মানে, মানুষের সঙ্গে মেলামেশার যথেষ্ট হয়েছে এখন।

কেননা কোনো মানুষই নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ নয়। কেন আমরা মানুষের সঙ্গ খুঁজি? কেন আমরা বই পড়ি? শুধু কি সময় কাটাবার জন্য, হালকা একটু আমোদের জন্য? যদি তার মূলে আমাদের অন্তরের কোনো গভীর প্রেরণা না-থাকতো, তাহ'লে মানুষ হ'তো শুকনো কতগুলো হাড় ; আর বই যে-কাগজে ছাপা হয় হ'তো তারই মত শুকনো। কিন্তু মানুষ জীবন্ত ; আর বইও জীবন্ত—যেহেতু জীবন্ত মানুষের তা সৃষ্টি। যখন একটা বই পড়ি, শুধু কি কতগুলো কথার কুচকাওয়াজ চোখের উপর দিয়ে ভেসে যায়? না, তা প্রাণের তীব্র একটা স্রোত : আমাতে যা সঞ্চারিত হচ্ছে, আমাকে যা ভরে' তুলছে।

আর মানুষ—তার কাছ থেকে আমরা কী চাই? সে সুন্দর হবে, সে ভালো হবে, সে বুদ্ধিমান হবে; ভালো করে' সে কথা বলবে, যেখানে হাসবার হাসতে ভুলবে না। কিন্তু শুধু এই? তা-ই যদি হ'তো, তাহ'লে শেখানো-পড়ানো, মাজা-ঘষা পুতুল নিয়েও তো কাজ চলতে পারতো। সব চেয়ে বড় যার প্রয়োজন, যা না-হ'লে অন্য-কিছুরই কোনো মানে হয় না, তা এই যে তার মধ্যে থাকবে প্রাণের উষ্ণতা, আগুনের শিখার মত উষ্ণ , আগুনের শিখার মত জ্বলবে তার প্রাণ। সে যখন ঘরে এসে ঢুকবে, নিয়ে আসবে একটা উষ্ণ অনুভূতি ; যদি তার হাতের উপর হাত রাখি, চামড়ার নিচে তার রক্তের উষ্ণ স্পন্দন যেন অনুভব করতে পারি।

এমনি করে'ই আমাদের পূর্ণতা আমরা খুঁজি। আর মানুষকে যখন পেয়েছি, আজকের মত বই পড়া যখন শেষ হয়েছে, তখন স্তব্ধতা, তখন শান্তি, তখন নির্জনতা। তখন—তার আগে নয়। তখনই ভালো লাগে চুপ করে' বসে' থাকতে, আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ করে' থাকতে ; তখনই ছড়িয়ে যাই মেঘে আর পাতায় আর তারায় ; তখনই হারিয়ে যাই বিশ্বের নিঃসীম অন্ধকারে। বড় মধুর, সেই নিঃসঙ্গতা। মনে হয়, এর আগে যা কিছু হয়েছে, যা-কিছু পেয়েছি সব যেন সার্থক হ'য়ে উঠলো এর স্পর্শে।

কিন্তু আগে কিছু পাওয়া চাই : এ যেন আসে সবার শেষে, দিনের শেষে, আমাদের জীবনের রাত্রি-মুহূর্তে।

কেননা অনেক আমাদের প্রয়োজন ; অনেকগুলো সুর নিয়ে আমাদের এই জীবন। কোনো-একটা যদি বাদ পড়ে' যায়, তাহ'লে নিজেকে খণ্ডিত, বিভক্ত, অঙ্গহীন মনে হয়।

কিন্তু নিঃসঙ্গতা যদি হয় অভাব—তা থেকে আমাদের রক্ষা করো, দেবতা। নিঃসঙ্গতা যদি হয় অসম্পূর্ণতা, আত্ম-খণ্ডন, অঙ্গহীনতা—তার ভয়ঙ্কর নিষ্পেষণে যদি আমাদের হৃৎপিণ্ড হাঁপাতে থাকে, যদি আমরা মরে' যাই! পৃথিবীতে তার মত আর-কিছু নয়—এই সীমাহীন শূন্যতার চেতনা : তা আমাদের মুচড়িয়ে ভেঙে ফেলে, ছিঁড়ে ফেলে টুকরো-টুকরো করে' ; সেই তীব্র বিষের ধারে আমাদের মাংসের দেয়াল ক্ষয়ে' যায়। তখন কোথায় আমি যেতে পারি? কী আমি করতে পারি? এই যাকে 'আমি' বলছি, তার কতটুকু আর বাকি আছে!

অভাব! জ্বলন্ত, জীবন্ত কোনো অভাব—এক মুহূর্ত যাকে ভুলে থাকা যায় না। আর তা-ই নিয়ে বেঁচে থাকা!

সেই নিঃসঙ্গতাই কি আজ আমাকে ঘিরছে মৃত্যুর কালো জলের মত, আয়নার দিকে তাকিয়ে সে ভাবলে।

আজকাল বেশিরভাগ সময় তাকে একা থাকতে হয়। বন্ধুরা পৃথিবীর প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে টাকা শিকার করে' বেড়াচ্ছে। তাদের সঙ্গে মাঝে-মাঝে যখন দেখা হয়, তাদের চোখ উজ্জ্বলতরো, তারা কথা বলে দ্রুততরো ; তাদের সমস্ত শরীরের ভঙ্গিতে শিকারীর সতর্ক সচেতনতা। এ-খেলায় উত্তেজনা প্রচুর, সন্দেহ নেই। আজকের দিনে জঙ্গলে বুনো জানোয়ার শিকারের চাইতে এই সহরে টাকা শিকারে অনেক বেশি স্নায়বিক শক্তি, অনেক বেশি ধৈর্য্য, আর ধূর্ততা নিশ্চয়ই অনেক বেশি দরকার। যাদের নিয়ে সে জীবন আরম্ভ করেছিলো, যাদের উপর সে নির্ভর করেছিলো, যাদের মুখ থেকে সে কখনো তার উৎসুক চোখ ফেরায়নি, তারা আস্তে-আস্তে দূরে সরে' যাচ্ছে। যাবেই। সে কী করে' বাধা দেবে, ভাগ্যকে বেঁধে রাখবে কেমন করে'? জীবনই তো এই।

যাকে ভালোবাসি সে কেন দূরে চলে' যায়, চিরকাল মানুষের এই কান্না। ঘটনা তাকে ঠেলে নিয়ে

যায় দূরে, মৃত্যু তাকে কেড়ে নিয়ে যায়। কিন্তু, অত বেশি কষ্টের যদিও নয়, তবু এক হিসেবে সব চেয়ে ভয়াবহ, সব চেয়ে নিষ্ঠুর এই অলক্ষিত, মন্থর বিচ্ছেদ ; যখন কাছাকাছি থেকেও দিনের পর দিন আমরা পরস্পরের দূরে সরতে থাকি ; যে-সংযোজনা আমাদের মধ্যে ছিলো তা নষ্ট হ'য়ে যায়, যে-উদ্দীপনা আমাদের মধ্যে জ্বলেছিলো তা নিবে যায়।

অনেকদিন থেকেই সে তা বুঝতে পারছিলো, যদিও নিজের কাছে সে তা স্বীকার করবে না। একটা অভাব মাথা খুঁড়ে মরছিলো তার মধ্যে। কিন্তু তাকে ভাষা দিতে তার ভয়।

কিন্তু আজ আর তাকে ঠেলে রাখা গেলো না, বসন্তের এই সকালবেলায়। তা উথলে উঠলো উত্তপ্ত, দুঃসহ স্রোতে তার বুকের ভিতর থেকে। একটা কষ্ট, প্রায় শারীরিক কষ্টের মত। টন্‌টন্ করছে তার হৃৎপিণ্ড, যেন তা এখনই ফেটে যাবে।

চায়ের সঙ্গে সে খবরের কাগজ খুললো, কিন্তু একটা লাইন সে পেলো না পড়বার মত। ছবির পাতার দিকে একটুখানি তাকিয়ে থেকে সে সেটা ফেলে দিলে ছুঁড়ে। চিঠি এলো ; চিঠিগুলো একবার হাতে তুলে দেখে সে আবার রেখে দিলে, একটাও খুললে না।

এখন এই তো সমস্ত দিন পড়ে' আছে তার সামনে। এ নিয়ে কী করা যায়?

সে উঠে দাঁড়ালো। তার বুকের উপর সমস্ত সময়ের যেন ভার। সে ভাবলে একটা বই পড়ে, কি কিছু লেখে, কিন্তু দুটো কাজই অসম্ভব মনে হ'লো। যদি সে একটা বই খোলে তাহ'লে তার ভিতর থেকে এই যন্ত্রণাই লাফিয়ে উঠবে সাপের মত। আর, কী সে এখন লিখতে পারে, তাকে ঘিরে এই শূন্যতা, মৃত্যুর এই কালো জল?

আব সে বুঝতে পারলে যে আর্টের উপর বড় বেশি আস্থা সে রেখেছিলো। আর্ট থেকে অনেক শান্তি পাওয়া যায়, অনেক শক্তি , কিন্তু জীবনের কোনো দুঃসহ ভীষণ রূপ যখন ভেঙে পড়ে বুকের উপর, তখন যাকে সে দুর্গ বলে' জেনেছে তা ছিঁড়ে উড়ে যায় প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে তাঁবুর মত। আর একেই সে আশ্রয় করেছিলো, সে বেঁচেছিলো এরই মধ্যে। জীবনকে মুখোমুখি দেখতে সে চায়নি ; তার চোখ ছিলো আর্টের উপর। আজ জীবন নিচ্ছে তার প্রতিশোধ। সে যেন উপড়ে পড়ছে, মূলসুদ্ধ। যেখানে চিরন্তনতা, যেখানে অখণ্ড শান্তি, যেখানে অনির্বচনীয় সম্পূর্ণতা—সেই সমস্ত আজ ছোট ছেলেব হাতের এলোমেলো আঁকিবুকির মত অর্থহীন। বড় ভয়ঙ্কর—জীবন যখন বুকের উপর ভেঙে পড়ে, উত্তপ্ত, অনবগুণ্ঠিত, স্পন্দমান জীবন। কী ব্যথা! আমাদের সমস্ত সাহস আর সমস্ত শক্তি একত্র কবে'ও তাকে সহ্য করা যায় না। জীবন যখন বুকের উপর তার দুরন্ত, উন্মত্ত ঝাপটা মারে, তখন রক্ত ঝরবেই, রক্ত ঝরবেই হৃৎপিণ্ড দিয়ে—আমাদের একমাত্র প্রার্থনা এই হ'তে পারে একেবারে যেন মরে' না যাই।

তাই, এই বাঁচাই বোধ হয় আমাদের সব চেয়ে বড় সাধনা : জীবনকে সহ্য করা, জীবনকে পরিপূর্ণ করে' তোলা। আর তারপর আর্ট।

এই সহজ কথাটা বুঝতে এত সময় নিলে, সে ভাবলে।

কিন্তু যদি কোনো উপায় থাকতো, কোনো মুক্তি' কোনো নেশা, হৃদয়কে যা দিয়ে অসাড় কবে' ফেলা যায় ; যাতে ঘুমিয়ে পড়া যায়—দীর্ঘ, নীবন্ধ্র ঘুম। এ কী ভয়ানক যে ব্যথা থেকে কোনো মুক্তি নেই, জীবনে ব্যথা থেকে কোনো মুক্তি নেই।

বাড়ি থেকে একটু বেরোলেও হয়, সে ভাবলে। কাছেই আছে বন্ধুর বাড়ি, হয়-তো আরো দু'একজন সেখানে আসবে। কী উৎসুকতা, মানুষের কণ্ঠস্বর শোনবার জন্য কী উৎসুকতা। কথা, কথা, কথা . মর্ফিয়া। টন্‌টন্ করে' যেখানটা ছিঁড়ে পড়ছে, তখনকার মত একটু অবশ করে বটে। আর তবু, সমস্ত কথার আড়ালে, সমস্ত কথা ছাড়িয়ে বুকের মধ্যে যা শিরশির. শিরশির করছে সব সময়, তাকে কী করে' চাপা দেবো?

তবু—তবু তাকে যেতেই হবে মানুষের খোঁজে ; যে-সব কথা কোনোরকমেই তার জীবনের অংশ নয়, তা-ই শুনতে, আর বলতে। যা-ই হোক, এই শূন্যতার চেয়ে সেটা ভালো। এ আর আমি সইতে পারছিনে, এই শূন্যতা।

বাক্স থেকে জামা খুলে সে পরতে গেলো। আর দেখলো, একটা বোতাম নেই জামায়। হাতের কাছে একটা সেফ্‌টিপিন নেই। বাধা পেয়ে সে থমকে গেলো : আর রাগের একটা সূক্ষ্ম স্রোতে তার শরীরের শিরা জ্বলতে লাগলো।

আর হঠাৎ, হঠাৎ, অত্যন্ত সহজে, অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে সে ঠিক করে' ফেললে সে বিয়ে করবে।

হয়-তো তাতে তার এই নিঃসঙ্গতা ভেঙে যাবে, বুকের উপর থেকে সরে' যাবে সময়ের ভার। আনন্দের উন্মত্ততা তাতে থাকবে না হয়-তো ; থাকবে শান্তি। আর এখন তা-ই তো সে চায় : শান্তি। এ-রকম ভেঙে-চুরে যাওয়ার আর কত? আর-একজনেব সঙ্গে যদি মিলতে পারি, আর-একজনের স্রোত যদি আমার স্রোতে এসে মেশে, তাহ'লে কি জানবো না সেই প্রচণ্ড, অখণ্ড শান্তি ; সেই স্তব্ধতা বাতাসে যার বিদ্যুৎ? বেশি কথা থাকবে না—কথার কী দরকাব? নীরব, উষ্ণ একটা আশ্বাস—তা ছাড়া আর কী চাই? একটা আশ্বাস : ভয় নেই, ভয় নেই। জীবনকে ভয় কোরো না। হৃদয়ে উষ্ণতার স্পর্শ, রক্তে উষ্ণ অনুভূতি, নিবিড়, নীরব রক্ত-সংস্পর্শ। আর কী চাইতে পাবে মানুষ? তখন আমি আর জীবনকে ভয় করবো না, তখন আমি জীবনের চোখের দিকে তাকাবো, জীবনকে নেবো দু'হাত ভরে', নেবো বুকের মধ্যে, আমার রক্তের স্রোতে। পাথর ভেঙে ফেলো : আমার এই পাথরের হৃদয় সরিয়ে দাও ; আমাকে দাও জীবন্ত মাংসের হৃৎপিণ্ড যা গাঢ়, উত্তপ্ত, স্পন্দমান রক্ত সমস্ত শরীরে দেবে, সমস্ত সত্তায়।

জামাটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিলে হাত থেকে : তারপর বসে'-বসে' ভাবতে লাগলো কাকে বিয়ে কবা যায়। অনেক মেয়েকে সে চেনে। তারা সবাই সহরের ; তাদের মধ্যে সহরেপনা রক্তহীনতা কোনো-না-কোনো ভাবে যেন আছেই। তারা এত চমৎকার—এত ভালো করে' তারা কথা বলতে পারে, হাসতে পারে এমন মানানসই করে' : তবু ভিতরে ভিতরে তারা যেন শুকনো, তাদেব বক্ত যেন পাৎলা ; কোথায় তাদের বিবর্ণতা, কোন্ গোপন অদৃশ্য উৎসে তারা শুকিয়ে যাচ্ছে। এক-এক করে' সকলের কথা সে ভাবলে। তাদের অনেককেই তার ভালো লাগে। কোনো-কোনো মেয়ের প্রতি তাব শ্রদ্ধা আছে মনে-মনে। দু'একজন আছে, যাদের বুদ্ধিতে, মনের দীপ্তিতে মুগ্ধ না-হ'য়ে সে পারে না। কিন্তু সে কি তা-ই চায়—বুদ্ধি? মনের দীপ্তি?

একজনের কথা তার মনে পড়লো। ক্ষীণ তার শরীর। বেশি কথা সে বলে না। বড় আর কালো তার চোখ। আর সেই চোখ তুলে কেমন করে' সে তাকায়! বার-বার তা মনে পড়ে।

তাই সে বাক্স থেকে আর-একটা জামা বার করে' পরলে, একবার তাকালে নিজের দিকে আয়নায়, তারপর বেরুলো রাস্তায়। কী বোকা আমি, যেতে-যেতে সে ভাবলে, এতদিন আমি জানিনি কোথায় রয়েছে আমার পূর্ণতা।

মিনু বসে' ছিলো সেলাই হাতে নিয়ে ; সে কাছে যেতে চোখ তুলে একবার তাকালো। কিছু বললে না।

'তোমার পাশে একটু বসতে পারি?' সে বললে।

মিনু একটু সরে' জায়গা করে' দিলে তার জন্য।

'রাখো তোমার সেলাই। কথা আছে।'

সেলাইয়ের উপর আরো একটু ঝুঁকে পড়ে' মিনু বললে, 'বলো না।'

একটু চুপ করে' থেকে সে বললে, 'তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?'

মিনুর সক্রিয় আঙুলগুলো স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। তার কালো চোখের দৃষ্টি লুটিয়ে পড়লো তার মুখের উপর। দাঁত দিয়ে সেলাইয়ের বাড়তি সুতোটা কেটে ফেলে' সে বললে, 'আমি কেন তোমাকে বিয়ে করবো?'

'কেনই বা করবে না?'

মিনু মাথা নিচু করলো ; তার ক্ষীণ আঙুলগুলো আবার চঞ্চল হ'যে উঠলো সেলাই নিয়ে। আস্তে-আস্তে সে বললে, 'এখনো—এখনো নয়।'

'কখনো, তাহ'লে?'

'কে জানে!'

কিন্তু তবু সে বসে' রইলো ; এই উত্তর নিয়েই সে চলে' যেতে পারে না। রুমাল বার করে' সে ঘাড় মুছলো একবার। তারপর বললে, 'আমি কি ভুল করেছি?'

মিনুর মাথা আনত ; আর তার কালো চুলের মাঝখানে দীর্ঘ ভাগ-রেখা তার চোখের সামনে আশার উজ্জ্বল রাস্তার মত জ্বলে' উঠলো।—'না, ভুল করোনি', মিনু বললে।

'তবে?'

নরম, ক্ষীণস্বরে মিনু বললে, 'ঈশ্বরের মনে যা আছে, তা-ই হবে।'

'আর তোমার মনে কী আছে জানতে পারিনে?'

মিনু রেখে দিলে সেলাই।—'কেন জানতে চাও?' তার স্তব্ধ, কালো চোখ তুলে সে বললে, 'তোমার ইচ্ছা দিয়ে তুমি কী ঘটাতে পারো?'

কপিল—নাম তার কপিল—বুঝতে পারলে। উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে, 'একদিন হয়-তো সময় আসবে।' বলে' চলে' গেলো।

দুই

বাড়ি ফিরে এসে তার মনে পড়লো আর-একজনের কথা। যাকে, কোনো-এক সময়ে, সে ভালোবেসেছিলো। একমাত্র ভালোবাসার 'ব্যাপার', তার জীবনে।

বয়েস তখন অল্প ছিলো। জীবনে ছিলো সুখ ; নতুন যৌবনের উদ্দীপনা। বসন্তের গাছে যেমন নতুন, সবুজ পাতার রাশি, তেমনি তার জীবনে তখন আশা আর স্বপ্ন আর সঙ্কল্প আর নতুন অনুভূতির ভিড়। আর সেই উন্মীলনের একটা মঞ্জরী, সেই মেয়ে, বাণী। একটি মেয়েকে না-হ'লে সে-সময়কার ছবি অবিশ্যি সম্পূর্ণ হয় না।

গ্যয়টে ছিলেন একজন মানুষ যিনি সমস্ত জীবন ভরে' প্রেম করে' গেলেন—আত্মার সমৃদ্ধির জন্য। যেমন আমরা ব্যাঙ্কে টাকা জমাই, আর বড়লোক হ'য়ে উঠি ; তেমনি আমরা আত্মায় প্রেম জমাই, আর বড় হয়ে উঠি! নিখুঁত হিসেব! চোখ খুলে রাখো, কোনো সুযোগ হারিয়ো না : কোন্ অভিজ্ঞতা তোমার আত্মায় সোনার টুকরো হ'য়ে উঠতে পারে, কিছুই বলা যায় না।

এম্নি, বিরাট মনের বিরাট আত্ম-প্রেম। আর তারা একদল আছে যাদের জীবনের মূল কথা হচ্ছে 'অভিজ্ঞতা'। অভিজ্ঞতা : কিনা, যে-সব স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে তুমি এসেছো তাদের সংখ্যার আধিক্য। সংখ্যাটা যত বড়, তত বেশি তারা 'পেলো'। বছরের পর বছর তারা খাঁজ কেটে-কেটে যায়, আর মোট অঙ্কটার স্ফীতিতে গর্বে আর সুখে বুক তাদের ভরে' ওঠে। ওঃ, কখনো কোনো সময় নষ্ট হয়নি, এ-কথা মনে করবার তৃপ্তি!

কিন্তু সে ছেলে ছিলো লাজুকগোছের—মেয়েদের সঙ্গে বিশেষ করে' লাজুক। কখনো সে এগিয়ে যাবে না। সব সময় সে সরে' দাঁড়াবে, ছেড়ে দেবে। আর হয়-তো, শেষ পর্যন্ত, সেটাই ঠিক—কেননা জীবনেই আছে অপব্যয়, যন্ত্রে নেই। যন্ত্র মিনিট ধরে' নির্দিষ্ট একটা বস্তুর পরিমাণ উৎপাদন করতে পারে: লক্ষ বীজের অপব্যয়ে একটা ফুলের সৃষ্টি। আর সে চেয়েছিলো সৃষ্টি করতে।

আর তাকে সৃষ্টি সে করেছিলো, সেই মেয়েকে। একদিন সে তাকে দেখলে, আয়নার সামনে বসে' খোঁপা বাঁধছে বিকেলের আলোয় ; অসমাপ্ত প্রসাধনের সৌরভ তার গায়ে। চমকে উঠলো তার মন। এ কী! রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে অবাক হ'য়ে ভাবলে, এ কী! আমি কি প্রেমে পড়ছি?

মন ঠিক করতে অনেক সময় সে নিয়েছিলো—কি নিতো, যদি না বাণী নিজেই আসতো এগিয়ে। আর তারপর, যত কবিতা সে পড়েছিলো, যত কল্পনা তার মনকে কোনো-না-কোনো সময়ে হানা

দিয়েছে, সে-সমস্তর সঙ্গে বাণী জড়িয়ে গেলো, মিশে গেলো ; উঠে এলো সেই তরুণ কবি-মনের স্বপ্ন-সমুদ্র থেকে, একদিন আফ্রোদিতে যেমন উঠে এসেছিলো ঢেউয়ের সমুদ্র থেকে। কিন্তু আফ্রোদিতে সে নয়, প্রেমের জননী সে নয় ; তার মধ্যে ছিলো না সেই অপরিসীম, অনির্বচনীয় কোমলতা। তা তো তারই কোমলতা, তারই স্নেহ, যে-সমুদ্র থেকে আফ্রোদিতে উঠে এসেছিলো : যে-স্নেহে বুক ভরে' যায়, যে-বিশাল স্নেহ সীমাহীন, সময়হীন শূন্যতার মধ্যে একদিন প্রাণকে এনেছিলো, তা না-হ'লে প্রেমের দেবতার কি সৃষ্টি হ'তে পারে?

না, যদি কোনো দেবীর সঙ্গে তাকে তুলনা করতেই হয় সে আর্টেমিস, বনের ছায়ায় এইমাত্র মিলিয়ে গেলো যার উজ্জ্বল, উন্মুক্ত চুল ; যে হানা দেয়, স্বপ্নকে যে হানা দেয়, ঘুমের নির্জনতা যে ভরে' রাখে। রাত্রি যার, আর রাত্রির অরণ্য, আর চাঁদের অপরূপ কান্তি, চাঁদের ঐশ্বর্য্য। তাকে ঘিরে ছায়া, তাকে ঘিরে রহস্য। সে নয় নগ্ন আর নিঃসঙ্গ আর বিশুদ্ধ আফ্রোদিতের মত!

কপিল তাকে সৃষ্টি করেছিলো কবিতার ইন্দ্রজাল থেকে, আর সে অবিশ্রান্ত স্ফীত করে' তুলেছিলো কপিলের অন্তরের কবিতাব স্রোত। এমন পরিপূর্ণ দেয়া-নেয়া আর হয় না। যা থেকে তার উদ্ভব, বাণী তাকেই আবার নতুন করে' তুললো। কপিলকে সে-ই তো হাতে ধরে' নিয়ে গেলো আর্টের বহস্য-মর্মে। এতদিন সে যেন বাইবে অপেক্ষা করেছিলো, সেই বিশাল প্রাসাদের বাইরের কারুকার্য শুধু দেখছিলো মুগ্ধ হ'য়ে। আজ সে খুঁজে পেলো ভিতরে যাবার রাস্তা। সেখানে বাণী মশালের মত জ্বলছে তার সামনে। যা-কিছু সে পড়েছিলো, সব আবার পড়তে হ'লো নতুন করে'। স্তব্ধ হ'য়ে গেলো সে বিস্ময়ে, সম্ভ্রমে, ভয়ে। কয়েকটা কথার মধ্যে এত থাকতে পারে, কে জানতো।

আমি যদি এত বেশি কবিতা না-পড়তুম, মনে-মনে সে বললে, তাহ'লে হয়-তো তাকে ভালোবাসতুম না। যদি তাকে ভালো না-বাসতুম, তাহ'লে হয-তো কবিতাকে জীবনে এমন করে' পেতুম না। সত্যি, কাকে আমি ভালোবেসেছিলুম—কবিতাকে, না সেই মেয়েকে?

যা-ই হোক, তাতে মধুরতা ছিলো, তাদের সেই ভালোবাসায়। তাতে মধুরতা ছিলো, আনন্দ ছিলো, কান্না ছিলো। ছিলো না স্নেহ, সত্যিকারের স্নেহ। বোধ হয় অল্প বয়েসে সেটা আসে না। বোধ হয় স্নেহ জীবনের দুরূহতম সিদ্ধি। অনেক বছরের, অনেক দুঃখের, অনেক বিপ্লবের, অনেক মৃত্যুর ও নবজন্মেব পবে তবে তা পাওয়া যায়।

কাঁচা বয়েস ভালোবাসতে পারে না, তা বড় বেশি আচ্ছন্ন থাকে নিজের মধ্যে। তখন থাকে নতুন আত্ম-সচেতনতার গর্ব। তখন থাকে স্পর্ধার অজ্ঞান নিষ্ঠুরতা। নিজের একটু লাগবে সেই ভয়ে অন্যকে দ্বিগুণ মারতে তখন আমরা কুণ্ঠা করিনে। যতদিন নিজে ব্যথা না-পেয়েছি, অন্যকে ব্যথা দিতে আমরা ভাবিনে : ততদিন স্নেহ আসে না।

ভালোবাসা, কপিল ভাবতে লাগলো, তা ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত। তার কাছে আমরা আনত হ'বো—গর্বহীন, লজ্জাহীন, ভয়হীন—নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করবো তার কাছে। ফেলে আসবো আমাদের সব পরিচয়, সব অভিজ্ঞান—বাইরে থেকে যত জিনিসে আমরা জড়ানো—কেবল নিজেকে নিয়ে যাবো, নিরাভরণ, নিরাবরণ নিজেকে—তবে যদি পাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ। আমাদেরও হ'তে হবে আফ্রোদিতের মত নগ্ন, শুভ্র, বিশুদ্ধ : তবে যদি প্রেমেব জন্ম দিতে পারি।

কিন্তু সে-সময়ে, কপিল ভেবে দেখলে, সে-সময়ে আমি ছিলুম আর্টে আচ্ছন্ন হ'য়ে, আমার মুখ ছিলো ঢাকা। আর তাকেও আমি দেখেছিলুম আর্টের জ্যোতির্মন্ডলের মাঝখানে : তাকে দেখতেই পাইনি, সত্যি বলতে। সত্যি বলতে, পরস্পরকে আমরা কখনো দেখিনি। আমরা শুধু একে অন্যের মধ্যে নিজেদের পোষা স্বপ্নকে দেখেছিলুম!

আর তাই, তাদের সেই ভালোবাসা ঠিক ফুলের মত হ'য়ে উঠতে পারেনি। ঠিক ফুটে উঠতে পারেনি, ফুল যেমন করে' ফোটে। কোথায় যেন একটু জোর ছিলো। একটু চেষ্টা। হৃদয়াবেগ নিয়ে টানা-হেঁচড়া। কখনো হয়-তো নিজেদের ফেনিয়ে তুলতে হ'তো, তারা তা বুঝতে পারতো না। আমি, আমি! এই 'আমি'র বেড়াজাল থেকে তারা সত্যি-সত্যি বেরিয়ে আসতে পারতো না কখনো। আমি

ভালোবাসছি, আমি পাচ্ছি ভালোবাসা। তারা তা ভুলতে পারতো না, পরস্পরকে ভুলতে পারতো না। ভুলতে দিতো না, এমন কি। বসে'-বসে' ভাবতো, দেখতো তাদের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের প্রতি অদ্ভুত নিষ্ঠা তাদের : তা থেকে তারা ভ্রষ্ট হ'তে পারে না মুহূর্তের জন্য।

তার তবু, তাতে মধুরতা ছিলো। বাণী ছিলো তার মনের মত মেয়ে। সে হাসতে পারতো। সে খুসি হ'তে পারতো। তার ভালো লাগতো তার কাছে থাকতে, তাকে দেখতে, তার কণ্ঠস্বর শুনতে। আর তাদের সেই সমস্ত দীর্ঘ, দীর্ঘ আলাপ—দীর্ঘ দুপুর ভরে', দীর্ঘ সন্ধ্যা ভরে' অবিশ্রান্ত তাদের কথা বলা! বোধ হয় সেই কথাতেই তাদের চরম সংস্পর্শ, তাদের সব চেয়ে বড় সুখ। বোধ হয় চুপ করে' থাকতে তারা একটু ভয় করতো মনে-মনে ; ভয় করতো অন্য রকমের সংস্পর্শ।

যদিও সেটাও ছিলো। থাকতেই হবে। একটা অনিবার্য অংশ, তাকে বাদ দেয়া যায় না। কিন্তু বাদ দিতে পারলেই যেন ভালো হ'তো। অনিবার্য : কিন্তু যতখানি প্রাধান্য তাকে দেয়া হয়েছে, ঠিক তার যোগ্য কি? অবিশ্যি মূলে সেটা আছেই। গভীর, গভীর মূলে। ওকে যে-রকম ভালোবাসি, ও-রকম করে' কোনো পুরুষকে ভালোবাসা যায় না। ও মেয়ে বলে'ই ওকে এই বিশেষ ধরণে ভালোবাসছি। কিন্তু এই পর্যন্ত। আর তারপর? আমাদের শরীর সম্পূর্ণরূপে আমাদের মনের দাস—সে-ই তো সভ্যতা। আমরা বাঁচি তো মন দিয়েই, শরীর তার কতগুলো প্রতীক রচনা করে মাত্র। কে বলবে এই কথা বলার আনন্দই সব চেয়ে বড় নয়, সব চেয়ে ভালো নয় দূরে গিয়ে মনে-মনে ভাবা?

এমনি সে ভেবেছিলো, সেই সময়ে। তখনও সে জানেনি কথা বলার অপরিসীম ক্লান্তি, ভাবনার অবরুদ্ধ অন্ধকার। আমরা যা চাই, তা মুক্তি। নিজের মধ্যে বন্দী হ'য়ে আছি, তা থেকে মুক্তি চাই। যেখানে আমি ছাড়া কিছু নেই, সেই ধূসর নিঃসঙ্গতা থেকে যেতে চাই আরক্ত, উত্তপ্ত সংস্পর্শের পূর্ণতায়।

আর বাণীকে যখন তার ছাড়তে হ'লো, বড় লেগেছিলো তার ; কিন্তু তার চেয়েও বেশি তার রাগ হয়েছিলো—বাণীর উপর, তার নিজের উপর, সমস্ত পৃথিবীর উপর রাগ। তখন পর্যন্ত দুঃখে অনভ্যস্ত, তাকে যে এই কষ্ট পেতে হবে, এটা তার কাছে প্রকৃতির একটা নির্লজ্জ ব্যভিচারের মত লেগেছিলো। বিদ্রোহে জ্বলে' উঠেছিলো তার নবযৌবনের অভিমান। দুঃখকে গ্রহণ করবার নম্রতা আর সাহস তার ছিলো না : সে তাকে লড়বেই, তাকে মাড়িয়ে যাবেই পায়ের তলায়—যদি সেই সঙ্গে নিজের হৃৎপিণ্ডও মাড়িয়ে যেতে হয়, তা-ই হোক্।

আর খানিকটা সময় সে ছিলো তিক্ত আর কঠিন আর নিষ্ঠুর। সে মরে' ছিলো।

সে মরে' ছিলো, সে বেঁচে উঠেছিলো। বেঁচে উঠেছিলো নতুন হ'য়ে। যাতে নতুন হ'য়ে উঠতে পারি, সেইজন্যই মাঝে-মাঝে মরতে হয়।

আশ্চর্য্য, মানুষ কী-রকম বদলায়। এ-কথা যখন বলি, 'আমি অসুখী', তার মানে এ নয় যে সুখী হবার কোনো উপকরণ আমার হাতে নেই। যদি তা-ই হ'তো তাহ'লে কি এত লাগতো মনে? তাহ'লে বাইরের কোনো কারণকে দোষ দিয়ে একটু সান্ত্বনা কি পাওয়া যেতো না? তা তো নয় : অনেক উপকরণ হয়-তো আছে কিন্তু সে-সব আমি ছাড়িয়ে এসেছি। মন খুঁজছে কোনো নতুন, কোনো গভীরতরো তৃপ্তি। তা পাবো কোথায়? জীবনে দুঃখের এ-ই তো একটা মূল উৎস যে আমরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকিনে ; পুরোনো বাঁধ ভেঙে কেবলই বেরিয়ে যাই, কেবলই এগিয়ে যাই ; কিন্তু আমাদের গায়ে লেগে থাকে পুরোনো অভ্যাসের আঁশ, পুরোনো জীবনের অনুষঙ্গ একেবারে হঠাৎ ভেঙে ফেলতে পারিনে। আর নতুন বাসনার উন্মেষ সঙ্গে-সঙ্গেই তো তার পরিপূর্ণতা নিয়ে আসে না : অপেক্ষা করতে হয়—আর দুঃখ পেতে হয়।

সেই চুপচাপ, অলস দুপুরবেলায়, বাণীর কথা মনে করে' তার ভালো লাগলো। এতদিন পরে, কতদিন পরে! এখনো মনে করতে ভালো লাগে। সত্যি, প্রথম প্রেম ভোলা যায় না। তবু, তাদের যে চিরকালের মত ছাড়াছাড়ি হয়েছে, ভালোই হয়েছে সেটা। তার দিন ছিলো : তার দিন গেছে। এতদিন ধরে' তাকে সঙ্গে-সঙ্গে টেনে আনলে কিছুতেই চলতো না। আসতেই হ'তো কোনো-না-কোনো দিক থেকে ভাঙন। বাইরে থেকে না-এলে, নিজেদেরই ভিতর থেকে। তবু ভালো যে বাইরে থেকেই তা

এসেছিলো। তবু ভালো যে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিলো অশ্রুতে আর চুম্বনে। তবু ভালো যে স্মৃতির চিরন্তন অরণ্য বসন্তের মত মধুর।

সে একটু চোখ বুজলো, আর সেই অন্ধকারে ফুটে উঠলো বাণীর মুখ। ম্লান, অত্যন্ত ম্লান—এত ম্লান তো সে কখনো ছিলো না। বালিসে মাথা রেখে সে শুয়ে আছে, একটু খোলা তার ঠোঁট। কপিল অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। ক্লান্তি জড়ানো তার মুখে। সে যেন মরছে। সে মরছে, মরে' যাচ্ছে। আর এই তো আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি : আমার চোখের উপর আস্তে-আস্তে সে মরছে। আমি তাকে মরে' যেতে দিচ্ছি।

আকাশের গায়ে স্বচ্ছ সাদা মেঘ জড়ানো, যেন উর্বশীর শরীর থেকে ওড়না খসে' পড়েছে। কপিল সেদিকে তাকিয়ে রইলো চুপ করে'। সে চাইলো স্তব্ধ হ'য়ে যেতে, একেবারে স্তব্ধ : চুপচাপ, চুপচাপ শুয়ে থাকা এই দীর্ঘ উষ্ণ দুপুর ভরে'। সে কিছু করবে না, সে কিছু ভাববেও না। শুধু চুপ করে' থাকবে তার নিজের মধ্যে। বিশ্ব চঞ্চল : তার সমস্ত গ্রহমণ্ডল আর তারার পুঞ্জ আর নীহারিকারাশি নিয়ে চিরকাল ঘূর্ণ্যমান, কোটি-কোটি মৃত্যুর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে চিবকাল ধাবমান ; কিন্তু কোনোখানে, তার অন্তরে কোনোখানে নিশ্চয়ই আছে শান্তি ; আছে অপরিসীম, অনশ্বর স্তব্ধতা। আব আমাদের হৃৎপিণ্ড টিপ্‌টিপ্ করে' ভেঙে পড়তে চাইছে ; আর আমাদের রক্তের তীব্র স্রোত টেনে তুলছে বাসনার আর হতাশার ফেনা ; কোন্ দুর্বার প্রচণ্ড প্রাণ রস বয়ে' যাচ্ছে আমাদের দেহ-তরুর শাখায় আর পাতায়, আমাদের প্রতি অঙ্গে, প্রতি মুহূর্তে : তবু দাও, আমাকে দাও অন্তরের সেই স্তব্ধতা, সেই ধ্বংসহীন শান্তি, আমাকে শক্তি দাও চুপ করে' থাকবার!

কিন্তু কী করে' পাওয়া যাবে তাকে? আর যতক্ষণ পাওয়া না-যায়, একে কী করে' সহ্য করবো?—এই ক্লান্তি, এই নিঃসঙ্গতা? আমি যে মরে' যাচ্ছি, কপিল মনে-মনে বললে, আমি যে মরে যাচ্ছি।

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তার লজ্জা হ'লো, নিজেকে প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করলে তার শেষ কোথায়? যা-ই হোক্ না, মনের মধ্যে মেনে নাও। কিছু বোলো না : মনে-মনে, নিজের কাছেও বোলো না। তা চলুক্ তার নিজের স্রোতে, নিজের ধারে নিজেকে ক্ষয় করে' যাক্ : বলে' তাকে আরো শক্তি দেবে কেন?

কী দীর্ঘ মনে হচ্ছে এই দুপুরবেলাটা। আব এমন চুপচাপ। সময় যেন ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। সে ঘড়িটার দিকে তাকালো ; শুনলো তার টিকটিক—সময়ের ক্ষীণ হৃৎস্পন্দন। ঘড়িটার কোনো ভাবনা নেই ; সে কখনো ভুল করে না, তাড়া করে না ; তার কাঁটা এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় আসতে যতটা সময় নেবার তা-ই নেয়। কিন্তু আমাদের পক্ষে কী কষ্ট—কী কষ্ট সেইটুকু রাস্তা পার হ'য়ে আসতে, কী কষ্ট, যখন রুদ্ধশ্বাসে, কান পেতে শুনতে হয় প্রতিটি মুহূর্তেব পায়ের শব্দ।

ভালো লাগে না। ঐ একটা কথা সমস্ত প্রাণ দিয়ে সে ঘৃণা করে : ভালো লাগে না। সব সময় কি ভালো লাগতেই হবে? মাঝে-মাঝে যদি ভালো না-ই লাগে, অত ভয় কেন তাকে? মাঝে-মাঝে ভালো তো লাগবেই না। চুপ করে' সহ্য করো সেটা, মুখ দিয়ে তা এনো না কখনো। সেটা রোগ, সেটাকে লুকিয়ে রাখো। নিজের করুণার উপর, অন্যের দয়ার উপর জুলুম কোরো না।

কতদিন, কত লোককে সে এ-সব কথা বলেছে। আর আজ তার নিজেকেই বলতে হ'লো : ভালো লাগে না। কী লজ্জা, কী অবমাননা। সে চোখ বুজলো ; নিশ্চল, নিঃশব্দ। নিজের চারদিকে সে রচনা করবে শূন্যতা। নিজেকে সে লুপ্ত করে' দেবে। লুপ্ত করে' দেবে তার এই তৃষ্ণার্ত, করুণাপ্রার্থী সত্তাকে।

তাব ঘরে বই, কেবল বই। যে-সব আত্মা তাকে লালন করেছে ; তাকে দিয়েছে শক্তি, দিয়েছে শান্তি, সেই সমস্ত মহান, মৃত্যুহীন আত্মার উপর এক-এক করে' সে মন বুলিয়ে গেলো। যদি সে একটু হাত বাড়ায়, তাহ'লেই তাদের পেতে পারে : ছাপার পৃষ্ঠা থেকে তার মুখের উপর এসে লাগবে জ্বলন্ত নিঃশ্বাস, আর তবু সে নিশ্চল হ'য়েই রইলো। এখন নয়, এখন নয়। যে-বই জীবন্ত, তার উপর জবরদস্তি চলে না। সহজে তাকে পাওয়া যায় না। ক্লান্তি থেকে, বিতৃষ্ণা থেকে, দম্ভ থেকে যদি তাকে হাতে তুলে নাও, সে তোমার হাতে মরে' থাকবে, প্রকাশ করবে না তার রহস্য। অনেক সময় তাকে দিতে হয়,

নিজের অনেকখানি তাকে দিতে হয়। সে সৃষ্টি করবে তার নিজের ভাব-মণ্ডল ; আর সেই বাষ্পে জ্বলে' উঠবে তার শিখা। আর তুমিও জ্বলে' উঠবে—নিবিড় মিলনের লাবণ্যে, পারস্পরিক প্রবাহের নিঃস্পন্দ আনন্দে।

কিন্তু তার উপর জোর কোরো না ; জোর করলে সে ধরা দেবে না। রাখো নিজের মধ্যে তোমার ক্লান্তি। যে-বই দিয়ে তুমি তাকে হত্যা করতে যাবে, হত্যা করবে সেই বইকেই : ক্লান্তি থাকবে।

অপরূপ, অপরূপ—ভীষণ প্রজ্বলন্ত সেই সব আত্মা। কিন্তু জীবন আরো কত ভীষণ, আরো কত অপরূপ। অনেক, অনেকদিন পর্যন্ত, কপিল ভাবলে, আমি সেই আগুনের দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে ছিলাম। ভেবেছিলাম, সেটাই চরম। দূর থেকে জীবনকে দেখেছিলাম—তার ভাঙাচোরা, তার বিকৃতি, তার তুচ্ছতা নিয়ে ; আর দেবতাকে আমি ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম যে তিনি আমাকে বাঁচিয়েছেন, আমার প্রয়োজন নেই সেই তুচ্ছতায়, সেই ভাঙাচোরায় অবিশ্রান্ত বিক্ষুব্ধ হ'তে—আমার জন্য আছে এই আগুনের দেয়াল, এই বিরাট অখণ্ড জ্যোতিঃপুঞ্জ। আজ ভাঙলো ভুল। আজ জীবন আমাকে মারছে তার অন্ধকার, অপরূপ রহস্য দিয়ে। আজ জীবন আমাকে ছিঁড়ে তুলে নিয়ে যাচ্ছে—তারই তো এই ব্যথা। এতদিন, এতদিন পরে আমি হয়-তো বাঁচতে শিখবো। আমার এই আর্ট তো সেই বাঁচারই একটা অংশ। বাঁচতে হবে, শিখতে হবে বাঁচতে। আমরা যেমন লিখতে শিখি, পড়তে শিখি, ভালোবাসতে শিখি, তেমনি বাঁচতেও শিখতে হয়। আর এই বাঁচাটাই আসল, সব চেয়ে বড়।

আর এমনি করে' সমস্ত দিন সে কাটিয়ে দিলে ; আর বাইরের রাস্তায় সন্ধ্যার ছায়া যখন দীর্ঘ হ'য়ে লুটিয়ে পড়ছে, তখন সে উঠলো, বেরুলো বাড়ি থেকে। আবার গেলো মিনুর কাছে। মিনু কলের নিচে কয়েকটা চায়ের বাসন ধুচ্ছে, আর গান করছে গুন্‌গুন্ করে'। সে চুপ করে' গিয়ে দাঁড়ালো তার পাশে। মিনু একবার চোখ তুলে তার দিকে তাকালো, তার চাপা গলার গুন্‌গুনানি থামলো না।

কপিল বললে, 'আবার আমি এলুম।'

'একটু দাঁড়াও।'

কাজ শেষ করে' মিনু উঠলো। দোতলায় খোলা বারান্দা, সেখানে পাটির উপর বসলো দু'জনে। হাওয়া বইছে দক্ষিণ থেকে ; আর পশ্চিমের আকাশে অপরূপ কোনো মণির মত জ্বলছে পঞ্চমীর চাঁদ। খানিকক্ষণ কেউ কিছু বললে না।

মিনু তার নখ দিয়ে পাটির উপর একটা আঁচড় কাটলে। বললে, 'কী চাও তুমি আমার কাছে?'

কপিল বললে, 'বড় একা লাগে।'

'ভালোই তো।'

'না, ভালো নয়। বড় কষ্ট।'

মিনু একটু চুপ কবে' রইলো।

'না-হয় কষ্টই হ'লো।'

'যদি কষ্ট হ'তেই হয় তবে আর উপায় কি। কিন্তু কষ্ট পেতে কে চায়? মরতে চায় কে?'

'তোমার মনের কথাটা কী, বলবে বুঝিয়ে?'

'বোঝাতে পারবো না। তুমিই বলো : যা চাই তা কি পাবো না কখনো?'

'সে-কথা আমি বলবো কী করে'? অনেক সময় তো আছে।'

'সময়ই যে নেই। বড় ছোট জীবন।'

'তুমি কি তাকে খুব বেশি করে' চাও, সত্যি?'

কপিল একটু চুপ করে' রইলো, তার মাথা আনত।

'আমি তাকেই শুধু চেয়েছি। মরে' গেলেও মেকিকে মেনে নিতে পারিনি।'

'মেকিকে কেন নেবে?'

'আর যদি তা কখনো না-ই পাই—'

'তবে?'

'কী আর করবো,' ক্ষীণ, অস্পষ্টস্বরে কপিল বললে।

কিন্তু পরের মুহূর্তেই সে চোখ তুলে তাকালো :

'কিন্তু পাই যদি, সেটাই তো ভালো।'

মিনু একটু ভাবলে।

'হয়-তো পাবে—কোনো সময়ে।'

'তোমার মুখের এই আশ্বাস কি নিতে পারি?'

'আশ্বাস যদি দিতে পারতুম, নিজেকেও তাহ'লে দিতে পারতুম।'

'কোথায় তোমার কুণ্ঠা?'

মিনু চুপ করে' একটু ভাবলে।

'তুমি বরং এখন যাও।'

'কিন্তু আবার তো আসতে হবে ফিরে।'

'হ্যাঁ, ফিরে আসবে।'

কপিল মিনুর একখানা হাত টেনে নিলে নিজের হাতের মধ্যে। মিনু হাত সরিয়ে নিলে না , নরম, উষ্ণ, ঈষৎ-আর্দ্র তার হাত কপিলের মুঠোর মধ্যে এসে লুকোলো।

'এত ভয় কেন তোমার?' কপিল বললে।

'না, ভয় নয়। ভয় করিনে বলে'ই তো তোমাকে চলে' যেতে বলতে পারছি।'

'কিন্তু আর কী? আর কী হ'লে ভবে' উঠবে তোমাব মন?'

'আমাকে দিয়ে তো শুধু কথা নয়।'

'কী, তাহ'লে?'

মিনু ক্ষীণ হাসলো :

'তুমি আব আমি—আমরা কী? কী আমরা কবতে পাবি? সবই ঈশ্ববের হাতে। কেবল ঈশ্বব ফুল ফোটাতে পারেন।'

কপিল একটু চুপ করে' রইলো।

'আমরা নষ্ট তো করতে পাবি!'

মিনু অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললে, 'নষ্ট হবে না।'

তারপর খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপ। ক্ষীণ চাঁদ এরই মধ্যে ঝুলে পড়েছে লাল হ'যে ; অন্ধকাব হ'যে আসছে। কপিল মিনুর হাত ছেড়ে দিয়ে বললে, 'যাই তাহ'লে।'

'একটু বোসো।'

কপিল চুপ করে' অপেক্ষা করতে লাগলো।

'আমাকে দিয়ে কি ভরবে তোমার নিঃসঙ্গতা?' মিনু আস্তে-আস্তে বললে।

'যদি ভরে' তুলতে না-পারি, সে-দোষ আমারই হবে।'

তারপর অনেকক্ষণ তারা বসে' রইলো, পরস্পরেব দিকে না-তাকিয়ে, কিছু না-বলে'। তারপব কপিল আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালো।

মিনু তার দিকে চোখ তুললো :

'চললে?'

'হ্যাঁ, যাই এবার।'

মিনু তার সঙ্গে সিঁড়ির মাথা পর্যন্ত এলো। একটু দাঁড়ালো দু'জনে, একবার মিললো দু'জনের চোখ।

'আবার কবে আসবে?' মিনু বললে।

'আবার দেখা হবে,' বলে' কপিল সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো।

তিন

এখন অবিশ্যি বাড়ি ফেরা যায় না, রাস্তায় বেরিয়ে সে ভাবলে। কিন্তু কী করা যায়? কোথায় যাওয়া যায়? যানের আর মানুষের, গতির আর শব্দের সেই ঘূর্ণির মধ্যে সে দাঁড়িয়ে রইলো, ভাবতে লাগলো। সমস্ত রাস্তাটা ঝক্‌ঝক্ করছে, বসন্তের এই সন্ধ্যায়। কোনোখানে তাকে যেতেই হবে।

আর হঠাৎ তার মনে পড়লো তার বন্ধু বাসবকে। বাসব দাস, যে গল্প লেখে। তার গল্প ভালো : কিন্তু একজনের লেখার ভিতর দিয়ে তার কতটুকুই বা পাওয়া যায়। অন্তত, এই বাসবকে বেশি পাওয়া যায় না। সে কম লেখে ; আর যেটুকু লেখে, খুব কম করে' লেখে। আর তার লেখা যেন তার অন্য-কোনো লুকোনো সত্তা থেকে সঞ্জাত, যা সংযত, যা শীত-স্বভাব, যাতে নিখুঁত মাত্রা। সে-সত্তা নয়, কপিল যাকে চেনে ; যা দিয়ে সে হাসে, আর চলে, আর কথা বলে ; যেখানে সে জ্বলছে, যেখানে সে যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে, যেখানে তার আনন্দ ফোয়ারার মত উচ্ছলিত। যারা কেবল তার লেখা পড়ে' মুগ্ধ হ'লো, তারা তার কী জানলো?

আমার কপাল ভালো, কপিল ভাবলে, আমি তার সঙ্গে এক সময়ে জন্মেছি। আমার কপাল ভালো, তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আমি পেয়েছি তার উষ্ণতার স্পর্শ : তার যে-উষ্ণ, উৎসুক প্রাণ জ্বলে' ওঠে তার চোখে আর তার হাসিতে।

দু'জনের মধ্যে ছিলো বন্ধুতা, যার ভিত্তি শ্রদ্ধায়, স্রষ্টার আনন্দে, একই কোনো সন্ধানের ব্যথায়, একই আত্ম-প্রকাশের উৎসুকতায়। আমরা সকলেই চাই অন্য কারো কাছে নিজের কথা বলতে। কিন্তু কথা আসে না। কথা যা আসে, তা রূপক ; কেমন করে' লোকে তা বুঝবে? কিন্তু কেউ হয়-তো বুঝবে, কোনো-একজন হয়-তো বুঝবে। তা-ই আমরা আশা করি। একদিন তাকে হয়-তো পাওয়াও যায়। আর তখন মন ভরে' যায় নতুন আনন্দে, নতুন ঐশ্বর্য্যের অনুভূতিতে।

বেশি দেখা তাদের হ'তো না। বেশি দেখা হবার প্রয়োজন যেন তাদের নেই। বাসব ঘুরতো সমাজের অন্য-এক স্তরে। তার অবস্থা ভালো ; কপিলের চাইতে সে উঁচু 'জাত'। যে-সব জায়গা, যে-সব বাড়ি নিয়ে বাসবের পরিধি, কপিলের সেখানে প্রবেশ নেই। মাঝে-মাঝে তাদের দেখা হ'তো—দু'জনের কোনো-একজনের বাড়িতে। বাসব হয়-তো তাকে নিয়ে যেতো কোনো হোটেলে। আর তারা কথা বলতো—কি, আরো ভালো, চুপ করে' বসে' থাকতো কোনো ফরাসি সাদা মদের ছোট্ট গেলাস সামনে নিয়ে।

আর তাদের মধ্যে একটা সংস্পর্শ ; একটা সংস্পর্শ যা, তারা অনুভব করতো, কখনো নষ্ট হবে না।

অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা নেই, কপিল ভাবলে। এখন কি তাকে বাড়ি পাওয়া যাবে? না-পাওয়ারই কথা : তবু—না-হয় বসে'ই থাকবো গিয়ে। নির্দিষ্ট কারো জন্য অপেক্ষা করা তবু ভালো।

কপিল একটা বাস্‌-এ চড়ে' বসলো—বাসবের বাড়ি সহরের অন্য প্রান্তে। আর গিয়ে অবিশ্যি সে তাকে পেলো না ; অপেক্ষা করতে লাগলো তার ঘরে বসে'।

ঘরের মধ্যে অবিশ্বাস্য বিশৃঙ্খলা। যেখানে-সেখানে বই ছড়ানো—চেয়ারের উপর, মেঝেতে, কুশানের নিচে। কোনো বইয়ের ফাঁকে রয়েছে চ্যাপ্টা-হ'য়ে-যাওয়া সিগ্রেট, পৃষ্ঠা-চিহ্ন। প্রকাণ্ড টেবিল: সেখানে কাগজ-পত্রের অরণ্যের মধ্যে কপিলের চোখে পড়লো একতাড়া আলগা কাগজ—বাসবের অত্যন্ত যত্নহীন দ্রুত হাতের লেখায় ভরা, তুলে নিয়ে সে পড়তে আরম্ভ করলো। সে যা ভেবেছিলো তা নয়; একটা লেখা নয়। চার-পাঁচটা লেখার আরম্ভ : কোনোটার দু'পাতা, কোনোটার কয়েক লাইন মাত্র। গল্প রয়েছে একটা, রয়েছে কেঁচো আর উইপোকা নিয়ে প্রবন্ধ, আর শিশুদের জন্য একটা রূপকথা, তারপর আরো একটা গল্প। সবগুলো লেখাই টাটকা—দেখেই বোঝা যায়। কপিল কাগজের তাড়াটা গুছিয়ে একধারে রেখে দিলে সরিয়ে। তার সঙ্গে দেখা হ'তেই বাসব এ-সম্বন্ধে যা বলবে তা মনে করে' মনে-মনে সে হাসলো।

অনেকক্ষণ কাটলো, বাসব ফিরছে না। কপিল বসে' রইলো, দুটো-একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া

করলো। এখনো তার মন যাচ্ছে না পড়ায়। একদিন সে গর্ব করে' বলেছিলো, যে-কোনো ছাপার অক্ষরের জিনিস হ'লেই আমি সময় কাটাতে পারি। আর এখন চারদিকে তার ছাপার অক্ষরের পাহাড়। কিন্তু সে রয়েছে দূরে। অনেক লোভনীয় সব নাম তার চোখে পড়লো : কিন্তু সে পাতাও ওল্টালে না, কি পাতা উল্টিয়েই রেখে দিলে।

দশটা প্রায় বাজলো। দু' ঘণ্টার উপরে সে বসে' আছে। কিন্তু তাব খুব খারাপ লাগছিল না। আর বাড়ি ফেরবার কথা এখনো সে ভাবতে পারছে না।

বাসব ফিরলো প্রায় এগারোটায়। সুন্দর তার কাপড়-চোপড়, সুন্দর করে' আঁচড়ানো তার চুল। কিন্তু তার মুখ একটু ম্লান।

'এ কী! তুমি!'

'কত দেরি করলে!'

'কতক্ষণ বসে' আছো?'

'অনেকক্ষণ।'

বাসব একটা চেয়ার টেনে এনে কপিলের কাছে বসলো।—'ঘরটার আনাচে-কানাচে আমি ছড়ানো রয়েছি। কিছু মনে কোরো না।'

'তোমার সব নতুন লেখা দেখছিলুম', কপিল বললে।

'ওঃ!' বাসব দু'আঙুলে মাথাটা টিপে ধরলো। 'কিচ্ছু লিখতে পারছিনে। মাথা খারাপ হ'য়ে গেলো কিনা ভাবছি।'

কপিল এ-কথা শোনবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েই ছিলো—ক্ষীণ একটু হাসলো।

'সত্যি কিছু লেখা হচ্ছে না। কী হ'লো আমার?'

'কয়েকদিন না-ই লিখলে।'

'আমিও ভেবেছি ও-কথা। মনে-মনে বলেছি, ভিতর থেকে একদিন ঝোঁক আসবে। কিন্তু কতদিন তো গেলো। কোথায়? কোথায়? ভিতরটা যেন একেবারে মরে' গেছে।'

কপিল তার দিকে তাকালো, আশ্চর্য উজ্জ্বল তাব চোখের দিকে, যেখানে আগুনেব মত জ্বলছে প্রাণ। কিছু বললে না।

'তারপর কাল মনে করলুম—আর নয়, এবার লিখবোই, জোব কবে'ই লিখবো। কাল সমস্ত দিন ঘরের দরজা বন্ধ করে'—ঐ তো দেখলে। কিন্তু কী কষ্টই যে হয়েছে।'

'একসঙ্গে ক'টা লিখবে?'

'ঐ জন্যেই তো। একটা আরম্ভ করে'ই মনে হয়, কী ছাই হচ্ছে। তক্ষুনি অন্য কিছু ধবি। এমনি করতে-কবতে ঐ তো দাঁড়িয়েছে।—পড়েছো নাকি?' একটু থেমে, অন্যরকম সুবে বাসব জিজ্ঞেস করলে।

'সব পড়িনি।'

'যেটুকু পড়েছো, খুব খারাপ হয়নি তো?'

'না, খারাপ হয়নি।'

কথাটা শুনে বাসব যেন গভীর শান্তি পেলো মনে। নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, 'যাক, খারাপ্ না-হ'লেই হ'লো। কিন্তু সত্যি, আর কি কখনো সত্যিকারে ঝোঁক আসবে না লেখার?'

কপিল চুপ ক'রে রইলো।

'তারপর দ্যাখো—আজকে আবার মনটা একেবারে বেঁকে বসেছে। কালকের লেখার ঠেলায় আজ সমস্তটা দিন নষ্ট করতে হ'লো। এই তো, দ্যাখো, বাড়ি ফিরছি।'

'নষ্ট কেন বলছো?'

বাসব মুহূর্তের জন্য চোখ বুজলো :

'শুধু দিন নষ্ট হ'লে ভাবনা ছিলো না। এখন ভয় হচ্ছে আমি নিজেই হয়-তো নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছি।'

'তোমার মন আজ ভালো নেই।'

'অবিশ্যি ও-কথার কোনো অর্থ হয় না, তা ঠিক। কিন্তু আমার আর ভালো লাগছে না এ-সব। বড় বেশি লোক, বড় বেশি কথা—সবই বড় বেশি। আজ এক বাড়িতে গিয়েছিলুম, সেখানে মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে প্রায় তিরিশ জন উপস্থিত ছিলো। আর—বিশ্বাস করবে?—আমি তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদাভাবে আলাপ করেছি।'

'এতে আশ্চর্য কী। তোমার তো এই করে'ই অভ্যেস।'

'কিন্তু এ-অভ্যেস আমায় ছাড়তেই হবে। এই অভ্যেসই আমাকে মেরে ফেলছে। এমন কেন হ'লো যে আগেকার মত আমার আর লেখা আসছে না? এই ধরনের অকারণ, অর্থহীন, নিষ্ফল মেলামেশা—তা আমার জীবনীশক্তি শুষে নিচ্ছে।'

'কিন্তু এরই মধ্যে তুমি জন্মেছো। এরই মধ্যে তুমি বড় হয়েছো। এ থেকে তুমি পালাবে কী করে'?'

'ঘবের দরজা বন্ধ কবে' বসে'-বসে' কেবল পড়বো আর লিখবো।'

কপিল মুচকি হসলো।

'পারবো না ভাবছো?' বাসব সে-হাসি লক্ষ্য করে' বলে' উঠলো। 'ইচ্ছে করলে কী না পারি।'

'হ্যাঁ', কপিল বললে। 'যা ইচ্ছে করে, তা-ই আমরা করতে পারি। যা ইচ্ছে করে, তা-ই শুধু করতে পারি। কিন্তু আমাদেব ইচ্ছেটাই যে বার-বার বদলায়।'

'সে-কথা ঠিক।' বাসব একটু চুপ করে' রইলো, তারপর আবার বললে, 'কিন্তু জীবনের একটা কেন্দ্র দবকার?'

'তুমি কি এখনো তা খুঁজে পাওনি?'

'খুঁজে কি তা পাওয়া যায়? নিজে থেকেই তো তা গড়ে' ওঠে, আমরা টেরও পাইনে।'

দু'জনে পরস্পরেব চোখের দিকে একবার তাকালো, তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে' রইলো।

'তোমার মধ্যে আজ একটা অস্থিরতা লক্ষ্য করছি,' কপিল বললে।

'নিজের এই নিষ্ফলতা আমি আর সইতে পারছিনে।'

'লিখতে না-পারার নিষ্ফলতা?' কপিল হাসলো।

'শুধু তা-ই নয়। যদিও সেটাও আছে। একটা প্রকাণ্ড, সমগ্র নিষ্ফলতার সেটা একটা অংশ।' বাসব তাব চেয়ারে নড়ে'-চড়ে' একটু ভালো হ'য়ে বসলো। একটু পরে বললে, 'এক-এক সময় আমার মনে হয় যে আমি হয় তো সত্যিকারের আর্টিসট্ই নই। তা যদি হ'তাম, তাহ'লে আমার জীবন আর্টের মধ্যেই পেতো তার কেন্দ্র।'

'ও-কথা বোলো না', প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে কপিল বলে' উঠলো।

কী ছিলো তাব কথাব সুরে, বাসব একটু অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকালো। কপিল আবার বললে, 'না—ওখানে নয়, ওখানে নয, তুমি যা চাও। তোমার আর্ট তোমার ভিতর থেকে উঠে আসবে, তোমাকে লুকিয়ে রাখবে না। তোমার আর্ট তোমার ফুটে ওঠা, গাছের যেমন ফুল। কিন্তু আসল জীবনটা গাছের, আসল জীবনটা তোমার।'

'কিন্তু জীবনে যদি কিছু না-থাকে—'

'জীবনে কিছু থাকবে না কেন? এতদিন তুমি কি এ-ই বুঝলে?'

একটু সময়, বাসব সোজা তার সামনে তাকিয়ে রইলো।

'এটা বুঝেছি যে জীবনে ক্লান্তি আছে। আর কোনোখানে আছে কোনো বিকৃত ভাগ্য। আমরা যা করতে চাইনে, আমাদের দিয়ে তা-ই করায়। আমাদেব মনকে তৈরি করে একরকম করে', আর জীবনের ঘটনাকে তার বিপরীত। আর এই অবিশ্রান্ত আত্ম বিরোধ আমরা ক্ষয়ে' যেতে থাকি, শুকিয়ে যেতে থাকি।'

'তুমি তোমার নিজের কথা বলছো।'

'হ্যাঁ, নিজের কথাই তো বলছি। একটু আগে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে ঠিক এ-সব কথা ভাবছিলুম।

যে-সব জায়গায় যেতে আমি চাইনে, ঠিক সে-সব জায়গাতেই যাই ; যাদের সঙ্গে মিশলে আমাকে কেবল ক্লান্ত হ'তে হয়, তাদের সঙ্গেই রোজ মিশি।'

'কেন কারো ও-রকম?'

'না-করে' পারিনে।'

কপিল একটু থেমে রইলো।

'বুঝতে পারি', মৃদুস্বরে সে বললে। 'বড় ভয়ানক নিঃসঙ্গতা এই জীবনে।'

বাসবের উজ্জ্বল চোখ মুহূর্তের জন্য যেন কোমল, অস্পষ্ট হ'য়ে এলো। 'সেইজন্যেই তো', আস্তে-আস্তে সে বললে, 'যদি সেই নিঃসঙ্গতা ভরে' তুলতে না-ই পারো, তাকে মারবার ব্যবস্থা অন্তত করতেই হবে।'

কপিল অপেক্ষা করতে লাগলো, ভিতরে-ভিতরে তার নিঃশ্বাস রুদ্ধ। এ-ই তো সে ভেবেছে আজ সমস্ত দিন ভরে'—সে, ধৈর্য্যে স্তব্ধ, প্রার্থনায় আনত। আর এর কী বলবার আছে এ নিয়ে—এই চঞ্চল, অশান্ত মানুষ, নিজের মধ্যে যে ছিঁড়ে যাচ্ছে?

'হ্যাঁ, তাকে মারতেই হবে', বাসব আবার বললে, 'মারতে হবেই। যেমন করে' পারো। আর-কোনো উপায় নেই তোমার। আর কেমন করে' তা হবে? কোনো নেশা—যে-কোনো নেশা। আর এ-রকম নেশা আর কী আছে—মানুষের মুখের, মানুষের কণ্ঠস্বরের, মানুষের গায়ের গন্ধের? এত বৈচিত্র্য কি তুমি পাবে মদে? এমন অফুরন্ত বৈচিত্র্য? আর এমন নির্মম, এখন ভয়ঙ্করও আর-কোনো নেশা নয়। আর-কোনো নেশা কি আছে যা তোমার আত্মাকে পচায়?'

বাসব অল্প একটু হেসে উঠলো।—'আমরাই হচ্ছি বর্তমান যুগের সন্ন্যাসী, আমরা যারা শিল্পী। আমরাই চাই পৃথিবী থেকে দূরে সরে' যেতে, নিজের জীবনকে সৃষ্টি করতে। কোনো শঙ্করাচার্যের, কোনো সেইন্ট্ ফ্রান্সিসের পৃথিবীর উপর এমন বিতৃষ্ণা ছিলো না—যা আছে আমার—আর তোমার।'

'পৃথিবীর উপর বিতৃষ্ণা আছে নাকি আমাদের?'

'যখন পৃথিবী মানে এক সন্ধ্যায় তিরিশজন মেয়ে-পুরুষের সঙ্গে আলাদাভাবে আলাপ করা,' একটু হেসে বাসব বললে, 'যখন পৃথিবী মানে টাকা পাওয়া আর টাকা খরচ করা। যখন পৃথিবী মানে তোমার চারদিকে সব পচে'-যাওয়া আত্মার দুর্গন্ধ।'

'সে-পৃথিবীকে তোমার যেটুকু না-দিলেই নয়, তা-ই দেবে। তার বেশি দেবে না। বাকিটা তোমার; বাকি সময় তোমার। তা কি যথেষ্ট নয়? অন্তত তা-ই নিয়ে কি তুমি তোমার জীবনকে সৃষ্টি করতে পারো না?'

'আমিও ও-কথা ভেবেছি,' একটু চুপ করে' থেকে বাসব বললে। 'মনে-মনে বলেছি কতবার : এই আমি দরজা বন্ধ করলুম পৃথিবীর মুখের উপর ; এর পর থেকে আমার নিজের জগত যেখানে আমি রাজা, যেখানে আমি ঈশ্বর। বর্তমান সময়ের এমনি ব্যবস্থা যে একেবারে বিচ্ছিন্ন থাকবার উপায় নেই ; পৃথিবীর মোটা-মোটা স্যাঁৎসেঁতে আঙুল মাঝে-মাঝে গায়ে এসে লাগবেই। সেটা সইবো মুখ বুজে। আর তা ছাড়া, সেটা শুধু আমার চামড়াতেই লাগবে—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমার খোলসে, আমার বাইরের-আমিতে। কিন্তু তা ছাড়া আরো কিছু আছে। তা ছাড়া যেটা আছে সেটাই তো আসল। যেখানে আমি রাজা হ'বো, সেখানে আমি হ'বো ঈশ্বর।'

কপিল মাথা নিচু করে' চুপ করে' রইলো, আর বাসব বলতে লাগলো :

'কিন্তু নেশার হাত থেকে মুক্তি নেই। মানুষের মুখ আমাকে দেখতেই হবে, আমাকে শুনতেই হবে মানুষের কথা। আমাকে পেতেই হবে অনেক মিলিত নিঃশ্বাসের সেই ভারি উত্তাপ। রোজ যখন সন্ধ্যা হয়, আমার মধ্যে একটা প্রবল শারীরিক তৃষ্ণার মত জ্বলে' ওঠে সেই কামনা। আর আমাকে বেরিয়ে পড়তে হয়—এখানে, ওখানে, গৃহহীন প্রেতের মত—লম্পট যেমন গণিকার দরজা থেকে দরজায় ঘুরে বেড়ায়। আমাকে যেতেই হবে—এ-কথার ভয়াবহতা তুমি বুঝতে পারছো?—যেতেই হবে, না-গিয়ে আমার উপায় নেই। আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি কাটিয়ে দিই—আমার কাছে যাদের কোনো অস্তিত্বই

নেই, সেই সব লোকের সঙ্গে, আমার কাছে কোনোরকম অর্থ হয় না এমন সব আলাপে। ভালো লাগে না, তবু যেতে হয় : নিজের উপর রাগ হয়, নিজেকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করি—তবু যেতে হয়। কেন? কেন এটা? এমন একটা নিঃসঙ্গতা আছে যাকে চাপা দিতেই হবে, যাকে ভুলতেই হবে। নয় তো তুমি বাঁচতে পারবে না।'

কপিল চোখ তুলে তার বন্ধুর দিকে তাকালো। তার চোখ ঝলসাচ্ছে, জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে তার সমস্ত মুখ। সুপুরুষ তাকে বলা যায় না ; কিন্তু এই উত্তেজনা, আত্মপ্রকাশের এই রোমাঞ্চ তার মুখে এনে দিয়েছে এক অদ্ভুত আভা যাতে সে প্রায় সুন্দর হ'য়ে উঠেছে।

আর, একটু পরে কপিল আস্তে জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার স্ত্রী কেমন আছে?'

সঙ্গে-সঙ্গে বাসবের মুখের চেহারা বদলে গেলো। তার চোখ আত্ম-সচেতন হ'য়ে উঠলো ; ঠোঁটে ফুটে উঠলো মার্জিত, সূক্ষ্ম, একটু হাসি।

'ও, মৈত্রেয়ী! ভালো আছে, বেশ ভালোই আছে সে।'

বাসবের বিয়ে হয়েছে প্রায় পাঁচ বছর। তারই সমাজের মেয়ে ; দু'পরিবারে অনেকদিনের জানাশোনা। যখন তারা নেহাৎ ছেলেমানুষ তখন থেকেই তাদের বিয়ে একরকম ঠিক হ'য়ে আছে। আর তাদের বিয়ে অল্প বয়েসেই হয়।

মৈত্রেয়ীর সঙ্গে কপিলের দু'একবার দেখা হয়েছে। অপূর্ব দেখতে। প্রথম বছরটা বাসবকে খুবই সুখী মনে হয়েছিলো তাকে পেয়ে। লোকে তা-ই বলে।

কিন্তু তাদের এই বিয়েটা সম্পূর্ণ সামাজিক : তাদের সমাজের, তাদের দলের মধ্যে একটা ঘটনা ; তাদের সমাজের একটা শোভা যেন। সবাই খুসি হযেছিলো ; সবাই মুগ্ধ হয়েছিলো তাদের দেখে। 'বাঃ, চমৎকার মানিয়েছে।' এবং অন্যের চোখে এই ভালোলাগাটাই যেন তাদের বিয়ের উচ্চতম সফলতা। তা যেন তাদের জীবনের নয় . তা বেড়ে উঠতে পারেনি তাদের সত্তার অন্ধকারে।

কিন্তু বিয়ে নেপথ্যের, বিয়ে অন্ধকারের ; বিয়ে কেবল দু'জনের পরস্পর-উৎসুক, পরস্পর-সংবেদিত জীবনের। কেবল মিলন নয়, সংবেদন। পূজার প্রদীপের শিখা যেমন দেবতার অন্ধকার মুখের দিকে উৎসুক। যেমন দেবতার অন্ধকার, ভয়ঙ্কর দৃষ্টি শিখার আরক্ত অভীপ্সার উপর আনত। আত্ম-অঞ্জলিতে আর আত্ম-সমর্পণে, প্রার্থনায় আর করুণায় অনির্বচনীয় সেই সংবেদন।

সে-বিয়ে যখন হয়, তখন আব ভয় থাকে না। সেটা সমস্ত জীবনের : সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে তা আনে গভীরতরো, নতুনতরো সংস্পর্শ ; বয়েস যত বাড়ে, তা শান্তিতে সোনালি হ'য়ে উঠতে থাকে, সোনালি হেমন্তের মত।

কিন্তু এই বিয়ে, যেটা কেবল সামাজিক, প্রধানত অন্যেব খুসির জন্য, যেটা একটা শোভা, গোষ্ঠীগত জীবনের একটা অলঙ্কার—এ-বিয়ে কৃত্রিম, এ-বিয়ে মিথ্যা। যে-জিনিস সম্পূর্ণ বাইরে থেকে চাপানো তার ভার বেশিদিন সয় না। যে-জিনিস নিজের ভিতর থেকে গড়ে' ওঠেনি, দু'দিনেই তার রস শুকিয়ে যায়। তারই আছে ক্ষয় ; তা-ই যায় পুরোনো হ'য়ে ; তাকেই ছিঁড়ে ফেলে সময়ের আঙুল। আর আমরা আমাদের মূঢ়তা থেকে চমৎকার ছোট-ছোট থিওরি তৈরি করি : বলি, ভালোবাসাই এমনি, জীবনই এমনি . বলি, যতদিন তাকে কাছে না পাও, ততদিনই প্রেমের মহিমা। তখনই আমাদের মধ্যে আসে পবিত্রতার বিকৃতি, কামুকতার বিকৃতি, ছোট্ট-ফুটফুটে-ফুলের-মত মেয়েকে উপাসনার বিকৃতি।

অবিশ্যি এমন নয় যে বাসব সত্যি-সত্যি অসুখী ছিলো। জীবন চলতো মসৃণগতিতে ; কোনোখানে একটা চিড় নেই, একটু খুঁত নেই। কোনো অভাব নেই, কোনো বিরোধ নেই, কোনো সংঘাত নেই। স্বামী-স্ত্রী প্রায়ই একসঙ্গে বেরুতো। একই সব লোককে তারা চেনে ; একই সব জায়গায় তাদের যাতায়াত। অনেক তাদের রুচির ও আসক্তির মিল। মৈত্রেয়ীর সঙ্গে কথা বলতে বাসবের ভালো লাগতো। আর অনেক-কিছু নিয়েই সে কথা বলতো—শুধু তার লেখার কথা কখনো নয়। আর মৈত্রেয়ী যদি কখনো ভুল করে' কিছু বলে' ফেলতো, সে থাকতো চুপ করে'। সে যে লেখে সেটা যেন ঈষৎ একটু লজ্জার ব্যাপার, স্ত্রীর কাছে তার এই মনোভাব। সেটা লুকোতে হবে : স্ত্রীর কাছ থেকে সেটা

লুকোতে হবে।

এমনি কাটছিলো। তারা সুন্দর একটি ছবি তৈরি করেছিলো—এই পর্যন্ত। তারা মানিয়েছিলো—যাতে অন্যেরা দেখতে পারে এবং দেখে খুসি হ'তে পারে। এই পর্যন্ত। ভিতরে সব ফাঁকা। মৈত্রেয়ী কখনো আগুনের অঞ্জলির মত জ্বলে' ওঠেনি, লুটিয়ে পড়েনি ; আর বাসব কখনো তার ভয়ঙ্কর দেবতার-মুখের করুণ, অপরূপ দৃষ্টি আনত করেনি তার উপর।

মৈত্রেয়ীর মনে অবিশ্যি কোনো ক্ষোভ ছিলো না। থাকবার কথাও নয়। যা আমরা কখনো আকাঙ্ক্ষাই করিনি, যা আছে বলে'ই আমরা জানিনে, তার অভাব আমরা বুঝবো কী করে'? মৈত্রেয়ী যা চেয়েছিলো, তা-ই সে পেয়েছিলো। তার মনে ছিলো সুখ : তার চিরপরিচিত পারিপার্শ্বিকে শৈশব থেকে অভ্যস্ত তার জীবন পেয়েছে বলে'। তার বিয়েটা যেন খেলা। মেয়েদের বিয়েতে যে-বিচ্ছেদের, দ্বিধা হ'য়ে যাবার, ছিঁড়ে পড়বার যে-ব্যথা, তা তাকে পেতে হয়নি। যেখানে সে ছিলো, সেখানেই সে রয়ে' গিয়েছিলো। যে-বাড়িতে তার জীবন কাটবে তার সঙ্গে অনেক আগে থেকেই সে পরিচিতি। যে-মানুষকে নিয়ে তার জীবন কাটবে তাকে সে অনেক আগে থেকেই মনে-মনে মেনে নিয়েছে স্বামী বলে'। তাকে পেতে হয়নি কোনো আকস্মিকতার, কোনো বিচ্ছেদের, কোনো নির্মম রহস্যের ব্যথা। আর সেখানেই সে সুখী।

বাসবের কথা অবিশ্যি আলাদা। তার মধ্যে ছিলো এক অপরিসীম অভাবের চেতনা কোন্ সূক্ষ্ম, তিক্ত কষ্টে তার বুকের ভিতরটা যেন টন্‌টন্ করছে সব সময়। কিন্তু তার কাছে সে হার মানবে না, মরে' গেলেও। এ নিয়ে যদি বিলাপ করতে হয়, লজ্জায় সে মরে' যাবে। আর, কেউ– যত লোকের সঙ্গে সে মিশতো, যত লোকের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে আলাপ করতো– কেউ সন্দেহ করতো না তার অন্তরের শূন্যতা। শুধু কপিল জানতো। শুধু কপিল বুঝতো।

এ নিয়ে কখনো তাদের মধ্যে স্পষ্ট কোনো কথা হয়নি অবিশ্যি। তবু, কপিলের পক্ষে বোঝা খুবই সহজ ছিলো। কোনোরকমে স্ত্রীর কথা উঠলেই বাসবের মুখের চেহারা বদ্‌লে যেতো। নেমে আসতো তার চোখের পাতা, তার ঠোঁটে ফুটে উঠতো সূক্ষ্ম হাসি।

আর তবু, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তার মনে কোথায় যেন একটা অনাসক্তি ছিলো। সাধারণ অর্থে প্রেম যদি সে চাইতো, সে তা পেতে পারতো ইচ্ছে করলেই। ছোটখাটো একটা প্রেমের ব্যাপার, একটা ছুটির দিন, আত্মার শনিবারের রাত্রি। চাইলেই সে পেতে পারতো। কিন্তু কোনো মেয়ের সঙ্গেই তার সম্পর্ক ভদ্র নাগরিকতার বাইরে যেতে পারতো না। তারপর কোথায় যেন একটা বাধা, তার নিজেরই ভিতরে একটা পাথরের দেয়াল। এটা লোকে লক্ষ্য করতো, আর পুরুষরা বলাবলি করতো—ও রকম স্ত্রী যার, ইত্যাদি। এমনি আমরা মানুষকে বিচার করি, বাইরে থেকে দেখে।

দীর্ঘ নীরবতা। তারপর হঠাৎ কপিল বললে :

'আমি ভাবছি বিয়ে করবো।'

বাসবের উজ্জ্বল চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টি তার মুখের উপর এসে পড়লো ·

'হ্যাঁ, করো। আমার অবাক লেগেছে এতদিন তুমি বিয়ে করোনি।'

'অবাক লেগেছে? কেন?'

'যখন থেকে তোমাকে চিনি আমার মনে হয়েছে তোমার মধ্যে কোথায় একটা অসম্পূর্ণতা আছে।'

'কপিলের ভগ্নাংশ!' কপিল হেসে উঠলো, নিজেকে ঠাট্টা করে'।

কিন্তু বাসব সে-হাসিতে যোগ দিলে না :

'তোমার মধ্যে ভালোবাসার অভাব ছিলো।'

'ভালোবাসার?' খুব নিচু গলায় কপিল পুনরাবৃত্তি করলে।

'তোমার জীবন ছিলো একটা সুরে বাঁধা', একটু চুপ করে' থেকে বাসব বললে।

'কী সে-সুর?'

'তা তুমিই ভালো জানো। কিন্তু একটা সুর। অনেকদিন চলেছে সেটাতে। সেটারও প্রয়োজন

ছিলো—সেটা না-হ'লেও তোমার চলতো না।'

বাসব হঠাৎ থেমে গেলো। কপিল বললে :

'কিন্তু এখন আর সেটাতে চলছে না—এ-ই তো বলতে চাও তুমি?'

'না, আর চলছে না। সেটা ফুরিয়ে গেছে—অন্তত, যাওয়া উচিত। এখন নতুন সুর আসা দরকার তোমার জীবনে। আর তা তুমি কোথায় পাবে—তা তুমি কোথায় পাবে, যদি না কোনো মেয়ের মধ্যে পাও, কোনো মেয়ের সঙ্গে সংস্পর্শে?'

কপিল চুপ করে' রইলো। আর বাসব বলতে লাগলো :

'তোমার মধ্যে বাইরের একটা প্রশান্তি ছিলো। আর আমি, অস্থিরতা যার জন্মগত, আমি প্রথমটায় ঈর্ষা করেছিলুম তোমার সেই প্রশান্তিকে। জীবনকে তুমি একদিক থেকে মেনে নিয়েছিল ; কোনো দিক থেকে, কোনোখানে, একটা মিল খুঁজে পেয়েছিলে নিজের মধ্যে। সেটা ভালো, নিজেকে অকারণে অবিশ্রান্ত ছড়িয়ে-ছড়িয়ে দেয়ার চাইতে সেটা ভালো। নিজের অনেকটা বাঁচে তাতে, জমে' ওঠে। কিন্তু জীবনের সবটা তুমি নাওনি—নিতে চাওনি। তোমার সেই আত্মস্থতার খুঁটি ছিলো তোমার গর্ব আর নিজের উপরে তোমার অভিমান। অভিমানে তুমি মুখ ফিরিয়ে ছিলে। গর্বে তুমি চোখ তুলে তাকাবে না। নিজেকে তুমি সম্মোহিত করে' রেখেছিলে বিশেষ একটা আদর্শে। খানিকটা জোর-খাটিয়েছিলে নিজের উপর। তোমার মধ্যে যে-প্রশান্তিটা দেখা যেতো, সেটা সত্যিকারের প্রশান্তি নয় : সেটা তোমার গর্বের আর অভিমানের শক্ত-হ'য়ে থাকা। তোমার মধ্যে কোথায় একটা কঠিনতা কি ছিলো না? সেটা আসে ভালোবাসার অভাব থেকে। আমি অনেকদিন থেকে আশা করে' ছিলুম যে সেটা তোমার ভাঙবে, তোমার এই অভিমানের বিমুখতা। অন্যকে তুমি মারতে চেয়েছিলে তা দিয়ে, মেরেছিলে কেবল নিজেকেই। এ চলতে পারে না, আমি বুঝেছিলাম। নতুন কোনো সুর আসতেই হবে তোমার জীবনে। তোমাকে সহজ হ'তেই হবে, সত্যিকারের নম্রতায় আর বিনয়ে সহজ। আর তা শুধু তখনই হবে যখন তুমি ভালোবাসার স্পর্শ পেয়েছো। একবার যদি ভালোবাসার হাত তোমাকে স্পর্শ করে, তুমি আর কঠিন হ'য়ে থাকতে পারো না। তুমি তখন মাথা নিচু করবে, তুমি তখন চুপ করে' থাকবে ; জীবনের গভীর রহস্যের সামনে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়াবে। একটা সময় আছে, যখন আমরা নিজের ব্যক্তিত্বের মোহে অন্ধ হ'য়ে থাকি ; তার বাইরে কিছু দেখতে পাইনে ; তার বাইরে যা-কিছু, তাকেই ঘা দিতে চাই। কিন্তু তখন তোমার হবে সেই ব্যক্তিত্ব থেকে মুক্তি। তখন তুমি আর ঘা দিতে চাইবে না ; তখন তোমার মধ্যে আসবে ভালোবাসা ; তখন তুমি বুঝবে।'

'আর এটা কী, এই ভালোবাসা, তুমি যার কথা বলছো?'

'কী আবার। ভালোবাসা : সহজ, সজীব মানুষের ভালোবাসা। জানো না, কী?' তারপর হঠাৎ বাসব জিজ্ঞেস করলে :

'কাকে তুমি বিয়ে করছো?'

'তুমি চিনবে না তাকে।'

'ঠিক করে' ফেলেছো?'

'আমার মন আছে ঠিক। তার কথা এখনো পাইনি।'

বাসব মুহূর্তকাল কপিলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো :

'তোমার মুখে নতুন একটা আভা।'

'তুমি তা-ই কল্পনা করছো।'

'না, সত্যি, সত্যি।'

'কিন্তু তোমাকে বলতে পারি এটা ভালোবাসার ব্যাপার নয়।'

'কী করে' জানো?'

'তার সঙ্গে আমার আলাপ—খুব বেশি নয়।'

'আলাপ দিয়ে কি ভালোবাসা হয়?'

কপিল চুপ করে' রইলো।

'তুমি কি তাকে চাও?' বাসব হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে।

'চাই?' কপিল প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারলে না।

'তুমি কি তাকে চাও?' বাসব আবার বললে।

এইবার, তার গলার সুরে, অর্থটা বোঝা গেলো।

'হ্যাঁ, তাকে আমি চাই,' অত্যন্ত সহজভাবে কপিল বললে।

'এ নিয়ে তুমি খুব বেশি ভাবছো না তো?'

'না, ভাববার এতে কী আছে?'

'লোকে অদ্ভুত সব কথা বলবে। বলবে, বিয়ে করা মস্ত দায়িত্ব। আমরা যে বাঁচি সেটা কি একটা দায়িত্ব? বলো, সেটা কি একটা দায়িত্ব?'

কপিল নীরবে তার বন্ধুর দিকে তাকালো। বাসবের মুখে কয়েকটা রেখা, যেন এ-সব বলতে তার কষ্ট হচ্ছে। তবু, তাকে বলতেই হবে। কী যেন ঠেলে' উঠছে তার ভিতর থেকে।

'বলো, এই যে তুমি আর আমি এখানে বসে' কথা বলছি, এটা কি দায়িত্ব? পরস্পরে আমাদের যে-প্রয়োজন, তা কি দায়িত্ব? ভালোবাসা কি জড়ো করে' রাখবার, জমিয়ে তোলবার, ভারের মত সঙ্গে-সঙ্গে বয়ে' নিয়ে যাবার? লোকে বলবে, বিয়ে তো শুধু ভালোবাসা নয়। বিয়ে তবে কী? মানুষের সঙ্গে মানুষের সংস্পর্শ তা ছাড়া আর কী? লোকে বলবে, ভালোবাসা থাকে না। কিন্তু ভালোবাসা কি নষ্ট হ'তে পারে? তুমিই বলো, ভালোবাসা কি কখনো নষ্ট হ'তে পারে?'

বাসব আস্তে-আস্তে কথা বলছে, নরম সুরে, নিজের মনে-মনে যেন। হঠাৎ ফুটে উঠেছে তার মুখে সমস্ত দীর্ঘ দিনের ক্লান্তি। তার মাথার এক পাশ থেকে শিথিল চুলের গুচ্ছ নেমে এসেছে কপালের উপর। সাধারণত উজ্জ্বল, রক্তাভ তার মুখে যেন বেরিয়ে এসেছে অত্যন্ত সঙ্গোপন, অত্যন্ত সযত্নে লুকোনো একটা ম্লানতা।

'লোকে তোমাকে ভালোবাসা সম্বন্ধে সাবধান করে' দিতে আসবে। বলবে, হৃদয়কে বিশ্বাস কোরো না। হৃদয়কে বিশ্বাস করবো না, আমার রক্তের স্পন্দনকে বিশ্বাস করবো না, আর বিশ্বাস করবো তোমাদের কথা! তাদের মনে কেবল ভয়, বুঝি ভুল করলুম, বুঝি এ থাকবে না। তারা সব ক'টা আঙুল দিয়ে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে' রাখতে চায় ; আর তবু যখন আঙুলের ফাঁক দিয়ে খসে' পড়ে, দোষ দেয় ভালোবাসার। বলে, ভালোবাসা একটা বিলাসিতা ; অনেক আড়ালে, অনেক যত্নে রাখতে পারলে তবে তা বাঁচে, অত সময় আমাদের কই? কিন্তু ভালোবাসা কি হীরের একটা টুকরো যে তাকে অনেক যত্নে আড়াল করে' রাখবে? তা একটা স্রোত, জীবনের সঙ্গে তা মিশে যায়। আদরে আর বিরোধে, তিক্ততায় আর আনন্দে তা বয়ে' চলে, তা বয়ে' চলে ; জীবনের ঢেউ তাকে ঠেলে নিয়ে যায় ; সংঘর্ষে তা নতুন হ'য়ে ওঠে ; বছরের পর বছরের বাঁচার ভিতর দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ করে' তোলে। তা আলাদা করে' রাখবার, আড়ালে লুকিয়ে রাখবার জিনিস নয় : তাকে অর্জন করতে হবে এই জীবনে, যেখানে ক্লান্তি, যেখানে গ্লানি, যেখানে উৎসবের মধুরতা। সেখানেই মিথ্যা, যেখানে আমরা তাকে 'পবিত্র' বলে' জানি ; কেবল উৎসবের, কেবল সৌগন্ধের। সব সময় মনে থাকে ভয়, বুঝি একটু মলিনতা লাগলো তার গায়ে। দারিদ্র্যের সঙ্গে, কোনোরকম কুশ্রীতার সঙ্গে, কোনো বেসুরের সঙ্গে তাকে দেখতে পারিনে। এই বুঝি গেলো! এই বুঝি গেলো! একে আমরা বলি ভালোবাসার দায়িত্ব—আমরা যারা উন্নত, যারা মার্জিত, সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তিসম্পন্ন। আর সঙ্গে-সঙ্গে অবিশ্যি ভালোবাসা মরে যায়। কী করে' তা বাঁচতে পারে যদি তা না হয় স্রোত : যদি জীবনের ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে তা বয়ে' না চলে? জীবনের মূল উৎসে যদি তা সঞ্চারিত না-হ'লো, তাহ'লে তা বার-বার নতুন করে' নিজেকে সৃষ্টি করবে কোন্ শক্তিতে? যারা বলে ভালোবাসা থাকে না, তারা জানে না এই রহস্য। ভালোবাসা থাকে, হয়-তো তার বাইরের রূপ বদলায়। আর বয়েস যত বাড়তে থাকে, আমরা পরস্পরের মধ্যে পাই উষ্ণতা, পাই স্নেহ, পাই শান্তি। অনেক বিক্ষোভ, অনেক সংগ্রামের পরই তা আসে, স্নেহের সেই শান্তি। সেটা

প্রয়োজন ; আর সেইজন্য সেই বিক্ষোভ আর সংগ্রামও প্রয়োজন। ভালোবাসা বিলাসিতা নয়, সেটা প্রয়োজন, জীবনের প্রয়োজন। যত দিন যাচ্ছে, ততই আমি সেটা উপলব্ধি করছি। এমন ভয়ঙ্কর এই প্রয়োজন কে জানতো!'

বাসব এক হাত দিয়ে ঢাকলে তার মুখ। কয়েক মুহূর্ত নিঃস্পন্দ স্তব্ধতা। তারপর সে সরিয়ে নিলে হাত, উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে।

'রাত বাড়ছে', বাসব বললে।

চার

কী ভয়ানক, রাস্তায় বেরিয়ে কপিল বললে।

বাইরে, রাত্রির রঙিন ভিড়। নগর কথা বলছে, প্রলাপ বকছে। আগাছার মত, ভেসে-চলা সমুদ্রের-লতার মত পুরুষ আর মেয়ে—দাঁড়িয়ে আছে, হেঁটে যাচ্ছে, চীৎকার করছে, হাত-পা নাড়ছে। সমস্ত দিন ওরা কোথায় থাকে—আর রাত বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে কোথা থেকে উঠে আসে, মাটির তলা থেকে যেন। দুঃস্বপ্ন। দুঃস্বপ্নের অবাস্তবতা এদের মুখে। এরা রাত্রির জীব, নগরের রঙিন রাত্রির ; নগরের অবাস্তব, উন্মত্ত নিশীথের এরা। ভোরের আলোর সঙ্গে-সঙ্গে এরা মিলিয়ে যায় ; আর তবু—শূন্য রাস্তাও যেন এদের আতঙ্ক ভুলতে পারে না।

কী ভয়ানক, কপিল আবার বললে।

তাদের দিকে সে তাকিয়ে রইলো। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে অনেক মশাল নিয়ে মিছিল চলে' গেলো, দেয়ালে দীর্ঘ, কালো ছায়া ফেলে'—এরা সেইরকম। সেই অস্পষ্ট, অদ্ভুত ছায়ার মত। দ্রুত এদের গতি, দেয়ালের গায়ে দ্রুত বিসর্পিত ছায়া। আর যে-আলো এদের মুখে পড়েছে তা ধোঁয়ায় ভরা ; থেকে-থেকে অস্থির, পাটল নৃত্যে তা লাফিয়ে উঠছে।

আর তারই ভিতর দিয়ে কপিলের বাস্ চলেছে। এক কোণে বসে' সে চোখ বুজলো। একটা বাড়ির ভিতর থেকে স্ত্রীকণ্ঠের বিহ্বল, বিলোল হাসির শব্দ তার কানে এসে লাগলো। কিন্তু এ-ই তো জীবন। একেবারে কাঁচা, খোসা ছাড়ানো জীবন। এই বিস্রস্ত, বিশৃঙ্খল মেয়ে আর পুরুষের মিছিল। এই উন্মত্ততা। এই শূন্যতা।

জীবনকে জানতে হয়, লোকে বলে। সমস্ত দিক থেকে জীবনকে জানতে হয়। কিন্তু তা আরম্ভ করবো কোনখান থেকে? নগরের এই রঙিন রাত্রি থেকে কি? আমাকেও কি হ'তে হবে দেয়ালের উপর একটা অস্থির, অদ্ভুত ছায়া? তাহ'লে, আর-কিছু না হোক্, জানবার তৃপ্তি তো পাবো।

কিন্তু সব কি আমরা জানতে পারি? যতটুকু আমরা জানতে পারবো, আমাদের জন্ম-গত স্বভাব কি তার সীমা টেনে দেয় না? তার উপর কোনো হাত নেই আমাদের। আমার মধ্যে যা নেই, আমার বিশ্বে তা নেই। শুধু সেটুকু আমি জানতে পারি, আমার নিজের মধ্যে যা আছে। বাইরে থেকে, জোর করে' যে-জানা, সেটা ভুল, সেটা মিথ্যা। তাতে কেবল নিজের ক্ষয়।

এই রাত্রি আমার নয়, কপিল মনে-মনে বললে, ছায়ার আর পাটল আলোয় জালি-কাটা এই নগর-রাত্রি। একে আমি কেবল দূরে থেকে দেখতে পারি, দেখে সরে' যেতে পারি। এ যদি জীবন হয়, আমার জীবন তা নয়। তার ভালো লাগলো যে বাস্ এরই মধ্যে রাত্রির কেন্দ্র পার হ'য়ে অপেক্ষাকৃত শান্ত রাস্তায় এসে পড়েছে।

আর তবু—আমার কী? আমরাও তো দেয়ালের গায়ে অদ্ভুত কালো ছায়া, মশালের আলোয় নাচছি? বাসব—সে কী? শুধু তার পটভূমিকা আলাদা। হয়-তো সেখানকার রঙের বিন্যাস একটু অন্যরকম। কিন্তু একই তো।

সেখানেও তো এই অবাস্তবতা, এই উন্মত্ততা, এই শূন্যতা।

কিন্তু এরা কাঁদে না, এই রাত্রির যারা জীব, এরা কথা বলে না। এরই মধ্যে এরা জন্মেছে, এর বাইরে কিছু এরা জানে না। এরা কাঁদে না, এরা ভাবে না। এরা কেবল দেয়ালের উপর মুহূর্তের ছায়া-চিহ্ন, প্রতি রাত্রে ফুটে ওঠে, প্রতি প্রভাতে মুছে যায়।

তা নয় বাসব। যদি সে হয় দেয়ালের উপর ছায়া, তাহ'লে যে-আলো সেই ছায়া ফেলেছে সেই আলোও সে। এ তো তারই আত্ম-প্রসারণ—তারই সেই ছায়ামূর্তি। নিজের কাছ থেকে সে পালাতে চায়, নিজের আলো থেকে। তার আলোর আড়াল থেকে সে দেখছে, তাকে দেখতে হচ্ছে দেয়ালের উপর তারা ছায়া-নাচ। আর কী যন্ত্রণা, নিজের ভিতরে এই দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে যাবার কী যন্ত্রণা!

ভালোবাসবার প্রয়োজন। ভালোবাসা পাবার প্রয়োজন। কী অদ্ভুত এই প্রয়োজন, কী নিষ্ঠুর। তা মেটাতেই হবে। অথচ কী করে' তাকে পাওয়া যাবে কেউ জানে না। কেবল ঈশ্বর পারেন ফুল ফোটাতে। আমরা শুধু চুপ করে' বসে' থাকতে পারি।

আর যদি তা কখনো না-আসে? যদি তাকে পাওয়া না-যায়? তাহ'লে সেই অপরিসীম অভাব নিয়েই বাঁচতে হবে, তবু বাঁচতে হবে। কোনো উপায় নেই, কিছু করবার নেই। সমস্ত বাসনা, সমস্ত উত্তপ্ত উৎসুকতা শূন্যতায় ঝরে' পড়বে, মিলিয়ে যাবে। কী অপচয়, কী ভয়াবহ নিষ্ফলতা।

মিনুর ছোট, উষ্ণ হাতের স্পর্শ তার মনে ফিরে এলো, সেই স্পর্শ যেন এখনো রয়েছে তার হাতে। সেখানে যেন জ্বলছে সদ্যোজাত, স্বাধীন কোনো প্রাণ, যেখানে সে তাকে স্পর্শ করেছিলো। এ-ই কি ভালোবাসা?

কিন্তু এটা ঠিক যে কপিলের জীবনে নতুন সুর এসেছে। সে জেগে উঠেছে নতুন একটা অনুভূতিতে। এ আমি কখনো জানিনি, মনে-মনে সে বললে। এই অদ্ভুত প্রয়োজন, আর এই ব্যথা! কে জানতো ভালোবাসার এমন অসীম ক্ষমতা আমার মধ্যে রয়েছে। আমি যে এত ভালোবাসতে পারি তা কি আমিই জানতুম!

আর এর পর—ভাগ্য এ নিয়ে কী করবে? সেই সার্থকতা কি আসবে? না কি, আস্তে-আস্তে, অলক্ষিতে, সময়ের সঙ্কীর্ণ আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে এ ঝরে' পড়বে শূন্যতায়, নিঃশেষ হ'য়ে যাবে নিষ্ফলতায়?

যদি তা-ই হয়? ওকে যদি হারিয়ে ফেলতে হয় সময়ের অন্ধকার গলিতে? আর কপিলের হৃৎপিণ্ড হঠাৎ যন্ত্রণায় মুচড়িয়ে উঠলো, সেই কথা ভেবে।

আর মুহূর্তে সে উপলব্ধি করলে বাসবের মনের ভীষণ, বিশাল হতাশা। তার মত এমনি প্রশ্ন সে অনেক হয়-তো করেছে মনে-মনে। আজকাল আর করে না। তবু—এমনি করে' তারও হৃৎপিণ্ড হাঁপায়, ভেঙে পড়তে চায়। কী করে' সইছে সে? কিন্তু সইতেই হবে, সইতেই হবে। আর বাসবের ভিতর থেকে তা ঠেলে ওঠে, মাথা খুঁড়ে মরে—আর ঐ তো সে, অনেক লোকের, অনেক কথার নিঃসাড়তার মধ্যে। সে পেয়েছে তার নেশা, যাতে সে আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকতে পারে তখনকার মত। তার এই বাইরের জীবন—তাকে নিজের চারিদিকে বুনে নিয়েছে বর্মের মত। বাঁচতে হবে তো।

কিন্তু সে, কপিল—বাইরের জীবনের এই নেশাও তার নেই। কী আছে তার? তার কি আর্ট? তার কি ঈশ্বর? বজ্রের মত ভয়ঙ্কর বাণী কি তার? সে ভেবে দেখলে। সে ভেবেছিলো তপস্বীর মত কাটবে তার জীবন, নিজের মধ্যে আবদ্ধ। কী মূঢ়তা, কী অন্ধ মূঢ়তা। নিজেকে কেবলই ফেনিয়ে-ফেনিয়ে পৃথিবীকে ভরে' তোলা। বইয়ের মধ্যে নিজেকে পড়া, আকাশের তারায় নিজেকে দেখা, কোনো মেয়ের উৎসুক, সানন্দ স্বরে নিজেকে শোনা। এই তো তোমার তপস্বীর জীবন! সে আরো ভেবে দেখলে। আর তার মনে হ'লো তার জন্য আর-কিছু নেই, আর-কিছু নেই ; শুধু আছে মিনুর নরম, উষ্ণ হাত।

সেই রাত্রে বাড়ি ফিরে সে কোনো কাজ নিয়ে বসলো না। বিছানায় শুয়ে তাকিয়ে রইলো অন্ধকারে। ঘুম তার একেবারেই পাচ্ছিলো না ; তবু যেন তার ভালোই লাগছিলো স্তব্ধ হ'য়ে শুয়ে থাকতে, অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে। আর চিরকাল এটা ছিলো তার জীবনের একটা আতঙ্ক—যদি বিছানায় শুয়ে ঘুম না আসে। কিন্তু আজ যেন আর এই অন্ধকারকে তার ভয় নেই, এই নিঃসঙ্গতাকে। কী যেন, এটা

ভালো লাগছে। কী ব্যথা, মিনুকে ছেড়ে এই চলে' আসা। তখন সে কিছু টের পায়নি ; কিন্তু এখন তার হৃৎপিণ্ড টন্‌টন্‌ করছে। আর তবু কেমন যেন তার ভালোও লাগছে—ভালো লাগছে এই রাত্রি, রাত্রিতে মিশে গিয়ে তার এই চুপ করে' শুয়ে থাকা।

পরের দিন তার কাজ ছিলো সহরে। সমস্তটা দুপুর তাকে কাটাতে হ'লো পয়সা করবে বলে' পণ করেছে এমন সব লোকের সঙ্গে পয়সার আলাপে। এ-রকম তাকে করতে হয় মাঝে-মাঝে। তখন সংসারের মোটা মোটা, স্যাঁৎসেঁতে আঙুলগুলো বেশ ভালো করে'ই লাগে তার গায়ে। কিন্তু গায়ে সে মাখে না। সেটা নেহাৎই তার বাইরের খোলস, যেখানে লাগে সংসারের চড়-চাপড়। তার ভিতরটা সব সময় অনুপস্থিত। আর ফেরবার সময়, সে-সমস্ত সে বাইরে রেখে আসে, বাড়ি পর্যন্ত বয়ে' নিয়ে আসে না—যদিও তখনকার মত মন হয়-তো খারাপ লেগেছিলো, হয়েছিলো রাগ।

একদিক থেকে, সে বুঝেছিলো, এটাই বাঁচবার উপায়। এই ভোলাবার ক্ষমতা, মনে না-করবার, মনে না-রাখবার ক্ষমতা। পৃথিবীর সমস্ত ছোটখাট আঁচড় আমাদের যেটুকু নেবার তা তো নিচ্ছেই ; তার উপরেও যদি তা নিয়ে আমরা ভাবতে যাই, তাহ'লে বাঁচবো কখন?

কিন্তু সেদিন সহরটাকে তার মনে হ'লো যে অতিকায় কুৎসিত একটা জন্তু, তারে-তারে, চাকায়-চাকায় সে ডাক ছাড়ছে, কাকে তেড়ে মারতে আসছে তৃপ্তিহীন, হিংস্র আক্রোশে, দাঁত দিয়ে তার গড়াচ্ছে ব্যস্ততার ফেনা। মানুষের নিজের হাতের সৃষ্টি, এই বীভৎস জন্তু। মানুষ তাকে দিয়েছে তার নিজের প্রাণের অংশ। মানুষের হাত তৈরি করেছিলো বাগান, তুলেছিলো মন্দির, তার আনন্দ ফুটেছিলো ফুলে, আকাশের দিকে উঠেছিলো তার পাথরের স্তব। কিন্তু তার শেষ কীর্তি তখনো বাকি ছিলো : আধুনিক কালের এই শহর, বাতাস যেখানে ভরে' গেছে যন্ত্রের চীৎকারে, আর ব্যবসার ঘূর্ণিস্রোতে মানুষ কুটোর মত ঘুরপাক খাচ্ছে। মানুষ একে তৈরী করলে নিজের হাতে, তারপর স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো নিজেই। ব্যবসার এই বিশাল, জটিল, সর্বব্যাপী চাকা, দারুণ বেগে তা ঘুরছে, অবিশ্রান্ত প্রদক্ষিণ করছে নিজেকে, কী করে' তা চলছে কেউ জানে না, কারো ক্ষমতা নেই তাকে থামাতে পারে। আর আমরা সবাই আটকা পড়েছি তার মধ্যে, সবাই, কেউ বাদ নেই ; তারই ঠেলায় তো আমরা ছিটকে পড়েছি এখান থেকে ওখানে ; ছটফট করছি, কাৎরাচ্ছি, গোঙাচ্ছি, তার চাপে রক্ত আমাদের শুকিয়ে গেলো। তারই ঠেলায়, কপিল ভাবলে, আমাকে আসতে হয়েছে এদের কাছে, এই সব লোক, মাকড়শার মত মানুষ, ব্যবসার সেই পরম চাকার মধ্যে ছোট-ছোট এক-একটি চাকা ; সেই বিরাট ঘূর্ণনের অংশ, কিন্তু এরাও ঘুরছে নিজেদের চারিদিকে, অবিশ্রান্ত। ধূসর মানুষ, কেশহীন, রক্তহীন, তাদের কোনো বয়েস নেই, তাদের সুখ নেই কি দুঃখ, তাদের হলদে চোখে শুধু লোভের ভীষণ একাগ্রতা। যীশুকে দোষ দিয়ে বলেছিলেন কবি : তোমার নিঃশ্বাসে পৃথিবী ধূসর হ'য়ে গেলো। কিন্তু সেই কবি যদি দেখতেন আজকের এই ব্যবসা ধূসর পৃথিবী, যীশুকে ক্ষমা করতে পারতেন তিনি। এদের প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সঙ্গে আকাশের রঙ একটু করে' মুছে যাচ্ছে। উচিত নয় এদেরকে নিঃশ্বাস ফেলতে দেয়া। আর তবু, কপিল ভাবলে, এরাই খুব সহজে, নিশ্চিন্ত আরামে নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে ; আর আমাকেই এসে বসে' থাকতে হচ্ছে এদের কাছে, যাতে নিঃশ্বাস ফেলবার পবিত্র অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'তে না হয়। লোভ, লোভ ; সেই বিরাট, নিদারুণ চাকাকে যা ঘোরাচ্ছে তা লোভ ; এই মানুষদের হলদে, শক্ত দৃষ্টিতে লোভ, লোভ , আর এদের শক্ত একটানা কণ্ঠস্বরে লোভ, লোভ। কপিল তা বরাবর জেনে এসেছে, তবু আজ যেন সে তা নতুন করে' উপলব্ধি করলে। আর তার সমস্ত জঠর যেন নিজেকে উগ্‌রে ফেলতে চাইলো, বিতৃষ্ণায়। কেমন করে', যেন তার নাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে ব্যবসার এই জটিল জালের একটা বিষাক্ত সুতো, তাকে উগ্‌রে ফেলতে হবে।

আর যখন সব কাজ তার শেষ হ'লো, তার মনে হ'লো সমস্ত শরীরে আর মনে এমন ক্লান্ত জীবনে কখনো তার লাগেনি। পরিষ্কার দিনের আলোয় এই সহরের দিকে সে যেন তাকাতে পারছে না। সূর্য আর তত উজ্জ্বল নয়, মানুষের লোভ তার মুখ ঢেকেছে। আমাকে যেতেই হবে, সে ভাবলে, এখান থেকে আমাকে চলে' যেতেই হবে। আমাকে যেতে হবে সূর্যের আরো কাছে।

সে ব্যবস্থা করে' ফেললো দু' একদিনের মধ্যেই। তারপর কলকাতা ছেড়ে চলে' এলো সাঁওতাল পরগনার এক ছোট্ট শহরে, যেখানে মানুষের সব চেয়ে বড় উত্তেজনা এই যে রাত্তিরে রেলের লাইন দিয়ে নীল-আলো-জ্বালা মস্ত ডাকগাড়ি ছুটে যায়। সেখানে সে নিলে ছোট একটা বাড়ি, কিছুদিন থাকবে বলে'। একেবারে একা ; একটা লোক শুধু আছে, সে রেঁধে দেয়। বড় ভালো লাগলো তার যে এখানে সকালবেলা উঠেই খবরের কাগজের মুখ দেখতে হয় না।

আর তার মনে নামলো শান্তি। এখানে আকাশ আছে। এখানে আকাশ সমস্ত পৃথিবী ভরে' ছড়িয়ে আছে। এক পা চললেই যেন আকাশের উপর হোঁচট খেয়ে পড়তে হয়। যে-কোনো দিকে তাকালেই আকাশের উপর চোখ গিয়ে পড়ে। আর এত ভালো লাগে, আকাশের দিকে চুপ করে' তাকিয়ে থাকতে এত ভালো লাগে। প্রথম কয়েকদিন, কপিল তা ছাড়া আর কিছুই প্রায় করলে না।

আর আকাশে তার আত্মা ভরে' উঠলো—কোনো দুর্লভ, স্বচ্ছ সুরায় স্ফটিকপাত্র যেমন ভরে' উঠতে পারে। এমন নীল কতদিন সে দেখেনি। সকালবেলায় ম্লান, নতুন সূর্যের জ্যোতিতে অস্পষ্ট। আর দুপুরবেলায়, সূর্যের আলো যখন সব দিকে সমান হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ে, সমস্ত আকাশ একটা বিশাল, অখণ্ড নীলার মত জ্বলে' ওঠে। বিশ্বাস হয় না, এত নীল। সূর্য নামে পশ্চিমে, বিকেলের আকাশ নরম, সমস্ত দিনের পর অলস-হ'য়ে-আসা যেন। লাল সূর্য আগুনের একটা নীড় হ'য়ে ওঠে, দিগন্তে ডুবে যায় ; আকাশের চোখে যেন ঘোর লাগে। কোথায় একটু লালচে আভা ; ক্লান্ত, আহত দিনের রক্তস্রোতে অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে। তারপর অন্ধকার। বিস্ময়ে কপিলের নিঃশ্বাস আটকে যায় ; কী অদ্ভুত সত্যিকারের এই অন্ধকার। যেন হঠাৎ কালো একটা সমুদ্র উথলে উঠলো—দিগন্তকে নিয়ে গেলো ভাসিয়ে। আব সেই অন্ধকার ভরে' সমস্ত আকাশ যেন তারায়-তারায় গান করে' ওঠে।

প্রথম গ্রীষ্ম—দুপুরবেলায় হাওয়া তেতে ওঠে। গাছগুলো তাদেরর সমস্ত পাতা ঝরিয়ে দিয়েছিলো, এইবার নতুন করে' ভরে' উঠেছে। কোনো-কোনো গাছ এখনো নগ্ন, প্রতীক্ষায় স্তব্ধ। হাওয়ায ওঠে শুকনো, হলদে পাতাব ঘূর্ণি ; কাঠবিড়ালি খামকা চমকে উঠে ছুটে যায়। লাল রাস্তা দিয়ে যায় গোরুর গাড়ি, নেংটি-পরা ছোট ছেলে চুপ করে' দাঁড়িয়ে তা-ই দেখে।

শুধু এ-ই। এ-ই নিয়ে সমস্ত দিন, সেই আকাশের মাঝখানে। দিগন্তে ঘন-নীল রেখা, সকালবেলায় কান্নার চোখের মত ছলোছলো। পাখিরা চ্যাঁচামেচি করে নতুন আলোয় ; আর বিকেলেব ছায়া যখন দীর্ঘ হ'য়ে আসে, তাদের ডানা-ঝাপটানির শব্দে আকাশ ভরে' যায়। গোরুরা তাকিয়ে থাকে ঘুমে-ভরা চোখে। হাওয়ায় শিরশির করে' ওঠে গাছগুলো।

শুধু এ-ই। এ-ই নিয়ে সমস্ত দিন। আর রাত্রি ভরে' অন্ধকার, আর তারা। আর আছে সেই সব চাঁদের রাত্রি, চাঁদ যখন বুকের উপর এসে লুটিয়ে পড়ে। কখনো সে ক্ষীণ আর বাঁকা, কোনোরকম করে' আকাশকে আঁকড়ে রয়েছে যেন, তবু সে আমাদের রক্তকে টেনে তুলতে চায়। আর আছে জ্যোছনাব বন্যার রাত্রি ; এত জ্যোছনা, চাঁদ নিজেই হারিয়ে যায় তার মধ্যে। তারপর কৃষ্ণপক্ষ : হঠাৎ মাঝ-রাতে লাল হ'য়ে ভাঙা চাঁদ উঠলো, মাঠের বুকে অদ্ভুত সব ছায়া উঠলো লাফিয়ে। কিন্তু সব সময়, যে-কোনো অবস্থায়, বুকের উপর এসে সে ধাক্কা মারে, রক্তকে টেনে তোলে তার দিকে, যেন জোয়ারের উচ্ছ্বাসে।

এখানে তারা অনেক কাছে—আকাশ, আর আকাশের চাঁদ আর তারা—এখানে তারা জীবন্ত। এখানে তারা দরজায় এসে ভিড় করে। ঘা দেয় বুকে। এখানে তারা সমস্ত জীবনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ; মিশে যায় রক্তে। এখানে তারা বলে।

কী বলে? কপিল তা বোঝে না, বুঝতে চায়ও না। শুধু তার মনে হয়, কী যেন সে পেয়েছে, এতদিন পরে কী যেন সে ফিরে পেয়েছে। আর এক-এক রাত্রে, যখন তার সাদা বিছানায় জ্যোছনা লুটিয়ে পড়ে, তার চোখ জলে ভরে' ওঠে, সেইদিকে তাকিয়ে।

আব এখানে পৃথিবীতে যে-স্তব্ধতা, তা এলো তার মনেও। সে স্বচ্ছ, স্তব্ধ একটা দিঘির মত হ'য়ে উঠলো, যেখানে আকাশ প্রতিফলিত। এখন পড়বার সময় ; কাব্যের রহস্যের আর রোমাঞ্চের। কলকাতা থেকে সে আনালে বই। কখনো সে পড়ে, কখনো সে চুপ করে' বসে' থাকে : কখনো নিজে একটু

লেখে; কখনো কলম রেখে দিয়ে বসে'-বসে' ভাবে।

পাঁচ

এক সাঁওতাল মেয়ে ইঁদারা থেকে তার স্নানের জল তোলে, বাসন মাজে ; তার দীর্ঘ, সবল বাহুর কালো রঙ্ রোদে চিক্‌চিক্ করে। একদিন সে কপিলের চোখে পড়লো।

বাড়ির সামনে অনেকখানি ফাঁকা জমি ; সেখানে বিকেলবেলায় সে শুকনো পাতা আর কাঠের কুচি কুড়োচ্ছে, বাড়ি নিয়ে যাবে বলে'। তার পরনের কাপড় কুসুম ফুল দিয়ে হলদে রঙ করা। আঁচল কোমরে জড়ানো। সবগুলো এক জায়গায় সে জড়ো করলে, তারপর আঁচলে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

একটু দূরে কপিল ছিলো দাঁড়িয়ে ; তাকে দেখেই মেয়েটা চোখ নামিয়ে নিলে। তারপর তার ফুলে'-ওঠা আঁচলটা শক্ত করে' বেঁধে নিয়ে বিকেলের আলোর ভিতর দিয়ে মাঠ পার হ'য়ে চলে গেলো।

পরের দিনও সে অমনি যখন পাতা কুড়োচ্ছে, কপিল এগিয়ে এলো তার কাছে। মেয়েটা চোখের কোণ থেকে তাকে দেখলে ; তারপর কোমর থেকে আনত তার শরীর সোজা করে' তুলে দাঁড়ালো।

কপিল জিজ্ঞেস করলে, 'রোজ-রোজ পাতা নাও কেন?'

মেয়েটা ভুরু বাঁকিয়ে তার সাঁওতালি বাঙলায় বললে, 'এ-সব পাতা দিয়ে আর কী হবে? তবে তুমি যদি রাগ করো আর নেবো না।'

কপিল মনে-মনে হাসলো। এই সমস্ত পাতা, ঝরে'-পড়া ডালের ছোট্ট কুচিটুকু পর্যন্ত তার। সে ভাড়া দেয়। তার অধিকারের মধ্যে সমস্ত। আর এই সাঁওতাল মেয়েও তা জানে।

'এ-সব দিয়ে কী করো?' সে আবার জিজ্ঞেস করলে, তার কণ্ঠস্বরে সাঁওতালি সুর আনবার চেষ্টা করে'।

'আগুন জ্বলে। রান্না হয়।'

মেয়েটা নির্ভীক চোখে কপিলের দিকে তাকালো। তার জট-বাঁধা চুল তেলের অভাবে লালচে। তার মুখের ছাঁদ সুশ্রী নয় ; কিন্তু তার দীর্ঘ, দৃঢ় শরীর নিখুঁত আয়নার মত নিটোল।

কপিল জিজ্ঞেস করলে, 'তোমাব নাম কী?'

একটু চুপ করে' থেকে মেয়েটা বললে, 'ঝমর।'

'ঝমর?' কপিল ঠিক ধরতে পারলে না প্রথমটায়।

'ঝমর।—পাতা নেবো?' একটু পরে, একটু উদ্বিগ্ন স্বরে মেয়েটা জিজ্ঞেস করলে।

'নাও না।'

ঝমর আবার নিচু হ'য়ে কুড়োতে আরম্ভ করলো। তার পিঠের বাঁকা বেখা বিকেলের আকাশের নিচে স্পষ্ট আর তীক্ষ্ণ। কপিল একটু তাকিয়ে রইলো, তারপর আস্তে-আস্তে ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

আর-একদিন সকালে সে তাকে দেখলে, মস্ত ধামা মাথায় চাপিয়ে তার স্নানের জল এনে রাখছে। তার দুই দীর্ঘ, কালো হাত উপরের দিকে তোলা, শক্ত আঙুলগুলো ধামার ধার আঁকড়ে রয়েছে। শ্রমের চাপে চোখের দৃষ্টি তার স্থির। কপিল বারান্দায় বসে' ছিলো ; সে তার পাশ দিয়ে, তাকে পার হ'য়ে গেলো স্নানের ঘরে, তার দেখলেই না যেন। কোমর বাঁকিয়ে সে ধামা নামালে, তাবপর স্নানের টবে ছলছলিয়ে ঢাললে জল। দূর থেকে কপিল অস্পষ্ট দেখলে। সে ফিরে এলো, হাতে তার শূন্য ধামাটা ঝোলানো: গেলো বাইরে ইঁদারার ধারে ; দড়ি-বাঁধা বালতিতে করে' জল টেনে-টেনে ধামা ভরলো ; একটু থমকে দম বন্ধ করে' সেটা তুলে নিলে মাথায় ; তারপর আবার গেলো কপিলকে পার হ'য়ে স্নানের ঘরে।

কপিল চুপ করে' তাকিয়ে দেখলে। এই শান্ত, উজ্জ্বল সকালবেলার সঙ্গে এই কালো মেয়ের অঙ্গ-চালনার ভঙ্গির কোথায় একটা মিল ছিলো যেন।

বিধাতা এর শরীরে সুষমা দেননি। যে-সুষমা প্রতি অঙ্গের পারস্পরিক ছন্দে, যে-লাবণ্য মুখের লক্ষ সূক্ষ্ম ভাবনার ঢেউ-খেলানোয়, তা থেকে এ বঞ্চিত। কেননা সেটা মানুষের সৃষ্টি। সেটা মানুষের নিভৃত অবসরের রচনা। একদিন কোনো মেয়ে আয়নায় তার মুখ দেখেছে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ; একটি অলক খসে' পড়েছে কপালের উপর—তা সরাতে গিয়ে বাহুর এক অপরূপ ভঙ্গি সে আবিষ্কার করেছে। আর-একদিন কোনো পুরুষ তা দেখে মুগ্ধ হয়েছে : সে-কথা বলেছে তার কানে-কানে। এমনি করে' শরীরের সুষমা আমরা তৈরি করেছি—হাজার দিনের ভিতর দিয়ে, হাজার ভাঙা মুহূর্তে, হাজার আলস্যের স্বপ্নে। সে-সুষমা আছে বন্য পশুতে, কিন্তু যে-মানুষ সভ্যতার দৌড়ে একেবারেই পেছিয়ে আছে তার মধ্যে নেই। অন্তত আমাদের চোখে তা লাগে না।

কিন্তু এই মেয়ের শরীরের সবল, নির্ভীক গতির রেখা—তাতে কী আছে, যা প্রায় সৌন্দর্যের মত। যখন সে স্থির হ'য়ে থাকে, তাকে মনে হয় একতাল কাদা, এখনো ঈশ্বরের আঙুল তাকে স্পর্শ করেনি। কিন্তু যখন সে চলে, যখন সে কাজ করে, যখন সে দড়ি টেনে-টেনে ইঁদারা থেকে জল তোলে—তখন তার দেহ-রচনারর কুশ্রীতাকে ছাড়িয়ে অন্য-কিছু বেরিয়ে আসে—কাজের মধ্যে সে এমন আত্ম-অচেতন; তার বাহুর, তার আঙুলের, তার সমস্ত অঙ্গের নিঃশব্দ গতি-রেখা এমন স্বতঃস্ফূর্ত স্রোতে ঝরে' পড়ে তার চারদিকে। এ তো প্রায় সৌন্দর্য, এই স্তব্ধ সূর্যালোকে তার কাজের নিঃশব্দ গতি-রেখা।

কোনো অভিযোগ এর নেই। সহজে এ কাজ করে, সব সময় এ কাজ করে, নদী যেমন তার নিজের জল বয়ে' নিয়ে-নিয়ে যায়। কখনো বলে না, 'উঃ, মরে' গেলুম।' কখনো মনে আনে না, 'আর পারিনে।' এ তার রক্তের মধ্যে মিশে গেছে—এই কাজ। যখন অন্যের কাজ শেষ হয়, তখন সে তার নিজের কাজ নিজে তৈরি করে' নেয়। শালের পাতা দিয়ে ঠোঙা—তৈরি করে। আর পুরোনো কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে-ছিঁড়ে চুল বাঁধবার দড়ি। কোথা থেকে খুঁজে-খুঁজে কী সব ফুল আর লতা জোগাড় করে' আনে কাপড়ে রঙ করবে বলে'। সব সময় সে কাজ করছে—যদিও সে তা জানে না।

কাজ তো এমনি হওয়া উচিত। কাজকে যখন ভার হ'য়ে উঠতে দিই, তখনই তো আমরা মরি। আর তাই, আমাদের সভ্য জীবন দীর্ঘ একটা চীৎকার হ'য়ে উঠছে . আর পারিনে। আর পারিনে। এতটুকু কাজ আমরা করবো না, একবার প্রতিবাদ না-করে'। আমাদের মেয়েরা সংসারের সব কাজই হয়-তো করে, কিন্তু তাদের মুখ থেকে এ-কথা কখনো মিলোয় না : মরে' গেলুম, আর পারিনে। আর তাই, ও-সব কাজ তাদের অবিশ্যি করা উচিত নয়, কখনো করা উচিত নয়। শূন্যতায়, শূন্যতায় তারা পচে' থাক, তবু যেন তারা কাজ না করে।

আর আমরা পুরুষরা সমস্ত দিন ভরে' ছুটোছুটি করি, ছটফট করি, প্রতি মুহূর্তে ভাগ্যকে আমরা শাপ দিই, নিজের জীবনকে ছিঁড়ে ফেলতে চাই কুচি-কুচি করে'—আর এমন ক্লান্তি, এমন বিতৃষ্ণা নিয়ে বাড়ি ফিরি যে আর-কিছু তখন আমাদের করবার থাকে না। বাকি সময়টুকু আমরা মৃত। তাই যদি হয় তবে ফেলে দাও কাজ, দু'হাতে তুলে নিয়ে আছড়ে ভেঙে ফেলো। আর তাতে যদি সভ্যতা থেমে যেতে হয়, মানুষকে লুপ্ত হ'তে হয় পৃথিবী থেকে, তা-ই হোক্ : তাতে কিছু এসে যায় না।

কেননা এটা সত্যি যে প্রত্যেক মানুষেরই কাজ করা উচিত। তা ছাড়া কী আমরা করতে পারি? কিন্তু সে-কাজ যেন মিশে যায় আমাদের রক্তের মধ্যে ; কাজ যখন করছি তখনও যেন তাকে ভুলে' থাকতে পারি। তা যেন আমাদের নিজেদের বাইরে কিছু না হয়, বাইরে থেকে চাপানো ; তা যেন আমাদের পেয়ে না বসে দানোর মত, চুল ধরে' আমাদের টেনে নিয়ে না যায় কাজের কুৎসিত উন্মত্ততায়।

সত্যিকারের যেটা কাজ, তার মূল আমাদেরই সত্তায় ; আমাদেরই মধ্যে তা বেড়ে ওঠে গাছের মত, ছড়িয়ে পড়ে উৎসুক শাখায় আর অজস্র নতুন পাতায় · আর সেই গাছ থেকে বেরিয়ে আসে ফুল, আর ফল আনন্দে রক্তিম—প্রাণে গুঞ্জিত এই গাছ, আনন্দে আর উৎসাহে মর্মরিত। মানুষ সৃষ্টি করে এই কাজ, এই কাজে সে নতুন হ'য়ে ওঠে। কাজ যদি তা না হয় ; কাজে যদি কেবল টাকাই বাড়ে, ফুল না ফোটে ; যদি তার একমাত্র ফল হয় মোটরগাড়ির সংখ্যাবৃদ্ধি—তাহ'লে পৃথিবীর সমস্ত

টাকা আর সমস্ত মোটরগাড়ি মিলেও আমাদের বাঁচাতে পারবে না।

আর কপিলের ভালো লাগলো এই সাঁওতাল মেয়ের তন্ময় আত্ম-অচেতন কাজ—সে, মানুষে ক্লান্ত, কথায় ক্লান্ত, সহরে ক্লান্ত।

এখানেও তো জীবন, সে ভাবলে। চিৎপুরের রাত্রি জীবনের একমাত্র রূপ নয়। বাসবের ভয়ঙ্কর হতাশা জীবনের একমাত্র জিনিস নয়। আরো আছে। অন্য-কিছুও আছে। কিন্তু তা আমাদের চোখেই পড়ে না; আর চোখে যে পড়ে না, তাও কেউ লক্ষ্য করিনে। সহরের রাত্রির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আতঙ্কে যখন চোখ বুজি, তখন আমার কানের কাছে এ কথা বলার লোক আছে : 'কী করছো? চেয়ে দ্যাখো, এ-ই তো জীবন।' কিন্তু যখন আকাশের দিকে একবার চোখ তুলে তাকাইনে ; লক্ষ্য করিনে ঘাসের উপর দিয়ে তীরের মত ছুটে-যাওয়া কাঠবিড়ালিকে, আর এই কাজে-নিঃশব্দ সাঁওতাল মেয়েকে, তখন কেউ আমাদের একবার বলবে না : 'দ্যাখো, চেয়ে দ্যাখো।'

আমার ভদ্রলোকের প্রবৃত্তি বলে, কপিল ভাবলে, 'মুখ ফেরাও, এই সাঁওতালনির দিক থেকে মুখ ফেরাও।' আমার সমস্ত শিক্ষা, শৈশব থেকে অর্জিত যত সংস্কার, সব আমাকে অন্ধ করে' রাখবে, নিঃসাড় করে' রাখবে। আমি যদি এখনো আমার নিজের ব্যক্তিত্বের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে থাকতুম, তাহ'লে কি একে কখনো চোখে পড়তো?

বাড়ির সামনে যে-ফাঁকা জমি, তারই এক কোণে কী করে' একটা বেলফুলের চারা লুকিয়ে ছিলো আগাছার জঙ্গলের মধ্যে : এক বিকেলে ঝমরকে দেখা গেলো, আগাছাগুলো হাত দিয়ে উপড়ে ফেলছে, তারপর সেই চারায় ঢালছে জল।

কপিল তার সামনে গিয়ে বললে, 'কী করছো?'

ঝমর চমকে ফিরে তাকালো, কাজের মধ্যে একটু থেমে বললে, 'ফুলের গাছ। বেলফুল।'

'গাছ কবে বড় হবে? কবে ফুটবে ফুল?'

'ফুটবে শিগগিরই। জল না-পেলে তো মরে'ই যাবে।' বলে' সে হাতের জলের ঝারিটা গাছের গোড়ার উপ্ড়োনো মাটির উপর খালি করে' দিলে। আবার বললে, 'আরো কয়েকটা চারা নিয়ে আসবো, বাবু?'

'এনো, যদি তোমার খুসি হয়।'

ঝমর একটু চুপ করে' রইলো। তারপর বললে : 'এত জায়গা রয়েছে পড়ে'—একটা বাগান করো না।'

'ফুলের?'

'একধারে ফুলের—মিঠে গন্ধ ছাড়বে রাতে। আর অন্যদিকে তরকারি, আর শাক নানারকমের—সকালবেলায় আমি তুলবো, তোমার চাকর রেঁধে দেবে।'

'তরকারির একটা ভাগ তুমি নেবে না?'

'তুমি যদি দাও।'

'তোমার বাড়ির সামনে ক্ষেত আছে বুঝি?'

'সে আর কতটুকু! তোমার এত জায়গা—ফেলে' রেখেছো কেন? তুমি যদি বলো, আমি সব করে' দিই।'

'কী হবে করে'? যদ্দিনে তোমার ফুল আর তরকারি দেখা দেবে, ততদিন কি আমি থাকবো?'

'বাবু, তুমি চলে' যাবে?'

'যাবো না?'

ঝমর একটু চুপ করে' রইলো।—'কবে যাবে?'

'দেরি আছে এখনো।'

ঝমর একটু হাসলো ; তার কালো রঙ চিরে ঝলসে উঠলো তার সাদা দাঁত।—'তাহ'লে ফুলের চারা লাগানো যায়, বেশি দেরি তো ওতে হবে না।'

কপিল তার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললে : 'বেশ তো, করো না।'

আর ঝমর কোথা থেকে সব ফুলের চারা নিয়ে এলো জুটিয়ে। সেই বেলের চারার কাছাকাছি সবটা জমি পরিষ্কার করে' সেগুলো সে দিলে পুঁতে। দু'বেলা সে জল দেয় ; জল দিয়ে তাকিয়ে থাকে। অন্য কাজের মধ্যে একটু ফাঁক পেলেই ছুটে এসে একবার দেখা যায়।

চারাগুলো চমৎকার বাড়তে লাগলো। আর কপিলও রোজ আসে, এসে দাঁড়ায় সেখানে ; দেখে, কতটুকু বাড়লো আর। আশ্চর্য, এই ছোট সব টুকরো—এরই মধ্যে নিবিড় শিকড়ে এরা দাঁড়িয়ে উঠেছে, এরই মধ্যে এদের গায়ে এসেছে প্রাণের সবুজ, স্নিগ্ধ আভা। এরা বাঁচাতে চায়, এদের প্রাণের উৎসাহ ফোটাতে চায় ফুলে-ফুলে। কী সহজে এরা বাঁচে—কী সহজে এরা মরে।

কপিল বলে : 'সবগুলোতে কি একই সময় ফুল ধরবে?'

'একই সময়ে।'

'কী হবে এত ফুল দিয়ে?'

'ফুল তোমার ভালো লাগে না?' ঝমর চোখ তুলে তাকালো।

'কিন্তু এত ফুল!'

কপিলের এ-কথাটা ঝমর ঠিক বুঝতে পারলে না। বললে, 'ফুল বড় ভালো।'

রোজ তাদের দেখা হয় একটু-আধটু। গোড়ার মাটি একটু খুঁড়ে ঝমর জল ঢালে। আর কপিলের এতো ভালো লাগে মাটির সেই ভিজে গন্ধ, আর গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ঝরে'-পড়া বিকেলের আলোর গোল-গোল সোনালি চাক্‌তি, আর চারাগুলোর গায়ে প্রাণের সবুজ আভা। এই সমস্তর সঙ্গে মিশিয়ে ঝমরকে সে দেখলে। ছোট-ছোট কথা হয়। বেশি কথা ঝমর বলে না ; আর কপিলের মনে যা আসে তা বলতে গেলে সে বুঝবে না। বেশির ভাগ সময়, ঝমর কাজ করে' যায়, আর কপিল চুপ করে' দেখে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। আর সত্যি, কথা বলবার কোনো দরকার নেই।

আর তাদেরও মধ্যে যেন একটা চারাগাছ বেড়ে উঠছে : অদৃশ্য, অন্ধকার একটা গাছ, তার অন্ধকার শিকড় সত্তার গোপনতম তন্তুতে জড়ানো—তেমনি উৎসুক, প্রাণের উৎসুকতায় তেমনি কাঁপছে।

তারপর একদিন কপিল তাকে নিলে। নিলে অত্যন্ত সহজে। বিনা দ্বিধায়, বিনা লজ্জায়, বিনা অহঙ্কারে। কিছু বলা হ'লো না—বলবাব কিছু ছিলো না। সেটা ঘটলো, কেউ বুঝতে পারলে না।

আর তার পর থেকে—সে যেন সব সময় রয়েছে কপিলের পিছনে, নিঃশব্দ, নিশ্চিত ; সব সময় যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে নিঃস্পন্দ চোখে। সে যেন জলের একটা স্রোত হ'য়ে তার ভিতর দিয়ে বয়ে' গেলো, তার মধ্যে মিশে গেলো। কপিল চেয়ে দেখলো অবাক হ'য়ে।

'আমাকে তোমার সঙ্গে কলকাতায় নিয়ে যাবে?'

'কী করবে তুমি সেখানে গিয়ে?'

'আমি তোমার সব কাজ করে' দেবো।'

'সেখানে কল দিয়ে জল পড়ে, সেখানে তো তুমি ইঁদারা থেকে জল টেনে তুলতে পারবে না। আর সেখানে আমার বাড়ির সামনে এতটুকু জমি নেই যে তুমি বাগান করতে পারো।'

'আমি তোমার বাসন মাজবো। তোমার ঘর ঝাঁট দিয়ে দেবো। তোমার কাপড় কেচে দেবো।'

'না, কলকাতায় গেলে তুমি বাঁচবে না।'

'চলো না আমাকে নিয়ে।'

কপিল আবার বললে, 'না, ওখানে গেলে তুমি বাঁচবে না।'

আর এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন, যখন চারাগুলো বেশ বড় হয়েছে, অথচ ফুল ফোটবার সময় হয়নি, বিকেলবেলায় ঝমরকে দেখা গেলো না। অথচ সকালবেলায় ঠিক সময়ে সে এসেছিলো। তার চাকর কপিলকে এসে বললে যে ঝমর রান্নাঘরের পাশের ছোট কুঠুরিটায় মেঝের উপর পড়ে' ঘুমুচ্ছে।

কপিল গিয়ে দেখলো ঝমর পড়ে' রয়েছে জ্বরের ঘোরে। শরীর পুড়ে যাচ্ছে। কয়েকবার ডাকাডাকির পর সে একটু চোখ খুললো, কিন্তু তার সে-চোখ থেকে দৃষ্টি মুছে গেছে।

কপিল তাকে নিয়ে এলো তার নিজের ঘরে। বসলো তার শিয়রে। মনে-মনে ভাবলে : ওর একবার চোখ খোলা উচিত, একবার আমাকে চেনা উচিত, একবার একটা কথা বলা উচিত। কিন্তু ঝমর পড়ে' রইলো নিশ্চল, মূর্চ্ছায় আচ্ছন্ন।

ডাক্তার এসে মাথা নেড়ে চলে' গেলো। এ-রকম জ্বর এ-অঞ্চলে খুব কম হয়, কিন্তু হ'লে কোনো আশা নেই। হাতের কাছে বরফ থাকলে বরফ দেয়া যেতো মাথায়, কিন্তু তা যখন নেই, আপনি বরং একটু ঘুমিয়ে নিন্।

আর তাই কপিল জেগে বসে রইলো' সমস্ত রাত, আর সমস্ত রাত ঝমর মুখের ভিতর দিয়ে ভারি, সশব্দ নিঃশ্বাস টেনে নিলে। কখনো কপিল একটু হাওয়া করে মাথায়, কখনো একটু জল দেয় মুখে; কিন্তু মনে-মনে সে জানে যে কিছু করবার নেই। কিছু সে করতে পারে না। ও আমার চোখের উপর মরছে, আর এমন কিছু নেই, কিছু নেই, যা আমি করতে পারি।

ভোরের দিকে ঝমরের গলার ভিতর আরম্ভ হ'লো মৃত্যুর ঘর্ঘর। তার সমস্ত শরীর শেষ নিশ্চেতন যন্ত্রণায় মুচড়িয়ে মুচড়িয়ে উঠতে লাগলো। আর হঠাৎ তার চোখ খুলে গেলো, ভীষণভাবে বিস্ফারিত হ'য়ে গেলো : তার কালো মুখের ভিতর থেকে চোখের সমস্তটা সাদা উল্‌টিয়ে বেরিয়ে এসে কপিলের চোখের উপর নিবদ্ধ হ'লো। তারপর শেষ হ'লো।

আর পরের দিন, সন্ধ্যার পর, ক্লান্ত শরীরে বিছানায় শুয়ে কপিল উপলব্ধি করলে ভালোবাসার সমস্ত অসহ্য ব্যথা। জানলা দিয়ে তারায়-ভরে'-যাওয়া আকাশের দিকে সে তাকিয়ে রইলো। আর সমস্ত আকাশ দিয়ে, সমস্ত সত্তা দিয়ে, সহস্র মৃত্যুতে মর্মরিত সমস্ত জীবন দিয়ে সে অনুভব করলে—তাকে নয়, যে এইমাত্র তাকে ছেড়ে গেলো ; কিন্তু অন্য-একজনকে, যাকে সে রেখে এসেছে ; যাকে, কোনো-একদিন, মিলতেই হবে তার সঙ্গে।

এইবার সময় হয়েছে, মনে-মনে সে বললে।

ছয়

কপিল ফিরে এলো কলকাতায়—একটু শীর্ণ, অনেকখানি কালো ; কিন্তু ভিতরে-ভিতরে অনেক বেশি সুস্থ, আর তার মনের মধ্যে আশ্চর্য শান্তি।

প্রথমে সে গেলো বাসবের কাছে। বাইরের ঘরে মৈত্রেয়ী বসে' আছে তার এক বন্ধুকে নিয়ে। দরজার কাছে কপিল একটু ইতস্তত করলে।

মৈত্রেয়ী উঠে দাঁড়ালো, তার মুখ হাসির রেখায় মধুর। লক্ষবার এই হাসি সে হেসেছে। সে ঠিক জানে, কোন্ পেশীর উপর কতটুকু চাপ পড়লে ঠিক ফুটবে এই আপ্যায়নের হাসি।

'আসুন।'

কপিল ঘরের ভিতর এগিয়ে আসতে-আসতে বললে : 'বাসব কোথায়?'

'আছে। একটু বসুন। আমার এই বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

আলাপ হ'লো। ইলা বিশ্বাসের চুল ঘন বাদামি রঙের, ডিমের ছাঁচের মুখ। কিছু বিলিতি গোছের সৌন্দর্য। কথা বলবার ফাঁকে-ফাঁকে একটু অদ্ভুত চোখে কপিলকে সে দেখে নিচ্ছিলো। যেমন করে' খাঁচার ফাঁক দিয়ে আমরা চিড়িয়াখানার জানোয়ার দেখি। কপিল বসে' রইলো একটু আড়ষ্টভাবে।

'একজন লেখকের সঙ্গে আলাপ হওয়া কী ভাগ্য,' ইলা বিশ্বাস বললে।

কপিল তার পাঞ্জাবির বোতাম নিয়ে নাড়াচাড়া করলে।

'সোসাইটি নিয়ে আপনার গল্পগুলো ভালো লেগেছিলো', সচেতনভাবে একটু হেসে ইলা বললে।

'ভালো লেগেছিলো আপনার?' এ ছাড়া কপিল কিছু বলতে পারলে না। মনে-মনে সে অবাক হ'লো। 'সোসাইটি' নিয়ে সে গল্প লিখলো কবে? ইলা বিশ্বাস, তুমি কি মনে-মনে ভাবো তুমি আমার একজন

চরিত্র?

'আপনার সঙ্গে আলাপ করবার আমার ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু আপনাকে তো কোনোখানেই দেখা যায় না।'

'ইনি কোথাও বেরোন না,' মৈত্রেয়ী বললে।

'কিন্তু সেটা কি উচিত?' ইলার মুখের ভাব প্রায় উদ্বিগ্ন হ'যে উঠলো। 'যাদেব নিযে লেখেন, তাদের সঙ্গে কি আপনার মেশা উচিত নয? না-জানলে কী লিখবেন?'

'কিন্তু জানি তো,' কপিল হঠাৎ বলে' ফেললো। 'কী না জানি?'

ইলা মৃদুস্বরে হেসে উঠলো, ঠাট্টা ভেবে।—'আপনার বেরুনো উচিত, লোকের সঙ্গে মেশা উচিত। তা আপনার লেখায় সাহায্যে করবে।'

'লেখায় সাহায্য পাবো বলে'ই মিশতে বলছেন?'

'আপনার পক্ষে সেটাই তো বড় কথা। তা ছাড়া, আমার মনে হয়, লেখার বাইবে কোনো জিনিসে উৎসাহ রাখা ভালো।'

কথাটা ইনি কোথায় শুনেছেন, কপিল ভাবলে। কেননা নিশ্চযই এটা অন্য কোথাও শোনা, নয় তো এমন গম্ভীরমুখে, এমন নিশ্চিতভাবে ইনি বলতে পারতেন না। তা ছাড়া, কথাটার অর্থ কী? লেখাব বাইরে কোনো জিনিস—? তা কি হবে 'সোসাইটি', বাদামি চুলেব মেয়ে, কি ক্রিকেট খেলা—না কি, জীবনের খোলসেব গাযে যতটা নোঙ্‌রামি আটকে থাকে, তা-ই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কবতে হবে? তাকে কি হ'তেই হবে বিজ্ঞাপনের মত স্পষ্ট, স্থূল, প্রত্যক্ষ—যাতে সবাই দেখতে পায, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পাবে? কী আছে আমাব লেখাব বাইবে? লেখার বাইবে যদি কিছু থাকতো, তাহ'লে লেখাটাও হ'তো আমার জীবনেব বাইরেব? লেখাব বাইরে। কিন্তু তা তো নয। যা আমাব লেখাব বাইবে, তা আমাব জীবনের বাইরে. তা নিয়ে আমি কী করবো?

কেননা লেখাটা যে আমার জীবনেবই একটা অংশ। লেখা ব্যাপাবটাব ভিতবকাব প্রক্রিয়া সম্বন্ধে খুব কম লোকেরই ধারণা আছে। কোনো মেযের চোখেব পুকুব থেকে বঁড়শি ফেলে' কবিতাব লাইন তুলে আনা হয় না। চোখের সামনে যেটা ঘটে, সেটাকে তখন-তখন মনের দেরাজে তুলে রাখিনে গল্প লিখবো বলে'। বয়ে' চলে আমাদের জীবন—আব লেখা আসে। যেমন আমবা ভালোবাসি আর কাঁদি আর একা বসে' গুন্‌গুন্ কবে' গান কবি, তেমনি আমরা লিখি। লেখাটাও তোমবা যাকে বলো 'জীবন', লেখাটাও তোমরা যাকে বলো 'অভিজ্ঞতা'। আব সমস্ত জড়িয়ে এই যে আমাদেব বাঁচা, তা-ই কি যথেষ্ট নয়, তা-ই কি সব নয়? লেখাব জন্য একটা খোপ কি থাকতেই হবে, আব লেখাব বাইরে যাতে উৎসাহ নিতে পাবি, তাব জন্য আলাদা একটা খোপ?

'কিন্তু মেলামেশারও বাড়াবাড়ি হ'তে পারে', মৈত্রেয়ী বললে। 'বাসব যদি এত সময নষ্ট না-কবতো তাহ'লে অনেক বড় লেখা সে দিতে পারতো।' বলে' সে তাব সুন্দর লাল ঠোঁট গোল করে' তুলে একটু হাসলো।

যদি বাসব ইচ্ছে কবতো তাহ'লে সে আমাকে নতুন একটা অলঙ্কার দিতে পারতো, যা দেখে অবাক হ'য়ে যেতো লোকে. মৈত্রেয়ীর কথাটা অনেকটা এইবকম শোনালো।

'বাসব আসলে ওর আর্টকে সে-রকম ভালোই বাসে না', ইলা বলে' উঠলো চাপা গলায, পাখিব স্বরে।

'আমারও তা-ই মনে হয়েছে', মৈত্রেয়ী বললে। 'কতদিন আমি ওকে সে-কথা বলতে গেছি।'

'ওর যদি টাকার অভাব থাকতো ভালো হ'তো। বাধ্য হ'তো লিখতে।'

'কিন্তু টাকার জন্য লিখলে লেখা খারাপ হ'য়ে যায না?' মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে কপিলেব দিকে তাকালো।

'কী জানি!' কপিল বললে।

'আপনার তো জানা উচিত।'

কপিলের মুখে একটু লাল হ'য়ে উঠলো। কিছুদিন আগে একটা সাপ্তাহিকের প্রতি সংখ্যায় একটা করে' গল্প সে লিখে যাচ্ছিলো—টাকার জন্য। লোকে তা নিয়ে কথা বলেছে। লোকে তার মধ্যে দেখতে পেয়েছে অন্যমনস্কতার চিহ্ন। তার রচনার সে-ধার সব জায়গায় থাকছে না। কথাগুলো সব সময় ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছতে পারছে না। আমি যদি, কপিল ভাবলে, সবগুলো গল্প একসঙ্গে লিখে তারপর বছরে দুটো করে' বার করতুম, তাহ'লে ওরা কি এ-সব কথা বলতো?

'নিজের কিছু টাকা থাকলেই লেখার সব চেয়ে সুবিধে তা-ই নয়?'

'নিশ্চয়ই', কপিল তৎক্ষণাৎ সায় দিলে।

'কিন্তু দুঃখ পাওয়া দরকার', ইলা গম্ভীরমুখে বললে। 'দুঃখ না-পেলে মানুষ বাড়ে না।'

আর-একটা, কপিল মনে-মনে বললে। এটা কেন হয় যে অন্যের কোনো কথা বললেই এরা সেটা বুঝতে দেয়? সেটা লুকোবার মত বুদ্ধি অন্তত থাকা উচিত। অন্যের কাপড় যদি পরতেই হয়, সেটা কেটে-ছেঁটে নিজের মাপসই করে' নেয়া যায় না? আর দুঃখ কি কেবল টাকার অভাব? ইলা বিশ্বাস, গরিব হবার ভয় কি তোমার এতই বেশি যে অন্য কোনোরকমের দুঃখ তুমি ভাবতে পারো না?

'বাসবকে দিয়ে কেউ যদি জোর করে' লেখায় তাহ'লে ভালো হয়', অন্য দু'জন কিছু বলছে না দেখে ইলাকেই আবার বলতে হ'লো।

'জোর করে' কি লেখা হয়?'

'না লিখতে-লিখতে নষ্টও হ'য়ে যেতে পাবে শেষ পর্যন্ত।'

'ওর নিজেরই এক-একটা ঝোঁক আসে মাঝে-মাঝে। দরজা বন্ধ করে' বসে' থাকে সারাদিন। কিন্তু ও-রকম করে' কিছু হয় না।'

এমনি দুই বন্ধু আলাপ করলে, 'বিশ্লেষণ' করলে, নানাদিক থেকে দেখলে। আর যখন তারা মনে করলো যথেষ্ট খাতির করা হয়েছে, সাহিত্য নিয়ে যথেষ্ট বলা হয়েছে, তারা চুপ করলো। 'আচ্ছা', বলে' কপিল উঠে দাঁড়ালো। 'বাসবকে কোথায় পাবো?'

'ওর সেই ঘরটাতেই আছে। ওর এখন লেখবার ঝোঁক।'

'আচ্ছা', ইলা বিশ্বাস মধুর হাসিতে তার ঝক্‌ঝকে দাঁতের সারি দেখালো। দু'হাত তুলে সে নমস্কার করলে।

আর যে-মুহূর্তে কপিল তাদের দিকে পিঠ ফেরালে সে অনুভব করলে যেন তাদের মুখের ভাব বদলে গেছে : দুই বন্ধু কাছাকাছি চেয়ার টেনে এনে যেন বলছে, 'এইবার।'

বাসবের বন্ধ দরজায় কপিল টোকা দিলে, কোনো উত্তর এলো না। আবার টোকা দিয়ে একটু অপেক্ষা করলে। তারপর ডাকলে, 'বাসব।'

সঙ্গে-সঙ্গে শোনা গেলো চেয়ার ঠেলে' সরাবার শব্দ। বাসবের এক হাতে কলম ধরাই রয়েছে, অন্য হাত দিয়ে কপিলের একটা হাত সে আঁকড়ে ধরলো।

'কপিল!' তার কণ্ঠস্বরে নতুন একটা সুখের সুর। আর কপিলের শরীর দিয়ে হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ স্পন্দিত হ'য়ে গেলো, তার হাতের চাপে।

কপিলকে সে টেনে নিয়ে এলো ঘরের মধ্যে, তারপর—যে-চেয়ারে বসে' এতক্ষণ লিখছিলো সেখানে না-বসে' ছোট একটা চেয়ারে বসলো, কপিলের পাশে। তার মুখে তিন দিনের দাড়ি, তার চোখের নিচে কালো দাগ, গাল বসে' গেছে। শুধু তার চোখে হিংস্র, অস্থির দীপ্তি। আর সমস্ত টেবিল ভরে' কাগজের রাশি ছড়ানো, চৈত্রের গাছের নিচে যেমন অজস্র এলোমেলো পাতা। কপিল তার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে' রইলো।

'লিখছিলাম', বাসব বললে। আর তার সমস্ত মুখে হাসি জ্বলজ্বল করে' উঠলো আলোর মত।

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। আমি এসে বাধা দিলুম—কিন্তু না-এসেও পারলুম না।'

'ওঃ! এসে যায় না, কিছু এসে যায় না। অনেক সময় আছে। না—সময় নেই। সময়ই তো নেই। আর সবই আছে।'

'খুব লিখছো তো?'

'পাগলের মত লিখছি। সমস্ত মন দাউ-দাউ করে' জ্বলছে।—বেশি কাছে এসো না, পুড়ে যাবে।' বলে' বাসব অনিশ্চিত, কাঁপা গলায় হেসে উঠলো। তাড়াতাড়ি সে কথা বলছে, একটু উচ্চস্বরে, মাঝে-মাঝে তার অগোছাল চুলের স্তূপ নিয়ে টানা-হেঁচড়া করছে। দু'মিনিট একভাবে বসে' থাকতে পারছে না।

'ততক্ষণে তোমার কি আর কিছু বাকি থাকবে! মনে হয় না,' কপিল হেসে বললে। 'যা চেহারা দেখছি।'

'ওঃ, চেহারা! স্বাস্থ্য দিয়ে কী হয়? চেহারা দেখে কী বোঝা যায়? কী ভালো আমি আছি, কী ভালো এই ক'দিন আমার লাগছে তা আমি কী করে' বোঝাবো?'

'আমি বুঝতে পারি', কপিল বললে।

'এত ভালো লাগছে যে আমি সইতে পারছিনে। আর মাঝে-মাঝে কেমন যেন ভয় করে। এ কী, আমার ভিতর থেকে যা ঠেলে উঠছে—যাকে আমি চাইনি, যাকে আমি মরে' গেলেও থামাতে পারবো না? এ যে আমার মধ্যে ছিলো তা তো আমি জানতুম না।'

কপিলের মনে পড়লো মৈত্রেয়ী আর ইলার কথা—বসে'-বসে' তারা ভাবছে কী করে' বাসবকে দিয়ে লেখানো যায়।

'কী অদ্ভুত যে আমাকে লিখতেই হবে, না-লিখে আমার উপায় নেই। না-লিখলে আমি যেন বাঁচবো না। কী যেন মাথা খুঁড়ে মরছে. সব সময় মাথা খুঁড়ে মরছে—এইখানে', বাসব তার বুকের উপর হাত রাখলো। 'তার শক্তি প্রচণ্ড, আমাকে তা ছিঁড়ে ফেলছে। কিন্তু এমন আনন্দও আর নেই। এ-আনন্দ যে কী তা আমি কখনো বলতে পারবো না।'

বাসব উঠে গিয়ে টেবিল থেকে তার লেখার কয়েকটা কাগজ তুলে নিয়ে চোখ বুলিয়ে গেলো।—'আমার এই লেখা পড়ে' অবাক হ'য়ে যাবে।'

'ভালো হয়েছে খুব?'

'আশ্চর্য! আমারই মনে হচ্ছে যেন অন্য কারো লেখা।'

'এখন আর তাহ'লে তোমার ভাবনা নেই,' কপিল আস্তে-আস্তে বললে।

'কিন্তু কত লিখবো?' বাসব কপিলের কথাটা যেন শুনতেই পেলে না, 'কত আর লিখবো? মুঠো-মুঠো করে' বিলিয়ে দিতে পারি, দু'হাতে জলের মত ছড়াতে পারি। হাজার কথা এক-সঙ্গে তোলপাড করছে মনে—কিন্তু সময় নেই। এই সমস্ত লেখা এখন যদি কোনোরকমে হারিয়ে যায় তাহ'লেও আমার ভাবনা নেই ; আমি বসে'-বসে' আবার নতুন জিনিস লিখি।'

বাসব ফিরে এসে বসলো।

'তুমি কেমন আছো?' হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করলে, কপিলের চোখের দিকে তাকিয়ে।

'বেশ ভালো আছি।'

একটু সময় বাসব তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'কবে ফিরলে?'

'কালই তো মোটে।'

'যার জন্যে ওখানে গিয়েছিলে তা পেলে?'

'তার বেশি পেয়েছি।'

বলে' কপিল ছোট-ছোট কয়েকটা কথায় সাঁওতাল মেয়ের কথা তাকে বললে।—'আমার চোখের উপর সে মরলো। আমি কিছু করতে পারলুম না।'

বাসবের চোখ আনত হ'লো।—'খুব ভয়ানক লেগেছিলো?'

'না, সে-রকম কিছু নয়। কিন্তু নতুন একটা জিনিস পেয়েছি।'

'কী সেটা?'

'বলতে পারবো না। শুধু মনে হয়, নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম, এইবার ফিরে পেয়েছি।'

'আর তারপর?'

'তারপর কী তা তো জানোই।'

খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপ করে' রইলো।

'তোমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো বাইরের ঘরে', কপিল বললে।

'মৈত্রেয়ী? কী করছে সে?'

'সঙ্গে তার আর-একজন ছিলো—ইলা বিশ্বাস। আলাপ হ'লো।'

'একটুখানি "জীবন" দেখলে, তাহ'লে?'

কপিল একটু হেসে চুপ করে' রইলো।

'এ-ক'দিন আমার কী ভালোই লাগছে যে ঐ "জীবন" দিয়ে নিজেকে মুড়ে রাখতে হচ্ছে না। আমি পেয়েছি আমার নিজের জীবন।'

'কিন্তু এ কি সব সময় থাকবে?'

'না-ই বা থাকলো। যে-ক'দিন পেলাম, সুখী হ'য়ে নিলাম তো।'

'সুখী হয়েছো?'

'এত সুখী হবার ক্ষমতা যে আমার আছে তা আমি জানতুম না।'

কপিল চুপ করে' রইলো। একটু পরে বাসব আবার বলতে লাগলো :

'দ্যাখো, এই পৃথিবীতে তুমি বাঁচতে পারবে না ; এই পৃথিবীই তো তোমার ভিতরটাকে খেয়ে যাবে। দু'হাতে তাকে ঠেলে রাখবে, তা থেকে পালিয়ে যাবে—যেমন করে' পারো। সেটাই বাঁচবার উপায়।'

'কিন্তু তার পরেও তো কিছু আছে : নতুন একটা পৃথিবী তৈরি করা।'

'সেই কথাই তো আমি বলছি। নতুন একটু পৃথিবী : কিন্তু তা হোক্ তোমার নিজের, তোমার একলার। তুমি কি অন্যদের তার ভাগ দিতে পারবে?'

কপিল একটু ভাবলে।

'না, ভাগ দিতে যেয়ো না, অন্যদের ডেকো না সেখানে—তাহ'লেই তা নষ্ট হ'য়ে যাবে। আর যা-ই করো, আমাদের এই পৃথিবীকে নতুন করে' তোলবার কথা ভেবো না। পৃথিবীর যা হবার হোক্, তোমার তাতে কী? তুমি তোমার নিজের পৃথিবী তৈরী করবে নিজের মধ্যে। সমস্ত কথা আর সমস্ত মানুষ আর সমস্ত খবরের কাগজ একত্র হ'য়েও তাকে নষ্ট করতে পারবে না। সেখানে তোমার অন্ধকার রাজত্ব। সেখানে তুমি মুক্ত, সেখানে তুমি চিরন্তন। সেখানে আর-কোনো প্রয়োজন তোমার নেই।'

কপিল চুপ করে' একটু ভাবলে। তারপর বললে, 'কিন্তু ভালোবাসাব প্রয়োজন—যে-কথা তুমি সেদিন বলছিলে?'

বাসব মুহূর্তের জন্য হাতের মধ্যে মুখ ঢাকলো। অদ্ভুত চাপা গলায় বললো, 'যদি তা না পাও তাহ'লে আর কী করতে পারো?'

কপিল মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলো। আর, একটু পরে, বাসবের কণ্ঠস্বর যেন আনন্দে বেজে উঠলো :

'আর যদি তা পাও—যদি তা পাও, তবে তো পেলেই। তা তো তোমার পৃথিবীকে ভেঙে দেবে না—তা তোমার মধ্যে এসে মিলবে অন্ধকার নদীর মত। কিন্তু তোমাকে সৃষ্টি করতেই হবে তোমার নিজের পৃথিবী। সবার আগে তা-ই, সবার শেষে তা-ই। তা যদি না-পারো, পৃথিবীর সমস্ত ভালোবাসা তোমার বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। আর যা-ই হোক্, কি না-ই হোক্, একে হ'তেই হবে—তোমার নিজের, তোমার একলার, তোমার অন্ধকারের এই পৃথিবী।'

'হবে তা-ই', বলে' কপিল উঠে দাঁড়ালো।

সাত

পরের দিন দুপুরে কপিল যখন গেলো, সমস্ত বাড়িটা চুপচাপ। পুরুষেরা গেছে যে যার কাজে, মেয়েরা ঘুমুচ্ছে।

কপিল নিঃশব্দে মিনুর ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু তার আগেই সে শুনতে পেলো মিনুর কণ্ঠস্বর।

লোহার সাদা খাটে মিনু শুয়ে, সাড়ির আঁচলটা মুখের উপর ছড়ানো। সে গান করছে—নরম, চাপা গলায় ; অদ্ভুত, ভাঙা-ভাঙা গলায়। অদ্ভুত সে-গান—টেনে-টেনে যাওয়া, বুনে-বুনে চলা ; তার কথাগুলো বোঝা যায় না, তার সুর জ্যোছনায় কুয়াশার মত। কোনো দিশি সুর, সাধারণ মানুষের, চাপা কান্নার, তাতে বিরহের আর প্রার্থনার জাদু। সেই গান মিনু গাইছিলো, নিজের মনে, আঁচলে মুখ ঢেকে, অদ্ভুত ভাঙা-ভাঙা গলায়, যেন তার গলা দিয়ে স্বর ফুটছে না। আর তবু তা উঠে আসছিলো, ক্ষীণ স্বচ্ছ স্রোতে, বার-বার ; সুরের অদৃশ্য জালে একই নক্সা বার-বার বোনা হচ্ছিলো, দুপুরবেলার সেই শান্ত হাওয়ায়। কপিল অপেক্ষা করলে, তা থামলো না। তা উঠে আসছে, সেই ক্ষীণ, নরম সুরের ফোয়ারা ; তা ঝরে' পড়ছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে, দুপুরবেলাকার শান্ত হাওয়ায়।

আর কপিল স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো, আর শুনলো ভাঙা-ভাঙা, চাপা গলার সেই অদ্ভুত গান। মিনুর মুখ ঢাকা, তার শরীর একটু নড়ছে না। যেন কোনো অদৃশ্য, গোপন উৎস থেকে উঠে আসছে এই গান, দিনের শরীরে লুকোনো কোনো অন্ধকার থেকে। একটু ছেদ নেই, ক্ষীণ হ'য়ে মিলিয়ে যেতে-যেতে তা আবার ঠেলে উঠছে, দিনের গোপন, অন্ধকার উৎস থেকে উৎসারিত এই গান।

আর কপিলের বুক কাঁপতে লাগলো, কাঁপতে লাগলো, যেন তা ভেঙে যাবে। ঘরে ঢুকতে তার সাহস হ'লো না, একটু শব্দ করতে তার সাহস হ'লো না। তার সামনে এক অন্ধকার, অনির্বচনীয় রহস্য তার ভিতরে তাকে ঢুকতে হবে, ঢুকতেই হবে। কিন্তু তার সাহস হয় না ; বাইরে দাঁড়িয়ে সে কাঁপছে।

বারান্দা দিয়ে কে যেন চলে' গেলো। আর, পাছে কেউ তার কাছে এসে পড়ে, এসে তার সঙ্গে কথা বলে, কপিল তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে। কিন্তু তবু থামলো না গান। সে আরো একটু অপেক্ষা করলে, তারপর গিয়ে দাঁড়ালো মিনুর শিয়রে। পাশের ছোট টেবিল থেকে একটা বই তুলে নিয়ে ফেলে দিলে মেঝের উপর।

মিনু মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে তাকালো। কিছু দেখতে পেলে না। আর তারপর সে মুখ ফেরালো শিয়রের দিকে। সে উঠলো না, কিছু বললে না ; খানিকক্ষণ শুধু চুপ করে' তাকিয়ে রইলো কপিলের মুখের দিকে।

তারপর বললে, 'এসো'। বলে' উঠে বসলো। কোনোরকম করে' জড়ানো খোঁপা ভেঙে তার দীর্ঘ কালো চুল নেমে এলো বৃষ্টির পশলার মত।

'তোমার গান থামিয়ে দিলুম।'

'গান শুনতে চাও?'

'না, এখন আর নয়।'

কপিল বসলো খাটের অন্য ধারে। মিনুর মুখ একটু ফেরানো, তার চোখ আনত। থেকে-থেকে তার চুলের গন্ধ কপিলের বুকে এসে লাগছে।

খানিক পরে মিনু চোখ তুলে তাকালো।—'বাইরে গিয়ে কেমন ছিলে?'

'ভালো ছিলাম বেশ।'

'এখন তোমার মন শান্ত হয়েছে?'

'হ্যাঁ, শান্তি আমি পেয়েছি। সে আশ্চর্য।'

মিনু তার স্তব্ধ কালো চোখ কপিলের কৃশ মুখের দিকে তুলে চুপ করে' রইলো।

'এখনো কি সময় হয়নি?' একটু পরে কপিল বললে।

'কে জানে!'

'তুমিই তো জানো।'

'আর তুমি—তুমি ঠিক জানো? ভালো করে' ভেবে তারপর বলো।'

'ভাববার কিছু নেই।'

'আমি অনেক ভেবেছি,' মিনু আস্তে-আস্তে বললে। 'কিন্তু যা আমরা ভাবি, তা-ই কি হয়?'

'না, তা হয় না। কিন্তু যা আমবা চাই, তা-ই হয়।'

'কী নিশ্চয়তা আছে তার?'

'না, নিশ্চয়তা কিছু নেই। থাকবেই বা কেন? নিশ্চয়তা আছে যন্ত্রে, জীবনে তা থাকে কী করে'?'

'তাহ'লে দেখা যাক্ জীবন আমাদের কোথায় নিয়ে যায়।'

'এখনো কেন সংশয় তোমার মনে?'

'যদি কোনো সংশয় থাকে তা তোমারই জন্যে।'

'আমি জানি তোমার মনেব কথা। কোনো নিশ্চয়তা যে নেই—বড় লাগে এ-কথা মনে করতে। যা চাই তাকে কি পাবো? ও-কথা জড়িয়ে কত দ্বিধা, কত যন্ত্রণা, কত কান্না। তা তো ছাঁচে-ঢালা, তৈরি জিনিস নয় যে হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে। চাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তো পূর্ণতা আসে না। আর, যা-ই বলো না, তা আসে না বলে'ই তো এত মজা।'

'এ-সব কেন বলছো?'

'কিন্তু দুঃখও আছে বইকি', কপিল বলতে লাগলো, যেন নিজেরই মনে, 'বড় ভীষণ দুঃখ সেই চাওয়ার। কান্নায় তোমার বুক ভেঙে যাবে, হতাশায়। তবু তা সইতে হবে। তবু যেন আমরা ভুল না করি। নিজের উপর অভিমান করে' ভুল না করি।'

'ভুল আমি করবো না', মিনু বললে, 'ভুল আমি কখনো করি না।'

একটু সময় কপিল চুপ করে' রইলো, চুলের মধ্যে আঙুলগুলো চালালো।

'ও-কথা তুমি বলতে পারো?'

'না, ভুল আমি করিনে,' মিনু আবার বললে।

'আমি ও-কথা বলতে পারিনে। আমি ভুল করেছি অনেকবার। কিন্তু সব সময় মনে-মনে আমি জানতুম যে ভুল করছি।'

'তুমি কি এখন দুঃখিত তার জন্য?'

'এমন অপব্যয়—নিজেব এমন অপব্যয়। কিন্তু ও-রকমই হয়, ও-রকম হ'তেই হয়। হয়-তো তারও প্রয়োজন আছে। দুঃখিত কেন হ'বো? এমনি করে'ই তো আমরা পূর্ণ হ'য়ে উঠি। নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে, নিজেকে হারিয়ে ফেলে', নিজেকে পায়েব নিচে মাড়িয়ে গিয়ে। সেই কষ্ট যদি-না-জানতুম তবে কি আজ এই আশ্চর্য শান্তি আমি পেতুম?'

মিনু কিছু বললে না। তার মুখ ফেরানো, তার চুলের গন্ধ কপিলের বুকে এসে লাগছে।

'সেই সমস্ত পার হ'য়ে আমি আজ তোমার কাছে এসেছি', কপিল বললে।

তবু মিনু কিছু বললে না। কপিল তার একটু কাছে সরে' এলো, তারপর বলতে লাগলো :

'প্রথম যখন তোমার কাছে এসেছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে ভালো করেছিলে। আমি এসেছিলুম আমার হতাশা থেকে ; তোমার কাছে চেয়েছিলুম সান্ত্বনা, চেয়েছিলুম শান্তি। কিন্তু ও-রকম করে' হয় না। আমার মধ্যে ছিলো অভাব, ভেবেছিলুম, তোমাকে দিয়ে তা ভরে' তুলবো।'

'তা কি ভরতো?' ক্ষীণ, ক্ষীণস্বরে মিনু বললে।

কপিলের মুখে ছোট একটু হাসি খেলে গেলো :

'কিন্তু এখন আমি পেয়েছি আমার নিজের শান্তি। এখন আমি তোমাকে ডাকছি, হতাশা থেকে নয়, নিঃসঙ্গতা থেকে নয়—আমার আনন্দ থেকে, পূর্ণতা থেকে। সমস্ত ভাঙাচোরা, সমস্ত ক্ষত আর লজ্জা পার হ'য়ে এসে—আমি, নতুন, সদ্যোজাত, সম্পূর্ণ, আমি তোমাকে ডাকছি। এখন আর তুমি আমাকে

ফিরিয়ে দিয়ো না।'

আর আস্তে, আস্তে, পাখির মত, নরম পাখির মত, মিনুর ছোট, নরম হাত কপিলের হাতের উপর এসে পড়লো, ছোট, ছোট আর নরম, আগুনের শিখার মত নরম, আর শিখার মত উষ্ণ, রক্তের আগুনে উষ্ণ ; আর কপিলের হাতের ভিতর দিয়ে যেন এক অপরূপ সুরা রক্তের মধ্যে গিয়ে মিশলো ; আর তার সমস্ত মাংস যেন জ্বলে' উঠলো, জ্বলে' উঠলো আনন্দে।

আর তারপর তার মনে হ'লো এ আর সে সইতে পারছে না : মনে হ'লো মিনুর ছোট, নরম হাতের চাপে সে যেন মরে' যাবে—সে যেন ছিঁড়ে যাবে এই আনন্দে, এই ব্যথায়। হাত ছেড়ে দিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো।

'আবার কবে আসবে?' মিনু জিজ্ঞেস করলে।

'যে-কোনোদিন।'

'কাল আসবে?'

'আসতে পারি।'

'না, বলে' যাও আসবে কিনা।'

'আসবো।'

আর পরের সন্ধ্যায় কপিল তাকে পেলো ছাতে, পাটি পেতে বসে'। একটু আগে সে স্নান করেছে ; পিঠের উপর এলানো তার চুল এখনো জলে চিকচিক করছে।

অনেকক্ষণ কেউ কিছু বললে না।

তারপর কপিল মিনুর আঙুলের মধ্যে নিজের আঙুল জড়িয়ে বললে :

'তোমার জন্য একটা আংটি আনতে ভুলে' গেলুম।'

'কী হবে আংটি দিয়ে? এ-ই তো যথেষ্ট।'

'তবু আমরা চাই বাইরে প্রকাশ করতে। সেটা পুরুষের দুর্বলতা।'

'দিয়ো আংটি এনে।'

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ।

'সবাই এখন জানবে', কপিল বললে।

'জানবেই তো।'

'সে-কথা ভাবতেই আমার খারাপ লাগছে।'

'কেন?'

'লোকের কথাকে আমি বড় ভয় করি। তাদের ব্যাখ্যা। তাদের বিশ্লেষণ।'

'তুমি তো আর সে-সব কথা শুনবে না।'

'কিন্তু তবু—কেউ যদি কখনো না জানতো! যদি এমনি হ'তো চিরকাল! যে-মুহূর্তে আমরা হ'বো স্বামী আর স্ত্রী, তখনই আমরা এই সমাজের একটা অংশ হ'য়ে গেলাম, তখনই এই পৃথিবী তার কুৎসিত, স্যাঁৎসেঁতে হাত বাড়াবে আমাদের ধরতে। তাকে এড়াতে চাই, ভুলতে চাই তাকে ; কিন্তু তাকে একেবারের বাদ দিয়ে তোমাকেও আমি নিতে পারিনে।'

'কিন্তু তা ছাড়া উপায় কী?'

'না, উপায় নেই। যেমন আমাকে সইতে হয় টাকা রোজগারের নোঙরামি, তেমনি এ-তো সইতে হবে।'

'কিন্তু কী এসে যায় তাতে? এ কতটুকু—তোমার এই সমাজ আর পৃথিবী? এ তো নেহাৎই বাইরের জিনিস। তুমি আর আমি তো আছি—যা ছিলাম, তা-ই আছি।'

'আর তা-ই থাকবো', কপিল বললে।

'হ্যাঁ, তা-ই থাকবো।'

একটু চুপচাপ।

'কী শান্তি, কী আশ্চর্য শান্তি তোমার মুখে এ-কথা শোনা,' বলতে-বলতে কপিল মিনুর সমস্ত চুল দু' হাতে তুলে ধরলো, তারপর সেই ঠাণ্ডা, নরম চুলের রাশিতে চেপে ধরলো তার মুখ। ঐ চুল দিয়ে নিজেকে সে যেন জড়িয়ে রাখতে চায়, ঢেকে রাখতে চায়। লুকিয়ে থাকতে চাই এই অন্ধকারে—মানুষের সমাজ থেকে অনেক দূরে, এই কুৎসিত পৃথিবী থেকে অনেক, অনেক দূরে। ঠাণ্ডা, অন্ধকার এই ঝরনা তার মুখের উপর ঝরে' পড়ছে, তার বুকের উপর—ঝরে' পড়ছে তার গভীরতম আত্মায়।

এমনি কাটলো খানিকক্ষণ। তারপর মিনু আস্তে-আস্তে মুখ ফেরালো পিছনে, যেখানে কপিলের মুখ তার চুলের মধ্যে মগ্ন। রুদ্ধস্বরে ডাকলে, 'এই, শোনো।'

কপিল মুখ তুলে তাকালো, সন্ধ্যার ছাদের অস্পষ্ট আলোয় অদ্ভুত, পাংশু তার মুখ। আর হঠাৎ মিনুর ক্ষীণ দুই বাহু কপিলকে ঘিরে জড়িয়ে ধরলো, তার সমস্ত শরীর ঢেউয়ের মত ভেঙে পড়লো তার উপর ; আর সেই তাব স্তব্ধ, শুভ্র মুখ হঠাৎ কপিলের চোখে আগুনের একটা ঝড় হ'য়ে উঠলো, আগুনের উদ্দাম ঝড়, হাজার উদ্দাম অগ্নিশিখা অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ফেটে পড়ছে। কপিল হাত বাড়িয়ে তাকে নিতে যাচ্ছিলো, কিন্তু পরের মুহূর্তে মিনু নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো, আর তার দুই চোখ ভরে' উঠলো জলে। নিজেকে সে সামলাতে চাইলো, চাইলো কপিলের দিকে তাকাতে, কিন্তু সেই চেষ্টায় সে আরো ভেঙে পড়লো, কান্না উথলে উঠলো তার বুক ঠেলে'। দূরে সরে' গিয়ে দু' হাতেব মধ্যে সে মুখ ঢাকলো, আর কপিল বসে' রইলো স্তব্ধ হ'য়ে।

আট

'তুমি চলে' গেলে, রাত বাড়লো, বাড়ির সবাই একে-একে ঘুমিয়ে পড়লো, আমি জেগে রইলুম। সবাই ঘুমিয়ে আছে, আমি জেগে বসে' তোমায় চিঠি লিখছি।

এর আগে কখনো তোমাব চিঠি লিখিনি—ভারি অদ্ভুত লাগছে। এইমাত্র তুমি গেলে, দু'দিন পরেই আবার দেখা হবে, তবু লিখছি। না-লিখে পারছিনে।

যখন সিঁড়িতে তোমার পায়ের শব্দ শুনি, যখন দেখি তোমার মুখ, যখন শুনি তোমাকে কথা বলতে—কেউ জানে না কী কষ্ট আমি পাই, আমি যে ভেঙে লুটিয়ে পড়তে চাই, মরে' যেতে চাই। কেউ জানে না, শুধু আমি জানি। অনেক লোকের মধ্যে তোমাকে যখন দেখবো, কেমন করে' আমি তাকাবো তোমাব দিকে? কথা বলবো কেমন করে'?

এখন তুমি কাছে নেই, তবু সেই কষ্টে আমি কাঁপছি। টিপ্‌টিপ্ কবছে আমার বুক, আমার কেমন ভয় করছে।

তুমি কি অবাক হয়েছিলে, আমি যে কেঁদেছিলাম? কিন্তু আর কী উপায় ছিলো, আর কী উপায় ছিলো আমার? আজ সকাল থেকে আমার চোখ থেকে-থেকে কেবলই জলে ভরে' উঠছিলো। কেননা আজ তুমি আমার কাছে আসবে।

আর এখন—এখনও যদি আমি চুপ করে' থাকি, কান্নায় আমি অন্ধ হ'য়ে যাবো।

কী সুন্দর তুমি—আর কী ভয়ঙ্কব। তোমার মুখের দিকে আমি তাকাতে পারিনে। তোমাকে আমি কেমন করে' সইবো?

তবু আমি জানতুম একদিন আমাকে এমনি করে' কাঁদতে হবে। অনেকদিন থেকেই তা ঘনিয়ে আসছে বুকের মধ্যে। আব এতদিন তা প্রতীক্ষা করেছে—তোমার। একদিন তুমি আমাকে স্পর্শ করবে—আর তখন তা বুক ঠেলে' উঠে আসবে—কোনো বাধা মানবে না। আমি তা জানতুম।

তুমি কি রাগ করেছিলে, আমি যে সরে' গিয়েছিলাম, কেঁদেছিলাম? কিন্তু এ-কান্না তো দুঃখের নয় : এ আনন্দের, এ সার্থকতার। যা চেয়েছিলাম—অনেক, অনেকদিন ধরে' যা চাইছি তা পেলাম, তাকে যে পাওয়া গেলো, এই অসহ্য উপলব্ধির আনন্দ। কী আনন্দ তা আমি বলতে পারবো না।

আমি তোমাকে চলে' যেতে বলেছিলাম—চলে' তুমি গিয়েছিলে। আর আমার দিন আর রাত যেন বদলে গেলো : পেখম-তোলা ময়ূরেরর মত দিন, প্রতি মুহূর্তে রঙ বদলাচ্ছে ; আর রাত্রির অন্ধকার যেন আমার বুকের মধ্যে কথা কয়ে' উঠতে চায়। রাত বাড়ে, আমার ঘুম আসে না ; হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে চুপ করে' ভাবি। কী ভাবি জানিনে।

এর আগে আমি কখনো জানিনি, রাত্রির মধ্যে যে-সব স্বর লুকিয়ে থাকে। অশরীরী ছায়া-স্বর . যে-মুহূর্তে আলো নিবিয়ে দিয়ে শুতে যাই, তারা যেন লাফিয়ে ওঠে, ছুটে মারতে আসে আমাকে। আমার স্বপ্নকেও যদি তাবা হানা দেয়, সেই ভয়ে আমি চোখ বুজতে পারিনে।

আর তবু—এখন তুমি এসেছো, এখন আমার প্রায় বলে' উঠতে ইচ্ছে করছে : আমাকে ছেড়ে দাও, মুক্তি দাও আমাকে। যখনই তুমি আমার দিকে তাকাও, হঠাৎ একটা আগুন লাফিয়ে ওঠে, জড়িয়ে ধরে আমাকে। এ আমি কেমন করে' সইবো?

মনে-মনে প্রায় বলে' ফেলি—তোমাব সঙ্গে দেখা না-হ'লেই ভালো ছিলো। আমাকে কি চিরকাল জ্বলতে হবে, তোমার দৃষ্টির অন্ধকারে, অন্ধকারের মধ্যে লুকোনো, গোপন আগুন?

তবু আমি জানি যে আমি আর ছাড়া পাবো না। তুমি এসেছো তোমার পূর্ণতা থেকে আমার কাছে। আমি মিলেছি আমার সার্থকতা থেকে তোমার মধ্যে। এখন আর কিছু বলবার নেই।

কিছু আর বলবার নেই এখন। এখন আর সময় নেই ভাবনার কি স্বপ্নের। তোমাকে বলি, তোমার স্বপ্ন দিয়ে আমাকে জড়িয়ে রেখো না। দেবতার মত হও তুমি, দেবতার মত স্নেহ কোরো আমাকে। আমার সমস্ত ত্রুটি আর অসম্পূর্ণতার উপর পড়ুক তোমার দৃষ্টি। আমার রচনায় সেই-সব ফাঁক তুমি ভরে' তুলো—স্বপ্ন দিয়ে নয়, কল্পনা দিয়ে নয়, স্নেহ দিয়ে, করুণা দিয়ে।

আরো বলি তোমাকে : তোমার অনাদর, তোমার মলিনতা, তোমাব উদাসীনতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখে আমাকে লজ্জা দিয়ো না। অন্য সব জিনিস থেকে আলাদা করে' রেখো না আমাকে। শুধু কি তোমার আনন্দ, তোমার সৌন্দর্য্য, তোমার চুম্বনই নেবো ; আর যেখানে তুমি ক্লান্ত, প্রতিদিনের আঘাতে দীর্ণ, যেখানে তোমার গায়ে লেগেছে এই পৃথিবীর আঙুলের দাগ, সেখানেই থাকবো অন্ধ হ'য়ে? তোমার ভালোবাসা সইতে পারবো, আর তোমাব বিমুখতা সইতে পারবো না?

আমি তোমার কাছে চুপ করে' বসে' থাকবো , তোমার সেবা করবো, তোমাব শরীরের সেবা করবো। আমি তোমার কাছে চুপ করে' বসে' থাকবো।

হয়-তো এ-রকম চিরকাল থাকবে না। কেনই বা থাকবে? নতুন জিনিস আসবে · নতুন আশা, নতুন আনন্দ, নতুন দুঃখ। আর সবার শেষে থাকবো তুমি আর আমি, সবার আগে যেমন ছিলাম। এখন যেমন আছি।

যেমন আছি আজকের এই রাত্রিতে। কী চুপচাপ চারদিক—কলকাতা এমন চুপচাপ হ'তে পারে কখনো জানতুম না। কোথায় একটা কোকিল ডেকে উঠছে থেকে-থেকে, লিখতে-লিখতে আমি অন্যমনস্ক হ'য়ে যাচ্ছি। তুমি কী করছো?

আজকের সমস্ত দিনটার কথা যত ভাবছি, ততই অবাক লাগছে। রাত্রে যখন খেতে গেলুম, আমার মুখ তুলতে সাহস হয় না। আর খাওয়ার পরেই পালিয়ে চলে' এলুম—এখানে, আমার এই ঘরে : সেই কখন্ থেকে বসে' আছি জানলার ধারে। আজ আমি আর-কিছু চাইনে, শুধু একা থাকতে চাই ; তোমার সঙ্গে থাকতে চাই, একা। কী ব্যাকুলতা, তোমার কাছে যাবার জন্য আমার রক্তের কী ব্যাকুলতা।

মাঝখানে দু'দিন তোমাকে দেখবো না। কী তোমার এমন কাজ একটু আসতে পারবে না? এক সময় আমি ভাবতুম, অনেক সময় আছে, অনেক সময় আছে এখনো। ভাবতুম, শান্ত হ'য়ে অপেক্ষা করবার শক্তি আমার কাছে। কিন্তু আজ আর একটু মুহূর্তও আমার হারাতে ইচ্ছে করছে না। সমস্ত জীবনও যে যথেষ্ট নয় ; আমাদের জীবন আর কতটুকু?

তবু আজ মনে হচ্ছে যেন আমাদের জীবন চিরকালের ; তোমার জীবন, আর আমার . আর এই রাত্রির ভিতর থেকে আমার হৃদয় তোমাকে ডাকছে, তোমাকে ডাকছে, বাইরে যেমন থেকে-থেকে

কোকিল ডেকে উঠছে।

তাহ'লে শেষ করি চিঠি, শুতে যাই। আমার এই চিঠি ভরে' আমার হাতের স্পর্শ তোমাকে পাঠালুম, সমস্ত কথার চেয়ে তা বেশি। এখন শুতে যাই, যদিও জানি শুয়ে-শুয়ে অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারবো না।'

'আজ সারাটা দিন বাইরে-বাইরে ঘুরতে হ'লো, টাকার দরকার। তোমাকে যে বিয়ে করতে যাচ্ছি, তার জন্যেও টাকার দরকার। পৃথিবীর প্রতিশোধ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিৎ আমারই। বাঁচবার জন্য যেটুকু টাকার আমার দরকার, তা কোনোরকম করে' নিঙড়ে বার করে' আনবো, তারপর দেবো দরজা বন্ধ করে' পৃথিবীর মুখের উপর।

যেমন এখন দিয়েছি। এখন রাত্রি, আর আমি একা। এখন আমি একা, আমি সুখী।

সমস্ত দিন কাটলো নানা লোকের সঙ্গে নানারকমের কথায়—সে-সব মনে করলেও এখন মরে' যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এমন বোকা কে যে মনে করবে? শেষ হ'লো দিন, দিনের গ্লানিও শেষ হোক্ সেই সঙ্গে। এখন, এই রাত্রিতে আর এই নীরবতায় আমি তোমার।

শোনো, কিছু টাকা পাওয়া যাবে—চলো কোথাও যাই, সমুদ্রের ধারে কোথাও। তোমার মুখ অমন ম্লান কেন—আর এত কম তুমি হাসো! আমার ইচ্ছে করে তোমার হাসি শুনতে—রূপোর ঘণ্টার মত আকাশে বেজে উঠছে। সমুদ্রের ঢেউ যখন তোমাকে পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে আছড়ে ফেলবে, তখন অমনি করে' তোমাকে হাসতে হবে। না-হেসে তুমি পারবে না। চলো যাই। সমুদ্র তোমাকে নতুন প্রাণ দেবে, আমি তোমাকে নতুন প্রাণ দেবো।

আর সেই যাওয়া যাতে সম্ভব হ'তে পারে, তার জন্য আমাকে এখন লিখতে বসতে হবে। টাকার জন্য নাকি লিখতে নেই। কিন্তু লেখা দিয়ে কী হবে—লেখা তো থাকবে না। তুমি থাকবে, আমি থাকবো।

এখন রাত্রি, এখন শান্তি, এখন আমি একা। এই রাত্রি আমার। আর এই একা-আমি আর আমার এই রাত্রি—তা তোমার, তোমার।

তোমার চিঠি ভরে' তোমার হাতের স্পর্শ পেলাম। আর আমার হাত তোমার জন্য উৎসুক, আর আমার সমস্ত শরীর আর শরীরের রক্ত; আমার রক্তের সমুদ্র আর এই রাত্রির অন্ধকারের সমুদ্র ফেনিয়ে উঠছে তোমার দিকে। আমি ফেনিয়ে উঠছি; আমার সমস্ত ভিতরটা খুলে গেছে তোমার দিকে—বেরিয়ে আসছে তীব্র, উচ্ছল স্রোতে, ছুটে যাচ্ছে ঢেউ খেলিয়ে—তোমার সঙ্গে মিলবে বলে'। তোমার হাতে আমার চুম্বন নিয়ো, আর তোমার মুখে, আর তোমার দুই চোখে চুম্বন করে' আমি ডেকে আনছি ঘুম।

আমি এখন আমার লেখা আরম্ভ করি—তুমি ঘুমোও। তুমি ঘুমোও; ঘুমিয়ে থাকো সুখে। আজ আমার কী ভালো লাগছে—তোমাকে সুখী বলে' ভাবতে পারছি। সুখী আমরা কেন হ'বো না—সুখী হবার মত আর কিছু নেই। এই সুখে আর চুম্বনে আমি তোমাকে ভরে' তুলছি—কোনো শেষ কি আছে এই চুম্বনের আর সুখের?

তুমি ঘুমোও, আমি এখন বসে'-বসে' লিখি। ঘুমোও: কোনো ভয় নেই।'

বিশাখা

আমাদের শহুরে সমাজে ছেলেমেয়েদের বিয়ের ভাবনা মা-বাবাদের আর ভাবতে হয় না আজকাল, সে-ভার তারা নিজেরাই নিয়েছে। এ ব্যবস্থা ভালোই। যে-সব মা-বাবা এটা মেনে নিতে পারেন না, বাধা দিতে গিয়ে খামকা একটা গোলযোগ পাকিয়ে তোলেন, তাঁরা সুবুদ্ধির চাইতে অধিকারবোধের পরিচয় দেন বেশি।

ছেলেমেয়েরা নিজেরা যখন বিয়ে করে তাকে আমরা বলি প্রেমে-পড়া বিয়ে। এই প্রেমে পড়া ব্যাপারটি সম্বন্ধে অনেক মা বাবার মনে একটা নিদারুণ ত্রাস আছে—এখনো আছে। কেন, কে জানে। তাঁরাও তো প্রেমে পড়েছেন, যদিও বিয়ের আগে নয় পরে। বিয়ের আগে প্রেমে পড়ার সুযোগই তাঁরা পেতেন না, এত অল্প বয়সে তাদের বিয়ে হ'তো। অবশ্য বিয়ের পরে, বেশ কিছুদিন পরে, অন্য কোনো পুরুষ বা নারীর প্রতি তাঁরা যে মনে মনে কখনোই মধুর হননি, তা কি কেউ জোর ক'রে বলতে পারে? কিন্তু সে কথা মুখে কেউ স্বীকার করবে না, ম'রে গেলেও না।

নিজেরা যাঁরা প্রেমে প'ড়ে বিয়ে করেছেন তাঁদের ছেলেমেয়েদের এখনো বোধহয় বিয়ের বয়স হয়নি। তা যখন হবে তখন এ ব্যাপারটি নিয়ে এত হাঙ্গামা হয়তো হবে না। না কি তখনো হবে? দুই পুরুষের মাঝখানে কালের ঢেউ যে খাল কেটে দেয়, তার উপর সাঁকো তোলা সত্যি কি অসম্ভব?

তা ই যদি হয় তা হ'লে নিজেরা যাঁরা প্রেমে প'ড়ে বিয়ে করেননি, তাঁদের আর দোষ কী। তাঁদের অনেকেরই ধারণা যে প্রেমে পড়া বিয়ে কখনো সুখের হয় না। হৃদয়রঞ্জন গুপ্তর মনে এ-ধারণা তো বদ্ধমূল। গুপ্ত সাহেব (সকলে তাকে তা ই ব'লে জানে) জীবনে কখনো প্রেমে পড়েন নি। ন বাল্যে, না কৈশোরে, না যৌবনে, না প্রৌঢ়ত্বে। না কোনো মেয়ের সঙ্গে, না কোনো পুরুষের সঙ্গে, না কোনো বই বা ছবি বা সুর বা ভাবের সঙ্গে। দেশে না, বিদেশে না। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে তো নয়ই, পরস্ত্রীর সঙ্গেও না। এম এ পাশ ক'রে বিয়ে করেছেন, বিয়ে ক'রে বিলেতে গিয়েছেন, বিলেতে গিয়ে আরো কতগুলো পাশ করেছেন, ফিরে এসেই চাকরি নিয়েছেন কলকাতার এক পয়লা নম্বরি সওদাগরি হৌসে, লাফিয়ে লাফিয়ে উন্নতি করতে করতে আজ একটি আড়াই হাজারি গদিতে তিনি সমাসীন। মস্ত তাঁর বাড়ি, তিনখানা গাড়ি, তার কথায় হাজার লোক ওঠে বসে। জীবনের এ-রকম ঋজু, মসৃণ নিঃসংশয় গতি মনুষ্যসমাজে দুর্লভ বইকি।

গুপ্তর চার ছেলে এক মেয়ে। মেয়ে বড়ো। তিনি যখন বিলেত যান তখন তার জন্মের সূচনা, ফিরে এসে দু-বছরের মেয়ে কোলে নিলেন। যুবা বয়স থেকেই গুপ্তর নীরন্ধ্র দায়িত্বজ্ঞান, তখন থেকেই মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি ভাবছেন। কালক্রমে যখন দেখা গেলো যে খুব সম্ভব এ-ই তাঁর একমাত্র কন্যা, তখন ভাবনা আরো গভীর হ'লো। মেয়েকে কী ভাবে তৈরি করবেন তিনি, কেমন ক'রে জীবনের জন্য প্রস্তুত করবেন? সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে মেয়েকে প্রেমে পড়ার ব্যামো থেকে বাঁচাতে হবে। এই রকম সাধু সংকল্পের প্রেরণায় এখনকার দিনেও অনেকে যৌবনের প্রথম উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গেই মেয়েকে পরিণয়ের পরপারে নির্বিঘ্নে পৌঁছিয়ে দেন। যেন বিয়েটাই এ রোগের চরম চিকিৎসা। যেন দেহের দাবি মিটলেই প্রেমের বীজ ম'রে যায়। বিয়ে হ'লো, ছেলেপুলে হ'লো, ঘরসংসার হ'লো, তারপর যদি মেয়ে অন্য কারো প্রেমে পড়ে? তখন উপায়?

এ কথা তাঁরা অবশ্য মনেও আনতে পারেন না। গুপ্তসাহেবও পারেন নি। তিনিও একবার ভেবেছিলেন চোদ্দ বছরেই মেয়ের বিয়ে দেবেন। তা যে দেননি তার একটা কারণ এই যে আজকালকার দিনে কেউ তা করে না। কেউ বলতে অবশ্য তাঁর বন্ধুবান্ধব চেনা-শোনার মহলই বোঝায়। কেউ যা করে না সেটা করতে হ'লে গুপ্ত-সাহেবের মাথা হেঁট হয় সকলে যা করে সেটা না-করলে তাঁর মাথা কাটা যায়।

এ ছাড়াও আরো একটা কারণ ছিলো। সেটাই আসল। চৌরঙ্গি-ঘেঁষা সার্কুলর রোডে নিজের বাড়ি হবার আগে তিনি যখন শেয়ালদা-ঘেঁষা সার্কুলর রোডে পৈতৃক বাড়িতে থাকতেন, তখন তাঁর এক প্রতিবেশীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং সে-পরিচয় থেকে ক্রমে দু-পরিবার রীতিমতো ঘনিষ্ঠতা গ'ড়ে ওঠে। ভদ্রলোক বয়সে হৃদয়রঞ্জনের কিছু বড়ো, নাম অমিয়াংশু দাশ, তখন কোনো-এক মহকুমা শহরে এস. ডি. ও.। পড়াশুনোর সুবিধের জন্য পুত্রকন্যাকে, আর পুত্রকন্যার সুবিধের জন্য তাদের মা-কে কলকাতাতেই রেখেছিলেন, নিজে ছুটি-ছাটায় এসে কাটিয়ে যান। তাঁব কর্মস্থল কলকাতা থেকে তিন ঘণ্টার রাস্তা হ'লেও তিনি খুব ঘন-ঘন আসতে পারতেন না —সরকারি চাকরিতে ও-সব কড়াকড়ি তো খুব—একা-একা কর্মস্থলে প'ড়ে থাকতে তাঁর খারাপই লাগতো। তবু এ-কৃচ্ছ তিনি বরণ করেছিলেন প্রধানত তাঁর বড়ো ছেলের কথা ভেবে। স্মরজিৎ পড়াশুনোয় ভালো, ক্লাশের পরীক্ষায় ফার্স্ট হচ্ছে বরাবর, এখন থেকেই তাকে ভালো ইশকুলে ভালো মাষ্টারের তত্ত্বাবধানে রাখা দরকার। বন্ধুকে তিনি বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে ছেলের পড়াশুনোর যাতে কোনো ব্যাঘাত না-হয়, সেদিকে একটু লক্ষ রাখতে। বলাবাহুল্য, এ-অনুরোধ হৃদয়রঞ্জন আঠারো আনা পালন করেছিলেন। তিনি স্বভাবতই কর্তব্যপরায়ণ, কর্তব্য হিশেবে কিছু একটা করতে পারলে আর-কিছু তিনি চান না।

স্মরজিৎকে দেখতে-দেখতে তাঁর খুবই ভালো লাগলো। রং কালো, কিন্তু মুখশ্রী মনোহর, চোখে-মুখে বুদ্ধি জ্বলজ্বল করছে, স্বাস্থ্য নিটোল। যাকে বলে চৌকশ ছেলে। এই বয়সে বুক্ অব নলেজ আগাগোড়া প'ড়ে ফেলেছে, গড়গড় ক'রে ইংরেজি বলতে পারে, ম্যানার্স জানে, এদিকে উঁচু লাফে প্রাইজ তার বাঁধা। এ-ছেলে কিছু-একটা না-হ'য়ে যায় না। ভারি চমৎকার একটা কথা হৃদয়রঞ্জনের মনে হ'লো।

একদিন বন্ধুকে তিনি বললেন কথাটা। ঠাট্টার সুরেই বললেন, কিন্তু ঠাট্টার স্তরে বেশি দিন রইলো না। বাবাদের মুখ থেকে মা-দের মুখে উঠলো, মা-দের মুখ থেকে বাবাদের মুখে ফিরে এলো, তারপর দু-বাড়ির সকলেই জেনে গেলো কথাটা, পাত্র-পাত্রী দু-জনও জানলো। স্মরজিতের বয়স তখন এগারো আর বিশাখার সাত।

অমিয়াংশুবাবুর দিক থেকে আপত্তির কোনো কারণই ছিলো না। হৃদয়রঞ্জনের গায়ে টাকার গন্ধ তিনি পেয়েছিলেন। ছেলের পড়াশুনোর জন্য তিনি যে অকাতরে ব্যয় করছেন ও করবেন, ছেলের শ্বশুরের কাছে তার ডবল উশুল করতে না-পারলে আর হ'লো কী! ভালো হ'লো, কিছুর জন্যেই চাপ দিতে হবে না, হৃদয়রঞ্জনের সঙ্গে কথা ব'লেই বোঝা যায় যে তাঁর একটিমাত্র মেয়ের সুখের জন্য এমন-কিছু নেই যা তিনি না-করবেন। ফর্দ ধ'রে চাইতে গেলে হয়তো ঠকাই হবে। আর মেয়েটির স্বাভাবিক রূপলাবণ্য যা-ই হোক, মাজাঘষা শাড়ি-জামার দৌলতে বড়ো হ'লে তাকে ভালোই দেখাবে, সেই সঙ্গে চাল-চলন ইংরেজি উচ্চারণ যে তার রপ্ত হবে, সে তো জানাই। স্মরজিতের বৌ হ'য়ে তাকে মানাবে ভালো। একদিন রাত দুটো অবধি অমিয়াংশু আর তাঁর স্ত্রী চুল-চেরা আলোচনা ক'রে দেখলেন যে এর চেয়ে ভালো আর কিছু হ'তে পারতো না। দু-বাড়ির সকলেরই তা-ই মত। সকলেই খুশি।

সকলের চেয়ে বেশি খুশি হৃদয়রঞ্জন (তখন পর্যন্ত তিনি গুপ্ত-সাহেব হননি)। এ-বিয়ে বিধাতা যেন নিজের হাতে সাজিয়ে রেখেছিলেন—জাতে পর্যন্ত মিলে গেছে। ঘর ভালো, আর্থিক অবস্থা ভালোই, আর ছেলের তো তুলনা হয় না। যেমন মেধাবী, তেমনি স্বাস্থ্যবান ; উৎসাহী, অথচ উচ্ছৃঙ্খল নয়। শাখাকে তিনি যে-আদর্শে যেমন ক'রে গ'ড়ে তুলছেন, স্মরজিৎকে ওর ভালো লাগবে নিশ্চয়ই। খুব ভালো লাগলো, খুব নিশ্চিন্ত হলেন এ-কথা ভেবে যে প্রেমে পড়ার সম্ভাবনাটাকে একবারে গোড়াসুদ্ধ উপড়ে ফেলা হ'লো। ছেলেবেলা থেকে দু-জনে দু-জনকে সব সময় কাছাকাছি দেখবে ; কাছাকাছি দেখার জন্য ভালোবাসা হবে, অথচ সব সময় দেখার জন্য কোনো অসংযম সম্ভব হবে না ; বড়ো হ'তে-হ'তে এই ধারণা মনের মধ্যে একেবারে গাঁথা হ'য়ে যাবে যে ওরা স্বামী-স্ত্রী, তাই মনে-মনে অন্য কোনো মানুষকে বসাতেই পারবে না সেই জায়গায়—ইচ্ছেটা জাগবার আগে থেকেই ইচ্ছার পরিপূর্ণতার ছবি

চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। মেয়ে যে হঠাৎ একদিন এসে বলবে, 'বাবা, আমি বিমলকে (কি সুরেশকে কি প্রভাতকে) ভালোবাসি, তাকে আমি বিয়ে করবো—' তারপর তা নিয়ে খুনোখুনি করবে, তার আর উপায় রইলো না। বাল্যবিবাহের স্থিতিশীলতার উপর কোর্টশিপের রংটুকু মাখিয়ে দেয়া হ'লো, কাটা পড়লো দুটোরই অনাচার। প্রেমে পড়ার চেহারাটা রইলো, ওরা যদি চায় তা নিয়ে খেলা ক'রে সময় কাটাতে পারে, বন্ধুবান্ধবের কাছে এটাকে প্রেমে-পড়া বিয়ে ব'লে চালাতেও পারে—জানতেও পারবে না যে যে-বস্তুর নাম ওরা করছে তার দ্বীপান্তর হ'য়ে গেছে অনেক আগেই। প্রেমে পড়ার এমন একটা চিরস্থায়ী, অব্যর্থটিকে কে কবে বের করতে পেরেছিলো! নিজের বুদ্ধিতে নিজেই চমৎকৃত হলেন হৃদয়রঞ্জন।

মেয়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল রঙে ফুটে উঠলো তাঁর চোখের সামনে। কোনো হাঙ্গামা নেই, জ্বলুনি-পুড়ুনি নেই ; শান্ত স্থির প্রসন্ন চিত্তে ঠিক সময়ে ঠিক লোকের সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে গেলো। বিয়ের পরে আর ভাবনা কী—কেননা স্মরজিৎ শুধু যে ভালো ছেলে তা তো নয়, অত্যন্ত যোগ্য ছেলেও বটে। ওর বাপের শেষ লক্ষ্য অবশ্য আই. সি. এস. পরীক্ষা—আর ওর রকম-সকম এখনই যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় ঐ গোলোকধামে প্রবেশ না-ক'রে ও ছাড়বেই না।

স্মরজিতের বাড়ির লোকেরাও ধ'রে নিয়েছিলো যে সে আই. সি. এস. হবে। তার দুই কুল তিন পুরুষ সরকারি চাকুরে। পিতামহ ছিলেন পাব্লিক প্রসিকিউটর, মাতামহ দিল্লি-শিমলার মহিমান্বিত কেরানিকুলের অন্যতম। কাকারা মামারা কেউ মুন্সেফ, কেউ ট্যাক্সো-অফিসার, কেউ বা ডিস্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ব, কেউ বা সিভিল সার্জন। এমনকি, তার তিন মেশো আর চার পিশে সকলেই কোনো-না-কোনো ডিপার্টমেন্ট আলো করেছিলেন কিংবা ক'রে আছেন— কেউ পুলিশে, কেউ পোস্টাপিশে, কেউ কৃষিতে, কেউ বাণিজ্যে। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে রায় সাহেব রায় বাহাদুরের ছড়াছড়ি। কোনো পারিবারিক বিবাহ উপলক্ষে সবাই যখন একত্র হন, বাইরের লোকের মনে হয় যে সমস্ত ব্রিটিশ গবর্মেন্টি ঘরে-ঘরে গমগম করছে। খেতাব-খচিত পেনশন-পোষিত রাজসেবার এই রাজপথ কোনো-একদিন আই. সি. এস.-এর কৈলাসে গিয়ে পৌঁছিবে, মনে-মনে সকলেরই এই আশা। এঁদের মধ্যে চেষ্টা ক'রে বিফল হয়েছেন অনেকেই। সকলের সেই সম্মিলিত উচ্চ আশা স্মরজিতের মধ্যে যেন রূপ নিলো। এতদিন ধ'রে এত লোকের আজীবন প্রভুভক্তির পরম অভিব্যক্তি এ-ছেলের মধ্যে দেখা যদি না-দেয়, সেটা অন্যায়, সেটা ভাগ্যের বঞ্চনা।

ছেলে বয়স থেকেই স্মরজিৎ জেনে আসছে যে তাকে আই. সি. এস. হ'তে হবে। প্রস্তুত হচ্ছে ছেলেবেলা থেকেই। নানা বিষয়ে পড়াশুনো করছে, সেই সঙ্গে ব্যায়ামচর্চা। পনেরো বছর বয়সেই তার চাল-চলন রাশভারি হ'য়ে উঠলো, সুদৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে কথা বলে, প্রতিবাদ করে, গুরুজনদের ইংরেজির ভুল শুধরে দেয়। সে যে আই. সি. এস. হবার জন্যই ধরাধামে এসেছে সে-বিষয়ে তার নিজের মনে আর সন্দেহ নেই, অন্যদেরও বুঝিয়ে দেয় সুযোগ পেলেই। কুড়ি টাকা স্কলারশিপ নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে সে যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকলো তখন তার ভাবখানা এমন হ'লো যেন সে আই. সি. এস. হ'য়েই গেছে। ক্লাশের মধ্যে নানারকম কুতর্কের অবতারণা ক'রে প্রোফেসরদের নাজেহাল করতে দারুণ ফুর্তি লাগে তার—বেশির ভাগ প্রোফেসরকে মানুষের মধ্যে গণ্যই করে না, আর সহপাঠীদের কী চোখে দ্যাখে তা না-বলাই ভালো। কোন প্রোফেসরের কত মাইনে, কোন দরের চাকরি, সে-সব খবর তার মুখস্থ ; শুধু তাদের সঙ্গেই সে বিনীতভাবে কথা বলে, যাঁদের খাশ ইম্পীরিয়ল কি নিদেনপক্ষে সুপীরিয়র সার্ভিস। যত রাজ্যের খুচরো খবরের এঁটোকাঁটা কুড়োনোই তার পেশা (আই. সি. এস.-এ ও-ধরনের 'বিদ্যে' খুব কাজে লাগে) ; তাকে জিগেস করো, মেক্সিকোর কোন লেখক সবচেয়ে বিখ্যাত, অস্ট্রেলিয়ার কনস্টিট্যুশন কী, থিওরি অব নম্বর্স কাকে বলে, পজিট্রন-নিউট্রন কী-জিনিশ, পৃথিবীতে পা-দৌড়ে চ্যাম্পিয়ন কে, সোশ্যালিজম আর কম্যুনিজম-এ তফাৎ কী, তক্ষুনি সে নির্ভুল জবাব দিয়ে দেবে। পৃথিবীর এমন-কোনো বড়ো কবি বা দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক বা রাজনীতিক নেই, যাঁর সম্বন্ধে বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুরে সে কথা না বলে, প্রতি মাসের নতুন বইয়ের নাম তার রসনাগ্রে সর্বদা চুলবুল

করে। ম্যাট্রিকে কুড়ি টাকা স্কলারশিপ তো কত ছেলেই পায়, কিন্তু এমন ছেলে হয় ক-টা।

অমিয়াংশুবাবু তখন বগুড়ার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট। ছেলেকে হস্টেলে রেখে, কলকাতার বাসা তুলে দিয়ে তিনি সপরিবারে কর্মস্থলে ফিরলেন। গুপ্ত যখন আছে, ছেলের দেখাশোনার জন্য ভাবতে হবে না। দেখাশোনার জন্য ভাবনা ছিলো না এমনিতেও, স্মরজিৎ সমস্ত বিষয়েই স্বাবলম্বী। অভ্রান্ত নিয়মে দিন কাটে তার। সকালে কলেজ যাবার আগে ঠাশা চার ঘণ্টা পড়াশুনো সে করবেই। রাত জেগে কখনো পড়ে না, পাছে শরীর খারাপ হয়। হস্টেলের খাওয়া যথেষ্ট পুষ্টিকর নয়, নিজের ঘরে ডিম রুটি চীজ বিস্কুটের বন্দোবস্ত আছে তার। ব্যায়াম করতে একদিনও ভোলে না। বিকেলে কখনো টেনিস খেলে, কখনো বাছা-বাছা দু-চারটি বড়োলোকের ছেলের সঙ্গে আড্ডা দেয়, কখনো ঘরে ব'সে রবীন্দ্রনাথ পড়ে—কেননা দু-চার লাইন রবিঠাকুর আওড়াতে না-পারলে পুরোপুরি 'কালচার্ড' হওয়া যায় না। মাঝে-মাঝে সিনেমায় যায়, কেননা অনেককিছু জানা যায় সিনেমা দেখলে। নিয়ম ক'রে সপ্তাহে দু-দিন গুপ্তর বাড়িতে যায়, কিন্তু নিমন্ত্রণ না-করলে খায় না। বিশাখা ততদিনে শাড়ি ধরেছে, নখে ঠোঁটে রং লাগাতে শিখেছে, কিন্তু স্মরজিৎ তাকে বেশি লক্ষ করে না, তার বেশির ভাগ কথা গুপ্ত-সাহেবের সঙ্গেই। একতলায় মেম-মাস্টারনির কাছে ইংরেজি পড়া শেষ ক'রে বিশাখা ফিরে এসে একটু দূরে একটা চেয়ারে বসে, স্মরজিৎ যাবার সময় তার কাছে দাঁড়িয়ে বলে, 'ভালো আছো, শাখা?' বিশাখা বলে, 'তুমি ভালো আছো?' তারপরই স্মরজিৎ নেমে যায়।

এ-বিয়ে ঠিক করবার পরেই গুপ্ত-সাহেব মেয়েকে ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল থেকে ছাড়িয়ে লোরেটো হাউসে ভর্তি করেছিলেন। দু-বছর পরে নতুন বাড়িতে যখন উঠে এলেন, তখন থেকে উঠে প'ড়ে লাগলেন মেয়ের পিছনে। স্মরজিৎ আই. সি. এস হবার জন্য তৈরি হ'তে লাগলো, বিশাখা তৈরি হ'তে লাগলো আই, সি. এস -এর স্ত্রী হবার জন্য। স্কুলের পড়া তৈরি করতে সারা সকাল যায়—সে-পড়ার বহর এত লম্বা যে স্কুল থেকে এসেই আবার বসতে হয়। তারপর সন্ধ্যাবেলা আছে বিবিধ উপসর্গ। সোম আর শুক্রবার গানের ওস্তাদ আসেন, তিনি খেয়ালে তালিম দেন, বুধবারে আর-একজন আসেন রবীন্দ্রসংগীত শেখাতে। মঙ্গল আর শনিবার আসেন মিস হ্যারিস, তিনি ইংরেজি বুকনি অভ্যেস করান আর ফ্রেঞ্চ তর্জমাটা ঘ'ষে-মেজে দেন। মঙ্গলবার বিকেলে একজন বিধবা মহিলা আসেন শেলাই শেখাতে। বুধবার বিকেলে আর রবিবার সকালে আসেন ছবি আঁকার মাস্টার। এই সব ক'রে উঠে যেটুকু সময় বাকি রইলো তাতে গানের রেওয়াজ করতে হবে, বটগাছের ছবিতে রং চড়াতে হবে, স্মকিং-এর ফোঁড় তুলতে হবে, ফরাশি ধাতুরূপ মুখস্থ করতে হবে। অতটুকু মেয়ের পক্ষে এ কি সম্ভব? কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব কি? এখানেও শেষ নয় : বাড়িতে অতিথি এলে গান শোনানো আছে , স্কুলে, বাড়িতে কিংবা বাবার কোনো বন্ধুর বাড়িতে অমিশোল মেয়ে-নাটকে অভিনয় করা আছে— কখনই বা পার্ট মুখস্থ করে, কখনই বা রিহার্সেলে যায়, কিন্তু করতেই হবে, বাবা ছাড়বেন না তা না-হ'লে—তবু কী ভাগ্যিশ বাবা মেয়েদের নাচা পছন্দ করেন না, নয়তো এর উপরে আবার নাচতে হ'তো।

এত সে কেন শিখবে, কখন শিখবে, কেমন ক'রে শিখবে এ প্রশ্ন ছেলেমানুষ-বিশাখার মনেও উঠতে পারতো, কিন্তু ওঠেনি কখনো। অত্যন্ত মৃদু তার স্বভাব, মাথা পেতে মেনে নিয়েছে বাবার নির্দেশ, তার শক্তি অনুসারে প্রাণপণ পরিশ্রম করেছে, ফল ভালো না-হ'লে মন খারাপ করেনি, চলনসই গোছের হ'লেই খুশি হয়েছে। খুব ভালো কোনোটাতেই তার হবে না, এ-কথা অল্প বয়স থেকেই সে কেমন একরকম বুঝে নিয়েছিলো—অথচ সবই তাকে করতে হবে, এ-সব করবার জন্যই তো আছে সে।

এইভাবে দিনের পর দিন কাটতে লাগলো, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। কখনো খেয়ালের ওস্তাদের বদলে এলেন বেহালায় বিলেতি বাজনা শেখাবার ইহুদি মাস্টার, কখনো রবীন্দ্র-সংগীতের বদলে পিয়ানোর শিক্ষয়িত্রী, কখনো ছবি আঁকার ফাঁকে-ফাঁকে চামড়ার উপরে বাতীকের কাজ শেখা হ'লো। শেখা হ'লো মানে দেখা হ'লো। কেউ একজন করলো, সে শুধু দেখলো ব'সে-ব'সে। মনে-মনে ভাবলো, এ-জগতে আরো কত বিদ্যে আছে কে জানে। এ-ও একবার ভাবলো—বিয়েটা হ'য়ে গেলে বাঁচি।

ততদিনে সে বড়ো হয়েছে। তার জন্য আসছে রাশি-রাশি শাড়ি ঝুড়ি-ঝুড়ি গয়না। ভালোই লাগে তার, এ তো বিয়েরই আয়োজনের আরম্ভ। এ-সব শাড়ি-গয়না যে শুধু-শুধু ভালোবেসেই আনা হচ্ছে না, সমস্তই যে তার বিয়ের খরচ থেকে কাটা যাচ্ছে, এ-কথা বাবার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে। গুপ্ত-সাহেব আজকাল কন্যার সঙ্গে বিশেষ-একটু সযত্ন ব্যবহার করেন, মাঝে-মাঝে তাকে নিয়ে এমন-সব বাছা-বাছা সিনেমায় যান, যাতে প্রখর আদিরসাত্মক কোনো দৃশ্য নেই (এ-জন্য বেশির ভাগ ফিল্ম আগে তিনি দেখে নেন) ; বিশাখা খুব ঘটা ক'রে সেজে মুখে-চোখে রং-কালি মেখে মা-বাবার সঙ্গে বক্সে গিয়ে বসে—সিনেমা দেখতে তার ভালো লাগে, কিন্তু খুব ভালো লাগে না। খুব ভালো কিছুই লাগে না তার। মা-বাবার সঙ্গে বছরে দু-একবার তাঁদের কোনো বন্ধুর বাড়িতেও যায় সে, গিয়ে একটি কথা বলে না, কারো দিকে তাকায় না, মাথা নিচু ক'রে চুপচাপ ব'সে থাকে সারাক্ষণ। সমবয়সী কোনো বন্ধু তার নেই, সেজন্য কোনো অভাববোধও নেই। লোরেটোয় বাঙালি মেয়ের সংখ্যা বেশি নয়, যে-ক'টি আছে তারা বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া কেউ কারো বাড়িতে যায় না। দামি উপহার নিয়ে ক্লাশের মেয়েদের জন্মদিনের নিমন্ত্রণে যায়, কিংবা তার জন্মদিনে সমান দামের উপহার নিয়ে তারা আসে—খাওয়া-দাওয়া, খেলা, হেঁয়ালি, এক-আধটু নির্দোষ ফাজলেমি, সবই হয়—কিন্তু সবই ঠিক মাপ-মতো, সবই হিশেব করা ; সন্ধে পেরোতেই যে যার গাড়িতে উঠে বাড়ি ফেরে, আর তার পরেই হয়তো ইংলন্ডের রাজাদের নামের নামতা মুখস্থ করতে বসতে হয়, কিংবা বেহালা শিখতে ব'সে বেহালাটা এমন কাঁদে যে নিজেরই কান্না পায়।

দৈবাৎ এক-আধ দিন এমন হয় যে সন্ধেবেলা তার হাতে কিছুই থাকে না। মা-বাবা হয়তো নেমন্তন্নে বেরিয়েছেন, ভাইয়েরা নিচের ঘরে মাস্টারের কাছে পড়ছে, মস্ত বাড়িটায় নিজেকে একটু একা লাগে তার। রেডিওর কাছে ব'সে যা হচ্ছে তা-ই মন দিয়ে শোনে, খানিক পরে উঠে এসে বসে ঘরের সংলগ্ন বারান্দায়। আলো জ্বালে না ; তাকিয়ে দেখা যায় অস্পষ্ট গাছপালা, খানিকটা আকাশ, কয়েকটি তারা। হঠাৎ তার মনে হয় তার জীবনে যেন কোনো আশা নেই, অর্থ নেই, উদ্দেশ্য নেই। কিসের জন্য এত সব, কিসের জন্য শাড়ি-গয়না, কিসের জন্য ছবি গান ইতিহাস অঙ্ক রবীন্দ্রসংগীত? এর পরে কী হবে তা সে জানে, তার পরে কী হবে তাও জানে, তারও পরে জানে। মা-বাবা আজকাল আলাদা ঘরে শোন ; সে যখন ছোটো ছিলো তাকে নিয়ে একসঙ্গেই শুতেন ; আবছা মনে পড়ে হঠাৎ এক-এক রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে হাত বাড়িয়ে মা-কে সে পেতো না, ভয় করতো। সবই তো জানা, সবই তো পর-পর সাজানো আছে। নতুন কিছু হবে না তার জীবনে, এমন-কিছু হবে না যাতে সে অবাক হবে, যা তাকে হাসাবে, কাঁদাবে, নাচাবে, পাগল ক'রে দেবে। তাহ'লে কেন এ-সব?

বিশাখার মনে এ-সব কথা কোথা থেকে এলো? কোনো কবিতায় কি পড়েছিলো, কোনো ফিল্মে কি শুনেছিলো? কিন্তু কবিতা যাঁরা লেখেন, গল্প যাঁরা বানান, তাঁরা এ-সব কোথায় পান? তাঁদের আগে যাঁরা লিখে গেছেন তাঁদের বই থেকে? প্রাচীনরা প্রাচীনতরদের কাছে? কিন্তু একদিন তো পৃথিবীতে প্রথম কবিতা লেখা হয়েছিলো, সেদিন কোথা থেকে এসেছিলো এ-কথা?

অবশ্য বিশাখার মনে এ-সব কথা উঁকি দিয়েই মিলিয়ে যায়, পরে সে নিজের মনেই লজ্জিত বোধ করে। যদিও কাছাকাছি কেউ নেই, আর থাকলেও তাকে দেখে বুঝবে না সে কী ভাবছে, তবু ত্রস্ত চোখে চারদিকে তাকায়, তারপর দ্রুত বেগে বারান্দা থেকে চ'লে আসে পড়ার ঘরে, খাতা কলম বের ক'রে কলকাতার দৃশ্যবস্তু সম্বন্ধে ইংরেজিতে রচনা লিখতে বসে।

এমনি এক হঠাৎ-ছুটি-পাওয়া সন্ধ্যায় স্মরজিৎ এলো। বিশাখা ড্রয়িংরুমে ব'সে একটি বিলেতি স্বরলিপির বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলো, তাকে দেখে চোখ তুলে বললে, 'এসো।'

স্মরজিৎ তখন থার্ড ইয়ারে। ততদিনে পাকা যুবক হয়েছে সে, চেহারাটি ভরেছে, কামানো দাড়ির নীলচে আভার পুরুষালি শ্রী যদিও তখনও ফোটেনি, সরু একটু গোঁফ রেখে সেটা পুষিয়ে নিয়েছে। বয়সের তুলনায় একটু বড়োই দেখায় তাকে। সেটা দরকার, তেইশ বছর বয়সে একটা মহকুমার কর্তা হ'বে তো। ছেলেমানুষ দেখালে, কিংবা ছেলেমানুষি ভাব থাকলে চলবে না।

স্মরজিৎ জিগেস করলে, 'তোমার বাবা কোথায়, শাখা?'

'মা বাবা দু'জনেই বেরিয়েছেন।'

'কখন ফিরবেন?'

'দেরি হবে। প্রথমে তাঁরা সিনেমায় যাবেন, সেখান থেকে একটা বিয়ের নেমন্তন্নে।'

'তুমি গেলে না?'

বিশাখা হঠাৎ বললে, 'আমি গেলে কি ভালো হ'তো? অত দূর থেকে তুমি এসে ফিরে যেতে।'

স্মরজিৎ বিশাখার দিকে একবার তাকিয়ে একটু গম্ভীর হ'লো।

'দাঁড়িয়ে আছো কেন? বোসো।'

বিশাখা ব'সে ছিলো একটা লম্বা সোফায়, সৌজন্যসূচক প্রচুর ব্যবধান রেখেও ওটাতে বসা যেতো, কিন্তু স্মরজিৎ অন্য একটা চেয়ারে ব'সে বললে, 'তোমার পড়াশুনো কেমন চলছে?'

'ভালো।'

'আজ তোমার মাষ্টার মশাইরা কেউ আসেননি?'

'নাঃ', নিজের অজান্তে ফোঁশ ক'রে একটা নিশ্বাস পড়লো বিশাখার। স্মরজিৎ তার হাতের বইটাব দিকে তাকিয়ে বললো, 'পিয়ানো শিখছো?'

'শিখছি কি আর—ঐ একরকম—'

'একটু বাজাও না।'

'পারি না।'

'পারবে, পারবে, চেষ্টা করলেই পারবে,' স্মরজিৎ উৎসাহ দিয়ে বললো। 'আমি ছেলেবেলায় অঙ্কে ভীষণ কাঁচা ছিলুম, জানো তো। একবার হাফ-ইয়ার্লিতে বারো পেয়েছিলুম। তারপব অঙ্ক নিয়ে এমন উঠে-প'ড়ে লাগলুম যে ছ-মাসে সমস্ত অ্যারিথমেটিক অ্যালজেব্রা জল-ভাত হ'য়ে গেলো। তারপব আব কোনো পরীক্ষায় নব্বুইয়ের নিচে নামিনি।'

বিশাখা একটু হেসে বললো, 'আমি কি আর তোমার মতো!'

কথাটা শুনে স্মরজিৎ খুশি হ'লো। বিশাখার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বললে, 'তোমার কানেব গয়নাটা নতুন দেখছি।'

বিশাখা কানে একবাব হাত দিযে একটু লজ্জিতভাবে চুপ ক'রে বইলো।

'বেশ মানিয়েছে।'

'কী বললে?'

'বললুম, ভালো হয়েছে।'

'ভালো হয়েছে, না ভালো দেখাচ্ছে?'

'ও একই কথা।'

'না—একই কথা হবে কেন?' বিশাখা একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে বললে, 'এই মস্ত-মস্ত সোফাগুলোর একটা অসুবিধে এই যে দু-জনে বড্ড দূরে-দূরে বসতে হয়, ভালো ক'রে গল্প করা যায় না। তুমি এখানে এসো না।'

'আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।'

'এক্ষুনি যাবে?'

'হ্যাঁ, যাই—কাকাবাবুর সঙ্গে একটু দরকাব ছিলো, তা তাঁর আসতে তো দেরি হবে বলছো।' স্মরজিৎ উঠে দাঁড়ালো।

বিশাখা হঠাৎ হেসে ফেলে বললে, 'আরো বড়ো হ'লে তুমি ঠিক আমার বাবার মতো হবে।'

'তোমার বাবার মতো হ'তে পারলে তো ভালোই।'

'ভালো ব'লেই তো বলছি। পৃথিবীর সমস্ত ভালোর তুমিই তো নিদর্শন।' বিশাখা আবার হাসলো, এবার খিলখিল করে।

'ও-রকম হাসছো কেন বার-বার?'

'কী জানি', স্মরজিতের চোখের দিকে তাকিয়ে বিশাখা থমকে গেলো।

'এ-রকম খামকা হাসতে তো তোমাকে দেখিনি কোনোদিন। আজ তোমার হয়েছে কী?'

বিশাখা বললে, 'চলো না বারান্দায় গিয়ে বসি। এখানে বড্ড গরম।'

'এমন আর গরম কী। পাখা চলছে তো।'

'আমার ভালো লাগছে না, আমি যাই,' স্মরজিতের দিকে আর না-তাকিয়ে বিশাখা হনহন ক'রে বারান্দায় গিয়ে একটি ইজি-চেয়ারে এলিয়ে পড়লো।

স্মরজিৎ তার পিছন-পিছন এসে বললে, 'কী হ'লো? শরীর খারাপ হয়নি তো?'

'হ্যাঁ, মাথা ধরেছে বড্ড।'

'মাথা ধরেছে!' স্মরজিৎ ব্যস্ত হ'য়ে দেয়াল হাৎড়ে আলো জ্বাললো। 'কই, দেখি। তাই তো, চোখ যে ছলছল করছে। জ্বর না হয় আবার।' ঝুঁকে প'ড়ে বিশাখার কপালে হাত রেখে বললে, 'গা-টা তো একটু গরমই মনে হচ্ছে।'

সবেগে তার হাত সরিয়ে দিয়ে বিশাখা বললে, 'তুমি কি ডাক্তার নাকি? গায়ে হাত দিয়ে জ্বর বলতে পারো!'

স্মরজিৎ বললে, 'ডাক্তার হ'লে ভালো ডাক্তারই হতাম। এই দ্যাখো না তোমাকে সারিয়ে দিচ্ছি। বাড়িতে অ্যাস্পিরিন আছে নিশ্চয়ই? ল্যাভেন্ডারও আছে?'

'কোথায় কী আছে আমি জানি না!'

'কী ছেলেমানষি করো—বলো না কোথায় আছে।'

'বলছি, জানি না!'

'তাহ'লে দোকান থেকে আনিয়ে দিই। মাথা-ধরায় এ-রকম কষ্ট পাওয়া কি ভালো? দুটো অ্যাস্পিরিন খেয়ে কপালে একটু ল্যাভেন্ডারের জল-পটি লাগিয়ে চুপ ক'রে শুয়ে থাকো—সেরে যাবে।'

'না, না, অ্যাস্পিরিন আমি খাবো না।'

'সে কী কথা! অ্যাস্পিরিন খাবে না কেন? ওতে হার্ট খারাপ হয় শুনেছো বুঝি? ও কিছু না—বেশি ক'রে একটু জল খেয়ো, তাহ'লেই অ্যাস্পিরিনের দোষ কেটে যাবে।'

'ম'রে গেলেও অ্যাস্পিরিন খাবে না আমি। উঃ, আলোটা নিবিয়ে দাও.' বিশাখা দু-হাতে চোখ ঢাকলো।

'থাক না। খুব কি অসুবিধে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, অসুবিধে হচ্ছে, খুব অসুবিধে হচ্ছে,' বিশাখা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো।

আলো নিবিয়ে দিয়ে স্মরজিৎ আবার এসে দাঁড়াতেই বিশাখা বললো, 'তুমি না তখন যাচ্ছিলে? যাও না—দাঁড়িয়ে আছো কিসের জন্য?'

'তোমাকে অসুস্থ ফেলে কেমন ক'রে যাই!'

'রোগীর পরিচর্যাই বুঝি তোমার পেশা?'

'তুমি আজ বড্ড বাজে বকছো, শাখা!'

'বেশ তো, বাজে কথা শোনবার জন্য দাঁড়িয়ে আছো কেন? যাও না তুমি!'

একটু চুপ ক'রে থেকে স্মরজিৎ বললে, 'ওঁরা কোন সিনেমায় গেছেন বলো তো? টেলিফোনে একটা খবর দেবার চেষ্টা করি।'

'কেন, খবর দেবার কী হয়েছে? আমি কি ম'রে যাচ্ছি?'

'তাহ'লে অনিল-সুনীলদের ডেকে আনি নিচে থেকে।'

'কিছু-একটা না-করলে বুঝি তোমার বিবেক মানছে না? তাহ'লে এক কাজ করো—আমার কাছে এসে বোসো, মাথাটা একটু টিপে দাও।'

'আমি—মাথা-ধরার মাসাজ আমি ঠিক জানি না।'

হাসি-কান্নার মাঝামাঝি অদ্ভুত একটা আওয়াজ ক'রে বিশাখা হেসে উঠলো। অত্যন্ত অবাক হ'য়ে স্মরজিৎ বললে, 'নাঃ, শরীরে কিছু-একটা গোলমাল হয়েছে তোমার। বোধহয় লিভর ফাঙ্কশন ভালো হচ্ছে না। ডাক্তার দেখানো উচিত।'

'ডাক্তার হ্যাঁ, ডাক্তার উঃ!' হাসতে হাসতে বিশাখা গোল হ'য়ে গেলো।

'আমি কি হাসির কথা কিছু বলেছি?' স্মরজিতের কথায় যেন আস্ত রাইটার্স বিল্ডিং এর গাম্ভীর্য।

'না, না হাসির কথা '

আর-কোনো কথা বিশাখা বের করতে পারলো না মুখ দিয়ে। এক ঝটকায় উঠে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে চ'লে গেলো শোবার ঘরে, আছাড় খেয়ে পড়লো বিছানাটার উপর, বালিশে মুখ চেপে হু হু ক'রে কেঁদে উঠলো। কাঁদতে-কাঁদতে তার জিভ শুকিয়ে গেলো, নাক বন্ধ হ'লো দম আটকে এলো তবু কান্না থামে না।

স্মরজিৎ পরদার বাইরে দাঁড়িয়ে কান্নার শব্দ শুনতে-শুনতে ভাবতে লাগলো ঘরে ঢোকা তার উচিত হবে কিনা। বিমূঢ় সে কখনোই হয় না, যে-কোনো অবস্থায় নিজের কর্তব্য ঠিক বুঝতে পারে চটপট মনস্থির করতে না-পারলে আই সি এস-এর কাজ চালানো শক্ত—কিন্তু এখন তার মনস্থির করতে একটু সময় লাগলো, কেমন একটু বিমূঢ় হ'য়ে পড়লো সে। মনের জোরে সে ভাবটা কাটিয়ে উঠলো নিঃশব্দে স'রে এলো দরজার কাছ থেকে। না, ঘরে ঢোকাটা ঠিক হবে না তার, শাখা তো আর ছেলেমানুষ নেই। ও কেন কাঁদছে তা যদি সে জানতো, তাহ'লে প্রতিকারের জন্য উঠে প'ড়ে লাগতো নিশ্চয়ই কিন্তু তা যখন জানে না, জানবার উপায়ও নেই, তখন আর কী করা যাবে। কোনো কারণ উপলক্ষ বা অর্থ নেই, অথচ কেউ যদি পাগলের মতো কাঁদে সেটাকে সাময়িক পাগলামি ব'লেই ধ'রে নিতে হবে—সে বিষয়ে কিছু করতে যাওয়াই ভুল, যথাসময়ে আপনিই সারবে। স্মরজিৎ তার বয়সে নানারকম বই ই পড়েছে, এ খবরটাও সে রাখে যে বিশেষ একটা বয়সে মেয়েদের মন মেজাজের বড়ো ওলোট-পালোট হয়। এ-ও হয়তো তা ই। একা একা শুয়ে থাক কাল সকালে উঠে আজকের কথা ভেবে নিজেই লজ্জিত হবে।

স্মরজিৎ ভুল ভাবেনি, এই কান্নার কথা মনে ক'রে অনেক দিন পর্যন্ত বিশাখার ম'রে যেতে ইচ্ছে করেছে লজ্জায়। কেন সেদিন ও-রকম করেছিলো সে, কেন হেসেছিলো কেঁদেছিলো কী সে চায় কিসের দুঃখ তার, এ সব কোনো কথাই তার কাছে স্পষ্ট নয়। সব তার মনেও পড়ে না কী বলেছিলো কী করেছিলো সবই ঝাপসা লাগে, সেদিনের কথা ভাবলে এইটে শুধু তার মনে হয় যেন সে একটা নৌকোয় যেতে-যেতে হঠাৎ গভীর জলে প'ড়ে যাচ্ছিলো, অনেক কষ্টে সামলে বেঁচে উঠেছে। সেই বেঁচে ওঠার কৃতজ্ঞতায় সে দ্বিগুণ বেগে মন দিলো নির্দিষ্ট কর্মতালিকায়। পড়া তৈরি করে গায় বাজায়, ছবি আঁকে, পুতুলের মতো সেজে ড্রয়িংরুমে বসে, ঝলমলে হ'য়ে মা বাবার সঙ্গে সিনেমায় যায়, বড়োদের পার্টিতেও যায় মাঝে-মাঝে। সপ্তাহের প্রতিটি দিন, দিনের প্রতিটি ঘণ্টা যে কাজ আর আমোদের খাওয়া আর ঘুমোনোর নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা—এই নিশ্চিন্ত নিস্পৃহ স্থায়িত্ব তার দেহে এক পরদা মেদের চেকনাই আনলো। যেদিন কেঁদেছিলো সেদিন তার বয়স ছিলো চোদ্দ, তারপর তার পনেরো হ'লো, ষোলো হ'লো, সতেরো, আঠারো হ'লো, কিন্তু ও-রকম দুর্ঘটনা আর ঘটলো না।

সে-বছর সে সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করলো আর স্মরজিৎ আই সি এস পরীক্ষায় প্রথম হ'য়ে বেরুলো। খবরটা পাওয়া গেলো জুন মাসে, সেপ্টেম্বরে সে বিলেতে যাবে। তার আগে বিয়েটা সারতে হয়।

তখন য়োরোপের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। হিটলার অর্ধেক য়োরোপ দখল করেছে ইংলন্ডে বোমা পড়ছে ঘন-ঘন। বিশাখার মা অমলা দেবী স্বামীকে বললেন, 'বিয়েটা এখনই দেবে, না ফিরে এলে '

গুপ্ত বললেন, 'না, না, আর দেরি না। এই শ্রাবণ মাসেই—'

'বিলেতে যে-রকম বোমা-টোমা পড়ছে শুনছি—'

গুপ্ত গলা চড়িয়ে বললেন, 'ছী-ছি, এ কথা তুমি ভাবতে পারলে! মেয়ের কপালে যদি দুঃখ থাকে

তো খণ্ডাবে কে?'

অমলা দেবী বললেন, 'তা বলছিলাম না, তবে একটা উদ্বেগ তো। চিঠিপত্রও সময়মতো আসবে না---'

'বিয়ে না-হ'লেই কি উদ্বেগ কম হবে? ওকে তো আমরা জামাই ছাড়া কিছু ভাবি না।'

'আমাদের কথা নয়, শাখার কথা ভাবছিলাম।'

'শাখার পক্ষেও একই কথা।'

'তবু—বিয়ে হওয়া আর না-হওয়াতে তফাৎ আছে।'

গুপ্ত বললেন, 'তা আছে ব'লেই তো বিয়েটা এখনই হওয়া ভালো। আমি বিয়ে ক'রেই বিলেতে গিয়েছিলাম, আমার জামাইও তা-ই যাবে—ভাবতে ভালোই লাগছে আমার।'

ভালোই. অমলা দেবী মনে-মনে ভাবলেন। বিলেতে যে যায় তার বোধহয় ভালোই লাগে। কিন্তু যে প'ড়ে থাকে? কোন সুদূরের স্মৃতি তাঁর মনে ভেসে এলো। তাড়াতাড়ি ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে আইসক্রীম বানাতে বসলেন।

গুপ্ত স্মরজিৎকে বললেন, 'বিলেত যাবার আগেই কিন্তু বিয়ে।'

স্মরজিৎ বললে, 'কেন, আপনার কি ভয় হচ্ছে আমি বিলেতে গিয়ে মেম বিয়ে করবো? আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন আমাকে—আপনার কন্যাকে ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে স্ত্রী ব'লে ভাবা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

কথা শুনে গুপ্ত অবাক হলেন, কিন্তু আই. সি. এস হ'লে মানুষ একটু উদ্ধত হয়ই, এটা মেনে নিতে হবে। বললেন, 'সে-কথা নয়—আমি জিগেস করছিলাম, এখন বিয়ে করতে তোমার আপত্তি নেই তো?'

'না, আপত্তি কিসের।'

'তোমার বাবারও তা-ই ইচ্ছা!'

'বেশ তো। বিয়ে তো হবেই—যে-কোনোদিন হ'লেই হয়।'

এর পরে গুপ্ত মেয়েকে বললেন, 'শ্রাবণ মাসেই বিয়েটা হ'য়ে যাক, কেমন?'

বিশাখা ক্ষীণস্বরে বললে, 'আমাকে আর জিগেস করছো কেন, বাবা।'

'তোর বিয়ে, তোকে জিগেস করবো না?'

কথাটা শুনে বিশাখার চমক লাগলো। সত্যি তো, তারই বিয়ে। বুকের ভিতরটা দুরদুর ক'রে উঠলো তার।

বিয়েতে অনেক ঘটা হ'লো। গুপ্ত খরচ ধ'রে রেখেছিলেন পঁচিশ হাজার, কিছু বেশি হ'লো। যৌতুকের মধ্যে টালিগঞ্জে এক খণ্ড জমি এবং একটি মোটর-গাড়িও ছিলো। অমিয়াংশুবাবু তখন বাঁকুড়ায়—সেখানে গাড়ি চালাবার পথ-ঘাট আছে, ঝকঝকে গাড়ি নিয়ে সগর্বে স্বস্থানে ফিরলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। গুপ্ত আকণ্ঠ খুশি করেছেন তাঁকে, গা বেয়ে খুশি ঝরছে।

বিয়ের লগ্ন ছিলো রাত বারোটায়, স্ত্রী-আচারের হাঙ্গামা শেষ ক'রে বর-কন্যার শুতে-শুতে প্রায় তিনটে বাজলো। যে-ঘরে বিশাখা আট বছর ধ'রে মা-র সঙ্গে শুয়েছে, যে-ঘরে চার বছর আগে একদিন সে কেঁদেছিলো, আজ তার বাসরশয্যা সেই ঘরে। মা-র বিয়ের উঁচু, চওড়া জমকালো-কাজ-করা খাট সরিয়ে তার বিয়ের নিচু, নিরাভরণ, ছিমছাম জোড়া-খাট পাতা হয়েছে; কিন্তু বিয়ের রাত্রের খাটে শুতে নেই, মেঝেতে গদির উপর সিলেটের চিকন পাটি বিছো'না, সেখানে ব'সে-ব'সে তারা চাল খেলেছে, জলে শোলা ভাসিয়েছে, বর্ষীয়সীদের ঠাট্টা সহ্য করেছে—সেখানেই বাকি রাতটুকু তারা শোবে। এক কোণে জ্বলছে প্রদীপ, ঘরের মধ্যে ফুল, চন্দন আর বিলিতে এসেন্স মেশানো একটা গন্ধের আচ্ছন্নতা।

যে-মুহূর্তে তারা একা হ'লো, স্মরজিৎ ব'লে উঠলো, 'উঃ, কী-সব অসভ্য প্রথা! কবে যাবে এগুলো দেশ থেকে!' ব'লেই উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বাধা পেলো। আঁচলে-আঁচলে গেরো বাঁধা। গাঁটছড়া খুলতে-খুলতে আবার বললো, 'বিয়ে করা এত কষ্ট কে জানতো। তোমার ঘুম পায়নি?'

বিশাখা জবাব দিলো না।

'সাত পা হাঁটলেই তো আইনের চোখে বিয়ে হ'য়ে যায়—এগুলো আর কেন? এর পরেও আরো কী-সব আছে শুনছি। একেবারে মেরে ফেলবে।' বিশাখাকে নিরুত্তর দেখে স্মরজিৎ আবার বললো, 'ঘুমুলে নাকি?'

'না।'

'চটপট ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করো, কাল সকাল থেকেই তো আবার আছে,' বলতে-বলতে স্মরজিৎ উঠে দাঁড়ালো। 'আমি যাই—একটু হাত-পা ছুঁড়ে আসি। এতক্ষণ ঠায় ব'সে থেকে-থেকে গা ব্যথা হ'য়ে গেছে।'

স্মরজিৎ বাথরুমে ঢুকলো, বিশাখা শুয়ে-শুয়ে শুনলো তার ব্যায়াম করার হুশহুশ শব্দ, তারপর জলের ছলছলানি। মিনিট দশেক পরে বেরিয়ে এলো শাদা পাজামা আর গেঞ্জি প'রে। গেঞ্জি-পরা স্মরজিৎকে বিশাখা বড়ো হ'য়ে কখনো দ্যাখেনি, তার কেমন লজ্জা করলো। বললে, 'বিয়ের কাপড় ছাড়লে কেন?'

'বাব্-বাঃ! ও-সব প'রে মানুষ শুতে পারে! তুমি ও-সব জবড়জং প'রেই থাকবে নাকি?'

'বিয়ের রাতে বিয়ের কাপড় ছাড়তে নেই।'

'ও-সব কুসংস্কার তোমারও আছে!' স্মরজিৎ হাসলো।

'গরদের পাঞ্জাবিটা পরো না—বেশ দেখাচ্ছিলো।'

'না, না—গেঞ্জি প'রে শোওয়া আমার অভ্যেস।' স্মরজিৎ শুয়ে পড়লো। হঠাৎ বললো 'অতগুলো গয়না প'রেই ঘুমুবে? অসুবিধে হবে না?'

কথা না-ব'লে বিশাখা পাশ ফিরলো। রিনিঠিনি বেজে উঠলো চুড়ি। এই মৃদু আওয়াজটি তার নিজেরই ভারি ভালো লাগলো, ভারি নতুন ঠেকলো কানে। এর আগে হাজার বার গয়নার আওয়াজ হয়েছে তার গায়ে, কিন্তু এমন কখনো লাগেনি।

'ওঃ-হো! দবজাটা বন্ধ আছে তো?' স্মরজিৎ লাফিয়ে উঠলো। মিটিমিটি আলোয় সুন্দর দেখালো তার বেতের মতো শরীর! দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে আবার এসে শুলো, বেড়ালের মতো একবার গায়ের আড়মোড়া ভেঙে বললে, 'ওদিকে ফিরে আছো কেন? শোনো একটা কথা।'

বিশাখা আবার পাশ ফিরলো। রিনিঠিনি বাজলো চুড়ি।

স্মরজিৎ তার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললে, 'কেমন লাগছে?'

বিশাখা চোখ বুজে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগলো।

স্মরজিৎ গম্ভীর স্বরে বললো, 'আমাকে বিয়ে ক'রে তুমি সুখী হয়েছো?'

'তুমি?'

'আমি নিশ্চয়ই সুখী হয়েছি—না-হয় আই. সি. এস.-ই হয়েছি, তবু এর চেয়ে ভালো বিয়ে আমার আব কী হ'তে পারে কিন্তু তোমার বাবা মস্ত ধনী—তিনি হয়তো এর চেয়েও ভালো বিয়ে দিতে পারতেন। এ-কথা কি কখনো তোমার মনে হয়?'

'এ-বিয়েও তো বাবাই দিলেন।'

'তা-ই বলছি। যা-ই হোক, আশা করি অনুশোচনা তাঁকে কখনো করতে হবে না। তোমাকে সুখী করবার আপ্রাণ চেষ্টা আমি করবো, শাখা।' একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললে, 'আমরা এখন স্বামী-স্ত্রী।' তারপর মুখ বাড়িয়ে বিশাখার মুখের উপর চুম্বন ক'রে পাশ ফিরতে-ফিরতে বললে, 'এখন ঘুমোও—আর জাগলে কাল আর দাঁড়াতে পারবে না।'

একটু পরেই স্মরজিৎ ঘুমিয়ে পড়লো।

বিয়ের হৈ-চৈ চুকতে দিন দশেক লাগলো। তারপর দু-জনে গেলো বাঁকুড়া, সেখানে আর-এক প্রস্থ হৈ-চৈ। সে-পালা যখন শেষ হ'লো তখন স্মরজিতের বিলেত রওনা হবার আর এক মাস মাত্র বাকি।

এই এক মাস কলকাতা-বাঁকুড়া টানা-পোড়েনে কাটলো। বিশাখা রইলো কলকাতায়। সবই সে-রকম আছে, সেও কিছু বদলায়নি, শুধু একজনের স্ত্রী হয়েছে ব'লে কোনোরকম বিদ্যাশিক্ষার আর তার

প্রয়োজন নেই। গানের ওস্তাদ, ছবির মাষ্টার, শেলাইয়ের শিক্ষয়িত্রী সকলেই বিদায় হলেন ; বেহালা পিয়ানো ফ্রেঞ্চ গ্রামারের ভূত নামলো ঘাড় থেকে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো বিশাখা।

বাঁচলো—মানে, ছোটো-ছোটো গুরুর হাত ছাড়িয়ে বড়ো গুরুর হাতে পড়লো। স্মরজিৎ তার ছাত্রজীবনের অনেকগুলি বই এ-বাড়িতে নিয়ে এসেছে।—বিশাখার সেগুলি পড়া চাই। মার্ক্স, ফ্রয়েড, আইনস্টাইন সবই নাকি বুঝতে হবে তাকে, নয়তো সে 'এ-যুগের উপযোগী' হ'তে পারবে না। বইগুলোর পাতা উল্টিয়ে বিশাখা অবাক হ'য়ে যায়। বাপরে, এ-সব বই পড়েছে স্মরজিৎ? প'ড়ে বুঝেছে!

বইগুলোর মধ্যে একখানা ছিলো মোটাসোটা কালো মলাটের, একদিন সেটা বের ক'রে স্মরজিৎ বললো, 'এটা পড়েছো?'

বিশাখা মাথা নাড়লো। সত্যি বলতে, কোনো বই-ই সে পড়েনি।

'এটা পোড়ো। এটা পড়া তোমার অত্যন্ত দরকার।'

বিশাখা একবার বইটার নামের দিকে, একবার স্মরজিতের মুখের দিকে তাকালো।

'তোমার বুঝি অবাক লাগছে? এ-সব বিষয়ে যে বই আছে তা বুঝি জানতেও না?'

'কী হয় এ-সব প'ড়ে?'

'কী হয় মানে? সকলেরই বিয়ে করার আগে এ-বিষয়ে পড়া উচিত।'

বিশাখা বইখানা হাতে নিয়ে পাতা উল্টিয়ে দেখলো। পাতায়-পাতায় লাল পেনসিলের দাগ। স্মরজিৎ খুব যত্ন নিয়েই পড়েছে। প্রথম পাতায় স্মরজিতের নাম লেখা, তলায় তারিখ বসানো। দু-বছর আগে কিনেছে বইখানা।

স্মরজিৎ আবার বললে, 'আমাদের দেশে সেক্স সম্বন্ধে কোনো এডুকেশনই তো হয় না—অথচ প্রত্যেক ছেলেমেয়ের শিক্ষার এটা অঙ্গ হওয়া উচিত।'

বিশাখা বোকার মতো বললো, 'এ-বিষয়ে আবার শেখবার কী আছে।'

'ঐ তো! তোমারও তা-ই ধারণা! পড়ো, পড়ো, তাহ'লেই বুঝবে কত শেখবার আছে! এ-সব না-পড়লে বিবাহিত জীবন সুখের হয় না।'

বই প'ড়ে বিবাহিত জীবনে সুখী হ'তে হয়, এ-খবর বিশাখার কাছে নতুন। কিন্তু তর্ক করতে সে পারে না। সেদিন দুপুরবেলা স্মরজিৎ যখন স্যাটের ট্রায়াল দিতে বেরিয়ে গেলো, তখন সে বইখানা নিয়ে বসলো। অর্ধেক কথারই মানে সে জানে না, কিন্তু একটু-একটু ব্যাপারটা যেন আঁচ করতে পারলো। যেখানে-যেখানে স্মরজিৎ দাগ দিয়েছে, সে-রকম দু-একটা জায়গা ভালো ক'রে বোঝবার চেষ্টা করলো। কী বুঝলো সে-ই জানে, হয়তো ভুলই বুঝলো, কিন্তু হঠাৎ অত্যন্ত মন-খারাপ হ'য়ে গেলো তার। এ-বই স্মরজিৎ দু-বছর আগে প'ড়ে ফেলেছে, হয়তো তার আগেও এ-ধরনের বই পড়েছে, এ-সব জ্ঞান কবে থেকে মনের মধ্যে বহন করছে সে? বিশাখা উঠে তাড়াতাড়ি বাথরুমে গেলো, চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে শাড়িটা বদলে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো।

সে-রাত্রে স্মরজিৎ যখন তাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরতে গেলো, সে ব'লে উঠলো, 'না, না --'

'কেন, কী হ'লো?'

'ভালো লাগছে না আমার—' বিশাখা ছিটকে দূরে স'রে গেলো। কিন্তু শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙে সে নিজেই হাত বাড়িয়ে স্বামীকে সজোরে চেপে ধরলো বুকের মধ্যে। স্মরজিৎ চোখ মেলে তাকালো, তারপর নিজেও উদ্বেল হ'লো, কিন্তু পরে, জানালায় ভোরের প্রথম আভা দেখতে-দেখতে বিশাখার আবার মন-খারাপ হ'য়ে গেলো। কেউ যেন তাকে কথা দিয়ে কথা রাখেনি, তাকে ফাঁকি দিয়েছে, ঠকিয়েছে। পৃথিবীর সব কথাই কি বইয়ে লেখা আছে, পৃথিবীর সব জিনিশই আগে থেকে ঠিক হ'য়ে আছে—এমন-কিছু নেই যা ভাবা যায় না, জানা যায় না, যা হঠাৎ এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ডুবতে-ডুবতেও বোঝা যায় না যে ডুবছি?

স্মরজিতের যাবার দিন এসে পড়লো। এ-দু'বছর বিশাখা বাপের বাড়িতে থাকবে, এবং এ-দু'বছর

সে কী ক'রে কাটাবে তার একটা খশড়াও স্মরজিৎ ক'রে ফেলেছে। পড়াশুনো করবে, নিজের পুরোনো বইগুলি ছাড়াও আরো অনেক নতুন বই সে স্ত্রীর জন্য কিনে এনেছে—তার মধ্যে বাংলা গল্পের বইও আছে কয়েকখানা। কিন্তু কোনো পরীক্ষা পাশ করতে না-হ'লে শুধু বই প'ড়ে সময় কাটানো শক্ত, তাই স্মরজিৎ ব্যবস্থা কবলো যে বিশাখা ছবি আঁকাটা ভালো ক'রে শিখবে। তার মতে ছবি আঁকায় হাত আছে বিশাখার। বিশাখা আপত্তি করেছিলো—আর তার ভালো লাগে না এ-সব—কিন্তু স্মরজিৎ তার কথা কানেই তুললো না, শ্বশুরের সঙ্গে কথা ব'লে সব ঠিক ক'রে ফেললো। গুপ্তর খুব উৎসাহ—তক্ষুনি ছবি আঁকার মাস্টার ঠিক ক'রে ফেললেন। বিশাখা এ-পর্যন্ত তিনজনেব কাছে ছবি আঁকা শিখেছে, তার মধ্যে শেষ যিনি ছিলেন, সে-ভদ্রলোকের ছবির জগতে একটু নামই আছে, কিন্তু তাঁকে যখন বাখা হ'লো, তার দু-মাস পরেই বিয়ে হ'য়ে গেলো ব'লে তাঁর কাছে কিছু শিখে নেবাব সুযোগ বিশাখাব বড়ো-একটা হয়নি। তাঁকেই আবার ডেকে আনা হ'লো, তাঁব সঙ্গে কথা ব'লে স্মবজিৎও অপছন্দ করলো না। আগে তিনি সপ্তাহে দু-দিন আসতেন, এবার ঠিক হ'লো চার দিন ক'রে আসবেন—একটু ঘন-ঘন না-হ'লে কিছু শেখা হয় না—আগে গুপ্ত-সাহেব পঞ্চাশ টাকা ক'রে দিতেন, এবার দেবেন একশো ক'বে। অসীমবাবু রাজি হলেন—রং তুলি কাগজ আরো কী-কী দরকার তার একটা ফর্দ দিযে গুপ্তকে আর স্মরজিৎকে আলাদা-আলাদা ক'বে বিদায় নিলেন।

স্মরজিৎ পরের দিনেই রং তুলি ইত্যাদি নিয়ে এলো। শুধু তা-ই নয়, শ্বশুবকে ব'লে তেতলার ঘরটাকে ছবি আঁকার স্টুডিও বানিয়ে নিলো সে। আগেকাব মতো শাখা একতলায ব'সে ছবি আঁকা শেখে, এ তার ইচ্ছে নয়। তেতলায় শখ ক'রে একটিমাত্র ছোটো ঘব কবেছিলেন গুপ্ত—উত্তবটায দেয়ালের বদলে ঘষা কাচ দিযেছেন—কোনো-এক কালে এটি তাঁব স্ত্রীর ঠাকুবঘব হ'তে পাববে. সেই দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিলো। কিন্তু অমলা দেবীর মন এখনো ঠিক ঠাকুবঘরেব দিকে যাযনি, ঘবটি তাই প্রায ব্যবহারই হয় না, মাঝে-মাঝে ভোরবেলা গুপ্ত-সাহেব গিয়ে একটু বসেন, কি ছুটিব দিনে ছেলেবা লাইন পেতে বেলগাড়ি চালায। স্মবজিৎ বললে, 'কী সুন্দর নর্থ লাইট, স্টুডিওর পক্ষে একেবারে আইডিয়েল।' গুপ্ত তক্ষুনি উৎসাহে টগবগ করতে-করতে ঘর থেকে ছেলেদেব খেলা সব সরিযে দিলেন, ছোটো একটা পাখা বসালেন, দেয়াল ঘেঁযে সোফাও বাখলেন একটি—আঁকতে-আঁকতে ক্লান্ত হ'যে বিশ্রাম কববে। বিশাখা বিরক্ত হ'য়ে বললে, 'কী আরম্ভ করেছো তোমরা—কত যেন আমি ছবি আঁকবো।'—স্মরজিৎ বললে, 'আঁকবে না কেন, নিশ্চয়ই আঁকবে—একদিন যে তুমি খুবই ভালো আঁকবে না, তা কি কেউ বলতে পারে?'

যাবার আগের দিন বাত্রে স্মরজিৎ স্ত্রীকে বললে, 'আমি চ'লে যাচ্ছি, কষ্ট হচ্ছে না তোমার?'

বিশাখা বললে, 'সেটা কি আমার মুখের কথায় শুনতে চাও?'

'আমারও খারাপ লাগছে খুব। যুদ্ধ না-থাকলে তোমাকে নিযেই যেতাম।'

যুদ্ধ কথাটা উচ্চাবিত হ'তেই বিশাখা চকিত হ'লো। একটু পবে বললো, 'না-গেলে চলে না?'

'কোথায় না-গেলে?'

'বিলেতে।'

'কী যে বলো!' স্মরজিৎ হেসে উঠলো।

'তুমি যদি আই. সি এস. না-হ'তে, অন্য কিছু তো হ'তে।'

'তুমি কি আমাকে আই. সি এস. ছেড়ে দিতে বলছো!' কথাটা স্মরজিৎ এমন ব্যঙ্গেব সুরে বললো যে বিশাখা আর কিছু বলার সাহস পেলো না। মনটা উদাস হ'য়ে গেলো তার। সাত সমুদ্রের পবপাবে কোথায় বিলেত! সেখান থেকে তার স্বামী মস্ত চাকুরে হ'য়ে আসবে—টাকা হবে, ক্ষমতা হবে, আরো টাকা, আরো ক্ষমতা, আবো, আরো, কিন্তু তারপর? তারপর? কী হবে টাকা দিয়ে? কী হবে ক্ষমতা দিয়ে? যে-টাকা আর যে-ক্ষমতা উপার্জনের জন্য এত চেষ্টা, সেটা যখন হাতে আসবে, তখন কী হবে? কী সেই অমূল্য বস্তু, এত টাকা আর এত ক্ষমতা না-হ'লে যা কিছুতেই পাওয়া যেতো না?

স্মরজিৎ আবার বললে, এবার অনেকটা নরম সুরে, 'মন-খারাপ কোরো না, বোমার ভয় শুনতে

যতটা লাগে আসলে ততটা নয়। আর প্রাণের ভয়ে সমস্ত ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দেবো, আমি এতই কাপুরুষ।'

বিশাখা বললে, 'সাবধান-মতো থেকো কী আর বলবো।'

স্মরজিৎকে তুলে দিতে স্টেশনে গিয়ে বিশাখার দু-চোখ ছাপিয়ে জল এলো। বাড়ি এসে আর টিকতে পারে না। কোন ছেলেবেলা থেকে ওর সঙ্গে চেনা—এতগুলি বছর ভ'রে এ-বাড়িতে ওর অবিরাম যাওয়া-আসা, আর আজ কোন দূর দেশে ও চ'লে গেলো, দু-বছরের মধ্যে আর আসবে না। শুয়ে শুয়ে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদলো বিশাখা, কাঁদবার পর মন অনেকটা হালকা হ'লো।

পরের দিন সকালে উঠে এইটে ভেবে তার সবচেয়ে খারাপ লাগলো যে তার কিছুই করবার নেই। বাবার স্নেহে মা-র যত্নে, রোস্ট কাবাব সরভাজা পুডিং খেয়ে আর সপ্তাহে পাঁচটা সিনেমা দেখেই কি দিন কাটবে তার? অত্যন্ত অনুতাপের মতো তার মনে হ'লো বিয়ের পরে স্বামী বিদেশে গেলে মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতেই থাকা উচিত—কিন্তু শ্বশুরবাড়িতেও তো মেয়েরা আজকাল বেকার, স্বামী আই সি এস হ'লে তো আরো।

হঠাৎ তার মনে পড়লো পরশু থেকেই অসীমবাবুর তাকে ছবি আঁকা শেখাতে আসার কথা। যাক, তবু একটা কাজ হ'লো – স্মরজিৎ এ ব্যবস্থাটা খুব বুদ্ধিমানের মতোই করেছে। ছবি আঁকায় সে সত্যি মন দেবে এবার- স্বামীর তার বাবার এত উৎসাহ, এত আয়োজন একেবারেই যেন ব্যর্থ না-হয়। দু দিন ব'সে ব'সে দুটো স্কেচও ক'রে ফেললো দেখাবার জন্য।

অসীম[illegible] এসে তাকে প্রথম কথা বললেন, 'যদিও তুমি একজন ভদ্রলোকের স্ত্রী, তবু আমি [illegible] তুমিই বলবো ছাত্রীদের তুমি না-বললে আমার অসুবিধে লাগে।

বিশাখা [illegible] হ'য়ে বললো, 'বাঃ, আপনি তো আগেও—'

অসীমবাবু তার কথায় বাধা দিলেন—'আগের সঙ্গে এখনকার তফাৎ হয়েছে ব'লেই কথাটা ব'লে [illegible]।

বিশাখার স্কেচ দুটো দেখে অসীমবাবু কিছুই বললেন না। মাথা নিচু ক'রে পেনসিল দিয়ে নিজে [illegible] ড্রয়িং করতে লাগলেন। হঠাৎ চোখ তুলে জিগেস করলেন, 'ছবি আঁকা তুমি কেন শিখছো?'

এ প্রশ্নের কী জবাব দেবে বিশাখা কিছুই ভেবে পেলো না। অসীমবাবু তার হ'য়ে জবাবটা দিলেন 'সময় কাটাতে?'

বিশাখা ভীরু গলায় জিগেস করলে, 'আমার কিছুই হবে না, আপনার মনে হয়?

'হওয়া বলতে কী বোঝো?'

অসীমবাবুর কথার সুরে আরো একটু ঘাবড়ে গেলো বিশাখা। চোখের দিকে না তাকিয়ে বললে, 'ছবি আঁকা শিখতে কি পারবো আমি?

'চেষ্টা করলেই পারবে,' ব'লে অসীমবাবু আবার ড্রয়িং এ মন দিলেন। সেদিন আর যতক্ষণ ছিলেন, একরকম চুপচাপই কাটলো। ভদ্রলোক স্বভাবতই স্বল্পভাষী। চলাফেরাও নিঃশব্দ। সপ্তাহে চার দিন নিয়মিত আসেন যান, বিশাখার আঁকার উপর দাগা বুলিয়ে দেন, মন্তব্য করেন না। বিশাখা ধ'রেই নেয় যে তার আঁকা খুব খারাপ হচ্ছে। খারাপ হচ্ছে -এ-কথাটাও তো উনি মুখ ফুটে বলতে পারেন না।

একদিন বিশাখা ব'লেই ফেললো, 'আমি তো খুব চেষ্টা করি, ভালো হয় না কেন বুঝি না।'

'ভালো হয় না মানে?' অসীমবাবু এমনভাবে বিশাখার দিকে তাকালেন যেন সে বোকার মতো কিছু বলেছে। বিশাখা নতমুখে নীরব হ'য়ে রইলো। অসীমবাবু আবার বললেন, 'কত আর ভালো হবে তুমি আশা করো?'

তা হ'লে ভালো হচ্ছে। বিশাখার মন লাফিয়ে উঠলো। কিন্তু অসীমবাবুর পরের কথাটা শুনেই দ'মে গেলো আবার।

'আরো একটা কথা আমার জিগেস করবার আছে। আমার কাছে তুমি--মানে তোমার অভিভাবকরা কী আশা করেন?'

কী আশা করেন মানে? বিশাখা ভিতরে-ভিতরে ঘেমে উঠলো। যেন তার মনের ভাবটা বুঝতে পেরেই অসীমবাবু আবার বললেন, 'তাঁরা কি মনে করেন আমি তোমাকে শিল্পী বানাতে পারি? না, পারি না। তোমাকে লাইন টানতে, রং লাগাতে শেখাতে পারি—তার বেশি আর-কিছু না, তার বেশি কেউ পারে না। কিন্তু রঙে-রেখায় তো ছবি হয় না, ছবি হয় মনে। সেই মন তোমাকে কেউ দিতে পারে না, সেটা তোমার থাকা চাই। তুমি কি ভেবে দেখেছো সে-মন তোমার আছে কিনা?'

কথা শেষ ক'রে অসীমবাবু বিশাখার দিকে তাকালেন। এ-ধরনের কথা কোনোদিন শোনেনি সে, এ থেকে সে কী বুঝবে, কী ভাববে তা-ই সে জানে না। আর উনি এমন ক'রে তাকান যেন ভিতরটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন, চোখের সামনে পড়লে চোখ নামিয়ে নিতে হয়।

'আমার কথা কি তুমি শুনেছো?'

বিশাখা মাথা নেড়ে সায় জানালো। অসীমবাবু যেন তার মুখ থেকে কিছু শোনবার জন্য একটু অপেক্ষা করলেন, কিন্তু বিশাখা চুপ ক'রেই রইলো, তিনিও আর-কিছু বললেন না।

বিয়ের আগে বিশাখা যখন এঁর কাছে শিখেছে, তখন মানুষটিকে ভালো করে লক্ষ করেনি। তখন আধ-ডজন মাস্টার মাস্টারনির মধ্যে ইনিও যেতেন আসতেন, কোনোরকমে ঘণ্টা খানেক চুপচাপ ব'সে থাকতে পারলেই হ'য়ে যেতো, আর-কিছু করবার বা ভাববার ছিলো না। যে-বিয়ে হবার জন্য এত সব, সে-বিয়েই তো আর ক'দিন, পরে তার হবে—কী হবে আর এ-সব দিয়ে?

এবারে তাই অসীমবাবুকে দেখতে-দেখতে সে অবাক হ'তে থাকলো। ছেলেবেলা থেকে যে-সব মানুষ সে দেখে আসছে—তাদের আত্মীয়, স্মরজিতের আত্মীয়, বাবার বন্ধুবান্ধব—তাদের কারো মতোই নন ইনি। অথচ কেন যে নন, কিসে যে ইনি স্বতন্ত্র, তাও বিশাখা বোঝে না। শুধু মনে হয়, তাঁকে যে-রকম দেখায় আসলে তিনি সে-রকম নন—সত্যি-মানুষটিকে মার্জিত ব্যবহারের তলায় ইনি চাপা দিয়েছেন, যে-মানুষ হঠাৎ কখনো ভেসে ওঠে তাঁর চোখের তীব্র দৃষ্টিতে। তাঁর চেহারা, তাঁর ভাব-ভঙ্গি, তাঁর কথাবার্তা—সবই শান্ত, গম্ভীর ও প্রৌঢ়জনোচিত ; তাঁর বয়স চল্লিশ বললেও অবিশ্বাস হয় না, যদিও ভালো ক'রে মুখের দিকে তাকালে (সে-রকমভাবে একবার দু-বারই বিশাখা তাকিয়েছে) সন্দেহ হয় যে ভদ্রলোক এখনও হয়তো তিরিশের তলাতেই আছেন। বিশাখা শুনেছিলো যে ছবি আঁকার ট্যুশনি করাই তাঁর প্রধান উপজীবিকা ; দেখতে গুরুগম্ভীর হ'লে ট্যুশনি পাওয়া সহজ হয় ব'লেই কি ও-রকম চেহারা করেছেন? যা-ই হোক, ওটা যে তাঁর একটা আচ্ছাদন, এ-কথা বিশাখার প্রায়ই মনে হয়। ওর তলায় যাকে তিনি চাপা দিয়ে রেখেছেন—সে, আর যা-ই হোক, অন্যরকম। সেই অন্তরালবর্তীর কথা ভাবতে বিশাখার ভালো লাগে, আবার ভয় করে।

অসীমবাবু আসেন বেলা দশটায়। আরো সকালে আসতে তাঁর আপত্তি ছিলো না, বিশাখা দেরিতে ওঠে ব'লেই এই ব্যবস্থা। আটটার আগে ঘুম ভাঙে না তার। বিছানায় শুয়ে-শুয়েই এক পেয়ালা চা আর একটি ডিম খায়, তারপর হাত-মুখ ধুয়ে রেফ্রিজরেটরে ঠাণ্ডা-করা কিছু ফল-মিষ্টি খেয়ে নাইতে যায়। স্নান করতে প্রায় চল্লিশ মিনিট লাগে তার। যতদিন স্কুলে যেতো, ও-পাটটা তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হ'তো, স্কুল ছাড়বার পরেও আগের অভ্যেসই র'য়ে গিয়েছিলো, কিন্তু এখন সে স্নানের আরামটি পুরোপুরি ভোগ করে, স্নানের ঘরে থরে-থরে সজানো বিলাসদ্রব্যের কোনোটিরই সদ্ব্যবহার করতে ভোলে না। শুভ্র, স্নিগ্ধ, সুগন্ধ হ'য়ে একটি হালকা রঙের শাড়ি প'রে সে বেরিয়ে আসে, তারপর এক গ্লাশ বাড়ির তৈরি ঘোল খেয়ে দশটার কয়েক মিনিট আগে তেতলার স্টুডিওতে যায়। আবাল্য এ-বাড়িতে কাটলো, কিন্তু তেতলার এই ঘরটি এতদিন অজানাই ছিলো। মাত্র কয়েকটা সিঁড়ির ব্যবধানে পৃথিবীর চেহারায় যে এত বদল হ'তে পারে, কে জানতো! এলেই বিশাখার মনে হয় সে অন্য-কোথাও এসেছে, অন্য কোনো দেশে। যেখানে সে বসে, সেখান থেকে চোখে পড়ে শুধু মস্ত আকাশ, আর আকাশে শাদা মেঘ, আর মেঘের কাছাকাছি দু-একটি কালো পাখি। এদের নিয়েও আর-একটা জগৎ আছে। কলকাতার শহরে যেমন সারাদিন ধ'রে কত কিছু হচ্ছে, ওখানেও তা-ই। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ মনে পড়ে সেই যে একদিন সন্ধ্যায় সে কেঁদেছিলো। সে-কান্না এসেছিলো ঐ আকাশ

থেকেই, আকাশ যেন ও-কথা জানে। তারপর স্মরজিতের কথা মনে পড়ে। ঠিক দুঃখ নয়, বিচ্ছেদের তীক্ষ্ণ অনুভূতি নয়, বুকের মধ্যে কেমন-একটা ভার। মন যেন ভরা-ভরা। অসীমবাবু যে-মনের কথা বলেছিলেন, এ কি তার সেই মন? সে-মন কি তার আছে?

ঠিক দশটার সময় অসীমবাবু আসেন। বাইরে জুতো রেখে মার্বেল-মেঝের উপর বসেন দরজার দিকে পিঠ দিয়ে, এক মিনিট সময় নষ্ট না-ক'রে কাজ আরম্ভ ক'রে দেন। নিজে কাজ ক'রে ছাত্রীকে শেখানো বোধহয় তাঁর পদ্ধতি। স্কেচ করেন, ড্রয়িং করেন, রং মেশান, রং লাগান—বিশাখা ব'সে-ব'সে চুপ ক'রে দ্যাখে। শাদা কাগজ দেখতে-দেখতে গাছপালায় মানুষে পশুতে বিষাদে খুশিতে ভ'রে ওঠে। ছবির সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর আঙুলও দ্যাখে বিশাখা, হাতটি ভারি নরম মনে হয়। পনেরো মিনিট কুড়ি মিনিটে এক-একটি ছবি শেষ ক'রে সরিয়ে রাখেন—বিশাখা বুঝতে পারে না কেন সেগুলো 'ভালো' ছবি নয়, কেন সেগুলো অনাদরে ফেলে দেন উনি।

যেতে-যেতে সাড়ে-এগারোটা হয়, কোনোদিন বারোটা। এই সময়টা গুপ্তসাহেব যান আপিশে, ছেলেরা যায় স্কুলে, অমলা দেবী সংসারের তদারক শেষ ক'রে নিজে স্নান সেরে নেন। স্টুডিওতে কেউ আসে না, বাড়ির কোনো আওয়াজ পৌঁছয় না সেখানে, বাড়িটা যে আছে সে-কথাই বিশাখা ভুলে থাকে মাঝে-মাঝে। নিচে যখন নামে, মনে হয় যেন বিদেশ থেকে বাড়ি ফিরলো। ভারি আরাম লাগে। প্রথমেই খাটে খনিকক্ষণ শুয়ে নেয়, তারপর মা-র সঙ্গে ব'সে গল্প করতে-করতে অনেকক্ষণ ধ'রে ভাত খায়।

এই আরামের নেশা তার এমন হ'লো যে সপ্তাহের যে-তিন দিন অসীমবাবু আসেন না, সে-তিন দিনও সকালের ঐ নির্দিষ্ট দু-ঘণ্টা সে স্টুডিওতে কাটাতে লাগলো। অসীমবাবু যেখানে বসেন, ঠিক সেখানটাতে ব'সে ছবি আঁকে, আঙুলের ঠিক ঐ-রকম ভঙ্গি, মুখের ঠিক ঐ-রকম ভাব আনবার চেষ্টা করে, কিন্তু নিজেই বুঝতে পারে যে ছবি তার কিছুই হয় না। ব'সে থেকে-থেকে কেবলই তার মনে হয় এই বুঝি অসীমবাবু তার পিছনে এসে দাঁড়ালেন। এত নিঃশব্দে আসেন তিনি, এলেও তো টের পাবে না। বার-বার পিছন ফিরে তাকায়, কিন্তু না। আসবেনই বা কেন, আজ তো তারিখ নয়। কিন্তু ভুল কি হ'তে পারে না কোনোদিন? শুক্রবারের বদলে বেস্পতিবার এসে পড়তে পারেন না? না, ভুল অসীমবাবুর হয় না, কোনোদিন না।

একদিন অসীমবাবু জিগেস করলেন, 'মিস্টর দাশের কোনো চিঠি পেয়েছো।' বিশাখা বুঝতে না-পেরে তাকিয়ে রইলো।

'তোমার স্বামীর কথা বলছি।'

'ও!' ব'লেই একটু যেন লজ্জিত হ'য়ে বিশাখা বললে, 'হ্যাঁ, পেয়েছি।'

গেলো সপ্তাহে স্মরজিতের অনেকগুলো চিঠি এসেছে একসঙ্গে। লন্ডনে পৌঁছেই হাওয়াই ডাকে যা ছেড়েছে, আর পথে-পথে বিভিন্ন বন্দরে জল-ডাকে যেগুলি পাঠিয়েছিলো, সব প্রায় একই সময়ে এসে পৌঁছলো। সবসুদ্ধ সাতখানা চিঠি, চারখানা স্ত্রীকে, আর তিনখানা শ্বশুরকে। দেশ ছাড়বার দু-মাস পরে এই তার প্রথম খবর। বিশাখা প্রথমে নিজেরগুলি পড়লো, তার পর বাবার ক'খানা, তারপর তারিখ মিলিয়ে-মিলিয়ে পর-পর সাতখানা আবো একবার। বাবার চিঠিগুলোই তার বেশি ভালো লাগলো, তার কারণ বোধহয় এই যে সেগুলি ইংরেজিতে লেখা—বাংলার চাইতে ইংরেজিটাই স্মরজিৎ লেখে ভালো। বিলেতে পা দিয়েই যুদ্ধকালীন ইংলন্ডের বর্ণনা এমন সুন্দর ক'রে লিখেছে যে সেক্সর একটি আঁচড়ও কাটতে পারেনি। ওখানকার বোমা-নিবারক ব্যবস্থা সম্বন্ধে এমন অনেক খবরই পাওয়া গেলো, যাতে বেশ আশ্বস্ত হওয়া যায় ; এ-রকম কোনো খবরই পেলো না যাতে উতলা হ'তে হয়। তাকে ছেড়ে গিয়ে স্মরজিতের ভালো লাগছে না, কোনো-না-কোনো কথা থেকে এ-খবরটি মুচড়ে বের করবার চেষ্টা বিশাখার বিফল হ'লো। সে বেশ ভালোই আছে—শাখাও যেন ভালো থাকে, স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়, পড়াশুনো করে, ছবি আঁকায় মন দেয়।

'ভালো আছেন তিনি?' অসীমবাবু জিগেস করলেন।

'হ্যাঁ ভালো আছেন। আমাকে মন দিয়ে ছবি আঁকতে বলেছেন।'

'তাহ'লে মন দেয়া যাক।' অসীমবাবু এক কর্তব্য সমাপন ক'রে আর-এক কর্তব্যে নিযুক্ত হ'লেন। হঠাৎ বিশাখার মনে হ'লো যে ইনি তো তার সম্পূর্ণ পরিচয় জানেন—তার বাবা, মা, স্বামী সকলকেই চেনেন, অথচ সপ্তাহে এই আট ঘণ্টার বাইরে তার কাছে তো এঁর অস্তিত্বই নেই। ইনি কোথায় থাকেন, বাড়িতে কে-কে আছেন, এঁর স্ত্রী কেমন, বন্ধুবান্ধব কারা—এ-সব কিছুই জানে না সে। ছবি-আঁকা ছ'ড়া অন্য-কোনো বিষয়ে ইনি কখনোই কথা বলেন না, তাঁর ভাবখানা এই রকম যেন সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে তিনি একাই আছেন, তাঁর আশে-পাশে আর-কেউ নেই, আর-কিছু নেই। বিশাখা মনে-মনে ভেবে দেখলো, ভদ্রলোক অত্যন্ত দাম্ভিক।

এর পরে অসীমবাবুর যেদিন আসবার কথা, বেলা ন'টা নাগাদ টেলিফোন বেজে উঠলো। গুপ্তসাহেব ধরলেন। একটু পরে মেয়েকে এসে বললেন, 'অসীমবাবু আজ আসতে পারবেন না, তাঁর বাড়িতে অসুখ।'

বিশাখা সচকিত হ'য়ে বললো, 'উনি নিজেই ফোন করছিলেন?'

গুপ্ত বললেন, 'অসুখ-বিশুখ খুব হচ্ছে আজকাল। শীত প'ড়ে এলো— তবু বিরাম নেই। শহরটা কী যে হচ্ছে দিন-দিন!'

'আমাকে একটু ডেকে দিলেই পারতে, বাবা।'

'তোর কথা কিছু তো বললেন না। আজকের কামাইটা কাল এসে পুষিয়ে দেবেন, বললেন। লোকটি খুব অনেস্ট—ফাঁকি-টাকির ধার ধারেন না।'

ঈষৎ আরক্ত হ'য়ে বিশাখা বললো, 'আহা—একদিন আসবেন না—তার জন্য আবার—'

গুপ্ত বললেন, 'না, না—একদিন আসা-না-আসার কথা নয়— কিন্তু এইটেই হচ্ছে ক্যারেক্টর, এতে মানুষ চেনা যায়।' গুপ্তর অধীনে যে-হাজার খানেক লোক কাজ করে তাদের মধ্যে এই ক্যারেক্টরের অভাব প্রায়ই তিনি লক্ষ করেন, তাই কোথাও তার সন্ধান পেলে খুশি হ'য়ে ওঠা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক।

একটু চুপ করে থেকে বিশাখা বললে, 'ওঁকে একটা টেলিফোন করলে হ'তো। কার অসুখ, কী হয়েছে—'

গুপ্ত হেসে বললেন, 'ওঁর কি আর বাড়িতে টেলিফোন আছে।'

'ওঁর ঠিকানাটা জানো, বাবা?'

'ভবানীপুরের দিকে কোথায় যেন—কিন্তু ঠিকানা তো জানি না। কেন রে, মাস্টার মশাইর উপর তোর খুব দরদ হয়েছে দেখছি।'

'আমি ভাবছিলাম ওঁকে একদিন খেতে বললে হয়।'

'বেশ তো! নিশ্চয়ই! তোর যেদিন ইচ্ছে বল।—দাঁড়া, আমি কবে ফ্রী আছি দেখে নিই' গুপ্ত পকেট থেকে নোটবই বের ক'রে পাতা ওল্টাতে লাগলেন— 'রাত্তিরে বলবি, না চায়ে?' মেয়ের জবাবের অপেক্ষা না-ক'রে নিজেই বললেন, 'ওকে আর রাত্তিরে ব'লে কী হবে—চায়েই বল —কী মুশকিল, একটা বিকেলও যে খালি পাচ্ছি না—দাঁড়া, দাঁড়া—এই যে, এই সোমবারটা—হ্যাঁ, সামনের সোমবার বিকেলটা খালি আছে—রাত্তিরে আবার যতীশ বাঁড়ুয্যের মেয়ের বিয়ে। তাহ'লে সোমবারে ওঁকে ব'লে দিস—তোর মা-ই-বলবে'খন—আমিও এটা লিখে নিচ্ছি—নয়তো ভুলে গিয়ে অন্য কোথাও হয়তো চায়ের নেমন্তন্ন নিয়ে ফেলবো—এনগেজমেন্টের যা ভিড় আজকাল' নোট বই পকেটে ফিরিয়ে রেখে গুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন। —'ঠিক আছে?'

বিশাখা মাথা নাড়লো।

'ভালোই হ'লো। লোকটির সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয় করার আমারও ইচ্ছা ছিলো। আর্টিস্টদের আমার ভালোই লাগে।'

পরের দিন অসীমবাবু এলেন একটু দেরি ক'রে। ঐ একটু দেরি, আর চোখের একটু লাল ভাব—এ ছাড়া সবই অন্য দিনের মতো। এসেই বিনা বাক্যব্যয়ে কাজে বসলেন। একটু উশখুশ ক'রে বিশাখা

বললো, 'আপনার বাড়ির অসুখ কেমন আছে?'

অসীমবাবু এমন ক'রে তাকালেন যে বিশাখা অপরাধীর মতো সংকুচিত হ'য়ে গেলো। এ ভারি অন্যায় কিন্তু—অত্যন্ত সহজ, সাধারণ প্রশ্নের উত্তরে এইরকম ক'রে তাকানো।

'একটু ভালো।'

বিশাখা একবার ঢোঁক গিলে বললো, 'কার অসুখ?'

'আমার বোনের।'

এই সামান্য কথাটুকুতে বিশাখা মনে-মনে উল্লসিত হ'লো। অসীমবাবুর যে বোন আছে, আর সে-বোনের যে অসুখ করে এ যেন বিশাখার মস্ত জিৎ। এবার অনেকটা নির্ভয়ে সে এর পরের অনিবার্য প্রশ্নটি করলে, 'কী অসুখ?'

'জ্বর হচ্ছে। কী অসুখ বলতে হ'লে ডাক্তার হ'তে হয়।'

অকারণে এমন তিরস্কার বিশাখা কখনো শোনেনি—কারণেও না। ভেবেছিলো এর পরে জিগেস করবে, 'আপনার ভাই-বোন ক-টি?' কিন্তু লজ্জায় আর মুখ তুলতে পারলো না। অথচ লজ্জাই বা কিসের—সে তো কোনো অন্যায় করেনি, অন্যায়টা অসীমবাবুরই, এমন-কী মহাপুরুষ তিনি যে সাধারণ লোকের সঙ্গে সাধারণভাবে কথা কইতে পারেন না। তিনি যদি রোগীর পরিচর্যায় রাত জেগে থাকেন, আর আজ যদি তাঁর মেজাজ বিগড়ে থাকে, সে তো তার দোষ নয়—কালকের কামাইয়ের খেশারতস্বরূপ আজ কেউ তাঁকে আসতেও বলেনি।

যাবার সময় সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে বিশাখা বললে, 'মা-র সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাবেন। তিনি কী বলবেন আপনাকে।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ, আপনাকে,' একটু চেষ্টা ক'রে বিশাখা বললো, সিঁড়ির তলায় মা-কে দেখতে পেয়েই ব'লে উঠলো, 'মা, এঁকে তুমি কী বলবে বলেছিলে?'

চায়েব নিমন্ত্রণের কথা অমলা দেবী ভুলেই গিয়েছিলেন, মেয়ের কথায় মনে পড়লো। মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে বললেন, 'সোমবার বিকেলে আপনি এখানে এসে চা খাবেন।'

কথাটা শুনেই অসীমবাবু একবার বিশাখার দিকে তাকালেন। বিশাখার মনে হ'লো তাঁর চোখে এতক্ষণ যেটা লাল আভাসমাত্র ছিলো সেটা সমস্ত শাদা অংশে ছড়িয়ে পড়লো নিমেষে। তাড়াতাড়ি বললে, 'বাবার খুব ইচ্ছে আপনি সোমবার এসে আমাদের সঙ্গে চা খান—আসবেন নিশ্চয়ই?'

একটু চুপ ক'রে থেকে অসীমবাবু বললেন, 'আসবো। কখন আসতে হবে?'

অমলা দেবী বললেন, 'এই পাঁচটা—ছ-টা—যখন আপনার সুবিধে—'

বিশাখা বললে, 'ঠিক পাঁচটাতেই আসবেন আপনি।'

'আচ্ছা।'

অসীমবাবু চ'লে যেতেই বিশাখা বললে, 'মা, অমন কাঠ-কাঠ করে বললে কেন কথাটা?'

'কাঠ-কাঠ আবার কোথায় হ'লো?' অমলা দেবী অবাক হলেন।

'না-হয় তোমার মেয়ের মাষ্টারিই করেন, একজন গুণী লোক তো।' ব'লেই বিশাখা হাসলো, যেন জানাতে চায় কথাটা ঠাট্টা ক'রে বলা।

'হয়েছে, আমার উপর আর সর্দারি করতে হবে না ' অমলা দেবীও হাসলেন। কিন্তু বিশাখার মনে কিসের একটা খোঁচা লেগে রইলো সারাদিন।

রবিবার দুপুরে খেতে ব'সে বাবাকে সে একবার মনে করিয়ে দিলে, 'বাবা, কাল কিন্তু অসীমবাবুকে চায়ে বলেছো।'

'মনে আছে আমার।' স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভালো ক'রে একটু ব্যবস্থা কোরো—অসীমের কথা অনেকেই জানে, দেখলাম।'

বিশাখা প্রশ্ন-ভরা চোখে বাবার দিকে তাকালো।

'কাল গিয়েছিলুম সুরবন্ধু সরকারের বাড়ি—তাঁর ছবির খুব ভালো কলেকশন, জানিস তো? হঠাৎ একটি ছবির গায়ে নাম-সইটা আমার চোখে পড়লো—সে-ছবি আগেও দেখেছি তাঁর বাড়িতে। জিগেস করলুম, "এই অসীম মিত্রকে চেনেন?" তিনি যা বললেন তাতে বোঝা গেলো এ আমাদেরই অসীম। অনেক খবর পাওয়া গেলো ওর সম্বন্ধে।'

খবরগুলো যে সে-ও জানতে চায় তা কী-ভাবে জানাবে বুঝতে না-পেরে বিশাখা মিছিমিছি এক ঢোঁক জল খেলো। কিন্তু গুপ্তকে প্রশ্ন করতে হ'লো না, নিজেই বলতে লাগলেন, 'সুরবন্ধুবাবু অসীমকে ছেলেবেলা থেকেই চেনেন—ওর বাবা তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর মতে আমাদের তরুণ শিল্পীদের মধ্যে অসীমই সবচেয়ে প্রমিসিং—'

বিশাখা হেসে উঠে বললে, 'উনি যদি এখনো তরুণ থাকেন তাহ'লে আর—'

'তরুণ বইকি।' সুরবন্ধুবাবুর মুখের একটা কথা গুপ্ত-সাহেব গম্ভীরভাবে নিজের ব'লে চালিযে দিলেন, 'শিল্পীর জীবন তো পঞ্চাশেই আরম্ভ, তার আগে শুধু প্রস্তুত হওযা। শিল্পীব পক্ষে সাতাশ আর বয়স কী!'

বিশাখা মৃদুস্বরে বললে, 'দেখতে কিন্তু ওঁকে তিরিশেরও বেশি লাগে।'

'তা লাগে বইকি, তাব কারণও আছে। ওর বাবা দীর্ঘকাল অসুখে ভুগে-ভুগে মারা যান—কিছু বেখে যেতে পারেননি ভদ্রলোক—আর সেই থেকে সমস্ত সংসাবের ভার ওবই উপর পড়েছে। মা, বিধবা পিসিমা—অনেকগুলি ছোটো-ছোটো ভাই-বোন—'

'কী ক'রে চালায়?' টেবিলের দূর প্রান্তে থেকে অমলা দেবী জিগেস কবলেন।

'চালায় এই ট্যুশনি ক'রে আর ছবি বেচে। তবে আমাদেব দেশে কেই-বা কেনে ছবি—ও দিযে অত বড়ো সংসার চালানো কি সোজা!'

'চাকরি কেন করে না?' অমলা দেবীর দ্বিতীয় প্রশ্ন।

'চাকরি করলেই বা হাতি-ঘোড়া কী পাবে—সাধাবণ বি. এ পাশ ছেলেব মাসিক মূল্য তো ষাট টাকা।'

'উনি চাকরি করতে যাবেন কোন দুঃখে। যে-বিদ্যে ওঁব জানা আছে, তা-ই দিয়েই বাশি-বাশি অর্থ উপার্জন করবেন একদিন।' নিজেব কণ্ঠস্বরেব উষ্ণতায বিশাখা নিজেই অবাক হ'লো। পবমুহূর্তে অনেকটা সহজভাবে বললে, 'এমন-কিছু কষ্টে আছেন ব'লে তো মনে হয না ওঁকে দেখে। বোজ একেবারে পাট-ভাঙা ধবধবে জামা-কাপড প'রে আসেন, এতদিনেব মধ্যে একদিনও দেখিনি আধ-ময়লা কাপড় পরতে।'

গুপ্ত হেসে বললেন, 'আজকাল কি আর জামা-কাপড় দেখে অবস্থা বোঝা যায়! লক্ষপতিও ছিটের হাফ-শার্ট প'রে ঘুরে বেড়ায়, আর দু'বেলা যার খাওয়া জোটে না, সে-ও সেজে-গুজে ফুল-বাবু হ'যে বেরোয়।'

'পুরুষের ভারি মুশকিল কিন্তু। সব ভদ্রলোকেবই কাপড়চোপড় প্রায় একই রকম। লক্ষপতি হ'লেও তো আর সোনার জামা পরে না।' ব'লে অমলা দেবী একটু হাসলেন।

'অতগুলো হাঁ ভরাতে নিশ্চয়ই বেগ পেতে হয় ওকে। তাও ভাগ্যিশ বিয়ে করেনি!—চাটনিটা আর-একটু দাও তো।'

স্বামীর দিকে চাটনির পাত্রটি ঠেলে দিয়ে অমলা দেবী বললেন, 'কী আব হ'তো বিয়ে করলে—ওরই সঙ্গে চ'লে যেতো।'

'না—না—বিযে কবলেই দায়িত্ব, ছেলেপুলে, সামাজিকতা—পঞ্চাশ রকমের ঠেলা। আশা করি অবস্থা একটু ভালো করতে পারার আগে বিয়ে কবার মতো দুর্মতি ওর হবে না।'

অমলা দেবী ব'লে ফেললেন, 'বাপেব ছেলেপুলের দায়িত্বের চাইতে নিজের ছেলেপুলেব দায়িত্ব তবু ভালো।'

পনেরো থেকে আট পর্যন্ত বয়সের চার-চারটি ছেলের দিকে তাকিয়ে গুপ্ত একবার কাশলেন, তারপর

অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে বললেন, 'যা-ই হোক, যুদ্ধ ক'রে টিকে আছে তো কলকাতার শহরে। সুরবন্ধুবাবু বলছিলেন, সেদিন একটা এগজিবিশনে আড়াইশো টাকায় একখানা ছবি বিক্রি হয়েছে ওর—' একটু চুপ ক'রে, যেন মনে-মনে একটা হিশেব ক'রে নিয়ে বললেন, 'একখানা ছবি যার আড়াইশো টাকায় বিক্রি হয়, তাকে তো নেহাৎ ফ্যালনা আর্টিস্ট বলা যায় না।'

'বছরে ক-খানা ছবি বিক্রি হয়?' অমলা দেবী জানতে চাইলেন।

'তার কি কিছু ঠিক আছে? এই ক'রে-ক'রেই হয় আস্তে-আস্তে। আপাতত শাখার ট্যুশনিটা পেয়ে ওর একটু সুবিধেই হয়েছে বোধহয়—মাসে বাঁধা একশো টাকা তো চট ক'রে আসে না।'

কথা শেষ ক'রে গুপ্ত মেয়ের দিকে তাকালেন, কিন্তু বিশাখার চোখ আনত। মা-বাবার আলোচনা তার এত খারাপ লাগছিলো যে ভালো ক'রে খেতেই পারলো না সে। অথচ ছেলেবেলা থেকে ওঁদের মুখে এই রকম কথাই সে শুনে আসছে চিরকাল—কখনো মনে কিছু লাগেনি। আজ এত খারাপ কেন লাগলো, তার কারণটা নিজেকে সে জিগেস করলো না, শুধু তীব্র প্রতিবাদ করতে ইচ্ছা করলো, ঝাঁঝিয়ে উঠে কিছু বলতে ইচ্ছে করলে—কিন্তু কিসের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ তা বুঝতে পারলো না, প্রতিবাদের ভাষাও খুঁজে পেলো না। নিজের ঘরে আবদ্ধ হ'য়ে একা-একা কাটালো সারা দুপর।

সোমবারে অসীমবাবু যখন এলেন, গুপ্ত তখনো আপিশ থেকে ফেরেননি। অমলা দেবী চায়ের আয়োজনে ব্যস্ত, বিশাখা তাকে অভ্যর্থনা ক'রে ড্রয়িংরুমে এনে বসালো। এই ঘরে বিশাখা অনেকটা সহজ বোধ করলো ; হাসিমুখে বললো 'আমার এমন ভয় হচ্ছিলো আপনি না ভুলে যান।'

ক্ষীণ হেসে অসীমবাবু বললেন, 'ভুলে তো যাই-ই নি, বরং একটু আগেই যেন এসে পড়েছি মনে হচ্ছে।'

'না, না, আগে আর কী—ঠিক সময়েই তো এসেছেন—'

'মিস্টর গুপ্ত এখনো আপিশ থেকে ফেরেননি বুঝি?' অসীমবাবু অত্যন্ত কোমল স্বরে বললেন, কিন্তু বিশাখাকে কথাটা বিঁধলো। চারটে থেকে প্রস্তুত হ'য়ে সে ঘন-ঘন এ-জানলায় ও-জানলায় তাকাচ্ছিলো, পাছে উনি এসে কাউকে দেখতে না-পেয়ে অপ্রস্তুত হন। আর বাবা বাড়ি নেই ব'লে ওঁর আসাটাই ব্যর্থ হ'য়ে গেলো!

'আজকের উপলক্ষটা কী?'

'উপলক্ষ কিছুই নয়, আর-কেউ আসবেও না, আর আপাতত আমার একলার সঙ্গই আপনাকে সহ্য করতে হবে,' বলতে-বলতে বিশাখার মুখ গরম হ'য়ে উঠলো।

অসীমবাবু বিশাখার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলেন।

গলার সুর বদলে বিশাখা বললে, 'আপনার বোন কেমন আছেন?'

এ-প্রশ্নের অসীমবাবু কোনো জবাব দিলেন না।

বিশাখা আবার বললে, 'সেদিন আসতে পারেননি, তাই আবার পরের দিন এলেন। আপনি বুঝি কোনো কারণেই কর্তব্যে ত্রুটি হ'তে দেন না?'

'সে-জন্যে নয়। ভালো লাগে ব'লেই আসি।' বিশাখা সচকিত হ'য়ে চোখ তুলতেই অসীমবাবু আবার বললেন, 'তেতলার স্টুডিওটি বেশ।'

লম্বা পা ফেলে গুপ্ত-সাহেব ঢুকলেন ঘরে।—'এই যে, নমস্কার। কতক্ষণ? খুব ভালো হ'লো—অনেকদিন থেকেই ইচ্ছে আপনার সঙ্গে আর্ট নিয়ে একটু আলাপ করি। বসুন—আসছি এক্ষুনি।'

আশ্চর্য অল্প-সময়ের মধ্যে আপিশের কাপড় ছেড়ে ধুতি-পাঞ্জাবি প'রে গুপ্ত-সাহেব ড্রয়িংরুমে এসে গদিয়ান হলেন। একটু পরে অমলা দেবী এসে জানালেন চা দেয়া হয়েছে।

'এখানেই আনতে বলো না—অসীমবাবুর সঙ্গে গল্প করতে-করতে বেশ ঘরোয়াভাবেই খাওয়া যাক।' কিন্তু অমলা দেবী এমনভাবে চুপ ক'রে রইলেন যে গুপ্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ও, খাবার ঘরেই ব্যবস্থা করেছো বুঝি? বেশ। অসীমবাবু, আসুন।'

টেবিলের মাথায় বসলেন গুপ্ত, তাঁর ডান দিকে অমলা দেবী, বাঁ দিকে অসীমবাবু , অসীমবাবুর পাশে বিশাখা। গুপ্ত অবিশ্রান্ত কথা বলতে লাগলেন, অসীমবাবু, মাঝে-মাঝে মা-মেয়ে নীরব। অসীমবাবুর কণ্ঠস্বর এতই নিচু যে গুপ্তকে যে-সব কথা তিনি বলছিলেন, পাশে ব'সেও বিশাখা অনেক সময় তা শুনতে পাচ্ছিলো না। খেতে-খেতে সে দেখতে লাগলো অসীমবাবুর খাওয়া—ছবি আঁকার মতোই কোমল ভঙ্গিতে তিনি চায়ের পেয়ালা মুখে তুলছেন, আর হাতের পাতাটি কী টুকটুকে লাল, কোনো পুরুষমানুষের অমন সে দ্যাখেনি, কোনো মেয়েরও না। এমন নিঃশব্দে খান তিনি—ডালমুট খেতেও আওয়াজ হয় না—সেইজন্য বোধ হয় চোখেও পড়ে না তাঁর খাওয়া। গুপ্ত-সাহেব বার-বার বলতে লাগলেন—'আর-একটু নিন, অসীমবাবু, আর-একটু নিন—ভালো ক'রে খান, বেশি ক'রে খান।'

অসীমবাবু একবার বললেন, 'বেশি ক'রে খাওয়ার জন্য আমাকেই নির্বাচন করলেন?'

'আপনি অতিথি—আপনি ভালো ক'রে খেলেই আমাদের তৃপ্তি। অবশ্য আমি নিজেও—' গুপ্ত-সাহেব হাত বাড়িয়ে আর-একটি ডিমের শিঙাড়া নিলেন। 'বেশ করেছে এগুলো—কী বলেন?'

'খুব ভালো হয়েছে,' ব'লে অসীমবাবু শিঙাড়ার থালাটি বিশাখার সামনে ধ'রে বললে, 'তুমি তো কিছুই খাচ্ছো না, বিশাখা।'

অসীমবাবুর মুখে নিজের নাম উচ্চারিত হ'তে বিশাখা এই প্রথম শুনলো। নিমেষে একটা শিরশিরানি ব'য়ে গেলো তার মেরুদণ্ডে।

'নাও একটা—'

অসীমবাবুর চোখ থেকে দৃষ্টির হলকা যেন বিশাখার মুখে লাগলো। মাথা নিচু ক'রে বললে, 'না, আর না।'

অসীমবাবু আর পিড়াপিড়ি না-ক'রে অমলা দেবীর দিকে থালাটি বাড়িয়ে বললেন, 'আপনি আর-একটা নিন, মিসেস গুপ্ত।'

অমলা দেবী এতক্ষণ পরিবেষণেই ব্যস্ত ছিলেন, এইমাত্র নিজে খেতে আরম্ভ করেছিলেন। মৃদু হেসে নিলেন শিঙাড়া।

গুপ্ত হঠাৎ বললেন, 'শিল্পীদের জীবনের সমস্যার কী-ভাবে সমাধান হ'তে পারে, আপনার মনে হয়?'

'জীবনের সমস্যা মানে?'

'মানে—তাঁরা কী-ভাবে বাঁচবেন—'

'কেন বাঁচবেন, কেমন ক'রে বাঁচবেন, না কী নিয়ে বাঁচবেন?'

'না, না—আমি ভাবছিলুম শিল্পীদের খাওয়া-পরা ঘর-সংসারের ব্যবস্থা কী-রকম হবে—কতখানি সময় তাঁরা দেবেন ও-দিকে, আর ও-সব করতে গিয়ে কতটা ক্ষতি হবে তাঁদের। এই ধরুন—আমরা সাধারণ মানুষ—চাকরি করছি, সংসার করছি, আড্ডা দিচ্ছি, কোনো ভাবনাই নেই আমাদের, কিন্তু শিল্পীদের কথা আলাদা।'

'ও, আপনি জীবিকার কথা বলছেন?'

'সেটাই তো এ-যুগের সবচেয়ে বড়ো কথা,' গুপ্ত উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন। 'মনে করুন আজ স্টেট যদি শিল্পীদের ভরণপোষণের ভার নিতো, সেটা কি অনেক সুখের হ'তো না?'

'খুব সুখের হ'তো কি?'

'কেন, এ-কথা বলছেন কেন? বেশির ভাগ শিল্পীর অর্ধেক জীবনই দুঃখে কাটে—তারপর বুড়ো বয়সে যখন মানসম্মান অর্থ-প্রতিপত্তি আসে, তখন ও-সব জিনিশের বিশেষ আর মূল্য থাকে না তাঁদের কাছে। কী ট্র্যাজেডি ভাবুন তো!'

'অর্ধেক কেন, সারা জীবনই দুঃখে কাটে শিল্পীর। দুঃখ না-থাকলে তার চলেই না। ঘটনার দুঃখ না-থাকলে সে মনে-মনে দুঃখ বানিয়ে নেবে। অন্নাভাবই তো একমাত্র কষ্ট নয়।

গুপ্ত চলতি কালের বুলি আওড়াচ্ছিলেন, ভেবেছিলেন অসীমের সম্পূর্ণ সায় পাবেন, না-পেয়ে

ভাবলেন অসীমের মতটাই বুঝি আধুনিক ছাড়িয়ে অত্যাধুনিক। নিজের মত বদল করবার লোভ হ'লো, কিন্তু এটুকু সময়ের মধ্যে তা তো করা যায় না। তাই আগের কথাটাতেই আরো জোর দিয়ে বললেন, 'কিন্তু বেঁচে থাকার পথটা তো সুগম হওয়া চাই। তা যদি না হয়, তাহ'লে আর্ট বলুন, কালচার বলুন, কিছুই সার্থক হ'তে পারে না।'

'সে তো ঠিকই। মৃত মানুষ তো আর ছবি দ্যাখে না, গান শোনে না। বেঁচে থাকার উপাদান নিয়ে কাড়াকাড়ি চলেছে—কিন্তু মানুষ না-চাইতে যা পেয়েছে, তা তো কেউ কেড়ে নিতে পারে না। আর সেই না চাইতে পাওয়াকে নিয়েই মানুষ বাঁচে—বাঁচবার একটা যন্ত্র হ'লো দেহ।'

'আপনি খুব একটা উচ্চ ভাব থেকে কথাটা বলছেন, কিন্তু এ কি সাধারণ মানুষের কথা?'

'মানুষমাত্রেরই কথা এই।'

গুপ্ত উত্তেজিত হ'য়ে বললেন, 'তাহ'লে আর পৃথিবী ভ'রে এই যুদ্ধ কেন? এই অশান্তি কেন? এ-যুদ্ধের পরিণতি কী হবে তা কেউ ভাবতেও পারছে না—কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের অবস্থা দিন-দিন আরো খারাপ হবে, জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর বীভৎস অভাবে দিশেহারা হ'য়ে পড়বে মানুষ আর সবচেয়ে খারাপ হবে শিল্পীদের অবস্থা। তখন তাঁরা কী করবেন?'

অসীমবাবু শান্তস্বরে বললেন, 'জানি না। যুদ্ধের ব্যাপার কিছুই বুঝি না আমি। শুধু এটুকু আমার মনে হয় যে মানুষ না-চাইতে যা পায়, তা-ই নিয়েই মানুষ বাঁচে, আর সমস্ত পৃথিবী ভ'রে সব সময়ই তা ছড়িয়ে আছে—তার অন্ত নেই, ধ্বংস নেই, যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ বিপ্লব তার কিছুই করতে পারে না।'

গুপ্ত মুখের উপর একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু বাইরের অবস্থার উপর আমাদের মনের শান্তি অশান্তি তো অনেকটা নির্ভর করে। এই তোমার কথাই ধরো না—' গুপ্ত হঠাৎ 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' ধরলেন —'তোমাকে আজ এত বড়ো সংসার চালাতে হচ্ছে, বাড়ি-ভাড়া, বাজার, ডাক্তার, চাল, চিনি, কয়লা, সমস্তটারই ব্যবস্থা করতে হচ্ছে—তা যদি না হ'তো, যদি সমস্তটা সময় শুধু আর্ট নিয়েই থাকতে পারতে, তাহ'লে ছবির ভিতর দিয়ে নিজেকে যে রকম ক'রে ফোটাতে পারতে, এখন কি তা সম্ভব?'

গুপ্ত যতক্ষণ কথা বলছিলেন, অসীম নিষ্পলক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলো, কথা শেষ হওয়ামাত্র বললে, 'আপনি কি আমার আর্থিক অবস্থার বিবরণ জানতে চাচ্ছেন?'

কথাটা শুনে গুপ্ত একটু অপ্রতিভ হলেন, তাঁর ফরশা সুগোল মুখ লাল হ'য়ে উঠলো। সুরবন্ধুবাবুর মুখে অসীমের কথা শুনে অবধি তিনি এই দুর্দশাগ্রস্ত শিল্পীর প্রতি সমবেদনা অনুভব করছিলেন, সে-দুর্দশার পরিধি ঠিক কতখানি তা কথাপ্রসঙ্গে জানতে পারলে তাঁর ভালোই লাগতো, তার সঙ্গে আচার-ব্যবহারের একটা স্থির নির্দেশ পাওয়া যেতো তাহ'লে। শিল্পীকে সাহায্য করতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত, সেটা কী-ভাবে হ'তে পারে তারই একটা ইঙ্গিত এই কথাবার্তার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে পড়ুক, এই তাঁর ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু সে-রকম কিছুই হ'লো না। গুপ্তর ধারণা ছিলো যে বর্তমান সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারাই খুব হৈ চৈ করে, নিজেরা যারা গরিব, এবং তাঁর সমান অবস্থাপন্নদের মধ্যে যাঁদের মুখে ও-সব কথা শোনা যায়, তাঁরা অসামান্য আলোকপ্রাপ্ত। কিন্তু অসীমের কথা শুনে তাঁর ধাঁধা লাগলো। তবে কি এই কথাগুলোই (যা তিনি উচ্চশিক্ষিত মহলে আজকাল প্রায়ই শোনেন) ঠিক নয়, না কি অসীম সম্বন্ধে তাঁর ধারণাই ভুল—ছবি এঁকে হয়তো বেশ দু-পয়সাই সে রোজগার করে? মনে-মনে স্থির করলেন যে তার বাড়িতে গিয়ে একদিন দেখতে হবে সে কী অবস্থায় থাকে। সেদিনের সভা ভঙ্গ হবার আগে অসীমের ঠিকানাটা জেনে নিতে তিনি ভুললেন না।

চায়ের পর্ব শেষ ক'রে অমলা দেবী অদৃশ্য হলেন, গুপ্ত বারান্দায় এসে বসলেন দু-জনকে নিয়ে। ভৃত্য এসে জানালে যে আপিশের একজন লোক দেখা করতে এসেছে। 'আমি তাহ'লে এখন—' ব'লে অসীম উঠতে গেলো, গুপ্ত বাধা দিয়ে বললেন, 'না, না, বসুন—বোসো একটু। আমি আসছি এক্ষুনি।'

এর আগে অনেকক্ষণ বিশাখা একেবারেই চুপ ক'রে ছিলো, গুপ্ত একতলায় নেমে যাবার পর বললে, 'আপনার কথাই ঠিক।'

'তোমার তা-ই মনে হয়?'

একটু চুপ ক'রে থেকে বিশাখা বললে, 'একটা কথা বলবেন আমাকে? কেন আপনি আমাকে কথা বলবার যোগ্য মনে করেন না?'

'বিশাখা, তুমি—'

'আমি হয়তো আপনার সব কথা বুঝবো না,' বিশাখা নিজের ঝোঁকে বলতে লাগলো, 'কিন্তু আপনি বুঝিয়ে দেবেন। আমি তো আপনার ছাত্রী।'

'কী-কথা তুমি শুনতে চাও, বলো তো?'

'তা কেমন ক'রে বলি? আপনি তো কোনো কথাই বলেন না আমাকে।'

এর পরে দু-জনেই চুপ ক'রে রইলো। গুপ্ত নিচে থেকে ফিরে এলেন। অসীম উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আচ্ছা, তাহ'লে—'

'সে কী! আর-একটু বোসো না। আমরাও বেরোবো খানিক পরে, না-হয় একসঙ্গেই--'

'না, আমার কাজ আছে। অমলা দেবীকে নমস্কার জানাবেন।'

বিশাখা সঙ্গে-সঙ্গে সিঁড়ি পর্যন্ত এলো। সিঁড়ির মুখে একবার মুখ ফিরিয়ে অসীম বললে, 'চলি আজ, কেমন?' ঐ কথাটুকু যেন গান হ'য়ে বিশাখার হৃদয়-মন ভ'রে দিলো।

গুপ্ত বললেন, 'অসীমের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে বেশ লাগলো। মাঝে-মাঝে বলিস তো ওকে।'

বিশাখা বললে, 'বাবা, শুক্কুরবার আমরা যে-সিনেমায় যাচ্ছি তাতে ওঁকে বললে তো হয়।'

'বেশ তো।'

'ফেরার সময় রাত্তিরে একেবারে খেয়ে যাবেন।'

'ভালো। তুই তাহ'লে ব'লে দিস।'

কিন্তু শুক্কুরবারের নিমন্ত্রণ অসীম গ্রহণ করলো না। তার অনেক কাজ, একেবারে সময় নেই সেদিন।

বিশাখা একবার মাত্র বললো, 'কিছুতেই পারেন না?'

অসীম বললে, 'শোনো, বিশাখা—আমার খেতেও ভালো লাগে না, সিনেমা দেখতেও না—'

'আপনার ভালো লাগাটাই বুঝি সব? আর কারো ভালো লাগা কিছুই নয়?'

বিশাখার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে অসীম একটু চুপ ক'রে রইলো। তারপর প্রায় অস্ফুট স্বরে বললে, 'আচ্ছা, আসবো।'

কিন্তু শুক্কুরবারে বিশাখার মনে হ'লো ইনি না-এলেই ভালো হ'তো। সারাক্ষণ একটি কথা বললো না অসীম, চুপ ক'রে ব'সে-ব'সে সিনেমা দেখলো, বাড়ি এসে চুপ ক'রে খেলো, এবং প্রায় কিছুই খেলো না। কথা ব'লে-ব'লে গুপ্ত হয়রান হ'য়ে গেলেন, অথচ 'খিদে নেই,' 'ভালো লাগছে না,' ছাড়া একটি কথাও বের করতে পারলেন না তার মুখে দিয়ে, তার ব্যবহারেও কোনো পরিবর্তন আনতে পারলেন না। চ'লে যাবার পর গুপ্ত বললেন, 'আর্টিস্টরা খামখেয়ালি হয় এ তো জানা কথাই—তাদের যখন যা মনে হয় তা থেকে কেউ আর নড়াতে পারে না।'

'এ-সব লোক নিয়ে ভারি মুশকিল কিন্তু,' বললেন অমলা দেবী।

'হ্যাঁ, এরা অন্যদের অনেক সুখ দেয়, কিন্তু নিজেরা সুখী হ'তে পারে না, আশে-পাশের লোকদেরও সুখী করতে পারে না।'

'বাবাঃ—দুঃখী-টুঃখী হ'য়ে কাজ নেই, বেশ আছি সুখী হ'য়ে,' অমলা দেবী হাসলেন।

বিশাখা হঠাৎ ব'লে উঠলো, 'সকলের সুখ-দুঃখ তো একরকম নয়।'

'সুখ-দুঃখের আবার আলাদা-আলাদা আছে নাকি?' অমলা দেবী বললেন, 'সুখ হ'লো সুখ, আর দুঃখ হ'লো দুঃখ—এ-কথা কে না বোঝে।'

কথাটা বিশাখার মনের মধ্যে আলোড়িত হ'তে লাগলো। সুখ মানেই সুখ আর দুঃখ মানেই দুঃখ? সত্যি কি তা-ই?

এর পরে অসীম যেদিন এলো, বিশাখা বললে, 'আপনার যদি আমাদের সংসর্গ অতই খারাপ লাগে,

তাহ'লে দয়া ক'রে অনুরোধ রক্ষা করবার ছিলো না।'

'দয়া বলছো কোনটাকে?

'আপনার সবই দয়া। আপনি দয়া ক'রে আমাকে শেখান, দয়া ক'রে আমাদের বাড়িতে আসেন, দয়া ক'রে কথা বলেন—আর কথা যখন বলেন না, সেটাও আপনার দয়া।'

ঠোঁটের কোণে পাৎলা একটু হেসে অসীম বললে, 'বেশ তো, দয়া নেবার চেয়ে দয়া করাই তো ভালো। ভালো না?'

'কিন্তু আমাদের মতো যারা অধম, দয়া নিতে তাদেরও খারাপ লাগে।'

অসীম নিঃশব্দে বিশাখার আঁকা একটি অর্ধ-সমাপ্ত ছবি দেখতে লাগলো। হঠাৎ মুখ তুলে ডাকলো, 'বিশাখা।'

যেন বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে বিশাখা বললো, 'বলুন।'

একটা কথা তোমাকে বলি। আমাকে কাছে টানার চেষ্টা কোরো না।'

'এ-কথা কেন বলছেন? মানুষ মানুষের কাছাকাছি আসবে, তাতে তো অস্বাভাবিক কিছু নেই।'

'অল্প একটু কাছে এসে যথোচিত মাত্রায় দূরে থাকবার মতো ভব্যতা আমি শিখিনি, বিশাখা।'

বিশাখার বুকের ভিতর কেঁপে উঠলো। ঠোঁট কামড়ে চুপ ক'রে রইলো একটু। তারপর খুব মৃদুস্বরে বললে, 'সকলেই আমাকে শাখা ব'লে ডাকে। আপনি শুধু বিশাখা বলেন।'

অসীম অত্যন্ত সহজভাবে বললে, 'আমার কাছে তুমি যা, অন্য কারো কাছে তা তো নও। এই লাল রংটা লাগাও দেখি এখানে।'

বিশাখা তুলি হাতে নিয়ে থমকে রইলো। অসীম আবার বললে, 'লাগাও রং।'

'আমার—আমার ভালো লাগছে না আজ।'

'কী? শরীর খারাপ হয়েছে?'

বিশাখা বললে, 'পৃথিবীতে আপনার সম-স্তরের মানুষ নিশ্চয়ই আছে—তারা কাছে ডাকলে আপনি কি পালাতে চান?'

লোকে ছেলেমানুষের সঙ্গে যে-রকম করে, সেইরকমভাবে চোখ টিপে মুচকি হেসে অসীম বললে, 'কাজের সময় গল্প করে না। ছবিটা শেষ করো—বেশ ভালোই হবে, মনে হচ্ছে।'

অসীমের ছেলে-ভোলানো ভঙ্গি দেখে বিশাখার অন্তরাত্মা জ্ব'লে গেলো।

কয়েক্‌দিন পরে গুপ্ত টালিগঞ্জে এক আত্মীয়-বাড়ি থেকে সপরিবারে ফিরছিলেন। চড়কডাঙাব মোড়ের কাছাকাছি আসতে-আসতে তিনি বললেন, 'অসীমের বাড়ি এই কাছেই। একবার গেলে হয়। কী বলিস, শাখা?'

বিশাখা ব্যাকুলভাবে ব'লে উঠলো, 'না বাবা, না।'

অমলা দেবী বললেন, 'এখন আর গিয়ে কাজ নেই। রাত হ'য়ে গেছে—'

'রাত আর কী—সবে তো ন-টা। প্রায়ই যাবো মনে করি—আব হ'য়ে ওঠে না। চল না, শাখা।'

'না, বাবা। কাউকে চিনি না ওঁর বাড়ির—এ-রকম হঠাৎ—'

'আহা—জন্ম থেকেই কি আর কেউ কাউকে চেনে! দেখাশোনা হ'লেই চেনাশোনা হয়,' বলতে-বলতে গুপ্ত গাড়ি ঘোরালেন। স্ত্রী-কন্যার আপত্তি অতিক্রম ক'রে নিজের গরজেই প্রিয় মল্লিক রোডে একটি বাড়ির সামনে গাড়ি থামালেন তিনি।

অমলা দেবী তাকিয়ে বললেন, 'বেশ বাড়ি তো।'

'একতলার একটা অংশ নিয়ে থাকে। এসো।'

বিশাখা বললে, 'বাবা, আমি গাড়িতেই থাকি।'

'আহা, আয় না! কী যে তোদের—!'

দরজা খুলে দিলেন একজন প্রৌঢ়া বিধবা। গুপ্ত নমস্কার ক'রে জিগেস করলেন, 'অসীমবাবু আছেন নাকি বাড়িতে?'

'না, সে তো এখনো ফেরেনি।'

'ও, বাড়ি নেই? তা আমি—আমরা একটু এসেছিলাম—আমার নাম হৃদয়রঞ্জন গুপ্ত, আমি—'

'আর বলতে হবে না, বুঝেছি। আপনারা আমার ছেলেকে কত যত্ন করেন, আমার পরম বন্ধু আপনারা। আসুন। এই বুঝি মেয়ে? এসো, মা।'

বিশাখা ভদ্রমহিলাকে নিচু হ'য়ে প্রণাম করলো। অতিথিদের ভিতরের ঘরে নিয়ে বসালেন তিনি, বড়ো-বড়ো দুই মেয়ে, আর তাদের চেয়ে ছোটো দুটি ছেলেকে এনে আলাপ করিয়ে দিলেন, কথাবার্তায় এমন আবহাওয়া আনলেন যেন সকলেই এক পরিবারভুক্ত, অনেক দিন পর আবার দেখা হ'লো। বাড়িতে তিনটি মাত্র ঘর, কিন্তু তিনটির বেশি যেন দরকারই ছিলো না। আসবাবপত্র বেশি নয়, কিন্তু ওর বেশি হ'লে যেন বিশ্রী হ'তো। সকলেরই ভালো লাগলো এসে, ভদ্রমহিলা একটু মিষ্টি না-খাইয়ে ছাড়লেন না, গল্প করতে-করতে দশটা বেজে গেলো।

গুপ্ত উঠে বললেন, 'অনেকক্ষণ বসলাম—অসীমের সঙ্গে দেখা হ'লো না।'

'কাজ সেরে ফিরতে একটু দেরি হয় ওর। কত খুশি হ'তো থাকলে।'

বেরোবার সময় বিশাখা সামনের ছোটো ঘরটি ভালো ক'রে একটু দেখলো। ও-ঘরটি যে অসীমের তা ব'লে দিতে হয় না। সরু একটি তক্তাপোশ—বিশাখার অবাক লাগলো—একজন পূর্ণবয়স্ক লোক ওতে কেমন ক'রে ঘুমোয়। টেবিলে ক-খানা বই, ছবি আঁকার সরঞ্জাম, কলম, রাইটিং প্যাড, দেয়ালে একটি মাত্র ছবি। বিশাখা পেছিয়ে পড়েছিলো, বাইরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি একটু জল খাবো।'

'জল খাবেন?' বোনেদের একজন দৌড়ে গেলো জল আনতে।

'বসুন না,' আর-এক বোন বললে।

সুজনিতে ঢাকা তক্তাপোশের উপর বিশাখা বসলো। টেবিলটির ধারে একবার হাত রেখে বললে, 'অসীমবাবু ছবি আঁকেন কোথায়?'

বোন বললে, 'এখানেই। টেবিলে ব'সে আঁকেন। ওঁর এক বন্ধুর স্টুডিও আছে—বড়ো ছবি আঁকতে হ'লে সেখানেও যান।'

জলের গ্লাশ হতে ক'রে অন্য বোন তার কাছে এসে দাঁড়ালো, কিন্তু বিশাখা তাকিয়ে রইলো চুপ ক'রে।

—'এই যে, জল।'

'ও, হ্যাঁ,' বিশাখা ত্রস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো। ঢকঢক ক'রে অনেকখানি জল খেয়ে ফেলে বললে, 'উঃ, কী তেষ্টাই পেয়েছিলো!'

বাড়ি ফিরতে-ফিরতে বিশাখা বললে, 'ছোটো বাড়িই ভালো বাবা। বেশ বাড়ি-বাড়ি লাগে।'

গুপ্ত হেসে বললেন, 'বেশ, টালিগঞ্জের জমিতে ছোটো বাড়িই বানিয়ে দেবো তোকে। কিন্তু স্মরজিতের কি পছন্দ হবে?'

'তুমি যে-রকম ছোটো বাড়ি ভাবছো আমি সে-রকম ভাবছি না।'

'তুই কী-রকম ভাবছিস বল তো?'

বিশাখা কথাটার জবাব দিতে গিয়েও যেন থেমে গেলো। একটু পরে বললে, 'তা যা-ই বলো, বড়ো বাড়িরও সুবিধে আছে। এই তো আমাদের তেতলায় স্টুডিওটা কী সুন্দর হয়েছে। অথচ আমি তো আর সত্যি-সত্যি ছবি আঁকি না—ও প'ড়েই আছে। এক কাজ করো না বাবা, অসীমবাবুকে বলো না মাঝে-মাঝে ওখানে এসে ওঁর নিজের ছবি আঁকতে।'

'ঠিক বলেছিস। আমিও ভাবছিলাম ওকে দিয়ে দু-একখানা ছবি আঁকিয়ে কিনে রাখবো। তাতে ওর একটু উপকারও হবে—'

'ওঁর আর উপকার কী, বাবা। বাড়িতে ভালো ছবি থাকবে—সেটা আমাদেরই লাভ।'

'তোর কী মনে হয় রে? ও বেশ ভালোই আঁকে, না?'

'কী যেন, অত-শত বুঝি না, আমি।'

পরের দিন অসীমের আসবার কথা নয়, কিন্তু সকালবেলা তাকে দেখতে পেয়ে বিশাখা অবাক হ'য়ে গেলো। সে তখন সবে ঘুম থেকে উঠে ড্রয়িংরুমে ব'সে খবর-কাগজ পড়ছে। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো—'আপনি!'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে। কেমন আছো তুমি?'

অসীমের এই হালকা ফুর্তির ভাবটা বিশাখার মোটেই ভালো লাগলো না। নীরস কণ্ঠে বললে, 'কেমন আবার থাকবো। ভালোই আছি।'

গুপ্ত দাড়ি কামানো সেরে ঘরে ঢুকে বললেন, 'এই যে, অসীম। কাল তোমার বাড়ি গিয়ে তোমার দেখা পেলুম না।'

'ভালোই হয়েছিলো—আমার দেখা হয়তো একটু বেশিই পাচ্ছেন আপনারা।'

'আরে না, তোমার জন্যেই আমাদের যাওয়া। তারপর—আর কী খবর-টবর, বলো।'

'মা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন এই কথা বলতে, রবিবার রাত্রে কি আমাদের ওখানে একবার আসতে পারবেন আপনারা?'

গুপ্ত মনে-মনে তাঁর এনগেজমেন্টের ফিরিস্তিটা একবার ভেবে নিয়ে বললেন, 'বেশ, আসবো। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা কিছু কোরো না। এমনিই আসবো আমরা।'

'সে তো আমি কিছু বলতে পারবো না—ও-সব মা-র ব্যাপার,—আসবেন তাহ'লে? বিশাখা, তুমি আসবে তো? তোমার মা-কে একবার—'

গুপ্ত হাঁক দিলেন, 'ওগো, শোনো একবার—'

অমলা দেবীর কাছে নিমন্ত্রণের পুনরাবৃত্তি ক'রে অসীম উঠলো। বিশাখা বললো, 'আপনি তাহ'লে এই নিমন্ত্রণ করতেই শুধু এসেছিলেন?'

'অনুমতি করো, যাই। কাজ আছে।'

গুপ্ত বললেন, 'একটু চা—'

'না, সত্যি সময় নেই।'

দ্রুত প্রস্থান ক'রলো অসীম। গুপ্ত মন্তব্য করলেন, 'নিশ্চয়ই কোনো ট্যুশনিতে যাচ্ছে। বড্ড খাটতে হয় কিন্তু ওকে।'

বিশাখা ব'লে উঠলো, 'খাটতে সকলকেই হয়। তুমি তোমার আপিশে সারাদিন খাটো না? যেখানে ওঁর খাটুনি, সেখানেই ওঁর ভালোবাসা, এইটেতে তোমাদের উপর ওঁর জিৎ।'

'তুই যে বেজায় গুরুভক্ত হ'য়ে উঠছিস দিন-দিন!' গুপ্ত হাসলেন, 'ভালো, ভালো—শিক্ষকের প্রতি ভক্তি না-থাকলে কিছু হয় না।'

রবিবারে রাত্রিতে বিশাখা যতক্ষণ ও-বাড়িতে ছিলো তার মনে হচ্ছিলো সে একটা স্বপ্নের মধ্যে আছে। এমন পরিচ্ছন্নতা, এমন পারিপাট্য, এমন স্নিগ্ধ, সুস্বাদু, সুমিত রান্না, এমন সহাস্য সুস্মিত সুন্দর অভ্যর্থনা—এ-সবই যেন তার অভিজ্ঞতার বাইরে। অসীম, অসীমের মা, তার চারটি ভাই-বোন, এমনকি তার বৃদ্ধা পিসিমা—অতিথিদের সমস্ত রকম সুখবিধানের জন্য বাড়ির সমস্ত লোক যেন একজন মানুষের মতো এক পায়ে দাঁড়িয়ে। মানুষ যে মানুষের এমন ক'রে সেবা করতে পারে, সেবা ক'রে এত সুখী হ'তে পারে—এটা তার পক্ষে এক নতুন জিনিশ। এও তার মনে হ'লো যে সেবা পাওয়ার চাইতে সেবা করা ভালো—সে যদি আজ এ-বাড়ির অতিথি না-হ'য়ে এ-বাড়িরই লোক হ'তো, তাহ'লে আরো কত ভালো লাগতো না জানি, কত যে ভালো লাগতো তা সে ধারণাও করতে পারে না। সে খেলো, হাসলো, কথা বললো, সবই করলো—কিন্তু অতি তীব্র সুখের একটা আচ্ছন্ন, আবিষ্ট ভাব এক মুহূর্তের জন্যও কাটিয়ে উঠতে পারলো না।

এই ভাবটা বাড়ি এসেও কাটলো না তার, তার পরের দিনও না। তারপর এমন হ'লো যে ঐ বিহ্বলতা যেন তার নিত্যকার সঙ্গী। সমস্ত পৃথিবী যেন তার বন্ধু, কোনোখানে তার ভয় নেই, কারো কাছে তার

দ্বিধা নেই। তার কণ্ঠস্বর একটু ভারি হ'লো, চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হ'লো, চলা হ'লো স্বচ্ছন্দ, বলা হ'লো সহজ। একটা স্বপ্নের মেঘ সব সময় তাকে ঘিরে আছে যেন—তা ভেদ ক'রে কোনো দুঃখ তাকে ছুঁতে পারবে না, কোনো ক্ষতি তার নাগাল পাবে না।

বোধহয় এইজন্যেই স্মরজিতের জন্য কোনো দুশ্চিন্তা সে-সময় তার হয়নি। দুশ্চিন্তা হবার কারণ ছিলো। তখন মার্চ মাস, তিন মাস ধ'রে ইংলন্ডে ভীষণ বেগে বোমা পড়ছে। স্মরজিতের শেষ চিঠি এসেছে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে, তারপর তার আর-কোনো খবর নেই। চিঠির পর চিঠি ; টেলিগ্রাম; বাপে-শ্বশুরে মিলে তিনটে কেব্‌ল্‌ পাঠালেন ইন্ডিয়া অফিসে ; কোনোটারই জবাব নেই। এদিকে রোজ সকালে কাগজ প'ড়ে শিউরে উঠতে হয়। বাইরে হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করলেও গুপ্ত-সাহেবের মন ভারাক্রান্ত হ'লো। একদিন স্ত্রীকে বললেন, 'তুমিই ঠিক বলেছিলে—বিয়েটা তখন না-দিলেই হ'তো।'

'ভেবো না—ও ভালোই আছে,' অমলা দেবী সান্ত্বনা দিলেন।

'হ্যাঁ ভালো আছে নিশ্চয়ই—' গুপ্তও অনেকটা হালকা সুর চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর বুকের উপর যেন পাথর চেপে রইলো। যদি কিছু হয়—হে ঈশ্বর—যদি কিছু হয়!

'শাখার কিন্তু কোনো উদ্বেগ দেখি না,' অমলা দেবী একটু হঠাৎ বললেন।

'ও বরাবরই চাপা—নয়তো ও কি আর ওতে আছে!'

'কই, কখনো তো বলে না কিছু!'

গুপ্ত রাগের স্বরে বললেন, 'বলবে আবার কী! ও তো সে-রকম মেয়ে নয় যে চুল এলো ক'রে কাঁদতে বসবে!'

'আমার এক-এক সময় মনে হয়—'

'কী?'

'না, কিছু না।'

স্ত্রীর কী মনে হয় তা জানার জন্য পিড়াপিড়ি করলেন না হৃদয়রঞ্জন। ভাবতে লাগলেন মেয়ের দুশ্চিন্তার প্রতিষেধক কী-কী হ'তে সারে। জোর ক'রে আনন্দ-উৎসবের মাত্রা আবো বাড়িয়ে দিলেন। আজ বাড়িতে গানের জলসা ডাকেন, কাল বেড়াতে যান রাজগঞ্জের স্টিমারে, পরশু মেয়েকে নিয়ে কোনো গণ্যমান্যের বক্তৃতা শুনতে। সিনেমা থিয়েটার অল্পই বাদ যায়। এর উপর নিত্য-নৈমিত্তিক সামাজিকতা তো আছেই। মেয়ে যেন কখনো মন-খারাপ করার সময় না পায়, এই তাঁর লক্ষ্য। বিশাখা এক-এক দিন আপত্তি ক'রে বলে, 'ভালো লাগে না, বাবা, এত হৈ-চৈ।'

'চল, চল, গেলেই ভালো লাগবে।'

'সত্যি, বাবা! বাড়ি ব'সে-ব'সে একাই ভালো থাকি আমি।'

গুপ্ত ভাবেন, মন-খারাপ করার একটা নেশা আছে, তাই মেয়ে বেরোতে চায় না। আরো উৎসাহে নানা জায়গায় নিয়ে যান।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বিশাখা বললে, 'মা, আমি ভোরবেলা স্বপ্ন দেখলাম স্মরজিৎ আমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে।'

কথাটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে অমলা দেবীর ডান চোখ কেঁপে উঠলো। চোখ কচলে বললেন, 'তারপর?'

'আমাকে কী-যেন বললো, কিন্তু একটা কথাও আমি বুঝতে পারলাম না। মনে হ'লো অন্য-কোনো ভাষা বলছে।'

অমলা দেবী রুদ্ধস্বরে বললেন, 'তারপর?'

'তারপর আর কী। ঘুম ভেঙে গেলো। তুমি অমন গম্ভীর হ'য়ে গেলে যে?'

মেয়ের মাথায় হাত রেখে মা বললেন, 'না রে, কিছু না। স্মরজিৎ নিশ্চয়ই ভালো আছে—এ স্বপ্নের মানেই তা-ই। যাই—তোর চা পাঠিয়ে দিই।'

অমলা দেবী তাড়াতাড়ি উঠে স্বামীর ঘরে গেলেন। মেয়ের স্বপ্নের কথা বললেন। 'এদিকে আমারও

ডান চোখটা লাফাচ্ছে,' বলতে-বলতে তাঁর চোখে জল এলো।

'রাখো তো তোমাদের মেয়েলি কুসংস্কার!' কিন্তু কুসংস্কারমুক্ত পুরুষের কণ্ঠস্বর তেমন তেজীয়ান শোনালো না।

'না, না—কিছু ভালো লাগছে না আমার,' অমলা দেবী আঁচলে মুখ ঢাকলেন।

মার্চের অর্ধেক হ'য়ে গেলো, কোনো খবর নেই। খবরের জন্য ব্যাকুল প্রত্যাশার সঙ্গে-সঙ্গে, পাছে হঠাৎ একদিন চরম খবর আসে, এই উৎকণ্ঠা যুক্ত হ'লো। গুপ্ত রোগা হ'য়ে গেলেন, অমলা দেবী মেয়ের দিকে তাকাতে পারেন না।

মা-বাবার দুশ্চিন্তা বিশাখার মনকেও স্পর্শ করলো। মনে-মনে সেদিনের স্বপ্নের কথা ভাবতে লাগলো সে। স্পষ্ট দেখলো স্মরজিৎকে, স্পষ্ট শুনলো তার গলার আওয়াজ। এ-স্বপ্নের মানে কী? স্বপ্নের আবার কোনো মানে আছে নাকি—ও-সব বাজে কথা। তারপর ভাবলো লন্ডন শহরে কত লক্ষ-লক্ষ লোক তো আছে—বোমা বেছে-বেছে তার স্বামীর মাথার উপরেই বা পড়বে কেন? কিন্তু—কিছু কি বলা যায়? যদি স্মরজিৎ না ফেরে? কথাটা মনে করতেই তার হৃৎপিণ্ড এমন জোরে লাফিয়ে উঠলো যে প্রায় নিশ্বাস পড়ে না। —সত্যি—কী-সব ছাইভস্ম ভাবছে সে, ঠিক আছে সব, স্মরজিতের কিছু হয়নি।

মা-বাবাকে সে বললে, 'তোমরা অমন দুশ্চিন্তা করো কেন সব সময়?'

মেয়ের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে গুপ্ত বললেন, 'না—দুশ্চিন্তা কিসের।'

'ভেবো না তোমরা—শিগগিরই ওর চিঠি আসবে, দেখো।'

গুপ্ত একটু অবাক হলেন। কোথায় মেয়ের মন ভালো করবার জন্য উঠে-প'ড়ে লেগেছেন তিনি, এদিকে মেয়েই নাকি তাঁদের সান্ত্বনা দিচ্ছে। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন একবার, অমলা দেবী চেষ্টা ক'রে মুখে হাসি এনে বললেন, 'তুই নিশ্চিন্ত থাকলেই আমরা নিশ্চিন্ত। আর কী।'

বিশাখা বললে, 'আমার তো কোনো ভাবনাই হয় না, মা।'

গুপ্ত ব'লে উঠলেন, 'ঠিক! এই রকমই হওয়া উচিত। আমাদের বয়স হ'য়ে গেছে কিনা—তাই বোধহয় অন্য সব রোগের মতো ভাবনাও আমাদের পেয়ে বসে।' প্রসঙ্গ পরিবর্তন ক'রে বললেন, 'অসীমকে যে ছবি আঁকার কথা বলেছিলাম, তার কী হ'লো?'

'কী যেন, কিছু তো বলেন না উনি।'

'একটু মনে করিয়ে দিস।'

পরের দিন বিশাখা অসীমকে বললো, 'বাবা জিগেস করছিলেন আপনি কবে থেকে আঁকা শুরু করবেন।'

'হবে।'

রবিবার রাত্রে সেই নিমন্ত্রণের পর প্রায় একমাস কেটে গেছে। গুপ্ত সে-দিনই অসীমকে জানিয়েছিলেন যে তার আঁকা দু-একখানা ছবি তিনি বাড়িতে রাখতে চান ; আর সে-ছবি যদি সে ঐ তেতলার স্টুডিওতে ব'সেই আঁকে তাহ'লে তিনি অত্যন্ত খুশি হবেন। এই প্রস্তাবে অসীম তেমন উৎসাহ বা তেমন অনিচ্ছা কোনোটাই প্রকাশ করেনি, শুধু ঘাড় নেড়ে বলেছিলো, 'আচ্ছা।' কিন্তু ঐ আচ্ছা পর্যন্তই, তার পরে আর কিছুই না।

বিশাখা আবার বললে, 'বাবার প্রস্তাবে আপনার যে সম্মতি নেই, সে-কথা ওঁকে তখন বললেই হ'তো।'

একটা ব্যথিত ভাব অসীমের মুখে ছড়িয়ে পড়লো। চোখ নিচু ক'রে বললো, 'আঁকবো ছবি।'

'কবে থেকে?'

'শিগগিরই।' চোখ তুলে অনেকটা সহজভাবে বললে, 'মিস্টর দাশের চিঠিপত্র পাচ্ছো নিয়মিত?'

অত্যন্ত সংগত এবং সৌজন্যসম্মত প্রশ্ন, কিন্তু কথাটা শুনে বিশাখার একটা অস্পষ্ট রাগ হ'লো। দু-আঙুলে কপাল থেকে চুল সরিয়ে বললে, 'আপনিও কি তাঁর জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত?'

অসীম শান্তভাবে বললে, 'তোমাকে চিনি, তাই তাঁর কথাও মনে পড়ে। ভালো আছেন তিনি?'

'আমার বিশ্বাস তিনি ভালোই আছেন। কিন্তু তাঁর চিঠি-পত্র অনেকদিন আসে না—মা-বাবা ভীষণ ভাবছেন, আত্মীয়-স্বজন সবাই ভাবছে, এখন আপনিও ভাবুন, নয়তো ভালো দেখায় না।'

চোখ তুলে তাকালো অসীম। বিশাখা তাকিয়ে রইলো নির্ভয়ে, তার চোখের উপর একটি স্বচ্ছ ভিজে আভা চিকচিক ক'রে উঠলো।

'বিশাখা, আমি কিছু বললেই তুমি রাগ করো কেন?'

'আপনি আবার কিছু বলেন নাকি!' বিশাখা অস্ফুট হাসলো।

'কিছুদিন ধ'রেই দেখছি তুমি মাঝে-মাঝে হঠাৎ আমাকে একটু রূঢ় কথা ব'লে ফেলো। নিশ্চয়ই বোঝো না যে রূঢ়, নয়তো বলতে না।'

অসীমের মুখের দিকে তাকিয়ে বিশাখার মনের মধ্যে যেন উল্লাসে ছড়িয়ে পড়লো। নম্র অথচ দৃঢ় স্বরে বললে, 'সত্য কথাই আপনার কানে রূঢ় শোনায়। আপনার অপরিসীম ভদ্রতা দিয়ে সমস্ত সত্যই আপনি ঢেকে রাখেন—আমি তা পারি না। আমি জানি এখানে আসতে আপনার ভালো লাগে না—আমাকে ছবি আঁকা শেখাতে ততোধিক খারাপ লাগে—মনে-মনে এই প্রার্থনাই আমি দিন-রাত করছি যে স্মরজিৎ তাড়াতাড়ি ফিরে আসুক—সে এলেই আমি তো আর ছবি আঁকা শিখবো না—আপনিও বাঁচবেন, আমাকেও আপনার চোখের তলায় ব'সে অপমানিত হ'তে হবে না প্রতিদিন।'

অসীম চুপ ক'রে বিশাখার সমস্ত কথা শুনলো, তারপর সস্নেহে বললে, 'ছেলেমানুষ!' হাত বাড়িয়ে বিশাখার আনত মাথাটি স্পর্শ করলো সে, সঙ্গে-সঙ্গে বিশাখা হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজলো, অনেকক্ষণ আর মুখ তুললো না।

মার্চের শেষে স্মরজিতের চিঠি এলো। ভালো আছে। অন্যান্য খবরের পর লিখেছে যে যুদ্ধের জন্য তাদের ট্রেনিং-এর মেয়াদ খুব সম্ভব এক বছর কমিয়ে দেয়া হবে—আর তা যদি হয় তাহ'লে দেশে ফিরবে কয়েক মাসের মধ্যেই।

তিন মাস পর গুপ্ত মন খুলে হাসলেন। বাড়িব আবহাওয়া হালকা হ'লো, প্রাণ ফিবে এলো উৎসবে অনুষ্ঠানে।

ততদিনে গুপ্তর জন্য ছবি আঁকতে শুরু করেছে অসীম। যে-সময়টা শেখাবাব জন্যে নির্দিষ্ট, তাতে সে নিজের কাজ করবে না—সপ্তাহের অন্যান্য দিনে বিকেলের দিকে এসে ঘণ্টাখানেক এঁকে চ'লে যায়। দু-দিনই এসেছে এ-পর্যন্ত। প্রথম দিন ত্যে স্কেচ করার কাগজের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে শুধু সিগারেটই খেলো, তারপর গুপ্ত-সাহেবের সঙ্গে একটু গল্প করে চ'লে গেলো। পরের দিন সে আসামাত্র বিশাখা নিজের হাতে এক পেয়ালা চা তৈরি ক'রে নিয়ে এলো উপরে, চা-টা ভালোবেসেই খেলো, যাবার আগে আর-এক পেয়ালা চা আনলো বিশাখা, তা দেখে অসীম খুশি হ'য়ে ব'লে উঠলো, 'বাঃ, লক্ষ্মী মেয়ে!'

বিশাখা বললো, 'আপনি ও-রকম বলেন কেন? আমি কি ছেলেমানুষ নাকি?'

'বাঃ, বড়োরা বুঝি লক্ষ্মী হয় না?'

'হয়, কিন্তু আমি তা নই। আমি তো আপনাকে কেবল রূঢ় বাক্যই বলি।'

সেদিন ক্যানভাসের গায়ে ছবির একটা অস্পষ্ট আভাস ফুটলো। কী হবে, এখনো বোঝা যাচ্ছে না। পরের দিন একটু সকাল-সকাল এলো, এসেই শুরু করলো কাজ, চা-ও খেলো না। কাছে দাঁড়িয়ে বিশাখা দেখতে লাগলো, দেখতে-দেখতে কেবলই অবাক হ'লো। চিত্র দেখবে না চিত্রকরকে দেখবে ভেবে পেলো না। ঐ তো শান্ত চুপচাপ মানুষ—কিন্তু মানুষটা যেন বদলে গেছে! দু-চোখ জ্ব'লে উঠেছে, ঠোঁটে ঠোঁট চাপা, হাতটি যেন এক তাজা ঘোড়ার বল্‌গা চেপে আছে। আঁকতে-আঁকতে অসীম মাঝে-মাঝে বিশাখার দিকে তাকালো, কিন্তু মুখে তার কথা নেই ; একবার অমলা দেবী দেখতে এলেন, গুপ্ত-সাহেব আপিশ থেকে ফিরে একটু ঘোরাঘুরি ক'রে গেলেন, কিন্তু ভ্রূক্ষেপই নেই অসীমের। দু-বার দু-পেয়ালা চা ঠাণ্ডা হ'লো। অবশেষে যখন দিনের আলো প'ড়ে এলো, পৃথিবীর অন্য সব রং সূর্যাস্তের আভায় লাল হ'য়ে উঠলো, তখন তুলি নামিয়ে রেখে একটু দূরে স'রে অসীম ছবিটি দেখলো খানিকক্ষণ, তারপর জানলার ধারে সোফায় এসে বসলো।

বিশাখা বললো, 'এখন চা দিই?'

'পরে হবে। আমার সঙ্গে-সঙ্গে তো তুমিও সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলে। একটু বোসো না।'

সোফার অন্য প্রান্তে ব'সে বিশাখা জিগেস করলো, 'আর ক-দিনে শেষ হবে?'

'জানি না।'

'আপনি খুব ভালো আঁকেন। আপনার মতো কেউ আঁকতে পারে না।'

অস্ফুট গলায় অসীম হেসে উঠলো।

'জগতের কাছে আমার এ-কথার কোনো মূল্য নেই, কিন্তু জগতের মূল্যই কি সব কথা?'

'না, তা কেন। প্রত্যেকের ভালো লাগার মূল্য তার নিজের কাছে।'

'অথচ দেখুন, আমার ভালো লেগেছে, এই কথাটা বলতে আমরা কতই না ভয় পাই।'

'হ্যাঁ—পাছে অন্যেরা সেটা হেসে উড়িয়ে দেয়, পাছে কালের পরীক্ষায় সেটা বাতিল হ'য়ে যায়। আর তা-ই তো হয়—বিশেষ ক'রে অল্প বয়সের ভালো-লাগায়। যে-ভালোলাগা পৃথিবীর লোক মেনে নেবে, তা আয়ত্ত করতে মাথার চুল পেকে যায়, বিশাখা।'

বিশাখা একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আপনিও তো আমার ভালো-লাগাটাকে বাতিল ক'রেই দিলেন।'

'তা কেন করবো? তোমার যে ভালো লাগছে তাতে তো এটাই প্রমাণ হয় যে ঈশ্বর তোমাকে ভালোবাসেন,' বলতে-বলতে অসীম উঠে দাঁড়ালো। 'চলো, নিচে গিয়ে চা খাওয়া যাক।'

ছোটো ছবি, আর পাঁচ দিনে আঁকা শেষ হ'লো। বিষয় কিছু অভিনব নয়, বরং মামুলিই বলা যায়। বসন্তকাল ; কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে ; শাড়ির রঙে গাছের রঙে মিলে একটা লাল-সবুজের আনন্দধ্বনিতে আকাশ যেন ভ'রে গেছে।

শেষ-করা ছবি দেখে গুপ্ত প্রথম কথা বললেন, 'মেয়েটির মুখ অনেকটা শাখার মতোই হয়েছে।'

অসীম বললে, 'তা হবে। সব সময় কাছে থাকতো, হয়তো আদল এসেছে।'

গুপ্ত যথোচিত সময় ধ'রে ছবিটিকে নিরীক্ষণ করলেন। তারপর অসীমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা এটার জন্য—এটার জন্য তোমাকে—'

'একেবারে হাতে-হাতে নগদ দাম দিয়ে প্রার্থীকে বিদায় করবেন?'

গুপ্ত লজ্জিত হ'য়ে বললেন, 'না, না, সে-কথা নয়—আই মীন, এটা তো তোমার প্রোফেশন—আর আমিই তো তোমাকে বলেছিলাম ছবির কথা—'

'আচ্ছা, সে হবে।'

এমন একটা নিষ্কম্প্র গাম্ভীর্যের সঙ্গে অসীম বললো কথাটা যে গুপ্ত পর্যন্ত আর-কিছু বলতে পারলেন না। ছবিটি ভালো ক'রে ফ্রেম করিয়ে এনে রাখলেন ড্রয়িংরুমে। বাড়িতে যে এলো সেই বললো যে ছবির মেয়েটি অবিকল বিশাখার মতে দেখতে।

অমলা দেবী বললেন, 'অসীম তোকেই এঁকেছে, শাখা। তোর সেই সবুজ মান্দ্রাজি শাড়িটা পর্যন্ত।'

'কী যে বলো, মা! পৃথিবীতে যেন ঐ একখানাই সবুজ শাড়ি!'

'দ্যাখ না, ঠিক ঐ রকম ক'রে তুই দাঁড়াস।'

ছবিটার দিকে এক পলক তাকিয়ে বিশাখা বললে, 'তা-ই নাকি? তবে তো ভালোই দাঁড়াই আমি।'

মেয়েকে একটু আদর ক'রে মা বললেন, 'লক্ষ্মী মেয়ে তুই আমার—তোর কপালেই স্মরজিতের ফাঁড়া কাটলো।'

সম্প্রতি স্মরজিতের চিঠি নিয়মিত আসছে। জুন মাসের একটি চিঠিতে সে লিখলে যে তাদের ট্রেনিং-এর মেয়াদ শিগগিরই শেষ হবে—খুব সম্ভব অগস্ট মাসেই দেশে পৌঁছতে পারবে সে। এ-খবর পেয়ে সমস্ত আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব একত্র ক'রে বিরাট একটি ভোজ দিলেন গুপ্ত। অসীমকেও বলার ইচ্ছে ছিলো তাঁর, কিন্তু 'অত লোকজন গোলমালের মধ্যে তাঁর ভালো লাগবে না,' ব'লে বিশাখা বারণ করলো। সেদিন বিশাখাকে দেখে সকলেই বললো যে সে দেখতে অনেক সুন্দর হয়েছে, স্মরজিৎ যেমন

বিদ্বান ও মস্ত চাকুরে, শাখার মতো মেয়েও তেমনি দুর্লভ, যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের এ-রকম মিলন আমাদের দেশের বিয়েতে কমই দেখা যায়। গুপ্তর সুবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির খুব প্রশংসা হ'লো, দম্পতির সুন্দর মধুর দীর্ঘ জীবন যেন সমস্ত দেশের সামনে একটা উদাহরণ হ'য়ে থাকে, এই রকম সব শুভকামনার বর্ষণে আচ্ছন্ন হ'লো বিশাখা। সমবয়সী একটি মেয়ে ঠাট্টা করলো, 'কী, দিন আর কাটছে না তো?'

বিশাখা বললো, 'বড্ড তাড়াতাড়িই কাটছে। দেখতে-দেখতে একটা বছর চ'লে গেলো!'

গালে টোকা দিয়ে মেয়েটি বললো, 'ফাজিল!'

কিন্তু বিশাখা ঠিকই বলেছিলো—সিংহের তাড়া-খাওয়া হরিণের মতো দিনগুলি যেন দৌড়চ্ছে। এই সেদিন ছিলো গরম, কখন বর্ষা এসে পড়লো?

সকাল থেকে সেদিন মেঘলা। দশটার একটু পর থেকে মেঘ এমন ঘন হ'লো যে ঘরের মধ্যে ভালো ক'রে দেখা যায় না। স্টুডিওতে ব'সে-ব'সে বিশাখার মনে হ'লো যেন এই ঘরটাও মেঘের মধ্যে ঢুকে গেছে কিংবা যেন চারদিকের পৃথিবী মিলিয়ে গিয়ে-গিয়ে এই একটি ঘর ছাড়া কিছু রইলো না।—অসীমবাবু আজ আসবেন তো? না, কর্তব্যপরায়ণ তিনি, এক-আকাশ মেঘ মাথায় নিয়ে ঠিক সময়মতো উপস্থিত হলেন। কেমন রাগ হ'লো বিশাখার—এ কি আপিশের কেরানিগিরি নাকি যে আসতেই হবে? অসীমকে দেখামাত্র বললে, 'আজ আমি ছবি আঁকবো না।'

'বেশ।' অসীম ইম্প্রেশনিস্ট ছবির একটা অ্যালবাম তুলে নিলো—কয়েকদিন আগে স্মরজিৎ পাঠিয়েছে বিশাখাকে। চোখ না-তুলেই বললো, 'আলোটা জ্বালো তো।'

বিশাখা বললে, 'থাক।'

'থাক কেন?' অসীম চোখ তুললো, 'কিছু দেখা যাচ্ছে না।'

'না-ই বা গেলো।'

বাইরের দিকে তাকিয়ে অসীম বললো, 'ঈশ খুব মেঘ করেছে তো।'

'হ্যাঁ, আজ সারাদিন ধ'রে বৃষ্টি হবে—আপনার আব বাড়ি যাওয়া হবে না।'

'বর্ষার দিন ভালোই লাগে, কিন্তু কাজ বড়ো নষ্ট হয়।'

'কাজ ছাড়া কিছুই বুঝি জানেন না আপনি?'

একটু চুপ ক'রে থেকে অসীম বললো, 'তা জানি না তা নয়—' অন্ধকারে তাব চোখে হঠাৎ যেন দপ ক'রে উঠলো—'কিন্তু আমার দুটি বোনের বিয়ে দিতে হবে, দুটি ভাইকে মানুষ করতে হবে—আমার সময় নেই, বিশাখা,' বলতে-বলতে অসীম উঠে দাঁড়ালো।

সঙ্গে-সঙ্গে বিশাখাও দাঁড়িয়ে বললে, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'যাই আজ। আজ তো আর কাজ হবে না। এক্ষুনি বেরোলে বৃষ্টির আগেই পৌঁছতে পারবো।'

বিশাখা স্টুডিওর ছোট্ট দরজা দুই হাতে আগলে দাঁড়ালো।—'না, আপনি যাবেন না।'

'পথ ছাড়ো, বিশাখা।'

'আপনি যাবেন না।'

'আমাকে যেতে দাও—'

'না, না, আপনি যাবেন না। কেন আপনি ভান করেন? কেন প্রবঞ্চনা করেন নিজের সঙ্গে? আপনি জানেন—আমিও জানি—যে ছবি আঁকতে আমি পারি না, পারবো না—কোনোকালেও ও-দিকে কিছু হবে না আমার—তবু কেন রোজ আপনার কাছে বসি, আঁকা-আঁকা খেলা করি? সে কি শেখবার জন্য? সে যে কিসের জন্য তা আপনি—'

'চুপ!' অসীম গর্জন ক'রে উঠলো, 'আর-একটি কথা না।'

অসীমের কণ্ঠস্বরে বিশাখা কেঁপে উঠে স'রে গেলো। দরজাটা একটু ফাঁক পেয়ে অসীম একলাফে বাইরে এসে বললো, 'আমি যাচ্ছি।'

পিছন থেকে চীৎকার ক'রে বিশাখা বললো, 'না, না, যাবেন না—' কিন্তু ততক্ষণে অসীম অর্ধেক

সিঁড়ি নেমে গেছে। সে-ও চ'লে গেলো, আর মেঘ ডেকে উঠলো আকাশ ফাটিয়ে, নামলো ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি। বিশাখা ছাতে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আকুল হ'য়ে ভিজলো। ভিজতে-ভিজতে তার সারা শরীরে যখন কাঁপুনি ধ'রে গেছে, তখন শপশপ করতে-করতে সব ক-টা সিঁড়ি ভিজিয়ে সে নিচে নামলো। অমলা দেবী দেখে অবাক।—'এ কী রে?'

'বৃষ্টিতে ভিজলাম, মা।'

'ভিজলি? কেন?'

'খুব ভালো লাগলো।'

'অসীম কোথায়?'

'চ'লে গেছে—' আর কথা না-ব'লে বিশাখা স্নানের ঘরে ঢুকলো কাপড় ছাড়তে।

পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে ঠিক এলো অসীম। বিশাখা বললো, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি আর আসবেন না।'

'কেন বলো তো?'

'আমি আপনাকে বলেছি যে ছবি আঁকায় আমার মন নেই, তবু আমাকে শিখিয়ে সময় নষ্ট করবেন?'

'আর ক-দিনই বা। মিস্টর দাশ তো শিগগিরই আসছেন, তারপর তো আর শিখবে না।'

'আমি এখন থেকেই ছেড়ে দিতে চাই।'

বিশাখার কথা গ্রাহ্য না-ক'রে অসীম বললো, 'এসো, কাজ করো। এ-রকম পাগলামি করে না। তুমি কি ভাবছো তুমি নামজাদা আর্টিস্ট হ'তে পারবে না ব'লেই তোমার এ-শিক্ষা ব্যর্থ? তা নয়—এতে তোমার মন যদি জেগে থাকে সেটাই বা কম লাভ কী? ভালোকে ভালোবাসতে শেখাও ভালো।'

'কিন্তু এতে শুধু জীবনের দুঃখই বাড়ানো হ'লো, অসীমবাবু। ভালোকে আমি পাবো কোথায় যে ভালোবাসবো?'

অসীম গম্ভীর গলায় বললো, 'ভালোর কি অভাব? পৃথিবীতে কি তার অন্ত আছে?' একটু চুপ ক'রে থেকে, একটু হেসে আবার বললো, 'হয়তো কোনো-একদিন বুঝতে পারবে যে আমি তোমার ক্ষতি করিনি।'

বিশাখা নতমুখে স্তব্ধ হ'য়ে রইলো। অসীম একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে বললে, 'নাও, তুলি হাতে নাও। আজ বেশ ভালো ক'রে কাজ করা যাক।'

অগস্টের মাঝামাঝি স্মরজিৎ এসে পৌঁছলো। কলকাতায় দু-দিন কাটিয়ে সে বাঁকুড়া গেলো বাবার কাছে, কয়েকদিন পরে আবার যখন এলো অমিয়াংশুবাবুও এলেন ছেলের সঙ্গে। তিনি উঠলেন বালিগঞ্জে তাঁর ভাইয়ের বাড়িতে, স্মরজিৎ শ্বশুরবাড়িতেই থাকলো। তার প্রথম চাকরি হয়েছে খুলনায়, পয়লা সেপ্টেম্বর থেকেই জোয়াল ঘাড়ে নিতে হবে, ভারি ব্যস্ত সে। দিনের বেলায় সরকারি পাড়ায় আনাগোনা করতে হয়, সন্ধেবেলা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখাশোনা—স্ত্রীকে নিয়ে বেরোয় না, আর ক-দিন পরেই তো মা-বাবার সঙ্গে ওর চিরবিচ্ছেদ, থাক এখন ওঁদের কাছে—স্বামী-স্ত্রীতে ভালো ক'রে দেখা হয় সেই রাত্রিতে শোবার সময়। এ-রকম অবস্থায় এ-রকম বয়সের স্বামী-স্ত্রী সাধারণত অনেক রাত পর্যন্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখস্বপ্ন দেখে কাটায়, কিন্তু তাদের স্বপ্ন দেখার কিছু নেই, নদীর ধারে চমৎকার বাংলো থেকে শুরু ক'রে অপেক্ষা করার ঘরে বহুক্ষণ ব'সে-থাকা স্থানীয় ভদ্রলোকের পক্ষে চমক-লাগানো সূক্ষ্ম ছুঁচোলো 'ব্যেরা' ডাক পর্যন্ত সবই একেবারে অবধারিত। কথাবার্তা তাই বেশি হয় না দু-জনের। ডোরা-কাটা পাজামার উপর গেঞ্জি প'রে লম্বা হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে স্মরজিৎ হয়তো বলে, 'কেমন ছিলে, শাখা?'

'কেমন আবার থাকবো।'

'তোমার বুঝি খুব ভয় হয়েছিলো আমার জন্য?'

'মা-বাবা খুব ব্যাকুল হয়েছিলেন—আমার মোটেও ভয় হয়নি।'

'কী করলে এই এক বছর?'

'কী আর করলাম! খেলাম, ঘুমোলাম, মোটা হলাম।'

'না মোটা তো হওনি,' মাপ নেবার মতো ক'রে দু-আঙুলে বিশাখার বাহুতে চাপ দিয়ে স্মরজিৎ বললে, 'যেটুকু হয়েছো, তা ভালোই। আগে একটু রোগাই ছিলে।'

'কে জানে—এখন থেকে কেবলই হয়তো মোটা হ'তে থাকবো।'

'পাগল। সে আমি কিছুতেই হ'তে দেবো না,' ব'লে স্মরজিৎ স্ত্রীর একটু কাছে স'রে আসে।

বিশাখা জড়িত স্বরে বলে, 'উহুঁ—ঘুম পাচ্ছে বড্ড।' কিন্তু খানিক পরে স্মরজিৎ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, বিশাখা উঠে জল খায়, জানলার ধারে দাঁড়ায় একটু, মনে হয় বড্ড গরম, চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে আবার এসে শোয়, চোখ যতবার ঘুমে লেগে আসে, ততবারই হঠাৎ কী-যেন মনে প'ড়ে চমকে ওঠে। ভাদ্র মাসের এই মেঘ-চাপা গরম ভারি বিশ্রী।

একদিন স্মরজিৎ জিগেস করলে, 'তোমার ছবি আঁকা শিক্ষা কী-রকম হ'লো?'

'হ'লো একরকম।'

'কী-সব আঁকলে আমাকে দেখালে না তো।'

'দেখবে। ঢের সময় আছে তার।'

'সেদিন ঐ ছোকরার সঙ্গে কথা হ'লো খানিকক্ষণ—আহা, কী না নাম—ঐ যে তোমাকে ছবি আঁকা শেখায়—'

'ছোকরা-ছোকরা বলছো কাকে? তোমার চেয়ে বয়সে বড়ো।'

'নামটা কী বলো তো? হ্যাঁ—অসীম। মডার্ন আর্ট নিয়ে খানিকক্ষণ কথা হ'লো। আমি দেখলাম, বিলেত না-গেলে আর্ট সম্বন্ধে ভালো ধারণা হয় না।'

বিশাখা হঠাৎ বললে, 'স্মরজিৎ, ছেলেবেলা থেকেই তুমি একটু ডেঁপো। এখন বড়োশড়ো হয়েছো, এখন আর মানায় না। ও সব ছাড়ো।'

এ-রকম কথা এই সুদীর্ঘ পরিচয়ে বিশাখার মুখে স্মরজিৎ কখনো শোনেনি। অবাক হ'য়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কী হয়েছে তোমার?'

স্মরজিতের চোখ থেকে চোখ না-সরিয়ে বিশাখা বললে, 'কিছু হয়নি। ঠিক আছি আমি।'

এমন একটা ভাব স্মরজিতের মুখে ছিলো যেন সে স্ত্রীকে উপযুক্ত শাসন করতে উদ্যত। কিন্তু হঠাৎ একটা মন-গলানো হাসিতে তার মুখের চেহারা বদলে গেলো। কোমল সুরে বললে, 'আমাকে ছেলেবেলা থেকে দেখছো, আমার কিছুই অজানা নেই তোমার কাছে। আমার কথায় প্যাঁচ নেই, আমার মনেও না। তোমার মাস্টার মশাইকে অসম্মান করতে আমি চাইনি—তাঁর কাজ আমার ভালোই লাগে। সেইজন্যই—'

'এ-সব কথা আমাকে বলছো কেন—তাঁরই সঙ্গে ব'সে যত খুশি আর্টের চর্চা করো—আমি এ-সবের কী বুঝি!'

'তোমাকে যে-ছবিখানা দিয়েছেন সেখানা বেশ ভালো হয়েছে।'

'আমাকে আবার ছবি দিলেন কবে?'

'ঐ যে ড্রয়িংরুমে—'

'ও তো উনি বাবার জন্য এঁকেছেন। বাবা কিনেই নিয়েছেন বোধহয়।'

ঠোঁটের কোণে একটু হেসে স্মরজিৎ বললো, 'কিনে কেন? একখানা ছবি উনি কি উপহার দিতে পারতেন না?'

'আমার বাবা তো আই. সি. এস. নন যে সকলের কাছেই উপহার আশা করবেন।'

'আমি কি তা-ই বললাম—লোকে তো ভালোবেসেও দেয় অনেক সময়...তা ছবিখানা সত্যি ভালো হয়েছে। অবশ্য আমার ভালো লাগার বিশেষ একটা কারণও আছে—মেয়েটি হুবহু তোমার মতো।'

'সকলেই তা-ই বলে।'

'প্রথমে আমার ততটা মনে হয়নি, কিন্তু ছবিখানা যত দেখছি ততই আমার মনে হচ্ছে ও তোমারই ছবি।'

'ভালোই হ'লো,' বিশাখা বললে, 'তোমার স্ত্রীব একটা পোর্ট্রেট হ'য়ে রইলো।'

যাবার দিন এসে পড়লো। এতদিন পরে মেয়েকে বিদায় দিতে হবে—আনন্দের মধ্যেও অমলা দেবীর চোখ-মুখ ছলোছলো, গুপ্তও মনের ভার লুকিয়ে রাখতে পারছেন না। শুধু বিশাখাই যেন নির্বিকার। যেমন স্মরজিৎ বিলেতে থাকতে তার আচরণে কোন উদ্বেগ প্রকাশ পায়নি, তেমনি এখনো দুঃখের ছায়া নেই তার মুখে। সে স্যুটকেস গোছাচ্ছে, জিনিশপত্র কিনছে, বন্ধুদের কাছে টেলিফোনে বিদায় নিচ্ছে। সে যে যাবে, এটা যেন চিবকালের স্বতঃসিদ্ধ কথা। স্বতঃসিদ্ধ নিশ্চয়ই—কিন্তু তাই ব'লে একটুও কি দুঃখ হ'তে নেই? আশ্চর্য মেয়ে!

ববিবার ওদের যাত্রার দিন। শুক্রবার সকাল দশটায যথারীতি এলো অসীম, এসে বললে, 'বিশাখা, আজই শেষ।'

বিশাখা বললো, 'আপনি তো খুব খুশি?'

'খুশি কেন?'

'আর তো কেউ ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধ'রে বাখবে না আপনাকে, এখন স্বাধীন হলেন।'

অসীম এ-কথার কোনো জবাব দিলে না।

'সেদিন ঐ বৃষ্টির মধ্যেই গেলেন তো? এ কি আমি জীবনে ভুলবো!'

অসীম একটু হেসে বললো, 'ভুলবে, বিশাখা, ভুলবে।'

বিশাখা রুদ্ধস্বরে বললে, 'আপনি হেসে-হেসে ও কথা বলতে পারলেন আমাকে! আপনি কি মানুষ!'

অসীমের মুখের হাসি মিলিযে গিযে যন্ত্রণার রেখা ফুটে উঠলো। চুপ ক'রে রইলো একটু, তারপর ধীর স্বরে বললে, 'হ্যাঁ বিশাখা, আমিও মানুষ। সে-কথাটা তোমাকেই মনে করিয়ে দেওয়া দরকার।' বিশাখা কী যেন বলতে যাচ্ছিলো, অসীম হাত তুলে তাকে বাধা দিলে।—'কেন দরকার তাও বলি। তুমি শুধু নিজের কথাই ভাবছো—আমি যে মানুষ, আমারও যে বক্ত আছে, মাংস আছে, ইচ্ছে আছে—এ-কথা কি কখনো তোমাব মনে হয়?'

অসীমের কথাগুলিতে একটুও উত্তেজনা প্রকাশ পেলো না, কিন্তু শুনতে-শুনতে বিশাখার মাথার ভিতরে আগুন জ্ব'লে উঠলো। বিদ্রূপেব সুবে জবাব দিলো, 'কী ক'রে মনে হবে? আপনি যে সত্যি-সত্যি পাথবের মূর্তি নন, তা কেমন ক'বে বুঝবো আমি?'

'সত্যিই তো—তুমি তা বুঝবে না। আব ঐ পাথবেব মূর্তি হবাব জন্য কী মূল্য আমাকে দিতে হচ্ছে, তাও তুমি বুঝবে না, বিশাখা।'

'কাকে দিচ্ছেন মূল্য? তাব কি কোনো অস্তিত্ব আছে?'

'দিচ্ছি তোমাকে—তোমাব সমস্ত জীবনকে।'

'চাই না! চাই না!'—জোবে মাথা ঝোঁকে উঠলো বিশাখা—'ও-মূল্য চাই না আমি। আজ এই শেষের দিনে আপনি বলুন—একবাব বলুন—'

'বিশাখা।'

'না, না, আমাকে থামাতে পাববেন না আপনি—আমি—' বিশাখা হঠাৎ থেমে গেলো।

তার মুখেব উপর চোখ রাখলো অসীম। 'থামলে কেন? বলো।—কিন্তু ভেবে দেখেছো কি, সে-বলার মানে কী? ব'লে তুমি চ'লে যাবে, তা তো হ'তে পাবে না।'

বিশাখা সম্মোহিতের মতো বললে, 'না, আমি চ'লে যাবো না।'

অসীমের দুই চোখ যেন ভিতরের কোনো আলো'য উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। বিশ্বাসের সুরে বললে, 'যাবে না? সে-সাহস তোমার আছে? এক্ষুনি জবাব দিয়ো না—ভেবে দ্যাখো।'

বিশাখা হঠাৎ যেন চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠলো। স্থিব দৃষ্টিতে অসীমের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ, তাকিয়ে থাকতে-থাকতে দু-চোখ বেয়ে অবিরল ধারায় জল পড়তে লাগলো। অসীমের পায়ের উপর হাত রেখে বললে, 'আমাকে দযা করুন—আমাকে ক্ষমা করুন।' তারপর মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলো, দরজার কাছে স্মরজিৎ দাঁড়িয়ে। অসীম একদৃষ্টিতে বিশাখার দিকে তাকিয়ে

ছিলো, তার চোখে ভাবান্তর লক্ষ ক'রে সে-ও মুখ ফেরালো। স্মরজিৎকে দেখতে পেয়ে বললে, 'আসুন। বিশাখা বড্ড বিচলিত হ'য়ে পড়েছে—আপনি আসুন, শান্ত করুন ওকে।'

স্মরজিৎ ব'লে উঠলো, 'বাঃ! চমৎকার শিক্ষা হচ্ছে! চমৎকার!' মানুষের কণ্ঠনালী চেপে ধরলে যেমন হয়, তেমনি তার গলার আওয়াজ। হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে বিশাখা দ্রুতবেগে উঠে দাঁড়ালো, দেয়ালে পিঠ দিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে বললে, 'স্মরজিৎ, তুমি যাও!' স্মরজিতের মুখের উপর তার চোখ পড়লো—সে-মুখ নীল হ'য়ে গেছে, চোখ ঘোলাটে, নিচের ঠোঁট শিথিল হ'য়ে ঝুলে পড়েছে—তারপর একবার তাকালো অসীমের দিকে—সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে হ'লো সে আর তার উপায় নেই।

স্মরজিৎ বললে, 'যাচ্ছি—কিন্তু আর আমি ফিরবো না, এটা জেনে রাখো।' ফ্রেমে-আঁটা ছবিব মতো মুহূর্তকাল দরজায় দাঁড়িয়ে রইলো স্মরজিৎ, তারপর সৈনিকের মতো দ্রুত ভঙ্গিতে পিছন ফিরে দুমদাম শব্দে নেমে গেলো।

তখন গুপ্ত আপিশ যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, অমলা দেবী কাছে দাঁড়িয়ে। স্মরজিৎ সোজা কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে, 'শুনুন—'

তার চেহারা দেখে দু-জনেই চমকে উঠলেন।—'কী হয়েছে, স্মরজিৎ?'

'আপনাদের কন্যার সঙ্গে আমার আর কোনো সংস্রব নেই। ছেলেবেলা থেকে যে-সম্পর্কের দাবিতে আপনাদের সঙ্গে আমার বন্ধন, আজ থেকে তা ছিন্ন মনে করবেন। আমার আর খোঁজ-খবর নেবেন না আপনারা—আমি চললাম।'

গলা দিয়ে একটা আওয়াজ বের করতে পারলেন না গুপ্ত, একবার চোখের পলক ফেলতে পারলেন না, স্মরজিৎ তার আগেই তিন লাফে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলো—বজ্রাহত হ'য়ে ব'সে রইলেন তিনি, অমলা দেবী আঁচলে কয়েকবার মুখ মুছে একটা সোফায় এলিয়ে পড়লেন। একটু পরে ধীর গম্ভীর নিঃশব্দ পায়ে অসীমকে নেমে আসতে দেখা গেলো। গুপ্তর দিকে একবার তাকালো অসীম, কিন্তু অসীমকে ডেকে গল্প করবার মতো মনের অবস্থা এখন তাঁর নয়—তিনি অন্য দিকে তাকিয়ে রইলেন। অসীম যাবার পর হঠাৎ তার কী মনে হ'লো, তাড়াতাড়ি একজন চাকরকে ডেকে বললেন, 'দ্যাখ তো, অসীমবাবু চ'লে গেলেন নাকি। থাকলে এক্ষুনি ডেকে আন।'

চাকর ফিরে এসে বললে যে বাবু চ'লে গেছেন। তখন গুপ্ত স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শাখাকে একবার ডাকো।'

ডাকতে হ'লো না, শাখা আস্তে-আস্তে নেমে এলো। ফোলা-ফোলা তার চোখ, মুখ এমন ফ্যাকাশে যেন কতকাল অসুখে ভুগে উঠেছে। মা-বাবার দিকে না-তাকিয়ে সে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিলো, গুপ্ত গম্ভীর স্বরে ডাকলেন, 'শাখা, এদিকে এসো।'

বিশাখা থমকে দাঁড়ালো।

'বোসো এখানে।'

কলে টেপা পুতুলের মতো বিশাখা বসলো।

'স্মরজিৎ চ'লে গেলো কেন?'

'আমি জানি না।'

'কেন চ'লে গেলো? কী হয়েছে?...জবাব দাও কথার!—বলো, কী হয়েছে?'

'আমি কিছু জানি না।'

'তুমি জানো না মানে? স্মরজিৎ এইমাত্র ব'লে গেলো যে তোমার সঙ্গে তার আর কোনো সংস্রব নেই। কেন বললো এ-কথা?'

'আমি জানি না।'

'তুমি জানো না তো কে জানে?' গুপ্তর গলার আওয়াজে দেয়াল কেঁপে উঠলো। 'সে তোমার স্বামী—তোমার জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি সম্পদ সার্থকতা তার হাতে—সে যদি আজ তোমাকে পরিত্যাগ করে তোমার উপায় হবে কী?'

'তাও আমি জানি না।'

অধৈর্যের একটা ভঙ্গি ক'রে গুপ্ত বললেন, 'শাখা—একগুঁয়েমি কোরো না, কী হয়েছে তোমাকে বলতেই হবে!'

অমলা দেবী বললেন, 'শাখা, বল না।'

বিশাখা চুপ।

'তবু চুপ ক'রে আছো!'

স্বামীর চোখ-মুখ দেখে অমলা দেবী ভয় পেয়ে মেয়ের মাথায় হাত রেখে বললেন, 'আচ্ছা, আমাকে বল—'

'তুমি চুপ করো! আদর দেবার সময় এখন নয়!' চেয়ার ছেড়ে উঠে গুপ্ত অস্থিরভাবে পাইচারি করতে লাগলেন ঘরের মধ্যে। মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে, তার চোখে চোখ ফেলার চেষ্টা করতে গিয়ে তাঁর চোখ পড়লো অসীমের আঁকা সেই ছবিটার উপব। নিষ্পলক চোখে ছবিটা দেখছে বিশাখা। সঙ্গে -সঙ্গে, বিদ্যুৎ যেমন নিমেষে অন্ধকারকে উদ্ভাসিত ক'বে দেয় তেমনি গুপ্ত যেন সমস্ত ব্যাপারটা চোখের সামনে দেখতে পেলেন। চীৎকার ক'রে উঠলেন, 'শাখা!'

বিশাখা ছবি থেকে চোখ সরিয়ে নিলো।

'তোর মনে এই ছিলো! এই ছিলো!' যেন আপন মনেই গুপ্ত বললেন। অসহায়ের মতো একবার চারদিকে তাকালেন তিনি, তাঁর সুখের ভাণ্ডার, শান্তির আধার, উপার্জনের প্রতিবিম্ব এই বাড়ির কোনোখানেই কোনো আশ্রয় পেলো না তাঁব চোখ—ঘর পার হলেন, বারান্দা পার হলেন, নিচু-নিচু চওড়া মার্বেলের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলেন—গাড়ি নিয়ে ছুটলেন স্মরজিতের কাকার বাড়িতে।

ফিরে এলেন প্রায় দু-ঘণ্টা পরে, বিশাখা ততক্ষণে স্নানাহারেব অভিনয় সেরে নিজের ঘরে শুয়েছে। ড্রয়িংরুমে ব'সে অমলা দেবীর সঙ্গে নিচু গলায় কথা বললেন, দু-একটা কথা বিশাখার কানে এলো—তার মধ্যে অসীমেব নাম শুনলো একবার। বুঝলো, বাবা এক্ষুনি তার কাছে আসবেন, উঠে ব'সে প্রস্তুত হ'য়ে বইলো।

গুপ্ত এসে বললেন, 'স্মরজিতের কাছে সব শুনলাম।'

বিশাখা চুপ।

'তার কথা আমি বিশ্বাস করি—মিথ্যে সে বলে না। তবু তোমাকে জিগেস করি—সে যা দেখেছে বা শুনেছে তা কি সত্য নয়?'

সত্য নয়! বিশাখার বুক ফেটে একটা চীৎকার বেরিয়ে আসতে চাইলো। সত্য, সত্য! এ যে কত সত্য স্মরজিৎ তার কী জানে।

বিশাখার উত্তরের জন্য গুপ্ত মুহূর্তকাল অপেক্ষা করলেন।

'স্মরজিৎ বদ্ধপরিকর, তোমাকে আর গ্রহণ করবে না। যদিও তুমি আমারই কন্যা, তাকে দোষ দিতে পারি না আমি। আমিও আর তোমার মুখ দেখতে ইচ্ছা করি না।' দৃঢ়, স্পষ্ট, কঠোর স্বরে এই কথাগুলি ব'লে গুপ্ত বেরিয়ে গিয়ে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিলেন।

গুপ্ত ভাবলেন তিনি কন্যার মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ করলেন, কিন্তু বিশাখার কানে তা মুক্তির ঘোষণার মতো শোনালো। একটা উদ্দাম আনন্দে আলোড়িত হ'য়ে উঠলো তার মন। হঠাৎ যেন তার চোখের সামনে কারাগারের দেয়ালগুলি ভেঙে পড়তে লাগলো—আরামের দেয়াল, অভ্যেসের দেয়াল, ভব্যতার দেয়াল, শাড়ি-গয়নার দেয়াল, ইংরেজি উচ্চাবণ ফরাশি ব্যাকরণ শেলাই রবীন্দ্র-সংগীত চা-পার্টি সিনেমা পিকনিকের দেয়াল, ন-বছর বয়স থেকে একজনের স্ত্রী হবার জন্য নিজেকে ছাঁচে ঢালবার দেয়াল। আজীবন এই কারাদণ্ডের আদেশ নিয়ে জন্মেছিলো সে, শৃঙ্খলকেই ভেবেছিলো রমণীয়, বন্ধনকেই জেনেছিলো আশীর্বাদ—যে-মুহূর্তে জানলো এটা কারাগার, সে-মুহূর্তেই সে মুক্ত হ'লো। আজ সমস্ত পথ তার খুলে গেছে। স্মরজিৎ তাকে গ্রহণ করবে না, বাবাও তাকে পরিত্যাগ করলেন—আজ আর তার ভয় কিসের।

প্রথমেই মনে হ'লো অসীমকে একটা চিঠি লেখে। মনে-মনে চিঠিটা রচনা করতে লাগলো, কিন্তু ভালো ক'রে কিছুই ভাবতে পারলো না। সে যে বেঁচে গেছে, এই আশ্চর্য কথাটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাসই হ'লো না তার। নিশ্চিতের মুঠি থেকে খ'সে জীবনের তরঙ্গের মধ্যে সে প'ড়ে গেলো কেমন ক'রে? চোখ বুজে চুপ ক'রে শুয়ে-শুয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে বিশাখা শুধু এই কথাটাই ভাবলো যে অসীমকে সে ভালোবাসে। সমস্ত দেহ দিয়ে ভাবলো কথাটি, সমস্ত বুক ভ'রে ভাবলো, এ-কথাটি ভাববার আর যে তার কোনো বাধা নেই, এই আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে ভাবলো। তার মনে হ'লো আজকের আগে কখনো সে বাঁচেনি।

আর না—আর দেরি ক'রে লাভ কী—অসীমকে লিখে দেবে এক্ষুনি চ'লে আসতে। বিশাখা লাফিয়ে উঠে বসলো বিছানার উপর। কিন্তু চিঠি পাঠাবে কাকে দিয়ে? ভাইয়েদের কাউকে দিয়ে? চাকরকে দিয়ে? এ-বাড়িতে বাবার বিরুদ্ধতা ক'রে কে তার বন্ধু হবে? মা? মা তো বাবারই ছায়া। বাবার ইচ্ছেই এ-বাড়ির আইন—তিনি আর তার মুখ দেখতে চান না, তাই সকলেই তাকে দেখে শিউরে উঠবে। এ-বাড়ি থেকে লুকিয়ে কোনো চিঠি পাঠানো? অসম্ভব।

কেন, ডাকে দিলেই হয় চিঠি। কিন্তু পেতে দেরি হবে, ততক্ষণ সে থাকবে কেমন ক'রে। এখনই, এই মুহূর্তে, অসীমকে তার চাই। চিঠি লিখতেই বা হবে কেন, সে তো আসবেই, এখনই কেন আসে না? সবই তো জানে সে, তবে আসে না কেন? কোথায় আসবে? এইখানে, এই বাড়িতে? হ্যাঁ, তা-ই আসবে ; সে-ই না বড়ো সাহসের কথা, শক্তির কথা বলছিলো? কিন্তু সেই সাহস বিশাখা কি তাকে দিয়েছে? সে তো পায়ে ধ'রে ক্ষমা চেয়েছিলো—অসীম সমস্তটা জেনে যায়নি, জেনে গেছে যে বিশাখা দুর্বল, সে দয়া চায়, রক্ষা পেতে চায়। নিজের উপর অসীমের দয়া নেই, তাই বিশাখাকে দয়া করতে সে কাতর হবে না। যদি তা-ই হয়? যদি তা-ই করে? হঠাৎ একটা আতঙ্কের আঘাতে বিশাখার হৃৎপিণ্ড যেন বন্ধ হ'য়ে গেলো। তাই তো, কী ভাবছিলো সে এতক্ষণ! অসীম তো আর আসবে না, সে যদি কোনোরকমে একটা চিঠি পাঠাতেও পারে, তাহ'লেও না—তার মুখের কথাই রাখবে সে, তাকে সে ক্ষমা করবে, রক্ষা করবে, বাঁচাবে! নিজে থাকবে পাষাণ হ'য়ে, আর সেই পাষাণ হবার মূল্য উপহার দেবে বিশাখার জীবনকে। না, তা নয়—তার মূল্য নেবে বিশাখার জীবন।

তবে কি অসীমও তাকে পরিত্যাগ করলো?

বিশাখার কপাল ঘেমে উঠলো, সে যেন আর নিশ্বাস নিতে পারছে না। খাট থেকে নেমে জানলায় দাঁড়ালো। বাইরে তাকিয়েই ইচ্ছে হ'লো ছুটে রাস্তায় চ'লে যায়। একদিন আগেও সে যখন খুশি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেখানে খুশি যেতে পেরেছে—আজ সে কিছুই পারে না। বাড়ির সামনের এই রাস্তা দিয়ে বিশাখা জীবনে কখনো হাঁটেনি—তার একলার জন্যেই ছোটো গাড়ি ছিলো একখানা—যারা হেঁটে বেড়ায় তাদের সে করুণার চোখেই দেখেছে বরাবর। আজ তার মনে হ'লো যারা পায়ে হাঁটে তারাই সুখী, কোনো আয়োজন করতে হয় না তাদের, অন্যের উপর নির্ভর করতে হয় না, যখন ইচ্ছে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লেই হ'লো। কিন্তু লোকের চোখে না-প'ড়ে সে কি রাস্তায় বেরোতে পারবে? সে তো সাধারণ একটি মেয়ে নয় ; সে এইচ. আর. গুপ্টার কন্যা—একজন আই. সি. এস.-এর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিলো। আর বেরোতে পারলেও তো পথ চিনে যেতে পারবে না—অসীমের বাড়িতে দু-দিনই মাত্র সে গিয়েছে, তাও রাত্তিরে, আর জন্ম থেকে গাড়ি চ'ড়ে-চ'ড়ে পথ-ঘাট সম্বন্ধে তার একেবারেই ধারণা নেই।

তা'হলে? কী উপায়?

ঘরটা যেন ছোটো হ'য়ে গেছে, দেয়ালগুলো তাকে চেপে ধরেছে, পৃথিবীকে বাতাস যেন কম। এখান থেকে তাকে বেরোতেই হবে—নয়তো সে বাঁচবে না। যাবে কোথায়? এ-ঘর থেকে বেরোতে হ'লেই তাদের কাছে মুখ দেখাতে হয়, যারা আর তার মুখ দেখতে চায় না। তাহ'লে কি এই ঘরেই আবদ্ধ হ'য়ে কাটাতে হবে সারা জীবন? না, না, তা হ'তে পারে না। স্মরজিৎকে বাদ দিয়ে, বাবাকেও বাদ দিয়ে, তার তো একটা অস্তিত্ব আছে। তাকে তো বেঁচে থাকতে হবে। কী করবে সে? কী হবে

তার? কী হবে? কী করবে?

কী আবার করবে—অসীম থাকতে তার ভয় কী। কিন্তু অসীম কোথায়? সে কি আছে? ঐ তেতলার স্টুডিওতে সকালবেলার দু-ঘণ্টা—এইভাবেই যদি চলতো চিরকাল! ওতেই সে ভ'রে ছিলো, ওর বেশি সে চায়নি। না, চেয়েছে। সে চায়, সমস্তটাই চায়। কিন্তু পাবে কি? পাবে কি? না তো! তার যে একবার বিয়ে হ'য়ে গেছে, অসীমকে সে তো কখনো পাবে না। কোনো হিন্দু মেয়ের কি দু-বার বিয়ে হয়, স্বামী ত্যাগ করলেও? কেন অসীমের সঙ্গে তার আগে দেখা হয়নি, কেন সে বিয়ে করেছিলো, কেন অপেক্ষা করেনি, কেন এই ভুল করলো সে?

বিশাখার মনে হ'লো তার আর দাঁড়াবার শক্তি নেই। আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো। তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলো, মাথার উপর ইলেকট্রিক পাখাটা ঘুরছে, দেয়ালের গায়ে লেগে আছে একটা মোটা ফর্শা নিঃসাড় টিকটিকি, আর তার ঠিক পাশেই, আয়নাতে রোদ্দুর লেগে, জ্বলছে একটি ছোট্ট রামধনু। এই রঙিন মায়া এক্ষুনি মিলিয়ে যাবে, মিলিয়ে গেলো ব'লে। সে যদি উঠে গিয়ে ড্রেসিংটেবিলের আয়নাটাকে একটু তুলে দেয়, কি একটু নামিয়ে দেয়, তাহ'লেই রামধনু আর থাকবে না। কত সহজ! অথচ সে ইচ্ছে ক'রে শুয়ে আছে, আর রামধনু এমন নিশ্চল যেন চিরকাল ওখানেই থাকবে। ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলো বিশাখা, তাকালো আকাশের দিকে, যে-আকাশ সব সময় উপস্থিত। না, কোনো উপায় নেই তার। তাকে মরতে হবে।

অত্যন্ত সহজে, শান্তভাবে বিশাখা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলো। মানুষ যতক্ষণ স্বপ্ন দেখে স্বপ্নটাকেই সত্য মনে হয়, কিন্তু যে-মুহূর্তে জেগে উঠে বাস্তব জগৎকে দেখতে পায়, সে-মুহূর্তেই স্বপ্ন ভুলে গিয়ে সেই বাস্তবকেই সত্য ব'লে গ্রহণ করে। তেমনি বিশাখাও এতক্ষণ নানা দ্বন্দ্বে সংশয়ে অভিভূত হ'য়ে ছিলো, যে-মুহূর্তে মৃত্যুর কথা মনে হ'লো, সে-মুহূর্তে অন্য সব মিলিয়ে গেলো শূন্যে। স্মরজিতের কাছে আর তাব ফিরে যাবার কথাই ওঠে না, স্মরজিৎ চাইলেও না ; বাবার ঘৃণা আর ভাইয়েদের অবজ্ঞা সহ্য ক'রে এখানে সে থাকতে পারবে না , অসীমকে পাবার কোনো আশা তার নেই। আব আজ থেকে এ-বাড়িতে আব স্মরজিতের বাড়িতে যে-অশান্তির সূত্রপাত হ'লো, তা কি সহজে থামবে? আস্তে-আস্তে ছড়াবে দু-বাড়ির আত্মীয়-বন্ধু মহলে, এ নিয়ে তর্ক হবে, হাসাহাসি হবে, রেষারেষি হবে, তারপর ছড়াবে সারা শহরে, সাবা বাংলাদেশে, একটা চমকপ্রদ খবর হ'য়ে। সে-অপমান সে সহ্য করবে কেমন ক'রে? না—বিশাখা ভেবে দেখলো মৃত্যু ছাড়া তার পথ নেই।

সত্যি কি মরবে? ম'রে গেলে আর তো আশা নেই। এমনিতেই বা কী-আশা আছে তার? দেহের অস্তিত্বই তো জীবন নয়। স্নেহ ভালোবাসা সম্মানের সিংহাসনে যারা তাকে বসিয়েছিলো, সেই সব আত্মীয়স্বজন বন্ধুদের কাছে অবহেলা অনাদর নির্যাতন আর বিদ্রূপ ছাড়া আর-কী তার প্রাপ্য হ'তে পারে এখন? বাবা কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবেন না তাকে, উনিশ বছর ধ'রে এ-বাড়িতে যে-গৌরব সে ভোগ ক'রে এসেছে তা সে চিরকালের মতো হারিয়েছে। দিনের পর দিন যাবে, তারপর অসীমও ভুলবে তাকে। সে যুবক, অবিবাহিত, সে স্বাধীন,—কোনো-একদিন আবার কোনো-একটি মেয়েকে তার ভালো লাগবে, তাকে বিয়ে করবে, সুখী হবে অতএব—

মনে পড়লো অসীমের চোখ, তার মুখ, তার গলার আওয়াজ। আর কি কখনো দেখবে না তাকে? দেখবার তীব্র ইচ্ছেতে সে জ্বলবে প্রতিদিন, অথচ কখনো দেখতে পাবে না?...আচ্ছা, তা-ই ভালো থামিয়ে দেবে এই পাগল হৃৎপিণ্ডকে, আর তারপর—তারপর আর কী। হয়তো তার এই ইচ্ছে তখনও মরবে না, তা মিশে থাকবে মেঘে বাতাসে বৃষ্টিতে, কিন্তু সে থাকবে না, কোথাও থাকবে না—আর সেটাই শান্তি।

এক পেয়ালা চা হাতে নিয়ে অমলা দেবী ঘরে ঢুকলেন। আজ আর তাকে সকলের সঙ্গে ব'সে চা খেতে ডাকা হ'লো না ; তার জাত গেছে।

'বড়ো ভয়ানক সব কথা শুনছি।'

বিশাখা চুপ ক'রে রইলো।

'আজকাল অবশ্য ঘরে-ঘরেই এ-সব কাণ্ড হচ্ছে—তবে বিয়ের পরে কিনা, তাই মুশকিল। আর তোমার বাবা এ-সব একেবারেই পছন্দ করেন না—বিয়ের আগেও না।'

বিশাখা মাথা নিচু ক'রে সিঁথির উপর দিয়ে একটি আঙুলের ডগা বুলিয়ে গেলো।

'আমি বলছিলাম কী—কয়েকদিন পরে তোমার বাবা তোমাকে নিয়ে খুলনা যান—ছেলেবেলা থেকে দেখছে, কাছে গেলে কি আর ফেলতে পারবে!'

বিশাখা এক চুমুক চা খেলো।

'আর ও-সব...ও-সব কিছু না। ছেলেবয়সে কত হয় ও-রকম, ও নিয়ে ভাবতে হ'লেই হয়েছিলো!'

মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে বিশাখা ভাববার চেষ্টা করলো যে কোনো বয়সে, কোনো সময়ে, কোনো মানুষের প্রতি এ-রকম তাঁর হয়েছিলো কিনা।

'না-হয় তুমিই স্মরজিৎকে একবার—'

'মা, চুপ করো।'

'চুপ ক'রে থাকার কথা এ তো নয়, শাখা, এ হ'লো জীবন-মরণের কথা—'

ঠিক। হয় জীবনের, নয় মরণের।

'কী অবস্থা বাড়ির!' অমলা দেবী বলতে লাগলেন, 'তোমার বাবা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যেন বুড়ো হ'য়ে গেছেন, ছেলেগুলো চোরের মতো পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াচ্ছে, আর আমার সেই হার্টের ব্যথাটা অনেকদিন পর—' একটু যেন কষ্টে নিশ্বাস নিয়ে তিনি কথা শেষ করলেন, 'এর একটা বিহিত হওয়া চাই তো।'

বিশাখা জিগেস করলো, 'মা, তুমি সেই হার্টের ওষুধটা খাও না আজকাল?'

'কে জানে কোথায় আছে ওষুধ, আর এখন কাকেই বা আনতে বলি—কিছু ভালো লাগছে না।'

রাত্রে অমলা দেবী মেয়ের কাছে শুলেন। জলের সঙ্গে মিশিয়ে দু-ফোঁটা ওষুধ খেলেন শোবার আগে।—'এটা খেয়ে নিই, নয়তো ঘুমোতে পারবো না।'

'কোথায় পেলে ওষুধ?'

'ছিলো একটা অনেকদিন আগেকার।'

'কী হয় ওষুধ খেয়ে, আবার তো ব্যথা হয়।'

'হার্টের অসুখ সারে না—তখনকার মতো আরাম হওয়া দিয়েই কথা।'

ওষুধের শিশিটা হাতে নিয়ে বিশাখা বললে, 'বিষ লেখা দেখছি।'

'ওষুধমাত্রেই বিষ।'

'কেউ যদি সবটা খেয়ে ফ্যালে?'

অমলা দেবী শুনতে পেলেন না কথাটা। আবার স্মরজিতের কথা তুললেন। বিশাখা নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুয়ে-শুয়ে অন্য কথা ভাবতে লাগলো। ওষুধের শিশিটা তার বালিশের তলায় অপেক্ষা করছে—আর-একটু রাত হোক।

তখন অসীমের চোখেও ঘুম ছিলো না। সারাদিন সে অনর্থক ঘুরে বেড়িয়েছে সারা শহর, অনেক রাত্রে ক্লান্ত হ'য়ে বাড়িতে ফিরেও ঘুমোতে পারছে না। সে-ই ভুল করেছে, সকালবেলা তক্ষুনি চ'লে আসাটা ভুল হয়েছে তার। ওকে ওরা কী বলেছে? কী করেছে? সারাদিন ধ'রে নিজেকে সে যতই বুঝিয়েছে যে এ-ব্যাপারে তার কোনো সংস্রব নেই, এটা নিতান্তই স্বামী-স্ত্রীর একটা ঘরোয়া ঝগড়া, সব স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার মতোই একটু পরে আপনি মিটে যাবে, সে এর মধ্যে কিছু করতে গেলে ভালো তো হবেই না, বরং স্বামী-স্ত্রীর মিলনের অন্তরায় হবে সেটা, আর সেইজন্য নিজেকে এখন একেবারে মুছে ফেলাই তার কর্তব্য—যতই এ-সব ব'লে নিজেকে বেঁধে রাখার চেষ্টা করেছে, ততই তার মনের গভীর তলা থেকে এই কথাই বার-বার শুনতে পেয়েছে যে সে ভুল করছে, ভুল করেছে। এটা তারই ব্যাপার, এ নিয়ে সে কিছু না-করলে কেউ কিছু করতে পারে না। ও-বাড়িতে যাতে সে না যায়, যাতে ও-বাড়ির মোড়ে হঠাৎ ট্রাম থেকে নেমে না পড়ে, তার জন্য নিজেকে সে চাবুক মেরেছে সারাদিন।

কিন্তু নির্ঘুম রাত্রিতে ছটফট করতে-করতে হঠাৎ সে বিশাখাকে অত্যন্ত স্পষ্ট ক'রে অনুভব করলো। বিশাখা এখন তাকে চাইছে, তাকেই খুঁজছে, তাকে না-পেলে বিশাখার চলবে না। এক্ষুনি তার যাওয়া চাই। অসীম উঠে পড়লো বিছানা ছেড়ে, দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দ্যাখে, সারি-সারির আলোর তলায় শূন্য পথ অর্থহীনভাবে প'ড়ে আছে। অনেকক্ষণ পাইচারি করার পরে ঘরে এসে ঘড়ি দেখলো—মাত্র দুটো! কখন ভোর হবে?

সে-রাত্রে গুপ্তরও ভালো ঘুম হ'লো না।—জীবনে এই প্রথম তাঁর অনিদ্রা রোগ—খুব ভোরে উঠে বারান্দায় বসলেন। একটু পরে দেখলেন, অসীম সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। উঠে গিয়ে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ালেন তিনি ; দু-সিঁড়ি আগে মুখ তুলে অসীম বললো, 'নমস্কার, মিস্টর গুপ্ত।'

অত্যন্ত গম্ভীর গলায় গুপ্ত বললেন, 'তুমি এলে, ভালোই হ'লো। এসো।'

'আপনি কি ভেবেছিলেন আমি আর আসবো না?'

'কালকের দিনের মধ্যে অনেক কথাই ভেবেছি।' বারান্দায় এনে তাকে বসিয়ে গুপ্ত বললেন, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'সব শুনবো। কিন্তু বিশাখা কোথায়? তাকে একবার ডেকে দিন।'

গুপ্ত স্তম্ভিত হ'য়ে অসীমের মুখের দিকে তাকালেন। এত নির্লজ্জ! হিমালয়তুল্য গাম্ভীর্য নিয়ে বললেন, 'তার সঙ্গে তোমার আর দেখা হবে না।'

'কেন?' অসীম এমনভাবে প্রশ্ন করলো যেন গুপ্ত তার কোনো অধিকারে হস্তক্ষেপ করছেন।

'কেন, তা জিগেস করছো? তোমার লজ্জা নেই?'

'আমি তো লজ্জাকর কিছু করিনি। তাকে একবার ডেকে দিন, আমি এখানে আপনার সামনে বসে তাকে একটা কথা বলবো। আমাকে বিশ্বাস করুন, এতে কোনো ক্ষতি হবে না, এতে ভালোই হবে।'

'না। তুমি জানো, স্মরজিৎ আমার কন্যাকে আর গ্রহণ করতে চাচ্ছে না?'

'আমি সেইরকমই ভয় করছিলুম।'

'তুমি জানো যে এ-জন্য তুমিই দায়ী?'

'আমি উপলক্ষ ; কিন্তু আমাকে যদি দায়ী হ'তে বলেন—আমি তা-ই হবো।'

'একটা জীবন তুমি নষ্ট করলে, অনেকগুলি জীবনে অশান্তি আনলে—এর জন্য তোমার কী-শাস্তি হ'লে ঠিক হয়? তোমাকেই জিগেস করছি।'

'আপনাকে জিগেস করছি, শাস্তি আমাকে দেবে কে?—কিন্তু এ-সব আলোচনার পরে অনেক সময় পাবো, মিস্টর গুপ্ত, এখন ওকে ডেকে দিন।'

গুপ্ত একটু ভেবে বললেন, 'তুমি তাহ'লে ওর সামনেই শাস্তি নেবে?'

'তা-ই নেবো।'

'ওর সামনেই শপথ ক'রে বলবে যে ও-সব তোমার মনের বিকার?'

অসীম অসহিষ্ণু হ'য়ে বললে, 'হবে, হবে, সব হবে। আপনি ওকে আসতে বলুন।'

গুপ্ত একজন চাকরকে ডেকে বললেন, 'মা-কে বল তো দিদিমণিকে একবার এখানে পাঠিয়ে দিতে।' তারপর অসীমের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললেন, 'ছেলেমানুষ—কিছু বোঝে না—ওর জীবনটা নষ্ট হ'তে দিয়ো না তুমি।'

'আমার কাছে আপনি কী আশা করেন?'

'না, না, কিছু আশা করার কথা নয়—তবে কিনা, তুমি যদি একটু বুঝিয়ে বলো—আমাদের কথার চাইতে তোমার কথাতেই কাজ হবে এখন।'

দ্রুত চোখে একবার গুপ্তর দিকে তাকিয়ে অসীম বললে, 'বেশ, বলবো বুঝিয়ে।'

কিন্তু বিশাখার আসতে কেবলই দেরি হ'তে লাগলো। অমলা দেবী ঘরে গিয়ে দেখলেন, মেয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। দু-চার বার ডেকে সাড়া পেলেন না। তখন গায়ে ঠেলা দিতে-দিতে ডাকলেন 'শাখা, শাখা—ওঠ!'

বিশাখা জড়িতস্বরে বললো, 'উঁ?'

'ওঠ, ওঠ,' অমলা দেবী গলা চড়ালেন, 'তোর বাবা তোকে ডাকছেন—'

বিশাখা বিহ্বল চোখে তাকালো। এ কী? তার মা? সেই ঘর! সে কি তাহ'লে মরেনি? নিজের কপালের উপর একবার হাত রাখলো, হাতের আঙুলগুলোর দিকে তাকালো একবার। সে বেঁচে আছে! তাড়াতাড়ি বালিশের তলায় হাত দিলো—ওষুধের শিশিটা তেমনিই প'ড়ে আছে। হায় হায়, সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো, সে মরতে পারেনি, আরো একটা দিন এই অসহ্য জীবন তাকে বহন করতে হবে!

অমলা দেবী গলা নিচু ক'রে বললেন, 'ওঠ, তোর বাবা তোকে বারান্দায় ডাকছেন—অসীম এসেছে।'

কে! আর-একটু হ'লেই বিশাখা চেঁচিয়ে উঠেছিলো। অসীম এসেছে! কী ভাগ্য সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো, কী ভাগ্য সে ওটা খায়নি! দ্রুত বেগে বালিশের তলা থেকে শিশিটা বের ক'রে বললে, 'এই দ্যাখো! তোমার ওষুধটা বিছানাতেই প'ড়ে আছে! এটা কোনো ভালো জায়গায় রেখে দাও, মা নয়তো আবার দরকার হ'লে খুঁজে পাবে না।'

শেষরাত্রির দিকে কয়েক ঘণ্টা সে বোধহয় ভালোই ঘুমিয়েছিলো, ঝরঝরে লাগছে শরীর। আজকের মতো ভোরে খুব কম দিনই সে ঘুম থেকে উঠেছে, এ তার নতুন লাগলো। নতুন লাগলো পৃথিবী, নতুন লাগলো নিজেকে। কাল রাত্রে সে হয়তো ম'রেই গিয়েছিলো, ম'রে গিয়েও আবার বেঁচেছে—এ তার নতুন জন্ম, এ তার নবজীবন। মৃত্যু খুব কাছে এসেছিলো কাল ; হাত বাড়িয়েছিলো, হয়তো ঘুমের মধ্যে নিয়েও গিয়েছিলো তাকে, আবার ফিরিয়ে দিয়ে গেলো। কেন ফিরিয়ে দিলো? আজ সকালে ঘুম না-ভাঙতেই অসীম আসবে ব'লে। বাথরুমের আয়নায় নিজের মুখ দেখে বিশাখা ভাবলো যে তার নাম একই আছে, চেহারা একই আছে, কিন্তু সে আর সে নেই, সে আর-একজন, সে সদ্যোজাত—পুরোনো কোনো দাবিই তার উপর আর চলবে না।

তাড়াতাড়ি মুখ-চোখ ধুয়ে পরিষ্কার একটি শাড়ি প'রে বিশাখা বারান্দায় এলো। গুপ্ত মেয়েকে দেখে একটু অবাক হলেন—তার মুখে অশান্তির কোনো চিহ্ন নেই। অসীম তার দিকে তাকিয়ে বললে, 'কেমন আছো, বিশাখা?'

'ভালো আছি। তুমি—' বিশাখার মুখে অত্যন্ত সহজে 'তুমি' এসে পড়লো, আর সে-জন্য একটুও অপ্রতিভ হ'লো না সে। অতীত মুছে গেছে, আজ সব নতুন ক'রে আরম্ভ। তবু যেন জগৎ-সংসারকে অনুগ্রহ ক'রে 'তুমি'-টাকে চাপা দিয়ে বললে, 'আপনি কখন এলেন?'

গুপ্ত বললেন 'শাখা, তোমাদের দু-জনের সামনেই একটা কথা বলবে ব'লে তোমাদের ডেকেছি। তোমার ভবিষ্যৎ কোন পথে যাবে তার মীমাংসা এখনই হওয়া চাই, তা তুমি নিশ্চয়ই বোঝো?'

'কী ভেবেছো তুমি?'

'স্মরজিতের মনে তোমার সম্বন্ধে যে-সন্দেহ ঢুকেছে সেটাকে অমূলক প্রতিপন্ন করতে হবে। আর অসীমের সম্বন্ধে তোমার ধারণা যে ভুল সেটাও তোমার জানা দরকার।'

কথার প্রথমার্ধ সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ না-ক'রে বিশাখা বললে, 'কী ধারণা আমার?'

'সেটা অসীমের মুখেই শোনো। বলো, অসীম।'

অসীম বললে, 'কী আপনি শুনতে চান?'

গুপ্ত একটু চেষ্টা করে বললেন, 'ওর সম্বন্ধে তোমার মনে যেটা আছে সেটা যে সামান্য একটা মোহ মাত্র—'

কথার মাঝখানে অসীম ব'লে উঠলো, 'না, সেটা সামান্যও নয়, মোহও নয়। আমি বেশি বলতে চাই না—আপনি বুঝে নিন।'

'বুঝে নেবো!' গুপ্ত জ্ব'লে উঠলেন। 'ওর জীবনটা ব্যর্থ ক'রে দিলে—এই তুমি বুঝতে বলছো আমাকে!'

'ব্যর্থ আমি করিনি, ব্যর্থ করেছেন আপনি, আর আপনার জামাতা।'

'কিন্তু সে যা দেখেছে, যা শুনেছে—তারপর এ ছাড়া আর কী সে করতে পারতো? তার যদি মনে হয় যে তার স্ত্রীর মন তার উপরে নেই, এমনকি, তারও বেশি কিছু—'

'সে-কথা আপনার কন্যাকেই জিগেস করুন।'

বিশাখার দিকে একবার তাকিয়েই গুপ্ত চোখ সরিয়ে নিলেন।—'ওর কথা পরে শুনবো। তুমিই বলো না, এ-অবস্থায় ওকে কী করতে বলো?'

'আপনি নিজেকে বিচারকের আসনে বসিয়েছেন—আপনার বিচারের ফলাফল আগে শুনি, তারপর মনস্থির করবো।'

এর উত্তরে গুপ্ত কী বললেন, হঠাৎ ভেবে পেলেন না। যে-তেজ নিয়ে এ-আলোচনা আরম্ভ করেছিলেন, সেটা যেন ভিতরে-ভিতরে এরই মধ্যে মীইয়ে গেছে। স্ত্রীকে কাছে দেখে বললেন, 'একটু চা পাঠিয়ে দাও তো আমাদের।'

অমলা দেবী তাঁর হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বললেন, 'একজন লোক এইমাত্র দিয়ে গেলো এটা। দ্যাখো তো কার।'

টাইপ-করা চিঠি, অত্যন্ত গদ্য চেহারা, কিন্তু পড়তে-পড়তে ঝকঝকে হ'য়ে উঠলো গুপ্তর চোখ-মুখ, দেহে যেন প্রাণ ফিরে এলো। স্মরজিতের চিঠি। লিখেছে—ভেবে দেখলো এ-রকম ঘটনার সূত্র ধ'রে একটা স্ক্যান্ডল দেশময় ছড়িয়ে পড়তে পারে—আর যদিও সে এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ, শুধু নির্দোষ নয়, অন্যায়ের ভুক্তভোগী, তবু কোনো-একটা স্ক্যান্ডল-এর সঙ্গে নিরপরাধভাবেও নিজেকে জড়াতে সে ইচ্ছে করে না, সেটা তার উচ্চ রাজকার্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই সে শাখাকে ক্ষমা করতে এবং গ্রহণ করতে প্রস্তুত, আশা করা যায় যে তার এই মহানুভবতাকে কেউ দুর্বলতা ব'লে ভুল করবে না। তার আইনত বিবাহিত স্ত্রী যেন আজ সকাল ন-টার মধ্যেই তাদের বালিগঞ্জের বাড়িতে পৌঁছয়—প্রস্তুত হ'তে যতক্ষণ লাগে তার বেশি এক মুহূর্ত সময়ও সে আর পিত্রালয়ে থাকে এটা স্মরজিতের ইচ্ছে নয়—পূর্বব্যবস্থামতো কাল সে স্ত্রীকে নিয়ে কর্মস্থলে যাত্রা করবে। তলায় এস. দাশের একটা দর্পিত নাম-সই।

চিঠির সবটা ভালো ক'রে না-প'ড়েই গুপ্ত চেঁচিয়ে উঠলেন, 'শাখা, স্মরজিৎ তোকে যেতে লিখেছে—এক্ষুনি যেতে লিখেছে। ওঠ, ওঠ, চটপট তৈরি হ'য়ে নে। রামদীন, বড়ো গাড়ি বের করো—আমি নিজেই যাবো তোকে নিয়ে—' গুপ্ত উত্তেজিত-ভাবে উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে, 'ওগো—শাখাকে একটু খাইয়ে-টাইয়ে দাও—জিনিশপত্রের হাঙ্গামা এখন কোরো না, পরে পাঠিয়ে দিলেই হবে—আর হ্যাঁ,' দেখতে-দেখতে গুপ্তর উৎসাহ তাঁর স্বাভাবিক মাত্রাকেও ছাড়িয়ে গেলো— 'স্মরজিতের জন্য কিছু খাবার-টাবার—এখন আবার তৈরি করতে বোসো না, দেরি হ'য়ে যাবে—কিছু চীজ, সসেজ আর টিনের মাছ আনিয়ে নাও চট ক'রে—ও-সব ও ভালোবাসে খুব—আর দ্যাখো, বাঁড়ুয্যের দোকানে টেলিফোন ক'রে দাও সবচেয়ে ভালো তাঁতের ধুতি দু-খানা পাঠিয়ে দিতে—না, না, চারখানাই বলো—ওর বাপ আছে, খুড়ো আছে—তাই তো বলি, স্মরজিৎ সোনার ছেলে, ও কি কখনো—' এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা ব'লে গুপ্ত হঠাৎ নিশ্বাস নিতে একটু থামলেন, অসীমের উপর চোখ পড়ামাত্র বললেন, 'আচ্ছা অসীমবাবু, আপনি তাহ'লে—'

'আমাকে দিয়ে আপনার আর দরকার নেই, মনে হচ্ছে?' অসীম ক্ষীণ হাসলো।

'না, না, দরকারের কথা কী—বসুন, বসুন, একটু চা তো খাবেন।' হঠাৎ অসীমের পাশে ব'সে প'ড়ে ঘনিষ্ঠভাবে বললেন, 'তোমাকে কিন্তু মাঝে-মাঝে আসতে হবে, অসীম—এ-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দিলে চলবে না।'

'নিশ্চয়ই আসবো,' অসীমের মৃদু গলা হঠাৎ একটু চড়া শোনালো।

'আমি আসছি এক্ষুনি—পালিয়ো না আবার।' গুপ্ত লাফ দিয়ে উঠলেন, ছুটে ঘরে গেলেন, ঘর গমগম করতে লাগলো তাঁর একটানা উচ্চস্বরে—নানারকম নির্দেশ দিচ্ছেন চাকরদের।

স্মরজিতের চিঠিটা তুলে নিয়ে বিশাখা পড়তে লাগলো, অসীম নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো তার মুখের

দিকে। পড়তে-পড়তে একটা গভীর লাল রং ছড়িয়ে পড়লো তার মুখে ; গাছ থেকে যেমন শুকনো পাতা ঝ'রে পড়ে, তেমনি চিঠিটা খ'সে পড়লো তার হাত থেকে। অসীম তার মুখ থেকে চোখ সরালো না, আর তার চোখ অসীমের চোখের উপর পড়ামাত্র হঠাৎ বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়ালো বিশাখা। সঙ্গে-সঙ্গে যেন কিছু বুঝতে পেরে অসীমও উঠলো, রুদ্ধস্বরে বললে, 'তাহ'লে—'?

বিশাখা বললো, 'চলো।'

'আমি প্রস্তুত,' অসীমের চোখে একবার পলক পড়লো না। 'কিন্তু তোমার কি ভয় করছে না?'

'না।'

'ভেবে দেখেছো, এর মানে কী?'

'আর কথা না,' বিশাখা দ্রুত দৃষ্টিতে একবার এদিক-ওদিক তাকালো। 'চলো—সময় নেই।'

ঘরের মধ্যে গুপ্তর কণ্ঠস্বর স্রোতের মতো ব'য়ে যেতে লাগলো অবিরাম। স্ত্রীর উপর তাঁর বেশি আস্থা নেই, সমস্ত ব্যবস্থা নিজে করলেন, আর ভাবতে লাগলেন যে স্মরজিৎ খুশি হবে, আর সেই খুশিকে জড়িয়ে লতার মতো বেড়ে উঠবে কন্যার সুখ-শান্তি। মেয়েটার ভাগ্য, জামাইয়ের তাই সুমতি হয়েছে। এখন মেয়ে বুঝে-সুঝে চলতে পারলেই—

'শাখা! এখনো ব'সে আছিস! যা—স্নান-টান—' বলতে-বলতে বারান্দায় এসে গুপ্ত অবাক। কোথায় শাখা, অসীমই বা কোথায়। গুপ্ত এদিকে তাকালেন, ওদিকে তাকালেন, একবার রেলিঙে ভর দিয়ে রাস্তা দেখলেন, একবার দরজার কাছে এসে সিঁড়িটা দেখলেন—পা বাড়ালেন যাবেন ব'লে, কিন্তু পা চললো না, পা অবশ হ'লো, একটা খালি বস্তাকে দাঁড় করাতে গেলে যেমন হয়, তেমনি ক'রে তিনি নেতিয়ে পড়লেন একটা চেয়ারে—তাঁর লম্বা-চওড়া সুপুষ্ট দেহ কুঁকড়ে যেন এইটুকু হ'য়ে গেলো।

মনের মতো মেয়ে

কনকনে ঠাণ্ডা রাত্রি, ডিসেম্বর মাস। টুণ্ডলা স্টেশনের ফর্স্ট ক্লাশ ওয়েটিংরুমে চার জন যাত্রী নিঃশব্দে ব'সে আছেন। চার জনেরই ওভারকোট গায়ে, পা থেকে গলা পর্যন্ত ঢাকা, তবু রেল-কোম্পানির মাপজোক মতো বানানো এবং সাজানো সেই হৃদয়হীন কামরার নিস্তেজ আলোতেও বোঝা যাচ্ছে যে, চার জন চার জাতের মানুষ, সংসারের বিভিন্ন বিভাগ থেকে ছিটকে আজ এখানে এসে জুটেছেন। ইজি-চেয়ারে যিনি ছড়িয়ে আছেন তাঁর প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ শরীর—হয়তো একটু অশোভনরকম বলিষ্ঠ, যেন সেই অতিশয় পুরুষজাতীয় জীব, যারা যোলোয় প'ড়েই জুতো-জামার মাপ-পেরোনো লম্বা হ'য়ে বাপ-মাকে তাক লাগিয়ে দেয়। এঁর মুখখানাও মস্ত, প্রায় একটা কাঁঠালের সমান, ছাঁদটাও তেমনি লম্বার দিকে, আর তাঁর গালের চওড়া জমিতে আগামী প্রত্যুষের দাড়ির বীজ —বোধহয় ঠাণ্ডায় রোমকূপ ফুলে উঠেছে ব'লেই—এখনই বেশ বুটি-বুটি নীল হ'য়ে ফুটেছে। দ্বিতীয় জন সুগঠিত সুশ্রী মানুষ, সাজগোজেও দোরস্ত, টুপি ছড়ি দস্তানা সুদ্ধু, শ্বেতাঙ্গবেশে টিপটপ। এঁর মুখখানা গোল ছাঁদের, নধর, গম্ভীর, গায়ের রং ঠিক সেইরকম মসৃণ কালো, যাতে সুশ্রী পুরুষকে আরো সুশ্রী দেখায় ; আর মাথার চুল ঘন এবং কালো হ'লেও হঠাৎ এক-একবার রুপোলী সুতো ঝিলিক দেয়। ঠোঁট চাপাও না, ভরাও না, তীক্ষ্ণ রেখায় পরিস্ফুট, যেন ঐ ঠোঁটের কম কথায় হুকুম ক'রে অভ্যাস। এঁকে যে দেখবে সে-ই বলবে যে, এঁকে কখনো গলা চড়াতে হয় না, এঁর নিশ্চিত, সুশৃঙ্খল জীবনে নিয়মের নড়চড় হয় না কখনোই। এই আরাম, নিজেকে বেশ তোয়াজে রাখার রুটিন, এই ওয়েটিংরুমের চেয়ারেই হাঁটুতে হাঁটু তুলে ব'সে থাকায় এঁর যে স্বাভাবিক কর্তৃত্বের ভাব, তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায় তৃতীয় জনেও। ইনি একটু মোটার দিকে—সেকেলে বাবুগোছের চেহারা, মাথার মধ্যিখানে টেড়ি-করা চুল, গাল দুটি লালচে—যারা খুব ফল খায় তাদের যেমন হয়—ঠোঁটের উপর পরিষ্কার গোঁফ দিব্যি মানিয়েছে। কিন্তু চতুর্থ জন—তিনি যেন এই আরামের ঠিক উল্টো ছবি। ছোটো-খাটো মানুষ—বসেছেন একটু কোণের দিকে, একটা চেয়ারে ব'সে আর-একটায় পা তুলে দিয়েছেন—যদিও আর-একটা বিরাট ইজি-চেয়ার শূন্য প'ড়ে আছে, কিন্তু বসার ভাবটায় স্বাচ্ছন্দ্য নেই। বার-বার ন'ড়ে-চ'ড়ে কোনোরকমেই যেন আরাম পাচ্ছেন না, আর মাঝে মাঝে চোখ বুজলেও কপালে থেকে-থেকে রেখা পড়ছে—যেন কী জরুরী কথা ভাবছেন, যেন ভাবনায় অস্থিরতাই এঁর অভ্যাস। হঠাৎ দেখলে এঁর বয়স খুব কম লাগে,—হয়তো চার জনের মধ্যে এঁরই বয়স সবচেয়ে কম, কিন্তু নাকের ঠিক তলাটিতে যখন আলো পড়ে, তখন আর এঁকে যুবক ব'লে ভুল হয় না।

এই চার ভ্রাম্যমাণের এর আগেও পরস্পরের দেখা হয়েছে। তাজমহলের বাগানে, সেকেন্দ্রার সিঁড়িতে, তারপর আজ আগ্রা থেকে এক কামরাতেই এলেন। কিছু কথাও হয়েছে ট্রেনে ব'সে। তাতে বোঝা গেলো, বলিষ্ঠ পুরুষটি কনট্র্যাক্টর, দিল্লিতে এসেছিলেন ভারত সরকারের অর্ডার নিতে, ফিরতি-পথে আগ্রা, ইচ্ছে আছে কাশীতেও একবার থামবেন। দ্বিতীয় জন দিল্লিরই একজন পুরোনো, বিশ্বস্ত রাজপুরুষ, সম্প্রতি মিলিটারি বিভাগে একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত, এবং দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কাজেই আগ্রা থেকে এখন যাচ্ছেন এলাহাবাদ, তারপর লক্ষ্ণৌ ক্যান্টনমেন্ট। তৃতীয় জন কলকাতার ডাক্তার—ডাক্তার ধর—নামজাদাদের মধ্যেই একজন—দিল্লিতে মেডিকেল কনফারেন্সে ডিপথেরিয়া বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে এখন রোগীদের তদারকে ফিরে যাচ্ছেন। আর চতুর্থ জন—তিনি উত্তর ভারতে এসেছেন শুধুই বেড়াতে, দৃশ্য দেখতে, এখান থেকে সোজা কলকাতায় ফিরবেন, না, পথে কোথাও

নামবেন, সে বিষয়ে ঠিক মনস্থির নেই। তাঁর পেশা কী তাও ঠিক বোঝা গেলো না, বললেন বই লেখেন, কিন্তু বই লেখাটা ঠিক কাজের মধ্যে পড়ে কি? তবে মানুষটা যে বই ঘেঁষা তা বোঝা গেলো, কেননা, কথাবার্তা ফুরোবার পর যে মস্ত মোটা বইখানা তিনি খুলে ধরলেন, সেটি আকারে-প্রকারে—অন্য তিন জনেরই মনে হ'লো—ট্রেনে ব'সে পড়ার একেবারেই অযোগ্য, আদৌ পাঠযোগ্য কিনা তাও হয়তো সন্দেহ করা যায়।

টুণ্ডলায় এসে দুঃসংবাদ! আলিগড়ের কাছে মালগাড়ি ডিরেল্ড হয়েছে, সব গাড়ি বন্ধ। কতক্ষণ? তা লাইন ক্লিয়ার হ'তে চার-পাঁচ ঘণ্টা তো লাগবে। তার মানে, আজ রাত্রের মতো আশা নেই? মনে তো হয় না। রাজপুরুষের জরুরি কাজ, তিনি এরোপ্লেনের খবর নিলেন। হ্যাঁ, আগ্রায় ফিরে যাবার গাড়ি আছে, কিন্তু আগ্রায় ফিরে প্রথম প্লেন পাওয়া যাবে সকাল সাড়ে-ন'টায়। ডাক্তারটি যেন চেষ্টা করলেন বেশ দার্শনিকভাবে ব্যাপারটা মেনে নিতে, কিন্তু কনট্র্যাক্টর ঘন-ঘন নিশ্বাস ছেড়ে বলতে লাগলেন, ওঃ, এই শীতে—! যদিও তাঁর দেহের আয়তন আর আচ্ছাদনের ঘনতা, দুটোই উত্তমরূপে শীতনিবারক। তবে, রোগা ভদ্রলোকটির সত্যি খুব শীত লাগছিলো, তিনি হাতে হাত ঘষলেন, একটু পায়চারি করলেন, তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে অন্য তিন জনকে এই অনাবশ্যক খবরটা জানালেন যে, ওয়েটিংরুমে রাত কাটানো ছাড়া এখন আর উপায় নেই।

এই একটু আগেই মালপত্র নিয়ে বসেছেন এঁরা। কারো মুখেই কথা নেই, আপাতত তিন জনেই বোধহয় মনে-মনে এই দুরদৃষ্ট হজম করতে সচেষ্ট। এক-একটা মিনিটকেই কী লম্বা মনে হচ্ছে, আর শীতের এই লম্বা রাত!

ইজি-চেয়ারে ন'ড়ে-চ'ড়ে কনট্র্যাক্টর জিগেস করলেন, 'ক-টা বাজলো?' তাঁর নিজের হাতেও ঘড়ি ছিলো, কিন্তু আলস্যবোধেই হোক, কিংবা কথা বলার ছুতো ব'লেই হোক, তিনি অন্য দু-জনকেই জিগেস করলেন কথাটা।

জবাব দিলেন সরকারি চাকুরে : 'বারোটা পঁয়ত্রিশ।'

পঁয়ত্রিশ! যাক্, ট্রেন থেকে নামার পরে আধ ঘণ্টা প্রায় কাটানো গেছে। কনট্র্যাক্টর আর-একটি প্রশ্ন খুঁজে পেলেন :

'শোবার ব্যবস্থা হবে নাকি?'

'এই মেঝেতে?'

তাতে কনট্র্যাক্টরের আপত্তি ছিলো না, কিন্তু অন্যের উন্নত রুচি অগত্যা মেনে নিলেন।

'এখানে রিটায়ারিং রুম নেই?'

'না।'

এই এক-কথার জবাবের পর কথাবার্তা এগোনো শক্ত, কিন্তু মোটা মানুষ মিশুক হয়, আলাপী হয়, তাই ইজি-চেয়ারের গহ্বর থেকে আবার আওয়াজ উঠলো।

'আমরা তো তবু ব'সে-ট'সে যা-ই হোক—কিন্তু অন্য প্যাসেঞ্জারদের কী দুর্দশা!'

এর উত্তরে কোনো সমব্যথী মন্তব্য হ'লো না, কিন্তু, যেন এর উত্তরেই, ওয়েটিংরুমের টানা দরজা ফাঁক হ'লো, আর বাইরের হিম হাওয়ায় হঠাৎ ঘর ভ'রে গেলো। বোধহয় সেইজন্যই চার জনেরই দরজার দিকে চোখ ফিরলো, যিনি মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে ছিলেন, তাঁরও।

এই চার-জোড়া চোখের সামনে, দরজা খোলার কারণ যারা, তারাও থমকালো। দু-জন তারা। দরজাটা ফাঁক ক'রে ধ'রে যুবকটি দাঁড়ালো, সবটা তার দেখা গেলো না, আভাসে বোঝা গেলো, তার শীতে-ফাটা মুখ, গায়ের ব্রাউন রঙের বাড়িতে-বোনা পুল-ওভার, পরনে শস্তা দরের প্যাৎলুন। আর মেয়েটি তার পাশে, প্রায় গা ঘেঁষে, আরো একটু আড়ালে। তাকে প্রায় দেখাই গেলো না—শুধু কিছু কালো চুল ঝিলিক দিলো, সিঁদুরের গর্বিত লাল, তরুণ মসৃণ গলা, গালের উপরে চূর্ণালক।

মাত্রই কয়েক সেকেন্ড তারা সেখানে দাঁড়ালো, অস্ফুটে দু-একটা কথা বললো—কিন্তু ঐটুকুতেই ওয়েটিংরুমের বিশীর্ণ শীতে ঈষৎ যেন উষ্ণ হাওয়া দিলো, এটুকুতেই বোঝা গেলো তাদের নতুন বিয়ে হয়েছে—হয়তো দু-মাস, হয়তো এক বছর, কিন্তু পরস্পরের ভালোবাসায় এখন—এখনো—তারা আত্মহারা। ঐ-যে তারা একটুখানি দাঁড়ালো, নিচু-গলায় কী বললো কী বললো না, তারপর ফিরে গেলো, ওতেই বয়স্ক তিন জন পুরুষকে তারা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলো যে, এখনো তারা স্বর্গের অধিবাসী একজনের আর-একজন থাকলে আর-কিছু চাই না, কিছু না, কাউকে না, কিছুই না।

দরজা আবার বন্ধ হ'লো, আবার থাকলো শুধু হৃদয়হীন কৃপণ ওয়েটিংরুম, ট্রেনের অভাবে, আরামের অভাবে, ঘুমের অভাবে কাতর চার জন বয়স্ক পুরুষ।

মিশুক মোটা মানুষটি এবারেও প্রথম কথা বললেন।

'এঁরা ফিরে গেলেন যে?'

'ফর্স্ট ক্লাশের প্যাসেঞ্জার ব'লে মনে তো হ'লো না', জবাব দিলেন ডাক্তার।

'না, সে-জন্য না,' বললেন তৃতীয় জন, কপালে-রেখা-পড়া বইঘেঁষা মানুষটি, ওয়েটিংরুমে আসবার পরে এই তিনি প্রথম কথা বললেন! 'সে-জন্য না। ফিরে গেলো আমাদের দেখে।'

চাকুরের চিক্কণ মুখে হালকা হাসি ফুটলো! 'আই সী! হানিমুন! ইন লভ। ওয়েল...অন্তত আজ রাত্রিটা এদের দুঃখেই কাটবে।'

'না, দুঃখে না,' আলগোছে জবাব দিলেন বই-পড়ুয়া। 'এরই মধ্যে একটু নিরিবিলি দেখে ব'সে থাকবে কোথাও —ভালোই থাকবে। এরা আর-কিছু চায় না, একটু নিলিবিলি চায়।'

'ও, রিয়েলি! জীবনের এই একটা সময়!' কথার শেষে চাকুরের মুখ গম্ভীব হ'লো, যেন অন্য-কিছু ভাবতে-ভাবতে সিগারেটের টিন খুললেন।

কনট্র্যাক্টর ফোঁস ক'রে নিশ্বাস ফেললেন। 'ওঃ, ঠাণ্ডা!' একটু পরে, কোণের কুণ্ঠিত মানুষটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা নিরিবিলি হোক, কিন্তু ঠাণ্ডা তো লাগবে। এঁদের আসতে বললেই হ'তো।'

'বললেও আসতো না।'

ডাক্তার একটু হেসে বললেন, 'তাহ'লে—তাহ'লে আমরাই না-হয় নব দম্পতীর অনারে—'

'ওয়েটিংরুম ছেড়ে দেবো?' রোগা ভদ্রলোক চেয়ার থেকে পা নামিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এবার তাঁর একটা অন্য ছবি পাওয়া গেলো। ছোটো হালকা ছিপছিপে মানুষ, কিন্তু ভঙ্গিটা মজবুত, কর্মঠ, চলাফেরায় পাখির মতো দ্রুত, চোখের দৃষ্টি লাজুক অশান্ত, ঠিক সোজাসুজি কারো দিকে তাকান না। আর-কিছু না-ব'লে তিনি দরজা পর্যন্ত হেঁটে গেলেন, আবার ফিরে এসে হাতের কাছে যে-কোনো চেয়ারে ব'সে পড়লেন।

'মনে হচ্ছে, নব দম্পতীর বিষয়ে আমরা বড্ড বেশি ভাবছি,' টিপ্পনি কাটলেন দিল্লিওলা। 'আসুন—' সিগারেটের টিন এগিয়ে দিলেন।

'নো, থ্যাঙ্কস', বললেন ডাক্তার। অন্য তিন জন সিগারেট ধরালেন, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকলেন একটুক্ষণ।

দরজা আবার ফাঁক হ'তেই এঁরা চকিত হলেন। উর্দি-আঁটা বেয়ারা এসে জিগেস করলো, সাব-লোগের কিছু কি চাই? রিফ্রেশমেন্ট-রুম বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে।

অন্যদের চোখের সম্মতি পেয়ে চাকুরেটি বললেন, 'কফি!'

আবার চুপচাপ। বাইরে এতক্ষণ সাড়াশব্দ ছিলো—লোকজনের চলাফেরা, হাঁকডাক এবার প্যাসেঞ্জাররা সবাই বোধহয় বাতের মতো গুছিয়ে বসলো, যেখানে হোক, যেমন হোক জায়গা ক'রে

নিলো—সেই দু-জনও কোথাও একটু জায়গা পেয়েছে, এখানে আর আসবে না। এতক্ষণ কিছু বোঝা যায়নি, কিন্তু বাইরের গোলমাল থামতেই বড্ড বেশি চুপচাপ লাগলো চারদিক, এত বড়ো স্টেশনের পক্ষে অস্বাভাবিক চুপ। কিন্তু লাইন বন্ধ ; আজ রাতে আর কোন গাড়ি আসবে না, ঘণ্টা বাজবে না ; তার উপর যা শীত, কুলি, ফেরিওলা, পানবিড়ি, আপাতত সব ব্যস্ততাই ফুরোলো। আর এই ঘরের মধ্যে অনুজ্জ্বল আলোয় এই চার জন, পরস্পরের পরিচিতও নয়, সিগারেটের সূক্ষ্ম নীল ধোঁয়া তাঁদের সঙ্গী, যেন মনে হ'লো, বাইরের অন্ধকারে পৃথিবীটাই মুছে গেছে, একটা আরামহীন অভ্যর্থনাহীন ছোট্ট দ্বীপে তাঁরা আশ্রয় পেয়েছেন। পরস্পরকে তত আর অচেনা লাগলো না, এমনকি, কোথায় যেন এইরকমও একটা অনুভূতি হ'লো যে, চার জনেই একই কথা ভাবছেন। ঐ-যে দু-জন তরুণ-তরুণী—যারা মুহূর্তের জন্য দরজার ধারে ঝিলিক দিয়ে চ'লে গেলো, ঐটুকুতেই তারা কিছু রেখে গেছে —যেন যৌবনের পাখি উড়ে যেতে-যেতে পালক ঝরিয়ে দিলো ; কোনো-একটু চিহ্ন, কোনো তাপ, কোনো সুখ, দুঃখ, কম্পন, যা এখনো থামছে না, যা নিয়ে এই চার জন, কথা যদি নাও বলেন, অন্তত মনে-মনে যা ভাবতে পারবেন, তাতেও হয়তো এই বিশ্রী রাতটা কোনোরকমে কাটতে পারবে।

হঠাৎ ডাক্তারটি বললেন, 'আমাদের বোধহয় অভদ্রতাই হ'লো।'

'এখনো দম্পতীর কথাই ভাবছেন?' দিল্লিওলা হাসলেন, কিন্তু তাঁর কথাতেই প্রমাণ হ'লো যে, তিনিও তাদের ভোলেননি।

'ভাবছিলাম—অন্য কথা ভাবছিলাম। ভাবছিলাম এমন দিন এদের জীবনে ক-দিন থাকবে।'

এবার দিল্লিওলা ছোট্ট আওয়াজ ক'রে হাসলেন। 'সেটা কি একটা ভাববার বিষয়? সেটা কি আমরা সকলে জানি না?'

'পরে আমরা সকলেই জানি,' কথা বললেন অন্য জন, শীর্ণ মুখের ছোট্ট মানুষটি, 'কিন্তু তখনকার মতো কেউ জানি না। ধরুন, ঐ দু-জন এমন কি ভাবতে পারে যে, এর মেয়াদ কত অল্প দিনের? তারা কি কখনো ভাবতে পারে যে, ঠিক এইভাবেই আর বেশি দিন তাদের জীবন কাটবে না? এই আশ্চর্য ফাঁকির এটাই তো সবচেয়ে আশ্চর্য।'

'আশ্চর্য ফাঁকি। বাঃ, বেশ বলেছেন কথাটা!' কনট্র্যাক্টর মাথা নেড়ে অনুমোদন জানালেন।

কফি এলো।

'তাহ'লে কি সবটাই ফাঁকি?' কনট্র্যাক্টরের মস্ত মুখে যেন দুশ্চিন্তার ছায়া নামলো।

'অন্তত এই কফিটা একেবারেই ফাঁকি না। দিব্যি ধোঁয়া উঠছে। আপনার চিনি? ব'লে ছিমছাম ডাক্তার কফি ঢালতে ব্যস্ত হলেন।

মস্ত মোটা মানুষটি—মনে হ'লো—মনের কৌতূহলে শরীরের আলস্য ভুললেন। ইজি-চেয়ার ছেড়ে অন্য দু-জনের কাছাকাছি চেয়ার টেনে বসলেন, ঠাণ্ডা টেবিলে হাত রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে বললেন, 'তাহ'লে কি সবটাই ফাঁকি? কিছুটা থাকে না? আপনি তো সাহিত্যিক—আপনি বলুন তো?'

সাহিত্যিক ব'লে যাঁকে সম্মান করা হ'লো, তিনি এই সম্ভাষণে কুণ্ঠিত হলেন, কিন্তু তাই ব'লে জবাব দিতে দেরি করলেন না।

'স্মৃতি থাকে। শেষ পর্যন্ত শুধু স্মৃতিই থাকে, আর-কিছুই থাকে না।'

'স্মৃতির কী মূল্য?'

'কিচ্ছু না!' দিল্লিওলা প্রফুল্ল স্বরে ঘোষণা করলেন। 'মিছিমিছি কাজের ক্ষতি, সময় নষ্ট, ব'সে-ব'সে মন-খারাপ করা। আসুন—আপাতত কফিটা খাওয়া যাক।'

কনট্র্যাক্টর তবু আবার একটা প্রশ্ন করলেন, 'যে-সুখ এখন আর নেই, তার স্মৃতি সুখের, না

দুঃখের?'

দিল্লিওলার ঠোঁটের কোণে ঠাট্টার হাসি ফুটলো। 'ও-সব ভেবে লাভ নেই, তবে একটা গল্প শোনান তো সময় কাটে।'

'গল্প! গল্প কিসের?'

'আই মীন—আচ্ছা, আমরা এখানে চার জনেই বয়স্ক পুরুষ মানুষ, মহিলাও কেউ উপস্থিত নেই, তাই মন খুলে কথা বললে দোষ হয় না।'

'আপনি বলছেন কী?' মোটা কনট্র্যাক্টর একটু যেন ভীত হলেন।

'ইনি বলছেন,' ডাক্তার বুঝিয়ে দিলেন, 'যে এইরকম দিন —ঐ দু-জনের মতো দিন আমাদেরও জীবনে একদিন ছিলো—'

'আমার না!' কনট্র্যাক্টর আপত্তি জানালেন, এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর দাড়ির ছায়া-পড়া প্রশস্ত গাল বিসদৃশ লজ্জায় হঠাৎ একটু লাল হ'লো।

'আপনারও,' বললেন সাহিত্যিক, 'এমন কেউ নেই যার কখনো কাউকে ভালো লাগেনি। তারপর কী হ'লো সেটা কিছু কথা নয়, ঐ ভালোলাগাটুকুই দামি। হয়তো তার স্মৃতিরও কিছু মূল্য আছে। তেমনি কোনো স্মৃতি—'

'আমার নেই!' কনট্র্যাক্টর সজোরে হাত নেড়ে প্রতিবাদ করলেন। 'আপনারা বলুন, আমি শুনি!'

'বেশ, আমরাও বলবো,' ডাক্তার ভারিক্কি-গলায় বললেন, 'কিন্তু আপনাকেও বলতে হবে। আজ তো আর ঘুম-টুমের আশা নেই, গল্প ক'রেই রাতটা কাটানো যাক। আরম্ভ করুন।'

'আমাকে বলছেন?' কফির পেয়ালা তুলতে গিয়ে কনট্র্যাক্টর থামলেন। 'আমি দেখুন, ব্যবসা করি, ব্যবসা ছাড়া কিছুই বুঝি না, আমার ও-সব—'

'হ্যাঁ, আপনারও আছে—' খুব নিশ্চিন্তভাবে সাহিত্যিকটি বললেন।

কনট্র্যাক্টর নিচু-মাথায় চুপ ক'রে থাকলেন একটু। তারপর বললেন, 'আমার কোনো কথা নেই, তবে অন্য-একজনের কথা আমি জানি—আমার এক বন্ধু—'

'বেশ, তার কথাই বলুন।'

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে কনট্র্যাক্টর আরম্ভ করলেন।

মাখনলালের দুঃখের কাহিনী

মনে করুন তার নাম মাখনলাল। নাম শুনেই বুঝতে পারছেন সে খুবই মোটামুটি আটপৌরে-গোছের মানুষ, কিন্তু বাড়িতে তার খাতির খুব। তার কারণ সে তার বংশের প্রথম বি.এ.। তার ঠাকুরদার সাত ছেলে, সাত ছেলের বত্রিশটি, আর সেই বত্রিশের যে আরো কত কে জানে—এখনো কি তার শেষ হয়েছে! কিন্তু এতগুলি লম্বা-চওড়া পুরুষজাতীয় জীবের মধ্যে একজনও ম্যাট্রিকের চৌকাঠ পেরোতে পারেনি, কেউ-বা সেখানেই ঠোক্কর খেয়েছে। এ-নিয়ে হিরণ্ময়ীর—অর্থাৎ মাখনলালের মা-র মনে আক্ষেপের অন্ত ছিলো না, কথায় কথায় এ-নিয়ে স্বামীকে এমন খোঁটা দিতেন যে, রাঘববাবুর মুখের আর রা বেরোতো না। তাঁর—মানে হিরণ্ময়ীর— দুই দাদাই বি.এ. পাশ, নিজে তিনি 'নীলফামারি গার্লস্ হাই স্কুলে' ক্লাশ নাইন অবধি পড়েছিলেন। তাই তাঁর প্রথম পুত্র, এবং প্রথম সন্তান মাখনলাল যেদিন জন্মালো, সেদিন থেকেই তাঁর প্রতিজ্ঞা যে, ছেলেকে বি.এ. পাশ করানো চাই।

এ-প্রতিজ্ঞা পালন করা সহজ হয়নি। বাড়ির হালচাল শাবেকী-জমিদারির মৌতাতে ভরা। কাজ

ক'রে খেতে হবে এ-কথা অনেকদিন কারো মনেই হয়নি, তাই সরস্বতীর গোলদীঘি-মার্কা পদ্ম কুড়োতেও কারো গরজ ছিলো না। আজ অবস্থা প'ড়ে গেছে, কিন্তু সেকেলে চালটুকু আছে ; এখনো বাড়ির কর্তারা বেলা দুটোয় গড়িমসি ক'রে স্নান ক'রে, বাটিবেষ্টিত সুবৃহৎ থালায় ভোজন করেন, তারপর পাশ-বালিশটিকে আলিঙ্গন ক'রে পরম প্রশান্ত চিত্তে নিদ্রা যান। এই দিবানিদ্রা তাঁদের বংশগত বৈশিষ্ট্য, দেউলে হ'তে-হ'তেও এটা তাঁরা ছাড়েননি। অর্থাভাবে কষ্ট হয় বই কি, কিন্তু অর্থোপার্জনের কষ্ট যে ততোধিক।

রাঘববাবুরও ঐভাবেই দিন কাটছিলো—ঐভাবেই কাটতো—যদি-না হিরণ্ময়ী পণ করতেন, ছেলেকে পাশ করানো চাই। দেশে প'ড়ে থাকলে হবে না, হ'তেই পারে না। তাই মাখনলাল যেবার গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলো, স্বামীকে প্রচণ্ড তাড়া দিয়ে সেবারই তিনি চ'লে এলেন ছেলেপুলে সুদ্ধু কলকাতায়। রাজি হওয়াই সবচেয়ে সোজা ব'লে গোলগাল রাঘববাবু স্ত্রীর কথায় রাজি হ'লেন, আলস্যের বনেদি অভ্যাসটাও আস্তে-আস্তে তাঁকে ছাড়তে হ'লো। কলকাতায় আসার অল্পদিন পরেই তিনি পুঁজিপাটা ভাঙিয়ে ছোটো একটি দোকান দিলেন ভবানীপুরে। বলা বাহুল্য, এটাও স্ত্রীর পরামর্শে। হিরণ্ময়ী বুঝেছিলেন যে, জমিদারির স্মৃতি ভাঙিয়ে ভাত-কাপড়ও আর বেশি দিন জুটবে না। মাথার বুদ্ধি আর গায়ের গয়না খরচ ক'রে তিনি স্বামীকে দোকান ক'রে দিলেন।

কাঠের দোকান। ছুতোরের কাজে রাঘববাবুর শখ ছিলো, নিজের হাতে চেয়ার-টেবিলও বানিয়েছিলেন। তাই, অনিচ্ছায় আরম্ভ করলেও, ক্রমে-ক্রমে কাজে বেশ নেশাই লাগলো তাঁর। দুপুরের ঘুমটুকু ছাড়লেন না, কিন্তু সেই দু-তিন ঘণ্টা বাদ দিয়ে প্রায় সারাদিনই তিনি দোকানে। হয়তো সেইজন্যই লক্ষ্মী তাঁকে কৃপা করলেন, এবং লক্ষ্মীর কৃপায় আরো তাঁর উৎসাহ বাড়লো। বছর-দুয়েকের মধ্যে তাঁর ছোট্ট দোকানে 'দি সাউথ ক্যালকাটা ফারনিশিং হাউসে'র পত্তন হ'লো।

রাঘববাবুর ইচ্ছে ছিলো, মাখনলাল প্রথম থেকেই দোকানে বসুক, কাজকর্ম শিখুক, কাঠের গন্ধ, স্পর্শ, বর্ণের সঙ্গে পরিচিত হোক। কারবারে উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে কাজও যখন বেড়ে চললো, তখন বড়ো ছেলের সাহায্য পেতে আরো তিনি ব্যস্ত হলেন। আই.এ. তো হ'লো—আর কী দরকার—হবেই-বা কী পাশ ক'রে—এদিকে কারবার উঠতির মুখে, ঠিক এই সময়টায় ভাগ্যের টুঁটি চেপে না-ধরলে শেষটায় না ফশকে যায়। কিন্তু বৃথা যুক্তি! যদি সর্বস্ব যায়, তবু মাখনলালের বি. এ. পাশ করাই চাই।

সেই মাখনলালের সেই বি.এ. পরীক্ষায় পাশের খবর যেদিন পাওয়া গেলো, সেদিন হিরণ্ময়ীর আনন্দ আপনারা কল্পনা ক'রে নিন। তাঁর একুশ বছরের স্বপ্ন এতদিনে সার্থক! এত খুশি হলেন যে, খুশির ঝোঁকে তিনি একটা অদ্ভুত প্রস্তাব করলেন—বললেন, ছেলের এবার বিয়ে দেবো।

অদ্ভুত না? বি.এ. পাশ করলেই বিয়ের যোগ্যতা হয় এ-কথা আজকাল কেউ ভাবে? মাত্র বি.এ.-পাশ করা ছেলে—সে তো ছেলেমানুষ! তার আবার বিয়ে।

কিন্তু হিরণ্ময়ীর কাছে এতে একেবারেই কিছু অদ্ভুত ছিলো না। প্রথমত, এটাই ওদের পারিবারিক প্রথা—ওর বাপ-খুড়োরা কেউ আঠারো পেরোয়নি। শিক্ষায় আধুনিক হ'য়ে, বিয়ে্র ব্যাপারে শাবেকী হ'তে দোষ কী—সংসার সচ্ছল, ঘরে বৌ এলেই এখন ভরা-সুখ। আর ছেলে কি আজ-কালকার চশমা-চোখো পুঁচকেদের মতো—একবার চেহারাখানা দ্যাখো না!

হ্যাঁ—চেহারাখানা তার দেখবার মতো—সে-কথা সত্যি। মাখনলালকে আমি ভালোই চিনি—চিনতাম—একুশ বছরেই যেন বত্রিশ বছরের জবরদস্ত জোয়ান সে। বড়ো-বড়ো দাঁত, বক্ষস্থল ঘনরোমশ, পায়ের প্রকাণ্ড জুতো দুটো এমনিতে প'ড়ে থাকলে দেখে প্রায় তাক লাগে। তিন ছেলের বাপ ব'লে স্বচ্ছন্দে যাকে চালানো যায়, বিয়ে না-করলে তাকে আর মানাবে কেন?

পাত্রীও হাতের কাছেই জুটে গেলো। পাশের বাড়িতে থাকেন সুভদ্রবাবু, মনে-মনে তাঁর মেয়েকেই হিরণ্ময়ীর প্রথম থেকে পছন্দ। কারণ, রূপ? বাপের টাকা? কোনোটাই না। সুভদ্রবাবু আধা-গরীব প্রোফেসর, আর মেয়েটি—আমি মাখনলালের কাছেই শুনেছিলাম সব—যাকে সুন্দরী বলে ঠিক তেমন-কিছু নয়। কিন্তু, বিদ্যে! বাপ বিদ্বান, আর মালতী—মেয়েটির নাম মালতী—সে নিজেই কি কম! ম্যাট্রিকুলেশনে তিন তারা পেয়ে এখন কলেজে পড়ছে, খেতে ব'সেও নাকি বই পড়ে সে। আর বইয়ের কী ছড়াছড়ি বাড়িতে—বাসরে! —এমন কি আর কোথাও দেখা যায়?

বই দেখে মেয়ে পছন্দ একটু হয়তো নতুন শোনায়, কিন্তু আপনারা এতক্ষণে তো বুঝেছেন যে, ঠিক ওখানটাতেই হিরণ্ময়ীর দুর্বলতা। একটুও অতিরঞ্জন না-ক'রে বলা যায় যে, একসঙ্গে অত বই তিন কুলে কোথাও তিনি দ্যাখেননি। সবচেয়ে কম দেখেছেন শ্বশুরবাড়িতে, সেখানে ও-সবের পাটই নেই। মাখনটাও তা-ই, পাশ করুক আর যা-ই করুক, এমনিতে একটা বইয়ের কখনো পাতা ওল্টায় না—বংশের ছাঁচই এদের অদ্ভুত।

অতএব, বংশের ধারা বদলাতে হ'লে বিদ্বান-বাড়ির মেয়ে চাই—এই হ'লো হিরণ্ময়ীর মনের কথাটা। অর্থাৎ, যেমন তিনি কাঠের ছুতো ধ'রে লক্ষ্মীকে ডেকেছিলেন, তেমনি এখন পুত্রবধূর ফাঁদ পেতে সরস্বতীকে ধরতে গেলেন। জাত-গোত্র সব মিলে যাচ্ছে—এই শ্রাবণেই হ'য়ে যাক না, নয়তো সেই অঘ্রাণ আবার কত দূর!

স্বামীর সামনে পঞ্চ-ব্যঞ্জন সাজিয়ে কথাটা একদিন পাড়লেন তিনি। রাঘববাবুর ইচ্ছেটা অন্য রকম—মোটা রকম কিছু হাতে পেলে ব্যবসাটি জাঁকিয়ে তোলেন, কিন্তু হিরণ্ময়ী উড়িয়ে দিলেন সে-কথা। বললেন, 'টাকা তোমার কপালে থাকলে এমনিতেই হবে—হাত পাতবে কেন?'

'না, না, হাত পাতার কথা না—তবে এই...সেদিন অবিনাশবাবুই বলছিলেন...'

'কে অবিনাশবাবু?'

'আমার পাশেই তাঁর দোকান।'

'মদের দোকান? ছি! শুঁড়ির মেয়ে!'

'শুঁড়ি তো নয়—চব্বিশ পরগনার কায়েৎ। একটু গরজও আছে মনে হ'লো—তুমি না-হয় মেয়েটিকে একবার—হ'লে বোধহয় সব দিক থেকেই—'

'থামো তো বাপু। আমার বুদ্ধিতেই এতদূর এগোলে, এখন আর বাগড়া দিয়ো না।'

'দ্যাখো, যা ভালো বোঝো। কিন্তু প্রফেসরের জামাই হ'য়ে দোকানদারিতে মন বসবে তো ছেলের?'

'তার জন্য ভাবছো? মাখন কি আমার তেমন ছেলে—দ্যাখো না, দু-দিন বাদে তোমার এই সংসারই ঘাড়ে নেবে সে!' ব'লে হিরণ্ময়ী ছেলের দিকে তাকালেন। 'কী রে, তোর মত আছে তো?'

বাপের পাশে ব'সে মাখনলালও খাচ্ছিলো, মা-র প্রশ্ন শুনে তার খাওয়া থেমে গেলো। কিছু বললো না, শুধু মুখমণ্ডল অতিশয় গম্ভীর ক'রে নতনেত্রে থালার গায়ে আঁচড় কাটলো! বোঝা গেলো—চোখেও দেখা গেলো যে—আস্ত সংসারটা তুলে নেবার মতোই চওড়া যার কাঁধ, একটি কলেজে-পড়া ছিপছিপে মেয়ের ভার বইতে তার খুব অসুবিধে হবে না।

আপনারা ভাবছেন এর কোনো ইতিহাস আছে? হ্যাঁ, আছে একটু। প্রকৃতি দেবীর কারসাজিতে ভুল হয় না, অত বড়ো প্রকাণ্ড যে-মাখনলাল, তারও বলিষ্ঠ রোমশ-বুকের মধ্যে কোথায় একটি ফুল ফুটেছিলো।

কথাটা এই যে, মালতীর সঙ্গে রোজই তার দেখা হয়। দেখা হয় বলাটা ভুল হ'লো, মালতীকে সে রোজই প্রায় দেখতে পায়। ওদের ভিতরের দিকের বারান্দাটা চোখে পড়ে তার ঘর

থেকে ; এমন দিন বড়ো যায় না যেদিন অন্তত দু-একবার শাড়ি-পরা হালকা একটু হাওয়া মাখনলালকে আনমনা ক'রে না দেয়। সে অতীব ভদ্রভাবে—কি নিজেই লজ্জা পেয়ে—তখনই চোখ ফেরায়, কিন্তু ফিরিয়ে নিতে-নিতেও একটুখানি দেখেই ফেলে। কখনো মালতী ঐ বারান্দায় বেতের চেয়ার টেনে আনে—একটু দূরেই যে কোনো-একজন মানুষ তাকে লক্ষ্য করছে, অন্তত করতে পারে, সে-বিষয়ে কোনো চেতনাই নেই তার—ব'সে-ব'সে পড়ে, হাসে, চ্যাঁচায়, গল্প করে, ভাই-বোনের সঙ্গে গান করে গুনগুন। কোনো মহিলার দিকে তাকিয়ে থাকতে নেই এ-কথা কে না জানে—কিন্তু মহিলাটি নিজেই যদি চোখের সামনে এসে ব'সে থাকেন, তাহ'লে চোখ দুটোকে উপড়ে ফেলা যায় না তো! —মাখনলাল অনেক সময় নিজেও জানেনি সে কী দেখছে, কিন্তু যেই মালতী বারান্দা ছেড়ে ঘরে গেছে, তখনই বুঝেছে এতক্ষণ তার চোখ কেন চঞ্চল ছিলো। শুধু কি চোখ? প্রশস্ত বুকের তলায় হৃৎপিণ্ডও কি দ্রুত হয়নি?

এইটুকুই ইতিহাস। কিছুই নয়, কিন্তু খুব কি কম? মাখন লাল—আপনারা ঠিক ধরেছেন—একটু কম-বুদ্ধির মানুষ, শহরের তুখোড় যুবকদের মতো কম বয়সেই অনেক-কিছু সে জেনে ফেলেনি। ঐ একটু চোখে-দেখার পুঁজি নিয়েই তার সুখ, এমনকি, মনে মনে ভাবটা তার এই, যেন সত্যিই মালতী তার চেনা। এদিকে মালতীর বিশ্বজগতে মাখনলাল নামক একজন প্রকাণ্ড প্রতিবেশী পুরুষের যে অস্তিত্বই নেই এ-কথা সে কি জানে? ভাবে কখনো? হয়তো জানে, কিংবা জানে না, কিন্তু ভাবতে হ'লে মালতীকে খুব কাছের মানুষ ছাড়া আর-কিছু ভাবতে পারে না। তাই মা-র এই প্রস্তাবে সে তেমন অবাক হ'লো না, অত্যন্ত বেশি সুখীও হ'লো না, যেন প্রায় জানা কথা ব'লেই মেনে নিলো। পাশের বাড়ির বারান্দাবর্তিনী যখন তার পার্শ্ববর্তিনী হবে, তখন তার সঙ্গে কী-রকম ক'রে চলবে, কী-রকম কথা বলবে, তারও একটা খশড়া রাত্রে শুয়ে-শুয়ে মনে মনে তৈরি ক'রে ফেললো সে। প্রথম কথা জিগেস করবে এই যে, তোমাদের বারান্দা থেকে আমাকে কি কখনো দেখেছো? কী বলবে তখন?

এর দু-একদিন পরেই হিরণ্ময়ী কাজে নামলেন। দুপুর বেলা খাওয়ার পরে লালপেড়ে পাটভাঙা শাড়ি পরলেন, বেশ বড়ো ক'রে সিঁদুরের ফোঁটা দিলেন কপালে, আর একটি পান মুখে দিয়ে প্রোফেসরের বাড়িতে রওনা হলেন। ফিরে যখন এলেন, তখন তাঁর মুখের হাসি মুছে গেছে, পান-খাওয়া ঠোঁটেও তেমন আর প্রসন্নতা নেই।

রাঘববাবু তখন বাড়িতে, সেটা তাঁর দিবানিদ্রার সময়। কিন্তু সেদিন তাঁর পুরোনো অভ্যাসে গুরুতর ব্যাঘাত ঘটলো।

পাশের ঘরে ব'সে মাখনলাল শুনলো তার মা-র প্রায় অবিরাম গলা, মাঝে-মাঝে বাবার মৃদু আওয়াজ—কিন্তু মাঝে-মাঝে মা যখন গলা চড়ালেন, তখন কথাগুলিও তার কানে এলো।

'কী বললে! দোকানদার! দোকানদারের ছেলে! তা ওদেরই-বা এত দেমাক কিসের শুনি? প্রোফেসর? কিন্তু মাইনে পায় কত? আমাদের সেই কত বড়ো বাড়ি, বড়ো-বড়ো নৌকো বোঝাই ধান, পূজোর সময় সে কী তুমুল...ও-রকম দেখেছে ওরা কখনো? . না, কথাটা কানেই তুললো না! "বিয়ের কথা আমরা ভাবছি না এখনো! মেয়ে আমাদের ছেলেমানুষ!"..ছেলেমানুষ! কত আর ধিঙ্গি হবে বলো তো?...পছন্দ? আমার ছেলে কি কারো চাইতে কম? সে কি বি.এ. পাশ করেনি, না কি তার চরিত্র ভালো না, কি তার খাওয়া-পরার অভাব? কোথায় পাবে ওর চাইতে সুপাত্র? ঐ তো কালো মেয়ে, কোন রাজপুত্তুর বরণ করবে তাকে? কত ভাগ্য ওদের যে আমি...ওঃ!'

ঘুরে-ফিরে এই একই কথা বার-বার। রাঘববাবু ততক্ষণে বোধহয় ঘুমিয়েই পড়লেন, মাখনলালও আর শোনবার চেষ্টা করলো না, কিন্তু মা-র গলার আওয়াজ পেলো আরো খানিকক্ষণ।

এর পরে কয়েকটা দিন অপমানের জ্বালায় ছটফট করলেন হিরণ্ময়ী। অপমানের ডবল কারণ

এই যে, বৌ ঘরে আনবার গরজ তাঁর যত, মালতীকেই বৌ করার ইচ্ছে তার বেশি। 'বললাম, মেয়েকে পড়াতে চান আমরাই পড়াবো, বি.এ. পাশ বৌ হ'লে আমাদেরই সুখের কথা, আমাদের দাবি-দাওয়া কিছু নেই তাও বললাম, তবু কিনা কানেই তুললো না কথাটা! বাবা রে বাবা, গরবে যেন ন'ড়ে বসে না! কিন্তু কেন—কারণটা শুনতে পাই কি? টেবিল সাজিয়ে ব'সে পুঁই-চিংড়ির চচ্চড়ি খায় ব'লে?'

'আঃ! থামো, মা!' মাখনলাল মৃদু স্বরে প্রতিবাদ করলো। 'এই গায়ে-গা-লাগা বাড়ি—কেউ শুনে-টুনে ফেললে—'

'শুনুক না!' হিরণ্ময়ী প্রোফেসরের বারান্দার দিকে স'রে এসে আর-এক পরদা গলা চড়ালেন। 'আমি কি ওদের ডরাই, না আবার ওদের সাধতে যাচ্ছি! অঃ, তোর মতো যুগ্যি ছেলের মা আমি—আমার আবার ভাবনা! দেখবি, মাখন দেখবি, এমন একদিন হবে যে, তোর দিকে—হ্যাঁ, তোর দিকে তাকিয়ে বুক জ্বলে যাবে ওদের! এই আমি ব'লে দিলাম।'

এইরকম ঢেউ উঠলো আরো ক-দিন, তারপর মাখনলালের বিয়ের কথাটা আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেলো। মদের দোকানের অবিনাশবাবু শ্রাবণেই তাঁর মেয়ে পার করলেন, আরো অনেক শাদা-সিঁথি সিঁদুর ছুঁলো, কিন্তু শ্রীমাখনলাল ঘোষ, বি.এ. যে কিনা স্ত্রীর ভার গ্রহণ ও বহন করার বিশেষভাবে যোগ্য, তার বিয়ের কথাই আর উঠলো না। নিশ্চয়ই সে-বছর বাংলা দেশে কুমারী কন্যার অভাব ছিলো না, কিন্তু হিরণ্ময়ী মুখে অনেক ব'লে-ট'লেও শেষ পর্যন্ত তেমন উদ্যোগী হলেন না। কেন? তক্ষুনি ছেলের খুব ভালো বৌ ঘরে এনে প্রোফেসরকে বাড়ি-সুদ্ধ তাক লাগাতে পারতেন তো? তা-ই তো তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিলো? নিশ্চয়ই—কিন্তু কেন হিরণ্ময়ীর ব্যবহার এখানে উল্টো হ'লো, আমি তা ঠিক বলতে পারবো না। তিনি কি সত্যি-সত্যি ভাবছিলেন যে, ঐ বিদ্বান-বাড়ির উপর আশ্চর্য কোনো প্রতিশোধ নিতে পারবেন? তা-যদি হ'য়ে থাকে, অন্তত বাস্তবে তার লক্ষণ কিছু ছিলো না। মাস কাটলো, দু-মাস কাটলো, প্রোফেসরের বৌ ভদ্রতা ক'রেও—এমনি প্রতিবেশী বলেও—একদিন এলেন না, কোনোদিনই আসেন না তিনি, যদিও হিরণ্ময়ী মাঝে-মাঝে আগে যেতেন! সেই বারান্দা তেমনি নির্বিকার, তেমনি সেখানে হাসির হাওয়া, আঁচলের ঝলক, কিন্তু মাখনলাল সেদিকে আর তাকায় না।

আপনারা ভাবছেন মনের দুঃখে? না, মাখনলালের একটা গুণ এই যে, অত দুঃখ-টুঃখ বোঝে না। আসল কথা, তার এখন সময় নেই। সকালে উঠে এক বাটি দই-চিঁড়ে খেয়ে দোকানে চ'লে যায়, দুপুরে খেতে আসে একবার, একটু জিরিয়েই আবার বেরোয় আর ফেরে সেই রাত্রে। বাপের অর্ধেক কাজই সে তার চওড়া কাঁধে তুলে নিয়েছে—বলতে গেলে সবটাই ; যেমন তার উৎসাহ, তেমনি উদ্যম, আর মস্ত মোটা মাথার মধ্যে মগজের যদি অভাব থাকে, স্রেফ পরিশ্রমেই তা পুষিয়ে যায়। তাকে তো দেখেছি সে-সময়ে— ঘোড়ার মতো খাটছে সারাদিন, চরকির মতো ঘুরছে সারা শহর, এর মধ্যে বিদ্বান-বাপের বিদুষী কন্যার কথা মনে করার সময় তার কোথায়?

না, সময় নেই। শুধু যেতে-আসতে প্রোফেসরের বাড়ির সামনের পথটুকু তার কেমন অস্বস্তি লাগে। হঠাৎ মনে হয় সে বুঝি বড্ড লম্বা, বড্ড মোটা, কাপড়টা বুঝি ময়লা, চলনটা বিশ্রী। একতলার রাস্তার ধারেই ওদের বসবার ঘর ; মাখনলাল প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও একবার না-তাকিয়ে পারে না। কিছু দেখতে পায়? কিছু না, পরদার ফাঁকে ঝাপসা শুধু আভাস। কিন্তু হঠাৎ কোনো-একদিন পরদা হয়তো স'রে যায়, তখন চোখে পড়ে— চোখে পড়ে অচেনা এক অন্য জগৎ। মাখনলালের জন্ম-চেনা বাড়িতে সবই যেন সব সময় অগোছালো, পরিষ্কারটাও বড়ো জোর আধ-ময়লা ;—আর এখানে সাজানো ঘর, সুন্দর অভ্যর্থনা, দেয়ালে ছবি, সারি-সারি বই, অন্য জগৎ। কখনো হাসি, টুকরো কথা, একটু হয়তো শাড়ির ঝিলিক। কোনোদিন এমনও হয় যে, মাখনলালের পা যেন আর

চলে না, প্রকাণ্ড পেশীবহুল বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড দ্রুত হয় একটু ; হঠাৎ মনে হয় ঐ কাঠের দোকান, আর ঐ অফুরন্ত হাতে-হাতে-ঘোরা ছাপানো কাগজ—তা কাঠের মতোই শুকনো, কাগজের মতোই রক্তহীন। কিন্তু যখনই এ-রকম মনে হয়, তখনই ডবল-কদমে পা চালায় সে, ছুটে গিয়ে ট্রাম ধরে, তারপর কাজের ভিড়ে সব ভুলে যায়।

যুদ্ধের দ্বিতীয় বছরের মাঝামাঝি তখন, সাপ্লাই-আপিশের অন্তঃপুরে টাকার ভিয়েন বসেছে, গন্ধ দিচ্ছে হাওয়ায়। অন্য অনেকের মতো মাখনলালও সে-মুখো হ'লো—একটু ভয়ে-ভয়েই, কিন্তু হাতে-হাতে ফল যা পেলো, তা নিশ্চয়ই তার আশাতীত। বয়সের তুলনায় তাকে বড়ো দেখায় সেটা হয়তো সুবিধে ছিলো, হয়তো তার বলবান চেহারায় বিশ্বাস জাগে, কিংবা তার লেগে থাকার শক্তি কিছু বেশি ;—কারণটা যা-ই হোক, ঘুরে-ঘুরে একে-ওকে ধ'রে বেশ কিছু কাজ তার চটপট জুটে গেলো। তারপর শীতকালে যেই জাপান যুদ্ধে নামলো, অমনি যেন—কিন্তু তখনকার কথা আপনারা তো জানেন।

হ্যাঁ, আশ্চর্য সময় গেছে তখন। কলকাতায় লোক নেই, কলকাতায় লোক ধরে না, কলকাতায় বোমা, কলকাতার ফুটপাতে ধুঁকে-ধুঁকে কত হাজার মানুষ মরলো। দু-পয়সার জিনিস বারো আনা, চাল, চিনি, কয়লা, নুন কিচ্ছু নেই, দেশ ভ'রে খাকি, চাকরি, আর টাকা-টাকা শস্তা নোটের ছড়াছড়ি। ভাবতে এখন আমাদেরই অবাক লাগে, কিন্তু এরই মধ্যে মাখনলালও কম আশ্চর্য না। একেই হয়তো কপাল বলে—না কি তার মা-র আশীর্বাদই ফললো?—যেখানে সে হাত দেয়, সেখান থেকেই টাকার যেন ঢল নামে। এক-একবার একসঙ্গে প্রায় কুলির বোঝা নোট পায়, পকেটে ধরে না, খবর-কাগজে বাণ্ডিল বেঁধে ব্যাঙ্কে বয়ে আনতে হয়। রোজ জমা দিচ্ছে, রোজ মোটা-মোটা চেক কাটছে, আর দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর কেমন ক'রে কেটে যাচ্ছে। কখন দিন আর কখন রাত্রি, সে-কথাই প্রায় ভুলতে বসেছিল, হঠাৎ একদিন দম নিয়ে দেখলো সে লক্ষপতি হয়েছে। সত্যি।

যেখানে ছিলো গলির মধ্যে ছোট্ট দোকান, সেখানে এখন মস্ত কারখানা, বড়ো রাস্তায় শো-রুম, একশো লোকের রুটির মালিক মাখনলাল। তার ছোটো দু-ভাই, তারাও কলেজ ছেড়ে কাজে লাগলো—এবার আর হিরণ্ময়ী আপত্তি করলেন না। আর রাঘববাবু? তাঁর এখন পেনশন—পেনশন অন্ ফুল্ পে! ছেলের যোগ্যতার সুযোগে তাঁর জমিদারি মেজাজে উজান বইলো ; সকালবেলা বিরাট বাজার নিয়ে বাড়ি ফেরেন, তারপর রান্নাঘরের চৌকাঠে ব'সে স্ত্রীর সঙ্গে খোশগল্প, গড়িমসি-বেলায় যাকে বলে ভোজন, লম্বা ঘুমে দুপুর পার, রাত্রে মাঝে-মাঝে মাখনলালের সঙ্গে হিশেবপত্রের একনিষ্ঠ আলোচনা। রোজগারের ভার ছেলে যখন নিয়েই নিলো, অগত্যা তিনি খরচের ভারটা নিজের হাতে রাখলেন। খরচ এবং না-খরচ দুটোরই। অর্থাৎ কতটা ব্যয়, কতটা সঞ্চয় এবং কী-ভাবে সঞ্চয়, এইসব কঠিন সমস্যার সমাধানে রাঘববাবুর মাথা খাটলো, এবং তাঁর ইকনমিক প্ল্যানিং-এ হিরণ্ময়ীর অনুমোদন এতই নিশ্চিত যে, মাখনলালের কোনো কথা বলারই দরকার করে না। কথা বলার ফুরশৎও তার নেই, হয়তো ইচ্ছাও না, কাজের ঝোঁকেই ভরপুর সে, অন্য সব ওঁদের হাতে ছেড়ে দিয়ে সে বরং নিশ্চিন্তই হ'লো। বাড়ির খাওয়া-পরা এখন খুব সচ্ছল—পরার চাইতে খাওয়াই বেশি—কিন্তু দাম-টাম আগুন হ'লেও খেতে আর মানুষ কত পারে, আর বেশি টাকার দুশ্চিন্তাই কি নেই-টাকার ভাবনার চাইতে কম! বাইরে হাল-চাল কিন্তু তেমনি, সব আগের মতোই আধ-ময়লা গরিবভাবের, চেহারা দেখে কেউ বুঝবেই না যে, এই পরিবারের আয়ের অঙ্ক দুন-চৌদুন ছাড়িয়ে এখন দশগুণ।

আপনারা ভাবছেন এঁরা খুব সংযমী? ঠিক হয়তো তা নয়, হয়তো একেবারে পাইকেরি আড়ম্বর দেখাবেন ব'লেই খুচরোগুলি এঁরা বাদ দিচ্ছিলেন। ব্যাঙ্কে এঁদের আস্থা নেই, মাটিই খাঁটি! রাঘববাবু জমি কিনছেন, সোনা, হিরণ্ময়ীর গয়নার কথা ছেড়েই দিলাম। মেয়েদের বিয়েরও প্রায় সময় হ'লো।

একজনের তো সাবেকি-মতে শিগগিরিই, তবে ছোটোটিকে, হিরণ্ময়ীর দু-নম্বর পণ, বি.এ.পাশ করানো চাই। বি.এ.পাশ ছেলের শুধু না, বি.এ.পাশ মেয়েরও মা হবেন তিনি ; 'দেখুক ওরা, শুনুক, বুঝুক যে, বিদ্যেতেও আমরা কিছু কম না!'

ওরা মানে অবশ্য পাশের বাড়ি, ঐ প্রোফেসরের গরবিনী বৌ। কেমন—দেখলে তো এবার! বিয়ে দিলে রাজরাণী হ'তো মেয়ে, ছেলে আমার লক্ষপতি আজ!

ঠিকে-ঝির মুখে পাকে-প্রকারে বার্তাও পাঠিয়েছিলেন হিরণ্ময়ী, যেদিন রাঘববাবু বালিগঞ্জে অর্ধেক-শেষ-করা একটা বাড়ি কিনলেন সে-খবরটাও ভোলেননি ;—সে-সব যথাস্থানে পৌঁচেওছিলো, কিন্তু প্রতিপক্ষের মৌনভঙ্গ হ'লো না। তাঁদের কাছে প্রতিবেশীর যেমন অস্তিত্বই নেই, তেমনি হিরণ্ময়ী প্রতিবেশীর কথা ভুলতে পারেন না। অদ্ভুত তাঁর প্রতিযোগিতা, আশ্চর্য তাঁর প্রতিহিংসার ইচ্ছা।

ভগবান দয়া করলে বোধহয় এমনিই হয় ; হিরণ্ময়ীর সে-ইচ্ছাও প্রায় পূর্ণ হ'লো। শোনা গেলো, প্রোফেসরের ঘরে নাকি এখন হাঁড়ি চড়ে না। ভারি খুশি হলেন কথাটা শুনে, একদিন ছেলেকে ডেকে সবিস্তারে শোনালেন সব।

বলবার মতো খবর বইকি। সুভদ্রবাবু ছ'মাস ধ'রে মাইনে পাচ্ছেন না ;—কোথাকার পচা কলেজ একটা, কোনোদিনই ঠিক-ঠিক মাইনে দিতো না, আশি টক্কলি হাতে গুঁজে, আড়াই-শো লিখিয়ে নিতো। ও-সব সাত-সতেরো ফুটুনি থাকলে হবে কী—ভিতরে ফক্কিকার। ট্যুশনি ক'রে, নোটবই লিখে চালাতো। এখন কাগজ নেই ব'লে নোট-ফোট আর ছাপাচ্ছে না কেউ, এদিকে ছেলেরা সব ঠাশঠাশ চাকরি পাচ্ছে—মাস্টার রেখে পড়াবে কে? এখন নাকি এমন অবস্থা যে—

চুপ ক'রে এ-পর্যন্ত শুনে মাখনলাল জিগেস করলো, 'তুমি জানলে কী ক'রে?'

'বাঃ, হরিমতি ওদের বাড়িতেও বাসন মাজে না? ওই তো কাল বলছিলো যে, ওখানে আর পোষাবে না তার.. সত্যি, ও গরিব মানুষ, পেটেব দায়ে খাটে, মাইনে না-পেলে ..তা চাকর-বাকর তো বেশি কথাই ..রোজ নাকি বাজারও হয না। এদিকে মেযেটা বি.এ.পবীক্ষা দেবে এবার—তাব ফিশের টাকা—'

এখানে বোধহয় সুপুত্র মাখনলাল কিছু ব'লে-ট'লে থাকবে—পবের খবরে আমাদের দরকার কী, বা আস্তে তার চেয়েও মৃদু কোনো প্রতিবাদ। হিবণ্ময়ী তখনই সুর বদলালেন —'তা তো ঠিকই, তা তো ঠিকই, আমি বাপু অত সাতে-পাঁচে নেই—তবে কিনা মেযেটার কথা ভাবছিলাম, বিয়েও হ'লো না—তা আমি বলি কী, বিদ্যাশিক্ষা তো অনেক হ'লো, তুই বলিস তো এবার এক অন্য রকম শিক্ষা দিই।'

মোটা মাখনলাল এই সূক্ষ্ম কথার মানে বুঝলো না, হিরণ্ময়ী তাই কথাটা বিশদ করলেন।

'একবার টিপে দেখবো নাকি প্রোফেসবের বৌকে? আব দেখবারই বা আছে কী—বর্তে যাবে না এখন তু ক'রে ডাকলে!'

খুব একটা গৌরবেব হাসিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে ছেলের দিকে তিনি তাকালেন, কিন্তু মাখনলালের স্বভাবতই গম্ভীব মুখমণ্ডল এখন প্রায় কঠোর দেখালো, কথা না-ব'লে বেরিয়ে গেলো আস্তে-আস্তে, যেতে যেতে অস্ফুটে শুধু বললো, 'বাজে!' মন্তব্যটা কাব উদ্দেশ্যে, তা ঠিক বোঝা গেলো না।

সেদিন কাজের শেষে বাড়ি ফিবতে অনেক বাত হ'লো মাখনলালেব। প্রোফেসবেব বাড়ির সামনে এসে হঠাৎ মা-র মুখে-শোনা কথাগুলি তার মনে পড়লো। একটু দাঁড়ালো, মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলো বাড়ির দিকে। অন্ধকার ;—শুধু দোতলার একটি ঘবে আলো জ্বলছে, পাখা চলছে, আর সেই পাখার ব্লেডের মস্ত কালো ছায়া ঘুরছে দেয়ালে। শুধু এটুকুই দেখা গেলো, আর কিছু না। মা-র সব কথাই বোধহয় ভুল—ভালোই আছে এরা। অন্তত তাই বিশ্বাস করার চেষ্টা করলো মাখনলাল। কিন্তু রাস্তা থেকে দোতলার দিকে তাকিয়ে কতটুকু বোঝা যায়।

কেমন একটা ছোট্ট কাঁটা মাখনলালের বুকের মধ্যে বাসা বাঁধলো—কাজেব ফাঁকে-ফাঁকে হঠাৎ খচ ক'রে ওঠে। সত্যি কি ওরা খুব কষ্টে আছে? না, না—মা-র যত বাজে ও-সব! ওদের কষ্ট ভাবতে মা-র সুখ হয়, অকারণ ঈর্ষায় শুড়শুড়ি লাগে—তাই বাড়িয়ে বানিয়ে ইচ্ছে মতো—কিন্তু সত্যি যদি তা-ই হয়? হ'তেও তো পারে? হ'লে তার কী, সে কী করতে পারে, তাব কী কববাব আছে—কিছু না, কিছুই না? কিছুই যে তার করবার নেই, পাশের বাড়িতে—যদি মাব কথাই সত্যি হয়—ভাত-কাপড়ে টান পড়লেও তাকে এই আশার অতীত এবং প্রয়োজনেব অতীত টাকার বস্তা নিয়ে চুপ ক'রেই থাকতে হবে, এ-কথা ভাবতে মাখনলালের অদ্ভুত একটু আঘাত লাগলো। তাতে আবার রাগ হ'লো নিজেরই উপব ;—আমিও কি আমাব মা-র মতো, আমিও কি ওদের কথা ভুলতে পারছি না?

এদিকে যুদ্ধের হুলুস্থূল দিন—দিনেব পব দিন, মাসেব পর মাস—যুদ্ধ যেন এ-জীবনে শেয হবে না। শেষ হবার তাড়াই-বা কিসেব—এমন সুযোগ মানুয়ের জীবনে ক-বাব আসে, বিশেযত বাঙালির জীবনে! বালিগঞ্জের সেই বাড়ি নিয়ে উঠে-প'ড়ে লাগলেন বাঘববাবু , মাল মশলা কনট্রোলের দরেই জোগাড় হ'লো, কনট্যাক্টর ভরসা দিলো, মাস-চাবেকেই শেষ হ'তে পাববে। বাড়িব ঢিলেঢোলা গেরস্ত ভাবটা, চটকদার আসবাবের অভাব—তারও এবার তিন-ডবল শোধ চাই, এই হ'লো হিরণ্ময়ীর মত। অতএব প্রত্যেক ঘবের আলাদা-আলাদা মাপমতো আনকোবা নযা ছাঁদেব চেয়ার, টেবিল, আলমারি, পালঙ্ক তৈরি হ'তে লাগলো নিজেদেবই কাবখানায , মাখনলাল সোনাব দামে সেগুন কিনলো, ডবল মজুবি কবুল ক'রে ভাগিয়ে আনলো পার্ক স্ট্রীটেব কাবিগর। হ্যাঁ মা-বাপেব এই উৎসাহে, এই 'ষড়যন্ত্রে' মাখনলালও যোগ দিলো—নিজেব ইচ্ছায় ঠিক নয়, কিন্তু এ ছাড়া আর করবারই-বা আছে কী? এটুকু ভালো হ'লো যে, আবো খানিকটা কাজ তাব বাড়লো।

এ ে স ।

কাজ ; —জীবনে যাব আব-কিছুই নেই, মনেব কোনো বন্ধই যাব জমলো না, তুমি তো সেই দুর্ভাগারই পরিত্রাণ। মাখনলালের এখন এমন অবস্থা যে, দিনেব গাড়িটাকে কোনো বকমে বাত্তিব বারোটার ঘুমের অতলে ঠেলে দিতে পারলে বাঁচে—দিনটা কেটে যাক, এ ছাড়া দিনেব কাছে আব কিছু সে চায় না। কত দিন স্নানাহারও হয না ; লক্ষ্যই করে না, কষ্টও হয় না কোনো।

কিন্তু হিরণ্ময়ী লক্ষ্য কবলেন, ছেলেকে যথোচিত সস্নেহে ভর্ৎসনাও করলেন। এমন কবলে শবীব আর ক-দিন—এত যাদের ঘোরাঘুবি, তাদের কি আর গাড়ি না হ'লে চলে। সেই-যে তাবাপদ গাড়িব কথা বলেছিলো—

'পাওয়া গেলো না, মা!'

'হ্যাঁঃ। তুই মন করলে আবার পাওয়া যায় না।'

'থাক না, চ'লে যাচ্ছে তো বেশ।'

'ঐ তোর এক বিশ্রী স্বভাব—সবার জন্য সব হবে, শুধু নিজেব বেলায কিপটেমি। ঐ ভিড়েব মধ্যে ট্রামে-বাস-এ আজকাল উঠতে পাবে মানুষ!'

'সবাই উঠছে, মা—মেয়েবা সুদ্ধ।'

'মে-যে-রা! মেয়েদের কথা বলিসনে আমাকে। মেয়ে আর আছে নাকি আজকাল—মরদ্, সব মরদ্ ব'নে গেছে। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে মূর্তি কী এক-একটা!—হ্যাঁ, জানিস, প্রোফেসরের মেয়ে বি.এ. পাশ করে চাকরিতে ঢুকেছে। বাপ এবাব মেয়ের রোজগারে ব'সে-ব'সে খাবেন।'

এ-কথা উঠতেই মাখনলাল আস্তে স'রে গেলো সেখান থেকে, আয়নার সামনে দাড়ি কামাতে ব'সে গেলো। কিন্তু হিরণ্ময়ী তার পিছন-পিছন এসে যেন আপন মনেই বলতে লাগলেন—'কেমন। এখন তো বুক জ্ব'লে যাচ্ছে! আহা—তখন যদি মেয়েটার বিয়ে দিতুম—এমন জানলে কি আব—তা

বাপু লজ্জা না-ক'রে মনের কথাটা মুখ ফুটে বললেই হয়!'

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে হিরণ্ময়ীর সেই একই কথা বার-বার।

এর ক-দিন পরে মাখনলাল দমদমে একটা কাজ সেরে ট্যাক্সিতে ফিরছে। লাটের বাড়ির মোড়ে, লাল আলোর সামনে থামতে হ'লো। প্রায় সন্ধে তখন, আপিশের ছুটির সময়, ট্রাম-বাস্-এর দিকে তাকাতেও ভয় করে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে তিন-চারটি আপিশ-ফেরতা বাঙালি মেয়ে...কী ক'রে তারা ট্রামে উঠবে, কখনো কি উঠতে পারবে। কিন্তু কেনই-বা এ সব ভাবা, রোজই যাওয়া-আসা করে এরা—অভ্যেস আছে। তবু মাখনলাল আর একবার তাকালো ; এবার মনে হ'লো—হয়তো আগেও মনে হয়েছিলো—একজনের মুখ তার চেনা! হ্যাঁ—সেই—সেই প্রোফেসরের মেয়ে। ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়েছিলো ফুটপাত ঘেঁষে, মাখনলাল ভালো ক'রে তাকে দেখতে পেলো, এত কাছে থেকে আগে দ্যাখেনি। কেমন হতাশ চোখে তাকিয়ে আছে মালতী, মুখে ক্লান্তির শ্রী—ক্লান্তিটুকু সুন্দর তাকে মানিয়ে গেছে যেন। একবার তার দিকে, একবার নিজের পাশের শূন্য প্রশস্ত আসনের দিকে মাখনলাল তাকালো—এমনি দু-তিন বার, কিন্তু একবারও চোখোচোখি হ'লো না। ডাকবে? কিন্তু কী ব'লে ডাকবে, আর সেটা—সেটা কি উচিত? যদি কিছু মনে করে—যদি বলে—কিছুই না বলে—কিন্তু—এমনি—ভাবতে-ভাবতে লাল আলো সবুজ হ'লো, ট্যাক্সি ফের চলতে লাগলো, পিছনে প'ড়ে থাকলো ট্র্যামে ওঠার হতাশ প্রত্যাশা। মাখনলাল বাড়ির দিকেই যাচ্ছিলো, কিন্তু হঠাৎ গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে গেলো চিৎপুরে, নতুন বাড়ির ড্রেসিংটেবিলের আয়না বাছতে।

আরো কয়েক মাস কাটলো।

রাঘববাবুর বাড়ি প্রায় শেষ, আসবাবপত্র তৈরি, এখন একটা শুভদিন দেখে গৃহপ্রবেশ করলেই হয়। হিরণ্ময়ী কোমরে হাত দিয়ে সারা দিন ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বাজে জিনিস বেচে দিচ্ছেন, পুরোনো শাড়ির বদলে এলুমিনিয়েমের বাসন রাখছেন, বিলিয়ে দিচ্ছেন ছেঁড়া জামা-কাপড়। শ্বশুরের আমলের কয়েকটা স্টীল ট্রাঙ্ক ছিলো—রং চ'টে গেছে, কোনোটার তালাও ভেঙেছে, কিন্তু খুব পোক্ত এখনো ;—সেগুলো নিয়ে কী করা যায় একদিন সকালবেলা ব'সে-ব'সে তা-ই ভাবছেন, এমন সময় ছোটো মেয়ে লক্ষ্মী ছুটে এসে খবর দিলো যে, সুভদ্রবাবুর বাড়ি পুলিশে ঘেরাও করেছে।

'অ্যাঁ!'

'হ্যাঁ মা, সত্যি পুলিশ এসেছে, কত লোকজন. দেখবে'সো...'

লক্ষ্মী মা-র হাত ধ'রে টানলো, কিন্তু তার দরকার ছিলো না। ব্যাপারটা শুধু ছোটোদের না, বড়োদেরও দ্রষ্টব্য বই কি। হিরণ্ময়ীর তো বিশেষ।

হিরণ্ময়ী প্রথমে রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। প্রোফেসরের বাড়ির সামনে ছোটোখাটো ভিড় জমেছে, তার মধ্যে পুলিশের লাল পাগড়ি জ্বলজ্বল করছে রোদ্দুরে। নিচের ঘরের দরজাটা হাঁ-করা খোলা, মনে হ'লো, বাইরে থেকে ধাক্কা দিয়ে ভেঙেছে ; কয়েকজন লোক হুড়মুড় ক'রে ভিতরে ঢুকে পড়লো, আর-একজন হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে-পিটিয়ে প্রোফেসরের পিতলের নেম-প্লেটটা তুলে ফেলে দিলো রাস্তায়। হিরণ্ময়ী মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখতে লাগলেন। চার-চার কুলি ধরাধরি ক'রে প্রোফেসরের হলদে-কাপড়ে-মোড়া বড়ো সোফাটা রাস্তায় এনে রাখলো, তারপর চেয়ার দুটো, তারপর সেন্টার টেবিল...পথ দিয়ে চলতে-চলতে একবার থমকে দাঁড়ালো সবাই, আশে-পাশের আট-দশখানা বাড়ির বারান্দায় জানলায় জোড়া-জোড়া চোখে বিকীর্ণ হ'তে লাগলো কৌতূহল, হয়তো সভয় কৌতুক, সেইসঙ্গে একটু-বা করুণা।

এর পর হিরণ্ময়ী ভিতর দিকের বারান্দায় এলেন। সেখান থেকে ওদেরও ভিতরের বারান্দা চোখে পড়ে, জীবনের প্রতিদিনের চলাফেরার ছবি, ভেসে আসে প্রতিবেশীর অস্তিত্ব বিষয়ে নির্বিকার হাসির টুকরো, গানের টুকরো, বেঁচে থাকার আনন্দের টুংটাং।

সেই বারান্দা এখন শূন্য প'ড়ে আছে নিঃশব্দ। দরজা-জানলা বন্ধ, ভিতরে কেউ আছে ব'লে মনেই হয় না। কী-হয়েছে, ব্যাপার কী? নতুন আর কী হবে, হরিমতি তো সব বলেইছে। রাজ্যের বাড়িভাড়া বাকি, এখন বাড়িওলা মালপত্র ক্রোক করেছে আর কি, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাবে সব। তারপর? ওদেরও কি হাত ধ'রে টেনে বের ক'রে দেবে রাস্তায়? প্রোফেসরের বৌকে, বাচ্চা দুটোকে, আর ঐ বি.এ. পাশ চাকরিকরুনি মেয়েটাকেও? তারপর সুভদ্রবাবুকে হাত-কড়া পরিয়ে সকলের চোখের সামনে দিয়ে ধ'রে নিয়ে যাবে? ঈশ্—সত্যি—বেচারা—ছি-ছি—কী কাণ্ড!

'কী কাণ্ড!' হিরণ্ময়ী ছুটে এলেন মাখনলালের কাছে, 'প্রোফেসরকে তো হাত-কড়া পরিয়ে ধ'রে নিয়ে গেলো।'

'কী!'

মাখনলাল তখন বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছে, মাথার মধ্যে কাঠ, লোহা, পেরেক, বল্টুর পঞ্চাশ ভাবনার ঘুরপাক—এরই মধ্যে হঠাৎ হিরণ্ময়ী উড়ে এসে সুভদ্রবাবুর বাড়ির এবং বাড়িওলার খবর সবিস্তারে তার কানে ঢাললেন।

সেদিন কাজে বেরোতে দেরি হ'য়ে গেলো মাখনলালের। খবরটা শুনে তার কী মনে হ'লো, কী ভাবলো, তা আমি বলতে পারবো না ; এর পরের ঘটনা তার মুখেই যেটুকু শুনেছি, এবং যে-রকম শুনেছি, তারই সঙ্গে আমার অনুমান মিশিয়ে আপনাদের শোনাই। ততক্ষণে—একবার সে বারান্দায় গিয়ে দেখলো—আরো জিনিস বের করা হয়েছে ; বই-ভরা-ভরা বুককেস, খাবার টেবিল, রেডিও, গ্রামোফোন, ফ্রেমে বাঁধাই বড়ো-বড়ো ছবি। এক পলক তাকিয়েই মাখনলাল ঘরে এসে বসলো ; হিরণ্ময়ী এসে আরো এক কাহন কথা বললেন—সত্যি, কী-কষ্ট ওদের—তা আমরা আর ভেবে কী করবো—যার যেমন কপাল আর কপালই-বা বলি কেন—আয় বুঝে ব্যয় না-করলে—কিন্তু মাখনলাল কোনো কথারই জবাব দিলো না, মা-র চোখেও চোখ ফেললো না।—কী আশ্চর্য, সারা বাড়িতে জনপ্রাণীর সাড়া নেই—পালিয়েছে নাকি সব?—এতদিন আছে পাড়ার মধ্যে, কোন্ লজ্জায় আর মুখ দেখাবে! ইত্যাদি ইত্যাদি কথাতেও মাখনলালের যখন মৌনভঙ্গ হ'লো না, তখন হিরণ্ময়ী ছেলের মুখ থেকে কিছু-একটা শোনবার আশায় জিগেস করলেন, 'তুই আজ বেরোবি না?'

মাখনলাল বললো, 'হুঁ', কিন্তু তার পরেও তেমনি মুখ ফিরিয়ে ব'সে থাকলো। অগত্যা হিরণ্ময়ী চ'লে এলেন সেখান থেকে, পর্যবেক্ষণ করতে আবার একবার বারান্দায় এলেন।

ততক্ষণে ব্যাপারটা পুরোনো হ'য়ে গেছে। সকালবেলার টাটকা উত্তেজনা আর নেই ; আশে-পাশের বারান্দা থেকে জোড়া-জোড়া কৌতূহলী চোখ স'রে গেছে ; কেজো বেলা বাড়লো—সকলেরই কাজ আছে, আছে রান্নার তাড়া ; আপিশের তাড়া হাঁ ক'রে পরের ব্যাপার দেখলেই তো আর দিন কাটবে না—আর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখাই-বা যায় কতক্ষণ! সব মিটতে বেশ দেরি হবে মনে হচ্ছে। ফুটপাতে রোদ্দুরে প'ড়ে আছে প্রোফেসরের অসহায় ফার্নিচার—জাজিমসুদ্ধ খাট, লেখার টেবিল, চায়ের বাসন, ইলেকট্রিক পাখা—আরো আছে, আসছে, একটা সংসারের জিনিস তো বড় কম না।

হিরণ্ময়ী সেখানে আর দাঁড়ালেন না, লক্ষ্মীকে অবজারভেশন পোস্টে বসিয়ে চ'লে এলেন রান্নাঘরের তদারকে।

যখন সকরুণ প্রতিবেশীরা যে যার কাজে মন দিলো, রান্নাঘরের ছ্যাঁকছ্যাঁক শব্দে কৌতূহল চাপা পড়লো, যখন পাড়ার মধ্যে কোনো-এক বাড়ির চমকপ্রদ ঘটনাটাও প্রায় প্রতিদিনের তুচ্ছতায় মিশে এলো, তখন ঐ বাড়ির ভিতরদিকের একটি দরজা আস্তে খুলে গেলো, বারান্দায় বেরিয়ে এলো একটি মেয়ে, সেই মেয়ে, যার আঁচলের হাওয়া কোনো-একদিন ঐ বারান্দা থেকেই মোটা

মাখনলালকে ছুঁয়ে গিয়েছিলো। এর মধ্যে অনেকদিন সে মাখনলালের চোখে পড়েনি, কিন্তু আজ ঘরে ব'সে-ব'সে মাখনলাল দেখলো তাকে, দেখে যেন চিনলো, ঠিক চিনতে পারলো। রেলিঙে ভর দিয়ে একটু দাঁড়ালো সে, একবার হাত তুলে কপাল থেকে চুল সরালো, তারপর চকিতে ফিরে গেলো ঘরে, আবার বন্ধ হ'লো দরজা। আব মাখনলাল—মাখনলাল তখন যা করলো তা একটু অদ্ভুত, হয়তো আপনারা হাসবেন শুনে, কেন যে সে ওরকম করলো, সে নিজেও তা জানে না, কিন্তু সে-মুহূর্তে—পরে আমাকে একদিন সে বলেছিলো—সেটাই তার 'এসে গেলো', যেন নিজে-নিজেই হয়ে গেলো সব।

মাখনলাল আর দেরি করলো না, চটিতে অর্ধেক পা ঢুকিয়ে মস্ত অশোভন শরীর নিয়ে বেগে বেরিয়ে এলো বাস্তায়। ফুটপাতে ফার্নিচারের ভিড় তাদেব বাড়ি অবধি ঠেকেছে, বার্নিশে ঝিলিক দিচ্ছে এগারোটার বদ্দুবে, তারই মধ্য দিয়ে পথ ক'বে পাশের বাড়ির সামনে সে দাঁড়ালো। হাঁ-করা দরজা তাকে বাধা দিলো না, সামনেই সিঁড়ি পেয়ে—একটু দ্বিধা না, ভাবনা না—সোজা উঠে এলো উপরে। সামনের ঘরটা সদ্য-বিধবার মতো প'ড়ে আছে, শুধু দেয়ালে একটা ছবি ঝুলছে, যেন সদ্যবিধবারই সিঁথিতে দীর্ঘ-জীবনের বক্তিমার স্মৃতি। পাশের ঘরে কতকগুলি কালো-কালো ঘামে-তেলতেলে মানুষ জিনিস ঠেলছে—মাখনলাল হন হন ক'রে পার হ'য়ে এলো। এর পর আর একটি ঘর, একেবাবে কোণে, দরজা বন্ধ—এখানেই আছে বোধহয় বাড়ির লোক? টুকটুক টোকা দিলো দবজায—কোনো জবাব নেই। আবার টোকা, তারপব আস্তে ধাক্কা দিতেই ভেজানো দরজা খুলে গেলো , ভিতবের দৃশ্য মাখনলালের চোখে আব গোপন থাকলো না।

ছোটো ঘব। চারটি শাদা দেয়াল ছাড়া আব-কিছুই তাতে নেই, কিন্তু যেখানে-যেখানে জিনিস ছিলো, মেঝেতে তাব দাগ এখনো মোছেনি। মেঝেয় জড়োসড়ো হ'য়ে ব'সে বাড়ির ক-টি মানুষ, প্রোফেসব, তাঁব স্ত্রী আব কন্যা, একটু দূবে দুটি বাচ্চা গোল হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, একজনেব পা আর-একজনেব গাযেব উপব তোলা। এতদিন যাদেব দূর থেকে দেখেছে, আজ হঠাৎ অদ্ভুত অবস্থায় তাদের মুখোমুখি কাছাকাছি দেখতে পেয়ে মাখনলাল ধাক্কা খেয়ে বুঝলো এরা তার কত দূর, কত অচেনা। কেন এসেছে এখানে? কী সে করতে পারে?

অন্য পক্ষও নীরব। প্রোফেসর একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নিলেন, তাঁর স্ত্রী চোখই তুললেন না, ব্যস্ত হ'যে উঠে দাঁড়ালো শুধু মালতী—হ্যাঁ, নামটা মাখনলাল এখনো ভোলেনি।

তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এসে বললো, 'আপনি! আপনি কেন এসেছেন?'

রুক্ষ স্বব, অভ্যর্থনার ছিটেফোঁটাও নেই, তবু মাখনলাল যেন গান শুনলো। 'আপনি! কেন এসেছেন?' তাব মানে তাকে চিনেছে, তাকে চেনে। কুণ্ঠা ঝ'বে পড়লো তার, সাহসে ভ'বে উঠলো মন। খুব সহজভাবে বললো, 'আমাকে আসতেই হ'লো। এক একটা ব্যবস্থা হওয়া তো দরকার।'

মালতী বোধহয কিছু বলতে যাচ্ছিলো, কোনো প্রখব আত্মসম্মানের প্রতিবাদ, কিন্তু মাখনলাল তখনই সেখান থেকে স'রে এলো। পাশেব ঘরেই ছিলো বাড়িওলাব লোকজন, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে এই সমস্ত গোলমালটা মিটিয়ে দিলো ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। প্রোফেসরও উঠে এলেন সেখানে-- ক্ষীণ স্বরে কথা বললেন—ঐ অবস্থায় যতটা সম্ভব আপত্তিও জানালেন মাখনলালের এই মধ্যবর্তিতায় : আর শেষপর্যন্ত সব যখন মিটে গেলো, সেই ঘামে-তেলতেলে লোকগুলোই আবার সব জিনিসপত্র তুলে ঠিক ঠিক জায়গামতো সাজাতে লাগলো, তখন—ততক্ষণে—প্রোফেসর এত ক্লান্ত যে, কোনো কৃতজ্ঞতার মামুলি কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বেরোলো না, আর তাতে মাখনলাল ভারি আরাম পেলো মনে-মনে।

দিনেব অবশিষ্ট সময় যেন উড়াল দিয়ে চ'লে গেলো তার। কী যে ভালো লাগলো তার সেই দিনটি, ভালো লাগলো কাজ, লোকজন, কলকাতার শহর—বোধহয় পৃথিবীটাকেই ভালো লাগলো।

আর তার প্রতি পৃথিবীরও যেন দয়ার আজ শেষ নেই ; যাকে যা বলছে তাতেই সে এক কথায় রাজী, কিছুই যেন কোথাও আর আটকায় না, যেটা চায় সেটা মনে-মনে চাওয়া মাত্রই যেন সামনে হাজির। আর কাজের শেষে তার বাড়ি ফেরাও আজ অন্য রকম ; রোজ ফেরে ফিরতে হবে ব'লেই, কোনোখানে ক্লান্তির সীমা আছে ব'লেই ;—আজ তার মনে হ'লো—ঠিক মনে হ'লো না, তবু রাত্রির আর হাওয়ার ভাবটা যেন এই রকম যে, কেউ বা কিছু সে ফিরবে ব'লে অপেক্ষা ক'রে আছে।

প্রোফেসরের বাড়ির সামনে স্বতই তার পা থামলো। ঘরে-ঘরে আলো জ্বলেছে, দোতলার ঘরের দেয়ালে তেমনি ঘুরছে পাখার ব্লেডের কালো ছায়া। নিশ্চয়ই ঠিক আছে সব, আর-কোনো গোলমাল হয়নি, তবু ভাবলো একবার খোঁজ নিয়ে যাই। এ কি তার বিশুদ্ধ হিতৈষণা? তার নিজের কোনো স্বার্থ কি ছিলো না তাতে? এই প্রশ্ন আপনাদের মনে এখন যেমন উঠছে, তেমনি তখন আর-একজনের মনেও উঠেছিলো। সেখানেই এই গল্পের শেষ।

আস্তে টোকা দিতেই নীচের ঘরের দরজা খুলে গেলো, আর মাখনলাল মালতীকেই দেখতে পেলো তার সামনে দাঁড়ানো। অন্য কেউ হ'লে সে সুখী হ'তো, কিন্তু এখন আর ফিরে যাবার পথ নেই।

'আমি—আমি একবার এসেছিলাম—'

একেবারেই অনাবশ্যক ঘোষণা, এবং এর উত্তরে অন্য জন—বা প্রতিপক্ষ—কিছুই যখন বললো না, তখন এর অনাবশ্যকতা কমবুদ্ধির মাখনলালও বুঝতে পারলো।

'সব ঠিক আছে কিনা তা-ই একবার দেখতে—'

'আপনি আসুন'—বলবার ধরনটা এমন, যেন ডাক্তার রোগীকে ভিতরে আসতে বলছে—'হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।'

মাখনলাল ভিতরে এসে দাঁড়ালো। তাকিয়ে মনে হ'লো সবই ঠিক আছে, দেয়ালে ছবি, শেলফে বই, কোণে রেডিও —ঠিক যেমন সে যেতে-আসতে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখেছে। কোনো-এক সময়ে তার মনে হয়েছিলো ঐ ঘরের মধ্যে না জানি কত আনন্দ, কিন্তু এখন ঐ সুন্দর সাজানো পরিবেশে তার সারাদিনের ভালো লাগাও যেন নিবে গেলো—মনে হ'লো তার কোনো ভিত্তি নেই, অর্থ নেই।

'আপনি বসুন।'

বসবার একটুও ইচ্ছে ছিলো না, কিন্তু কে যেন মাখনলালকে বাধ্য করলো।

একটু দূরে ব'সে মালতী বললো, 'আমি জানতাম আপনি আবার আসবেন। আপনার জন্যই ব'সে ছিলাম এখানে।'

এ-কথা শুনে মাখনলাল তার সমস্ত মোটা শরীরে কেঁপে উঠলো।

'আপনাকে একটা কথা আমার জিগেস করার আছে।'

'বলুন।'

'এ-কাজ আপনি কেন করলেন? ..চুপ ক'রে আছেন কেন? বলুন!'

তার প্রশ্নকারিণীর চোখের দিকে তাকিয়ে মাখনলাল বুঝলো সে অপরাধ করেছে।

'কেন করলাম? তা তো আমি জানি না।'

'আপনি জানেন না? তাহ'লে আমার মুখে শুনুন। পরোপকারের আত্মপ্রসাদ কি কম! দরিদ্রকে দয়া করার সুযোগ পেলে বেশ ভালোই তো লাগে! অন্যের কৃতজ্ঞতা অতি উপাদেয় বস্তু—তা-ই না?'

আধুনিক শিক্ষিত তরুণীর সুগঠিত ঠোঁট থেকে প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট উচ্চারণে খ'সে পড়লো।

একসঙ্গে এত-সব শক্ত-শক্ত কথা শুনে মোটা মাখনলাল আবো যেন বোকা হ'য়ে গেলো , উত্তবে কিছুই বলতে পাবলো না।

'আব তা ছাড়া, এব মধ্যে আপনাব উদ্দেশ্যও আছে। এই উপায়ে আমাদেব হাতেব মুঠোয় নিয়ে এসে আমাদেব উপব প্রতিশোধ নেবেন—এই তো আপনি ভেবেছেন।'

উদ্দেশ্য', 'প্রতিশোধ', এ-সব কথায় অর্থহীন আওয়াজ ছাড়া আব কিছুই মাখনলাল শুনতে পেলো না। মনে-মনে সে কথা খুঁজলো, অন্ধকাবে মানুষ যেমন হাৎড়ায় কিন্তু কী বলবে, কী তাব বলবাব আছে কিছুই খুঁজে পেলো না।

কিন্তু আপনি যা ভাবছেন, তা হবে না, হবাব নয়।'

এবাব মাখনলাল উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি কিছুই ভাবিনি। আপনাদেব একটু অসুবিধে হয়তো ঘটালাম, সেটা —ভুলে যাবেন।'

'আপনাব টাকা ফেবৎ দিতে পাবলে তবে তো ভুলে যাবাব কথা। কিন্তু ফেবৎ আপনি পাবেন—হয়তো দেবি হবে—কিন্তু নিশ্চয়ই আমবা ফেবৎ দেবো।'

'বেশ '

'আব একটা কথা আপনি শুনে যান। এ বাড়িতে আপনি আব আসবেন না---কখনো না কোনো কাবণেই না।

দবজাব পাশ থেকে একবাব ফিবে দাঁড়িয়ে মাখনলাল আস্তে বললো, 'না, আব আসবো না।'

ব'লেই এসে মাখনলাল বাড়ি ছাড়িয়ে চ'লে গেলো , তাব প্রকাণ্ড অশোভন শবীবেব অসুন্দব চলন নিয়ে অনেক, অনেকক্ষণ ঘুবে বেড়ালো সেই বাত্রে, ব্ল্যাক আউটেব অন্ধকাব সেদিন তাব মনে হ'লো বড়ো ভদ্র, সহৃদয় কৌতূহলহীন।

কনট্রাক্টবেব মোটা ভাবী মন্থব আওয়াজে ঘবটা যেন এতক্ষণ ভ'বে ছিলো , তিনি থামতেই আবো গভীব হ'য়ে নামলো ওয়েটিং-রুমেব বাত্রি, বাত্রিব প্রতীক্ষমাণ নীববতা। দূব থেকে অনেকটা কুয়াশাব পর্দা ফুঁড়ে, শান্টিং এব আওয়াজ এসে পৌঁছলো যেন স্বপ্নে-পাওয়া কোনো গোঙানি, আবো দূবে হঠাৎ একবাব আকাশ ফুঁড়ে দিলো কুকুবেব আর্তস্বব। সেই শব্দেব বেশ যখন থামলো, তখন মৃদু একটু কেশে, দিল্লিওলা বললেন

'এখানেই আপনাব গল্পেব শেষ?'

'আপনি কি এব পবে আবো শুনতে চান?' সাহিত্যিকেব ঠোঁটেব কোণে হাসি ফুটলো।

বড়ো চাকবেটি সকলেব কাছে তোয়াজ পেয়ে তাঁব অভ্যাস - সেই বাঁকা হাসিতে একটুও বিচলিত হলেন না। গম্ভীব মুখে বললেন, 'একটা কথা জানতে চাইলে বোধহয় দোষ হয় না ... ই টাকা কি প্রোফেসব ফেবৎ দিয়েছিলো?'

কনট্র্যাক্টব হাত বাড়িয়ে সিগাবেট নিলেন। থাবাব মতো তাঁব হাত, আঙুলেব গাঁট মোটা মোটা, লোমশ আব মুখেব ব্যাস এত বড়ো যে, ঠোঁটে সিগাবেটেব মতো হালকা জিনিস ঠিক যেন মানায় না। আনাড়িব মতো ফুড়ুক ক'বে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'মাখনলালেব এই কাহিনীব আমি এইটুকুই জানি। এব বেশি কিছু জানি না।'

'এব বেশি দবকাবও নেই', সাহিত্যিক, অভিজ্ঞভাবে মন্তব্য কবলেন। 'এব পব কী হ'লো তাব সঙ্গে মেয়েটিব আব দেখা হয়েছিলো কি হয়নি, উপকাবীব অপমান ক'বে মেয়েটিবই বা পবে কেমন লেগেছিলো, কোনোদিন সন্ধ্যাব পবে সেই মস্ত মোটা বিশ্রী চেহাবাব মানুষটিকেই দেখাব জন্য সে তাব নিচেব ঘবে জানালাব ধাবে বই পড়াব ছল ক'বে ব'সে থেকেছে কি থাকেনি—এ সব কথাই অবাস্তব। সেই-যে মনেব মতো মেয়ে—আমাদের মনেব মধ্যেই যাব বাসা—তাকে জীবনে কোনো-একবাব কোনো-এক বাস্তব মানুষেব মধ্যে দেখতে পেয়েছিলো মাখনলাল—সেটুকুই খাঁটি, সেটুকুই

দামী, অন্য কিছুই কিছু না। নিশ্চয়ই নতুন বাড়িতে উঠে যাবার কিছুদিনের মধ্যে মাখনলাল মা-র পছন্দমতো গৃহলক্ষ্মী এনেছিলো—এতদিনে ছেলেপুলে নিয়ে তার সংসার ভ'রে উঠছে, টাকাও রোজগার করছে খুব—কিন্তু পরের কোনো ঘটনাই আগের ঘটনাকে বাতিল ক'রে দেয় না ; মাখনলাল তার মালতীর কাছে যদি কিছু পেয়ে থাকে তা তো পেয়েই গেছে, তা তার জীবনেও হারাবে না—কী বলেন আপনি?' কথার শেষে সাহিত্যিক কন্‌ট্র্যাক্টরের দিকে কটাক্ষ করলেন।

'মাখনলালের কথা এখন থাক, এবার আপনাদের পালা,' ব'লে কন্‌ট্র্যাক্টর বড়ো-বড়ো দাঁত বের ক'রে হাসলেন।

'আপনি বলুন,' ডাক্তার চাকুরেটিকে চোখ টিপলেন।

দিল্লিওলা যেন এর জন্য প্রস্তুতই ছিলেন। আপত্তি তুলে সময় নষ্ট করলেন না—বোধহয় আগের গল্প শুনতে-শুনতে নিজেরটাও তিনি ভেবে রেখেছিলেন, এটাও হয়তো তাঁর আপিশের সুশৃঙ্খল অভ্যাসের ফল। যেমন আপিশে ঠিক-ঠিক সময়মতো নিয়মিত নিজের কাজটুকু ক'রে যান, তেমনি মসৃণ, অনুচ্চ গলায়, মাপা-মাপা ছোটো কথায় একটু পরেই বলতে আরম্ভ করলেন—

গগনবরণের গল্প

আমার নাম গগনবরণ চ্যাটার্জি। দিল্লি-শিমলের খুদে মাতব্বর আমি, সেখানে জি.বি. চ্যাটার্জি নামে সবাই আমাকে চেনে, বড়ো-বড়ো সরকারি দলিলে জি.বি.সি. দস্তখৎ অন্তত হাজার বার পড়েছে। একুশ বছর বয়সে আমি বিলেত গিয়েছিলুম, চব্বিশ বছরে ফিরে এসে চাকরি পেলুম দিল্লিতে। তারপর থেকে এ-মুল্লুকেই বরাবর। এতদিন থাকতে-থাকতে এখন যেন ভাবতেই পারি না যে, কোনোদিন অন্য কোথাও ছিলুম, বা থাকবো। পেন্সনের পরে? তার ব্যবস্থাও ক'রে নিয়েছি, দিল্লিতে সিভিল লাইন্সে নিজেরই বাড়ি আমার, বারান্দা থেকে যমুনা দেখা যায়। স্যাঁৎসেঁতে বাংলাদেশে স্ত্রীর শরীর টেঁকে না—তাঁর বাপ ছিলেন আগ্রা কলেজের প্রিন্সিপাল —ছেলেমেয়েরা হিন্দি-ভাঙা বাংলা বলে, আরো বেশি বলে ইংরেজি—আর এই যে আমি এতক্ষণ ধ'রে আপনাদের সঙ্গে বাংলা বলছি, এটাও আমার পক্ষে নতুন। বাংলার সঙ্গে মোলাকাৎ আমার কিছুই নেই আজকাল, কোনোই টান নেই সেদিকে, কালেভদ্রে যা কলকাতায় যাই তাও সরকারি কাজে, দরকারের বাইরে এক দিনও থাকি না।

অথচ আমি বাংলাদেশেই জন্মেছিলুম, বড়ো হয়েছিলুম, জীবনের প্রথম চ্যাপ্টার সেখানেই আমার কেটেছিলো। তখন, সেই সুদূর ছেলেবেলায় আমার এই এখনকার 'আমি'কে কি কল্পনাও করতে পারতুম? না কি এখনই সেই তখনকার একটি বালক, একটি লাজুক স্বভাবের যুবককে এই আমারই আগের এডিশন ব'লে ভাবতে পারি? সে-সব যেন মুছেই গেছে মন থেকে, ভেবেছিলুম ভুলেই গেছি—কিন্তু আজ আপনাদের কথাবার্তা শুনে হঠাৎ খুব স্পষ্ট হ'য়েই মনে পড়ছে।

মনে পড়ছে একটি ছেলেকে, সাধাবণ বাঙালি-ঘরের ছেলে, বয়সে সতেরো, মফস্বলের শহরে কলেজের ছাত্র। ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পেয়েছি, অনেকের অনেক উচ্চাশার আমি কেন্দ্র ; সেই উচ্চাশার উপযোগী হবার চেষ্টাতেই বেশির ভাগ সময় আমাব কাটে। এখন আমাকে দেখে আপনাদের তা বিশ্বাস হওয়া বোধহয় শক্ত, কিন্তু সেই বয়সে আমি বড্ড বেচারা গোছের 'ভালো ছেলে' ছিলুম, গুরুজনের বাধ্য, পড়াশুনোয় পরিশ্রমী, আর সকলের কাছেই অতিশয় বিনীত, প্রায় চোখ তুলেই তাকাই না।

তা হ'লে হবে কী? আমার বয়সের ধর্ম ভিতরে ভিতরে তার নিজের কাজ নির্ভুল নিয়মে ক'রে যাচ্ছিলো। আপনারা ভালোবাসার কথা বলছিলেন, আমিও তখন ভালোবাসার কথা ভাবতুম। কত

কষ্ট ক'রেই কেমিষ্টির ফর্মূলা মুখস্থ করেছিলুম, কিন্তু জীবনের আদি ফর্মূলা নিজে-নিজেই শেখা যায়, তার পরামর্শে একটুখানি অস্থায়ী রং ধরে সকলেরই মনে, আমার মনেও ধরেছিলো। পাঠ্যকেতাবের ফাঁকে-ফাঁকে কত যে নভেল গিলতুম তখন—যা-কিছু পাওয়া যেতো সেই ছোটো শহরে—হ্যাঁ, এমনকি—আপনি সাহিত্যিক, এ-কথা শুনে হাসবেন না—এমনকি কবিতাও পড়তুম। গল্পে, কবিতায়, যেখানেই ভালোবাসার কথা, সেখানেই আমার মনের খোরাক—আর এ কী রহস্য যে, এত লিখে-লিখেও ফুরোয় না, যত তার কথা শুনি, ততই আরো শুনতে ইচ্ছে করে।

আজ মনে হয় যে, ছাপানো বইতে কতবার তো ভালোবাসার কথা শুনেছিলুম, কিন্তু কিছুই শুনিনি, শুনেও শুনিনি। সেই সতেরো বছর বয়সে পাখির মুখে যখন শুনলুম, আকাশ ভ'রে বাঁশি বেজে উঠলো।

হ্যাঁ, সেই সুদূর সতেরো বছরে পাখি আমাকে ভালোবেসেছিলো। বলতে-বলতে এখন মনে পড়েছে তাকে, যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কালো দুটি চোখ। চোখে-চোখেই ভালোবাসার জন্ম, চোখে-চোখেই তার জীবন—সেই ঘোরতর ব্যাকওঅর্ড-সেকালে আর-কোনো ভাষা আমাদের জানা ছিলো না। সকলের সঙ্গে সকলের কথাবার্তার মধ্যে আমি ব'সে থাকতুম, সে-ও থাকতো—মনেই করতে পারি না যে, দু-জনে সোজাসুজি কখনো কিছু বলেছি। হয়তো সেও একরকমের বলা, তখনকার খিদে তাতেই মিটে যায়। অন্তত আমাদের ওর বেশি আশা ছিলো না, বেশি কোনো আশার ফুরশৎও ছিলো না।

সেই পাখির মুখে একদিন কথা ফুটলো—এক রাত্রে, আজকের মতোই এক শীতের রাত্রে।

রাত তখন তিনটে হবে। কল্পনা করুন মফস্বলের শহর, শহরের প্রান্তে প্রকাণ্ড মাঠের মধ্য দিয়ে রাস্তা, চারদিকে কুয়াশা, আর সেইসঙ্গে আকাশে একটা তোবড়ানো চাঁদের ফ্যাকাশে জ্যোছনা। রেল-বাবুদের ক্লাবে নাটকের পালা হ'লো —সেখানকার মস্ত ঘটনা এটা—প্রায় প্রত্যেক বাড়ি থেকেই কেউ-না-কেউ এসেছে। উৎসাহ মহিলাদেরই, পুরুষরা বেশির ভাগ এসকর্ট মাত্র। সেই সম্মানজনক পদ—যদিও নেহাৎ ছেলেমানুষ—শুধুই পুরুষজাতীয় জীব হবার জোরে সেই রাত্রে আমি পেয়েছিলুম। বড়োরা কেউ রাজি নন, আর আমি একটা আস্ত মানুষ বেকার ব'সে আছি—অর্থাৎ সামনেই কোনো পরীক্ষার তাড়া আমার নেই—অতএব আমাকেই পাকড়াও করলেন মা-বৌদির দল। আমার ইচ্ছে ছিলো না, কিন্তু জোর ক'রে 'না' বলার চাইতে যে-কোনো অনিচ্ছার কাজ আমার পক্ষে তখন সহজ ছিলো।

মেয়েরা তখনো চিকের আড়ালে বসেন, কিন্তু কণ্ঠস্বরের অবরোধপ্রথা কোনোকালেই তো ছিলো না। চোখে না-দেখলেও কানে শুনলুম তাঁদের—হাসাহাসি, গালগল্প, বসবার জায়গা নিয়ে ঝগড়া, নাটক বিষয়ে মন্তব্য, বাচ্চাদের উপর তর্জনগর্জন—সব মিলে এক বিচিত্র অদ্ভুত চ্যাঁচামেচি। চ্যাঁচামেচি স্টেজেও প্রচণ্ড পরিমাণে হচ্ছিলো ;—ঘুমে ঢুলতে-ঢুলতে আমার ব'সে-ব'সে মনে হচ্ছিলো, একসঙ্গে দুটো নাটক শুনছি—না, তিনটে, কেননা, একটু সামনের দিকে বসেছিলুম ব'লে প্রম্‌টিংও স্পষ্ট শুনছিলুম, আর দ্রৌপদী আর ভীমসেনকে সিগারেট ফুঁকতেও দেখা যাচ্ছিলো মাঝে-মাঝে। এই তিন-মিশেলি গোলমাল চলেছে তো চলেইছে, কখনো থামবে এমন মনেই হয় না—এক-এক বার আমি ব'সে-ব'সেই ঘুমিয়ে নিচ্ছি খানিকটা—তবু সেই নাটক কি ফুরোয়!

শেষ পর্যন্ত সত্যি যখন শেষ হ'লো, সবাই বললো গ্র্যান্ড সক্সেস, অনেকের মনে এটুকু শুধু আপশোষ থাকলো যে, নেহাৎই মাঘ মাসের রাত ব'লে একদম ভোর ক'রে দেয়া গেলো না।

এবার বাড়ি ফেরার পালা। যান-বাহনের বালাই নেই, দল বেঁধে-বেঁধে হাঁটতে লাগলো সকলেই। কিছু দূর পর্যন্ত সকলেরই এক রাস্তা, প্রায় সকলেই সকলের চেনা, তাই মহিলাদের কলধ্বনি তেমনি চললো অবিরাম—যেন নাটক শেষ হ'য়েও শেষ হয়নি, পিছন-পিছন তাড়া করেছে। হঠাৎ জজ-সাহেবের মটরটি ফটফটিয়ে চ'লে গেলো, আর তারপরেই—আমার মনে হ'লো—চারদিক যেন চুপ, ঠাণ্ডা, মরা জ্যোছনায় ছড়িয়ে প'ড়ে আছে মাঠের পরে মাঠ, কোন্‌টা গাছ আর কোন্‌টা তার

ছায়া ঠিক ঠাহর হয় না, মানুষ যারা চলেছে, তাদেরও ছায়া ব'লে ভুল হয়—আর একটু পরে কাছাকাছি অন্য মানুষও নেই, আমি একাই হেঁটে চলেছি। তখন বুঝলুম যে, সঙ্গিনীদের ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে এসেছি—বোধহয় শীতের জন্য তাড়াতাড়ি হাঁটছিলুম, ভালো লাগছিলো হাঁটতে। খানিক আগেও ঘুমে এলিয়ে ছিলুম, কিন্তু এখন আমার চোখে ঘুমের ছিটেফোঁটাও নেই—সেই মস্ত খোলা মাঠের মধ্যে, কুয়াশার রাত্রে আমার মনে হ'লো, শরীরের অণুতে-অণুতে আমি জেগে আছি, বেঁচে আছি।

কিন্তু বড্ড বেশি এগিয়ে এলুম না তো? কর্তব্যপালনে ত্রুটি হচ্ছে কি? অবশ্য, নতুন-গোঁফ-ওঠা একটা মোটা গলার ছেলে পাশে-পাশে থাকলে কোনো লাভ নেই ওঁদের, বরং তাতে অসুবিধেই, তবু—যদি-বা কোনো দরকার হয়।

নিশ্বাস নিয়ে দাঁড়ালুম, পিছনে তাকালুম। মহিলার দল অনেকটা পিছনে, কুয়াশায় চোখেই পড়ে না। কিন্তু মনে হ'লো কে একজন খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে আমার দিকে আসছে। কে? একটি মেয়ে। নিশ্চয়ই মা-র কোনো শাসন, কি বৌদির কোনো ফরমাশ?

কাছে আসতে দেখি, পাখি।

আমি বললুম, 'কী হয়েছে?'

'কী আবার হবে?'

'তবে?'

'তবে মানে?'

'তুমি যে?'

'মা-রা এত আস্তে হাঁটেন!'

এ-কথা শুনে আমি অবাক হয়েছিলুম মনে পড়ে। খুব সাহস তো!

জিগেস করলুম, 'ওঁদেব বলেছো?'

'বলেছি।'

'কী বললেন ওঁরা?'

'কী আবার বলবেন!' পাখি মাথা ঝাঁকালো. আবছা জ্যোছনায নতুন ক'রে ওকে দেখলুম।

'তার মানে—'

আমার কথায় বাধা দিয়ে পাখি বললো, 'দাঁড়িয়েই থাকবে নাকি?'

এই প্রথম তার সঙ্গে মুখোমুখি কথা বললুম। মনটা হঠাৎ যেন খুব ভ'বে গেলো, যেন ভাব. যেন বুকের মধ্যে ভারি কিছু বাসা বাঁধলো।

আবার হাঁটতে লাগলুম, এবার পাশাপাশি দু-জনে। কিন্তু বাকি পথটুকু আর কথা না। জোরে হাঁটলুম আমি, পাখি একবারও বললো না 'আস্তে', ঠিক আমার সঙ্গে-সঙ্গেই চললো। সে তখন চোদ্দ বছরের—সে-যুগের হিসেবে মস্ত মেয়ে, এবং সে-যুগের হিসেবেও শান্ত। কিন্তু তখন তাকে একটুও শান্ত লাগলো না আমার ; মনে হ'লো তার পা দুটি অনেক, অনেকক্ষণ ধ'রে এমনি চলতে পারে আমার সঙ্গে—বাড়ি ছাড়িয়ে, শহর ছাড়িয়ে, হযতো আমাদের চেনাশোনা ছোট্ট পৃথিবী ছাড়িয়ে অন্য কোথাও!

সেই ছেলেবয়সে বোকার মতো কত কথাই মনে হয়! হবেই-বা না কেন?' ততক্ষণে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বাঁধা শড়ক ছাড়িয়ে পায়ে-চলা মাঠের পথে নেমেছি, পায়ে-পায়ে চোরকাঁটার খোঁচা—দুষ্টমির আদরের মতো লাগছে, নিশ্বাস একটু ভারি, চারদিকে ঘাসের গন্ধ, শিশিরের গন্ধ, পৃথিবীর গন্ধ। এমনি খানিকক্ষণ যেন স্বপ্নের মধ্যে হাঁটলুম, তারপর মাঠ ফুরোলো, শহর, শহর সরু হ'লো পাড়ায়, ঘুমে-বোঝাই বাড়িগুলির পাশেই হঠাৎ একটা পুকুর চাঁদকে চুরি ক'রে ব'সে আছে। এর পরে একটি মোড় নিয়েই পাখিদের একতলা। পাশাপাশি বাড়ি আমাদের, বেজায় বন্ধুতা দু-বাড়িতে—সকলেই সকলের বন্ধু তখন, সকলেই সুখী—আমাদের এ-বয়সের এটাই সবচেয়ে বিশ্রী, যখন মনে হয়

জীবনের সব সুখ পিছনে প'ড়ে আছে।

পিছনে তাকিয়ে অভিভাবিকাদের চিহ্ন দেখলুম না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলুম—জোরে নিশ্বাস পড়ছে, আর এতটা হাঁটার পরে শরীর বেশ গরম, যেন শীতের শেষরাত্রে—সবচেয়ে ঠাণ্ডা যখন, তখনই ফাল্গুনের হাওয়া দিচ্ছে।

একটু পরে বললুম, তুমি না-হয় বাড়ি যাও।'

'একটু দাড়াই।'

আমারও তা-ই ভালো মনে হ'লো। এতক্ষণ আর-কিছুই মনে ছিলো না, কিন্তু এই চেনা পাড়ায়, চেনা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গুরুজনদের কথা আমার মনে পড়লো। হয়তো দোষ করেছি, বকুনি পাওনা আছে, সেই বকুনি মাথা পেতে নেবার জন্য পাখিকে নিয়ে এখানেই আমার দাঁড়িয়ে থাকা উচিত।

এবাব কথা বললো পাখি।

'বাড়িটা আরো দূর হ'লে বেশ হ'তো।.. তা-ই না?'

আমি বললুম, 'কিন্তু, পথ তো ফুরোতোই।'

পাখি একবার আমার দিকে তাকালো, জ্যোছনায় চিকচিক ক'রে উঠলো তার চোখ। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো, 'এতক্ষণ কী ভাবছিলে তুমি?'

'কী জানি।'

'আমি ভাবছিলুম—ভাবছিলুম যে, হাঁটতে তো খুব ভালো লাগছে, কিন্তু হাঁটছি ব'লেই পথ ফুরোচ্ছে।'

এ কথা শুনে আমার তখন হাসি পেয়েছিলো। কিন্তু এখন মনে হয় যে, সেই চোদ্দ বছরের মেয়ে না জেনে ঠিক জ্ঞানেব কথাই বলেছিলো। জীবনটা এই রকমই আমাদেব—বাঁচতে বাঁচতেই বেঁচে থাকাব ক্ষয়, যে-পথে চলতে ভালো লাগে, চলতে হয় ব'লেই সে-পথ ফুরোয়।

'আবো অনেক কথা ভাবছিলুম', পাখি আবার বললো। 'কিন্তু বলবো না, তুমি হাসবে।'

'বলো না', আমার কলেজে পড়া বিজ্ঞতায় আমি যেন দয়া ক'রে তাকে অনুমতি দিলুম।

'না, বলতে পাববো না।'

'কেন?'

'ভুলে গেছি।'

'এর মধ্যে ভুলে গেলে?'

'এই বকমই তো হয় আমাব। তোমাকে বলবো ব'লে কত কথাই ভাবি, বলতে গিয়ে কিছুই মনে পড়ে না।'

'মনে পড়ে না?'

'না। তোমাকে ভালোবাসি, তাই ও-বকম হয়। কথা ভুলে যাই।'

এ-কথা শুনে আমি কেঁপে উঠলুম। মুখ ফিরিয়ে নিলুম—যাতে ওর দিকে না-তাকাতে হয়—মোড়ে মহিলাদের দেখা গেলো।

বাঁচলুম যেন। এব পব পাখি আরো কী বলতো কে জানে। গুরুজনরা কি বকেছিলেন আগে চ'লে আসার জন্য? মনে পড়ে না! কিছু কথা তাঁরা বলেছিলেন, কিন্তু তাঁদের কোনো কথাই আমি শুনিনি। আমার সমস্ত শ্রবণশক্তিতে পাখির শেষ কথাটি ছাড়া আর-কিছুরই জায়গা তখন ছিলো না।

বাড়ি ফিরে বাকি রাতটুকু আর ঘুমোতে পাবলুম না।

গগনবরণ চুপ করলেন। অন্য তিন জন নিঃসাড়—তাঁরা শুনছিলেন কি শুনছিলেন না, বোঝার উপায় নেই। কনট্র্যাক্টর তাঁর ওভারকোটের গলা কান পর্যন্ত তুলে দিয়েছেন, ডাক্তার কোমর থেকে পা ঢেকেছেন কম্বলে, চোখে ঘুমের ঢুলু ঢুলু ভাব। সাহিত্যিকটি চেয়ারের পিঠে মাথা ঠেকিয়ে মুখ

উঁচু ক'রে আছেন, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট পুড়ে যাচ্ছে, একটু পরে হাতটি যখন ঠোঁটে ঠেকালেন, তখন বোঝা গেলো জেগে আছেন। কিন্তু দিল্লির চাকুরে, শ্রোতাদের দিকে তাকালেন না, সামনের দেয়ালটাকে মন দিয়ে দেখলেন একটু, যেন ওখানে তাঁর গল্পের বাকি অংশ লেখা আছে। অতীতের অদৃশ্য লেখা—যা মানুষ ভুলে গিয়ে ও ভুলতে পারে না—আস্তে তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠলো, মসৃণ ধীর স্বরে আবার বলতে লাগলেন।

আর-এক দিনের কথা মনে পড়েছে। এবারেও দিন না, রাত্রি। সেও জ্যোছনার রাত, কিন্তু শীতের কুয়াশা-মাখা জ্যোছনার বদলে, বৈশাখের পাগলের মতো পূর্ণিমা এবার। তখন কলকাতায় থাকি, এম এস-সি.র বছর আমার। দাদা আগের বছর কলকাতায় এসেছেন, আমি হস্টেল ছেড়ে তাঁর শ্যামবাজারের বাড়িতে আছি। আর সেই বাড়িতেই পাখি এসে উঠেছে একদিনের জন্য—কার্সিয়ঙে তার স্বামীর কাছে যাবার পথে।

খুব ধুমধাম ক'রে পাখির বিয়ে হয়েছিলো। ম্যাথমেটিক্সে মাথা খাটিয়ে ততদিনে আমার নভেলিয়ানা কিছু কমেছে, তবু মনে হ'লো পাখির বিয়েতে আমার কিঞ্চিৎ হার্টব্রেক না-হ'লে মানায় না। ওকে বিশ্বাসঘাতক কল্পনা ক'রেও মনে-মনে গর্জালাম, কিন্তু সত্য বলতে একটুও কষ্ট হ'লো না আমারও, রাগও না, বইয়ের এন্তার বুলি সত্ত্বেও হৃৎপিণ্ড আমার অটুট থাকলো। তাতে আবার একটু নিবাশও হলাম, নিজের বিষয়ে ধারণা যেন নেমে গেলো, এবং—যতদূর জানতে পেরেছি—নতুন চাকরি-পাওয়া ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটকে বিয়ে করার সময় পাখিও একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলেনি।

আপনারা ভাবছেন, দীর্ঘশ্বাসের কী আছে। ছেলেবয়সের ধরাধার্য অঙ্গ এ-সব— বয়স বাড়লে নিজেই সেরে যায়, এ নিয়ে আবার মাথা ঘামায় নাকি কেউ? হ্যাঁ, ছেলেমানুষি নিশ্চয়ই ; পৃথিবীতে ছেলেমানুষ যতদিন আছে, ততদিন ও-বস্তুটাও বাদ যাবে না ; আজ বুড়ো হ'য়ে যে যাই বলি, ওটাও উড়িয়ে দেবার নয়। হ্যাঁ—সত্যি কথাই, বিয়ের কথা কেউ আমরা ভাবিনি, এই আমাদের এখনকার চেনাশোনার বাইরে এর আর ব্যাপ্তি নেই—এ-ই আমরা মনে-মনে ধ'রেই নিয়েছিলুম। কিন্তু তাই ব'লে কি একে সস্তা মাল বলবো, ভেজাল, বাজে? তা-ই যদি হবে, তাহ'লে এত বছর পরে আজ এই অস্থানে অসময়ে পাখিকেই আমার মনে পড়লো কেন?

কলকাতায় তার আত্মীয়বাড়ির অভাব ছিলো না, কিন্তু বেছে-বেছে আমাদের ওখানেই উঠলো। কেন, কখনো আমি নিজের মনেও প্রশ্ন করিনি। বৌদি খুব ভালোবাসতেন ওকে, আমাদের বাড়ির সকলকেই ও ভালোবাসতো—এর বেশি কোনো কারণ, কোনো অন্য, সত্য কারণ যদি-বা থাকে, তাকে মেনে নেবার সাহস আমার ছিলো না।

না, সাহস ছিলো না। পাখি এসে পৌঁছলো বিকেলবেলা, আমি শুধু তাকে চোখেই দেখলুম একবার—'কী, কেমন আছো?' এইটুকুই শুধু কথা হ'লো। তারপর থেকেই সে অন্যদের দখলে, বাড়ির সকলের, বিশেষত মেয়েদের, কেননা যে-মেয়ের নতুন বিয়ে হয়েছে, তার মতো ইন্টারেস্টিং জীব অন্য-সব মেয়েদের কাছে আর নেই, হোক বয়স সাত কিংবা সাতাশি। সন্ধ্যের পরে জ্যোছনার বারান্দায় পাটি পেতে সবাই বসলো, আমি আস্তে বেরিয়ে গেলুম হস্টেলে আড্ডা দিতে। প্রায়ই আড্ডা দিই ; কিন্তু মনে পড়ে সেদিন কত ভালো লেগেছিলো—বন্ধুরা সকলেই যেন প্রাণের বন্ধু, আর তারা সবাই একবাক্যে বললো, আজকের মতো ফূর্তি আমার কখনো তারা দ্যাখেনি। ফূর্তি? জানি না তার কী নাম দেবো! আনন্দ—হ্যাঁ, একরকম বুক-কাঁপানো ভয়-লাগানো অদ্ভুত আনন্দ। কৃপণ যেমন তার রত্ন কখনো ভুলতে পারে না, তার যে নিশ্চিত লুকোনো রত্ন আছে, সে-কথা ভেবেই সুখ পায়, এও তেমনি, কিন্তু তফাৎ এই যে, কৃপণের সর্বদা ভয় পাছে হারায়, আর আমার ভয় পাছে দেখি, দেখা হয়, হাতে পাই। তাই বাড়ি ফেরার পথে সারাক্ষণ আমার বুক দুরদুর করলো, সুখে, আশায়, আশঙ্কায়, আনন্দে।

আশ্চর্য সেই বৈশাখের জ্যোছনা।

খাওয়ার পরে আমি নিজের ঘরে বসলুম। বৌদিরা আবার বারান্দায় জমলেন ; ব'সে-ব'সে তাঁদের গলা শুনছিলুম, হাসি, পাখির নরম গলার হাসি শুনছিলুম। ক্রমে রাত বাড়লো, কথা ক'মে এলো। আমি টেবল-ল্যাম্পের সামনে মস্ত মোটা বই খুলে ব'সে আছি। সত্যি পড়ছি, অন্তত চেষ্টা করছি, পাতাও ওল্টাচ্ছি মাঝে-মাঝে—কিন্তু কী পড়েছিলুম, বইটাই-বা কী, পরের দিন সকালবেলা তার বিন্দুবিসর্গও আমার মনে ছিলো না।

রান্নাঘরের দিকে চাকরদের শব্দ থামলো, বারান্দার আড্ডা ভাঙলো, ব'সে-ব'সে শুনলুম ওদের খশখশ চলাফেরা, ছিটকিনি বন্ধ করার ছোট আওয়াজ। রাস্তার গোলমালও ক'মে এসেছে ততক্ষণে ; রাত নিঝুম, কিন্তু আমি বই খুলে চুপ ক'রে ব'সেই আছি।

হঠাৎ এক সময় দেখি পাখি, আমার টেবিলের ধারে দাঁড়িয়েছে। যে-মুহূর্তে তাকে চোখে দেখলুম, সে-মুহূর্তে বুঝলুম যে, এরই জন্য আমার এতক্ষণ ব'সে থাকা। হ্যাঁ—লুকোবার চেষ্টা ক'রে লাভ নেই—এরই জন্য। মনে হ'লো আমি আমার অসম্ভব ইচ্ছা দিয়ে তাকে এখানে ডেকে এনেছি, না-এসে তার উপায় নেই, না-এসে সে পারেই না। তাই আমি অবাক হলুম না, কোনো কথা বললুম না, চুপ ক'রে শুধু তাকিয়ে থাকলুম।

সেদিন তাকে কেমন দেখেছিলুম? সেই চোদ্দ বছরের ছিপছিপে মেয়ে, আর এই উজ্জ্বল বিবাহিতা তরুণী—এ-দুয়ের কোনো তুলনা হয় নাকি? আজ তার পরনে নীল রেশমের শাড়ি, কত রকম গয়না—ঐ গয়না জিনিশটা দু-চক্ষে দেখতে পারি না কোনোদিন, কিন্তু সেদিন—সেদিন যেন মনে হয়েছিলো, মন্দ না—অন্তত কোনো-কোনো মানুষকে কখনো-কখনো মানিয়ে যায়।

প্রথম কথা বললো পাখি। সেই কথাটা স্পষ্ট আমার মনে আছে।

'আমি একজন ভদ্রমহিলা। আমাকে দেখে তোমার উঠে দাঁড়ানো উচিত।'

আমি বাধ্যভাবে উঠে দাঁড়ালুম।

'এত রাত জেগে বই পড়ছো?'

উত্তরে আমি পাতা-খোলা মোটা বইটার দিকে একবার তাকালুম শুধু।

'শুধু কি বই পড়ার জন্যই জেগে ছিলে?'

এবার অপরাধীর মতো মাথা আমার নিচু হ'লো। একটু কাটলো চুপচাপ। পাশের ঘরের দেয়াল-ঘড়ির টিকটিক শুনলুম ; আর একটা শব্দ, বোধহয় আমারই বুকের ভিতরে আওয়াজ দিচ্ছিলো—ভারি অদ্ভুত সেটা।

পাখি আবার বললো, 'বিলেত যাচ্ছো শিগগিরিই?'

'কথা তো হচ্ছে।'

'কতদিন থাকবে।'

'অন্তত দু-বছর—বেশীও হ'তে পারে।'

'কবে বওনা হবে?'

'সেপ্টেম্বরে।'

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এইটুকু শুধু কথাবার্তা হ'লো আমাদের, তারপর আবার চুপচাপ। অনেকবার আমার ইচ্ছা হ'লো তার দিকে তাকাই, মুখোমুখি, সোজাসুজি ভালো ক'রে তাকে দেখি—কিন্তু জানি না কিসের লজ্জা আমাকে বাধা দিলো ; আমি মুখ ফিরিয়ে থাকলুম, শুধু মনে-মনে জানলুম, সমস্ত মন দিয়ে জানলুম যে, সে এখানেই আছে—আমার কাছে, এত কাছে, কিন্তু একটু পরেই আর থাকবে না।

হঠাৎ পাখি ঘুরে এসে আমার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। 'শোনো'—

আমি মুখ তুলে তার দিকে তাকালুম। তার মুখ গম্ভীর, প্রায় কঠোর। তার গলার তলায় ছোটো গর্তটিতে নিশ্বাসের ওঠাপড়া আমার চোখে পড়লো, চারদিক এমন চুপচাপ, আর সে আমার এত

কাছে দাঁড়িয়েছে যে, সেই নিশ্বাসের শব্দ আমি প্রায় শুনতে পেলুম।

'জীবনে বড়ো হ'তে হবে তোমাকে,' হঠাৎ পাখির গলা শুনলুম। 'আর রাত জেগে শরীর নষ্ট কোরো না। শুয়ে পড়ো, আমি যাই।'

আমি বোধহয় কিছু বলতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু কোনো কথাই গলা দিয়ে বেরোলো না।

'তোমার আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যাই।'

আমি দেখলুম তার একটি হাত আমার টেবল-ল্যাম্প ছুঁলো, আর মুহূর্তে যেন অন্য এক জগতে বদলি হলুম। নীলচে জ্যোছনা জেগে উঠলো ঘরে, ঘর আর ঘর থাকলো না, তার শাড়ি নীল প্রায় কালো দেখালো, আর হঠাৎ সে একটু নড়তেই তার চোখ দুটি চাঁদের আলোয় চিকচিক ক'রে উঠলো, আর ঠোঁট যেন জ্যোছনার তুলিতে আঁকা হ'য়ে থাকলো। এক মুহূর্ত তাকে দেখলুম, ও-রকম, আর তারপর তার লম্বা, নরম, প্রবল, কঠিন বাহু দুটি আমাকে জড়িয়ে ধরলো, আমাকে শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধ'রে ঠোঁটের উপর বার-বার সে চুমু খেলো, আমার চোখ অন্ধ হ'লো, নিশ্বাস বন্ধ হ'লো, মনে হ'লো মৃত্যুর পূর্বস্বাদ ভোগ করছি।

তারপর স'রে গিয়ে বললো, 'এর বেশি তোমাকে আমি দিতে পারি না।'

ব'লে চ'লে গেলো। সে-রাত্রেও আমি আর ঘুমোতে পারলুম না।

গগনবরণ আবার থামলেন। পেয়ালায় কফি ঢালতে গিয়ে নিরাশ হলেন—আর নেই, যতটা ছিলো অনেক আগেই শেষ হয়েছে। একটি সিগারেট নিয়ে ধরালেন—বোধহয় সিগারেটের খুব তেষ্টা পেয়েছিলো—বুক ভ'রে নিশ্বাস নিয়ে আস্তে-আস্তে বের করতে লাগলেন মুখ দিয়ে।

সাহিত্যিক ন'ড়ে উঠে বললেন, 'তারপর?'

দিল্লিওলা একটু যেন চমকালেন অন্য কারো আওয়াজ শুনে, যেন অপ্রস্তুত হলেন। কী দুর্মতি তাঁর হয়েছিলো, এই গল্প ফেঁদে বসার! যাকগে—কী-বা এসে যায়—এঁদের কারো সঙ্গে আর তো দেখা হবে না জীবনে। মনে মনে চেষ্টা করলেন তাঁর বর্তমান বাস্তব-জীবনে ফিরে যেতে ; দিল্লি চাকরি, তাঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, এ-সব কথা মনে আনলেন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ও-সব তেমন জরুরি ব'লে বোধ হ'লো না—এতক্ষণ যা বলছিলেন, তারই প্রতিধ্বনিতে মন যেন ড'বে আছে।

সিগারেটটি বাঁ হাতে ধ'রে আবার তিনি আরম্ভ করলেন :

তারপর আমি বিলেত গেলুম, ফিরে এলুম, চাকরি, বিয়ে, ছেলেপুলে, সংসার, চাকরিতে ধাপে-ধাপে উন্নতি, অজান্তে বয়স বেড়ে চলা—হ্যাঁ, যতই যত্ন নাও শরীরের, ভালো থাকো, ভালো খাও, কথায়-কথায় ডাক্তারের কাছে, ডেনটিস্টের কাছে ছোটো, সময় হ'লে বুড়ো হ'তেই হয়, কারো নিষ্কৃতি নেই। আমারও চুল পেকেছে, যদিও হঠাৎ চোখে পড়ে না, কিন্তু কতদিন আর লুকোনো থাকবে—এবং আমি লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করি যে, শুভ্রকেশে আমি কিছুমাত্র গৌরবের বিষয় দেখতে পাই না—তার আগেই যারা ধরাধাম থেকে বিদায় নেয়, তাদেরই বরং ভাগ্যবান মনে হয় আমার।

অর্থাৎ, সংসারের হাজার-হাজার মানুষের জীবন যেমন বাঁধা-ধরা মামুলিভাবে চলে, আমারও তা-ই চলছিলো। পাখির সঙ্গে আর দেখা না-হ'লে ক্ষতি ছিলো না, না-হ'লেই এই গল্পের দিক থেকে মানাতো ভালো ;—কিন্তু ঐ রোমান্টিক অধ্যায়টিকে কিছুমাত্র সম্মান না-ক'রে ছেড়ে-ছেড়ে অনেক বছর পর-পর আবারও কয়েকবার দেখা হ'লো। নিতান্তই সাধারণ, সংক্ষিপ্ত সে-সব দেখাশোনা। ক্রমশই সে মোটা হচ্ছে, বড্ড পান খায়, খুব হাসিখুশি, খুব সুখে আছে, ছেলেমেয়ে ইত্যাদি নিয়ে সংসারে মসগুল একেবারে। একবার তার মেয়েকেও দেখলুম—বড়ো হচ্ছে—হঠাৎ মনে হ'লো মেয়েটি যেন তার মা, সেই অনেক, অনেকদিন আগে ছেলেবেলায় সে যেমন ছিলো।

সেই মেয়ের বিয়েতেই শেষ তাকে দেখেছিলুম—বছর-তিনেক আগে। কলকাতার মধু রায়ের গলিতে বিয়ে। আমাকে দিল্লিতে ছাপানো চিঠি পাঠিয়েছিলো—সঙ্গে আমার স্ত্রীকে দু-লাইন, 'ভাই, তোমরা কোনোরকমে আসতে পারলে কতই-না সুখী হতাম!' আমার স্ত্রীর সঙ্গেও তার দেখা হয়েছে

দু-একবার—তিনি কনভেন্টে-পড়া মেয়ে, পাখিকে গ্রাম্য লেগেছিলো, কিন্তু পাখি আমাকে ওরই মধ্যে এক ফাঁকে বলেছিলো, 'ওঃ, তোমার স্ত্রীভাগ্য খুব!'

ঠিক সেই সময়টায় একবার সরকারি কাজে কলকাতায় আসতে হ'লো আমাকে। ঐ বিয়ের নেমন্তন্নে যাবো কি যাবো না ভাবতে-ভাবতে শেষপর্যন্ত গেলুম। কলকাতা অনেকদিন ধ'রে বিদেশ হ'য়ে গেছে আমার কাছে, দু-একদিনের জন্য আসি, হোটেলে থাকি, সিনেমা দেখে সন্ধ্যা কাটাই, সরকারি লোকজন ছাড়া কারো সঙ্গেই দেখা হয় না। এবার অন্য কিছু আছে, রাইটার্স-বিল্ডিঙের বাইরে যাবার জায়গাও আছে কোথাও—ভাবতে নেহাৎ মন্দ লাগলো না। তারিখটা মনে ছিলো—ভাবলুম বিয়েবাড়ির ভিড় জ'মে ওঠার আগে সন্ধ্যেবেলা সেরে আসি। সঙ্গে ধুতি নেই—ধুতির পাটই আমার নেই আজকাল, অগত্যা বেমানান বিলিতি বেশেই রওনা হলুম।

ভবানীপুরে মধু রায়ের গলি বের করতে বেশ সময় লাগলো। কলকাতা কত বদলেছে আর পথঘাটও যেন ভুলে গেছি। উপহারস্বরূপ একটি বেনারসি শাড়ি হাতে ক'রে বিয়েবাড়ির দরজায় পৌঁছলুম সন্ধ্যে পেরিয়ে। আলো, শামিয়ানা, শানাই, অতিশয় সাজগোজ-করা ছেলেমেয়ে, ভিতর থেকে লুচিভাজার ক্ষীণ গন্ধ—এই খাঁটি স্বদেশী আবহাওয়ার সামনে কতকাল পরে দাঁড়ালুম। একটু বাধো-বাধো লাগলো, যেন আমি এখানে মানাই না, কিন্তু ঠিক তখনই আমার সম্পূর্ণ অচেনা একটি যুবক 'আসুন আসুন' ব'লে আমাকে আহ্বান করলো।

আমি বললুম, আমার নাম অমুক, দিল্লি থেকে এসেছি, ভিতর থেকে একবার কাউকে—

একটু পরে বছর-পনেরোর একটি ছেলে এসে আমাকে উপরে নিয়ে গেলো। আন্দাজে বুঝলুম, পাখির ছেলে।

আমাকে দেখে পাখি উচিতমতো অবাক হ'লো, এবং প্রায় অনুচিতরকম খুশি হ'লো। দু-একটা কথার পর আমি বললুম, 'আমি কিন্তু বেশিক্ষণ থাকবো না।'

'আচ্ছা আচ্ছা, বেশি দেরি করিয়ে দেবো না।'

একটা কোণের ঘরে একলা আমাকে বসিয়ে রেখে পাখি উধাও হ'লো। কিন্তু বেশিক্ষণ একা থাকলুম না আমি, আমার কোনো-এককালের চেনাশোনা গুরুজন-স্থানীয় যাঁরা, একে একে তাঁরা এসে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, দাঁত প'ড়ে গেছে, মাথায় চুল নেই, চোখের দৃষ্টি কারো-কারো ঘোলাটে। যেন এক জন্মান্তর পেরিয়ে এঁদের দেখলুম। আস্তে-আস্তে আমার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করলেন এঁরা—ভাবটা একটু লজ্জার মতো, কিন্তু এতকাল পরে আমাকে দেখে এঁদের ভালো লাগছে তা স্পষ্ট বুঝলুম। আমারও ভালো লাগলো। এঁরা আমাকে ছোটো দেখেছিলেন, ছেলেমানুষ দেখেছিলেন—এ-রকম মানুষ আর কতকাল থাকবে এই পৃথিবীতে, এর পর শুধু তাদেরই পালা, যাদের কাছে আমি বয়স্ক, বুড়ো, বড়ো-জোর সমবয়সী। এই পারিবারিক মহলে আমি যেন খানিকক্ষণ বছরের ভার ভুলে থাকলুম ; অবাক হলুম এইটে দেখে যে, এঁদের সঙ্গে আলাপ করা আমার পক্ষে কঠিন হ'লো না। 'উনি কোথায়?' 'সে কেমন আছে?' 'অমুকের খবর কী?' এই সব হ'তে-হ'তে আরো কথা মনে পড়লো, পুরোনো কথা, দু-একটা হাসির কথা—কখনো ভাবিইনি এত কথা এখনো মনে আছে।

বেশ খানিকক্ষণ পরে পাখি আবার দেখা দিলো। হাতে প্রকাণ্ড থালা, মালার মতো বাটি সাজানো। আরে সর্বনাশ! 'না, না, কিছু শুনবো না, খেতেই হবে।' বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও যোগ দিলেন তাতে, আমি প্রায় নববধূর মতো অধোবদনে একটু-একটু ক'রে খেতে লাগলুম, শেষ পর্যন্ত অনেকটাই খেয়ে ফেললুম।

যা ভেবেছিলুম তার চেয়ে অনেকটা বেশিক্ষণ থাকা হ'য়ে গেলো। যার বিয়ে তাকে দেখলুম, নিজের কেনা শাড়ির সুখ্যাতি শুনলুম, চারদিক থেকে কত সব ছেলেমেয়ে এসে জুতো ছুঁয়ে টিপটিপ পেন্নাম ঠুকলো। শেষটায় মনে হ'লো যে, যতটা আত্মীয়তার আবহাওয়া এই দু-ঘণ্টায় এখানে ভোগ করা গেলো, তাতে আমার বাকি জীবন অনায়াসে কুলিয়ে যাবে।

এর পর যখন বর আসার সময় হ'লো, সারা বাড়ি চঞ্চল, নতুন ক'রে শানাই বেজে উঠলো, আমি তখন বিদায় নিলুম। পাখি আমাকে এগিয়ে দিতে দরজা পর্যন্ত এলো, পিছন-পিছন আরো দু-একজন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এইরকম কিছু কথাবার্তা বোধহয় হ'লো।

'যাক, তবু আবার দেখা হ'লো তোমার সঙ্গে।'

'হ্যাঁ। বিয়ের আসরে থাকতে পারলুম না, কিছু মনে কোরো না।'

'কালই ফিরে যাচ্ছো?'

'কালই।'

'এটা নাও,' ব'লে পাখি আমার হাতে একটা বিস্কুটের টিন দিলো।

'কী? বেশ ভারি মনে হচ্ছে।'

'তোমার বৌ, ছেলেপুলের জন্য কিছু, মিষ্টি। নিয়ে যেয়ো কিন্তু।'

'বাঃ! নেবো না! বাংলার মিষ্টি ভারতবিখ্যাত। জগতে এর জুড়ি নেই। ওরা খুব খুশি হবে।'

'সকলকে নিয়ে একবার বেড়িয়ে যাও না কলকাতায়।'

'হ্যাঁ—দেখি—যা চাকরি—আচ্ছা, চলি—'

আমি পিছন ফিরতেই মন্তব্য শুনলুম—বোধহয় ঠানদি-স্থানীয়া কোনো-একজনের—'আরে, তোমার চুল পেকেছে দেখছি!'

আমি ঠাট্টার সুরে লাগসইরকম কিছু বলতে যাচ্ছি, এমন সময় পাখি আস্তে আমার ঘাড় ছুঁয়ে বললো, 'হ্যাঁ—আমাদের গগনবরণ—তারও চুল পাকলো!'

কথাটা কিছুই না, ঘটনাটা কিছুই না, কিন্তু ঐ কথাটা যেমন ক'রে সে বলেছিলো তা কি আমি কখনো ভুলবো! না। ঐ কথায়, আর তার হাতের একটুখানি ছোঁওয়ার সেদিন আমি স্পষ্ট বুঝেছিলুম যে, পাখি আমাকে এখনো ভালোবাসে—ভালোবাসা কাকে বলে তাও বোধহয় মুহূর্তের জন্য তখনই শুধু বুঝেছিলুম।

রাস্তায় এসে শানাইয়ের সুরে মনটা ভারি খারাপ হ'য়ে গেলো।

'বেশ গল্প! বে—শ!' ফোঁস ক'রে অনেকখানি নিশ্বাস ছেড়ে কনট্র্যাক্টর তারিফ করলেন।

সাহিত্যিক বললেন, 'কিন্তু উপদেশটা স্পষ্ট। যাকে হারালে তাকেই পেলে এই আর কি কথাটা! ভালোবাসা আছে দূরে, অন্য কোথাও, হয়তো সেটা শুধু ইচ্ছা, কল্পনা—বাস্তবে আদৌ নেই। এই মতটা পুরাকাল থেকে অনেকেই প্রচার করেছেন—আমি একদম মানি না।'

'আমি দেখুন কোনো মতামত জানি না', দিল্লীওলা বললেন, 'এ-সব বিষয়ে ভাবিও না কোনোদিন। খেয়ে-প'রে আরামে থাকবো—এর বেশি আমার কোনো মত নেই।'

'সে-বিষয়ে আমরা সকলেই একমত,' কনট্র্যাক্টর হাসলেন।

'কিন্তু আপনারা দু-জনেই দুঃখের গল্প বললেন,' একটু হেসে টিপ্পনি কাটলেন ডাক্তার। 'এবার একটা মজার গল্প শুনুন।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

'আমার বিয়ের গল্প। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ ক'রে নেহাৎই যাদের অকালমৃত্যু না হয় তাদের—ঠিক সকলেরই না হোক্, অধিকাংশেরই কোনো-না-কোনো সময় কারো-না-কারো সঙ্গে বিয়ে হয়ই ; ঘটনাটায় অসাধারণ কিছু নেই। তবু—আমার বিয়েতে একটু মজাই হয়েছিলো—গল্পটা নেহাৎ মন্দ নয়।'

'ভণিতা থাক। বলুন।'

ডাক্তার আরম্ভ করলেন :

অবনী ডাক্তারের বিয়ে

মাত্র বছরখানেক যখন প্র্যাকটিসে বসেছি তখনই আমার বিয়ে হ'লো। এত শিগগির বিয়ের কথা ভাবিনি। ধরমতলায় চেম্বর নিয়েছি, টেলিফোন আছে, ছোটো একখানা গাড়িও আছে, কিন্তু প্র্যাকটিস তখনো কিছুই না। মনে-মনে হিশেব ক'রে দেখেছি যে, বাবা তাঁর একমাত্র পুত্রের জন্য যা রেখে গেছেন তাতে বছর-পাঁচেক চালাতে পারবো—আর ততদিনে যদি প্র্যাকটিস জমাতে না পারি তবে ধিক্ আমার জীবনে।

ভেবে রেখেছিলুম যে, মাসে অন্তত হাজারখানেক নিজস্ব রোজগার যতদিন না হয় ততদিন বিয়ের কথা ভাববোই না। যারা সব ষাট টাকার একটি চাকরি হবার সঙ্গে সঙ্গেই টোপর প'রে বর সাজে, তাদের দেখে আমার বুক কাঁপে। বিয়ে তো হ'লো—তারপর ছেলেপুলে, অসুখবিসুখ, স্ত্রীর মরজি, নিজের ইচ্ছে—এ-সব? আর এ-সব যদি মেটে তাহ'লে ওতে কেবলই খিটিমিটি, বুক-জ্বলুনি, টানাহেঁচড়া। আমি ওর মধ্যে নেই। এইরকম ভেবেছিলুম, কিন্তু হ'য়ে পড়লো অন্যরকম।

আমার পাশ ক'রে বেরোবার বছর মা-ও স্বগর্তা হয়েছিলেন, সংসারে কোনোই টান ছিলো না আমার। অবিবাহিত যুবক ডাক্তাররা সাধারণতঃ একটু উচ্ছৃঙ্খল হয়, আমার মতো নিরঙ্কুশ অবস্থায় উচ্ছন্নে যাবার কোনো বাধা ছিলো না। কিন্তু আমি নিজেকে সামলে নিয়েছিলুম কোনো অসামান্য চরিত্রবলে নয়, বড়ো ডাক্তার হবার অদম্য উচ্চাশায়। রাত্তিরে খাওয়ার পর বারোটা-একটা অবধি পড়াশুনো করি, ডাক্তারি বই প'ড়ে ক্লান্ত হ'য়ে বিছানায় যাই একটি নভেল নিয়ে, আবার ঘুম ভেঙে বিছানা ছাড়বার আগে শুয়ে-শুয়ে খানিকক্ষণ নভেলটি পড়ি। এই অভ্যেসটি তখনো আমার ছিলো, কিন্তু বেশিদিন আর থাকলো না।

এখন সে-কথা ভাবলে আমার হাসি পায়, কিন্তু বিয়ের দিন সকাল থেকে আমার বুকের ভিতরে ধুকপুক করেছে। বীণাকে কতদিন ধ'রে কত বিভিন্ন অবস্থায় দেখেছি, প্রথমে সজনে ও পরে বিজনে কত গল্প করেছি তার সঙ্গে, কিন্তু যখনই ভেবেছি ও আমার স্ত্রী হবে, আমার বাড়িতে থাকবে, আমারই বিছানায় শোবে, আমার জীবনের উপর কর্তৃত্ব আমার চেয়েও বেশি হবে ওর—আর এ-রকম চলবে দু-চার মাস না, দু-চার বছরও না, সমস্ত জীবন— এ-কথা যখনই ভেবেছি তখনই কুঁজোর ধারে গিয়ে এক ঢোঁক জল খেয়েছি, নয়তো খানিক পায়চারি করেছি ঘরের মধ্যেই।

হ্যাঁ, সেদিন বড্ড নার্ভাস লেগেছিলো আমার। কিন্তু শেষের কথা আগে বলা হ'য়ে যাচ্ছে। প্রথম থেকে বলা যাক।

বীণাকে প্রথম যেদিন দেখেছিলুম সে-কথা মনে পড়ছে। একদিন সকালবেলা সেজেগুজে রোগীহীন চেম্বারে ব'সে আছি, হঠাৎ রমেনের টেলিফোন পেলুম। 'ওহে, এক্ষুনি একবার আসতে পারো?'

'কী ব্যাপার?'

'একটি মেয়ের পা কেটে গিয়ে ফুলে উঠেছে—বড়ো কষ্ট পাচ্ছে—'

আমি হেসে বললুম, 'তার জন্য ডাক্তারকে সশরীরে আসতে হবে? বোরিক কমপ্রেস দাও—সেরে যাবে।'

'না না, হয়েছে কী—মেয়েটির খুব শিগগির সেরে ওঠা চাই, নয়তো আমাদের রিহার্সেল এগোতে পারছে না।

'রিহার্সেল? কিসের?'

'বাঃ, জানো না—"নব নীড়" নাটকের অভিনয় হচ্ছে।'

'নব নীড়' নামে একটা উপন্যাস কয়েকদিন আগেই পড়েছিলুম, তখনকার নামজাদা শৈলেশ দত্তর বই। তা-ই থেকে নাটক হচ্ছে? জিগেস ক'রে জানতে পারলুম যে তা-ই। শৈলেশবাবুই উপন্যাস থেকে নাটক করেছেন, অভিনয়ও তিনিই করাচ্ছেন—যে-মেয়েটির অসুখ সে তাঁরই শ্যালিকা। তার পার্টটাই আসল, অথচ বেচারা পায়ের ব্যথায় ভালো ক'রে দাঁড়াতেও পারছে না। তাই আমি যেন

চটপট আসি, এবং চটপট অসুখ সারিয়ে দিই। শৈলেশ দত্তর বাড়িতেই—রমেন লেক রোডের একটা ঠিকানা দিলো—তখন কলকাতার লেক নতুন, লেক রোড সবেমাত্র খুলেছে।

আমি রমেনকে জিগেস করলুম, 'তুমি ওখানে কী করছো?'

'আমিও আছি তাঁদের সঙ্গে।'

'সাহিত্যিকদের সঙ্গে আবার হবনব করছো কবে থেকে?'

'সব রকম লোকের সঙ্গেই আলাপ রাখতে হয়..এসো কিন্তু', ব'লে রমেন টেলিফোন ছেড়ে দিলো।

রমেন আমার খুব বন্ধু ছিলো তখন। অদ্ভুত লোক সে। মেডিকেল কলেজের প্রথম দু-বছরেই সে বুঝতে পেরেছিলো যে, ডাক্তারি পরীক্ষা পাশ করা তাকে দিয়ে হবে না। ছেড়ে দিয়ে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে চশমার দোকান খুললো। সে-দোকান উঠে এলো চৌরঙ্গিতে, বিলেতি ডিগ্রিওলা চোখের ডাক্তার বসেন সেখানে, কাউন্টারে দাঁড়াবার জন্য একটি ফিরিঙ্গি মেয়েও রাখলো। তার ব্যবসা এতটা ফেঁপে উঠবে আমরা কেউ ভাবিনি, একটু অবাকই হয়েছিলুম। পার্থিব মূলধন তার বিশেষ ছিলো না, কিন্তু একটি দৈব মূলধন ছিলো—সে তার চেহারা। অমন সুন্দর চেহারা বাঙালির মধ্যে কমই হয়। ছ'ফুট লম্বা, ফুটবলের সেণ্টারফরওয়ার্ডের মতো লিকলিকে শরীর, হলদে-লালে মেশা গায়ের রং, ঘন কোঁকড়া কুচকুচে চুল। ঐ চেহারার জোরেই—আমার মনে হয়—জীবনে তার উন্নতি। অবশ্য মাঝে-মাঝে ছোটোখাটো বিপদেও পড়ে—ঐ চেহারারই জন্য। একবার এক ফিরিঙ্গি মেয়ে তার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলো —মেয়েটা এমন নির্লজ্জ যে, তাকে বিয়ে না ক'রে ছাড়লোই না। আমরা বন্ধুরা দু-হাতে ঠেকাতে চাইলাম, কিন্তু রমেন শিষ দিতে-দিতে চ'লে গেলো রেজিষ্ট্রারের আপিশে। এক বছরের মধ্যেই বিয়ে গেলো ভেস্তে—কিন্তু তাতেও রমেনের বিকার নেই, আগের মতোই মহা উৎসাহে সে দোকান চালাচ্ছে, এবং অবিলম্বে আর-একটি ফিরিঙ্গি মেয়েকে এনে কাউণ্টারে দাঁড় করিয়েছে।

লেক রোডের ঠিকানায় এসে দেখি, রমেন আমার জন্য ফুটপাতে পায়চারি করছে। গাড়ি থেকে নেমে বললুম, 'যাক, তবু দেখা হ'লো তোমার সঙ্গে। আজকাল তো পাত্তাই নেই তোমার।'

রমেন সলজ্জ হেসে বললো, 'যা ব্যস্ত থাকি। চলো উপরে।'

শৈলেশবাবু আর তাঁর স্ত্রী গায়ত্রী দেবী দু-জনেই আমাকে সহাস্যে অভ্যর্থনা করলেন। এর আগে শৈলেশবাবুর বই প'ড়ে খুশি হয়েছিলুম, আলাপ হ'য়ে আরো খুশি হলুম। মনে হ'লো চমৎকার মানুষ—দু-জনেই। অভিবাদন ইত্যাদির পরে বললুম, 'পেশেন্ট কোথায়?'

'আসুন এ-ঘরে,' ব'লে গায়ত্রী দেবী আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন।

সেখানে যে মেয়েটি শুয়ে ছিলো, আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, তার সঙ্গেই পরে আমার বিয়ে হ'লো। আমাদের দেখে ত্রস্ত হ'য়ে উঠে বসলো সে। তাকে দেখে আমি অবাক হলুম—সামান্য পায়ের ব্যথায় কোনো মানুষের চেহারা কি এত খারাপ হ'তে পারে? মুখ ফ্যাকাশে, জ্বরের রোগীর মতো শুকনো ঠোঁট, চোখ লাল, মাথার চুল মুখে চোখে ছড়ানো। এক পলক তাকিয়েই আমার মনে হ'লো অসুখটা বেশ শক্ত-রকম কিছু।

অথচ খুব ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রেও তেমন কিছু পেলুম না। আমি যতক্ষণ নিচু হ'য়ে পা পরীক্ষা করছিলুম, রোগিণী দু-হাঁটুর ফাঁকে থুতনি চেপে চুপ ক'রে ছিলো ; সোজা হ'য়ে জিগেস করলুম, 'ব্যথা কি খুব?'

মেয়েটি কোনো জবাব দিলো না।

আবার জিগেস করলুম, 'খুব বেশি ব্যথা?'

আমার পাশ থেকে রমেন বললো, 'বলো, বীণা, কথার জবাব দাও।'

মেয়েটি কারো দিকে না-তাকিয়ে আস্তে বললো, 'হ্যাঁ, খুব।'

মামুলি একটা প্রেস্‌ক্রিপশন লিখে বাইরে এসে বললুম, 'কিছুই তো হয়নি, অথচ বড্ড যেন কাহিল হ'য়ে পড়েছে।'

শৈলেশবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, খুবই কাহিল।'

অভয় দেবার সুরে বললুম, 'ভাবনার কিছু নেই—শিগগিরিই সেরে যাবে।'

রমেন বললো, 'অল্প থেকেই অনেক সময় বিভ্রাট দাঁড়ায় কিনা, তাই তোমাকে ডাকলুম। নাটকটা না পণ্ড হয়।'

'না, না, সে-ভয় নেই। সেরে যাবে।'

আমি ডাক্তার ব'লেই হোক বা যে-কোনো কারণেই হোক, শৈলেশবাবু আর গায়ত্রী দেবী দু-জনেই আমাকে একটু সুনজরে দেখেছেন মনে হ'লো। রিহার্সেলে আসবার নিমন্ত্রণ জানালেন। সপ্তাহে তিন দিন ক'রে রিহার্সেল হয় তাঁদের বাড়িতেই। কালই আছে, যদি আমার সময় হয়—

'খুব চেষ্টা করবো,' ব'লে আমি তখনকার মতো বিদায় নিলুম। রমেন আমার সঙ্গে-সঙ্গে নেমে এসে বললো, 'এসো না রিহার্সেলে—ভালোই লাগবে।'

সন্ধেবেলাটা আমি আড্ডা দিয়েই কাটাই। যাদের সঙ্গে দিই তারা সকলেই ডাক্তার। ডাক্তারের ডাক্তার ছাড়া বন্ধু হয় না—বাইরের লোকের সঙ্গে বন্ধুতা করতে চায় না তারা, পাছে বিনি পয়সার রোগীর সংখ্যা বেড়ে যায়। ডাক্তারি গল্প, ডাক্তারি রসিকতা কিছুদিন পরে একঘেয়ে হ'য়ে আসে, আর সেই একঘেয়েমির প্রতিষেধকরূপে ছোকরা ডাক্তারা যে-সব উত্তেজনার আয়োজন করে, আগেই বলেছি তাতে আমি কখনো যোগ দিতুম না। রিহার্সেলে যাবার নিমন্ত্রণ তাই উড়িয়ে দিতে পারলুম না। ওখানকার আড্ডা নিশ্চয়ই অন্য রকম—আমার পক্ষে নতুন রকমই হবে। পরের দিন সন্ধেবেলা ধরমতলার গোলমালের মধ্যে ব'সে-ব'সে ভাবছি ওখানে যাবো কিনা, এমন সময় রমেন দ্রুত ঘরে ঢুকে বললে, 'চলো।'

'কোথায়?'

'বাঃ, রিহার্সেলে যাবে না?'

'তুমি যাচ্ছো?'

'আমি তো রোজই যাই।'

'আমি—সত্যি যাবো?'

'সত্যি যাবো মানে? আরে, চলো-চলো. খুব খুশি হবেন ওঁরা।'

ভদ্রজনোচিত ধুতি-পাঞ্জাবি প'রে রমেনের পাশে তার ক্রীম রঙের মরিস গাড়িতে উঠে বসলুম, খানিক পরেই শৈলেশবাবুর ড্রয়িংরুমে ঢুকলুম। রমেনের উদ্দেশে যে অভ্যর্থনা নানা কণ্ঠের কনসার্টে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠছিলো, আমাকে দেখে তা একটু সংযত হ'লো। অনেকেই আমার দিকে একটু তাকালেন : ভাবখানা—ইনি আবার কে? ইনট্রোডাকশনের ভার নিলেন শৈলেশবাবু ; প্রথমে তিনি আমার নাম বললেন, তারপর একে-একে অন্য-সকলের নাম—মেহনৎ বড়ো কম না, কারণ ঘরের মধ্যে অন্তত কুড়িজন লোক ছোটো-ছোটো দলে বিভক্ত হ'যে জটলা করছিলো, তাদের কারো-কারো মনোযোগ আকর্ষণ করাই বেশ শক্ত কাজ।

আমার অনুমান ভুল হয়নি—এ-আড্ডার স্বাদ একেবারেই আলাদা, তখন পর্যন্ত আমার জীবনে এমন-কোনো অভিজ্ঞতা হয়নি এর সঙ্গে যার তুলনা করতে পারি। উজ্জ্বল আলো-জ্বলা ঘরে এতগুলি সুশ্রী সুবেশ তরুণতরুণীর মেলা আমার জীবনে কবে আর দেখেছিলুম! তাদের হাসি, দৃষ্টি, কথাবার্তা, চলাফেরা, একটুখানি হাত নাড়া পর্যন্ত জানিয়ে দিচ্ছে যে, তারা এক উজ্জ্বল জগতের অধিবাসী, মেডিকেল কলেজের সীমানার মধ্যে যার অস্তিত্বও কেউ সন্দেহ করে না। সেদিন আমার তা-ই মনে হয়েছিলো, যদিও পরে মিশতে-মিশতে বুঝেছিলুম যে, এরা অনেকেই আমাদের মতোই সাধারণ, শুধু উপরের পালিশটা একটু বেশি চিকচিকে।

ঘরে ঢোকার মিনিটখানেকের মধ্যেই রমেনের সঙ্গ আমি হারালুম। চারদিক থেকে সবাই তাকে ডাকছে : কখনো এ-দলে, কখনো ও-দলে, কখনো ব'সে, কখনো দাঁড়িয়ে, কখনো আধো শুয়ে—সে চোখে হাসছে, মুখে হাসছে, চোখেমুখে কথা কইছে। রমেনের স্বভাবটা খুব তরল, তার কোথাও

আড় নেই ; সে যা-ই করে তা-ই যেন তার চেহারাব জন্যই তাকে মানিয়ে যায়। বরাবরই দেখেছি সে যেখানে যায় সেখানেই সকলের প্রিয়পাত্র হয়—এখানেও সে সমস্তটা জুড়ে আছে দেখলুম। তার সঙ্গে দুটো-একটা গোপনীয় কথা আছে সকলেরই, —স্বয়ং গায়ত্রী দেবী জানলাব ধারে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে প্রায় দশ মিনিট ধ'রে নিচুগলায় আলাপ কবলেন।

শৈলেশবাবু অনেকক্ষণ ধ'রেই বিহার্সেল আরম্ভের চেষ্টা কবছিলেন, কিন্তু এদের গল্পই ফুবোয না। ইতিমধ্যে চা এলো, চায়ের সঙ্গে কড়াইশুটি-ছিটোনো চিঁড়ে-ভাজা। একবারে সকলের হ'লো না, আমি অতিথি ব'লে প্রথম বারেই পেলুম ; দ্বিতীয় প্রস্থ হ'তে-হ'তে আটটা বাজলো। তখন শৈলেশবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এবার আবম্ভ হোক। অনুপম আব ললিতাব দৃশ্যটা অনেকদিন হয়নি, সেটা আজ প্রথম হবে। অনুপম! ললিতা!'

রমেন উঠে দাঁড়িয়ে মুখ-চোখেব চেহাবা গম্ভীব ক'বে ফেললো।

'ললিতা! বীণা, চ'লে এসো!'

আমাদের কালকের রোগিণী—এতক্ষণ দেয়ালে ঠেশ দিয়ে চুপ ক'বে এক কোণে ব'সে ছিলো। আমি লক্ষ্য করেছিলুম, এত লোকের মধ্যে থেকেও একটি কথা সে বলেনি, চোখ তুলেও তাকায়নি কারো দিকে। একখানা বই কোলে নিয়ে বইয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলো, অথচ সে যে পড়ছে না তার মুখ দেখেই তা বোঝা যায়। সে-মুখ কালকের মতোই ফ্যাকাশে। সন্ধেবেলায় সে চুল বেঁধেছে, ভালো কাপড় পরেছে, একটু প্রসাধনও করেছে- কিন্তু তাব সমস্ত দেহটিতে যেন এক ফোঁটা বস নেই। আমি এসেই গাযত্রী দেবীকে তার কথা জিগেস কবেছিলুম, তিনি বলেছিলেন আজ একটু ভালো আছে। কিন্তু ভালো থাকার কোনো লক্ষণ তো দেখছি না। একটু উদ্বিগ্নই হলুম মনে মনে। একবার রক্ত পরীক্ষা ক'রে দেখলে হয—যে রকম রোগা দেখছি, এক্স রে করলেও মন্দ হয না।

শৈলেশবাবু আবার ডাকলেন, 'বীণা।'

ব্যান্ডেজ-বাঁধা পা নিয়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে বীণা এসে দাঁড়ালো। শৈলেশবাবু বললেন, 'রমেন, বলো এবার।'

আমি এতক্ষণ বুঝিইনি যে, রমেনও পার্ট করছে। আব পার্টও যে সে নয়, তবণ প্রেমিকেব। সমস্ত বইটার মধ্যে অনুপম-ললিতার প্রেমের ব্যাপারটাই সবচেয়ে ভালো লেগেছিলো আমাব। ন'ড়ে চ'ড়ে ভালো হয়ে বসলুম।

রমেন বললো, ''কী, আমাকে চিনতে পারছো?'

বীণা অস্ফুটস্বরে কী বললো বোঝা গেলো না। 'ভালো ক'বে বলো।' পিছন থেকে গ্রন্থকাব তাড়া দিলেন।

এবার মৃদু আওয়াজ শুনলুম,—'বাঃ, আপনি আমাদের অনুপমবাবু না!'

'তাকিয়ে বলো। ওর দিকে তাকাও।'

অতি কষ্টে চোখ তুলে বীণা আবাব কথাটি আওড়ালো।

'হাসো, হেসে বলো।'

ফ্যাকাশে একটু হাসলো এবাব। কিন্তু হাসিব সঙ্গে কথাব মিল হ'লো না, দুটোই ফাঁকা ঠেকলো।

ততক্ষণে আমি ভাবছি এ-মেয়েকে এ-পার্টে এঁরা নিলেন কেন।

শৈলেশবাবু উঠে দাঁড়িয়ে একটি বক্তৃতা শুরু করলেন। 'বীণা, তুমি কি চাও যে, শুধু তোমাব জন্য আমাদের এত পরিশ্রম পণ্ড হয? তুমি যদি এ-রকম কবো তাহ'লে তো অন্য কারো উৎসাহ হবে না—তোমার পার্টটাই যে সবচেয়ে বড়ো, সকলের সঙ্গেই তোমার কথা আছে।'

বীণা নিশ্বাস ফেলে বললো 'আমাকে বাদ দিন।'

'কী ছেলেমানষি করছো!' ব'লে রমেন তার মাথায় টোকা দিলো। 'ভালো হ'য়ে দাঁড়াও-- ভালো ক'রে পার্ট বলো।'

সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটি যেন কেঁপে উঠলো, তার চোখ খুলে গেলো, মুখে রক্ত এলো। তারপব

পার্ট সে একরকম মন্দ বললো না। তবু তার মুখ থেকে কষ্টের রেখা যেন কিছুতেই মিলোচ্ছে না, কথাগুলি সে যেন বলতে চায় না, কিছুতেই মুখে আনতে চায় না, বাধ্য হ'য়েই বলতে হচ্ছে।

খানিক পরে শৈলেশবাবু বললেন, 'আচ্ছা, এবার প্রথম অঙ্ক হোক। সর্বেশ্বর, বাসন্তী, লিলি, প্রিয়নাথ—'

বলতে বলতে চার-পাঁচজন উঠে দাঁড়িয়ে মেঝে দখল করলো।

রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত রিহার্সেল চললো। বন্ধু, কর্মী, উৎসাহদাতা আরো অনেকে এলেন—ঘর ভর্তি। চেয়ারগুলি দেয়ালের সঙ্গে লাগিয়ে-লাগিয়ে মেঝেতে মস্ত ফরাশ বিছানো হয়েছিলো, তারই এক কোণে ব'সে আমি দেখছি, শুনছি, ভাবছি, অবাক হচ্ছি। আমার আশেপাশে যাঁরা আছেন, সকলেরই বেশ গুণী গুণী কিংবা কেজো কেজো চেহারা। একজন ফাউন্টেন পেন দিয়ে অবিশ্রান্ত কাগজের উপর মেয়েদের স্কেচ ক'রে যাচ্ছেন, কেউ পেনসিল নিয়ে বড়োরকমের হিশেবে মগ্ন, কেউ বা ছাপাখানার প্রুফ দেখছেন। কখনো তিন চারজন মিলে বারান্দায় চ'লে গিয়ে খুব সম্ভব মনের কথার আদান-প্রদান করছে, তাদের কলস্বর রিহার্সেলের ব্যাঘাত না-করলেও দরজা-ঘেঁষে-বসা আমার কানে একটু আধটু পৌঁচচ্ছে। এই বিচিত্র নাট্যানির মধ্যে নিজেকে আমার বেখাপ্পা লাগছিলো, তবু ভালো লাগেনি বলতে পারবো না, কারণ, চুপ ক'রে একা ব'সে ব'সেও অতখানি সময় কেমন ক'রে কেটে গেলো টেরই পেলুম না।

সাড়ে দশটার সময় কে একজন বললো, 'আজ এখানেই থাক।'

শৈলেশবাবু বললেন, 'অনুপম-ললিতার শেষ দৃশ্যটা একবার—'

বীণা ব'লে উঠলো, 'না, না, ওটা না।' হঠাৎ এমন জোর দিয়ে বললো যে, আমি অবাক হলাম।

রমেন বললো, 'নিশ্চয়ই। এসো বীণা, রাত হ'য়ে যাচ্ছে।'

বীণা আস্তে আস্তে উঠে এলো। দেখে মনে হ'লো তার মুখ দিয়ে একটি কথাও ফুটবে না, কিন্তু এই শেষ দৃশ্যটুকু বা সুন্দরই বললো সে। অনুপম যখন বললো, 'আমি যাই, ললিতা', তখন 'না, যেয়ো না, আমাকে ফেলে যেয়ো না তুমি', বলতে বলতে তার চোখ জলে ভ'রে এলো। আমি মনে মনে খুব তারিফ করলুম।

রমেন বিদায় নিলো সকলের শেষে, ওর জন্য আমাকেও দেরি করতে হ'লো। গায়ত্রী দেবী বললেন, 'আসবেন মাঝে মাঝে, কেমন?'

আমি বিনীতভাবে মাথা নোয়ালুম আর রমেন ফশ ক'রে ব'লে উঠলো, 'মাঝে-মাঝে কেন, রোজই আসবে। ওর তো কোনো প্র্যাকটিস নেই—শুধু লোক দেখাবার জন্য চেম্বর সাজিয়ে ব'সে থাকে।'

গায়ত্রী দেবী হেসে বললেন, 'বেশ তো এখানেই আপনার প্র্যাকটিস শুরু করুন। আপনি আমাদের "নব নীড়ের" মেডিকেল অফিসার নিযুক্ত হ'লেন।'

আমি বললুম, 'সে তো ভালো কথাই, কিন্তু আমার প্রথম কেসটায় বিশেষ সুবিধে করতে পেরেছি ব'লে তো মনে হচ্ছে না।'

'বীণার? ওর কিছু হয়নি, ও সেরে যাবে।'

সে রাত্রিটা রমেন আমার ওখানে কাটালো। আমি চেম্বরেই বসি, চেম্বরেই শুই—মানে, তখনো তা-ই করতুম। রেস্তোরা থেকে কিছু ফ্রাইড রাইস আর কাটলেট আনিয়ে নিলুম, খাওয়ার পরে কফি নিয়ে ব'সে গল্প। কথায় কথায় আমি বললুম, 'বীণা মেয়েটি বেশ অভিনয় করে কিন্তু।'

রমেন হাসলো, কিছু বললো না।

'কিন্তু স্বাস্থ্য তেমন ভালো মনে হচ্ছে না।'

'স্বাস্থ্য ভালোই—সম্প্রতি একটু খারাপ হয়েছে।'

'আমার মনে হচ্ছিলো, পায়ের কাটাটা কিছু না—ভিতরে-ভিতরে শক্ত কোনো অসুখ করেছে।'

'ঠিকই ধরেছো।'

আমি উৎসাহিত হ'য়ে বললুম, 'কী অস্বাভাবিক ফ্যাকাশে —অ্যানেমিয়া মনে হয়। বলো তো খুব ভালো ক'রে পরীক্ষার ব্যবস্থা করি। না-হয় মেজর ঘোষকে একবার—'

'কোনো ডাক্তার কি ওর অসুখ সারাতে পারবে?'

'বলো কী! পারবে না! তুমি নিজে অর্ধেক ডাক্তার— তোমার ও-রকম বলা উচিত না।'

'ওর অসুখটা কী আমি জানি।'

'তুমি জানো?'

'ওর অসুখের নাম, প্রেম।'

'কী বললে?'

'প্রেম। লোকে যাকে প্রেমে-পড়া বলে, তা-ই! ও প্রেমে পড়েছে।'

এ-কথা শুনে আমি যেন ডাঙা থেকে জলে পড়লুম। একটু পরে নিজেকে সামলে মুখে আবার ডাক্তারি ভাব এনে বললুম, 'ও! তাহ'লে আর ডাক্তারের কিছু করবার নেই।'

'অন্য ডাক্তারের না থাকলেও তোমার আছে,' ব'লে রমেন তার লম্বা শরীরটি ঈষৎ বেঁকিয়ে শুয়ে পড়লো। পায়ে পা ঘষতে-ঘষতে বললো, 'আঃ, তোমার এই কাউচটি ভারি আরামের। ব্যাপারটা হয়েছে কী, মেয়েটির এই ব্যাধির যে-উপলক্ষ্য, সে—আমি।'

আমি হাসলুম। 'এ তো তোমার জীবনে কিছু নতুন ঘটনা নয়!'

রমেন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললো, 'তা তুমি আমাকে কী করতে বলো? আমি কি ম'রে যাবো, না দেশত্যাগী হবো! বীণা অমন ভালো মেয়ে, ও যে হঠাৎ বিশ্রী একটা কাণ্ড বাধাবে কক্ষনো আমি ভাবিনি।'

এর পর রমেন তার দুঃখের কথা শুরু করলো। এ-রকম হ'তে থাকলে জীবনে আর শান্তি কোথায়। ঐ-তো সারাদিন ব'সে-ব'সে ব্যবসা করে—সন্ধেবেলাটা শৈলেশবাবুর ওখানে কাটে বেশ, ওঁদের সঙ্গে অল্প সময়ের মধ্যেই আত্মীয়তার মতোই হয়েছে তার, দাদা-বৌদি ডাকে, ওঁরাও লোক ভারি ভালো, নযতো ওঁদের কাছে এখন তার মুখ দেখানোই দায় হ'তো।

এটুকু শুনে আমি বললুম, 'তা, তোমার একলার আর দোষ কী—এসব তো একপক্ষে হয় না!'

'বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, কিন্তু এটা একেবারেই এক পক্ষের। আমার দিক থেকে কিছুই নেই।'

'কিছুই নেই? বাজে কথা!'

'ঐ তো! তুমিও এ-কথা বললে তো! শৈলেশবাবু আর গায়ত্রী দেবীও মনে-মনে কি আর তা-ই না ভাবেন। এদিকে আমি এই ক-দিন ধ'রে ওকে বোঝাবার চেষ্টা ক'রে ক'রে হয়রান হ'য়ে গেলুম! আর পারি না।'

'কী বলছো তুমি ওকে?'

'বলছি শান্ত হ'তে, স্থির হ'তে, ভালো হ'তে, লক্ষ্মী হ'তে।'

'আর সে?'

'বলবে আবার কী—কান্না, কেবল কান্না! কোনো মানুষ যে এত কাঁদতে পারে জানতুম না। ফুটফুটে মেয়েটা মড়ার মতো হ'য়ে গেলো। আর ও-রকম ক'রে কাউকে কাঁদতে দেখলে কেমন লাগে বলো তো—আর তুমি যখন জানো সে-কান্না তোমারই জন্য! আমি যত সান্ত্বনা দিতে যাই, ততই ও আকুল হ'য়ে কাঁদে!'

আরো যে-সব বললো তার মোদ্দা কথা এই যে, ও-বাড়ির সংশ্রবই সে ছাড়তো, কিন্তু নাটকটার জন্য তারও উপায় নেই। আর তাছাড়া ছাড়বেই-বা কেন? তার নিজের কি কোনো জীবন নেই, সুখ নেই, শান্তি নেই? যেখানে তার ভালো লাগে সেখানে সে কি যেতেও পারবে না, যেহেতু একজন যুবতী মেয়ের মাথা খারাপ হয়েছে? কী অন্যায় ভাবো তো!

আমি তাকে সান্ত্বনা দিলাম যে, এটা তার ভালো চেহারার খাজনা।

হ্যাঁ—তার চেহারাই তার শত্রু তা সে অনেক আগেই বুঝেছিলো। দ্যাখো না কাণ্ড, রিহার্সেলের হৈ-চৈতে বেশ কাটছিলো সন্ধ্যাগুলো, হঠাৎ চোখের জলে সব ডুবতে বসলো। বীণাকে আমি যা দেখেছি—রমেন বললো—তা থেকে ধারণাই করা যাবে না ও কেমন মেয়ে। টগবগে চটপটে হাসিখুশি— "নব নীড়" নভেলে ললিতার চরিত্র প্রথম দিকে যে-রকম আছে ঠিক তা-ই। শৈলেশবাবু ওটুকু বোধহয় শ্যালিকার ছাঁচেই এঁকেছিলেন। ও দরজা দিয়ে ঢুকলে মন-খারাপের ভূত জানলা দিয়ে পালায়। বেশ মেয়ে, খুবই ভালো, এবং তাকে যদি কেউ জিগেস করে সে নিশ্চয়ই বলবে যে, শৈলেশবাবুর এই শ্যালিকাটিকে যে বিয়ে করবে সে রীতিমতো ভাগ্যবান।

'ভাগ্যবানটিকে সে নিজেই তো বেছে নিয়েছে।'

আমার এই ঠাট্টার উত্তরে রমেন দীর্ঘশ্বাস ফেললো। কেনই-বা সে জুটেছিলো ঐ দলে! শৈলেশবাবুদের নাটকের সবই ঠিক হ'য়ে গিয়েছিলো, শুধু অনুপমের পার্টের জন্যই লোক পাচ্ছিলেন না ওঁরা—রমেন দৈবাৎ জুটে যেতেই পুরো দমে রিহার্সেল শুরু হ'লো। মাসখানেক চমৎকার চললো রিহার্সেল, সবাই একবাক্যে বললো যে, ললিতা যা হচ্ছে তার উপর কথা নেই। ছুটোছুটি লাফালাফির প্রথম অংশটা তো ওর ভালো হবেই— কিন্তু শেষের দিকে প্রেমের দৃশ্য, দুঃখের দৃশ্যগুলিও যে ও অত সুন্দর করতে পারবে, তা ওর দিদিও আশা করেননি। রিহার্সেল সুন্দর এগোচ্ছে, এর মধ্যে হঠাৎ একদিন শোনা গেলো যে বীণার শরীর খুব খারাপ, আজ রিহার্সেল দিতে পারবে না। রমেন ব্যস্ত হ'লো, সবাই ব্যস্ত হ'লো, কিন্তু ওর সঙ্গে কাউকেই দেখা করতে দিলেন না ওঁরা—ভীষণ নাকি মাথা ধরেছে, চুপচাপ শুয়ে আছে অন্ধকার ঘরে। সেদিন রিহার্সেল মোটে জমলোই না, শৈলেশবাবুও অন্যমনস্ক, গায়ত্রী দেবী বার-বার উঠে ভিতরে যাচ্ছেন, অন্য দিনের চাইতে একটু সকাল-সকালই আড্ডা ভাঙলো। তখন গায়ত্রী দেবী এক ফাঁকে রমেনকে ডেকে বললেন যে, তার সঙ্গে দরকারি কথা আছে।

তাঁর মুখে খবর শুনে রমেন বজ্রাহত। আগের দিন রিহার্সেল ছিলো না, না থাকলেও সে মাঝে-মাঝে যায়, কিন্তু সেদিন যায়নি। বীণার চোখ মুখ বিকেল থেকেই থমথমে, এ ঘর থেকে ও-ঘরে যাচ্ছে, এ-জানলা থেকে ও-জানলায় দাঁড়াচ্ছে। গায়ত্রী দেবী দু-একবার জিগেস করলেন, 'কী রে, তোকে অমন দেখাচ্ছে কেন?' কোনো জবাব নেই। সন্ধের পর হঠাৎ জিগেস করলো, 'রমেনবাবু আজ আসবেন না, দিদি?' 'কী জানি— আটটা বেজে গেলো, আজ কি আর আসবে!' 'ওঁকে আসতে বলো— টেলিফোন করো।' গায়ত্রী দেবী অবাক হ'য়ে বোনের মুখের দিকে তাকিয়েই দেখলেন তার চোখ জলে ভরা। 'বীণা! হয়েছে কি তোর?' ব'লে তার কাঁধের উপর হাত রাখতেই বীণা দুই হাতে দিদিকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'দিদি, আমি রমেনকে বিয়ে করবো, আমি রমেনকে বিয়ে করবো!' তার পর থেকে এ-পর্যন্ত এই চলেছে। নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে শয্যা নিয়েছে বীণা। 'কী মুশকিলেই পড়েছি!' ব'লে গায়ত্রী দেবী কথা শেষ করলেন।

এর উত্তরে রমেন কী বলবে, কোন্‌দিকে তাকাবে, হাত দুটো কোথায় রাখবে, কিছুই ভেবে পেলো না। বিশ্রী লাগলো নিজেকে, অথচ—অপরাধী সত্যি তো—তার কী দোষ? সে কখনো কিছু করেনি, বলেনি, ভাবেওনি, যাতে বীণার মনে ও-সব ভাব জাগতে পারে। এ যে বিশ্বাস করাই শক্ত।

কিন্তু বীণাকে চোখে দেখে বিশ্বাস করতেই হ'লো। করুণ অবস্থা তার। রমেন কাছে ব'সে জিগেস করলো, 'কী হয়েছে, বীণা?' আর অমনি তার হাতটা আঁকড়ে ধ'রে কেঁদে ফেললো সে। সাধারণ শোভনতার জ্ঞানটুকুও নেই—পাগল হ'লো নাকি! রমেন স্তম্ভিত হ'লো, কিন্তু সেই সঙ্গে খুব কষ্টও হ'লো তার।

দত্ত-দম্পতীর সৌজন্যবোধ অসাধারণ, তাঁরা ঘর ছেড়ে চ'লে গেলেন। রমেনের ভারি বাধো-বাধো লাগলো, সেটা কাটাবার জন্য হাসির চেষ্টা ক'রে বললো, 'কী, ব্যাপার কী?'

ভাঙা-গলায় জবাব হ'লো 'দিদির কাছে সব শুনেছেন?'

'শুনলুম।'

'আপনি কী বলেন?'

রমেন তাকে বোঝালো যে, এ-বিষয়ে কথা বলবার পরে অনেক সময় হবে, আপাতত তার সুস্থ হ'য়ে ওঠা চাই, যাতে নাটকটি নষ্ট না হয়।

কিন্তু কিছুই ফল হ'লো না। তাকে বোঝাতে, শান্ত করতে, সুস্থ করতে এ-ক'দিন ধ'রে কম চেষ্টা রমেন করেনি, আর তার দিদি তো লেগেই আছেন সব সময়—কিন্তু না! বীণার কী-এক ধারণা হয়েছে যে, রমেনকে বিয়ে না করলে জীবনই তার ব্যর্থ হবে, এ-থেকে কেউ তাকে একচুল নড়াতে পারেনি। রমেন যে আগে একবার বিয়ে করেছিলো, তাতে ওর কিছুই এসে যায় না, আর তার জীবনযাপন যে একটু ফিরিঙ্গি-ভাবের সেটা ওর পছন্দই। ঐরকম পুরুষই নাকি ওর আদর্শ—লম্বা, ফর্শা, শিষ দিতে-দিতে সিঁড়ি ওঠে নামে, টেনিস খেলে, সব সময় প্যান্ট প'রে থাকে। দিদিকে নাকি এমন কথাও বলেছে যে, সাধারণভাবে যদি বিয়ে না হয়, তাহ'লে সে নিজেই একদিন রমেনের বাড়ি গিয়ে উঠবে—তখন তো আর গলা ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিতে পারবে না!

রাত দুটো পর্যন্ত রমেন আমাকে তার দুঃখের কথা শোনালো। তাবপব জিগেস কবলো, 'তুমি বলো তো এখন কী করা যায়?'

আমি অবশ্য জবাব দিলুম, এর উপায় খুব সহজ—বিয়ে।

'আমাকে বিয়ে করতে বলছো? সেটা সম্ভব হ'লে তো ভাবনাই ছিলো না।'

'সম্ভব নয় কেন?'

রমেন বললো, 'বিয়ে-টিয়ে আমার ভালোই লাগে না।'

এবার আমি ব্যস্ত হলুম রমেনকে বোঝাতে। 'ভালো লাগে না? তার মানে? কিন্তু কববে তো? না-ক'রে তো আর সারাজীবন থাকবে না? আর, বিয়েব কোনো বাধাও নেই, তুমিও তো বললে যে, মেয়েটিকে তোমার ভালো লাগে, তার জন্য কষ্টও বোধ কবো—'

'কষ্ট কেন বোধ করবো না—আমি একটা মানুষ তো!'

'কিন্তু তোমার বিয়ে করার বাধাটা কী তা তো আমি বুঝতে পারছি না।'

'আছে বাধা।' রমেন এতক্ষণে আর-এক কথা ফাঁশ করলো —'রুথকে আমি কথা দিয়েছি যে, আবার যদি কখনো বিয়ে করি, ওকেই করবো।'

'রুথ! সে আবার কে?'

'রুথ আমার দোকানের—'

'রমেন, ফের!'

'আঃ—বোঝো না—কেউ নেই মেয়েটার—আর কেমন একরকম ধ'বে পড়েছে—খুব সম্ভব বিয়ে আমি আর করবো না, কিন্তু যদি কখনো—'

আমি রেগে উঠে বললুম, 'তাহ'লে বাঙালি মেয়ের চোখের জলের চাইতে একটা ফিরিঙ্গির ছলাকলাই তোমার কাছে বেশি হ'লো?'

'বকো যত খুশি! আমি ঘুমুই।'

রমেন হ্যাঁচকা টানে কোট খুলে মেঝেয় ছুঁড়ে ফেললো, ট্রাউজর্সের পা দুটো হাঁটু অবধি মুড়ে গায়ে কম্বল টেনে ঐ কাউচেই লম্বা হ'লো।

আমি রাগ ক'রে আর কথা বললুম না।

সে-রাত্রে খানিকক্ষণ ঘুম এলো না আমার। বীণার মলিন মুখ মনে পড়লো, ফোলা-ফোলা চোখ, উশকো চুল। কেমন কষ্ট লাগলো, অথচ সেটা ঠিক কষ্টও না, একটা নতুন রকমের ভালো লাগা। আমি কল্পনা করলুম—বীণাকে আমি শান্ত করছি, সান্ত্বনা দিচ্ছি ; আমার কথা সে শুনতেই চাচ্ছে না, কিন্তু আমি ব'লে যাচ্ছি—একবার সে একটু হাসলো, একটি কথা বললো, আর তারপর আমি

হঠাৎ দেখলুম যে, আমার কল্পনার মধ্যে রমেন আর নেই, তার কথা ভুলেই গিয়েছি। নিজের কাছেই লজ্জিত হ'য়ে তখনই মনে-মনে স্থির করলুম যে, পরের ব্যাপারে মাথা ঘামানোটা কিছু না, শৈলেশবাবুর বাড়িতে আমার আর যাবারই মানে হয় না কোনো, নিজের চরকায় তেল দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু রমেন আমাকে ছাড়লো না, পরের দিনও ধ'রে নিয়ে গেলো। আগেই বলেছি যে, ওখানকার আবহাওয়া আমার ভালো লেগেছিলো ; দু-চারদিন যেতে-যেতে নিজেরই নেশা লাগলো, তারপর রমেনের পুনশ্চ হওয়া ছেড়ে দিয়ে আমি স্বাধীনভাবেই যাওয়া ধরলুম। এ-ক'দিনে বীণা অনেকটা সামলে উঠেছে, মুখের রং বদলেছে, হাসি ফুটেছে, পার্ট ছাড়াও আরো অনেক কথা বলে। তার আরোগ্যের সঙ্গে-সঙ্গে রিহার্সেলের বেগও খুব বেড়ে গেছে, তার রিহার্সেলের আগে, পরে এবং ফাঁকে-ফাঁকে বিশুদ্ধ আড্ডা যা চলছে, ও-রকম আমি জীবনে সেই একবারই দেখেছিলুম।

শৈলেশবাবুদের বাড়িতে আমি প্রথম গিয়েছিলুম শীতকালে —বোধহয় জানুয়ারি তখন। মার্চের প্রথম সপ্তাহে 'নব নীড়' স্টেজে উঠলো—অভিনয় হ'লো চার রাত্রি। চার রাত্রির অভিনয়েই আমি উপস্থিত, কখনো অডিটরিয়মে দর্শকদের রিঅ্যাকশন লক্ষ্য করছি, কখনো ভিতরে গিয়ে অভিনেতাদের আগামী দৃশ্যের কস্টুম্ সাজিয়ে রাখছি। গাড়ি নিয়ে নানা কাজে ছুটোছুটিও করলুম, আর অভিনয়ের শেষে মস্ত দলের যে কোনো তিনজনকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেবার সসম্মান দায়িত্ব থেকেও বঞ্চিত হলুম না।

অভিনয় শেষ হ'লো, এখন তার জের চললো আরো এক মাস। প্রথমে শৈলেশবাবুর বাড়িতে, তারপর রেস্তরাঁয়, তারপর তাঁদের এক বন্ধুর বাগানে, পরিশেষে আবার শৈলেশবাবুরই বাড়িতে—ভোজের পর ভোজ, উৎসবের পর উৎসব। আমি যদিও বেশি কিছু কাজে লাগিনি, বেশির ভাগ সময় চুপচাপ ব'সে-ব'সেই কাটিয়েছি, তবু প্রতি উৎসবেই নিমন্ত্রিত হলুম—দত্ত-দম্পতির ভদ্রতায় ত্রুটি নেই। এ-দু-মাসে দলের অনেকের সঙ্গেই চেনাশোনাব সুযোগ হয়েছিলো, এখন আব দলেব মধ্যে নিজেকে খাপছাড়া লাগে না , যদিও আমি ডাক্তার মাত্র, এবং সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে অজ্ঞ, তবু এই অত্যুজ্জ্বল দলের কেউ-কেউ ততদিনে আমাকে বেশ সাদরেই গ্রহণ করেছেন। এতগুলি লোকের মধ্যে আমার সঙ্গে বীণারই সবচেয়ে কম চেনা, ফর্ম্যালিটির আঁটো ফ্রেমে যেটুকু ধরে তার বেশি কিছুই না। আমাব সম্বন্ধে কেমন একটা বিরুদ্ধ ভাবই লক্ষ্য করেছি তার। হয়তো আমার চেহারাই পছন্দ হয় না--কিংবা এও হ'তে পারে, রমেন যে আমাকে সব কথাই বলেছে তা সে জানে—যে কারণেই হোক, আমার সংসর্গ সে যেন এড়িয়েই চলে। তাতে আমার আপশোষ ছিলো না, ও-রকম একজন প্রেমে-পড়া, প্রেমে-পোড়া তরুণীর সঙ্গে কী বলতে হয়, কী ভাবে চলতে হয়, আমার পক্ষে তা আন্দাজ করাই শক্ত। এ-ই ভালো!

এপ্রিল মাসে দত্ত দম্পতি কালিম্পং গেলেন। তাঁদেব যাবাব তারিখে একবাব গিয়েছিলুম, আর কেউ ছিলো না তখন। এ-কথা ও-কথার পর গায়ত্রী দেবী বললেন, 'আপনাকে একটা খবর দিই, আপনার রোগিণী এখন সম্পূর্ণ রোগমুক্ত।'

খুব সুখের কথা—মনে-মনে বললুম—কিন্তু আমাকে কেন এ-সব বলা। আমার সঙ্গে সম্পর্ক তো চুকলো।

যেন আমার মনের কথা আঁচ ক'বে গাযত্রী দেবী আবার বললেন, 'আপনি সবই জানেন—তাই বলছি।'

একটু পরে আমি বললুম, 'আমার কিন্তু মনে হয়, বমেন বিয়ে না-ক'বে খুব অন্যায় করলো।'

'আর-একজনকে কথা দিয়েছে—এর উপর তো কথা নেই।'

'কথা দিয়েছে? ও-সব বাজে কথা। আসলে ওব ইচ্ছে নেই।'

'তা, ইচ্ছার উপরেও তো জোর চলে না। আমি তো বীণাকে এই ব'লেই বুঝিয়েছি—"ওকে তো কখনো পাবি না তুই, তবু কেন এ-রকম করিস? তোর একটা আত্মসম্মান নেই? চিরকাল

পুরুষই এসে মেয়ের পায়ে মাথা খুঁড়ে মরেছে আর তুই মেয়ে হ'য়ে''—'

এখানে শৈলেশবাবু টিপ্পনি কাটলেন, 'এ-যুগে ও-সব উল্টিয়ে গেছে, আজকাল দেখি, মেয়েরাই তাড়া করে আর পুরুষই ছুটে পালায়। বেচারা রমেন! ওর অবস্থাটা সে-সময়ে ঈর্ষাযোগ্য ছিলো না।'

গায়ত্রী দেবী বললেন, 'তা, রমেনই যা-হোক ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত সামলে নিয়েছিলো—আমি ওকে খুবই ভালো বলবো! মেয়েটা যে-রকম দিশেহারা হ'য়ে পড়েছিলো, রমেন একটুও মন্দ হ'লে ওর কি আর রক্ষে ছিলো!'

আরো একটু রমেনের সুখ্যাতি ক'রে গায়ত্রী দেবী বললেন, 'এখন বীণা বলছে, বেশ, রমেন তাকে বিয়ে না-ই করলো, কিন্তু সে-ও অন্য কাউকে বিয়ে করবে না, জীবনেও না। আমরা কিন্তু শিগগিরই ওর বিয়ের কথা ভাবছি। এখন ওকে বড়দির কাছে রেখে যাচ্ছি—সেই যিনি নাটকের সময় মেয়েদের কাপড়ের চার্জে ছিলেন, আপনার সঙ্গে তো আলাপ হয়েছে—মা আসবেন সামনের মাসে, এই শেষ মেয়ের বিয়ে হ'লেই তিনি নিশ্চিন্ত। আপনি দেখবেন-না আপনার জানাশোনা কোনো সুপাত্র থাকে যদি!'

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম, কিন্তু গায়ত্রী দেবীর কথাগুলি আমার বড়ো হৃদয়হীন লাগলো। এই এতো বড়ো একটা কাণ্ড হ'য়ে গেলো—এক্ষুনি আবার বিয়ের কথা! মুখে যা বলেছে তা সম্পূর্ণ সত্য হয়তো নয়, সারা জীবন বিয়ে না-ক'রে নিশ্চয়ই থাকবে না, তাই ব'লে রমেনকে ভোলা কি ওর পক্ষে সহজ! সবাই তো আর রমেনের মতো ফুঁ দিয়ে সব ঝেড়ে ফেলতে পারে না।

গায়ত্রী দেবী আবার বললেন, 'বড়দি থাকেন সাদার্ন এভিনিউতে-- মাঝে-মাঝে যাবেন-না ওঁদের ওখানে! ওঁরা খুশি হবেন। আর বীণার শরীরটাও—আমার ইচ্ছে ছিলো ও কোনো ডাক্তারের কথামতো কিছুদিন খুব নিয়মের মধ্যে থাকে—'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়ই! আমি যথাসাধ্য করবো।'

এরপর থেকে আমার যাতায়াত শুরু হ'লো সাদার্ন এভিনিউতে। 'নব নীড়ের' দলের আরো দু-একজন যায় সেখানে, কিন্তু বেশির ভাগই যায় না—শৈলেশবাবুর বাড়িটাই ছিলো পীঠস্থান, তাঁরা চ'লে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে আড্ডাটি ভেঙে গেলো। অন্যদের সঙ্গে যদি-বা ক্বচিৎ দেখা হয়, রমেনের সঙ্গে একেবারেই না—সে যেন এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলো, শৈলেশবাবুরা চ'লে যেতেই এমন ডুব দিলো যে তার আর পাত্তাই নেই।

বীণাকে এক কোর্স ক্যালশিয়ম ইনজেকশন দিলুম, খাওয়ার পরে আর শোবার আগে দুটো পেটেন্ট ওষুধ দিলুম, বেঁধে দিলুম ডায়েট। মনে হ'লো চিকিৎসায় ধরেছে —ওর গাল আরো লাল, চোখ আরো একটু উজ্জ্বল, চামড়া আরো চিক্কণ। বড়দি ঠাট্টা ক'রে বললেন, 'বীণার চেহারায় শ্রী খুলেছে—এইবার বিয়ে হবে।'

তার মা এলেন কাশী থেকে, বিয়ের চেষ্টা চলতে লাগলো। যে-কোনো পাত্রের কথা ওর সামনে বলা হয় ও তক্ষুনি দু-হাত তুলে মুখ-ভঙ্গি ক'রে বলে, ''বাবা, বাবা, রক্ষে করো।' এতদিনে ওর আর আমার মধ্যে আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গিয়েছিলো—আমার সামনেই চাদর-জড়ানো ছোকরা প্রোফেসর থেকে রংপুরের বিপত্নীক জমিদার পর্যন্ত সকলকেই নকল ক'রে অভিনয়ের ধরনে এমন মন্তব্য করতে লাগলো যে, দেখতে-দেখতে আমার হাসিও পেলো, আর সেই-সব অচেনা ভদ্রলোকদের কথা ভেবে খারাপও লাগলো মনে-মনে।

বড়দি বললেন, 'বীণা, তোর এ-সব রঙ্গভঙ্গ রাখ। কাউকেউ তোর পছন্দ হয় না—এ-রকম করলে বর জুটবে না তোর!'

বীণা বললো, 'আমি কি তার জন্য কাঁদছি?'

বড়দি বললেন, 'কাঁদবার এখনই হয়েছে কী। চারিদিকে যা সব দেখছি আজকাল—পঁচিশ-তিরিশ বয়স হ'য়ে যায় মেয়েগুলোর, তবু বিয়ে হয় না, মাষ্টারি করতে-করতে হাড়ে ঘুণ ধরে। তোর

না সে-দশা হয়।'

'যার কপালে যা আছে তা কি ঠেকাতে পারে কেউ?'

'কেন এ-রকম পাগলামি করছিস বল তো? মা-র কথা ভাব—তাঁর বয়স হয়েছে, আর ক'দিনই-বা—'

'এ-সব কথা অনেক শুনেছি বড়দি।'

'আচ্ছা, তুই-ই বল্‌, কী-রকম তোর পছন্দ—আমরা সে-রকমই চেষ্টা করি।'

বীণা বললো, 'এ কি একটা জামা না জুতো যে, দোকানে ফরমাশ দিলেই পাওয়া যায়?'

আমার সামনেই এ-সব কথা হচ্ছিলো, শুনতে-শুনতে অস্বস্তি লাগছিলো আমার। কোনো ছুতোয় উঠে যাবো কিনা ভাবছি, ঠিক তক্ষুনি বড়দি হঠাৎ আমারই দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পাত্রের জন্য এত খোঁজাখুঁজিরই-বা দরকার কী—এই আমাদের অবনীর সঙ্গেই তো দিব্যি তোকে মানায়।'

এ-কথা শুনে বীণা খিলখিল ক'রে হেসে উঠে বললো, 'ওমা! সে আবার কী কথা!'

ওর হাসিটা স্বাস্থ্যের বেশ ভালো অবস্থারই পরিচয় দিলো, কিন্তু ডাক্তারের কানে সেটা খুব উপাদেয় ঠেকলো না। উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে বললুম, 'আমি আজ চলি।'

বড়দি বললেন, 'তোমার যেন রাগ ভাব?'

'কী আশ্চর্য! —আমার একটু কাজ আছে, তাই—'

'তোমার গাড়িতে আমাদের একটু হাওয়া খাইয়ে আনবে? যা গরম!'

'বেশ তো, চলুন—'

'তুই যাবি নাকি, বীণা?' বলতে-বলতে বড়দি উঠলেন।

বীণাও এলো। লেকে দু-এক চক্কর দিয়ে গাড়িটা দাঁড় করালুম, বড়দির ইচ্ছা গাড়ি থেকে নেমে ঘাসে বসা হবে। কিন্তু নেমেই তার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো এক প্রতিবেশিনীর, দু-জনে কথা বলতে-বলতে খানিকটা এগিয়ে গেলেন।

আমি বীণাকে বললুম, 'কী করবেন? বসবেন, না ওঁদের পিছন-পিছন যাবেন?'

বীণা বললো, 'ফিরে গেলেই হয়—লেকটা আজকাল বিশ্রী হয়েছে।'

'ওঁরা এলেই বাড়ি ফিরবো—ততক্ষণ আসুন একটু বসি।

দু-জনে বসলুম, কিন্তু তারপর আর কথা নেই। আমার অল্পস্বল্প যা মগজ আছে, তারই কোন এক ভাঁজের তলা থেকে বলবার মতো কিছু কথা খুঁজছি, এমন সময় বীণা হঠাৎ বললো, 'দিদিরা ভাবছেন রমেনকে আমি ভুলে গিয়েছি।—কিন্তু আমি ভুলিনি—ভুলবোও না।'

এ-কথার উত্তরে আমি বললুম, 'আমি তা জানি। ওঁদের কথায় আমারও খুব খারাপ লাগে।'

'কিন্তু আপনাকে একটা কথা জিগেস করি। আপনি কেন এ-বাড়িতে ঘুরঘুর করছেন—আপনি না রমেনের বন্ধু!'

সে-মুহূর্তে আমার মুখের চেহারা কেমন হয়েছিলো আমি অবশ্য তা বলতে পারবো না, তবে খুবই খারাপ হয়েছিলো নিশ্চয়ই, কারণ, আমার দিকে তাকিয়ে বীণারই মুখের ভাব বদলে গেলো। একটু নিচু গলায় তাড়াতাড়ি বললো, 'কিছু মনে করবেন না—কথাটা খুবই অন্যায় বলেছি।'

'ঠিক বলেছেন,' ব'লে আমি উঠে দাঁড়ালুম।

বীণাও সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে বললো, 'কখনো কাউকে আমি এ-রকম বলি না—আজ আপনাকে বললুম কেন, জানি না। বলুন আপনি এটা মনে রাখবেন না।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন।'

'না, আমি ভুল বলেছি। খুব অন্যায় বলেছি। কাল আপনি আসবেন তো? আসবেন—বলুন আসবেন?'

'আসবো।'

'একটা কথা বলতে পারেন আপনি?—রমেন কি তার কথকে বিয়ে করেছে?'

'জানি না।'

'আপনার সঙ্গে আর দেখা হয় না তার?'

'অনেকদিন হয়নি।'

বীণা আর কথা বললো না।

আমি বললুম, 'আপনার কিছু বলবার থাকে তো তাকে আমি জানাতে পারি।'

'না, কিছু বলবার নেই', ব'লে বীণা নিশ্বাস ফেললো।

বড়দি এলেন। বীণা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'চলো বাড়ি যাই।'

'এখনই?' ব'লেই বড়দি একবার ওব দিকে, একবাব আমার দিকে তাকালেন। 'ব্যাপার কী, ঝগড়া করেছো নাকি দু'জনে?'

বীণা এমনভাবে হেসে উঠলো যাতে বড়দির কথাটার চরম অসারতা প্রমাণ করা হয়, কিন্তু হাসিটা তেমন খুললো না। আমিও গম্ভীর হ'য়ে থাকলুম।

সেই রাত্রে আমি মনস্থির করলুম। আর না—এখানেই ইতি। বীণা যখন আমাকে অমন কথা মুখের উপরেই বলতে পারলো, মনে-মনে আবো যে কত কী ভাবে, তা কল্পনা ক'বে আমি ঘেমে উঠলুম। 'ঘুরঘুর' কথাটা মাথার মধ্যে পোকার মতো কুরে খেতে লাগলো। কিন্তু হঠাৎ একটা-কিছু ক'রে ফেলাও ঠিক না—সেটা কেমন নাটুকে দেখাবে, লোকের চোখে পড়বে, আলোচনাব বিষয় হবে। হাজার হোক, এ-ক'মাসে ওঁদের সঙ্গে আমার একটু ঘনিষ্ঠতাব মতোই তো হয়েছে। মনের ভাব কিছুমাত্র প্রকাশ না-ক'রে যাওয়া আসাটা আস্তে-আস্তে কমিয়ে আনবো, তাবপর একদিন একেবারেই হাওয়া হ'য়ে যাবো—কাবো মনেই হবে না যে, উল্লেখযোগ্য কিছু হ'লো—আমিও শান্তি পাবো, ওঁরাও বাঁচবেন, একটা বোকা মানুষের অবাঞ্ছিত সঙ্গ বীণাকেও আব ভোগ কবতে হবে না।

মনে-মনে এইরকম সংকল্প ক'রে পবেব দিন গিয়ে দেখি, বীণা সেজে-গুজে বাইবের ঘবে ব'সে আছে। আমাকে দেখেই বললো, 'এই তো আপনি এসেছেন!'

আমি ওর দিকে এক ঝলক তাকাতেই আবার বললো, 'আমার এমন ভয হচ্ছিলো যে, আপনি বুঝি আর আসবেন না।'

বুঝলুম, কালকের আঘাতের উপর মিষ্টি কথার পুলটিশ লাগানো হচ্ছে। মুখে একটু হাসি টেনে বললুম 'আসবো না কেন?

বীণা খুব সরলভাবে ব'লে উঠলো, 'আমিও তো তা-ই বলি! কিন্তু কাল বড়দি আমাকে কী বকাটাই বকলেন!'

'বকলেন! কেন?'

'আমি নাকি ভীষণ অভদ্র, অভব্য, অসভ্য—'

'কী? হয়েছে কী?'

'আমি তো বলছিই যে ও-কথা বলা আমার অন্যায় হয়েছিলো—তাবপরেও আবার এত কথা কেন? যাক, আপনি এলেন, আমি এবার নিশ্চিন্ত। বড়দি, ও বড়দি,' বীণা ওখানে ব'সে-ব'সেই ডাকলো, 'এসো এখানে, অবনীবাবু এসেছেন!'

বীণার এ-রকম ফুর্তি আমি শিগগির দেখিনি, কখনোই দেখিনি বলা যায়—কেননা, আমি ওকে প্রথম যখন দেখলুম তখন থেকেই ও প্রেমের প্রভাবে মুহ্যমান। ওকে ভারি নতুন লাগলো, ছেলেমানুষ লাগলো, ভালো লাগলো।

সান্ধ্য-স্নানের পরে একখানা চওড়া পাড় তাঁতের শাড়ি প'রে বড়দি ঘরে এসে বললেন, 'বীণা, যা তো, চা-টা নিয়ে আয়। নিমকি ভাজা হচ্ছে, তা-ও কয়েকখানা আনিস।'

বীণা চ'লে যেতে বড়দি হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঐ মুন্সেফ ছেলেটিব সঙ্গেই বীণার বিয়ে ঠিক করলুম, অবনী। পাত্রপক্ষের তাড়া আছে, এদিকে মা-ও ভাবি ব্যস্ত হ'যে

পড়েছেন। আর সত্যিই তো, কতই-বা আর দেরি করা যায়!'

শুনে আমার মনে হ'লো বীণা যেন এঁদের ভার হয়েছে, তাকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচেন এঁরা। ভালো লাগলো না কথাটা।

'এই জষ্টিমাসেই উনতিরিশে একটা তারিখ আছে, আমরা ভাবছি, সেদিনই—'

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, 'এত শিগগির!'

'গায়ত্রীকে চিঠি লিখে দেয়া হয়েছে—ওরা এসে পড়বে শিগগিরই।'

ব্যাপাব এত দূর! অথচ আমি কিছুই জানি না! অবশ্য আমার জানবার কথাই-বা কী হয়েছে—আমি এঁদের কে-বা। আর সেইজন্যই কি বীণার এত ফূর্তি আজ?

বড়দি বললেন, 'তুমি যে কিছু বলছো না?'

'আমি আর কী বলবো—শুধু ভাবছিলুম—'

'কী ভাবছিলে সেটাই তো জানতে চাই।'

'ওর নিজের মত হয়েছে?'

'বীণার? ওর মতের জন্য ব'সে থাকতে হ'লেই হয়েছে! ওর সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও তো ছেলেমানুষ হ'তে পাবি না।'

তার মানে, মত নেই? মতের বিরুদ্ধেই বিয়ে! তবু এত ফূর্তি?

চা এলো, নিমকি এলো, বীণা ও এল। কিন্তু চা আমাব মুখে তেতো লাগলো, নিমকি বিস্বাদ, বীণাব দিকে তাকালুমও না।

চায়ের পর বড়দি বললেন, 'আজও যাবে—লেকে?'

অন্যমনস্ক হ'যে পড়েছিলুম, হঠাৎ চমকে বললুম, 'আমাকে বলছেন?'

'হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি। তোমার গাড়ি না-হয় থাক—বেশি দূর তো না—হাঁটতে বেশ লাগবে।'

পাড়াব সকলের সঙ্গেই বড়দির জানাশোনা, রাস্তায় বেরিয়েই তাঁর সমবয়সী সঙ্গিনী জুটলো, একটু পরেই দেখলুম, বীণা আব আমি ওঁদের ফেলে অনেকটা এগিয়ে গেছি। তখনকার দিনে বালিগঞ্জে মেয়েদের অবাধ চলাফেরা সবে আরম্ভ হয়েছে। সেইটি লক্ষ্য ক'রে বললুম, 'মেযেদের এই স্বাধীনতাটা খুব ভালো জিনিশ হয়েছে।'

বীণা বললো, 'হেঁটে-চলে বেড়াবার স্বাধীনতাই বুঝি সব?'

'আস্তে-আস্তে সব বিষয়েই হবে।'

'কোথায় আর?'

অনেকক্ষণ ধ'বেই কথাটা জিভের ডগায় নিশপিশ করছিলো —এই সুযোগে ব'লে ফেললুম. 'বড়দির মুখে একটা সুখবর শুনলুম।'

'কী সুখবর?'

'এই জষ্টিমাসের উনতিরিশেই নাকি—'

'পাগল হয়েছেন!'

'কথাটা কি তাহ'লে ঠিক না!'

'যাঁব কাছে শুনেছেন, তাঁকেই জিজ্ঞেস করুন!'

আমি আর কিছু বললুম না, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে মনটা কেমন হালকা লাগলো। যে-বীণা কাল অমন ক'রে বললো যে, রমেনকে সে জীবনেও ভুলতে পারবে না. আজ যদি তারই মুখে শুনতে হ'তো যে, সে স্বেচ্ছায় এক নবীন মুন্সেফকে বিয়ে করতে যাচ্ছে তাহ'লে কি খুবই দুঃখের কথা হ'তো না? কিন্তু কেন—দুঃখই-বা কিসের, এ-রকম কি সংসারে হয় না? খুব হয় ; রোজই হচ্ছে—আর এতে দোষ-ই বা কী? অন্যদের যদি-বা দোষ দেয়া যায়, বীণার কোনো দোষের কথা ওঠেই না—রমেন না-একবার আসে, না-একটা খবর নেয়, বোধহয় রুথকে নিয়েই মশগুল—স্কাউড্রেল! আমার যদি হাত থাকতো আমি ওকে কানে ধ'রে টেনে এনে বিয়ের পিঁড়িতে

বসিয়ে দিতুম—কিন্তু আমিই-বা এত ভাবছি কেন, আমার কোন্ দায়? এই-না আমি কাল রাত্রেই...আমিই-না প্রতিজ্ঞা করলুম যে, এখানেই দাঁড়ি টানবো? সত্যই...কী করছি আমি এখানে, কেনই-বা রোজ আসি, কী কুক্ষণেই 'নব নীড়' নাটক হয়েছিলো! আমার এখন প্র্যাকটিস গ'ড়ে তোলবার সময়, অন্য কোনো দিকে তাকানোই উচিত না। নাঃ—হঠাৎ আমার কথাটা মনে হ'লো—কলকাতা না ছাড়লে আমার পরিত্রাণ নেই। যাই না কয়েকদিন দারজিলিং ঘুরে আসি—তারপর নতুন উদ্যম, নতুন মন নিয়ে কাজে বসবো—হ্যাঁ, এইটে ঠিক বুদ্ধি এসেছে মাথায়।

নিজের ভাবনায় মগ্ন ছিলুম, হঠাৎ বীণার স্বর কানে এলো, 'কী ভাবছেন?'

সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিলুম, 'আমি দারজিলিং যাচ্ছি।' কথাটা নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনালো।

'কেন?'

'এমনি—বেড়াতে।'

'কবে যাচ্ছেন?'

ব'লে ফেললুম, 'জুন মাস পড়লেই যাবো।'

'তার মানে—শিগগিরিই?'

'শিগগিরই।'

বীণা হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললো, 'একটু দাঁড়ান—বড়দি অনেক পিছিয়ে পড়েছেন!'

আর কী! সাত দিন পরেই যখন দারজিলিং যাচ্ছি, তখন এ-ক'দিনের জন্য আর নিয়মভঙ্গ ক'রে কী হবে! রোজই যাচ্ছি, এবং লেকে বেড়ানোটাও নিত্যনৈমিত্তিক হ'য়ে উঠেছে। এ বিষয়ে বড়দিরই উৎসাহ, লেকে পাড়ার অনেকের সঙ্গেই তাঁর দেখা হয়, আমাদের ফেলে তাদের সঙ্গে আড্ডা জমান তিনি। আমি আর বীণা খানিকটা হাঁটি, খানিকটা বসি, কখনো গল্প করি, কখনো চুপ ক'রে থাকি। এ-ক'দিনে পৃথিবীর অনেক বিষয়েই আমরা আলোচনা করেছি, এবং আশ্চর্যের বিষয় এইটে দেখা গেছে যে, পৃথিবীর অনেক বিষয়েই আমরা একমত।

জুন মাসে পয়লা তারিখে বীণা জিগেস করলো, 'কবে যাচ্ছেন?'

'যাচ্ছি? কোথায়?'

'তাহ'লে দারজিলিং যাচ্ছেন না।'

লজ্জার ভাবটা চাপা দেবার জন্য অনর্থক কথা বললুম—'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাচ্ছি বইকি, এখন একটা জরুরি কেস হাতে আছে, তাই—'

'ঠিকই যাবেন?'

'নিশ্চয়ই!' কথাটা বার-বার বলতে-বলতে আমার নিজেরই জেদ চাপলো—হ্যাঁ, যাওয়াই চাই।

বীণা লেকের জলের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বললো, 'না, যাবেন না।'

'যাবো না! আপনি বলছেন কী!' নিজের কানেই ধরা পড়লো আমার গলার কাঁপুনি।

'না, যাবেন না,' বীণা আবার বললো। 'আপনি তো জানেন না—বড়দিরা সত্যি-সত্যি—সব ঠিক ক'রে ফেলেছেন—এই উনতিরিশ তারিখেই—কিন্তু আমি পারবো না—ঐ প্যান্ট-পরা মুন্সেফকে বিয়ে করতে পারবো না আমি—'

বিশেষণটা আমার কানে ভালো ঠেকলো না, কেননা, আমিও নিয়মিতই শ্বেতাঙ্গ-বেশ ধারণ ক'রে থাকি, ডাক্তারদের ওটা করতেই হয়। গম্ভীরভাবে বললুম, 'প্যান্ট পরলে যমেরে মতো ভালো কি আর সকলকে দেখায়, তাই ব'লে—'

বীণা আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো, 'তাই ব'লে এই ক্যাবলাকান্ত কে না কে!'

অভিভাবকের ভাব ধ'রে বললুম, 'একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে কি ও-রকম বলা উচিত?'

'তা, ভদ্রলোক ভদ্রলোকের মতো থাকলেই পারেন। আপনি দেখবেন, দিদিরা যা ভাবছেন তা কিছুতেই হবে না।'

'কিন্তু, বিয়ে তো আপনাকে করতেই হবে।'

'করতেই হবে কেন?'

'আপনি তো ছেলেমানুষ নন—আপনি তো বোঝেন সব।'

'আপনিও এই কথা বলেন!' ব'লে বীণা আবার জলের দিকে তাকালো। একবার ওর চোখের দিকে তাকালুম আমি, একবার জলের দিকে। মনে হ'লো দুটো একই ধরণের জিনিশ কালো আর শাদা, ছলছলে আর ভিজে-ভিজে।

হঠাৎ আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বীণা বললো, 'না—আমি পারবো না—আপনি যাবেন না, আমাকে বাঁচান।'

'আমি! আমি কী ক'রে বাঁচাবো আপনাকে?'

ব'লেই বুঝলুম, এই প্রশ্ন একেবারেই অনর্থক, অনেক আগেই বীণা তাব জবাব দিয়েছে!...

সুখবর পেয়ে সকলের আগে ছুটে এলো রমেন। এসেই প্রকাণ্ড তিন লাফ দিলো, আমাকে জড়িয়ে ধ'রে শূন্যে তুললো, চাকরদের ডেকে বকশিষ দিলো পাঁচ-পাঁচ টাকা—তারপর ঝড়ের মতো বেরিয়ে গিয়ে, ঝড়ের মতো ফিরে এলো ঘণ্টাখানেক পরে। পান্না-বসানো আংটি আর রূপোর কাজ-করা বেনারসি আমার হাতে দিয়ে বললো, 'এই রইলো তোমার অধিবাসের তত্ত্ব—ও-বেলা যেয়ো শৈলেশদার ওখানে—ওঁরা আজই এলেন।'

শৈলেশদার সঙ্গে দেখা হ'তেই তিনি মুচকি হেসে বললেন, 'কী হে, কী সব শুনছি?'

'নব নীড় তাহ'লে তোমার কপালেই সার্থক হলো!' বললেন গায়ত্রী দেবী।

শৈলেশবাবু বললেন, 'তা-ই দেখছি! অবনীর "নব নীড়"— বাঃ, বেশ মিলেও গেলো!'

'মিলবে না! যা মিল ওরা বানিয়েছে, এখন তো মুখে-মুখে মিলে যাবে।'

স্বামী-স্ত্রীতে এমনি চালালেন খানিকক্ষণ, আমি লাল হ'য়ে বোকার মতো হাসতে লাগলুম। যা কাটলো সেই কয়েকটা দিন! একদিকে দুই শ্যালিকার চোখা-চোখা বাক্যবাণ—এখানেও শৈলেশবাবু একটা মিল দিয়ে বললেন যে, ভাগ্যবানের কপালেই বাক্যবাণ জোটে—অন্যদিকে অন্য সব ব্যবস্থা—নতুন বাড়ি খুঁজে বের করা, সংসারে দরকারি সব জিনিশপত্র কেনা—রমেন আমার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে সব ঠিক ক'রে দিলো, নয়তো আমি একা কি পারতুম! আর তারপর—তারপর আব কী সেই উনতিরিশে জ্যৈষ্ঠ। নতুন বাড়িতে এলুম, রমেন সকাল থেকে ব'সে আছে—সে-ই বরপক্ষের সোল বেপ্রেজেন্টেটিভ—তার সুন্দর মুখের উৎসাহে জ্বলজ্বলে চেহারা আজও আমার মাঝে-মাঝে মনে পড়ে—আর হঠাৎ মনটা একটু খারাপও হ'য়ে যায়। সে-ই তো জাগিয়েছিলো বীণাকে—আর আমি পেয়েছিলুম। আমি কি তাহ'লে হাতের কাছে-পাওয়া জিনিশমাত্র ছিলাম? আমি না-হ'য়ে অন্য কেউ কাছে এসে পড়লেও এ-ই হ'তো? আমার বদলে সেই প্যান্ট-পরা মুন্সেফও? বিয়ের পরে বীণাকে জিগেস করেছিলুম কথাটা, সে রীতিমতো বৌ-বৌ ভাব ক'রে জবাব দিয়েছিলো—যাওঃ! তারপর এও বলেছিলো যে, রমেনকে নিয়ে যে-কাণ্ড সে করেছিলো তা ভাবতে এখন তার হাসি পায়। হাসি পায়? এখনই? তাহ'লে দৈবাৎ যদি আমার সঙ্গে তখন বিয়ে না হ'তো, তাহ'লে আবার কয়েক মাস পরে—কিন্তু ঐ-সব বাজে কথা ভেবে লাভ কী, বীণাকে নিয়ে দিব্যি সুখেই তো জীবনটা কেটে গেলো।

ডাক্তারের এই জবানবন্দি সোৎসাহে গৃহীত হ'লো। কনট্র্যাক্টরের খানিক আগে হয়তো ঝিমুনি এসেছিলো, কিন্তু 'নব নীড়ে'র ঘটনাবলী শুনতে-শুনতে তিনি সশব্দে হেসে উঠলেন কয়েকবার, আর দিল্লীওলার সুগঠিত ঠোঁটেও কৌতুকের ক্ষীণ রেখা মাঝে-মাঝে দেখা দিলো। শুধু সাহিত্যিকটি যেন নিঃসাড়—পকেটে হাত ঢুকিয়ে মাথা এলিয়ে চুপ—কিন্তু ডাক্তার থামার পরে তিনিই প্রথম কথা বললেন।

'এটা ঘটকালির গল্প হ'লো, প্রেমের গল্প না।'

'ঠিক আছে,' জবাব দিলেন দিল্লীওলা। 'এর পরে প্রেমের গল্প আপনার মুখে শুনবো।'

'ক-টা বাজলো?'

'প্রায় তিনটে।'

'প্রায় তিনটে! ওঃ, রাত কী লম্বা! শীত কী প্রচণ্ড! আমাদের গাড়ি আসবার কোনো খবর নেই এখনো?'

'কিচ্ছু না!'

'তা হ'লে এখন ঘুমের চেষ্টা করা যাক—ব'সে-ব'সেই মন্দ কী!'

রাত-জাগা ভাঙা গলায় কনট্র্যাক্টর বললেন, 'উহুঁ'—এখন আব ফাঁকি দিলে চলবে না। এবার আপনার পালা আরম্ভ করুন।'

সাহিত্যিক হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন, পকেট থেকে বের ক'রে হাতে হাতে ঘষলেন, ঘরের মধ্যে খুব জোরে পায়চাবি করলেন কয়েকবার। তারপর আবার ব'সে বদমেজাজি আওয়াজে বললেন, 'প্রেমের গল্প? এই শীতে! আচ্ছা :'

সাহিত্যিকের স্বগতোক্তি

আমরা তিনজন একসঙ্গে তার প্রেমে পড়েছিলাম . আমি আব অসিত আর হিতাংশু ; ঢাকায, পুরানা পল্টনে, উনিশ-শো সাতাশে। সেই ঢাকা, সেই পুরানা পল্টন, সেই মেঘে-ঢাকা সকাল।

এক পাড়ায় থাকতাম তিনজন। পুরানা পল্টনে প্রথম বাড়ি উঠেছিলো তারা-কুটিব, সেইটে হিতাংশুদের! বাপ তার পেন্সন-পাওয়া সব-জজ, অনেক পয়সা জমিয়েছিলেন, এবং মস্ত বাড়ি তুলেছিলেন একেবারে বড়ো রাস্তার মোড়ে। পাড়ার পয়লা নম্বব বাড়ি তাবা-কুটির, দু'-অর্থেই তা-ই, সবচেয়ে আগেকার এবং সবচেয়ে ভালো। ক্রমে-ক্রমে আরো অনেক বাড়ি উঠে ঘাস আর লম্বা-লম্বা চোরকাঁটা-ছাওয়া মাঠ ভ'রে গেলো, কিন্তু তারা-কুটিরেব জুড়ি আর হ'লো না।

আমরা এসেছিলাম কিছু পরে, অসিতদের বাড়ির তখন ছাদ পিটোচ্ছে। একটা সময় ছিলো, যখন ঐ তিনখানা বাড়িই ছিলো পুরানা পল্টনে ; বাকিটা ছিলো এবড়োখেবড়ো জমি, ধুলো আব কাদা, বর্ষায় গোড়ালি-জলে গা-ডোবানো হলদে-হলদে-সবুজ রঙের ব্যাং আর নধর সবুজ ভিজে-ভিজে ঘাস। সেই বর্ষা, সেই পুরানা পল্টন, সেই মেঘ-ডাকা দুপুর।

আমরা তিনজন একসঙ্গে থাকতাম সবসময়—যতটা এবং যতক্ষণ একসঙ্গে থাকা সম্ভব। রোজ ভোরবেলায় আমার শিয়রের জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে অসিত ডাকতো, 'বিকাশ! বিকাশ!' আর আমি তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে আসতাম ; দেখতাম, অসিত সাইকেলে ব'সে আছে এক পা মাটিতে ঠেকিয়ে—এমন লম্বা ও, ওর কাঁধে হাত রাখতে কনুই ধ'বে যেতো আমার! হিতাংশুকে ডাকতে হ'তো না, দাঁড়িয়ে থাকতো তাদের বাগানের ছোটো ফটকের ধারে, কি ব'সে থাকতো বাগানের নিচু দেয়ালে পা ঝুলিয়ে, তারপর অসিত সাইকেলে চেপে চ'লে যেতো পাকা শড়ক ধ'রে স্কুলে, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে, আমি আর হিতাংশু ঘুরে-ঘুরে বেড়াতাম হাতে হাত ধ'রে, হাওয়ার গন্ধ, যেন কিসের, যেন কার, সে-গন্ধ আজও যেন পাই, কী মনে পড়ে, কাকে মনে পড়ে।

বিকেলে দুটি সাইকেলে তিনজনে চ'ড়ে প্রায়ই আমরা শহরে যেতাম, কোনোদিন বিখ্যাত ঘোষবাবুর দোকানে চপ-কাটলেট খেতে, কোনোদিন শহরের একটিমাত্র সিনেমায়, কোনোদিন চিনেবাদাম পকেটে নিয়ে নদীর ধারে। সাইকেল চালানোটা আমার জীবনে হ'লো না—চেষ্টা ক'রেও শিখতে পারিনি ওটা—কিন্তু ঐ দু-চাকার গাড়িতে চড়েছি অনেক, কখনো অসিতের, কখনো হিতাংশুর

গলগ্রহ হ'য়ে লম্বা-লম্বা পাড়ি দিয়েছি তাদের পিছনে দাঁড়িয়েই। আবার কত সন্ধ্যা কেটেছে পুরানা পল্টনেরই মাঠে, ঘাসের সোফায় শুয়ে ব'সে, ছোটো-ছোটো তারা ফুটেছে আকাশে, চোরকাঁটা ফুটেছে কাপড়ে, হিতাংশুদের সামনের বারান্দার লণ্ঠনটা মিটমিট করছে দূর থেকে। এ-সময়টা হিতাংশু বেশিক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকতো না—আটটার মধ্যে তাকে ফিরতেই হ'তো বাড়িতে। অত কড়া শাসন আমার উপর ছিলো না, অসিতেরও না, দু'জনে ব'সে থাকতাম অন্ধকারে, ফেরবার সময় আস্তে একবার ডাকতাম হিতাংশুকে, পড়া ফেলে উঠে এসে চুপি-চুপি দু'-একটা কথা ব'লেই সে চ'লে যেতো।

আমরা তিনজন তিনজনের প্রেমে পড়েছিলাম, আবার তিনজন একসঙ্গে অন্য-একজনের প্রেমে পড়লাম, সেই ঢাকায়, পুরানা পল্টনে, উনিশ-শো সাতাশ সনে।

নাম তার—অন্তরা। তখনকার ঢাকার পক্ষে নামটি অত্যন্তই শৌখিন। কিন্তু ঢাকার মতো কিছুই তো তাঁদের নয়, মেয়ের নামই-বা হবে কেন। ভদ্রলোক প্রচণ্ড সাহেব—আমাদের তখন তা-ই মনে হ'তো—আর ভদ্রমহিলা এমন সাজেন যে, পিছন থেকে হঠাৎ তাঁকে মেয়ে ব'লে ভুল হয়। আর তাঁর মেয়ে, তাঁদের মেয়ে, তার কথা আর কী বলবো। সে সকালে বাগানে বেড়ায়, দুপুরে বারান্দায় ব'সে থাকে বই কোলে নিয়ে বিকেলে রাস্তায় হাঁটে প্রায় আমাদের গা ঘেঁষেই, সব-সময় দেখা যায় তাকে, মাঝে-মাঝে শোনা যায় গলার আওয়াজ—সেই ঢাকায়, সুদূর সাতাশ সনে, কোনো একটি মেয়েকে চোখে দেখাও যখন সহজ ছিলো না, যখন বন্ধ-গাড়ির দরজার ফাঁকে একটুখানি শাড়ির পাড় ছিলো আমাদের স্বর্গের আভাস, তখন—এই যে মেয়ে, যাকে দেখতে পাই এক-একদিন এক-এক রঙের শাড়িতে, আর তার উপর নাম যার অন্তরা, তার প্রেমে পড়বো না এমন সাধ্য কী আমাদের!

নামটা কিন্তু বের করেছিলাম, আমি। রোজ সই ক'রে পাঁউরুটি রাখতে হয় আমাকে। একদিন রুটিওলার খাতায় নতুন একটি নাম দেখলাম নীল কালিতে বাংলা হরফে পরিষ্কার ক'রে লেখা—'অন্তরা দে'। একটু তাকিয়ে থাকলাম লেখাটুকুর দিকে, খাতা ফিরিয়ে দিতে একটু দেরিই করলাম, তারপর বিকেলে হিতাংশুকে বললাম, 'নাম কি, অন্তরা?'

'কার—?' কিন্তু তক্ষুনি কথাটা বুঝে নিয়ে হিতাংশু বললো, 'বোধহয়।'

অসিত বললো, 'তাকে তরু ব'লে।'

তরু! এই ঢাকা শহরেই দু'-তিনশো অন্তত তরু আছে, কিন্তু সে-মুহূর্তে আমার মনে হ'লো, এবং আমি বুঝলাম অসিতেরও মনে হ'লো যে, সমস্ত বাংলা ভাষায় তরুর মতো এমন একটি মধুর শব্দ আর নেই। তা হোক, হিতাংশুর একটু বাজে কথা বলাই চাই, কেননা যাকে নিয়ে, বা যাদের নিয়ে কথা হচ্ছে, ওদেরই বাড়ির একতলায় তারা ভাড়াটে, আমাদের চাইতে বেশি না-জানলে ওর মান থাকে না। তাই ওর নাকের বাঁশিটা একটু কুঁচকে বললো, 'অন্তরা থেকে তরু—এটা কিন্তু আমার ভালো লাগে না।'

'ভালো না কেন, খুব ভালো।' গলা চড়িয়ে দিলাম, কিন্তু ভিতরটা কেমন দ'মে গেলো।

'আমি হ'লে, অন্তরাই ডাকতাম।'

কী সাহস! কী দুঃসাহস! তুমি ডাকতে, তাও আবার নাম ধ'রে! ঈশ! প্রতিবাদের তাপে আমার মুখ গরম হ'য়ে উঠলো, বেশ চোখা-চোখা কয়েকটা কথা মনে-মনে গোছাচ্ছি, ফশ ক'রে অসিত ব'লে উঠলো, 'আমিও তাই।'

বিশ্বাসঘাতক!

এ-রকম ছোটো-ছোটো ঝগড়া প্রায়ই হ'তো আমাদের। এমন দিন যায় না যেদিন ওকে নিয়ে কোনো কথা না হয়, আর এমন কোনো কথা হয় না যাতে তিনজনেই একমত হ'তে পারি। সেদিন যে নীল শাড়ি পরেছিলো তাতেই ভালো দেখাচ্ছিলো, না, কালকের বেগনি রঙেরটায় ; সকালে যখন বাগানে দাঁড়িয়েছিলো তখন পিঠের উপর বেণী দুলছিলো, না, চুল ছিলো খোলা ; বিকেলে

বারান্দায় ব'সে কোলের উপর কাগজ রেখে কি চিঠি লিখছিলো, না, আঁক কষছিলো। এমনি সব সমস্যা নিয়ে চ্যাঁচামেচি ক'রে আমরা গলা ফাটাতাম। সবচেয়ে বেশি তর্ক হ'তো যে-কথা নিয়ে সেটা একটু অদ্ভুত। ওর মুখের সঙ্গে 'মোনা লিসা'র মিল কি খুব বেশি, না অল্প একটু, না, কিছুই না। আমি তখন প্রথম মোনা লিসার ছাপা ছবি দেখেছি এবং বন্ধুদের দেখিয়েছি। হঠাৎ একদিন আমারই মুখ দিয়ে বেরোলো কথাটা—বললাম, 'ওর মুখ অনেকটা মোনা লিসার মতো।' তারপর এ নিয়ে অসংখ্য কথা খরচ করেছি আমরা, কোনো মীমাংসা হয়নি, তবে একটা সুবিধে এই হ'লো যে, আমাদের মুখে-মুখে ওর নাম হ'য়ে গেলো মোনা লিসা। অন্তরালে। যতই সুর করুক [illegible] যতই তরুণতা, যে-নামে ওকে সবাই ডাকে, সে নামে তো [illegible] পায় না। অন্য একটি নাম, যা আমরা শুধু জানি আর কেউ জানে না, [illegible] আমরা যেন ওকেই পেলাম।

হিতাংশুকে প্রায়ই বলতাম, 'তোমার সঙ্গে [illegible]' হিতাংশুও একটু লাল হ'য়ে বলতো, 'যাঃ!' [illegible] তা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনাই চলতো আমাদের, কিন্তু মনে-মনে আমরা ধ'রেই নিয়েছিলাম যে, এ-সব কিছু না, শুধুই কথা, কথার কথা।

একদিন সন্ধ্যার পরে তিনজনেই ফিরছি সাইকেলে, [illegible] আমি হিতাংশুর পিছনে। নির্জন পথে নিশ্চিন্তে গল্প চালিয়েছি, হঠাৎ হিতাংশু [illegible] সাইকেলের উপর [illegible] কেঁপে উঠলো, সঙ্গে-সঙ্গে আমি প্রায় প'ড়ে যাচ্ছিলাম [illegible] সাইকেলের পিছন থেকে, টাল সামলাতে গিয়ে টেনে ধরলাম হিতাংশুর জামার গলা 'উঃ' ব'লে সে নেমে পড়লো, আমিও পায়ের তলায় মাটি পেলাম। সঙ্গে-সঙ্গে মোটা গলায় একজন ব'লে উঠলেন, 'Take care young men!' তাকিয়ে দেখি ঠিক আমাদের সামনে দে-সাহেব দাঁড়িয়ে, আর তাঁর স্ত্রী আর মেয়ে। অসিত [illegible] ঘুরিয়ে এক পা মাটিতে ঠেকিয়ে চুপ ক'রে আছে, মুখের ভাবটা [illegible]

'Really you must—' বলতে বলতে দে সাহেব হিতাংশুর মুখের উপর চোখ [illegible] 'Oh it's you! কেশববাবুর ছেলে!'

আমি স্পষ্ট দেখলাম, হিতাংশুটা বোকার মতো ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে আছে।

'আর এরা—তিনজনকে একসঙ্গেই তো দেখতে পাই সব সময়, বন্ধু বুঝি? বেশ বেশ। I like young men. এসো একদিন আমাদের ওখানে তোমরা।'

ওঁরা চ'লে গেলেন। আমরা রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে ঘাসের উপর পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম লম্বা হ'য়ে। একটু পরে অসিত বললো, 'কী কাণ্ড! হিতাংশু ঘাবড়ে গিয়েছিলে, না?'

'না তো! ঘাবড়াবো কেন? ব্রেকটা হঠাৎ—'

'কোনোদিন এ-রকম হয় না। আর আজ কিনা একেবারে ওঁদের সামনে।'

'বেশ তো! হয়েছে কী তাতে? কারো গায়েও পড়িনি, প'ড়েও যাইনি। হঠাৎ ব্রেকটা কষতে গিয়ে—'

'না, না, তুমি তো ঠিকই নেমেছিলে, তবে তোমার মুখটা যেন কেমন হ'য়ে গিয়েছিলো। আর বিকাশ তো—'

আমার নাম করতেই আমি খেঁকিয়ে উঠলাম, 'চুপ করো! ভালো লাগে না!'

'ও বোধহয় একটু হেসেছিলো', অসিত তবু ছাড়লো না। ('ও' বলতে কাকে বোঝায়, তা বোধহয় না-বললেও চলে।)

'হেসেছিলো তো ব'য়ে গেলো!' চীৎকার ক'রে বললো হিতাংশু, কিন্তু সে-চীৎকার যেন কান্না।

'তুমি দেখেছিলে, বিকাশ? ঠিক মোনা লিসার হাসির মতো কি?'

'যা বোঝো না, তা নিয়ে ঠাট্টা কোরো না।' বলতে গিয়ে আমার গলা ভেঙে গেলো। সে রাত্রে ভালো ঘুমোতে পারলাম না, দু-দিন আধ-মরা হ'য়ে থাকলাম, সাতদিন মন-মরা।

রাগ করি আর যা-ই করি, আমাদের মধ্যে অসিতটাই তুখোড়। সে কেবলই বলতে লাগলো,—'চলো না একদিন যাই আমরা ওদের ওখানে।'

'পাগল নাকি!'

'কেন? দে-সাহেব বললেন তো যেতে। বললেন না?'

ক্রমে-ক্রমে হিতাংশুর আর আমারও ধারণা জন্মালো যে, দে-সাহেব সত্যিই আমাদের যেতে বলেছেন, প্রায় নিমন্ত্রণই করেছেন, আমরা গেলে রীতিমতো সুখী হবেন তিনি, না-গেলে এমনকি তাঁকে অসম্মানই করা হবে। তাঁর সম্মানবক্ষার জন্য আমরা ক্রমশঃই বেশি ব্যস্ত হ'তে লাগলাম। রোজ সকালে স্থির করি, 'আজ', বোজ বিকেলে মনে করি, 'আজ থাক।' কোনোদিন দেখি ওঁরা বাগানে বসেছেন বেতের চেয়ার টেনে ; কোনোদিন বাড়িব সামনে মোটরগাড়ি দাঁড়ানো, দেখেই বুঝি—শহরের একমাত্র ব্যারিস্টর দাস-সাহেব বেড়াতে এসেছেন ; আর কোনোদিন-বা চুপচাপ দেখে ধ'বে নিই ওঁরা বেরিয়েছেন। দৈবাৎ একদিন হয়তো চোখে পড়ে দে-সাহেব একা ব'সে খবর-কাগজ, পড়ছেন মনে হয় এইটে ভারি সুসময়, কিন্তু বাগানের গেটেব সামনে পা থমকে যায় আমাদের, অসিতের ততটা নয়, যতটা হিতাংশুর, হিতাংশুর ততটা নয়, যতটা আমার ; একটু ঠেলাঠেলি ফিশফিশানি হয়, আর শেষপর্যন্ত 'তারা-কুটিব' ছাড়িয়ে মোড় ঘুবে আমরা চ'লে যাই। কেবলই মনে হয় এখন গেলে বিরক্ত হবেন, আবার তখনই ভাবি—বিরক্ত কিসের, আর এ নিয়ে এত ভাববারই-বা কী আছে, মানুষ কি মানুষের সঙ্গে দেখা কবে না! আমবা চোবও নই, ডাকাতও নই, যাবো, বসবো, আলাপ কববো, চ'লে আসবো— ব্যস!

সেদিন আকাশে মেঘ, টিপটিপ বৃষ্টি। বাইরে থেকে দেখে মনে হ'লো, ওঁরা বাড়িতেই আছেন। ছোট্ট গেট ঠেলে সকলের আগে ঢুকলো অসিত, লম্বা, ফর্শা, সুশ্রী, তারপর হিতাংশু, গম্ভীর, চশমা-পবা, ভদ্রলোক-মাফিক, আর সকলেব শেষে পুঁচকে আমি। বাগান পার হ'য়ে বারান্দায় উঠে দাঁড়ালাম আমবা, কাউকে ডাকবো কিনা, কাকে ডাকবো, কী ব'লে ডাকবো, এইসব ভাবতে-ভাবতেই পরদা ঠেলে দে সাহেব নিজেই বেরিয়ে এলেন। দাঁতেব ফাঁকে মোটা পাইপ চেপে ঘাঁৎ ক'রে বললেন, 'Yes?'

এই বিজাতীয় সম্ভাষণে সপ্রতিভ অসিতও একটু বিচলিত হ'লো। 'আমি—আমরা—মানে আমবা এসেছিলাম—আপনি বলেছিলেন—'

আবছা-আলোয় তখন দে সাহেব আমাদেব চিনলেন। 'ও, তোমরা! তা...'

অসিত আবার বললো, 'আপনি বলেছিলেন আমাদের একদিন আসতে।'

'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ...তা' একটু কেশে—'এসো, এসো তোমবা', পরদা সরিযে দরজার ধারে দাঁড়ালেন দে-সাহেব, আমরাও দাঁড়িযে থাকলাম।

'যাও, ভিতরে যাও।'

ঢুকতে গিযে হিতাংশু তার নিজেবই বাড়ির চৌকাটে হোঁচট খেযে আমার পা মাড়িযে দিলো, আমার লাগলো খুব, কিন্তু তখন চুপ ক'রে থাকা ছাড়া আব উপায় কী। আমাদের কাদা মাখা জুতোয ঝকঝকে মেঝে নোংরা ক'রে-ক'বে এগিয়ে এলাম আমরা। কী সুন্দর সাজানো ঘর, এমন কখনো দেখিনি। পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। সামনেব দিকে সোফায় ব'সে মিসেস দে উল বুনছেন, আর দেয়ালের সঙ্গে ঠেকানো কোণের চেয়ারটিতে ব'সে আছে আমাদের মোনা লিসা, কোলের উপব মস্ত মোটা নীল মলাটের বইয়ের পাতায় চোখ নামিয়ে।

দে-সাহেব বললেন, 'সুমি, এই যে পুরানা পল্টনের থ্রী মস্কেটিঅর্স। এটি হচ্ছে কেশববাবুর ছেলে, আর এরা...

হিতাংশু পরিচয় করিয়ে দিলো, 'এর নাম অসিত ; আর এই হচ্ছে—বিকাশ।'

মিসেস দে মৃদু হেসে বললেন, 'তিন বন্ধু বুঝি তোমরা? বেশ, বেশ, রোজই তো দেখি তোমাদের। বোসো।'

একটা লম্বা সোফায় ঝুপঝুপ ব'সে পড়লাম তিন জনে। মিসেস দে ডাক দিলেন, 'তরু!'

মোনা লিসা চোখ তুললো।

'এঁরা আমাদেরই প্রতিবেশী—আর এই আমার মেয়ে।'

মোনা লিসা বই রেখে উঠলো, ছিপছিপে সবুজ একটি গাছের মতো দাঁড়ালো, অল্প হাওয়ায় গাছ যেমন নড়ে, তেমনি ক'রে মাথা নোয়ালো একটু, তারপর আবার চেয়ারে ব'সে বই খুলে চোখ নিচু করলো।

আমার মনে হ'লো আমি স্বপ্ন দেখছি।

অসিত কলকাতার ছেলে ; আমাদের সকলের চাইতে স্মার্ট, খবর-টবরও রাখে বেশি ; আর হিতাংশু—সে-ও তার বাবার সঙ্গে নানা দেশ ঘুরেছে, উচ্চারণ পরিষ্কার, আর তাছাড়া এই 'তারা-কুটির' তো তাদেরই বাড়ি। কথাবার্তা যা-একটু বললো, ওরাই দু-জনে, আমি মেঝের দিকে তাকিয়ে চুপ, কিছু বলতে ভরসাও হ'লো না, আমার পাছে বাঙাল-উচ্চারণ বেরিয়ে পড়ে। চোখ তুলে মোনা লিসাকে দেখে নেবার ইচ্ছা আমাকে ভিতরে-ভিতরে অস্থির ক'রে তুলছিলো, কিন্তু কিছুতেই পারছিলাম না।

ইলেকট্রিসিটি না-থাকলে জীবন কী-রকম দুর্বহ, ঢাকার মশা কী সাংঘাতিক, এ-সব কথা শেষ হবার পর মিসেস দে বললেন, 'তোমারা কি কলেজে পড়ো?'

অসিত যথাযথ জবাব দিয়ে সগর্বে বললো, 'হিতাংশু পনেরো টাকা স্কলারশিপ পেয়েছে ম্যাট্রিকে।'

'বাঃ, বেশ, বেশ! আমার মেয়ে তো অঙ্কের ভয়ে পরীক্ষাই দিতে চায় না।'

হঠাৎ ঘরের কোণ থেকে তাদের মতো একটি আওয়াজ বেজে উঠলো, 'বাবা, কীট্‌স্ কত বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন?'

দে-সাহেব আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা কেউ বলতে পারো?'

অসিত ফশ ক'রে বললো, 'বিকাশ নিশ্চয়ই বলতে পারবে —বিকাশ কবিতা লেখে।'

'সত্যি?' মুখে একটি ছেলেমানুষি হাসি ফোটালেন মিসেস দে, আর মুহূর্তের জন্য—আমি অনুভব করলাম—মোনা লিসার চোখও আমার উপর পড়লো। হাত ঘেমে উঠলো আমার। কানের ভিতর যেন পিঁপি আওয়াজ দিচ্ছে।

সবসুদ্ধ কতটুকু সময়? পনেরো মিনিট? কুড়ি মিনিট? কিন্তু বেরিয়ে এলাম যখন, এত ক্লান্ত লাগলো, কলেজে চারটে পাঁচটা লেকচার শুনেও তত লাগে না।

মিসেস দে জোর ক'রেই, একটা ছাতা দিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু ছাতা আমরা খুললাম না, টিপটিপ বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে মাঠের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলাম। হঠাৎ অসিত—বকবক না-ক'রে ও থাকতেই পারে না—ব'লে উঠলো, 'কী চমৎকার ওঁরা।'

হিতাংশু সঙ্গে-সঙ্গে বললো, 'সত্যি! চমৎকার!' আমি কথা বললাম না, কোনো কথাই ভালো লাগছিলো না আমার।

একটু পরে অসিত আবার বললো, 'আজ আবার তুমি হোঁচট খেলে, হিতাংশু!'

'কখন?'

'ঘরে ঢোকবার সময়।'

'যাঃ!'

'যাঃ আবার কী। আর ঘরে ঢুকে, নমস্কার করেছিলে তো মিসেস দে-কে?'

'নিশ্চয়ই!'

একটু চুপ ক'রে থেকে হিতাংশু বললো, 'কিন্তু যখন...মোনা লিসা যখন উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলো...'

অন্ধকারে আমরা তিন বন্ধু একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম, এবং অন্ধকারেই বোঝা গেলো যে, তিনজনেরই মুখ ফ্যাকাশে হয়েছে। একটি মেয়ে, একজন ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার

করলেন, আর আমরা কিনা জরদ্গবের মতো ব'সেই থাকলাম—উঠে দাঁড়ালাম না, প্রতিনমস্কার করলাম না, কিছু বললাম না, কিচ্ছু না। ওঁরা আমাদের বাঙাল ভাবলেন, কাঠ-বাঙাল, জংলি, বর্বর, খাশ কলকাতার ছেলে অসিত মিত্তিরও আমাদের মুখরক্ষা করতে পারলো না।

কী-যে মন খারাপ হ'লো, তা কি আর বলবার!

পরের দিন তিনজনে আবার গেলাম ছাতা ফেরৎ দিতে। চাকর আমাদের ঘরে নিয়ে বসালো, তারপর...তারপর মোনা লিসাই এলো ঘরে, তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম। একটু হেসে বললাম, 'এই ছাতাটা....' 'ও মা! এর জন্য আবার...বসুন...।' মনে মনে এইরকম সাজিয়েছিলাম ঘটনাটা, কিন্তু হ'লো একটু অন্য-রকম। চাকর এসে ছাতাটা নিয়ে ভিতরে চ'লে গেলো, আর ফিরে এলো না, কেউই এলো না। আমরা একটু দাঁড়িয়ে থেকে মাথা নিচু ক'রে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম—কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না।

না, না। ঐ সুন্দর ক'রে সাজানো ঘরে, যেখানে শাদা ধবধবে আলোয় দেয়ালের প্রতিটি কোণ ঝকঝক করে, যেখানে কোণের চেয়ারে ব'সে পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য মেয়েটি মস্ত মোটা বইয়ের পাতা ওল্টায়, সেখানে জায়গা নেই আমাদের। কিন্তু তাতে কী। মোনা লিসা—মোনা লিসাই।

ঝমঝম ক'রে বর্ষা নামলো পুরানা পল্টনে, মেঘে ঢাকা সকাল, মেঘ-ঢাকা দুরুদুরু দুপুর, নীল জ্যোছনায় ভিজে-ভিজে রাত্রি। পনেরো দিন ধ'রে প্রায় অবিরাম বৃষ্টির পরে প্রথম যেদিন রোদ উঠলো, সেদিন বাইরে এসে দেখি, শহরের সবচেয়ে বড়ো ডাক্তারের গাড়ি তারা-কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে।

হিতাংশুকে জিগেস করলাম, 'তোমাদের বাড়িতে কারো অসুখ নাকি?'

'না তো!'

তবে কি ওদের বাড়িতে—প্রশ্নটা উচ্চারিত না-হ'য়েও ব্যক্ত হ'লো। পরের দিন হিতাংশু গম্ভীর মুখে বললে, 'ওদের বাড়িতেই অসুখ।'

'কার?'

'ওরই অসুখ?'

'ওর অসুখ!'

'ওর!'

সেদিনও বড়ো ডাক্তাবের গাড়ি দেখলাম, তার পরদিন দু-বেলা। আমরা কি একবার যেতে পারি না, খবর নিতে পারি না, কিছু করতে পারি না? ঘুরঘুর করতে লাগলাম রাস্তায়, ডাক্তারেব গাড়ির আড়ালে। ডাক্তার বেরিয়ে এলেন, দে-সাহেব সঙ্গে-সঙ্গে গেট পর্যন্ত। আমাদের চোখেই দেখলেন না তিনি, তারপর হঠাৎ দেখতে পেয়ে বললেন, 'তোমরা একবার যাও তো ভিতরে, উনি একটু কথা বলবেন।'

সিঁড়ির উপরের ধাপে দাঁড়িয়ে ছিলেন মিসেস দে, একটা সিঁড়ি নিচে দাঁড়িয়ে অসিত বললো 'আমাদের ডেকেছেন, মাসিমা?' কলকাতার ছেলে, ডাক-টাকগুলো দিব্যি আসে, আমি ম'রে গেলেও ও-সব পারি না।

মিসেস দে ভারি-গলায় বললেন, 'তরুর অসুখ।'

'কী অসুখ?'

'টাইফয়েড।' ঐ ভয়ংকর শব্দটা আস্তে উচ্চারণ ক'রে তিনি বললেন, 'আমার কিছু ভালো লাগছে না।'

অসিত ব'লে উঠলো, 'কিছু ভাববেন না। আমরা সব ক'রে দেবো।'

'পারবে, পারবে তোমরা? দ্যাখো বাবা, এই একটাই সন্তান আমার'...বলতে-বলতে চোখ তাঁর জলে ভ'রে এলো।

মোনা লিসা, কোনোদিন জানলে না তুমি, কোনোদিন জানবে না কী ভালো আমাদের লেগেছিলো,

কী সুখী আমরা হয়েছিলাম, সেই সাতাশ সনের বর্ষায়, পুরানা পল্টনে, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, সেই জ্বরে, ঝড়ে, বৃষ্টিতে, থমথমে অন্ধকারে, ছমছমে ছায়ায়। দেড় মাস তুমি শুয়ে ছিলে, দেড় মাস তুমি আমাদের ছিলে। দেড় মাস ধ'রে সুখের স্পন্দন দিনে-রাত্রে কখনো থামলো না আমাদের হৃৎপিণ্ডে। তোমার বাবা আপিশ যান, ফিরে এসে রোগীর ঘরে একবার উঁকি দিয়েই হাত-পা এলিয়ে শুয়ে পড়েন ইজি-চেয়ারে ; তোমার মা-র সারাদিনে ফুরশৎ নেই, কিন্তু রাত্তিরে আর পারেন না তিনি, রোগীর ঘরে ক্যাম্পখাটে ঘুমোন ; আর সারারাত পালা ক'রে-ক'রে জেগে থাকি আমরা, কখনো একসঙ্গে দু-জনে, ক্বচিৎ তিনজনেই, বেশির ভাগ একলা একজন। আর তোমাকে নিয়ে এই একলা রাত-জাগার সুখ আমিই পেয়েছি সবচেয়ে বেশি—অসিত সারাদিন ছুটোছুটি করেছে সাইকেলে, হিতাংশুও বার-বার, সবচেয়ে কাছের বরফের দোকান এক মাইল দূরে, ওষুধের দোকান দু-মাইল, ডাক্তারের বাড়ি সাড়ে-তিন মাইল—কোনোদিন অসিত দশ বার যাচ্ছে, দশ বার আসছে, কতবার ভিজে কাপড় শুকোলো গায়ে, কোনোদিন রাত বারোটায় হিতাংশু ছুটলো বরফ আনতে, সব দোকান বন্ধ, রেলের ষ্টেশন নিঃসাড়, নদীর ধারে বরফের ডিপোতে গিয়ে লোকজনের ঘুম ভাঙিয়ে বরফ নিয়ে আসতে-আসতে দুটো বেজে গেলো তার ; এদিকে আমি আইসব্যাগে জলের পরিমাণ অনুভব করছি বার-বার, আর অসিত বাথরুমে বরফের ছোটো-ছোটো ছড়ানো টুকরো দু-হাতে কুড়োচ্ছে। সাইকেলে আমার দখল নেই ব'লে বাইরের কাজ আমি কিছুই প্রায় পারি না, সারাদিন ঘুরঘুর করি তোমার মা-র কাছে-কাছে, হাতের কাছে এগিয়ে দিই সব, ওষুধ ঢালি, টেম্পারেচর লিখি, ডাক্তার এলে তাঁর ব্যাগ হাতে ক'রে নিয়ে আসি, নিয়ে যাই। তারপর সন্ধ্যা হয়, রাত বাড়ে, বাইরে অন্ধকারের সমুদ্র, সে-সমুদ্রে ক্ষীণ আলো-জ্বলা একটি নৌকোয় তুমি আর আমি চলেছি ভেসে, তুমি তা জানলে না, মোনা লিসা, কোনোদিন জানবে না।

সারাদিন, সারারাত মোনা লিসা মূর্ছিতের মতো প'ড়ে থাকে, ভুল বকে মাঝে-মাঝে—এত ক্ষীণ স্বর যে, কী বলছে বোঝা যায় না—তবু যে-ক'টি কথা আমরা কানে শুনেছি তা-ই যত্ন ক'রে তুলে রেখেছি মনে, একের শোনা কথা অন্য দু-জনকে বলাই চাই , কখনো হঠাৎ অবসর হ'লে তিন জনে ব'সে সেই কথা ক'টি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, যেন তিন জন কৃপণ পৃথিবীকে লুকিয়ে তাদের মণিমুক্তা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দেখছে, বন্ধ ঘরে, অন্ধকার রাত্রে। যদি বলেছে, 'উঃ,' সে যেন বাঁশির ফুঁয়ের মতো আমাদের হৃদয়ে দোলা দিয়ে গেছে ; যদি বলেছে, 'জল', তাতে যেন নদীর সকল তরলতা ছলছল ক'রে উঠেছে আমাদের মনে।

এক রাত্রে, হিতাংশু বাড়ি গেছে, আর অসিত বারান্দার বিছানায় ঘুমুচ্ছে, আমি জেগে আছি একা। টেবিলের উপর জ্বলছে মোমবাতি, দেয়ালের গায়ে বড়ো-বড়ো ছায়া কাঁপছে, অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ, ক'রে-ক'রে ঐ আলোটুকু আর যেন পারে না। আমিও আর পারছি না ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ডাকাতের মতো ঘুম—আমার হাত-পা কেটে টুকরো ক'রে দিলো, মোমের মতোই গ'লে যাচ্ছে আমার শরীর, যতবার চাবুক মেরে নিজেকে সোজা করছি, লাফিয়ে উঠছে অতল থেকে বিশাল ঢেউ। ডুবতে-ডুবতে মনে হ'লো, মোনা লিসা, তুমিও কি এমনি ক'রেই যুদ্ধ করছো মৃত্যুর সঙ্গে, মৃত্যু কি এই ঘুমের মতোই টানছে তোমাকে, তবু তুমি আছো, কেমন ক'রে আছো! মনে হ'তেই ঘুম ছুটলো, সোজা হ'য়ে বসলাম, তাকিয়ে রইলাম তোমার মুখের দিকে, সেই ক্ষীণ আলোয়, কাঁপা-কাঁপা ছায়া, রাত চারটের স্তব্ধ মহান্ মুহূর্তে। তুমি কি মরবে? কোনো উত্তর নেই তোমার মুখে। তোমার কি ঘুম পেয়েছে? কোনো উত্তর নেই। তুমি কি ঘুমিয়েছো, না, জেগে আছো? উত্তর নেই। তবু আমি তাকিয়ে থাকলাম, মনে হ'লো, এর উত্তর আমি পাবোই, পাবো তোমারই মুখে, তোমার মুখশ্রীতে, তোমার কণ্ঠে। আর, আমি অবাক হ'য়ে দেখলাম, আস্তে-আস্তে চোখ খুলে গেলো তোমার, মস্ত বড়ো হ'লো, পাগলের মতো ঘুরে-ঘুরে স্থির হ'লো আমার মুখের উপর, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোলো, 'কে?'

আমি তাড়াতাড়ি তার মাথায় আইসব্যাগ দিলাম।

'কে তুমি?'

'আমি।'

'তুমি কে?'

'আমি বিকাশ।'

'ও, বিকাশ! বিকাশ, এখন দিন না রাত্রি?'

'রাত্রি।'

'ভোর হবে না?'

'হ্যাঁ, এখনই হবে।'

'ও। আমি একটু ঘুমাই [illegible]'

আমি তার কপালে হাত রাখলাম।

'আঃ, খুব ভালো লাগছে [illegible]।'

আমি [illegible] 'ঘুমোও।'

'তুমি চলে যাবে না তো?'

'না।'

'যাবে না তো?'

'না।'

[illegible] দু'একটা পাখি ডাকলো। ভোর হ'লো।

[illegible] একটা আনন্দই থাক একলা আমার। এই একটা কথা ওদের দু জনকে [illegible] হ'লো না। এমনও কিছু আছে যা আমি জানি না, তার কেউ জানে না। তুমি, তোমা লিসা [illegible] জানবে না কোনোদিন।

[illegible] দুঃখের কথা কিন্তু আমরা যেন বেকার হয়ে [illegible] দিন পনেরো পর [illegible] তোমার মা আমাদের তিন [illegible] সেদিন [illegible] হ'লো যে, এই খাওয়াটা আমাদের [illegible] পার্টি।

[illegible] আমরা [illegible] পারি [illegible] পারি [illegible] লিসাকে গ্রামোফোন বাজিয়ে শোনাতে পারি [illegible] বালিশ [illegible] পারি [illegible] ক'রে। এদিকে আকাশ কালো মেঘের সঙ্গে সাদা [illegible] খেলা [illegible] নীলের মেলা এই ক'রে ক'রে আশ্বিন যেই এলো ওরা চলে গেল। [illegible]—বাঁচি। বাধাছাঁদা থেকে আরম্ভ ক'রে নারানগঞ্জের স্টিমারে [illegible] সঙ্গে [illegible] আমরা [illegible]।

ফার্স্ট ক্লাশের ডেকে [illegible] দাঁড়ানো [illegible] লিসার ছবিটি যখন চোখের সামনে ঝাপসা হ'লো, তখন আমাদের মনে পড়লো যে ওদের [illegible] বাড়ির ঠিকানাটা জেনে রাখা হয়নি। আমার ইচ্ছে করছিলো বাড়ি ফিরেই একটা চিঠি লিখে ডাকে দিই, তা আর হ'লো না।

অসিত বললে, 'ওরই তো আগে লেখা উচিত।'

'তা কি আর লিখবে। একটু [illegible] ছিলো [illegible]।'

কেন লিখবে না, [illegible] লেখায় কী আছে?'

কী আছে কে জানে, কিন্তু কুড়ি দিনের মধ্যেও কোনো চিঠি এলো না। এলো হিতাংশুর বাবার নামে মনি অর্ডারে বাড়ি ভাড়ার টাকা। তা-ই থেকে ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে আমরা চিঠি লিখবো স্থির করলাম, ও লেখেনি ব'লে আমরাও না লিখে রাগ দেখাবো এটা কোনোরকম যুক্তি ব'লেই মনে হ'লো না আমাদের। দুর্বল শরীর, হয়তো এখনো ভালো ক'রে সারেনি—কেমন আছে, সে-খবরটা আমাদেরই তো নেয়া উচিত। কিন্তু চিঠিতে পাঠ লিখবো কী? আপনি লিখবো, না, তুমি? মুখে ও অবশ্য আমাদের তুমিই বলেছে, আমরাও তা-ই, কিন্তু কতটুকু কথাই-বা এ পর্যন্ত বলেছি

আমরা—এত কথা নিশ্চয়ই বলিনি যার জোরে কালির আঁচড়ে জ্বলজ্বলে একটা 'তুমি' লিখে ফেলা যায়। তাছাড়া, কী লিখবোই-বা চিঠিতে? কেমন, ভালো তো? এতেই তো সব কথা ফুরোলো। আমরা কেমন আছি, কী করছি, সে-সব লিখলে কত কথাই লেখা যায়—কিন্তু মোনা লিসা কি আমাদের খবর জানতে ব্যস্ত?

অনেকক্ষণ ধ'রে কথা ব'লেও কোনো মীমাংসা যখন হ'লো না, তখন ওরা আমাকে বললো চিঠিখানা রচনা ক'রে দিতে। আমি কবিতা-টবিতা লিখে থাকি, তাই।

সে-রাত্রেই লণ্ঠনের সামনে ঘামতে-ঘামতে আমি একটা খশড়া করলাম। পাঠ দিলাম, 'সুচরিতাসু', তারপর বক্তব্যটা এই ধরনের দাঁড়ালো যে, আমরা এখানে ভেবেছিলাম চিঠি আসবে, কিন্তু চিঠি এলো না। ভাবতে-ভাবতে একুশ দিন কেটে গেলো। খুবই ভালো লাগছে বুঝি রাঁচিতে? অবশ্য ভালো লাগলেই ভালো, আমরা তাতেই খুশি। তারা-কুটিরের একতলা বন্ধ, পুবানা পল্টন তাই অন্ধকার। ওখানে পেট্রোম্যাক্স জ্বলতো কিনা রোজ সন্ধ্যায়। তা যা-ই হোক, আমরা ব'সে-ব'সে রাঁচির ছবি দেখছি। পাহাড়, জঙ্গল, লাল কাঁকরের রাস্তা, মিশকালো সাঁওতাল। হাসি, আনন্দ, স্বাস্থ্য। সত্যি, কী বিশ্রী অসুখ গেলো—আর যেন কখনো অসুখ না করে। কিন্তু কারো কোনো অসুখ না-ক'রেও এমন কি হয় না যে, আমাদের খুব খাটতে হয়? সত্যি—শুয়ে-ব'সে সময় আর কাটে না। চিঠি পেলে আবার আমাদেব চিঠি লিখতে হবে, কিছু তবু কাজ জুটবে। মাসিমা-মেসোমশায়কে প্রণাম।

'আপনি-তুমি' দুটোই বাঁচিয়ে এর বেশি পারলাম না। এটুকুতেই রাত তিনটে বাজলো। তাকিয়ে দেখি, কাটাকুটির ফাঁকে-ফাঁকে এই ক'টি কথা যেন কালো জঙ্গলে ঝিকিমিকি রোদ্দুব। বাব-বাব পড়লাম ; মনে হ'লো বেশ হয়েছে, আবার মনে হ'লো ছি-ছি, ছিঁড়ে ফেলি এক্ষুনি। ছিঁড়ে ফেললামও, কিন্তু তার আগে ভালো একটি কাগজে নকল ক'রে নিলাম, আর পরদিন তিনজনে বসিয়ে দিলাম যে যার নাম-সই, চোখ বুজে ছেড়ে দিলাম ডাকে।

ঢাকা থেকে রাঁচি, রাঁচি থেকে ঢাকা। চার দিন, পাঁচ দিন...আচ্ছা, ছ-দিন। না, চিঠি নেই। সন্ধ্যায় কুয়াশা, একটু একটু শীত ; চিঠি নেই। শিউলি ফুরিয়ে স্থলপদ্ম ফুটলো , চিঠি নেই।

চিঠি এলো শেষ পর্যন্ত, হিতাংশুব নামে শীর্ণ একটি পোস্টকার্ড, লিখেছেন ওর মা।

কল্যাণীয়েষু হিতাংশু অসিত বিকাশকে বিজয়ার আশীর্বাদ জানিয়েছেন, তারপর খবর এই যে, তাঁদের রাঁচির মেয়াদ ফুরোলো, শীগগিরই ফিরবেন, ইতিমধ্যে হিতাংশু যদি তাঁদের ঘরগুলি খুলিয়ে ঝাঁটপাট করিয়ে রাখে তাহ'লে বড়ো ভালো হয়। চাবি তার বাবার কাছেই আছে। আর সব-শেষে লিখেছেন যে, তরুর শরীর এখন বেশ সেরেছে, মাঝে-মাঝে আমাদের কথা বলে।

মাঝে-মাঝে আমাদের কথা বলে! আর আমাদের চিঠি? পোস্টকার্ডটি তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া গেলো না যে, চিঠিটা পৌঁচেছিলো। কী হ'লো চিঠির? কিন্তু সে-কথা বেশিক্ষণ ভাববার সময় কই আমাদেব, তক্ষুণি লেগে গেলাম কাজে। একদিনের মধ্যে তারা-কুটিরের ধুলো-পড়া একতলাকে আমরা এমন ক'রে ফেললাম যে, মেঝেতে মুখ দেখা যায়। কয়েকদিন পরে আর-একটি পোস্টকার্ড . 'ববিবাব ফিরছি, স্টেশনে এসো!' শুধু স্টেশনে? আমরা ছুটলাম—নারানগঞ্জে।

আ, কী সুন্দর দেখলাম মোনা লিসাকে, কচি পাতাব রঙের শাড়ি পরনে, লাল পাড়, কালচে মুখের রং, একটু মোটা হয়েছে, একটু যেন লম্বাও। পাছে কাছে দাঁড়ালে ধরা পড়ে যে সে আমাকে মাথায় ছাড়িয়ে গেছে, আমি একটু দূরে দাঁড়ালাম, হিতাংশু ছুটোছুটি ক'রে বরফ লেমনেড কিনতে লাগলো, আর অসিত কুলিদের ঠেলে দিয়ে বড়ো-বড়ো বাক্স-বিছানা হাঁই-হাঁই ক'রে তুলতে লাগলো গাড়িতে।

মাসিমা বললেন, 'তোমরা এ-গাড়িতেই এসো।'

'না না, সে কী কথা,—আমরা এই পাশের গাড়িতেই—'

'আরে, এসোনা—' ব'লে দে-সাহেব গার্ডকে ডেকে আমাদের বাড়তি ভাড়াটা দিয়ে দিলেন।

নারানগঞ্জ থেকে ঢাকা : মনে হ'লো আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়টি এতকাল এই পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জন্যই অপেক্ষা ক'রে ছিলো। ফার্স্ট ক্লাসের গদিকে অবজ্ঞা ক'রে আমরা বসলাম বাক্স-বিছানার উপর, তাতে একটা সুবিধে এই হ'লো যে, একসঙ্গে সকলকেই দেখতে পেলাম—দেখলাম, মোনা লিসা খুশি, ওর মা খুশি, বাবা খুশি, দেখতে-দেখতে আমরাও খুশিতে ভ'রে গেলাম ; এতদিন যা বাধো-বাধো ছিলো তা সহজ হ'লো, এতদিন যা ইচ্ছা ছিলো তা মূর্ত হ'লো—রীতিমতো কলরব করতে-করতে চললাম আমরা, এত বড়ো রেলগাড়িটা যেন আমাদের খুশির বেগেই চলেছে। মোনা লিসা নাম ধ'রে-ধ'রে ডাকতে লাগলো আমাদের—কত তার কথা, কত গল্প—আর গাড়ি যখন ঢাকা স্টেশনের কাছাকাছি, কোন-এক ঝরণার বর্ণনা করছে সে, হঠাৎ আমি ব'লে উঠলাম, 'আমাদের চিঠি পেয়েছিলে?'

'তোমাদের চিঠি, না তোমার চিঠি?'

আমি একটু লাল হ'য়ে বললাম, 'জবাব দাওনি যে?'

'এতক্ষণ ধ'রে তো সেই জবাবই দিচ্ছি। বাড়ি গিয়ে আরো দেবো।'

মিথ্যে বলেনি মোনা লিসা। স্বর্গের দরজা হঠাৎ খুলে গেলো আমাদের। আমরা তিন জন আমরা চার জন হ'য়ে উঠলাম।

তারপর একদিন মাসিমা আমাদের ডেকে বললেন, 'একবার তোমরা তরুর জন্য খেটেছো, আর একবার খাটতে হবে। পঁচিশে অঘ্রান ওর বিয়ে।'

পঁচিশে! আব দশ দিন পরে!

ছুটে গেলাম ওর কাছে, বললাম, 'মোনা লিসা, এ কী শুনছি!'

ভুরু একটু কুঁচকে বললো, 'কী? কী বললে?'

গোপন নামটা হঠাৎ বেরিয়ে যাওয়ায় আমি একটু থমকে গেলাম, কিন্তু একবার যখন বেরিয়েই গেছে তখন আর ভয় কী। মরিয়া হ'লে মানুষের যে-সাহস হয়, সেই সাহসের বশে আমি সোজা তাকালাম ওর চোখের দিকে, চোখের ভিতরে—যা আগে আমি কখনো করিনি—বেগনি-বেগনি ব্রাউন রঙের ওর চোখ, এক ফোঁটা হীরের মতো চোখের মণি—তাকিয়ে থেকে আবার বললাম, 'মোনা লিসা!'

'মোনা লিসা! সে আবার কে?'

'মোনা লিসা তোমাবই নাম,' বললো অসিত। 'জানো না?'

'সে কী।'

হিতাংশু বললো, 'আর-কোনো নামে আমরা ভাবতেই পারি না তোমাকে।'

'মজা তো!' কৌতুকের রং লাগলো ওর মুখে, মিলিয়ে গেলো, পলকের জন্য ছায়া পড়লো সেখানে, যেন একটি ক্ষণিক বিষাদের মেঘ আস্তে ভেসে গেলো মুখের উপর। একটু তাকিয়ে রইলো, চোখের পাতা দুটি চোখের উপর, নামলো একবার।

'কী শুনছি? মোনা লিসা, কী শুনছি?' আমাদের কথায় ঠাট্টার বুড়বুড়ি।

'কী, বলো তো?' ব'লে আঁচলে মুখ চেপে খিলখিল ক'রে হেসে পালিয়ে গেলো।

বর এলো বিয়ের দু-দিন আগে কলকাতা থেকে। ধবধবে ফর্শা, ফিনফিনে ধুতি-পাঞ্জাবি পরনে, কাছে দাঁড়ালে সূক্ষ্ম একটি সুগন্ধে মন যেন পাখি হ'য়ে উড়ে যায়। দেখে আমরা মুগ্ধ। হিতাংশু বার-বার বলতে লাগলো, 'হীরেনবাবু কী সুন্দর দেখতে!'

অসিত বললো, 'ধুতির পাড়টা!'

'পা-দুটো!' ব'লে উঠলো হিতাংশু। 'অমন ফর্শা পা না হ'লে কি আর ও-রকম ধুতি মানায়!'

আমি ফশ ক'রে বললাম, 'কিন্তু বড্ড সুন্দর, একটু বোকা-বোকা।'

'কী! বোকা-বোকা!' অসিত চেঁচিয়ে উঠলো, কিন্তু চিৎকার বেরোলো না, কারণ লোকজন নিয়ে চ্যাচামেচি ক'রে বিয়ের অনেক আগেই সে গলা ভেঙে ব'সে আছে। রেগে-যাওয়া বেড়ালের মতো ফ্যাঁচফ্যাঁচ ক'রে বললো, 'এমন দেখেছো কখনো?'

'মোনা লিসার মতো তো নয়!' আমি আমার গোঁ ছাড়লাম না।

'একজন কি আর-একজনের মতো হয়! খুব মানিয়েছে দু-জনে। চমৎকার!' ব'লে অসিত লাফিয়ে সাইকেলে উঠে বোঁ ক'রে কোথায় চ'লে গেলো। বিয়ের সমস্ত ভারই তার উপর, তর্ক করার সময় কোথায়।

বিয়ের দিন শানাইয়ের শব্দে রাত থাকতেই আমার ঘুম ভাঙলো। চোখ মেলেই—মনে পড়লো সেই আর-একটি শেষরাত্রি, যখন মৃত্যুর হাত থেকে—তা-ই মনে হয়েছিলো তখন —মোনা লিসাকে আমি ফিরিয়ে এনেছিলাম। সেদিন অন্ধকারের ভিতর থেকে একটু-একটু ক'রে আলোর বেরিয়ে আসা দেখতে-দেখতে যে-আনন্দে আমি ভেসে গিয়েছিলাম, সেই আনন্দ ফিরে এলো আমার বুকে, গা কাঁটা দিয়ে উঠলো, শানাইয়ের সুরে চোখে জল এলো। আর শুয়ে থাকতে পারলাম না, তারা ভরা আকাশের তলায় দাঁড়ালাম এসে, শুনতে পেলাম বিয়ে-বাড়ির শাঁখ, কাছে গেলাম, মনে হ'লো একবার যদি দেখতে পাই, এই ভোর হবার আগের মুহূর্তে, যখন আকাশ ঘোষণা করছে মধ্যরাত্রি আর হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে ভোর, এই অদ্ভুত অপার্থিব সময়ে একটু দেখতে পাই যদি। কিন্তু না—গায়ে-হলুদ হচ্ছে, কত-কত অচেনা মেয়ে ঘিরে আছে তাকে, কত কাজ, কত সাজ—এর মধ্যে আমি তো তাকে দেখতে পাবো না। বাইরে দাঁড়িয়ে ভিতরকার চলাফেরা কথাবার্তা শুনতে লাগলাম, আর সব ছাপিয়ে, সব ছাড়িয়ে শানাইয়ের সুর ঝরলো, আমার চোখের সামনে কাঁপতে কাঁপতে শেষ তারা মিলিয়ে গেলো, ফুটে উঠলো গাছপালার চেহারা, মাটির অবয়ব, পৃথিবীতে আর একবার ভোর হ'লো।

সেদিন অসিতের গলা একেবারেই ভেঙে গিয়ে নববধূর মতো ফিশফিশে হ'লো, এত ব্যস্ত সে, আমাকেই ভালো ক'রে চেনে না। হিতাংশুও ব্যস্ত, ব্যস্ত এবং একটু গর্বিত, কেননা বর সদলে বাসা নিয়েছেন তাদেরই বাড়ির দুটো ঘরে, একতলা-দোতলায় দূতের কাজ করতে-করতে সে স্যাণ্ডেল ক্ষইয়ে ফেললো। আমি সারাদিন ধ'রে একবার হিতাংশুকে, একবার অসিতকে সাহায্যের চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার নিজের মনে হ'লো না বিশেষ কোনো কাজে লাগছি, আর শেষ পর্যন্ত বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে কনেকে সাত-পাক ঘোরাবার সময় যখন এলো, তখনও আমি এগিয়ে গেলাম, কিন্তু আমাকে ঠেলে দিয়ে অসিত আর হিতাংশুই পিঁড়ি তুললো, দু-হাত দিয়ে দু-জনের গলা জড়িয়ে ধ'রে ও সাত পাক ঘুরলো, আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলাম।

বিয়ের পরদিন থেকেই আমরা তিনজন হীরেনবাবুর চাকর ব'নে গেলাম। তাঁর মতো সুন্দর কেউ না, তাঁর মতো বিদ্যাবুদ্ধি কারো নেই, তাঁর মতো ঠাট্টা কেউ করতে পারে না। অন্য পুরুষদের বাঁদর মনে হ'লো তুলনায়—আমারও আর মনে হ'লো না যে তাঁর মুখের ভাবটা বোকা-বোকা। এমনকি আমি তাঁর নকল করাও ধরলাম, চেষ্টা করলাম তাঁর মতো ক'রে বসতে, দাঁড়াতে, হাঁটতে, হাসতে, কথা বলতে। ওরা দু-জনও তা-ই করলো, আবার তা দেখে হাসি পেলো আমার, হয়তো প্রত্যেকেই আমার অন্য দু-জনের চেষ্টা দেখে হেসেছি মনে-মনে, যদিও মুখে কেউ কিছু বলিনি।

একদিন দুপুরবেলা হীরেনবাবুর কাছে খুব একটা মজার গল্প শুনছি, তিনি একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ বললেন, 'দ্যাখো তো ভাই, তরু গেলো কোথায়?'

'ডেকে আনবো?' ব'লে আমি ছুটে বেরিয়ে গেলাম।

দক্ষিণের বারান্দায় রোদে পিঠ দিয়ে ব'সে মোনা লিসা চুল আঁচড়াচ্ছে। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, দাঁড়িয়ে কথা বলতে ভুলে গেলাম, হঠাৎ কেমন নতুন লাগলো তাকে, একটু অন্যরকম, সিঁথিতে সিঁদুর, পরনে কড়কড়ে নতুন শাড়ি, কানে হাতে গলায় চিকচিকে গহনা, আর কেমন-একটা গন্ধ দিচ্ছে গা থেকে—হীরেনবাবুর সেন্টের গন্ধ না, নতুন ফার্নিচারের মদ-মদ গন্ধ না, চুলের

তেল কি মুখের পাউডারেরও না—আমার মনে হ'লো এ সমস্ত গন্ধের যেটা আত্মা, সেটাই ভব করেছে মোনা লিসাব শরীরে। জোরে নিশ্বাস নিলাম কয়েকবার, মাথাটা যেন ঝিম ক'রে উঠলো।

চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কী?'

'কিছু না—' সঙ্গে-সঙ্গে কাজের কথাটা মনে পড়লো, 'হীরেনবাবু ডাকছেন তোমাকে।'

আমার শেষ কথাটা যেন শুনতেই পেলো না মোনা লিসা, নিশ্চিন্তভাবে চুলই আঁচড়াতে লাগলো।

'শুনছো না কথা! হীরেনবাবু ডাকছেন তোমাকে।'

'ডাকছেন তো হয়েছে কী! উনি ডাকলেই যেতে হবে?'

'বাঃ—!'

চিরুনি থামিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আব কী! শীগগিরই তো চ'লে যাবো!'

আমি বললাম, 'কত ভালো লাগবে তোমার কলকাতায়—ঢাকা কি একটা জায়গা!'

'তোমরা আমাকে মনে রাখবে, বিকাশ?'

আমি ব্যস্ত হ'য়ে বললাম, 'আব কথা না। চলো এখন।'

'দেখছো না চুল আঁচড়াচ্ছি। বলো গিয়ে এখন যেতে পারবো না।'

কথা শুনে প্রায় ভড়কে গিয়েছিলাম, কিন্তু একটু পরেই মোনা লিসা উঠলো, তার সঙ্গে-সঙ্গে আমিও এলাম ঘরে। বললাম, 'তারপর কী হ'লো, হীরেনবাবু?'

কিন্তু হীরেনবাবুর গল্প বলবার উৎসাহ দেখি মিইয়ে গেছে। জানলা দিয়ে বাইবের দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি, আব মোনা লিসা চেযাবে ব'সে টেবিলেব কাপড় খুঁটতে লাগলো।

আমি পীড়াপীড়ি কবলাম, 'বলুন না তারপব!'

'এখন থাক।'

আমি খাটে ব'সে একটা ইংরেজি বইয়ের পাতা উল্টিয়ে বললাম, 'এটা পড়েছি। ভারি মজার বই।'

হীবেনবাবু হঠাৎ শোযা থেকে উঠে ব'সে বললেন, 'এ-বইটাও ভাবি মজার। এক কাজ করো তুমি—ওটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে প'ড়ে ফ্যালো, আমি চট ক'রে একটু ঘুমিযে নিই। কেমন?' বলতে-বলতে তিনি একেবাবে উঠে দাঁড়ালেন।

আমি আর কথা না ব'লে আস্তে বেরিযে এলাম. পিঠ দিয়ে অনুভব করলাম ঘরেব দবজা বন্ধ হ'য়ে গেলো। বাড়ি গেলাম না, বারাণ্ডায় যেখানে ও ব'সে ছিলো, ঠিক সেখানটায় ব'সে পড়লাম। ওব চুলের গন্ধমাখা চিরুনিটা সেখানেই প'ড়ে ছিলো, হাতে তুলে নিয়ে দাঁতগুলির উপর আঙুল চালাতে লাগলাম বাব বার।

আবো একদিন আরো একদিন। যাবার দিন এলো, পিছোলো, আর-একটা, একটা দিন। তারপব ওরা চ'লে গেলো।

চিঠি এলো এবার, তিনজনের কাছে একখানা চিঠি, মোটা নীল খামে, আমার নামে। তিনজনের হ'য়ে জবাব লিখলাম আমি, একটু লম্বাই হ'লো. সেইসঙ্গে একটা কবিতাও লিখে ফেললাম, সেটা অবশ্য পাঠালাম না। চিঠিপত্র বন্ধ হ'লো শীগগিবই, তাবপর শুধুই কবিতা লিখতে লাগলাম।

মাসিমার কাছে খবর পাই সবই। ভালো আছে ওরা, খুব ভালো আছে। হীবেন গাড়ি কিনেছে, সেদিন ওবা আসানসোল বেড়িয়ে এলো। কলকাতায় কথা-বলা সিনেমা দেখাচ্ছে, টোম্যাটোর সের এক পযসা, তবে শীত ক'মে গেছে হঠাৎ, অসুখ-বিসুখ দেখা না দেয়। আর-একটু গবম পড়লেই ওরা চ'লে যাবে দারজিলিং।

মনে-মনে না-দেখা দারজিলিং-এর ছবি দেখতে লাগলাম, কিন্তু সে-ছবি মুছে দিয়ে মাসিমা একদিন বললেন, 'ওরা তো আসছে।'

আসছে। এখানে! ঢাকায়! কেন, দারজিলিঙের কী হ'লো?

আমাদের নীবব প্রশ্নের উত্তরে মাসিমা বললেন, 'শরীবটা খারাপ হয়েছে ওর, আমার কাছেই

থাকবে এখন।'

'আবার অসুখ?' চমকে উঠলাম তিনজনে।

'না, অসুখ ঠিক না, শরীরটা ভালো নেই আর কি,' মাসিমা মৃদু হাসলেন।

খুব খারাপ লাগলো। খারাপ লাগলো মাসিমার কথা শুনে, হাসি দেখে। শরীর ভালো না, অথচ অসুখ নয়—এ আবার কী রকম কথা? আর মাসিমা কেমন নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ, যেন খুশিই হয়েছেন খবর পেয়ে। রীতিমতো রাগ হ'লো মনে-মনে।

ওরা পৌঁছবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা তিন মূর্তি গিয়ে হাজির। মোনা লিসা সোফায় ব'সে আছে একটু এলিয়ে, হাতে সিগারেটের টিন। চকিতে আমরা তিনজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম—হীরেনবাবু কি সিগারেট ধরালেন ওকে?

আমাদের দেখে ফিকে একটু হাসলো। কথা বললো না।

'কেমন আছো, মোনা লিসা?' আমরা চেষ্টা করলাম ফূর্তির সুর লাগাতে।

সিগারেটের টিনটি মুখের কাছে এনে তার সঙ্গে মুখ ঠেকিয়ে ডালা বন্ধ ক'রে বললো, 'এই—

'তোমার নাকি অসুখ?'

সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে বললো, 'তোমাদের কী খবর?' তারপর আস্তে-আস্তে এটা-ওটা গল্প করতে লাগলো, আর সিগারেটের টিনটি মুখে তুলতে লাগলো ঘন-ঘন।

হীরেনবাবু ঘরে এসে ব্যগ্রভাবে বললেন, 'তরু, এখন কেমন আছো?'

ক্লান্ত চোখ তুলে বললো, 'ভালো।'

'তুমি বরং একটু শোও।'

'না, এই বেশী আছি।'

'এই যে তোমরা এসেছো দেখছি। তরু তো এদিকে—' হঠাৎ থেমে গেলেন হীরেনবাবু।

'হয়েছে কী ওর?'

'হয়নি কিছু, তবে...'

তবে কী? ওর কি এমন কোনো সাংঘাতিক অসুখ করেছে যা কারো কাছে বলাও যায় না? আর ও যেন কেমন হ'য়ে গেছে, হাসি পেলে ভালো ক'রে হাসেও না। মায়েদের মুখে শুনেছি যে, বিয়ের পরে মেয়েদের শরীর আরো ভালো হয়, কিন্তু আমাদের মোনা লিসার এই নাকি হ'লো!

ছোট একটি প্লেট হাতে ক'রে মাসিমা এসে বললেন, 'এটা একটু মুখে দিয়ে দ্যাখ তো।'

'কী, মা?'

'দ্যাখ না—' ব'লে তিনিই আঙুল দিয়ে মুখে গুঁজে দিলেন।

'না, না, আর না,' মোনা লিসার মুখে কষ্টের রেখা ফুটে উঠলো, গলার কাছটায় হাত রেখে মুখ নিচু করলো সে।

বেরিয়ে এসে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটলাম আমরা, মন খুবই বিষণ্ণ। হঠাৎ অসিত বললো, 'ও বার-বার থুতু ফেলছিলো সিগারেটের টিনে।'

'যাঃ!' আমি আঁৎকে উঠলাম।

'সত্যি! আমি দেখলাম!'

আমি বললাম, 'তাহ'লে এটাই বোধহয় ওর অসুখ।'

'অসুখ না,' অসিত গম্ভীরভাবে বললো, ওর ছেলে হবে!'

শুনে হিতাংশুটা খুকখুক ক'রে হেসে উঠলো। 'হাসছো কেন?' আমি চ'টে উঠে বললাম, 'হাসবার কী আছে এতে?'

অসিত বললো, 'ঐ জন্যই তো কাঁচা আম মাখা এনে দিলেন মাসিমা। এ-রকম হ'লে টক খেতে ভালো লাগে।'

'তুমি সবই জানো!' রাগে আমি গর্জে উঠলাম।

'হ'লো কী তোমার?' অসিত, যেন সকৌতুকে, আমার দিকে তাকালো।

'যা-ওঃ! কিছু ভালো লাগছে না আমার, আমি বাড়ি যাই।'

ওদের ত্যাগ ক'রে একা ফিরে এলাম বাড়িতে, বেলাশেষের আলোয় খাতা খুলে কবিতা লিখতে ব'সে গেলাম।

হীরেনবাবু ফিরে গেলেন দু-দিন পরেই। দুপুরবেলা গাড়ি। ঘোড়ার গাড়িতে মাল তোলা হ'লো : হীরেনবাবু উঠতে গিয়ে থমকালেন। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'কিছু ফেলে এসেছেন, নিয়ে আসবো?'

'না, না, আমিই যাচ্ছি।'

তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরে গেলেন তিনি, ফিরে এসে কোনোদিকে না-তাকিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। চাবুকের শব্দ হ'লো। অসিত গলা বাড়িয়ে বললো, 'কবে আসবেন আবার?'

'আসবো...তোমরা দেখো ওকে', ব'লে হীরেনবাবু মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমার মনটা হু-হু ক'রে উঠলো।

কী স্তব্ধ সেই দুপুরবেলা, কেমন ছবির মতো সুন্দর, সেই উনিশ শো-আটাশ সনে, পুরানা পল্টনের ফাল্গুন মাসে। ঘোড়ার গাড়িটা ছোটো হ'তে-হ'তে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হ'লো, আমরা ভিতরে এলাম। বালিশে মুখ গুঁজে মোনা লিসা ফুলে-ফুলে কাঁদছে।

'মোনা লিসা!'

'শোনো, কথা শোনো।'

'হীরেনবাবু আবার তো আসবেন—'

'এর পর ওঁকে আর যেতেই দেবো না আমরা!'

'আর না—আর কেঁদো না, মোনো লিসা।'

থামলো না কান্না। আমি মেঝেতে হাঁটু ভেঙে ওর কাছে ব'সে পড়লাম, ওর মাথায় হাত রেখে বলতে লাগলাম, 'চুপ করো, চুপ করো, মোনা লিসা। বলতে-বলতে হঠাৎ গলা ভেঙে আমার চোখেও জল এলো।

একটু পরে মোনা লিসা আমাকে ঠেলা দিয়ে বললো, 'এই —কাঁদছো কেন? বোকা!' চুল ধ'রে ঝাঁকানি দিয়ে আবার বললো, 'পুরুষমানুষ—কাঁদতে লজ্জা করে না! থামো এক্ষুনি!'

আমি মুখ তুললাম। ওর সঙ্গে চোখোচোখি হ'তেই সুখে আমার বুক কেঁপে উঠলো, তারপর সারাদিন ধ'রে একটু-একটু কাঁপলো, রাত্রে ঘুমের মধ্যেও ভুলতে পারলুম না।

আমরা তিনজন ওকে ঘিরে রইলাম। ও যাতে ভালো থাকে, খুশি থাকে, কখনো মন খারাপ না করে। হঠাৎ এক-একটা অদ্ভুত জিনিস ওর খেতে ইচ্ছে করে, অসিত শহর চুঁড়ে তা জোগাড় ক'রে আনে। দেখেই ওর ইচ্ছে চ'লে যাবে, জানা কথাই, কিন্তু আবার নতুন ইচ্ছা করে হবে সেই আশায় থাকি আমরা। আর যদি কখনো একটু খায়, খেয়ে ভালো বলে, তাহ'লে তো কথাই নেই—খুশিতে, আমরা হাবুডুবু।

হীরেনবাবুর চিঠি আসতে দেরি হ'লেই আমরা বলি, উনি হঠাৎ এসে অবাক ক'রে দেবেন ব'লেই চিঠি লিখছেন না। কথাটা ঠিক নয় জেনেও প্রতি বারই মোনা লিসার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। আমরা চুপ ক'রে উপভোগ করি।

হীরেনবাবু এলেন তিন মাস পরে। ততদিনে ওর শরীর অনেকটা সেরেছে ; খায়, বেড়ায়, ফেরিওলা ডেকে কাপড় কেনে, চেহারাও ভারি-ভারি হয়েছে। এবার দিন-দশেক থাকলেন হীরেনবাবু, তারপর পুজোর ছুটিতে এসে এক মাস কাটালেন।

ততদিনে ওর শরীর আবার খারাপ হচ্ছে। ডাক্তার আসছেন ঘন-ঘন, ওষুধ দিচ্ছেন, কিন্তু যা শুনি তাতে মনে হয়, কিছুই হচ্ছে না। কী কষ্ট জানি না, বুঝি না, শুধু চোখে দেখতে পাই—চোখে কালি পড়েছে, দুটো কথা বললেই হাঁপিয়ে পড়ে, মুখটা এক-এক সময় নীল হ'য়ে থাকে। আমরা

কাছে-কাছে ঘুরঘুর করি, শুয়ে থাকলে হাওয়া করি হাতপাখায়, কখনো একটু ভালো দেখলে হাসিঠাট্টায় ভোলাতে চাই, —কিছুই পারি না।

একদিন আমি বললাম, 'বাবর নিয়েছিলেন হুমায়ুনের অসুখ, ও-রকম নিতে পারলে বেশ হ'তো।'

অসিত হো-হো ক'রে হেসে উঠলো।—'আর যা-ই পাবো, ওর এ-অসুখটা তুমি নিতে পারবে না!'

লাল হ'য়ে বললাম, 'অসুখ না, অসুখের কষ্ট।'

হিতাংশু বললো, 'কী কষ্ট, সত্যি। সারা রাত নাকি পায়চারি করে—ঘুমোতে পারে না। শুতেও নাকি কষ্ট হয়।'

অসিত বললো, 'তা তো হবেই। দেখতে কী রকম হয়েছে, দেখেছো!'

আমি প্রতিবাদ করলাম, 'কী আবার হবে। সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর।'

'যত সুন্দরই হোক, এই শেষের সময়টা—'

আমি গলা চড়িয়ে বললাম, 'এই সময়টাই তো সবচেয়ে সুন্দর!'

আমার তীব্রতা ওদের বোধহয় একটু অপ্রস্তুত ক'রে দিলো ; আর-কিছু বললো না।

যত দিন কাটলো, ততই আমি ওকে আরো সুন্দর দেখলাম, ওর সারা শরীর এক আশ্চর্য সৌন্দর্যে ভ'রে উঠলো আমার চোখে। একদিন ওকে না ব'লে পারলাম না সে-কথা। গেলো-বছর যেদিন ওরা রাঁচি থেকে ফিরেছিলো, যেদিন রেলগাড়ির একটি ছোটো কামরায় সমস্ত স্বর্গ ধ'রে গিয়েছিলো, ঠিক সেই রকম একটি প্রথম শীতের রোদ্দুর ঢালা দিনে ও হঠাৎ বললো, 'আমি দেখছি, বিকাশ, আজকাল তুমি বড্ড তাকিয়ে থাকো আমার দিকে।'

'তুমি আজকাল খুব সুন্দর হয়েছো, তাই।'

'আগে বুঝি সুন্দর ছিলাম না?'

'এখন আরো বেশি হয়েছো।'

মোনা লিসা ভুরু কুঁচকে বাইরের দিকে তাকালো। বললো, 'সত্যি তোমরা ভালোবাসো আমাকে। কিন্তু ও-রকম ক'রে আর তাকিয়ো না, ভারি অসুবিধে লাগে আমার।...ঈশ, বাইরে কী রোদ।'

আমি উঠে জানলাটা ভেজিয়ে দিলাম।

'একটু ঘুমিয়ে নিই, কেমন?'

পায়ের কাছে একখানা চাদর ছিলো ভাঁজ-করা, খুলে গায়ের উপর ছড়িয়ে দিতে দিতে বললাম, 'আজকাল তুমি বেশ ভালোই আছো, না?'

'আমি তো ভালোই আছি।'

ওর মুখে দেখলাম সাহসের সঙ্গে আশা, আশার সঙ্গে ভয়, ভয়ের সঙ্গে ধৈর্য। পায়ের পাতা থেকে চাদর সরিয়ে দিয়ে বললাম, 'হীরেনবাবু চ'লে গেলেন কেন?'

'বা রে! ওঁর বুঝি কাজকর্ম নেই?'

'কবে আসবেন আবার?'

'আসবেন সময়মতো।'

'কী দরকার ছিলো যাবার—আমার মোটেও ভালো লাগে না!'

'হয়েছে, হয়েছে—আর পাকামি করতে হবে না,' ব'লে পাশ ফিরে চোখ বুজলো। বোজা-চোখেই বললো—'আমি কিন্তু ঘুমোলাম,' এবং সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লো। আহা, রাত্তিরে ঘুমোতে পারে না, কত ক্লান্তি ওর শরীরে। মনে-মনে বললাম—কার কাছে জানি না—ওর ভালো হোক, ওর ভালো হোক।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে মনে হ'লো, ও হয়তো এতক্ষণে ছটফট করছে কষ্টে, উঠে পায়চারি করছে ঘরের মধ্যে, আর বাইরে শেয়াল-ডাকা অন্ধকার আর আকাশে এখনো সাত-আট ঘণ্টা রাত্রি। কেন আমি কিছু করতে পারি না, কেন এক্ষুনি যেতে পারি না ওর কাছে, কোনো অলৌকিক উপায়ে

ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি না ওকে? চোখের উপর কষ্ট দেখতে হবে, কিছু করা যাবে না, এই কি মানুষের ভাগ্য? সত্যি কি আমাদের হাত-পা বাঁধা, কোনো উপায় নেই? ভাবতে-ভাবতে ঘুম ছুটলো চোখের, কবিতার লাইন মনে এলো, উঠে বসতেই চোখে পড়লো বাইরে কৃষ্ণপক্ষের জোছনা; আমার জানলা দিয়ে আবছা দেখা যাচ্ছে তারা-কুটির, স্বপ্নের মতো, স্মৃতির মতো। বেশিক্ষণ তাকালাম না, লণ্ঠন জ্বেলে কেরোসিনের গন্ধে আর মশার কামড়ে ব'সে-ব'সে কবিতা বানাতে লাগলাম।

রোজ হ'তে লাগলো এ-রকম ; আমার রাত্রি থেকে ঘুম চ'লে গেলো। আমিও জেগে আছি ওর সঙ্গে-সঙ্গে ; আমি ওর প্রহরী, সকল দুঃখ থেকে আমি বাঁচাবো ওকে—এ-কথা ভাবতে-ভাবতে দেবতা মনে হ'লো নিজেকে, কবিতায় এমন সুন্দর-সুন্দর সব কথা এলো যে নিজেই অবাক হলাম।

এমনি এক রাত্রে—রাত প্রায় দুটো তখন—লিখতে-লিখতে হঠাৎ আমার হাত কেঁপে একটা অক্ষর বেঁকে গেলো। শুনলাম, বাইরে কে ডাকছে আমাকে, 'বিকাশ, বিকা—শ!' একটু অপেক্ষা করলাম, আবার শুনলাম চাপা-গলার ডাক। আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখি, ওরা দু-জন ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে।

সে-রাত্রে তখনো চাঁদ ওঠেনি, সারা রাত্রেও বোধহয় ওঠেনি, অমাবস্যার কাছাকাছি রাত। আকাশ ছিলো তারায় ঝকঝকে, তারই ধুলোর মতো আলোয় আমরা তিনজন দাঁড়ালাম—শীতের রাত্রে, মাঠের মধ্যে, ঢিপঢিপ বুকে।

'কী, অসিত? হিতাংশু, কী-খবর?'

'আরম্ভ হয়েছে বোধহয়', কথা বললো হিতাংশু।

'আরম্ভ হয়েছে?'

'একতলায় শুনলাম চলাফেরা, কথাবার্তা, আর চাপা একটা গোঙানি। ঘুমের মধ্যেই যেন শুনলাম, তারপর আর বিছানায় থাকতে পারলাম না। অসিতকে ডেকে তুলে তোমার কাছে এলাম। তুমি কি জেগেই ছিলে?'

আমি কথা বললাম না, তারার আলোয় দেখলাম হিতাংশুর মুখ শাদা, আর অসিত মুখ ফিরিয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে আছে। এ-ক'দিনে আমরাও যেন বদলে গিয়েছিলাম, হাসি ঠাট্টা আড্ডা ক'মে গিয়েছিলো, বেশি কথা বলতাম না. আর এতদিন ধ'রে যে-মানুষকে নিয়ে লক্ষ কথা আমরা বলেছি, তার বিষয়েই একেবারে আমরা চুপ। রুদ্ধশ্বাস আমরা, প্রতীক্ষায় রুদ্ধশ্বাস।

আমরা বুঝলাম না যে আমরা কাঁপছি, জানলাম না যে আমরা হাঁটছি, কখন বাগানের ছোটো গেট খুলে কখন এসে সিঁড়ির তলায় দাঁড়ালাম। নিশ্চয়ই আমরা কোনো শব্দ করিনি, কোনো কথাও বলিনি, কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দে-সাহেব টর্চ হাতে বেরিয়ে এলেন, যেন আমাদেরই অপেক্ষা করছিলেন এতক্ষণ। নিচু-গলায় বললেন, 'অসিত, একবার যাও তো সাইকেলটা নিয়ে ডক্টর মুখার্জির কাছে—একেবারে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবে তাঁকে।'

অন্ধকারে হাওয়ার মতো মিলিয়ে গেলো অসিত। আমি আর হিতাংশু সিঁড়ির উপরেই ব'সে পড়লাম। একটা কান্না, চাপা, একটানা, আমাদের পিঠ ফুঁড়ে বুকের মধ্যে ঢুকলো, তার যেন আওয়াজ নেই, শুধু কষ্ট আছে, যেন পৃথিবীর প্রাণে আঘাত দিয়েছে কেউ, পৃথিবীর বুক থেকে এই কান্না উঠছে, তাই কোনোদিনই থামবে না।

ওকে চোখে দেখতে পারি না আমরা, দূর থেকেও না ; ওর ঘরে যেতে পারি না আমরা, ঘরের কাছেও না ; শুধু বাইরে ব'সে থাকতে পারি, শীতে, অন্ধকারে, না-জেগে, না-ঘুমিয়ে, আকাশের সামনে, অদৃষ্টের মুখোমুখি।

ডাক্তারের আনাগোনা শুরু হ'লো, চললো বাকি রাত ভ'রে, চললো তার পরের দিন। সকাল হ'তেই চড়া মাশুলে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম হীরেনবাবুকে—মনে-মনে ভাবলাম, টেলিগ্রাম যত দ্রুতই ছুটে যাক, আর তার চেয়েও দ্রুতবেগে আসুক হীরেনবাবুর মন, কাল বিকেলের আগে তিনি পৌঁছতে পারবেন না কিছুতেই—কী অসহায় মানুষ, কী নিরুপায়! ডাক্তার, নর্স, ধাত্রী ; ওষুধ,

ইনজেকশন, প্রার্থনা—তবু অসহায়, তবু মানুষ অসহায়;—কী হচ্ছে, কী হ'লো, কী হবে, এ-সব প্রশ্নের উত্তর নেই কারো চোখে, ডাক্তারের মুখ পাথরের মতো, ওর মা-বাবার মুখে সংক্ষিপ্ত ফরমাশ ছাড়া কথা নেই, মাসিমা আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি পর্যন্ত করেন না, আর, দে-সাহেবের পরিপাটি চেহারার তলায় একজন কুঁকড়োনো বুড়ো-মানুষ যে লুকিয়ে আছে এতদিন তা কে জানতো! কে জানতো আকাশের নীল ভাঁজে এই কান্না আছে লুকিয়ে! আর, আমাদের কি আর-কিছু করবার নেই, কান পেতে এই কান্না শোনা ছাড়া?

দুপুরের আগেই বিকেল হ'য়ে গেলো সেদিন, বিকেলের আগেই অন্ধকার। তারপর, রাত যখন একটু ভারি, হঠাৎ যেন পৃথিবীর পেট চিরে চিৎকার উঠলো ; উঠলো, পড়লো, আবার উঠলো আকাশের দিকে ; আকাশ চুপ, তারাদের নড়চড় হ'লো না ; আবার, প্রতিমার সামনে যেন ছাগশিশুর আর্তরব, কিন্তু দু-বার চার বার দশ বার নয়, চললো ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বিরামহীন। আমরা ছুটে গেলাম বাইরে, মাঠের মধ্যে যত দূরে যাই সে-শব্দ আমাদের পিছনে ছোটে, মাতা পৃথিবীর চিৎকার এটা, এ থেকে কোথায় নিস্তার?

ফিরে গেলাম। ভিতরে আলো, ব্যস্ততার ঢেউ, ফাঁকে-ফাঁকে ডাক্তারের ব্যস্ত গলা, আর বাইরে অফুরন্ত তারা, অসীম অন্ধকার, অপরূপ রাত্রি। কিন্তু, পৃথিবীর কান্না তো থামে না।

যে-তারা ছিলো মাথার উপর, নেমে এলো পশ্চিমে ; যে-তারা ছিলো চোখের বাইরে, উঠে এলো দিগন্তের উপরে ; পুবের কালো ফিকে হ'লো, অনেকগুলি ছোটো তারা মুছে গিয়ে একটি মস্ত সবুজ একলা তারা জ্বলজ্বল করতে লাগলো সেইখানে। এই সেই অপার্থিব মুহূর্ত, অলৌকিক লগ্ন, যখন আমি জেগে উঠে বাইরে এসেছিলাম ওর বিয়ের দিনে, যখন আমি ওকে পেয়েছিলাম মৃত্যুর হাত থেকে, অন্ধকারের সমুদ্রের মধ্যে একটি মাত্র আলো-জ্বলা নৌকোয়। অন্তত এক মুহূর্তেব জন্য সেদিন সে আমার হয়েছিলো, আজ কি আবার এলো সেই মুহূর্ত?

অসিত ফিশফিশ ক'রে বললো, 'কী, হ'লো?'

হিতাংশু বললো, 'কই, না।'

'সব যেন চুপ?'

'তাই তো!'

'যাবো একবার?' অসিত উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু গেলো না। অনেক, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম আমরা, কিন্তু আর-কোনো শব্দ নেই, সব স্তব্ধ, তারপর হঠাৎ দেখি দে-সাহেব আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ভোরের প্রথম ছাইরঙা আলোয় দেখলাম, তাঁর ঠোঁট ন'ড়ে উঠলো। এমন স্থির হ'য়ে আমরা তাকিয়ে ছিলাম, আর এমন স্তব্ধ চারদিক যে, তাঁর কথাটা আমরা কানে না-শুনে যেন চোখ দিয়ে দেখলাম :

'এসো তোমরা, ওকে দেখবে।'

অসিত আর হিতাংশুই সব করলো, রাশি-রাশি ফুল নিয়ে এলো কোথা থেকে, আরো কত কিছু, বেলা দুটো পর্যন্ত শুধু সাজালো, তারপর নিয়ে যাবার সময় সকলেব আগে থাকলো ওরা দু-জন। আরো অনেকে এলো কাঁধ দিতে, শুধু আমি বেঁটে ব'লে বাদ পড়লাম, পিছন-পিছন হেঁটে চললাম একলা। ঠিক একাও নয়, কারণ, ততক্ষণে হীরেনবাবুও এসে পৌঁচেছেন, গাড়ির কাপড়ে, জুতো-ছাড়া পায়ে তিনিও চললেন আমার পাশে-পাশে।

হীরেনবাবু পরের বছর আবার বিয়ে করলেন, দে-সাহেব চ'লে গেলেন বদলি হ'য়ে। কিছুদিন পর্যন্ত লোকেরা বলাবলি করলো ওঁদের কথা, তারপর তারা-কুটিরের একতলায় অন্য ভাড়াটে এলো, পুরানা পল্টনে আরো অনেক বাড়ি উঠলো, ইলেকট্রিক আলো জ্বললো। অসিত স্কুল থেকে বেরিয়ে চাকরি নিলো তিনসুকিয়ায়, ছ-মাসের মধ্যে কী-একটা আসামি-অসুখ ক'রে হঠাৎ ম'রে গেলো। হিতাংশু বি.এস-সি. পাশ ক'রে জর্মানিতে পড়তে গেলো, আর ফিরলো না, সেখানকারই একটি মেয়ে বিয়ে ক'রে সংসার পাতলো, এখন এই যুদ্ধের পরে কোথায় আছে, কেমন আছে, কে জানে!

আর আমি—আমি এখনো আছি, ঢাকায় নয়, পুরানা পল্টনে নয়, উনিশ-শো সাতাশে কি আটাশে আর নয় ; সে-সব আজ মনে হয় স্বপ্নের মতো, কাজের ফাঁকে-ফাঁকে একটু স্বপ্ন, ব্যস্ততার ফাঁকে-ফাঁকে একটু গন্ধ—সেই মেঘে-ঢাকা সকাল, মেঘ-ঢাকা দুপুর, সেই বৃষ্টি, সেই রাত্রি, সেই—সেই তুমি! মোনা লিসা, আমি ছাড়া আর কে তোমাকে মনে রেখেছে!

সাহিত্যিকের শেষ কথাগুলি ঘরের বদ্ধ হাওয়ায় যেন খানিকক্ষণ ভেসে থাকলো, তাঁর শেষ উত্তরহীন প্রশ্নের সামনে একলা তিনি চুপ ক'রে ব'সে থাকলেন। এখন আর অস্থিরতার কোনো লক্ষণ নেই তাঁর মধ্যে, সোজা ব'সে আছেন হাত দুটি কোলের উপর স্তব্ধ ক'রে, সোজা তাকিয়ে আছেন—কোন দিকে, কিসের দিকে নিজেও তিনি জানেন না। এতক্ষণ আপন মনেই ব'লে যাচ্ছিলেন—যেন আওয়াজ ক'রে ভাবছিলেন মনে-মনে—কোথায় আছেন, অন্য কেউ তাঁর কাছাকাছি আছে কিনা, এ-সব যেন ভুলেই গিয়েছিলেন। কথার শেষেও তাঁর কথা যেন ফুরোলো না, নিজের কথাই ফিরে-ফিরে শুনতে লাগলেন, তারপর জলের গায়ে ঢিল-ছোঁড়া ঢেউয়ের মতো তাঁর কথার রেশও আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেলো। তখন তাকিয়ে দেখলেন চারদিকে, দেখলেন ইলেকট্রিকের কেমন-যেন অস্বাভাবিক আলোয় টুণ্ডলা স্টেশনের ওয়েটিংরুম, সামনের টেবিলে ছাইদানে জ'মে-ওঠা সিগারেটের ছাই, কফির পেয়ালায় সিগারেটের টুকরো ;—তাঁর তিন সহযাত্রীকেও দেখলেন। তিন জনেই ঘুমুচ্ছেন। ইজি-চেয়ারে কনট্র্যাক্টর, ওভারকোটের উপরে কম্বল মুড়ি দিয়েছেন, পুরোনো ঘড়ির ঘণ্টা বাজার মতো ঘড়ঘড় ক'রে নাক ডাকছে। ডাক্তার ঘুমুচ্ছেন টেবিলে হাতের ভাঁজে মাথা গুঁজে, কিন্তু, দিল্লিওলা সোজা ব'সে ব'সেই, শুধু মাথাটি একটু হেলিয়ে, ঘুমেও তাঁর গাম্ভীর্যের খেলাপ হয়নি। এই ঘুমন্ত মানুষদের নিঃশ্বাসে, আর এতক্ষণের সিগারেটের ধোঁয়ায়, ঘরের হাওয়া কেমন ভারি, ঘন ;—বিকাশবাবু, অর্থাৎ সাহিত্যিকটি, নিজেও যদিও বড্ড সিগারেট খান, তবু ঐ কটু গন্ধটা তখন তাঁর ভালো লাগলো না। আস্তে উঠে বাইরে এলেন তিনি —কনকনে ঠাণ্ডায় প্রথম একবার কেঁপে উঠলেন, তারপরেই, যেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে খুব কাছেই কোথায় জোর গলায় মোরগ ডেকে উঠলো—দিনের দূত, আলোর প্রতিশ্রুতি।—ভোর!

সাহিত্যিকের সারা শরীরে আনন্দের রোমাঞ্চ জাগলো—এ আনন্দ কত কাল পর তিনি জানলেন। আবার সেই মহান্ মুহূর্ত যখন আকাশে রাত্রি কিন্তু হাওয়ায় ভোর—সেই আশ্চর্য মুহূর্ত, যখন কল্পনা করাও যায় না যে, এই অন্ধকার আর আকাশভরা তারায় ছড়ানো রাত্রির প্রকাণ্ড ভার কত নম্র লঘু-হাতে সরিয়ে দিয়ে, কত শীঘ্র উজ্জ্বল ঊষাদেবী পৃথিবীর দরজায় এসে দাঁড়াবেন। স্বচ্ছ হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে-নিতে সাহিত্যিকের মনে হ'লো এ যেন ঠিক তেমনি একটি ভোর, যেমন তিনি দু-একবার পেয়েছিলেন তাঁর পুরানা পল্টনে, উনিশ-শো সাতাশে। কী আশ্চর্য যে, পৃথিবী একটুও বড়ো হয় না, সব ঠিক তেমনি থাকে, শুধু আমরাই শুকিয়ে-শুকিয়ে ঝ'রে যাই।

প্ল্যাটফর্মে পায়চারি শুরু করলেন তিনি। নিচু ক্লাশের ওয়েটিংরুমে আটকে-পড়া যাত্রীদের ভিড়, কেউ-কেউ চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে ব'সে ঢুলছে, অনেকে মালপত্র নিয়ে প্ল্যাটফর্মেই প'ড়ে থাকলো। রাত্রিটা কী-কষ্টেই কাটলো এদের! আর সেই তরুণ দম্পতি—বিকাশবাবুর হঠাৎ মনে পড়লো—সেই যারা কাল রাত্রে ওয়েটিংরুমের দরজায় একটুখানি দাঁড়িয়েই ফিরে গিয়েছিলো, আর যাদের নিয়ে কথা বলতে-বলতে চার জন প্রৌঢ় সমস্ত রাত কাটিয়ে দিলো—হ্যাঁ, তাদের নিয়েই তো কথা ;—মানুষের বদল হয়, কিন্তু ভাবের, অনুভূতির তো বদল নেই—সেই তরুণ দম্পতি কোথায়?

ঘুরতে-ঘুরতে দৈবাৎ তাদের চোখে পড়লো। প্ল্যাটফর্মে যেখানে মাল ওজনের কল বসানো, সেখানে প্যাকিংকেসের স্তূপের পিছনে ছোট্ট একটু জায়গা তারা খুঁজে নিয়েছে। ভালোই জায়গা ;—মালপত্রের তৈরি দেয়ালে শীতের হাত, লোকের চোখ, দুটোই তারা এড়িয়েছে। বিকাশবাবুর সাহিত্যিক-চোখ একটু দেরি করলো এই দৃশ্যের উপর। এই অতি প্রকাশ্য স্টেশনের মধ্যেও কেমন

নিরিবিলি নিবিড় জায়গা খুঁজে পেয়েছে এরা ; ওরই মধ্যে ছোট্ট বিছানা পেতে একটাই কম্বলের তলায় কী সুখে ঘুমোচ্ছে। কোনো প্রাসাদের আরাম পেলেও আজকের দিনে এর বেশি সুখ এদের হ'তো না। আলো কম, মুখ ভালো দেখা যায় না, তবু বোঝা যায় যে ঘুমের মধ্যেও পরস্পরের অস্তিত্ব এরা ভোলেনি, ঘুমের মধ্যেও পরস্পরকে কাছে পাওয়ায় এরা পরিপূর্ণ।

বিকাশবাবু আস্তে স'রে এলেন সেখান থেকে। ক্রমে আলো ফুটলো, লোকজনের চলাফেরা শুরু হ'লো, একটু পরে খবর এলো যে, ট্রেন আসতে আর দেরি নেই। সঙ্গে সঙ্গে সারা স্টেশন সরগরম।

কন্ট্র্যাক্টর, ডাক্তার এবং দিল্লির চাকুরে, কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে একে-একে বেরিয়ে এলেন। ভোরের প্রথম আলোয় ধূসর দেখালো তাঁদের, অনিদ্রায় এবং গালের দাড়িতে একটু বেশি বুড়োও দেখালো। চার জনের পরস্পরে দেখা হ'লো, কিন্তু আর কোনো কথা হ'লো না— আস্তে একবার 'এই যে—' ব'লেই দূরে-দূরে স'রে গেলেন তাঁরা। রাত্রি যাঁদের একসঙ্গে কাটলো দেয়ালে ঘেরা অদ্ভুত অন্তরঙ্গতায়, এখন দিনের আলোয় ব্যস্ত-হওয়া প্ল্যাটফর্মে সেই চার জন পরস্পরকে আর চিনলেনই না। গাড়ি যখন এলো, তখনও—বোধহয় ইচ্ছে ক'রেই —আলাদা আলাদা কামরায় তাঁরা উঠে বসলেন, কালকের রাত্রিটাকে মুছে ফেলাই যেন তাঁদের ইচ্ছা। শুধু সাহিত্যিকটি জানলা' দিয়ে বার-বার তাকালেন সেই তরুণ দম্পতিকে আর-একবার দেখবার আশায় , কিন্তু তারা যে কখন কোন কামরায় উঠে বসলো কে জানে—না কি টুণ্ডলাতেই পড়ে থাকলো ভিড়ের মধ্যে তাদের আর দেখা গেলো না।

মৌলিনাথ

১

একটি গ্রীষ্মের সকাল

১

সকালবেলাটি জ্যোতির্ময় হ'য়ে দেখা দিলো। কাল রাত্রে যে বৃষ্টি হয়েছিলো আকাশে তার চিহ্নমাত্র নেই, বাতাসে আছে তার স্মৃতি। আজ আকাশ কূলে-কূলে নীল, আয়োজন-উজ্জ্বল, দিগন্ত থেকে দিগন্তে প্রসারিত। মেঘ নেই, এক ফোঁটা শাদা মেঘও লেগে নেই কোথাও, নগ্ন বিশাল উন্মুক্ত আকাশ থেকে রৌদ্র ঝরছে অপরিমাণ আবেগে, যেন সূর্যদেব তাঁর শাশ্বত পিতৃত্ব ভুলে প্রেমিকের রূপে দেখা দিয়েছেন, তাঁর অজস্র তারুণ্যের তেজে প্লাবিত ক'রে দিচ্ছেন তাঁর কন্যকা এই পৃথিবীকেই। স্থিরমতি অবিচল পৃথিবীর মাতৃত্বময় হৃদয় থেকে নিশ্বাস উঠছে উত্তরে— ক্লান্তির নয়, সহিষ্ণুতারও না, বরং সুখের, তৃপ্তির, যেন বহুকাল ভুলে থাকা কোনো বিরহের আকস্মিক অবসানের তপ্ত শ্বাস। তাপ উঠছে মাটির বুক থেকে, সূক্ষ্ম তাপ, তাতে ক্লেশ নেই, তীব্রতার সূচীমুখের প্রথম সুখকর স্পর্শটুকু মাত্র, যে-স্পর্শ হাওয়াতেও এখনো লাগেনি -- সেই হাওয়া, যে ভুলতে পারেনি হ'য়ে-যাওয়া বৃষ্টিকে অথচ আজকের উজ্জ্বলতাকেও মেনে নিয়েছে—শুধু মেনে নিয়েছে তাও নয়, তাকে স্নিগ্ধ ক'রে তুলছে কালকের স্মৃতিকণার মৃদুতা পৃথিবী ভ'রে ছড়িয়ে দিয়ে। আশ্চর্য লীলা সৌরমণ্ডলের, আশ্চর্য সকাল। আশার যদি কোনো রূপ থাকতো, উৎসাহের যদি কোনো ছবি হ'তো, এই সকালটি যেন তা-ই। গ্রীষ্মের যে-প্রাণসাধনায় পূর্বাসে ফুল ফোটে, জঞ্জালের স্তূপ মাটিতে মিশে তার উর্বরতা বাড়ায়, এবং ফুল-ঝরানো শুকনো তাপে পুড়ে-পুড়েই আমের বুকে ঘনমধুর জ'মে ওঠে, তারই উদ্দীপনা এই রৌদ্রে, তারই কল্যাণময় প্রণয় এই হাওয়ায়। এ রকম সকাল বছরে একটি-দুটির বেশি আসে না ; চৈত্র-বৈশাখের কোনো এক অপ্রত্যাশিত তিথিতে হঠাৎ সে দিনের দিগন্তে এসে দাঁড়ায় ; —পৃথিবীর লোক বাজার করে, রান্না করে, আপিশে যায়, হয়তো ও-সব করতে তাদের ভালোই লাগে সে দিন, কিংবা একটু বেশি ভালো লাগে, কিংবা হঠাৎ বোঝে, বুঝে অবাক হয়, কেমন একরকম বিনম্র বিস্ময়ে পথের ধারে ঘুঁটের গন্ধে চকিতে উপলব্ধি করে যে ও-সব কাজ— যাতে মনে হয় কষ্ট ছাড়া কিছু নেই - ও-সব কাজ প্রতিদিনই ভালো লাগে তাদের, ও সব আছে ব'লে বেঁচে থাকা সার্থক। হয়তো রাস্তায় বেরিয়ে জোরে নিশ্বাস নেয় কেউ, মনে হয় ফুশফুশে বেশি হাওয়া যাচ্ছে, হয়তো মনে-মনে একবার বলে, 'বাঃ, বেশ তো'—আর রোগশয্যায় শুয়ে কেউ হয়তো ভাবে, 'আজ আমি ভালো আছি'—কেন ও-রকম হয় কেউ বোঝে না।

যে-কোনো শহরে, যে-কোনো ভিড়ে, যে-কোনো কলকারখানা বস্তি-ধোঁয়ার চ্যাঁচামেচি নোংরামির মধ্যে এই সকালটি সুন্দর হ'তো, কিন্তু এর আনন্দময় মদির মূর্তিটি এমন পরিপূর্ণ ক'রে অন্য কোথাও কি প্রকাশিত হ'তে পারতো, যেমন হয়েছে এই ঢাকায়, পুরানা পল্টনে? নামের মধ্যে প্রাচীনতা নিয়ে নতুন গ'ড়ে উঠেছে পাড়া —ঠিক পাড়াও হয়নি এখনো, হবে ব'লে উদ্‌যোগ মাত্র শুরু করেছে, এখনো বেশির ভাগই মাঠ, যার বুক চিরে সিঁথির মতো পথ বেঁকেছে, যার গর্ত ঘাস আগাছা খোদলের স্বচ্ছন্দ প্রচুরতার ফাঁকে-ফাঁকে এখন পর্যন্ত চারিটি কি পাঁচটি যা বাড়ি উঠেছে, তা প্রান্তরের সহজ বিস্তারে বাধা না দিয়ে ঠিক সেইটুকু যেন যোগ করেছে শুধু, যেটুকু না-হ'লে মানুষের হাতের হালকা যেই ছোঁওয়াটুকু না-পেলে প্রকৃতি ঠিক প্রস্ফুটিত হয় না, সম্পূর্ণ হয় না। শহরের বাইরে বসতি। মাইলখানেক দক্ষিণে,

রেললাইনের ঘুণ্টি-গেট পেরিয়ে, তবে আরম্ভ হ'লো শহর, গন্ধে আর গোলমালে ভরা ঢাকার শহর, যার বিখ্যাত ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়ার খুরে ঐতিহাসিক ধুলো উড়ছে, হাওয়ায় যার প্রাদেশিক ভাষার লয়দার আলস্য ছড়ানো, আর তারই সঙ্গে ককনি বুলির প্রখর সুর—বণিকশ্রেণীর কড়া অথচ মিষ্টি টান, আর তার চেয়েও বিশিষ্ট, আশ্চর্য, একেবারেই স্থানীয় এবং স্বতন্ত্র, উর্দু-বাংলার তিনমিশোলি রবোল্লাস—আর যার, যেই পুরোনো এবং পরিতৃপ্ত শহরের, শাঁখা শাড়ি বাখরখানির অলি-গলি এঁকে-বেঁকে শেষ হয়েছে বিশীর্ণ বুড়িগঙ্গার ধারে নবাব-বাড়ির লাল পাথরের সূর্যাস্তচ্ছটায়। এই ঢাকা, যা লক্ষণযুক্ত, চিহ্নিত, সময়ের স্বাক্ষরে প্রামাণ্য এবং জীর্ণতাস্পৃষ্ট, তার সঙ্গে আড়ি ক'রে, রেষারেষি ক'রে, অথচ অস্তিত্বের জন্য তারই উপর নির্ভর ক'রে স্ফুট হয়েছে উত্তরবর্তী অভিনব রমনা, বাতিল-হওয়া বঙ্গভঙ্গের সুখস্মৃতিবহ উপনগর—কিংবা উপবন—বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন, জ্ঞানী, গুণী, ছাত্র—ছাত্রী—মহিলামুক্তির বিহারভূমি, আধুনিকতার পীঠস্থান।

এই রমনারই পূর্ব প্রান্তে, আকাশে-বাতাসে তারই সমান অংশীদার, কিন্তু গৌরবের ভারে গম্ভীর নয়, অপরিণত, সদ্য-আরব্ধ, জায়মান পুরানা পল্টন। দক্ষিণে তার মাইল-ছড়ানো মাঠ, দূরের দিকে ফুটবল খেলার জনতালোভন প্রাঙ্গণ, কিন্তু কাছে এলে শুধুই প্রান্তর—হাওয়া আর আলো ছাড়া কিছুই খেলে না সেখানে ;—আর প্রান্তর-পাড়ার সীমান্তরেখাও স্পষ্ট হ'তো না, যদি-না দাঁড়াতো, দাঁড়িয়ে থাকতো, ম্যুনিসিপালিটির কাঁচা রাস্তায় শুকনো পাতার বংশাবলী ঝরিয়ে, আকাশ ভ'রে অবিরল মর্মরধ্বনি তুলে, অচল-চঞ্চলের মিলন-তোরণের মতো উন্নত প্রশস্ত বলীয়ান একটা বটগাছ। শুধু দক্ষিণে নয়, চারদিকেই তার সবুজ, উত্তর পুব গ্রাম্য উচ্ছ্বাসে ঘনশ্যামল, আর কোথাও-কোথাও সেই সব সেগুনের ভিড়ে নিবিড়, যাদের জাতিগোষ্ঠী কাটা পড়েছে পুরানা পল্টনকে বাসযোগ্য করতে। শুধু ক-টি বাড়ি ছাড়া বানানো কিছুই চোখে পড়ে না আশে-পাশে, যদি-না তথ্যের খাতিরে স্বীকার করা হয় ছোট্ট একটা টিলাকে, বিশ-পঁচিশ ফুট উঁচু একটা ঢিপি, পাড়ার নামের সামরিক ইঙ্গিতটুকু যার দান, আর যার গায়ে, ঐ ইঙ্গিতটিকে কিঞ্চিন্মাত্র সার্থক ক'রে, এখনো মাঝে-মাঝে আঘাত করে সেপাইনবিশের বন্দুকচর্চার প্রতিধ্বনি। সব মিলিয়ে পুরানা পল্টনের ভাবটা ভারি ছেলেমানুষি, শুধু নতুন ব'লে নয়, এলোমেলো সবুজ ব'লে নয়, অসমাপ্ত ব'লে, সমাপ্য ব'লে—এর সমস্তটাই যেন হ'য়ে-ওঠা হ'য়ে-উঠতে-থাকা, কিশোর—মানে, কৈশোরের সেই লাবণ্যে জড়ানো যার নিজেকেই সম্পূর্ণ করা ছাড়া আর-কোনো উদ্দেশ্য নেই, অথচ যে নিজেকে ঠিক জানেই না এখনো—শুধু অপরিণত নয়, পরিণতির যোগ্য, অপরিণামদর্শী। যা-কিছু বয়স্ক, আত্মচেতন, শৃঙ্খলাবদ্ধ, তার যেন স্থান নেই এখানে, যা-কিছু দায়িত্বের ভারে মন্থর এবং মূল্যবান সব যেন অবান্তর ; দেয়ালে এখনো গৌণ, আশ্রয় ছাড়িয়ে আকাশের অনিশ্চয়তাই বিস্তীর্ণ, মানুষ এখনো সমর্থ এবং অত্যন্ত হ'য়ে উঠে পরিবেশের প্রভুত্বপ্রয়াসে নামেনি।

পাড়াটা মনে-প্রাণে তরুণ, এই হ'লো কথাটা। আর তাই এই অলৌকিক সকাল, উত্তরায়ণে প্রগতিশীল যুবা সূর্যের এই অমূল্য উপঢৌকন, দিনের বৃন্তের উপরে কম্পমান অচিরস্থায়ী এই সকালবেলাটি—সে যেন তার দেবশৈশব নগ্নতা, তার স্বচ্ছ স্বাধীন অপরশ সৌন্দর্য, সমস্ত উন্মোচিত ক'রে এখানে দাঁড়িয়েছে। আলো, আনন্দ, উৎসাহ, অনুপ্রাণনা—শুধু-যে বাইরে খোলা মাঠে আকাশের তলায় তরঙ্গ তুলেছে তা নয়, দেয়ালের সীমার মধ্যেও নিশ্বাস ছড়ালো তার, আলোর নিশ্বাস, সূর্যের উজ্জীবনী সত্তাসার। পুরানা পল্টনে ঘর বলতে যে-ক-টি আছে তার মধ্যে এমন নেই যেখানে আজ সকালবেলার সোনার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা পায়নি। বিশেষত একটি ঘরে—ছোটো একটি একতলা বাড়ির সিঁড়ি উঠে প্রথম ঘরটিতে—সেখানে যেন আর ঘর আর নেই, এমন বান ডেকেছে আলোর, এমন অবিরল অথচ মৃদুমন্দ হাওয়া, আর এমন অবারিত আলিঙ্গন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আকাশের। ঘরটি ছোটো, তার উপর চার-পাঁচটা জানালা-দরজা এমনতর বেপরদারকম খোলা যে বাইরে থেকে কেউ এলে হয়তো মনে হবে সে বাইরেই আছে এখনো—ঠিক তাও নয়, বাইরেটাকে ঠিক উপলব্ধি করবে এখানেই, কেননা ঐ অল্প একটু দেয়ালের বাধায় অসীম যেন সীমার মধ্যে গ্রাহ্য হয়েছে, অর্থ পেয়েছে,

পেয়েছে স্পষ্টতা, যাথার্থ্য, সুষমা, রূপ—মনে হবে আকাশ যেন দহনীয় হ'য়ে, বিশ্বাসযোগ্য হ'য়ে নেমে এসেছে ঘরের মধ্যে, যেন এই সকালবেলার বলতে, না-পারা ব্যাকুলতা হঠাৎ এই ঘরের মধ্যে গুনগুন গান হ'য়ে উঠলো। সত্যি সে শুনবে—যদি কেউ এখন এই ঘরে আসে—শুনবে মৃদু স্বরের গুনগুনানি, মৃদু, অপরিস্ফুট, কিন্তু আবেগময়, আবেগের ছন্দে বাঁধা ;—সত্যি শুনবে ছন্দ যদি মন দিয়ে শোনে, বিদেশী ভাষায় কোনো-এক আনন্দে ভরা বেদনার সুর, স্বপ্নে-পাওয়া কথা, কবিতা। কবিতা—অনির্বচনীয়কে ব্যক্ত করার এই মায়াজাল, এই হৃদয়গ্রাহী ছলনা, তাতে—ঠিক তাতেই—ধ্বনি পেয়েছে অপরূপ সকালবেলাটি, বাণী পেয়েছে নিঃশব্দ নীলিমা। ঐ সকালবেলার আলোর খেলাঘরে ইংরেজি কবিতা পড়ছে একলা ব'সে একজন যুবক।

যুবক? সদ্য যুবক, কিশোর, কিশোরের চেয়ে যুবক বেশি, সমবয়সির তুলনায় যুবক বেশি। শৈশবে যে তার শ্রী ছিলো না, স্বাস্থ্য ছিলো না, কৈশোরের প্রথম আঘাতেই শরীরের যে তার গচ্ছিত গোপন লাবণ্য ফুটেছিলো, বয়ঃসন্ধির সংকটকালে সে যে যন্ত্রণায় ম'রে গিয়েছিলো প্রায়, আবার সেই জন্মান্তর সাধিত হওয়া মাত্র সে যে স্বচ্ছন্দে অধিকার করেছিলো তার রাজত্ব, তার যৌবরাজ্য—এই পৃথিবী—আর এখন সে যে যৌবনের আবেগে, জীবনের আবেগে কম্পমান, অসংখ্য তীব্র অনুভূতির আকাশপাতাল উথালপাথালে অবিরাম অস্থির—এ-সমস্তই লেখা আছে তার মুখে, যার দৃষ্টি আছে তার জন্য পরিষ্কার লেখা আছে। তেমন ক'রে তার দিকে তাকালে বোঝা যাবে যে জন্ম থেকেই যৌবনের জন্য সাধনা করেছে তার দেহমন, যে ছোটো ছেলে হ'য়ে বেঁচে থাকতে সত্যি তার ভালো লাগেনি কখনো, শৈশবস্মৃতির কিছুই এখন মূল্য নেই তার কাছে—শৈশবটা বলতে গেলে অবান্তর তার জীবনে—কখনো নিশ্বাস ফেলে না বালগোপাল ছেলেবেলার জন্য, ঐ অপরিহার্য বছর ক-টা কাটিয়ে উঠে সে বেঁচেছে, সত্যি বেঁচেছে, বাঁচতে সত্যি শুরু করেছে ডুবতে-ডুবতে কৈশোরের ঘূর্ণি পেরিয়ে যৌবনের তীরে পা দেবার পর থেকে। ঠিক যে এখনো শক্ত পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে তা নয়, কিন্তু ভঙ্গি খুব সহজ, যেন আঙুল তোলা আদেশের ভাব, কেননা এটা বুঝেছে যে সে পৌঁছে গেছে, এখন এই পৃথিবী তাকে কিছুই না দিয়ে পারবে না, শুধু সে ইচ্ছে করলেই যৌবনের বন্ধদূত জীবনের যে-কোনো দরজা খুলে দেবে তার জন্য। তার ঈষৎ ফোলা-ফোলা নীলচেমতো চোখের পাতায়, তার ঠোঁটের সবল অথচ সুকুমার ভোগেচ্ছু ভঙ্গিতে, এই কথাই যেন লেখা আছে যে যৌবনের আবিষ্কারে কখনোই সে শান্ত হবে না, ক্লান্ত হবে না—যেন সে সেই দুঃখে-দাগানো শান্তিহীন মানুষদের একজন হ'য়ে জন্মেছে, যারা যৌবনের অচিরস্থায়িতায় বিশ্বাস করে না। এই যুবক সে যে উত্তরকালে জীর্ণ দেহেও বুড়ো হ'তে চাইবে না, আপত্তি করবে, অস্বীকার করবে, তথ্যটাকে উড়িয়ে দেবে রীতিমতো, এবং খুব সম্ভব সে এত বড়োই দুর্ভাগা যে বুড়ো হ'তে সত্যি কখনো পারবেও না—হয়তো এই কথাও ধরা পড়বে যদি তেমন দ্রষ্টা কেউ লক্ষ্য করে এখন তার মুখের দিকে।

সুশ্রী মুখ। ঠিক মনোহর না হোক, প্রীতিসঞ্চারী। গাল দুটি ঈষৎ ভেঙেছে, বালোচিত পেলব স্ফীতিটুকু ঝরিয়ে দিয়েছে সময়মতো—কিংবা হয়তো ঠিক সময়ের একটুখানি আগেই—কিন্তু বালকের শ্যামলিমা—দৈবাৎ যারা ধবধবে ফর্শা হ'য়ে না জন্মায় সেই সব বাঙালি বালকের তরুণ গাছপালার মতো শ্যামলিমা—কোনো যাত্রার দলের বিড়ি-ফোঁকা কৃষ্ণের মুখে যার বিস্ময়কর পরম প্রকাশ হঠাৎ কখনো নিশ্বাস কেড়ে নেয় আমাদের—সেই শ্যামলিমার আভা মোছেনি মুখ থেকে, কেননা—একটু তাকালেই বোঝা যায়—মুখখানার ক্ষৌরকর্মের প্রয়োজন যদিও ঘটেছে, সেটা কৈশোরের চিহ্নলাশক নিত্যকর্মে পরিণত হ'তে দু-এক বছর দেরি আছে এখনো,—বয়স তার আঠারোর বেশি না, বড়ো জোর সবেমাত্র উনিশ। এখন, এই আনমনা কিংবা একমনা মুহূর্তে, যখন সে কবিতা ছাড়া কিছু ভাবছে না—কিংবা কিছুই ভাবছে না, শুধু ছন্দের নেশায়, ধ্বনির আনন্দে ভরপুর হ'য়ে আছে—এখন তার বয়সের লক্ষণ, হয়তো তার স্বভাবেরও লক্ষণ, স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তার মুখে ঃ মুখের ভাবটি নিষ্পাপ, স্বার্থপর, কূটচক্রী, সরল, পবিত্র, অথচ স্পৃষ্ট, উচ্ছিষ্ট, হঠকারী, যেন অবিচারে অপ্রতিরোধ্য তার প্রবণতা, যেন, এমনকি, নড়তে-থাকা ভোগেচ্ছু ঠোঁট দুটিতে কোথায় যেন, কখন যেন, নিষ্ঠুর। আত্মবিরোধী মুখ, সৌম্যহীন, হঠাৎ

বাধা পেয়েছে থুতনিতে এসে—ছোটো থুতনি, বেসুরো, ছন্দোপাতক, ছোট্ট একটি মেয়েলি টোলের আভাসমাত্র ফুটিয়ে যেন ফাঁকি দিয়েছে তাকে, ধরিয়ে দিয়েছে তার মৌল ছেলেমানুষি, তার দুর্বলতা, অনতিক্রম্য অসহায়তা—আবার সেই সঙ্গেই এঁকে দিয়েছে যেন অনাক্রমণীয় আভিজাত্যের টীকা তার কপালের গর্বিত নীল শিরায়, এঁকে দিয়েছে উন্নত নাকের ঋজু-নেমে-আসা রেখায় ত্যাগের, দুঃখের, পরিশ্রমের, আত্মপীড়নের প্রতিজ্ঞা। সুন্দর মুখ, কিন্তু গূঢ় কোনো পোকায়-ধরা সুন্দর ; অনম্য নিয়মের অমিত স্বেচ্ছাচারিতার মুখ ; সংযমের, প্রশ্রয়ের, বীরের, পলায়নপন্থীর মুখ ; অর্জুনের মুখ, অন্যায়রকম সৌভাগ্যভাগী কৃষ্ণসখার ;—কবির মুখ, সত্যি বলতে—শিল্পীর মুখ।

এই যুবক, তরুণ, কবিতায় আর তরুণতায় বিহ্বল এই মানুষ—কবি, কবিকিশোর—সে যে ব'সে-ব'সে গুনগুন করছে কবিতা, এর চেয়ে স্বাভাবিক—যখন পৃথিবীতে যেন স্তব্ধতা আর উজ্জ্বলতা ছাড়া কিছু নেই, তখন এর চেয়ে সুসংগত আর কি কিছু হ'তে পারে? যে-কবিতা তার মনে পড়েছে আজ, স্বতই উঠে এসেছে মুখে, তাও ঠিক শোভন, সমঞ্জস—বলা যেতে পারে যথোচিত, মান্য—তাও ঠিক মিলে গেছে আশে-পাশের সমস্ত কিছুর সঙ্গে, যেন গ'লে যাচ্ছে—মুখ থেকে বেরোনোমাত্র গ'লে যাচ্ছে হাওয়ায়, সোনালি-সবুজ সুন্দর ভঙ্গুর এই বৈশাখের সকালবেলায়। এই বাংলায়, বাংলার মাতাল-ক'রে-দেয়া বৈশাখী উত্তাপে, কোনো-এক সম্ভবপর কবির মুখে নিঃসৃত হচ্ছে সুইনবর্ন—কবিদের মধ্যে দানবিক ছেলেমানুষ ; চিরকুমার, কামাতুর—কৌমার্যের অক্ষম কামোন্মাদনায় হিংস্র ; শুধু সাহিত্যের সংরাগ ঢেলে প্রেমের জ্বালা জুড়োবার ব্যর্থতায় যে আরক্তিম, রক্তাক্ত ; ধ্বনিময় ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভিত্তিহীন প্রাসাদের কারুশিল্পী ; প্রগল্‌ভ কবি, অর্থহীন, অসংবৃত ; স্বতোচ্ছ্বাসিত, আত্মময়, কৃত্রিম;—মোহাচ্ছন্ন এবং মোহজাতক, শুধুই মোহজাতক—ছেলেমানুষ। টেবিলের উপর খোলা আছে এই কবির কাব্য—আর তার পাশেই, যেন এই কবিতার সমস্ত তিক্ত মাধুরীতে মূর্ত ক'রে, এই উন্নয়মান সূর্যের বন্যাকে সংহত, সুস্মিত এবং ইন্দ্রিয়লোভন ক'রে, প'ড়ে আছে শাদা পাথরের থালায় কয়েকটি রোদ্দুর রঙের চাঁপা, মাংসল, উদ্ধত, পীন, রূপে নির্লজ্জ, স্পর্শে নির্ভয়, রৌদ্রের নিবিড়-চুম্বিত ঘ্রাণভাণ্ডার। কিন্তু চাঁপার গন্ধের স্বতন্ত্র কোনো চেতনা নেই যুবকটির—অন্তত তা-ই মনে হয় তার হাতের অসতর্ক ভঙ্গি দেখে, যে-হাতে একটি ফুল তুলে সে তখনই আবার ফেলে দিলো—বইয়ের দিকেও চোখ নেই তার, তাকিয়ে আছে বাইরে, চেয়ারের পিঠে মাথা ঠেকিয়ে, যে-ভাবে মানুষ শরীরটাকে নিষ্ক্রিয় রেখে ভিতরে-ভিতরে মনের তাপে জ্বলতে থাকে, সেই রকম এলিয়ে-থাকা অলস জীবন্ত ভঙ্গিতে। মাথা ভরা লম্বা ঘন চুল তার, একটু কোঁকড়া, বেশামাল, একটি এইমাত্র লুটিয়ে পড়লো কানের কাছে, সেইটি সে এক আঙুলে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে জড়াতে লাগলো, আর বলতে লাগলো গুনগুন ক'রে সেই কথা, যে-কথা বলতে চুম্বনের মতো আনন্দ ছড়ায় তার শরীরে ঃ

> 'There lived a singer in France of old
> By the tideless dolorous midland sea,
> In a land of sand and ruin and gold
> There shone one woman—and none but she.'

আবার বললো থেমে-থেমে, যেন রসনার সমস্ত আস্বাদ দিয়ে প্রত্যেকটি শব্দকে আপ্লুত ক'রে-ক'রে আবার বললে' In a land of sand and ruin and gold'। নিশ্বাস পড়লো তার, নিশ্বাসের সুরে বললো, 'কী সুন্দর! কী সুন্দর! কিন্তু ব'লে কি হবে, সুন্দরের কি কোনো ভাষা আছে? যে নিজেই পূর্ণ প্রকাশিত তাকে আবার প্রকাশ করবে কে? কিন্তু তবু—কত ভাগ্যে ভাষা আছে, ধ্বনি আছে, আছে বাণী—কবিতা—নয়তো এই বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য কেমন ক'রে সহ্য করতো মানুষ? কত ভাগ্যে তার জন্য সাজানো আছে—তার হাতের কাছেই, এমনকি তার মনেরই মধ্যে সাজানো আছে সুইনবর্নের স্তবকের পর স্তবক, নয়তো আজ ঘুম থেকে উঠেই চারদিক থেকে এই সুন্দরের আঘাত, এই আক্রমণ, প্রত্যক্ষ অত্যাচার—সে-ই বা সহ্য করতো কেমন ক'রে? মুহূর্তের জন্য চোখ বুজলো সে, যেন প্রত্যক্ষের দখল ছাড়াতে, যেন সুখভোগের ক্ষণিক বিলাসী ক্লান্তিতে, কিন্তু হঠাৎ চাঁপার গন্ধ যেন লুকিয়ে-থাকা

বাঘের মতো লাফিয়ে পড়লো তার উপর. আহত হরিণের মতো কেঁপে উঠলো সে, তারপর চোখ মেলে, যেন সমস্ত দৃষ্টিকে বাইরের গভীরতায় প্লাবিত ক'রে দিয়ে, আবার মৃদুস্বরে আরম্ভ করলো ঃ

'Wilt thou yet take all, Galilean ? but these thou shalt not take,
The laurel, the palms and the paean, the breasts of the nymphs in the brake.
Breasts more soft than a dove's—'

হঠাৎ বাধা পড়লো কবিতার আবৃত্তিতে ; ব'লে উঠলো, 'আরে ! ঐ বটগাছের কাছে, ম্যুনিসিপালিটির শাদা ধুলোর রাস্তা যেখানে বেঁকেছে, সেখানে একটি ঘোড়ার গাড়ি এইমাত্র মোড় নিলো।

২

পুরানা পল্টনে ঘোড়ার গাড়ির আবির্ভাব উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কালে-ভদ্রে দু-একটি আসে ; আর আসে যখন, প্রায় আগে থেকেই ব'লে দেয়া যায় ঐ অল্প ক-টি বাড়ির মধ্যে কোনটি তার গন্তব্য। যদি পিচের রাস্তা ছেড়ে ডাইনে বেঁকে একটু পরেই আবার বাঁয়ে ফেরে, তাহ'লে অবশ্য বুঝতে হবে যে বকুলবাটিকায় বেড়াতে এলেন ঈশানবাবুর মোগলটুলির আত্মীয়রা। আর যদি সোজা চ'লে যায়, যদি বটগাছ পেরিয়েও এগিয়ে চলে, তাহ'লে কমলেশবাবুর বাড়ির সামনেই থামতে হবে—যদি-না—তাও হয় ক্বচিৎ কখনো—নয়নেন্দুর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসেন সুদূর ফরিদাবাদ থেকে তাঁর ভাগ্নি-জামাই। কিন্তু বটগাছ থেকে যে-গাড়ি বাঁয়ে ফেরে, সেটি—সেটি যাচ্ছে ঐ যেখানে নতুন বাড়ি উঠেছে সেখানে—যাব ছাদ-পেটানো গানের সুর দুপুরগুলিকে উদাস ক'রে দেয় আজকাল—আর নয়তো সেটি দাঁড়ায় সেই একতলাটির সামনেই, যার জানলা-খোলা ঘরে একজন সদ্যযুবকের পদ্য আওড়ানো হঠাৎ এইমাত্র থেমে গেলো।

চেয়ারে সোজা হ'য়ে বসলো সে, ভালো ক'রে গাড়িটার দিকে তাকালো। বাড়ি কদ্দুর উঠলো, তা-ই দেখতে মহিলাগণ আসছেন? কিন্তু কেন এ-সব অনর্থক প্রশ্ন, কেন আর নিজের মনে লুকোচুরি? সে তো জানে, গাড়িটায় প্রথম বার চোখ পড়ামাত্র সে তো জেনেছে, তার চোখে পড়েছে—গাড়ি যখন মোড় নিচ্ছে ঠিক তখনই চকিত নিশ্চিত একটিমাত্র মুহূর্তেই সে দেখে নিয়েছে এক টুকরো নীল, নীলের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আভা, হাঁটুর উপর শাড়ির ভাঁজের মিলিয়ে-যাওয়া নির্ভুল নীলিমা—আর তারপর তার দ্রুত-হওয়া হৃৎপিণ্ড অন্য সব কথা তাকে ব'লে দিয়েছে। নীল, আকাশ-নীল, হালকা-নীল, স্বপ্ন-নীল। চিত্রা পরে ব'লেই ঐ রং তার ভালো লাগে? না কি তার ভালো লাগে ব'লেই চিত্রা পরে? কী জানি, এখন আর মনে পড়ে না। আর কী-বা এসে যায় তাতে—যা-ই হোক আর না-ই হোক। চিত্রা যা করে তা-ই তার ভালো লাগে ; তার যা ভালো লাগে তা-ই করে চিত্রা। ও-দুয়ে তফাৎ নেই আর ; মিশে গেছে, এক হ'য়ে গেছে। এখন, গাড়ি এগিয়ে আসতে, আরো স্পষ্ট হ'লো শাড়ির রং কিন্তু আড়ালে-থাকা দর্শকের চোখ দূরে চ'লে গেলো গাড়ি ছাড়িয়ে অথচ দৃষ্টিপথে সেটাকে রেখে, যেন এই অভ্যর্থনার তুমুল সময়ে, হৃৎপিণ্ডের উতরোল ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে, খুব বেশি দেখে ফেলতে সে চায় না, বড্ড বেশি দেখে ফেলতে তার ভয়। ভালোই যে এটা পাল্কি-গাড়ি, জানলা নেই, আরোহীদের মুখ দেখা যায় না ; দরজার ফাঁক দিয়ে একটু মাত্র আভাস শুধু উন্মোচিত, শুধু একটু নির্বস্তুক নীল, হাঁটুর ভাবলেশহীন অথচ কত অর্থভরা ভঙ্গিটুকু! গাড়ি কাছে এলো, চাকা থামার শব্দ শোনা গেলো, হয়তো ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়েও তাকালো কেউ—অন্য কেউ ; কিন্তু যুবকটি আর তাকালো না, চেয়ার ছেড়ে, ঠিক একই ভাবে ব'সে থাকলো প্রতীক্ষায় বাণবিদ্ধ হ'য়ে, রুদ্ধশ্বাস।

বেশিক্ষণ না, সেই স্তব্ধতার, নিঃসাড়তার, উত্তেজনার কয়েকটি মুহূর্ত। ফটক খোলার ছোট্ট আওয়াজ পাওয়া গেলো, পায়ের শব্দ সিঁড়িতে—এমনকি—তীব্রমধুর যন্ত্রণাদায়ক মুখবন্ধ!—হালকা একটু হাসি। একটু পরে অভ্যাগতরা ঘরে এলেন। প্রথমে এলেন প্রৌঢ়া একজন মহিলা, তাঁর

পিছনে—দেখেই বোঝা যায়—তাঁর দুই মেয়ে, আর সবার পিছনে, অন্যদের একটু পরে, বছর পনেরোর একটি ছেলে, যে তার বয়স ছাড়িয়ে হঠাৎ অনেকটা লম্বা হ'য়ে গেছে ব'লে, এবং অন্ততপক্ষে পুরুষ ব'লে মা বোনের এস্কর্টের পদ অপ্রয়োজনেও পেয়ে গেছে। মেয়ে দুটির মধ্যে ছোটোটির বয়স বছর বারো, ফুটফুটে দেখতে, ফ্রক পরনে—কিন্তু শিগগিরই তার আর ফ্রক পরা চলবে না। বড়ো বোনের কুড়ি-একুশ বয়স। নীল যার পরনে এ সেই মেয়ে, নীল শাড়ি প'রে দরজার ধারে দাঁড়িয়েছে, চোখ দুটিতে হাসির আভাস অথচ যেন হাসিও নয়, হাতের বই দুটি কোলের কাছে আলতো ক'রে ধরা। একবার সে তাকালো যুবকটির দিকে—যে অতিথি দেখে, মহিলা দেখে, উঠে দাঁড়াবার সৌজন্যটুকুও রক্ষা করলো না—তারপর একটু তাড়াতাড়ি কাছে এসে বললো—বললো কোনো তুচ্ছ কথা, প্রতিদিনের সাধারণ কোনো কথা—হয়তো শুধু, 'বই দুটো রাখো', কিংবা নিজেই ও-দুটো টেবিলে রেখে চ'লে যেতে-যেতে বললো, 'মাসিমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।'—কিন্তু কি বললো তাতে কিছু এসে যায় না ; কোনো কথাই শুনলো না যুবকটি, শুধু শুনলো গলার আওয়াজ, স্বর—সেই অশরীরী বিশুদ্ধ সত্তা, নীলিমার তরঙ্গকম্পন। মিলিয়ে গেলো শব্দের রেশ, মেয়েটি চ'লে গেলো বাড়ির ভিতরে, অন্যেরাও গেলো, আবার যুবকটি একলা।

—কিন্তু এ রকম, এ-রকম তার আগে কখনো লাগেনি। এত সে ভালোবাসে চিত্রাকে! ঘরে এলো, একটু দাঁড়ালো, একটু কথা ব'লে চ'লে গেলো—আর তাতেই, শুধু এইটুকুতেই সারা শরীরে এ কী আবেশ তার, চেতনার নিস্পন্দতা যেন, আবার হৃদয়ের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে আনন্দের, জীবনানন্দের, বর্বর বাঁশির মতো নিঃস্বন! কখনো ভাবেনি এ-রকম হবে ; একটু আগেও, ওদের আসতে দেখেও ভাবতে পারেনি কেমন লাগবে সত্যি যখন চোখে দেখবে তাকে—প্রায় প্রত্যহ যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে তাকে দেখেই হঠাৎ তার স্নায়ুতন্ত্রে ছিলার মতো টান পড়বে কে জানতো—কে জানতো এমন উন্মাদের মতো স্পন্দিত হবার শক্তি রাখে তার হৃৎপিণ্ড, এমন বেগে রক্ত ছড়াতে পারে শুধু তার শরীরে নয়, তার জীবনে, তার ভবিষ্যতে, তার সারসত্তায়, কবিতায়—যত কবিতা এখনো সে লেখেনি, কিন্তু লিখবে, যা তাকে লিখতেই হবে, যার ঋণে ইতিমধ্যেই তার জীবনসুদ্ধ বিকিয়ে গেছে, সেই সব আশ্চর্য, চিন্তামাত্রে চমৎকার। কবিতায়। নিজের প্রণয়ের প্রতিভায় নিজেই অবাক হ'য়ে গেলো সে, স্তম্ভিত, মুহ্যমান—যেন নিজের সম্ভবপরতার বিপুলতার সামনে নিজেই একেবারে নিঃশেষ বিনয়ে বিচূর্ণ হ'য়ে গেলো।

চাঁপার ধারালো গন্ধ আঘাত করলো তাকে, রৌদ্র-জ্বলা নীল হাওয়া ঝলমল করলো চোখের সামনে। কিন্তু স্বতন্ত্র কোনো আহ্বানে আর সাড়া দিতে পারলো না সে ; অন্য কিছু ভাবতে পারলো না চিত্রাকে ছাড়া, কিংবা চিত্রাকে দেখে হঠাৎ তার অস্তিত্বের এই উন্নয়নের রহস্য ছাড়া ;—কিংবা, সত্যি বলতে, কোনো-কিছুই ভাবতে পারলো না, শুধু সেই রহস্যবোধের দিগন্তপ্লাবনে মগ্ন হ'য়ে ব'সে থাকলো। আর, একটু পরে, চিত্রা যখন ফিরে এলো, তার নীল শাড়ির সমস্ত সুকোমল সৌজন্য নিয়ে তার কাছে এসে দাঁড়ালো, তখন সে কিছু বললো না, কোনো কথাই বলতে পারলো না এই মেয়েকে, যে তার অত্যন্ত চেনা হ'য়েও কত দূরে স'রে গেছে এখন, সুদূরের সমুদ্রপারে দাঁড়িয়ে আছে।

চিত্রা তার দিকে তাকিয়ে থাকলো একটু ; যেখানে একটি চুলের গুছি কানের কাছে কোঁকড়া হ'য়ে নেমেছে সেই দিকে তাকালো, তার ভারি, নীলচে এখন প্রায় ঢেকে চোখ নেমে-আসা চোখের পাতার দিকে তাকালো। হাসি আরো স্পষ্ট হ'লো মেয়েটির চোখে, কিন্তু ঠোঁট পর্যন্ত ছড়ালো না, চোখ থেকেই মিলিয়ে গেলো চোখের কোণের প্রচ্ছন্ন কোনো বিষাদের ছায়ায়। ঠিক তখনই চোখ তুললো যুবকটি; চোখাচোখি হ'লো দু-জনের। চিত্রা বললো, 'কী? মৌলি?' স্নেহ ফুটলো কথাটায়, প্রায় আদর, অন্তরঙ্গ তার অভ্যাসের আরাম—আবার সেই সঙ্গে যেন আহ্বান, যুদ্ধে আহ্বান, আর ঈষৎ অতি মৃদু, সতর্ক একটু ঠাট্টার সুর। দেখা হ'লে এই কি তাদের প্রথাসিদ্ধ সম্ভাষণ? না কি চিত্রা আজই প্রথম বললো, বিশেষ কোনো অর্থ দিয়েই বললো? যা-ই হোক, কথাটা কিছু নয়, এমন কিছু নয়, এমন কোনো প্রশ্ন নয় যার উত্তর চাই। উত্তর আশাও করেনি চিত্রা, কেননা ব'লেই সে চোখ ফেরালো, চোখ ফেললো টেবিলের উপর পাতা-খোলা বইটাতে, তারপর হাত বাড়িয়ে—সরু সোনার রুলি-পরা হাত বাড়িয়ে

টেবিলের পাশের আরাম-চেয়ারটা একটু বেঁকিয়ে কাছে টেনে এমনভাবে বসলো যাতে সন্দেহ থাকলো না যে এই ঘরের পরিবেশ তার বাড়ির মতোই স্বাচ্ছন্দ্য।

'সুইনবর্ন পড়ছিলে?'

'না। ঠিক পড়ছিলাম না।' মৌলি এটুকু ব'লেই থামলো।

'একটু পড়না শুনি।'

সত্যি কি চিত্রা মৌলির মুখের কবিতা শুনতে চায়, না কি এটা তার ঢিল ছোঁড়া, বঁড়শি ফেলা শুধু—যে-কোনো একটা ছুতো ক'রে মৌলিকে ধ'রে ফেলার চেষ্টা? মৌলির এই ভাব, মুখের উপর ছেয়ে-নামা এই ভাব, যখন তার চোখের পাতা ভারি হ'য়ে চোখ দুটিকে প্রায় ঢেকে দেয়, যখন হাসি থামে, ফুর্তি থাকে না, যখন যৌবনের চলোর্মিস্রোত হঠাৎ যেন থেমে যায় দূরকালের গ্লেসিয়ারের স্পর্শ পেয়ে—মৌলির এই ভাবটির সঙ্গে ভালোই চেনা আছে চিত্রার। তখন তার একা থাকাই ভালো—কিংবা হয়তো আরো ভালো চিত্রাকে যদি কাছে পায়—কেননা চিত্রাই পারে পাখির মতো ঠুকরে-ঠুকরে তাকে উত্যক্ত ক'রে সান্ত্বনা দিতে—হয়তো তখনই সবচেয়ে তার চিত্রাকে চাই—অন্তত, যতক্ষণ এই সময়টুকু আছে, সে-কথা ভেবে চিত্রা যদি রোমাঞ্চ পায় তো ক্ষতি কী।

'পড়বে?'

'না।' সুইনবর্ন বন্ধ ক'রে ঠেলে রাখলো মৌলি, চিত্রার ফেরৎ-আনা বই দুটো দু-আঙুলে নাড়লো একবার।

'বই দুটো পড়লাম,' এই সুযোগটুকু ছাড়লো না চিত্রা। 'ভালো বুঝলাম না।'

'বোঝবার আর কী আছে।'

'সত্যি বলতে, এই এম এ পরীক্ষাটাই সমুদ্রের মতো লাগছে এখন।'

'ও কিছু না ; ছেলেখেলা।'

'তোমার কাছে ছেলেখেলা, মৌলি, কিন্তু আমার—'

'ও-সব বোলো না। চুপ করো।'

'যে-রকম ক'রে কথাটা বললো মৌলি, ঐ 'চুপ করো'টা যে-রকম নিচু গলায় অথচ তীব্র সুরে বেরিয়ে এলো, আর বলবার সময় তার কপালের রাজদণ্ডের মতো শিরা যে-রকম ক'রে ফুলে উঠলো একটু, তাতে চিত্রা অবাক না-হ'য়ে—মৌলিকে এত ভালো ক'রে চিনেও অবাক না-হ'য়ে পারলো না। একটু তাকিয়ে থেকে বললো, 'আজ কি কথা বলবে না? কী হয়েছে তোমার?'

কী হয়েছে? কী হয়েছে তা কি মৌলি বলতে পারে, না কি বলতে গেলে তার কোনো অর্থ হয়? কী হয়নি তার, কী বাকি আছে, কোথায় এতটুকু ফাঁক রেখেছে এই দিন, এই অলৌকিক সকালবেলা? বৈশাখ মাস—গ্রীষ্ম, বসন্তের অসহনীয় সম্পূর্ণতায় বৎসরের যাত্রারম্ভের সময় ; যৌবন—যৌবনের অনির্বচনীয় পবিত্র যূপে আত্মাহুতির অনির্বাণ যজ্ঞধূম , কবিতা—কবিত্ব—না, আর ভুলিয়ে রাখার, ভান ক'রে থাকার সময় নেই ; আছে, পেয়েছে, জন্মেছে তা-ই নিয়ে—আর-কেউ এখনো না জানুক সে তো জানে—সে তো জানে তার মনের তলায় কী আছে, কোন খনি, মহাদেশ, সাম্রাজ্য—যা কোনোদিন, যে-কোনো দিন, বিস্ময়ের তরঙ্গ তুলে প্রকাশিত হবে শুধু তার আদেশ, তার অঙ্গুলিহেলনের ইঙ্গিত মাত্র পেলে। আর, যেন এতেও যথেষ্ট হ'লো না, যেন এই বৈশাখের সকালে যুবক হ'য়ে, কবি হ'য়ে বেঁচে থাকাটাই যথেষ্ট হ'লো না ; যেন এই শ্রী, ঋদ্ধি, শক্তির চেতনা—একে সংহত ক'রে, গুচ্ছ ক'রে বাঁধতে হ'লে বেদনার একটি সূত্র চাই—প্রেম এলো, চিত্রা এলো। যে-মুহূর্তে এলো, যে মুহূর্তে ভালোবাসা তার দেহের মধ্যে আবদ্ধতার দুঃখ নিয়ে কাছে এলো, সে-মুহূর্তে ফুটে উঠলো সমস্ত জীবন, জীবনের সমস্ত সুখ, আনন্দ, সম্ভাবনা একটি মাত্র মুহূর্তের বৃন্তে আকাশজোড়া পদ্মের মতো ফুটে উঠলো এখন আমি একে নিয়ে কী করবো? একে আমি সইতে পারবো কেমন ক'রে?

'অমন ক'রে তাকিয়ে আছো কেন? কী?'

চিত্রাই কথা বললো আবার, একটু ক্ষীণ স্বরে ; ব'লেই মুখ নামালো। কোনো মিনারের গম্বুজের

মতো উঁচু দেখালো লম্বা ক্ষীণ তনুটির উপর তার পর্যাপ্ত খোঁপা ; তার ডিমের ছাঁদের মুখ—ম্লান রঙের—মৌলির ভাষায় বতিচেলি-মুখ—সেই মুখের পরিষ্কার একটি প্রোফীল এঁকে দিলো নীল-সোনার পটভূমিতে তার ঠিক পিছনের পুবের জানলা—আর হঠাৎ, সে যখন একটু নড়লো—না কি কেঁপে উঠলো?—তখন সেই রঙের বিন্যাসে তার শরীরকেও সাজিয়ে দিলো একটি রোদের রেখা, নীল শাড়ির উপর দিয়ে ছুটে এসে একটি সোনালি তীর বিদ্ধ হ'লো তার বুকের সেই ছোট্ট, নিচু অংশটিতে, ঠিক যার উপর থেকে মেয়েদের দুই স্তনের পৃথক যাত্রা শুরু হয়। যেন দেবতার এই প্রণয়চিহ্নে লজ্জিত হ'য়ে মাথা আরো নিচু হ'লো তার, শরীরের তুলনায় ছোটো মুখটি আরো ছোটো দেখালো, আর—আপাতত কোনো কারণ যদিও নেই—স্পষ্ট একটি লালের ফোঁটা রাঙিয়ে দিলো তার পাণ্ডুবর্ণ গাল।

'না, তাকাবো না।' মৌলি মাথা ঝাঁকালো, যেন তাড়িয়ে দিলো ঐ মাথার মধ্যে যা-কিছু তার চলছে এখন। তা-ই হোক তবে—আপাতত তা-ই হোক—এই রমণীয় ছলনা, জীবনের এই সমতলের সৌভাগ্যভূমি, যেটা আছে ব'লে আসলটাকে কোনোরকমে সহ্য করা অন্তত সম্ভব হয়। মেনে নেয়া যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেষ্টনে তাদের প্রকাশ্য জীবন। চেয়ারে একটু এলিয়ে বসলো সে, পা দুটোকে সামনে টান ক'রে দিয়ে বললো, 'বলো। খবর বলো। এম. এ. পরীক্ষা সমুদ্রের মত লাগছে এখন?'

নিশ্বাস পড়লো চিত্রার। যেন চেনা গাঙে নাইতে নেমে আ-ঠাই জলে পড়েছিলো হঠাৎ, পায়ের তলায় মাটি পেয়ে নিশ্বাস ফেললো। আস্তে মিলিয়ে গেলো গাল থেকে লালের বিন্দুটি. ঠোঁটে যেন কৃতজ্ঞতার হাসি ফুটলো। মাথা সোজা করলো সে—আর সঙ্গে-সঙ্গে সোনালি তীর ভদ্রভাবে ঝ'রে পড়লো তার পায়ের কাছে ;—হেসে তাকিয়ে বললো, 'সত্যি তা-ই। কোনোদিকেই কূল দেখতে পাচ্ছি না।'

'এ সব সাধারণ কথা তুমি বললে আমার অপমান লাগে, চিত্রা।'

'ভুলে যাও কেন, আমিও সাধারণ?'

'না। সাধারণ কিছুই ভালোবাসি না আমি। আর সত্যি—ভাবতে গেলে—পৃথিবীতে কিছুই তো সাধারণ নয়। বাদ দিতে পারো অধিকাংশ লোকসংখ্যা—আর এম.এ পরীক্ষার মতো দু'টো-একটা বাজে বিষয়কে।'

'ও-রকম বলো ব'লেই তো বন্ধুমহলে তোমার বদনাম।'

'কী ব'লে বদনাম?'

'অসহ্য অহংকারী ব'লে। তোমার অনার্সের ফল বেরোবার পর—মনে আছে?—যারা তোমাকে প্রশংসা জানাতে গিয়েছিলো, তারা তোমার মুখ থেকে ভদ্রগোছের জবাবও কিছু পায়নি।'

'ভালো লাগেনি সেই প্রশংসা। খারাপ লেগেছিলো।'

'যেটা স্বতঃসিদ্ধ সেটা নিয়ে আর কথা কেন—এই তো তোমার মনের ভাবটা?'

'তাও নয়। কথাটা এই যে এ-সব আমার কিছু না। এ-সবের মধ্যে আমি নেই। অন্য কাজ আছে আমার।'

'অর্থাৎ—এটা এতই তুচ্ছ যে এ নিয়ে প্রশংসা পেতেও তোমার আপত্তি?'

'তুচ্ছ—মূল্যবান—এ-সব কথার তুলনা ছাড়া মানে নেই। আমার কাজ অন্য—অন্য কিছু।'

' "অন্য কিছু!" ঐ এক কথা তোমার মুখে। তোমার বন্ধুরা যখন পড়া-শুনোর কথা বলে, ফলস্টাফের চরিত্র নিয়ে তর্ক তোলে, তুলনা করে গ্রীকদের সঙ্গে টমাস হার্ডির, তুমি তখন মাথা ঝাঁকে হেসে বলো, "রাখো ও-সব! অন্যকিছু বলো!"—তারপর তাদের টেনে নিয়ে যাও আদিত্যর দোকানে, চা-শিঙাড়ার ফরমাশ দাও, আর তারা যখন খেতে-খেতে আড্ডা জমায়, তুমি শুয়ে পড়ো লম্বা হ'য়ে গাছের তলায় আকাশের দিকে তাকিয়ে।—তুমি কি ভাবো এতে তাদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে না?'

'আর কী-কী আমি অন্যায় করি, বলো। শুনি তোমার মুখে।'

'তারপর—তারা কেউ যখন তোমাকে কিছু জিগেস করে, মনে করো সিম্বলিজম-এর অর্থ, কিংবা

ধরো ক্লাইভ বেল-এর "ইসথেটিক ইমোশন" বিষয়ে তোমার মত জানতে চায়—কিংবা দেখতে চায় তোমার ক্রিটিসিজম-এর নোটের খাতা—তুমি তাদের বলো, "ও-সব কিছু নেই আমার। আমি কিছু জানি না।" এতে তাদের কেমন লাগে তা বোঝো?'

'কিন্তু সত্যি যে তা-ই। সত্যি আমার নোটের খাতা কিছু নেই। সত্যি আমি কিছু জানি না।'

'কেউ বিশ্বাস করে না ও-কথা। ভাবে তোমার তুকতাক সব লুকোচ্ছো। ছোটো ভাবে তোমাকে।'

'তা মন্দ কী। কোনো বিদ্যে শিখিনি শুধু ফাঁকি দেবার বিদ্যে ছাড়া—এর কিছু-একটা শাস্তি তো আমার প্রাপ্যই।'

'ফাঁকি?'

'বিশুদ্ধ ফাঁকি। আমার কাছে যারা পরামর্শ চায় তারা প্রত্যেকে আমার দশ গুণ অন্তত পড়েছে। তাদের কাছে আমি হঠাৎ এটা-ওটা শিখে ফেলি কত সময়—খুব কাজে লেগে যায়, সে-সব—তারা তা জানে না। কিংবা জানে হয়তো—সন্দেহ করে—আমাকে ধ'রে ফেলতে চায় ব'লেই পীড়াপীড়ি করে ও-রকম। আর মাঝে-মাঝে কেমন ধরাও প'ড়ে যাই দ্যাখো না?'

'সেদিন বি.কে. পালের ক্লাশের কথা বলছো?'

'শুধু সেদিন কেন, ক্লাসে কোনো কথা উঠলে কোনোদিন আমি ঠিক-ঠিক কিছু জবাব দিতে পারি! আমি যে কত কম জানি প্রোফেসররাও তা কি জানেন না ভেবেছো?'

'তা জেনেও তোমার খাতায় যখন দারুণরকম নম্বর তাঁরা বসিয়ে দেন, উদাহরণস্বরূপ প'ড়ে শোনান অন্য ক্লাসে, তখন কেমন লাগে বলো তো সেই অন্য ছেলেদের, যারা পড়াশুনো করেছে তোমার দশ গুণ?' বলতে-বলতে চিত্রার মুখে একটি আতপ্ত আভা ছড়িয়ে পড়লো, গর্বের, গৌরবের দীপ্তি, যেন এই সব অসামান্য কৃতিত্বে তারও কোনো অংশ আছে, দায়িত্ব আছে, যেন, সত্যি বলতে, তারই অলংকার এ-সব, তারই সম্পত্তি। কোমল দেখালো ডিমের ছাঁদের মুখটি, চোখের ভাব স্নিগ্ধ, আর যখন ছোটো মাথাটি ঈষৎ হেলিয়ে মৌলির দিকে তাকালো, তখন সেই দৃষ্টি যেন প্রায় কোনো ইতালিয়ান ছবির কুমারী মেরী মাতার। 'আর তুমি,' একটু স্বার্থপর খুশির সুরে কথা শেষ করলো চিত্রা, 'তুমিও কিনা তাদের রাগিয়ে দাও শুধু! মৌলি, বন্ধুদের সঙ্গে ব্যবহার তুমি ভালো করো না।'

চিত্রার মুখের এই ভাবটি, তাকে নিয়ে চিত্রার যেন আঁচলে-বাঁধা এই গৌরববোধ, এটা মৌলির ভালো লাগে না, রীতিমতো আপত্তিকর লাগে, আবার এতেই কেমন চিত্রার উপর মমতাও তার বেড়ে যায়। একটু হেসে, যেন চিত্রার এই দুর্বলতাকে একটুখানি প্রশ্রয় দিয়ে, কিন্তু অন্য দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো, 'আমার দোষ অনেক। একটিমাত্র গুণ যে বন্ধুরা আমাকে ভালোবাসে।'

'তোমাকে ভালো না-বেসে উপায় আছে মৌলি!' ব'লে চিত্রা একটু থামলো। দমকা হাওয়া এলো ঘরে, যেন কথাটাকে উড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলো অন্য জানলা দিয়ে। হাত বাড়িয়ে টেবিলের কাগজে চাপা দিলো চিত্রা, তারপর যেন আগের কথাটাতেই জোর দিয়ে, অথচ তার ওজন কমিয়ে বললো, 'আর তাই তো তোমাকে সহ্য করা এত শক্ত। জানো, তোমার বন্ধুরা তোমাকে ঈর্ষা করে না—ঈর্ষা পর্যন্ত করে না? তোমাকে ঈর্ষা করারও যোগ্যতা ওদের আছে, এ-কথা ভাবতে পারে না কেউ। আর তুমি—তাদের নিয়ে কী করো তুমি? তাদের কথাবার্তা শোনো, টুকে নাও মনে-মনে, যার কাছে যেটুকু পাবার ঠিক-ঠিক আদায় ক'রে নাও, তারপর—তারা যখন তাদের কোনো দাবি জানায়, তাদের ন্যায্য পাওনাটুকুই চায় তোমার কাছে, তখন তাদের চায়ের দোকানে বসিয়ে দিয়ে নিজে স'রে আসো একলা হ'য়ে গাছের তলায়। তারা বোঝে—তুমি যে-অন্যায় করো তাদের উপর তা তারা বোঝে—কিন্তু—তবু—তুমি যখন লম্বা চুলে ঝাঁকানি দিয়ে হাসো, তোমার ঐ দু-চোখ ভরা আনন্দ নিয়ে তাদের দিকে তাকাও, তখন তোমাকে ভালো না-বেসেও তারা পারে না। অন্যায়—সমস্তটাই অন্যায়! এই অন্যায়ের কিছু তো প্রতিকার তুমি করতে পারো। চেষ্টা ক'রেও তাদের কিছু কাজে লাগতে কি পারো না?'

কী-কথা এ-সব? প্রণয়ের এ কী গুণ্ঠিত অথচ লজ্জাহীন উচ্ছ্বাস! অন্যদের পক্ষ নিয়ে, বন্ধুদের

ছদ্মবেশ প'রে, ভক্তির এ কী কুল-খোয়ানো আত্মনিবেদন। এ-সব কথা কি বন্ধুদের না কি চিত্রার, চিত্রারই নিজের—এ-সব বলতে, ব'লে-ব'লে নিঃশেষে নিজেকে লুটিয়ে দিতে, কিংবা আজ এক নিশ্বাসেই বহুদিনের রুদ্ধ সঞ্চিত ব্যর্থ কামনার প্রতিশোধ নিতে—এর জন্যই সে কি আজ এসেছে এই বৈশাখের সকালবেলায়? তার কথা শোনার পর একটু স্তব্ধ হ'য়ে থাকলো মৌলি, তার বাঁ হাতের তর্জনীপ্রান্তে আবার জড়ালো একটি চুলের গুছি, যেমন হয়, যখনই আনমনে কিছু ভাবে সে। একটু পরে চুল ছেড়ে দিয়ে বললো, 'পারলে আমি তোমারই তো কাজে লাগতাম। পড়িয়ে দিতাম তোমাকে।'

'থাক। অনেক শিখেছি তোমার কাছে। পাঠ্য পড়াটা বাদ দাও।'

মুখ উঁচু করলো মৌলি, ঘাড়ের উপরে করোটির হাড় যেখানে আরম্ভ হয়েছে সেখানটা ঠেকিয়ে দিলো চেয়ারের কাঠে। নরম আওয়াজে হেসে উঠে বললো, 'ঠিক বলেছো, চিত্রা। তা কথাটা কী জানো—ঐ যে তুমি চেষ্টা করতে বললে না?—কিন্তু চেষ্টা ক'রে কিছুই পারি না আমি—চেষ্টাই করতে পারি না—যা-কিছু আমি ক'রে ফেলি সব নিজে-নিজেই হ'য়ে যায়, কেমন ক'রে হয় আমি বুঝি না। আর যা-ই করি, মাস্টারি আমি করতে পারবো না কখনো।'

'তুমি কোন দুঃখে মাস্টারি করবে, মৌলি? শালগ্রাম শিলা কেউ কি শিলনোড়ার কাজে লাগায়?'

'কিন্তু—তুমি ঠিক বলেছো—চেষ্টা আমার করা উচিত, চেষ্টা করতে শেখা উচিত এতদিনে। বন্ধুরা কিছু জিগেস করলে পালিয়ে বেড়াই—লজ্জার কথা বইকি। কিন্তু—কী হয় জানো?' মৌলি একটু থামলো, টেবিলের উপর সুইনবর্নের বইটা হঠাৎ খুলেই বন্ধ করলো আবার। একটু নিচু গলায়, যেন প্রায় আপন মনে বললো, 'এই কবিতা পড়ছিলাম একটু আগে—না, পড়ছিলাম না, ভাবছিলাম। কবিতা আমি পড়তে পারি না, চিত্রা। তেমন যদি কবিতা হয়, পড়তে পারি না। গলা ধ'রে আসে, বুক ভেঙে আসে যেন, প্রায় কান্না পায়। তা'হ'লে কেমন ক'রে বোঝাবো তার মানে কী।'

চিত্রার চোখের মুগ্ধতা মৌলিকে যেন স্পর্শ ক'রে গেলো। 'অনেক দেখেছি, মৌলি, তোমার মতো কবিতা-পাগল আর দেখিনি।'

'পাগল—পাগল না-হ'য়ে উপায় আছে! শব্দে কী মোহ! ভাষায় কী জাদু! ছন্দে কী শক্তি! ধ্বনি—শুধু ধ্বনিতে কী উল্লাস!' মৌলির চোখের পাতা নীলচে হ'য়ে নেমে এলো চোখের উপর, কেমন-যেন সলজ্জ বিস্ময়ের সুরে আস্তে-আস্তে বললো, 'কবিতা যারা পড়ে না তারা কেন বেঁচে থাকে, চিত্রা, আর কেমন ক'রেই বা বেঁচে থাকে!'

ক্ষীণ হাসি ফুটলো চিত্রার ঠোঁটে, যেন বেদনার, যেন করুণার হাসি। যৌবনের, কবিত্বের, কবিকল্পনার মুখের দিকে আর যেন তাকাতে পারলো না সে, চোখ সরিয়ে নিয়ে গুনগুন নরম গলায় বললো, 'কিন্তু তোমার মতো সবাই হ'লে তুমি কেমন ক'রে বাঁচতে, মৌলি?'

পুরো খুলে গেলো মৌলির চোখ, হাসির আওয়াজ ছোট্ট হ'য়ে বেরোলো তার গলা দিয়ে। 'ঠিক! এখানেও তুমি ঠিক বলছো, চিত্রা। ঠিক কথা—পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যে কবিতা পড়ে না, সে তো আমাদের ভাগ্য, সৌভাগ্য! সবাই যদি কবিতা পড়তো তাহ'লে তুমি কি ভেবেছো এই যাকে আমরা সংসার বলি তা ছিন্নভিন্ন ধ্বংস হ'য়ে যেতো না?'

'তোমার কী মনে হয়?' হাসির ঝিলিক লাগলো চিত্রার চোখে।

'ঐ দ্যাখো—তুমি বললে কথাটা, আর এক্ষুনি আমি তোমার কাছেই নিজের ব'লে চালাচ্ছি! চোর না-হ'য়ে কবি হবার কি উপায় নেই?' মৌলি হাসলো, যেন শিশুদের মতো সপ্রতিভ সরল কৌতুকে। একটু পরে অন্য সুরে বললো, 'কিন্তু কিসে আমার অবাক লাগে, জানো? অবাক লাগে তাদের দেখে, যারা কবিতা পড়ে, কিন্তু পাগল হয় না। তারা পাশ করে, তাঁরা পাশ করান, ভালোমানুষ ভদ্রলোক তারা। কবিতা প'ড়ে পাগল তারা হয় না। আঘাত পেয়ে শিউরে ওঠে না তারা—না, থরথর শিউরে ওঠে না কবিতার আঘাতে—বিস্ফোরণে। আমি কি আনতে পারি সেই আঘাত, আমি কি পারি তাদের জ্বালিয়ে দিতে নিজে আমি যেমন জ্বলছি? এই এটা—এটা ছাড়া চেষ্টার যোগ্য আর কী আছে বলো তো? কিন্তু পারি না—আমার মধ্যে যা আছে তা দিতে পারি না আমি। সেটা সম্ভব নয়।' শেষের কথাটায় বিষাদের

সুর লাগলো, সেই বিষাদের চকিত পূর্বাভাস যেন, যা গুণী কবির গনগনে উনুনে হঠাৎ কখনো শীতের মতো নামে, নিবিয়ে দেয় ভাষা, শব্দ, সুর, বুঝিয়ে দেয় সব কথাই ব্যর্থ, কোনো কথাই বলা যায় না।

বেদনার ব্যাকুলতা ফুটলো চিত্রার মুখে, কথা বলতে গিয়ে কেঁপে উঠলো তার ঠোঁটের কোণ। 'তুমি তো দাও, মৌলি, অজস্র দাও—' তার নিজেরই আগের কথার খণ্ডন ক'রে ব'লে উঠলো সে—'তোমারই মতো ক'রে দাও তুমি—হালকা হাওয়ায় ছড়িয়ে দাও তোমার আগুন। ওরা নিতে পারে না—আমরা নিতে পারি না —যার মধ্যে যা থাকে না সে তা নিতেও পারে না, মৌলি। তাই তো দ্যাখো, যদিও তোমাকে আমি পেয়েছিলাম—'

' "ছিলাম" কেন?'

মানে, পেয়েছি—'একটু ফ্যাকাশে মুখে ব্যাকরণের ভুল শুধরে নিলো চিত্রা,—'তবু তো দ্যাখো মহেন্দ্রবাবুর কাছে পড়তে যাই মাঝে মাঝে।'

'জানি সে-কথা,' মৌলি একটু বাঁকা ক'রে হাসলো। 'কিন্তু কাল তোমাকে দেখলাম না?'

'এসোসিয়েশনের মিটিঙে? যাইনি। ফোলিও-তত্ত্ব কত আর শোনা যায়।'

'ওখানে ভুল করলে। মহেন্দ্রবাবু শেক্সপিয়রটা ভালো জানেন। পণ্ডিত লোক।'

ও কথা কেন বললো মৌলি? কেন হঠাৎ নামিয়ে দিলো নিজেকে, প্রায় যেন শত্রুপক্ষে চ'লে গেলো? মনে মনে অবশ্য, তাদের সব ক-টি অধ্যাপকের মধ্যে, মহেন্দ্রবাবুকেই সবচেয়ে কম পছন্দ করে সে সত্যি বলতে অবজ্ঞা করে। তথ্যকীট, কমা-জ্ঞানী মহেন্দ্র ঘোষ, অক্ষরের মূর্তিপূজক, সাহিত্যের উৎকর্ণভুক রসরক্তহীন পতঙ্গ। এই সব কথা, আরো একটু প্রাকৃত ভাষায়, বন্ধুদের কাছে—চিত্রার কাছেও — কখনও সে যে প্রকাশও করেনি তা নয়। যাকে বলে পাণ্ডিত্য —গবেষণা—সেই সমস্ত ধূসর অধ্যবসায়ী জগৎটাকে সে কেমন-একরকম বিস্ময়ের চোখে দ্যাখে—অবোধ বিস্ময়ে যেন—ভাবটা যেন এ সব আবার এখানে কেন, কী হয় এ সব দিয়ে? বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য পড়তে এসে ঐ জগতের সঙ্গে • হ'লেই নয় সংস্রবটুকু কোনোরকমে সে রক্ষা ক'রে চলে অবশ্য —বলা যেতে পারে ভদ্রতাটুকু বজায় ?।হ মন যাকে দিতে পারে না তাকে অন্তত কিছু সময় দেবার শিষ্টাচার—কিন্তু মহেন্দ্রবাবুর ক্লাশে তাও আর সম্ভব হয় না, নীরসতার বিরাট ওজনে মাথা তার নুয়ে আসে, চোখ জড়িয়ে আসে ক্লান্তিতে, প্রায় ঘুমিয়ে পড়তে-পড়তে যন্ত্রণার খোঁচা খেয়ে জেগে ওঠে, যখন মহেন্দ্রবাবু তার দিকে তাকিয়ে—পুরু কাচের চশমার ভিতরে বড়ো বড়ো গোল-দেখানো চোখ দুটি ঠিক তারই উপর নিবদ্ধ ক'রে আস্তে-আস্তে চিবিয়ে বলা কোনো-একটি নিখুঁত বাক্য শেষ করেন। যন্ত্রণা, প্রায় শরীরের যন্ত্রণা মহেন্দ্র ঘোষের মুখে শেক্সপিয়রের ছন্দোবন্ধ শোনা, তাঁর চেষ্টাকৃত চিবিয়ে-বলা নিখুঁত নিষ্প্রাণ উচ্চারণে লাল গরম আগুন-জ্বলা কবিতা শোনা, যন্ত্রণা -শরীরের, আত্মার যন্ত্রণা সেই দৃশ্য দেখা, যখন—হাজার মানুষের সমান জীবন্ত যে একজন কবি, সে কবির শবব্যবচ্ছেদের কৌশল যখন কৃতজ্ঞ ছাত্রদের সামনে উদ্ঘাটন করেন মহেন্দ্র ঘোষ। তাহ'লে এখন—চিত্রার এই অতি মৃদু পরিহাসটুকুর উত্তরে, মৌলিনাথেরই উদ্ভাবিত 'ফোলিওতত্ত্বে'র উল্লেখের পরে, মৌলি কেন গম্ভীর হ'য়ে ও-কথা বললো, চিত্রাকে প্রায় চপলতার জন্য শাসন করলো যেন, চ'লে গেলো তার নিজের ইচ্ছার, রুচির, এমনকি স্বভাবের বিরুদ্ধে? এ কি শুধু ছেলেমানুষি খামখেয়াল, চমক লাগাবার প্রলোভন? না কি আজ আকাশময় বৈশাখের এই দিনটিকে পেয়ে, চিত্রার নীল শাড়ির উদার স্মৃতিসৌরভে প্লুত হ'য়ে সবই আজ সহজ হ'য়ে গেছে তার কাছে, মহেন্দ্র ঘোষকে ক্ষমা করাও সহজ হয়েছে? না কি ঐ ক্ষমা তার পক্ষে স্বভাবতই সহজ ,—নিকৃষ্টের প্রতি উৎকৃষ্টের যে সহাস্য সহনশীলতায় কোনো চেষ্টারই প্রয়োজন হয় না, তারই একটা কপট ভঙ্গি শুধু প্রকাশ পেলো ঐ কথায়? না কি তার অগোপন অবজ্ঞায় একটু লুকিয়ে-রাখা চোরা চাউনির ঈর্ষারও মিশোল আছে—না কি মহেন্দ্র ঘোষকে মনে-মনে একটু ঈর্ষাও করে মৌলিনাথ, এমনকি—তাও কি সম্ভব?—অচেতন মনে তাঁরই মতো—তাঁরও মতো—হ'তে চায়, তেমনি আত্মস্থ, অনস্থির, তৃপ্ত, উপায়নিপুণ, তথ্যের মজবুত মাটিতে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত? কে জানে, কে বলতে পারে কবি-মনের খবর, কে জানে কেমন ক'রে চলে সেই জটিল প্রচ্ছন্ন যন্ত্র, কত রকম স্বতোবিরোধের বাষ্পচাপে,

কত বিচিত্র বিপরীতের প্রয়োজনীয় চক্রচরতায়! 'বাঃ, দ্যাখো তো এঁকে!' এ-রকম কথাও কি মৌলিনাথ কখনো ভাবেনি? মহেন্দ্র ঘোষের ক্লাশে ব'সে, তাঁর অতিযত্নবান উচ্চারণে যন্ত্রণাবিদ্ধ হ'তে-হ'তেও কখনো কি ভাবেনি—'দ্যাখো তো এঁকে! কেমন আরামে আছেন, কেমন পরিপাটি তৈরি হ'য়ে ক্লাশে আসেন, যে-কোনো প্রশ্নের ঠিক-ঠিক জবাবটি এঁর জিভের ডগায় আর জুতোজোড়াটি কী চকচকে পরিষ্কার! স্পষ্ট বোঝা যায় পড়াতে এঁর ভালো লাগে, সারা জীবন পড়িয়েই কাটাবেন, ভাবনা কিছু নেই এঁর। আমি কেন এ-রকম হলাম না? আমার কেন কিছু ভালো লাগে না, নয়তো পাগলের মতো ভালো লাগে ;—কী আমি বলতে চাই আমি জানি না, কী আমি লিখে ফেলি নিজে বুঝি না ;—কেন আমি কাপড়জামার কথা একটুও না-ভেবে চোরকাঁটার ঘাসের উপর শুয়ে থাকি?'—হয়তো এই সবগুলি ভাবই মৌলির কথাটায় ছিলো—অনায়াসের প্রতি অবজ্ঞা, নির্দিষ্টের দিকে আকর্ষণ, অন্যকে দিয়ে নিজের কোনো অভাবের পূরণকামনা, আর সেই সঙ্গে—খুব সম্ভব—ঈর্ষাও ছিলো একটু, বাস্তবের প্রতি ভাবুকতার ঈর্ষা, সাধারণের প্রতি প্রতিভাবানের সূক্ষ্ম গোপন অনুচ্চারণীয় ঈর্ষার ঈষত্তম দংশন। তাই হয়তো একটু পরেই সে আবার বললো, 'হ্যাঁ—পণ্ডিত লোক। চোখকান মন-প্রাণ প্রভৃতির গোলমেলে বালাই নেই, একেবারেই পণ্ডিত।'

'সব মানুষ এক রকম হয় না, মৌলি।'

'জানি সে-কথা। আমি মহেন্দ্রবাবুর কথা ভাবছি না ; আমি তোমার কথা ভাবছি।'

'এতদিনেও কি বোঝোনি যে আমার কিছুই তোমার মতো নয়?'

'না, তোমার কিছুই আমার মতো নয়। তুমি মেয়ে, আমি পুরুষ। সেখানেই ব্যবধান, সেখানেই আনন্দ।'

'যে-মেয়ে তোমার যোগ্য তার দেখা কোনো-একদিন তুমি পাবে, মৌলি—হয়তো পাবে।'

'আমার ভাবনা এই যে আমি তোমার যোগ্য হবো কেমন ক'রে। কত আমার অভাব, কত আমি দুর্বল, তা কি আমি নিজের মনে জানি না?'

'কত তোমার শক্তি তা কি তুমি জানতে পেরেছো এখনো?'

'এটা তো জানলাম যে আমি তোমার কাজে লাগি না ; তোমাকে মহেন্দ্রবাবুর কাছে পড়তে যেতে হয়।'

'তুমি আবার আলাদা ক'রে কোনো কাজে লাগবে, মৌলি।'

'সবই আমার ইচ্ছে করে। মনে হয় সব পারবো তোমার জন্য। পারি না, তা তুমি মেনে নিয়ো না, চিত্রা। আমাকে চেষ্টা শেখাও, কষ্ট শেখাও। মহেন্দ্রবাবুর কাছে আর যেয়ো না তুমি।'

'তুমি বলো তো পরীক্ষাই না দিলাম।'

'তা বলি না। কিন্তু মহেন্দ্রবাবুর কাছে আর যেয়ো না। আমি বারণ করছি তোমাকে।'

মৌলির এই কথায় কৌতুক ফুটলো না চিত্রার মুখে, বরং আরো গম্ভীর হ'লো চোখের কোণের লুকোনো বিষাদ হঠাৎ যেন চোখ ছেয়ে নামলো তার, চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকলো—মৌলির দিকে না, খোলা দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতরে, যেখানে বারান্দা পেরিয়ে ঘাসের উঠোনে চোখে পড়ে। আর, যেন তারই কোনো গোপন প্রার্থনার উত্তরে, সেই দরজার কাছে বিধবা একজন মহিলাকে দেখা গেলো ; তাঁর পরনের থানধুতিটি যেমন ধবধবে শাদা, তেমনি শাদা কাপড়ে ঢাকা চায়ের ট্রে হাতে ক'রে আসছেন। চিত্রা তাঁকে দেখামাত্র উঠলো, এগিয়ে গিয়ে বললো, 'আমাকে দিন, মাসিমা, ট্রে এনে টিপয়ে নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। মহিলাটি কাছে এসে ঢাকনা তুললেন। ধোঁয়া উঠলো দুধের জগ থেকে, চিকচিক করলো বড়ো দানার চিনি, নধর মোটা শবরি কলা হলদে ছায়া ফেললো উজ্জ্বল শাদা জাপানি পেয়ালায়, আর সেই পেয়ালার গায়ে তারই সোনালি প্রান্তটুকুর মতো সরু একটি রোদের সুতো ঝিলিক দিলো হঠাৎ, গরম টোস্ট টাটকা মাখনের সূক্ষ্ম সুস্থ সাত্ত্বিক একটি সুগন্ধ মুহূর্তের জন্য ঘ্রাণগোচর হ'য়েই পরিব্যাপ্ত গ্রীষ্মসৌরভে মিলিয়ে গেলো।

মৌলি একবার দৃষ্টিপাত ক'রে বললো, 'ডিম নেই, মা?'

'না, ডিমওলা কাল আসেনি তো—'

'সকালে আমার ডিম ছাড়া কিছু ভালো লাগে না।'

'রাখুকে পাঠিয়েছি বাজারে—'

'সে আসতে-আসতে আমার কি আর ইচ্ছে থাকবে।'

'কম মিষ্টি দিয়ে নরম সন্দেশ করেছি। খাবি তো?'

'আচ্ছা।'

'এমন অসুবিধে এখানে জিনিসপত্রের—দু-মাইল দূরে বাজার—'মৌলির মা চিত্রার দিকে তাকালেন।

'বাঃ! একদিন ডিম না-হ'লে কী হয়!' বললো চিত্রা। 'কত রকম তো আছে।'

'যার যেমন অভ্যেস তেমনি হ'লে তো ভালো লাগে।'

'না মাসিমা,' চিত্রা হাসলো, 'আপনি আদর দিয়ে-দিয়ে ছেলেকে নষ্ট করছেন।'

'নষ্ট করছি বুঝি?' মহিলাটি হাসলেন। 'তা আমার সন্দেশের জন্য ভাবনা নেই চিত্রা থাকতে। বড়োটা তোর, চিত্রা, কিশমিশ দিয়েছি বেশি ক'রে।' উপুড়-করা পেয়ালা দুটো সোজা করলেন তিনি, চামচে প্লেট অদরকারেও একবার গুছিয়ে দিয়ে বললেন, 'চিত্রা তাহ'লে চা তৈরী কর—আমি যাই ওদিকে।' যেতে-যেতে একটু থেমে আবার বললেন, 'তোমরা খাও, কেমন?'

তাঁর চ'লে যাওয়ার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে চিত্রা বললো, 'আশ্চর্য মা তোমাব!'

'সব মা-ই আশ্চর্য।'

'কিন্তু মায়েদের মধ্যেও সবকি আব সমান!'

'না, সব সমান কোনোখানেই নেই,' মৌলি ঠোঁটের কোণে হাসলো একটু। 'ওটা বানানো কথা, কম-বেশি নিয়েই বাস্তব।'

টী-পটের ঢাকনা তুলে ভিতবে একবার উঁকি দিলো চিত্রা, আস্তে চা নেড়ে বললো, 'ঐ বেশিটা একটু বেশি মাত্রায় পেয়েছো তুমি।'

'আঃ! চায়ের গন্ধ!' জোবে নিশ্বাস নিলো মৌলি, তারপর চিত্রার চা-তৈরি-করা হাতটির মৃদু ব্যস্ততার দিকে তাকিয়ে বললো, 'সকলেই সব পায়, চিত্রা ; নিতে পারে দু-চার জন।'

'থাক, ও নিয়ে আর জাঁক কোরো না। নিতে তুমি পারো তা সত্যি, নিংড়ে সবটুকু নিতে জানো, কিন্তু যারা দেয় তাদের কথা ভাবো কখনো?'

'সবটুকু? অসম্ভব, চিত্রা। মাত্র কযেকটি ফোঁটার বেশি কিছুতেই সম্ভব না। দ্যাখো ঐ বাইরের দিকে তাকিয়ে। এর কতটুকু তুমি নিতে পারো তোমার ছোট্ট জীবনে, ছোট্ট শরীরে?'

চা ঢালতে নিচু হ'লো চিত্রার মুখ, চামচে পেয়ালায় ক্ষীণ ভঙ্গুর টুংটাং আওয়াজ দিলো। মুখ তুলে বললো, 'তোমার সব পাওয়া কি বাইবেই?'

'আমার মা-র কথা ভাবছো?'

'তোমার কথাই ভাবছি। আচ্ছা, তোমার মা-র কথাই ধরো। তোমার খাওয়া-পরা, তোমার সুখ-সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্য, তা-ই নিয়েই তিনি ব্যস্ত সারাদিন। আর কোনোদিন তার এক চুল উনিশ-বিশ হ'লে তোমার কি তা সহ্য হয়?"

কালচেমতো ঘন-ব্রাউন চায়ের উপর প্রথম দুধ প'ড়ে কেমন ক'রে কুটিল প্যাঁচে সোনালি রং ফুটিয়ে তোলে, সেই তার প্রিয় দৃশ্যটি একমনে দেখছিলো মৌলি। চিত্রার কথা শুনে একটি যেন ক্ষমা-চাওয়া হাসি ফুটলো তার মুখে ; নিচু গলায় বললো, 'ডিমের কথাটা বললাম ব'লে? তা সকালবেলা একটি ক'রে ডিম কি খুব বেশি চাওয়া?'

'কত বেশি তোমার চাওয়া তা তুমি জানো না, মৌলি।'

'কেন জানবো না। নিজের কথা সবই জানি আমি।'

'যে তোমাকে ক'লের মতো সব জুগিয়ে যায় তাকে তুমি ফিরেও দ্যাখো না তা কি তুমি জানো?

তুমি কি জানো তোমার মা-র উপর অত্যাচার করো তুমি?'

'অত্যাচার করি!' লম্বা চুলে ঝাঁকানি দিয়ে মৌলি হেসে উঠলো। 'থাক, আর মন্দ বোলো না। চা খাওয়া যাক।' ছোট্ট, অসমাপ্ত, তাপের জন্য স্পর্শমাত্রেই শেষ-হওয়া প্রথম চুমুকটি দিয়ে পেয়ালা নামিয়ে রাখলো সে, শাদা ধোঁয়া আস্তে-আস্তে পেঁচিয়ে উঠলো রোদ্দুরে, স্বচ্ছ আভা হ'য়ে মিলিয়ে গেলো।

চিত্রা জিগেস করলো, 'রুটি দেবো তো?'

'রুটি?... সকালবেলা কিছু চিবিয়ে খেতে আমার ইচ্ছে করে না। তা দাও একটু।'

'মাখনের উপর সন্দেশ মাখিয়ে দেবো?'

'কেমন সন্দেশ? এলাচ দিয়েছে?'

'খেয়ে দেখতে পারো।'

মৌলি চামচে দিয়ে এক ফালি সন্দেশ তুলে আলগোছে জিভের উপর ফেললো। নরম, কম-মিষ্টি, একটু ভেজা-ভেজা মিহিন সন্দেশ জিভের উপর গ'লে গেলো যেন সুইনবর্নের কোনো শুভ্র সিলেবল, কৈশোরের লাজুক মন্থর কামোন্মেষের মতো এলাচের গোপন গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত মুখে। চিত্রা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কেমন? ভালো না?'

'ভালো? আমি একে বলি হৃদয়নন্দন!'

'কলাটাও মন্দ লাগবে না বোধহয়।'

'কলা?'—মৌলি ঠোঁটের ভঙ্গি করলো একটু—'নাঃ! ঠাণ্ডা—আর বড্ড সলিড। ভালো লাগে না আমার। এই সন্দেশটা বানাতে তুমি শিখে নাও।'

'এটাও শিখতে হবে আমাকে?' চিত্রা হাসলো, কেমন ভীরু, বিষণ্ণ আবার একটু ঠাট্টা-করা, মৌলিকে প্রায় হারিয়ে-দেয়া হাসি। 'আর? মুদি গয়লা কয়লাওলার হিসেবপত্তর?'

'আবার আমার মা-র কথা?' মৌলি হাসলো না, চোখে যেন অভিযোগ নিয়ে, তিরস্কার নিয়ে চিত্রার দিকে তাকালো।

'সন্দেশ তাহ'লে এমনিই খাবে?' একটি মাখন-লাগান ঈষদুষ্ণ টোস্ট প্লেটে ক'রে এগিয়ে দিলো চিত্রা। নিজেরটি হাতে তুলে বললো, 'আচ্ছা মৌলি, একটা কথা জিগেস করি তোমাকে। তোমার মা-র সুখদুঃখের কথা তুমি ভাবো কখনো?'

'"ভাবা" বলতে কী বোঝো? বাজার থেকে হাতে ক'রে চালতে নিয়ে আসা?'

'ঠিক তা-ই। সেটাই। তাতেই বোঝা যায় অন্য জনের অস্তিত্ব তুমি স্বীকার করো।'

'আলাদা ক'রে প্রমাণ দিতে হবে?'

'ঐ তো! আলাদা ক'রে কারো কথাই তুমি ভাবো না। যে তোমাকে ভালোবাসবে প্রতিদানের আশা তাকে ছাড়তে হবে।'

'প্রতিদান? ভালোবাসা কি ব্যবসাদারি?'

'বিনিময় ছাড়া ভালোবাসার অস্তিত্ব কোথায়?'

'ঠিক বলেছো। ভালোবাসাটাই বিনিময়। তার যদি অস্তিত্ব থাকে, তাহ'লে কোনো-না-কোনো রকমের বিনিময়ও আছে নিশ্চয়ই।'

একটু বিস্ময়, একটু বিস্মিত বেদনা ফুটলো চিত্রার মুখে, ঠোঁটের রেখায় প্রায় কেমন ভয়ের ম্লানিমা, যেন সে জানে, হৃদয়ের গভীরতম অন্তঃপুরে নিজেই জানে যে এ-সব কথা তার অর্থহীন, যে রাত্রে বিছানায় শুয়ে বালিশের কানে একবার কোনো কথা বললে সে-কথা আর ফিরিয়ে নেয়া যায় না। একটু চুপ ক'রে থাকলো সে, একটি আঙুল আস্তে একবার বুলিয়ে গেলো কপালে, যেন মুছে দিলো কোনো অবিস্মরণীয়ের আকস্মিক ছায়াপাত, তারপর আবার বললো, চোখ-ভরা কল্যাণময় সাহস নিয়ে, চোখের কোণে বরদাত্রী ঠাট্টা নিয়ে এর পরেও তর্ক করলো—'কিন্তু তোমার বিনিময় কী-রকম? তোমার মা একে-ওকে ব'লে ডবল মজুরির দরজি আনাবেন বাড়িতে, আর তুমি দয়া ক'রে গায়ের মাপটি দিতে

উঠে দাঁড়াবে—এই তো তোমার বিনিময়?'

'কী করবো বলো। আমার কাজ আছে—অন্য কাজ।'

'কিন্তু ভাবো কখনো?—তুমি ছাড়া যার কাজ থাকবে না এমন মানুষ কোথায় পাবে তুমি চিরকাল?' ব'লে চিত্রা তার চোখ দুটি সম্পূর্ণ তুলে ধরলো মৌলির দিকে, প্রশ্ন ভরা চোখ, সাহসে ভরা, এমনকি—চোখের কোণে বিষাদ যেখানে লুকিয়ে ছিলো, সেখানে এখন স্পর্ধার মতো ঝিলিমিলি উজ্জ্বল।

আর সেই উত্তর-চাওয়া চোখের দিকে তাকিয়ে মৌলির হঠাৎ মহেন্দ্র ঘোষকে মনে পড়লো। মনে পড়লো তাঁর সুস্থির চলা, তাঁর 'wh' ব্যঞ্জনবর্ণের চেষ্টাকৃত, ত্রুটিহীন উচ্চারণ, নিজের পরিধির মধ্যে তাঁর আত্মবিশ্বাস—আত্মপ্রসাদ—যা কিছুতেই সহ্য করা যায় না অথচ যাতে দোষ ধরাও সম্ভব নয়। কোনোরকমেই। সেটাই সবচেয়ে অসহ্য যে দোষ ধরার উপায় নেই, ভুল তিনি করেন না কখনো—কাঁটায়-কাঁটায় সেমিকোলনটি পর্যন্ত ঠিক আছে সব সময়। এ-কথা কি কল্পনাও করা যায় যে মহেন্দ্র ঘোষের জন্য বাড়িতে কখনো দরজি গেছে? না; নিজেই গেছেন দোকানে, পাঁচ দোকান ঘুরেছেন, দশ রকম কাপড় দেখেছেন, তখনকার পক্ষে সবচেয়ে পছন্দসই জামাটি অন্যদের চাইতে কয়েক আনা কম খরচে তৈরি করিয়েছেন যখনই তাঁর দরকার হয়েছে। কথাটা ভাবতে হাসি পেলো মৌলির, অবজ্ঞার ঢেউ উঠলো মনে—যারা নিপুণ, যারা নির্বোধ, যারা তৃপ্ত, সেই নিকৃষ্ট সাধারণ মানুষদের সমস্ত সংসারটারই উপর অবজ্ঞা—কিন্তু সেই সঙ্গে ঈর্ষাও লাগলো একটু, কোনো-এক সূক্ষ্ম গোপন উন্নিদ্র ঈর্ষার দংশন।

এ-সব কথা স্রোতের মতো ব'য়ে গেলো তার মনের উপর দিয়ে ; মুহূর্তের বেশি সময় লাগলো না। 'চিরকাল?' একটুমাত্র দেরি ক'রে চিত্রার কথার সে জবাব দিলো, 'সে যে অনেক! সে যে অনেক দূর। অত দূর পর্যন্ত কিছুই এখনো ভেবে দেখিনি।' ব'লে হেসে উঠলো যেন চিত্রা কোনো মজার কথা বলেছে, কিংবা যেমন শিশুরা হাসে যখন কোনো লজ্জা ঢাকতে চায়।

চিত্রার চোখ কোমল হ'লো, করুণার ছায়া পড়লো তাতে। চোখ সরিয়ে নিলো মৌলির দিক থেকে, সামনের পেয়ালা-সাজানো টেবিলটার দিকে তাকালো, বাইরে আকাশের দিকে দেখলো একবার। 'সত্যি! চিরকাল অনেক দূর। আপাতত—' হঠাৎ থামলো, যেন অন্য কিছু বলতে গিয়ে কথা বদলে নিলো—'আপাতত বেশ লাগছে। সন্দেশ খেলে না?'

'আর খাবো না। ইচ্ছেটা জীইয়ে রাখা ভালো।'

'আরো ভালো ভালোর প্রতি সুবিচার করা,' ব'লে মৌলির সন্দেশের ভগ্নাংশটুকু নিজের প্লেটে তুলে নিলো চিত্রা। দু-আঙুলে একটু ক'রে ভেঙে নিয়ে এক-এক চুমুক চায়ের সঙ্গে খুব আস্তে শেষ করলো ওটুকু, তারপর :

'কিন্তু হাসির কথা নয়, মৌলি , ভেবে দ্যাখো,' বলতে-বলতে গম্ভীর হ'লো চিত্রার মুখ, 'যে-ত্যাগ মা দিতে পারে তা কি কোনো বন্ধুর কাছে কেউ পায় কখনো, না কি—'একটু থামলো সে, তার ম্লান গালের ঠিক মধ্যিখানে লাল ফোঁটাটি দেখা দিলো আবার—'না কি কোনো স্ত্রীর কাছেই পায়? লোকে তোমাকে ধন্য বলবে, মৌলি, জগতে তুমি আনন্দ বিলোবে অনেক, কিন্তু, মৌলিনাথ, বিয়ে করলে স্ত্রী তোমার সুখী হবে না।' শেষের কথাটা হালকা গলায় বললো, কিন্তু ধার লাগলো সুরে, ঝলসে উঠলো চোখের দূর কোণ দুটি।

এবার চিত্রাকে বিঁধলো মৌলির চোখ, উদ্ধত চোখ, ক্ষমাহীন, আর আর সেই সঙ্গে যেন অসহায়, হেরে-যাওয়া, প্রার্থনায় আত্মবিস্মৃত। আস্তে আস্তে বললো, 'সুখ! সুখী!' যেন ও-সব কথার অর্থ বোঝার চেষ্টা করছে। 'তুমি কি এ-সব তুচ্ছ কথা বলবে, চিত্রা, যখন আমরা দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, মন্দিরের সামনে, বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে যখন আমরা ভয়ে কাঁপছি যেহেতু আর উপায় নেই! আর উদ্ধার নেই আমাদের। ভয় কোরো না, শুধু তোমার হাতটি তুলে আস্তে একটু ছোঁও একবার, দরজা খুলে যাক।'

কী নির্লজ্জ মৌলি, কথা থামিয়েও থামলো না, চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকলো চিত্রার ডিমের ছাঁদের ম্লান রঙের ইটালিয়ান ম্যাডোনার মতো মুখের দিকে, করুণায় কোমল-হ'য়ে-আসা চোখ দুটির দিকে। আর হঠাৎ সেই চোখের পাতা কেঁপে উঠলো, নিবে গেলো চোখের কোণের ঝিলিমিলি, আরো ম্লান দেখালো মুখটি, হলদেমতো ফ্যাকাশে মতো শাদা, গালের হাড় উঁচু হ'য়ে ফুটলো, গম্বুজের মতো খোঁপা যেন মনে হ'লো এলিয়ে ভেঙে ছড়িয়ে যাবে। চোখে ঝাপসা দেখলো চিত্রা, যেন অনেকখানি কুয়াশা পার হ'য়ে ঝাপসা দেখলো দরজার ধারে দাঁড়িয়ে-থাকা অন্য দু-জন মানুষকে।

৩

ঘরের নীরবতা, নিবিড়, স্পন্দমান নীরবতা, মুহূর্তের বেশি স্থায়ী হ'লো না। কুয়াশা কেটে গেলো, হাওয়া বইলো আবার, চিত্রা একটু ন'ড়ে ব'সে ডাকলো, 'গীতা! বেণু! আয়।'

সেই বারো বছরের ফুটফুটে মেয়েটি এগিয়ে এলো, পিছনে তার সদ্যগোঁফের ছায়া-পড়া হঠাৎ-লম্বা-হওয়া দাদা। সেই জানলা-খোলা ঘরে, ফুল ফল খাদ্য পানীয়ে উজ্জ্বলতর বৈশাখী হাওয়ায়, চাঁপার গন্ধে চায়ের পেয়ালায় আবিষ্ট মন্থর পরিবেশে, মুখোমুখি দু-জন মানুষের অসমাপনের তীব্রতাব মধ্যিখানে, দ্বিধান্বিত লাজুক পায়ে এগিয়ে এলো ওরা, শবরি কলায় আলো-করা চায়েব টেবিলের একটুখানি দূরে এসে দাঁড়ালো। চিত্রা আড়চোখে একবার তাকালো মৌলির দিকে, দেখলো তার চোখের ছায়াচ্ছন্নতা, তার কপালের ঈষৎ ফুলে-ওঠা রাজদণ্ডের মতো শির।

'মৌলি! একবার তো বসতেও বলতে পারো ওদের। কেমন বেচারা মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।'

'বোসো, গীতা। বেণু, বোসো।'

মৌলির এই কর্তব্যপরায়ণ আমন্ত্রণে সাড়া দিলো না কেউ। বেণু তাব সদ্যপ্রাপ্ত পুরুষের গলায় গমগম ক'রে বললো, 'নাঃ, বসবো না। মা জিগেস করলেন, তুমি কি এখন যাবে, দিদি?'

'এই—একটু পরে। তোরা খেয়েছিস?'

'কখন!'

'আর-কিছু ইচ্ছে আছে নাকি? সন্দেশ একটু?' ব'লে চিত্রা দু-জনের দিকেই তাকালো, আর দু-জনের হ'য়ে বেণুই আবার উত্তর দিলো, 'নাঃ। যা পেয়ারা, দিদি, ঐ গাছটায়!' ব'লেই মৌলির দিকে তাকিয়ে একটু লাল হ'লো।

'খুব পেয়ারা হয়েছে, না?' যে-চোখে একটু আগেই মেঘ ছিলো, হয়তো বিদ্যুৎ, ঝড়ের সংকেত, সেই চোখেই এখন নির্মল হ'য়ে ছড়ালো গার্হস্থ্য প্রসন্নতা ; চোখে হেসে চিত্রা বললো, 'কিন্তু এতক্ষণে একটাও বোধহয় নেই?'

'যাঃ! আমি মোটে এই দুটো-একটা—তুমি খাবে, দিদি? এনে দেবো?'

'এখন না। নিয়ে চলিস কয়েকটা।'

'হ্যাঁ, তা-ই বেশ ভালো হবে। যেতে-যেতে গাড়িতে খাওয়া যাবে বেশ। তাহ'লে যেতে দেরি আছে?'

'বেশিক্ষণ না।'

'কতক্ষণ? ধরো—কুড়ি মিনিট?'

'অত ঘণ্টা-মিনিটের হিশেব দিতে পারবো না,' চিত্রা এবার প্রকাশ্যেই হাসলো, প্রায় শব্দ ক'রেই। 'খানিক পরে যাবো আরকি।'

'না, যদি দেরি থাকে তাহ'লে তারকদের বাড়ি ঘুরে আসি একবার।'

'বেশ তো ; ঘুরে আয়।'

'ওদের সাইকেলটা পেলে গাড়ি আনারও সুবিধে হয়। সেই স্টেশনে তো যেতে হবে গাড়ির জন্য।'

'ওটাই রেখে দিলে হ'তো।

'বা রে, খামকা বেশি ভাড়া দেবো কেন? সাইকেল না পাই হেঁটেই নিয়ে আসবো এক ছুটে। আনিনি আগে?'

'সত্যি, বেণু সঙ্গে থাকলে ভাবনা নেই।'

মুখ টিপে হাসলো ছেলেটা—চেষ্টা ক'রেও লুকোতে পারলো না। বুক টান করে বললো, 'যাই তাহ'লে। আমি ঠিক সময়মতোই আসবো—' আলগোছে শার্টের আস্তিন টেনে কব্জির দিকে একটা কটাক্ষ হানলো বেণু—'এই তারকের সঙ্গে খানিকক্ষণ—তারপর—বড়ো জোর আধ ঘণ্টা লাগবে আমার।'

'আমাদের খুব তাড়া নেই তেমন।'

'না না, সময়মতোই সব করা ভালো।' বেণু একবার ঘরের চারিদিকে তাকালো, মৌলির সঙ্গে চোখে-চোখে কোনোরকমে একটা সম্ভাষণ সেরেই ঘুরে দাঁড়ালো, বেরিয়ে গেলো এখনো-ঠিক-অভ্যেস-না-হওয়া মস্ত পায়ে এঁকে-বেঁকে।

চিত্রা হেসে বললো, 'ওর ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্যে বাবা ওকে ঘড়ি কিনে দিয়েছিলেন, সেই থেকে বেণু বেজায় পাংচুয়াল হ'য়ে পড়েছে। কাঁটায়-কাঁটায় সব করা চাই। ওর সময়মতো নাওয়া-খাওয়ার তাড়ায় বাড়িতে সব অস্থির আছি আমরা।'

এই হাল্কা আদরের মতো পরিহাসের ছোঁওয়ায়, জীবনের সঙ্গে সহজ সম্বন্ধের এই ঝিরিঝিরি আরামদায়ক হাওয়াটুকুতে, মৌলি সাড়া দিলো না। সামনের পেয়ালাটা হাতে তুলেই নামিয়ে রেখে বললো, 'চা কি আছে আর?'

চিত্রা চা ঢাললো মৌলির পেয়ালায়, নিজেও নিলো আর-একটু। পেয়ালা নিয়ে মৌলি যখন ঝুঁকেছে. হাত বাড়িয়েছে চিত্রার দিকে, যখন তার চোখে পড়লো, যেন এই প্রথম বার চোখে পড়লো অন্য জনকে, অন্য মেয়েটিকে। জিগেস করলো. 'গীতা চা খায় না?'

এতক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলো গীতা ; বাড়ি ফেরার. গাড়ি ডাকার কথায় চুপ ক'রে ছিলো ; বেণুকে ঘড়ি নিয়ে ঠাট্টা করার সুযোগ নেয়নি, যোগ দেয়নি পেয়ারা পাড়ার সুখচর্চায়। বোধহয় অন্য কিছু দেখছিলো, অন্য কিছু ভাবছিলো, বোধহয় নিজেকেই এতক্ষণ ভুলে ছিলো এই বারো বছরের মেয়ে। এইবার তার অস্তিত্বের উল্লেখ শুনে—তার নাম, তারই নাম উচ্চারিত হ'তে শুনে যেন চমকে চোখ তুলে তখনই আবার নামিয়ে নিলো।

'কী খাবি নাকি একটু?' তারপর ঈষৎস্ফুট অসম্মতির মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্রা আবার বললো, 'থাক, গীতা এখনো চা খায় না তেমন।'

'সেটা ভালোই। কিন্তু কবিতা কি পড়ে এখনো?'

'বাঃ! তোমার সব কবিতা ওর মুখস্ত তুমি জানো না?'

'সেরে যাবে। আর দু-তিন বছরেই সেরে যাবে। ভেবো না,' ব'লে মৌলি একটা তির্যক দৃষ্টিপাত করলো গীতার দিকে।

টুকটুকে লাল হ'য়ে উঠলো গীতার মুখ। দিদির মতো মুখ নয় তার, বরং নানা ভাবেই দিদির সে উল্টো। যা পুরোনো, যা ম্লান, যাকে মনে হয় ম্লান ব'লেই মূল্যবান, মনে হয় যেন ভঙ্গুর এবং যত্নে সাধা, কোনো ধূসর অবক্ষয়ের আভাসে যার রমণীয়তার ইন্দ্রিয়-ধার ক্ষ'য়ে যায়, যাকে হঠাৎ কখনো মনে হ'তে পারে ঝড়ের মতো, তানের পরে গান থেমে আসার সর্বশেষ নিশ্বাসটুকু—এ-মেয়ের মুখে কিছুই তার নেই। গোল ছাঁদের পুষ্ট মুখ, ফুটফুটে ফর্শা রঙের, তেমনি গোলাপি ধরনের ফর্শা যাকে মনে হয় প্রায় আপত্তিকর—বাংলার, বিশেষত পূর্ব বাংলার মাটিতে রীতিমতো অস্বাভাবিক এবং অশোভন। হয়তো কপালটি মেয়েদের পক্ষে একটু বেশি চওড়া, কিন্তু এই খুঁতটুকু ঢেকে দিয়েছে যেন তুলি দিয়ে আঁকা পরিষ্কার দুটি কালো ভুরু, আর তারই তলায় স্বচ্ছ গভীর চোখ দুটি, যার কোণের দিকে যেন নীল ছায়া জ'মে থাকে সব সময়, আর সামনের নীলচে-ব্রাউন গোলকের মধ্যে দু-ফোঁটা

হিরের মতো তারা দুটি জ্বলজ্বল করে। পাৎলা বিলেতি অর্গ্যাণ্ডির কুঁচি-দেয়া ফ্রক পরেছে বকের মতো শাদা, কিন্তু তার মাথার ফুল-ক'রে-বাঁধা রিবনটি ঠিক তার দিদির শাড়ির মতোই হালকা-নীল। মোটের উপর এ-মেয়ের বিধিলিপি যেন রূপসী ব'লে পরিচিত হওয়া, নিতান্তই সাধারণ অর্থে, সাংসারিক অর্থে রূপসী—এবং পরিশীলিত রসজ্ঞের মতে হয়তো তেমন পাংক্তেয় নয়, কেননা তাকে দেখে মনে হয় সেই সব মেয়েদেরই একজন, যারা ছেলেবেলায় খোলা হাওয়ায় খুব ছুটোছুটি করে, আর যা-কিছু খায় তা-ই নিঁখুত হজম ক'রে চিক্কণ মেদসঞ্চয় করে শরীরে—এবং যথাসময়ে স্বামী এবং সন্ততি নিয়ে ভরপুর সংসার ক'রে জীবন কাটায় ; যাদের কখনো অসুখ করে না, ঘরে কখনো অকুলোন ঘটে না, যাদের ফর্শা কপালে সিঁদুরের টিপ একটুও কম উজ্জ্বল দেখায় না কখনো, যারা মোটা হয়, সুখী হয়, সুখী করে। এখন—এই যে সে দাঁড়িয়ে আছে তার বিসদৃশ চওড়া কপাল নিচু ক'রে, তার মাথার নীল রিবনের গুচ্ছটিকে সামনে এনে, এখন তার ইতিমিধ্যেই গোল-হয়ে-ওঠা বাহু, আর ফ্রকের নিচে মসৃণ তরুণ জংঘার দিকে তাকিয়ে তাকে মনে হ'তে পারে এতই জীবনযোগ্য, সংসার-যোগ্য, যে তার কানের ডগাটুকু পর্যন্ত ছড়িয়ে-পড়া লজ্জার লাল আগুনের অর্থ হয়তো ঠিক কারো চোখেই তেমন ক'রে ধরা পড়বে না।

মৌলি তাকালো গীতার দিকে, গম্ভীর চোখে তাকে দেখলো একটু। জিগেস করলো, 'তোমার কোনো বন্ধু নেই পাড়ায়?'

গীতা জবাব দিলো না।

'তুমি ফুল ভালোবাসো? এই নাও'—টেবিল থেকে একটি চাঁপা তুলে হাত বাড়ালো মৌলি।

গীতা এগিয়ে এলো, মৌলির সামনে দাঁড়িয়ে একবার চোখ তুললো তার দিকে, একটি অপ্রত্যাশিত ললিত ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে ফুল নিলো তার হাত থেকে, পা টিপে-টিপে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলো।

'আশ্চর্য!' একটু পরে ব'লে উঠলো চিত্রা।

'কোনটাকে আশ্চর্য বলছো?'

'গীতার কথা বলছি। বাড়িতে ওর দুরন্তপনায় টিঁকতে পারি না আমবা, আর তোমাকে দেখলে কী অসম্ভব শান্ত হ'য়ে যায়!'

'নাকি?' তেমন কৌতূহল কি উৎসাহ প্রকাশ পেলো না মৌলির গলায়।

'আমাদের ওখানেও যাও যখন—ওর সাড়াশব্দ পাও কখনো?'

'কী যেন—লক্ষ্য করিনি।' মাথার চুল উপর দিকে ঠেলে দিয়ে মৌলি বুঝিয়ে দিলো যে প্রসঙ্গটা বদলালে এবার ভালো হয়।

'না! গীতা তখন অন্য মানুষ!' চিত্রা কিন্তু এ-প্রসঙ্গ ছাড়লো না, বরং আঁকড়ে ধরলো, যেন গীতাকে দিয়ে আরো একটুক্ষণ আড়াল করতে চাইলো নিজেকে, মৌলিকে—যেন এই ছুতোয় আরো একটু পেছিয়ে দিতে চাইলো সেই হাতুড়ির বাড়ি, এই সকালবেলার গীতিকবিতার শেষ দারুণ পংক্তিটি। 'তুমি যতক্ষণ থাকো—ও যে কোথায় থাকে কেউ দেখতেই পায় না। একদিন—তুমি হঠাৎ "পূরবী" হাতে ক'রে এলে, এসেই আওড়াতে লাগলে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে—আমি একবার উঠে গিয়ে দেখি পাশের ঘবে গীতা ব'সে আছে চুপ ক'রে ; সামনে স্কুলের বই খুলে তাকিয়ে আছে দেয়ালটার দিকে, তুমি যে কবিতা বলছো তা-ই শুনত একমনে। আমাকে দেখে চমকে উঠলো।'

এই খবরটা শুনে মৌলি কোনো মন্তব্য করলো না।

'আর এখন দেখলে তো? কী-রকম ছবির মতো দাঁড়িয়ে ছিলো এসে! দু-একটা অন্তত কথা বলতে পারতে ওর সঙ্গে! ওর ইচ্ছে—আমি তো বুঝি—ওর ভীষণ ইচ্ছে তোমার একটু কাছে আসে ; কিন্তু সাহস পায় না।'

'কী জানি,' মৌলি উদাসভাবে চুল টানলো। 'বাচ্চাদের সঙ্গে ভাব জমাতে আমি একেবারেই পারি না।'

'বাচ্চা বলছো কাকে?'—চিত্রার চোখে কী-রকম একটা আলো আবার ঝলক দিলো হঠাৎ, যেন

কোনো বোবা রাগের ঝিলিমিলি, প্রায় কোনো হিংস্রতার স্ফুরণ—'আর দু-দিন পরে গীতা যখন শাড়ি ধরবে, তোমারই মতো কত যুবকের বুকে ঢেউ তুলবে না তখন!'

'তোমার এ-সব ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না,' অত্যন্ত গম্ভীর মুখে মৌলি জবাব দিলো, যেন কোনো অপমানকর, অসম্মানজনক কথা শুনেছে।

'ঠাট্টা নয়—সত্যি কথা। ছেলেমানুষ ব'লে যে চোখেই দ্যাখো না গীতাকে, তোমার নিজেরই বা বয়সটা কী?'

'আয়ুর অঙ্কে বয়স হয় না, চিত্রা ; বয়স মানুষের মনে। আমারও পনেরো-ষোলো বয়স ছিলো, কিন্তু আমি কখনো বেণুর মতো ছিলাম না। কোনোদিনই ও-রকম ছিলাম মনে করতে পারি না। গীতা তো ছোটোই ; অনেক বিষয়ে তোমার চেয়েও অনেক বেশি বয়স্ক আমি।'

'যথা—কাঁচা পেয়ারা?' চিত্রা ঠোঁটের কোণে হাসলো।

'ঠিক ধরেছো! তুমি—এই তুমি—তুমি এখন গাড়িতে যেতে-যেতে পেয়ারা খাবে—অন্তত সেটা সম্ভব ব'লে মনে করো—এ-কথা ভাবতে আমার কী-রকম কষ্ট হয় জানো না?'

'কষ্ট হয়?'

'অবাক লাগে, বিশ্বাস হয় না, মেলাতে পারি না। তোমার সঙ্গে মেলাতে পারি না, চিত্রা।'

'আচ্ছা, মৌলি—সত্যি ক'রে বলো—তুমি যদি ঐ গাড়িতে থাকো, আর আমরা সবাই পেয়ারা খেতে-খেতে যাই, তুমি একটাও খাবে না?'

'আমি ঐ গাড়ি থেকেই নেমে যাবো।'

'সত্যি?'

'নিশ্চয়ই। এ-সব সাধারণ সুখ অসহ্য লাগে আমার।'

'অসহ্য লাগে?' চিত্রার চোখের কোণের বিষাদের ছায়া এবার নীল হ'য়ে নামলো সমস্ত মুখে ; বেদনায় ভরা, করুণায় ভরা দুটি চোখ বিস্ফারিত ক'রে মৌলির দিকে তাকিয়ে থাকলো। তার ঠোঁট দুটি ফাঁক হ'লো, কিন্তু কথা বেরোলো না, শুধু ছোটো মাথাটি আস্তে-আস্তে নড়লো একটু—যেন বলতে চাইলো, 'আহা বেচারা!' বলতে চাইলো, 'ভগবান তোমাকে দয়া করুন!'—কিন্তু তাও থেমে গেলো ঠোঁটের কাছে উঠে আসার আগেই—কোনো কথাই থাকলো না, শুধু মনে-মনে ডাকলো, 'মৌলি, মৌলি!'—যেন হৃদয়ের গভীরতম কোনো দয়ার স্বরে, অপরিসীম নম্র কোনো নিঃশব্দ উচ্চারণে শুধু তার নাম ধ'রে ডাকলো কয়েকবার। তারপর আস্তে-আস্তে, নিজেরই অজান্তে চোখ তার ভারি হ'য়ে বুজে এলো , চোখ বুজে থাকলো একটুক্ষণ ; তারপর হঠাৎ যেন ঝাঁকানি দিয়ে জেগে উঠে বললো, 'চা খাওয়া হয়েছে তোমার? এগুলো নিয়ে যাবো?'

'থাক। বোসো। তুমি কি খুব অবাক হ'লে পেয়ারা বিষয়ে আমার কথা শুনে?'

'অবাক হবো কেন। জানি তো তোমাকে।'

'অথচ অনেক সময় এমন ব্যবহার করো, যা আমার—কী বলবো—যা আমার বাইরে, আমার জগতের বাইরে—বিরুদ্ধে বললেও দোষ হয় না।'

'কিন্তু তোমার জগতের বাইরেও মস্ত একটা বিশ্বজগৎ আছে, মৌলি। সেটা কি তোমার ইচ্ছেমতো চলবে তুমি আশা করো?'

'আমার আশা খুব ছোটো, চিত্রা। প্রকাণ্ড বিশ্বজগতের মধ্যে একজন মানুষ—শুধু একজন মানুষ—এইটুকু দাবি করলেও দোষ?'

'দু-জন মানুষ কখনো এক মানুষ এক হয় না, মৌলি।'

'হয় না? তুমি আমি আজ যেখানে এসে মিলেছি সেখানে কোথায় ফাঁক আছে বলো তো? তাই বলি তোমাকে—সুর কেটে দিয়ো না, আরো কাছে এসো। ঘনিষ্ঠ হও।'

'কিন্তু—মৌলি—আমাকেই বা এত বিশ্বাস কিসের!' চিত্রা জোরে একবার নিশ্বাস নিলো কথাটা ব'লে, যেমন হয় কথার মধ্যে হাসি পেলে, কিংবা যদি দম আটকে আসে হঠাৎ।

'তাই বুঝি?' ছোট্ট হাসি ফুটলো মৌলির ঠোঁটে, দয়ালু হাসি, মা যেমন ভুরু বাঁকিয়ে অভয় দেন, কোনো অপরাধ ক'রে শিশু যখন সামনে এসে দাঁড়ায়। হাঁটু উঁচু ক'রে টেবিলে ঠেকিয়ে চেয়ারটি দোলাতে লাগলো আস্তে-আস্তে, আয়েসি গলায় বললো. 'ভারি একটা মজার গুজব রটেছে ইউনিভার্সিটিতে ; জানো তো?'

'কী, শুনি?' চিত্রাও যেন আরাম ক'রে পিঠ এলিয়ে দিলো ইজি-চেয়ারে।

'তোমার নাকি বিয়ে—আর কার সঙ্গে জানো?—মহেন্দ্রবাবু, মহেন্দ্র ঘোষ প্রোফেসরের সঙ্গে!' নিচু, নরম গলায় লম্বা টানে হেসে উঠলো মৌলি—যেমন ক'রে হেসেছিলো গীতার কবিতা পড়ার কথায়—হাসির ঝোঁকে চেয়ারটা একটু বেশি উল্টিয়ে যেতেই হাত দিয়ে টেবিলটা ধ'রে ফেলে সোজা হ'লো। 'ছেলেরা সব বলাবলি করে এ নিয়ে—আর জানো, আমার কাছেই বলে।'

'তুমি কী বলো?' একটুও নড়লো না চিত্রা, একটু টেনে-টেনে কথাটা বললো, যেন তার ঘুম পেয়েছে, যেন ক্লান্ত হ'য়ে বিশ্রাম করছে এখন, অনেক উত্তেজিত তর্কের পর আরামে ব'সে একটু মৃদুকোমল বিশ্রম্ভালাপে নেমেছে।

'আমি আর কী বলবো—হাসি পায়—গম্ভীর হ'য়ে শুনে যাই সব। ওরা তো আর জানে না—কিন্তু জানে না কেন তাও বুঝি না—তোমাকে দেখে, আমাকে দেখে ওদের বোঝা উচিত।'

'কী বোঝা উচিত?'

'কে কবে আগুন লুকোতে পেরেছে? ওদের চোখ নেই? দেখতে পায় না?'

চিত্রা জবাব দিলো না। জবাব না-দিলেও চলে এই প্রশ্নের—না কি সে এতই ক্লান্ত যে একটু কথা বলতেও তার আলস্য? কেমন দেখাচ্ছে তাকে—একটু কি ফ্যাকাশে হয়েছে মুখ?—না কি ইতিমধ্যেই-তারুণ্য-হারানো সকালবেলায় জানলা থেকে রোদ স'রে গিয়ে তার মুখের স্বাভাবিক ম্লানতা আরো বেশি প্রকট হয়েছে? স্তব্ধ হ'য়ে এলিয়ে আছে সে, ইজিচেয়ারের বঙ্কিমার সঙ্গে তার শরীরের ছিপছিপে গড়নটি খাপে-খাপে মিলে গেছে যেন, হাত দুটি নেতিয়ে আছে পাশে, চোখে যেন তন্দ্রাভরা শূন্যতা;—বিরাম, পূর্ণ বিরামের ছবি তাকে দেখে মনে হবে এখন, লাফিয়ে পড়ার আগে যেমন ঝোপের পিছনে লম্বা রেশমি বাঘিনীর শরীরের আশ্চর্য বিরাম! ঠিক তেমনি ব'সেই, মৌলির দিকে স্পষ্ট ক'রে না-তাকিয়ে, চিত্রা আস্তে-আস্তে বললো, 'যদি আমি বলি যে গুজবটা সত্যি?'

'সত্যি! সত্যি!' মৌলি হাসলো, আর-কিছু বললো না।

'সত্যি, মৌলি! তুমি যা শুনেছো তা সত্যি।'

এতক্ষণে মৌলি লক্ষ্য করলো চিত্রার ফ্যাকাশে দেখানো মুখ, তার শরীরের নেতিয়ে-পড়া অবশ নিস্পন্দ ভঙ্গি। একটু ভয়, ভয়ের অতিশয় হালকা একটু ছায়া তার মুখের উপর দিয়ে ভেসে গেলো। তারপর আশ্বাসের সুরে, বিশ্বাসের সুরে, একটি অতি কোমল সুদূরস্পর্শী স্নেহের সুরে বললো, 'তুমি কি আজ পাগল হ'লে?'

'মৌলি, আমার কথা শোনো—' হঠাৎ যেন একটা কাঁপুনির ঢেউ ব'য়ে গেলো চিত্রার পা থেকে মাথার খোঁপা পর্যন্ত—'তোমাকে একটা কথা বলতেই আজ এসেছিলাম।'

আবার একটু থমকালো মৌলি, চিত্রার দিকে সরু চোখে একবার তাকালো, কিন্তু তখনই আবার পরিষ্কার সরল হ'লো তার চোখ, খুব শান্ত একটি হাসি ফুটলো মুখে। 'কী, বাড়ির লোক জোর করছে? তা ভয় কী। তুমি—আমি—এই অফুরন্ত পৃথিবী—ভয় কী আমাদের?'

'তোমার জন্য অফুরন্ত পৃথিবী ; আমার জন্য ছোটো একটি সংসার।'

'ও-দুই কি মিলবে না কখনো?' হঠাৎ মৌলির মন যেন অন্য কোথাও চ'লে গেলো—আবেশে আরো কালো দেখালো তার চোখ, যেমন হয়েছিলো দেখতে যখন একলা ঘরে সুইনবর্ন গুনগুন করছিলো সে; গুনগুন ক'রে, যেন আপন মনেই বলতে লাগলো, 'ও-কথাও ভেবে দেখেছি আমি। কত এমন সময় আসে যখন আমার মনে হয় আমি সব পেয়েছি, শুধু এই পৃথিবীতে জন্মেছি ব'লেই সব পেয়েছি ; সকাল, বিকেল, দুপুর, রাত্রি, ঋতুর পর ঋতু—কোনো-একটি মুহূর্তের মতো নয়— ; কত

সময় আমার মনে হয় যদি একশো বছর বাঁচি তবু ক্লান্ত হবো না কিছুতেই, শেষ হবে না আমার বেঁচে থাকার আবেগ।'

চিত্রা নিঃসাড় ব'সে থাকলো, যেন মৌলির কথা শুনছেই না, কিংবা খুব একমনে শুনছে ঠিক তার নিজের মুহূর্তটিকে ধরবে ব'লে।

'কিন্তু আবার অন্য অনেক সময় আসে, যখন আমি তোমাকে চাই। তোমাকে চাই, চিত্রা। যখন মনে হয় তুমি না-হ'লে কিছুই হ'লো না ; এই আলো, আকাশ, আকাশের তারা এরা কোনো কথাই বলবে না আমাকে, যদি না তারা তোমার গলা খুঁজে পায়। তখন বুঝি, কত মিথ্যা আমার দম্ভ, কত আমি অসম্পূর্ণ—তোমাকে ছাড়া। উপকরণের অন্ত নেই পৃথিবীতে, কিন্তু কে তাকে ছন্দে বাঁধবে তুমি না-হ'লে? তথ্যকে কবিতা ক'রে তুলতে, বস্তুকে সুর ক'রে বাজাতে কার কাছে আমি শিখতাম তোমাকে যদি না পেতাম? সেই তুমি—চিত্রা, সেই তুমি!'

চিত্রার ছোটো মাথাটি আস্তে-আস্তে নড়লো একটু, কিন্তু আর কোনো ভঙ্গি হ'লো না শরীরে, মুখের ভাবও বদলালো না। নিশ্বাসের স্বরে বললো, 'সে আমি নই, সে আমি নই।'

'এখনো তোমার ভুল ভাঙলো না?'

'আমি কখনো ভুল করিনি, মৌলি। কখনো ভাবিনি যে ও-সব কথা যাকে তুমি বলো সে তোমারই মনের কল্পনা ছাড়া অন্য কিছু।'

'তুমি আছো ব'লেই সার্থক আমার কল্পনা। নয়তো কিছুই থাকে না—সব ফাঁকা, শূন্য—নয়তো পায়ের তলায় মাটি থাকে না, চিত্রা।'

'আমি নই—সে আমি নই। তোমার বন্ধুরা ভুল বলেনি, মৌলি।'

'মানে?' মৌলির চোখের দৃষ্টি বদলে গেলো হঠাৎ, তার তন্ময় দীপ্তি নিয়ে গিয়ে কেমন-একটা পথ-হারানোর অনিশ্চয়তা ফুটলো। যেন ছটফট ক'রে ব'লে উঠলো, 'কী বলছো, তুমি?'

আর সেই তার অস্থির, অসহায়, করুণ, সুন্দর চোখের দিকে তাকিয়ে একটা তীব্র, অক্ষম, কিন্তু একটু মধুর, প্রায় যেন উপভোগ্য আক্রোশ চিত্রার বুকের মধ্যে ঠেলে উঠলো। দ্যাখো, দ্যাখো একে! দ্যাখো এই লোকটার দিকে তাকিয়ে! নির্বোধ, এখনো নির্বোধ থাকবে তুমি—আমাকে বাধ্য করবে আরো বলতে, টুকরো ক'রে ফুল ছিঁড়তে—সাধারণ সুখ সইতে পারে না যে-মানুষ, তার প্রচণ্ড দুর্বলতাকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে যতক্ষণ না গিয়েছি ততক্ষণ ছাড়বে না আমাকে, আমাকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে না-গিয়ে ছাড়বে না, নিষ্ঠুর? লাল হ'য়ে উঠলো চিত্রা, গুণ-পরানো তীরের ফলা যেমন একটু-একটু কাঁপে তেমনি তার নাকের ডগাটি কাঁপলো একবার, হঠাৎ এক টানে তীরের মতো উঠে ব'সে অদ্ভুত অন্য রকম গলায় বললো, 'শোনো, মৌলি। শুনে নাও কথাটা। যা শুনেছো, সত্যি। একটুও ভুল নেই তাতে। শুনেছো? বুঝেছো?'

মৌলির উপরের ঠোঁট নিচেরটির উপর আঁটো হ'য়ে নামলো, এলোমেলো চুলে ভরা মাথাটা ভারি হ'য়ে নামলো তার বুকের কাছে। প্রথমে মনে হলো সে হেরে গেছে এবার, আর-কিছু বলবে না, কিন্তু একটু পরেই মুখ তুললো যখন, সে-মুখে দেখা গেলো একটি আশ্চর্য সরল মধুর নিষ্করুণ হাসি। ঐ হাসি দিয়ে চিত্রাকে যেন নতুন ক'রে সম্ভাষণ ক'রে সে বললো, 'শুনেছি। বুঝেছি। কিন্তু বিশ্বাস করি না।'

'শোনো। কেউ জোর করেনি আমাকে। আমারই মত নিয়ে হচ্ছে। এই দু-দিন আগেই ঠিক হ'লো সব। যা বলতে এসেছিলাম বলা হ'লো ; এখন যাই।'

'না। যেয়ো না। বোসো।'

'আর-কিছু বোলো না, মৌলি। আমাকে যেতে দাও।'

'ব'লে যাও এ-সব কথা মিথ্যা!'

'মিথ্যে নয়, সত্য।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'ঐ মহেন্দ্র ঘোষ—তাঁকেই?'

'হ্যাঁ। তিনি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন বাবার কাছে। আমি রাজি হয়েছি।'

'তুমি—রাজি হয়েছো?'

'যা ভালো—যাতে ভালো হবে—আমাকে তা করতেই হ'লো।'

'ভালো? এই ভালো?' মৌলি নির্বোধের মতো আওড়ালো কথাটা, যেন ঠিক বুঝতে পারছে না। দু-হাতে মুখ ঢেকে চুপ ক'রে থাকলো একটু। হাত যখন সরালো দেখা গেলো তার নাসারন্ধ্র স্ফীত, আর চোখের কোণে লাল-লাল ছিটে। 'ভালো কেন?'

'তা তুমি এখন বুঝবে না। পরে বুঝবে। দু-বছর—হয়তো এক বছর পরেই বুঝবে যে এই ভালো হ'লো।'

চিত্রার এই কথায় তার নিজের কথারই প্যারডি শুনলো মৌলি, খানিক আগে গীতাকে সে যা বলেছিলো তারই উৎকট ব্যঙ্গানুকৃতি। আর এতক্ষণ এত কথার পরে এতেই যেন মর্মস্থলে আঘাত লাগলো তার, আঘাত লাগলো মূল্যবান আত্মাভিমানে, ধারালো চোখে চিত্রার দিকে তাকালো, গর্বিত, উৎপীড়িত, বিদ্রোহময় দৃষ্টিতে। কিন্তু মৌলি কিছু বলতে পারার আগেই, তার প্রতিবাদের চীৎকার কোনো ভাষা পাবার আগেই চিত্রা আবার কথা বললো :

'তুমি যা ভেবেছো—ভেবেছিলে—জানো না, সেটা অসম্ভব?'

'সেই অসম্ভব তুমি কখনো ভাবোনি? সাহস থাকে তো সত্য জবাব দাও।'

চিত্রার চোখের লম্বা পলক তার গালের উপর ছায়া ফেললো। যেন অনিচ্ছার বাধা ঠেলে অস্ফুটে উচ্চারণ করলো, 'আমার কথা তুমি বুঝবে না, মৌলি। তুমি পুরুষ—তুমি ছেলেমানুষ।'

মৌলির চোখে ঝলক দিলো বিদ্যুৎ। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললো, 'কী?'—'ক'-টা—'খ' এর মতো শোনালো—'কী বললে?'

চিত্রাও উঠে দাঁড়ালো সঙ্গে-সঙ্গে। মনে হ'লো সে হাত বাড়াবে, হাত বাড়িয়ে ধ'রে ফেলবে মৌলিকে, কিংবা হঠাৎ হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়বে ঐ মেঝের উপরেই। মৌলি একটু পিছনে স'রে গর্জন ক'রে উঠলো—'আমি ছেলেমানুষ!'

'তুমি অসাধারণ, তুমি প্রতিভাবান, তুমি অনেক বিষয়ে অনেক বড়ো—সব মানি, মৌলি ; কিন্তু তুমি যে ছেলেমানুষ সে-কথাও তো সত্য!' বলতে-বলতে নিশ্বাস ভারি হ'লো চিত্রার, ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম ফুটলো কপালে, কখনো কল্পনা-করা-যায়-না এমন দু-একটা কুশ্রীতার রেখায় বিকৃত হ'লো সুন্দর ছোটো মুখটি ; কিন্তু তবু, তার কষ্টের খরতর উজান ঠেলে তবু সে বলতে লাগলো, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, মৌলি, ভক্তি করি বলতেও বাধে না ; যদি তুমি কোনোদিন পৃথিবীতে কোনো মন্ত্র প্রচার করো তোমারই কাছে দীক্ষা নেবো আমি—তোমাকে গুরু ব'লে মানতে এখনো আমার আপত্তি নেই—কিন্তু সংসার—সংসার আছে, মৌলি—মেয়ে হ'য়ে জন্ম নিয়ে সংসার থেকে মুক্তি কোথায়। মুখটি একটু উঁচু ক'রে চুপ করলো চিত্রা, তার লম্বা-দেখানো গলার উপর অনতিস্ফুট কণ্ঠাটি স্পন্দিত হ'লো দু-একবার, তারপর শাদা-হ'য়ে-যাওয়া ঠোঁট নেড়ে আবার বললো, 'সেই সংসারে তুমি ছেলেমানুষ, মৌলি—সেখানে তোমাকে আর-কিছুই ভাবতে পারি না।'

মনে হ'লো মৌলি তার উত্তর নিয়ে তৈরি, তার পবম পাশুপত উত্তর, যা চিত্রার পরিশ্রমী প্রাকার মুহূর্তে উপড়ে দেবে ধুলোয়, ঢেলার মতো গুঁড়িয়ে দেবে সব কথা, মুচড়ে লুটিয়ে ফেলবে চিত্রাকে চিরকালের মতো তার পায়ের তলায়। নিশ্বাসের বেগে ঠোঁট খুলে গেলো তার, কিন্তু—কিছু বললো না। হঠাৎ যেন শক্তি ফুরিয়ে গেলো, ক্লান্ত হ'য়ে এলিয়ে ব'সে পড়লো আবার, নিষ্প্রভ হ'য়ে, নিবে গিয়ে, যেন শরীরের আয়তনেও ছোটো হ'য়ে মাথা নিচু ক'রে ব'সে পড়লো। আর সত্যিও তাকে দেখালো যেন দুরন্ত ছেলে উপযুক্ত ধমক খেয়েছে এইমাত্র ; বলবার তার কিছুই আর নেই।

আর তারপর সেই ঘরের মধ্যে সব কিছু থেমে গেলো যেন। বাইরে গাছের পাতা হাওয়ায় নড়লো, ডেকে চললো অধ্যবসায়ী একলা একটা পাখি, আকাশের অম্লান নীলিমা নির্বিকার তাকিয়ে থাকলো

পৃথিবীর সুখদুঃখের দিকে। ঘরের বাইরে বেণুর গলা শোনা গেলো—'দিদি, গাড়ি এসেছে।'

'যাই।' চিত্রা স'রে এসে মৌলির চেয়ারের পিছনে দাঁড়ালো। প্রায় কোনো শব্দ না-ক'রে ডাকলো, মৌলি।'

মৌলি মুখ তুললো না।

'আমি যাই তবে?'

মৌলি চুপ।

চেয়ারের পিঠের উপর দিয়ে নিচু হ'লো চিত্রা, দু হাতে হাতল দুটো ধরলো। মৌলির চুলের গন্ধ তার নিশ্বাসে লাগলো, মৌলির মাথাটা স্পর্শ করলো তার বুক। আবার ডাকলো 'মৌলি।'

মৌলি কথা বললো না, নড়লো না।

'তুমি কিছু বলবে না আমাকে?'

মৌলি একভাবেই ব'সে থাকলো। চিত্রার ঘনিষ্ঠ বুক থেকে মাথাটি পর্যন্ত সরিয়ে নিলো না—হয়তো তাতেই বোঝাতে চাইলো তার কাছে চিত্রা এখন কত অর্থহীন।

'একবার ফিরেও তাকাবে না?'

কোনোরকম বদল হ'লো না মৌলির ভঙ্গিতে। হয়তো তাকে ভান করতে হ'লো যে ঐ শব্দটা সে শুনছে না, তার স্ফীত শিরার দপদপ শব্দ মাথার মধ্যে—না কি চিত্রার—না কি কানের কাছে চিত্রার হৃৎপিণ্ড, তার তৃপ্তিহীন, সান্ত্বনাহীন হৃদয়স্পন্দন?

'থাক। কথা বোলো না। আমার দিকে চেয়ে দেখো না। আমি যাই। যাবার আগে শেষ কথা ব'লে যাই তোমাকে। মৌলি—তোমাকে ভালোবাসি।'

আর তারপর—মৌলির পিছন থেকে আশ্রয় স'রে গেলো, তার মাথাটি শূন্যে ঝুলে থাকলো যেন—সব শূন্য—তবু সেই হৃৎস্পন্দন থামলো না, কিংবা একটু বদল হ'লো তাতে, একটু অন্য রকম শোনালো। এখন মৌলিকে শুনতে হলো—ঠিক শুনতে হ'লো তাও বলা যায় না, শরীরের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে অনুভব করতে হ'লো চিত্রার অতি মৃদু দিগন্তব্যাপী পায়ের শব্দ।

বেলা বাড়লো। কমলেশবাবু সাইকেলে চ'ড়ে কোর্টের দিকে রওনা হলেন। মোড়ের কল থেকে জল নিয়ে এলো ভাঁড়ি। রোদে তেতে উঠলো শাদা ধুলোর পথ। ঘরে প'ড়ে থাকলো খাওয়া-শেষের দাগ-ধরা চায়ের পেয়ালা, কলার খোশা, রুটির গুঁড়ো। একটা রৌদ্রজাত নীল মাছি ভোজে ব'সে গেলো সেখানে। একবার উড়ে গিয়ে হঠাৎ একটু দূরে বসলো পাথরের থালায় চাঁপা ফুলের উপর। মৌলি চুপ ক'রে দেখতে লাগলো মাছিটাকে, তাড়াবার জন্য হাত তুললো না, চুপ ক'রে ব'সে থাকলো।

২

একটি বর্ষার সন্ধ্যা

১

পাঁচ বছর পবে আষাঢ়েব এক অপরাহ্ণ নিবিড় হ'যে নেমেছে সেই পুরানা পল্টনে। সেই—? না কি অন্য এক, অন্য কোনো—যা ছিলো তাব স্মৃতি দিয়ে ভরা, যা হ'যে গেছে তার চিহ্ন মুছে-ফেলা, শুধু সেই একই নামের সূত্রে বাঁধা অন্য এক পুবানা পল্টন? আবো অনেক বাড়ি উঠেছে পাড়ায · দোতলা বাড়ি, জাঁকালো বাড়ি, বাগানওলা, পরদা-ঘেরা, মার্বেল পিতলের নামেব ফলকে চকচকে আত্মসচেতন। পাড়ার এই চকচকে ভাবটাই বিশেষ ক'বে চোখে পড়ে এখন—যখন 'শহব' থেকে, শাঁখাবিবাজাব, তাঁতিবাজাব ইসলামপুরের মিষ্টি স্যাঁৎসেঁতে পচা-পচা নেশা-ধবানো গন্ধে-ভবা পুরোনো দিনেব ঢাকা থেকে কেউ আসে সেখানে—টাটকা চুনকাম-করা দেযাল—কেননা, অধিকাংশ বাড়ি নতুন, আব তেমন পুরোনো কোনোটাই এখনো নয়—সদ্যসবুজ খড়খড়ি, ক্রেটোন কাপড়েব পবদার ফাঁকে ধূসর শীতল মসৃণ মেঝের পবিচ্ছন্ন আভাস ;—সব মিলিয়ে নতুন , কিন্তু কৈশোবেব, তারুণ্যেব, অসমাপ্ত, সমাপ্য, নিজে-নিজে হ'তে-থাকা এবং হ'যে-ওঠা কোনো পদার্থের বেপথুমান অস্থিব নতুনত্ব আব নয় - সদ্য বানানো পণ্যের মতো নিশ্চিন্ত নতুন, সদ্যকেনা জিনিসেব মতো গম্ভীব চকচকে--পালিশ-কবা, শেষ করা, তৈরি। তৈরি হ'যে উঠেছে এতদিনে ; শাদা ধুলোব বাস্তা এখন শান-বাঁধানো, পিচেব প্রলেপে নির্ভরযোগ্য, মোড়ে-মোড়ে বিজলি-বাতিব ভদ্রতা, আর ঘবে—কোনো-কোনো ঘবে—এই সেদিনমাত্র গুজব যার শোনা গেলো, আর ইতিমধ্যেই সগৌরবে যে সমাগত, সেই রেডিওযন্ত্রে কলকাতাব কলতান। না—এখন আর দূষ্য কিছু নেই , জংলি প্রকৃতি পোষ মেনেছে মানুষেব হাতে ; এই পাড়া এখন স্থিত, সুস্থির, আরামদায়ক, সম্ভ্রান্ত, তাব উপব রমনার মহিমা-ছোঁওযায গরীযান ; হাল আমলেব, আধুনিক, ফ্যাশনযোগ্য ; বদলি-হ'য়ে-আসা ডেপুটিবাবুর আকাঙ্ক্ষিত পীঠস্থান।

এই ইস্ত্রি-করা টেবি-কাটা পাড়ায়, ডেপুটি-মুন্সেফ-প্রোফেসর এবং পেন্সন-পাওযাদের প্রতিবেশিতাব মধ্যে, মৌলিনাথের ছোটো একতলাটি তেমন ভালো আব দেখায না--একটু বেখাপ লাগে, যেন দলছাড়া, গোত্র-হাবানো। এর মালিকের—দেখেই বোঝা যায—তেমন যত্ন নেই বাড়িব উপর—কিংবা সামর্থ্য নেই ; বৃষ্টি স'যে-স'যে কালশিরে পড়েছে দেযালে, কোথাও আবাব কালোব গায়ে শ্যাওলা ধরেছে—আর সেই শ্যাওলার বুকে বেগনি বঙেব যে-ছোট্ট ফুল হঠাৎ উঁকি দেয এক-একদিন, পাশের বাড়ির ডালিয়া-ফোটা বাগানের সামনে কোন লজ্জায সে মুখ তুলবে! এই পাশেব বাড়িটা—শৌখিন, অর্বাচীন, দর্পিত দোতলা, সে তার বড়ো-বড়ো ঘব আব বাবান্দা ছড়িযে মৌলিব পুব দিকটাকে প্রায় পূর্ণগ্রাস কবেছে , সেদিকে তাকালে মৌলিনাথ আজকাল দেখতে পায-- দূর গাছপালার আবছা-সবুজ কালচেমতো পুঞ্জ আর দেখতে পায না, ঐ বাড়িটাব হালকা চটুল গোলাপি বংটাই দৃষ্টিসীমা জুড়ে থাকে। কিন্তু দক্ষিণ—অন্তত দক্ষিণটা তার অবাধ আছে এখনো , প্রান্তর পেবিযে ফুটবলের মাঠ, তারপর রেল-লাইন—তারও ওপারে লম্বা সরু বাবান্দাওলা শন্তবে বাড়ির চিলকোঠা পর্যন্ত চোখ দিয়ে ছুঁয়ে আসবার বাধা নেই ; আব এদিকে, চোখের সামনে, প্রান্তব থেমে পাড়া যেখানে আরম্ভ, সেখানে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে হাজাব পাতায অফুরন্ত অস্থির সেই স্থবিব বলীয়ান বটগাছ। এখন, এই ছায়াচ্ছন্ন থমথমে বিকেলে, মৌলি ব'সে আছে দক্ষিণেব জানলা দিয়ে বাইবে তাকিয়ে—সেই ইজিচেয়ারে, চিত্রা যেটাতে বসেছিলো। চেযারটি একটু মলিন হয়েছে এ-কয় বছরে,

ঘরের অন্যান্য আসবাবও তা-ই ; দেয়াল একটু বিবর্ণ ; পুবের জানলায় পরদা দিতে হয়েছে, আর মেঝের যেখানটা খুব রোদ্দুর পায় গ্রীষ্মকালে—যেখানে নীল-শাড়ি-পরা চিত্রা তার পা দুটি রেখেছিলো—সেখানে চুলের মতো অতি সূক্ষ্ম ফাটল নকশা এঁকে দিয়েছে সিমেন্টে। এ ছাড়া আর ঘরটির বিশেষ বদল হয়নি ; শুধু বইয়ের সংখ্যা বেড়েছে, মৌলির পুরোনো বেঁটে আলমারির পাশে আর-একটা এখন উঁচু এবং বেঢপ হয়ে দাঁড়িয়ে, তাছাড়া ছোটো শেলফ গোটা তিনেক—তাদেরও আকৃতিগত সামঞ্জস্য নেই ব'লে এবং মোটের উপর বড্ড বেশি বই আছে ব'লে, ঘরটি আগের চাইতে ছোটো দেখায় এখন—হয়তো, অন্যদের কাছে একটু গম্ভীরও লাগে।

চুপ ক'রে ব'সে আছে মৌলি। তার পায়ের কাছে মেঝের উপর প'ড়ে আছে দু-ঘণ্টা আগে পৌঁছনো কিন্তু মাত্রই একটু আগে চোখ-বুলিয়ে-রাখা এলোমেলো খবরের কাগজ। পাশে, বেতের ছোটো গোল টেবিলে দু-একটা বই, বাংলা মাসিকপত্র। তাকিয়ে-তাকিয়ে মৌলি দেখছিলো, কেমন বিশাল, কেমন সীমান্তহীন বিস্ফারিত হয়ে নেমে আসছে আষাঢ়ের সন্ধ্যা। মেঘের উপর মেঘ জমেছে আকাশে, রঙের উপর রং লেগেছে ; পরতে-পরতে, ভাঁজে-ভাঁজে, একই রঙের ক্রমশ-গাঢ়-হওয়া স্বরগ্রামের কী আশ্চর্য সংগতিসাধন এই আকাশময় বিস্তীর্ণ অর্কেস্ট্রায়! শাদা মেঘের উপর ধোঁয়া মেঘ, ধোঁয়ার উপর নীল, নীলের উপর কালো। আশ্চর্য, অপরূপ, অলৌকিক—শূন্য দিয়ে গড়া এই রঙ্গমঞ্চ, আকাশ নামক কল্পনা দিয়ে বানানো এই নাটমন্দির—অলীক, ভিত্তিহীন, কিছুই না—অথচ বাস্তব, বিশ্বাস্য, দৃশ্যমান। ঐ দূরে, রেল-লাইনের ওপারে শহরে চিল-কোঠার উপর আকাশ যেখানে ঢালু হ'য়ে নেমেছে—কিংবা যেখানে তার উত্থানের আরম্ভ—সেখানে আকাশ নির্মেঘ নিরঞ্জন, কিংবা—যেহেতু কোনো নাম আমাদেরই দিতে হবে—কিংবা শুভ্র, যাকে ঠিক শাদা বলে তাও নয়—ডিমের খোলার মতো নির্বিকার রঙের—কোমল, স্বচ্ছ, স্পর্শাতীত, পবিত্র—অস্পৃষ্ট ঋষ্যশৃঙ্গের চোখে বারাঙ্গনার উদ্‌ঘাটিত উরুর মতো অপাপবিদ্ধ। তারপর ধাপে-ধাপে উঠেছে মিশ্র স্বর, শ্রুতি, সুরসম্ভার, অতি কোমল রেখার থেকে তীব্র নিখাদ পর্যন্ত; বেঁকে-বেঁকে উঠেছে ছাই রং, ছায়া রং, ধূসর ; ধূসর একটি হৃদয়হরণ মীড় দিয়ে মিশে গেছে নীলের মধ্যে : নীল, হালকা-নীল, গাঢ়-নীল—কোথাও একটু সবুজের ছোঁয়া—অরণ্য-পথে চুঁইয়ে-পড়া ভোরের মতো সবুজ ; আবার মৌলির চোখ যেখানে আর পৌঁছয় না, আকাশের সেই সব তুঙ্গ সুদূর শিখরে-শিখরে পরিকীর্ণ—যাকে নষ্ট মেয়ে সুরঙ্গমা চেনে কিন্তু প্রিয়তমা মহিষী যাকে চেনে না, সেই প্রেমিক, ভয়াল, প্রেমাতুর, প্রার্থনীয় রাজার মতো ভাবনা-বাসনা-সব-ডোবানো অকূল অতল অপরিমাণ কালো। আর সেই কালোর বুকে—তিন লাইন ছেড়ে-দেয়া কোনো স্বপ্নে-পাওয়া অচিন্তনীয় মিলের মতো, কিংবা কবিতার ফিরে-আসা কিন্তু সমস্তটির অর্থ-বদলে-দেয়া ধুয়োর মতো, কিংবা—সুর যখন ব্যাকুল হ'য়ে ঘুরে-ঘুরে নিজেকে প্রায় অসীমে হারায় তখন সমের মুখে হঠাৎ-পড়া ফিরিয়ে-আনা মৃদঙ্গ-বোলের মতো—সেই ঘনকালোর বুকে আবার ভেসে আছে হালকা রং, ধোঁয়াটে শাদা অনিশ্চিত স্বচ্ছ মেঘ, যেন গগন ঠাকুরের মায়াবী কোনো জানলায় দেখা আলো—ঐ কালোকে কোথাও, দুপুরবেলার বনচ্ছায়ার মতো মখমল-গভীর বেগনিতে ডোবানো ; তারপর সেই বেগনি থেকে গড়িয়ে-গড়িয়ে কালো, নিথর কালো, পুঞ্জীভূত—আরো উজ্জ্বল ক'রে তুলে আস্তে-আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে তারই মধ্যে। দেখা যাচ্ছিলো মেঘেদের নড়াচড়া—মন্থর ধ্রুপদী তালে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে পরস্পরে মিশে যাওয়া, কোনো-এক অত্বর, অধৈর্যহীন, পরিবর্তমান স্থাপত্য-বিলাস—মিনার, খিলান, সোপান, গম্বুজ, বারান্দার পর অফুরন্ত বারান্দার ভাঙা-গড়া ;—তারপর, তাকিয়ে থাকতে-থাকতেই, সব ভেঙে গেলো, মুছে গেলো, একাকার হ'লো কালোয় ; স্তব্ধ হ'লো গতি, হাওয়া বন্ধ ;—কম আলোয় আরো-বিস্তীর্ণ-দেখানো প্রান্তরের উপর, ছবির মতো নিস্পন্দ-হওয়া বটগাছটার উপর, সমস্ত রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষমান পৃথিবীর উপর, মেঘ তার জটায়ু-পাখা আদিগন্ত ছড়িয়ে দিয়ে প'ড়ে থাকলো। এখন আর কিছু নেই, আর-কিছু হবার নেই : শুধু বৃষ্টি।

—বৃষ্টি নামুক। মেঘ ফেটে যাক, দিগন্তকে ছিঁড়ে নিক হাওয়া, আকাশটাকে ফাটিয়ে দিয়ে বজ্র বেজে উঠুক। আ—মৌলি মনে-মনে ভাবলো—কী আনন্দ এই রকম সন্ধ্যায়, কী আনন্দ ঝড়বৃষ্টির সহচর

বিরুদ্ধতাকে বুকে ক'রে বেরিয়ে পড়তে, ঘুরে বেড়াতে, এগিয়ে যেতে! কত দিন, কত রাত্রে এই বৃষ্টি তাকে ধ'রে ফেলেছে মাঠের মধ্যে ; একটু থামেনি সে, আশ্রয় খোঁজেনি, দ্রুত করেনি গতি, কোনো একটি ক্ষুদ্রতম অনিচ্ছার, এমনকি কোনো বিস্ময়ের ভঙ্গিতেও সেই নির্জন মিলনের গৌরবহানি করেনি; শুধু, যখন তার চুল বেয়ে জলের ধারা ঠোঁটে নেমেছে আর গায়ের জামাটা লেপটে গেছে পিঠের চামড়ায়, তখন শুধু ভিতরে-ভিতরে কেঁপেছে, বৃষ্টির প্রণয়প্লাবনের আনন্দে কেঁপেছে, অন্ধকারে হাওয়ার শীৎকারে শিউরে উঠেছে সমস্ত শরীরে। সেই শিহরণ—যদিও বৃষ্টির আগে সব এখন স্তব্ধ, আর মৌলি ব'সে আছে ঘরের মধ্যে আরামচেয়ারে—সেই তীক্ষ্ণ হাওয়ার ঠাণ্ডা অথচ বুকের মধ্যে উষ্ণ-ক'রে-তোলা শিহরণ ক্ষণিকের জন্য অনুভব করলো মৌলি, যেন কোনো পাগল অভিসার বিদ্যুতের মতো চমক দিলো তার শরীরে—তারপরেই মিলিয়ে গেলো, ফুরিয়ে গেলো। আকাশ থেকে চোখ ফিরিয়ে আনলো সে, একবার তাকালো ঘরের চারদিকে, যেখানে সবই আরাম-দায়ক, সুব্যবস্থিত, তারই সুবিধের খাপে-খাপে সব বসানো—যেখানে কিছুই তাকে বাধা দেয় না, কোথাও কিছু প্রতিকূল নেই।

ডাকের চিঠির হাতে ক'রে তার মা ঘরে এলেন। এ-কয় বছরে একটু রোগা হয়েছেন ভদ্রমহিলা, বয়সের ছাপ পড়েছে মুখে, চোখের তলাকার চামড়ায় সূক্ষ্ম রেখা পড়েছে যা আগে ছিলো না। মৌলি তাঁর দিকে না-তাকিয়েই চিঠিগুলি হাতে নিয়ে চোখ বুলিয়ে গেলো একবার—তার পাব্লিশার দাস লাইব্রেরির খাম, তার সাহিত্যিক বন্ধু বিদ্যুৎ সেনের ছাপার মতো হাতের লেখা, আরো দু-একটা যার প্রেরকের নাম আন্দাজ করা যায় না—না-খুলেই বেতের টেবিলে রেখে দিলো।

মা জিগেস করলেন, 'চিঠি পড়লি না?'

'পড়বো।'

মা একটু অবাক হ'য়ে ছেলের দিকে তাকালেন। আর সত্যিও, এই উদাসীনতা, টাটকা-পাওযা বার্তা বিষয়ে এই নিঃস্পৃহ ভঙ্গি—এটা মৌলির পক্ষে অ-সাধারণ, ঠিক স্বাভাবিক নয়, যে তাকে একটুও চেনে তার চোখেই লক্ষ্যণীয়। অভ্যাস তার একেবারেই উল্টো। সারাদিনের মধ্যে এই সময়টাই তাব সবচেয়ে ভালো লাগে আজকাল, এই বিকেলবেলাটা, যখন সে ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরেছে, যে-কাজের কোনো অর্থ নেই তার কাছে সেই কাজ সেদিনের মতো চুকিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরেছে, আর তার খানিক পরেই হাতে পেয়েছে সেদিনের ডাক—কলকাতার চিঠি, অন্য কত না-শোনা কি নাম-না-শোনা শহরের, যে-পৃথিবী অনেক বড়ো সেই পৃথিবীর স্পর্শ পেয়েছে, যখন সে মুক্তি পেয়েছে অন্য এক বৃহত্তব জগতে। সেটাই তার পক্ষে প্রথাগত, স্বভাবসিদ্ধ—অধীর হাতে খাম খোলা, প্রথম বার চোখটাকে শুধু দৌড়িয়ে এনে পরের বারে মন দিয়ে পড়া, তারপর সেদিনই সন্ধ্যায়, কিংবা শোবার আগে রাত্রে ব'সে জবাব লেখা—যাতে পরের দিনের ডাক ধরতে পারে, কেননা এই পদ্মা-পেরোনো শহবে সভ্য জগতের নিয়ম উল্টিয়ে চিঠিপত্র পৌঁছয় বিকেলে এবং যাত্রা করে পূর্বাহ্ণে। প্রায় সব চিঠিরই জবাব দেয় সে, অপরিচিত পাঠকেরও—অনেকেই তারা পাঠিকা—ইতিমধ্যেই খ্যাতির উপজাতক এ-সব চিঠিপত্র সে পাচ্ছে কিছু-কিছু—যে-চিঠিতে অমুক লেখা ভালো লেগেছে এ ছাড়া আব কথা নেই, তারও কোনো উত্তর না-দিলে তার শান্তি হয় না। যে-কোনো, যে-কোনো কিছু, যা সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যা জড়িত তার সত্যিকার কাজের, তার সত্যিকার জীবনের সঙ্গে, সেদিকে মন তাকে দিতেই হবে—কিছুই সেখানে তুচ্ছ নয়, ভানেরও মূল্য আছে সেখানে—সেখানে তার চরম মন তাকে দিতেই হবে, নয়তো তার অস্তিত্বটা আছে কেন।

সাধারণত এই রকমই মনে হয় তার—অন্তত কিছুদিন আগে পর্যন্তও, এই রকমই মনে হ'তো। কিন্তু সম্প্রতি মাঝে মাঝে এমন হচ্ছে যে এই উৎসাহ, এই তাকে অন্ধ বেগে টেনে-নিয়ে-চলা প্রেরণা, তাতে হঠাৎ যেন গুমোট ক'রে আসে, আজকের এই মেঘে ঢাকা বেলার মতোই থমথমে, আলো নেই, হাওয়া নেই, কিন্তু বাঁধন-ছেঁড়া বর্ষণেরও যেন আশা নেই। এই তার অভ্যাসের আরাম, মা-র হাতের যত্নে রাখা দৈনন্দিন জীবন, রীতিমতোই উল্লেখ্য এবং বহির্জগতে আলোচিত তার কৃতিত্ব—এ-সবের অন্তরালে, যেন পূর্ণস্বাস্থ্যে প্রচ্ছন্ন কোনো বীজাণু, সুস্থতার কান্তি নকল ক'রে লুকিয়ে-থাকা কোনো সূক্ষ্ম রোগ,

এই তার সুখী এবং আত্মস্থ জীবনের অন্তরালে মৌলিকে কামড়ে আছে, তাকে কুঁড়ে খাচ্ছে—কী তার নাম দেবে সে জানে না—অতৃপ্তি? অশান্তি? ব্যর্থতাবোধ? সেটা যা-ই হোক সেটা আছে, কাজ ক'রে যাচ্ছে ভিতরে-ভিতরে ; সেটা কখনো দেখা দেয় মিষ্টি-মিষ্টি কবিত্বময় মন-খারাপের চেহারা নিয়ে ; তখন সে এমন কোনো বিষাদ-ভরা ব্যাকুল কবিতা লিখে ফেলে যার ফলে কলকাতার কোনো সম্পাদকের কিংবা এলাহাবাদের কোনো সিকতাকণার চিঠি চ'লে আসে তার কাছে ;—আবার কখনো এ-সব অপরিচিতের অভিবাদনের ফলেই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে মনে, আহত আত্মাভিমানের জ্বালা, যা চায় তা অত্যন্ত বেশি সহজে পেয়েই সে ঠ'কে গেলো, এই সন্দেহ ছোবল মারে তার মনের মধ্যে—তখন সে অবশ হ'য়ে যায়, অক্ষম, যেমন আজকের এই ঘনায়মান মেঘলা বিকেলে—একখানা চিঠি খুলতেও তার হাত ওঠে না তখন, শুধু শোনে, মনে-মনে, কানে-কানে শোনে, কোনো-এক শব্দহীন অট্টহাসির উপহাস চুরমার ক'রে দিচ্ছে তার সাতাশ বছরের জীবনটাকে।

সাতাশ বছর! এক-এক সময় শুধু এই চিন্তাই পাথর হ'য়ে চেপে ব'সে তার বুকের উপর যে, বয়স তার সাতাশ হ'লো। মাত্র সাতাশ, ইতিমধ্যেই সাতাশ, কী দারুণ বার্ধক্যের মতো, এই সাতাশ! জীবনের পূর্ণকাল কি ইতিমধ্যেই কাটায়নি সে? সমাপ্তির প্রান্তে এসে কি পৌঁছয়নি? অভিজ্ঞতার দীর্ঘ পথ পার হ'য়ে কি আসেনি—মানুষের মহিমা, মানুষের ইন্দ্রিয়-বন্দী অসহায় তুচ্ছতা, সব কি উপলব্ধি করেনি নিজের মধ্যে, জানেনি আনন্দ, হৃদয়প্লাবী আহ্লাদ—জানেনি তৃষ্ণা, বুক-ফাটা তৃষ্ণায় জলের দিকে ছুটে-ছুটে বালুর মধ্যে মুখ থুবড়ে জ্ব'লে মরা, তাও কি সে জানেনি? আরো যত বছর সামনে প'ড়ে আছে, আরো যত দীর্ঘ দিন তাকে বাঁচতে হবে এখনো—কী তারা দিতে পারে, কী নতুন আনতে পারে তারা, যা-কিছু হবে সবই কি আগে হ'য়ে যায়নি, যা-কিছু নতুন সবই কি পুরোনোর পুনরাবৃত্তি নয়? যখন ষোলো ছিলো, সতেরো ছিলো, উথালপাথাল উনিশ-কুড়ি ছিলো, তখন এই পঁচিশ-পেরোনো বছরগুলির দিকে কত আশাব দৃষ্টিতে সে তাকিয়েছে, কত উজ্জ্বল রঙে এঁকেছে তাদের—পরিণত, প্রস্তুত, যে-কোনো দিকের যে-কোনো হাওয়ায় ছিন্নভিন্ন নয় আর, কোনো-এক অচঞ্চল-আলো-জ্বলা রুদ্ধ ঘরে নিবিষ্ট —আরম্ভের জন্য, এতদিনের আরম্ভের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু কী হ'লো? কয়েকখানা বই লিখেছে সে, সে-সব বই ভালো বলছে লোকে ; সে যা-কিছু লেখে তা-ই ছাপা হচ্ছে ; নিন্দার দ্বারা, নিয়মিত, ক্রুদ্ধ, সুপরিচালিত নিন্দার দ্বারা তাকে সম্মান করছে কেউ-কেউ ;—হঠাৎ তার কোনো-একটা লেখা, যা সে লিখেছিলো তার বিগত যৌবনে কখনো শুধু মন-খারাপের ভার নামাতে, কিংবা হঠাৎ খেলাচ্ছলে শুধুমাত্র ইচ্ছে করেছে ব'লেই—তা-ই নিয়ে কী দুশ্চিন্তা সেই সব প্রৌঢ়বয়স্ক সুপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞজনের, মাসিকপত্রের গল্প পড়ার চাইতে আরো কিছু ভদ্রগোছের কাজেই যাঁদের ব্যস্ত থাকা উচিত। এই সব হয়েছে তার এরই মধ্যে : এতদিনেও কিছুই তার হয়নি।

'দেখিস, কোনোটা হারিয়ে না যায়।' মৌলির মা চিঠিগুলোর উপর বই চাপা দিলেন।

যেন ভালো দেখাবে ব'লেই, কিংবা মা-র কাছে মুখরক্ষার জন্য, মৌলি হাত বাড়িয়ে বিদ্যুৎ সেনের চিঠিটা তুলে নিলো, খাম খুলে প্রথম যেখানে চোখ পড়লো সেখানেই শুরু কবলো পড়তে।...'মুশকিলে পড়েছি। উপন্যাসটা আরম্ভ করেছিলুম শীতকালে জসিডি থেকে ফিরে। পৌষ মাসের সাঁওতাল পরগণায় গল্পটা সাজিয়েছিলুম। মাঝে ক-মাস ফেলে রাখার পর এখন আবার লিখতে গিয়ে দেখি—কিছুতেই তো সুর মিলছে না। ঘোর বর্ষা এখন—রোজই কিছু বৃষ্টি হচ্ছে—আমাদের গলি সেদিন জল দাঁড়িয়ে খাল হ'য়ে গেলো। এর মধ্যে মাঠজোড়া কুয়াশা, ঘাসের পথে শিশির, আর রোদের দুপুরে কমলালেবু আর ফুলবাগানে প্রজাপতির ঝাঁক—এ-সব যেন খুঁজেই পাচ্ছি না মনের মধ্যে। তাই ভাবছি...' মৌলি আর পড়লো না, খামে ভ'রে পকেটে রাখলো ; পরে ভালো ক'রে পড়বে। আ—লেখা, লেখা! কী ক'রে লেখে মানুষে, জন্ম দেয়, সৃষ্টি করে! স্রষ্টা, ধাতা, বিধাতার প্রতিদ্বন্দ্বী, ঐশ্বরিক আদিশক্তির অপহারক! কী ক'রে পারে? শিল্পীরা তীব্র ক'রে বাঁচেন, চরম ক'রে বাঁচেন—এ-কথাই মৌলি ভেবেছে এতদিন—বাঁচার পেয়ালা পূর্ণ হ'য়ে যা উপচে পড়ে সে-ই তাঁদের সৃষ্টি, শুধু বেঁচে থেকে বাঁচার ধার মেটে না তাঁদের—হাজার মানুষের সমান জীবন্ত কোনো শেক্সপিয়র, বিশাল কোনো

বীণার মতো দুরন্ত কোনো রবীন্দ্রনাথের। অর্থাৎ—মৌলি ভেবেছে এতদিন—অন্যান্য মানুষের চাইতে শিল্পীর প্রাণশক্তি, কামশক্তি অনেক বেশি প্রবল ; বাঁচার কোনো-পরদা-চড়ানো বৃহত্তর রূপেরই নাম শিল্পরচনা। কিন্তু তা-ই কি? শীতঋতুর কাব্যটি যে শুরু হ'য়েই ঠেকে গেলো, সে কি এই জন্যই নয় যে বিদ্যুৎ সেন যথেষ্ট পরিমাণে শিল্পী এখনো হ'তে পারেনি? ঋতুর চপলতার ঊর্ধ্বে, আকাশ-বাতাসের মনোহরণ ছেলেখেলার ঊর্ধ্বে, স্থান, কাল, শরীর, শরীরের মধ্যে সীমিত এই জীবনেরও ঊর্ধ্বে কি উঠতে হবে না শিল্পীকে? বেঁচে থাকা, আর শিল্পী হওয়া, এ দুই কি একই সঙ্গে সম্ভব?

আর তুমি, মৌলিনাথ? মৌলি আবার বাইরে তাকালো, মৃদু একটু নিশ্বাস পড়লো তার। একটু আগে সব স্তব্ধ ছিলো, আর এখনই—জটিল কোনো এঞ্জিনের রওনা হবার স্পন্দনের মতো—বটের পাতা একটু-একটু কাঁপছে।—না, না, তার কিছু হবে না : সে ভালোবাসে, সে লোভী, সে ভোগী। আকাশে মেঘ করলে তার মন-কেমন করে, আকাশে মেঘ জমলে সে কাজ ফেলে তাকিয়ে থাকে।

চোখ ফিরিয়ে এনে সে তার মা-কে একটা কথা বললো।

'শুনেছো, মা, বটগাছটা নাকি কাটিয়ে ফেলা হচ্ছে?'

মা ইতিমধ্যে তার টেবিল গোছাতে ব্যস্ত হয়েছিলেন, কাজ না-থামিয়ে বললেন, 'শুনছি তো!'

'পাড়ার কর্তারা লেখালেখি করছেন ম্যুনিসিপালিটিতে। বড্ড পাখি বসে, নোংরা করে।'

'সেদিন রাসবিহারীবাবুর বাড়ির ছাতে একটা শকুন—'

'শুনেছি। ভারি আস্পর্ধা শকুনটার—কমিশনারের পার্সন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট রাসবিহারী বাঁড়ুয্যে, তাঁর এই সেদিনমাত্র-শেষ-হওয়া মস্ত বড়ো বাড়ি—সেই বাড়ির ছাতে গিয়ে বসা! শাস্তি হওয়া উচিত।'

'শকুন বসলে অকল্যাণ হয় গৃহস্থের।'

'তা হ'লেও কিছু-একটা হয় তো!' বাঁকা হাসলো মৌলি, যেন আরো কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলো।

মা-র চোখ—একটু ভৎর্সনা, একটু আশঙ্কা-মেশানো দৃষ্টি—চকিতে একবার ছুঁয়ে গেলো তাকে। মৌলি ফিরে তাকালো যেন লজ্জা-পাওয়া ছেলেমানুষি সরল চোখে, কিন্তু বাঁকা হাসির রেখাটুকু তার ঠোঁট থেকে মুছে গেলো না। একটু পরে বললো, 'তোমার মনে আছে, মা, সেই রাত ক'রে বাচ্চা শকুনের কান্না?'

'মনে নেই! নয়নেন্দুর মা-র নাকি ঘুম হ'তো না প্রথম-প্রথম!'

'কিন্তু ওরা তো আর নেই আজকাল। সেই ডাক কতদিন আর শুনি না। আমি ভাবি, ঐ শকুনটা এলো কোত্থেকে। কিংবা ফিরে এলো কেন। এর কি কোনো অর্থ নেই?'

'যত অদ্ভুত ভাবনা তোর! আর এত বই টেবিলে কেন জড়ো করিস বল তো?'

'ঐ বটগাছেই বাসা বেঁধেছে আবার? ঠিক জানো?'

'তা-ই তো শুনছি। এই প্রুফগুলো পুরোনো নাকি দ্যাখ। ফেলে দেবো?'

গুমরে নিচু গলায় আকাশ ভ'রে ডেকে উঠলো মেঘ, যেন আহত কোনো বিশাল বাঘের দূর-থেকে-শোনা গর্জন। মৌলির মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, যেন হঠাৎ খুঁজে পেয়েছে কোনো আনন্দ, কোনো সুন্দর সমাধান। আস্তে আস্তে বললো, 'খুব ভালো হয় মা, খুব ভালো হয়, যদি আজই, এখনই, হঠাৎ বাজ প'ড়ে বটগাছটা ম'রে যায়! এক মুহূর্তে ঝলসে পুড়ে ম'রে যাক গাছটা, তারপর আমি, আমিও—' হঠাৎ থেমে গেলো মৌলি, যেন ভিতর থেকে বাধা পেলো কথায়, তার মুখের আলো মিলিয়ে গিয়ে কেমন করুণ দেখালো, কেমন কান্না-পাওয়া আধুটে গলায় কথা শেষ করলো সে—'এখানে আর এক মুহূর্ত আমার থাকতে ইচ্ছে করে না।'

'তোর লেখার খাতা বাঁ দিকে থাকলো, আর চিঠির প্যাড সব ডান দিকে। খামগুলো দেরাজে রাখলাম।' টেবিল গোছানো শেষ ক'রে মা একটু কাছে এসে দাঁড়ালেন, প্রায় একই সুরে বললেন, 'তা আমি তো কবে থেকেই বলছি কলকাতায় চল। তুই চেষ্টা করলে ওখানে কি আর সুবিধে না হবে।'

'সুবিধে?' মৌলির ঠোঁটের কোণ আবার একটু বেঁকে গেলো। 'হ্যাঁ, সুবিধে হবে। চাকরি হবে।'

'কিন্তু প্রোফেসরি তো ভালোই। কত সম্মান, কত ছুটি।'

'ভালো! ভালো!' কথার তালে-তালে মৌলি টোকা দিলো চেয়ারের হাতলে, আর কিছু বললো না। তার বাঁ-দিকে সিঁথি-করা ঘন-চুলে-ভরা মাথাটি নিচু হ'লো, যেন নুয়ে পড়লো কোনো লুকিয়ে-রাখা ভুলতে-না-পারা লজ্জায়। না, কখনো ভুলতে পারে না সে, ঠ'কে গেছে—নাকি ঠকিয়েছে?—কথা দিয়ে কথা রাখেনি, প্রতারক সে, জোচ্চোর! যা কখনো ভাবেনি তা-ই হ'লো : সেই মাস্টারি করছে। প্রবঞ্চনা তার নিজের সঙ্গে, প্রবঞ্চনা তার অন্যদের সঙ্গে ; ছাত্ররা যা চায় তা পায় না তার কাছে ; আর ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষ, তারই সুবান্ধব অধ্যাপকেরা, এই কয়েক বছর আগেও তার গুণপনায় যাঁরা মুগ্ধ ছিলেন, তাঁরাও—যদি বাইরে তাঁরা উৎসাহী এবং সহৃদয়, তবুও মৌলি তো বোঝে, এও বোঝে এতে তাঁদের অন্যায় কিছু নেই—তাঁরাও আজকাল আড়চোখে দেখছেন তাকে, মনে-মনে নিজেদের মধ্যে বলছেন যে মৌলিনাথের কাছে এর বেশি কি প্রত্যাশা আমাদের ছিলো না? সে ছিলো অদ্বিতীয় ছাত্র, সর্বত্র অবাধ যার অধিকার হয়েছে কনিষ্ঠতম শিক্ষক, সহনীয়, লক্ষ্যণীয়, স্নেহভাজন—মাত্র একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট লেকচারার! এই পতন কেমন ক'রে সে সহ্য করছে!

'কেন, তোর ভালো লাগে না?'

মা-র এই কথায় মৌলি মুখ তুললো। 'এই মাস্টারি?' ব'লে নিচু গলায় হাসলো একটু, আরাম ক'রে হেলান দিলো চেয়ারে। 'ও-সব ছেড়ে দাও মা ; আমার কিছু হ'লো না এটা জেনে নাও।'

'কিছু হ'লো না বুঝি?' একটি মোলায়েম হাসি ছড়িয়ে পড়লো মা-র মুখে, মোড়া টেনে মুখোমুখি তিনি বসলেন, যেন বিষয়টা বুঝিয়ে না দিয়ে ছাড়বেন না। 'তাই বুঝি পাশ করার সঙ্গে-সঙ্গেই ডেকে নিয়ে চাকরি দিয়েছে? আর তাই বুঝি এটুকু বয়সেই সারা দেশে তোর নাম?'

এটুকু বয়স! সারা দেশে নাম! কত বেশি আমার বয়স, আর কত তুচ্ছ এই নাম তা তুমি কখনো জানবে না, মা! মৌলির মনে পড়লো সেই সব স্বপ্নে-চালানো দিনের কথা, যখন সত্যি তার বয়স ছিলো অল্প, সত্যি সে ছেলেমানুষ ছিলো। সুখ ছিলো তখন, সেই নিজেকে দিয়েই ঘেরাও-করা গণ্ডির মধ্যে সুখ ছিলো—কী দুর্ভাগ্য মানুষের যে কূপমণ্ডূকের আত্মপ্রসাদ ছাড়া সুখ নেই তার জীবনে! সুখ ছিলো, যখন দশ বছর বয়সে অ্যালাস্টর তর্জমা করেছিলো, যখন ম্যাট্রিকুলেশনে এমন খাতা লিখেছিলো যে পাদ্রি পরীক্ষক ভেবে পাননি ছেলেটি জিনিয়স না বদ্ধ পাগল, যখন তার সতেরো বছর বয়সের কোনো-এক আলস্যময় দুপুর-কাটানো কবিতায় বাংলা কবিতার মোড় ফিরেছিলো, যখন সে ছিলো সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র, তার তুল্য আর-কেউ ছিলো না, যখন লোকেরা প্রায় ভেবেই পেতো না শেষ পর্যন্ত কোনখানে সে পৌঁছবে। সেই বদ্ধতায়, সেই অন্ধতায়—তাতেই শুধু সুখ ছিলো। আর এখন?.. নাম? খ্যাতি? কী তুচ্ছ, কী গ্লানিকর সেই খ্যাতি, যা অন্য পাঁচজনের সঙ্গে সমান ভাগ ক'রে নিতে হয় ; কী লজ্জার সেই প্রশংসা শোনা যাতে লোকে ভালোই বলে কিন্তু এ-কথা কেউ বলে না যে এমন আর হয় না ! এর উপরে ওঠা, তুলনায় উপরে ওঠা, অনন্য হওয়া! শুধু আপন মনে প্রত্যয় নয়, জগতের সামনে প্রমাণ করতে পারা যে কেউ তার সমকক্ষ নয়, সন্নিকটও নয়, সকল প্রতিযোগিতার সে পরপারে! গ্যেটে! রবীন্দ্রনাথ! কপট কৃষ্ণের অন্যায় সাহায্যে স্বভাবজয়ী অর্জুন!...না, না, সে নয়, সে তা নয় ; মহাপ্রস্থানের পথে বিশ্বজয়ী মুখ থুবড়ে সে পড়বে না, সে মরবে তার আপন মনের প্রত্যয়ের পাঁকে, তার ইচ্ছায়, তার শক্তিহীন, দুর্বার ইচ্ছায় কর্ণের মতো রথের চাকা ডুবে-ডুবে।...এই তো—এখনই—অতীতের কথা ভাবছে সে, যাত্রা শুরু হ'তে-না-হ'তেই পিছন ফিরে তাকাচ্ছে—বুড়ো হয়েছে, অকালেই বুড়ো হয়েছে।...তাহ'লে ইচ্ছাটাকেই ছেঁটে দিলে কেমন হয়? ভদ্রলোক হ'য়ে জীবন কাটাবার যে-প্রলোভন নিত্য উপস্থিত, তারই কাছে হার মানলে কেমন হয়?

'হাঁ, খুব হয়েছে আমার। আর ক-দিন পরেই পুরানা পল্টনের একজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক হ'য়ে বসতে পারবো।'

ছেলের দিকে চুপ ক'রে একটু তাকিয়ে থাকলেন মা। তারপর বললেন, 'তোর যা ভালো লাগে না তা তুই করিস কেন, মৌলি। চাকরি ছেড়ে দে, চল কলকাতায়।'

'চাকরি ছাড়তে পারি, তোমাকে ছাড়বো কেমন ক'রে? তুমি না-থাকলে এতদিনে আমি এ-দেশেই থাকতাম না।'

ছোট্ট নিশ্বাস পড়লো মা-র। এই বিধবা ভদ্রমহিলা, একটির বেশি সন্তান যিনি ধারণ করেননি, এই ছেলে যাঁর জীবনের লক্ষ্য, জীবনের অর্থ, সর্বস্ব, তার সব ইচ্ছা মেটাতে গিয়ে নিজের সব সম্বল যিনি খুইয়েছেন, কত রাত্রে বিছানায় শুয়ে মনে মনে শুধু-এ-ই বলেছেন যে মৌলি যেন বেঁচে থাকে, আর কখনো-কখনো ভয়ে যাঁর বুক শুকিয়ে গেছে পাছে মৌলির এই অসামান্যতাই তাঁর অদৃষ্টে সহ্য না হয়—ছেলের এই কথায় তাঁর নিশ্বাস পড়লো। কিন্তু তার দোষ কী? কোন্ কথায় ব্যথা লাগে সে তো জানে না, জানলে কি বলতো? না, মৌলির কিছু দোষ নয়; দোষ তাঁরই, মা-র—এ তো সত্যি কথাই যে মৌলি তাঁকে ছাড়িয়ে বেড়ে উঠেছে এতদূর পর্যন্ত যেখানে তাঁর অস্তিত্বটাই এখন—এখন অবান্তর, শুধু অবান্তর নয়, অন্তরায়—হ্যাঁ, অন্তরায় বইকি, তার আরো বেড়ে ওঠার প্রতিবন্ধক। এই অদ্ভুত, এই-যে আশ্চর্য মানুষটিকে তিনি পৃথিবীতে এনেছিলেন, আজ এর কতটুকু বোঝেন তিনি, কতটুকু জানেন এর কথা? তার এ-সব ভাবভঙ্গি, এই এক-এক সময় মনগুমরে ব'সে থাকা, যখন সে কথা বলে না; কিংবা শুধু দুঃখ পাওয়া—কখনো বা দুঃখ-দেয়া—বাঁকা সুরে কথা বলে—এ-সব অবশ্য খুবই ভালো চেনা আছে তাঁর, এর চেহারাটা তিনি ভালোই চেনেন, বাইরে থেকে অনেক দেখেছেন, কিন্তু সত্যি এব অর্থ তো কিছুই বোঝেন না, কিছুই জানেন না কী ভাবছে সে আপন মনে, কোনো কাজেই লাগতে পারেন না তার, তার হতাশ হ'য়ে ব'সে থাকার দিকে কোনো রকমেই হাত বাড়াতে পাবেন না। এখন তাব প্রয়োজন—অনেক দিন ধ'রেই তিনি ভাবছেন কথাটা, ছেলের সঙ্গে কথা বলার সুযোগও খুঁজছেন—মা-র প্রয়োজন তার নেই আর—এখন অন্য কাউকে চাই যে সত্যি তার জীবনের অংশ নিতে পারবে, সঙ্গিনী, সহানুভাবিনী, স্ত্রী। যোগ্য মেয়ে? কত দয়া ভগবানের যে ঠিক যোগ্য মেয়েটি তৈরি হয়েছে তারই জন্য, দিনে-দিনে তৈরি ক'রে তুলেছে নিজেকে, উৎসর্গ করেছে এখনই তাকে নিজেব জীবন! কেন ওরা দেরী করছে আব? মিলুক ওরা, দু-জনে মিলে বিলেত চ'লে যাক, দু-জনের জোবে বড়ো হ'য়ে উঠুক—আমি, শুধুমাত্র মা, শুধুমাত্র শৈশবের অধিকারিণী, এর বেশি অন্য কোনো স্বর্গসুখ আমি চাই না।

'তা ভাবনা কী,' মনের কথার অর্ধেক শুধু প্রকাশ করলেন তিনি। 'আমি তোকে বিলেত পাঠাতে পারলাম না, কিন্তু তুই নিজেই যেতে পারবি একদিন। এখানকার ইউনিভার্সিটি থেকেই পাঠাবে তোকে।'

মৌলি জবাব দিলো না কথার। আ, এও কি কপালে আছে তার? কোনোদিন তাদেরও একজন কি হ'তে হবে তাকে, যারা ঋণের কৃপণ অন্নে প্রতিপালিত হ'য়ে, লন্ডন শহবে চোখ-কান বুজে দু-বছর কাটিয়ে, কোনো রকমে একটা ডিগ্রি কুড়িয়ে দেশে ফেরে—তারপর একশো মুদ্রা বেশি মূল্যের চাকরির চেষ্টায় মরীয়া হ'য়ে রক্ত তোলে মুখে? বিলেতের বুড়ি ছুঁয়ে এসে সাংসারিক উন্নতি! অন্তত এটুকু কোরো, ভগবান, সেখানে আমাকে নামিয়ো না। সে যদি যায়—সে যে অনেক দিনের , অনেক দূরের যাত্রা! তাকে যে সব দেখতে হবে—ইটালির রেনেসাঁস-নীলিমা, এল গ্রেকোর আলো-আঁধারি-স্বপ্ন-জড়ানো স্প্যানিশ রাত্রি, ঐতিহাসিক স্বপ্ন ভাবাতুর জর্মন নগর, ইস্পাত-নীল ধারালো পরিচ্ছন্ন উত্তরাপথ—স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, পুরাণভূমি আইসল্যাণ্ড—আর রাশিয়া, ধ্যানে এবং তুষারে ধবল টলস্টয়ের রাশিয়া—সব যে চাই তার, সব যে চায় তাকে, কোনোটাই ছেড়ে গেলে তার চলবে না।—কেন সে লক্ষপতি হ'লো না? কিন্তু তাহ'লেই বা কী হ'তো? এই ইওরোপ, এই তার বইয়ে-পড়া মনের পাওয়া ইওরোপ, একে ভ্রমণ ক'রে এর বেশি কি পাবে কখনো;—তাতে কি শুধু ভিড় দেখবে না, নেহাৎই শুধু মানুষের মুখ—হোটেল, বাজার, গির্জে, গ্যালারী, নয়তো শুধু দৃশ্য, জল-মাটি-আকাশ-মেশানো আপাতনতুন কিন্তু আসলে সেই একই চেনা রমণীয়তা—শুধু অবয়ব, শুধু অনুষ্ঠান;—একে এর বেশি পেতে হ'লে, প্রাণ দিয়ে পেতে হ'লে, সেখানেই কি জন্মাতে হয় না...আর নয়তো, নয়তো সেই মনের মধ্যেই যতটা তার পাওয়া যায়, চিন্তার মানচিত্রে যতটা তার ধরা যায়, নিজের বাড়িতে নিশ্চল ব'সে-বসে, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে, যখন—আর দেরি নেই, ঐ বুঝি উড়াল দিলো আষাঢ়, ঝাঁপ দিলো বৃষ্টি, সারা আকাশ বাংলা ভাষায় কথা ক'য়ে উঠলো।

২

বাইরের দিকে চোখ রেখেই মৌলি বললো, 'না, মা, এই বাংলাদেশই সবচেয়ে ভালো আমার। এমন বর্ষা তো আর কোথায় নেই।'

কিন্তু তার কথা শোনা গেলো না, শোনা গেলো তারই কথার যথাযোগ্য উত্তর, যার সামনে, যার বিশাল বাঁশির মতো নিঃস্বনে, তুচ্ছ হ'য়ে মিলিয়ে গেলো মৌলিনাথের বিক্ষোভে ভরা স্বগতোক্তি। মেঘের নিগড়ে বন্দী হ'য়ে যে ছিলো এতক্ষণ, সে হঠাৎ মুক্তি পেয়ে ছুটে এলো, বেরিয়ে এলো স্তব্ধতার বুক ফেটে হাওয়া—ঠাণ্ডা ; উদ্দাম—চকিত কাকের কর্কশ ডাক শাঁকের মতো বেজে উঠলো, বটগাছের জটিল দেহটি দুলে উঠলো যেন নম্বুদ্রির মতো নাচের ভঙ্গিতে—কিন্তু তার পরেই গাছটি আর দেখা গেলো না, ধুলোর ঝড়ে আঁধার হ'লো প্রান্তর, ধুলো-কুটো-কাঁকর-ওড়ানো দামাল হাওয়া খেপিয়ে দিলো এইমাত্র গোছানো টেবিলের কাগজপত্র।

মৌলির মা তাড়াতাড়ি উঠলেন জানলার শার্সি লাগাতে। অনেকগুলো জানলা ; একে-একে বন্ধ করতে-করতেও কিছু কাগজ উড়ে পড়লো মেঝেতে, ধুলো লাগলো জিনিসপত্রে, মৌলির চুলে। মৌলি নড়লো না, মা-কে সাহায্য করতেও উঠলো না ; আর মা যখন শেষ জানলাটির শার্সি লাগিয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছেন, ঠিক তখনই মুহূর্তের জন্য আলো হ'য়ে উঠলো প্রান্তর ; ভুতুড়ে, অদ্ভুত, গা-ছমছম-করা সান্ধ্য বিদ্যুতের নীল-সবুজ-সোনালি-শাদা পাগল আলোয় অস্থির বটগাছটা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেলো আবার, তারপর ভীষণ শব্দে বাজ পড়লো যেন আকাশটাকে চুরমার ক'রে ফাটিয়ে দিয়ে। আর মেঘের দূর গহ্বরে-গহ্বরে তার প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই রিমঝিম মধুর শব্দে বৃষ্টি যেই ঝাঁপিয়ে নামলো, অমনি দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে ঘরে এলো একটি মেয়ে, ঘন-নীল পরদাটাকে পিছনে রেখে দরজার ধারে দাঁড়ালো।

—'উঃ, খুব বেঁচে গেছি!'

কথাটা হালকা হ'য়ে খ'সে পড়লো মেয়েটির মুখ থেকে, যেমন ডাল থেকে ফুল ঝ'রে পড়ে, শার্সি-বন্ধ-করা ঘরে হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়লো তার সৌরভ, অনুরণন ; এই ঘরে, যেখানে এতক্ষণ ধ'রে সব ছিলো গম্ভীর, চিন্তায় এবং আষাঢ়ে ভারাতুর, সাতাশ বছরে বার্ধক্য-বোধে আচ্ছন্ন, আত্মচেতনার কুয়োর মধ্যে খুঁড়ে-খুঁড়ে তন্ন-তন্ন তল্লাশের শ্রমে প্রপীড়িত—সেখানে হঠাৎ যেন আলোর জগতের ডাক এলো এই কথায়—এই প্রায় অশরীরী কথায়—কেননা মেঘের ছায়ায় কালো-হ'য়ে-আসা ঘরের মধ্যে মেয়েটিকে ভালো দেখা যাচ্ছিলো না—এলো বাস্তবের, স্বাস্থ্যের ডাক, জীবনের, যৌবনের লজ্জাহীন চপল আহ্বান।

এই ডাকে প্রথম সাড়া দিলেন মা। 'গীতা!' স্পষ্ট শোনা গেলো আনন্দের কাঁপন তাঁর গলায়, যেন এই নামটুকু ধ'রে ডাকতেও তাঁর সুখ। দেয়ালে হাত রেখে আলো জ্বাললেন তিনি। বাইরে বৃষ্টি-ভরা সন্ধ্যার পটভূমিতে ঘরের মধ্যে ইলেকট্রিক আলো অত্যন্ত বেশি উজ্জ্বল দেখালো, কেমন কড়া, কাঁচা, নিজেকে-যেন-জাহির-করা হলদে ;—মৌলি হাত তুলে চোখ আড়াল করলো, এতক্ষণ নম্র ছায়ায় মিশে থাকার পর হঠাৎ এই আলোর ঔদ্ধত্য তার ভালো লাগলো না। তবু সে একবার না-তাকিয়েও পারলো না, দরজার ধারে দাঁড়িয়ে-থাকা অতিথির দিকে একটুখানি তাকিয়েও তাকে থাকতে হ'লো—ব'সে ব'সে দেখতে হ'লো মেয়েটিকে—আলোয় উদ্ভাসিত, যেন বিকশিত—ঘন নীল পরদাটি পিছনে থাকায় যার ধবধবে রং প্রায় অন্যায়রকম ফর্শা দেখাচ্ছে, যার চুলে, কপালে, যেন তুলি-দিয়ে আঁকা পরিষ্কার দুটি ভুরুর উপর একটু বিসদৃশ-রকম চওড়া কপালে মুক্তোর মতো চিকচিক করছে জলের ফোঁটা, আর যার বুকের কাছে শাড়ির আঁচলে কয়েকটি বৃষ্টিফোঁটা এঁকে দিয়েছে তাদের ক্ষণকালীন কালো-কালো প্রণয়স্বাক্ষর। মেয়েটি অনুভব করলো সেই দৃষ্টি—অনুভব করলো তার রক্তের ঈষদুষ্ণ চঞ্চলতায়, যা ছড়িয়ে পড়ে তার শরীরের মধ্যে গোপনে, যখন ইউনিভার্সিটির ক্লাশে, ব্রাউনিঙের সঙ্গে এজরা পাউণ্ড এবং আধুনিক কবিতার সম্বন্ধ বোঝাতে গিয়ে, কিংবা কবিতায়—সাহিত্যে—উপমাপ্রয়োগের অপরিহার্য

উপকারিতার বিষয়ে বলতে-বলতে, মৌলিনাথের চোখ হঠাৎ পড়ে তার মুখের উপর, আর তারপর —অন্যেরা যতক্ষণে অধ্যাপকের বক্তব্যের পিছনে ছুটেছে, কিংবা কেউ হয়তো নিঃস্পৃহভাবে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে—সে শুধু শোনে, মনে-মনে, ভয়ে-ভয়ে শোনে, তার হৃৎপিণ্ডের ঈষৎ-দ্রুত-হওয়া স্পন্দন। এই সব—হ্যাঁ, এতটাই তাব ভিতরে-ভিতরে ঘ'টে যায়—যদিও গীতা জানে—জেনে মনে-মনে কোথায় যেন শান্তিও পায়—যে মৌলিনাথের ঐ দৃষ্টির লক্ষ্য সে নয়, কোনো-এক দিকে তাকাতে হবে ব'লেই সে তাকিয়েছে তার দিকে ;—আর এখনো—যদিও মৌলিনাথেরই দরজায় সে দাঁড়িয়েছে—তবু সে জানে যে ঐ চোখ তাকে ঠিক দেখছে না, যে-কোনো একটা বস্তুকেই, হয়তো—কী লজ্জা!—চোখের পক্ষে প্রীতিকর কোনো বস্তুকেই শুধু দেখছে। তাই গীতা সেই দৃষ্টির কোনো জবাব দিলো না, ঘুরে দাঁড়ালো মৌলির মা-র মুখোমুখি, যিনি মাতৃত্বময় হাসিমুখে তাকেই দেখছিলেন, বিশেষ একটু মন দিয়েই দেখছিলেন যেন।

এগিয়ে এসে তার মাথায় তিনি হাত রাখলেন। 'ভিজিসনি তো?'

'না, মাসিমা, আমিও ঢুকছি আর বৃষ্টিও নামলো।' বাঁ হাতে কপালের জল মুছে ফেলে গীতা একটু হাসলো, তার পুষ্ট, পূর্ণ ঠোঁটের ফাঁকে সুন্দর শাদা দাঁতের সারি ঝিলিক দিলো ইলেকট্রিকের আলোয়। '.মেয়েদের হস্টেলে পার্টি ছিলো, সেখান থেকে বেরিয়ে ভাবলাম—'

'বেশ করেছিস। বোস।' বিধবা মহিলা আর কিছু বললেন না, কিন্তু চোখ দিয়ে যেন আরো কিছু বললেন, যেন প্রায় ব'লেই দিলেন যে একটু আগে তারই কথা ভাবছিলেন তিনি, যে তাঁর আজকালকার সব ভাবনার মধ্যে গীতার কথাই ফিরে-ফিরে আসে বার-বার।

গীতা কি বুঝলো সে-কথা? তার মাসিমার মনেব কথা সে কি বুঝেছে? এও কি বোঝেনি যে তার কথাও মাসিমার কাছে লুকোনো নেই, যে সে ধরা প'ড়ে গেছে সমস্ত রকম ছদ্মবেশের অতীত হ'য়ে? কিন্তু ধবা না-প'ড়ে পালাবে কোথায়? না-বুঝে কি উপায় আছে? কে না বুঝবে, কে না দেখতে পাবে তার ভিতরটাকে—নিজের বুকের শব্দ শুনতে-শুনতে গীতার এক-এক সময় মনে হয়—ক্লাশের অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী, ইউনিভার্সিটির অন্যান্য অধ্যাপকেরা, সারা রমনা, সারা শহর, যে-পথ দিয়ে সে হেঁটে যায় সেই পথের অন্য সব অচেনা মানুষ—কখনো তার এমনও মনে হয় যেন সকলেই তাকে বুঝে ফেলছে, দেখে ফেলছে—যেন সে স্বচ্ছ হ'য়ে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে রৌদ্রময় চৌরাস্তায়—আর এখানে তো মা! চোখ নামিয়ে নিক, দ্রুত পথ চলুক, আঁচল আরো ঘন ক'রে গায়ে জড়াক—না, সে-রকম চঞ্চল-হওয়া সময়ে কাবো কাছেই নিস্তার নেই তার—শুধু ঐ একজন ছাড়া, ঐ অন্ধ, অবোধ, করুণাময়, হৃদয়হীন মৌলিনাথ ছাড়া। কথাটা ভাবতে মুচড়ে ওঠে তার বুকের মধ্যে, আবার কোথাও যেন আশ্বাসও পায়।

প্রৌঢ়া মহিলার সামনে দাঁড়িয়ে গীতা অস্ফুট নিশ্বাস ফেললো। আমরা দু-জন ষড়যন্ত্রী, চোখে-চোখে চক্রান্তকারী আমরা। আমি তা হ'তে চাই না, কিন্তু না-হ'য়ে আমার উপায় নাই। আমি এখানে আসতে চাই না, এলে টিকতে পারি না—কিন্তু না-এসেও টিকতে পারি না। মাসিমা কি এতটাও জানেন? গীতা একটু চোখ সরিয়ে নিলো, যেন কোনো ছল ক'রে তার এই প্রশ্নেরই উত্তরের আশায় জিগেস করলো, 'কেমন আছেন, মাসিমা?'

'আমি? আমি আবার কেমন থাকবো? ভালো আছি।'

'আপনার হাঁপানি?'

'ও কিছু না।'

'ভালো একজন ডাক্তার দেখান না কেন, মাসিমা?'

'বলতে চাস যে-ডাক্তার দেখিয়েছি সে ভালো নয়?'

'হোমিওপ্যাথিতে আপনার মতো বিশ্বাস তো থাকে না সকলের। দাদা এবার ছুটিতে এসে বলছিলো—'

'ও, বেণু! মস্ত ডাক্তার হয়েছে সে!'

'এই রকমই হয় মাসিমা। যারা ছোটো ছিলো তারা বড়ো হয়—তা আপনারা মানুন আর না-ই

মানুন।'

'বাসরে! না-মেনে উপায় আছে! বিজ্ঞের মতো কত কথা আমাকে শুনিয়ে গেলো একদিন।'

'দাদা বলছিলো নতুন কী-একটা ইনজেকশন বেরিয়েছে—'

'সে-সব আমার জানতে বাকি নেই! তা আমি বলি, আমাদের নতুন ডাক্তারটিও পাশ ক'রে বেরোক, তখনই হবে সব।' ব'লে, একটু হেসে, ভদ্রমহিলা দরজার দিকে স'রে এলেন, কিন্তু গীতা তখনই আবার কথা পাড়লো, মাসিমার ঐ অনতি-আলোচ্য অসুস্থতার প্রসঙ্গটাকেই অবলম্বন ক'রে আরো একটু ধ'রে রাখলো তাঁকে—'আপনার হাঁপানির কথা আগে তো শুনিনি কখনো?'

'আমিও প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম রে। কিন্তু এই দ্যাখ না, আমার ছেলেবেলার সঙ্গীটি ঠিক সময়ে দেখা দিয়েছে আবার।'

'ঠিক সময়ে কেন?'

'ঝাঁটপাট দিয়ে রাস্তাটি তো পরিষ্কার ক'রে রাখতে হবে।'

'ওঃ, খুব বুড়োদের মতো কথা বলছেন আজকাল!' ঠাট্টার সুরে, কিন্তু বেদনা-ছোঁয়া নরম গলায় গীতা একটু হাসলো। 'তাহ'লে কি মিটফোর্ডের নরেন গাঙ্গুলিকেই নিয়ে আসবো একদিন?'

'বলিস কী গীতা, বেণুর প্রথম রোগী হাতছাড়া হ'তে দিবি তুই? অমন কথা মুখেও আনিসনে। ও তাহ'লে মনে করবে কী বল তো! এমনিই এবার ইনজেকশন দিতে না-পেবে মনের দুঃখে ছুটি থাকতেই চ'লে গেলো। তারপর—কেমন আছে? চিঠিপত্র পাস?'

'মা-কে লেখে মাঝে-মাঝে। খুব কম।'

'তা এটা কি আর মা-মাসিকে মনে পড়ার বয়স! তুই-ই বা ক-দিন আসিস বল তো?' ব'লেই, গীতার মুখের একটুখানি রং-বদল লক্ষ্য ক'রেই, তার জবাবের জন্য অপেক্ষা না-ক'রে—কিংবা তাকে জবাব দেবার কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে—ভদ্রমহিলা আবার বললেন, 'এ-বিষয়ে চিত্রা কিন্তু খুব ভালো।'

'দিদি?' হঠাৎ গীতা একটু লাল হ'লো, একটু নিচু গলায়, কেমন-যেন বিষণ্ণভাবে বললো, 'তার সঙ্গে কার তুলনা? এমন সপ্তাহ যায় না যে দিদির চিঠি না আসে।'

'প্রথম-প্রথম আমাকেও লিখতো খুব। কিন্তু আমি কি পারি চিঠি লেখায় ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে?'

বিষাদের ছায়া ঘন হ'লো গীতার মুখে, তার চোখেব কোণ দুটি, যেখানে নীল ছায়া জ'মে থাকে সব সময়, সেখানে যেন কালো ক'রে এলো মুহূর্তের জন্য। সে-সব চিঠি—গীতা দেখেছে, মাসিমা একদিন দেখিয়েছিলেন তাকে—সকলের সব চিঠি তোলা থাকে তাঁর হাতবাক্সে—সে-সব স্মৃতিভরা, হৃদয়-ঢালা, কখনো প্রায় কান্না-পাওয়া উচ্ছ্বাস—সে-সব কি এই প্রৌঢ়া মহিলারই উদ্দেশে লেখা, আসলে কি অন্য একজনকেই লেখা নয়? সে কি দেখেছে সে-সব? পড়েছে কখনো? আর সে—সেই অন্য একজন—সে নিজেও কোনো চিঠিপত্র কি পায়নি কোনোদিন, চিঠি লেখায় হারিয়ে দেয়নি সেই দিদিকে, যে কাশ্মীর থেকে বারো পৃষ্ঠা বর্ণনা লিখে পাঠিয়েছিলো?

'জানেন, মাসিমা,' হঠাৎ একটু উৎসাহিত গলায় গীতা বললো, 'দিদি এবার কাশ্মির বেড়াতে গিয়েছিলো, গুলমার্গ থেকে আঠারো পৃষ্ঠা চিঠি লিখেছিলো আমাকে!'

'বারো'টা 'আঠারো' হ'য়ে গেলো তার মুখে—নিজের অজান্তে নয়—তথ্যের এই অপলাপটুকু তার বিবেকে সহ্য হ'লো সহজেই, কথাব শেষে বিস্ময়-চিহ্নটিও স্পষ্ট আওয়াজ দিলো গলায়। কিন্তু মাসিমার হাসিমুখে স্নেহপ্রসূত প্রশংসার প্রশ্রয় ছাড়া কিছুই ফুটলো না।

'তাই তো বলি আমি, যে পাবে সে সবই পারে। সংসার চালানো, ছেলেপুলে মানুষ কবা, তার উপর আবার মেয়েদের কলেজে প্রোফেসরিও করছিলো না?'

'শুধু কি তা-ই? সেবারে দিল্লিতে দিদির বাড়িতে এক মাস থেকে এলুম তো—দিদি একেবারে দশভুজা! মহেন্দ্রবাবুর পরীক্ষার খাতা দেখে দেয় দিদি, ক্লাশে ছাত্রদের তিনি যে-নোট দেন তাও তৈরি ক'রে দেয় মাঝে-মাঝে—এদিকে রোজ রাত্রে মহেন্দ্রবাবু একটা সুপ খান, সেটা দিদি নিজের হাতে না-রাঁধলে নাকি চলে না!' যেন বলতে বেশ লাগছে, বলতে পেরে তৃপ্ত হচ্ছে নিজের মনে, যেন মনের

মধ্যে কোথায় কোন অন্যায় সুখের স্বাদ নিচ্ছে, এমনি ক'রে কথাগুলি বললো গীতা, তারপর পুষ্ট ঠোঁটে সুন্দর কিন্তু কুটিল একটু হেসে বললো, একেবারে লক্ষ্মী মেয়ে, কি বলেন?'

প্রৌঢ়া মহিলা সকৌতুকে এই বর্ণনা শুনছিলেন, গীতা থামামাত্র জবাব দিলেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, অত জাঁক করতে হবে না দিদিকে নিয়ে। আমাদের এখানেও লক্ষ্মী মেয়ে আছেন একজন—সরস্বতীও বলতে পারিস। আপাতত একটু বসুন তিনি—আমি দেখে আসি রাখু ওদিকে কী করছে,' ব'লেই নীল পরদায় ঠেলা দিয়ে তিনি চ'লে গেলেন—গীতাকে আর কথা বলার, বাধা দেবার সময় দিলেন না।

মুহূর্তের জন্য গীতা দাঁড়িয়ে থাকলো সেখানেই, কাঁপতে-থাকা পরদাটার উপর চোখ রেখে। মুহূর্তের জন্য-তাকে দেখালো যেন সেও চ'লে যাবে ঘর থেকে, মাসিমার পিছু-পিছু গিয়ে হয়তো বসবে জলপাইয়ের আচার চাখতে, কিংবা হয়তো রান্নাঘরে তাঁর পাশে ব'সে হাত পাকাবে নিমকি ভাজায়। কিন্তু না—আর হয় না। যে-মুহূর্তে মাসিমা চ'লে গেলেন, যে-মুহূর্তে তার আঁকড়ে-থাকা ক্ষীণ ছুতোটুকু ছিঁড়ে গেলো, সে-মুহূর্তে আর-কিছুই গীতার চেতনায় থাকলো না, ওপাশের ঐ জানলার ধারে ইজিচেয়ারে ব'সে-থাকা মানুষটির অস্তিত্বই আবার তার সমস্ত মন জুড়ে বসলো। আর, মাসিমার সঙ্গে তার এই কথাবার্তা, তার এই নিজেকে লুকোতে সচেষ্ট কিন্তু অকৃতকার্য কথাবার্তা শেষ হওয়ামাত্র ঘরের আবহাওয়াও বদলে গেলো একেবারে ; কাচের শার্সিতে প্রতিহত হ'য়ে বাইরের অঝোর বৃষ্টি কানে লাগলো—মনে লাগলো—অতি মৃদু স্পর্শকোমল বিরহব্যাকুল কোনো অফুরন্ত দীর্ঘশ্বাসের মতো। মিথ্যা, মিথ্যা সব—বৃষ্টির শব্দ যেন এই কথা ব'লে যাচ্ছে—যা নিয়ে তোমরা কথা বলো, যা নিয়ে তোমরা কাজ করো, যা-কিছু নিয়ে দিনের পর দিন তোমরা কাটিয়ে দাও—সব, সব মিথ্যা।

গীতা ফিরে দাঁড়ালো, আস্তে-আস্তে মেঝে পার হ'য়ে মৌলির সামনে এসে বসলো সেই মোড়াটিতে, যেটাতে একটু আগে তার মা বসেছিলেন। খুব চেনা, একই পবিবারভুক্ত অন্তরঙ্গ নয় অথচ খুব অভ্যস্ত এবং আপন কারো কাছে—যেখানে কথা বলার বিষয়ের কোনো অভাব হয় না অথচ কথা বলার বাধ্যতাও থাকে না কোনো, সেখানে মানুষ যেমন ক'রে আসে এবং বসে, গীতার বসবার ধরনে, দু-হাতে হাঁটু জড়িয়ে মৌলির দিকে ঠিক মুখোমুখি না-তাকাবার ভঙ্গিতে, সেই স্বাচ্ছন্দই বোঝা গেলো—অন্তত, সে বুঝিয়ে দিলো তা-ই, তার অতি গভীর অচিকিৎস্য অস্বস্তি একটুও ফুটতে দিলো না বাইরে। কোনটা খাঁটি আর কোনটা মেকি, কোনটা স্বতঃস্ফূর্ত আর কোনটা ভান, তা কি কখনোই কেউ নিশ্চিত ক'রে বলতে পারে—মেয়েদের বেলায়? মেয়েরা—সেই আশ্চর্য জীব, আত্মস্থ, চতুর, সংযত, সাবলীল, যে-কোনো অবস্থায় অবিদ্রোহী, যে-কোনো পরিবেশে নমনীয়, যারা বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধে না-গিয়েই তাকে হারিয়ে দেয় শেষ পর্যন্ত, যারা তাদের ইচ্ছাটাকেই দৈবাৎ যেন ঘটিয়ে দেয় এবং দৈবাৎ যেটা ঘ'টে যায় সেটাকেই মিলিয়ে নেয় ইচ্ছার সঙ্গে, অর্থাৎ যারা অসম্ভবের পাথরে মাথা ফাটিয়ে মরে না কখনো, অতএব স্বাভাবিকের আশ্রয় থেকেও কিছুতেই চ্যুত হয় না—সেই কপট, সহজ, সহজেই চক্রান্তকারী, জীবনযোগ্য, জীবনশিল্পী মেয়েদের বেলায় কেউ কি কখনো বলতে পারে কোনটা স্বতঃস্ফূর্ত আর কোনটা ভান? না কি এটা শুধু জীবনশিল্পেরই কথা নয়, শিল্পকলার, সৃষ্টিকলারও কথা—না কি স্বতঃস্ফূর্ত ব'লে সত্যি কিছু নেই, কিংবা স্বতঃস্ফূর্ত সুন্দর হয় না কখনো—কেননা শুদ্ধতায় সৌন্দর্য নেই? যা সুন্দর, রূপে, শব্দে, ভাষায় কিংবা চিন্তায় সুন্দর—ছবি, গান, কবিতা—তা-ই কি কোনো-এক অর্থে বানানো নয়, পরিকল্পিত, সংঘটিত—কোনো-এক স্রষ্টার গঠনশক্তিরই কি প্রকাশ নয় সে, বিক্ষিপ্ত বিশৃঙ্খল আণবিক রাশিকে সংঘবদ্ধ ক'রে তোলার শক্তির—এবং সংঘ মানেই কি অস্বাভাবিকতা নয়, কৃত্রিমতা নয়? হয়তো তা-ই—যা প্রত্যেক কবি মনে-মনে জানেন যদিও হাবেভাবে অনেক সময় অন্যরকম দেখান—যাকে মনে হয় অপ্রতিরোধ্য প্রেরণার ফল, সৃষ্টির তেজোস্ফূর্তির স্বতঃপ্রভ বিকিরণ—তাও চেষ্টিত, আদিষ্ট, অভিনীত, নিজেকে কোনো-এক অভিনয়ের মধ্যে অবিকল মিশিয়ে দিতে যিনি পারেন, তাঁকেই না শিল্পী বলি আমরা! কে এমন শিল্পী আছেন যিনি নারীর ছলনা শেখেননি, যিনি স্বভাবতই অংশত নারী নন—কোথায় সেই ভগবান যাঁকে অর্ধনারীশ্বর হ'তে হ'লো না?

গীতা চুপ ক'রে ব'সে থাকলো একটুক্ষণ ; বাইরের উতল সন্ধ্যার শব্দ শুনলো। তারপর বললো, 'খুব বৃষ্টি হচ্ছে।'

মন্তব্যটা বাহুল্য সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্য জনের মৌনভঙ্গের পক্ষে যথেষ্ট হ'লো এটি। মৌলি বললো, 'এ-রকম বৃষ্টি হ'লেই কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে আমার।'

'আমি এসে বাধা দিলাম বোধহয়?'

'না, গীতা, তুমি ছাড়াও বাধা আছে। ইচ্ছে! এই ইচ্ছে জিনিসটা কী? শুধু আমাদের দুঃখের মূল।'

'ওটা ধর্মযাজকের কথা হ'লো ; তোমার মুখে মানায় না।'

'কিন্তু ভেবে দ্যাখো—যেখানে ইচ্ছে থাকে, কিন্তু ইচ্ছার অনুপাতে শক্তি থাকে না?'

'ইচ্ছে করতে পারাটাকেই একটা শক্তি বলবে না তুমি?'

'সেটা কী-রকম শক্তি? সে বলে, আমাকে প্রকাশ করো। সেখানে তার যোগ্য হ'তে পারে ক-জন?'

'অনেকেই পারে না। কেউ-কেউ পারে।'

'যারা পারে বলছো তাদের মুখেও কী-কথা শুনে? "যত সাধ ছিলো সাধ্য ছিলো না"? এই আক্ষেপ থামলো না কখনো। পৃথিবীর এই ইচ্ছুক মানুষগুলি নিজের তাপে জ্ব'লে গেলো চিরকাল।'

'জ্বলতেই হবে, নয়তো আলো হবে কেমন ক'রে। শক্তি নেই—এই আক্ষেপ ছাড়া শক্তি হবে কেমন ক'রে?'

'মানি তোমার কথা। ইচ্ছার অনুপাতে 'শক্তি থাকে না ব'লেই শক্তির সীমা বেড়ে চলে মানুষের। কিন্তু তারপর? ইচ্ছা যখন আরো দূরের দিগন্তে স'রে যায়?'

'সেই দিগন্তের পিছনে ছুটেই তো বাঁচে মানুষ। আর যা-ই করো, ইচ্ছাটাকে দোষ দিয়ো না তুমি। আমি বলি—'

'কী বলো তুমি, শুনি?'

গীতা ন'ড়ে বসলো মোড়ায়। একটু বাঁকা হেসে, যেন না-বলাটা আরো বেশি লজ্জার হবে ব'লেই লজ্জা-কাটানো ঠাট্টার সুরে বললো, 'মনে করো যা চাই তা আমি পাবো না। মনে করো তা জেনেই নিয়েছি। তাই ব'লে কি চাওয়াটাকেই বাদ দিতে বলবে তুমি? না! আমি বলি, তবু ঐ ইচ্ছেটুকু থাক। তাতেই বুঝবো যে বেঁচে আছি।'

মৌলি ভরা চোখে গীতার দিকে তাকালো। গীতা চোখ নামিয়ে নিলো না, ফিরিয়ে দিলো সেই দৃষ্টি, উজ্জ্বল কালো ভুরু দুটি একটু কুঁচকে, যেন স্পর্ধিত চোখে, ভিতরে-ভিতরে যে দুর্বল তার চেষ্টাকৃত স্পর্ধিত চোখে মৌলির দিকে ফিরে তাকালো। মৌলি বললো, 'সত্যি! সত্যি কথা বলেছো! তোমার কথা শুনে আমি অবাক হ'য়ে যাচ্ছি, গীতা!'

'অবাক কেন?'

'এই আমাদের সেদিনের গীতা—সে আজ এত কথাও বলতে শিখেছে!'

'তুমি আমাকে ছোটো দেখেছো, সে তো আমার অপরাধ নয়।'

'বোধ হচ্ছে সেটা আমারই অপরাধ?' মৌলি হাসলো।

—ঠিক কথা, তোমারই অপরাধ। তুমি আমাকে ছোটো দেখেছো, এমন একটা সময় থেকে আমাকে দেখছো যখন আমি প্রায় শিশুদের দলে, আর তুমি—অকালপক্ক!—বয়স ছাড়িয়েও যুবক হ'যে উঠেছো. তোমার এই অপরাধ কি আমিই ক্ষমা করতে পারবো কোনোদিন, না কি তুমিই তার প্রায়শ্চিত্ত করতে পারবে? সেই বয়সে, সেই সবচেয়ে কাঁচা এবং আগ্রহে ভরা বয়স থেকে তোমাকে যদি না-দেখতাম—তুমি, এমন আশ্চর্য সজীব, আর এমন উদাসীন?—তাহ'লে তোমার প্রতি এই অন্যায় ভক্তির নিগড়ে কি আমি এমন করে বন্দী হতাম আজ? তোমার ঐ চুল দুলিয়ে হেসে ওঠা দেখবো ব'লে কতবার কত ছুতোয় ঘুরে বেড়িয়েছে একটি ছোটো মেয়ে—তুমি কি তা জানো? তোমার আবোলতাবোল ঝোড়ো গলার কথা শুনতে, কত সময় দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থেকেছে ছোটো একটি মেয়ে—তুমি কি তা জানো?—কিন্তু এমনই বা ছোটো কী? তবু—ঐ ছোটো থাকার বদনাম তার ছিলো ব'লেই তুমি

তাকে এমন করলে—করতে পারলে—যে সে আজ তোমারই মতো চলে, বলে, ভাবতে চায়, তোমার মুদ্রাদোষ পর্যন্ত নকল করে, আর তোমার কাছে শেখা কথা আবার তোমারই কাছে আওড়ায় যখন, তখন তোমার প্রশংসা শোনার লজ্জাও তাকে সইতে হয়!

এই কথাগুলো গীতা বললো মনে-মনে—যেমন আগে অনেকবার বলেছে—তারপর মৌলির কথার জবাব দিলো, 'কিন্তু এতে অবাক হবার কী আছে তোমার? এ-সব তো আমার কথা নয়, তোমারই কথা।'

'কথার কোনো কপিরাইট আমি মানি না। যে যেটা নিজের ক'রে নিতে পারে সেটাই তার নিজের। সেই নিতে পারার শক্তি তোমার আছে গীতা।'

'মনে হচ্ছে সার্টিফিকেট লিখে দিচ্ছো ছাত্রীকে?'

'যথোচিত ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। মাস্টারি করলে এই রকমই সব অধঃপতন হয়।'

'আমি বলতে চেয়েছিলাম যে সার্টিফিকেটের যোগ্য আমি নই। সেদিন ক্লাসে তুমি মেটাফিজিকাল কবিদের বিষয়ে যা বললে, তা বোঝার মতো বুদ্ধিও আমার জুটলো না।'

হঠাৎ একটু লাল হ'লো মৌলি। যে-কর্ম সে নিয়েছে সে-কর্ম তাকে সাজে না, এ-কথা সে কি কখনো ভুলতে পারে যে আবার তাকে মনে করিয়ে দিতে হবে? না, পারে না সে—কিংবা হয়তো এখানে তার মনই নেই—তার একদা-গুণমুগ্ধ অধ্যাপকেরা নিরাশ হচ্ছেন মনে-মনে, আর ছাত্ররা—সেই সতেজ, উৎসাহী, জিজ্ঞাসু যুবকদের বিষয়ে মর্মঘাতী কথাটা এই যে তাদের চোখে এখনো তার খ্যাতির ঘোর লেগে আছে—ছাত্রহিসেবে তার প্রবচনরূপ খ্যাতির, তার উপর বাংলা সাহিত্যে তার ক্রিয়াকর্মের বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়ার। আ, খ্যাতি—গ্লানিকর, দুঃসহ পদার্থ—সবচেয়ে গ্লানিকর তখন, যখন তা ছড়িয়ে পড়ে কোনো অক্ষমতার অক্ষম্য আচ্ছাদনের মতো, যখন তা ঢেকে রাখে, লুকিয়ে রাখে, ঘটতে দেয়, নিজের সঙ্গে এবং পরের সঙ্গে কোনো প্রবঞ্চনা! তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ এই মাস্টারি, কিন্তু যে-কোনো কাজ, তুচ্ছতম যে-কোনো কাজ হাতে নিয়ে তাতে অকৃতকার্য হওয়া—এটা কেমন ক'রে মেনে নিতে পারে সে, একদা যার কথা ছিলো বিশ্বজয়ী গাণ্ডীব হাতে বেরিয়ে পড়ার? কবে এই মাস্টারি সে ছাড়তে পারবে? কবে আর তাকে সইতে হবে না বাছা-বাছা ছাত্রদের শ্রদ্ধা—মর্মস্পর্শী অপমানকর উপহার—সেই উজ্জ্বল সম্ভ্রমের ব্যঙ্গ বিমলেন্দু সেনের মতো ছাত্রের চোখে, নিজের চরকায় তেল দেবার ক্ষমতা সত্যি বলতে তার চেয়ে যার অনেক বেশি।

মৌলি হাতের মুঠো শক্ত ক'রে ছেড়ে দিলো একবার—যেন তার উদ্গত অভিমানটাকে পিষে দিলো আঙুলের চাপে। 'বুদ্ধি জুটলো না বুঝি?' ব'লে হাসলো। 'কিন্তু সে-দোষ তোমার বুদ্ধির নয়, গীতা। মেটাফিজিকাল কবিতা অন্য কাউকে পড়াতে দেবার জন্য আন্দোলন করা উচিত তোমাদের?

'আমি ভাবছিলাম তোমার কাছে এসে একদিন—কিন্তু তোমার কি সময় হবে?'

'সময়? আমাকে এতদিন ধ'রে দেখার পর তুমি কি এই ভাবলে, গীতা, যে আমি "ব্যস্ত" মানুষ?'

'আমি জানি যে সময়ের অভাব কখনোই কারো হয় না। শুধু ইচ্ছারই অভাব হয়। তাই জিগেস করলাম।'

'শুধু ইচ্ছার নয়, শক্তিরও অভাব হয় মনে রেখো। যারা বলে যে সময় পেলে তারা এই করতো, ঐ করতো, তারা করুণারও যোগ্য নয় ভুলো না।'

'তাহ'লে দেবে একদিন বুঝিয়ে?'

'আমি পারিনা বুঝিয়ে বলতে।' মৌলি সরল গলায় হেসে উঠলো, তার কপালের উপর নেচে উঠলো একটি চুলের গুছি। 'আর তা ছাড়া'—হাসির সুর হঠাৎ মিলিয়ে গেলো তার গলা থেকে—'আমি কি নিজেই কিছু বুঝেছি যে অন্যকে বোঝাবো? কোনো বিষয়েই মনস্থির করতে আমি কি পেরেছি এখনো? আমি বড়ো উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ—কত সময় কত রকম মনে হয় নিজেই তার দিশে পাই না।'

—উদ্‌ভ্রান্ত! তা-ই তো, তা-ই-তো তোমাকে হ'তে হবে। তার মানেই জীবন্ত, তার মানেই মনের তার বার-বার হাজার সুরে বেজে ওঠে। তুমি কি কখনো তাদের একজন হ'তে পারো, যারা পায়ে পা

তুলে নিশ্চিন্ত, যারা সব বিষয়ে 'ঠিক জানে' যারা কয়েকটি 'প্রিন্সিপল' মেনে জীবন কাটায়? শিখবে তুমি চিরকাল, নতুন হবে বার-বার, বেড়ে উঠবে তুমি চিরকাল! তোমার মতো উদ্‌ভ্রান্ত হতে পারা কারো-কারো উচ্চাশার আকাশ, তা কি তুমি জানো?

'বোঝা গেলো' আবার একটু হাসি ফুটলো গীতার ঠোঁটে, তার ছবির মতো ভুরুটি একটু বেঁকলো। 'আবেদন মঞ্জুর হ'লো না। এদিকে ক্লাশের সবাই ভাবে কী, জানো? ভাবে, "গীতার আর ভাবনা কী! স্বয়ং মৌলিনাথবাবু তার সহায়!"'

'স্বয়ং মৌলিনাথবাবু যার সহায় সেই ছাত্রকে ভগবান যেন দয়া করেন। পাশ করানো বিদ্যে আমি কিছুই জানি না, তা তো বুঝেছো?'

'বড্ড তোমার দেমাক! আমি তো পাশ করার জন্যই জীবন পণ করেছি!'

'ঠিক অতটা পণ না করলেও তোমার চ'লে যাবে, মনে হচ্ছে। প্রোফেসরদের সকলেরই ধারণা যে এ-বছর দুটি ফর্স্ট ক্লাস হবে : একটি তুমি, আর একটি বিমলেন্দু। এর মধ্যে ফর্স্ট কে হয় সেটা একটা দ্রষ্টব্য বিষয়।'

'কী এসে যায়, বলো তো, ফর্স্ট হ'লে। প্রত্যেক বছর, প্রত্যেক ইউনিভার্সিটিতে, কতই তো ফর্স্ট হ'য়ে বেরোচ্ছে। কী এসে যায়?'

'পারলে, যে-কোনো কাজ হাতে নিয়ে করতে পারলে, এইটুকু এসে যায়। না-পারা কি ভালো?'

'কিন্তু আমি ভাবি অন্য কথা। তখন কিছুই ভালো লাগে না।'

'কী ভাবো বলো তো?'

'সাধারণের মধ্যে একটু অসাধারণ না-হ'য়ে নেহাৎই সাধারণ হওয়া কি ভালো নয়?'

মৌলি একটু তাকিয়ে থাকলো গীতার দিকে। নিচু গলায়, যেন কোনো গোপন কথা বলছে এমনি সুরে বললো, গীতা! এইটে আমার মনের মতো কথা বলেছো!'

'আমার খারাপ লাগে, কেমন রাগ হয়, যখন ইউনিভার্সিটিতে তোমার কথা বলাবলি করে ওরা। কথায়-কথায় বলে—"সবাই কি আর মৌলিনাথ হয়।" তোমাকে ওরা প্রতিযোগিতার বাইরে রেখেছে।—কিন্তু কেন?'

মৌলি একটু হাসলো, স্পষ্ট বোঝা গেলো সে খুশি হ'লো কথাটা শুনে। গীতা আবার বললো, 'আমি ভাবি যে তুমি যেখানে আছো সেখানে কখনো পৌঁছনো যাবে না, এই যদি স্বতঃসিদ্ধ কথা, তাহ'লে এ-সব চেষ্টার প্রহসন ক'রে লাভ কী।'

সেই তৃপ্তির হাসিটুকু—যে প্রশংসা নিজেকে সে দিতে চায় তা অন্যের মুখ থেকে শোনার ক্ষণিক আত্মপ্রসাদ--মৌলির মুখ থেকে মিলিয়ে গেলো। 'গরম হচ্ছে ঘরটা,' ব'লে উঠে গিয়ে একটা জানলা খুলে দিলো, গীতার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো একটুক্ষণ। হাওয়ার জোর আর নেই, বৃষ্টি পড়ছে অবিকল ঋজু রেখায়, যেন কোনো একই কথা অফুরন্ত বার-মনে করিয়ে দিচ্ছে পৃথিবীর বিস্মৃতিপ্রবণ মানুষদের। পাড়ার ঝাপসা-দেখানো ইলেকট্রিক আলোর সারি পেরিয়ে তার চোখ চ'লে গেলো প্রান্তরের অন্ধকারে, ফিরে এলো যেখানে অন্ধকার আরো ঘন ব'লে বটগাছটা দাঁড়িয়ে আছে বোঝা যায়। বাইরের সোঁদাগন্ধ হাওয়ায় নিশ্বাস নিলো, মুখে মাখলো স্পর্শময় বর্ষণের নির্যাস। তারপর ফিরে এলো চেয়ারের কাছে, কিন্তু বসলো না, গীতার সামনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো : 'আমি? আমি কি কোনোখানে পৌঁচেছি? না, গীতা। আমার দুঃখের কথা বলি তোমাকে ; এতদিনেও মনের কোনো আশ্রয় আমি খুঁজে পাইনি। তাই তো অন্যদের কোনো কাজে আমি লাগি না : তুমি, গীতা—তোমারও কোনো কাজে লাগতে পারি না আমি। সাহিত্যের পথে বেরিয়েছো তুমি আজ : কী দেখচো এখানে? এখানেও পাণ্ডা আছেন, পুরুৎ আছেন, নানা, মতের মোহান্ত—সমালোচক তাঁরা, পণ্ডিত, ধর্মযাজক, তাঁরা তোমাকে হাতে ধ'রে নিয়ে যাবেন পর-পর সুশৃঙ্খল পা ফেলে, তাঁদের কাছে পদ্ধতি শিখবে তুমি, নির্দেশ পাবে, নির্দিষ্টের আশ্রয় পাবে তাঁদেরই কাছে গীতা। আর আমি এই এঁদেরই এড়িয়ে গেছি বরাবর, দূর থেকে গড় ক'রে পালিয়ে গেছি, পৈতে নিইনি, তিলক কাটিনি—এঁদের কারোরই কোনো ইশকুলে

আমি ভর্তি হলাম না কখনো—স্বর্গরাজ্যের যে-চাবির গোছা বাঁধা আছে এঁদের কোমরে, তার রুন্‌ঠুন্‌ আওয়াজের আহ্বানে আমার মন সাড়া দিলো না ; আমি চ'লে এলাম মন্দির গির্জে পাশ কাটিয়ে ; আমি চাইলাম স্বাধীনভাবে স্বর্গে পৌঁছতে, আঁকাবাঁকা ধূলোর পথে ঘুরে-ঘুরে সোজাসুজি স্বর্গে পৌঁছতে চাইলাম : আমাকে বলতে পারো সাহিত্যের পথে বাউল, আপন উপলব্ধি ছাড়া আর কিছুই যে মানে না সেই মিস্টিক বলতে পারো আমাকে। এই পর্যন্ত বেশ ভালো।' ব'লে মৌলি থামলো, গীতার মুখে চোখ রাখলো একবার, গীতার চোখের তারা দুটি ছোট্ট দু-ফোঁটা হিরের মতো জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো। তারপর নিশ্বাস ফেলে আবার বললো, 'হ্যাঁ, এই পর্যন্ত শুনতে বেশ ভালো। কিন্তু যেখানে আমি তাঁবু বাঁধতে চেয়েছিলাম, সেই উপলব্ধি আমার কোথায়? এতদিনে কিছুই আমি সম্বল কুড়োতে পারিনি—শুধু অভিজ্ঞতা ছাড়া। কিন্তু সেই আমার দিনে-দিনে, পলে-পলে পাওয়া অসংখ্য অবাক-করা আঘাত—আমার সাহিত্যের অভিজ্ঞতা, বলতে পারো জীবনেরও অভিজ্ঞতা—তার উতরোল অস্থিরতাকে উপলব্ধির সূত্রে কি আমি বাঁধতে পারলাম এখনো? না, গীতা, তা আমি পারিনি—তার মানে কিছুই পারিনি। অভিজ্ঞতা ঢেউয়ের মতো আসে আর যায়—উচ্ছৃঙ্খল তারা, নিয়ম মানে না, পরস্পরের প্রতিকূলে চলে কত সময়—ফেলে রেখে যায় কিছু পলিমাটি, দিনে-দিনে জ'মে ওঠে ভূমি—কিন্তু সেই মাটির স্তরে-স্তরে ফসল ফলাতে হ'লে শিক্ষা চাই, শাসন চাই, হয়তো—হয়তো কোথাও আত্মসমর্পণেরও শক্তি চাই, গীতা। কিন্তু আমি—আমি আমার অহমিকাকেই সিংহাসনে বসিয়েছি, কবিতার ক্রিমিনাল আমি—বিদ্রোহী—স্বপ্নের স্বৈরাচার আমার পেশা। এখানে স্বাধীনতা আছে, কিন্তু নিঃসঙ্গতাও আছে, গীতা ; একরকম বলতে-না-পারা তীব্রতার আস্বাদ আছে, কিন্তু শান্তি নেই—শান্তি নেই।'

'মনে করো আমি শান্তি চাই না?' যে-মুহূর্তে মৌলি থামলো সে-মুহূর্তেই গীতা ব'লে উঠলো, 'মনে করো আমিও যদি উদ্‌ভ্রান্ত হ'তে চাই?'

ছোট্ট আওয়াজ ক'রে হাসলো মৌলি। তার বসবার ইজিচেয়ারটায় এক পা তুলে দাঁড়িয়ে গীতাকে একটু দেখলো-যেন মন দিয়ে। 'মনে হচ্ছে ইতিমধ্যেই একটু উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছো?' তারপর হঠাৎ অন্য রকম গলায় বললো, 'তোমার পড়াশুনোয় কখনো কোনো অসুবিধে ঘটলে বিমলেন্দুকে জিগেস করতে পারো।'

'উদ্‌ভ্রান্ত হবার ওষুধ বুঝি বিমলেন্দু সেন?'

'ও অমন সুস্থির হ'লেই ওকে আমার ভালো লাগে।'

'সত্যি?' হাসির আভাস ঝিলিক দিলো গীতার চোখে।

না, সত্যি নয় কথাটা। সুস্থির মানুষ মৌলিনাথের ভালো লাগে না। ভালো লাগে না, কিন্তু তারিফ করে মনে-মনে। বিমলেন্দুর নিচু গলার কথা, তার অপ্রগল্‌ভ, অনুচ্ছ্বসিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ কথাবার্তা, তার চোখের স্মিতশীতল দৃষ্টি, আর বইয়ের পাতা ওল্টাবার অতিশয় মৃদু এবং সশ্রদ্ধ ধরনটি—এমন কখনো হয় না যে এ-সব মৌলিনাথের মনের কোনো-এক অংশের প্রশংসা কেড়ে না নেয়। ক্লাশে যখন বিমলেন্দুর দিকে তার চোখ পড়ে—মন দিয়ে শোনার ফলে একটু লম্বাটে দেখায় মুখটি, কিন্তু চোখে চোখ পড়লেই বোঝা যায় যে শুনতে-শুনতেই বাহুল্য অংশ ছেঁটে দিচ্ছে সে—কিংবা যখন ছাত্রদের কোনো অনুষ্ঠানের সন্ধ্যায় সে ন্যূনতম ব্যস্ততা দেখিয়ে অধিকতম সুচারুতা সম্পাদন করে—কিংবা কোনোদিন যখন মৌলিনাথের বাড়িতে এসে—সেদিন হয়তো রবীন্দ্রনাথের হাল আমলের গদ্য নিয়ে কথা উঠলো—অধ্যাপকের অনেক কথার ফাঁকে-ফাঁকে গদ্য-কবিতার অবাস্তবতা প্রমাণ ক'রে অল্প কয়েকটি সারবান মন্তব্য ক'রে কৃতজ্ঞ মুখে উঠে চ'লে যায়—তখন মৌলিনাথ মনে-মনে বলে, 'ছেলেটির সবই ভালো, কিন্তু এমন—পরিমিত!' আর সঙ্গে-সঙ্গে তখনই আবার বলে, 'ভাগ্যবান যুবক! ভাগ্যবান!'

'বিমলেন্দুকে সত্যি খুব ভালো লাগে আমার', যেন একটু ক্লান্তির নিশ্বাস ফেলে মৌলি বললো। 'সত্যি খুব ভালো ছেলে।'

' "ভালো ছেলে"দের ভক্ত হ'লে কবে থেকে?'

'সে অর্থে নয়,' মৌলি চোখ দিয়ে প্রায় তিরস্কার করলো গীতাকে ; 'ও পড়েছে বিস্তর, বুঝেছে অনেকটা, যা বুঝেছে তা গুছিয়ে বেশ বলতেও পারে।—কিন্তু আমার চাইতে তুমি তো ওকে বেশি জানো।'

'হ্যাঁ, জানি। জানি ওর মস্ত গুণ এই যে, ও যা বোঝে না তা নিয়ে কথা বলে না। হয়তো,' একটু থেমে গীতা জুড়ে দিলো, 'হয়তো তা বুঝতেও চায় না।'

'যা বোঝা যায় না,' গীতার কথাটা ভুল শুনলো মৌলি, কিংবা হয়তো ইচ্ছে ক'রেই বদলে নিলো, 'তা বুঝতে না-চাওয়াই তো ভালো! যা বোঝা যায় না তা বোঝার চেষ্টা, যা বলা যায় না তা বলার চেষ্টা'—অর্থাৎ থেমে গেলো মৌলি।

'বলো!' যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এলো গীতার এই নিচু গলার ডাক, আবেদনে ভরা আহ্বান, নিশ্বাসের সুরে মনে মনে বলা প্রায় কোনো প্রার্থনার মতো। কিন্তু মৌলি জবাব দিলো না, স'রে গিয়ে পাইচারি করতে লাগলো ঘরে মধ্যে। আ, এ-সব কথা গীতাকে কেন বলছে সে, কেন সে তার মনের ভাবনা গীতার সামনে মেলে ধরে যখনই গীতাকে সে কাছে পায়? এটা অভ্যেস হ'য়ে গেছে তার, ওরও তাই হয়েছে হয়তো ; গীতা এলেই এই রকম কথা চলে খানিকক্ষণ, ও কেমন একরকম পারে তার কথাকে ঠিক সে-সব দিকেই বইয়ে দিতে যেখানে বলতে গেলে কথা আর ফুরোয় না। ভালো না—ভালো হয়নি এটা। কথা বলার তাব হয়তো প্রয়োজন আছে, কিন্তু অন্যের তো শোনার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই শুধু নয়, বীতিমতো অপ্রয়োজন আছে : ক্ষতি হয় ওতে, নষ্ট হ'য়ে যায় জীবন। এক দিকে এই কবিতা, সাহিত্য—যা কিছু বানানো, রচিত, কল্পিত অর্থ-দিতে-চাওয়া ; অন্য দিকে বিনা-জবাবদিহির জীবন। সুখ শুধু তারাই জানে, শুধু বাঁচতে পারাই যাদের যথেষ্ট। বাস্তবে ছাড়া আব কোথায় স্বাস্থ্য আছে মানুষের? সংসাবে ছাড়া আর কোথায় আশ্রয় আছে? নিজে যারা সুন্দর হ'তে জানে, সুন্দর ক'রে বাঁচতে পারে, কোন দুঃখে সুন্দবের পিছনে ছুটবে তারা—সেই উন্মাদ অভিশপ্ত মৃগয়া, যাব শেষে বিজেতাই একদিন মুখ থুবড়ে মাটিতে প'ড়ে থাকে কিরাতের বর্বর তীরের লক্ষ্য হ'য়ে! আগে সে ভাবতো যে জীবন আর সাহিত্য পরস্পবেব পবিপূবক : জীবনে যে-সব প্রশ্ন জাগে তাবই উত্তর মানুষ খুঁজে পায় সাহিত্যে।—কিন্তু না! কিছু জানবার জন্য আমবা লাইব্রেরিতে যাই, সেটা সাহিত্য পড়া নয় ; শোকেব দিনে আমরা গীতা খুলে বসি, সেটা কবিতা পড়া নয়। জীবন-সমস্যার মেটিরিয়া মেডিকো নয় সাহিত্য, তার সম্বন্ধে সবচেয়ে ভয়ংকব কথাই তো এই যে সে স্বয়ং প্রতিষ্ঠ, এই বিশ্বে স্বাধীন সত্তা আছে তার। তাই তো খুঁজে-খুঁজে তাব অন্ত কেউ পায় না ; তাই তো সব ব্যর্থ—অর্থহীন—যত কথাই কবিতা নিয়ে আমরা বলি না, যত না আমরা সুন্দরের সুতো ছিঁড়ি ব'সে-ব'সে! কবিরা কবিতা লেখেন—সব সময় বলবার কিছু আছে ব'লেই কি লিখতে বসেন? তা তো নয়। এর আরম্ভ কোথায়? সেই প্রথম চালিয়ে-দেয়া ধাক্কা আসে কোথা থেকে? খেলাচ্ছলে আরম্ভ হয় কত সময়—হয়তো কোনো ছন্দেব পোকা মগজ থেকে তাড়াবার জন্য, কিংবা যখন হঠাৎ কোনো তৈরি লাইন পথের ধারে নর্দমার জলে উপহার পায়, কিংবা কোনো চমকে-দেয়া আদরের মতো মিল—শুধু একটি মিলেরই জন্য কি কবিতা লেখা শুরু হয় না কখনো! কিন্তু সেই তুচ্ছ আরম্ভ থেকেও মহৎ পরিণাম সম্ভব হয় কোন্ জাদুবলে? কেমন ক'রে তাতে বেরিয়ে আসে পরতে-পরতে অভিজ্ঞতা, ধরা পড়ে স্তরে-স্তরে অর্থ, আসে ব্যাপ্তি, ঘনতা, সংগতি ;—শুধু তা-ই নয়, তার উপরেও এমন কিছু এসে মিশে যায় কবি নিজে যা ইচ্ছে করেননি, ইচ্ছে করলেও দিতে পারতেন না কখনো—যার ফলে কবিতা হ'য়ে ওঠে মানুষজাতির সংহত ইতিহাস? খেলা আর খেলা থাকে না যখন, তখনকার তাপ, হিম, পরিশ্রম, ত্যাগ—নিজেকে নিংড়ে বের করার দম-বন্ধ-করা কষ্ট—সব বুঝে নিয়েও, সেখানে পূর্ণ মূল্য মিটিয়ে দিয়েও—তবু তো কিছু বাকি থাকে যা বোঝা যায় না—সেই সর্বশেষ স্পর্শটুকু, যা না-হ'লে কিছুই হ'তো না, যেটুকু না ঘটলে কথার সারি তাসের বাড়ির মতো ভেঙে পড়ে। সেই অনির্বচনীয়ে উঁকি দেবে কে? সৃষ্টির রহস্য যেখানে সহনীয় দৃশ্য দিয়ে ঘিরে রেখেছে—সেই আশ্চর্য দ্রৌপদীর শাড়ি!—কার এত স্পর্ধা যে পরদা সরিয়ে উঁকি দিতে যাবে সেখানে? না, না! এই গীতা, আজকের এই উনিশ বছবের গীতা আমাদের, যার সামনে

আস্ত একটা ভরপুর জীবন প'ড়ে আছে—তাকে কেন লুব্ধ করা, ব্যর্থতার পথে, আবেগের ব্যভিচারের পথে, তাকে কেন টেনে আনা?

'তুমি কী ভাবছো জানতে পারি?'

'তোমাকে একটা কথা বলবো ভাবছিলাম।' মৌলি পাইচারি থামিয়ে আবার এসে ইজিচেয়ারে বসলো। 'আমাকে কোনো কথা বলতে এতক্ষণ ভাবতে হয় তোমার?'

'তোমার জন্য আমার ভাবনা হয়, গীতা, যেহেতু তুমি কবিতা ভালোবাসো।'

—কবিতা ভালোবাসি? হায় মূঢ় মানুষ! পৃথিবীর সমস্ত কবিতা আমি কি মহানন্দে বানের জলে ভাসিয়ে দিতাম না, আমার চাওয়ার এক বিন্দু তাতে মিটতো যদি। কী পড়ি আমি কবিতায়, কেন পড়ি, কোন মূল্য সেখানে আমার জমা আছে তা তুমি বোঝো না—বুঝো না—কোনোদিন না-বুঝে আমায় বাঁচিয়ে দিয়ো তুমি, আমার এই ফাঁকির বেসাতি ধ'রে ফেলো না।

'হ্যাঁ, ভাবনা হয়,' আস্তে সস্নেহ সুরে মৌলি বললো, কখনো-কখনো ভয় করে তোমার জন্য। না, গীতা না, এ-সব নিয়ে কেন এত ভাবছো তুমি?'

'কী নিয়ে ভাবছি বলো তো?'

'ভালো না এ-সব ঐ-যে তুমি বললে যে তবু ঐ ইচ্ছেটুকু থাক, ও-রকম কথা ভালো না, গীতা। তাতে বুঝবে বেঁচে আছো? না, না! আমি বলছি তোমাকে, ওতে মানুষ বাঁচে না। আমি তো জানি, আমি তো একটা ইচ্ছার পিণ্ড হ'য়ে ব'সে আছি; আমি তো জানি যে চীৎকার ক'রে বুক ফাটালেও সাড়া দেবে না সেই বধির। এই পাপ, হৃদয়ের এই ব্যাধি যদি উপড়ে ফেলতে না পারো, গীতা, তাহ'লে জীবন তার প্রতিশোধ নেবে তোমার উপর, তুমি বুড়ো হবে অকালে, জিভে স্বাদ থাকবে না, বন্ধুরা তোমাকে ছেড়ে যাবে—তাহ'লে তোমার দু-চোখে দুটি হিরের ফোঁটা আর জ্বল-জ্বল করবে না, গীতা! ঐ পরিণামের দিকেই রঙিন পথ মেলে দিয়েছে এই—এই সব—কবিতা ইত্যাদি ব্যাপার। বুঝেছো আমার কথা?'

'বুঝেছি। কিন্তু রাখুকে একটু সাহায্য করলে বোধ হয় ভালো হয়,' ব'লে গীতা উঠে দাঁড়ালো।

৩

দু-হাতে ধ'রে চায়ের ট্রে নিয়ে আসতে-আসতে রাখু ঠেকে গিয়েছিলো দরজার পরদায়, গীতা গিয়ে পরদাটা তুলে ধরলো। ঘরে এসে বেতের টেবিলে ট্রে নামিয়ে রাখু একটু দাঁড়ালো। আধবুড়ো মানুষ, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, চওড়া মুখের ভাবটি যেন জজিয়তি ধরনের গম্ভীর। একটু ঢিলে, দীর্ঘসূত্রী, কিন্তু মোটের উপর বিশ্বাসী, কাজের লোক, আর অবশ্য অনেক দিনের পুরোনো—তবে বড্ড যেন রাশভারি, এই বিশ্বসংসারে অনুমোদনের অযোগ্য কিছু আবিষ্কার করতে সর্বদাই যেন প্রস্তুত। মৌলি তাকে সমীহ করে, প্রায় একটু ভয় করে বললেও ভুল হয় না; তার মনে হয় রাখু যেন কঠিন সমালোচনার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়—এই ঘরের মধ্যে বইপত্র নিয়ে ব'সে যা-কিছু সে করে কিংবা করে না, তার সমস্তটাই রাখুর বিচক্ষণ আনুকূল্যহীন বিচারের অধীন ব'লে মৌলি সন্দেহ করে মনে-মনে।

বেতের টেবিলের বই, চিঠিপত্র, লেখার টেবিলে তুলে রাখলো রাখু। ঠিক দরকার ছিলো না, তবু ট্রে-সুদ্ধ টেবিলটি মৌলির আরো হাতের কাছে এগিয়ে দিলো। ঈষৎ শ্লেষ্মাজর্জরিত গলায় জিগেস করলো, 'আর-কিছু লাগবে?'

'না,' রাখুর দিকে না তাকিয়ে মৌলি জবাব দিলো।

'চিনির শিরেয় চিনেবাদাম পশিয়ে ভাজা হয়েছে; মা খেতে বললেন।'

'আচ্ছা।'

মাপা-মাপা পা ফেলে রাখু চ'লে গেলো ঘর থেকে। তার ফতুয়া-পরা জোরালো পিঠটা—মৌলির মনে হ'লো—যেন নিঃশব্দে তাকে বিদ্রূপ ক'রে গেলো। হঠাৎ কেমন নিস্তেজ লাগলো তার, অবসন্ন; যেন একটা হিম কাঁপুনি নামলো মেরুদণ্ড বেয়ে ; মুহূর্তের জন্য মনে হ'লো তার এই সাহিত্যচর্চা—জীবনের সর্বস্ব তার—তা কিছু না, কিছুই না, কিছুই এতে এসে যায় না। মনে হ'লো যৌবন তার ফুরিয়ে গেছে ; আর সেই অভাবের ক্ষতিপূরণ হয় এমন কোন সম্পদ আছে পৃথিবীতে?

বাইরের কালো রাত্রির দিক থেকে চোখ সরিয়ে আনলো মৌলি, আপাতত এ কথা ভেবেই সুখী হবার চেষ্টা করলো যে ঠিক সময়ে চা পাঠিয়ে দিয়েছেন মা। সুখ : কথা ব'লে ক্লান্ত হ'য়ে গরম চায়ে গলা ভিজোবার সুখ, কোনো বৃষ্টি-নামা শেষরাত্রের ভাঙা ঘুমে পায়ের তলায় পুরোনো কাঁথার উষ্ণ-নরম শীতলতার স্পর্শসুখ—সুখের এ-সব উঞ্ছবৃত্তি নিয়েই সারা জীবন কেটে যায় মানুষের। ভালো—কিন্তু তাও কি ভালো নয়, এইটুকুই কি বাঁচোয়া নয়, সত্যি বলতে? কোনো-না-কোনো রকমেব সুখ যদি না থাকে তাহ'লে আত্মসম্মানও থাকে না, আর আত্মসম্মান না-থাকলে আর থাকলো কী জীবনে? হ্যাঁ, ভালোই তো, ভালোই তো দেখাচ্ছে এই সাজানো ট্রে, সবুজ হলুদে ডোরা-কাটা কাপড়ের উপর গোয়ালিয়রের গাঢ়-নীল পেয়ালা—সেবার নিয়ে এসেছিলো কলকাতা থেকে—গন্ধ উঠছে গরম নিমকির, চিনিতে পশানো চিনেবাদামটাও দেখতে কিছু মন্দ লাগছে না। মৌলির মনে হ'লো যে এই সব দৈনন্দিন জিনিস—জীবনের সাধারণ সব উপকরণ, যা সে ব্যবহার করে, ভোগ করে, নির্ভব ক'রে থাকে যাদের উপর—এদেরও কিছু পাওনা আছে তার কাছে, কিন্তু এদের সেই মূল্যটুকু মিটিয়ে দিতে সে-যে ভুলে যাচ্ছে আজকাল, এতেই বোঝা যায়—এটাই কি তার ব্যর্থতার পরিমাপ নয়?

গীতা আবাব সেই মোড়াটিতে এসে চুপ ক'রে ব'সে ছিলো, মৌলির চোখ স'রে গেলো তাব দিকে। একটু পবে বললো, 'তোমার শাড়ির রংটি বেশ।'

'হেলিওট্রোপ রং তোমার ভালো লাগে?'

'হেলিওট্রোপ—সুন্দব কথা! আসল মানে "সূর্যমুখী"। অবশ্য আমাদেব ভাষায় সূর্যমুখী আলাদা। হেলিওট্রোপ ফুল তুমি দেখেছো?'

'না, দেখিনি।'

'আমিও দেখিনি। তবে কচুরিপানার ফুল দেখেছি। তাও সুন্দর। আর ঠিক এই বকমই তাব রং।' একটু চুপ ক'রে থেকে মৌলি আবাব বললো, 'বেশ রংটি।'

'বেশ বলছো? না, বংটা বাজে।'

'বাজে?'

'নয়তো আমাকে ছাড়িযে শাড়ির রংই তোমার চোখে পড়লো।'

'আসলে এই রংটিতে তোমাকে মানিয়েছে বেশ।'

'কিন্তু আর কি মেয়ে নেই যাকে এ-রঙে মানায়?'

একচ্ছত্র আধিপত্য চাও?' মৌলি হাসলো।

'তোমার চা বোধহয কড়া হ'য়ে যাচ্ছে,' গীতা মনে কবিয়ে দিলো মৌলিকে, কিন্তু চা ঢেলে দেবার মেয়েলি কর্তব্যটুকু সম্পাদন করতে অগ্রসর হ'লো না।

'চা—-বেশ, বেশ। আমাদের পূর্বপুরুষদের আমি ক্ষমা করতে পারি না, গীতা—এই ভারতবর্ষীয় চা-পাতা তাঁরা পাঁচ হাজার বছরে আবিষ্কার কবতে পারলেন না। কাজটা বাকি রাখলেন ইংরেজের জন্য।

'আমি কিন্তু এখন চা খাবো না!'

'খাবে না?'

'এইমাত্র খেয়ে আসছি।'

'তাহ'লে নিমকি একটা?' মৌলি নিচু হ'য়ে টি-পটের ঢাকনা তুললো।

'আচ্ছা, দাও। মৌলির হাত থেকে আধখানা নিমকি ভেঙে নিলো গীতা, বাঁ-হাতে দু-আঙুলে ধ'রে থাকলো।

'তোমাকে প্লেট দিইনি বুঝি?'—মৌলি ভ্রম সংশোধন করলো তাড়াতাড়ি। 'একটু মিষ্টি চিনেবাদাম? রাখু বিশেষভাবে রেকমেণ্ড করলো এটা।'

গীতা দুটি-তিনটি চিনেবাদামের দানা তুলে নিলো। 'আচ্ছা, একটু চা-ও দাও। আধ পেয়ালারও কম কিন্তু।' তারপর মৌলির হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নিয়ে তার উপর মুখ নামিয়ে গভীরভাবে নিশ্বাস নিলো একবার। চোখ বুজে এলো তার, সেই গন্ধে, সেই দুর্বার, ক্ষণকালীন আঘ্রাণে, যাকে কিছুতেই ধ'রে রাখা যায় না কিন্তু মুহূর্তেই যে অনেক কিছু কাজ ক'রে চ'লে যায়, যে-গন্ধ প্রথম তাকে আঘাত করেছিলো যখন চা নাড়তে টী-পটের ঢাকনা তুলেছিলো মৌলি। সে কি চায়ের গন্ধ? না চাঁপা ফুলের? না কোনো বৈশাখের সোনার মতো সকালবেলার? এ তো সে-ই আবার—বৃষ্টি, অন্ধকার, বছর, সময়, সমস্ত পার হ'য়ে সে-ই আশ্চর্য উজ্জ্বল সকালবেলাটি, যখন সে পা টিপে-টিপে এই ঘরে এসেছিলো, ওদের দু-জনের কত কী বলাবলির মধ্যে হঠাৎ এসে মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়েছিলো। আ—ছেলেমানুষ! ছেলেমানুষ গীতা। কিন্তু তার মন, তার হৃদয়, তার বারো বছরের কাঁপনলাগা শরীরের অণু-পরমাণু দিয়ে তখনই কি সমস্ত ইতিহাস সে প'ড়ে নেয়নি।—ইতিহাসের পাত্রীও কি হ'য়ে পড়েনি সঙ্গে-সঙ্গে?—ওদের দু-জনের—কথাটা কি উচ্চারণ করা যায়? কিন্তু এখন আর বাধাই বা কী—ওদের দু-জনের কিশোর-প্রণয়ের তাপ সেও কি আভাসে কিছু পায়নি, ঢেউ তুলে ছড়িয়ে যায়নি তাব আবহাওয়ায়—যেমন ফাগুন মাসে দুপুর বেলায় হঠাৎ দক্ষিণে হওয়া দেয়, আর আমের ডাল শিউরে উঠে মুঠো-মুঠো মুকুল তোলে ফুটিয়ে? —সেখানেই আরম্ভ! অনেক দিন, অনেক মুহূর্ত, বার-বাব কত সোনালি ঝলক ব'য়ে গেছে তার উপর দিয়ে—কিন্তু সেদিনের সেই সকাল বেলাটির মতো, চাঁপার গন্ধে, চায়ের গন্ধে নেশা-ধরানো সেই মুহূর্তটির মতো, কিছুই আর ঘটেনি এই ইতিহাসে। কী তীব্র ভালো লাগা ছিলো তাতে, সেই শুধু কাছে এসে একটু দাঁড়ানোয়, তার হাত থেকে চাঁপা ফুল নিয়ে মাথা নিচু ক'রে আস্তে-আস্তে ফিরে যাওয়ায়—যাতে কিনা এই জীবনের যা-কিছু সুন্দর, সমস্তই ঐ গন্ধ হ'য়ে জড়িয়ে আছে তার মনের মধ্যে। আর এখন? এই কি তোমার ভালো লাগার অবসান হযেছে, গীতা? এই তো তুমি ব'সে আছো—যে-চায়ে সত্যি তোমার ইচ্ছে নেই সেই চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে, যে কবিতায় সত্যি তোমার মন নেই তারই স্বচ্ছ জালের মধ্যে আবদ্ধ হ'যে—শুধু কাছে থাকতে, ব'সে থাকতে, তাকিয়ে থাকতে!

'চা খাচ্ছো না? ভালো হয়নি?'

'খাচ্ছি।' গীতা মুখ নীচু করলো পেয়ালায়, কিন্তু চুমুক না-দিয়ে তখনই আবার বললো, 'তোমাব মনে পড়ে, একদিনের কথা? একদিন—অনেকদিন আগে—সকালবেলা তোমাব এখানে এসেছিলাম। সবাই এসেছিলাম আমরা। মা, দাদা—দিদিও। তোমার টেবিলে সেদিন পাথবে থালায় চাঁপা ফুল ছিলো।' এটুকু ব'লে চুপ করলো গীতা, যেন আরো কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলো।

একটু কি ছায়া পডলো মৌলির মুখে? চোখের পাতা মুহূর্তেব জন্য নেমে এলো চোখের উপর? কিন্তু তখনই হাসি ফুটলো ঠোঁটে, পরিষ্কার চোখে হেসে তাকিয়ে বললো, 'মনে আছে তোমার? তোমাকে সেদিন একটা ফুল দিয়েছিলাম, কিন্তু সব ক-টাই দেওয়া উচিত ছিলো। যা সুন্দর তুমি ছিলে তখন!'

'ছিলাম!'

নিঃশ্বাস পড়লো মৌলির। সবচেয়ে নিষ্ঠুর কথা—ঐ ছিলো, ছিলাম! কিন্তু ঐ তো হয় গীতা, ঐ তো হয়। তোমার ঐ বয়সে—তোমার রূপের যেন তুলনা ছিলো না। আর এখন—আরো দশজন রূপসীর ভিড়ে মিশে গেছো তুমি। এক দশা তোমার আর আমার।

'কেউ-কেউ হয়তো বলবে যে এখন তুমি আরো সুন্দর।

'কিন্তু তুমি তা বলবে না—এই তো? তা তোমার মতো বছর-বছর আরো সুন্দর তো সবাই হয় না।'

মৌলি হাসলো, যেন বেশ খুশি হ'য়েই হাসলো। আমার অনেক প্রশংসা শুনেছি, গীতা, কিন্তু আমি

দেখতে ভালো এ-কথা এই প্রথম শুনলাম।'

এই প্রথম? কেন এ-সব মিথ্যা ব'লে আমাকে আরো মনে করিয়ে দাও আমার হার? আমি কি জানি না যে আমি হেরে গেছি, প্রথম থেকেই হেরে ব'সে আছি, ঠিক শুরু করতেই আমি কখনো পারলাম না!'

'দিদি কী বলতো, জানো?' একটু সাবধানে, কিন্তু আপাতত খুব সহজ ক'রে গীতা বললো, 'বলতো—মৌলির মতো চোখ, মৌলির মতো হাসি, কোনো মানুষের হয় না।'

'হাঁ, তোমার দিদি যদি ও-রকম বলতেন,' ব'লে মৌলি একটু আয়াস ক'রে 'হেলান দিলো চেয়ারে। 'কিন্তু তোমার উপর দিদির প্রভাব স্বাস্থ্যকর হয়নি।'

—দিদির প্রভাব? কে জানে কার প্রভাব। দিদিকে সে ভালোবাসতো—সেই তার শিউরে-ওঠা সবুজ বয়সে দিদিকে সে ভালোবাসতো খুব মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে থাকতো দিদির দিকে—সবচেয়ে ভালোবাসতো মৌলির সঙ্গে যা-কিছু তখন ছিলো চিত্রার। আ—ঈর্ষার পর্যন্ত স্থান ছিলো না তখন, এত সে অস্ফুট, অব্যক্ত, দুর্বল। দিদির যখন বিয়ে ঠিক হ'লো বিয়ে হ'লো, তারপর মহেন্দ্রবাবু দিল্লিতে চাকরি নিয়ে চ'লে গেলেন—সেই সমস্তটা সময় সে কেঁদেছিলো খুব—থেকে-থেকেই তার কান্না পেতো তখন—কিন্তু সে-কান্না কিসের? কার জন্য? দিদির বিয়ের খবর সে প্রথম যখন শুনলো—সেই চাঁপাফুলের সকালবেলার দু-একদিন পরেই—তখনই কি লাফিয়ে ওঠেনি তার হৃৎপিণ্ড, মনে-মনে 'হায়-হায়' ক'রে ওঠেনি যে আর তো সে আমাদের বাড়ি আসবে না। কিন্তু তারপর, সেই বসন্ত ঋতুর প্রথম ঝড়ঝাপট কেটে যাবার পর, যখন সে প্রামাণ্যরূপে বড় হ'য়ে শাড়ি ধরলো, স্কুল ডিঙিয়ে কলেজে এলো—কপালগুণে পড়াশুনার জোরে লক্ষ্যণীয়ও হ'তে পারলো একটুখানি—আর সর্বশেষে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে এসে নতুন একটা অধিকার পেলো যখন—এই এতগুলি বছর ভ'রে গীতার মনে এই কথারই ঢেউ দিয়েছে থেকে-থেকে যে ভাগ্যে দিদি এখন কাছে নেই। ভাগ্যে সুমতি হ'লো দিদির, মানুষটাকে আস্ত জুড়ে দখল করার স্পর্ধা হ'লো না, ভাগ্যে দিদি স্থিত হ'লো হাজার মাইলের নিশ্চিন্ত পরপারে—যখন—যখন আর অন্য কারো পিছন পিছন পা টিপে-টিপে ঘরে আসতে তাকে হয় না, যখন সে নিজেরই পায়ে দাঁড়াতে পারছে!—নিজের পায়ে, কিন্তু অন্যের জমিতে বোধহয়? অন্তত, অন্য কেউ এই পথেই এগিয়েছিল তার আগে—পৌঁছতে না পারুক, এই পথেরই দূর্বাঘাস মাড়িয়েছিলো? এমনি ক'রে এই ঘরে এসেছিলো অন্য কেউ, এমনি ক'রে কথা শুনেছিলো, দু-চোখ ভ'রে দেখছিলো। জানি, মেনে নিয়েছি সব, তবু অসহ্য লাগে এক-এক সময়। তুমি মহেন্দ্র ঘোষের স্ত্রী, তোমাকে কি আসতেই হয়েছিল এই দেশে দু-দিনের জন্য বেড়াতে? আমার এই স্বর্গে, এই অলীক, ভিত্তিহীন, অনুপার্জিত স্বর্গে, এই একটু ছায়া কি তোমাকে ফেলতেই হ'লো দরিয়াগঞ্জের দোতলা বাড়ির গৃহলক্ষ্মীর? এ-কথা যখন ভাবে, তখন যেন দিদিকে আর ক্ষমা করতে পারে না গীতা, দিদির কারণে যে পুলক সে পেয়েছিলো তার জন্যে কৃতজ্ঞ হ'তে ভুলে যায়—তখন তার মনে হয় যে দিদির সব ফাঁকা, ফেনিয়ে-তোলা, ভেজাল, ঐ তার লম্বা-চওড়া সাহিত্যিক ভাবের চিঠিপত্রেরই মতো, যাতে মৌলিনাথের আগেকার গদ্যের অসাধু অনুকরণ লক্ষ্য ক'রে গীতার যন্ত্রণাবিদ্ধ মন কিছুতেই আর সান্ত্বনা মানে না।

'বোধহয় কারো উপরেই অন্য কারো প্রভাব স্বাস্থ্যকর হয় না, ব'লে গীতা যেন সন্ধানী চোখে চকিতে একবার মৌলির দিকে তাকালো। তারপরই বললো, যেন তার প্রথম কথাটারই দ্বিতীয়টা কোনো উদাহরণ, 'দিদি আমাকে এখনো খুব চিঠি লেখে, অনেক সব উপদেশের কথা থাকে তাতে।'

'ভালো, ভালো।' পিঠ-চাপড়ানো মোলায়েম গলায় মৌলিনাথ জবাব দিলো। 'ও-বিষয়টায় বরাবরই তিনি পারদর্শী। তারপর—কেমন আছে সে?'

'ভালো আছে। গীতা লক্ষ্য করলো 'তিনি'র বদলে 'সে' কথাটা, আর সেই সঙ্গে বলার সুর কেমন একটু বদলে গেলো। একটু নিমকি ভেঙে মুখে দিলো, সঙ্গে একটি মিষ্টি বাদাম, চুমুক দিলো স্মৃতিভরা চায়ের পেয়ালায়। কিন্তু ততক্ষণেও মৌলি যখন আর-কিছু বললো না, তখন চোখ তুলে হালকা ক'রে

জিগেস করলো, 'দিদির সঙ্গে শিগগির তোমার দেখা হয় নি বোধ হয়?'

'শিগগির?' ঐটুকু ব'লেই মৌলি থামলো। তাকে মনে হ'লো অন্যমনস্ক, যেন বিষয়টাতে ঠিক মন দিচ্ছে না।

'দিদি তা তো ছুটিতে আসেন, আর তুমি তো তখন প্রায়ই আবার থাকো না।'

গীতা কি ভাবছে তার দিদিকে এড়াবার জন্যই ছুটিতে আমি বাইরে চ'লে যাই? কত বাষ্প ঢুকেছে ওর মগজে, ওর সুন্দর মুখটি ম্লান ক'রে দেবার জন্য কত কল্পনার ষড়যন্ত্র ওকে ঘিরেছে? টুক-টুক টোকা দিচ্ছে দরজায়—শুনতে চায় ও, জানতে চায়, আশতে চায়, ও যাকে ভাবছে 'ভিতরে', অতীতটাকে সৃষ্টি ক'রে নিতে চায় আবার, তারই মধ্যে বাঁচতে চায। বেচারা! তার দিদির জন্য ছুটিতে আমি থাকি না? আ—যদি তা-ই হ'তো! কাউকে এড়াতে চাই, কারো সঙ্গে পাছে দেখা হয় তাই পালিয়ে যাই—সে-রকম কোনো আশ্চর্য সম্ভাবনা দিগন্তে কোথাও জেগে থাকতো যদি! দেখা হয়নি? তাও হয়েছে। প্রমাণ পেয়েছি উত্তরভারতীয় জলবায়ুর স্বাস্থ্যকরতার, প্রমাণ পেয়েছি সে ভুল বলেনি, তার কথাই ঠিক—তোমার কথাই সত্য হ'লো, চিত্রা। ছেলেমানুষ—ছেলেমানুষি! কিন্তু আমি কি তার মুখের দিকে তাকিয়ে—তার প্রিব্যাফেলাইট পাণ্ডুতাজয়ী এখনকার মেদচিক্কণ মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কি মনে-মনে বলতে পেরেছি, 'কী বোকাই আমি ছিলাম তখন!' ভগবান না করুন! ভগবান করুন এত বিজ্ঞ যেন কখনো আমি না হই যে রঙ্গমঞ্চে নায়ক আর নই ব'লেই দর্শকের আসনে ব'সেও একাত্ম হ'তে পারি না! সবই আমরা ভুলে যাই—কিছুই আমরা ভুলি না। অতীত—কী আশ্চর্য এই যাকে আমরা অতীত বলি, প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে, মুছে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে বর্তমানের স্রোতের মধ্যে—কোনো-একটি মুহূর্ত সেই মুহূর্তকালের বেশি দাঁড়িয়ে থাকবে না—অথচ কোথাও সব হ'য়ে-যাওয়ার একটা নিজস্ব সত্তাও আছে। যেন, সেখান থেকে কিছুতেই তাকে নড়ানো যাবে না। যা ছিলো তাকে এখন দেখলে চিনতেই পারবো না, কিন্তু যা কোনো-একদিন ছিলো তা যেন চিরকাল ধ'রেই আছে। চিরকাল, চিত্রা, চিরকাল। আমি কি ভুলতে পারি—সেই তুমি যখন আমাব চেয়ারেব পিছনে দাঁড়িয়েছিলে, সেই তোমার শবীরের স্পর্শ, বুকেব উত্তাপ, তোমাব শরীরের সৌরভে ভবা নিশ্বাসেব উন্মাদনা! আমি কি ভুলতে পারি তোমার কথা—'তোমাকে ভালোবাসি, মৌলি!' আকাশ ভ'রে বাঁশি বেজে উঠলো, সে-বাঁশি আর থামলো না। 'ভালোবাসি!' কিন্তু সে তুমি নও, চিত্রা, সে তুমি নও—এ-কথাও তুমি ঠিক বলেছিলে। তোমার সঙ্গে দেখা না-হ'লে আর এসে যায় না আমাব—তোমার সঙ্গে দেখা হ'লেও আর এসে যায় না, চিত্রা! তুমি—আমি—ও-সব কিছু না, খেলা, ছেলেমানুষি। কিন্তু এর পরেও আরো একটু কথা আছে যা তুমি বলোনি, বলতে পারোনি। আর তাই—যদিও তুমি অনেক দিয়েছো আমাকে, অনেক করেছো আমার জন্য, তবু এই ছেলেমানুষির চিকিৎসা আমাব তোমার হাতে হ'লো না। সংসার ডাকলো তোমাকে, বাঁচলে তুমি সেখানে গিয়ে, জীবনের মৃন্ময় তাপ মুঠোর মধ্যে পেলে সেখানে—সেই একমুঠো জীবন, চিত্রা, যার অভ্যাসে, প্রথায, দুটি-চারিটি বিশ্বাস্য প্রতীকের আশ্চর্য বলশালিতায় আমাদের হাজার উতরোল ইচ্ছা যেন মায়ের বুকে শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়ে। এদিকে আমি—আমার মনে কোনো একটি ইচ্ছা আজও বেঁচে থাকে যদি, সে ইচ্ছা শুধু ছেলেমানুষির, শুধু অফুরন্ত বার বোকা হবার, পাগল হবার! আর তাই তো আমাকে জীবন ভ'রে খুঁজে বেড়াতে হবে কে আমাকে আবার বলবে 'ভালোবাসি', যে আমাকে ভালোবাসে তাকে পাবো না জেনেও খুঁজে-খুঁজে পাগল হ'তে হবে চিরকাল।

মৌলির মনে পড়লো তার চায়ের পেয়ালা—তার প্রিয় পানীয়—এটা ভালোই যে এ-সব সহজলভ্য জড় বস্তুতেও কিছু ভালোবাসা ছড়িয়ে থাকে মানুষের। পেয়ালা হাতে তুলে বললো, 'বৃষ্টি থামলো. মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, ধ'রে এলো বোধহয়।'

'তোমাকে গাড়ি আনিয়ে দিতে হবে?'

'আমার যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছো, মনে হয়?'

'না,' মৌলি হাসলো। 'আমি বরং তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম যে এখনই যেয়ো না। আর-একটু বসো। আরো দু-একটা কথা বলি তোমাকে।'

গীতা চোখ তুলে তাকালো, প্রায় ছাত্রীর মতোই একান্ত দৃষ্টিতে ; তার মসৃণ শাদা কপালটির উপরে কুমারী সিঁথি সুন্দর দেখালো।

'কথাটা এই যে আমাদের, এই মানুষদের মাপে জগৎটা ঠিক তৈরি হয়নি। এই পৃথিবী—জগৎ—এটা বড্ড বড়ো, আমাদের পক্ষে বড্ড বেশি বড়ো এটা। ভেবে দ্যাখো এই জগৎ জুড়ে কত কিছু ব্যাপার চলছে অনুক্ষণ—তার কতটুকু আমরা নিতে পারি, পেতে পারি? একটা সহজ উদাহরণ নাও : পৃথিবীতে প্রতিদিন সূর্যাস্ত হচ্ছে—আশ্চর্য, হৃদয়প্লাবী ঘটনা—কিন্তু কোনো মানুষ তার সমস্ত আয়ুষ্কালে ক-টা সূর্যাস্ত চোখে দ্যাখে, বলো তো? আর দেখলেও বা তার কতটুকু দেখতে পায়? কতক্ষণ দেখতে পারে? গ্যেটে বলেছিলেন, পনেরো মিনিটের বেশি না। হয়তো বাড়িয়েই বলেছিলেন। হয়তো পাঁচ মিনিটেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে অধিকাংশ মানুষ। যা প্রিয়, যা সুন্দর, যা পরম, তার দিকে বেশিক্ষণ মন দিতে পারি না আমারা, তার দিকে নিবিষ্ট হওয়া প্রায় অসম্ভব। ছোটো-ছোটো ইন্দ্রিয়ের দূত ছোটো-ছোটো অভিজ্ঞতা এনে দেয় আমাদের—কতটুকু তাদের দৌড়, কত অল্প গিয়েই হাঁপিয়ে পড়ে তারা, তা কি সবচেয়ে দুঃসাহসী মানুষও উপলব্ধি করে না তারা ভরা আকাশের দিকে অন্ধকারে তাকিয়ে? মন দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে অনেকটা তুমি জানতে পারো তা সত্যি ; কিন্তু তাও তোমার নিজেরই মাপে অনেক, জগতের মাপে কিছুই না। যে-কোনো একটা বিষয় সম্পূর্ণ ক'রে জানতে হ'লে—শুধু তা-ই বা কেন, কোনো একটিমাত্র অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করতে হ'লে মানুষের সমস্ত জীবন যথেষ্ট নয়, গীতা। আর তাছাড়া, ঐ বুদ্ধি ব্যাপারটা অবান্তর, বলতে পারো বাইরেকার কথা ওটা। আসল কথাটা—সেটা কী আমি জানি না ; শুনেছি ঋষিরা জানেন—মেয়েরাও জানে আমার মনে হয়।'

পেয়ালার অবশিষ্ট চা আস্তে-আস্তে শেষ করলো মৌলি, তারপর আবার বললো :

'আর তাই আমরা এই পৃথিবীটাকে—জীবনটাকে ছোটো-ছোটো টুকরো ক'রে ভাগ ক'রে নিই—নিতেই হয়, গীতা, না-নিয়ে কোনো উপায় নেই শেষ পর্যন্ত। কিংবা থাকলেও সে-উপায় ভালো না, তাতে ভালো হয় না, হয়তো শুধু সর্বনাশের লাল বাতি জ্ব'লে ওঠে। হ্যাঁ গীতা, তা-ই ভালো—যার ভাগ্যে যেটুকু পড়লো সেই চিলতেটুকু নিয়ে খুশি হওয়া, তার বেশি সাহস না-করা—শুধু তা-ই নয়, তার বেশি কিছু হ'য়ে উঠতে চাইলে তাকে বাধা দেয়া, ঠেকিয়ে রাখা, এড়িয়ে যাওয়া। কথাটা তোমার ভালো লাগছে না বুঝতে পারছি—এখন লাগবেও না—কিন্তু কোনো-একদিন—সে-দিন খুব দূরেও নয় হয়তো—তুমি ঠিক বুঝবে যে সম্মোহন ভাঙে না শুধু তথ্যের, প্রথার, পরিমিতির, তখন ঐ টুকরোটিকেই সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তোলার শক্তিও তুমি পাবে নিজের মধ্যে। যে-সুন্দর সত্যি পর্যাপ্ত, তৃপ্তিকর—যা শুধু তৃষ্ণা বাড়িয়ে চ'লে যায় না—তাও শুধু ওখানেই আছে। একটু আগে তোমার দিদির কথা জিগেস করছিলে না। না, শিগগির দেখা হয়নি তার সঙ্গে, কিন্তু দেখা হয়েছে। আর তাকে দেখেই আমি বুঝেছিলাম—বুঝেছি—যাকিছু ব'লে-ব'লে এতক্ষণে তোমার ধৈর্যের পুঁজি উজাড় ক'রে এনেছি প্রায়। আমি তাকে সুন্দর দেখেছিলাম ; নিজের ছোট গণ্ডির মধ্যে একান্তে বাঁচতে পারা যে কী-রকম সুন্দর, তা তোমার দিদিকে দেখেই বুঝেছিলাম, গীতা।

'কিন্তু এটা পরের কথা। এর আগে অন্য একটা সময়—অন্য একটা অবস্থা যায় মানুষের। তখন তার মনে হয় যে সমস্ত পৃথিবীটাই তার, কোথাও তার বাধা নেই, একটিমাত্র ক্ষুদ্র জীবনে মহান জীবন বাঁচাবার তার স্পর্ধা হয় তখন। সেটাকে বলতে পারো মনের ছেলেবেলা—ছেলেমানুষি—কিছুতেই যখন তৃপ্তি হয় না, শান্তি হয় না—যা কিছুই হোক মনে হয় আরো কিছু—অন্য কিছু কেন হ'লো না—আর সেই অন্য কিছু ঘটিয়ে তুলতে তার ইচ্ছাই শুধু যথেষ্ট মনে হয়। মধুর বলতে পারো সেই সময়টাকে—সেই প্রথম ঘুমভাঙা ভোরবেলা, যখন আমরা স্বপ্নও দেখেছি আবার স্বপ্নটাকে ও ইচ্ছামতো চালিয়ে নিচ্ছি যেন হঠাৎ-পাওয়া অদ্ভুত কোনো দৈববলে। হ্যাঁ—মধুর হয়তো, কিন্তু সুখের না—অন্তত আমি তাকে সুখের বলবো না—আর তথ্য তাতে কম থাকে ব'লে তার জ্বালাযন্ত্রণার মজুরিও মেলে

না সব সময়। সুখ এসে পৌঁছয় পরে—যখন বেলা বাড়ে, সোনালি আভা মুছে যায়, স্বপ্নের অলস বিছানা ছেড়ে স্বাস্থ্যকর ঠাণ্ডা জলে নাইতে হয় যখন, যখন রান্না চড়ে, আপিশের ঘণ্টা বাজে ঘড়িতে—বেলা বাড়ে। তখন আমরা চিনতে পেরে সুখী হই, প্রামাণ্যকে বুঝতে শিখি—তখন থেকে পলে-পলে সুখী হ'তে শিখি আমরা, যার উপর জীবনে আর শিক্ষা নেই। কেউ-কেউ থাকে কুঁড়ে, তারা দেরী না করে উঠতে পারে না; কেউ-কেউ তাদের দুপুর আলোতেও ভোরের স্বপ্ন বয়ে বেড়ায়—লোকে তাকে পাগল বলে। কিন্তু তুমি, গীতা—তোমার ঐ সুন্দর ক-টি আঙুলেব ফাঁক দিয়ে দিনের ভরপুর অঞ্জলি গ'লে-গ'লে ঝ'রে যাবে—এমন ভয় কল্পনাতেও তুমি স্থান দিয়ো না। তুমিও শিখবে একদিন, মেনে নিয়েই হারিয়ে দিতে পারবে; আর তখন—এই আজকের দিনে যা-কিছু নিয়ে তুমি জড়িয়ে আছো, সব ঠিক উচিত মূল্যই পাবে তখন; এই তোমার কবিতা নিয়ে মধুর খেলা, এই এখানে আমাব কাছে ব'সে-ব'সে কত রকম ভাবনা নিয়ে ছেলেখেলা—'

'কী বললে? খেলা? ছেলেখেলা?'

'হ্যাঁ, গীতা, খেলা। কিন্তু তাই ব'লে অনর্থক নয়; জীবনেরই জন্য তৈবি হওয়াব উপায় এটা—কিন্তু উপায় মাত্র, অস্থায়ীরূপে প্রয়োজনীয়, সে-কথা ভুললে চলবে না। শিশু খেলতে-খেলতেই অভিজ্ঞ হয়, কিন্তু তাই ব'লে কি এমন সময় আসে যখন তার অভিজ্ঞতার সে প্রমাণ চায় জগতের কাছে? তোমার মনের এখনকার ভাব আমি বেশ বুঝতে পারি। তোমার শাড়ির রং কারো চোখে ভালো লাগলে তোমাব মনে হয় তোমাকে ছাপিয়ে শাড়িটাই তার চোখে পড়লো। তোমার কথা শুনে কেউ ভালো বললে তুমি সন্দেহ করো সে-কথা তোমার নিজের নয়। মনে-মনে নিজেকে যে-মূল্য দাও তুমি বাইরের কাছে তা পাচ্ছো না ভেবে দুঃখ পাও। কিংবা হয়তো ভাবো—"এই শাড়ি, কথা—যা আভরণ, বিশেষণ, গুণ—তার বাইরে এমন কিছু নেই আমার মধ্যে, যাতে কোনো আয়োজনের কথাই ওঠে না—যা শুধু আছে ব'লেই মূল্যবান?" কিন্তু আমাদের মধ্যে যে-অংশটা সহজ, —বিনা-সাফাই, বিনা-জবাবদিদিব অন্তরঙ্গ,—যেটা গ'ড়ে তোলা, ঘটিয়ে তোলা নয়,—সেটা কখনোই কোনো মূল্য পায় না যতক্ষণ না কেউ-এসে তার মূল্য দেয়। সে-মূল্য আমরা সকলের কাছে, অনেকের কাছে চাই না, কোনো একজন বিশেষের কাছেই চাই। তোমাকে যে তোমার পূর্ণ মূল্য দেবে, সে-ও একদিন আসবে গীতা।'

'হয়েছে তোমার? শেষ করেছো?' মৌলি চমকে উঠলো আওয়াজ শুনে—ঐ রকম ন্যাকড়া ছেঁড়ার মতো চাপা অথচ কর্কশ আওয়াজ গীতার গলা থেকে বেরোতে পাবে সে ভাবেনি কখনো—আব এ কী আগুন-রং কখন তার মুখে জ্ব'লে উঠলো! গীতা!'—তার দিকে হাত বাড়ালো মৌলি—'কী হযেছে তোমার?' কিন্তু গীতা মাথা নেড়ে উড়িয়ে দিলো ঐ উদ্বিগ্ন প্রশ্ন, তার সামনে শূন্যটাকেই ঠেলে দিলো হাত দিয়ে। 'শেষ করেছো তুমি? আর কিছু তো বলবার নেই তোমার? তাহ'লে শোনো—আমার দু-একটা কথা শোনো এবার। তুমি তো অনেক বললে—জীবনের তত্ত্ব বোঝালে, মেয়েদের বিষয়ে মন্তব্য শোনালে, আমার বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণীও করলে দু-একটা। পণ্ডিত তুমি—চিন্তাশীল সুধীজন—কথা বলার অধিকার আছে তোমার। হ্যাঁ, কথা বলা—তোমার নিজের মনটাকে বাইরে বেশ মনোরম ক'রে ফুটিয়ে তোলা—তা পারো তুমি, সেটাই পেশা তোমার, সেটা তোমার "আসে", বেশ ভালোই আসে সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐটুকুই! শুধু কথা! বোঝো না তুমি কিছুই, জানো না তুমি কিছুই; নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত আছো তুমি সারাক্ষণ, নিজেরই মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছো, তার বাইরে কিছুই তোমার চোখে পড়ে না।' কথাগুলো ঝোঁকে ঝোঁকে বের করলো গীতা, যেন তার গলার উপর তার বশ নেই আর—কখনো হঠাৎ চড়া পরদায় আবার কখনো এত নিচুতে যে প্রায় শোনাই যায় না; আর এই অসম স্বরেরই দৃশ্যমান ছবির মতো তার মুখের রঙেরও বদল হ'লো থেকে থেকে—আগুন থেকে ছাই, পাংশু, পাংশু দুটি ঠোঁট কখনো নড়তে গিয়ে কেঁপে উঠলো, আবার সেই ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে থেকেই গনগনে তেতে উঠলো কখনো। 'না, কিছুই না! আমি নিজের মনে কী ভাবি আর না ভাবি তাও জানো তুমি? না, কিছুই জানো না! একটিমাত্র মানুষকে তুমি চেনো—অন্তত, চিনতে চাও—একটিমাত্র মানুষে

তোমার মন আছে : সে তুমি নিজে। নিজের মনেই অন্যদের তুমি ভাঙো গড়ো—কল্পনার কারিগরি তোমার—তা-ই নিয়ে বিলাস করো ব'সে ব'সে অন্যদের তাতে কিছুই এসে যায় না। অন্যকে দেখতে পাওয়া—মনে-মনে বানানো কেউ নয়, উপন্যাসের চরিত্র কেউ নয়—জ্যান্ত কোনো মানুষকে ঠিক দেখতে পাওয়া—সেই দৃষ্টি যদি থাকতো তোমার—' এখানে হঠাৎ গীতার গলা ভেঙে গেলো—'তাহ'লে আমাকে আজ পরিপাটি যে-সার্মনটি তুমি শোনালে তা নিজের উপরই প্রয়োগ কবার বুদ্ধি কি তোমার হ'তো না? বুদ্ধি—তোমার মতে বাজে জিনিস—তোমার মধ্যে তার অভাব আছে ব'লে গর্ব করো তুমি—আর তাই বোধহয় তুমি যা বলো নিজেই তার মানে বোঝো না, বলতে ভালো লাগে ব'লেই বলো—মুখে তোমার কথা জোগায় তাই শুধু ব'লে যাও। কিন্তু এই একটা কথা আজ শুনে রাখো আমার মুখে—'গীতার চোখের হিরের দুটি ফোঁটা থেকে হঠাৎ যেন লাল ফুলকি ঠিকরে বেরোলো—'যে তোমার ঐ মনোহরণ মাকড়শার জালে কাউকে তুমি বাঁধতে পারবে না শেষ পর্যন্ত, কাউকে তুমি কাছে পাবে না কোনোদিন। অনেক কীর্তি রাখবে তুমি, লোকের মুখে নাম থাকবে তোমার, সভাস্থলে আসন পাবে উঁচুতে—কিন্তু নিজের ঘরে ফিরে এসে বুক শুকিয়ে তিলে-তিলে মরবে তুমি;—তোমার সব আশা, ইচ্ছা, তোমার শরীরের রক্ত মাংস মজ্জা—সব ঐ কথাতেই পর্যবসিত হবে, ঐ তোমার কথার ছায়ালোকে—যার গোলকধাঁধার অলিতে-গলিতে নিজেকেই তুমি হারিয়ে ফেলবে একদিন।'

ব'লে গীতা উঠে দাঁড়ালো ; কোনোদিকে না তাকিয়ে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। মৌলি উঠে জানলার ধারে দাঁড়ালো। বৃষ্টি আর নেই ; মেঘ চুঁইয়ে জ্যোছনা পড়েছে ভিজে মাঠে। এরই মধ্যে ছাতা হাতে বেরিয়ে পড়েছেন সুবোধবাবু—মোটা মানুষটি দুলে-দুলে চলা দেখে মৌলি চিনলো—রোজ সন্ধ্যায় প্রসন্ন সিংহের তাসের আড্ডায় তাঁর যাওয়া চাই। পাশের পুব-দিক-ঢাকা দোতলা বাড়ির রেডিওর গান কানে এলো, একটু শুনলো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ; তারপর জানলা থেকে স'রে এসে বসলো... আরামচেয়ারে আর নয়, লেখার টেবিলেই সোজা হ'য়ে বসলো। টেবিলের উপর না-খোলা দুটো খামের দিকে তাকালো একবার ; পকেট থেকে বের করলো বিদ্যুৎ সেনের চিঠিটা। বেশ লিখেছে কিন্তু—পড়তে-পড়তেই তার জবাবের কয়েকটা লাইন—কয়েকটি ছিপছিপে শ্রবণসুভগ বাক্য—তার মনের উপর ভেসে উঠলো। পড়া শেষ ক'রে ফিরে তাকিয়ে দেখলো মা কেমন উদ্‌ভ্রান্ত মুখে তার চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখে অবাক হ'লো না—মা-কে আশাই করছিলো মনে-মনে।

মা বললেন, 'গীতার কী হয়েছে রে?'

'কিছু হয়েছে নাকি?'

'তুই ওকে কী বলেছিস?'

'অনেক কথাই বলেছি।'

'বারান্দা দিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ আমার চোখে পড়লো। অন্ধকারে ব'সে আছে আমার ঘরে। আলো জ্বেলে দেখি—'

'কাঁদছিলো?' জিগেস করলো মৌলি।

'তুই কেমন মানুষ বল তো!' মা আর-কিছু বললেন না।

'তুমি ওর সঙ্গে কথা বললে?'

'বলবো আর কী—সবই তো বুঝি। এ-রকম ক'রে আর চলতে পারে না, মৌলি।'

'আমিও তা-ই ভাবছিলাম। আমার সংসর্গ থেকে ওকে দূরে সরানো দরকার।'

'মানে?'

'যা বললাম তা-ই। আমার প্রভাব ভালো হচ্ছে না ওর উপর। ওর সুখের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছি আমি।'

'বলছিস কী তুই?' মা চোখ বড়ো ক'রে ছেলের দিকে তাকালেন। 'ওর সুখের অন্তরায় হ'য়ে

দাঁড়িয়েছিস—তুই।'

'দেখছি তো তা-ই এ-রকম কিছু-একটা হবে, অনেকদিন থেকেই ভয় করছিলাম মনে-মনে।'

'তুই কী বলছিস আমি বুঝতে পারছি না, মৌলি। যেটা সবচেয়ে সুখের, যার চাইতে সুখের কিছু আর হ'তে পারে না—ওর মা, বাবা, আমি নিজে—আমরা সবাই এতদিন ধ'রে যা আশা করছি—'

'তোমরা আশা করছো কিন্তু—'

'এর মধ্যে কোনো কিন্তু নেই, মৌলি। যা পাঁচজনে দ্যাখে—রূপ, গুণ বিদ্যেবুদ্ধি—ও-সব ছেড়েই দে, ওর নিজের মন আজ কোন্‌দিকে ছুটেছে তা তো তুই জানিস। এর পরেও কি অন্য কোনো কথা থাকে?'

'অসম্ভব, মা!' মৌলি একটু বিষণ্ণ ক'রে হাসলো।

'কোন্‌টাকে অসম্ভব বলছিস?'

'তোমরা যা ভাবছো তা হবার নয়।'

মা এক পা পিছনে সরলেন, যেন ছেলের মুখ ভালো ক'রে দেখবেন ব'লে। একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, 'ভালো ক'রে ভেবে কথা বল। মানুষের জীবন নিয়ে খেলা চলে না, মৌলি।'

'আমি কোনো খেলা করিনি, মা, মৌলি মিনতির সুরে বললো। 'আমাকে কেন বলছো?'

'কাকে বলবো তবে? সত্যি ক'রে বল, তুই কি ওকে ভালোবাসিস না?'

'ভালোবাসি না? ঐটুকু থেকে দেখছি ওকে—আমাদের গীতা—ওকে ভালোবাসি না?'

'ঐটুকু,' 'আমাদের গীতা'—এই কথাগুলি বেসুরো লাগলো মায়ের কানে। মুখে বললেন, 'ওকে প্রথম যখন দেখেছিলি তুইও তখন "ঐটুকু"ই ছিলি। আজ তোমরা দু-জনেই যথেষ্ট বড়ো হয়েছো।' একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, 'এটাই ঠিক সময় ; আর দেরি করা তোমাদের উচিত হবে না।'

'না, মা, আর দেরি করবো না। আমি চ'লে যাবো এখান থেকে।'

'নিশ্চয়ই—যেখানে তোর ভালো লাগে—যা তোদের ভালো লাগে! বিয়েটা হ'য়ে যাক, তারপর বিলেত যেতে চাস তাই যাবি তোরা। আমি যেমন ক'রে পারি পাঠাবো।'

'থাক, মা,' ক্লান্ত সুরে জবাব দিলো মৌলি, 'এ-সব কথা থাক।'

'বিয়ে যে তুই করবি না তা তো নয়?'

'আমি কি সে-কথা বলেছি?'

'তবে তুই আর গীতা—এর সঙ্গে তুলনা হয় নাকি অন্য কিছুর? এ-রকম বন্ধু, স্বজন, সর্ববিষয়ে ওর মতো সহায়—সারা জীবনে আর কি তুই পাবি ভেবেছিস?'

'কতটা পেলাম, সেই লাভের হিসেব ওঠে কিসে। বিয়েটা কি ব্যবসা?'

'দেয়া-নেয়া নিয়েই তো মানুষের জীবন। তুই বল, আমাকে বুঝিয়ে বল, এতে তোর আপত্তি কোথায়।'

'বলতে পারবো না, মা। বোঝাতে পারবো না। ঠিক—ঠিক ও-রকম ক'রে ওকে আমার লাগেনি কোনোদিন। ওকে আমার ছেলেমানুষ লাগে। ওকে আমার—বোনের মতো লাগে, মা।'

'বোন!' মার শীর্ণ ঠোঁটে বিদ্রূপের ছটা ঝিলিক দিলো। 'ও-সব বাজে কথা মুখে আনিস না মৌলি!' তারপর কাছে এসে, মৌলির চেয়ারের হাতলে এক হাত রেখে বেদনা-ভরা নরম গলায় বললেন, 'আমার কথা শোন। আমার এই একটা কথা রাখ। বাজে কথা ব'লে—বাজে কথা ভেবে—ওর জীবনটা—তুই ব্যর্থ ক'রে দিস না।'

'তুমি জানো না, মা, ওকে বাঁচিয়ে দিলাম। ওর জীবন প্রায় ব্যর্থ হ'তেই চলেছিলো—কিন্তু আর ভয় থাকলো না।'

মা নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকলো ছেলের দিকে। তাঁর নিষ্প্রভ চোখের উপরে-নিচে বয়সের রেখা গভীর দেখালো। একটু পরে বললেন, 'কিন্তু তোর জীবন? তোর নিজের কথা একবার ভাবিস? আমি

আর ক-দিন। আর এখনই আমি কতটুকু করতে পারি তোকে। গীতাকে তোর পাশে দেখলে আমি নিশ্চিন্ত হ'তাম।'

মৌলির একটু অপমান লাগলো কথাটায়। মা তাকে উত্তরাধিকারসূত্রে রেখে যেতে চান গীতার হাতে। তার 'দেখাশোনা করা'র কেউ একজন চাই—নয়তো সে কি বাঁচতে পারে, বেচারা! একটু হেসে বললো, 'আমার জন্য ভেবো না, মা। আমি ঠিক আছি। ঠিক আছে সব।'

'শেষ পর্যন্ত ঠিক থাকলেই হ'লো,' ব'লে মা নিশ্বাস ফেললেন। 'একবার আসবি নাকি ও-ঘরে?'

'থাক। আমি আর গিয়ে কী করবো।'

'গাড়ি আনতে পাঠিয়েছি। তুই যাবি ওর সঙ্গে?'

'রাখুই যাক,' ব'লে মৌলি হাতে তুলে নিলো তার সেদিনের ডাকের অন্যান্য চিঠিপত্র।

মা নিঃশব্দে চ'লে গেলেন। মৌলি তার পাব্লিশারের খাম খুললো। তার শেষ বইটা বিক্রি হচ্ছে না তেমন—ছোটোগল্পের চাহিদা নেই—তবে সে যদি কোনো উপন্যাসে হাত দিয়ে থাকে, কিংবা যদি শিগগির দেয়...মৌলি রেখে দিলো চিঠি, ওটা যেন তার নিজেরই অজান্তে খ'সে পড়লো তার হাত থেকে। চেয়ারে হেলান দিয়ে বাইরে তাকালো, নতুন-জেগে-ওঠা রাত্রির দিকে পাঠিয়ে দিলো চোখ। এতক্ষণে আরো একটু হালকা হয়েছে মেঘ—মৌলি ব'সে-ব'সেই জানলা দিয়ে দেখতে পেলো—একটি তারা, যেন স্বর্গের কোনো বৃষ্টিবিন্দু, জ্বলজ্বল করছে তার চোখের সামনে। চাপা চাঁদের ফ্যাকাশে আলোয় নীল দেখাচ্ছে রাত্রিটাকে, সবুজের আমেজ লাগা ভিজে-ভিজে নীলচে-মতো ; মাঠের মধ্যে তাকালে—যদিও খানিক পরেই রেল-লাইন, রেল-স্টেশন, চিল-কোঠার ত্রিভুজ-তোলা শহর—তবু কেমন শান্তিভরা মস্ত একটা ঝাঁ-ঝাঁ দূরের স্পর্শের মতো মনে হয়। আশ্চর্য বিস্মৃতিপ্রবণ প্রকৃতি, আশ্চর্য তার অম্লান চপলতা। একটু আগেকার হুলুস্থূল—সেই উত্তাল আকাশ—কোথায় গেলো সব?' মৌলি তাকিয়ে দেখলো—দেখলো, লাল দুটো চোখ জ্বেলে এগিয়ে আসছে একটা ঘোড়ার গাড়ি! গাড়োয়ানদের দাঁতে-জিভ-চেপে-বের-করা গাড়ি থামাবার চেনা শব্দে হঠাৎ কেমন মুচড়ে উঠলো তার বুকের মধ্যে। 'এর মানে কি এই হ'লো যে ও আর আসবে না? আর তারপর শুনলো রওনা হবার চাবুকের শিষ—রাখু ব'সে আছে উপরে—টক-টক ঘোড়ার খুর বটগাছের মোড়ের কাছে মিলিয়ে গেলো। না, ঝড়বৃষ্টি সবই হ'য়ে গেলো, কিন্তু বটগাছটা মরতে পারেনি বাজ প'ড়ে—ঐ তো তেমনি দাঁড়িয়ে আছে আবছা জ্যোছনায়, তার লক্ষ পাতা থেকে লক্ষ-লক্ষ জলের ফোঁটা ফোঁটা টপটপ ক'রে ঝ'রে পড়ছে—সারা রাত ধ'রে ঝরবে—মৌলি কানে না-শুনেও মনে-মনে সেই শব্দ শুনলো। এই গাছ কেটে ফেলবে ওরা ; বোবা হবে মাঠ, বিধবা হবে দৃষ্টি, বর্ষার তানপুরোর তার ছিঁড়ে যাবে। একটা নিশ্বাস উঠে এলো মৌলির বুকের ভিতর থেকে। 'আমি—আমিও আর এখানে থাকবো না।'

৩

শীতের শিকল

১

কে আমাকে ছুঁয়ে গেলো আমার স্বপ্নে, হালকাছোঁয়া হাওয়ার মতো স্বপ্নে, পায়রা-পায়ে চলচপল লিবিডোসজল ভোরের স্বপ্নে! কতকাল পরে ফিরে-পাওয়া স্বপ্ন আমার : কে তুমি? এই তো তুমি ছিলে এখানে, আমার পাশে—'পাশে' বললে কিছুই বলা হয় না—মিশে গিয়েছিলে আমার মধ্যে, গ'লে-গ'লে ঝরেছিলে আমার সত্তায়, যেমন শরতের দুটি টুকরো মেঘ পরস্পরে মিশে গিয়ে হঠাৎ কিছু বৃষ্টি ঝরিয়ে ফুরিয়ে যায়। এই তো এইমাত্র। কোথা থেকে নিয়ে এলে ঐ বাহু, অপ্সরীর মতো উজ্জ্বল, রাশি-রাশি ফুলের মতো স্পর্শময়, অথচ যেন স্পর্শহীন, স্পর্শের অতীত—না, আলিঙ্গন তাকে বলা যায় না, কেননা শরীরের কোনো বাধাই যেন নেই আর—আমার ভিতর দিয়ে বেপথুমান ব'য়ে গেলে তুমি, আমি তোমাকে স্বপ্নের মতো শুষে নিলাম সেই আশ্চর্য-সহজ পূর্ণমিলনে, কোনো বাসরশয্যায় কখনো যা সম্ভব নয়। আবার অমনি ক'রেই ফাঁকি দিলে আমাকে, লোকোত্তরা ক্ষণিকা আমার, স্বর্গমর্ত্যের অসম্ভব সেতুবন্ধ মুহূর্তের বেশি দাঁড়ালে না;—যে-মুহূর্তে আমি তোমাকে জানালাম সে-মুহূর্তেই তোমার শেষ হ'লো। আর এখন—এখনো—আমাকে ঘিরে আছে সেই সৌরভ, নিশ্বাস, শীতের ভোবে ঘুম-ভাঙা বিছানার কনকনে উষ্ণতার আবেশে ফেলে গেলে শুধু চ'লে যাওয়ার নিশ্বাসটুকু তোমার। নিষ্ঠুর তুমি, সকরুণ তুমি। স্পর্শে ধরা দিলে না—নাকি সইতে পারলে না স্পর্শ—স্থূল সেই যোগসূত্র দেহীদের!—কিন্তু আমার চোখ, আমার চোখের লক্ষ্য এড়াতে তুমি পারলে না, আমার দৃষ্টি তোমাকে ধ'রে ফেললো, মোহিনী! না কি তুমি—তুমিই আমাকে ধ'রে ফেলেছিলে, ধ'রে রেখেছিলে অন্তহীন, মায়াবী একটি মুহূর্ত ভ'রে—না কি তুমিই আমাকে খুঁজতে এসেছিলে অচেতনেব বীজাণুব্যাকুল অন্ধকারে, খুঁজে বের করেছিলে আমাকে—স্বপ্নের সুড়ঙ্গ-পথে নেমে এসেছিলে, বাসনার হাজার সিঁড়ি উঠে এসেছিলে—আমারই সঙ্গে দেখা হবে ব'লে' স্পষ্ট দেখলাম তোমাকে। যেমন সিনেমার পবদা কালো হ'য়ে গিয়ে তখনই আবার আলো হ'য়ে ওঠে—না, সে-রকম নয়; যেমন যবনিকা স'বে যায় ঢেউয়ের মতো দুই দিকে, আর পদ্মের মতো ফুটে ওঠে নটী—না, সে-রকমও নয়,—ঠিক বলতে পারবো না কী-রকম—মনে হ'লো আমার ঘুম ছিঁড়ে গেলো, ভাঁজে-ভাঁজে ঝ'রে পডলো, ভিতব থেকে বেরিয়ে এলো—যেন কালো রঙের পটভূমির উপর সম্পূর্ণ ক'রে আঁকা একটি মুখ। আর তখন আমি বুঝলাম, জানলাম—আমার স্বপ্নের আধেয়বস্তু কী, আমার ঘুমের কৌটায় কোন কৌস্তুভ লুকোনো আছে। মুখটি স্থির থাকলো আমার সামনে—বতিচেলি-মুখ, পাণ্ডুর, বিষণ্ণ, অথচ পবিষ্কার দুটি কালো ভুরুতে কৌতুকের ইঙ্গিত যেন, অথচ পুষ্ট দুটি সরস ঠোঁটে একটু যেন প্রলোভনের আভাস! চোখে চোখে রাখলাম : গম্বুজের মতো খোঁপা নেড়ে হাসলো সে, তার চোখের তারা হিরের মতো জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো। কে তুমি?

অন্ধকারে শব্দ শুনলো মৌলিনাথ। একটু পরে আলো জ্ব'লে উঠলো, তার শিয়রে রাখা টেবিল-ল্যাম্পের সীমিত আলো ফুটিয়ে তুললো এক চিলতে দেয়াল, জানলার ধুলো-পড়া কাচ, পাতার ফাঁকে পোস্টকার্ড-গোঁজা বই, দিশি নেটের মশারির একটা অংশ। ঝলক দিলো চায়ের বাসনে।

'বাবু!'

অস্ফুট আওয়াজ ক'রে মৌলিনাথ জানিয়ে দিলো তার ঘুম ভেঙেছে।

'চা দিলাম।' ব'লে আগন্তুক—ঠিক আগন্তুক নয়, মৌলিনাথের পরিচারক সে—ছিটের শার্ট গায়ে ছিপছিপে মানুষটি—শিয়রের দিকে স'রে এলো। আধো আলোয় আবছা দেখা গেলো—ঠিক দেখা গেলো বললে ভুল হয়, কেননা, আলো তাব মুখে পড়েনি, তাছাড়া মশারির তলায় আধো চোখ বুজে শুয়ে কতটুকুই বা দেখতে পাওয়া সম্ভব—না, মৌলি ঠিক চোখ দিয়ে দেখলো না, কিন্তু শুয়ে-শুয়ে মনে-মনেই দেখলো তার সেবকের অভ্যস্ত মুখ—হলদে-ঘেরা রঙের উপব লালচে দুটি মদির ভাবের চোখ বসানো—এই ভোরবেলায় আরো বেশি লালচে দেখায়—পাৎলা সরু বিনয়ী গোঁফ ঠোঁট ছাড়িয়ে একটুখানি ঝুলে আছে। সেই গোঁফের বিষণ্ণ প্রান্তটুকুও দেখতে পেলো মৌলি, দেখতে পেলো মনে-মনে, মনের চোখে, তার রাতশেষের ঘুম-ভাঙা উষ্ণতায় শিথিলস্নায়ু শুয়ে-শুয়ে।—এরই মধ্যে অন্য ছবি! এরই মধ্যে, এই মুহূর্তমাত্রেব ব্যবধানেই অন্য ছবি ভেসে উঠেছে তার স্বপ্ন পেরিয়ে; তার কতকাল পর ফিরেপাওয়া রত্নটিকে এখনই এসে ঢেকে দিচ্ছে প্রতিদিনের প্রতিবিম্ব, উপস্থিতের অভিজ্ঞান, মৃদু, বৈধ, বিশ্বাসযোগ্য চিত্ররূপ!

মৌলি একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে বললো, 'ঠিক আছে, প্রদীপ।'

প্রদীপ—কুলপ্রদীপ তার নাম—মশারির সামনের দিকটা তুলে দিয়ে চ'লে গেলো। মৌলি লেপের তলায় পাযে পা ঘষলো—যেন আবার একা হবার আরামটুকুর প্রমাণস্বরূপ—তারপর পাশ ফিরলো বিছানায়। দেয়ালের দিকে ফিরলো সে, আলোর উল্টোদিকে—সেদিকে মশারিটাও ফেলা আছে এখনো—যেন এই ছায়াচ্ছন্নতায়, আর দেয়ালের আর মশারির আশ্রয়ে, একটু বেশি নির্বিঘ্ন হবে তার স্বপ্ন, একটু কম আক্রমণীয় হবে। হাঁটু মুড়ে শুলো, একটি হাত রাখলো হাঁটুর ফাঁকে, অন্যটি গালের তলায়; চোখ বুজে, অপেক্ষমাণ তপ্ত পানীয় উপেক্ষা ক'রে, যেন নতুন ক'বে ঘুমিয়ে পড়ার আয়োজন করলো।

কিন্তু না, স্বপ্ন আর ফিরবে না, তার স্মৃতিও মিলিযে গেলো এতক্ষণে—না কি জমা হ'লো অচেতনের সেই মঞ্জুষায়, যার সম্পদ সুদে খাটিয়েই সমস্ত কিছু ক'রে যাই আমরা, কিন্তু যার চাবি নিজেদের হাতে নেই আমাদের? তাই তো বিদায় বলবো না! আছো তুমি, থাকো তুমি, জানি তোমাকে হারাতে পারি না কোনোদিন। রেশ দাও, আরো একটু রেশ দাও, তোমার ফেলে যাওয়া নিশ্বাসে লীন ক'রে দাও আমাকে ঘুমের কোমলতম প্রান্তটুকুতে অবশ ক'রে দাও। সেই ঘুম ভেঙে ঘুমিয়ে থাকার স্বরাজ, স্বপ্নের উপর ইচ্ছার যেন প্রভুত্ব, স্বপ্নের নীল জল থেকে সেই অধৈর্যহীন, মদির উঠে আসা! ধীরে ধীরে : লম্বা দিন সামনে প'ড়ে আছে, এটুকু আর কতটুকু সময়। তার ছেলেবেলায়—যৌবনে—এই ঘুম ভাঙার মুহূর্ত ক-টি নিয়ে স্বেচ্ছাচারী কত খেলাই খেলেছে সে। কত প্রিয় নামে ডেকেছে একে, একে বলেছে শুভক্ষণ, কবিতার জন্মক্ষণ, প্রেরণার দৈব লগ্ন, যখন মানুষ—ঘুম আর জাগরণের সীমান্তরেখায় স্পন্দমান কোনো সত্তা—হঠাৎ কখনো বুদ্ধি ছাড়িয়ে বিবেক পেরিয়ে চ'লে যায়, ফিরে পায় মুহূর্তের জন্য তার আদিম বোধি, যখন সাধারণ মানুষও বোধিসত্ত্ব হয় মুহূর্তের জন্য! হ্যাঁ, ছিলো তখন, এ-বিষযে বিশেষ একটু প্রতিভাই ছিলো তার, সোনালি-নরম অলস হয়ে ঘুমের উপর ভেসে থাকার। সেই একটি শক্তি সে হারিয়েছে, সেই একটি অভিজ্ঞতা চ'লে গেছে তার পরিধির বাইরে। তাহ'লে—মৌলি শোবার ভঙ্গি বদল করলো, মাথাব নিচে দু-হাত রেখে টান করলো শরীরটাকে।

না, ও-রকম আব পারে না এখন, আধো-ঘুমের আবেশে আর মগ্ন হ'তে পারে না। তার ঘুম আর জাগরণের মধ্যে ব্যবধান খুব ক'মে গেছে আজকাল—বলতে গেলে কিছুই নেই—যে-মুহূর্তে তার ঘুম ভাঙলো সে-মুহূর্তে সে পূর্ণ সজাগ। যে মুহূর্তে তাব ঘুম ভাঙলো সে-মুহূর্তেই—হ্যাঁ, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চলতে শুরু করে চাকা—মগজের কলকব্জা তার ভাবতে শুরু করে আগের দিন যেখানে থেমেছিলো ঠিক সেখান থেকেই, যেন মাঝখানে ঘুমের বিরতি ঘটেইনি। ভাবে—তার কাজের কথাই ভাবে অবশ্য; যে-সব এখন হাতে আছে আর অন্য যে-সব মনের মধ্যেই আছে এখনো; ভাবে শব্দ, শব্দযোজনা, বাক্য, বাক্যাংশ; ভাবে ছন্দ, রূপ, রূপকল্প; ভাবে ঘটনা, চরিত্র, অনুভূতি—অনুভূতি প্রকাশ করতে হ'লে তারও বিষয়ে ভাবতে হয়—আব কখনো-কখনো এমন কিছুও ভাবে নিজেই যার নাম

জানে না। এই ভাবেই ভোর হয় তার রাত্রি, আরম্ভ হয় তার দিন—ঠিক সুখে নয়, আরামে নয়, যেন কিসের অনিশ্চয়তায়; ভাষার সঙ্গে ভাবনার এই বিরতিহীন অসম যুদ্ধে সেদিন ঠিক ল'ড়ে উঠতে পারবে কিনা, যেন তারই অনিশ্চয়তায়। আজও তার ব্যতিক্রম হ'লো না।

আবার পাশ ফিরলো মৌলি, স্পষ্ট ক'রে চোখ মেললো। আলোর দিকে এবার, দিনের দিকে, দিনের ভূমিকাস্বরূপ প্রথম পেয়ালা চায়ের দিকে। বালিশে কনুই রেখে অর্ধেক উঠে ব'সে চা ঢাললো; ক্রুশেন সল্টটা বেশি ক'রেই নিলো একটু। হ্যাঁ, এবারেও ঠিক জানান দিয়েছে, শীতের প্রথম সাড়া পেয়েই তার আঙুলে—ডান হাতের অনামিকায় ছোট্ট একটু বাতের ছোঁয়া—বেশ সম্ভ্রান্ত গোছের ব্যাপার, একটু গর্ব ক'রেই বলার মতো—কিন্তু ভাগ্যে ও-আঙুলটা লেখার সময় কাজে লাগে না। শুয়ে-শুয়েই চুমুক দিলো চায়ে, পেয়ালাটি শেষ হওয়ামাত্র বিছানা ছেড়ে নামলো।

অন্ধকার কাটেনি তখনো। টেবল-ল্যাম্পের সংকীর্ণ সীমার বাইরে প'ড়ে আছে অর্ধেক ঘর। আবছা দেখা যাচ্ছে লেখার টেবিল, দেয়াল জুড়ে বইয়ের শেলফ, আলনায় ঝুলন্ত জামাকাপড়। মৌলি স'রে মৌলি স'রে এলো আবছায়ায়, একটু দূরে একটা খোলা জানলাব ধারে দাঁড়ালো। হিম ভোর স্পর্শ করলো তার মুখ; কেঁপে উঠে আলোয়ান তুলে নিলো চেয়ারের পিঠ থেকে, গায়ে জড়িয়ে বসলো তার লেখার টেবিলে। যেন স্থায়ীভাবে বসলো—তার নিজেরই তা-ই মনে হলো—কিন্তু ওটা অবশ্য ভান, কিংবা অভ্যাস—বলা যেতে পারে রিফ্লেক্স—ঐ টেবিলটার সামনে বসলেই তার এমন ভাব হ'য়ে যায় যেন শিগগির আর উঠবে না। আসলে অবশ্য উঠতে হবে একটু পরেই—কেননা নিত্যকর্মের পারম্পর্য আছে, আছে বাথরুমের বিবিধ প্রাথমিক অনুষ্ঠান। ও-সব—ও-সব বেশ ভালোই লাগে মৌলিব, ভাবতেও ভালো লাগে। দাঁত মাজা, দাড়ি কামানো, স্নান,—ও-সবে কোথায় একটা অনাড়ম্বর সান্ত্বনা আছে, একটুও পরিশ্রম না-ক'রে প্রয়োজনীয় কিছু ক'রে ওঠার আবাম অন্তত একবাব ক'বে পাওয়াই যায় দিনের মধ্যে। কিন্তু তারও একটু দেরি আছে আপাতত। আলো ফুটুক।

একটি সিগারেট ধরালো, জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো। এ-জানলাটা খুলে শোয রাত্রে—বিছানা থেকে দূরে এটা—ঘরের মধ্যিখানটা জুড়ে আছে তার লেখার টেবিল—কাগজ থেকে মাঝে-মাঝে চোখ তুলে এই জানলা দিয়ে দেখতে পায় একটা দেঁতো দেয়াল, সিনেমার পস্টার-মারা ডাস্টবিন, আর—এই 'অন্ধ' গলিটা নেহাৎই এখানে শেষ হয়েছে ব'লে—এক টুকরো পোড়ো জমিতে কয়েক কুচি দুর্বল কিন্তু দুর্দমনীয় ঘাস। আপাতত অবশ্য অন্য ছবি, রাত্রির যবনিকা ওঠেনি এখনো; এখন দেখা যাচ্ছে—প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না বাইরে, শুধু ঐ গ্যাসের বাতিটা কুয়াশা-মোড়া ভাবপ্রবণ চেহারা ক'রে ঠিক জানলার বাইরে জ্বলছে। পুবের জানলা এটা;—কিন্তু 'পুব' কথাটার সত্যি কোনো অর্থ নেই এখানে, ওটা বলতে হয় ব'লেই বলা, বুদ্ধির একটা সংস্কার মাত্র, বলা যেতে পারে বিশুদ্ধ একটা ধারণা—কেননা এখানে, এই বাগবাজারে গলির মধ্যে একতলায়, 'পুব' 'পশ্চিম' ইত্যাদির সব সংজ্ঞা যেন হারিযে যায়, কোনোটারই স্বাতন্ত্র্য ঠিক বোঝা যায় না; যে-কোনো ঋতুতে, এবং দিনের প্রায় যে-কোনো সময়ে, সব ক-টা দিকই এক ব'লে মনে হয়। তবু—ভাষার ঐ প্রথাটুকুরও মূল্য আছে; অন্তত ভাবতে ভালো লাগে যে এটাই পুব দিক এবং এ-দিকেই সূর্য ওঠে।

ঐ তো কেঁপে উঠলো পরদা। বদল হচ্ছে দৃশ্যের, বেরিয়ে আসছে আশে-পাশেব দুটো-তিনটে বাড়ি—তার বেশি আর চোখ চলে না—আলো জ্বলছে কোথাও কোনো রান্নাঘবে, উনুন ধরানো ধোঁয়াব গন্ধ এখানে ব'সেও পাওয়া যায়। আ, গন্ধ! ধোঁয়ার গন্ধ, ধুলোর গন্ধ, ভিস্তির জলের গন্ধ ; একটু ভিজে, একটু পচা, একটু দম-আটকানো, কিন্তু মোটের উপর মিষ্টি এবং আদরে ভরা গন্ধ এই ভোরবেলাব! সোঁদামিঠে আঁধার গন্ধ বাগবাজারের! দশ বছর ধ'রে নিশ্বাসে নিচ্ছে এই গন্ধ, রোজই তবু চমক লাগে। মনে হয় ওটা অদ্ভুত, অচেনা, বৈদেশিক; মনে প'ড়ে যায় এখানকার সে স্থানীয় নয়, এতদিনের বসবাসেও মেলাতে পারেনি নিজেকে তার পরিবেশের সঙ্গে। মেলাবার কথাই অবশ্য ওঠে না—আর ওঠে না ব'লেই এর মূল্য। এই দশ বছরের মধ্যে কতবার ভেবেছে বাসা-বদলের কথা—বন্ধুরাও তা-ই পরামর্শ দিয়েছে—শহরের দক্ষিণ পাড়ায় কোথাও, ছোট্ট ছিমছাম আধুনিক ফ্ল্যাটে—যেখানে আছে বাবান্দা,

বাথরুমে ঝর্না, আছে—এমনকি—ফুটপাতে গাছের সারি, এবং একটু মাত্র দূরে গেলেই রীতিমতো জোনাক-জ্বলা ঝোপঝাড়। ভেবেছে, কিন্তু হ'য়ে ওঠেনি—না কি তেমন ক'রে ভাবেইনি কখনো, না কি সত্যি কখনো যেতেই চায়নি এই একতলার ঘর, কলকাতায় তার প্রথম এই বাসা ছেড়ে? এর কারণ কি জাড্য—ইনার্শিয়া—আমরা যাকে বুদ্ধির বিরোধী ভেবে নিন্দে ক'রে থাকি অনেক সময়, কিন্তু আসলে যেটা প্রাণশক্তি ছাড়া কিছুই না, প্রাণশক্তি, লাইফ-ফোর্স—সেই আশ্চর্য অবিরোধী শক্তি, যার প্রভাবে দিনের পর দিন বেঁচে থাকার প্রেরণা পাই আমরা? শুধু তা-ই? না, এতে তার চেতন মনের কথাও আছে; এটা তার সুচিন্তিত নির্বাচন। কলকাতায় প্রথম এসে ইচ্ছে ক'রেই সে বাসা নিয়েছিলো এখানে—দেখে পছন্দ করেছিলো; এর ভিন্নতা, এর চরিত্র, এর প্রতিতুলনার সৌষ্ঠব দেখেই পছন্দ করেছিলো। আর তারপর থেকে এই বাগবাজারকেই সে ভালোবেসেছে—হ্যাঁ, এও একরকম ভালোবাসা—সেটা তার সমস্ত সাহিত্যিক-মানবিক শিক্ষাদীক্ষার পরিপন্থী ব'লেই।

সে—জীবনের অনেকগুলি বছর যে যত্নলালিত প্রশ্রয়ের মধ্যে কাটিয়েছে, আবাল্য যার পরিবেশ ছিলো বলতে গেলে তারই ইচ্ছার ছায়ামাত্র, অথচ লেখা প'ড়ে যাকে বিপ্লবীও ভেবেছে কেউ-কেউ—এই বিরুদ্ধ শক্তির প্রয়োজন সে নিত্যই অনুভব করে আজকাল। অবশ্য বিরুদ্ধতার অভাব নেই জীবনে—আর তার জন্য বেশি দূরেও যেতে হয় না—এই শরীরটাই তো শত্রুতা করে মনের, কত অপমান ক'রে যায় তাকে কত সময়! তবু জীবনের এই সব অসংগতি, অসামঞ্জস্য, বেঁচে থাকা নামক কর্মটির এই মৌলিক স্বতোবিরোধ—এর একটা বাইরের চেহারা—কিছু-বাস্তব-কিছু-কাল্পনিক চেহারা—দেখতে পেলে তো ভালোই লাগে। ভালোই—এ-ই তার ভালো লাগে, এই খাস কলকাতা, খাঁটি কলকাতা, যেখানে কিছুরই সঙ্গে তার 'মিল' নেই, কিছুই তাকে 'খুশি' করে না, সবই তার নিজেরই মধ্যে তাকে ফিরিয়ে আনে। যা-কিছু এখানকার স্থানীয় এবং বিশিষ্ট ছাড়া কিছুই প্রায় নেই এখানে—কলকাতার 'বাবু' নামক সেই বিখ্যাত এবং বিলীয়মান প্রতিষ্ঠান; গাঙ্গেয়ভূমির পরিপুষ্ট গৌরবর্ণ ধীরগামিনী তীক্ষ্ণভাষিণী ললনাকুল, ধারালো, কাটাছাঁটা, মুড়কির মতো মুড়মুড়ে এখানকার বাচনভঙ্গি, গলি, ঘেঁষাঘেঁষি, সবুজের অভাব; অধিবাসীদের প্রথাবদ্ধ, অবিচলিত জীবনযাত্রা, জীবনের গতানুগতি, লৌকিকতা, স্থায়িত্ববোধ;—এই সব-কিছুরই মধ্যে সে দেখতে পায়, শুধু অন্য এক ভূগোল নয়, অন্য এক ঐতিহ্য—যেন দেখতে পায় তার বিপরীতের চিত্ররূপ। এই বৈপরীত্যটাই পছন্দ করে সে—মানে, সম্মান করে, 'বোঝে,' সেটা উত্তেজনার মতো কাজ করে তার মনে, আবার এই রক্ষণশীল চরিত্রবলেই কোথায় যেন আশ্রয়ও দেয় মৌলিনাথকে। এর কাছে বালিগঞ্জ? মৃদু, মোলায়েম, অবিশেষ, চাটুকারী, শৌখিন এবং পল্লবশোভন বালিগঞ্জ? প্রোফেসর, সাহিত্যিক, আর অবাঙালির উদার ক্ষেত্র, আধুনিকতার—অর্বাচীনতার—পীঠস্থান, পূর্ববঙ্গীয় উপপ্লবের বিবর্ধমান বিজয়গড়? যেখানে সে 'আরামে' থাকতো, গৃহীত হ'তো, গণ্য হ'তো 'তাদেরই একজন' ব'লে, যেখানে—এমনকি—হয়তো মেনে নিতেও সে শিখতো এতদিনে? না! তার চেয়ে এই ভালো—এই বাগবাজার, এই বনেদি, পুরোনো, ঘুণ-ধরা, ঐতিহাসিক, ইতিহাসবিরোধী, হুতোম প্যাঁচার খোঁয়ারিধূসর এই বাগবাজার।

—কিন্তু কী এসে যায়? কোথায় আছে সে, কোথায় তার শারীরিক অবস্থান, মানচিত্রের কোন ক্ষুদ্র বিন্দুটিতে সে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে—কী এসে যায় তাতে? যেখানেই থাক, সে তো সে-ই থাকবে; যে-কোনো শহরে, যে-কোনো পাড়ায়, যে-কোনো দেশে, শেষ পর্যন্ত একটিমাত্র ঘরেই তো তার প্রয়োজন। এই ঘর, মৌলি চারদিকে তাকালো একবার—প্রথম ধূসর ভোরের আলোয় ফুটে উঠছে আস্তে-আস্তে—টেবিলের পাশে আরামচেয়ার, দেয়ালে ঝোলানো গোল আয়না, বাথরুমের দরজার পাশে টুলে বসানো জলের কুঁজো, আর তার পাশে ছোটো একটা দাগ-ধরা চৌকী টেবিল, যেটা নানারকম ব্যবহারেই লাগে তার—এই ঘর তার দশ বছরের বাড়ি, 'বাড়ি' বলতে যতটা বোঝায়—যতটা বাড়ি কোনো মানুষেরই থাকে আজকাল, কিংবা যতটা বাড়িতে যে-কোনো কালেই সত্যি মানুষের অধিকার আছে। বড়ো ঘর—মানে, তার পক্ষে বড়ো, অন্তত যথেষ্ট—এইটিতেই সে শোয়, বসে, কাজ করে—এমন কি খেয়েও নেয় এক-এক সময়; পাশের ছোটো ঘরটি, যেখানে 'ড্রয়িংরুম' সাজানো আছে গোটা কয়েক

বেতের চেয়ারে, সেখানে এমনও হয় যে সপ্তাহে একবারও সে যায় না—কেননা যখন ঝোঁক চাপে সে-ই বেরোয় বাড়ি ছেড়ে আড্ডা দিতে, আর সন্ধেবেলা বন্ধু কেউ এলে তার 'নিজের' ঘরেই চেয়ার টেনে গল্প করে—এমনও হয় যে মাসের মধ্যে একবারও সে পা বাড়ায় না এই ঘরের চারটি দেয়ালের বাইরে। এমনি ক'রে কেটে যায় তার দিন—অন্তত যখন কলকাতায় থাকে সে; যখন কোনো বই শেষ ক'রে, কিংবা শরীর সারাতে, কিম্বা নতুন দৃশ্যের তাগিদে—কিংবা সে-সব কোনো কারণেই নয়—একান্তই অকারণে এবং বিনা প্ররোচনায় যখন সে বেরিয়ে পড়ে না ভ্রমণে, ঘুরে বেড়ায় না হিমালয়ের পাইনবনের আলোছায়ায় কিংবা হোটেলের বারান্দায় ব'সে সমুদ্র দেখে দিন কাটিয়ে দেয় না। কিন্তু ঐ তার ছুটির দিন, ভ্রমণের পাল্লা—বিশ্রাম, বৈচিত্র্য, স্বাস্থ্য—কখন এক সময় মনে হয় যে এদের কাছে অনেক ঋণ জ'মে উঠলো তার, এবার ফিরিয়ে দাও, শোধ করো দ্বিগুণ ক'রে—আর তখন আর দেরি না-ক'রে বাক্স গোছাতে ব'সে যায়—যদিও তখনই হয়তো কালিম্পঙে হেমন্ত এলো পাতাঝরার সোনালি গান হাওয়ায় ছড়িয়ে, কি বৃষ্টি কেটে গিয়ে বেরিয়ে এলো রাশি-রাশি আনন্দের মতো বঙ্গোপসাগর—দেরি না ক'রে ফিরে আসে এই ঘরে, এই তার টেবিলটিতে, যেখানে ব'সে-ব'সে দিনের মধ্যে বারো, চোদ্দ কি ষোলো ঘণ্টাও সে কাটিয়ে দেয় কখনো কখনো, ব'সে থাকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস; ব'সে-ব'সে—লেখে।

'লেখে'—এই কথাটা সহজে বলা হ'য়ে গেলো, শেষ হ'লো যেন এক নিশ্বাসেই, কিন্তু এর মধ্যে অনেক-কিছু প্রচ্ছন্ন আছে, অনেক তথ্য, ইতিহাস, সমস্যা, ব্যবস্থাপনা—বলতে গেলে মৌলিনাথের সমস্ত জীবনটাই ধরা আছে ঐ ছোট্ট কথাটিতে। কেননা এই তার কাজ—লেখাকে সে 'কাজ' বলে সব সময়—এটা সে উপায়হিশেবে ব্যবহার করে না, এটাই তার লক্ষ্য, গন্তব্য, অবিরত আবো দূরে-স'রে-যাওয়া গন্তব্য, তার। অর্থাৎ, দু-চারখানা ভালো বই লিখে 'নাম' ক'রে, সেই নাম সুদে খাটাতে চেষ্টা করেনি সে, তারই জোরে প্রতিষ্ঠা খোঁজেনি জীবনের অন্যান্য বিভাগে। বসতে চায়নি বড়ো দরের দপ্তরে; ডিনারটেবিলে ধনী গৃহিণীর অলংকার ব'লেও গণ্য হ'তে চায়নি। তার লেখার কাছে অন্য কোনো মূল্যই .স ইচ্ছা করেনি; বরং তার নিজের যেটুকু মূল্য সব নিংড়ে দিয়েছে ওখানে। সবই দিয়েছে, কিছুই হাতে রাখেনি। খাদ্য থেকে, ঘুম থেকে, ভ্রমণ থেকে যা-কিছু সে পুষ্টি পায়, সবই এনে দেয় এখানে, প্রয়োগ করে; এখানেই ব্যয় করে তার উদ্যম, উৎসাহ, দৃঢ়তা, ধৈর্য—যা-কিছু মানসিক আর নৈতিক বল প্রকৃতির কাছে পেয়েছে সে। এটা—এই একটু অস্বাভাবিক অবস্থা—এটাকেই সে সম্ভব ক'রে নিয়েছে, এরই ছাঁচে গ'ড়ে নিয়েছে তার জীবন। অন্য কোনো পাওনাদার রাখেনি, অন্য কোনো বশ্যতা মানেনি, সংসারকে স্বীকার করেনি কোথাও। আর তার এই স্বাধীনতা—স্বাবলম্বিতা—একান্তরূপে শুধু 'আমি' হবার ক্ষুরধার স্বাধীনতা তার—এটা বজায় রাখার জন্য কিছু ত্যাগও তাকে করতে হয়েছে, অত্যাচারও সইতে হয়েছে কিছু। এটা বজায় রাখার জন্য তাকে অন্ধকারে নামতে হয়েছে কখনো-কখনো, নামতে হয়েছে শরীরময়ীদের উন্মোচিত পাতালে—যখন তাকে আঁকড়ে ধরেছে অন্ধ শীত—একই সঙ্গে তপ্ত আর তুহিন সেই বেগ—যখন কামের ঝড় ব'য়ে গেছে তার উপর দিয়ে।

চকিতে মৌলির মনে পড়লো তেমনি একটি রাত্রি, একটি মুহূর্ত—একটু হাসি ফুটলো তার ঠোঁটে। কাম! পুষ্পধনু, বসন্তসখা, পঞ্চশর। মহামোহ, মোক্ষ-রিপু মার। কত বিচিত্র তার রূপ এই জগতে! কত আদরের সুরে তাকে ডেকেছে মানুষ, আবার কত ভয়াল ক'রে এঁকেছে। একই সঙ্গে কত কুৎসিত সে, কত সুন্দর; কত স্থূল, কত সূক্ষ্ম; কত আবদ্ধ, কত অসীম। এই চাতুরী, প্রকৃতির তুচ্ছ কৌশল, প্রজননের ক্ষুদ্র, কৃপণ উপায়, শরীরের ক্ষণস্থায়ী এই নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া—এই কি আবার উৎস নয় সেই তেজের, সেই প্রেরণার, যার জোরে নিজের সীমা, দেহের সীমা, এমনকি মৃত্যুর সীমা লঙ্ঘন করে যায় মানুষ, ঝাপট দেয় পাগল পাখায় অমর্ত্যের সীমান্তে? শরীরে যার জন্ম তার ইন্দ্রিয়ে কেন তৃপ্তি নেই; কেন সে নিয়ে আসে সুন্দরের ধারণা—সেই আশ্চর্য সৃষ্টি মানুষের—আনে আনন্দ, সেই অজৈব উপার্জন এই জীবনের? মহাকাম ব্যক্তি ছাড়া কেউ কি হ'তে পেরেছে সাধক, শিল্পী, বীর, স্রষ্টা? আর ঐ যাকে মোক্ষ-রিপু বলেছেন প্রাচীনেরা, তা-ই কি আবার মুক্তির পথ, মোক্ষেরই উপায় নয় মানুষের, আর

কোথায় তার অমৃত আছে প্রেমে ছাড়া, আর কিসে মানুষ বাঁচে, বলো তো, যদি-না সে প্রেমে বাঁচে? কাকে বলে কাম? কাকে বলে প্রেম?...পার্থিব, পবিত্র? কিন্তু সত্যি কি ও-দুয়ে কোনো তফাৎ আছে? তেমন কোনো স্পষ্ট একটি মুহূর্ত কি আছে, যখন কামের স্রোত এঁকে-বেঁকে বইতে-বইতে হঠাৎ প্রেমে রূপান্তরিত হয়? না কি একই উৎস, শুধু ক্ষেত্র ভিন্ন, প্রয়োগ ভিন্ন—না কি তাও নয়, না কি একই সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দুটোই, না কি পার্থিবাকে ভালো না-বাসলে অমৃতময়ীর সন্ধান মেলে না?...তার ভোরের স্বপ্নটি একটু ভাবলো মৌলি, যে-লেখাটি হাতে আছে এখন, সে-বিষয়ে একটু চিন্তা করলো। প্রদীপ এলো গরম জল নিয়ে; সেই চৌকো দাগ-ধরা টেবিলটিতে সাজিয়ে দিলো দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম, তারপর বিছানার দিকে স'রে গিয়ে দিনের আলোয় বিবর্ণ-দেখানো টেবিল-ল্যাম্পটি নিবিয়ে দিয়ে শুরু ক'রে দিলো ঘরে গোছাতে। হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মৌলি; দিন আরম্ভ হ'লো।

অন্য যে-কোনো দিনেরই মতো এও একটি দিন; মৌলির জীবনের অন্য সব দিন থেকে আলাদা ক'রে নেবার মতো কিছুই নেই এতে। কিন্তু তার মানে এ-রকম নয় যে তার দিনগুলি সব 'একঘেয়ে', কিংবা একটা আর-একটার পুনরাবৃত্তি শুধু; যে-রকম দিন অভ্যাসে কাটিয়ে দেয় মানুষ, কেমন ক'রে কেটে যায় সে বোঝে না; কিংবা যে-রকম দিনের মসৃণ ঢালুর উপর দিয়ে ব্যস্ততার দ্রুত চাকায় গড়িয়ে চ'লে যায়—সে-রকম দিন মৌলিনাথকে মঞ্জুর করেননি তাঁর ভাগ্যবিধাতা। যদিও একই ছাঁচ, একই গড়ন, বাইরের চেহারা যদিও একই, তবু প্রতিটি দিনের অভিজ্ঞতা তার নতুন লাগে, নতুন যাত্রার মতো মনে হয়—যেন বেরোতে হচ্ছে অজানার আবিষ্কারে, যেন প্রত্যেক বার প্রথম থেকে শুরু করতে হচ্ছে আবার। এই রকমই মনে হয় তার—যদিও জেগে উঠে তার মনের ভাবনা আগের দিনের সুতোটি ঠিক খুঁজে পায়—যেন দিনগুলি হাতে হাত ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে পর পর, যেন সুর থামে না কখনো, তার সমস্ত সময়ের অন্তর্লীন সুর—আর তাই তার ঘুম ভাঙার প্রথম ক-টি মুহূর্তের অস্বস্তির সঙ্গে মিশে থাকে প্রতীক্ষার মতো, প্রত্যাশার মতো শিহরণ; তাই বিছানায় শুয়ে আসন্ন ঘটনাগুলির কথা ভাবতে কেমন একটা স্নায়ুতে-টান-পড়া গম্ভীর উৎসাহ সে অনুভব করে—চাঞ্চল্য নয়, ব্যস্ততা নয়, বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে কাজের টুঁটি চেপে ধরার মতো ক্ষিপ্রতা নয়, বরং যেন প্রেমিকের মতো কম্পমান কিন্তু অধৈর্যহীন অবস্থা—যখন মনে হয় সে এখনই আসুক, আবার প্রতীক্ষা করতেও ভালো লাগে, কেননা প্রতীক্ষাটাও প্রেয়সীতেই পরিপূর্ণ। আসল কথা মৌলিনাথের দিন কাটে সচেতনভাবে, নিবিড়ভাবে প্রতি মুহূর্তে বাঁচে সে—প্রায় তীব্রভাবে, যেন হাতের মুঠো শক্ত ক'রে, যেন ধনুকের ছিলা চড়ানোই আছে সব সময়—আর সেই টান যাতে সইতে পারে তাই বাইরে একটি বিরামের ভাবও বজায় রাখতে হয় তাকে। আর এইজন্যই সে 'ব্যস্ত' থাকে না কখনো—কাজ যা-ই করুক আর না-ই করুক—'সময় বাঁচাতে' চায় না, বরং এ-কথা বললে ঠিক হয় যে ব্যস্ত হবার সময় তার নেই। হ্যাঁ, তার সময় কম এই অর্থে যে সময়টাকে অনুভব করতে চায় সে, তাই অনেক সময় 'নষ্ট' তাকে করতেই হয়, দিতে হয় এক ঘণ্টার কাজে দেড় ঘণ্টা;—একটু ধীর, এমনকি একটু দীর্ঘসূত্রী তার ধরন-ধারন;—কিন্তু সতর্ক, কিন্তু প্রস্তুত; দিনটাকে হুশ ক'রে ফশকে বেরিয়ে যেতে সে দেয় না, ঘণ্টাগুলিকে যেন স্পর্শ ক'রে-ক'রে চ'লে যায়।

এই দিনটি, আপাতদৃষ্টিতে অন্য যে-কোনো দিনেরই মতো এই দিন—এটিও তার এমনি ক'রেই কেটেছে এতক্ষণ, অত্বর, অবিরল, ভিতরে-ভিতরে শিহরণময় কিন্তু বাইরে অনুত্তেজিত স্রোতে। সকাল থেকে এ-পর্যন্ত কিছুই উল্লেখযোগ্য ঘটেনি, তার মানে ছন্দ ভাঙেনি কোথাও। তার দাড়ি কামানো হ'তে-হ'তে কুলপ্রদীপ ঘর গুছিয়ে ফেলেছে; ত্রিভুজ হ'য়ে ঝুলে-থাকা কুশ্রী মশারিটাকে লুকিয়ে ফেলেছে তোশকের তলায়, মোটা মণিপুরী সুজনি দিয়ে ঢেকে দিয়েছে বিছানা, যেখানে-সেখানে প'ড়ে-থাকা বইগুলো কুড়িয়ে স্তূপ ক'রে সাজিয়েছে টেবিলে, ঝাঁট দিয়েছে, সাফ করেছে অ্যাশট্রে, মৌলির কাপড়, তোয়ালে হাতের কাছে রেখে বেরিয়ে গেছে লালচে চোখের নত ভঙ্গিতে। স্নান সেরে—এঁদো বাথরুমে

চৌবাচ্চার ঠাণ্ডা জলে স্নান সেরে বেরিয়ে মৌলি দেখেছে তার প্রাতরাশ তৈরি; সেই চৌকো টেবিলটা—যেটাতে দাড়ি কামালো একটু আগে, সেটাতে একটা শাদা-কালো বরফি-আঁকা কাপড় পেতে প্রদীপ সাজিয়ে দিয়েছে তার দ্বিতীয়বারের চা, পাশে রেখেছে খবর-কাগজ—নগরের ভোরের কাকলি, কালিমালিপ্ত বৈতালিক এই কলকাতার। চায়ের সঙ্গে খেয়েছে একটি আধ-সেদ্ধ ডিম, মাখন আর মামলেড মাখিয়ে দু-খানা টোস্ট,—ফাঁকে-ফাঁকে চোখ ফেলেছে খবর-কাগজে—খাওয়া শেষ ক'রে ব'সে গেছে কাজে। আরম্ভ করেছে তার অভ্যেসমতো উল্টো দিক থেকে, অর্থাৎ হালকাগুলো হাতে নিয়েছে আগে। চিঠি কিছু জ'মে ছিলো জবাব দেবার, প্রুফ ছিলো এক তাড়া, পুরোনো একটি প্রবন্ধের কিছু সংশোধন ছিলো;—এইগুলো সেরে নিয়েছে একে-একে। অনেকেই ব'লে থাকেন যে সকালবেলার সতেজ সময়টাই কঠিনতম প্রয়াসের পক্ষে প্রশস্ত, কিন্তু এ-বিষয়ে মৌলিনাথের মতটা একটু অন্য রকম। যেটা একেবারেই নতুন এবং প্রথম কাজ, যেটা রচনা, মৌলিক সৃষ্টি—সেটাকে সে পেছিয়ে দিতে ভালোবাসে, অন্য সব চুকিয়ে দিয়ে তবে তার মুখোমুখি দাঁড়ায়—যেমন সারাদিনের অন্য সব পাওনা মিটিয়ে তবে আসে প্রেয়সীর সঙ্গে মিলনের সময়, কিংবা যেমন বড়ো যুদ্ধে নামার আগে প্র্যাকটিসের মাঠে হাত খেলিয়ে নিতে হয়। আর তাই, এই অভ্যাসের ফলে, এ-সব 'অন্যান্য' নিয়েই কেটে গেছে তার সারা সকাল, ও-সব শেষ হ'তে-হ'তেই দুপুর বেজে গেছে ঘড়িতে। তখন উঠেছে, একটু পাইচারি করেছে ঘরে, কোনো-একটা মাসিক পত্রের পাতা উল্টিয়েছে, তারপর প্রদীপ এনে দিয়েছে তার দুপুরের খাওয়া—ভাত, আলু আর কাঁচাকুমড়ো-সেদ্ধ-ফেলা মুগের ডাল, পালং শাক, ট্যাংরা মাছের চচ্চড়ি, সবশেষে কাঁচা দুটো টম্যাটো। খাওয়ার পরে আবার বসেছে টেবিলে, লেখার প্যাড খুলে কলম হাতে নিয়ে মুখ নিচু করেছে।

এখন দুপুর, ভরা দুপুর, শীতের দিনে দুপুর বলতে যেটুকু বোঝায়। বেলা প্রায় দুটো। সারা পাড়া চুপ; ঘরকন্নার এই বিরামের সময়ে প্রায় অস্বাভাবিক রকম স্তব্ধ হ'য়ে গেছে এই গলি। সকাল ভ'রে নানা রকম শব্দ থাকে; জলের শব্দ, রান্নার শব্দ, বাচ্চাদের চ্যাঁচামেচি, ঝিয়েদের নাটুকে গলা—তখন কোনোটাই ঠিক লক্ষ্য করেনি মৌলি, কিন্তু এখন তাদের অভাবটাকে লক্ষ্য করলো। লক্ষ্য করার কারণ আছে। এই এক ঘণ্টা সে ব'সে আছে এখানে, সামনে প্যাড খোলা, হাতে কলম, তাকিয়ে আছে কাগজটার দিকে—অর্ধেক লেখা পাতা একটা—কয়েকটি আড়িতে বলা সুঠাম গদ্যের বাক্যবন্ধ, যাতে একই সঙ্গে দুটো অর্থের ইঙ্গিত চলেছে, যার রচনাশিল্পের অনুমোদন করতে মৌলিনাথের আপত্তি হয় না। কিন্তু এই অনুমোদনে কোনো সুখও হয় না তার—অন্তত আপাতত হচ্ছে না—কেননা ঐ অংশটুকু তার কালকের লেখা, কাল রাত্রে থেমেছিলো ওখানে; তারপর আজ, এতক্ষণে, এর পরে আরো কিছু যোগ করার তার কথা ছিলো, উচিত ছিলো সেটা, না-হবার কোনো কারণই ছিলো না—কিন্তু হয়নি। এই এক ঘণ্টায় একটি শব্দও লেখেনি সে, কাল যেখানে থেমেছিলো তার পরে কলমের আর একটি আঁচড়ও কাটেনি।

এতে এমনিতে অবাক হবার কিছু নেই। মৌলিনাথ—যে তার যৌবনকালে ব'লে বেড়াতো যে সহজে যা পারে না তা সে পারেই না—এমনকি, যেটা সহজে হয় না সেটা করবারই যোগ্য নয় ব'লে ঘোষণা করেছিলো—সে আজকাল অনায়াসে কিছু ক'রে ওঠার কোনো কল্পনাও স্থান দেয় না মনে। না, কিছুই আর সহজ নেই তার কাছে, কিছুই আর দ্রুত চলে না; ভাবতে সময় লাগে, লিখতে সময় লাগে, মনস্থির করতে সময় লাগে। আর এটা—তার লেখার এই দীর্ঘায়িত ছন্দ, এই 'বিলম্বিত লয়'—এটা তার ভালোই লাগে; ভালোই, যে তার লেখা আর হঠাৎ-হঠাৎ 'পেয়ে বসে' না তাকে, আঁকড়ে ধরে না গলা, যেন বাষ্পের চাপে বুক ফেটে যাবার দশা করে না, 'কী,' 'কেন,' 'কোথায়,' 'কতটুকু,' এই ধরনের সমস্ত প্রশ্ন ভাসিয়ে দেয় না এক দুর্বার ফেনিল খরস্রোতে। না, সে আর 'ভেসে' যায় না আজকাল; এই খেলার নিয়ম-কানুন বদলেছে, সুখের খেলা আর নয়, সরল নয়, নয় দ্বিধাহীন, দায়িত্বহীন, আকস্মিকের চমকও আর নেই; এখন দীর্ঘ জটিল লুকোচুরির পথে সতর্কভাবে চলতে হয় তাকে, পথ হারাতে হয় বার-বার, উপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়, ধৈর্যের সলতেটুকু জ্বালিয়ে রেখে ব'সে থাকতে হয়

অন্ধকারে, যেন কোনো কত দূরের পদধ্বনি শুধু শুনতে হয় ব'সে ব'সে। এটা তার ভালোই লাগে—এটাকে সে উপভোগ করে রীতিমতো ঐসব কঠিন ছলাকলা, তার সঙ্গে তার লেখার একটা গোপন চুক্তি অন্তরচ্ছেদী, অন্তরান্বিত সম্বন্ধসূত্র,—যাতে দ্বিধা অনেক, বাধা অনেক, অথচ সত্যি কোথাও একটু ফাঁক নেই, যাতে কাগজের গায়ে লেখা না পড়লেও মনের কাজ থেমে থাকে না কখনো, চোখ বুজে কথা ধরতে হয়, ঠোঁট নেড়ে ফেলে দিতে হয়—ভালো লাগে এই অভিনিবেশের আস্বাদ, এই ধীর, ক্রমানুগামী আরোহণ, তার রচনার এই মন্থর, কষ্টকর, কিন্তু অবিকল প্রবাহ—না, প্রবাহ বললে ভুল হয়, স্রোত আর বলা যায় না—বলা যাক তার বিন্দু-বিন্দু ক'রে বেরিয়ে আসা এই চিত্তক্ষরণ। সে যা কিছু করে এইভাবেই করে আজকাল; তার 'অন্যান্য' কাজ—প্রুফ দেখা, চিঠি লেখা, নিজের লেখার পরিমার্জনা—কোনোটাকেই 'হালকা' ঠিক বলা যায় না, চিন্তার ছায়া পড়ে সবটাতেই, দায়িত্ববোধ আক্রমণ করে, কলম বেঁকে যায়, হোঁচট খায়, থমকে থাকে। আর লিখতে ব'সে মাঝে-মাঝে খানিকক্ষণ...এমনকি অনেকক্ষণ চুপচাপ ব'সে থাকা—এটাও নতুন নয় তার কাছে, এর সঙ্গে বেশ চেনাশোনা আছে তার—এতে সে অবাক হয় না, ভয় পায় না, এর মধ্যেও আশ্বাস কিছু খুঁজে পায়।

কিন্তু এখন—এই নিঃশব্দ দুপুরবেলায় কলম হাতে ব'সে ব'সে একটু অন্য রকম মনে হচ্ছিলো মৌলিনাথের। মনে হচ্ছিলো ঘরটা বড়ো ঠাণ্ডা, মনে হচ্ছিলো আলো বড়ো কম, কালি বড়ো ফ্যাকাশে—না কি তাতে চশমা নিতে হবে?—মনে হচ্ছিলো গায়ে আলোয়ান জড়িয়ে ঠিকমতো লেখা যায় না কখনো। ও-সব অবশ্য লক্ষণ, উপসর্গ মাত্র; আসল কথাটা—এতক্ষণে নিজের কাছে স্বীকার না-ক'রে উপায় থাকলো না—আসল কথাটা এই যে সে থেমে গেছে—স্রেফ থেমে গেছে—তা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা নেই এর। সুর থেমে গেছে মনেব মধ্যে, কোথাও কোনো স্পন্দন নেই, যেন কোনো নিথব হিম হঠাৎ নেমেছে তার মনের উপব, যেন মৃত্যুর হাত ধ'রে ফেলেছে তাকে—না কি কারো প্রতিহিংসা, না কি অলক্ষ্যে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ক্ষমাহীন কোনো অভিশাপ? প্রথম নয় যে এ-রকম হ'লো তার। না, আর লুকোনো যায় না। মেনে নিতে হয়, বুঝে নিতে হয় ব্যাপাবটা। কী? কী হয় তাব কখনো-কখনো, সম্প্রতি হচ্ছে, এই দু-এক বছরের মধ্যে কয়েকবাবই হ'লো থেকে-থেকে—যখন, কেমন ক'রে জানে না, কারণ কিছু বোঝে না, যেন কোনো নেপথ্যে চলা চক্রান্তের ফলে হঠাৎ রুদ্ধ হ'যে যায় তার সমস্ত কিছু চিন্তার আব অনুভূতির উৎস, যেমন সারা শহর অন্ধকারে ডুবে যায় কোথায় কত দূবে একটিমাত্র সুইচ বন্ধ হ'লে। কথা খোঁজা, বাছাই করা, বিন্যাস, ব্যবস্থাপনা—এ-সবের কোনো কথাই আর থাকে না তখন; ব্যাপারটা—একেবারে নিছক সত্যটাই বলা যাক—ব্যাপারটা এই হয় যে সে কী লিখবে তা-ই আর ভেবে পায় না; শুধু তা-ই নয়, শুধু যে লিখতে পারে না তা নয়, কেন লিখবে, লিখে কী হবে, তাও আর ধারণা করতে পাবে না যেন—এই তার লেখা নামক কর্মটির কোনো অর্থ, কোনো সার্থকতাই খুঁজে পায় না মনের মধ্যে। আর এই রকম সময়ে—হঠাৎ মেরুদণ্ডের ঠাণ্ডা স্রোতে শিউরে উঠে সে জিগেস কবে—নিজেকেই জিগেস করে—যে সে সত্যিই বেঁচে আছে কিনা, না কি শুধু ছায়া হ'য়ে ভেসে আছে এই পৃথিবীতে।

এই রকম সময়ে, সত্যি বলতে, মৌলির সঙ্গে তার নায়কের অবস্থার মিল ধরা পড়ে—আর সেটা—সেই অশুভ সাদৃশ্য—তার নিজের কাছেও গোপন থাকে না। যে-লেখাটা এখন লিখছে, কিছুদিন ধ'রে লিখছে, যার পাণ্ডুলিপি সামনে খুলে ব'সে আছে এতক্ষণে এক ঘণ্টারও কিছু বেশি হ'লো, তাতে যেন নিজেরই মূর্তি দেখতে পেয়ে সন্ত্রস্ত হ'লো মৌলিনাথ। লেখাটা একটা গল্প, গদ্য গল্প—আজকাল গদ্যই বেশি লেখে সে, জীবিকার জন্য লেখে—নিজেরও জন্য লেখে—গদ্যের পরিসবে নিজেরই তার প্রয়োজন আছে মনে হয়। গল্প লেখে;—কিন্তু কোনো একটি গল্প তার বলার আছে বলেই লেখে না, গল্পটাকে উপলক্ষ্য ক'রে অন্য কিছু কথা সে ব'লে নিতে চায়। কোনো একটি ধারণা তার মনে জন্মায়, কোনো একটি চিন্তা বেড়ে ওঠে দিনে-দিনে—সেটিকে সে বের ক'রে আনে, চেহারা দেয়, কাপড় পরায়, সেটিকে সে মূর্ত ক'রে তোলে একটি গল্পে, গদ্য-কাব্যে, কোনো একটি রূপক-কাব্যে নীড় বেঁধে দেয় তার। এখন লিখছে একটি অসুস্থ মানুষের কাহিনী। অসুস্থ, রুগ্ন, কোনো এক দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির কবলে

পড়া একটি আধ বয়সী মানুষ—কেমন ক'রে তার অসুখ সারলো এইটুকু নিয়েই, এতটা নিয়েই—গল্প লিখছে সে। শক্ত অসুখ, মাসের পর মাস সমানে ভুগছে, বছর পেরিয়ে গেলো, ডাক্তারের পর ডাক্তার এসে কত রকম ব্যবস্থা দিলেন—কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না; অসুখটায় সবচেয়ে যা বিশ্রী সেটা এই যে তা বিছানায় শুইয়ে রাখে না, জ্বালাযন্ত্রণাও নেই কিছু; রোগী হেঁটে-চ'লে বেড়াচ্ছে, বাইরে থেকে দেখতে একজন স্বাভাবিক মানুষের মতোই, অল্প-স্বল্প কাজকর্ম্মও করে, মাঝে-মাঝে একটু ভালোও থাকে, এক-এক সময় খুব আশাও হয় যে সেরে উঠছে। কিন্তু এটাই—এই যে হঠাৎ কোনো ওষুধে যেন 'ধ'রে' যায়, কি হাওয়া-বদলে 'উপকার' হয়, ঠিক এটাই সবচেয়ে অন্যায়, বলা যেতে পারে দুর্নৈতিক—যেন তাকে রুগ্ন রাখার জন্যই ধিকিধিকি বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে। বাঁচিয়ে...? হ্যাঁ, অন্তত ডাক্তারি অর্থে সে বেঁচে আছে তা মানতেই হয়। শুধু তা-ই বা কেন, ভালোই আছে। কেউ যখন জিগেস করে সে নিজেও বলে, হ্যাঁ, ভালো আছি। কী বা আর বলা যায় তা ছাড়া? সে কি যকৃতে কোনো কষ্ট পাচ্ছে? না। তার হৃৎপিণ্ড দুর্ব্যবহার করে কোনো রকম? না। ফুশফুশ? ঠিক আছে। ঘুম হয় না রাত্রে? ভালোই হয়। খিদে? আছে। সবই আছে তার; আইনত, কাগজেপত্রে সবই আছে;—কিন্তু আসলে তার কিছুই নেই। তার হৃৎপিণ্ড বিকল, যকৃৎ অসূয়াপন্ন, ফুশফুশ দুষ্ক্রিয়; তার খাওয়া, ঘুম, একটু-একটু কাজকর্ম করা, ভদ্র বেশে ন'ড়ে-চ'ড়ে বেড়ানো—এ-সব মেকি, দেখানোপনা—তাও খুব অক্ষম অভিনয়—অভ্যাসেরও কঙ্কালটুকু শুধু; এ-সবে প্রাণ আসে, স্বাদ আসে, সুখ—অথবা দুঃখ—আসে যেখান থেকে, সেই মূল উৎসই তার শুকিয়ে গেছে। যা-কিছু করে সে, কিছুই তার ভালো লাগে না—তার মানে মন্দও লাগে না ;—ভালো আর মন্দ, সুখ আর দুঃখ, ও দুটো তো একই প্রাণসত্তার এপিঠ আর ওপিঠ ছাড়া কিছু না। না, ভালো-মন্দ কিছুই আর লাগে না তার, মন শূন্যে ঝুলে আছে, স্বত্ব হারিয়েছে, এক ফোঁটা দখল আর নেই কোথাও। যে-বিশ্বাস, জীবনের উপর সহজে ন্যস্ত যে-বিশ্বাসের কথা মুখে কেউ বলে না কখনো, যার কথা জানেও না কেউ, অথচ অলক্ষ্যে যা অনবরত কাজ করে যায়, আর যার ফলে প্রতিদিনের সমস্ত কাজ সজীব হ'য়ে ওঠে—ঘুমের মধ্যে যা বিশ্রাম দেয়, খাদ্যের মধ্যে যা পুষ্টি জোগায়, আলোকে যা উজ্জ্বল করে আর হাওয়াকে যা নিশ্বাসের যোগ্য ক'রে তোলে—জীবনের জীবনস্বরূপ সেই বিশ্বাসটাই চ'লে গেছে তার। অতএব কেমন ক'রে বলা যায় সে বেঁচে আছে? অথচ সে ম'রেও যায়নি, মরবার কোনো লক্ষণও দেখাচ্ছে না, মরবার মতো অসুখও একটা ঘটাতে পারছে না এতদিনেও—যদিও এক বছরের বেশি হ'য়ে গেলো রীতিমতোই অসুস্থ আছে সে। ক্রমে তার সন্দেহ হ'লো—মানে, রোগীর, মৌলিনাথের গল্পের এই নায়কের ক্রমে সন্দেহ হ'লো যে এই অসুখটা তার শরীরের নয়, মনের—ঠিক মনেরও না, আত্মার—হ্যাঁ, আত্মার অসুখ—যদি না ঐ কথাটায় কেউ আপত্তি করেন তাহ'লে এ-ই বোধহয় এর ঠিক বর্ণনা। এখানে গল্পের দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ, আরোগ্যের ইতিহাস এখানে শুরু হ'লো—মানে, হবে—কেননা মৌলি তার রচনায় এখনো এতদূর পর্যন্ত পৌঁছয়নি। এই শেষের অংশটা এখনো ঠিক স্পষ্টও হয়নি তার মনে, তার বিবরণ খুঁজে পায়নি এখনো—তবে মূল কথাটা মনে-মনে জানে সে, অনেক দিন ধ'রেই জেনেছে—ঐ কথাটি ফোটাবার জন্যই পুরো গল্পটা ভেবে নিতে হয়েছে তাকে। কথাটা এই যে রোগী এর পর তুচ্ছ কোনো ঘটনার সূত্রে আশ্চর্য এক আবিষ্কার হঠাৎ ক'রে ফেললো। সে দেখলো যে তার অসুখের কারণ—বললে ঠিক হয় না, দেখলো যে তার অসুখটাই আর-কিছু নয়, শুধু ভালোবাসার অভাব। ভালোবাসা নেই, তাই স্বাস্থ্য নেই; রোগ, ব্যাধি, পীড়া, এই কথাগুলি—স্পষ্ট বুঝলো সে—ভালোবাসার অভাবেরই নামান্তর মাত্র—আর-কিছু নয়, আর-কিছু নয়। কিন্তু অভাব কোথায় তার? বাড়িতে তার আপন জনেরা—তারা কি তাকে ভালোবাসে না? তাদের ভালোবাসার প্রমাণ সে কি দিনে-দিনে নতুন ক'রে পাচ্ছে না তাদের সেবায়, যত্নে, তাকে সারিয়ে তোলার সনির্বন্ধ চেষ্টায়? তবু কেন অসুখ সারে না তার? তবু কেন সে ম'রে আছে? আর এর পরে ভাবতে-ভাবতে আরো একটি আবিষ্কার করলো এই রোগী—একেবারে লাফিয়ে উঠে চীৎকার ক'রে বলার মতো অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার—অন্তত তার নিজের তা-ই মনে হ'লো তখন। ভালোবাসার অভাব বলতে কী বোঝায়, ভালোবাসা বলতে কী বোঝায়, এই

কথা—এই পুরোনো কথা—যেন এই প্রথম বার জানলো সে। সে বুঝলো যে ভালোবাসা পেলে কিছু হয় না, তাতে আনন্দ নেই, তাতে বাঁচে না মানুষ; ভালোবাসতে পারাকেই বলে আনন্দ, বলে স্বাস্থ্য, বলে সার্থকতা। সে বুঝলো যে ভালোবাসতে আর পারে না সে, নিজের মনে বিচার ক'রে বুঝলো যে সত্যি সে কাউকেই এখন ভালোবাসে না—না কি কোনোদিনই বাসেনি, আর তাই কি এই জীবন্মৃত্যুর অভিশাপ পড়েছে তার উপর? এ-কথা যেই বুঝলো সে আর দেরি করলো না; বেরিয়ে পড়লো বাড়ির আরাম, ডাক্তারের সান্ত্বনা ছেড়ে—কিংবা হয়তো তার আপন জনেরাই তাকে পাঠিয়ে দিলো আরো একবার হাওয়া-বদলে, তার পক্ষে নতুন কোনো স্বাস্থ্যকর জনপদে। মনে করা যাক সেখানে, শরতের কোনো সমুদ্রতীরে, কিংবা কোনো উপত্যকার বসন্তকাননে—একদিন একটি মানুষকে সে দেখতে পেলো, একটি মুখ তার চোখে পড়লো একদিন। কিংবা ট্রেনে যেতে-যেতে কোনো-এক অখ্যাত স্টেশনে হঠাৎ একটি মুখ দেখতে পেয়ে তখনই নেমে পড়লো সেখানেই। কার মুখ? হয়তো কোনো বিদেশিনীর, কোনো বিবাহিতা পতিপ্রেমিকার, হয়তো কোনো বালিকার—তার প্রায় কন্যা হ'তে পারতো এমনি একটি কিশোরীর—না কি কোনো গণিকার, বারাঙ্গনার, স্বৈরিণীর, মুখে মদের গন্ধে মাছি বসে—ধরা যাক না তেমনি কোনো বিলোল রূপসীর? কিছু এসে যায় না, কে। এটুকু হ'লেই হয় যে ব্যাপারটা হাস্যকর, অবিশ্বাস্য, অসম্ভব—অন্তত প্রণয়ের বিনিময় অসম্ভব, বিনিময়ের কোনো কথাই ওঠে না এটুকুই এর সার কথা। আর তারপর? তারপর সে—সেই রোগী—দিনের পর দিন কাটাতে লাগলো সেই নতুন শহরে, শুধু একটি মুখ দেখে-দেখে, কোনো একটি মানুষকে শুধু চোখে দেখার জন্য। কাছে গেলো না ছুঁতো ক'রে, আলাপের কোনো চেষ্টাই করলো না—যদিও তার বাধাও ছিলো না তেমন, দুটো-একটা সুযোগও ছিলো, কিন্তু বাইরের দিক থেকে এতটুকুও অগ্রসর হবার কোনো কল্পনাই জাগলো না তার মনে। তাকে দেখবার জন্য সে দাঁড়িয়ে থাকলো রাস্তায়, রোদ্দুরে; তার কাছাকাছি একটু দাঁড়াবার জন্য দোকানে ঢুকে খামকা কিছু জিনিস কিনলো; তার ফেলে-দেয়া কোনো টুকরো কাগজ লুকিয়ে রাখলো বুকের পকেটে, তার নখ কামড়াবার অভ্যেস আছে ব'লে সে—আমাদের রোগী, মৌলিনাথের গল্পের নায়ক—সেও তা-ই করতে লাগলো। তাকে দূর থেকে আসতে দেখলে বুকের মধ্যে ঝড় ওঠে, হাসির আওয়াজ কানে এলে দু-চোখে তার জল আসে আনন্দে, আর কখনো—ক্বচিৎ কখনো যদি এমন হয় যে তারই চোখে তার চোখ প'ড়ে গেলো হঠাৎ, তাহ'লে এই প্রৌঢ় পুরুষের হৃৎপিণ্ড কয়েক মুহূর্ত নড়ে না। এমনি ক'রে-ক'রে আরোগ্য হ'লো তার, এমনি ক'রে সে পূত হ'লো, এমনি ক'রে তার উদ্ধার হ'লো প্রেমে—এমনি ক'রে তার মুক্তি হ'লো। মনে করা যাক সুন্দরী একদিন বেড়াতে গেলেন দলের সঙ্গে হিরণ হ্রদে—সত্তর মাইল দূরে জঙ্গলে—ফিরতে রাত হ'লো, গাড়ি খারাপ হ'লো রাস্তায়, এদিকে আমাদের প্রেমিক—রোগী বললে ভুল হবে এখন—সে দাঁড়িয়ে আছে বিকেল থেকে ফেরার পথে, ওদের বাড়ির সামনের রাস্তায়, গাড়ি থেকে নামার সময় একটুখানি চোখে দেখবে ব'লে। সন্ধ্যা হ'লো, রাত হ'লো; সে নড়লো না, একটু চোখে না-দেখে যেতে পারে না সে, একবার চোখে না-দেখলে ঘুমোতে পারবে না রাত্রে। রাত বাড়লো, ঝড় উঠলো—ঠাণ্ডা ঝড়—আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি; এক ঘণ্টা, দু-ঘণ্টা—কতক্ষণ কোনো হিশেব নেই—স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো সে।...পরের দিন বিছানা ছেড়ে আর উঠতে পারলো না, এতদিনে সত্যি তার অসুখ সারলো, সত্যি অসুখ করলো—এতদিনে শয্যাশায়ী হ'তে পারলো অসুখে। বেশিদিন ভুগলো না এবার;—কিন্তু মরবার আগে জেনে গেলো তার মুক্তি হয়েছে।

এই গল্প এখন লিখছে মৌলিনাথ, এবই নায়কের সঙ্গে নিজের অবস্থার—অন্তত এখনকার 'হারিয়ে-যাওয়া' অবস্থার সাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রে এইমাত্র যেন আতঙ্কে সে কেঁপে উঠলো; এই গল্প লিখতে-লিখতে—লিখতে-ব'সে—হঠাৎ আজ শীতের দুপুরে পক্ষাঘাত নেমেছে তার মনের উপর। গল্পের প্রথম অংশের শেষের দিকে সে আছে এখন, রোগীর হতাশার বর্ণনা দিচ্ছে, তার নাস্তিবোধের গূঢ় তথ্য উদ্‌ঘাটিত করছে একটু-একটু ক'রে;—কেমন ক'রে বিরাট একটা 'না'য়ের মধ্যে সারা বিশ্ব মুছে গেলো তার—সেই ধূসর বিবরণ প্রায় শেষ ক'রে এনেছে মৌলিনাথ। এর পরেই একটি দুটি ক'রে প্রশ্ন জাগবে রোগীর মনে; প্রথমে অবশ্য শরীর বিষয়ে প্রশ্ন—খুব অন্তরঙ্গ বিষয় তার—অনেকদিন ধ'রেই ও ছাড়া

কিছু ভাবতেই পারে না—রোগের সেই চরম দুঃখ, যাতে মানুষ শুধুমাত্র তার শরীরটাতেই পর্যবসিত হয়, তার সঙ্গে এতদিনে বেশ ভালোই চেনাশোনা হয়েছে ত—যদি তার অবশ্য এ-রকম কোনো পরিচয়কে কোনো অর্থেই 'ভালো' বলা সম্ভব হয়। শরীরের সঙ্গে শারীরিক উপায়েই বোঝাপড়া চলে, এ-কথা সে ধ'রেই নিয়েছিলো এতদিন—আর কেনই বা নেবে না—প্রত্যেক প্রকৃতিস্থ মানুষের এটা ধ'রে নেয়াই তো কর্তব্য। খিদে পেলে খাবার, তেষ্টা পেলে জল, অসুখ করলে ডাক্তার—এর উপর আর কথা কী আছে। আর এমন করিৎকর্মা ডাক্তাররা আজকালকার—এমন আশ্চর্যরকম উপায়নিপুণ! তাদের সঙ্গে এতদিনের পরিচয়ে এই রোগী তাদের শ্রদ্ধা করতে শিখেছে, প্রায় ভক্তি করে মনে-মনে, কৃতজ্ঞ বোধ করে ধুরন্ধর বিজ্ঞানের কাছে, বিশ শতকে জন্মেছে ব'লে ভাগ্য মানে তার নিজের। এর আগে জন্মালে কোথায় পেতো সেই মাংসভেদী রশ্মি, কে দেখতো তার শরীরের অভ্যন্তরে—চিরকালের নিষিদ্ধ সেই অন্তঃপুরে তাকিয়ে কে ব'লে দিতো যে ফুশফুশ তার নির্দোষ, কোথায় পেতো এই আশ্চর্য খবর যে তার হৃৎপিণ্ড আকারে একটু বড়ো? একটু বড়ো—তাতে অবশ্য এসে যায় না কিছু, সেটা 'খুঁত' ব'লে গণ্য হয় না কোনোরকমেই, কোনো 'ব্যবস্থা'র কথা ওঠে না এর জন্য—তবু, তার হৃৎপিণ্ড যে একটু বড়ো, তার তুলনায় ছোটো-ছোটো সব হৃৎপিণ্ড নিয়ে যে জীবন কাটাচ্ছে অন্য মানুষেরা—এ-কথা ভাবতেই অবাক লাগে না? অবাক লাগে না, যখন অণুবীক্ষণে ধরা প'ড়ে যায় শরীরের সব কত কৌশলে লুকিয়ে রাখা পাপ—রক্তকণিকার অনাচার, মলমূত্রের ধর্মভ্রষ্টতা, অন্ত্রতন্ত্রের কোনো গোপন অভ্যন্তরে চতুর কোনো বীজাণুডিম্ব? এ কি আশ্চর্য নয় যে সব দেখতে পান ডাক্তারেরা, কোথায় কী হচ্ছে তার মধ্যে সব জানেন, তার 'ভিতরে'র কথা তাঁদের কাছে লুকোনো থাকে না কিছুই। কিছুই না?...এই প্রশ্নটায় ধাক্কা লাগবে রোগীর, এটা খুব ভাবিয়ে দেবে তাকে, আস্তে-আস্তে যেন অন্য একটা দিক থেকে দেখতে পাবে সমস্ত জিনিসটা। তার মনে পড়বে যে ডাক্তারদের কাছে সে বিশদ ক'রেই বলতে চেয়েছে তার অবস্থার কথা—তাঁদের সাহায্য করতেই চেয়েছে—অবশ্য নিজেকেও—ব্যাপারটা সব জানলে তবে তো ঠিক ব্যবস্থা দিতে পারবেন তাঁরা। তাঁদের সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে, পরীক্ষা শেষ হ'য়ে যাবার পরে, সে বলতে গেছে—যথাসম্ভব সহজ ক'রে, এবং ইচ্ছে ক'রেই একটু হালকা সুরে, বলতে গেছে তাকে দেখে যা মনে হয় তার চেয়েও তার অবস্থা অনেক খারাপ : 'ভালো' থাকলেও তার ভালো লাগে না, 'খারাপ' থাকলেও একই রকম লাগে প্রায়; এমন কোনো ব্যবস্থা কি হয় না যাতে তার কিছু একটা লাগবে, মানুষের যে অংশটায় 'লাগে', সেটা সে ফিরে পাবে কেমন ক'রে। অবশ্য এ-রকম ভাষায় বলেনি, তথ্য দিয়ে বলেছে; মুখে হয়তো বলেছে যে অমুক ওষুধটায় কাজ হচ্ছে না তেমন, কিংবা সসংকোচে নিবেদন করেছে যে খেতে ব'সে বড্ড তার ভয় করে পাছে একটু বেশি খাওয়া হ'য়ে যায়। কিন্তু ঐটুকু থেকেই—ঐ 'ভয়' কথাটা থেকেই কি বুঝে নেওয়া উচিত ছিলো না অমন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ডাক্তারদের? তাঁরা অবশ্য সদয়ভাবে শুনেছেন, 'সহানুভূতি' ফুটিয়েছেন মুখে, যাবাব সময় দরাজ হেসে ব'লে গেছেন কিচ্ছু হয়নি আপনার, এই দেখুন না আর এক মাসেই সেরে যাবেন। আবার কেউ-কেউ—পরে সে জানতে পেরেছে—বাড়ির লোকের কাছে ব'লে গেছেন যে ও-সব কিছু না, মেন্টেল। এই সব মনে পড়বে রোগীর, হতাশার শেষ প্রান্তে পৌঁছানো সেই মানুষটির; তখন তার মনে হবে যে তার সত্যিকার অবস্থাটা জানতেই পারেননি ডাক্তাররা, জানবার কোনো চেষ্টাই করেননি কখনও। ও-সব মেন্টেল? কোন্ সব! আর 'মেন্টেল' মানসিক, সেটা কিছু না? মনটা কিছু না? তা'হ'লে এটাই বলতে চেয়েছেন ডাক্তাররা যে অসুখটা তার মনের, তাঁদের বিষয়ের অন্তর্ভূতই নয় আসলে? আগে বললেই হ'তো—সেও তো বুঝে নিতে পারতো আগেই—নয়তো এত সব চিকিৎসারও পরেও সেরে ওঠা তার হচ্ছে না কেন? তবু অন্তত এটুকুই ভালো যে এখন বোঝা গেলো ব্যাপারটা, এই 'মনের অসুখ' নামক নতুন তথ্যটা আরো একটু এগিয়ে দি'লো তার চিন্তাকে। তবে কি তাকে মনোবিকলন করাতে হবে? শরণ নিতে হবে মনস্তত্ত্ববিদের? যাঁরা মনের পাপ টেনে বের করেন, যেমন ডাক্তাররা শরীরের? রোগী লুব্ধ হবে, কিন্তু দেরি করবে। আরো একটু ভাববে, মনের বিষয়ে ভাববে এবার, যেমন এর আগে শরীর নিয়ে ভেবেছে। শুধু মনের অসুখ? না কি আত্মার—ঐ 'আত্মা' কথাটাকে হঠাৎ খুঁজে পাবে এই

রোগী—আর তাতেই যেন অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে একসঙ্গে—তার শরীর-মন সমস্ত মিলিয়ে, সমস্ত ছাড়িয়ে যে-সত্তা, তার মধ্যে যেটা 'সে,' সেই অস্তিত্বেরই অসুখ নয় তো এটা? তার অস্তিত্বের মর্মমূলে কি ঢোকেনি এই ব্যাধি—আর সেখান থেকে কে তা উৎপাটিত করতে পারবে, যদি না সে নিজে পারে? আর এই রকম সময়ে, এই তার দ্বিধায় এবং কম্পমান আশার সময়ে—তখন ঘটবে সেই ছোট্ট ঘটনাটি যাতে সে আলো দেখতে পাবে, যা তার চিন্তাকে ঠেলে নিয়ে যাবে একেবারে অন্য এক দিকে, যখন সে ভাববে—শরীর-মনের কথা আর নয়—যখন ভালোবাসার কথা ভাববে সে, ভালোবাসার বিষয়ে আশ্চর্য সব আবিষ্কার করতে সে আরম্ভ করবে যখন।

সব ভাবা আছে মৌলিনাথের। পর-পর সাজানো আছে তার মনে, কেমন ক'রে ঐ প্রেমতত্ত্বের আবিষ্কার পর্যন্ত পৌঁছাবে, তার প্রত্যেকটি স্তর বিশদভাবে তৈরি আছে। অবশ্য একসঙ্গে বেশি দূর সে দেখতে পায় না, হাৎড়ে পথ চলে, জিনিসটাকে গ'ড়ে তোলে বাক্যের পর বাক্যে, অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদে; আজ যেখান থেকে তার ধরবার কথা সেখানে কোনো বাধাই তার ছিলো না। প্রথম ক-টি বাক্যও সে ভেবে রেখেছিলো কাল ঘুমের আগে, আবার আজ সকালে উঠে ভেবেছিলো—দেখতে পেয়েছিলো দুটি-একটি অনুচ্ছেদের গড়ন। লিখতে বসেছিলো হালকা মনে, অর্থাৎ ভরা মনে, কথাগুলোকে উল্টে-পাল্টে বেছে নিচ্ছিলো আঙুলের মধ্যে কলম ধ'রে। কিন্তু লিখতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলো হঠাৎ। ভুল!...আর তারপর কতবার কত রকম করে ভাবলো সে; একটি বাক্য, শুধু প্রথম বাক্যটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কত রকম ক'রে ভাবলো, আগের ভাবা বাতিল ক'রে নতুন আরম্ভের চেষ্টা করলো কতবার, কিন্তু কিছুতেই.. কিছুতেই ঐ আরম্ভটুকুও সে করতে পারলো না। ভুল, সব ভুল! যা-কিছু সে ভাবে, সব যেন তার স্পর্শমাত্রে ঝ'রে প'ড়ে যায়। যেন ভাবতেই পারে না, জন্মাবার আগেই ম'রে যায় ভাবনাটা, যেন মনের মাটিতে পড়ার আগেই বৃষ্টিবিন্দু উবে যায়—নয়তো জ'মে গিয়ে বরফ হ'য়ে পড়ে। যত কথাই সে মনে আনে কোনোটাকেই ঠিক মুঠোর মধ্যে পায় না, যেন ফশকে যায় কাছে এসে—ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না কোনোটাকেই, সন্দেহ জাগে—শুধু ভিন্ন-ভিন্ন কথাগুলির উপরেই নয়—যা-কিছু সে এখন ভাবছে, বা ভাবতে পারছে না, তারই উপর সন্দেহ নয় শুধু—সমস্ত লেখাটারই উপর, তার নিজের উপর, নিজের সমস্ত অস্তিত্বটারই উপর সন্দেহ জাগে তার।...আর এমনি ক'রেই, এই শূন্যতার মধ্যেই, কাটলো তার এক ঘণ্টা, দু-ঘণ্টা—সামনে প্যাড খুলে কলম হাতে নিশ্চল ব'সে-ব'সে! আড়াইটে বাজলো...প্রায় তিন—বেলা গেলো প্রায়—শীতের বেলা আর কতটুকু!

মৌলির যেন দম আটকে এলো। একটু নড়লো চেয়ারে, মেঝেতে পা ঘষলো, যেন কোনোরকমে নিজের কাছে প্রমাণ করতে চাইলো সে বেঁচে আছে। কলমের মুখ বন্ধ ক'রে হেলান দিলো চেয়ারে, জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো। ইট-বের-করা দেয়ালটায় আড় হ'য়ে রোদ পড়েছে—রোদ!—কত আকাশ ভেসে যাচ্ছে এই পড়ন্ত সোনালি আলোয়। আর তার ঘরে? আলো কম, শীত—বিশ্রী শীত—ঠাণ্ডা, কালো, মৃত—মৃত এই ঘর তার, মৃত সে নিজে—এই ঘরে যা-কিছু আছে কিছুতেই এখন প্রাণ নেই। উত্তুরে হাওয়া ব'য়ে গেলো ঘরেব মধ্যে—কেউ জাগলো না, প্রতিবাদ করলো না, শুধু একটা হিম-কাঁপুনি মৌলিনাথের মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেলো।

*　　　　*　　　　*

মৌলির যখন এই অবস্থা, যখন দু-ঘণ্টা ধ'রে ব'সে-ব'সে একটি অক্ষরও সে বসাতে পারছে না কাগজে, তবু ব'সে আছে অন্ততপক্ষে নিজের কাছেই অভিনয়টা বজায় রাখার জন্য, তখন চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়ে একটি ছোটো কালো গাড়ি মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছে উত্তর দিকে। গাড়িতে ব'সে আছেন একজন ভদ্রমহিলা। সুশ্রী মহিলা, প্রায় সুন্দরী। যারা চলতি পথে চকিতে তাঁকে দেখছে শুধু তাদের চোখেই না, অন্যদের চোখেও। যখন চৌরাস্তায় হাত তুলেছে পুলিশ, আর পাশাপাশি অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে, তখন রাস্তা থেকে, পাশের গাড়ি থেকে, তাঁকে মন দিয়ে দেখেছে কেউ-কেউ, লক্ষ্য করেছে কোনো-কোনো চোখ—যদিও তিনি যুবতী আর নন, কিংবা নন ব'লেই। সেই রকম সুন্দরী

ইনি—হয়তো কারো-কারো মনে হয়েছে—যে-রকম হ'য়ে থাকেন শুধু ভাগ্যবতীরা; যৌবন প্রায় পেরিয়ে এসে, জীবনের সেই দ্বিতীয় বয়ঃসন্ধিতে না পৌঁছলে যে-রকম রূপ কোনো মেয়েরই ফুটতে পারে না। পুষ্ট, তৃপ্ত, পর্যাপ্ত, কোথাও কিছু অভাব নেই—অথচ উচ্ছল নয় তাই ব'লে—সংহত, সংবৃত, নিবিড়, নিজেরই মধ্যে পরিপূর্ণ—এই কথাই লেখা আছে এঁর বসার ভঙ্গিতে, তার চেয়েও স্পষ্ট ক'রে এঁর চোখের ভাবে। হ্যাঁ, চোখ—চঞ্চল না হ'য়েও উন্মন ঐ চোখ—যেন জেগে-জেগে স্বপ্ন দেখছে, যেন বাইরের দৃশ্য সবই দেখছে তবু কিছুই দেখছে না—সেই চোখের দিকে তাকালে আরো মনে হয় যে এই আত্মস্থ মহিলাটি একান্ত কোনো ভাবনায় এখন ডুবে আছেন, অন্য কিছুতেই মন নেই, কথাবার্তায় একেবারেই ইচ্ছে নেই আপাতত।

ইচ্ছে থাকলে অভাব ছিলো কী। বললেই আসতো বিমলেন্দু;—এতটা পথ, শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত, গাড়িতেও সময় বড় কম লাগে না—একজন সঙ্গী হ'লে বরং ভালোই ছিলো তো। নয়তো মিতু—জানতে পেলে মিতুই কি আর না সাজতো সঙ্গে! মিতু—সেও বইপত্র পড়ে আজকাল, বিখ্যাত লেখকদের বিষয়ে কৌতূহল জাগছে তার, আবার মাঝে-মাঝে দেখি তর্কও করে বাপের সঙ্গে। এই সেদিনের মিতু। কখন এত বড়ো হ'লো?...মনে পড়লো চায়ের টেবিলে বাপে মেয়েতে সাহিত্যালাপ—প্রোফেসর বলেন ডেক্যাডেন্ট, বলেন পারভার্ট, পারভার্টেড রোমান্টিক—ঠিকই বলেন বোধহয়, আবার এও বলেন যে মৌলিনাথ আর যা-ই হোক বয়স্কপাঠ্য বই লিখছে বাংলা ভাষায়। হ্যাঁ, বয়স্কপাঠ্য তাতে সন্দেহ কী—সত্যি বোধহয় পড়া উচিত না মিতুর, সত্যি জানি না কী ওতে পায় ও, কিছু বোঝে কিনা—তা পায় হয়তো কিছু—ঐ গম্ভীর লেখা, আস্তে-আস্তে খুলে-যাওয়া চিন্তার সুতো—জটিল—হাঁপ ধরে—কিন্তু শেষ ক'রে উঠে একটা অপার্থিব আনন্দেও মন ভ'রে যায়। কোথায় এলাম?

একটা চৌরাস্তায় থেমেছে গাড়ি, ট্রাম চলেছে পুবে-পশ্চিমে। কী রাস্তা? চোখে পড়লো দোকানের সাইনবোর্ড—হ্যারিসন রোড। হ্যারিসন রোড—আর কি খুব বেশি দূর? না কি খানিক পরেই, আর-একটু পরেই... বাগবাজার, কাঁটাপুকুর, একুশের দুই। হঠাৎ মহিলাটির গালে একটু গাঢ় লাল রং ছড়ালো। অবশ্য গাল দুটি তাঁর স্বভাবতই লাল—দেখে মনে হয় ইনি উত্তরভারতে থাকেন আর খাবার টেবিলে আপেল আঙুরের অভাব হয় না—কিন্তু স্বাস্থ্যের অনপনেয় প্রমাণটুকু ছাপিয়ে উঠলো যেন ভিতর থেকে অন্য কোনো রং, অন্য কোনো অভিজ্ঞান। কিসের? কেন? কী? কী হয়েছে আমার? এ-রকম লাগছে কেন? অপার্থিব আনন্দ—সে কি শুধু বই থেকেই পাওয়া যায়, সে কি আমাদের জীবনেও নেই, জীবনের সব আনন্দই কি অপার্থিব নয়, অকারণ নয়, একেবারেই অর্থহীন নয়? এই-যে আমি চলেছি, চলেছি একজন—একজন পুরোনো বন্ধুকে বোনের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করতে—এই যাওয়াটুকু যে এমনতর স্বতন্ত্র হ'য়ে উঠলো, যেন অন্য সমস্ত দিন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে দাঁড়ালো এসে আমার সামনে—সত্যি কি কোনো কারণ আছে এর?

না, কারণ নেই, যুক্তি নেই কোনো, কিন্তু—তা-ই তো হ'লো। কথাটা প্রথম তুললো বেণু, কাল রাত্রে খাওয়ার পরে চুপি-চুপি ডেকে নিয়ে। 'দিদি, মৌলিদাকে বললে হয় না?' ঐ নিচু গলা, চুপি-চুপি ভাবটা—তারও কোনো কারণ নেই—অন্তত এখন আর নেই—কিন্তু সেটাই মেনে নেয়া হ'লো, যেন বিষয়টা একটু প্রচ্ছন্নভাবেই আলোচ্য। এটা নিয়ে সাধারণ কোনো পরামর্শ হ'লো না, কিন্তু আলাদা ক'রে বলা হ'লো প্রোফেসরকে, গীতাকে—হ্যাঁ, গীতাকেও বলা হ'লো। গীতা বললো, 'বেশ তো।' খুব সাধারণভাবেই বললো, কিন্তু কে জানে—কে জানে ওর মনের কথা! বড়ো গভীর মেয়ে, সেই ঢাকা ছেড়ে যখন দিল্লি চ'লে এলো একবারও মুখে আনেনি নাম—তারপর এত কাল পরে দেশে ফিরে সকলের কথাই জিগেস করেছে শুধু ঐ একজন মানুষকে বাদ দিয়ে!...তা যা-ই হোক, এখন আর 'মনের কথা'র ভাবনা ভেবে লাভ কী। শেষ পর্যন্ত জয় হ'লো বিমলেন্দুর—হবে না? অমন ধৈর্য, নিষ্ঠা, অধ্যবসায়! দশ বছর, বারো বছর ধ'রে অপেক্ষা করেছে সে; বাড়ি বেচে, পাকা চাকরি ছেড়ে দিয়ে, মরীয়া হ'য়ে বিলেত চ'লে গেলো হিটলারের প্রবল বোমা মাথায় ক'রে। হ্যাঁ, বিলেত দেশটা টলোমলো

তখন, কিন্তু গীতাকে ঠেকানো গেলো না কিছুতেই—স্কলারশিপটাও তখনই ঠিক জুটে গেলো—আর গীতা যেখানে বারণ মানলো না সেখানে কি বিরত হবে বিমলেন্দু? দু-বছরের কথা ছিলো, কিন্তু হ'তে-হ'তে প্রায় পাঁচ বছর হ'লো, পড়া শেষ ক'রে সেখানেই চাকরি নিলো দু-জনে, পুরো যুদ্ধটা কেটে যাবার পরেও আবার ক-মাস ব'সে থাকতে হ'লো জাহাজে জায়গা পাবার জন্য। একই জাহাজে ফিরলো ওরা, জাহাজে থাকতেই বাগদত্ত হ'লো বম্বাই যখন এক রাত্রি দূরে। মনস্থির করতে কতদিন লাগলো গীতার, কত বছর! কিন্তু তবু যে শেষ পর্যন্ত—ভালো, ভালো। প্রায় তিরিশ বছর বয়স হ'তে চললো, এখনো বিয়ে না-হ'লে কবে আর হবে।

'তাহ'লে, দিদি, তুমি কাল একবার—' 'বেশ তো।' আমিও বলেছিলাম, 'বেশ তো।' বিয়ের আগের ঘরোয়া উৎসব কাল—শুধু আমরা-আমরাই—ঠিক মনে পড়েছে বেণুর—না কি অন্য কারো-কারো প্রতিনিধি হ'য়ে ওকেই বলতে হ'লো মুখ ফুটে? তারপর ব'সে-ব'সে এটা-ওটা বললো খানিকক্ষণ—ঐ বেণুই যা-একটু তবু টিকিয়ে রেখেছে এতদিন, সে-ই কাছে ছিলো ঢাকায় যখন মাসিমা মরলেন—একাধারে ডাক্তার এবং সাহায্যকারী—তারপর কলকাতাতেও খোঁজ-খবর নিয়েছে যতদিন-না যুদ্ধের চাকরি নিয়ে চ'লে গেলো। এবার এসে আর সময় পায়নি, যা হাঙ্গামা কলকাতায় এখন বাড়ি পাওয়া, আর তারপর গীতার বিয়ের ব্যাপার। 'তা ওঁকে একেবারে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো, দিদি; "না" বললে শুনো না। সঙ্গে কেউ যাবে তোমার?' কী দরকার; ড্রাইভার তো বাড়ি চেনে?

না, দরকার নেই। শুধু তা-ই নয়, রীতিমতো অদরকার আছে। তাঁর আজকের এই যাত্রায় ইচ্ছে ক'রেই কোনো সঙ্গী আনেননি ভদ্রমহিলা—ঠিক ইচ্ছে ক'রে আনেননি বললেও ভুল হয়—ব্যাপারটা এই রকম যে সে-কথা যেন ওঠেই না। কাল রাত্রে আর কোনো কথা হ'লো না, বেণু ব'সে গেলো রেডিও খুলে গান শুনতে, শোবার আগে বেহালার জমির বিষয়ে কিছু কথা বললেন প্রোফেসর। যুদ্ধের আগেকার কেনা, এখন দাম চতুর্গুণ, অর্ধেকটা বেচে দিলে কেমন হয়? যা মনে হচ্ছে দিল্লিতেই জীবন কাটবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা আস্তানা চাই তো—আবো, 'দেশ' বলতে যা বোঝায় তা যখন পাকিস্তানে পড়লো। না কি যা আছে থাকবে? কখনো কিছু তুলতে পারলে একটু বাগান-টাগানও হবে—এতদিনের দিল্লির অভ্যেসের পরে আর যা-ই হোক হাঁপ ধরবে না। তুমি কী বলো? থাকবে? বেশ। আমারও তা-ই ইচ্ছে—আর এমনি অবশ্য কথাটা উঠতোই না—তবে একজন দালাল জুটেছে কিনা—যা-ই হোক, তাকে জবাব দিয়ে দেবো কাল।

এই সব আলাপ হ'লো শুতে এসে, এ-সব ভাবতে-ভাবতেই ঘুম এলো—মনে তো পড়ে না ঘুমের আগে অনেক কিছু ভেবেছিলেন—অন্তত বেণুর ঐ প্রস্তাবের বিষয়ে আর ভাবেননি সেটা বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে। কিন্তু আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই—আজ সকাল থেকেই কেমন অন্য রকম লাগছিলো তাঁর—যেন হালকা হ'য়ে গেছেন, কোনোটাতেই ঠিক মন লাগছে না, যেন আলগা হ'য়ে ভেসে-ভেসে যাচ্ছেন মিনিট ঘণ্টা সারা বেলার উপর দিয়ে। অপেক্ষায় দীর্ঘ হয় সময়—না কি উল্টোটা? অপেক্ষা করা—তার মানে তো সময়ের সরল রেখাকে বেঁকিয়ে দেয়া, যেটা ঘটতে এখনো দেরি আছে মনে-মনে প্রথম থেকেই তাতে পৌঁছে থাকা—এই তো অপেক্ষা করার মানে? যেমন, রাত দশটায় যে-ট্রেন ছাড়বে, বাচ্চা ছেলে সকাল থেকেই তাতে চ'ড়ে থাকে। সত্যি কিন্তু—এ-কথাটা আগে আমার মনে হয়নি কোনোদিন।

. ক্রমশ ডান দিকে বেঁকলো চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, এক ফালি চৌকো রোদ সুয়েডের স্যান্ডেল-পরা ফর্শা দুটি পা থেকে শুরু ক'রে আস্তে-আস্তে উঠে এলো কোলের উপর স্তব্ধ-বাধা হাত দুটিতে। মহিলাটি স'রে বসলেন না—যদিও স্বভাবত রোদ্দুর তার সহ্য হয় না একেবারেই—হয়তো রোদটাকে ঠিক অনুভব করলেন না সময়ের রহস্য নিয়ে ভাবতে-ভাবতে। ঠিক তা-ই—সময় কেমন ফাঁকি দেবার কারসাজি দেখায় মাঝে-মাঝে—আজ যেমন সকাল বেলাটা উডাল দিয়ে চ'লে গেলো, দেখতে-দেখতে দুপুর, আর দুপুর মানেই তো বিকেল,—মানে, দেড়টা যদি বাজতে পারলো তাহ'লে আড়াইটে ভেবে নিতেই বা দোষ কী—আড়াইটের মধ্যেই গাড়ি পাঠিয়ে দেবে বললে না বেণু? অথচ বাইরে এতটুকু

অধৈর্যভাব দেখালেন না, গাড়ি আসার পর বেশ মন দিয়েই শাড়ি জামা বাছলেন, গঙ্গাকে ডেকে রাতের রান্নার অণুকোটি বুঝিয়ে দিলেন, নতুন ঝিকে মনে করিয়ে দিলেন চারটের সময় হিমুকে যেন ওভালটিন দেয়। বেরোবার সময় সিঁড়িতে দেখা বিমলেন্দুর সঙ্গে—একটু থেমে যথোচিত এবং সময়োচিত ঠাট্টা করলেন দু-একটা, আর বিমলেন্দু যখন জিগেস করলো, 'কোথায়—?' তখন মিষ্টি একটু হাত নেড়ে বিদায় নিলেন। সেই নেমে এলেন সিঁড়ি দিয়ে, গাড়িতে উঠলেন, আর গাড়ি যেই চলতে লাগলো তাঁকে নিয়ে, তখন থেকেই সেই আশ্চর্য অনুভূতির আরম্ভ, যাকে ইনি একটু আগে নাম দিয়েছিলেন, 'অপার্থিব আনন্দ'—যেটা ক্বচিৎ কখনো মুহূর্তের জন্য ছুঁয়ে যায় মানুষকে, কিন্তু আজ যেন এই মেদমসৃণ মহিলাকে ঘিরে ধরেছে একেবারে। কিন্তু কী—ব্যাপারটা কী? কেমন লেগেছিলো, গাড়ি যখন দুটো-তিনটে মোড় দিয়ে লম্বা সোজা ল্যান্সডাউন রোডে পড়েছিলো? যেন ছুটি, যেন ছাড়া পেয়েছেন। গাড়ির নরম গদিতে হেলান দিতেই সারা শরীর অলস হ'যে এলো, অবশ, যেন ছেড়ে দিলেন নিজেকে, ছড়িয়ে দিলেন, নিজেকে সমর্পণ করলেন একান্তে এই অদ্ভুত নতুন অনুভূতির হাতে। ঝাপসা হ'য়ে এলো বাড়ি, সংসার, বেহালার জমি, দিল্লির বাগান; বোনের বিয়ে, আজ রাত্রের ঘরোয়া উৎসব, তারও উপর মনের তন্দ্রা নেমে এলো ধীরে-ধীরে; তাঁর প্রতিদিনের, এতদিনের জীবনটা যেন মুছে-মুছে এলো বাইরের শীতের বেলার এলিয়ে-পড়া রোদ্দুরে। না, কিছুই যেন আর থাকলো না; যত কাজ দায়িত্ব, সম্বন্ধ, যা-কিছু মানুষকে টিকিয়ে রাখে এই সংসারে, সেই সমস্ত প্রয়োজনীয় বাঁধন যে শিথিল হ'লো হঠাৎ, বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগলো শুধু এক চিহ্নহীন চিরকালের 'আমি'। মা, বোন, স্ত্রী, গৃহিণী—কিছু না, শুধু আমি। মৃদু, অতিশয় মৃদু সেই কাঁপন, অথচ স্পষ্ট, তাকে ভোলানো যায় না, ভুলে থাকা যায় না মুহূর্তের। আ—এই নিছক 'আমি' হওয়ার সুখ, শুধু নিজেকে দিয়েই ভ'রে থাকার এই মুক্তি! একেই কি বলে অপার্থিব আনন্দ—আর একেই কি আমরা খুঁজে-খুঁজে বেড়াই বইয়ের পাতায়, ঘাসের ফুলে, রাতের আকাশে—এ-ই কি সেই, মাঝে-মাঝে যার পরশ না পেলে বাঁচি না আমরা কিছুতেই বাঁচতে পারি না?

গাড়ি চলতে লাগলো; পাশ দিয়ে ভেসে গেলো শহর—অনেকটাই অচেনা এই শহর তাঁর কাছে। অচেনা বইকি—কলকাতায় আসাই হয় কতটুকু, এলেও কেমন ক'রে কেটে যায় দিনগুলি—সিনেমা, জিনিস কেনা, ডাক্তার দেখানো, আত্মীয়স্বজন—এর মধ্যে সময় হয় না। সময়? ইচ্ছে থাকলেই সময় হয়, মন করলেই সময় হয়। মনে পড়েনি কখনো। ভেবেছি মাঝে-মাঝে, কিন্তু—কী জানি, এতদিন দেখা না-হ'য়ে-হ'য়ে সেটাই যেন অভ্যেস হ'যে গেছে, নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে, যেন এই ব্যবস্থাই নিঃশব্দে মেনে নিয়েছে উভয় পক্ষ। কী বললে, উভয় পক্ষ? এখানে আবার 'উভয়'টা পেলে কোথায়—সবই তো তোমার এক পক্ষের ভাবনা। কিন্তু তা-ই বা ঠিক বলি কেমন ক'রে—ভাবতে গেলে 'উভয়ে'র একটু আভাস কি ধরা পড়ে না? শুনি তো ঘুরে বেড়ায় নানা দেশে, কিন্তু লেখকটির ভ্রমণ-পঞ্জীতে দিল্লির নাম উঠলো না কেন একবারও?

কাচের জানলার বাইরে স্রোতের মতো ব'য়ে গেলো কলকাতা—বড়ো-বড়ো বাড়ি, পার্ক, দোকান, মোড়ে-মোড়ে কত রাস্তার আঁকিবুঁকি—আর মনের উপর দিয়ে স্রোতের মতো ব'য়ে গেলো বছরগুলি।...কত কাল পরে দেখা হবে? বারো, চোদ্দ, পনেরো বছর? না কি যুগযুগান্ত? না কি এক পলক? চোখ বুজলে মনে হয় যেন সেদিন সকাল।

মহিলাটি চোখ বুজলেন; বোজা চোখের অন্ধকারে ফুটে উঠলো মস্ত ফাঁকা মাঠ, শাদা ধুলোর রাস্তা, বটগাছের ঝিকিমিকি শরীর। সেই গাছের ছায়ায় ব'সে টেম্পেস্ট পড়া হচ্ছিলো একদিন। দুপুরবেলা, একটু মেঘলা, খুব হাওয়া ছিলো। হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছিলো কবিতা, পাতার মর্মর শব্দে ডুবে যাচ্ছিলো। কিন্তু শুনতে পাইনি, শুনতে চাইনি...দেখছিলাম। হঠাৎ চোখ পড়লো আমার চোখে—পড়া থেমে গেলো। কেউ উঠলাম না, কেউ কিছু বললাম না; হাওয়া ব'য়ে গেলো মাঠের উপর দিয়ে, আকাশে মেঘ ভেসে গেলো। বাড়ি ফিরে সেদিন অনেক চোরকাঁটা বাছতে হয়েছিলো শাড়ি থেকে। সেগুলো খামে ভ'রে দেরাজে রেখে দিয়েছিলাম।

গাড়ির মসৃণ গতি একান্তে একটু অনুভব করলেন ভদ্রমহিলা। অনেক দূর তো। তা হোক না—আরো

অনেক দূর হোক, এমনি আমাকে নিয়ে গাড়ি চলুক আরো অনেক সময়ের প্রান্তর পার হ'য়ে। দেখা হওয়া, কথা বলা—তার চেয়ে বরং এই কি ভালো নয়, এই মনে-মনে ভাবা, এই মনের মধ্যে কতকাল পর ফিরে পাওয়ার মণিময় মুহূর্তটি? যাকে ভাবছি তার বয়স ছিলো উনিশ, আমার মনে তার বয়স আর বাড়লো না—আর যাকে দেখতে চলেছি? কেমন দেখবো? কেমন আছে? খুব বই লিখেছে, আশ্চর্য বই, নামের সঙ্গে 'বাবু' আর কেউ বলে না আজকাল—কিন্তু আছে কেমন? এখনো এত বোকা যে সংসারকে মানবে না, এত বড়ো বীর? ঐ একতলার ঘরে একজন চাকর নিয়ে—বেণু বলেছে সব—এ কী-রকম জীবন, কোনো রকম জীবন কি বলে একে? বিয়ে করলো না—করলোই না—এতদিন, এত দিনের মধ্যেও তাকে বাঁধতে পারলো না কোনো ভাগ্যবতী, কোনো মেয়েকেই মনে ধরলো না তোমার?

হঠাৎ একটি আশ্চর্য শিহরণ ভদ্রমহিলার মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেলো, একটি হাতের মুঠ বন্ধ করলেন, আস্তে-আস্তে ছেড়ে দিলেন আবার। ঘামছে? চামড়ার তলায় জ্বালা করছে নাকি মুখ? গরম—দিল্লির পরে কলকাতায় একটু গরমই মনে হয় জানুয়ারি মাসে। সুতি পরলেই হ'তো—নীল শাড়ি? হালকা-নীল? অদ্ভুত একটু হাসি ফুটলো মুখে, যেন নিজের কাছেই লুকোবার জন্য হাত দিয়ে চাপা দিলেন।

বোজা চোখের পাতার উপর রোদ লেগেই স'রে গেলো; গাড়ি ঘুরলো। চোখ খুলে অচেনা দেশে জেগে উঠলেন। পাঁচ রাস্তার মোড়—কেমন জায়গাটা, যেন সব এখানে এসে মিলে গেছে। কিন্তু ভালো ক'রে দেখা না-হ'তেই গাড়ি বেঁকলো বাঁ দিকে, একটু পরেই আবার বাঁয়ে ঘুরলো।

'আর কত দূর?' ভদ্রমহিলা জিগেস করলেন ড্রাইভারকে।

'এসে গেছি। এই তো বাগবাজার।'

উত্তরটা বোধহয় আশা করেননি ইনি, শুনে একটু চমকালেন, অন্তত তাঁর ভঙ্গির একটু বদল হ'লো। এতক্ষণে সোজা হ'য়ে বসলেন, উন্মন চোখে চঞ্চলতা এলো। দৃষ্টি ফেললেন এদিকে-ওদিকে—চলতি গাড়ি থেকে যতটা দেখে নেয়া যায়। এ-ই বাগবাজার। অবাক হবার কিছু নেই এতে, নেহাৎই একটা ভৌগোলিক তথ্য এটা, কিন্তু ঐ তথ্যটুকুই অনুধাবনের যোগ্য হ'য়ে উঠলো এঁর মনে। লক্ষ্য করলেন ভাঙা ফুটপাত, ঘেঁষাঘেঁষি পানের দোকান, খাবার দোকান, তারপর গাড়ি যখন আবার বেঁকলো সরু গলিতে, চোখে পড়লো মোছা মোছা অক্ষরে লেখা 'কাঁটাপুকুর লেন'। ভালো লাগলো গলির ছায়া, সোঁদা গন্ধ। আস্তে চললো গাড়ি, প্রায় দু-দিকের বাড়ির গা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে, এঞ্জিনের অতি মৃদু শব্দটা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের মতো শোনালো।

'থামলে যে?'

'এই তো।'

'কোন্ বাড়ী?'

'ঐ যে সামনে।'

মহিলাটি তাকিয়ে দেখলেন। সামনে পোড়ো জমি এক ফালি, খামকা একটা দেয়াল, ওপাশে বিবর্ণ একটা দোতলা। গাড়ি থেকে নেমে আস্তে এগিয়ে এলেন, চোখে পড়লো নম্বর লেখা একুশের দুই। কোনো দরকার ছিলো না, তবু নম্বরটা দেখলেন বেশ মন দিয়ে। কর্পোরেশনের ফলক নয়, দেয়ালের গায়ে আলকাৎরা দিয়ে বাজে ক'রে লেখা। সবুজ দরজাটা ভেজানো, একটু ফাঁক হ'য়ে আছে। আস্তে ঠেলা দিয়ে ভিতরে এলেন। সরু একটা প্যাসেজ, উঠেই বাঁ দিকে চৌবাচ্চাওলা স্নানের ঘর, আর পাশেরটা—রান্নাঘর বোধহয়? কেমন চুপচাপ—স্তব্ধ—কেউ নেই? কে আবার থাকবে, আর তো কেউ থাকে না এখানে, যে থাকে সে তো নিঃশব্দেই থাকে।—কিন্তু আছে তো? বাড়ি আছে তো? হঠাৎ বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড যেন থেমে গেলো, আর তার পরের মুহূর্তেই—যেই চোখে পড়লো ডান দিকের দরজাটা—ধোঁয়া লেগে-লেগে কালো দেখানো নীল রঙের পরদায় ঢাকা দরজা—আর পরদার ফাঁকে একজন চেয়ারে-বসা মানুষের একটুখানি আভাস—ঐ আভাসটুকু চোখে পড়ামাত্র এমন ন'ড়ে উঠলো ঐ থমকে-থাকা হৃদযন্ত্র যে-রকম ঐ যন্ত্রটির পক্ষে আর সম্ভব নয় ব'লেই বহুদিন ধ'রে জেনেছিলেন

ইনি। যৌবন—চিরন্তন যৌবন! কেউ জানে না কোথায় লুকিয়ে থাকে, কেউ জানে না কোথায় তার বাসা—কেমন ক'রে সে আসে, যায়, ফিরে আসে, চমকে দেয়; কত রূপে, রূপান্তরে, কত সূক্ষ্ম অফুরন্ত এঁকে-বেঁকে জীবন ভ'রে সে ব'য়ে চলে, কেউ কি তার হিশেব পেয়েছে কখনো? এই মহিলা—স্মিত, আত্মস্থ, সম্ভ্রান্ত, যাঁকে দেখে মনে হয় ইনি অভাবের মুখ দ্যাখেননি কখনো—কোনো অর্থেই না—মনে হয় ইনি জীবনের সঙ্গে ঝগড়া করেননি কোনোদিন, সময়ের উজান বাইতে যাননি, যৌবনের আকুল ফুল ঝরাতে-ঝরাতে শান্তভাবে ফলের দিকে এগিয়েছেন, সুন্দর ক'রে প্রৌঢ় হ'য়ে উঠছেন এখন—ঐ ময়লা পরদাটার বাইরে দাঁড়িয়ে ষোলো বছরের মেয়ের মতো কাঁপন লাগলো এঁর বুকের মধ্যে—কিন্তু এমন কখনো কাঁপে কি কোনো ষোলো বছরের? ভদ্রমহিলা দেরি করলেন একটু, শাড়ির আঁচল টান করলেন, জোরে নিশ্বাস নিলেন একবার, তারপর দরজার পাল্লায় আস্তে দু-বার টোকা দিয়েই চ'লে এলেন ঘরের মধ্যে।

*　　　　*　　　　*

অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখলো মৌলিনাথ। এক ঝলক রোদ এলো তার ঠাণ্ডা ঘরে, উজ্জ্বল একটি দিন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঐ লাল শাড়ি, জ্বলজ্বলে সিঁদুর, রক্তেমাংসে উদ্ভাসিত প্রতিমা—তার এই মৃত ঘর, এই মৃত মন—এখান থেকে কত দূরে এ-সব, কোন সুদূর পরপারে! যেন এই শীতের বিকেলে এখনো যেটুকু আলো আছে পৃথিবীতে, যেটুকু রোদ, স্বাস্থ্য, প্রাণের তাপ, তা অঞ্জলি ক'রে ধ'রে নিয়ে এলেন এই—এই ভদ্রমহিলা, এই অতীব শোভন মহিলাটি—আর কয়েক বছরের মধ্যে যিনি রীতিমতোই মোটা হ'য়ে উঠবেন মনে হয়, থুতনিতে হয়তো ভাঁজও পড়বে—কিন্তু যাঁর মুখের রেখায়, চোখের ছায়ায়, শরীরের ভঙ্গিতে, এই পূর্ণ, সমৃদ্ধ অবস্থার কোনো-এক ঠিকানাহীন অন্তরালে, এখনো চেনা যায় অন্য একটি মেয়েকে—সেই হালকা-নীল শাড়ি-পরা অন্য মেয়ে, যার ঠোঁটে হাসি আর চোখের কোণে বিষাদ, আর যার পাণ্ডুর গালে হঠাৎ এক-একটি রঙের ফোঁটা দেখা দিয়ে কী জানি কোন গোপন লজ্জা ধরিয়ে দেয়। অন্তত, মৌলি দেখামাত্রই চিনলো।

মহিলাটি—মেয়েটি—ঘরের মধ্যে বেশি দূর এগোয়নি, মাঝপথে থমকে দাঁড়িয়েছিলো গৃহস্বামীর চোখে চোখ প'ড়ে। একটু পরে উঠে দাঁড়ালো মৌলিনাথ, তার ছাইরঙের আলোয়ানটা হালকা হাতে ফেলে দিলো পিঠ থেকে, এগিয়ে এসে বললো, 'এসো।' অতিথিকে বসতে দিলো তার পুরোনো-কেনা আরাম-চেয়ারে, নিজে দাঁড়িয়ে থাকলো টেবিলটায় ঠেশান দিয়ে। একটু সময় কেউ কোনো কথা বললো না। এই ঘর, যা বলতে গেলে সারাদিনই চুপচাপ থাকে, আর আজ এই দুপুরের ঘণ্টাগুলি ভ'রে একটু বিশেষ অর্থেই স্তব্ধ ছিলো—এই ঘরে অন্য রকম নীরবতা নামলো এখন—তা-ই মনে হ'লো মৌলির—বন্ধ্যাতার নয়, ব্যর্থতার নয়—কোনো-একটা অর্থ যেন পেয়েছে এতক্ষণে, বলা যেতে পারে স্তব্ধতা ঠিক স্তব্ধ নেই আর, লক্ষ্য পেয়েছে, গতি পেয়েছে, চলছে। মৌলির কেমন আরাম লাগলো মনে-মনে, যেমন হয় জোর ক'রে ঘুম ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে কাজ করার পর শেষ পর্যন্ত ঘুম যখন ছেয়ে নামে।

তারপর চিত্রা কথা বললো—'একটু জল খাবো।'

'জল? দিচ্ছি।' কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে এনে দিলো মৌলি।

'খুব ঠাণ্ডা জল তো।'

'বড্ড ঠাণ্ডা, না?'

'আমার ভালোই লাগছে।' চিত্রার মুখের চেহারা তার কথার সমর্থন করলো। লালচে আভা গালের—উত্তর ভারতের স্বাস্থ্যকরতার প্রমাণ—এখন গভীর রঙে ছুপিয়ে দিয়েছে সারা মুখ—প্রায় অস্বাভাবিক লাল দেখাচ্ছে। রোদ লেগেছে গাড়িতে—এতক্ষণে তার মনে পড়লো—ছোটো-ছোটো ঠাণ্ডা চুমুকে জল খেলো, ফাঁকে-ফাঁকে তাকিয়ে দেখলো ঘরের চারদিকটায়। 'তুমি—বসবে না?'

'বসছি। গ্লাশটা দাও, রেখে দিই।'

'আমি রাখছি।' চিত্রা নিচু হ'য়ে গ্লাশ নামিয়ে রাখলো মেঝেতে, যখন সোজা হ'লো তার লাল দুল ন'ড়ে উঠে ঝলক দিলো মৌলির চোখে। এত লাল কেন, মৌলি বললো মনে-মনে, আমি ক্লান্ত; আমি ঘুমোতে চাই। হ্যাঁ—এতক্ষণে ঠিক বুঝেছে, ব্যাপারটা এই যে সে ক্লান্ত হয়েছে, তাই লিখতে পারেনি এতক্ষণ—কখনো-কখনো হার মানতেও তৈরি থাকা চাই, নয়তো শেষ যুদ্ধে জেতা যায় না।

আবার একটু চুপচাপ। ব্যাগ থেকে ছোট্ট সুগন্ধি রুমাল বের করলো চিত্রা, আস্তে চাপ দিলো মুখের এখানে-ওখানে, ব্যাগের মুখ বন্ধ ক'রে মৌলির দিকে তাকালো। 'তুমি—বোসো!'

মৌলি প্রথমে তার লেখার প্যাড বন্ধ ক'রে সরিয়ে রাখলো, তারপর চেয়ারটি ঘুরিয়ে নিয়ে বসলো ঠিক চিত্রার মুখোমুখি নয়, একটু আড় হ'য়ে। খুব সহজভাবে বললো, 'তারপর? কেমন আছো?'

আলাপ শুরু হ'লো। উল্লেখযোগ্য কিছু নয়; এমন দু-জন, কোনো-এক কালে পরস্পরের জীবনে যাদের অংশ ছিলো, অনেকদিন পর দেখা হ'লে তাদের কথাবার্তা যে-সব দিকে সাধারণত চলতে পারে, এখানে তার ব্যতিক্রম কিছু হ'লো না। তখন যাদের চিনতো তাদের কথা উঠলো; যারা ইতিমধ্যে স'রে গেছে জীবন থেকে, তাদের কথা—মৌলিনাথের মা তাদের একজন। নতুন যারা এসেছে তারাও বাদ গেলো না। লিপিযোগ্য আলাপ বলে না একে, আবার পরিমাণেও প্রচুর নয় তেমন। থেমে-থেমে চললো, আস্তে, নিচু গলায়, চিত্রাই কথা তুললো পর-পর, কিন্তু তাবও যেন বলার চাইতে দেখাতেই আগ্রহ বেশি, কথায় ভুলে চোখের ছবির টুকরোটিও যেন হারাতে চায় না সে। ফাঁকে-ফাঁকে বার-বার ঘুরে এলো তার চোখ, ঘুরে এলো ঘরের চাবদিকে—ধোঁয়া-লাগা পরদা থেকে আঁশ-বেরোনো সুজনিতে ঢাকা বিছানা পর্যন্ত, লক্ষ্য করলো বইয়ের শেলফ, বইগুলি—কোনো-কোনোটা উল্টো হ'য়ে দাঁড়িয়ে—বাজে কাগজের ঝুড়ির মধ্যে টুকরো খাম, সিগারেটের প্যাকেট, আস্ত একটা প্যাম্ফলেট বোধহয় সিনেমার বিজ্ঞাপন?—দেখলো ঝুল জমেছে সীলিঙের কোণে-কোণে, চুন খ'সে-খ'সে ঝাপসা ম্যাপ আঁকা হয়েছে দেয়ালে, মেঝেতে সূক্ষ্ম ফাটল ভাবনার মতো বেঁকে-বেঁকে চলেছে। গৃহস্বামীকেও দেখলো মন দিয়ে—ক্রমশ যখন তার মুখের রং স্বাভাবিকতা ফিরে পেলো, আর শরীরের ভিতরকার কলকব্জাও ভদ্রগোছেরই ব্যবহার করলো আবার—মনে-মনে টুকে নিলো সেই মুখে যা-কিছু এঁকে দিয়েছে এই বছরগুলি, কোনো-এক দিন যে-মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে সে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছিলো 'টেম্পেস্ট' নাটকটাকে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় তেমন বদল হয়নি, কিন্তু আস্তে-আস্তে ধরা পড়ে সময় ঠিক আদর ক'রে হাত বুলিয়ে যায়নি ওখানে, আর মানুষটির মনের ভূগোলেও আরো অনেক অদল-বদল হয়েছে ইতিমধ্যে। চুল তেমন ঘন নেই আর—আবার সিঁথি না-ক'রে উল্টিয়ে দিচ্ছে ব'লে চওড়া দেখায় কপালটা, আরো স্পষ্ট দেখায় কপালের শির—সেই 'বাজদণ্ড' তার—না কি কোনো অভিশাপের বিধিলিপি? রং ফর্শা হয়েছে আগের চাইতে—ফর্শা? না, ফ্যাকাশে, রক্তহীন?—অসুস্থ মনে হয় ভালো ক'রে দেখলে—সত্যি কি কোনো অসুখে ভুগছে ভিতবে-ভিতরে? যখন চুপ ক'রে থাকে বড্ড যেন গম্ভীর—ঐ নিবিষ্ট হ'য়ে শোনার ভঙ্গিটি ওর নতুন দেখছি—আর যখন ঠোঁটেব কোণে হাসে তখন ঐ-যে চোখে আলোর মতো ঝিলিক দেয়, সেটা হয়তো—হয়তো তার প্রতিভারই আভা, কিন্তু মনে হয় অস্বাভাবিক, অনিদ্রারোগীর উজ্জ্বল চোখের মতো অস্বাভাবিক।

আর মৌলিনাথ—ঐ ক্ষীণ, মন্থর কথোপকথনে সে যেটুকু অংশ নিলো তা প্রধানত শ্রোতার। যা বললো তো বেশির ভাগই কোনো প্রশ্নের জবাব, নতুন ক'রে প্রশ্ন কবলো খুব কম, কিন্তু চিত্রা যখন তুচ্ছ কোনো প্রশ্নের উত্তরে প্রয়োজনের বাইরেও খানিকটা ব'লে ফেললো, তখন সমস্তটা শুনলো মন দিয়ে। ক্লান্ত মনে হ'লো তাকে, যেন ঘুম পেয়েছে, অথচ ব'সে থাকতেই ভালো লাগছে বেশি। বসেছে শিথিল হ'য়ে চেয়ারে, পা দুটোকে সামনে বাড়িয়ে দিয়ে, মাথাটি একটু হেলানো—ঠিক মুখোমুখি নয়, একটু আড় হ'য়ে—আঙুলে-ধরা সিগারেটের ধোঁয়া পেঁচিয়ে উঠছে চুলের উপর দিয়ে। এইভাবে ব'সে থাকলো দু'জনে অনেক বছর পর দেখা হয়েছে যাদের, এই শীতেব বেলায়, রোদ-না-লাগা ঘরের এই ধূসরতায়—অজাত কথার বেদনায় ভরা ধূসর ভরা ধূসর হাওয়ায় এই দু-জন, যারা না ব'লে এখন শুনতে চায়, না-ব'লে এখন দেখতে চায়, হয়তো আরো অনেক বেশি চায় অনুভব করতে আপন মনে।

তারপর কথাটা উঠলো। দৈবাৎ এমন হ'লো যে মৌলি—দু-জনের মধ্যে বলার অংশ যার ক্ষীণতর—তার মুখ দিয়েই প্রথম বেরোলো নামটা। এর আগে পর্যন্ত অন্য নানা বিষয়ে কথা হয়েছে, শুধু ঐ নামটি উচ্চারিত হয়নি একবারও। তার মানে এমন নয় যে ইচ্ছে ক'রে এড়িয়ে গেছে কেউ—চিত্রা নিশ্চয়ই সুযোগ খুঁজছিলো, অপেক্ষা করছিলো—আর অবশেষে কথাটা যখন উঠলোই, তখন দু-জনেই যেন বুঝে নিলো, মেনে নিলো, যে এরই জন্য তারা অপেক্ষা করছিলো এতক্ষণ, যে অন্য সব কথা এরই ভূমিকামাত্র, এরই প্রস্তাবনা।

ঢাকার কথা হচ্ছিলো, পুরানো পল্টনের, কিন্তু স্মৃতিমন্থনে মৌলিনাথের যেন উৎসাহ নেই; পুরোনো দিনের কথা উঠলে যে-রকম কথা স্বভাবত সবাই ব'লে থাকে—যাতে কখনো একটু বেদনার ছোঁয়া লাগে, কখনো বা নিশ্বাস-ফেলা সুখের হাওয়া ব'য়ে যায়—সে রকম একটি কথাও বেরোলো না সাহিত্যিকটির মুখ দিয়ে। খুব হালকা ক'রে সে ছুঁয়ে গেলো প্রসঙ্গটাকে; ভাবটা এইরকম যেন প্রাণের ধর্মে ফিরে যাওয়া নামক ঘটনা যেহেতু নেই, অতএব ফিরে তাকাতেও ইচ্ছুক নয় সে—না কি তাকাতে তার ভয়, ভয়—যেহেতু মধ্যবয়সের সংকটকালে একবার পিছন ফিরে তাকালে বারে-বারেই তাকাতে হয়, একবার ধরা দিলে আর সহজে নিষ্কৃতি দেয় না অতীত। চিত্রা আড়চোখে একবার তাকালো; মৌলির চোখের পলকের কাঁপন দেখলো সে, সিগারেটের ছাই-ঝাড়া হাতের শ্লথ ভঙ্গি—একটু চুপ ক'রে থেকে অন্য কথা তুললো। দিল্লির কথা এবার; মন্দ না সিভিল লাইন্স জায়গাটা—সেখানেই ইউনিভার্সিটি—আর আজকাল তারা যে-বাড়িতে আছে তার বারান্দা থেকে যমুনা দেখা যায়, বাগান আছে সামনে, সবুজ ঘাস, মাঝে-মাঝে মনে হয়েছে যে মৌলিনাথ একবার—কিন্তু মৌলিনাথের বোধহয় দিল্লির আবহাওয়া ভালো লাগে না?

আর এ-প্রশ্নেরই উত্তরে মৌলি বললো যে গীতাকে তখন দিল্লিতে সরিয়ে নিযে খুব ভালো করেছিলো চিত্রা, প্রশংসনীয় বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলো।

সেই দুর্বিনীত রক্তিমা হঠাৎ ফিরে এলো চিত্রার মুখে। অস্ফুট স্বরে উল্লেখ করলো তাদের তখনকাব পারিবারিক অবস্থা, বাবার পেন্সন হ'লো সেবার, এদিকে বেণুর ডাক্তারি পড়ার খরচ—সে তাই ভেবেছিলো—

ঠিক!—মৌলি সমর্থন করলো সঙ্গে-সঙ্গে—ঠিক ভেবেছিলো চিত্রা। দিল্লি খুব ভালো জায়গা, কিন্তু বিলেত আরো ভালো, বিলেত আরো দূর। একটু হাসি ছুঁয়ে গেলো মৌলির ঠোঁট, ছুঁতে-না-ছুঁতেই মিলিয়ে গেলো।

হাসিটুকু বিঁধলো চিত্রাকে। তাকাতে গিয়ে চোখ নিচু হ'লো তার, বলতে গিয়ে বেধে গেলো কথা। সে কি ভালো করেছিলো? সে কি ভুল করেনি? কেন সে তখন গীতাকে নিয়ে এলো দিল্লিতে; কেন, তারপর, প্রোফেসরকে নিয়ে নানা দিকে চেষ্টা ছড়িয়ে দিলো যাতে তার বিলেত যাওয়ার উপায় হয়? বাবাকে সাহায্য করা শুধু তা-ই? স্নেহ, হিতৈষণা, বোনের ভালো হোক—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—কিন্তু সেই ভালোর মানেটা কী? মৌলি যেখানে নেই সেখানেই গীতার ভালো—এই তো ছিলো শুভানুধ্যায়িনী দিদির মনে? তা-ই না? এই গোপন কথাটি—যা সত্যি বলতে গোপনই নয়, যা কেউ মুখে না-আনলেও সকলেই মেনে নিয়েছিলো সেই সময়ে পারিবারিক মহলে, আর যা এড়াতে, লুকোতে, চাপা দিতে চিত্রা তার নিজের মনেও ব্যর্থ ছলাকলা ছড়িয়েছিলো কম না—এই কথাটি আজ এতকাল পর যেন প্রথম বার সে নিজের কাছে স্বীকার করলো। প্রথম বার প্রশ্ন করলো নিজেকে · ঠিক করেছিলাম?

হ্যাঁ, মানতেই হয়—এখন আর না-মানারও কোনো অর্থ নেই—মানতেই হয় যে এইটে ঘটাতে রীতিমত চেষ্টা করেছিলো সে—যাকে বলে উঠে-প'ড়ে লাগা প্রায় সেই রকম—লম্বা-লম্বা চিঠি লিখেছিলো, লিখেছিলো মা-কে, গীতাকে—মৌলির মা-কেও বাদ দেয়নি—সে চিঠি লেখার বুদ্ধি খাটিয়েছিলো খুব, তার সাংসারিক বুদ্ধির সবটুকু, সেই সঙ্গে সূক্ষ্মতর সেই চাতুরী যা মেয়েদের কখন দিতে ভোলেন না প্রকৃতি দেবী। যেন সে পণ করেছিলো যে গীতাকে উপড়ে আনা চাই। কিন্তু যদি...সে কিছু না-ই করত? সব জেনেও, সব বুঝেও, চুপ ক'রেই থাকত যদি সে, শান্তিতে থাকতো তার আপন

সংসারে—তাহ'লে? তাহ'লে যা হ'তো—হয়তো বা হ'তে পারতো কোনোদিন—তা কি ঠিক তা-ই নয় যা ছিলো সবচেয়ে ভাল, নিখুঁতরকম সংগত ও সুন্দর? মৌলি আর গীতা—ওরা তো জন্মেছিলো পরস্পরের জন্য, তৈরি হয়েছিলো সব দিক থেকে; ওরা মিলতে পারলে সার্থক হ'তো দুজনে, আলো হ'তো অন্য আরো জীবন, এই পর্বতপ্রমাণ সাধারণতার সংসারে কোথাও একটি উপত্যকা হ'তো যেখানে ফুল ফুটে এক বেলাতেই ঝ'রে যায় না।

চিত্রার পরিপুষ্ট চিক্কণ মুখে বিষাদের ছায়া নামলো। সম্ভাবনা, যা দিনের আলোর মত স্পষ্ট, পুরানা পল্টনের সবুজ কাহিনীর উজ্জ্বল উপসংহার—একে এমন ক'রে মুখোমুখি কি আর কখনো দেখেছিলো সে? হঠাৎ এক মুহূর্তে, গীতার সমস্ত মন যেন স্বচ্ছ হ'য়ে বেরিয়ে এলো তার সামনে; গীতার ধৈর্য, স্তব্ধতা, ঐ অবিচলিত কর্মপালনের প্রতিজ্ঞা—তার অন্তরালে আজ—এতদিনে—চিত্রা দেখতে পেলো দীর্ঘ গোপন অপ্রতিরোধ্য প্রতীক্ষা, শুনতে পেলো সান্ত্বনাহীন হাহাকার। কত দুঃখ পেয়েছিলো গীতা—আর সে-দুঃখ কি আমিই দিয়েছিলাম?

না, না! তোর ভাগ্যকে দোষ দে গীতা, আর যদি কাউকে দুষতে হয় সে যে কোন্ মানুষ তা কি আমার মুখে শুনতে হবে তোকে? না, আমি ভুল করিনি; কিছুই হ'তো না রে, ওকে তুই পেতিস না কোনোদিনই, শুধু চোখে দেখে-দেখে জ্ব'লে-পুড়ে মরতিস সারাদিন। তার চেয়ে এই ভালো হয়েছে;—শেষ পর্যন্ত বিমলেন্দু—কিন্তু তাও ভালো। সত্যি তা-ই না? বল গীতা, সত্যি ক'রে বল—তুই কি তেমন মেয়ে, আমার কথায় দিল্লি চ'লে আসবি—নিজের ইচ্ছেতেই এসেছিলি তুই, এসেছিলি—ভুলতে, জুড়োতে, বাঁচতে। না, কিছু হ'তো না—আমি তো জানি ওকে—তুই যত ভালো ক'রে জানিস আমিও প্রায় ততটাই—নিজের ইচ্ছা, নিজের ভাবনা, তার বাইরে কিছুই কি ও দেখতে পায়, কাউকেই কি ওর চোখে পড়েছে কোনোদিন? অন্ধ, অন্ধ, কঠিন; নিজের 'পরেও নিষ্ঠুর হওয়া যার স্বভাব, তার কাছে তোর কি কোনো আশা ছিলো?

কিন্তু কে জানে? কে জানে মৌলিরই মনের বদল হ'তো না কোনোদিন? যদি কোনোদিন খুলে যেতো তার চোখ, সেই তার অন্য চোখ তুলে গীতার দিকে তাকাতো যদি? তা কখনোই হ'তো না—এই আশ্বাসের কথা, সান্ত্বনার কথা, কেউ কি শোনাতে পারে চিত্রাকে? দেখা, শোনা, কাছাকাছি থাকা, কণ্ঠের রস, শরীরের তাপ—এর বাইরে আর কী আছে মানুষের, এর বাইরে যা-কিছু সবই তো শুধু ছায়া, শুধু স্মৃতি? সান্নিধ্য ছাড়া জন্ম নেই, ঘনিষ্ঠতায় আশাতীতের জন্ম হ'তে পারে। অমন-যে ঠাণ্ডা কাঠ, তাতেও ঠোকাঠুকি হ'তে-হ'তে আগুন জ্ব'লে ওঠে—আর এ তো মানুষ, এ তো রক্তমাংস। কিন্তু না, কোনো পথ আর থাকলো না তার, একেবারে চোখের বাইরে চ'লে গেলো।...কেন হ'লো এ-রকম? এই ঘটনায় তারও যে কিছু অংশ ছিলো তা যেন তখনকার মতো ভুলে গেলো চিত্রা, অবাক হ'য়ে ভাবলো—কেন হ'লো না, যা হওয়া উচিত ছিলো তা হ'লো না কেন। এই তো মৌলি—তার চারদিকে বই, কাগজ—শুধু কাগজ—এমনি সে ব'সে থাকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস—এমনি ক'রে সে বেঁচেছে আজ কত বছর ধ'রে এই ঘরে—কিন্তু বেঁচেছে কিনা কে জানে। চিত্রা আড়চোখে আবার লক্ষ্য করলো মৌলির মুখের পাণ্ডুতা—অস্বাস্থ্য—আর তার চোখের প্রতারক প্রতিভা, অনিদ্রারোগীর চোখের মতো উজ্জ্বল। দেখতে পেলো—একদিন যাকে দেখেছিলো পৃথিবীর যুবরাজ, দিন-রাত্রির অধীশ্বর, তাকে আর দেখলো না চিত্রা—হঠাৎ দেখতে পেলো অন্য এক মানুষ, যে মানুষ—তবে কি তা-ই সত্যি?—বাইরে প'ড়ে আছে—জীবনের বাইরে প'ড়ে আছে।

বুকের মধ্যে টান পড়লো চিত্রার, ভিতরটা যেন ব্যথা ক'রে উঠলো। একটা অদ্ভুত অনুভূতি হ'লো তার : ষোলো বছর আগে মিতু যখন জন্মেছিলো, আর তার তিন দিন পরে রসের প্লাবন টনটন ক'রে উঠেছিলো তার বুক ছাপিয়ে, আজ মৌলির সামনে ব'সে, মৌলির দিকে চোখ তুলে তাকাতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য সেই কষ্ট ফিরে এলো তার স্নায়ুতে, সেই রোমাঞ্চ ছুঁয়ে গেলো তার শরীর। সোজা হ'য়ে বসলো, যেন করুণ ক'রে হাসলো একটু, আর যখন কথা বলতে আরম্ভ করলো প্রথমে তার গলা প্রায় শোনাই গেলো না।

কিন্তু এই বাধো-বাধো ভাবটা একটু পরেই কাটিয়ে উঠলো চিত্রা। আত্মস্থ হ'লো আবার; যেন মনোমতো বিষয় পেয়ে এবার বেশ উৎসাহ নিয়ে বলতে লাগলো। ক্রমশ স্পষ্ট হ'লো তার গলা, দ্রুত হ'লো লয়, যাতে মৌলি কোনো ফাঁক না পায় কিছু বলার। হ্যাঁ—গীতার তখন ভালোই হয়েছিলো দিল্লি গিয়ে। শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছিলো না ওর, মিটফোর্ডের নরেন ডাক্তার শুকনো হাওয়া বাৎলেছিলেন। আর দিল্লিতে তো পড়াশুনোরও অসুবিধে নেই—মেয়েদের কলেজ তো সারা দেশের সেরা। কথা ছিলো বছরখানেকেই ফিরে যাবে—যতদিন-না কলেজের পালা সাঙ্গ হয়—কিন্তু থাকতে-থাকতে গীতারই যেন ভালো লেগে গেলো। আর বিলেত যাওয়া? ওটা নেহাৎই দৈবাৎ, নিছক বরাতজোর ছাড়া কিছু না। গীতার নিজের অবশ্য ইচ্ছে ছিলো খুব, অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছিলো রোডস ট্রস্টে, কিন্তু আমরা কেউ ভাবিনি যে সত্যি-সত্যি ও পেয়ে যাবে স্কলারশিপটা। আসলে ও পায়ওনি ঠিক, যে পেয়েছিলো সে বোমার ভয়ে হ'টে গেলো—গীতা লুফে নিলো তক্ষুনি। তা ওকে দিয়ে যে ভুল করেনি সেটা ও দেখাতে পেরেছে যা-ই হোক, খুব ভালো করেছে অক্সফোর্ডে, প্রাইজ পেয়েছে, মেয়েদের ম্যাগাজিনের এডিটর ছিলো—কিন্তু মৌলি বোধহয় জানে সব খবর, চিঠিপত্র তো পেয়েছে মাঝে-মাঝে?

না? চিঠি লেখেনি ওরা? বিমলেন্দু—এক কালের সেরা ছাত্র মৌলিনাথের? সেও না? তা মৌলির কাছে ও-সব চিঠি—কী বা মূল্য তার, শুধু সময় নষ্ট। বোধহয় শোনেনি বিমলেন্দুর খবর? হ্যাঁ, ভালোই—ডি. ফিল. নিয়েছে অক্সফোর্ডে, তার থীসিসের সুখ্যাতি করেছেন প্রোফেসররা, রিভিয়ু অব ইংলিশ স্টডিজ-এ তার লেখা বেরিয়েছে হেনরি জেমস না কি জেমস জয়স কাকে নিয়ে ঠিক মনে পড়ছে না। যাক—খুব ভালোই দাঁড়ালো শেষ পর্যন্ত—যা গেছে এ-ক'টা বছর ঘোর যুদ্ধের দুশ্চিন্তা ক'রে-ক'রে! কবে ফিরবে? বাঃ, ওরা তো ফিরেছে—এই তো একমাসও হয়নি—একসঙ্গেই ফিরেছে দু-জনে—হ্যাঁ, এখানেই, কলকাতায়—আর ওদেরই জন্য তো কলকাতায় আসতে হ'লো আমাদের।

ওদেরই জন্য, তার মানে ওদের—? হ্যাঁ, ঠিক তা-ই—মৌলির মুখ থেকে কথা কেড়ে নিলো চিত্রা—আওয়াজ তার নিচু হ'লো আবার, মুখে যেন বিষাদের মতো গম্ভীরতা ছড়িয়ে পড়লো অথচ একটু হাসিও থাকলো ঠোঁটের কোণে। হ্যাঁ, ওদের বিয়ে। আরো আগেই হ'তে পারতো—কেন হয়নি কে জানে—তা হয়নি ভালোই হয়েছে, এই বেশ ভালো হ'লো দেশে ফিরে আত্মীয়স্বজন সকলের মধ্যে—সত্যি খুব সুখের কথা, তা-ই না? বিয়ে এখানেই—বেণুর বাড়িতেই—এই সাতাশ তারিখে : তার মানে হচ্ছে সামনের বেস্পতিবার। একটা অনুরোধ আছে মৌলির কাছে, বাড়ির সকলের একটা সমবেত ইচ্ছা আজ জানাতে এসেছে চিত্রা : মৌলি যেন বিয়েতে যায়; যাবে? যাবে তো? আর তার আগে আজ একবার—কিছু না, উপলক্ষ্য কিছু না, এমনি। একবার হোক না দেখা সকলের সঙ্গে আবার; দোষ কী? বাইরের কেউ তো না, শুধু আমার বাড়ির লোকেরাই—সুখী হবে সবাই, আর মৌলি—তারও তেমন খারাপ হয়তো লাগবে না। অসুবিধে না থাকে তো এখনই, গাড়ি আছে সঙ্গে —কী? না, কিছু শুনবো না, যেতেই হবে—মানে, খুব যদি কাজের তাড়া না থাকে, এই তো ঘুরে আসবে খানিক পরেই—মনে হচ্ছে ইচ্ছে নেই তেমন?—তা একবার না-হয় অন্যের ইচ্ছেতে—কবে আর এমন হবে যে একসঙ্গে সবাই—রাখবে না কথাটা? ব্যাপারটা এই রকম যে মৌলিকে ছাড়া ঠিক যেন সম্পূর্ণ হচ্ছে না, ফাঁক থেকে যাচ্ছে—সকলেরই মনের কথা সেটা—আচ্ছা কথা দিচ্ছি যখন ইচ্ছে চ'লে আসবে, একটুও জোর করবে না কেউ—শুধু একবার কাছে গিয়ে—যারা বন্ধু, যারা আপন জন—হ্যাঁ, বলতে গেলে আত্মীয় বইকি—তাদের কাছে একবার—চলো, মৌলি!—শেষের কথাটা ফিশফিশে গলায় বেরোলো।

এমনি বললো চিত্রা, এমনি ক'রে চালিয়ে গেলো তার নিপুণ বক্তৃতা, কুটিল ওকালতি—সত্য আর অসত্য মিশিয়ে, আবেগের সঙ্গে শুধু সেটুকু কপটতা যোগ ক'রে, যেটুকু না-হ'লে ভদ্রতারক্ষা হয় না। কথা শেষ ক'রে দুই হাত জড়ো করলো কোলের উপর; সাহসী চোখে, সতর্ক চোখে উত্তর খুঁজলো মৌলির মুখে। কিন্তু মৌলির চোখ নিচু হ'লো, নেমে এলো চোখের পাতা ভারি হ'য়ে। তার মনে হ'লো

তারও কিছু বলার আছে উত্তরে—অনেক, অনেক-কিছু, অনেক আছে মনে করার, প্রশ্ন করার, মনে করিয়ে দেবার। চেষ্টা করলো ভাবতে, মনে আনতে, কোনো-একটি প্রশ্নের তীরে সূক্ষ্মতম কথার ফলা বসাতে। কিন্তু তাতে যেন শ্রম বড়ো বেশি, বড়ো বেশি দাবি করে তার কাছে—আর ঐ বছরগুলির ঝরা পাতার পথ আবার কি তাকে মাড়াতে হবে এখন? না, না—তার সময় নেই, সে ব্যস্ত, তার কাজ আছে। কী কাজ? কী করেছে সে আজ সারাদিন ধ'রে, এই দুপুরবেলার ঘণ্টাগুলি ভ'রে কী করছিলো সে এতক্ষণ? ঝাপসা লাগলো সব; অথচ মনে হ'লো ইতিমধ্যে কিছু-একটা ঘ'টে গেছে, কোনো একটা বাধা কোনো দিক থেকে, গোলযোগ কিছু—অথচ উড়িয়ে দেয়া যায় না, সেটা যেন বিবেচ্য, মীমাংসাধীন, জরুরি—যেন কোনো অনুচ্চারণীয় আকাঙ্ক্ষার দিকে মরচে-পড়া দরজা খোলার শব্দ হ'লো। এলো উষ্ণতা এই শীতের দেশে তাকে ঘুম পাড়াতে, এলো কেউ, অন্য কেউ, অন্য কিছু কানে-কানে গান গেয়ে তাকে ক্লান্ত ক'রে দিলো, ক্লান্ত হ'তে শেখালো। আর তাই, যেহেতু সে ক্লান্ত, তার ঘুম পেয়েছে, ঘুমোতে চায়—তাই মৌলি কোনো কথাই বললো না—কোনো প্রশ্ন, তর্ক, প্রত্যুত্তর, কিছুই না—শুধু মাথাটি একটু হেলিয়ে দিলো চেয়াবের পিঠে, আর চিত্রা তখনই উঠে দাঁড়িয়ে বললো—চলো যাই।

* * *

সেই ছোটো, কালো গাড়িটি আবার যখন মৌলির দরজায় দাঁড়ালো, রাত তখন বারোটা প্রায়। নামতে একটু দেবি করলো মৌলিনাথ।

'আচ্ছা, বেণু!'

'আচ্ছা, মৌলিদা! থ্যাঙ্কিউ!'

'একবার আসবে নাকি ভিতরে?'

'এখন আর থাক।' হাতের পিঠে হাই চাপলো বেণু। নিচু হ'য়ে দেখে নিলো পেট্রল আর কতটা আছে, মুখ তুলে বললো, 'বিয়ের দিন আসবেন কিন্তু ঠিক!'

উত্তরে কথা না-ব'লে বেণুর কাঁধে আস্তে একবাব হাতে রাখলো মৌলি। সিগারেট বেব ক'রে এগিয়ে দিলো তার দিকে।

'ওঃ, বাঁচালেন! আমার আবার—' বেণু পকেট চাপড়ালো।

'নেই বুঝি? প্যাকেটটা রাখো তুমি।'

'আপনার?

'আমার আছে। আ-চ্ছা।'

মৌলি গাড়ি থেকে নামলো, একটু স'রে দাঁড়ালো ইট-বের-কবা দেয়ালটা ঘেঁষে। পোড়ো জমিটুকুতে গাড়ি ঘুবিয়ে নিলো বেণু, সিগারেট-ধরা হাত তুলে বিদায় জানালো। গলির ফাঁকে অদৃশ্য হ'লো গাড়ির পিছনের লাল চোখ। এতক্ষণে মৌলি বুঝলো যে রাত হয়েছে, অনেক রাত হয়েছে।

তার সাড়া পেয়ে উঠে এলো বিশ্বস্ত কুলপ্রদীপ। উনুনের নিবন্ত আঁচে রান্নাঘরে সে ঝিমুচ্ছিলো এতক্ষণ; লালচে চোখের দৃষ্টি হেনে জিগেস করলো, 'খাবার আনবো?'

'না।'

মৌলি আর দেরি করলো না; ঘরে এসে কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লো। অন্ধকাবে তার চোখে লাগলো গ্যাসের বাতিটা—রোজই লাগে—ঠিক তার জানলার বাইরে নিষ্পলক চোখ—তার অনিদ্রার নিত্যসঙ্গী, তার স্বপ্নের প্রহরী, তার শত্রু, অভিভাবক। ভেবেছিলে তোমাকে ছাড়াতে পারবো না, এড়াতে পারবো না তোমার পিশুন দৃষ্টি, ভাঙতে পারবো না ডাইনি-জাদু তোমার? না, না! আমার সব স্বপ্ন তুমি জানো না এখনো, দু-একটি রত্ন আছে আমার—লুকোনো আছে সম্ভাবনার, সতর্কতার পবপারে।

মৌলি কপালে হাত রেখে গ্যাসের বাতিটা আড়াল করলো, কিন্তু চোখ বুজলো না। অন্ধকারে, তার খোলা চোখের সামনে, ভেসে উঠলো দৃশ্য—মানুষের চলাফেরা, ভঙ্গি। হাওয়ায় উড়ে এলো চেনা গলার

স্বর। কোথায় ছিলো সে এতক্ষণ? অন্য এক দেশে, অন্য এক জগতে। সে কি সেখানে বিদেশী, আগন্তুক, ক্ষণকালের অতিথিমাত্র? প্রথমে তা-ই মনে হয়েছিলো তার, যখন চিত্রার সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো দোতলায়, ঘরে এসে দরজার ধারে দাঁড়ালো। চোখের পাতা মিটমিট করেছিলো কয়েকবার, যেমন হয় ভুল ক'রে কোথাও এলে, কিংবা যেমন প্রবাস থেকে ফিরে এসে নিজের বাড়িও হঠাৎ মনে হয় অন্য রকম। কিন্তু তারপর—প্রথম ক-টি কথা যেই বলা হ'লো, দেখা হ'লো চারদিকে একবার তাকিয়ে—তরুণ-তরুণী, শিশুরা, মৃদুভাষিণী বৃদ্ধা—যে-মুহূর্তে এ-সব টুকরো ছবি পরস্পরে গ্রথিত হ'য়ে চলমান একটি দৃশ্য হ'য়ে উঠলো তার চোখের সামনে, তখন থেকে কিছুই তার করবার থাকলো না—কিছু করবার, ভাববার, বলবার চেষ্টা থেকে ছিন্ন হ'য়ে ভেসে গেলো সে, অথচ নোঙর-ছেঁড়া নৌকোর মতো লক্ষ্যহীন নয়, তাকে অলক্ষিতে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তন্ময় একটি হাওয়া—চারদিকের আবহাওয়া। হ্যাঁ, একটি আবহাওয়া—স্পষ্ট অনুভব করলো সে, যদিও কোনো বিশেষণ খুঁজলো না, নাম দিতে চাইলো না—দেয়ালের ছবি, চেয়ারের কুশান, উৎসবের আর স্মৃতির সূত্রে বাঁধা এই কয়েকজন মানুষ, এই সমস্তর যেটি যোগফল, উপজাতক—সেই আবহাওয়া ঘিরে ধরলো তাকে, নিবিড় হ'লো ক্রমশ, তার সম্মতির বা প্রতিবাদের অপেক্ষা না-রেখে শোষণ ক'রে নিলো কেমন ক'রে,—আর সে, মৌলিনাথ, সে শুধু ব'সে থাকলো, চেয়ে দেখলো, হাসলো কখনো ছোট্ট কোনো মেয়ের দিকে তাকিয়ে, কথা বললো যখন যেটুকু দরকার—ব'সে থাকলো নিষ্ক্রিয়, অনুত্তেজিত, সুস্থির, সংবেদনশীল।

চা এলো; আলো জ্বললো ড্রয়িংরুমে। টুংটাং পেয়ালার সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে কথা চললো, মাঝে-মাঝে হাসি;—মাঝে-মাঝে মুখের সে-সব বিশিষ্ট ভঙ্গি যা বলার সময় কি শোনার সময় হঠাৎ এক-একটি ছবি হ'য়েই মিলিয়ে যায়। সেই সব মোলায়েম বিষয় নিয়েই কথা উঠলো পর-পর, যা দিয়ে মানুষ সফলভাবে ভুলিয়ে রাখে নিজেকে, ভুলে থাকে জীবনের জ্বালা, কীটদষ্ট রুগ্ন হৃদয়ের যন্ত্রণা : পলিটিক্স, যুদ্ধের পরে দেশের ভবিষ্যৎ, পাকিস্তানের সম্ভাবনা, এই সব মসৃণ ঢালুতে গড়াতে-গড়াতে সিনেমার দিকে কথা বেঁকলো, সাইগলের মৃত্যুর জন্য অতি গভীর দুঃখ প্রকাশ করলো বেণুর স্ত্রী, যে কিনা এতক্ষণ ঠোঁটে একটি মনোরম হাসি ফুটিয়ে অতিথিদের শূন্য থালার পুনঃপূরণের চেষ্টাতেই ব্যস্ত ছিলো বেশি। সাইগল থেকে গানের কথা—ততক্ষণে চায়ের বাসন সরানো হচ্ছে...আর গানের কথা যদি গান গাওয়াতে না পৌঁছলো তাহ'লে তো এই সম্মেলনটাই অনর্থক বলতে হয়। তাই চেয়ার ঠেলে-ঠেলে জায়গা করা হ'লো মেঝেতে, হালকা পায়ে ছোট্ট তিনটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো—বেণুর প্রথমা, আর দুই বন্ধু তার;—ঘুরে-ঘুরে নাচলো তিনজনে, কখনো হাতে হাত ছুঁয়ে, কখনো স'রে-স'রে গিয়ে, কখনো পিঠে পিঠ দিয়ে ছন্দে-বাঁধা ব্যায়ামের ভঙ্গিতে; সঙ্গে টিংটাং গীটার বাজালো মিতু, আর হিম—মিতুর ভাই—সে এ-সব মেয়েলি বিষয়ে অত্যধিক অবজ্ঞা দেখিয়ে আলগোছে স'রে দাঁড়ালো এক কোণে, কিন্তু লুটিয়ে-পড়া চুলের তলায় তারও চোখ দেখতে-দেখতে নেচে উঠলো। সুন্দর ছেলে, হিম, সুন্দর ছেলেমেয়েরা! নাচের সঙ্গে গানও গাইলো ওরা—খুব একটা ছেলেমানুষি চপল গান—লাফানো তালের চটপটে সুরে বসানো; যখন সুর চড়লো তখন গলার পরদা স্থির রাখতে গিয়ে এ ওর চোখে তাকিয়ে ওরা হেসে ফেললো।

ঘণ্টা কাটলো, আরো ঘণ্টা; মৌলিকে ফাঁকি দিয়ে ব'য়ে গেলো সময়, সময়ের দাঁতের ধার অনুভব করা আর সম্ভব হ'লো না তার পক্ষে। আবছা কেমন মনে হচ্ছিলো যে উঠলে হয় এবার, কিন্তু বিদায় নেবার ফাঁকটুকুই যেন জুটছিলো না—অথচ কেউ যে তাকে পিড়াপিড়ি করছিলো তেমনও নয়, সব সময় স্বতন্ত্রভাবে তাকে লক্ষ্যও করছিলো না, খুব সহজেই মেনে নিচ্ছে তাকে, আছে ব'লেই ধ'রে নিচ্ছে যেন—এটাই তার সত্তার কোনো গভীর স্তরে স্পর্শ করলো তাকে; ভালো লাগলো তার, মনে হ'লো যেন নিজের ভার নেমে গেছে হঠাৎ, বাধ্যতা আর নেই, কথা বলার, চিন্তা করার, কাজ করার কোনো বাধ্যতা নেই আর। হ্যাঁ—এতই সব সহজ এখানে স্বতঃস্ফূর্ত, যে একবার তাকে একা ফেলেও চ'লে গিয়েছিলো অন্যেরা—যখন ড্রয়িংরুমের পালা ভাঙলো আর এদিক-ওদিক ছিটকে পড়লো সবাই—সে ব'সে ছিলো দক্ষিণের বারান্দায়, গোলাপি রঙের শেড-পরানো আলোর তলায়, কোলের উপর তিন

মাসের পুরোনো 'ল্যানসেট' পত্রিকা—নেহাৎই অভ্যেসের বশে তুলে নিয়েছিলো টেবিল থেকে। তাকিয়ে দেখছিলো ড্রয়িংরুমের দিকে, তার ওপারে লম্বা সরু খাবার ঘর—এরই মধ্যে রাতের খাওয়ার টেবিল সাজানো হচ্ছে—সেখানে দেখছিলো বিমলেন্দুকে—ড্রয়িংরুম পার হ'য়ে আসছে—শান্ত, মৃদু বিমলেন্দু, আগের মতোই খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, আগের চেয়েও পরিশীলিত মুখশ্রী—তার সমস্ত ভঙ্গিতে কোথাও কোনো আতিশয্য নেই, উৎসুকতাও নেই, কিন্তু প্রস্তুতি আছে অবিচল। নম্র গলায় বিমলেন্দু জানতে চাইলো মৌলিনাথের নতুন বইয়ের খবর, মৌলি সেটাকে ঘুরিয়ে দিলো ইংরেজি সাহিত্যের হালখবরের দিকে, কখন এসে মহেন্দ্রবাবু তাতে যোগ দিলেন। একটু পরে মহিলারা এলেন সেখানে, তুলনা চললো দিল্লি লন্ডন কলকাতার মধ্যে সবচেয়ে কম খরচ এখন কোন শহরে। মৌলি এ-আলোচনায় যোগ দিলো না, শুনলোও না সবটা;—কিন্তু তার ভালো লাগলো ব'সে থাকতে, গোলাপি শেডের আলোর তলায় বেতের চেয়ারে—যখন এতগুলি মানুষের গলা এঁকে-বেঁকে ঘুরছে তার চারদিকে। হঠাৎ কী-একটা কথার পরে সে আবিষ্কার করলো যে মহেন্দ্র ঘোষ মানুষটা বেশ ভালোই;—আর যখন খেতে ব'সে প্রভূত পরিমাণ পরোটা কাবাব পোলাও কালিয়ার পরে ছানার পায়েসের সদ্‌গতি করতে-করতে পুরু কাচের চশমার পিছনে তাঁর চোখ দুটি ঘোলাটে হ'য়ে এলো, তখন তাঁকে দেখে উৎফুল্ল না হবে এমন চিত্ত কি মানুষে সম্ভব!

টুকরো হ'য়ে, বিক্ষিপ্ত হ'য়ে, কোনোরকমে পারম্পর্য রক্ষা না-ক'রে অন্ধকারের পটের উপর দিয়ে ভেসে গেলো এলোমেলো তরল এই দৃশ্যগুলি। তারপর—হঠাৎ সব কালো হ'য়ে গেলো, মৌলির চোখের সামনে মুহূর্তের জন্য ঝুলে থাকলো শুধু অন্ধকার। মৌলি অপেক্ষা করলো, প্রতীক্ষা করলো; মনে-মনে জানলো তার ভুল হবে না। অন্ধকার কেটে গেলো আবার; বেরিয়ে এলো—ফিরে এলো—তার স্বপ্ন! কিন্তু স্বপ্ন আর নয়, সত্য। ঐ তো সে—গীতা—ব'সে আছে, দাঁড়িয়ে আছে, হেঁটে যাচ্ছে, জলের গ্লাশ মুখে তুলছে, কী-একটা কথা বলছে মিতুকে। সেই গীতা—যেমন আগে ছিলো তেমনি, মনে হয় না একটুও তার বয়স বেড়েছে, মনে হয় যেন পরিবর্তনের জোয়ার-ঢেউ থমকে গেছে তার সামনে এসে—কিংবা যেটুকু তাকে ভিজিয়ে গেছে সে শুধু আরো শালীন ক'রে তুলতে, আরো স্বচ্ছ, সৌষম্যে আরো নিখুঁত। একটু রোগা হয়েছে, তার লালচেভাবের ফর্শা রংটি একটু ম্লান—ভালোই হয়েছে বিলেতের খাওয়ার কষ্টে, না কি ভিতর থেকে তার চরিত্রই ফুটিয়ে তুলেছে নিজেকে, ব্যক্ত হয়েছে এতদিনে? দিশি তাঁতের শাড়ি পড়েছে, শাদা ব্লাউজ কাঁধে অল্প কাজ করা, পরিষ্কার দুটি ভুরুর তলায় চোখের রং হালকা দেখায় আগের চাইতে, যেন চোখ দুটি ধুয়ে দিয়েছে অনেকবার, মুছে দিয়েছে অনেকবার এই বছরগুলি। বার-বার ঐ চোখে তার চোখ পড়েছে—দূর থেকে, কখনো বা কাছাকাছি ব'সে—লোকজন, কথাবার্তা, খাওয়া, সব-কিছু অতিক্রম ক'রে বার-বার—কেমন যেন মনে হচ্ছিলো মৌলির যে এতগুলি ঘণ্টার মধ্যে যখনই সে চোখ তুলেছে তখনই দেখতে পেয়েছে গীতাকে, হয়তো ঘরের অন্য প্রান্তে, হয়তো ড্রয়িংরুম পেরিয়ে খাবার ঘরে, কিংবা হঠাৎ তার একেবারে সামনে যখন একলা সে ব'সে ছিলো বারান্দায়। কোনো কথার বিনিময় হয়নি—যদি বা হ'য়ে থাকে সে খুব সাধারণ কিছু কথা—না, না, কথা না, সেটা বড্ড বেশি, সেটা সহ্য হবে না—শুধু ঐ চোখ দুটি আমাকে দেখতে দাও, নির্মল চোখ তোমার—যেখানে আর প্রশ্ন নেই, বিক্ষোভ নেই, নেই মেঘ, মেঘের বুকে বিদ্যুতের ঝিলিক—কোন দূর সান্ধ্যঝড়ে যা-কিছু তুমি কুড়িয়েছিলে, তার কোনো চিহ্ন আর আঁকা নেই যেখানে।—আর যখনই গীতা স'রে গেছে, যখনই এমন হয়েছে যে গীতা হারিয়ে গেছে তার চোখ থেকে, তখনই সে দেখতে পেয়েছে চিত্রাকে, শুনতে পেয়েছে চিত্রার মুখে কথার সান্ত্বনা, সেই সঙ্গে এমন এক অরণ্যের মর্মর যা আরম্ভ হ'লে আর শান্ত হ'তে চায় না।

গীতা! চিত্রা!—বালিশের কানে নিশ্বাসের স্বরে উচ্চারণ করলো মৌলি—সেই দুটি নাম, যা একদিন সে ছেঁড়া চিঠির টুকরোর মতো উড়িয়ে দিয়েছিলো হাওয়ায়, কিন্তু আজ কোন নতুন অর্থ দিয়ে তার নিদ্রাহীনতা ভ'রে দিলো। সে-অর্থ প'ড়ে দেখবে এত সাহস কি আছে তার? কিন্তু সে তো জানে—বুকের মধ্যে টান পড়েছে তাইতে তার না-বুঝে আর উপায় নেই—জীবনে যা সবচেয়ে সহজ,

সবচেয়ে গভীর, তারই আধার আজ তার কাছে ঐ নাম দুটি, যেন ঝিনুকের দুটি খোলার মতো, যার মধ্যে বেশি কিছু নেই, কিন্তু সেটুকুই আছে যাতে মানুষের প্রয়োজন, যাতে মানুষ বাঁচে—তার ঘর, সংসার, শরীর, হৃদয়—কখনো যার অভাব হয় না সেই সব সাধারণ সুখদুঃখ। আ, চিত্রা—কেন তুমি আমাকে ভর্তি ক'রে নাওনি তোমার ইস্কুলে—জীবনের সেই আদিবিদ্যার মণ্ডপে—যেখানে কাঁচা পেয়ারা গাড়িতে ব'সে আরো ভালো লাগে, আর সেই গাড়ি থামলে দরজা খুলে দেয় কপালে-চুল-লুটিয়ে-পড়া ছোট্ট ছেলে! সেখানে কি কোনো পড়াই শেখা হ'তো না আমার—আমি কি এমন ক'রেই পালিয়েছিলাম যে কেউ আর ফিরে ডাকলো না আমাকে!...গীতা, তুমি! কিন্তু কেন তুমি কবিতা পড়লে, গীতা, তোমার চোখের হিরের ফোঁটা কবিতা প'ড়ে নিবিয়ে দিলে কেন—বোন হ'য়ে এলে কেন আমার কাছে, ডাকলে যদি আমারই গলায় ডাকলে কেন!...আবার? না, আর না, আর হবে না, আমি অনেকদূর এসেছি, আমি বৃত হয়েছি—বিদ্ধ হয়েছি, গীতা!—আমার জন্য কিছু আর নেই এখন, শুধু মুহূর্তের মহিমার আস্বাদ—আর রিক্ততা—শূন্যতা—দিনের পর দিন।

বছরগুলি স্রোতের মতো ব'য়ে গেলো। কী করেছে সে, কী ঘটেছে তার জীবনে এতদিন? মৌলির মনে পড়লো তার মা-কে, মা-র মৃত্যু, তার মুক্তি—শোকের আমেজে মধুর-হওয়া মুক্তি তার। সেই তো ছিঁড়লো পুরানা পল্টনের দড়িদড়া, চ'লে এলো কলকাতায়। তারপর? একদিকে তার সধূম কামাচার, আর এই ঘরে, ঐ একটি টেবিলে ব'সে-ব'সে, তার অসহ্য আহরণ, অকথ্য প্রতিদান। তৃপ্তি পায়নি, ইন্দ্রিয় তাকে ধুলোর ঝড়ে চাবুক মেরেছে; স্বাস্থ্য পায়নি, অসম্ভবের চেষ্টা তাকে বিকল করেছে; জীবন পায়নি, নিজে কিছু সৃষ্টি করবে এই স্পর্ধা বলি নিয়েছে তাকেই, তারই রক্তেমাংসে প্রবহমান প্রাণ। মেধার দীপ জ্বেলেছিলো ঘরে—কে জানতো এত ভীষণ তার ইন্ধন! কবি, শিল্পী, ভাবুক! না কি খঞ্জ, ক্ষয়িত, আতুর? চিন্তার প্রপাত, সংরাগের তুফান, শরীরের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে সেই জ্ব'লে ওঠা আর নিবে যাওয়া—কিছু বলার, ব্যক্ত করার যন্ত্রণা, শূন্য থেকে বিশ্ববোধনের অত্যাচার! সেই হিমজ্বরে, আগুনজ্বরে ক্ষয় হ'তে-হ'তে কোথায় এসে ঠেকেছে সে, কোন চরম প্রান্তে—এর পরে আর ক্লান্তিও নেই, এর পরে তার ক্লান্তিও তাকে ছেড়ে যাবে, তখন আর কিছুই থাকবে না। মৌলিকে যেন অন্ধকারে ঘিরে দাঁড়ালো তার জীবনের বিধ্বস্ত বছরগুলি—পাংশু প্রেতমূর্তি সব—ছায়ার মধ্যে ছায়া হ'য়ে মিলিয়ে গেলো—আর সেই অন্ধকার পার হ'য়ে ভেসে এলো ছোট্ট তিনটি মেয়ের গান, নাচের সুর—জীবনের তুচ্ছ, মধুর রাগিণী। বিষাদ নামলো তার বুকের উপর, চাপ দিলো হৃৎপিণ্ডে, আঁকড়ে ধরলো কণ্ঠনালী, বেরিয়ে এলো তপ্ত কঠিন চোখের জলে। মৌলি নিস্পন্দ হ'য়ে, প'ড়ে থাকলো, যেন কোনো নতুন দেবতার কছে নিজেকে সমর্পণ ক'রে, বালিশে মুখ চেপে অস্ফুটে উচ্চারণ করলো—'হৃদয়, হৃদয়, আমার মৃত হৃদয়, তুমি জেগে ওঠো, বেঁচে ওঠো আবার।'

উপসংহার

একটি বসন্তের রাত্রি

'গীতা, বিমলেন্দু,

তোমাদের বিয়েতে থাকতে পারলুম না, ইচ্ছে ক'রেই থাকলুম না। যেখানে ভিড়, কথার, চোখের, মুখের ভিড়, সেখানে তোমাদের হারিয়ে ফেলতুম আমি : তোমাদের কাছে থাকবো, সঙ্গে থাকবো ব'লে, খুঁজে পাবো, ফিরে পাবো ব'লে, আমাকে চ'লে আসতে হ'লো কলকাতা থেকে দু-শো মাইল দূরে, আকাশের তলায়, স্তব্ধতার বুকে, নির্জনতায়। আমি ছেড়ে এলাম, পালিয়ে এলাম, ফিরে গেলাম : অনেক কালো, অনেক কাঁটা, অনেক আঁকাবাঁকা দূরত্ব পার হ'য়ে তোমার কাছে ফিবে এলাম, গীতা।

জায়গাটার নাম হট্টিমারিয়া। নাম শুনেই বুঝতে পারছো কেমন জায়গা। কোনো টাইমটেবিলে খুঁজে পাবে না একে, নিকটতম রেল-স্টেশন আট মাইল দূরে, পোস্টাপিস পাঁচ মাইল। কাল ঝিঙ্কানির হাট—এদিককার বৃহত্তম, আর বলতে পারো একমাত্র ঘটনা : সকালে লরি যাবে, তাদের হাতে এই চিঠি পাঠিয়ে দেবো; কিংবা হয়তো—নিশ্চিন্ত হবার জন্য, এবং হাট দেখার জন্য, নিজেই চ'লে যাবো ভিণ্ডি ড্রাইভারের পাশে ব'সে। অতিশয় দ্রষ্টব্য হাট শুনেছি, বক্ত সেখানে আদিম ছন্দে লাফায় এখনো, ইস্পাতের ফলা-পরানো নখ দিয়ে পরস্পরের টুঁটি ছেঁড়ে জঙ্গি মোরগ, দশ গাঁযের ছেলে-বুড়োর চোখের সামনে যুবতীদের জাপটে ধ'রে টেনে নিয়ে যায় পাণিপ্রার্থীরা—আর মেয়েরা হাসতে-হাসতে অপহৃত হয়। সিংভূমেব হৃদয়ের মধ্যে চ'লে এসেছি—এরা এখানে আদালত চেনে না, বই চেনে না, আর্ট কাকে বলে জানে না, ক্রাইম কাকে বলে বোঝে না—বোঝে শুধু বিকালের রোদ্দুরে ব'সে দল বেঁধে পচাই খাওয়া, আর সন্ধ্যে হ'লে ছোট্ট একটি মাটিব ঘর। এদের ভূতের ভয় বড্ড, সেইজন্য জানলা দেয় না ঘরে—কিন্তু জীবনেব ভয় নেই, সমযের ভয় নেই! সভ্যতা থেকে দূরে আছে এরা, তোমাদের বিয়ের রাতের কাছাকাছি।

আমি এদের তারিফ করি, ঈর্ষা করি, করুণা করি, এদের জন্য উচ্ছেদ ইচ্ছা করি আমি। কেন আর আছে এরা, ইতিহাসের উদ্বৃত্ত হ'য়ে কেন আর প'ড়ে আছে পৃথিবীতে? শুধু নৃতত্ত্বের গবেষণার জন্য? পাদ্রির হাতে মরার আগে মরার জন্য? বেড়াতে-আসা নাগরিকের রঙিন একটু আমোদের জন্য? না কি আমার মতো বুদ্ধিপীড়িত মানুষের শুশ্রূষার জন্য? কোনোটাই না, জানি এদেব ও-রকম ক'রে ব্যবহার করাটা হীনতা;—কিন্তু সে যা-ই হোক, আপাতত আমার চেতনার ভার এদেব মধ্যে ছুঁড়ে দিলাম আমি, আমার সমস্ত ভাবনার দ্বন্দ্ব নির্বোধ প্রকৃতির পায়ে নামিয়ে দিলাম।

হট্টিমারিয়াকে আবিষ্কার করেছিলুম গেলো বছর, রাঁচি থেকে চক্রধরপুরে আসার পথে। বাস্ বিগড়োলো হঠাৎ, বোঝা গেলো দু-তিন ঘণ্টার ব্যাপার। বোকার মতো গাছতলায় দাঁড়িয়ে উদাসীন বনজঙ্গল নিরীক্ষণ করছি, এমন সময় পাহাড়ি পথে আশাব দূত মোড় নিলো। ছোট্ট, লাল রঙের গাড়ি : হাত তুলে থামাতে যাচ্ছিলুম, নিজেই থামলো। মুখ বাড়িয়েই নেমে পড়লেন সিল্কের পাঞ্জাবি-পরা ভদ্রলোক। 'আপনি...? কী ভাগ্য আমার! কী সৌভাগ্য!' 'আমার সৌভাগ্য ততোধিক, কেননা—' 'বুঝেছি। আসুন।' যেতে-যেতে ভদ্রলোক বললেন কবে আমাকে 'বিচিত্রা' আপিশে দেখেছিলেন, আমার দশ বছর আগেকার একটা বইয়ের নাম করলেন। মুহূর্তের জন্য নিজের উপর আমি খুশি হ'তে পারলুম বই লিখি ব'লে। একটু মুখ-বদল।

বাংলোর বারান্দায় বেতের চেয়ার, সামনে আকাশ, ঘাস, গাছপালা, পাঁচ ঘণ্টা বাস্-এর ঝাঁকুনির পর হাত-পা ছড়াবার আরাম, আপাতদৃষ্টিতে নির্মানুষিক জনপদে হঠাৎ আতিথেয়তার ওয়েসিস। চা

তেমনি ভালো, যেমন ভালো লাগে চা শুধু পথে, কিংবা বিপথে বেরোলে; দুটি অলস ঘণ্টা : তেমনি ভালো, যেমন ভালো লাগে নতুন কোনো জায়গায় গিয়ে শুধু ঘণ্টা দুই কাটিয়ে এলে। যেখানে গিয়ে বেশিদিন থাকি আমরা, তার চাইতে অনেক স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ, স্মৃতি এঁকে যায় চলতি পথে অল্পক্ষণ থাকি যেখানে; যে-ইচ্ছে মিটলো না সেটা মনের মধ্যে ছবি হ'য়ে বেঁচে থাকে। আমাকে আবার বাস্-এর রাস্তায় পৌঁছিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'যদি কখনো ইচ্ছে হয়, যদি কখনো সুবিধে হয়...খুব খুশি হবো।' স্মৃতি নিয়ে ফিরে এলাম সেবার, ইচ্ছে নিয়ে ফিরে এলাম।

এ-সব ইচ্ছে কখনোই প্রায় পূর্ণ হয় না জীবনে : সেই পাহাড়ের গায়ে ডাকবাংলো, সেই শিরীষ-ফোটা বিকেলবেলার রেল-স্টেশন, সেই শহর ছাড়িয়ে বনের মধ্যে হঠাৎ-খুঁজে পাওয়া রেস্তোরাঁ—ও-সব জায়গায় কখনোই আর ফিরি না আমরা! কিন্তু হট্টিমারিয়ার মনে-মনে প্রথম থেকেই এই ছিলো যে তার কাছে আমি আমার কথা রাখবো। সেই রাত্রে—যখন আবার দেখা হ'লো তোমাদের সঙ্গে, তিনটি ছোটো মেয়ের ছেলেমানুষি নাচের সুর কানে নিয়ে ফিরে এলাম—সেই রাত্রে ঘুমোবার আগেই আমি মনে-মনে জানলাম যে কালই আমাকে কলকাতা ছাড়তে হবে। আর হট্টিমারিয়া তখনই এসে হাজির হ'লো আমার মনের সামনে—প্রয়োজনীয়, পর্যাপ্ত, প্রস্তুত। ওখানটাতেই প্রয়োজন আমার; যা-কিছু আমার প্রয়োজন সব ওখানে আছে। বুকের মধ্যে প্রার্থনার মতো নিঃশব্দ গান নিয়ে, অর্ধেক-লেখা বইয়ের পাণ্ডুলিপি নিয়ে, সুখের মতো একটুখানি বিষাদ নিয়ে, পরের দিনই বেরিয়ে পড়লাম।

আছি সেই বাংলোতে, লম্বা, সরু, লুকিয়ে-থাকা বাংলো। এইজন্যে লুকিয়ে-থাকা যে দূর থেকে চোখেই পড়ে না, উঁচু-নিচু পাহাড়ি পথ ছেড়ে খানিকটা সমতল দিয়ে চলতে-চলতে হঠাৎ মোড় নিয়ে থামবে তোমার গাড়ি, আর তুমি একটু অবাক হ'য়ে তাকিয়ে দেখবে গাছপালা ঝোপঝাড়ের আড়ালে অতিশয় নিমন্ত্রণকারী বাংলোটি। উঠে আসবে বারান্দায়, সামনে বাগান, আর দূরে—যেদিকেই তাকাও—আর-কিছুই নেই ঈশ্বরের মাটি ছাড়া। কোনো 'দৃশ্য' নেই এখানে, চোখের কোনো চাটনি নেই, আজকালকার বাংলা বইয়ের মতো রঙিন মলাটের বিজ্ঞাপন নেই কোথাও—মস্ত জগতের চোখের বাইরে, অখ্যাত, অজ্ঞাত, প'ড়ে আছে এই হট্টিমারিয়া। কিন্তু জানো, অজ্ঞাত ব'লে কোনো দুঃখ নেই এর—আকাশের তলায় রোদ পোহাচ্ছে শুয়ে-শুয়ে; ফুল ফুটছে, পাতা কাঁপছে, দিনের পর রাত হচ্ছে, এইটুকু নিয়েই সম্পূর্ণ এর সুখ।

গৃহস্বামী থাকে বাংলোর পিছনে, লাউমাচা শব্জিক্ষেতে সাজানো বাড়িতে। বাংলোটা গেস্ট-হাউস গোছের, রাজার কলকাতার আপিশের কর্মচারীরা আসেন মাঝে-মাঝে, বছরে একবার খোদ ম্যানেজর। রাজা মানে মীরপুরের রাজা—নানারকম ব্যবসা করেন তিনি, হট্টিমারিয়ায় চিনেমাটির খনি কিনেছেন, তারই তদারক করেন এই ভদ্রলোক। ছোটো খনি, আর খুব নিঃশব্দ আর পরিষ্কার, তাল-তাল ছাইরঙের নমনীয় ঠাণ্ডা মাটি নিয়ে কারবার, হাতে নিলে দাগ লাগে না, গালে কপালে বুলোতে ইচ্ছে করে। খনিতে যেটুকু কাজ চলে তার কিছুই ঢেউ এসে পৌঁছয় না বাংলোয়—মাঝে-মাঝে লরির আওয়াজ ছাড়া—হো-মজুরদের যাওয়া-আসা, যন্ত্রপাতির চলাচল, রাজামশাইর লাভের অঙ্ক—সমস্তটাকে যেন গিলে খেয়ে চুপ ক'রে আছে অঢেল আকাশ। যেখানে আকাশ এত বড়ো, পৃথিবী এত প্রচুর, সেখানে মানুষের পরিশ্রমকে কী অকিঞ্চিৎকর মনে হয়, কী তুচ্ছ! এই চিনেমাটির খনি হট্টিমারিয়ার আদিম শান্তিতে আঁচড় কাটতে পারেনি, বরং একটি বাংলো উপহার দিয়েছে জায়গাটিকে, একটি আতিথ্যপরায়ণ পরিবার, যেখানে আমি আপাতত আশ্রয় পেয়েছি।

স্তব্ধতা ছাড়া, সূর্যের ওঠা-নামার সঙ্গে-সঙ্গে আলো-ছায়ার রং-বদল ছাড়া, বাত্তিরে কুয়াশার আকাশে বাড়ন্ত চাঁদ ছাড়া, আর কোনো খবর নেই এখানকার। ভদ্রলোক সকালে উঠে কাজে বেরিয়ে যান, ফিরে এসে খেয়ে দেয়ে ঘুম দেন দুপুরবেলায়, বিকেলে আবার আস্তে-আস্তে খনির দিকে যান একবার—আর ফাঁকে-ফাঁকে, মাঝে-মাঝে, একটু-একটু দেখা হয় আমার সঙ্গে, কথা হয়। তাঁর মুখে সব সময় হাসি, গলার স্বর নরম, জীবন সম্বন্ধে অভিযোগ কম, ছেলেপুলে অনেক। মাথায় প্রায় সমান-সমান গোলগাল বাচ্চারা—ক-জন এখনো ঠাহর করতে পারিনি—যখন-তখন বাপের জামা ধ'রে ঝুলে পড়ছে—দেখতে

বেশ লাগে আমার। অবশ্য আমার কাছাকাছি বেশি ঘেঁষতে দেয়া হয় না তাদের—পাছে আমার লেখায় ব্যাঘাত হয়, কী ক'রে এঁদের ধারণা হয়েছে আমি এখানে এসেও লিখছি। ভদ্রমহিলা—যখন অনেক ছেলেপুলে আর অধিকতর সংকোচ কাটিয়ে তিনি এক-আধবার আসতে পারেন—এই জংলি দেশে প'ড়ে আছেন ব'লে, আর আমার নানারকম কাল্পনিক অসুবিধের উল্লেখ ক'রে, ফিশফিশে গলায় বিলাপ করেন তিনি। এই ক-জনকে বাদ দিয়ে আর যে-মানুষটিকে এখানে মাঝে-মাঝে দেখতে পাচ্ছি, তার নাম—ঝিংকি বা ওনঝু বা ঐ-রকম কিছু—হো মেয়ে, কুচকুচে কালো, ধবধবে দাঁত, ফুর্তিতে উপচে-পড়া—সে আমার ঘর ঝাঁট দিয়ে দেয়, নিয়ে আসে ইঁদারা থেকে স্নানের জল, আর পথে যখন বাগানের মালি তার দিকে তাকিয়ে কিছু বলে, তখন—দু-হাতে দুই ভরা বালতি নিয়েই—হেসে ওঠে, হাজার পাখি একসঙ্গে যেন ডেকে উঠলো। সে কী হাসি—শুনলে মন ভালো হ'য়ে যায়, গীতা!

আমি যখন বাইরে আসি ছুটি নিয়েই আসি, কাজ বন্ধ থাকে। কিন্তু এবারের আসাটা একটু অন্যরকম, ভাবটা যেন উপরিওলার অনুমতি ছাড়াই চ'লে এসেছি, উপরিওলাও এসেছেন তাই সঙ্গে-সঙ্গে। যেই লিখতে-থাকা বইটা মাঝপথে হঠাৎ আটকে গেলো; উচিত ছিলো ওখানে ব'সেই কপাল কোটা, মাথা ফাটানো; কিন্তু ঐ দায়িত্বের প্রকাণ্ড ভার থেকে চিত্রা আমাকে মুক্তি দিলো। সে এলো আমার ঠাণ্ডা ঘরে, রুদ্ধ ঘরে; এসে বললে—হালকা হও, সহজ হও। তাই তো বাক্স গুছোবার সময় পাণ্ডুলিপিটাও বাদ দিলুম না, ঐ কাগজগুলোকে চোখে দেখে গা-বমি-বমি করলো না আমার, সাহস হ'লো নিজের কাঁধে ব'য়ে বেড়াতে। ঐ মৃত্যু থেকেই নিংড়ে নিতে হবে নতুন জীবন : বাঁচতে হ'লে বার-বার মরতে হয়, গীতা, মরতে না-জানলে জীবন কী ক'রে নতুন হবে? এখনো অবশ্য লেখাটা বের করিনি; ব'সে-ব'সে ভাবছি, লেখার কথা না, নানা কথাই ভাবছি—ঠিক ভাবছিও না, শুধু ব'সে আছি, হ'তে দিচ্ছি, হ'য়ে উঠছি। তার মানেই বইটার কথা ভাবছি—তাও না, আমিই হ'য়ে উঠছি বইটা, যেন অন্য কেউ আমাকে লিখে যাচ্ছে।

তোমাকে এই চিঠি : এই প্রথম এখানে এসে কলম ছোঁয়ালাম কাগজে। এ-চিঠি লিখতেই হ'লো; যখন আর না-লিখেই পারবো না, সেই মুহূর্তটির জন্য অনেকগুলো দিন আমি অপেক্ষা করেছি। আজ এসেছে সেই সময়। আজ আকাশ ভ'বে জ্যোছনা, আর হাওযায় যেন বসন্ত, হঠাৎ এখানকার কনকনে শীতেব মধ্যে ফাল্গুনের একটি রাত্রি। আজ ডাক এলো তোমার, আর ফেরাতে পারলুম না, ধরা দিতে হ'লো। জানলার ধারে লণ্ঠনের আলোয় ব'সে-ব'সে লিখছি।

আমার একটি গোপন কথা বলবো তোমাদের। জীবন ভ'বে, দিনের পর দিন, আমার প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছি আমি, আবার সেটাকে যত ভয় করেছি তেমন আর কিছুকেই না। তোমাকে জানি, গীতা; জানি তুমি কথাটাকে অহমিকার নমুনা হিশেবে নেবে না, আর তুমি—বুদ্ধিমান, মনোযোগী বিমলেন্দু, তুমিও আমার কথা বুঝবে। আমি-যে বই লিখি, না-লিখে পারি না, লোকে যাকে আর্ট বলে তারই ভাষায় জীবনটাকে তর্জমা না-করা পর্যন্ত আমি যে শান্তি পাই না, এর জন্য নিজেকে আমি যতটুকু তারিফ করেছি, তার চেয়ে ভয় পেয়েছি বেশি, নিছক ভয়, কাপুরুষ ভয়। কাপুরুষের মতো পালাতে চেয়েছি, লুকোতে চেয়েছি; পারিনি, আমার অসুস্থ, বিকৃত জেদটাকে বাগ মানাতে পারিনি। যত বছর ধ'রে আমি বই লিখেছি, বই ভেবেছি, বই খেয়েছি, বই নিযে ঘুমিয়েছি, তত বছর ধ'রে আমি মনে-মনে চেয়েছি অন্য কেউ হ'তে, অন্যদের মতো হ'তে—ভালো, ভদ্র, ভদ্রলোক। তার চেয়েও বেশি; আমি মানুষ হ'য়ে বাঁচতে চেয়েছি এই জগতে, সকলেব মতো হ'য়ে; যা আমি ভালোবেসেছি তা আমি সইতে পারিনি, যা আমি মানতে পারিনি তা আমি ঈর্ষা করেছি। আমি মহেন্দ্র ঘোষ হ'তে চেয়েছি, তুমি হ'তে চেয়েছি, বিমলেন্দু; আর পাছে তা হ'য়ে যাই, তার যে-কোনোরকম সম্ভাবনাকেই গলা টিপে মেরেছি। এই আমার ইতিহাস : যা-কিছু আমি করেছি আর করিনি, যা-কিছু আমি ভেবেছি আর করিনি, সেই পুঞ্জীভূত ব্যর্থতার ইতিহাস।

কিন্তু দুঃখ করি না। সব জেনেছি আমি : আতঙ্কের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছি। যদি আমি আব লিখতে না পারি, যদি আমি আর লিখতে না পারি। যদি ফুরিয়ে যায়, থেমে যায়, হাবিযে যাই। কী

হবে তাহ'লে, কী হবে, কী হবে, কী উপায় হবে আমার। কেমন ক'রে বাঁচবো, ম'রে গিয়েও বেঁচে থাকবো কেমন ক'রে। হিম হ'য়ে গেছে হাত-পা, বন্ধ হয়েছে নিশ্বাস। কিন্তু তবু তো শেষ পর্যন্ত হার হ'লো না আমার, বেরিয়ে এলুম। সেই রুদ্ধতার মধ্যে ভেঙে এলো চিত্রা, আমাকে টেনে নিয়ে গেলো মোহানার দিকে, নদী যখন সমুদ্রের কাছে এসে আরো বেশি চওড়া হয়, চাঞ্চল্য হারায়, জীবনের সেই মোহানার দিকে, গীতা। তোমাদের মিলনের মধ্যে এই আমি অর্থ পেলুম, এই নিঃশব্দ সঞ্চার, সমর্পণের সার্থকতা। যেখানে মেনে নেয়া মানে হেরে যাওয়া নয়, নুয়ে পড়া মানে দুর্বলতা নয়। ছোটো হবার শক্তি, হালকা হবার স্বাধীনতা। জীবনে যা আমি হারিয়েছি, ইচ্ছে ক'রেই হারিয়েছি, তার মূল্য বুঝে সবল হ'য়ে উঠলুম আমি। ধন্যবাদ তোমাদের—গীতা, চিত্রা, সব-কিছুর জন্য ধন্যবাদ।

রাত হ'লো, অনেক রাত হ'লো। এখানে সারাদিন চুপচাপ, আর সন্ধে হ'তেই রাত্রি, তবু মাঝরাতের বিশেষ একটি স্তব্ধতা আছে, হট্টিমারিয়াও তা থেকে বঞ্চিত নয়। চাঁদ চ'লে গেছে আমার চোখের বাইরে, জ্যোছনায় কালো-কালো গাছগুলো যেন নিজেদেরই ছায়ার মধ্যে মিশে আছে, হঠাৎ হাওয়ায় স্বচ্ছ হ'য়ে খুলে যাচ্ছে উঁচু ডালের ছোটো এক-একটি পাতা। চোখের মতো, তোমার চোখের মতো, গীতা। আমি কি জানি না যে আজকের এই বসন্ত আমার জন্য তোমারই উপহার, আমি কি জানি না যে এই হাওয়ায় তোমাদেরই বিয়ের রাত্রি ভেসে আসছে আমার দিকে, আমাকে স্পর্শ ক'রে যাচ্ছে তোমাদের হাতে রাখা হাত। তাই তো আর ভয় নেই আমার; এখন শুধু অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে—অন্য সব নিজে-নিজেই হবে। শুরু হ'য়ে গেছে এরই মধ্যে; এই রাত্রি ভ'রে তুলছে আমাকে, আমি বেড়ে উঠছি, আমার না-লেখা বই আলোর মধ্যে বেড়ে উঠছে তোমাদের অপেক্ষমাণ সন্তানের মতো। মিলিত হও, গীতা, সম্পূর্ণ হও, ভালোবাসো। আমার জন্য থাক আমার নির্জনতা, শুধু তৈরি হ'য়ে থাকার এই নম্রতা, আমার ক্লান্তির কালো কালো ফুলগুলি হো মেয়ের হাসির স্রোতে ভেসে যাক। আমি রওনা হলাম, বুকের মধ্যে নিঃশব্দ প্রার্থনা নিয়ে সুখের মতো এক ফোঁটা বেদনা নিয়ে, আবার আমি পথে বেরোলাম : আর এই নতুন পথে চলতে-চলতে, পৃথিবীর ধুলো-হাওয়া গায়ে মেখে-মেখে, বৃষ্টির মতো শিকড়ে-শিকড়ে ব'য়ে যেতে-যেতে, হয়তো আমি নিজেকে সহ্য করতে শিখবো কোনোদিন, ক্ষমা করতে পারবো শেষ পর্যন্ত, কোনো-একদিন কোনো-একটি লেখা শেষ ক'রে জেনে যাবো যে আমার বেঁচে থাকাটা একেবারেই ব্যর্থ হয়নি।'

শেষ পাণ্ডুলিপি

উৎসর্গ

শ্রীবিরাম মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

বীরেশ্বর গুপ্তের এই শেষ পাণ্ডুলিপিটা মাসখানেক আগে আমার হাতে এসেছিলো। হাসপাতালের কর্তারা তার অন্যান্য জিনিশের সঙ্গে এটাও তার স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সেখান থেকে আমি পেয়েছি। সঙ্গে আরম্ভ-করা, শেষ-না-করা আরো কিছু লেখার কাগজপত্র। টেবিলেব দেরাজ থেকে, তোশকের তলা থেকে, বইয়ের পাতার ভাঁজ থেকে, কান-ভাঙা, দোমড়ানো, এলোমেলো ঐ কাগজগুলো আমাকেই খুঁজে বের করতে হ'লো ; কেননা সুধা একে শোকে-দুঃখে জর্জর, তার উপব স্বামীর সাহিত্যিক বা আন্তরিক জীবনের সঙ্গে কোনোকালেই তার যোগ ছিলো না। সেগুলোকে গুছিয়ে, মিলিয়ে, তার প্রত্যেকটি অক্ষর এই এক মাস ভ'রে খুঁটে-খুঁটে মন দিয়ে পড়েছি। খুব খারাপ লাগছে এ-কথা বলতে যে একটি লেখাও এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়নি, যাতে অসমাপ্ত বচনা ব'লেও প্রকাশ করা যেতে পারে। বীরেশ্বরের মতো প্রচণ্ড লেখক যে এতগুলো লেখা আরম্ভ ক'রে প্রত্যেকটাকে ছেড়ে দিয়েছে, এতেই বোঝা যায় ইদানীং সে কত কষ্ট পাচ্ছিলো, কী-রকম ছিন্নভিন্ন আর বিশৃঙ্খল হ'য়ে উঠেছিলো তার মন।

একমাত্র ব্যতিক্রম হাসপাতালে লেখা এই রচনাটা। এটাও অবশ্য ঠিকমতো সমাপ্ত নয়, কিন্তু প্রকৃত অর্থে 'রচনা'ও এটাকে বলা যায় না। কোনো পাঠকের জন্য সে এটা লেখেনি , লিখেছিলো, তার নিজের মতে, হাসপাতালের ক্লান্তিকর সন্ধ্যাগুলো কাটাতে। কিন্তু অন্য দু-একটা কারণও হয়তো ছিলো। নিশ্চয়ই হাসপাতালের আরাম আর নিয়মের ফলে তার স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হয়েছিলো; আর ঐ নির্জনতায় ব'সে পেয়েছিলো ভাবার অবকাশ, ফিরে পেয়েছিলো মনোযোগের ক্ষমতা। হযতো তার সহজাত 'লেখার হাত'—যার প্রতি অপরিসীম অবজ্ঞা প্রকাশ না-ক'রে সে কথা বলতো না—সেইটেকে আর-একবার চালাবার জন্য তার ইচ্ছে হয়েছিলো। হয়তো চেয়েছিলো তার নিজের জীবনের কথা বলতে।

কোনো সাহিত্যিকের আত্মকথার মধ্যে কতখানি সত্য থাকে তা নির্ধারণ করা খুব শক্ত কাজ। একে তো আমাদের স্মৃতি জিনিশটা কল্পনারই সহকর্মী, তার উপর কোনো সাহিত্যিক যখন লিখতে বসে, তার হাতে জীবন প্রায় অসংবরণীয়ভাবে 'আর্টে' রূপান্তরিত হ'য়ে ওঠে। অনেক তথ্য গোপন থাকে, কিছু 'রচনা' এড়ানো যায় না। অর্থাৎ, ঠিক যা ঘটেছিলো তা নয়—যা ঘটলে মানিযে যায়, কিংবা যা ঘটুক ব'লে তার ইচ্ছে ছিলো, বক্তার ঝোঁক থাকে অনবরত সেইদিকেই। নিজের যে-মূর্তিটি সে ভাবতে ভালোবাসে সেটাকেই সে জগতের জন্য রেখে যেতে চায় ; যা করতে পারলে সে সুখী হ'তো অথচ বাস্তবে যা পেরে ওঠেনি, সে-রকম কিছু খাদ মিশিয়ে নিজেকে এবং লেখাটাকে উজ্জ্বল ক'রে তোলে। এর ক্লাসিক উদাহরণ অবশ্য রুসো , নিজের যে-সব দুষ্কর্ম তিনি বর্ণনা করেছেন তার সবগুলো বিশ্বাসযোগ্য নয় ; অনাথ-আশ্রমের কাউন্টারের উপর নিজেব অবৈধ সন্তানকে ফেলে আসার কথাটায় অনেকেই ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

অবশ্য বীরেশ্বরের এই লেখাটার বিষয়ে সে-রকম কোনো সন্দেহ জাগে না, এবং তা একাধিক কারণে। প্রথমত, সে কারো চোখের জন্য লেখেনি এটা, এ-বিষয়ে এত সতর্ক ছিলো যে রাত্রে ছাড়া লিখতো না—ডাক্তার, নার্স কেউ তার হাতে কলম দ্যাখেনি—লিখে-লিখে কাগজগুলোকে লুকিয়ে রেখেছে বিছানার স্প্রিং-এর গদির তলায়। (মানসিক চিকিৎসালয়ের রুটিন-কাজের মধ্যে একটা হ'লো রোগীরা যা-কিছু লেখে তা নিয়ে পরীক্ষা করা, ফাইল তৈরি করা, বোগ-নির্ণযের

দলিল হিশেবে সাজিয়ে রাখা। আমি বেশ বুঝতে পারি যে বীরেশ্বর গুপ্ত, মনোবিকলনের বিজ্ঞান বিষয়ে যার আতঙ্ক ছিলো, লেখার এই ডাক্তারি ব্যবহার ঠেকাবার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি।) দ্বিতীয় কারণ : এই লেখাটার প্রত্যেকটি ঘটনা, এবং ভাবনা আর ধারণাগুলো, সবই একেবারে নতুন—মানে, তার পক্ষে নতুন। সাধারণত লেখকরা তাঁদের জীবনের ঘটনাবলি সাহিত্য-রচনাতেই ব্যবহার ক'রে ফেলেন—জগতের অনেক উপন্যাসই ছদ্মবেশী আত্মজীবনী—কিন্তু এই পাতাগুলোতে যা আছে, বীরেশ্বরের কোনো গল্পে উপন্যাসে তার আভাসমাত্র প্রবেশ করেনি। এই কথাটা ভাবতে আমার খুব অবাক লাগছে, নিজের জীবনটাকে সে যে এমন নির্দয় হাতে তার সাহিত্য থেকে দূরে রাখতে পেরেছিলো। আজ তাই আরো বেশি অবাক হচ্ছি তার নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টির কথা ভেবে ; যে-'সাধারণ' মানুষের প্রতি অবজ্ঞা আর ঘৃণা ফুটে উঠছে তার এই লেখাটায়, সেই মানুষকেই সে ভাস্বর ক'রে গেছে তার সাহিত্যে—তার লেখার পাত্র-পাত্রী কখনো কোনো বিষয়ে ভাবে না, শুধু চলে, বলে, কাজ করে, বেঁচে থাকে। আর এটাই আর-একটা কারণ—যেহেতু এই শেষ লেখাটার মধ্যে নানা বিষয়ে এত রকমের চিন্তা সে ছিটিয়ে দিয়েছে—যার জন্যে এটাকে আমি খাঁটি ব'লে বিশ্বাস করতে চাই।

আমি তিরিশ বছর ধ'রে পত্রিকার সম্পাদকি করছি, দেশ-বিদেশের বহু বই আমাকে পড়তে হয়েছে ; যতটা আমার বিচারের ক্ষমতা তা-ই প্রয়োগ করার পর আমার প্রত্যয় হ'লো যে এটা বানানো লেখা নয়, সত্যই বীরেশ্বরের নিজের কথা, জীবনের কথা। অনেক লিখেও নিজের বিষয়ে সে মৌন ছিলো, আমি বলবো চেষ্টা ক'রেই মৌন ছিলো—তাই সে-বিষয়ে একদিন তাকে বলতেই হ'লো। বলতে হ'লো তার বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের কথা, তার জীবনদর্শন বা দর্শনের অভাব, সমকালীন জগতের বিষয়ে তার মনোভাব—যে-সব প্রসঙ্গ তার প্রকাশ্য লেখা থেকে সযত্নে সে দূরে রেখেছে বরাবর। বলতে হ'লো তার বাবা, মা, স্ত্রী আর প্রণয়িণীদেব কথা—যাদের সংঘাতে তার জীবনেব কাদায় গহ্বর আর পাহাড় জেগে উঠেছে। এর প্রায় প্রত্যেকটা ঘটনাই আমার সত্য ব'লে মনে হয়। শুধু একটা জায়গায় ঈষৎ সন্দেহ জাগে : গৌরীর সঙ্গে যে-রাত্রিবাসেব কথা সে লিখেছে, সত্যি কি তা-ই ঘটেছিলো, না কি শেষ মুহূর্তে পালিয়ে গিয়েছিলো সে? তখন তার যে-বয়স, সেই বয়সেই—বা কিছু আগে—আমি তাকে প্রথম দেখেছিলাম ; তার পর তাকে যতটা দেখেছি, যে-রকমভাবে দেখেছি—তাতে তার পালিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক মনে হয় আমার। মনে হয়, ওটা পাবেনি ব'লে তার মনস্তাপ ছিলো ; তারই পরিপূরণ করেছে লেখার মধ্যে। নয়তো, ঐ জয়ের পরেও, 'বাবার কাছে হেরে যাওয়া'র বা 'বাবাকে ক্ষমা করা'র কথা কেন?

তারপর ঐ মোটর-দুর্ঘটনার ব্যাপারেও, খুব সম্ভব সে ইচ্ছে ক'রেই একটু অস্পষ্টতা রেখেছে। তার লেখা প'ড়ে মনে হয় যে দুর্ঘটনাটা সে-ই ঘটিয়েছিলো—প্রায় ইচ্ছে ক'রে, চেষ্টা ক'রে—নেশার ঝোঁকে নয়, তার স্বভাব-অনুযায়ী কোনো চরম পরিণামের দিকে ব্যাপারটাকে ঠেলে দেবার জন্য। ধ্বংসের জন্য নিজেকে দায়ী ক'রে কিছুটা তৃপ্তিও সে পেয়েছে : কিন্তু মোটর-গাড়ি ঠিক কেমন ক'রে আর কী কারণে উল্টেছিলো তা কেউ জানবে না কোনোদিন। ওটাব পিছনে প্রফুল্ল রাযের কোন অভিসন্ধি ছিলো তাও আমার পক্ষে কল্পনা করা শক্ত ; ওটাকে নিছক দৈব ঘটনা ব'লে ধ'রে নেয়াই আমি সংগত মনে করি।

যা-ই হোক, অনেক ভেবে-চিন্তে এই পাণ্ডুলিপি আমি প্রকাশ করাই স্থির করলাম। জানি, প্রকাশ করার মস্ত বাধা তার স্ত্রী, কিন্তু ও-রকম স্বামীর হাতে প'ড়ে জীবনে সে যত কষ্ট পেয়েছে, এই লেখাটায় তার চেয়ে বেশি কষ্ট পাবে না। আর তাছাড়া, এটাকে উপন্যাস ব'লেই ছাপছি, পাঠকেরা যার যেমন খুশি অর্থ ক'রে নেবেন। অন্তত, এই লেখাটার মধ্যে বহুকাল পর বীরেশ্বর গুপ্তর যৌবনের সাবলীলতা দেখা দিয়েছে—সেই অবসাদহীন বেগ—সেই কারণেও এটা মূল্যবান। বোঝাই যায় খুব তাড়াতাড়িতে লিখেছিলো, উত্তেজনায় লিখেছিলো—পাছে কেউ দেখে ফেলে সেই ভয় সর্বদাই ছিলো বোধহয় মনের মধ্যে। তার ছোটো-ছোটো হাতের অক্ষর কোথাও-কোথাও ত্রস্ততার ফলে কেঁপে

উঠেছে, লাইন বেঁকে গেছে, কথা প'ড়ে গেছে, বানানে ভুল হয়েছে মাঝে-মাঝে। এই ত্রুটিগুলো আমি সংশোধন ক'রে দিচ্ছি ; বীরেশ্বর গুপ্ত ছাড়া অন্য সব পাত্রপাত্রীর নামও বদলে দিতে হ'লো। আমি বিশ্বাস করি না লেখকদের ব্যক্তিগত জীবনের কথা কলঙ্কের ভয়ে লুকিয়ে রাখাই আমাদের কতর্ব্য—কেননা মানুষটার আয়ু আর কতদিন, শেষ পর্যন্ত তার কাজটাই শুধু থাকে। জীবনের কথা জানবার পর কাজটাকে আমরা আরো ভালো বুঝতে পারি তা নয় ; কিন্তু এ-সব তথ্যের সাহায্যে শিল্পীর মনের গোপন প্রক্রিয়া জানতে পারি, তাতে সন্দেহ নেই। এ-বিষয়ে আমি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পক্ষপাতী।

বীরেশ্বরের মৃত্যুর বিবরণ সকলেই জেনে গিয়েছে এতদিনে। আমি সেই পুকুরটা দেখেছি—হাসপাতালে তাকে দেখতে গিয়েছি মাঝে-মাঝে—এই লেখাটাতেও তার উল্লেখ পাওয়া যাবে। আসলে একটা মজা দিঘি, ঝোপেঝাড়ে শ্যাওলায় দম-বন্ধ হ'য়ে পচা, পুরোনো পাড়াগেঁয়ে ডোবার মতো দেখতে হয়েছে (সেটাকে বুজিয়ে দেবার কথা চলছিলো হাসপাতালের সূত্রপাত থেকেই, এইবার কর্তারা উঠে-প'ড়ে লেগেছেন)—কিন্তু বন্দী অবস্থায় দূরে ব'সে দেখে-দেখে বীরেশ্বরের মনে সেটাই হ'য়ে উঠেছিলো তার গ্রামের টলটলে সচ্ছল দিঘি, যেখানে বাঁশঝাড়ে শুয়ে-শুয়ে সাপের স্বপ্ন দেখতো সে, যে-সাপ একদিন নারীর মূর্তি নিয়ে সত্যিই জড়িয়েছিলো তাকে। দিনের বেলা ঐ সবুজ জলের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে পুরোনো কথা সব মনে প'ড়ে গেছে তার ; ঐ ছেলেবেলা, স্বাস্থ্য, যৌবন, আর হয়তো গৌরীর ঠাণ্ডা বুকের আলিঙ্গন—ও-সব ফিরে পাবার তাগিদেই, যা ছিলো শুধু অস্পষ্ট পরিকল্পনা, তা-ই একটা সংকল্প হ'য়ে উঠলো তার মনের মধ্যে। হাসপাতালে মাত্র মাস দেড়েকের মধ্যেই সে যখন অনেকটা 'সেরে উঠলো', তার একটি অনুরোধ মঞ্জুর করলেন ডাক্তাররা : তাকে বাইরে বেরোতে দিলেন, এমনকি ঐ পুকুর-পাড়ের ভাঙা ঘাটলাতে এসে বসতে দিলেন মাঝে-মাঝে। 'এটার জন্যে বার-বার ক'রে বলছিলেন তিনি—' ডাক্তাররা পরে বলেছিলেন আমাকে—'প্রায় মিনতি করেছিলেন। আমরা ভেবেছি এতে ওঁর ভালোই হবে—আর লক্ষণ দেখে তা-ই মনে হচ্ছিলো—কতদিন ফিরে এসে স্বাভাবিকভাবে গল্প করেছেন আমাদের সঙ্গে। সঙ্গে অবশ্য লোকজন দিয়েছি আমরা—সেদিনও তারা কাছেই ছিলো, কিন্তু মাত্র দু-এক মিনিটের মধ্যে কী হ'য়ে গেলো। আর ঐ পচা ডোবাটায় এত জল ছিলো কে জানতো। আমরা ওঁকে সামনের মাসে রিলীজ করার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছিলুম—বাইরের কোনো লক্ষণেই বোঝা যায়নি যে আবার একটা নার্ভাস অ্যাটাক হচ্ছে ওঁর।'

এই হ'লো ডাক্তারদের কথা। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে স্নায়ুভঙ্গের জন্যই পুকুরে ডুবেছিলো সে ; না—আমার মনে হয়—আর এই লেখাটাতেও সে তা-ই বলেছে—সে বেশ ভেবে-চিন্তেই কাজটি করেছিলো, অপেক্ষাকৃত সুস্থ ছিলো ব'লেই করতে পেরেছিলো। ভাবছিলো অনেকদিন ধ'রেই ; ভাঙাচোরা শরীর-মন নিয়ে সাহস পায়নি, যেই একটু শরীর ভালো হ'লো সে আর দেরি করলো না। ধুতি ছিঁড়ে পা দুটোকে শক্ত ক'রে বেঁধে নিয়েছিলো, জামার পকেটে ভবা ছিলো বড়ো-বড়ো কাঁকর আর ইটের টুকরো। ঝপ ক'রে আওয়াজ হ'তেই লোকজন ছুটে এলো, ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে, কিন্তু ঐ পাতা-পচা সবুজ জলের মধ্যে অত বড়ো মানুষটা যেন মুহূর্তের মধ্যে তলিয়ে গেলো। নৌকো বেয়ে, জাল ফেলে, টর্চ জ্বেলে, অনেক রাত অবধি খোঁজাখুঁজি ক'রে (ঘটনাটা ঘটেছিলো বিকেলে)—প্রায় আট ঘণ্টা পরে উদ্ধার হ'লো তার দেহ। পরে পাশের গ্রামের বুড়োরা বললে যে বহুকালের একটা বদনাম আছে পুকুরটার।

সে আর বাঁচতে চায়নি, বাঁচার কোনো অর্থ আর খুঁজে পায়নি। এ-ই সব কথা।

এই লেখাটায় বীরেশ্বর তার নিজের কথা অনেকটাই বলেছে : সেই সঙ্গে, আমার এই অতি প্রিয় লেখক-বন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশে, আমি দু-একটি কথা যোগ করতে চাই। আমার দীর্ঘ কর্মজীবনে অনেক মানুষ আমি দেখেছি, বহু সাহিত্যিক, অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি, কিন্তু আর-কেউ আমার মনে তেমনভাবে নাড়া দেয়নি, যেমন দিয়েছে বীরেশ্বর। বয়সে আমার অনেক ছোটো সে, তবু আমি

তাকে স্নেহ যতটা করেছি (এমন একটা জোরালো অথচ আত্ম-অচেতন ভাব ছিলো তার যে তাকে ঠিক স্নেহ করা যেন যেতোই না), তার চেয়েও শ্রদ্ধা করেছি বেশি। সে আমাকে মুগ্ধ করেছে, নিরাশ করেছে, রাগিয়ে দিয়েছে, মাঝে-মাঝে আমার ঘৃণারও উদ্রেক করেছে—কিন্তু তার খুব 'খারাপ ব্যবহারে'ও তাকে আমার মন থেকে আমি সরিয়ে দিতে পারিনি। পারিনি, তার কারণ তার স্বভাবের ঋজুতা—ইংরেজিতে যাকে বলে অনেস্টি—নানা রকম উগ্র দোষ নিয়েও প্রায় ভয়-পাওয়ানো গোছের ঋজুতা তার। তীরের মতো বেপরোয়া, সোজা মানুষ—নিজের বা অন্যের মুখ চেয়ে কখনো কিছু বলেনি বা করেনি, অবস্থার সঙ্গে মানাবার জন্য একফোঁটা ভেজাল করেনি নিজেকে, তার প্রত্যেকটি কথা আর ব্যবহার সোজাসুজি তার হৃদয় থেকে উঠে আসছে—এবং হৃদয়ের কথা সব সময় খুলে বললে কোন সভ্য সমাজ তা শেষ পর্যন্ত সহ্য করবে? যদি তার জীবনের অবস্থা অন্য রকমও হ'তো, তবু, এই স্বভাব নিয়ে, ধ্বংস না-হ'য়ে তার উপায় ছিলো না।

তার লেখক-জীবনের আরম্ভ থেকেই তাকে দেখছি ; আমার 'মাসিক মালঞ্চে'ই প্রথম তার গল্প বেরোয়। মনে আছে, যেদিন সে প্রতিযোগিতায় গল্প দিতে এসেছিলো, তার বলিষ্ঠ লম্বা চেহারা আর লাজুক অথচ নির্ভীক আর জ্বলজ্বলে চোখ দেখে আমি মনে-মনে বলেছিলুম, 'হে ঈশ্বর, এই ছেলেটির লেখাটা যেন ভালো হয়!' সেবার তাকে প্রথম পুরস্কার দিতে পারিনি, কিন্তু ঐ নড়বড় লেখাটা যে রাজহাঁসেরই বাচ্চা তাও বুঝেছিলাম। তারপর এতদিন ধ'রে অনেক অবস্থার মধ্যে দেখেছি তাকে। তাকে জড়িয়ে ধরেছি এক-একটা লেখার পাণ্ডুলিপি প'ড়ে, তাকে দেখেছি (যদিও সময়ে-অসময়ে পড়াশুনো নিয়ে ঠাট্টা করাই তার অভ্যেস ছিলো) হঠাৎ এক-একটা বইয়ের মধ্যে অতলভাবে ডুবে যেতে—এক ঘণ্টায় একশো পৃষ্ঠা প'ড়ে ফেলতো, যা পড়তো ভুলতো না—দেখেছি তার সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে মাত্র-চোখে-দেখা মানুষগুলোর মুখের ছাঁদ, অঙ্গভঙ্গির অবিকল বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে। আবার তাকেই দেখেছি দু-পাশে দুটো কদর্য স্ত্রীলোককে ঝুলিয়ে নির্বিকারভাবে হেঁটে যেতে, সন্ধেবেলা মল্লিক বাজারের সামনে রিকশায় এলিয়ে প'ড়ে যেতে দেখেছি—গাড়ি ক'রে বাড়ি নিয়ে আসতে-আসতে অকথ্য গাল শুনেছি তার মুখে। এক রাত্রে একশো টাকাও উড়িয়ে দিয়েছে, আবার ময়লা জামা-কাপড়ে পাংশু মুখে পাব্লিশারদের দরজায়-দরজায় ঘুরেছে কতদিন, নোংরা গলির শুঁড়িখানায় ন-আনা দামের কালো বিয়ার নয়তো কালীমার্কা গিলে, তক্ষুনি অন্য কোথাও ধার কবতে ছুটেছে। আমি কতদিন লুকিয়ে তার স্ত্রীর হাতে টাকা দিয়ে এসেছি—নয়তো কালকের চাল কেনা হয়নি।

একদিন—বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা—তার কাছে উপন্যাসের কিস্তি কিছুতেই আদায় করতে না-পেরে আমি একটা অন্যায় ক'রে ফেলেছিলুম। যেদিন কাগজ বেরোবার কথা তার আগের দিন সন্ধেবেলা এসে বললে, 'এখনই লিখে দিতে পারি, যদি এক বোতল ব্র্যান্ডি আর এক টিন সিগারেট দাও।' তা-ই দিলুম, আমার আপিশেরই একটা ঘরে বন্ধ ক'রে রাখলুম তাকে। ভোরবেলা টেবিলের উপর খালি বোতল, কয়েকটা সিগারেট আর এক তাড়া কাগজ রেখে বাস্-এ চ'ড়ে বাড়ি চ'লে গেলো। সেদিন মনে-মনে খুব তারিফ করেছিলুম তাকে, তার জন্য ভয়ও পেয়েছিলুম।

সে-লেখাটা ভালো হয়েছিলো, কিন্তু আমার কাগজে ঐ তার শেষ লেখা। আমি রাগ ক'রে কিছুদিন আর লিখতে বলিনি তাকে, আর এমনিতেও তার লেখা ক্রমশ ক'মে এলো। মদের নেশা প্রথমে তাকে প্রেরণা জোগাতো—কিন্তু সেই ধার ক্ষ'য়ে যাবার পর অবসাদের কথা ভাবেনি সে। শেষের দিকে টাকার অভাবে তাকে মরীয়া হ'তে হয়েছিলো। একই লেখা দু-জায়গায় বেচেছে, একই বইয়ের কপিরাইট দু-জনকে। আর মাঝে-মাঝে বাধ্য হ'য়ে দু-একটা যা লিখেছে তা না-লিখলেই ভালো ছিলো। আস্তে-আস্তে সকলেই বুঝতে পারছিলো বীরেশ্বর গুপ্তর দিন ফুরিয়ে এসেছে।

এই সময়কার খবর আমি ভালো জানি না, তার সঙ্গে শেষের দিকে তেমন আর যোগাযোগ ছিলো না আমার। মাঝে একবার তার মোটর-অ্যাক্সিডেন্টের কথা কানে এসেছিলো, কিন্তু সঠিকভাবে কিছুই জানতে পারিনি, কেননা ততদিনে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বেধে গেছে ; যুদ্ধ শেষ,

রাজত্বের বদল আসন্ন ;—এক সাময়িক ও সুবৃহৎ ব্যভিচারের আঘাতে আমাদের স্থায়ী, ব্যক্তিগত সম্বন্ধগুলোকে টিকিয়ে রাখা শক্ত হ'য়ে উঠেছে। জনতার আন্দোলনে মানুষকে আমরা প্রায় ভুলেছিলাম সেই সময়ে ; বীরেশ্বরের খবর নেয়া হ'য়ে ওঠেনি ; চারদিকের তোলপাড়ের মধ্যে আস্তে-আস্তে তার নামের উপরেও অন্ধকার নেমে এলো। আমি অবশ্য প্রায়ই ভেবেছি তার কথা, নিত্যই আশা করেছি সে আবার সামলে উঠবে—কিন্তু সে-জন্য কোনো চেষ্টা করিনি। এই কথাটা ভাবতে এখন আক্ষেপ হয় ; মনে হয় সময় থাকতে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালে হয়তো এই ভয়াবহ পরিণতি ঘটতো না। —কিন্তু না, আমার কিছুই করবার ছিলো না, কারোরই কিছু করবার ছিলো না। সে যা লিখেছে ঠিকই লিখেছে : এ-রকম হ'তেই হ'তো ; দারিদ্র্য, দুঃখ, ব্যাধি, শূন্যতাবোধ—সবই তার স্বকৃত, যেমন তার লেখাগুলো তার নিজের ঠিক সেই রকমই। আমরা কেউ তার বইগুলো লিখতে পারতুম না, তেমনি তার জীবনকে গড়াও সাধ্য ছিলো না আমাদের। সবই তার নিজের হাত। অনেকবার অনেক চাকরি পেয়েছে, একটাতেও টিকে থাকেনি। নিয়মিত লিখতে রাজি হ'লেও এ-রকম অর্থাভাব তার হ'তো না। তার ভালোমানুষ স্ত্রীকে নিয়ে সুখী হবার মতো সহনশীলতা ছিলো না তার—আর সেইজন্যেই সন্তানের জন্ম দিয়ে মনে-মনে লজ্জিত ছিলো। হয়তো—তার বাবার সঙ্গে তার সম্বন্ধের জন্য—সে যে নিজেই আবার বাবা হয়েছে—সেই চিন্তাটাও তার অসহ্য ছিলো। কোনোভাবেই মানিয়ে নিতে পারলো না নিজেকে—জীবনকে ক্ষমা করতে পারলো না কোনোদিন, নিজেকেও না। কে তাকে বাঁচাতে পারতো সর্বনাশ থেকে?

আমি পুরোনো আমলের মানুষ ; আত্মায় বিশ্বাস করি, আত্মার জন্য প্রার্থনাতেও বিশ্বাস করি। অনেকদিন পর বীরেশ্বরের এই লেখা প্রকাশ কবতে গিয়ে আমি ঈষৎ বিচলিত বোধ করছি। কত রকম লোক পড়বে এটা—কী ভাববে তারা? আপনাদের যার যা ইচ্ছে বলবেন, আমি তর্ক করবো না। শুধু এই কথাটি ব'লে শেষ করি : বীরেশ্বরের মতো মানুষের সঙ্গে কেউ যেন মেয়ের বিয়ে না দেয়, কিন্তু তার মতো লেখককে ভালো না-বেসে তো উপায় নেই আমাদের। মানুষের জীবনের একটা অংশ চায় সুখ-শান্তি--আর একটা অংশ চায় আত্মার সমৃদ্ধি—আর সেই সম্পদ জোগাবার জন্য মাঝে-মাঝে কয়েকটা মানুষ যদি জ্ব'লে-পুড়ে মরে যায় তাহ'লে সেই উজ্জ্বল আত্মাহুতির দিকেই মুগ্ধ চেখে তাকিয়ে থাকি আমরা।

এক

তাহ'লে তা-ই হ'লো। শেষ পর্যন্ত তা-ই হ'লো তাহ'লে। আমাকে ওরা ধ'রে ফেললে, আমাকে ওরা ভালোবাসলে। সভা ডাকলো, চাঁদা তুললো আমার জন্য, ডাক্তার দেখালে, পাঠালে হাসপাতালে, আর তারপর, তারপর কলকাতার বাইরে এই 'আরোগ্য নিকেতন'। এখানে —ধন্যবাদ আমার বন্ধুদের! —আমার জন্য স্পেশাল বন্দোবস্ত হয়েছে ; ঐ দেয়াল-তোলা গোলাপি রঙের তেতলা বাড়িটা—যেটা দেখাতে হ'লে স্টেশনের বাবুরা একই সঙ্গে ভুরু আর আঙুল তোলেন—তাই বাইরে বেশি দামের আলাদা ঘরে জায়গা হয়েছে আমার, স্প্রিং-এর গদির ধবধবে বিছানা, পরিষ্কার চেয়ার-টেবিল, ধোপ-দুরস্ত চাকর, ট্রেতে ক'রে সাজিয়ে-আনা মাছ, মাংস, দই, মিষ্টি, ফল আর একটি আধাবয়সি নার্স যাকে প্রায় সুশ্রী বলা চলে...আর অবশ্য সকালে বিকেলে রাত্রে দুপুরে ডাক্তারের আনাগোনা। বড়ো, মেজো, ছোটো ডাক্তার। ভদ্রতা, যতদূর হ'তে হয় ; যত্ন, যতদূর হ'তে হয়। এমনকি, আমি যে একজন লেখক (বা কোনোকালে ছিলুম) তা পর্যন্ত এঁরা জানেন দেখছি।

এই রকম হালে-চালে আমি কখনোই থাকিনি জীবনে। নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেরই অবাক লাগছে, ফর্শা জামা-কাপড়, রোজ স্নান করছি (না-করলে ওরা জোর করবে ব'লে নয়, তাতে কিছু সময় কাটে ব'লে), আর মাত্র দিন দশেক নিয়ম-মতো খাওয়া-দাওয়ার ফলে এর মধ্যেই নাকি ওজন বেড়েছে আমার। অবশ্য আমার 'বর্তমান অবস্থা'য় ওজন বাড়া ভালো না মন্দ জানি না ; আর আমি অবশ্য সে-রকম কলুষিত, হীন আত্মার মানুষ নই (কোনোকালেই ছিলুম না) যারা শরীরের ওজনবৃদ্ধিকেই সুলক্ষণ ব'লে মনে করে। আর তাছাড়া আমার এখন ভালো হোক বা মন্দ হোক, তাতে আর কিছুই এসে যায় না আমার, নিজের বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হ'য়ে গিয়েছি আমি, এতদিনে অদৃষ্টকে জয় করেছি।

শেষের কথাটা লিখে একটু ভাবতে হ'লো। যদি এ-লেখাটা কখনো কারো চোখে পড়ে (সে-রকম সম্ভাবনা কম, কিন্তু বলা যায় না—আমি হয়তো শেষ মুহূর্তে ছিঁড়ে ফেলতে ভুলে যাবো, আর পাব্লিক নামক মাংসপিণ্ডের আর গুণ না থাক কৌতূহল নামক ছার গুণ পুরোমাত্রায় আছে)—যদি কখনো কারো চোখে পড়ে তারা হয়তো এটাকে মানসিক জড়তা ব'লে ভুল করবে, যাকে বলে 'আপাথি', মানে নিঃসাড়তা, যার বাড়াবাড়ি হ'লে সেটাকে মানসিক ব্যাধির মধ্যে ধ'রে থাকেন ডাক্তাররা। তাই এক্ষুনি আমার কথাটা পরিষ্কার ক'রে ফেলি : যখন বলি, ভালো-মন্দে আমার আর কিছুই এসে যায় না, তখন আমি এ-কথাটাই বলতে চাই যে 'ভালো' আর 'মন্দের' তফাৎটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি এখনো, এই সর্বজনস্বীকৃত বিশ্ববিশ্রুত ভেদরেখাব অস্তিত্ব, অনেক খুঁজেও, আমার এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে আমি আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারিনি। আমার বিশ্বাস, এই জগতে ভালো বা মন্দ ব'লে কিছু নেই, আছে শুধু শক্তি, ক্ষমতা ; সেই শক্তি যখন আমার অনুকূল কর্ম করে, তাকে 'ভালো' বলি, আর সে যখন আমার বিরুদ্ধে যায় তখনই তাকে 'মন্দ' ব'লে অভিহিত করি। 'আমি' মানে এখানে কোনো ব্যক্তি হ'তে পারে, হ'তে পারে কোনো সংঘ বা সমাজ, বা সমাজের কোনো প্রতিষ্ঠান। আর অনুকূল কর্ম তাকেই বলে যেটা বেঁচে থাকার সহায়ক, নিতান্ত জৈব অর্থে, জান্তব অর্থে বেঁচে থাকা। কিন্তু কোন ব্যক্তি বা সমাজ বা প্রতিষ্ঠানের এত মূল্য যে তার আয়ুর উপরে নির্ভর ক'রেই বিশ্বের কোনো আদিসত্য নির্ধারণ করা যায়? পৃথিবীতে, শুনতে পাই, গণ্ডা চারেক জাঁকালো সভ্যতা পর-পর ধ্বংস হ'য়ে গেছে, কিন্তু তাই ব'লে কি সমুদ্রের জলে লবণ ক'মে গেছে, না কি আগুন আর আগের মতো তাপ দেয় না?

যদি আমরা শুধু বাঁধা বুলির মোদক ছেড়ে নিজের চোখ দিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখি, তাহ'লেই আর সন্দেহ থাকে না যে ভালো আর মন্দ আসলে একই বস্তু, একই বস্তুর দুটো প্রকাশ—ঠিক তাও নয়, একই পূর্ণসংখ্যার দুটো অর্ধেক যেন, একটাকে না-হ'লে অন্যটার চলে না, যাকে আমরা সাধারণত 'সত্য' ব'লে থাকি তার মধ্যে ঐ দুটোরই তেজ সমানভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে। মোটরগাড়িতে যে চেপে বেড়ায় তার কাছে সেটা 'ভালো', যে-মানুষটা চাপা পড়ে তার কাছে? জাপান যখন বাণিজ্যে খুব উন্নতি ক'রে ফেললে, আমরা সবাই বাহবা দিলুম তাকে, কিন্তু যখন সে যুদ্ধে হেরে কোমর ভেঙে কাৎ হ'লো আমরা বললুম সেটা তার দুর্মতির ফল। কিন্তু দুর্মতি কেন? যে-কারণে সে উন্নতি করেছিলো, সেই কারণেই তাকে যুদ্ধে নামতে হ'লো , যে-কারণে পৃথিবীর মধ্যে জর্মানির কীর্তির তুলনা নেই, সেই কারণেই হিটলারের মতো রাক্ষসকে জন্মাতে হ'লো সেখানে। এ তো খুব সোজা কথা, অঙ্কের মতো সরল আর অনিবার্য। মানুষের কল্পনা যে-কালে সতেজ ছিলো, যতদিন পর্যন্ত পরিবার, সমাজ, ধর্ম আর রাষ্ট্রের চাপ তার মনটাকে আধ-মরা ক'রে ফেলেনি, ততদিন সে তার আদিম কাদা নিয়ে যত রকম খেলা করেছে তার মধ্যে কোনো ধাপ্পা ছিলো না ; ততদিন সে দেখিয়েছে অসুরের সাহায্য ছাড়া সমুদ্রমন্থন হয় না, আর দেবতারা যদি-বা জোচ্চোরি ক'রে লক্ষ্মীকে বগল-দাবা করেন তবু অসুরের আক্রমণের ভয়ে স্বর্গ চিরকাল তটস্থ থাকবেই ; দেখিয়েছে, স্বর্গ থেকে কচের মতো স্পাই পাঠালেও দৈত্যকুলের মরণ-বাণ খুঁজে পাওয়া যায় না, কেননা লক্ষ্মী দেবী স্বাস্থ্যের অনুপান জানলেও হৃদয় হরণের মন্ত্র জানে শুধু দানবকন্যা! এবং হৃদয় দিয়ে আমরা যা চাই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জেতা শেষ পর্যন্ত সম্ভব নয়। এই রকম সব গল্পের মধ্যে দিয়ে পুরোনো মানুষ—আসলে তারাই নতুন মানুষ, কেননা পৃথিবীটারই বয়স তখন কম ছিলো—তারা যা বুঝিয়ে দিয়েছিলো আমরা আজকাল অনেক বিদ্যে শিখে তা ভুলতে বসেছি ; আমরা ভাবছি, একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটাকে পাওয়া যায় ; এমন এক জগতের কথা ভাবছি যেখানে এরোপ্লেন থেকে আর বোমা পড়বে না, আব অ্যাটমের জোরে এরোপ্লেন চলবে কিন্তু কোনো নগব ধ্বংস হবে না কখনো। কী বোকার মতো কথা! কী মর্মান্তিক ছেলেমানুষি! বৃদ্ধি মানেই ক্ষয় : এ-ই তো জগতের একমাত্র প্রমাণনিবপেক্ষ সত্য। ফুলটা ফল হ'য়ে ওঠে সে তো ঝ'রে পড়ারই জন্য। শিশু যুবক হ'লো ; তার মানে মৃত্যুব দিকে অগ্রসব হ'লো সে। মৃত্যুর দুয়ার অসংখ্য ; লক্ষ দরজায় খিল দিলেও আরো অনেক রাস্তা আছে তার। মহামারী আর দুর্ভিক্ষ দূর করো ; যুদ্ধ থামিয়ে দাও, চারদিকে সব ভালো হোক—তখন ক্লান্তিতে, ক্লান্তিতে, ক্লান্তিতে ম'রে যাবে মানুষ, পাগল হ'য়ে গিয়ে পরস্পরের টুঁটি ছিঁড়বে। ঐ যাকে তোমরা ভালো বলো, তার মতো ক্লান্তিকর আর-কিছু নেই।

মাঝে-মাঝে আমাবও অসতর্ক মুহূর্ত আসে। দু-দিন আগে, কী-রকম মনের ভুলে, ডক্টর ঘোষের সামনেই এই ধরনের কথা ব'লে ফেলেছিলাম। প্রায়ই আসেন তাঁরা, কথা বলেন, আমাকে দিয়ে কথা বলান। আমি বুঝি সবই : এই আমার 'চিকিৎসা' হচ্ছে। আমার গোপন মন জেনে ফেলার জন্য চারদিকে ফাঁদ পাতছেন ওঁরা। আধুনিক গোয়েন্দা পুলিশের রকমফেব আরকি—হাতে মারেন না, শুধু প্রশ্নের ইস্কুরুপটাকে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে অন্ত্রতন্ত্র অবধি পৌঁছিয়ে দেন, যতক্ষণ না ধরা-পড়া মানুষটা প্রাণের দায়ে কিছু-একটা স্বীকাব ক'রে ফেলে। কিন্তু আমিও কি কম শেয়ানা বলবো না, কিছু বলবো না, বাজে কথা ব'লে সাবোটাজ ক'রে দেবো তোমাদের। আমাকে ধুয়ে-মুছে সাফ ক'রে দেবে ভাবছো? ফেলে দেবে ধুলো-বালি, মাকড়শার জাল, পচা ইঁদুর, ডিমসুদ্ধ আরশোলা? আর সেই সঙ্গে, সে-ই যে আমার এক টুকরো রত্ন, যা ছাড়া আর-কিছুই নেই আমার, তাও ঝেঁটিয়ে দেবে? না, না, না। আমার মনের সব 'পাপ' বেঁচে থাকবে—যতদিন আমি আছি। আমাকে কি নারকোলের খোল হ'য়ে বেঁচে থাকতে বলো? নির্দোষ ডাবের জল হ'য়ে? লাল-গালের, নরম-গলার ভালোমানুষ হ'য়ে? আমার সেই গভীর জলের মাছ, রুপোলি মাছ, সোনালি মাছ, রামধনু-রঙের মাছ, তাকে তোমরা ছুঁতে পাবে না কোনোদিন, চোখেও দেখবে না। আমিও তাকে

দেখিনি ; কিন্তু সে মাঝে-মাঝে ঘাই মারে ব'লেই তো বুঝতে পারি যে আমি—আমি।

বলতে-বলতে হঠাৎ থেমে গিয়েছিলুম সেদিন। ডক্টর ঘোষ বললেন, 'আপনি দার্শনিকের মতো কথা বলেন। শুনলে শিক্ষা হয়। তারপর?'

'তারপর? আর-কিছু না।'

'কিন্তু কখনো আপনার মনে হয়নি যে অমুক জিনিশটা ভালো আর অমুকটা ভালো না?'

'তা কেন হবে না?' আমি হাসলুম। 'স্কচ আর সোলানে তফাৎ বোঝে না এমন মোটা তারের মানুষ কেউ আছে নাকি? আর আপনাদের অমলা নার্সের চেহারাটি ভালো, তা দেখবার মতো চোখও আমার আছে।'

'আপনার এখানে ভালো লাগছে তাহ'লে? সুখের কথা। আর কিছু দরকার হয় তো বলবেন।'

'সে তো আগেই বলেছি। দাড়ির চুলকোনি সহ্য হয় না আর।'

'হবে, হবে।' এই ব'লে ডাক্তার ঘোষ বিদায় নিলেন। আর তিনি যাওয়া মাত্র আমি বিছানাটায় চিৎ হ'য়ে পড়লুম ; এই সব কথাবার্তার পর খানিকক্ষণ শুয়ে না-নিলে চলে না।

এই বিছানাটাকে ভালোবেসে ফেলেছি। এমন নরম, এমন গভীর, আমার নড়াচড়ার ভাঁজে-ভাঁজে এমন সুন্দর সায় দেয়, যখন আমি একমনে কিছু ভাবি চুপ ক'রে থাকে, যখন অলস হ'য়ে আড়মোড়া ভাঙি আস্তে কেঁপে ওঠে—তার সঙ্গে আমার ঠিক-ঠিক বোঝাপড়া হ'য়ে গেছে যেন। একা, একলা ঘরে এই রকম বিছানায় সেরেফ শুয়ে থাকার মধ্যে যে-আরাম আছে, তা কিন্তু—সত্যি বলতে—আমি কল্পনাও করিনি আগে। আমি ধ'রেই নিয়েছিলুম যে শোয়া মানেই নোংরামি— ছেঁড়া কাঁথা, শিশুর দুর্গন্ধ, চ্যাঁচামেচি, নানান বয়সের ছেলেপুলে, আর তারই মধ্যে, রাত গভীর হ'লে, একটা মোটা, মুর্খ, অকাল-বৃদ্ধা শূকরীর মতো স্ত্রীর শরীর। যে-সব মেয়েরা হাতে-হাতে নগদ নেয় তারা অন্তত শরীরটাকে মাজা-ঘষা করে, তারা অন্তত ভান জানে, ভঙ্গি জানে—এক ঘণ্টা আধ ঘণ্টার জন্যও ভুলিয়ে রাখতে পারে তারা। তার উপর নগদ দাম নিয়েই ছেড়ে দেয়, সারা জীবন আঁকড়ে থাকে না।

কিন্তু, শেষ পর্যন্ত, ওখানেই ফিরতে হয়—ঐ নোংরামির মধ্যেই। ঐ ছেলেপুলের জন্য আমি দায়ী, ঐ দারিদ্র্যের জন্য আমি দায়ী, সব জানি। কিন্তু কী করবো, বলো, যদি সহ্য না হয়? সহ্য হয় না ; যা-কিছু নিয়ে তোমরা হৈ-চৈ করো, গান বানাও, বক্তৃতা লেখো—বাড়ি, দেশ, সমাজ, জাতি—কিছুই সহ্য হয় না আমার। যেখানে আমি থাকি সেটা আমার বাড়ি নয়, যে আমাকে নিজের ক'রে নিতে পারবে সেই বাড়ি কোথায় আছে জানি না। আর দেশ? দেশ মানে কী? মানুষের জন্ম হয় দৈবাৎ, মানচিত্রের কোনো একটা বিন্দুতে দৈবাৎ ছিটকে পড়েছি ব'লেই তার মাটিতে মাথা ঠেকাতে হবে? না। কিছুই আমার নয় যা আমাকে উপার্জন করেনি। যে আমার ডাক শোনে না, আমার ভাষা বোঝে না, আমার কথায় নিরুত্তর থাকে, তাকে আমি আমার বলি কেমন ক'রে? কলকাতার ফুটপাতের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো : দ্যাখো হিন্দি সিনেমার সামনে কাতারে-কাতারে ভিড়। কী দেখার জন্য ভিড় করেছে? গুণ্ডামি, ভাঁড়ামি, কাঁচুলি-আঁটা স্ত্রীলোক—অশ্লীল হবার শক্তি নেই অথচ ইচ্ছে আছে সেই তেলতেলে চিটচিটে ঘেন্না। এদেরকে ভাই ব'লে বুকে জড়িয়ে মাতাল হ'তে হবে? মাপ করুন, মশাই, আমি সোজাসুজি মাতাল হওয়াটাই পছন্দ করি ; তাতে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হৃদয় জেগে ওঠে, গুমোট ভেঙে ক্ষমার হাওয়া ব'য়ে যায়।

ঐ জিনিশটি এখানে পাওয়া যায় না কিছুতেই। পায়ে ধরলেও ফল হবে না, জানি ; আমি তাই নিশ্বাসের অপব্যয় করিনি একবারও। হয়তো আমাকে এ-জন্যেই এখানে পাঠানো হয়েছে যাতে আর একটি ফোঁটাও পেটে না পড়ে। আমার বন্ধুরা ভালো করবেন আমার, ভালো করবেন আমাকে। ভালো, ভালো। কিন্তু টাকা আসে কোত্থেকে? সরকার দেবে, স্বাধীন দেশের সরকার। তা-ই শুনছি। লোকেরা কী বলাবলি করেছে তাও শুনছি মনে-মনে। আজ নয়, অনেকদিন ধ'রেই বলছে। 'অদ্ভুত প্রতিভা ছিলো, কিন্তু উচ্ছন্নে গেলো একেবারে!' 'দারিদ্র্যে নষ্ট হ'লো—কী দুঃখের কথা।' 'অসুখী

জীবন—কিন্তু কী-ই বা করা যায়।' করুণা করার সুখ, সেই সঙ্গে আত্মপ্রসাদের চলকানি। আর তারই সুযোগ দিচ্ছি আমি, আমি, বীরেশ্বর গুপ্ত। এর চাইতে ম'রে যাওয়া ভালো ছিলো না?...আর কয়েকটা দিন যাক।

এখানে এসে দাড়ি রাখতে হচ্ছে। কামাবার ক্ষুর ওঁরা দেবেন না কিছুতেই। কিন্তু ঠেকাতে পারবে ভাবছো? কতটুকু জানো তোমরা আমার? আমিও একটা হাসি লুকিয়ে রেখেছি আস্তিনের তলায়, সব শেষের প্রচণ্ড এক হাসি। আর ইতিমধ্যে, দাড়ি গজিয়ে ঋষির মতো চেহারা করবো, চুকচুক ক'রে খাবো তোমাদের জোলো চা, অমলা নার্সের বাড়ি থেকে রেঁধে আনা লাউয়ের শুক্তো মেখে ভাত খাবো, আর মাঝে-মাঝে এমন এক-আধটা ঠাট্টা করবো যাতে অমলা খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে। বেশি লাল হয় না ; ঝানু মেয়ে, মনে হয়। তাকে বলবো নাকি—তোমাকে নিয়ে নবদ্বীপে পালিয়ে গিয়ে কণ্ঠি-বদল করবো, যদি আমাকে একটা বোতল স্কচ এনে দিতে পারো। হুইস্কির বদলে যদি খাঁটি দাও তাহ'লে কিন্তু কণ্ঠি বদল হবে না—তবে অন্য সবই হতে পারে।' হঠাৎ চোখ টিপে ধরবো পেছন থেকে?

ঠাট্টাটা মন্দ না তেমন—ভেবে নিজেরই হাসি পাচ্ছে। কিন্তু কী নিকৃষ্ট কাজ—এই মনে-মনে ঠাট্টা তৈরি ক'রে নিজেই তাতে হেসে ওঠা, যেন নিজের মাংস ছিঁড়ে-ছিঁড়ে তা-ই খেয়ে বেঁচে থাকার মতো। কিন্তু সেই দুর্দশাই তো হয়েছে আমার এখন। দিনের বেলাটা যা-হোক একরকম কেটে যায়, কিন্তু সন্ধের পরে মদ না-খেয়ে মানুষ বাঁচে! ছ-টার সময় রাতের খাওয়া এনে দেয়; তারপর সন্ধে হয়, অন্ধকার নামে, চারদিক মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ, এই ঘরের মধ্যে মুখোমুখি ব'সে থাকি আমি—আর সময়। জন্তুর মতো সময়, হিংস্র চোখে গুঁড়ি মেরে তাকিয়ে থাকা পশুর মতো, আমি তার শিকার, ভয়ে-জ'মে যাওয়া ভেড়ার মতো কাঁপছি তার সামনে। আজ প্রথম নয়—অনেক, অনেকদিন আগেই এই অনুভূতি হয়েছে আমার, আমার বয়স যখন উনিশ, কুড়ি বা পঁচিশ, তখন থেকেই : তখন থেকেই আমি বুঝেছি সময়ের মতো শত্রু আর নেই আমাদের। কী ভয়ানক তার ভার, কী অসহ্য একগুঁয়েমি। এই ভার যে তুলে নিয়েছে, এই জন্তুকে যে বধ করেছে, সেই অস্ত্র আর বর্মের নামই মদ। এই কথাটা সুধা কোনোদিন বোঝেনি। বুঝবে ব'লে আশাও করিনি আমি—সে আমার স্ত্রী ব'লে আশা করিনি তা নয়, সে স্ত্রীলোকে ব'লেই অনেক জিনিশ তার ধারণার বাইরে। অবসাদ, নিঃসঙ্গতা, সময়ের ভার—এই অভিশাপগুলো পুরুষের ; মেয়েরা তার আভাস পাবে কেমন ক'রে? কেননা এই পৃথিবীতে শুধু মেয়েরাই সুখী হ'তে পারে, শুধু বেঁচে থেকেই সুখী হবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে তাদের। তারা জিগেস করে না কেন বাঁচবো? কিসের জন্য? আর তাই, তাদের মনের উপর কখনোই সেই বিরাট শূন্যতা নেমে আসে না, যার চাপে আকাশ আর পৃথিবীটাকে ধোঁয়ার মতো ধূসর মনে হয়, নিশ্বাসের বাতাসের মধ্যে বিষ ছড়িয়ে পড়ে। আর তোমরা, যারা এই বিষের আক্রমণ একবারও সহ্য করোনি, তোমরাও নিজেদের ঈশ্বরের বরপুত্র ব'লে ভেবো না ; ভেবে দেখো তোমরা ছেলেবেলা থেকেই ঐ বিষের টিকে নিতে-নিতে বড়ো হয়েছো কিনা—সাধারণতার টিকে, জীবনে 'উন্নতি' করার টিকে—ভেবো দেখো, এই যে বছরের পর বছর পৃথিবীর হাওয়ায় নিশ্বাস নিচ্ছো, তার মধ্যে কতটুকু সত্যিকার বেঁচেছো তোমরা। যেখানে প্রাণ আছে তারই আশে-পাশে মৃত্যু ঘুরে বেড়ায় ; জড়বস্তুকে স্পর্শ করে না।

—এই শত্রুকে ফাঁকি দেবার জন্য, আর কোনো উপায় না-দেখে, অগত্যা আবার কলম হাতে নিতে হ'লো। অনেকদিন পর, আবার। ঘুমের ওষুধ চেয়েছিলুম ; তাও আর দেবে না আমাকে ; বলে 'আর দরকার নেই।' পড়ার জন্য ছবিওলা পত্রিকা দিয়ে গেছে, হাসির গল্পের বই, যাকে ওরা বলে 'লাইট রীডিং'! কিন্তু বীরেশ্বর গুপ্ত এত নিচে কখনোই নামবে না যে রাজনৈতিক, খেলোয়াড় আর নটীদের ছবি দেখে সময় কাটাবে। তার চেয়ে ব'সে-ব'সে মুহূর্তগুলোকে লক্ষ করা ভালো— কোন-এক অনন্ত উদর থেকে বেরিয়ে আসছে একে-একে, কৃমির মতো পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে চলেছে—আস্তে, কী ভীষণ আস্তে! কিন্তু এখনো, এখনো একটা পথ খোলা আছে আমার, মুক্তির

একটা সরু রাস্তা, দম-বন্ধ-করা কম-হাওয়ার পথ, কিন্তু সইতে পারলে মদের চেয়েও পরাক্রান্ত। আর তাই, এই নিঝুম রাতে (আসলে হয়তো ন-টাও বাজেনি) ব'সে-ব'সে লিখছি।

দুই

শাদা বাংলায় কথাটা এই যে আমাকে ওরা পাগলের চিকিৎসালয়ে পুরেছে। কিন্তু সত্যি কি আমি পাগল? এ-কথার উত্তরে আমি বলবো, হ্যাঁ। এবং না। অর্থাৎ, আমি বরাবর যতটা পাগল ছিলুম এখনো সেই রকমই আছি, আগে আমাকে 'স্বাভাবিক' ব'লে ভাবাটা যেমন ভুল হয়েছিলো, এখন 'পাগল' বলাটাও ঠিক তেমনি ভুল হবে। আর এই যে আমরা কথাটা বলি—'স্বাভাবিক'—তার মানেই বা কী? 'স্বাভাবিক,' 'প্রকৃতিস্থ' : তার মানে যে নিজের প্রকৃতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আছে। কিন্তু ঠিক-ঠিক নিজের প্রকৃতির চাহিদা মেনে কে চলতে পারে এই সভ্য সমাজে, শুনি,? কেউ পারে না। বেশির ভাগ মানুষ নিজেকে দশের মাপে ঢালাই ক'রে নেয়—নিজের প্রকৃতিতে ছেঁটে-কেটে সামাজিক মানুষ হ'য়ে ওঠে তারা। তারাই সবচেয়ে 'প্রকৃতিস্থ' মানুষ, সন্দেহ নেই ; কিন্তু সেই প্রকৃতি তাদের নিজেদের নয়, সমাজের। কেউ-কেউ তা পারে না ; নিজের প্রকৃতির প্রবলতার মধ্যেই হাবুডুবু খায় সারা জীবন। আসল অর্থে তারাই ঠিক 'প্রকৃতিস্থ', কিন্তু বাড়াবাড়ি হ'য়ে গেলে প্রতিবেশীরা সহ্য করতে পারে না আর, পুলিশম্যানের হাতে সঁপে দেয়। আমিও সেই বাড়াবাড়ি করেছিলুম।

করেছিলুম একরকম ইচ্ছে ক'রেই। ব্যাপারটাকে একটা চরমে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছিলো আমার, নয়তো আব টেকা যাচ্ছিলো না। মনে করা যাক আমার প্রকৃতির মধ্যে জোরালো কয়েকটা খিদে আছে : ঐশ্বর্যের খিদে, সৌন্দর্যের খিদে, প্রেমের, আর রাজত্বের। এখন আকবর বাদশার মন নিয়ে যদি হরিপদ কেরানি জন্ম নেয়, তবে তার উপায় কী। কিন্তু ঠিক বলা হ'লো না, ঠিক তাও নয়, হরিপদ কেরানির সঙ্গে তফাৎ আছে বইকি আমার। জয় করার ইচ্ছে শুধু নয়, তার উপায়ও আছে আমার হাতে। অন্তত—ছিলো, এসেছিলো একবার। একটিমাত্র উপায় : তার নাম, লেখা। একবাব, জীবনে একবার, আমার মনে হয়েছিলো বই লিখেই জগৎটাকে জয় করতে পারি আমি। পারি, মনের বন্য জানোয়ারগুলোকে পোষ মানিয়ে সার্কাসের মতো কসরৎ দেখাতে। সেই সময়েই কয়েকখানা উপন্যাস লিখে ফেলেছিলুম পর-পর। ঝোঁকে লিখেছিলুম, তোড়ে লিখেছিলুম, একটু ভাবতে হয়নি, একবার হোঁচট খাইনি। একটা দম-আটকানো টান পড়েছে বুকেব মধ্যে, রাশ-টেনে-রাখা রেসের ঘোড়ার মতো টলমল করছি—এমনি মনে হ'তো। আর তারপর—তারপরই তার ছিঁড়ে গেলো।

আমার অবশ্য এ-কথা বুঝতে দেরি হয়নি যে সত্যিকার লেখক আমি নই। তার মানে, আমি সে-জাতের মানুষ নই যারা পটের উপর তুলি বুলিয়ে বা কাগজের পাতে অক্ষর এঁকেই নিজের সত্তাকে বিলিয়ে দিতে পারে, আর তার মধ্য থেকেই নিংড়ে বের করে বেঁচে থাকার অর্থ, সার্থকতা। ও-রকম মানুষের প্রধান লক্ষণ হ'লো ধৈর্য আর পরিশ্রমের ক্ষমতা, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, কামাই না-ক'রে, প্রেরণার জন্য অপেক্ষা না-ক'রে, থপ্ থপ্ গাধার খাটুনি টেনে যাবার ক্ষমতা। কিন্তু আমার ধাত ঠিক তার উল্টো ; যা সহজে পারি না তা আমি কিছুতেই পারি না, যে-মুহূর্তে ঠেকে গেলো সে-মুহূর্তেই সেটাকে আমি ছেড়ে দিই। মানে—লেখাটা যতক্ষণ আমাকে মাতাল ক'রে রাখতে পারে ততক্ষণই লিখতে পারি আমি, কিন্তু এমন কোন মদ আছে যার নেশা কখনো কাটে না?

আর তাছাড়া, কাজ হিশেবেও ওটা ঠিক পছন্দ হয় না আমার। সারাদিন শান্তভাবে চেয়ারে ব'সে, কাগজের উপর ঘাড় গুঁজে প'ড়ে থাকা—নিজেকে অনেকগুলো টুকরোর মধ্যে ভাগ ক'রে

দিয়ে তাদের মধ্যে ঈর্ষা দ্বন্দ্ব প্রণয় প্রতিযোগিতা চালানো—এই কি লাল-রক্ত-ওলা পুরুষের কাজ? তার তো বেরিয়ে পড়ার কথা ঘর ছেড়ে—আগল ভেঙে বেরিয়ে পড়বে সে পৃথিবীতে, মনে-মনে নয়, শরীর নিয়ে, কল্পনায় নয়, রক্তমাংসের বাস্তবে—রোদের আঘাতে, ঢেউয়ের দোলাতে, সমুদ্র আর প্রান্তরের তীক্ষ্ণ বিজয়ী বাতাসের মধ্যে। ঐ বকম কোনো কাজ পেলে বোধহয় মনের মতো হ'তো আমার ; কোমরে ছোরা গুঁজে সোনার সন্ধানে অজানা সমুদ্রে ভেসে পড়া, সোনার সন্ধানে অজানা দেশের পাহাড় ডিঙোনো। আগুন, রক্ত, হত্যা : তারই মধ্য দিয়ে নতুন জন্ম পৃথিবীর। নিদেনপক্ষে, একটা ছোটোখাটো দ্বীপের রাজা হ'তে পারতুম যদি, যদি পারতুম একশো রূপসীর প্রণয়ী হ'তে। কোনোটাই হ'লো না ; তাই নেহাৎই শুধু লেখক হ'তে হ'লো।

আমার পূর্বপুরুষের নিবাস ছিলো নোয়াখালি জেলায়। সেখানকার মানুষের মধ্যে মিশোল কিছু বেশি। আমার সন্দেহ হয়, আমার কোনো প্রপিতামহী কোনো পর্তুগীজ বোম্বেটের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তাই আমার রক্ত এত চঞ্চল। অবশ্য এই সন্দেহের কোনো কারণ নেই আমার, কোনো পারিবাহিক কানাঘুষো শুনিনি কোনোদিন, তাছাড়া বংশতালিকায় চরিত্রলক্ষণ খুঁজতে যাওয়া, আমার মনে হয়, হস্তরেখায় ভাগ্যনির্ণয় করতে যাওয়ার মতোই বোকামি। তবে কথাটা এই যে আমি ছেলেবেলা থেকে যা-কিছু পড়েছি (বেশি পড়িনি) তার মধ্যে আমার মনকে সবচেয়ে জোরে নাড়া দিয়েছে দস্যু-নাবিক-আবিষ্কারকদের বিবরণ : কলম্বাস, দিয়াজ, ভাস্কো দা গামা, বালবোয়া—কত ভাগ্য এঁদের, নিজের প্রতিভাকে প্রকাশ করার জন্য এঁরা পেয়েছিলেন—ভাবনা নয়, কল্পনা নয়, ভাষা নয়—একেবারে সসাগরা পৃথিবীটাকেই পেয়েছিলেন। লোভী এরা, দস্যু এরা, এদের ব্যবহারকে পৈশাচিক বললে ভুল হয় না, কিন্তু দস্যুতাকেই বিরাট আকার দিতে পারলে মানুষ হ'য়ে ওঠে বীর, সম্রাট, মহাপুরুষ। এই উজ্জ্বল বীর বংশের শেষ অবতার নেপোলিয়ন ; কিন্তু তাঁর সময়ের পরেই পৃথিবীটা কুঁকড়ে গেলো, বুড়ো হ'য়ে গেলো, পরোপকারী কমিটিব হাতে চ'লে গেলো, ও-রকম রাজত্ব করতে কেউ আর পারলো না তার পরে, না হিটলার, না ট্রটস্কি, না, এমনকি গান্ধী। বীর আর পীর, মানুষের এই দুটো ধারাই নির্বংশ হ'য়ে গেছে, কিংবা আমরা তার অযোগ্য হ'যে গেছি ; বীরকে আমরা গুণ্ডার স্তরে নামিয়ে আনি, মহাত্মাকে হ'তে হয় পলিটিশিয়ান। এখন সাধারণ মানুষের যুগ—সাধারণ, সাধারণ, সাধারণ মানুষের। সাম্যের যুগ এখন, আর সাম্যের নীতি সাধাবণ মানুষের পক্ষে উত্তম প্রস্তাব, সন্দেহ নেই।

এই সেদিন মানুষ এভারেস্টের শিখর ছুঁয়ে ফিরে এলো। এই শেষ ভূখণ্ড (যদি সেই তুষার চূড়াকে 'ভূখণ্ড' বলা যায়), যেখানে আদিযুগ থেকে মানুষের পা পড়েনি, তাও পরাজিত হ'লো এতদিনে। খুব ভালো, খুব তারিফ করি আমরা। কিন্তু কী লাভ হ'লো? মানুষের ইতিহাসে কি এতটুকু রেখা পড়লো তার? যদি তেনজিং সেখান থেকে সোনার খনির খবর নিয়ে ফিরতেন! যদি সেই বিশাল নির্জন উর্বর আব বাসযোগ্য হ'তো! তাহ'লে কী হ'তো ভাবতে গায়ে কাঁটা দেয়। কিন্তু না, কিছুই নেই, কাজটা করা গেছে, এইটুকু মাত্র কথা। উঁচু দরের একটা ক্রীড়া হ'লো যেন—ফুটবল প্রভৃতির চাইতে অনেক বেশি ব্যয়সাপেক্ষ, বুদ্ধিসাপেক্ষ, শ্রমসাপেক্ষ, কিন্তু একই জাতের জিনিশ। অগত্যা এঁদেরই বলছি বীর। এবং, দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য, আছেন বক্সিং চ্যাম্পিয়ন, ফুটবল চ্যাম্পিয়ান, ফিল্মস্টার, আর ফিল্মের ন্যাকামিপূর্ণ গুণ্ডা, যে ধনীদের উপর ডাকাতি ক'রে গরিবদের বিলিয়ে দেয়। সবই নকল, সবই বদলি : দুধের সাধ ঘোলে মেটানো, বস্তুর বদলে ছায়া নিয়ে মেতে থাকা। আর এই লেখা, তাও কি তা-ই নয় : বাঁচার বদলি, বাস্তবের বদলি, জল হাওয়া রৌদ্রের বদলে অলীকের আলিঙ্গন? বিশেষত এই বাংলা দেশে, যেখানে আকাশের তেজ এত উগ্র যে মানুষের জন্য বেশি কিছু বাকি থাকে না, আর যদি বা থাকে সেই তেজ বেরোবার রাস্তা প্রায় কিছু নেই—সেখানে মানুষের না-লিখে আর উপায় কী। আর-কিছুই নেই ব'লেই এ-দেশে যুবকেরা এত কবিতা আর গল্প লেখে, দুই অর্থেই করুণ সব কবিতা আর গল্প লেখে। তাদের সঙ্গে আমার তফাৎ এই যে তারা ভাবে তারা লিখতে ভালোবাসে ব'লেই লেখে (অনেকে বিয়ের

পরে আর লেখে না), আর আমি জানি যে আসল জিনিশের অভাব ঘটে ব'লেই, সেই শূন্যতা ভরাবার জন্য, মাঝে-মাঝে আমাকে লিখতে হয়। এই কথাটা আমি অল্প বয়সেই বুঝেছিলুম। আমার বয়স তখন ষোলো ; পূর্ব বাংলায়, যেখানে মিষ্টি মোটা লাল চালের ধান জন্মায়, সেই রকম একটা গ্রামে চাষার মতো স্বাস্থ্য নিয়ে বেড়ে উঠছি। মনের ত্রিসীমানায় লেখক হবার স্বপ্ন নেই। লেখা এবং পড়া, এ-দুটোর একটাতেও ঠিক সুখ পাই না ; সকাল-সন্ধ্যায় স্কুলের বই খুলে বসি বাবার চাবুকের ভয়ে, আর বছর-বছর স্কুলের পরীক্ষায় প্রোমোশন পাই, তাও বোধহয় বাবারই প্রতিপত্তির জোরে। আসলে সময় কাটে বনে-বাদাড়ে ঘুরে, আখ পেয়ারা জামরুল চিবিয়ে, পাখি ধ'রে, গাছে চ'ড়ে, খালে ডুবিয়ে, ফাঁক পেলেই বড়ো নদীতে একলা ডিঙি বেয়ে। আর পাঁচটা গ্রামের ছেলে থেকে আমাকে আলাদা ক'রে নেবার কিছুই নেই—শুধু একটা লক্ষণ ছাড়া। সেটা এই যে আমার একা থাকতে ভালো লাগে, মাঝে-মাঝেই একা হ'তে ইচ্ছে করে। দল বেঁধে দুরন্তপনা করা হচ্ছে, হঠাৎ আমার জিভের স্বাদ চ'লে গেছে যেন, কিছু না-ব'লে চ'লে এসেছি, পালিয়ে এসেছি, দূরে গাছের ছায়ায় ব'সে দেখেছি কাঠবিড়ালির খেলা, পিঁপড়েদের পরিশ্রমী সংসার। অন্য ছেলেদের সুখের আদর্শ ছিলো কাপাটি, চড়ুইভাতি, সাঁতারের রেস, শীতকালে খেজুরের রস চুরি ক'রে খাওয়া ; ও-সব ব্যাপারে উৎসাহ আমার কম ছিলো তা নয়, কিন্তু যখন একলা ডিঙি নিয়ে নদীর জলে উজান বেয়েছি, চ'লে গেছি মধুগঞ্জের ঘাট পর্যন্ত, যেখানে ভিড় করেছে বড়ো-বড়ো মহাজনি নৌকো, বরিশালের ডাল, চাঁদপুরের শুপুরি আর নারানগঞ্জের পাটের ভারে বোঝাই, আর সেই সঙ্গে বম্বাই মিলের কাপড়, ময়নামতীর শাড়ি, জাপানি গেঞ্জি আর খেলনা—তখন আমার যে-রকম ভালো লেগেছে তার সঙ্গে অন্য কিছুরই তুলনা হয় না। ফেরার পথে ভাটির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছি, ইলিশ ধরার প্রকাণ্ড বেড়াজালগুলোর ধার দিয়ে-দিয়ে ; কখনো জাল টেনে তুলেছে জেলেরা, আর পড়ন্ত রোদে ইলিশের ঝাঁক বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়েছে হাওয়ায়। আমার মুখ পড়েছে পশ্চিমের দিকে ; সেখানে, আমার চোখের সামনে, মেঘে আর সূর্যাস্তে মিশে জল থেকে আকাশ পর্যন্ত ধাপে-ধাপে প্রাসাদ উঠে গেছে, আর আমি মনে-মনে বলেছি, 'ঐ রকম প্রাসাদ একদিন আমার হবে।' আবাব কোনোদিন মেঘ এসেছে কালো হ'য়ে ; তখন আমি চেয়েছি এমন ঝড় উঠুক যাতে আমাকে আর বাড়ি ফিরতে না হয়।

এ-রকম হবার কারণ ছিলো। একটা দুঃখ ছিলো আমার মনে ; সে দুঃখ—আমার বাবা। তাঁর মতো প্রবল মানুষ আশে-পাশের দশখানা গ্রামের মধ্যে আর ছিলো না। বিরাট লম্বা চেহারা নিয়ে, কুচকুচে ঘন দাড়ি নিয়ে, জ্বলন্ত কয়লার মতো চোখ নিয়ে, খাটো ধুতিতে খালি পায়ে তিনি যখন দাঁড়াতেন, তখন গ্রামের জমিদার থেকে মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত সকলকেই নিচু গলায় কথা বলতে হ'তো। অথচ তাঁর বিষয়-আশয় তেমন ছিলো না ; কিছু ধানের জমি, কিছু শর্ষের খেত, আর একটা পানের বোরো আর আম-কাঁঠলের বাগিচা—এই ভাঙিয়েই সংসার চালাতেন। দশ জোয়ানের কাজ করতেন একলা, একটা ঘর ছাইতে একবেলার বেশি লাগতো না তাঁর, তাঁর সঙ্গে ধান কাটতে গিয়ে জাত-চাষিরা পেছিয়ে পড়তো। এই দৈহিক শক্তির সঙ্গে নৈতিক শক্তিরও যোগ হয়েছিলো ; মহেশ্বর চাটুয্যের সততা একটা প্রবাদ-বাক্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো সেই অঞ্চলে। কারো কাছে একটা আধলা ধারতেন না কখনো, একটা আধলা বেশি নিতেন না ; কারো এমন সাধ্য ছিলো না পাওনা থেকে পাই পয়সা তাঁকে কম দেয়। মাঝে-মাঝে চাষিদের টাকা ধার দিতেন, তার জন্য সুদ নিতেন না, কিন্তু ঠিক সময়ে ফেরৎ না-পেলে এক চড়ে চামড়া ফাটিয়ে দিতেন লোকটার। যে-কোনো মামলায় তাঁর সাক্ষ্য ছিলো শেষ কথা ; গ্রামে কখনো পুলিশ এলে তাঁর কথার উপর মরণ-বাঁচন নির্ভর করেছে অনেকের। এবং কেউ কোনো অন্যায় করেছে বুঝলে, বন্ধুকেও ধরিয়ে দেবার মতো কলজে ছিলো তাঁর। তাঁর কাছে অন্যায়ের মাত্রাভেদ ছিলো না ; তহবিল তসরুপ করাকে তিনি যত ঘৃণা করতেন, পরের পুকুরে মাছ ধরাকেও তেমনি। এই হিংস্র সততা, এই পাশবিক সাধুতার জোরে সারা গ্রামের উপর একরকম রাজত্ব করতেন তিনি—নিজের পরিবারবর্গের তো

কথাই নেই। আমার চারটে ছোটো ভাই-বোন তাঁকে যমের মতো ভয় করতো, ভক্তিও করতো ভগবানের মতো। একবার 'বাবা' শব্দ উচ্চারিত হ'লেই তাদের রোমাঞ্চ হয়, তিনি একবার দৃষ্টিপাত করলে মূর্ছা যাবার দশা হয় তাদের। আর দেখে-দেখে আমার ইচ্ছে করে ওদের সব ক-টাকে গলা টিপে মারি।

কেননা, ত্রিভুবনে আর-কিছুই ছিলো না, যাকে আমার বাবার চেয়েও ঘৃণা করতুম আমি। তাঁকে ঘৃণা করতুম, তিনি আমার চেয়ে প্রবল আর কর্মিষ্ঠ আর বুদ্ধিমান ব'লে, তিনি অন্যায়কে অমন ঘৃণা করেন ব'লে ঘৃণা করতুম তাঁকে, কেননা—আমার ধারণা ছিলো—সবচেয়ে বেশি অন্যায় করেছেন, এবং নিত্যই ক'রে থাকেন তিনি। সে-অন্যায় আমার মা-র উপর।

আমার মা-কে আমরা বরাবর ছোটোখাটো মানুষ ব'লে জেনেছি। কিন্তু আসলে, সে-যুগের বাঙালি মেয়েরা তুলনায়, তিনি বরং লম্বাই ছিলেন, তাঁর মাথা বাবার বুকের কাছে প'ড়ে থাকে ব'লে বাবার পাশে তাঁকে মনে হয়েছে হাস্যকর রকমের ছোটো, অক্ষম আর দুর্বল। বিশ্রী লাগতো আমার তাঁদের দু-জনকে কাছাকাছি দেখতে ; এমন বেমানান কোনো স্বামী-স্ত্রী আমি আর দেখিনি। রঘুর বাবাকে দেখার পর রঘুর মা-কে দেখামাত্র মনে হবে—হ্যাঁ, এই ঠিক! সুবলের মা-কে একবার দেখলে যেন না-চিনেও ব'লে দেয়া যায় যে উনিই তার বাবা। কিন্তু আমার মা-বাবাব মধ্যে যেন দিন আর রাত্রির ব্যবধান ; এই দু-জন যে একই সঙ্গে একই আকাশে বিরাজ করতে পারেন তা চোখে দেখেও বিশ্বাস শক্ত। গরমিলটা শুধু দৈহিক আকারে নয় ; চেহারায়, চরিত্রে, ব্যবহারে, কোনোখানে একফোঁটা মিল নেই দু-জনের। বাবার গায়ের রং কালো ; মা-র রং হাতির দাঁতের মতো ; বাবা একটা হাঁক দিলে সারা পাড়া কেঁপে ওঠে, মা-র গলার আওয়াজ ফিশফিশের উপরে ওঠে না ; বাবা পুজো-আর্চার ধার ধারেন না, হাড়গোড়সুদ্ধ পাঁঠা খেয়ে ফেলেন শুধু চামড়াটা বাদ দিয়ে, আর মা-র যে বছরের মধ্যে কত ব্রত আর মাসের মধ্যে কত উপোশ, তার আর অন্ত নেই। সে-সব দেখে বাবা আবার বলতেন, 'এত জপ-তপ তো বিধবার করবার কথা, কিন্তু তুমি তার সুযোগ পাবে কিনা সন্দেহ—যা স্বাস্থ্য আমার! তা ভালো, সময় থাকতে ক'রে নাও।'

'সময় থাকতে'—এই কথাটা আমার কানে বাজে। বাবা কি বুঝেছিলেন মা-র আর বেশি সময় নেই ; বুঝেছিলেন, তিনি তাঁর অর্ধাঙ্গিনীকে প্রায় শেষ ক'রে এনেছেন? অথচ, সত্যের খাতিরে বলতেই হয়, আমার জ্ঞানত মনে পড়ে না বাবাকে কখনো মা-র সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করতে দেখেছি। একটা কটু কথাও বলতে শুনিনি। বরং, মা-র প্রতি বিশেষ একটু স্নেহের ভাবই ছিলো তাঁর, যে-স্নেহ তাঁর সন্তানদের মধ্যে একজনকেও দেননি তিনি, পাছে তারা কোনো দুর্বল মুহূর্তে তাকে অমান্য ক'রে মাথার উপরে বজ্রপাত ডেকে আনে। সন্তানদের বিষয়ে তাঁর আশঙ্কা ছিলো, কিন্তু স্ত্রীর বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন ; সেইজন্য সেখানে একটু কোমল হ'তেও তাঁর আপত্তি হ'তো না। তাঁর রাজত্বের সবচেয়ে সুশীল প্রজা ছিলেন মা, অক্ষরে-অক্ষরে মেনে নিয়েছিলেন তাঁর অনুশাসন, ধ'রেই নিয়েছিলেন এই সংসারে (আর মা-র কাছে সেটাই ছিলো সারা জগৎ) তিনিই সর্বেসর্বা। তুচ্ছ কোনো অপরাধের জন্য ছেলেদের যখন গুনে-গুনে বেত মারতেন তিনি (বয়স অনুপাতে ছোটো আর বড়ো মাপের বেত ছিলো তাঁর, আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে অস্ত্রগুলিও লম্বায় বাড়তো) আর মেয়ে দুটোকে হাঁটুর ফাঁকে পিষে রাখতেন ঘড়ি দেখে দশ মিনিট থেকে আধ ঘণ্টা পর্যন্ত, তখনো মা কোনো প্রতিবাদ করতেন না, শুধু আমাদের অবমাননার ঘটনাস্থল ছেড়ে দূরে স'রে যেতেন। অতএব আর বিরোধ ঘটবে কী নিয়ে?

কিন্তু, বাবা যদি মা-র সঙ্গেও ঐ রকম কোনো কর্কশ ব্যবহার করতেন তাহ'লেই যেন সুখ হ'তো আমার, হৃদয়ের জ্বালা একটু জুড়োতো। আমার কোনো সন্দেহ ছিলো না যে বাবা মা-কে যন্ত্রণা দেন ; অনেক চেষ্টাতেও তার কোনো প্রমাণ পাইনি ব'লেই আমার বিশ্বাস লাফাতে-লাফাতে এগিয়ে গেছে। কী রকম যন্ত্রণা দেন জানি না, ধারণা করতেও পারি না ; কতদিন অর্ধেক রাত্রি জেগে থেকেছি অসম্ভব কথা ভেবে-ভেবে ; বাবা আমার মা-কে নিয়ে যে-রাত্রির মধ্যে লুকিয়ে

আছেন তার ভার অসহ্য হ'য়ে উঠেছে আমার। তা যদি না-ই হবে, যদি কোনো গোপন কষ্ট না-ই থাকবে, তাহ'লে মা এমন ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছেন কেন দিন-দিন, মুখের চামড়া হলদে হ'য়ে গেছে কেন, কেন হাত দুটি এত পাৎলা যে রোদ্দুর যেন এ-পিঠ ও-পিঠ ফুঁড়ে বেরোয়? আর কেনই বা এত ব্রত, এত উপোশ, পুজোর ঘরে এতক্ষণ কাটানো—যদি-না তার মানে হয় অমনি ক'রেই বাবাকে কিছুটা দূরে রাখা, অমনি ক'রেই নিজেকে ঘিরে বেড়া তুলে দেয়া— বাবার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য?

সেই ছেলেবেলায়, নিজের কাছেও এ-সব কথা প্রকাশ করার ভাষা আমি শিখিনি, কিন্তু চিন্তাগুলি ঝিলিক দিয়েছে মনের মধ্যে। তারপর, ক্রমশ যখন ভাষা শিখলুম, ভাবনাগুলিও স্পষ্ট হ'য়ে এলো, তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠলো, দেহের মধ্যে ছড়িয়ে-পড়া বিষ একটা অংশে জ'মে উঠে অস্ত্রোপচারের জন্য তৈরি হ'লো যেন। কিন্তু এর পিছনে ছোট্ট একটা ঘটনা আছে।

তিন

আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হবার দু-দিন পরে আমি একটা শিরীষগাছে চড়তে গিয়ে ডাল ভেঙে প'ড়ে গেলুম। এই আমার জীবনের প্রথম পতন নয়, কিন্তু সেবারে ডালটা বেশ উঁচু ছিলো, চোখে ঝাপসা দেখলুম কয়েক মিনিট, হলুদ চুনের প্রলেপ সত্ত্বেও রাত্রে ব্যথায় ঘুমোতে পারলুম না। পরের দিন মধুগঞ্জ থেকে পাশ-করা ডাক্তার এসে বললেন বাঁ পায়ের কব্জির আর বাঁ হাতের কনুইয়ের কাছে হাড় ভেঙে গেছে , দুই অঙ্গে কাঠের ফ্রেম লাগিয়ে, আঁটো, মোটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে চ'লে গেলেন তিনি। আমাকে যেন পেরেক ঠুকে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হ'লো।

যে-ক'দিন শরীরে খুব যন্ত্রণা ছিলো অন্য কিছু ভাবতে পারিনি। কিন্তু তার উপশম হ'তেই মনে হ'লো, ঐ ব্যথাই ভালো ছিলো আমার। জলজ্যান্ত সুস্থ শরীরে শুয়ে থাকা—আর তাও কিনা ঘৃণিত ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরে মহাদেবের মতো উদার ছুটির সময়ে! চুপ ক'রে শুয়ে থাকলে বেশ থাকি, কোনো কষ্ট আছে মনেই হয় না, কিন্তু উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেই শরীরটা আর্তনাদ ক'রে ওঠে। দিনের মধ্যে দু-চারবার প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মের জন্য উঠতে বা বসতে হয়—তাও দূরে যেতে পারি না, ঘরটাকে পরিষ্কার রাখতে গিয়ে মা-র খাটুনি দেখে আমি লজ্জায় ম'রে যেতে থাকি, তার উপর ঐটুকুতেই হাতে-পায়ে এমন শূল বেঁধে যে তার পরে আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা করার উৎসাহ থাকে না। তা তো হ'লো—কিন্তু আমি এখন করি কী? সময় কাটে কী ক'রে?

আর এমনি ক'রেই—জীবনে প্রথম বার—পড়ার দিকে আমার মন গেলো। বাড়িতে কতগুলো হিতবাদী আর বসুমতীর গ্রন্থাবলী ছিলো : বঙ্কিম, রমেশ দত্ত, শরৎচন্দ্র, অনুরূপা আর নিরুপমা দেবী, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ। আর ছিলো কালী সিঙ্গির মহাভারত, আর মোটা বাঁধানো ব্রহ্মসংগীত—কোদাল-কাটা হাতের লেখায় আমার বাবার নামাঙ্কিত। আর মা-কে বিয়েতে কে উপহার দিয়েছিলেন একখানা তুলোর প্যাডে বাঁধাই 'বৈষ্ণব গীতিকা'। এগুলোকে বহুদিন ধ'রে চোখে দেখেছি, কিন্তু ফিরে তাকাইনি—আজ ঐ জিরজিরে হলদে পাতাগুলোর মধ্যেই বন্দী দশার সান্ত্বনা খুঁজতে হ'লো। বিরুদ্ধ ভাব নিয়েই প্রথম ছুঁয়েছিলুম ওদের, একটু পরেই ছুঁড়ে ফেলার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে, ওদের অপদার্থতা প্রমাণ করার জন্যই কোমর বেঁধে। কিন্তু কখন এক সময়—আমারই অজান্তে—বইগুলো আমাকে টেনে নিলো ওদের মধ্যে , আমার খিদে নেকড়ের মতো দৌড় দিলে পাতার পর পাতা পার হ'য়ে, পথে যা কিছু পড়লো চেটে-পুটে সাবাড় ক'রে দিলে। ভাঙা হাত-পা নিয়ে বই পড়াও নির্বিঘ্ন হ'লো না, কিন্তু আস্তে-আস্তে—সব বিকল মানুষই যেমন করে—আমি কয়েকটা কায়দা আয়ত্ত ক'রে ফেললুম ; বালিশে হেলান দিয়ে আধো-শোয়া অবস্থায়, বুকে বালিশ চাপা দিয়ে উপুড় হ'য়ে, নয়তো বাঁ পাশ ফিরে কাৎ হ'য়ে, আমি শিখে নিলুম যে বই পড়ার জন্য

চোখ দুটোই যথেষ্ট, আর এক হাত দিয়েও বইটাকে আঁকড়ে ধরা যায়, পাতা ওল্টানো যায়। যে-দু'মাস শুয়ে ছিলুম, এমনি ক'রেই বেশির ভাগ সময় কাটলো। আর অবশ্য গৌরী এসেছে মাঝে-মাঝে।

গ্রামের পুরুষঠাকুর শীতল ভটাচাযের মেয়ে গৌরী। তার বয়স চোদ্দ, দেহ নধর, সন্ধেবেলায় দিঘির জলের মতো ঠাণ্ডা আর কালো তার গায়ের রং। চড়ুইপাখির মতো চঞ্চল দুটো চোখ। আর সে যখন ছুটে চলে তার বুকের দুটো বন্দী পাখি ডানা ঝাপটায়। মা-র সঙ্গে পুরুৎঠাকুরের সম্বন্ধ কিছু বেশি, প্রায় রোজই কিছু-না-কিছু খবর নিয়ে—বা বিনা কাজেই—গৌরী আসে এক-আধবার। কিন্তু আমি যখন গাছ থেকে প'ড়ে গেলুম, সেই যে সে ভয় পেয়ে পালালো, তার পরের দিনও আর বাড়ি ছেড়ে বেরোলো না। তার পরের দিন এসে আমার ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা জবড়জং অবস্থা দেখে তার মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো। গুনগুন ক'রে দুঃখ জানালো আমার কাছে : তার জন্যেই তো হ'লো এটা, সে ঐ উঁচু ডালের মঞ্জরীটা না-চাইলে তো আমাকে আর গাছে চড়তে হ'তো না, নিচুতেও অনেক ভালো-ভালো ফুল ছিলো, যা আমি লাফ দিয়ে বা হাত বাড়িয়েই পেড়ে দিতে পারতুম—তার অমন দুর্মতি কেন হ'লো কে জানে, নিশ্চয়ই শনির দৃষ্টি পড়েছিলো সেই সময়ে। এই পর্যন্ত শুনে আমি বললুম—'বোকার মতো কথা বোলো না, চুপ করো!'

কিন্তু, পুরুতের মেয়ে গৌরী, 'দোষ', 'দৃষ্টি', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'স্বস্ত্যয়ন', এই সব কথা শুনে-শুনে বড়ো হয়েছে ; এই দুর্ঘটনার কিছুটা দায়িত্ব সে নিজের উপরে না-নিয়েই পারলো না। আমি শরীর দিয়ে যে-কষ্ট পাচ্ছি, সেটাকে সে তার মনের মধ্যে নৈতিক অপরাধে পরিণত ক'রে নিলে, আর তার মার্জনার জন্যেও চেষ্টা করতে লাগলো নানা ভাবে। হাতের মুঠোয় ভ'রে সে নিয়ে আসে চিঁড়ের মোয়া, তিলের নাড়ু, নারকোলের তক্তি, কোনোদিন আঁচলে বেঁধে কচি শসা, তালশাঁস ; তারপর, যখন দিনগুলি বেশ গরম হ'য়ে উঠলো, কোঁচড় ভ'রে জামরুল, গোল-গোল ডাঁশা কালোজাম, ডুরে শাড়ির মতো রঙিন কামরাঙা। মেয়েলি খাওয়াও বাদ গেলো না ; তেঁতুলের আচার, নুন আর লঙ্কা দিয়ে মাখা কাঁচা আম, লঙ্কা আর গুড় মেশানো শুকনো কুলের আচার। কোনোদিন এত খাইনি আগে, খাওয়াতে আমার বেশিক্ষণ ধৈর্য থাকে না, কিন্তু গৌরী বলতো, 'খাও, খাও। বেশি ক'রে খেলেই তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে।' যদি বলেছি, 'এই তো একটু আগে ভাত খেলুম,' কি কোনো-কিছুর স্বাদুতা বিষয়ে সন্দেহ দেখিয়েছি, তাহ'লে বলেছে—'আচ্ছা, একটু চোখ বোজো তো। এবার হাঁ করো।' আর তার হাতের তাপে গরম-হ'য়ে-ওঠা খাবারটি যখন মুখের মধ্যে পড়েছে, তখন অবশ্য আমার জিভ থেকে সারা শরীরে সুখ ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয়নি।

আমাকে শুধু খাইয়েই তার তুষ্টি ছিলো না, অন্য ভাবেও আমার কাতর অবস্থা ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করতো সে। ব'সে-ব'সে গ্রামের সব খবর বলে—নবা ছুটিতে তেলিরবাগে তার মামাবাড়ি গেছে ; সেদিন একটা নৌকো ডুবেছে লোহজঙ্গের কাছে ; টেঁপি তার ছোটো ভাইকে ভুল ক'রে মালিশের ওষুধ খাইয়ে দেয়ায় সকলেই খুব ভয় পেয়েছিলো, কিন্তু ছেলেটার কিছু হ'লো না-দেখে এখন ভাবছে ওষুধটাতেই ভেজাল ছিলো কিনা। তার বাবার দশ-দুয়োরি পেশার জন্য অনেক ঘরেরই খবর পৌঁছয় তার কানে, আর সেই খবরগুলোকে বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে অঙ্গভঙ্গি ক'রে বলতেও তার আলস্য নেই। আর শুধু যে ঘরের কথাই বলতো তাও নয় : তার মুখে শুনতুম, মজুমদারের খিড়কি পুকুরের পাড়ে কৃষ্ণচূড়া গাছ দুটো নতুন বৌয়ের মতো লাল হ'য়ে উঠেছে, সেন-বাড়ির রাজহাঁসের ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়েছে সেদিন, মিনুর মা-র খোঁড়া কুকুরটা একটা বেড়াল-ছানাকে পুষ্যি নিয়েছে—দু-জনে ভাই-বোনের মতো খেলা করে কিন্তু ভাই-বোনের মতো মারামারি করে না। এমনি, আধ ঘণ্টা বা চল্লিশ মিনিট ব'সে-ব'সে গৌরী নানান কথা বলতো। আমি হয়তো তার আগে মহাভারতের তিরিশ পৃষ্ঠা পড়েছি, কি 'রাজসিংহ, কি 'অরক্ষণীয়া', কিংবা পড়েছি শ্রীরাধিকার বয়ঃসন্ধির বা কোনো-এক অস্পষ্ট, রহস্যময় 'তিনি'র বর্ণনা। সেই সব ছবি, দৃশ্য, ভাষা তখনো আমার কানে আর মনে ঘুরঘুর ক'রে বেড়াচ্ছে, আর তারই উপর ঝ'রে পড়ছে গৌরীর

কথাগুলো—একটা স্রোতের উপর ছোটো-ছোটো বৃষ্টির মতো। জলের মধ্যে জল যেমন মিশে যায়, তেমনি আমার পড়া-গল্পের মধ্যে গৌরীর খবরগুলো গ'লে গিয়েছে—আমি অনেক সময় মন দিয়ে শুনিওনি, হয়তো চোখ দিয়েই দেখেছি বেশি। কোনো-কোনোদিন মা এসেছেন, তাতে গৌরীর উৎসাহ আরো বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু কাছাকাছি বাবার সাড়া পেলেই সে চুপ ক'রে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়েছে। আমিও কোনো কথা বলিনি ; আমার বাবাকে সে ভয় না-পেলেই অবাক হতাম।

আমাদের কোঠাবাড়ি ছিলো না ; একখানা বড়ো, একখানা ছোটো টিনের ঘর, মাঝখানে উঠোন, উঠোনের ও-পাশে রান্না-ঘর, গোয়াল-ঘর, ঢেঁকি-ঘর। ছোটো ঘরটা দুটো কামরায় ভাগ করা ; একদিকে থাকি আমি, আর-এক দিকে আমার ছোটো দু-ভাই। বিছানায় বন্দী হবার পর থেকে আমার নির্জনতায় বেশি ব্যাঘাত ঘটে না : ভাইয়েরা বাইরে-বাইরে ঘোরে, বোন দুটো গোরুকে খাওয়ায়, ঢেঁকিতে ধান কোটে, মা সংসারের কাজে উদয়াস্ত সময় পান না। সকালে একবার আসেন আমার কাছে, দু-বেলা খাবার নিয়ে আসেন, মাঝে-মাঝে বোনেদের পাঠিয়ে খবর নেন, আর নিজে খাওয়া-দাওয়া সেরে বেলা তিনটে নাগাদ কাছে এসে বসেন খানিকক্ষণ। কোনো-কোনোদিন গৌরীও থাকে সে-সময়ে ; মা-কে আর তাকে একসঙ্গে দেখে আমার মনে প'ড়ে যায় খুব ছেলেবেলার একটা কথা—যখন, লক্ষ্মী-পুজোর সময়, শিউলি কুড়োতে বাইরে এসে আমি দেখেছিলুম একদিকে চাঁদ ডুবে যাচ্ছে আর-একদিকে ভোরের আকাশ রঙিন। দু-জনকে একসঙ্গে দেখতে একটু অদ্ভুত রকম ভালো লাগে আমার, আবার যেন কোথায় একটু কষ্ট হয় : কেমন যেন হিংসে হয় এ-কথা ভেবে যে মা অমন রোগা আর ফ্যাকাশে, আর গৌবী অমন স্বাস্থ্যে ভরপুর।

আমার ঘবেব পাশ দিয়ে বাবার যাওয়া-আসার পথ, এক-আধবার দাওয়ায় পায়ের শব্দ পাই, আধ মিনিট দাঁড়িযে খোঁজ নিয়ে যান কেমন আছি। কখনো গৌরীকে দেখলে ইস্পাতের মতো গলায় বলেন, 'গৌরী, যাও তো, দুটো পান নিয়ে এসো ভিতর থেকে,' নয়তো— 'ননীর মা-কে জিগেস ক'বে এসো শেলাইয়ের জন্য কত নম্বর সুতো চাই তাঁর।' গৌরীকে দেখলেই বাবার মুখ একটু অন্ধকাব হয়—তাঁর কালো রং আর ঘন দাড়িও তা লুকোতে পারে না—কিছু-না-কিছু ফরমাশ ক'রে তিনি তাঁকে তুলে দেন সেখান থেকে, আর সেও অবশ্য পালাতে পেরেই বাঁচে। আর একটু পরে যখন তাঁর আদিষ্ট জিনিশটি অথবা প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ননী কিংবা টুনি (আমার বোনেরা) এসে দাঁড়ায—তখন বাবা বাইবের দিকে চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকেন একটু, তারপর আমার দিকে আর না-তাকিয়ে হনহন ক'রে বেরিয়ে যান।

ভাঙা হাড় জোড়া লাগতে দেরি হ'লো, দু-মাসেও উঠে দাঁড়াবার সামর্থ্য হ'লো না। ততদিনে মা-ব ভাঁড়ারে বছবের প্রথম পাকা আম উঠেছে, কোকিলগুলোর চ্যাঁচামেচিতে তেমন পাগলামি আব নেই, আমি মহাভাবতখানা শেষ ক'রে এনেছি। ভারি গরম হয়েছিলো সেদিন। এই রকম দুপুরগুলো গাছের ছায়ায় কাটিয়ে দিয়েছি আমি, দিঘির ধারে বাঁশঝাড়ের তলায ঘুমিয়ে পড়েছি, যদিও জায়গাটার জাতিসাপের বাসা ব'লে বদনাম ছিলো। মনে-মনে ভেবেছি, হয়তো কোনোদিন সাপ বেরিয়ে আসবে আমার হাতে মারা পড়ার জন্য, কিংবা ঘুম ভেঙে দেখবো একটা সুন্দর মোটা সাপ আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছে, বা আমার মুখে ছায়া ফেলে মাথায় উপব ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে—যেমন গল্প শুনেছি কৃষ্ণের একবার হয়েছিলো। সাপের স্বপ্নও দেখেছি মাঝে-মাঝে, কিন্তু বাঁশঝাড়ে হঠাৎ দেখা হ'য়ে যায়নি কখনো।

গবমে ব্যাণ্ডেজ আরো অসহ্য, ভিতরে চুলকোয়, তার উপর টিনের চালার বিশ্রী তাপে কাদাব মতো ঘামতে হয়। মানুষ দুঃখে পড়লেই দুঃখ থেকে রেহাই পাবার বিদ্যে শেখে , আমিও ততদিনে বুঝেছিলুম অন্য কিছুতে মন দিতে পারলেই উপস্থিতকে ভুলে থাকা যায়। আমাব প্রিয় গ্রীষ্মাবাসটাব কথাই ভাবছিলুম সেদিন—দিঘির জল, বাঁশগাছের ছায়া, মাঝে-মাঝে বাতাসের নিশ্বাস। এক সময়ে ঘুমিয়েও পড়েছিলুম, ঘুমের মধ্যেই মনে হ'লো কে আমাকে স্পর্শ করলে। তাকিয়ে দেখি গৌবী আমার মুখের উপর ঝুঁকে আছে।

আমাকে চোখ মেলতে দেখে আমার কপাল থেকে হাত সরিয়ে নিলো সে। আমার বড্ড তেষ্টা পাচ্ছিলো, তাকে জল দিতে বললুম।

'লেবুর শরবৎ ক'রে আনবো?'

'না। জল।'

'পাতিলেবুর রসে গরম কমে জানো তো। কী ঘেমেছো—ইশ!'

হঠাৎ কেমন রাগ হ'লো তার উপর। উঠে ব'সে বললুম, 'তর্ক কোরো না। জল দাও।'

জলের গ্লাশ নিয়ে যখন কাছে এলো একটা মিষ্টি-মিষ্টি পচা ফুলের মতো গন্ধ পেলুম।

'এসেন্স মেখেছো নাকি?'

'এসেন্স কেন মাখবো।'

'তবে গন্ধ কিসের?'

'আমি কী ক'রে বলবো।'

'তোমার গা থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে, আর তুমি জানো না?'

'ও। চুলে ফুলেল তেল মেখেছি। ভালো?'

'বিশ্রী!'

'সেদিন বদগন্ধওলা কবরেজি তেল মেখেছিলুম ব'লে—

'এটাও তা-ই। বিশ্রী।'

'কী-রকম গন্ধ তোমার ভালো লাগে?'

'আমার ভালো লাগে বড়ো-বড়ো পুরোনো জালার ভিতরকার গন্ধ। আর খালপাড়ের ঝোপঝাড়ের গন্ধ। আর কেরোসিনের।'

'তাই ব'লে চুলে তো আর কেরোসিন তেল মাখা যায় না।' গৌরী হেসে উঠলো।

তার হাসি দেখে আরো রাগ হ'লো আমার, পায়ের ব্যথাটা নতুন ক'রে অনুভব করলাম। গোড়ালিতে চাপ সয় না তখনো, আমাকে বসতে হয় অনেকটা ভিখিরির ভঙ্গিতে, জখমি পা-টার হাঁটুতে ভর দিয়ে। বসার জন্যে ভালো ক'রে তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম, পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত, তার টলটলে শরীর, টলটলে দিঘির মতো ঠাণ্ডা তার গায়ের রং। কিন্তু সে-মুহূর্তে তার চড়ুই-চোখ স্থির হ'য়েই ছিলো।

'নতুন শাড়ি পরেছো দেখছি।'

'বাবা এনে দিয়েছেন চণ্ডীপুরের মেলা থেকে। তুমি ব'সে আছো কেন?'

'থাকি না।'

'লাগে না পায়ে?'

'লাগুক।'

গৌরী আমার বালিশটাকে ঝেড়ে-ঝুড়ে, চাদরটা একটু টান ক'রে দিলে। 'শোও এবার। একটা গল্প বলি, শোনো। অত মেজাজ কোরো না।'

আমি শুয়ে পড়লাম, কিন্তু আমার কিছুই ভালো লাগছিলো না। গৌরীকে আমার ভালোই লাগে, গৌরী এলেও ভালো লাগে, কিন্তু সেদিন কী-রকম অসহ্য মনে হ'লো তাকে ; সে যে কাছে আছে তাতেই যেন ফোড়ার মতো আমার সারা শরীর টনটন ক'রে উঠলো।

'জানো, চণ্ডীপুরের মেলায় বাবা একটা আশ্চর্য জিনিশ দেখে এলেন। এক বাজিকরের খেলা। প্রথমে সে একটা আস্ত শোলমাছ গিয়ে ফেললে, তারপর উগরে দিলে গলা থেকে, আর তারপর সেটাকে সকলের সামনে টুকরো-টুকরো ক'রে কেটে শূন্যে ছুঁড়ে দিতেই শূন্যি থেকে আস্ত একটা শোলমাছ পড়লো।'

'গৌরী, চুপ করো!'

'জ্যান্ত মাছ—খাবি খাচ্ছে। বাবা নিজ চক্ষে দেখেছেন। আর টুকরোগুলোকে কেউ কোথাও

খুঁজে পেলো না। কী ক'রে করে!'

'গৌরী, তুমি বাড়ি যাও এখন!'

আমার গলার আওয়াজে গৌরী কি অবাক হয়েছিলো না কি এইজন্যেই আশা ছিলো তার? সে আরো স'রে এসে আমার মুখের উপর নিচু হ'য়ে ভারি গলায় বললে, 'কী হয়েছে তোমার?'

আমি আমার ভালো হাতটা তুলে তার গালে এক চড় বসিয়ে দিলাম। তারপর সেই হাতেই তাকে টেনে নিয়ে এলাম বুকের উপর। আমার এক হাতেই দশ হাতের বল এসেছে তখন, আমার মুখের উপব অনুভব করলাম তার নিশ্বাস, আমার বুকের উপর তার বুক, আমার তাপের গায়ে তাব গ'লে যাওযার মতো শীতলতা।

কতক্ষণ এ-ভাবে কাটলো জানি না, হঠাৎ একটা আওয়াজে ঘর কেঁপে উঠলো।

—'বীবেশ্বর!'

আমি যে উঠতে পারি না, দাঁড়াতে পারি না, ছুটতে পারি না, সেটাকে এক বড়ো দুর্ভাগ্য ব'লে আর কখনো মনে হয়নি। যদি কোনোবকমেও উপায় থাকতো তাহ'লে আমি আমার জীবন নিয়ে, স্বাধীনতা নিয়ে পাগলেব মতো দৌড় দিতুম যে-দিকে চোখ যায়, সেই মুহূর্তেই আমার ভাগ্যের মীমাংসা হ'য়ে যেতো। কিন্তু আমাকে নিঃসাড়ে প'ড়ে থাকতে হ'লো, বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে, তুলোব মধ্যে দাঁত বসিয়ে, খাটের তক্তাটাকে দুই হাতে আঁকড়ে, আব বাবাব চামড়ার চাবুক শূন্যে শিস দিয়ে আগুনের মতো পিঠে পড়লো আমার—এক, দুই, তিনবার। বাবা একটু থামলেন, দাঁতে দাঁত ঘ'ষে বললেন—'বিজোড়ে শেষ করতে নেই।' ব'লে আর-একবার।

রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে মা আমার গায়ের উপব উপুড় হ'যে পড়লেন। কেঁদে ফেলে বললেন, 'হাত-পা ভেঙে প'ড়ে আছে ছেলেটা, তাকে তুমি এই করলে' তুমি কি একটা মানুষ!'

'শুয়ে-শুয়ে ঘি-দুধ খেয়ে বেশ তেল বেড়েছে দেখছি। এটুকুতে ভালোই হবে,' ব'লে বাবা—আমি মুখ তুলে চেয়েও দেখলুম—চাবুক দোলাতে-দোলাতে চ'লে গেলেন।

খুব যন্ত্রণা, ছেঁড়া ছালের মলম নিয়ে কবরেজ মশাইর আনাগোনা, মা-র নিঃশব্দ, শুশ্রূষাময় হাত দুটি। কিন্তু আমার কিছুতে মন ছিলো না। আমি শুধু একটা কথা ভাবছিলুম . কী ক'রে প্রতিশোধ নেয়া যায়। দূর থেকে ঢিল ছুঁড়ে মাথা ফাটিয়ে দেবো? নৌকোতে নদীতে নিয়ে ডুবিয়ে মারবো? না কি জমিদারের দারোয়ানকে সিদ্ধি খাইযে তার লম্বা ছোবাটা চেয়ে আনবো একদিন? কিন্তু বাবার যে আমার চেয়েও অনেক বেশি গায়ে জোর। আমাকে ধ'রে ফেলে আন্দামানে চালান দিয়ে দেবেন, আব তখন—আমারই স্বকর্মের শাস্তি পাচ্ছি ব'লে —তাঁকে আর ঘৃণা কবতেও পারবো না। সেটা যে ভয়ানক ক্ষতি হবে।

না, মুখোমুখি এঁটে উঠতে পারবো না · কৌশল চাই। ধরা যাক যদি সাপুড়েদেব সঙ্গে ঘোরাঘুরি করি কিছুদিন? চাকরেব মতো তাদের কাজ ক'রে দিলে তাবা কি কিছু শেখাবে না? তারপর সুযোগ বুঝে একটা বিষদাঁতওলা কালকেউটে ঠিক পায়ের কাছে ফেলে দিলেই হ'লো। সাপের কামড়ে কত মারা যায়—কেউ কিছু বুঝবে না।

না কি কোনো তান্ত্রিকের চেলা হ'য়ে বেরিয়ে পড়বো মারণ উচাটন মন্ত্র শেখাব জন্য? না কি ঢাকায় গিয়ে পালোযানি আখড়ায় ভর্তি হবো, তারপর আটচল্লিশ ইঞ্চি বুকেব ছাতি আব লোহাব মতো পেশী নিয়ে চাবুক হাতে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বলবো, 'আপনার দেনা শোধ কবতে এলাম। আসুন।'

কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, কোনোটাই যে পারি না। কবে সেরে উঠবো, তাবপব আরো কতদিন লাগবে সাপ পুষতে, মন্ত্র শিখতে, পালোয়ান হ'তে! এখন আমি কী করি তবে? বিছানায প'ড়ে-প'ড়ে দম আটকে ম'রে যাবো নাকি?

একদিন আমার স্কুলের খাতার শাদা পাতায় পেনসিল দিয়ে কয়েক পাতা লিখে ফেললাম। পিঠেব তখনো এমন অবস্থা যে চিৎ হ'য়ে শুতে পারি না। গিরগিটির মতো উপুড় হ'য়ে থাকি, লেখাব

কাগজটাকে চাপা দিতে গেলে বাঁ হাতে ঝনাৎ ক'রে ওঠে, কখনো একটু অসাবধান হ'লেই পায়ের অস্তিত্ব টের পেয়ে যাই। কিন্তু এই কষ্টগুলো—আমার মনের মধ্যে যা চলছে, তার তুলনায় তুচ্ছ হ'য়ে গেছে তখন। দুটো কাল্পনিক নাম ভেবে নিয়েছি : একজন পাশবিক বাবা, আর তার অপাপবিদ্ধ পুত্র। একজন নায়িকাও ছিলো, তার বেশি পার্ট ছিলো না, কিন্তু চুল ছিলো 'আগুল্‌ফলম্বিত।' লেখাটার শেষে পুত্রের মৃত্যু হ'লো, অনুতপ্ত পিতা তার চিতার আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, আর লেখক যেন আরোগ্যলাভ ক'রে উঠে বসলেন। আমার প্রথম গল্প এইভাবে লিখেছিলাম।

চার

অবশ্য আমি তখনো কল্পনাও করিনি যে আমি 'লেখক' হবো। পিঠের ঘা শুকোবার সঙ্গে-সঙ্গেই পেনসিলে লেখা খাতাটাকে ভুলে গিয়েছিলাম, আর ততদিনে নিয়মিত মৃদু ব্যায়ামের সাহায্যে জোড়া-লাগা হাত-পা দুটোকে সচল ক'রে তুলতেই বেশি ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছি। যতদিন না আরো তিন বছর কেটে গেছে, কিছু 'লেখা'র কথা আর মনেই হয়নি আমার। তখন আমি রিপন কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি ; একটা মাসিক পত্রে গল্প-প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন দেখলাম। নগদ টাকা পুরস্কার দেবে। আমার টাকার প্রয়োজন ছিলো ; বাবা এমন টায়ে-টুয়ে পাঠাতেন যে শহরের সুখের দিকে তাকিয়ে দেখারও সাধ্য হ'তো না ; বড়ো জোর সন্ধের পর দুরুদুরু বুকে একবার ঘুরে আসতুম বৌবাজারের সেই সব গলির মধ্য দিয়ে, যেখানে আধো-ছায়ায় নহ-মাতা-নহ-কন্যা-নহ-বধূরা সারি-সারি দাঁড়িয়ে থাকে। কলেজ কামাই ক'রে, হস্টেলের নিরিবিলি দুপুরবেলায়, তারপর অর্ধেক রাত জেগে একটা গল্প শেষ ক'রে পরের দিনই হেঁটে-হেঁটে সেই পত্রিকার আপিশ খুঁজে দিয়ে এলুম। লেখকের নামে আমার পদবিটা বদলে দিলুম—যাতে বাবার কখনো চোখে পড়লেও বুঝতে না পারেন, কিংবা যাতে এই একটা জায়গায় বাবার পুত্র ব'লে পরিচিত হ'তে না হয় আমাকে। ঐ 'দেবযানী' গল্প লিখে বীরেশ্বর গুপ্ত প্রথম 'বিখ্যাত' হন, এই কথাটা বাংলা ভাষার অভিধানেও পাওয়া যায় আজকাল।

আমি পেয়েছিলুম দ্বিতীয় পুরস্কার, চল্লিশ টাকা—পঁচিশ বছর আগে, কুড়ি বছরের যুবকের পক্ষে, অনেক টাকা সেটা। দু-জন বন্ধু নিয়ে রাতের মতো একটা রাত ক'রে তোলা গেলো। শেষের দিকটা তেমন উপভোগ্য হ'লো না, অনভ্যস্ত হুইস্কিতে বমি ক'রে ফেললাম, অভ্যস্ত মেয়েগুলো ধরাধরি ক'রে শুইয়ে দিলে আমাকে, তারপর আর মনে নেই। সেই ঘরেই ধূসর ভোরে তীব্র মাথা-ধরা নিয়ে জেগে উঠলাম : বেরোবার আগে পকেটের শেষ ক-টা টাকা আসলে-অব্যবহৃত মেয়েটার হাতে দিতে সে বললে, 'আবার এসো।' বেরিয়ে এসে মনে হ'লো এতদিনে বাবার সমকক্ষ হয়েছি, এমনকি তাঁর চেয়েও উন্নত মানুষ।

আমি আশাও করিনি বাবা আমাকে কলেজে পড়াবেন, আর তাও কলকাতায়। কিন্তু দৈবাৎ আমি ফার্স্ট ডিভিশনে গিয়েছিলুম, হেডমাস্টারের সুপারিশ ছিলো, আর আমাকে শিক্ষার যোগ্য জেনেও তা থেকে বঞ্চিত করবেন তেমন বিবেকহীন মানুষ অবশ্য বাবা নন। কিন্তু ঘরের কাছে ঢাকায় কলেজ থাকতে কলকাতায় কেন? তার কারণ, ঢাকা মাত্র ছ-ঘণ্টার পথ, আর কলকাতা আঠারো ঘণ্টার—বড়ো ছুটি ছাড়া বাড়ি আসতে পারবো না। আমাকে দূরে-দূরে রাখতে চান, গৌরীর সান্নিধ্য থেকে দূরে, হয়তো তাঁরও উপস্থিতি থেকে দূরে। শেষোক্ত প্রস্তাবে তাঁর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত ছিলুম, খুব খুশি মনেই নৌকোয় চড়েছিলুম লৌহজঙের ঘাটে গোয়ালন্দের স্টিমার ধরতে।

নদীর ঘাট অবধি মা এসেছিলেন সঙ্গে। অনেকদিন পর খোলা মাঠের মধ্যে মস্ত আকাশের তলায় দেখলাম তাঁকে। ঘরের মধ্যে ঠিক বোঝা যায় না ; বাইরে রোদ্দুরে দেখে মনে হ'লো মা হঠাৎ একটু মোটা হয়েছেন, কিন্তু আরো, আরো ফ্যাকাশে। আকাশের তলায় ছোট্ট এইটুকু মনে

হয়, গায়ের রং বা রঙের অভাবে কাগজে তৈরি ফাঁপা কোনো পুতুলের মতো। তাঁর মৃদু গতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে অসুবিধে হচ্ছিলো আমার, আর তাঁরও কষ্ট হচ্ছে বুঝে আমি কয়েকবার তাঁকে ফিরে যেতে বললুম। কিছু না-ব'লে ঘাট পর্যন্ত এলেন। দু-একবার গৌরীকে আমার মনে পড়লো ; সেই মধুর, গরম, যন্ত্রণার দিন—যার স্মৃতি নির্বোধ শরীরটা ভুলে গেলেও মনের মধ্যে তখনো দগদগ করছে—সেই দিনের পর তাকে আর দেখিনি, তাকে বাড়ি থেকেই আর বেরোতে দেন না তার মা—তবু একদিন হঠাৎ দেখে ফেলেছিলুম খালের জলে বাসন ধুচ্ছে। সে আমাকে দেখেছিলো কিনা জানি না, কিন্তু পিছন থেকে তাকে দেখে, নির্ভুল চিনতে পেরেও, তাকে হঠাৎ অন্য মানুষ মনে হয়েছিলো আমার, একেবারে অচেনা কোনো অন্য মানুষ।

নৌকো ছেড়ে দিলে, মা দাঁড়িয়ে রইলেন ঘাটে, আমি মুখ ফিরিয়ে নিলুম। খানিক পরে তাকিয়ে—যদিও সামনে ধু-ধু মাঠ ছাড়া কিছু নেই—তাঁকে আর দেখতে পেলাম না। এইটুকু সময়ের মধ্যে কোথায় গেলেন? বোধহয় দুপুরের রোদে ধাঁধা লেগেছিলো আমার চোখে, কিন্তু আমি যেন মুহূর্তের জন্য অস্বাভাবিক একটা কষ্ট অনুভব করলাম, মনে হ'লো তাঁকে আর কখনোই দেখবো না। কয়েকদিন আগে শোনা একটা কথা আমার মনে প'ড়ে গেলো। আমার শোনবার কথা নয়, দৈবাৎ শুনে ফেলেছিলুম। রাত্রে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার পর মা রান্নাঘর সাফ ক'রে রাখছেন, বাবা দাঁড়িয়ে আছেন দরজার ধারে। যেতে-যেতে মা-র গলার আওয়াজ আমার কানে এলো। 'আর কেন? তোমার হাতে মার খাবার জন্যে আর কত জন্মাবে ওরা?'

পুজোর ছুটিতে বাড়ি এসে, উঠোনে দাঁড়ানো মাত্র, প্রথমেই বাবার সঙ্গে দেখা। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, চোখ দুটো লাল। বললেন, 'এসো। আমি তোমাকে টেলিগ্রাম করতে যাচ্ছিলাম। জুতোটা আর গায়ের জামাটা খুলে ফ্যালো।' শুনলাম, ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা আগে মা মারা গেছেন। অকালে একটা শিশু জন্মেছিলো, সেও বাঁচেনি। ক-দিন পরে আব-একটা খবর পেলাম : শ্রাবণ মাসেই গৌরীর বিয়ে হ'য়ে গেছে।

এর পরে ছুটিতে বাড়ি আসাব উৎসাহ অনেক ক'মে গেলো আমার। নেহাৎই হস্টেল বন্ধ থাকে ব'লে, কিংবা খোলা থাকলেও বাবা টাকা পাঠাবেন না ব'লে যেতে হয়। বি.এ. ক্লাশে ওঠার পর থেকে আরো অসহ্য মনে হ'লো বাড়ি আসা, কেননা ততদিনে আমার কলকাতার আকর্ষণ অনেক বেড়ে গেছে, গল্প লিখে কিছু রোজগারও করছি, কিংবা রোজগারের জন্যই লিখছি মাঝে-মাঝে। আমার ভারি অবাক লাগে বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথের কথা ভাবতে, যাঁদের টাকার দরকার ছিলো না, আর তবু যাঁরা বই লিখেছেন।

ফোর্থ ইয়ারে ওঠার আগেকার গ্রীষ্মের ছুটিতে গৌরীর সঙ্গে আমার আবার দেখা হ'লো। সে বাপের বাড়িতে বেড়াতে আসেনি, বিধবা হ'য়ে এসেছে। আমি কলকাতায় থাকি, কলেজে পড়ি, দেখতেও মস্ত বড়ো হ'য়ে গেছি ; আর গৌরী তো আরো বেশি বদলে গেছে ; বোধহয় এ-সব কারণেই দেখা হবার বাধা হ'লো না। তার মা-ই একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন—কাছে বসিয়ে অনেক কথা বললেন, আমার মা-র কথা, মাতৃহীন হবার দুঃখের কথা—অবশ্য মা-বাবা তো কারোরই চিরকাল থাকে না, কিন্তু ঐ হতভাগিনী মেয়েটার জীবন এখন কাটে কী ক'রে—একটা সন্তান পর্যন্ত নেই। 'বোঝো তো বাবা, আমাদেব সব ঘরে মেয়েকে তো আর বেশি বড়ো করা যায় না, আর পুরুষমানুষে কোনো দোষই বর্তায় না, কিন্তু মেয়েদের পান থেকে চুন খসলেই সর্বনাশ। তা পাত্র ভালোই ছিলো, কিন্তু টিকলো না—কপাল। তোমার বাবা বলেন, "তাতে কী হয়েছে—আবার বিয়ে দিন মেয়ের," কিন্তু ও-সব খেরিস্তানি কাণ্ড ক'রে কি আর গ্রামে বসবাস চলে—আর ওঁদের হ'লো তিন পুরুষের যজমানি ব্যবসা। আর তাছাড়া কথা হ'লো যেখানে কুমারী মেয়েগুলোই ঘরে-ঘরে ধিঙ্গি হচ্ছে সেখানে বিধবাকে কে বিয়ে করবে, বলো!'

কথা শেষ ক'রে তিনি নিঃশব্দে একটু কাঁদলেন। তাঁর চোখের জলে মনস্তাপ ছিলো—কিছুদিন সবুর ক'রে আমার সঙ্গেই তাঁরা গৌরীর বিয়ে দেননি ব'লে, আর ছিলো অতি সূক্ষ্ম, প্রায় নিজের

কাছেও অব্যক্ত এই অসম্ভব ইচ্ছা যদি এখনো, কোনোরকমে, সেটা ঘটে যায়। এখন সবই জলের মতো বুঝতে পারি, কিন্তু তখন কিছু বুঝিনি। বুঝিনি, ভদ্রমহিলার কথা তেমন মন দিয়ে শুনিনি ব'লে, বিয়ে করার কল্পনাও তখন আমার ছিলো না ব'লে আর—এই কারণটাই সবচেয়ে বড়ো—গৌরীকে দেখে আমার দেহে-মনে কোনো সাড়া জাগেনি ব'লে। তার মা তাকে চুল কেটে ফেলতে দেননি, কিন্তু মোটা শাদা থানটাতেই তার সকল নারীত্ব যেন চাপা প'ড়ে গিয়েছিলো আমার চোখে। ভীষণ বোকা ছিলাম, আর অবশ্য ছেলেমানুষও ছিলাম। মিথ্যে আমরা যৌবনের স্তব করি—পৃথিবীতে অনেকগুলো বছর না-কাটানো পর্যন্ত কেউ বোঝে না কাকে বলে রূপ, কাকে বলে প্রেম, কাকে বলে বাসনা।

গৌরী আমার সঙ্গে দাওয়ায় এলো। আমার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, 'কেমন আছো?'

'ভালো।' এটুকু ব'লেই থেমে গেলাম। 'আর তুমি?' এই কথাটা বেধে গেলো মুখে। তার জন্য করুণা হ'লো আমার, আর যাকে আমরা কামনা বলি, করুণার মতো শত্রু আর নেই তার। দু-একটা তুচ্ছ কথার বিনিময় ক'রে, তার প্রতি আমার উৎসাহের অভাবে লজ্জিত হ'য়ে ফিরে এলুম। তার সঙ্গে আবার দেখা করার মতো উদ্যম জোগালো না। একটু ব্যস্তও ছিলুম, সেই জ্যৈষ্ঠেই আমার দুই বোনের একই লগ্নে বিয়ে হ'য়ে গেলো। আমাব পরের ভাই ঝুলনপুরেব জমিদার-শেরেস্তায় চাকরি নিয়ে চ'লে গেলো, আমিও ছুটি ফুরোবার আগেই কলকাতায় ফিরলুম। বাবাকে বললুম, পরীক্ষার·পড়ার জন্য পুজোর ছুটি আর বড়োদিনের ছুটি দুটোই কলকাতায় কাটাতে চাই। বাবা আপত্তি করলেন না। বরং, পুজোর মাসে বরাদ্দের বেশি টাকা পাঠালেন, নতুন কাপড় আর শীতেব আলোয়ান কিনে নেবার জন্য। আমি তা দিয়ে পুরীর সমুদ্র দেখে এলাম।

বাবা আমাকে কচিৎ যা চিঠি লেখেন সবই পোস্টকার্ডে, কিন্তু ক্রিসমাসের ছুটির আগে একটা খামের চিঠি পেলাম তাঁর। সে-চিঠির সারাংশ এই যে সম্প্রতি তিনি পুনবায় বিবাহ কবেছেন, এবং আমার 'মাতৃদেবী' আমাকে একবার দেখতে চান। অতএব আমি যেন আসন্ন ছুটিতে বাড়ি যাই।

এই খবরটি আমার মনে জোরালো কোনো আঁচড় কাটলো না। বিষাদ, খেদ, উত্তেজনা— কিছুই অনুভব করলুম না আমি, বরং চিঠিটা সরিয়ে রেখে কয়েকটা ক্যালকুলসের অঙ্ক ক'যে ফেললুম। শুধু একটু অবাক লাগলো এ-কথা ভেবে যে আমার বাবার স্ত্রী আমাকে দেখতে চাইবেন কেন। আর-একটা প্রশ্ন হ'লো : বাবার এই আদেশ পালন করবো কিনা।

শেষ মুহূর্তে চ'লেই গেলাম। না-যাওয়া অসম্ভব ছিলো তা নয়, কিন্তু আমার বুদ্ধির চেয়েও গভীর কিছু, আমার রক্তের কোনো অজানা চাঞ্চল্য—তা-ই আমাকে টেনে নিয়ে গেলো। এই রকমই হয়েছে আমার বার-বার, যখনই কোনো বোঝাপড়ার সময় এসেছে আমি সেটাকে ফেলে রাখিনি, অচেতনভাবেই এগিয়ে গিয়েছি তার দিকে ; যা হ'তেই হবে সেটাকে ঘটিয়ে দিতে দেরি করিনি।

বাড়ি এসে দেখি নতুন মানুষটি আর-কেউ নয় · গৌরী। ঘরে যাবাব আগেই, উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখা হ'য়ে গেলো। বাবা বললেন, 'তোমার মা। প্রণাম করো।'

আমি শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'প্রণাম করো!'

আমি এক চুল নড়লাম না।

'বীরেশ্বর!'

অন্য এক দিনের প্রতিধ্বনি ভেসে এলো। আমি চুপ।

বাবা কাছে এসে আমার চোখে চোখ রাখলেন। আমি সমানে-সমানে তাকিয়ে রইলাম তাঁর চোখে। প্রায় তাঁরই সমান লম্বা আমি তখন, চওড়া কাঁধ, ভাঙার পর থেকে বাঁ হাতটা কিছু দুর্বল হ'য়ে গেলেও ডান হাতটা নির্ভয়। কয়েক সেকেণ্ড চোখে-চোখে কাটলো।

বাবা স'রে গিয়ে বললেন, 'এঁকে যদি মা ব'লে মানতে না পারো তাহ'লে আর এ-বাড়িতে

জায়গা হবে না তোমার। আমি এখন নবিগঞ্জে যাচ্ছি, ফিরে এসে তোমাকে যেন দেখতে না পাই।' খানিক দূরে গিয়ে ফিরে এসে বললেন, 'এই নাও তোমার ভাড়ার টাকা।' ফতুয়ার পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিলেন, শূন্যে ঘুরপাক খেয়ে সেটা আমার পায়ের কাছে এসে পড়লো। সেটা কুড়িয়ে নিলে গৌরী। তারপর শান্তভাবে, বললে, 'এসো। ঘরে এসো।' ঢাকাই শাড়ি তার পরনে, গলায় হার, চকচকে চুলের সিঁথিতে জবার মতো গাঢ় সিঁদুর। এই প্রথম আমি তার বিবাহিত চেহারা দেখলাম। দেখে আমার বুকের মধ্যে জ্বালা ক'রে উঠলো।

আমাকে স্তব্ধ দেখে আমার হাত ধ'রে বললে, 'চলো।'

কিসের জ্বালা? ঈর্ষার, ঈর্ষার। ঈর্ষা আমার বাবাকে, আমার মরা মায়ের পক্ষ নিয়ে ঈর্ষা। কখনো, কখনো তার আগে আমি বুঝিনি আমার মা-কে আমি কত ভালোবাসতাম। তাঁর প্রথম সন্তান আমি, সেই বাল্যবিবাহের যুগে তাঁর সঙ্গে আমার বয়সের খুব বেশি তফাৎ ছিলো না ; তাঁর তরুণ চেহারা, প্রায় কিশোরী চেহারা স্পষ্ট মনে পড়ে আমার, মনে পড়ে তাঁর গায়ের গন্ধ, স্নানের পরে পিঠ-ভরা চুল, আমি প্রথম-প্রথম পাঠশালায় যাবার আগে আমার কড়ে আঙুলে তাঁর ছোট্ট মিষ্টি কামড়ের রোমাঞ্চ। এই উঠোনে দাঁড়িয়েই, এই সেদিন, তাঁর মৃত্যুর খবর শুনেছিলাম। আর হঠাৎ আমার সেই ঈর্ষার আবেগ পরিণত হ'লো ভালোবাসায়, মা-র জন্যে যত ভালোবাসা গোপন হ'য়ে ছিলো আমার, সব যেন উদ্বেল হ'য়ে ছুটলো—গৌরীর দিকে। আমার ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী আর রইলো না সে : বাবার মুখে ঐ 'মা' শব্দটা শোনামাত্র যেমন আমার মা-কে আমার মনে প'ড়ে গেলো, তেমনি—সেই একই ঝোঁকে—আমার চোখে অপরিসীম রূপে কাম্য হ'য়ে উঠলো গৌরী। মনে হ'লো চ'লে যাই—এই মুহূর্তে এ-দেশ ছেড়ে চিরকালের মতো চ'লে যাই।

কিন্তু বাবার আচরণের এই অর্থ আমি কখনোই করবো না যে আমাকে তাড়াবার জন্য তিনি এই কৌশল করেছিলেন। কেননা—তিনিও জানতেন আর আমিও জানতাম—আমাকে 'তাড়াবার' কোনো কথাই ওঠে না আর, আমি নিজেই তাঁর ডাল থেকে খ'সে পড়েছি—পাখি ডানা পেয়েছে, আকাশ পেয়েছে। তাছাড়া, তাঁর এই বহুকালের পরিকল্পনা পরিপূরণের জন্য দৈব যখন দু-দুটো মৃত্যু ঘটিয়ে দিলে, তখন যে-রকম সক্ষম আর নির্মলভাবে বাকি ব্যবস্থাটুকু তিনি ক'রে উঠলেন—দুই মেয়ের বিয়ে দিতে-দিতেই এক ছেলের চাকরি জুটিয়ে দিলেন—তা থেকেই বোঝা যায় আমাকে 'তাড়াতে' হ'লে মুখের উপরেই বলতেন সে-কথা, সোজা তীরের মতো বলতেন, 'আর তোমাকে টানতে পারবো না আমি। এবার নিজের পথ দ্যাখো।' বাবার সাহস, দম্ভ, আত্মবিশ্বাস যে কতখানি—আমি এতদিন ধ'রে যা জেনেছি তার চেয়েও যে অনেক বেশি—সেই রাত্রির ঘটনা থেকেই তা বুঝেছিলাম। ঠিক সেদিন নবিগঞ্জে না-গেলেই কি চলতো না তাঁর? রাত্রে কি ফিরতে পারতেন না ইচ্ছে করলে? ঠিক তখনই চ'লে গেলেন—সে কি সচেতনভাবে আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য, না কি আমাকে প্রতিযোগিতার যোগ্য ব'লেই ভাবেননি তিনি? এই কথাটার ঠিক উত্তর আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি। আমাকে অপমান করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন? আমি কত বোকা, কত অপদার্থ, তা-ই আমাকে বুঝিয়ে দেবার জন্য? না কি তাঁর নিজের মনেই ছোট্ট অপরাধবোধ ছিলো, তারই প্রক্ষালনের জন্য সেই রাতটা বাইরে কাটাতে হ'লো তাঁকে? অন্তত, তাঁর মতো বুদ্ধিমান মানুষ তাঁর নিজের নববধূর মন তো বুঝেছিলেন।

বুঝেছিলেন বইকি। বুঝেছিলেন ব'লেই ডেকে পাঠালেন আমাকে, বুঝেছিলেন ব'লেই তক্ষুনি তাঁর নবিগঞ্জে যাবার দরকার হ'লো। তা না-হ'লে যে আমার উপর তাঁর শ্রেষ্ঠতার শেষ ঘোষণা হ'তো না। যা ছিলো আমার মনে অচেতন, তিনি সজ্ঞানে চাইলেন সেই বোঝাপড়া—শুধু চাইলেন না, বলপ্রয়োগ করলেন তার জন্য, এবার শুধু পেশীর বল নয়, স্নায়ুর শক্তি, মনের শক্তি। নিজেরই দর্পের নিশেন ওড়াবার জন্য স'রে যেতে হ'লো তাঁকে—আমাকে আগুনের মুখে রেখে যেতে হ'লো। তাঁর নিশেন লুটিয়ে পড়লো—তিনি তা জানলেন না। কিন্তু তার মানে কি এই নয় যে আমিই প্রচণ্ডভাবে হেরে গেলাম তাঁর কাছে?

এই কথাটা ভাবতে এখনো খারাপ লাগে। ভাবতে খারাপ লাগে সে-রাতে গৌরী আর আমি যে-তীব্র মদ ছেঁকে তুলেছিলাম তার মধ্যে একটুখানি প্রতিশোধের গাদ ছিলো।

আমার এখন যে-বয়স, বাবার তখন ঠিক তা-ই। কিন্তু কোনো তুলনা হয় না তাঁর সঙ্গে আমার। তিনি ছিলেন ঋজু আর দৃঢ় আর বলিষ্ঠ, মাটিতে পা রেখে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়াতেন, ছোরার মতো চোখ, গোঁফদাড়ির ফাঁকে তীক্ষ্ণ, শাদা দাঁত। খেত কুপিয়ে, ধান কেটে, গঞ্জে-গঞ্জে আম ধান সর্ষে তিলের বেচাকেনা ক'রে, রোদ বৃষ্টি বাতাসের ঝাপট লেগে-লেগে, আঙুলের ডগাটুকু পর্যন্ত ক্ষমতায় ভরপুর ছিলো তাঁর শরীর। আমারও স্বাস্থ্য ছিলো, কিন্তু আরো বেশি ছিলো অস্বাস্থ্যের দিকে আকর্ষণ। হ্যাঁ—অস্বাস্থ্য বইকি, কয়েক পাতা কাগজ লিখে যার প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা মিটে যায়, কাম চরিতার্থ হয়, সে রুগ্ন নয় তো রুগ্ন কে? মদে, অত্যাচারে, রাত্রি-জাগরণে, আর এই নিশ্চল, উপবিষ্ট, আত্মভুক বই-লেখার পেশায়—সেই স্বাস্থ্য মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে চুরমার ক'রে ভেঙে দিয়েছি আমি। পিঠ কুঁজো হ'য়ে গেছে, রাত্রে ঘুমোতে পারি না, কোথাও একটা আওয়াজ হ'লে চমকে কেঁপে উঠি। শেষ পর্যন্ত এই 'আরোগ্য-নিকেতনে'! কিন্তু এ যে হ'তেই হবে, নিজেকে যে-কোনো উপায়ে ধ্বংস করতে হ'তোই আমাকে—যদি আমি ধ্বংস না-হতুম তবে আমি কিছুই হতুম না।

এই কথাটাই বোঝে না লোকেরা। বোঝে না, ছায়া বাদ দিয়ে আলো-কে পাওয়া যায় না, পদ্মকে ভালোবাসলে পাঁকটাকে মেনে নেয়া চাই। বোঝে না, য়োরোপের হিংস্রতা বাদ দিলে য়োরোপের সভ্যতাও ম'রে যাবে। মিতালি! প্রগতি! বিশ্ব-শান্তি! হো-হো ক'রে হেসে উঠতে হয় এ-সব শুনে। বাঘটা গোরু হ'য়ে যাবে, আর গোরুগুলো সিন্‌থ্রি ল্যাবরেটরিতে তৈরি বৈজ্ঞানিক ঘাস খেয়ে-খেয়ে জোয়ান হ'য়ে উঠবে?—বিরোধ! বিরোধ! বিরোধের উপর এই সৃষ্টি টিকে আছে—বিষ্ণু আর শিবের বিরোধ, সতী আর বেশ্যার বিরোধ, এমনকি এই একই দেহের মধ্যে প্রাণ আর মনের বিরোধ। বিরোধ বাদ দিলে চলে না, কোনোটাই বাদ দিলে চলে না। যাবা বলে, বীরেশ্বর গুপ্ত 'ভালোভাবে' জীবন কাটালে কত ভালোই না হ'তো, তাদের আমি এই কথা বলতে চাই : বীরেশ্বর গুপ্ত এমনি ক'রেই হয়েছে, শুধু এমনি ক'রেই হ'তে পারতো, ঠিক এই রকম ক'রে না-হ'লে—আবার বলি—বীরেশ্বর চাটুয্যে নামক একজন ভদ্রলোক সম্ভব হ'তে পারতো, কিন্তু বীরেশ্বর গুপ্ত কখনোই নয়।

এই সব পুরোনো কথা আমার এত মনে আছে তা আমি নিজেই জানতুম না। এখানে আসার পর—বোধহয় আর-কিছু ভাবার নেই ব'লে—আস্তে-আস্তে সব মনে পড়ছে। হয়তো ঐ পুকুরটাও এর জন্যে দায়ী। এই হাসপাতালের সবচেয়ে ভালো জিনিশ ওটা ; এই পুরোনো পুকুর—ডোবা বললেও ভুল হয় না—যেটা সারাদিন আমারই মতো বেকার হ'য়ে প'ড়ে থাকে—ঠিক হাসপাতালেরও নয়, কিন্তু কাছেই—আমার জানলা দিয়ে দিনের বেলা চোখে পড়ে। সকালে বিকেলে তার রঙের বদল লক্ষ করি, লক্ষ করি হাওয়ায় তার শিরশিরানি। কলকাতার লেকটাকে আমি বরাবর ঘেন্না করেছি—মরা জল, কোনো কথা বলে না। কিন্তু এই পুকুরটার কথা আলাদা। ভাঙা ঘাটের ধাপ দেখা যায়, একটা শীর্ণ গাছ এখনো একটু ছায়া দেয় সেখানে, জলের মধ্যে কচুরিপানা সাপের মতো ফণা তোলে। এখন আর কেউ নাইতে নামে না—কিন্তু এককালে অনেক বৌ কোন না ডুবে মরেছে।

আজ রাত্রিটা খুব অন্ধকার হয়েছে ; এই অন্ধকার আর জোনাকির ভিড় দেখে মনে করা শক্ত যে কলকাতা থেকে, আমার এখনকার 'জীবন' থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে আছি। যে-কোনো জায়গাই হ'তে পারতো, আমার বাবার সেই টিনের ঘরও হবার বাধা ছিলো না। সে-রাতটাও এই রকমই অন্ধকার ছিলো। আর ছিলো শীত। ব'সে-ব'সে গৌরীর মুখে তার দ্বিতীয় বিয়ের গল্প শুনছি। তার বাবা, শীতল ভটচায, প্রস্তাবে শুনে প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। হিন্দু বিধবার বিয়ে! চাটুয্যে মশাইর মাথা-খারাপ হ'লো নাকি? কিন্তু বাবা বললেন, 'আপনারা কেউ বিদ্যাসাগরের চাইতে বড়ো

পণ্ডিত নন। আপনার মেয়ে আজ কুমারী থাকলে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতেন কিনা তা-ই বলুন!' উত্তরে পুরুৎঠাকুরকে মানতেই হ'লো যে তাঁর মেয়ের জন্য অত বড়ো ভাগ্য তাঁর স্বপ্নের অতীত, কিন্তু বিধবা মেয়ের বিয়ে দিলে কি আর ভিটেমাটি টিকবে? 'কিছু ভাববেন না। আমি আছি।' তাঁর চেহারা দেখে বামুনঠাকুর আর তর্ক করতে পারলেন না, কাঁপতে-কাঁপতে ঘরে এলেন। খবর শুনে গৌরীর মা বললেন, 'হরি, হরি!' তারপর গৌরীকে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে ফেললেন। একই সঙ্গে সুখের আর দুঃখের সেই কান্না।

সাবা গ্রাম খেপে গেলো, জমিদার-মশাই ঘরে ব'সে হুংকার ছাড়লেন, কিন্তু কার এত সাহস যে মহেশ্বর চাটুয্যের মুখের উপর কোনো কথা বলবে। তাঁর সঙ্গে বামুন-কায়েৎ কেউ কথা বলে না, তাঁকে এড়িয়ে চলে, দূরে দেখলে সম্ভাষণ করার ভয়ে অন্য পথ নেয়। কী-বা তাঁর এসে যায় তাতে—তাঁর জীবন একই ভাবে চলছে, মণ্ডল আর ভুঁইমালিদের সঙ্গে খেতে কাজ ক'রে, হাটে-বাটে মহাজনেব গদিতে ঘুরে-ঘুরে। অনেক রকম ভয়ের কথা তাঁর কানে এলো—ডালকুত্তা লেলিয়ে দেবে, লেঠেল দিয়ে মাথা ফাটাবে—তিনি নির্বিকার। শেষ পর্যন্ত মুশকিল হ'লো বিধবার বিয়েতে মন্ত্র পড়তে কোনো পুরুৎ রাজি হয় না। দশ গ্রাম দূর থেকে এক বামুনকে যমের ভয় দেখিয়ে প্রায় চ্যাংদোলা করে ধ'রে নিয়ে এলেন মহেশ্বর চাটুয্যে। বিয়ের সময় কনেরাই সাধারণত কাঁপে, কিন্তু সে-বিয়েতে বর-কনে দু-জনেই স্থির ছিলো—কিছু কেঁপেছিলেন মেয়ের বাপ, আর পুরুৎঠাকুরটি বলির পাঁঠার মতো। 'সেই বামুন বেচারার কী দশা হয়েছে জানি না, কিন্তু বাবার সব বাঁধা ঘর থেকেও আজকাল আর ডাকে না তাঁকে, আব তোমার বাবাও হাতে একটা লাঠি নিয়ে বেরোচ্ছেন।'

সব শুনে আমি বললাম, 'কিন্তু তোমার কী মনে হ'লো?'

'বিয়ের কথায়? আমার আবার কী মনে হবে।'

'ভালো-মন্দ কিছুই মনে হ'লো না?'

'ভালোই মনে হ'লো। বিধবার জীবন তো সুখের নয়, সত্যি।'

'শুধু এই?'

'আর তোমার বাবার বৌ হবার সম্মান!'

'শুধু সম্মান?'

'না। কত বড়ো সুখ! তোমাকে দেখবো। তোমাকে কাছে পাবো।'

এ-কথা শুনে আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। বাবার ঘরের দাওয়ায় ব'সে ছিলাম আমরা, তার অর্ধেকটায় বাঁশের বেড়া দিয়ে একটা তক্তা পাতা, অর্ধেকটা খোলা। সেই তক্তায় একটা কম্বল পেতে নিয়েছে গৌরী। ঘরের চৌকাঠের কাছে খুব কমানো একটা লণ্ঠন জ্বলছে, বাইরে থমথমে অন্ধকার। নিশুতি রাত—অন্তত মনে হচ্ছে তা-ই, গ্রামে তো সন্ধের পরে রাত্রি আর নড়ে না। আমার ছোটো ভাই খাওয়ার পরে অন্য ঘরটায় শুতে চ'লে গেছে, তার পাশের কামরায়—সেই যেখানে আগে থাকতুম—আমারও বিছানা তৈরি। —কিন্তু গৌরীর সঙ্গে বহুকাল পর দেখা হ'লো।

অন্ধকারে তার মুখ ভালো দেখতে পেলাম না, কিন্তু লণ্ঠনের অতি ক্ষীণ আলোয় তার চোখ হঠাৎ জ্ব'লে উঠলো—যেমন পশুর চোখে সবুজ আভা ঝলক দেয়।

বললে, 'তোমার শীত করছে।'

'না।'

'তোমার গায়ের আলোয়ান ছেঁড়া কেন?'

'ছিঁড়ে যায় ব'লে।'

'নতুন নেই?'

'আছে।'

'কোথায়?'

'কলকাতায়।'

'সত্যি কথা বলো!'

'না, নেই।'

'বাবা কিনে দেননি?'

'টাকা পাঠিয়েছিলেন, আমি খরচ ক'রে ফেলেছি। আমার শীত লাগে না।'

'দেখি তোমার হাত।'

আমি হাত বাড়িয়ে দিলুম।

'ঠাণ্ডা হাত তোমার। চলো ঘরে যাই। আমারও শীত করছে।'

ঘরে এসে দোরের শিকল তুলে দিলে। 'বোসো। পা তুলে বোসো। এই নাও।' আমার হাঁটুর উপর লেপ ছড়িয়ে, নিজেও তার তলায় পা ঢুকিয়ে, মুখোমুখি বসলো। 'বলো এবার। তোমার খবর বলো, শুনি।'

আমি কথা বললাম না। তার আহ্বান অনেক আগেই বুঝেছি আমি ; জেনেছি, এরই মধ্যে তার দাঁত ব'সে গেছে আমার ঘাড়ে। আমার প্রতিটি রক্তকণিকা জেগে উঠেছে তখন, কিন্তু আমার মন পাগলের মতো কাজ ক'রে যাচ্ছে। কী করি আমি এখন? যদি তা-ই হয়, তা-ই হ'য়ে যায়, তাহ'লে তো বাঁধা প'ড়ে যাবো আমি ; অবিরল, অবিরল কামনা করবো ওকে ; অথচ আজকের এই রাত্রের পর ওকে আর চোখে দেখবো কিনা তাও জানি না। কিন্তু সেটাই কি সবচেয়ে বড়ো কারণ নয় যার জন্য আমার এখন অন্য পথ নেই আর? আর কখনো হবে না ব'লেই তো আজকের মুহূর্তটা এত মূল্যবান, এত ঐশ্বর্যময়, এমন অসীম সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। কিসের সম্ভাবনা? দেহের তৃষ্ণা, হৃদয়ের জ্বালা, মরুভূমির নিশ্বাস। একজনের অভাবে পৃথিবী শূন্য হ'য়ে যাবার ভয়। এখনই, এখনই আমি অনুভব করতে পারছি কাল আমার চ'লে যাওয়ার কষ্ট, ওকে ছেড়ে চ'লে যাওয়ার যন্ত্রণা।—কিন্তু কষ্টকে এত ভয় তোমার? স্বর্গ হাতে পেয়ে হারাবার ভয়ে নেবে না এত কাপুরুষ তুমি? নেবে, হারাবে, দুলবে, স্পন্দিত হবে—এ-ই নিয়েই তো জীবন।

তার কথা কানে এলো। —'মাঝে অনেকদিন বাড়ি আসোনি?'

'তোমার বিয়ের খবর পেলে আসতাম বইকি।'

'ঠাট্টা করো কেন। তুমি তো আর বিয়ে করলে না আমাকে। তোমাকে দোষ দিই না তার জন্য। অমন কত হয় ছেলেবেলায়— কে-ই বা মনে রাখে।'

'তুমি রেখেছিলে?'

অন্য কী-একটা বলতে গিয়ে গৌরী কথাটা বদলে নিলে।

'সে-কথাই বলছি। আমার অবশ্য হাত ছিলো না তখন। মা বিয়ে দিলেন, হ'য়ে গেলো।'

'আর এবার?'

'সে তো আগেই বলেছি।'

' "না" বললে না কেন?'

' "না" কেন বলবো। সবই তো অনিশ্চিত—আজকের এই সময়টুকু ছাড়া। তুমি কি সত্যি কালই চ'লে যাবে?'

'কালই যাবো।'

'থাকো না।'

'থাকলেই কি আর তুমি আসতে পারবে আমার কাছে?'

গৌরী নিচু গলায় হেসে উঠলো। 'এখনো বাবাকে তোমার এত ভয়?'

'ভয় তো এখন তোমারই বেশি, গৌরী। ধরো এখন, এই মুহূর্তে তিনি যদি এসে পড়েন?'

তার কাঁধ দুটো ন'ড়ে উঠলো একবার, বিছানার উপর দিয়ে পিছলে স'রে এলো আমার পাশে। 'বলো কী? অমন দৈত্যের মতো মানুষটাকে ভয় করবো না! এই তো—' আমার জামার তলায় পিঠের উপর হাত চালিয়ে দিলে, খুঁজে-খুঁজে একটা জায়গায় আস্তে আঙুল ছোঁয়ালো। 'এই এখানে।

চামড়াটা এখনো কুঁচকে আছে দেখছি। তিনি ভুলতে পারেন, তুমিও ভুলে যেতে পারো। কিন্তু আমি তো ভুলিনি!' —বলতে-বলতে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে আমার মাথাটাকে নামিয়ে আনলে তার কোলের উপর—'ঠিক! এ-ই ঠিক আছে। আসুন তিনি এবার—এই মুহূর্তে আসুন না তিনি চাবুক হাতে নিয়ে—আর কি তিনি ছুঁতে পারবেন তোমাকে? না, না। আমি এমনি ক'রে তোমাকে ঢেকে রাখবো—এমনি ক'রে! —এমনি ক'রে! হ্যাঁ, আমার শরীর দিয়ে ঢেকে রাখবো তোমাকে আমি—তারপর তিনি আমাকে টুকরো ক'বে কেটে ফেলতে পারেন, কিন্তু তার আগেই তাঁর লজ্জা আমি ছড়িয়ে দিয়েছি চারদিকে, চূর্ণ করেছি তাঁর দম্ভ, অপমানে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না মহেশ্বর চাটুয্যে। যে-মানুষ চারদিকে হুমকি দিয়ে বেড়ায়—আচার, ধর্ম, জমিদার, বামুন কিছুই গ্রাহ্য কবে না, সেই মানুষ—সকলে তাকিয়ে দেখবে—তার নিজেরই বৌয়ের কাছে হাবড়া বেতো বুড়োর মতো ঠ'কে যায়! এইজন্যেই—এইজন্যেই এতদিন পর ভগবান আজ এমনি ক'রে তোমাকে এনে দিয়েছেন আমার কাছে।'

কথা শেষ ক'রে গৌরী হাঁপাতে লাগলো।

এই আলাপের ঠিক-ঠিক কথাগুলো আমাব অবশ্য মনে নেই : যা বলা হয়েছিলো তার ভাবটা আমার নিজের ভাষায় প্রকাশ করলাম। উপন্যাস লেখার অভ্যাসবশত এতে কিছু রং চড়িয়েছি কিনা জানি না—কিন্তু জীবনের তুলনায় কতটুকুই বা কাজ করতে পারে উপন্যাস, জীবনের এক মুহূর্তের স্পন্দনের কাছে সারা বিশ্বের সাহিত্যের মূল্য কতটুকু!

—স্পন্দন! ঐ একটা জিনিশকে সত্য ব'লে জেনেছি আমি, যৌবনের প্রথম মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত আমি চেয়েছি—আর-কিছু না—স্পন্দিত হ'তে, স্পন্দিত হ'তে। ভালো, মন্দ, ন্যায়, অন্যায়, অর্থ, খ্যাতি, সুখ, দুঃখ, কিছুই কিছু না—একমাত্র যাতে এসে যায় জীবনে, তা—হৃদয়ে স্পন্দন, স্নায়ুব কম্পন, বক্তেব চঞ্চলতা। ও-রকম মুহূর্ত ক-টা আসে জীবনে? আর পাবার শক্তিই বা থাকে ক-জনেব? জীবনে ক-বাব কোনো নতুন আমেরিকার মাটি পেয়ে হাঁটু ভেঙে ভগবানের বন্দনা কবি আমবা? বিরল, বিবল সে-সব মুহূর্ত, নিজেকে যখন আকাশের সমান ব'লে মনে হয়, সমুদ্রের অশান্তি ব'লে মনে হয়—কিন্তু ঐ সব মুহূর্তগুলোতেই সত্যিকার বাঁচি আমরা ; অন্য সময়ে, বছরের পব বছর ভ'বে—শুধু নিশ্বাস নিই। যে-কোনো উপায়ে হোক —গান শুনে, বই লিখে, নেশা ক'রে, কিংবা কোনো পাথবের বা বক্তমাংসের রূপের সামনে দাঁড়িয়ে—সুখে হোক, দুঃখে হোক, অপেক্ষায় হোক, প্রার্থনায় হোক—স্পন্দন মানেই জীবন। হে সংসারের মানুষ—তোমরা যারা আপিশ করো, কর্তব্য করো, ববিবার দুপুরে ঘুমিয়ে বিকেলে খুঁজে-খুঁজে কোনো ভায়রা-ভাই বা মাসতুতো বোনের বাড়িতে দেখা করতে যাও, আব রোজ বাত্রে একমাত্র স্ত্রীকে জড়িয়ে শুযে থাকো —তোমরাও কি জীবিত ব'লে জানো নিজেদেব, তোমরা যারা পুরোনো পচা কাঠের মধ্যে মবচে-পড়া পেরেকেব চেয়েও মৃত?

কিন্তু মানুষের মধ্যে আর-একটা বৃত্তি আছে—সেটাই শয়তানের দান—তার বুদ্ধি, তার চিন্তার প্রেরণা। আর তাই, গৌরীর দুই জোরালো বাহুর মধ্যে বাঁধা প'ড়ে, তার চুমোয়-চুমোয অন্ধকারে ডুবে গিয়ে, কোমর থেকে গলা পর্যন্ত যখন ফেটে যাচ্ছে আমার, তখনও আমার মাথার মধ্যে অনেক কথার তোলপাড় থামলো না। হঠাৎ আমি বললাম, 'গৌরী, আমাকে ছেড়ে দাও।'

উত্তরে সে আরো নিবিড় ক'রে চেপে ধরলো আমাকে।

আবার বললাম, 'না, গৌরী। তাহ'লে পরে আর তোমাকে ভুলতে না পাবি যদি? কেবল যদি তোমাকেই চাই?'

'পাবে। আমি চ'লে যাবো তোমার সঙ্গে—কোনো দূর দেশে—তোমার সঙ্গে। পারবে না নিয়ে যেতে?'

'তাহ'লে এখনই যেতে হয়—আজ রাত্রেই। আর তো সময় নেই।'

'অনেক রাত আছে এখনো। কথা বোলো না। এসো।'

তবু আমি বললাম, 'নৌকোতে স্টিমার-ঘাটে যেতে চার ঘণ্টা লাগে। খুব ভোরে নারানগঞ্জের স্টিমার আছে। সেখান থেকে মৈমনসিং, মৈমসসিং হ'য়ে কলকাতা।'

'বেশ তো।'

'তোমার টাকা আছে?'

'গয়না আছে।'

'তাহ'লে চলো। ওঠো।' আমি তাকে দুই হাতে ঠেলে দিলাম।

আমাকে আঁকড়ে ধ'রে বললে, 'একটু থাকো—আর-একটু। সব ভুলে যাবে।'

'সেইজন্যেই বলছি। যদি যেতে হয় তো এখনই। পরে পারবো না। ভুলে যাবো। ঘুমিয়ে পড়বো।'

'আমার মনে থাকবে। আমি ডেকে দেবো তোমাকে। অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে পড়বো আমরা।'

'না। এখনই। এখনই চলো।'

আমি অনুভব করলাম গৌরীর দেহ হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। 'আসল কথা, তুমি ভয় পেয়েছো। সেই কথাই ভাবছো এখনো— যদি তিনি এসে পড়েন হঠাৎ!'

আমি এত জোরে উঠে বসলাম যে গৌরী ছিটকে পড়লো। 'কিন্তু তিনি থাকলে তুমিই বা এখন করতে কী?'

'কী করতাম? এ-ই করতাম।' সে আবার হাত বাড়িয়ে দিলে আমার দিকে। আমি তাকে বাধা দিলাম।

'না। করতে না। মুখে বলছো—কিন্তু করতে না।'

'প্রমাণ চাও?'

'প্রমাণ দিতে পারবে না। কাল ভোর হবে—তিনি ফিরে আসবেন —সব বদলে যাবে।'

'তুমি কিচ্ছু বোঝো না!'

'আমি ঠিক বলছি। আমি কোনো সুযোগ নিতে চাই না। ডাকাতি আমার পছন্দ।'

'বেশ তো। কাল তুমি দাঁড়িয়ো তাঁর মুখোমুখি—সব বোলো। আমি ঠিক তোমার পাশে থাকবো।'

'তার আগেই আমি চ'লে যেতে চাই তোমাকে নিয়ে।'

'পালাতে চাও?'

'তোমাকে চাই। এ ছাড়া আর পথ নেই তো এখন।'

'তার মানে—' অন্ধকারেও বুঝলাম তাব মুখ কঠিন হ'য়ে গেলো— 'তাব মানে, তুমি সাবধানেই থাকবে যতক্ষণ না বিপদের বাইরে চ'লে যেতে পারো? এই রকম তুমি? এখন দেখছি ঐ চাবুকটা তোমার পাওনাই ছিলো।'

আমি খাট থেকে লাফিয়ে পড়লাম। সে ছুটে এসে আমার সামনে দাঁড়ালো।

'না। যেয়ো না। তুমি যা বলবে আমি তা-ই করবো। তোমার দাসী হয়ে দেশে-দেশে ঘুরবো তোমার সঙ্গে। কিন্তু আজ না। আজকের রাতটা তুমি আমাকে দাও। নির্ভয়ে, নিশ্চিন্ত হ'য়ে আমার সঙ্গে থাকো তুমি। আর-কিছু ভেবো না! থাকো।' তার গলার আওয়াজ ভিজে উঠলো, আমার মুখের উপর হাত চাপা দিলে যাতে আর কথা বলতে না পারি। আমি অবশ হ'য়ে বিছানার উপর ভেঙে পড়লাম।

পরের দিন আমাকে বিদায় দিতে গৌরী কেঁদেছিলো। আর আমি বলেছিলাম, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, বি.এ.পাশ ক'রে কিছু-একটা কাজকর্ম জুটিয়েই তাকে নিয়ে পালিয়ে যাবো। কিন্তু পরীক্ষার ঠিক এক মাসে আগে কিছু নতুন খবর দেশ থেকে পৌঁছলো। বিধবা বিয়ে করে গ্রামের মধ্যে বসবাস করা আর সহ্য হচ্ছিলো না লোকেদের, আমার বাবার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলো তারা। কোনো মানুষের কোনো জখম হয়নি ; কিন্তু বাবা জমিজমা সব বেচে দিয়ে সপরিবারে আসাম চ'লে গেছেন—পরিবারের মধ্যে শীতল ভটচাযকেও বাদ দেননি। শোনা যায়, ভটাচায-মশাইকে অংশিদার ক'রে তিনি এক ব্যবসা খুলেছেন সেখানে। সেই শেষ খবর পেয়েছিলাম বাবার। তারপর, এতকালের

মধ্যে আর-কিছুই শুনিনি তাঁদের বিষয়ে— চোখে দেখা তো দূরের কথা। বাবা বেঁচে আছেন কিনা তাও জানি না, ভাই-বোনেরা কে কোথায় আছে তাও না।

আমি পরীক্ষা দিলাম না ; একটা খবর-কাগজের আপিশে ষাট টাকা মাইনেতে চাকরি নিলাম। মাস ছয়েক পরে দুম ক'রে বিয়ে ক'রে ফেললাম একদিন।

পাঁচ

কোনো কাজ ক'রে আমি অনুশোচনা করিনি কখনো! কেন করবো? যা করেছি সজ্ঞানে করেছি, আমার ইচ্ছে না-হ'লে জোর ক'বে কেউ করাতে পারতো না। আর আমাদের ইচ্ছের উপর যখন আর কর্তা নেই, তখন আর খেদ কিসের। কিন্তু সম্প্রতি একটা কথা মনে হচ্ছে আমার, ঠিক মনে হচ্ছে তাও না—যেন পেরেক ঠুকে ঢুকিয়ে দিচ্ছে ভিতরে : বিয়ে করা কখনোই উচিত ছিলো না। সংসার করতে পারি না আমি, চাই না আমি ; আমি জানি, তা যে চাই না আর পাবি না : তবু ঐ অন্য কতগুলো মানুষের ভার নেয়া! যদি আমি আজ একা মানুষ থাকতুম, তাহ'লে আমি নিজেকে নিয়ে যা কিছু কবেছি আর করবো, তার জন্যে কারো কাছে কোনো জবাবদিহি ছিলো না। ডঙ্কা বাজিয়ে চ'লে যেতুম। কিন্তু—আমার স্ত্রী নামে পরিচিত ঐ মানুষটি, আমার (আমারই) তিনটি (না চারটি?) ছেলেমেয়ে—কী হবে তাদের, কী খাবে তারা, কী করবে? ভিখিরি হবে, চুরি শিখবে, খেতে না-পেয়ে কি যক্ষ্মা হ'য়ে ধুঁকে-ধুঁকে মরবে, আর মরবার মুহূর্তে অভিশাপ দেবে আমাকে—আমি ম'রে গেছি ব'লেও ক্ষমা করবে না। —কেনই বা করবে। এ-ই আমার প্রাপ্য। অথচ, তাদের জন্য এতটুকু ভালোবাসা অনুভব করি না, যাতে তাদের কথা ভেবে বাঁচতে ইচ্ছে করে। আমিই বা করি কী।

এই একটা বোকামি করেছি জীবনে; এই একটা অন্যায় করেছি।

আমার মা-ব এক জ্যাঠতুতো বোন কলকাতায় থাকতেন (এখনো থাকেন—বাড়ি করেছেন গর্চা ফার্স্ট লেনে) : তাঁর ভাসুরঝির সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার জন্য চেষ্টা করছিলেন তিনি। বোধহয় এই উদ্দেশ্য নিয়েই (সাধু উদ্দেশ্য, দোষ দিচ্ছি না) মাঝে-মাঝে আমাকে নিমন্ত্রণ করতেন। এই নিমন্ত্রণ আমি বক্ষা কবতুম দুটো কাবণে : আমার মাসিমার চেহারায় বা চরিত্রে এমন কিছু ছিলো না যাতে মা-র কথা মনে পড়ে, আর দ্বিতীয় কারণ—সুধা। যে রূপসী ছিলো না, গুণবতী ছিলো না, ছিলো ফর্শা আর পুষ্ট আব আহ্লাদি আর শান্ত গোছের। আমার সঙ্গে মুখোমুখি তার কথা হ'তো না, কিন্তু সে আমাকে জল এনে দিতো, চা এনে দিতো, আর নিচু হ'য়ে যখন পরিবেশন করতো আমি তার বুকের ভিতরটা দেখতে পেতুম।

—কিন্তু বিয়ে কবেছিলুম কেন? শুধু কি এই কারণে যে শরীরটাকে ঠাণ্ডা কবার জন্য বাইরে আর ঘুরতে হবে না, বাড়ি এলেই পাওয়া যাবে? হায়, তা যদি বলতে পারতুম তবু আমাব ইজ্জৎ থাকতো! কিন্তু তাও না, নিছক জৈব প্রয়োজনের সাফাইটুকু পর্যন্ত নেই আমার। সুধা আমাকে সে-অর্থে চঞ্চল করেনি (তা যারা করেছে, যেমন গৌরী, অর্চনা, তাদের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখ ঝাপসা হ'য়ে গেছে আমার, কিন্তু সুধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমি মনে-মনে বিশ্লেষণ করতে পারতুম)—না, তা নয়—সুধা আমাকে এনে দিযেছিলো এক শান্ত, নরম, ঘরোয়া জীবনের ছবি, যার পিছনে আছে মানুষের বহু যুগের ইতিহাস, আর যেটাকে, কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল জীবন কাটাবার পর, আব গৌরীর অবসানের পর, মুহূর্তের জন্য রমণীয় ব'লেও মনে হয়েছিলো আমার। (সত্যি কি অবসান হয়েছিলো? কী দীর্ঘ আকাশ ভ'রে সেই অস্তরাগ! না কি সেটাকেই চাপা দেবার জন্য এই চেষ্টা?)

কিন্তু সংক্ষেপে বলতে হবে। কোনো-কোনো কথা নিজের কাছেও বলতে পারি না, এই নির্জন কাগজেও লিখতে পারি না।

আমার জীবনের সব দুর্ভাগ্যের একটা কারণ এই যে মানুষের কথার প্রভাব আমার মনের উপর ভয়ানকরকম প্রবল। র—বাবু ('মালঞ্চে'র সম্পাদক—সকলেই নাম জানেন) বহুদিন আগে একবার বলেছিলেন : 'সত্যিকার লেখক তুমি।' সেই কথা মগজ থেকে সরাতে পারিনি (যদিও নিজে আমি ভালোই জানি যে সত্যিই আমি সত্যিকার লেখক নই) ;—তারই ঠেলায় অনেকগুলো (অন্তত বেশ কয়েকটা) বই লিখে ফেলেছি। বাবা যেই বলেন 'তোমার মা'—সেই একটা কথায় আমার সকল রক্ত তোলপাড় ক'রে উঠলো। আর মাসিমা বার-বার বললেন—'ও তোর বৌ হ'লে তুই সুখী হবি—ভারি ভালো মেয়ে'—ঠোটের কোণে ঠাট্টা নিয়েও শুনে-শুনে একদিন বাঙাল ভাষায় 'বৌ' কথাটা ভারি ভালো লেগে গেলো। এমনকি বাংলা গল্পের 'কেরানির নীড়'টাকেও চেষ্টা ক'রে দেখবার অযোগ্য মনে হ'লো না।

—কিন্তু ক-দিন টিকেছিলো? খুব, খুব অল্পদিন? এক বছরের মধ্যেই আমার প্রতিকারহীন ভুল আমি বুঝতে পেরেছিলাম। সুধাকে দোষ দিই না, সত্যিই সে যাকে বলে 'ভালো মেয়ে,' এর চেয়ে সৌভাগ্য নিশ্চয়ই তার প্রাপ্য ছিলো জীবনে। কিন্তু ঐ 'ভালোত্ব'ই আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলো। আমি নিজেকে দেখতে পেলাম এমন একজন মানুষের মুখোমুখি যে কখনো বাধা দেয় না, প্রতিবাদ করে না, কোনো আঘাত করে না মনের উপর। স্বামীর ব্যবহারের জন্য একটি পাত্র ব'লেই নিজেকে ভাবে সে, তার কাছে কোনো আহ্বান নেই, প্রত্যাখ্যান নেই, অবহেলাও নেই। এক কথায়, কোনো চরিত্র নেই মানুষটার—আসল অর্থে মনুষ্যত্বই নেই। রান্না থেকে বাসন মাজা সবই করে—নালিশ নেই—হঠাৎ সচ্ছলতা হ'লেও কোনো শখের কথা বলে না। মাঝে-মাঝে বাংলা সিনেমায় বা আত্মীয়-বাড়ি যাওয়া—তার শখের ধারণা এর উর্ধ্বে ওঠে না। দুটোতেই আমি যখন 'না' বলি, চুপ ক'রে থাকে, শহীদের মতো মুখ ক'রে তাকিয়ে থাকে। 'একা যাও না।' 'না, থাক।' পাশের বাড়িতে রেডিওর শুক্রবারের নাটক শুনতে যাবে, আমি যদি বলি, 'কী বিশ্রী!' তখনই জবাব : 'তাহ'লে না গেলাম।' 'কেন? আমর বিশ্রী লাগে, তাতে তোমার কি?' 'থাক।' আমার এক-এক সময় মনে হয়েছে আমাকে তার কাছে অপরাধী ক'রে তুলেই সে কুটিল একরকম সুখ পায়, কিন্তু বুদ্ধির জন্য অত উঁচু নম্বরও তাকে দিতে পারি না। নেহাৎই সেই ধরনের নিস্তেজ মন, যাতে কিনা, অমুকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে ব'লেই, তার প্রত্যেকটি আচরণ প্রশংসাযোগ্য—অন্তত সমর্থনযোগ্য হ'য়ে ওঠে। আস্তে-আস্তে সেই শহীদের করুণতা (বিশেষত দ্বিতীয় বছরে একটা মৃত সন্তান প্রসব করার পর), তার মুখের উপর শক্ত হ'য়ে এঁটে গেলো, তার দিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পারি আমি কত বড়ো দুর্জন—যদিও তখন পর্যন্ত তার সঙ্গে চলনসই গোছের ভালো ব্যবহারই আমি করেছি। আর এর পর থেকেই আমার চেষ্টা হ'লো তার কাছে নিজেকে অপ্রীতিকর ক'রে তোলা (রাত্রে বাড়ি না-ফিরে নেশা ক'রে ফিরে ইত্যাদি)— যাতে সে আমাকে ঘৃণা করতে শেখে, ঘৃণা ক'রেও রেহাই দেয় আমাকে, অন্তত মুখের ভাবটা বদলায়। সে কেঁদেছে, অনুনয় করেছে, নিশ্বাস ফেলেছে, আমার রাগের ভয়ে (আর পড়শিদের ভয়ে) মুখ বুজে চুপ ক'রে থেকেছে, কিন্তু প্রতিবাদ করেনি। একবার ছাড়া।

(কিন্তু আমার মতো অসুরের বিরুদ্ধে কি করতে পারতো একজন বেচারা, আদরে পালিত, ভদ্রসন্তান বাঙালী মেয়ে? আর আমার এ-সব কথা মানুষের গড়া পদানত সিংহের মূর্তি বই তো নয় : আমিই বলছি, তাই আমারই মনোমতো ক'রে বলছি। আসল কথা, স্বর্গ থেকে দেবী এনে দিলেও আমিও কয়েক দিনেই তার অসংখ্য দোষ আবিষ্কার ক'রে ফেলতুম। আসল কথা, বন্ধনই আমার সহ্য হয় না।)

আমার ছেলেমেয়েদের জন্মাতে দেখেও আমি সুখী হ'তে পারিনি। আমি চাইনি তাদের, প্রক্ষিপ্ত এবং বিজাতীয় বস্তু ছাড়া আর-কিছুই তাদের আমার মনে হয়নি। হয়তো আজকালকার অনেক বাবারই প্রথমে তা-ই মনে হয় ; পরে, সমাজের চাপে, অন্যদের উদাহরণে, আর সবচেয়ে বেশি স্ত্রীর প্ররোচনায়, তারা অবাঞ্ছিতকে বাঞ্ছনীয়ে পরিণত করতে শেখে ('পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'য় অন্তত

এটুকু সুনীতি ছিলো যে মানুষগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আকাঙ্ক্ষিতভাবে জন্মাতো—আজকালকার মতো দৈবাৎ বা অবিবেচনার ফলে ভূমিষ্ঠ হ'তো না।) কিন্তু আমার বেলায় তার একটি প্রভাবও খাটলো না ; যখন তারা একটু বড়ো হ'য়ে উঠে আমার সংকীর্ণ ঘর কোলাহলে আর নোংরামিতে ভ'রে তুললে, আমি এক-একদিন লেখার ব্যাঘাতে ক্ষিপ্ত হ'য়ে দোয়াত ছুঁড়ে মেরেছি তাদের গায়ে, লাফিয়ে উঠে তাড়া করেছি ফুটপাতে। আর যতদিনে তারা অনেক-কিছু বোঝার মতো বড়ো হ'লো আমি ততদিনে এত কম সময় থাকি যে দেখাশোনাই প্রায় হয় না। —এর মধ্যে শুধু একটুখানি রুপোলি রেখা আমি দেখতে পেয়েছিলুম : সেটা এই যে এরা সুধার আর আমার মধ্যে দেয়ালেব কাজ করবে, আমার বিরক্তির জন্য একটি করুণ মুখ সাজিয়ে রাখা ছাড়াও আরো কিছু করবার থাকবে তার। কিন্তু আস্তে-আস্তে তাবাও তাদের মা-ব মতোই মুখের ভাব আয়ত্ত ক'রে নিলে ; একজনের বদলে, আমি আমার দুষ্কর্মের চার-পাঁচজন ম্লান ও জীবন্ত প্রমাণ আশে-পাশে ঘুরে বেড়াতে দেখলাম। কিন্তু আমার প্রতি আর কোন মনোভাবই বা সম্ভব ছিলো তাদের—তারা, আধ-পেটা-খাওয়া, ছেঁড়া-কাপড়-পরা, মাইনে-না-দিয়ে স্কুলের নাম কাটানো, আর আমি কলম নিয়ে টেবিলে বসলেই গাল খাবার ভয়ে সন্ত্রস্ত। আমি সংসারের কোনো কাজ করবো, এই আশা বিসর্জন দিতে সুধাকে অনেক আগেই বাধ্য করেছিলাম আমি : আর সে আমার দিকে একবার উল্লেখমাত্র না-ক'রে, তার ছেলে-মেয়েদের নিয়েই সবটা চালিযাছে ব'লে শেষ পর্যন্ত আমিই বাড়ির মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়লাম।

গৌরীর সঙ্গে শেষ দেখা হবার পর (তাব সংঘাতের পর, বলা উচিত) আমার একটা অস্পষ্ট ধারণা হয়েছিলো যে একবার শরীর দিয়ে ভালোবাসতে পারলেই তা-ই থেকেই মনের ভালোবাসা জন্মায়। কতটুকু কতক্ষণের সেই দেখা—তবু কলকাতায় এসে অনেকদিন পর্যন্ত চৈত্রমাসের পাতার মতো কেঁপেছিলাম আমি, তাকে ছাড়া আর-কিছুই ভাবতে পারিনি। (তখনই আমি বুঝেছিলাম আমাব মন ভিতরে-ভিতরে কত দুর্বল, এ-সব ব্যাপার হালকাভাবে নিতে পারি না, ঘুমের পরে সকালে উঠে ভুলে যাবার ক্ষমতা আমার কত কম। আর সেই থেকে, যেখানে নগদ দামেই সব চুকে যাবার কথা, সেখানেও কখনো স্বচ্ছন্দ হ'তে পারিনি আমি, সর্বদাই ভয় পেয়েছি পাছে হঠাৎ 'প্রেমে প'ড়ে গিয়ে' তাদের অবজ্ঞাভাজন হ'য়ে পড়ি।) —আমি তাই এমনও আশা করেছিলাম যে শরীরটাকে উনুনে চাপালেই তারই উপর ভালোবাসার সর পড়বে—কিন্তু হিশেবে ভুল হ'লো, দেহের কাছে ঠ'কে গেলাম এবার, সে উল্টো ব্যবহার করলে আমার সঙ্গে। বুঝিয়ে দিলে, তার তৃপ্তি শুধু তারই মধ্যে নেই, চাবি নিয়ে ব'সে আছে মন। সেই মন যদি জেগে না ওঠে তবে কিছুই কিছু না। অথচ—আশ্চর্য এই—মন তার দরজাই খুলবে না যতক্ষণ না ইন্দ্রিয়ের আঘাত পড়ে সেখানে। আমাদের দেহ আর মনের কী যে ঠিক সম্বন্ধ আজ পর্যন্ত তার কূল-কিনারা পাইনি।

পড়তে ভালো লাগে না আমার, কেমন নিষ্ক্রিয় মনে হয় ওটাকে, খানিকটা বাবুগিরির মতো। কিন্তু আমিও মাঝে-মাঝে পড়ার জ্বরে পড়েছি—ঠিক ইনফ্লুয়েঞ্জারই মতো তার আক্রমণ। যেমন এক-একবার সাতদিন ধ'রে অবিশ্রাম মদ খেয়েছি, তেমনি তিন, চার, পাঁচ সপ্তাহ ধ'রে প'ড়ে থেকেছি ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরিতে (তখন তা-ই নাম ছিলো)। কোনো বিষয়েই ধারাবাহিক শিক্ষা নেবার ক্ষমতা নেই আমার, এলোমেলো, আবোলতাবোল প'ড়ে গেছি প্রায় কোনোরকম বাছ-বিচার না-করে। এইভাবেই একবার শোপেনহাওয়ার পড়েছিলাম। আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিলো এই কথাটা প'ড়ে যে কোনো ঘটনাকে আমরা ইচ্ছে করেছি ব'লেই সেটা ঘটতে পারে। অর্থাৎ মনই কর্তা · আমাদের ইচ্ছাশক্তি সব-কিছু ঘটাচ্ছে। অনেক, অনেকদিন এই কথাটাকে নিয়ে ভেবেছি আমি। তাহ'লে : যার শরীরে যক্ষ্মার জীবাণু প্রবেশ করলে, সেও কি ইচ্ছে করেছিলো সেটা? আব যে-লোকটা মোটর-চাপা প'ড়ে মরলো, সেও? এ-কথার কোনো স্পষ্ট জবাব আমি পাইনি—চেষ্টাও করিনি তার জন্য ; কিন্তু আমাদের ইচ্ছাশক্তির কী যে ভীষণ জোর আমি তো তা হাড়ে-হাড়েই বুঝেছি। আমি ইচ্ছে করিনি ব'লেই সুধাকে ভালোবাসতে পারিনি ; আমি ইচ্ছে কবেছি ব'লেই

এই আরোগ্য-নিকেতনে এসেছি।

কিন্তু এই ইচ্ছেটা একটু বাঁকা পথে কাজ করে। নিশ্চয়ই—যদিও তখন তা জানতুম না—আমার কয়েকটা উপন্যাস লেখার ইচ্ছে হয়েছিলো, কিন্তু স্থির হ'য়ে টেবিলে বসতে সহজে রাজি হবো তেমন মানুষ তো আমি নই। নিজেকে বাধ্য করতে হ'লো সেইজন্য। হঠাৎ একদিন (তখন সেই খবর-কাগজের উন্নতি হচ্ছে, মাইনে বাড়ছে লোকদের), চাকরিটা ছেড়ে দিলুম। নিজেকে বললুম, টেলিগ্রামের তর্জমা করা অসহ্য হ'য়ে উঠেছে আমার, অসহ্য এই খবর-কাগজের আবহাওয়া। যা পানের পিক! যা কেচ্ছা! যা রাজা-উজির! আমার বিয়ের পর চার বা পাঁচ বছর কেটেছে তখন, দুটো শিশু হাঁটতে আর চ্যাঁচাতে পারে, মূর্তিমান খিদের মতো ঘুরে বেড়ায়। রোজগারের জন্য উপায় জানি না ব'লে লিখতে বসলুম। তার জন্যে সারাদিন বাড়ি থাকতে হয়। এই সময়েই পর-পর কিছু বই লিখে ফেলেছিলুম ; আর এই সময়েই আমার স্ত্রী আর সন্তানের প্রতি— এতদিন যা ছিলো উদাসীনতা, তা রীতিমতো বিরুদ্ধতায় দানা বাঁধলো। লিখতে বসলে বড্ড মেজাজ খারাপ হ'য়ে যায় আমার, কাছাকাছি কাউকে সহ্য করতে পারি না। (আমার উচিত ছিলো বাইরের কোনো কাজ নেয়া : কোনো ব্যবসা, ঘুরে-ঘুরে দালালি, সার্কাসে বেচার জন্য জানোয়ার ধরার বিদ্যে শিখলে বেশ হ'তো। লেখার কাজে ঘরে ব'সে অনেকক্ষণ ধ'রে একটা জিনিশ ভাবতে হয়—তার মতো অত্যাচার আর কিছুই নেই।)

সে-সব দিনে লেখায় আমার বেগ ছিলো আশ্চর্য—আর আজ পর্যন্ত যেটা আমি তাড়াতাড়ি ফাটিয়ে দিতে না পারি সেটা আমি পারিই না। যেন ফিরে-ফিরে একটা বিষ জ'মে উঠেছে শরীরে, সেটাকে বের ক'রে দিতেই হ'লো। যদি কোথাও ঠেকে গেছে, তার মানেই অসুখটা এখনো 'তৈরি' হয়নি— ছেড়ে দিয়েই ভুলে যেতে পেরেছি। কিন্তু বলীয়ান বীজাণুগুলো রেহাই দেয়নি আমাকে ; আমার অন্ত্রতন্ত্র খুঁড়ে-খুঁড়ে কাজ ক'রে গেছে। তাই লেখার সময় আমার এত মেজাজ, এত অস্থিরতা, আমার কাছে অন্যেরা এবং অন্যদের কাছে আমি এমন অসহনীয়। সেই সময়টায়—হয়তো মাত্রই তিন কি চার বছর তার মেয়াদ, আমার বয়স তখনো তিরিশের নিচে—সেই সময়টায় ভূতের মতো লিখেছিলাম, কেমন ক'রে রাত কেটে গেছে বুঝিনি, খেতে ভুলে গিয়েছি কতদিন। চোখে ঝাপসা দেখেছি, কলম-ধরা আঙুলর ডগা কেঁপেছে—কিন্তু ক্লান্তিতে নয়, আনন্দে।

—আনন্দ! ঐ কথাটা উচ্চারণ করার অধিকার কি আছে আমার? আনন্দ কাকে বলে তা কি আমি কখনো জেনেছি? এমন কোন শিখরে আমি দাঁড়িয়েছি যেখান থেকে পাতালের হাঁ স্পষ্ট দেখতে পাইনি? এমন কোন উষা দেখেছি, যা আমার বুকে বর্শা হ'য়ে বেঁধেনি? কিন্তু তবু—কিন্তু তবু। আমার চোখ গৌরীকে দেখে ঝাপসা হয়েছে : এও সেই রকম। তার চোখের ঝড় কাঁপিয়ে গেছে আমাকে : এও সেইরকম। এমনকি, বেশি আরো বেশি। লেখার সময় আমি যেন অন্য জগতে চ'লে গিয়েছি—না, শুধু আমি নই, কিংবা আমিই শুধু নই—পৃথিবীর কোটি-কোটি শূকরের মতো মানুষ, যারা জন্ম নেয় আর জন্ম দেয় আর ম'রে যায়—তারা সকলেই এক উন্নত উজ্জ্বল জগতের অধিবাসী হ'য়ে গেছে, তাদের ইতরামো, তাদের নষ্টামি, তাদের ন্যাকামি—এ-সব সত্ত্বেও, বা এ-সমস্ত নিয়েই—নিজের পায়ের উপর বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে তারা—কোনো মন্দিরের গায়ে রাক্ষসের কদাকার মূর্তিও যেমন কুৎসিত হয় না, তেমনি ক'রেই দেখতে পেয়েছি আমি তাদের। এই পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সব আমি সহ্য করতে পেরেছি তখন। আমার বাবাকেও ক্ষমা করতে পেরেছি।

কিছুদিন শুধু লিখেই সংসার চালিয়েছিলুম—যদি তাকে চালানো বলা যায়। যা টাকা হাতে আসে, তার অর্ধেকের বেশি সুধার হাতে পড়ে না। এক-একটা বই শেষ ক'রে উঠে মদের মধ্যে ডুবে থাকতে হয় কয়দিন। ফিরে এসে দারিদ্র্য—নোংরা দারিদ্র্য, অভিযোগে ভরা ফ্যাকাশে আর নিঃশব্দ কতকগুলো মুখ। নোংরামি জিনিশটার মজা এই যে সেটাকে যে রচনা করে সেও সেটাকে কম ঘৃণা করে না—এ-সবের জন্য আমিই দায়ী ভেবে আরো বেশি দম আটকে আসে আমার। ততদিনে

ছেলেমেয়েরা বড়ো হ'য়ে উঠছে, আমাকে বিষের চোখে দেখতে শিখছে। সুধা—এই অভাব সত্ত্বেও—আরো মোটা হয়েছে ; ভগবানের ক্ষণিক দান যৌবনের রং মুছে যাবার পর ভগবানের স্থায়ী দান তার বোকামিটা প্রকট হ'য়ে উঠেছে তার মুখে। আস্তে-আস্তে বাড়ি আমার অসহ্য হ'য়ে উঠলো। অথচ লিখতে হ'লে বাড়ি থাকতে হয়। তাই—আর তখন যুদ্ধের জন্য খরচ বেড়ে যাচ্ছে ব'লে আমি আবার চাকরি খুঁজতে বেরোলাম। ওষুধের কারখানায় কেরানিগিরি, রেডিওতে কেরানিগিরি, বিজ্ঞাপনের আপিশে কেরানিগিরি—তা ছাড়া আর কী আছে বাঙালির জীবনে?—কোথাও ছ-মাস, কোথাও বা দু-মাসেই ইস্তফা। আমার কাগজের নৌকো এঁদো নালায় বানচাল হ'লো—আর আমি একদিন কলম্বাসের স্বপ্ন দেখেছিলাম।

(কিন্তু যারা বলে 'দারিদ্র্যের জন্য' আমার লেখা হ'লো না, তারা কিছুই বোঝে না। আমার ঐটুকু বলবার ছিলো ; ঐটুকুই বলেছি।)

আর এই রকম সময়েই অর্চনার সঙ্গে আমার দেখা হ'লো। এখানে অর্চনাই বলছি—যদিও আসলে তাকে নাম ধ'রে ডাকিনি কখনো। শুধু একদিন—কিন্তু সে-কথা পরে।

ছয়

যুদ্ধের জন্য গজিয়ে ওঠা অসংখ্য নতুন আপিশের মধ্যে একটাতে ঢুকে পড়েছি তখন। সেই আপিশে একদিন প্রফুল্ল রায় কর্তা হ'য়ে এলো।

প্রফুল্ল রায় নামটা খুব সাধারণ, কলকাতার প্রত্যেক রাস্তায় একজন ক'রে পাওয়া যাবে হয়তো। কিন্তু একদিন ঐ নামে একটু দীপ্তি লেগেছিলো—অন্তত অল্প কয়েকজনের চোখে। তাকে নিয়ে বলাবলি করেছে যুবকের দল—কখনো বুড়োরাও—আর তখনো সে কলেজে-পড়া ছোকরা মাত্র। তার 'হীরা ও হাওয়া' নামের কবিতার বই (প্রথম এবং শেষ বই) আমিও পড়েছিলাম। ঠিক সেই রকম বিজ্ঞ, চতুর, অকালপক্ক, ফুর্তিতে আর বিষাদে ভরা লেখা, যাতে কোনো খুঁত নেই ব'লেই মনটা যেন খুঁতখুঁত করে, আর যা প'ড়ে ঐ বালকের ভবিষ্যৎ বিষয়ে কৌতূহলী আর উদ্বিগ্ন হ'তে হয়। সেই উনিশ কিংবা কুড়ি বছর বয়সেই—তার বইয়ের নাম থেকেই তা বোঝা যায় —ঐ বয়সেই সে দেখতে পেয়েছিলো, দেখাতে চেয়েছিলো, মানুষের জীবনে শাশ্বত আর ক্ষণিকের বিরোধ, আর ও-দুয়ের নিত্য সম্বন্ধ। দেহের জীবনের বিরুদ্ধে মনের জীবন, ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধে বুদ্ধি, হৃদয়ের পরিবর্তমান সুখদুঃখের পিছনে বর্বর, জড়, গণিতে বাঁধা উদাসীন প্রকৃতি। আর এই দ্বন্দ্বের কথা সে বলেছিলো ছোটো-ছোটো ছন্দে-বাঁধা কাহিনীতে, হালকা রূপকথায়, আমোদে মাখা ছবির সাহায্যে— কখনো এত হালকা যে তার অর্থ আরো অবাক ক'রে দেয় . যেমন (এখনো মনে আছে আমার) নিকুঞ্জে শুয়ে-থাকা প্রণয়ীযুগলের উপর গাছের পাতা ঝ'রে পড়ছে, এই ছবির মধ্যে সে ফুটিয়ে তুলেছিলো একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়বিলাস আর তার অবসানের বেদনা। তার লেখা ভরপুর ছিলো রবীন্দ্রনাথে, অথচ তার মধ্যে কিছু ছিলো (আর সেটাই তার সারবস্তু) যা রবীন্দ্রনাথে নেই তা যদি না হ'তো তাহ'লে আমি তার লেখা কখনো পড়তুম না।

প্রফুল্ল আর আমি একই সময়ে কলেজে পড়তুম, কিন্তু সে ছিলো প্রেসিডেন্সি কলেজে, আর তাছাড়া আমার মেলামেশায় মন ছিলো না। তবু তার সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছে সেই সময়ে : প্রথম বোধহয় 'মালঞ্চ' আপিশে, সেখান থেকে বেরিয়ে কোনো চায়ের দোকানে আধ ঘণ্টা বা চল্লিশ মিনিট কাটিয়েছি। তার চোখে-মুখে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি আমার প্রতি তার অনুরাগ, আমার সঙ্গে বন্ধুতা করার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আমি বড্ড একরোখা আর অমিশুক মানুষ : যখন আমি কড়া রকমের ফুর্তি জোটাতে না পারি তখন আমি একা থাকতেই ভালোবাসি, আর 'সাহিত্যে'র বিষয়ে কথা বলতে বিশ্রী লাগে আমার। আর তাই, যদিও পেশাদার অর্থেই লেখক হ'তে হয়েছে

আমাকে (ঈশ্বর জানেন, টাকার জন্য!), তবু আমি সাহিত্যিক আড্ডার দূরে-দূরেই থেকেছি, ওখানকার কথাবার্তা যেটুকু শুনেছি কোনো সুখ পাইনি। আমার বরং ভালো লেগেছে বস্তির ঝিয়েদের পিছনে হেঁটে-হেঁটে তাদের 'মনোগত' কথা শুনতে (দু-জন হ'লেই অনেক কথা বলে তারা)—এ-রকম অনেক হেঁটেছি আমি—শুধু তাদের কথা শোনারই জন্য, অন্য কোনো কারণে নয়।

আর তাছাড়া প্রফুল্লর সামনে কী-রকম একটু অস্বস্তি লেগেছে আমার ; বেশি ভণিতা না-ক'রে তার সহৃদয়তা প্রত্যাখ্যান করেছি ; আমি হাত নাড়তে পারার আগেই চা আর অমলেটের দাম সে চুকিয়ে দিয়েছে—আর আমি ইচ্ছে ক'রে উল্টো দিকের বাস্ ধরেছি যাতে তার সঙ্গে আর থাকতে না হয়।

আমার ভাবতে অবাক লাগছে যে প্রফুল্লর তখনকার চেহারা এত স্পষ্ট মনে আছে আমার। ছিপছিপে, মাঝারি লম্বা, শরীরের এমন মানানসই গড়ন যে সে কোনো ঘরে ব'সে থাকলে হঠাৎ তাকে চোখে পড়ে না, রেস্তোরাঁর ঘেঁষাঘেঁষি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার সময় চেয়ারটা একটু বেঁকেও যায় না এমনকি। ডিমের ছাঁদের মুখ, থুৎনিতে একটু আকস্মিকভাবে শেষ হয়েছে—তার জন্য তাকে ঈষৎ দুর্বল আর অসহায় মনে হয়—অথচ ছোটো আর সোজা নাকটির দু-পাশে শান্ত আর বুদ্ধিমান চোখ প্রতিজ্ঞায় ভরা। মাথার বাঁ দিকে সিঁথি ক'রে ডান দিকের চুলে একটু সেকেলে ধরনে ঢেউ খেলিয়ে দেয়—তাকে মানিয়ে যায় সেটা—চুলের তলায় কপালটি খুব পরিষ্কার, সেখানে তার কথা-বার্তায় ছায়া পড়তে দেখিনি, যদিও চোখের তলায় ছোটো একটা শিরা ফুলে উঠেছে মাঝে-মাঝে, আর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠে চোখ পর্যন্ত আলো ক'রে তুলেছে। সারা মানুষটার মধ্যে একটা অবর্ণনীয় (প্রায় অসহনীয়) পরিচ্ছন্নতা ছিলো : তার জামা-কামড়ে, দাঁতে, নখে আর বাদামি রঙের চামড়ায়, এমনকি তার হাত নাড়ায়, তার চলাফেরায়। হ্যাঁ—এইবার পেয়েছি ঠিক কথাটা, তাকে যে অমন ছিম-ছাম, সুসম্পূর্ণ মনে হ'তো তার জন্য দায়ী তার চেহারা নয়, তার নড়া-চড়ার মৃদুতা, চোখে-না-পড়ার মতো সংগতি—আক্ষরিক অর্থে সুষমা। কিংবা হয়তো তার মুখ-চোখও এই সৌষম্যের অংশ মাত্র, তার মনই তৈরি ক'রে নিয়েছিলো তার চেহারাটাকে—হঠাৎ তার এক-একটা ভঙ্গিতে আমার মাকে মনে প'ড়ে গেছে আমার। হয়তো সেইজন্যই অস্বস্তি বোধ করেছি।

এখন দেখছি তাকে আমি খুব মন দিয়েই লক্ষ করেছিলাম, আমার মনের উপর রীতিমতো ছাপ রেখেছিলো সে—যদিও বেশি বার তার সঙ্গে দেখাশোনা হয়নি। অথচ পনেরো বছর পর তাকে দেখে প্রথমে চিনতে পারলুম না।

কিন্তু কী-রকম অবস্থার মধ্যে দেখা হ'লো সেটা আগে বলা দরকার।

আপিশে, পঞ্চাশ কেরানির সঙ্গে, মস্ত হল-ঘরে আমার বসবার জায়গা। টেবিলটা একটু বড়ো, সে-টেবিলে একটা টেলিফোনও আছে : এইটুকু তফাৎ। নতুন ডিরেক্টর-সাহেব একদিন সেই হল-ঘরের মধ্য দিয়ে হেঁটে গেলেন। আমি লক্ষ করলুম ছোকরা কেরানিরা উঠে দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু আমি অতিশয় ব্যস্ততার ভান ক'রে যে-কোনো একটা কাগজের উপর চোখ দুটোকে আটকে রাখলুম। তিনি এসে আমার পাশের টেবিলে দাঁড়িয়ে দু-একটা কথা বললেন ; সে-ভদ্রলোকের দাঁড়ানো দেহটা ধনুকের মতো বেঁকে গেলো (আড়চোখে সবই দেখে নিচ্ছিলাম আমি), আমার পিঠের উপর কয়েকটা কটাক্ষ-পাত অনুভব করলাম। ছুটি হবার মিনিট দশেক আগে চাপরাশি এসে বললে সাহেব আমাকে 'সেলাম জানিয়েছেন'।

চাকরি ছেড়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে উঠে এলাম। একটু অবাক হলাম, যখন 'সাহেব' আমাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, হাত তুলে নমস্কার ক'রে বললেন 'বসুন। অনেকদিন পর দেখা হ'লো। কেমন আছেন?' তারপর, আমাকে কিঞ্চিৎ বিমূঢ় দেখে : 'আমি প্রফুল্ল রায়। ''কবি'' প্রফুল্ল রায়।' কথার উচ্চারণে কোটেশন চিহ্নটা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে।

এ-কথা শুনে আমি বোধহয় আধ মিনিটখানেক শুধু তাকিয়েই ছিলাম তার দিকে। আমার সামনে

উপবিষ্ট 'সাহেব'টিকে এককালের চেনা 'প্রফুল্ল রায়ে' তর্জমা ক'রে নিতে ঐটুকু সময় লাগলো। না-চেনার কোনো কারণ অবশ্য ছিলো না : আশা করিনি, ভাবিনি, কল্পনাও করিনি ব'লেই ভুল হয়েছিলো। শুধু যে পি.কে রায় নাম শুনে প্রফুল্ল রায়কে অনুমান করে নিতে পারিনি তা নয়, প্রফুল্ল রায় নাম শুনলেও কিছুই মনে হ'তো না আমার : সেই 'কবি'কে 'হীরা ও হাওয়া'র লেখককে বহু আগেই ভুলে গিয়েছিলাম—মনে রাখার বা মনে পড়ার কোনো কারণই ছিলো না : এতগুলো বছরের মধ্যে আর-কিছুই লেখেনি সে, কোথাও তার নাম শুনিনি—লেখকদের এক-নম্বর গোয়েন্দা 'মালঞ্চ'-সম্পাদক র-বাবুর মুখেও না। আর সেই আপিশের কামরায় মস্ত টেবিলে মুখোমুখি তাকে চিনতে পেরে, আমি প্রথমে মনের মধ্যে একটা কষ্ট অনুভব করলাম। আমার একটা গোপন মোহ ভেঙে গেলো।

—এই পরিণাম! যে-ছেলে উনিশ বছর বয়সে অবাক ক'রে দিয়েছিলো, সে এখন সরকারি আপিশে ডিরেক্টর বা ডেপুটি-ডিরেক্টর পদবীর তলায় কবর দিয়েছে নিজেকে। একদিন যে মায়াবীর মতো কলম চালিয়েছে সেই এখন সারাদিন ব'সে দিস্তে-দিস্তে ময়লা কাগজে সই লাগায়। একদিন যার কোনো-একটা শাশ্বতের জন্য তেষ্টা পেয়েছিলো, এখন সে যে-কোনো এক পুঁচকে মন্ত্রীর হুকুম খাটে। মন্ত্রী কী? গর্বনর কী? কোনো-একজন মস্ত চাকুরেই বা কী? একটা চেয়ার, একটা আসন, একটা খেতাব। একজন চ'লে যায়, অন্য একজন এসে বসে সেখানে, সেই অন্য জনকেই তৎক্ষণাৎ সেলাম করতে থাকে লোকেরা। কিন্তু একজন কবি! তার মূল্য তার নিজেরই জন্য, তার নিতম্বের তলায় কোনো গদিব জন্য নয়। খেপিয়ে-তোলা জনগণের ভোটের জন্যও নয়। কোনো আসন নেই, কেউ তাকে সনদ দেয়নি। সে আছে : এই কথাই সব। তার পরে অন্য কবি আসবে, কিন্তু তার বদলে কেউ আসবে না। আরো অনেক কবি হবে, কিন্তু সেও থাকবে।

আমি না-হয় নিজেকে নষ্টই করেছি, কিন্তু প্রফুল্ল রায় কেমন ক'রে তা পারলো—সে, এত স্থির, বুদ্ধিমান, এমন হালকা, মৃদু, সংযত তার নড়াচড়া, যেন সব উদ্যম ঠিক সময়ে খরচ কবার জন্য জমিয়ে রাখছে। কিন্তু জমিয়ে রেখেছিলো—এইজন্যেই?

ভাবে-ভঙ্গিতে একই রকম আছে। মুখটা একটু ভরা আর লালচে হয়েছে, চুল পাৎলা আর ওল্টানো ; তাছাড়া আর লক্ষণীয় বদল হয়নি। টেবিলের উপর যে-হাতটা রেখেছে তা তার ছেলেবেলার মতই কমনীয় ; যখন উঠে দাঁড়ালো তাব ঈষৎ সরু কাঁধের আর পরিষ্কার-ছাঁটা ঘাড়েব ভঙ্গিতে সেই রকমই কিশোর লাবণ্য দেখতে পেলাম। একটি ঢিলেঢোলা, চমৎকার স্যুট তার পরনে (আমিও বুঝতে পারছিলাম সেটা চমৎকার) ; হাওয়াই-শার্টের ফ্যাশনে ধরা না-দিয়ে নেকটাই আর কোট দুটোই পবেছে। কোনো ক্ষোভ অথবা অসন্তোষের লেশমাত্র চিহ্ন নেই মুখে, কৃতী অথবা ব্যস্ত লোকদের বিস্ফার বা অন্যমনস্কতাও নেই।

দেখা গেলো, তার আর আমার পথ অনেকদূর পর্যন্ত একদিকে। আমাকে তার গাড়িতে আহ্বান করলে। নিজেই চালায় ; রাস্তায়, ট্র্যাফিকের আলোর উপর নজর রেখেও, ফাঁকে-ফাঁকে কথা বললে। আমার সব ক-টা বই পড়েছে বুঝলাম (যে কাজ র-বাবু ছাড়া আর-কেউ করেছে ব'লে জানতুম না) ; কোনটার পর কোনটা বেরিয়েছে তা পর্যন্ত জানে ; আর সেগুলো থেকে এমন দু-একটা ছোটো ঘটনার উল্লেখ করলে, যা আমাকে বেশ চেষ্টা ক'রে মনে আনতে হ'লো। আমাকে জিগেস করলে, এখন কী লিখছি। উত্তরে আমি বললাম, 'কিন্তু আপনি আর কবিতা লিখছেন না?' 'পারি না লিখতে।' তখন আমার মনে পড়লো যে 'হীরা ও হাওয়া'র পবে আর-কোনো নতুন লেখকের কবিতার বই আমি পড়িনি। তাকে বললুম সে-কথা। আমার দিকে চকিতে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'পড়েননি? অনেকেই ভালো লিখছেন কিন্তু।' আমি হেসে বললাম, 'আমি কিছুই পড়ি না। পড়তেই ভালো লাগে না আমার।' 'অবশ্য নিজে কিছু লিখতে থাকলে অন্যের লেখা পড়া যায় না।'

'কিছু লিখছিও না এখন। কিন্তু আপনি ছেড়ে দিলেন কেন?'

উত্তরে সে জানালে যে কারণটা একটু হাস্যকর। বললে, না-প'ড়ে যেমন কেউ যেমন লিখতে

শেখে না, তেমনি বড্ড বেশি পড়ার ফলে নিজের ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে কেউ-কেউ। কোনো ভালো লেখা প'ড়ে উৎসাহ জাগে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই ভালোটাই জঙ্গলের মতো ছড়িয়ে প'ড়ে চারাগাছকে মেরে ফেলতে পারে। তার বেলায় তা-ই হয়েছিলো। অল্প বয়সেই অনেক বেশি পড়েছিলো সে, বোকার মতো পড়েছিলো। নানা দেশের উৎকৃষ্ট লেখার উদাহরণ যতই সে আবিষ্কার করলে ততই তার রক্ত যেন জ'মে যেতে লাগলো ; মনে হ'লো, এর পরে সে আর কী যোগ করতে পারে, যে-কোনো ধরনের লেখাতেই যখন অনেকগুলো ক'রে নক্ষত্র জ্বলছে, তখন সে না-লিখলে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হবে ধারণা করতে পারলে না। নিজেই বুঝলে, এই ধরনের চিন্তা কত অর্থহীন ; তাই, এ থেকে মুক্তি পাবার জন্য 'সাহিত্য'কেই ভুলে থাকার চেষ্টা করলে সে; হঠাৎ ইংরেজি অনার্স ছেড়ে দিয়ে ইকনমিক্স নিলে। তারপর টাটার স্কলারশিপ নিয়ে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স। সেখানে থাকতে-থাকতেই নিজ লেখার সব পরিকল্পনা ত্যাগ করলে ; কেননা, সে দেখলে, তা না-হ'লে যন্ত্রণাভোগ না-ক'রে, হতাশায় ডুবে না-গিয়ে কোনো সাহিত্যের বই সে পড়তেই পারবে না। ফিরে এসে প্রথমে কলকাতায় তারপর দিল্লিতে প্রোফেসরি, তারপর সরকারি চাকরি, যুদ্ধের ম.্যে পুনা, রাওলপিণ্ডি, শিঙাপুর ঘুরে অনেকদিন পরে আবার কলকাতা।

প্রফুল্লর এই কথাগুলোর মধ্যে একটুও অহমিকা, অভিমান বা অনুশোচনা প্রকাশ পেলো না ; বালক বয়সের কোনো দুর্ঘটনা বা লজ্জার কথা নিয়ে যেমন বয়স্করা হাসিমুখে গল্প করে, তেমন সহজভাবেই বললে। ততক্ষণে গাড়ি বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ঢুকেছে ; আমার মনে পড়লো সে এই পাড়াতেই থাকে। এক ফাঁকে বললুম, 'আমাকে একটা বাস্-স্টপের কাছে নামিয়ে দিন।'

'আমি পরে নামবো।'

'আমাকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিতে হবে না!' হঠাৎ একটু বেশি জোরেই ব'লে ফেললুম কথাটা।

'আমার কোনো অসুবিধে নেই।'

'আমি এখানেই নামছি।'

আসল কথা, বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে আমি যেখানে থাকি, সেই রাস্তায়, সেই বাড়ির সামনে প্রফুল্লকে নিয়ে যেতে আমার লজ্জা করছিলো। হ্যাঁ—আমিও এতটাই স্নব! আর লজ্জা করছিলো ব'লে রাগও হচ্ছিলো নিজের উপর : রাগ, অবজ্ঞা, আক্রোশ।

'ঠিকই নেমে যাবেন এখানে?'

তার সৌজন্যের অন্তত একটু মৌখিক প্রতিদান দেবার চেষ্টায় বললুম, 'আপনি আর কতদূর?'

'এই কাছেই।—যদি কিছু মনে না করেন,—বা কোনো অসুবিধে না হয়—আসুন না একবার পাঁচ মিনিটের জন্য।' ব'লে সে আমার দিকে মুখ ফেরালো, তার চোখে সন্দেহাতীত আগ্রহ দেখলাম। বাড়ি অবধি তাকে যেতে দিলুম না ব'লে মনটা একটু দুর্বল ছিলো সেই মুহূর্তে। কয়েক মিনিট পরে গাড়ি একটা গেট দিয়ে ঢুকলো, সামনে একটা নতুন শাদা, তেতলা ফ্ল্যাট-বাড়ি। আমি প্রফুল্লর সঙ্গে গাড়ি থেকে নামলাম।

—কিন্তু এর পরের ঘটনা বলবার আগে অন্য দু-একটা কথা ব'লে নিতে হবে : সেটাই জরুরি, সেটাই আসল। সেই প্রথম দিন তার বাড়ি গিয়েই আমার মধ্যে দুটো ভাব জেগে উঠলো, তার প্রথমটা প্রফুল্লর বিষয়ে। তার ঝকঝকে সাজানো ফ্ল্যাটে যখন তাকে দেখলাম—কোট ছেড়ে, শার্টের গলা খুলে, তালপাতার চটি প'রে এসে বসলো সে, আর আমি কান দিয়ে তার কথা শুনলাম আর মাঝে-মাঝে চোখ ফেললাম ঘরের চারিদিকে—তখন তাকে দেখে-দেখে একটা নতুন উপলব্ধি জেগে উঠলো আমার মনে। কবি থেকে চাকুরেতে পতিত হয়েছে ব'লে আর তাকে করুণা করলাম না : তার মধ্যে আমি দেখতে পেলাম আমার ঠিক বিপরীত মানুষ, যা-কিছু আমি নই, যা-কিছু আমার নেই, তারই সন্নিপাতের নাম প্রফুল্ল রায়। সুখী, শান্ত, শিক্ষিত, সুসংবদ্ধ, আরামে প্রতিষ্ঠিত এবং আরামের যোগ্য ; চেহারায়, চরিত্রে, হৃদয়বৃত্তিতে সংস্কৃত কাব্যের নায়িকার মতো অনুভূতিশীল আর সুন্দর : প্রফুল্ল রায়। একটা সূক্ষ্ম মেয়েলি গন্ধ বার-বার যেন ভেসে এলো তার গা

থেকে : মেয়েদের মতোই গোছালো স্বভাবের, সব সময় উপস্থিত, একসঙ্গে দুটো-তিনটে কাজ করতে সক্ষম। তার সিগারেট ধরানোটাও আমার চেয়ে কত নিপুণ! আমার হাত থেকে সিগারেট প'ড়ে যায়, ছাই ঝরে কাপড়ে, আঙুলের চাপে এক মিনিটেই চেপ্টে যায় ওটা। আর তার আঙুলের ফাঁকে সিগারেটটি তার সুগোল তারুণ্য শেষ পর্যন্ত অক্ষত রেখে জ্ব'লে যায়। যত তাকে দেখলাম, ততই তার দিকে আমার আকর্ষণ দুর্বার হ'য়ে উঠলো ; মনে হ'লো ওকে আমার প্রয়োজন, ওকে আমি চাই, ওর সঙ্গে আমার জীবনটা বাঁধা পড়লে এখনো উদ্ধার পাই আমি। আর সেই সঙ্গেই তার বিরুদ্ধে হিংসার আগুন জ্ব'লে উঠলো আমার মনে, আমার বিদ্বেষ তাকে ধ্বংস করার জন্য লাফিয়ে উঠলো। আতঙ্কে কেঁপে উঠে আমি উপলব্ধি করলাম যে আমি যা হ'তে চেয়েছি, হ'তে পারি না, অথচ এখনো যা হ'তে চাই—সেই অসম্ভবেরই নাম প্রফুল্ল রায়।

এবং দ্বিতীয় কথাটা এই যে তার স্ত্রী অর্চনাকে আমি পাগলের মতো ভালোবেসে ফেললাম। সেই প্রথম দিনেই। চোখে দেখা মাত্র।

সাত

সুন্দর সহজ ক'বে সাজানো ফ্ল্যাট। গোলাপি শেডের তলায় দাঁড়ানো আলো জ্বলছে (শীতেব আরম্ভ তখন, আপিশ থেকে ফেরার আগেই আলো জ্ব'লে যায়), মেঝেতে হলুদ আর সবুজে বোনা কার্পেট, আরামে ভরা আসন, দেয়াল জুড়ে বই, দেযালেব কোণে রেডিওগ্রাম। বেঁটে বুক-শেলফের মাথায় পিকাসোর ছাপা ছবি, নানা দেশের পুতুল। অসাধারণ কিছু নয়, সব 'ভদ্রলোকে'রই এ-রকম বসবার ঘর থাকে, এমন কত হাজার আছে কলকাতায়। কিন্তু প্রফুল্লর ঘরে ব্যক্তিত্বের ছাপ ছিলো ; সেখানে পা দিয়েই আমি বুঝেছিলাম ওটা শুধু সাজানো জিনিশ নয়, ওটা হ'য়ে উঠেছে দিনের পব দিনের বাঁচায আর ভালোবাসায। একটি সুখী পরিবার বাস কবে এখানে (সুশ্রী, সুবেশ, ছেলেমেয়ে দুটিকেও দেখলাম), পরস্পবকে ভালোবাসে তারা, তাদের জীবনটাকেই এই ঘরের মধ্যে চেনা যায়।

বোধহয় ভুল বললাম। শুধু ভালোবাসার দ্বারা কিছু হয না, শক্তি থেকেই সব জন্মায—শোভনতা নামক তুচ্ছ জিনিশটাও ব্যতিক্রম নয়। একশো টাকা রোজগার-করা দম্পতী, হাজার ভালোবেসেও, কেমন ক'বে তাদের ময়লা কাঁথা লুকোতে পারবে? আর কত অত্যুৎকৃষ্ট ড্রয়িংরুমের পর্দার পিছনে কত হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে, কে-ই বা তার খবর রাখে। না—জড় বস্তু তার নিবপেক্ষতা কাটিয়ে উঠতে পারে না কখনো, তার উপর মনের কোনো প্রভাব দেখাটা হাস্যকর। (উদাহরণ : গ্র্যাণ্ড হোটেলেব দামি ঘর সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক, তাই ব'লে কি সেটা কম আরামের?) আর তাছাড়া, এই সব সাজসজ্জা ব্যাপারটাই বাজে, এক রকমের মানসিক বাভিচার ; নিজেকে যেন সিকি-আনি-দুয়ানিতে ভাঙিয়ে খরচ ক'বে ফেলা। আমার মতে (এখনকার মতে) সবচেয়ে পবিত্র আশবাব হ'লো চারটি শাদা দেয়াল, যে দেয়াল নিজে কিছু বলে না, তাই যাকে আমার কথা দিয়ে ইচ্ছেমতো ভ'রে তুলতে পারি।

কিন্তু সেদিন, সেই সময়ে প্রফুল্লর ঘবটাকে আমি দেখেছিলাম তার আর অর্চনার একটা রচনার মতো। যেন ফাঁকে-ফাঁকে অনেক-কিছু পড়া যায়। তাই আমার অনেক-কিছুই ভালো লাগেনি।

—সত্য কথাটা এই যে আমার মধ্যেও ইতরামো আছে। প্রফুল্ল যে আপিশে আমার উপরিওলা সে-কথাটা ভুলতে পারিনি। যদি সে আমাকে আপিশে কয়েকটা ভদ্র গোছের বুলি শুনিয়ে ছেড়ে দিতো ('বিখ্যাত' লেখকের প্রতি ও-রকম দুর্বলতা থাকে অনেকের), তাহ'লে কোনো মুশকিল ছিলো না, আর ভাবতে হ'তো না তার কথা। কিন্তু আমাকে গাড়িতে তুলে নেয়া, বাড়িতে নিয়ে আসা, তারপর তার আর অর্চনার সুস্পষ্ট অনুরাগ (শুধু আমার লেখার প্রতি অনুরাগবশতই—ব্যক্তিগতভাবে আমার বিষয়ে কিছুই না-জেনে)—এ-সবে আমার ক্ষুদ্র অন্তঃকরণ নানারকম কুটিল

সন্দেহে ভ'রে উঠলো। এরা কি পিঠ-চাপড়াতে চাচ্ছে আমার? উপকার করতে? আমি কি করুণা করার সুখ দিচ্ছি এদের? এখন আমার মনে হচ্ছে যে তাদের মতো মানুষ আমি আগে দেখিনি, এমনকি আজ এ-কথাও মানতে পারি যে তাদের মতো কমই দেখা যায় ; কিন্তু তখন আমার কোনো উপায় ছিলো না। আত্মরক্ষায় প্রখর হ'য়ে-না উঠে, প্রত্যেকটি সম্ভব উপায় নিজের 'চরিত্র' (ঠিক এই কথাটাই ভেবেছিলাম তখন) জাহির না-ক'রে। মনে-মনে খুব উল্লসিত হ্লাম আমার জামা-কাপড় প্রতিদিনের চেয়েও ময়লা ব'লে ; ধুলোমাখা কাবলি থেকে আমার মস্ত চাষাড়ে পা দুটোকে বের ক'রে সোফার উপর আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসলাম, গোলাপের পাপড়ির মতো পাৎলা চিনেমাটির পেয়ালাটাকে ঠনাৎ ক'রে প্লেটের উপর নামালাম, কেকের গুঁড়ো ছিটিয়ে দিলাম মেঝেতে, ওদের দু'জনের নরম আওয়াজের পর ঘর ভ'রে গমগম ক'রে উঠলো আমার গলা। অবশ্য এই ব্যবহারই আমার পক্ষে স্বাভাবিক, আর এটাই আমি বরাবর বজায় রেখেছি ওদের সঙ্গে—নিজেকে মুহূর্তের জন্যও 'সাজিয়ে বের' করিনি ; তবুও ওরা সহ্য করেছে আমাকে, আর—আর—চুপি-চুপি বলি কথাটা—ভালোবেসেছে। আমি পালাতে চেয়েছি—ঈশ্বর জানেন আমি পালাতে চেয়েছি : ওদের বিতৃষ্ণা উৎপাদনের জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। সেই প্রথম দিনেই আশা করেছিলাম প্রফুল্ল আর আমাকে আসতে বলবে না, কিন্তু সে আমাকে পরের শনিবার আবার নিয়ে এলো, আর মাসখানেকের মধ্যে (বোধহয় আমার দুর্বলতা বুঝে) আমার বদলির ব্যবস্থা ক'রে দিলে যুদ্ধেরই অন্য একটা আপিশে। এতে আমার মাইনেও কিছু বাড়লো ; তার জন্য তাকে ক্ষমা করতে পারিনি। তার সঙ্গে আমার সাংসারিক ব্যবধানটা আরো যেন খুঁচিয়ে উঠলো এতে। তাকে ক্ষমা করতে পারিনি এইজন্যে যে, অন্তত একটা ক্ষেত্রে সে আমার চাইতে 'উঁচু দরের' মানুষ।

—কিন্তু শুধু একটা ক্ষেত্রে?

আট

হয়তো ছ-মাস, হয়তো চার-পাঁচ মাস ধ'রে আমার জীবন তাদের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে ছিলো। যতদিন না সেই ভয়ংকর ঘটলো।

আমার জীবনে এই একটা সময়, যখন আমি খুব বেশি কথা বলেছি। একসঙ্গে এত কথা আগে আমি বলিনি কখনো। সাহিত্যিক আড্ডাগুলো বিষয়ে আমার আপত্তিটাই এই যে বকবকানির চুলকোনি কেউ সামলাতে পারে না সেখানে। বক্তব্য কিছু নেই ; শুধু ব্যায়ামের জন্য, বা ভদ্রতারক্ষার জন্য, বা সময় কাটাবার জন্য কণ্ঠের কসরৎ ক'রে যায়। সুদূরপরাহত এবং কাল্পনিক সম্ভাবনা নিয়ে, নেহাৎই একটা অনুমান অথবা মতবাদঘটিত প্রশ্ন নিয়ে, সুভাষচন্দ্র বসু এই মুহূর্তে বার্লিনে না টোকিওতে না কি ইম্ফলে আছেন, এই ধরনের সমস্যা নিয়ে—তথাকথিত বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের উত্তেজনায় গলা ফাটাতে শুনেছি। বর্তমান জগতের 'শ্রেষ্ঠ মানব' কে, আধুনিক যুদ্ধে নৌবলের প্রাধান্য কতটা ক'মে গেছে এই 'আন্তর্জাতিক অবস্থা'র মধ্যে 'শিল্পীর কর্তব্য' কী, এই সব বাজে, বাজে, ছেলেমানুষি গবেষণার গাম্ভীর্য দেখে বিতৃষ্ণায় আমার নাড়িভুঁড়ি উল্টে এসেছে। আমি বরাবর মনে-মনে এই নিয়ে গর্ব করেছি যে আমার কোনো 'মতামত' নেই।

কিন্তু প্রফুল্লর ঘরে ব'সে, দিনের পর দিন, আমি দেখলুম আসলে কিছু-এসে-যায়-না এমন কোনো-কোনো বিষয় নিয়ে আমিও চঞ্চল হ'য়ে উঠতে পারি। প্রফুল্লই করেছে এটা : যেন ভেবে-ভেবে এমন কথা উত্থাপন করেছে, যাতে আমি যোগ দিতে বাধ্য হয়েছি—এমনকি প্রতিবাদ করতে। বলতে গেলে অনেক তর্ক হ'য়ে গেছে তার সঙ্গে আমার : ঠিক তর্ক নয়, কেননা আমাকে চেতিয়ে তুলেই সে চুপ ক'রে গেছে, চুপ ক'রে শুনেছে সে আর অর্চনা (তাদের ধৈর্যের তারিফ করি, কেননা আমার কণ্ঠস্বর সুশ্রাব্য নয়, উত্তেজনায় রীতিমতো কর্কশ হ'য়ে ওঠে, আর—লেখায় যেমনই হোক,

গুছিয়ে আমি কিছুই বলতে পারি না)—হ্যাঁ অশেষ ধৈর্য ধ'রে শুনেছে ওরা ; যখন খেই হারিয়ে ফেলেছি, অল্প কিছু ব'লে আমাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এ-সব কথাবার্তার একটা বড়ো বিষয় ছিলো—রবীন্দ্রনাথ। প্রফুল্লর মুখে যখন-তখন তাঁর নাম শুনি, তার বলার ধরনেই স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথকে সে কত বড়ো ব'লে ভাবে ; সে আক্ষেপ করে তাঁর কবিতা তেমন মন দিয়ে কেউ আর পড়ে না ব'লে, ঠোঁটের কোণে ঠাট্টা নিয়ে বলে যে ধ্যানমগ্ন শুভ্র মহাদেবের বিরাট কল্পনাকে বাঙালি যেন চড়ক-সংক্রান্তির ভালোমানুষ জামাতা-বাবাজীতে পরিণত করেছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের কিন্নর-কণ্ঠকেও সভাসমিতি-পাঠ্যবইয়ের হার্মনিয়মের সঙ্গে এমন ক'রে জুড়ে দিয়েছে যে আস্তে-আস্তে তাঁর আসল গলা ভুলেই যাচ্ছে লোকেরা।

আর, অবশ্য, এ-সব কথা শুনে, আমি একদিন বলতে বাধ্য হয়েছি যে রবীন্দ্রনাথ আমার ভালো লাগে না। তারপর, প্রফুল্লর দৃষ্টির উত্তরে, আরো বলতে হয়েছে।

—ভালো লাগে না (আমি বলেছি) অনেকগুলো সুস্পষ্ট কারণে। এক নম্বর : রবীন্দ্রনাথ বড্ড বেশি ভদ্রলোক ; দুই নম্বর, তিনি ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলেন ; তিন নম্বর, তাঁর লেখায় অনেক কপটতা ছিলো। অনেক বিষয়ে সত্য কথা তিনি বলেননি, নয়তো সত্য বলার ভয়ে বিষয়টাকেই এড়িয়ে গেছেন। তাঁর লেখা সরল, তরল, কোমল, ঐ 'ল' অক্ষরটার মতোই নরম আওয়াজের ; যেহেতু ছন্দ-মিল সহজে এসেছে, কবিতাগুলোকে অনর্থক বাড়িয়ে নষ্ট ক'রে দিয়েছেন ; লেখাটা যখন ভিতর থেকে ক্লান্ত হ'য়ে গেছে তখনো তিনি গায়ের জোরে চালিয়ে নিয়ে গেছেন বেচারাকে। গায়ের জোর মানে ভাষার জোর। আর জোর মানে ঠিক ক্ষমতাও নয় : টগবগে তেজি কোনো ঘোড়ার পিঠে তিনি চাপেননি ; ভাষাটা তাঁর জমিদারির মতো ছিলো, বাংলা ভাষার শব্দগুলো তাঁব অধীনস্থ প্রজার মতো যেন, তিনি আঙুল নাড়ামাত্র একজনের জায়গায় দশজন ছুটে আসে। একজনের জায়গায় দশজন : এই কর্তৃত্বেই তাঁর কাল হ'লো। তাঁর যে-কোনো একটা কবিতা নিন না : 'মানস-সুন্দরী' কি 'যেতে নাহি দিব'—অত, অত, অতক্ষণ ধ'রে কী ছিলো বলবার! কেন তিনি ছাঁটাই কবতে পারেননি, বাছাই করতে পারেননি—কেন তিনি কবিতাটার নিজের মধ্যে বেগ আনতে পারেননি, কোনো-একটা ধারণাকেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলেছেন শুধু? ধরুন, 'হৃদয় আমার নাচে রে'। কি, 'হে নিরুপমা' কি, এমনকি, 'দে দোল দোল', যেটা তিনি রেকর্ডে অনেক বাদ দিয়ে পড়েছিলেন ব'লেই ভালো লাগে, কিন্তু ছাপার অক্ষরে যার ভাষার ভারে দম বেরিয়ে যায়। এ-সব কবিতায় শুধু বর্ণনা আছে, কবিতা নেই। বর্ষা এসেছে, তার কয়েকটা উপমা, শুধু কয়েকটা উপমা ; শুধু কয়েকটা উপমা ; এ কি কোনো ভালো কবির যোগ্য কাজ? বর্ষাকে সাজানো হ'লো বটে, কিন্তু বলা হ'লো না। 'হে নিরুপমা—করিয়ো ক্ষমা' : এই মিলটা তাঁকে পেয়ে বসলো, নানাভাবে ওটাকে ব্যবহার ক'রে কবিতা শেষ ক'রে দিলেন। কিন্তু আমাদের জানতে ইচ্ছে করে: তারপর? মেয়েটি কী বললে? প্রেমিকের আবেদন কি মঞ্জুর হ'লো? যদি হ'য়ে থাকে তাতে তার নৈরাশ্য জাগলো, না উৎসাহ? এ-সব কথা জানতে ইচ্ছে করে আমাদের ; কিন্তু না, আগে-পিছে কিছুই নেই, শুধু একটা নান্দীপাঠ হ'লো, কোনো নাটক পেলাম না। গল্পে যেমন আবন্ত, আর প্রবাহ, আর শেষ, কবিতার মধ্যেও সেই রকম থাকলে তবে তো আমরা, সুখ পাবো। শেষ বয়সে তিনি নিজেও বুঝেছিলেন তাঁর দুর্বলতা ; কিন্তু অমিত রায়কে দিয়েও একটা অ-রাবীন্দ্রিক কবিতা তিনি লেখাতে পারেননি।

এমনি, আমি। সেই মুহূর্তের আগে আমি ভাবিওনি যে এত কথা আমার বলবার আছে ; ভাবিনি, রবীন্দ্রনাথ আমি যেটুকু বা পড়েছি তা নিয়ে এতখানি চিন্তা করার সময় কখনো হয়েছিলো আমার। বোধহয় আমার কথাগুলি ভীষণ বেয়াদপির মতোই শুনিয়েছিলো ওদের কানে ; প্রফুল্লর মুখটা একটু বেশি লালচে দেখালো, কিন্তু শান্ত ভঙ্গির কোনো ব্যতিক্রম ঘটলো না।

উত্তরে বেশ কয়েকটা সুনির্বাচিত কথায় সে আমাকে জানিয়ে দিলে যে আমার কথায় কিছু-কিছু আংশিক সত্য থাকলেও গোড়াতেই আমি ভুল করেছি। বাংলা ভাষা রবীন্দ্রনাথের জমিদারি

ছিলো না, পৈতৃক সম্পত্তি ছিলো না ; ছিলো তাঁর রাজত্ব, তাঁর নিজের উপার্জন। রবীন্দ্রনাথের আগেকার যে-কোনো লেখার সঙ্গে তুলনা করলেই তা বোঝা যায়। আর তাঁর লেখাগুলো পর-পর চিন্তা করলে আর সন্দেহ থাকে না। তখন আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই যে তিনি এক মহাজনমাত্র নন, শুধু পূর্বপুরুষের ব্যবসাকে সুদে খাটিয়ে বাড়াননি ; তিনি, তাঁর নিজের বলে আর একলার বলে, একটা ছোটো. গ্রাম্য পরগনাকে মহাদেশে পরিণত করেছিলেন ; তিনি অত বেশি না-লিখলে, আর 'অতক্ষণ ধ'রে' না-লিখলে বাংলা ভাষার এত ঐশ্বর্য প্রকাশ পেতো না। সত্য, ঐ জয় বা আবিষ্কার একটা নেশার মতো জুড়ে বসেছিলো তাঁকে, তাতে তাঁর অনেক কবিতার, কবিতা হিশেবে, ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু আরো কত আছে : কত বিচিত্র আর আশ্চর্য উদাহরণ। এক হাজার, দু-হাজার, পাঁচ হাজার লাইন ছেঁটে ফেললেও কোনো ক্ষতি হয় না তাঁর। হয়তো ভালোই হয়। 'ভাববেন না,' মুচকি হেসে আমার দিকে তাকিয়েছে প্রফুল্ল, 'ভাববেন না আপনার কথাতেই সায় দিচ্ছি। ঐ পাঁচ হাজার লাইন বেশি না-লিখলে তিনি তাঁর কাজটি ঠিক করতে পারতেন না। বাংলা ভাষার আর সাহিত্যের তখন যা অবস্থা, তাতে ঠিক ঐ রকম লেখারই প্রয়োজন ছিলো, ঐ ''নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে''রই মতো। উচ্ছ্বাস আর ঐশ্বর্য এক হ'য়ে গেছে ওখানে। মঙ্গল-কাব্যের মফস্বল থেকে ঐ তো আমাদের মুক্তি। ঐ তো প্রথম রীতি, নীতি, দেশাচার ছাড়িয়ে ব্যক্তির বিজয়-ঘোষণা। কল্পনাও করবেন না যে তাঁর কবিতা লেখা না-হ'লে আপনিও আজ আপনার উপন্যাস লিখতে পারতেন।'

'জানি না। আর সে হ'লো ইতিহাসের কথা। সে-দিক থেকে তিনি খুব মস্ত লেখক হ'তে পারেন ; কিন্তু উপস্থিত আমার কোনো কাজে লাগছেন না তিনি। তাঁকে দিয়ে আমার প্রয়োজন নেই।'

'আমাদের প্রয়োজনগুলিও সব সময় এক থাকে না,' এই ব'লে আরম্ভ ক'রে প্রফুল্ল আমাকে লিরিক কবিতার সারমর্ম বুঝিয়েছে। সেটাকে নেবার জন্যেও মনের একরকম আবহাওয়া চাই। কীর্তনে গান আর গল্প মিশে থাকে ; কিন্তু গল্পটাকে বাদ দিয়ে গান যেখানে নিজের পায়েই দাঁড়ায় তারই নাম লিরিক। কাহিনীর আভাস থাকতে পারে, কিন্তু তার উপর কিছু নির্ভর করছে না , একটা মুহূর্তের অনুভব, আমাদের মনের উপর দিয়ে যেটা তখনই গড়িয়ে প'ড়ে যায়, সেটাকে যেন জাদুমন্ত্রে ধ'রে ফেলা হ'লো : এ-ই হচ্ছে ব্যাপারটা। 'কৃষ্ণকলি' কবিতা কেন অমন অদ্ভুতভাবে হানা দেয় আমাদের মনে? ওতে কিছুই নেই, কোনো 'কথা' বলা হয়নি, কোনো নাটকীয় প্রতিঘাত পাই না ; একটি কালো মেয়ে একটা মাঠের মধ্যে একবার দাঁড়িয়েছিলো, তাতে কী এসে যায় পৃথিবীর? কিন্তু এসে যায় ব'লে প্রত্যয় জন্মায় তখনকার মতো ; ঐ তুচ্ছ হঠাৎ প্রধান হ'য়ে ওঠে, যাকে নিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে ভাববার মতো কিছু নেই তাকেও আমরা ভুলতে পারি না। এই কাজটি দু-ভাবেই করেছেন তিনি : ছন্দে বেঁধে, আর সুরে বেঁধে। তাঁর গানের কথা ভুললে চলবে না ; হয়তো তাঁর গানই তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা। সেই এক-একটি ছোটো রচনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জিনিশটা কেমন ভিতরে-ভিতরে গোপন চাপে গ'ড়ে উঠেছে ; তাঁর অনেক কবিতায় যা নেই—সেই গতি, ক্ষীণ আয়তন সত্ত্বেও, কাজ ক'রে যাচ্ছে ওখানে, ধাপে-ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে জিনিশটা, অথচ সব মিলিয়ে ব্যাপারটা যা হ'য়ে উঠেছে তাকে গদ্য ভাষায় তর্জমা করা যাবে না কখনো। অস্পষ্টতা নয়, যেন বড্ড বেশি বলার আছে, অনির্বচনীয়কে ব্যক্ত করতে চায়। এই সবই মনে রাখতে হবে তাঁর বিষয়ে কথা বলতে হ'লে। এবং, যে-বিষয়গুলো তাঁর সাহিত্যের মধ্যে তিনি আনেননি বা আনতে পারেননি, তা বলবার জন্যেই শেষ বয়সে তাঁকে ছবি আঁকতে হ'লো।

'ওখানেই আমার আরো আপত্তি,' জবাব দিতে দেরি করিনি আমি। তাঁর কবিতা যদি ''নিজের পায়েই দাঁড়াতে'' পারবে তাহ'লে তিনি কেন গান বেঁধেছিলেন ; কেন, শেষ পর্যন্ত, ''কৃষ্ণকলি''র মতো কবিতাতেও সুর বসিয়ে জাত মেরেছিলেন তার? আবার এদিকে—তাঁর অনেক গানের সুর বাদ দিয়ে দেখুন—তাহ'লে কিছুই থাকে না। সুরের ভেলকিতে বাজে কবিতাকেও ভালো ব'লে

চালিয়েছেন তিনি—এটা নিশ্চয়ই কবির যোগ্য কাজ নয়। আর তাঁর ছবির দগদগে লাল রং, ভাঙাচোরা মানুষের মুখ, দুঃস্বপ্নের মতো জন্তুগুলো—এ-সব তাঁর লেখার মধ্যেই থাকা উচিত ছিলো; সেখান থেকে পালিয়ে, অন্য একটা পরভাষায় বলতে হ'লো কেন তাঁকে? তাঁর কাজ ছবি আঁকা ছিলো না : লেখক তিনি। না—আমি এমন কবি চাই যিনি গান বাঁধেন না, ছবি আঁকেন না, তাঁর কবিতার মধ্য দিয়েই সব বলতে পারেন ; তারই মধ্যে ছবি আঁকেন, যতটা ছবি সহ্য হয় সেখানে; তারই মধ্যে সুর দেন, ঠিক যেটুকু সুরে কথাগুলো গরম হ'য়ে ওঠে কিন্তু গ'লে গিয়ে চরিত্র হারায় না। আমি চাই—এই ধরুন না আপনারই মতো একজন কবিকে চাই আমি।'

এ-কথা শুনে প্রফুল্ল তার পক্ষে একটু চড়া গলায় হেসে উঠলো।

'হেসে উঠলো।' বললাম, কিন্তু, এতটা কথা একদিনে হয়নি ; অনেক দিনের অনেক কথার সারাংশ লিখলাম এখানে। আর এই রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ থেকেই আরো বিষয় উৎপন্ন হয়েছে ; দেখা গেছে তার প্রত্যেকটাতেই প্রফুল্লর আর আমার ঠিক উল্টোউল্টি ধারণা। তার মধ্যে একটা কথা ফিরে ফিরে এসেছে অনেকবার : লেখকের কোনো বিশ্বাস থাকা উচিত কিনা ; আর, যদি তা-ই হয়, সে-বিশ্বাস কিসে?

প্রথমে রবীন্দ্রনাথ, তারপর কয়েকটা (আমার পক্ষে কানে-মাত্র-শোনা) বিদেশী নাম উল্লেখ ক'রে প্রফুল্ল দেখাতে চাইলো যে বিশ্বাস জিনিশটা শিল্পীর মনে (বিশ্রী কথা, শিল্পী!) রেলের এঞ্জিনে বাষ্পের মতো কাজ করে। আস্থা, সে বললে, নিত্য প্রেরণা জোগায়, ক্লান্তি আর জরার সঙ্গে যুদ্ধ করে, পরিশ্রমের সঙ্গে পুরস্কারের পার্থক্য ঘুচিয়ে দেয়। এই প্রশ্নটা সব সময়েই উঠছে—এই-যে আমি কাজটা করছি, এ কিসের জন্য? বাড়ির গৃহিণী যেমন নিশ্চিন্তে বলতে পারেন তাঁর স্বামী-সন্তান ভালো থাকবে ব'লেই তিনি অত যত্ন নিয়ে রান্না করেন, আর্টের বেলায় এ-রকম কোনো জবাব পাওয়া যায় না। ওতে লোকেরা 'উৎসাহিত' হয়, 'আনন্দ' পায়, ওতে তাদের 'মনের স্বাস্থ্য' ভালো থাকে, এই উত্তরগুলো অতিশয় অস্পষ্ট ; শরতের আকাশ, বন্ধুর সংসর্গ, সুন্দর নারী বা শিশু—আনন্দের এই সব অসংখ্য উপকরণ থাকতে সেটাকে আবার রচনা করার জন্য পরিশ্রম কেন— বিশেষত যখন জানি যে মানুষের তৈরি কোনো কিছুই প্রাকৃত বস্তুর মতো অব্যর্থ নয়। কিন্তু, কেউ যদি বলতে পারেন, 'আমি একটা সত্যকে পেয়েছি, সেইটেকে প্রকাশ করার জন্যই আমার চেষ্টা,' তাহ'লে অন্তত নিজের কাছে, তাঁর কাজ সার্থক হ'য়ে ওঠে।

এখন কথা হচ্ছে (প্রফুল্লর কথা আমি সংক্ষেপে লিখছি, তার উদাহরণগুলো বাদ দিয়ে যাই), আস্থার মধ্যেও মাত্রাভেদ আছে কিনা। আমরা কি জিনিশটাকে ছোটো, বড়ো, ভঙ্গুর আর সুদৃঢ় ব'লে ভাগ ক'রে নিতে পারি? পারি বইকি, না-ক'রে উপায় নেই আমাদের —চেষ্টা ক'রেও আমাদের মূল্যবোধ আমরা এড়াতে পারি না। তারকেশ্বরে মানৎ করলে ছেলের অসুখ সেরে যাবে ; ইহুদি, বা ব্রাহ্মণ, বা শাদারঙের-সোনালি-চুলের মানুষরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব; কোনো-একটা সমাজব্যবস্থার ফলে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হ'তে পারে—এগুলোও এক রকমের বিশ্বাস। কিন্তু এ-সব বিশ্বাসে কল্পনার স্বাধীনতা নেই, মানুষের মনকে তা নিয়মাবলীর মধ্যে বেঁধে ফেলে ; তাই এর প্রেরণা খুব বেশি দূরে নিয়ে যেতে পারে না মানুষকে। আর্টের জন্য বড়ো কোনো বিশ্বাস চাই, যে-বিশ্বাস সারা বিশ্বকে ধারণ করতে পারে। আস্থার পাত্র হিশেবে, সামাজিক উন্নতির চাইতে ভগবানের মহিমা অনেক বেশি কার্যকারী অন্তত এই কারণে, যে শেষেরটি অনেক বেশি কবিত্বময়।

'মানি না,' প্রফুল্লর কথা শেষ হওয়ামাত্র আমি ব'লে উঠেছি, 'আপনার কথা কোনোটাই মানি না আমি। ছবি, কবিতা— এ-সব জিনিশের সঙ্গে বিশ্বাসের কোনো সম্পর্কই নেই। আপনি দান্তে, মাইকেলেঞ্জেলোর নাম করলেন ; মাপ করবেন—তাঁদের বিষয়ে কিছুই জানি না আমি, কিন্তু এ-কথা কি ঠিক নয় যে তাঁদের সময়ে আরো অসংখ্য মানুষ খৃষ্টান ধর্মে বিশ্বাসী ছিলো ; আর তো কেউ ও-রকম কাব্য লেখেনি বা মূর্তি গড়েনি। তাঁদেরই ছিলো সেই শক্তি, তাঁরাই করেছেন। আরো কথা এই যে সে-যুগে মেরী-মাতার ছবির বড়ো-বড়ো খদ্দের ছিলো ; যেদিন থেকে খদ্দেরেরা

অন্য রকম চাইলেন ছবিও বদলে গেলো। কিন্তু তাই ব'লে আর্টের কি পতন হয়েছে বলবেন? বরং একটা বাঁধা-ধরা বিশ্বাস থেকে মুক্তি পেয়েই ভালো হয়েছে ; যে-কোনো কথাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কানুর গীত ব'লে চালাতে হয় না, সব রকম কল্পনাকেই কাজে লাগানো যায়। এই তো আপনার ঘরে পিকাসোর ছবি—এর মধ্যে কোন বিশ্বাস দেখতে পাচ্ছেন আপনি?

'তারপর কথা হচ্ছে—যদি বিশ্বাস ব'লে কিছু মানতেই হয় তার মধ্যে আর দর-দস্তুর চলে না। সব বিশ্বাসেরই সমান দাম। এমন কোনো মানুষ নেই যে তার জীবন ভ'রে কিছু-না-কিছু বিশ্বাস না করেছে, কিন্তু এমন কোনো মানুষই নেই যে জীবন ভ'রে একই জিনিশ বিশ্বাস করেছে। সব মানুষও একরকম বিশ্বাস করে না। বাবা, মা, পুরুৎ, প্রতিমা, জনতার নায়ক, সিনেমার নায়িকা—কিংবা হয়তো আপনারা যাকে বলেন আর্ট—এই সবই এক-এক সময়ে ঈশ্বরের অবতার হ'য়ে ওঠে মানুষের মনে। এর মধ্যে একটাকে বেশি আর-একটাকে কম নম্বর দেবেন কোন হিশেবে? আপনি যাঁদের নাম করলেন তাঁরা কি ধর্মের অনেক কুসংস্কারেও বিশ্বাস করেননি? তারকেশ্বরে হত্যে-দিয়ে-প'ড়ে-থাকা একজন মায়ের ছবি আঁকলে (যদি সত্যি আঁকার শক্তি থাকে) সেটা উৎকৃষ্ট 'আর্ট' হবার আমি তো কোনো বাধা দেখতে পাই না। আপনি বললেন, কোনো 'সত্যে' বিশ্বাসী হওয়াটাই আসল কথা। আবার বললেন, যাতে কল্পনা খেলা করতে পারে সেটাই 'বড়ো' বিশ্বাস। এ থেকে আমি এই মানে করছি যে সত্যকেই আপনি কল্পনা বলছেন। আর এই কথাটা আমার অবশ্য খুব মনঃপূত হয়। পরম সত্য ব'লে কিছু আছে কিনা আমি জানি না। অন্য কেউ জানে ব'লেও জানি না। ভগবান, মঙ্গল, সৌন্দর্য—সবই মানুষের মন-গড়া। অতএব, ভগবান মঙ্গলময় এই কথাটায় বিশ্বাস করলে যেমন জোর পাওয়া যায়, তেমনি ভগবানের অস্তিত্ব উড়িয়ে, এই পৃথিবীটাকে একটা নিয়মহীন, শৃঙ্খলাহীন নিষ্ঠুরতার মঞ্চ ব'লে ভাবলেই বা উদ্দীপনার অভাব হবে কেন? "কিছু নেই"—এ-কথাটা বলবার গরজেই এমন কবিতা লেখা হ'তে পারে, যাতে আপনিও মুগ্ধ না-হ'য়ে পারবেন না। আমাদের সব বিশ্বাসই যখন আনুমানিক, তখন কেউ অবিশ্বাসেই বিশ্বাস করলে তাকেও মেনে নিতে হবে আপনাকে। কলম্বাস যখন ভারতে পৌঁছবার জন্য পশ্চিম দিকে জাহাজ ভাসিয়েছিলেন তখন সারা জগতে তিনি একাই বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবীটা গোল। পরে তাঁর বিশ্বাসটাকেই সবাই মেনে নিলে। কিন্তু বিজ্ঞানের বাইরে কোনো কথাই ও-রকমভাব প্রমাণ হয় না। এমন কোনো সম্ভাবনা নেই যে আপনার আমার এই বিপরীত ধারণার মধ্যে কোনো-একটাতে ধ্রুব ব'লে সবাই মেনে নেবে কোনোদিন। অতএব যে যেমন খুশি বিশ্বাস করুক বা না করুক তাতে কিছুই এসে যায় না।'

'যাতে কিছুই এসে যায় না'—প্রফুল্লর চোখে ঈষৎ কৌতুক দেখতে পেয়েছি আমি—'সেটাকে অস্বীকার ক'রেও সময় নষ্ট করবে না কেউ। অবিশ্বাসও এক রকমের স্বীকৃতি।'

এমনি সব কথা হয়েছে প্রফুল্লর সঙ্গে আমার। মনে হচ্ছে তার সঙ্গে দেখা হবার এক মাস বা দেড় মাসের মধ্যেই এ-সব তর্ক খুব জ'মে উঠেছিলো। কথা বেশি বলতাম আমরা দু-জনেই (সবচেয়ে বেশি আমি) ; অর্চনা ব'সে থাকতো সে-ঘরে, কখনো উঠে যেতো ছেলেমেয়েদের কাছে, ফিরে এসে বসতো, মাঝে-মাঝে যোগ দিতো আমাদের কথায়, মাঝে-মাঝে চেষ্টা করতো অন্য কিছু হালকা বিষয়ের আমদানি করতে। তার উপস্থিতি প্রতি রোমকূপে অনুভব করেছি আমি ; তার দৃষ্টি অনুভব করেছি মুখের উপর ; কিন্তু আমি যদি তার দিকে তাকিয়েছি ভালো ক'রে তাকে দেখতে পাইনি।

নয়

অর্চনার মুখ আমার ভালো ক'রে মনে পড়ে না। সে কতটা লম্বা, কতটা রোগা বা মোটা, তার গায়ের রং কেমন—সবই আমার কাছে অস্পষ্ট। তার কথা যখন ভাবি সেই ভীষণ রাত্রিটাই ফিরে আসে মনে। তাই তার কথা ভাবি না, ভাবতে চাই না, পারি না, ভাবতে পারিনি এতদিন। কিন্তু এখন—এখন আমি জীবিত মানুষের সংসার থেকে সরিয়ে আনতে পেরেছি নিজেকে—এখন আর আমার ভয় নেই।

কথাটা এইভাবে বলা যাক যে প্রফুল্লর ঘরে বসবার আর আলোর ব্যবস্থার জন্যই অর্চনাকে আমি ভালো ক'রে দেখতে পাইনি। আলোর বিষয়েও প্রফুল্লর রুচি ছিলো মৃদুতার দিকে (আর আমার সন্ধেবেলা ছাড়া যাওয়া হ'তো না) ; একটিমাত্র দাঁড়ানো আলো জ্বলতো তার ঘরে, সেই আলোর সবচেয়ে কাছের আসনে সে, আমি তার একটু মাত্র দূরে (মাঝখানে ছোটো টেবিলে সিগারেটের বাক্স ইত্যাদি), আর ওপাশে, যেন ইংরিজি 'এল' অক্ষরের অন্য প্রান্তে, খানিকটা আবছায়ার মধ্যে অর্চনা। হয়তো ঠিক বলছি না ; হয়তো আমিই সচেষ্টভাবে চোখ সরিয়ে রেখেছি তার দিক থেকে, কিন্তু তখন মনে হ'তো তাকে দেখবার পক্ষে যথেষ্ট আলো নেই, কিংবা হয়তো তাকে দেখার কাজটি এমনই গুরুভার এবং দায়িত্বময় যে সেদিকে মন দিতে গেলে আমি আর একটি কথাও বলতে পারবো না, প্রফুল্লকে এক নিঃসঙ্গতার দ্বীপে পরিত্যাগ করতে হবে। পাৎলা স্যাণ্ডেলের মধ্যে অর্চনার পা দুটি দেখেছি মাঝে-মাঝে ; যখন চা ঢেলেছে তার বাঁকানা আঙুল, কব্জি থেকে ব্লাউজের হাতার ধার অবধি তার বাহু ; কখনো—চলাফেরার সময়—তার গলার আর বুকের খোলা অংশটুকুর উপরেও চোখ পড়েছে আমার : কিন্তু সবচেয়ে অনাবৃত আর সবচেয়ে দ্রষ্টব্য তার মুখটাকেই আমি এড়িয়ে গেছি। আমার পক্ষে সহজ ছিলো প্রফুল্লকে দেখা (সে আলোর কাছে ব'লেও সহজ) ; তার সুন্দর মুখে, তার শান্ত কপালে আমি নিবিষ্ট হ'য়ে দেখতাম সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, সার্থকতার ছবি—অর্চনাকে দেখতে পেতাম সেখানে।

এখানে খুব সাবধানে চলতে হবে আমাকে ; আমার মনের ভাবগুলোকে নির্মলভাবে ধরতে চাই ; যা তখন ভেবেছি, তাব সঙ্গে আমাব এখনকার ভাবনাকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। আচ্ছা...ভেবে দেখি। অবশ্য প্রথম কথাটা এই যে প্রফুল্লর মধ্যে একজন বিবাহিত সুখী পুরুষকে আমি দেখেছিলাম, প্রফুল্লব আর অর্চনাকে মিলিয়ে একটি সুখী দম্পতীকে রচনা করেছিলাম আমার মনে, প্রফুল্ল মুখের কমনীয়তায় অর্চনারই উদ্ভাস দেখেছিলাম। আর তারপরেই বুঝতে পেরেছি আমার ভুল ; মনে পড়েছে প্রফুল্লর মুখ ছাত্রবয়সেও ও রকমই ছিলো ; মনে হয়েছে এদের দু-জনের মধ্যে কেউ যদি কাউকে 'গ ড়ে নিয়ে থাকে, তাহ'লে প্রফুল্লই বোধহয় অর্চনাকে। কিন্তু তাও যদি হয়—কী চমৎকার মানিয়েছে দু-জনকে! স্বামীর প্রভাবে সম্পূর্ণ সায় ছিলো অর্চনার (তা-ই ভেবেছি আমি), তার ভাব-ভঙ্গির অনুকরণ ক'রেও সুখ পেয়েছে সে, আর স্ত্রীর মধ্যে নিজেকে দিতে গিয়ে প্রফুল্লও নিয়েছে তার কাছ থেকে, পূর্ণ ক'রে তুলেছে তার নিজের ব্যক্তিত্ব। মোটের উপর, ঐ দু-জন মানুষ এমন সংবদ্ধ হ'য়ে উঠেছিলো আমার চোখে, পরস্পরের এমন অন্তরঙ্গ, যে একজনকে বাদ দিয়ে আর-একজনকে ভাবতে পারতুম না আমি ; যদি অর্চনা আমাদের খুব উত্তেজিত কথাবার্তার মধ্যেও, নিঃশব্দে উঠে গেছে ঘর থেকে, আমি সেদিকে না-তাকিয়েই তা বুঝতে পেরেছি। আর, ওখানে তার বেশিক্ষণ ব'সে থাকার কোনো সত্যিকার কারণ যদিও ছিলো না, (ও-সব অবাস্তব মতামতের কথা কতক্ষণ ধৈর্য ধ'রে শোনা যায়?) —তবু ঐ আবছায়ার চেয়ারটাতেই সে ব'সে থাকতো রোজ, আর আমিও তার ব'সে থাকাটাই নিশ্চিত ব'লে ধ'রে নিয়েছিলাম।

কখনো সে কথা বলতো না তাও নয়। একদিন—এটা বেশ স্পষ্ট মনে আছে আমার—স্বামীর তর্কটাকে নিজের হাতে নিয়ে ব্যাপারটার সে মোড় ফিরিয়ে দিলে। ভালো আর মন্দ নিয়ে কথা হচ্ছিলো সেদিন। কথা হচ্ছিলো, যাকে আমরা 'প্রতিভা' বলি আর যাকে বলি 'ভালো', তাদের মধ্যে

কোনো সম্বন্ধ আছে কিনা ; যদি থাকে, তার প্রকৃতি কী রকম। আমি অবশ্য প্রথমেই জোরগলায় বলেছিলাম .যে কবিমাত্রেই স্কাউন্ড্রেল—হ্যাঁ, ঠিক তা-ই, জাগতিক অর্থে, সাংসারিক বিচারে ঐ বিশেষণটি উপার্জন করার বিশেষ যোগ্যতা তাঁদেরই আছে, যাঁরা কবি, শিল্পী বা দার্শনিক হিশেবে অমর নাম রেখে গেছেন। 'ভাববেন না'—চওড়া ক'রে হেসেছিলাম এখানে—'ভাববেন না আমি আমার নিজের কথা ভেবেই এ-কথা বলছি—যেমন আমি বেশি কিছু লিখতে পারিনি, তেমনি কুকর্মেও নিচের কেলাশে আছি এখনো, আর আমাদের এই এখনকার কম-জোরের দেশে অন্যায়গুলো পর্যন্ত কেমন মিনিমুখো বামন আকার ধারণ করে সিঁড়ির তলার অন্ধকারে লুকিয়ে-লুকিয়ে কিলবিল করে যেন—না, আমার কথা আমি ভাবছি না, নিজেকে গণ্যই করি না এর মধ্যে—কিন্তু আপনার মুখে যাঁদের নাম শুনি, কথা শুনি, তাঁদেরই জীবনগুলো একবার ভেবে দেখুন না। ঐ আপনার ঝকঝকে শেলফে যাঁদের উপন্যাস, কবিতা, ছবির বই সারি-সারি সাজানো আছে, তাঁরা তেমন মানুষ? কেমন দেবতার পায়ে পুজো দিচ্ছে, বলুন তো. সারা পৃথিবী? কেউ উন্মাদ, কেউ মৃগীরোগী, কেউ উপদংশে জর্জর। কেউ নিজের স্ত্রীকে ময়লার মতো ফেলে দিয়েছে, কেউ বা পরের স্ত্রীকে ময়লা করার পর ফেলে দিয়েছে। স্ত্রী, বন্ধু, প্রণয়িণী, প্রকাশক—কারো সঙ্গেই জোচ্চোরি করতে বাধেনি এদের—কখনো অচেতন, কখনো বা সচেতন আর সুচিন্তিত জোচ্চোরি। কত ঘরে আগুন দিয়েছে, এরা, ধ্বংস করেছে পরিবার, কত নারী আর বালিকার জীবন ছারখার ক'রে দিয়েছে। পাগলামি, মাৎলামি, ব্যভিচার, দায়িত্বজ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞানের অপবিসীম অভাব, সবার উপরে নিজেকেই শুধু সত্য ব'লে জানা এবং বেগতিক বুঝলেই —পলায়ন। এই তো জীবন এই মহোদয়গণের। আর মৃত্যুও তেমনি, সিফিলিসে প'চে, নিজের কান কাটার পর পাগলা-গারদে, নিজের গলায় ক্ষুর বসাবার প্রচণ্ড অট্টহাসিতে।...কিন্তু আপনাকে বলছি কেন এ-সব—' আমি হাত বাড়িয়ে প্রফুল্লর বাক্স থেকে সিগারেট তুলে নিলাম—'আপনি তো সবই জানেন, আমার চেয়ে ঢের বেশি ভালো জানেন আপনি। আমি শুধু এই কথাটা বলতে চাই যে এইজন্যেই "আর্ট" কথাটা শুনলে হাসি পায় আমার—হাসি পায়, আর গা ঘিনঘিন করে। পৃথিবীর সব শিক্ষিত ভদ্রলোক—তাঁরা যে-মানুষকে বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না, রাস্তায় দেখলে শিউরে উঠবেন—সেই রকমই অন্য একজনকে মাথায় ক'রে রাখবেন তাঁরা, যেহেতু সেই অন্য একজন তুলি কিংবা কলম চালাতে পারে! তামাশাটা ভেবে দেখুন!'

আমি কথা শেষ ক'রে ছোট্ট, জোরালো গলায় হেসে উঠলাম। এখন, এই মুহূর্তে, কথাগুলো কাগজের উপর লেখার পর, আমার সন্দেহ হচ্ছে যে এ-সব ব'লে আমি প্রফুল্লকেই আঘাত দিতে চেয়েছিলাম, কেননা উল্লিখিত 'শিক্ষিত ভদ্রলোকে'র সে-ই তো উজ্জ্বল প্রতিনিধি। তার আতিথেয়তা ভোগ করতে এসে—বা করছি ব'লেই —তাকেই বিদ্রূপ করা কি লক্ষ্য ছিলো আমার? না কি এই বক্তৃতার দ্বারা আসলে আমি চেয়েছিলাম—তাকে সাবধান ক'রে দিতে, আমারই বিষয়ে সাবধান ক'রে দিতে? 'আমাকে তুমি বাড়িতে ঢুকতে দিয়ো না, প্রফুল্ল, এখনো আমাকে তাড়িয়ে দাও—' এই কি ছিলো আমার করুণ, উদ্ধত আবেদন?

কিন্তু প্রফুল্ল চুপ ক'রে শুনলো আমার কথা, আমি থামার পরেও তার মুখে কোনো রঙের বদল দেখলাম না। শুধু একটু কৌতুকের হাসি ফুটলো ঠোঁটের কোণে, যখন সে আমার কথার জবাব দিলে। আমার কথায় সত্য নেই তা নয় (সে বললে), কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি আছে ; কতগুলো বাছাই-করা উদাহরণ থেকেই সাধারণ নিয়ম দাঁড় করাচ্ছি আমি। খুঁজলে, উল্টো উদাহরণেরও অভাব হবে না। সুখী, সুস্থির, গার্হস্থ্য জীবন—তার মানেই মনের মৃত্যু নয়, তা থেকেও দামি উপহার অনেক পেয়েছে পৃথিবী। আমি যে সব উদাহরণ ভাবছি সেগুলো পৃথিবীর একটা অংশের একটা যুগের বিশেষ লক্ষণ : গেটে, স্তাঁদাল, বোদলেয়ার, বায়রন, ভ্যান গ—এঁরা ইওরোপের বিশেষ যুগের বিশেষ কতগুলো লক্ষণে আক্রান্ত ; সেই লক্ষণগুলো সামাজিক কারণে উগ্র হ'য়ে উঠেছিলো, আর তারই চরম প্রকোপের নাম বোহিমীয় জীবনপ্রণালী, আর বোদলেয়ার যাকে বলেছেন dandyism—শৌখিনতা, উদাসীনতা, কাজে-না-লাগার গৌরব। উচ্ছৃঙ্খলতার প্রয়োজন ঘটেছিলো

সেই সময়ে—আত্মিক এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজন—কিন্তু সেই যুগ কেটে যাবার পর, সব রকম অবস্থা যখন অনেক বদলে গেছে—তখন আর ছেঁড়া কাপড় আঁকড়ে থাকার মানে হয় না। সেইজন্য সাম্প্রতিক পশ্চিমী লেখকদের মধ্যে (প্রফুল্ল একটু ভাবলো এখানে) বায়রনের মতো 'স্কাউন্ড্রেল' আর হ'লো না, কিন্তু বায়রনের মতোই পরের যুদ্ধে প্রাণ দেবার গরজ দেখা গেলো। আর তাছাড়া আমরা যার জন্য এঁদের ভক্তি করি তা এঁদের ব্যভিচার নয়, এঁদের সৃষ্টি। কত কবিতা, ছবি, মূর্তি আমরা পেয়েছি, যা দেখে মানুষকে সত্যিই দেবতা ব'লে ভুল হয়—কিন্তু তাদের স্রষ্টাদের বিষয়ে কিছুই জানি না আমরা, অনেক সময় নামটা পর্যন্ত না। কিন্তু তাতে কি কিছু এসে যায়? কোনো কাজের মূল্য কি ক'মে গেছে তার জন্য? না কি জীবনের কথা খুঁটে-খুঁটে বের করার যে-বেওয়াজ হয়েছে আজকাল, তাতেই আমরা কাজগুলোকে বেশি ভালোবাসতে শিখেছি? বরং (প্রফুল্ল একটু থামলো), বরং এই জীবনী নিয়ে অত্যন্ত বেশি ঘাঁটাঘাঁটির ফলে এ-রকম একটা ভুল ধারণাও ছড়িয়েছে যে ব্যভিচার থেকেই শিল্পের জন্ম—অর্থাৎ, উচ্ছৃঙ্খল জীবন কাটালেই সরস্বতীর বর মিলতে দেবি হবে না।

'এ-রকম কোনো ধারণা—বিশ্বাস করুন—আমার নেই,' জবাব দিতে দেরি হ'লো না আমার। 'একটি মন, আর একটি কলম, এই দুয়ের সংযোগের ফলেই লেখা হয়, তা আমি জানি। আর-কিছুরই কথা ওঠে না সেখানে ; সে কেমন মানুষ, বিয়ে করেছে কিনা, প্রাসাদে না কুঁড়েঘরে থাকে, অম্বল, অজীর্ণ, পিত্তশূল প্রভৃতি ব্যাধি তার আছে কি নেই—এই সব কথাই সেখানে অবান্তর। আর কিছুই থাকে না, শুধু কাজটাই থাকে। কিন্তু সেই কাজের সঙ্গে জীবনের কোনো সম্বন্ধ নেই তা-ই বা কেমন ক'রে বলি। যা-ই বলুন না, একজন জীবিত মানুষই তো ছবি আঁকে, কবিতা লেখে—মৃতেবা নয়। কেন এমন হয় যে একজনের জীবন তাকে কবিতা লেখার দিকে ঠেলে দেয়, আর তারই আশে-পাশে একই সময়ে লক্ষ-লক্ষ জীবিত মানুষ সেই কবিতা পড়তে পর্যন্ত চায় না?'

'এরই নাম সহজশক্তি, প্রতিভা। সেই শক্তি কোথা থেকে আসে আমরা জানি না। কোনো-কিছুরই আদিহেতু জানি না আমরা।'

'আদিহেতু নিয়ে ভাবনাও নেই আমাদের। আপনি যাকে সহজশক্তি বললেন, ধ'রে নেয়া যাক সেটা 'ঈশ্বরমশাই দান করলেন,' এই ব'লে আরম্ভ ক'রে আমি এলোমেলো অনেক কথা ব'লে গেলাম। কিন্তু ঈশ্বর তো ধানের গোলা উপহার দেন না (এই হ'লো আমার কথা)—এক টুকরো জমি দিয়ে বলেন, 'চাষ ক'রে খাও।' সেই মেহনতের তাগিদ জোটে কোথা থেকে? সেই এক টুকরো জমি—অনেক সময় ছোট্ট জমি—তাই আঁকড়ে প'ড়ে থাকার অস্বাভাবিক ইচ্ছেটা মরে না কেন? পৃথিবীতে কত আরামের কাজ, বড়ো-বড়ো কাজ করবার আছে। মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজদূত, নিদেনপক্ষে মোটা বেতনভোগী কর্মহীন সৈনিক, নিদেনপক্ষে আপিশের বড়ো সাহেব, নিদেনপক্ষে পান-চিবোনো, দিনে-ঘুমানো, তাস-পেটানো মধুর গার্হস্থ্য। এ-সবের বদলে, বা এগুলোকে আমল না-দিয়ে—একটামাত্র ঘরের মধ্যে বন্দী হ'য়ে, পৃথিবীর বিচিত্র আহ্বান উপেক্ষা ক'রে, একটানা একঘেয়ে, অকৃতজ্ঞ খাটুনি কোন মোহে খেটে যায় কোনো-কোনো মানুষ—দিনের পর দিন, বছরের পর বছর? এবং সেই খাটুনির যা ফল, তার দিকে ঠিক এই মুহূর্তে বেশি কেউ তাকিয়ে দেখবে না, তা জানতে পেরেও সে কাজ থামায় না, এই আশ্চর্য ঘটনারই বা কারণ কী?

'এর উত্তর দিতে আমি চেষ্টা করবো,' নরম আওয়াজে কথা বললো প্রফুল্ল। 'দুটো জিনিশ কাজ করে মনের মধ্যে : অর্থের লোভ অথবা প্রয়োজন, আর যশের আকাঙ্ক্ষা। অনেক বড়ো কাজেরই পিছনে ছিলো হাঁড়ি চড়াবার তাগিদ বা চড়া দামে বেচে দেবার সুযোগ। সকলেই যে বেঁচে থাকতে উপেক্ষা পেয়েছেন তাও তো নয় ; অনেকের বেশ পসারও হয়েছে। যাঁদের হয়নি তাঁরা চেয়েছেন উত্তরকালের কাছে সম্মান—অর্থাৎ অমরতা—সেটা পাবেন ব'লেও মনে-মনে জেনেছেন হয়তো, উদাস পৃথিবীর উপর এমনি ক'রেই প্রতিশোধ নিয়েছেন। এর একটাকেও মহৎ উদ্দেশ্য বলা যায় না—বরং বলা যায়, যে-কারণে সুদখোর টাকা খাটায় সেই কারণেই কবি তাঁর কবিতা লেখেন।

শেষের কথাটা বলেছেন হাল আমলের এক জর্মন দার্শনিক। লাভের আশায় ছাড়া কেউ কোনো কাজ করে না পৃথিবীতে—সেই লাভের চেহারা যেমনই হোক না। সাংসারিক সুখটাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেন যাঁরা, তাঁরা চান মৃত্যুর পরে অমরতা ; অস্তিত্ব সুদ্ধু বিকিয়ে দিয়ে নিজের দেহচ্যুত তুচ্ছ নামটাকে এতই ভালোবাসেন তাঁরা। অর্থাৎ, নিজেকে অত্যন্ত বেশি ভালো না-বাসলে, অত্যন্ত বেশি দাম্ভিক আর স্বার্থপর না-হ'লে, সত্যিকার শিল্পী হওয়া যায় না।'

'কিন্তু যাঁরা ঈশ্বরের জন্য সব ছেড়েছেন'—হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরোলো—'তাঁদেরও কি তা-ই বলবেন আপনি?'

'শিল্পীরা যা হ'তে চান,' জবাব দিতে এক মুহূর্ত দেরি হ'লো না প্রফুল্লর, 'কিন্তু পুরোপুরি কখনোই হ'তে পারেন না, সন্ন্যাসীরা তা-ই। বুদ্ধ স্ত্রী-পুত্রকে ত্যাগ করেছিলেন, সেই শিল্পীর পক্ষে সম্ভবপর, কিন্তু কোনো মারকন্যার দ্বারা আক্রান্ত হ'লে শিল্পীর কী অবস্থা হ'তো, অজন্তার ছবিতেই তার প্রমাণ র'য়ে গেছে। সেই মোহিনীর প্রতি বুদ্ধ যতই উদাসীন থাকুন, শিল্পী তার প্রেমে না-পড়লে অমন রূপের সৃষ্টি হ'তো না। আঁদ্রে জীদ ঠিকই বলেছেন, শিল্পী হ'তে হ'লে শয়তানের পরামর্শ চাই।'

'কী বললেন? শয়তানের পরামর্শ?' —উৎসাহে আমার গলার আওয়াজ নিজের কানেই কর্কশ শোনালো—'খুব ভালো বলেছে তো কথাটা —চমৎকার! ঠিক! —শয়তান! —যে-শক্তি একটা মানুষকে এক দণ্ডের জন্য শান্তি দেয় না, ঝুঁটিতে ধ'রে দিগ্বিদিকে নাচিয়ে বেড়ায়, তাকে শয়তান ছাড়া আর কী বলা যায়? তাহ'লে এই বোঝা গেলো —আমার আগের কথাতেই ফিরে আসছি আমি —যে শিল্পী মানেই স্কাউন্ড্রেল, সাংসারিক অর্থে, সামাজিক অর্থে স্কাউন্ড্রেল। আপনি বললেন পশ্চিমী দেশের উচ্ছৃঙ্খলতার কতগুলো ঐতিহাসিক কারণ ছিলো, এখন সে-যুগ কেটে গেছে—আমি তা জানি না, আমি পুঁথিপত্র পড়িনি—কিন্তু এটা আমি হাড়ে-হাড়ে টের পাই যে শিল্পী কখনো "ভদ্রলোক" হ'তে পারে না, আকারে-প্রকারে চলনসই বা নিখুঁত অভিনয় কবলেও মনটা বুড়ো বয়স পর্যন্ত দগদগে কাঁচা থেকে যায়। সে যদি ইস্ত্রি-করা জামা পরে, পরিপাটি চুল আঁচড়ায়, যোগ্য চাকুরে হ'য়ে বেতনবৃদ্ধির ধাপে-ধাপে উন্নীত হয়, যদি—এমনকি স্বামী, পিতা, নাগবিক প্রভৃতি পার্টে অনার্স নিয়েও পাশ ক'রে যায় সে—আমি মানছি এর কোনোটাই অসম্ভব নয়—তবু বুঝে নিতে হবে এগুলো সবই তার ছদ্মবেশ, তার নিপুণ অভিনয়—এক প্রতিকূল, ক্ষমাহীন, পরিব্যাপ্ত জগতেব মধ্যে তার নিজের সত্তা টিকিয়ে রাখার জন্য একটা নতুনতর কৌশল মাত্র। হয়তো কৌশল হিশেবে ব্যভিচারের চেয়ে আরো বেশি কার্যকরী এটা—আধুনিক কবিদের কিছুটা স্বেচ্ছাকৃত দুর্বোধ্যতার মতো—লোকেরা ঠিক ধরতে পারে না ব্যাপারটা কী, পার্টিতে দেখা হ'লে তাদেরই একজন ব'লে ভুল করতে পারেও বা, মুখোমুখি লড়াই এড়িয়ে কিছু সময়, কিছু উদ্যমও বাঁচানো যায়। কিন্তু সেই ভদ্রবেশী মানুষটি রচনা—তার সঙ্গে তার আপাতনির্দোষ জীবনযাপনের মিল কোথায়—সেই রচনাকে হ'তেই হবে সমাজবিরোধী, সংসারবিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী—অন্তত সে-সব বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও উদাসীন ; ঐ সব বৃহৎ, হিতকর প্রতিষ্ঠান, যার আশ্রয়ে মানুষ খেয়ে-প'রে ঘব বেঁধে ছানাপোনা পুষে বেঁচে থাকে, আর বংশানুক্রমে মাছির মতো জন্মায় আর জন্ম দেয় আর ম'রে যায়—তার সঙ্গে —এই আপনি যাকে "আর্ট" বলেন, তার কোথায় কী সম্বন্ধ আছে বলুন তো? ডাইনি-পুরুৎ মন্তর-তন্তরের দিন কবে শেষ হ'য়ে গেছে—মানুষের সমস্ত জীবনের সম্পূর্ণ ভার নিয়েছে বিজ্ঞান—তবু আর্ট কেন? কিছুতেই প্রমাণ করতে পারবেন না যে খুব ভালো কবিতা লিখে একটি কণা শস্য জন্মানো যায়, কখনোই দেখতে পারবেন না যে "ফসল বানাও" প্রপ্যাগাণ্ডার জন্য কোন সরকারি মাইনে-করা কবি ভালো কবিতা লিখেছেন। হয় কবিতা হয়নি, নয় কাজ হয়নি। তাহ'লে—এই যে কতগুলো লোক ঘরে ব'সে-ব'সে ছবি আঁকছে বা কবিতা লিখছে—যাদের নিয়ে মাতামাতি ক'রে আমরা কয়েকজন দেশের উন্নতির চেষ্টা করতে ভুলে যাচ্ছি—সেই লোকগুলোকে খারাপ ছাড়া আর কী বলা যায়, শুধু অকেজো নয়, রীতিমতো খারাপ, যাকে বলে evil—এই

দেখুন না, "evil" কথাটার কোনো প্রতিশব্দ নেই, এমনি মিনিমিনে আমাদের ভাষা।'

ঝোঁকের মাথায় কথা বলছিলাম, একসঙ্গে এত কথা আগে কখনো বলিনি, তবু ফাঁকে-ফাঁকে মনে হচ্ছিলো দূর থেকে কেউ আমাকে দেখছে। দূর থেকে, অন্ধকারের ভিতর থেকে এক জোড়া চোখ। এক কালো অথচ স্বচ্ছ পরদার আড়াল থেকে। মুহূর্তের জন্য অস্বস্তি বোধ করলাম, কিন্তু চোখের সামনে প্রফুল্লর স্নিগ্ধ মুখশ্রী ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না। আমার দিকে তাকিয়ে আমার শেষ কথাটার জবাব দিলে। বললে, 'আমাদের ভাষায় 'evil' কথাটার প্রতিশব্দ নেই, কেননা ভারতীয় হিন্দু evil-এর অস্তিত্বটাই স্বীকার করেনি। কথাটাকে তাঁরা 'না' দিয়ে বলেছেন : অশিব, অমঙ্গল ইত্যাদি। তার মানে—ভালোই সব, খারাপটা অভাবমাত্র। 'দেখুন না আমাদের "সৎ" কথাটা; যা আছে তা-ই সৎ, আবার সৎ মানেই ভালো, এবং সত্যের সঙ্গেও তার সম্বন্ধ রয়েছে।'

কথাটা শোনামাত্র আমার মেজাজ খারাপ হ'য়ে গেলো। মনে হ'লো, জীবনের আসল দ্বন্দ্ব এড়াবার জন্য খুব দুর্বল আর অক্ষম গোছের কারসাজি এটা। আর এটার উপরেই নির্ভর ক'রে মহাভারত লেখা হয়েছিলো এ-কথা মেনে নিতেও আমার প্রবৃত্তি হ'লো না। 'তাহ'লে—' আমি বললাম—'তাহ'লে শিবের সঙ্গী ভূত প্রেত পিশাচ কেন? আর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কেন জুয়ো খেলে দ্রৌপদীকে সুদ্ধ বিকিয়ে দেন? কেন কৃষ্ণ—যিনি স্বয়ং ভগবান—তাঁকে জানোয়ারের মতো ব্যাধের তীরে মরতে হয়? দেবতাদের নিজেদের মধ্যে এত বিরোধ কেন? আর কেনই বা অর্জুনের কানে আঠারো সর্গ গীতা জপানো হ'লো—যাতে সে মারতে পারে, মানুষ মারতে পারে?'

'এই কথাটা বোঝাবার জন্য যে দেহ নিয়ে জন্মালে সবই করতে হয়, ভালো-মন্দ কোনোটা থেকেই নিস্তাব নেই। জীবনের মরণশীলতা বোঝাবার জন্য। কিন্তু এই মরণশীল ক্ষণিকের বাইরে চিরন্তনের ধারণাটাও ছিলো।'

'দয়া ক'রে "অমৃতের পুত্র" বুলিটা আর আওড়াবেন না!' আমি হাত তুলে উঠে দাঁড়ালাম চেয়ার ছেড়ে—'অনেক, অনেক হয়েছে —আব চাই না শুনতে! কে বলেছে, অমৃতের পুত্র? কে বলেছে, একপাল বলিব পাঁঠা নয়?' কথাটা ব'লেই মনে হ'লো সেই দূরের চোখ তীক্ষ্ণ হ'য়ে বিদ্ধ করেছে আমাকে, মাঝখানকার পরদাটা শুধু স্বচ্ছ নয়, আমিও যেন স্বচ্ছ হ'য়ে গেছি সেই চোখের সামনে। একটু থেমে, একবার ঢোঁক গিলে, জোর ক'রে কথার তোড় চালিয়ে গেলাম, মনে হ'লো এমনি ক'রেই পরদা ছিঁড়ে শত্রুকে ঘায়েল করতে পারবো। "অন্ধকারের পরপারে সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষকে আমি দেখেছি"— কে দেখেছে? প্রমাণ কী তার? কেউ একজন এ-কথাটা ব'লে গেছে ব'লেই তো সেটা অভ্রান্ত হ'লো না। আমার অবাক লাগে ভাবতে যে এত বড়ো একটা ফাঁকি যুগ-যুগ ধ'রে চ'লে আসছে—আর আপনাদের রবীন্দ্রনাথ তারই চর্বিতচর্বণ ক'রে গেছেন!'

'একেবারে ফাঁকি হ'লে যুগ-যুগ ধ'রে চলতো না। তেষ্টা পায় মানুষের, সেই তৃষ্ণাতেই প্রমাণ। আপনারও আছে তৃষ্ণা, তা না হ'লে আপনিও এত কথা বলবেন কেন?'

কথাটা শুনে আঘাত লাগলো আমার, মোটা গলায় হেসে উঠলাম —'আপনার কথার অর্থ এই রকম দাঁড়ায় যে মানুষ যেহেতু ভূতের ভয় করে সেইজন্য ভূত নিশ্চয়ই আছে। আগে ভয় পেয়ে, সেই ভয়ের তাড়ায় অনেকে তো ভূতও দেখে ফেলে : তেমনি কোনো নেশা বা মৃগীরোগের ঝোঁকে হঠাৎ একজন আদিত্যবর্ণ পুরুষকে দেখে ফেলতেই বা দোষ কী। দেখাটা অবশ্য ভাবার্থে বলছি। মনটাকে ঠিকমতো গাঁজিয়ে তুলতে পারলে একটা বীভৎস কালীমূর্তির মধ্যেও পরম ব্রহ্মকে দেখা যায়। মানে—আমি বলতে চাই—ও সব তৃষ্ণা-টৃষ্ণা কিছু নয় —সবই নেশার তেষ্টা আসলে —হোক শ্যাম্পেন, হোক পচাই—মানে, সেই হান্স আণ্ডেরসনের রাজার পোশাকের গল্প আরকি—কেউ বোকা বনবে না—আর সেইজন্যেই—'

কথাব খেই হারিয়ে হঠাৎ থেমে গেলাম আমি। আমার অস্বস্তি চরমে উঠেছে ততক্ষণে : সেই চোখ যেন নিঃশব্দে শোষণ ক'রে নিচ্ছে আমার কথা, সেই সঙ্গে আমাকেও, নিঃশব্দ, নিষ্পলক চোখ, তার কাছে কী আমি বলতে চাই তা আমি জানি না। মুহূর্তের জন্য ঘবটা যেন অস্বাভাবিকরকম

স্তব্ধ হ'য়ে গেলো, আমি দেখলাম প্রফুল্লর ঠোঁট ন'ড়ে উঠলো, কিন্তু কোনো কথা বেরোতে পারার আগেই ঘরের অন্য দিক থেকে ভেসে এলো অন্য গলায় খুব নিরীহ, ছোট্ট একটা প্রশ্ন :

'—আপনি গান ভালোবাসেন?'

সেই গলার আওয়াজে একটা বিদ্যুতের স্রোত ব'য়ে গেলো আমার শরীরে, রোমাঞ্চিত হ'য়ে কেঁপে উঠলাম। ঘরের কম আলোর অংশে চোখ ফেললাম এবার, ঝ'রে-পড়া শাড়ির আঁচল দেখলাম, গালের ডৌল, শান্ত কপাল, কিন্তু চোখের কাছাকাছি চোখ নিয়ে যেতে সাহস হ'লো না। হঠাৎ খেয়াল হ'লো, আমি এখনো দাঁড়িয়েই আছি। ব'সে, নিজেকে সামলে নিয়ে, কেমন ক্লান্ত, ভারি গলায় বললাম, 'না, আমি গান ভালোবাসি না।'

'শুনতে ভালো লাগে না?'

'লাগে—যদি দূর থেকে হঠাৎ ভেসে আসে। ব'সে শোনার ধৈর্য থাকে না।'

'আচ্ছা, একটা গান শুনুন। একটা রেকর্ড—অল্পক্ষণই লাগবে—কেমন লাগে বলবেন।'

অর্চনা উঠে গেলো রেডিওগ্রামের কাছে। আমি হঠাৎ বললাম, 'আপনি থাকতে রেকর্ড শুনবো কেন।'

'আমি তো গাইতে পারি না।'

'গাইতে পারেন না এমন কোনো মহিলা আজকাল আছেন নাকি বাংলাদেশে?'

বেশ অভদ্র শোনালো আমার কথাটা, প্রফুল্লর মুখে ক্ষণিকের জন্য ছায়া প'ড়ে তখনই মিলিয়ে গেলো। অর্চনা বললে, 'মহিলাদের বিষয়ে আপনার বেশ উঁচু ধারণা দেখছি। কিন্তু আমি গাইতে পারলেও আপনাকে শোনাতুম না।'

'কেন? আপনার গান শুনে হয়তো গান বিষয়েই মত বদলে যেতো আমার। যেমন, আপনাকে দেখার পর, মহিলাদের বিষয়ে আমার ধারণা বদলে গেছে।'

ঠিক বুঝতে পারলাম না, কিন্তু অর্চনা যেন কেঁপে উঠলো মুহূর্তের জন্য—বিতৃষ্ণায় কেঁপে উঠলো। পিঠের উপর লাল রঙের শাল তুলে দিয়ে সে তার মনোমতো রেকর্ডটি বেছে নিলে। 'দেখুন তো—এ-গানটা শুনতে পারেন কিনা। অবশ্য রেকর্ডের প্রাণ নেই—আপনি না-শুনলেও সে কিছু মনে করবে না—এটা মস্ত সুবিধে।' রেকর্ড চললো : 'দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল-আলোক, তবে তা-ই হোক—' এই গান শুনলাম গ্রামোফোনে।

'শুনলাম' কথাটা এক আঁচড়ে লেখা হ'য়ে গেলো, কিন্তু আসলে ঐ শোনার কাজটি বেশ জটিল হ'য়ে উঠেছিলো আমার পক্ষে। প্রথমতম আরম্ভেই যেন ধাক্কা দিয়ে একটি দরজা খুলে দিল বুকের মধ্যে। তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠলো আমার অনুভূতিগুলো, প্রায় অসহ্যরকম তীক্ষ্ণ : প্রতিটি ছোটো-ছোটো শব্দের চেতনা আমার মনে বহুগুণ বর্ধিত হ'য়ে অনেকক্ষণ ধ'রে চলতে লাগলো—স্লো মোশন ফিল্মে যেমন আমরা ঘোড়ার একবারের পা তোলার ছবিটাই এক মিনিট ধ'রে দেখি—গানটার সম্পূর্ণ আবেদন নির্দয়ভাবে আছাড় মারলে আমাকে, অথই জল থেকে মুখ তোলা মাত্র আবার যদি কেউ ডুবিয়ে দেয় তখন যেমন দম ফেটে যায়, তেমনি মনে হ'লো আমার যখন কথাগুলো ঘুরে-ঘুরে ফিরে এলো—সেই আড়াই বা তিন মিনিট সময় যেন অন্তহীন হ'য়ে উঠলো আমার কাছে। আমি বুঝতে পারলাম গানটা একটা ইচ্ছে মাত্র—বা একটা প্রার্থনা—আর প্রার্থনার কোনোই মূল্য নেই—কেউ বলছেন ব'লেই দুঃখের মধ্যে মঙ্গল-আলোক জ্বলবে না—কোনো কথাই বলা হয়নি ওতে ; বুঝতে পারলাম কবিতা হিশেবে রচনাটা কত দুর্বল আর মামুলি, মনে-মনে বললাম, 'এই রকম কবিতা লিখতে রবীন্দ্রবাবুর আত্মসম্মানেই আঘাত লাগা উচিত ছিলো'—কিন্তু কিছুতেই পারলাম না সুরের সেই অসার, গম্ভীর একঘেয়েমি থেকে কান কিংবা মন সরিয়ে নিতে। আমাকে ক্লান্ত ক'রে দিয়ে তবে শেষ হ'লো গানটা, আমার মনে হ'লো মস্ত একটা কুস্তি ক'রে উঠলাম, আর সেই কুস্তিতে প্রতিপক্ষ আমাকে অন্যায়ভাবে কোমরের নিচে মেরে দিয়েছে। হ্যাঁ, অন্যায়—আজও আমি বলবো সে-কথা—এই রকম গান মানেই জুলুম, জবরদস্তি, অন্যায়, যাকে বলে হাতে-পায়ে

বেঁধে পিটোনো।

এই গানে এক নতুন অধ্যায়ের আরম্ভ ; অর্চনার জগতে সেই আমার প্রবেশিকা। প্রফুল্লর জগৎটা, নৈর্ব্যক্তিক ব'লেই, আমার পক্ষে আরামের ছিলো ; কিন্তু অর্চনা আমাকে আস্তে-আস্তে যেখানে নিয়ে এলো (কিংবা আমি আনীত হ'তে রাজি হলাম), সেখানে জীবন নামক বর্বর ব্যাপারটাকে ভুলে থাকা যায় না। তাতে অবশ্য আমার মনে বিরুদ্ধ ভাবই জেগে উঠলো প্রথমে—কেননা আমার জীবনটা কিছু প্রীতিকর পদার্থ নয়—কিন্তু এই ভাবে অর্চনার জীবনেও অংশ নেবার অধিকার পেলাম আমি, ওদের দু-জনের যৌথ জীবনেও। কথাবার্তার ধরন বদলে গেল ; প্রফুল্ল আর আমি, নানারকম তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে, যে-সব এলোপাথাড়ি কথা বলেছি এতদিন, তার বদলে দেখা দিতে লাগলো ঘরোয়া আলাপ, লোকে যাকে বলে 'গল্প করা,' সেই সব খুঁটিনাটি তুচ্ছতার বিনিময়, যার ব্যবহারে উপন্যাসের চরিত্র জীবন্ত হ'য়ে ওঠে আর বাস্তবের মানুষ হৃদয়ে স্থান পায়। সেই একটা সময়, যখন আত্মার উপর দেহের জয় ঘোষিত হয়েছিলো আমার কাছে, মূর্তের কাছে অমূর্তের, প্রাণের কাছে মনের পরাভব ; যখন আমি বুঝেছিলাম একজন মানুষের সাহিত্যিক বা আধ্যাত্মিক রুচির ঘনিষ্ঠ হ'য়েও আমরা সত্যিকার অর্থে ততটা তাকে পাই না, যতটা পাই অন্য একজন মানুষকে তার জীবনের খুব ছোটো একটা তথ্য জানলে। একদিন অন্য কী-একটা কথার সূত্রে প্রকাশ পেলো যে অর্চনা ছেলেবেলায় একবার নারানগঞ্জে ছিলো। এই খবরটা অদ্ভুতভাবে নাড়া দিলো আমার মনে—আমি তাতে নিজেই অবাক হলাম—পাটের গুদোম আর রেলের এঞ্জিনে ভর্তি নোংরা নারানগঞ্জ, সেই সহরটার প্রতি হঠাৎ একটা প্রবল ঔৎসুক্য অনুভব করলাম আমি ; তার বিষয়ে আমার সব চাপা-পড়া স্মৃতিগুলোকে হাৎড়ে-হাৎড়ে টেনে তুললাম মনের সামনে ; দেখতে পেলাম এমন কিছু খাবাপ ছিলো না জায়গাটা, শীতলক্ষ্যায় সিঁড়ি-নেমে-আসা মজার বাড়িও ছিলো দু-একটা, আর অন্তত একটা রাস্তা, যাতে ঝাউয়ের ডাল শোঁ-শোঁ করে সারাদিন। খুঁটে-খুঁটে অনেক কথা জিগেস করলাম তাকে ; কোন বছরে ছিলো, বাসা ছিলো কোন পাড়ায়, কতদিন ছিলো সেখানে। ভালো মনে পড়ে না—তবে প্রথম যুদ্ধ শেষ হ'লো সেবার, ছেলেমেয়েদের স্কুলে খুব কমলালেবু খাওয়ানো হচ্ছে, তারা বাবা সেখানে এস.ডি.ও. ছিলেন, তার বয়স তখন বছর ছয়েক। যুদ্ধ শেষ হয়েছে? শীতকাল? আমিও একবার নারানগঞ্জে গিয়েছিলাম তখন—ঠিক সেই সময়েই—আমাব বয়স তখন এগারো কি বারো, আমার এক পিসির বাড়িতে মাসখানেক ছিলাম। এই যে ঘটনাটা—অর্চনা আর আমি যে ছেলেবেলায় একই সময়ে একই শহরে ছিলাম কিছুদিন—হয়তো পরস্পরকে চোখেও দেখেছি, রাস্তায় গা ঘেঁষেও গিয়েছি কখনো, শুনেছি একই স্টিমারের ভেঁপু আর ট্রেনের গুমগুম আওয়াজ—এই এতদিন পর্যন্ত একেবারেই অজ্ঞাত ঘটনাটায় যেন জীবনের একটা হারানো রত্নকে মুঠোর মধ্যে ফিরে পেলাম আমি।

এই তার কথা বলার ছাঁচ ; খুব সহজেই জীবনের গল্প উঠে আসে তার মুখে ; রাওলপিণ্ডি শহরটার হয়তো বর্ণনা দিলে একদিন, তার এক পাগলাটে দাশু-মামার কাহিনী শোনালে, দু-দিনেব জন্যও কোথাও যেতে হ'লে সঙ্গে নেবার বই বাছাই করতে প্রফুল্ল কতটা সময় খরচ করে তা-ই নিয়েই বললে খানিকক্ষণ। অন্য নানা কথার ফাঁকে-ফাঁকে এগুলো যেন আলগোছে বোনা হ'য়ে যায়—তার গলায় দোলা দেয় কৌতুক আর অবসর ; তার বসার জায়গা বদল করে না, স'রে আসে না ছায়া থেকে স্পষ্টতায় (কিংবা আমার চোখই সেটা নিতে পারে না হয়তো)—কিন্তু কান দিয়ে তার কণ্ঠস্বর শুনে-শুনে আমার মনে হ'তে থাকে আমার আর-কোনো কাজ নেই, ভাবনা নেই, ক্লান্তিও নেই—একটা শুভ্র, সজাগ বিশ্রামের মধ্যে মিশে আছি যেন। যখন প্রফুল্লর কথা কিছু বলে তখনই সবচেয়ে ভালো লাগে শুনতে (প্রফুল্ল চোখ তুলে তাকায়, নরম ক'রে হাসে, তাকে বলতে দেয়) ; বইয়ের দিকে তার দুরন্ত ঝোঁক (বাথরুমেও একটা বইয়ের শেলফ বাখা চাই তার) শুধু নিজেই পড়বে না, অন্যকেও না-পড়িয়ে তার শান্তি নেই, দিল্লিতে এক-একজন ভালোমানুষ ভদ্রলোককে অস্থির ক'রে তুলেছে ; যদি সে নিজে এখনো লিখতো তাহ'লে বিষয়টার দিকে এমন

অস্বাভাবিক আকর্ষণ হয়তো থাকতো না, সত্যি তার আবার লেখা উচিত। আমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে (এ-ই হ'লো অর্চনার মত) প্রফুল্ল একজন কথা বলার মতো মানুষ পেয়েছে এতদিনে।

'কিন্তু কথা বলার মানুষের অভাব কী—আপনি থাকতে?'

' "মানুষে"র মধ্যে ঘরের লোককে ধরতে নেই।'

'ওটা হ'লো বিনয়ের কথা। বা নিয়মের কথা।'

'আমি তো নিয়মটা এই রকমই জানি যে সব চাহিদা এক জায়গায় মেটে না,' ব'লে অর্চনা তার স্বামীর মুখে চোখ রাখলো মুহূর্তের জন্য। তার সেই দৃষ্টিতে, আর তার মুখের প্রত্যেকটি কথায় আমি বুঝেছি স্বামীর প্রতি তার শ্রদ্ধা আর অনুরাগ কত গভীর। নিজেকে সে এমনকি একটু আড়ালেই রাখতে চায়, যাতে প্রফুল্লর মনের স্বাধীনতায় ব্যাঘাত না ঘটে কখনো। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও দেখতে পেয়েছি যে তার অনুরাগের মধ্যে অনেকখানি আছে স্নেহ। আর এতেই আমি গোপন একটা সুখ পেয়েছি, কেমন একটা আশা মনের মধ্যে : ভেবেছি, যে-মেয়ে তার স্বামীকে স্নেহ করে, সে কখনো সত্যি-সত্যি তৃপ্ত হ'তে পারে কি?

এ-সব কথার প্রতিদানে, আমার দিক থেকে, আমি অবশ্য কিছুই বলতে পারিনি। আমার পক্ষে আমার বাবার কথা বলা অসম্ভব, মা-র কথা বলা অসম্ভব, স্ত্রীর কথা বলা অসম্ভব। এই শেষের প্রসঙ্গটা নিয়ে একটু মুশকিল হয়েছে প্রথম দিকে। তারা আমাকে সস্ত্রীক আসবার জন্য অনেকবার বলেছে (কেননা ভব্য সমাজে সেটাই নিয়ম), আমি নানা ছুতোয় এড়িয়ে গেছি। অবশেষে একদিন বলতে বাধ্য হলাম, 'যদি আমারই জন্য আমাকে চান তাহ'লেই আমি আসতে পারি।' হেসে বলেছিলাম—কিন্তু ও কথার মানে কে না বোঝে। দু-জনে একটু চুপ ক'রে থাকলো কথাটা শুনে, আমার দিকে বা পরস্পরের দিকে তাকালো না, তারপর প্রফুল্ল অন্য কথা পাড়লো। তারপর থেকে আমার স্ত্রীর বিষয়ে আর কোনো উল্লেখ করেনি তারা। আমি আরো ঘন ঘন যেতে লাগলাম, এবং আরো স্বচ্ছন্দভাবে।

এই দু-তিন মাস সময়—প্রফুল্লর সঙ্গে দেখা হবার পর প্রথম কিছুদিন—আমার জীবনে এটাকে সব চেয়ে 'সুখের' ব'লে ধরা যেতে পারে। এই একটুখানি ক্ষণস্থায়ী বিরতি আমার—যখন আমি যন্ত্রণাভোগ না ক'রেও ভালোবেসেছি। ভালোবেসেছি প্রফুল্লকে, আর অর্চনাকে। এমনকি তাদের পরস্পরের ভালোবাসাকেও ভালোবেসেছি। এত কাছাকাছি এলাম তিনজনে যে সব সময় কথা বলারও আর প্রয়োজন হয় না। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তর্ক বাধে না আর—শুধু মাঝে মাঝে রেকর্ডে তাঁর গান শুনি। অর্চনা আর আমি যখন কথা বলি, প্রফুল্ল বই খুলে বসতেও দ্বিধা করে না—তার একটা কারণ যে-সব গল্প আমার কাছে নতুন তার সবই জানা কিংবা বহুবার শোনা। অর্চনার কথায় বাধা দেয় না সে, তার মুখের গল্পটাকে নিজের মতো ক'রে বলতে যায় না ; হয়তো, বলা শেষ হ'লে, কোনো হাসি-মাখা মন্তব্য করে। রাত্রে একেবারে খেয়ে যাই মাঝে-মাঝে, তারপর (অবশেষে, এত শিগগির!) রাস্তায় বেরিয়ে ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারে ঘুরে-ঘুরে বেড়াই। ভাবি—কিছুই ভাবি না। হয়তো আমাকে অসুখী জেনে ওরা আশ্রয় দিয়েছে, আমার অপমানিত বোধ করা উচিত, প্রতিদান দিতে না-পারলে আতিথেয়তা নেয়া উচিত না, হয়তো আমি অসহায়ভাবে অধীন হ'য়ে পড়ছি ওদের—এ-সব কোনো কথাই আমার মনে পড়ে না তখন। প্রফুল্ল আমার, আর আমার জীবন ওদের জীবনের, কত বিপরীত, সে-কথাও তখনকার মতো ভুলে থাকি। কোনো জাদুমন্ত্রে আমিই যেন প্রফুল্ল হ'য়ে যাই, অর্চনাকে নিয়ে উষ্ণ হ'য়ে-ওঠা তার শয্যার তাপ ছড়িয়ে পড়ে আমার শরীরে। এই রকম কোনো-কোনো সময়ে মদ খাবার ইচ্ছেও আর জাগেনি আমার—অনেক বড়ো আর অন্ধকার রাত্রিটাকেই যথেষ্ট মনে হয়েছে।

কিন্তু আমি অবশ্য তখন জানতাম যে এর পর আরো আছে।

দশ

একদিন গিয়ে দেখি, প্রফুল্ল একলা ব'সে একটা ফরাশি ভাষার মাসিকপত্রের পাতা ওল্টাচ্ছে। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট কাটলো, প্রফুল্ল একজন ফরাশি চিত্রকরের বিষয়ে বলতে শুরু করলে, কিন্তু আমার কানে ফাঁকা শোনালো তার কথাগুলো, আর প্রফুল্ল—যাকে আমি নিজের মধ্যে সম্পূর্ণতার জন্য তারিফ ক'রে এসেছি বরাবর—তাকে একটা ভাঙা টুকরোর মতো মনে হ'লো আমার। একটু পরে আমি জিগেস করলাম, 'মিসেস রায়কে দেখছি না?'

'তাঁর শরীরটা তেমন ভালো নেই আজ।'

'অসুখ করেছে!' বলামাত্র আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমার কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক উদ্বেগ ফুটেছিলো নিশ্চয়ই, আমি বুঝলাম প্রফুল্ল চুপ ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু মুহূর্তেরই জন্য। তারপর সেও উঠে দাঁড়িয়ে বললে—'তেমন কিছু না। আসুন।' পর্দা সরিয়ে আমাকে নিয়ে এলো তাদের শোবার ঘরে।

আর সেখানে আমি অর্চনাকে প্রথম দেখলাম।

জোড়া খাটের একটাতে শুয়ে আছে সে, গায়ে আঁটো উলের হলদে রঙের ব্লাউজ, কোমর অবধি সোনালি কম্বলে ঢাকা, কিন্তু পায়ের পাতা দুটি বেরিয়ে আছে। মাথার চুল ফাঁপা, চোখ লালচে আর ঈষৎ ফুলে-ওঠা, নাকের বাঁশিও তা-ই।

কাৎ হ'য়ে বই পড়ছিলো ; প্রফুল্ল বললে, 'ইনি একবার দেখতে এলেন তোমাকে। উঠো না, শুয়ে থাকাই দরকার তোমার।'

'বসুন।'

ছোট লেখাব-টেবিল থেকে পাৎলা চেয়ারটা প্রফুল্ল আমার জন্য নিয়ে এলো। আমি বললাম, 'কী হ'লো? জ্বর?'

'ঠিক জ্বর না—এই সর্দি আরকি।'

'খুব অন্যায় এ-রকম অসুখ করা। কখন থেকে হ'লো?'

'কাল থেকেই টিপটিপ করছিলো মাথাটা, আজ সকালে স্নান করাটাই বোধহয় ভুল হ'লো।'

'স্নান করার জন্য কিছু হয়নি—' প্রফুল্ল বললে— 'সর্দি হবার হ'লে ঠেকানো যায় না। আর মাঝে-মাঝে হওয়াও ভালো—বিশ্রাম হয়, নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকা যায়।'

'সকাল থেকেই শুয়ে আছেন?'

বেয়ারা এসে জানালে আপিশ থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন। 'বসতে বলো। তোমার কিছু চাই, অর্চনা? গরম জলের ব্যাগ? চাই না? আচ্ছা, এই দিকের জানলাটা একটু খুলে দিই বরং—একেবারে সব বন্ধ থাকা ভালো না। আপনি তাহ'লে বসুন এখানে— আমি আসছি।' চটি পায়ে, ছিপছিপে, নিপুণ, প্রফুল্ল পরদা ঠেলে অদৃশ্য হ'লো।

আমি ক্ষমাহীনভাবে একই প্রসঙ্গের অনুধাবন করলাম।

'সকাল থেকেই শুয়ে আছেন?'

'এই শুয়ে-ব'সে কাটিয়েছি কোনোরকমে। প্রফুল্ল বলে সর্দি হয়েছে কি বিছানা নিতে হবে। বিলেতি অ্যভ্যেস ওর।'

'ডাক্তার এসেছিলো?'

'এর জন্যে আবার ডাক্তার লাগে নাকি?' —অর্চনা হাসলো— 'নিজে-নিজেই সেরে যায়। বছরে দু-তিন বার সর্দি আমার হাতে ধরা।'

'বছরে দু-তিন বার? আশ্চর্য!'

'এতে আর আশ্চর্য কী আছে।'

কী আছে, আমি তা জানি না। কিন্তু ততক্ষণে সর্দিটা আমার কাছে একটা রহস্যময় বিষয় হ'য়ে

উঠেছে—রীতিমতো গবেষণার যোগ্য। আমি মনে করতে চেষ্টা করছি কবে আমার শেষ সর্দি হয়েছিলো (এ-সব ছোটোখাটো অসুখ ছাই করেই না আমার), কেমন লাগে সর্দি হ'লে, এ-বিষয়ে আমি কী শুনেছি, কিছু পড়েছি কিনা, আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা কোন সর্বশেষ বুজরুকি আবিষ্কার করেছেন এ-বিষয়ে। আর ততক্ষণ, অর্চনা শুয়ে আছে আমার সামনে, তার গায়ে হলদে রঙের আঁটো ব্লাউজ ; কোমর অবধি সোনালি কম্বলে ঢাকা। শিয়রে হাঁস-গলার টেবল-ল্যাম্প জ্বলছে, সেটা এমন ভাবে বাঁকানো যে তার চুলে, ঠোঁটে, গলায়, বাহুতে আলো পড়েছে, সারা ঘরটাকে ঝাপসা রেখে আলোর পেনসিলে ফুটিয়ে তুলেছে এক নারীর শরীর। একবার একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠলো সে, পা দুটি গুটিয়ে নিলো কম্বলের মধ্যে।

'কষ্ট হচ্ছে?

'না। এই-একবার গরম লাগে, একবার শীত করে—সুবিধে পাই না।'

তার গলা ভারি, মুখ লালচে, চোখ সজল আর উজ্জ্বল, শুকনো ঠোঁট দুটিতে মাঝে-মাঝে জিভ বুলিয়ে নিচ্ছে। তার জিভের ডগাটুকু আগুনের শিখার মতো বিঁধলো আমার চোখে ; তার নোনতা স্বাদ নিজের মুখের মধ্যে অনুভব করলাম যেন। কথা বলতে গিয়ে আমারও গলা ভারি হ'লো।

'জানলাটা ভেজিয়ে দিই?

'না, থাক। আপনি বসুন। আপনার খবর বলুন। আজ রোববার ছিলো : কী করলেন সারাদিন?'

'আমি আর কী করবো।'

'কেন? কাজের মতো কাজ তো আপনারাই করেন।'

'বাজে!' অবজ্ঞায় আমার ঠোঁট বেঁকে গেলো। 'দয়া ক'বে বলবেন না আমার লেখা অপনার ভালো লাগে।'

'বলবো না?'

'না। সেটা তুলে রাখুন প্রফুল্লর জন্য। আপনার কাছে তা আমি চাই না।'

অর্চনা একটু চুপ ক'রে রইলো, মুহূর্তের জন্য গম্ভীর দেখালো তাকে। তারপর হেসে বললে, 'ঠিক বলেছেন! প্রফুল্ল এত ভালোবাসতে পারে যে অন্যদেরটা বাহুল্য মনে হয়। আপনার লেখাও সে-ই পড়িয়েছিলো আমাকে। দিল্লিতে বাংলা বই তো বেশি পেতুম না।

'আপনি বিয়ের আগেই দিল্লিতে ছিলেন?' —জবাবের সময় না-দিয়ে তখনই আবার বললাম, 'প্রফুল্লর সঙ্গে কবে প্রথম দেখা হ'লো?

বেয়াদব প্রশ্ন সন্দেহ নেই, অর্চনা না-ও পারতো জবাব দিতে। কিন্তু তাকে একটুও ক্ষুণ্ণ বা অপ্রতিভ মনে হ'লো না, যখন সে আস্তে-আস্তে সে-সব কথাও বললে আমাকে। বি.এ.পাশ ক'রে এম.এ. পড়ার জন্য তৈরি হচ্ছে, ভাবছে বিদেশে যাবে, জর্মান শিখবে, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের গবেষণা করবে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এমন সময় প্রফুল্লর সঙ্গে দেখা হ'লো ; পনেরো দিনের মধ্যে ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে গেলো ও-সব পরিকল্পনা, তিন মাসের মধ্যে বিয়ে হ'য়ে গেলো। কাকে বলে বিদ্বান মানুষ, প্রফুল্লর সঙ্গে মেলামেশার আগে ধারণাই ছিলো না তার। প্রফুল্ল ডিগ্রি নিয়েছে ইকনমিক্সে ; কিন্তু মনে হয় সে সবই জানে, সবই পড়েছে, আর তার সব পড়া আর জানা আলোর মতো জ্বলজ্বল করছে তার মনের মধ্যে। 'আমি যতই পড়াশুনো করি, ও-রকম যখন হ'তে পারবো না তখন আর চেষ্টা ক'রে কী লাভ।'

'নিজে বিদুষী না-হ'য়ে বিদ্বানের সেবা করাই ভালো মনে করলেন?'

'সেবা কেন?' তার গালের রেখায় হালকা হাসি ফুটে উঠলো। 'আর যদি সেবাও হয় সেটা তো উভয় পক্ষেই। আমি চেয়েছিলুম প্রফুল্ল প্রোফেসরিতেই থাকে ; "সংসার চালাবার" জন্য তাকে বেশি খাটুনির সরকারি কাজ নিতে হলো এ-কথা ভাবতে ভালো লাগেনি। কিন্তু—'

'কিন্তু?'

'প্রফুল্ল বললে ইকনমিক্স তার ভালো লাগে না, ওটা আজকাল চড়া দামে বিকোয় ব'লেই সে

নিয়েছিলো, আর তা-ই যদি হয় তাহ'লে তা থেকে সবচেয়ে মোটা মজুরি নিংড়ে নেয়াই তার কর্তব্য। "ভেবো না আমি তোমার জন্য কোনো 'ত্যাগ করছি" —আমাকে বলেছিলো— "ছাত্র পড়ানো আমার পক্ষে বিরক্তিকর, আর তাছাড়া কেমন ক'রে বাঁচবো সে-বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট ছবি আছে আমার মনে, চাকরিটা তারই একটা উপায়।" আমি বলেছিলুম, "কিন্তু প্রোফেসরিতে অবসর বেশি—তুমি লিখতে পারবে, কবিতা লিখতে পারবে।" হেসে বলেছিলো, "সময়ের অভাবে, সুযোগের অভাবে কারো কখনো লেখা হয়নি এ-কথা বিশ্বাস করি না। আর আমি যে ইকনমিক্সে পাশ কবতে পেরেছি এতেই প্রমাণ হ'য়ে গেছে আমি কবি নই।" আসলে, প্রফুল্লর দুটো জীবন আছে ; আপিশের কাজের মধ্যে সে একভাবে কাটিয়ে দেয়, কিন্তু নিজের মনে সে একেবাবে আলাদা—সেখানে সে কত গভীর আমিও তার তল পাইনি এখনো।'

এমনি, অর্চনা তার স্বামীর বিষয়ে। পুরুষকে ঘায়েল করার জন্য মেয়েরা অচেতনভাবেই সে-সব ফাঁদ তৈরী কবে, এও হয়তো তারই একটা ; হয়তো সে চেয়েছিলো এমনি ক'রে তার বিষয়ে আমাকে জাগাতে, আমার ঈর্ষাকে তীক্ষ্ণ ক'রে তুলতে। —কিন্তু তার কোনো দরকার ছিলো না ; অক্টোপাসের শুঁড় আমাকে আগেই ধ'রে ফেলেছিলো। অদ্ভুত চতুরালি প্রকৃতির : ঐ সর্দির চেহারায় আমি দেখতে পেলুম এক নিখুঁত, নির্ভুল, প্রায় নির্লজ্জ অভিনয়। কোনো লক্ষণই বাকি ছিলো না : রাঙানো গাল, ছলোছলো চোখ, ফুলে-ওঠা নাক, নিশ্বাসের জন্য মাঝে-মাঝে খুলে-যাওয়া ঠোঁট দুটি—সব মিলিয়ে প্রেমিকাব মতো তাকে দেখলাম আমি, কামনায় আমন্ত্রণকারিণীর মতো, হলদে আর সোনালি আবরণের তলায় এক বানীর শরীব উদ্ভাসিত হ'লো আমাব চোখে, পূর্ণ, সুপক্ক, ঐশ্বর্যময়, যৌবনের চরম লগ্নে দৃপ্ত আর ক্ষুরধার। এইবকম দেখলাম তাকে আমি—সত্যি সে কেমন তা জানতে পাবিনি কোনোদিন। আগে বলেছি তাকে দেখামাত্রই ভালোবেসেছিলুম, কিন্তু সেদিন মনে হ'লো আমি পারি তাকে ভালোবাসতে—সেই ক্ষমতা আর সম্ভাবনা আছে আমাব আবো বেশি—তাকে ভালোবাসতে না-পাবলে আমার অস্তিত্বেব কোনো অর্থই থাকে না। এমনি সম্বন্ধে বাঁধা শবীব আব মন। গৌরীকে ভালোবেসেছিলুম শরীর দিয়ে, সেই থেকে আমাব মন তাকে ভুলতে পারলো না। আব অর্চনা—তাকে আমি 'মনে-মনে' ভালোবাসতে গিয়েই তার শরীরটাকে আবিষ্কার ক'রে ফেললাম, আর সেই থেকেই সর্বনাশের সূত্রপাত হ'লো।

তার সব কথা শুনে আমি বললাম, 'ভালোই হয়েছে। সুন্দরী আর সুখী মহিলাদের বিদুষী হওয়া উচিত নয়।'

জবাব দিলে, 'অন্য দুটো ভাগ্যের বিষয়, কিন্তু কোনো কাজ করতে হ'লে বুদ্ধি চাই।'

'বুদ্ধিটাও ভাগ্য। আর কাজ বলতে কী বোঝেন?'

আমার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললে, 'কিছু লিখছেন না আজকাল?'

'না।' আমি অসহিষ্ণুভাবে বসার ভঙ্গি বদল করলাম। 'আবার বলছি, আমার লেখার কথা কিছু বলবেন না দয়া ক'রে। প্রফুল্ল আপনাকে ইনফেক্ট করেছে, এ-সব জিনিশকে অন্যাযবকমেব বেশি মূল্য দিতে শিখেছেন তার কাছে। কিন্তু আমি এর জন্যে কানাকড়িও কেয়ার করিনে। যাবা ঠিকমতো বাঁচতে পারে না তাবাই লেখে। রুগ্ন তারা, জঞ্জাল তারা। যারা বাঁচতে পারে—যেমন প্রফুল্ল—তারা আর কোন দুঃখে লিখতে যাবে। আমার এই ছাইভস্ম লেখার কথা আপনিও যদি ভুলতে না পারেন তাহ'লে আমাকে বিদায় নিতে হবে এখান থেকে।'

এক সেকেণ্ড আগেও ভাবিনি এইরকম কতগুলো বদমেজাজি কথা বেরিয়ে যাবে আমার মুখ দিয়ে। কিন্তু—তাকে ও-বকমভাবে দেখার পর—মেজাজটা তো খারাপ হ'য়েই ছিলো আমার, আমি আর যা-কিছু বলতে যেতাম তাই মিথ্যে শোনাতো আমার কানে, আসল কথাটাকে চাপা দেবার চেষ্টার মতো শোনাতো। বিশ্রী লাগে—ঘুরিয়ে বলতে গেলেই ঘেন্না ধ'রে যায় নিজের উপর।

'ভুলতে না-পারলেও বলবো না ; এই কথা রইলো,' ব'লে অর্চনা গলা অবধি কম্বল টেনে দিলে। বোঝাই গেলো, আমার চ'লে যাবার ইঙ্গিত এটা। আমি একটু দেরি ক'রে উঠে দাঁড়ালাম।

'চলি। সেরে উঠুন তাড়াতাড়ি।'

'কাল আসবেন।'

বসার ঘরে এসে দেখি প্রফুল্ল তার নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে ব'সে আছে, হাতে সেই ফরাশি ভাষার পত্রিকা। ঘরে আর কাউকে না দেখে আমি বললাম, 'আপনার বন্ধু চ'লে গেলেন?'

'বন্ধু নয়, আপিশের লোক।'

'কখন গেলেন তিনি?'

'অনেকক্ষণ। একটা বেশ ভালো জিনিশ পড়ছিলাম এটাতে।' পড়ার জন্য তার চশমা লাগে, চশমা খুলে ফেলে আমার দিকে তাকালো। 'আসুন—' বাড়িয়ে দিলে বিলেতি সিগারেটে ভরা কাশ্মিরি কাঠের বাক্স।

আমি ব'সে-ব'সে একটি সিগারেট খেলাম, চেষ্টা করলাম বলার মতো কোনো কথা মনে আনতে। প্রফুল্ল বললে, 'আপনি কেমন আছেন?'

রোজ যার সঙ্গে দেখা হয় তাকে এ-কথাটা জিগেস করা অস্বাভাবিক। আমি বললাম, 'খারাপ দেখছেন?'

'ক্লান্ত দেখছি। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে আজ। —আসছি।' উঠে গিয়ে ঘরের কম-আলোর অংশে একটা বেঁটে আলমারি খুললো, ফিরে এলো তিনটে গ্লাশ আর কন্যাকের বোতল হাতে নিয়ে। এগুলো নামিয়ে বললে, 'আপনার কী-রকম পছন্দ? সোডা?'

আমার ধারণা ছিলো প্রফুল্লর এ-সব অভ্যেস নেই। একবার তাকিয়ে বললাম, 'তিনটে গ্লাশ কেন?'

'একটা অর্চনার। গরম দুধের সঙ্গে খেলে সর্দিতে ভালো লাগবে। আগে দিয়ে আসি ওকে।' অল্প ঢেলে, গ্লাশ হাতে শোবার ঘরে গেলো। ছবির মতো চলাফেরা তার, যেন কোনো নাটকে পার্ট করছে। ফিরে এসে বললে, 'সোডা চাই আপনার?'

না।। ব্র্যাণ্ডিও চাই না।'

'একটুও না?'

'আমি আরম্ভ করলে থামতে পারি না। নেশা হ'লে যা-তা ব'লে ফেলি। তাই খাবো না। চলি।' ব'লে—প্রফুল্লকে আর কথা বলার সময় না দিয়ে—আমি হনহন ক'রে বেরিয়ে গেলাম। অপমান লাগলো আমার—অপদস্থ বোধ হ'লো—প্রফুল্ল যে আমাকে 'দেখিয়ে দেখিয়ে' (তা-ই মনে হ'লো আমার) অর্চনাকে ব্র্যান্ডি দিয়ে এলো, এতে আমার পিত্ত জ্ব'লে গেলো রীতিমতো। তাকে কুটিল, ধূর্ত আর ঈর্ষাপরায়ণ মনে হ'লো সেই সময়ে ; আমাকে নেশা করিয়ে, আমার মনের কথা টেনে বের ক'রে, আমাকে তার ঠাট্টার আর দয়ার পাত্র ক'রে তুলতে চায়। তা-ই আমার মনে হ'লো তখন।

কিন্তু আসলে—আমি ভালোই জানি—এ রকম কোনো দুরভিসন্ধি তার ছিলো না। ভালোই জানি, কোনোরকম হীনতা তাকে স্পর্শ করেনি কখনো। সে চেয়েছিলো আমি যাতে স্বচ্ছন্দ বোধ করি, হয়তো নিজেরও মনের অব্যক্ত প্রতিবাদে লজ্জিত হ'য়ে আরো বেশি নিবিড় হ'তে চেয়েছিলো আমার সঙ্গে। এ-সবই তার কৌলীন্য বা সৌজন্যের প্রকাশ, তার মজ্জাগত কৌলিন্যের। কিন্তু সেদিন, সেই মুহূর্তে, আমার কাছে সে প্রফুল্ল রায় ছিলো না আর, হ'য়ে উঠেছিলো অর্চনার স্বামী, যে স্বামীকে অর্চনা ভালোবেসে সুখী হ'তে না-পারলেও না-বেসে আরো বেশি অসুখী হবে। তাই তার ব্যবহারে কিছুই ভালো দেখতে পেলাম না ; অভদ্রের মতো বেরিয়ে এলাম।

স্থির করলাম, আর যাবো না ওদের ওখানে। একদিন, দু-দিন, তিনদিন বাদ গেলো। মদ খেয়ে আর জুয়ো খেলে সন্ধেগুলো কাটিয়ে দিলাম। চতুর্থ দিনে আপিশে আমার জন্য টেলিফোন বাজলো। প্রফুল্লর গলা। সে আমাকে আজ পাঁচটার পরে আপিশ থেকে তুলে নিয়ে যাবে, আমি থাকি যেন। 'কেমন? ঠিক তো?' ব'লেই টেলিফোন কেটে দিল।

প্রথমে আমার মনে হ'লো তক্ষুনি টেলিফোন তুলে ব'লে দিই—না, যেতে পারবো না। তারপর ভাবলাম—টেলিফোনে সব বলা যায় না—আর এই আপিশের মধ্যে বলারও অসুবিধে—দেখা হোক। পাঁচটার কয়েক মিনিট আগে থেকেই বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। দেখলাম, প্রফুল্ল গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাস্তা পার হ'লো। শীতের সন্ধ্যা, কুয়াশা হয়েছে, স্ট্র্যাণ্ড রোডের ভিড়। তার মধ্যেও সুন্দর দেখলাম তাকে, বিদ্যুতের মতো ক্ষণিক আনন্দ ঝলক দিলো হৃদয়ে। আমাকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলো।

আমি তার হাত ধ'রে বললাম, 'প্রফুল্ল, আমাকে আর যেতে বোলো না।' (হঠাৎ 'তুমি' ব'লে ফেললাম)।

প্রফুল্ল শুধু তাকালো একবার ; আবছায়ায় দেখলাম শান্ত আর গভীর তার চোখ।

'এতে কারোরই কিছু ভালো হবে না, প্রফুল্ল। আমি একলা-স্বভাবের মানুষ, কোনো দিন কোনো জায়গায় মিশতে পারিনি। কাউকে কিছু দেবার নেই আমার। তাই আমি নিতেও পারি না। এটা কেমন ক'রে হ'লো যে এতদিন ধ'রে বেঁচে আছি অথচ একজনও বন্ধু নেই আমার।'

'একজনও নেই তা নয়।'

'না। আমার সব কথা জানো না তুমি। জানলে ও-কথা বলতে না।'

'সব জানি। আপনি চলুন।'

তার মুখের উপর চোখ রাখলাম। সেখানে কোনো ভাবান্তর হ'লো না।

'তবু আপনি যেতে বলছেন আমাকে?' (আবার 'আপনি' এলো আমার মুখে)—'আপনার কথায় ''না'' বলা কত কঠিন আমার পক্ষে, তা জেনে-শুনেই আমার উপর সুবিধে নিচ্ছেন?'

'আসুন। ঐখানে গাড়িটা রেখেছি। এই দিকে।'

তার সঙ্গে কয়েক পা হাঁটার পর আমি বললাম, 'কিন্তু তুমি কি আমাকে মহাত্মা হ'তে বাধ্য করবে? নয়তো পাষণ্ড?'

'আপনি যেমন আছেন সেটাই সবচেয়ে ভালো,' প্রফুল্ল হাসলো।

এখানে ওদের সঙ্গে আমার দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ : আমার অস্তিত্বটা, আমাকে অমান্য ক'রে, যেন প্রফুল্ল আর অর্চনার স্রোতের মধ্যে ভেসে চললো। তারা হ'য়ে উঠলো আমার সারা জগৎ ; কিন্তু তাদের অবশ্য অন্য সংসর্গের অভাব ছিলো না। আগে সেটা তেমন বুঝিনি : যেন ধ'রেই নিয়েছিলাম তারা আর আমি ছাড়া কেউ থাকবে না তাদের ঘরে ; কিন্তু এবারে তারা একটু বেশি মাত্রায় সামাজিক হ'য়ে উঠলো ; আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধবী, বন্ধুপত্নী—এদের আক্রমণ সহ্য করতে হ'লো আমাকে—শুধু তা-ই নয়, তার মধ্যে পার্টও নিতে হ'লো একটা। তখন, যুদ্ধের শেষের দিকে, কলকাতায় ককটেল-পার্টির নতুন চল হচ্ছে ; প্রফুল্ল, যে কখনো হাওয়াই-শার্ট পরেনি, ঐ ফ্যাশানটাকে মেনে নিলে ; এক-এক সন্ধ্যায় তার ঘর সব অর্থেই নানা রঙের মেয়ে পুরুষে ভ'রে যায় ; যে যার গ্লাশ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তারা কথা বলে, কোনো একজনই অন্য কোনো-একজনের সঙ্গে (তাকে স্পষ্টত ভালো লাগলেও) খুব বেশিক্ষণ কথা বলে না ; মানুষগুলো বেশ একটা নিয়মিত ছন্দে ঘরের নানা অংশে দলের মধ্যে আবর্তিত হ'তে থাকে : যে-কোনো একটা বিষয় নিয়ে অত্যন্ত বেশি উৎসাহ প্রকাশ করে না কেউ, আলাপের বিষয়টাকে বিভিন্ন বক্তার রুচি ও শক্তি অনুসারে পিছলে-পিছলে স'রে যেতে দেয়। রোগ, মৃত্যু, দুঃখ কখনো উল্লিখিত হয় না (যুদ্ধের সম্পর্কেও না) ; প্রফুল্লর সঙ্গে আমার আগে যে-সব 'তর্ক' হ'তো সেগুলো সম্ভবপরতার বাইরে চ'লে যায়, একটা মৃদু গোলাপি, কবোষ্ণ প্রীতির আবহাওয়া, মদে উদ্দীপিত হ'য়ে, আস্তে-আস্তে ছড়িয়ে পড়ে ঘরের মধ্যে, তার সংক্রমণ আমিও ঠিক এড়াতে পারি না। এড়াতে পারি না, কিন্তু একেবারে ধরাও পড়ি না কখনো, আমার প্রতিরোধ কখনো ভেঙে পড়ে না, আর সেটা বুঝে, আমাকে তার মধ্যে মানিয়ে নেবার জন্য, অর্চনা আর প্রফুল্লর পরিশ্রমের কথা ভেবে আমার প্রায় হাসি পায় আজকাল—প্রায় কান্না পায়। —কোনো-কোনোদিন তাদেরও নিমন্ত্রণ থাকে বাইরে, সেই

দিনগুলোই আমার পক্ষে সবচেয়ে কষ্টের, তাদের পক্ষেও।

আমি সন্দেহ করি, তার বাড়িতে এ-সব পার্টি ডাকার মধ্যেও প্রফুল্ল আমার কথা গভীরভাবে ভেবেছিলো। আমাকে নানা মানুষের সংস্পর্শে এনে, আমার মনটাকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলো সে, অন্য খাদে বইয়ে দিতে চেয়েছিলো। যাতে আমি নিরন্তর একই কথা না ভাবি, বিক্ষেপের স্বাস্থ্যকর বিশ্রাম পাই, যাতে আমি বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজের উগ্র স্বাতন্ত্র্যকে ভুলতে পারি : এ-ই ছিলো প্রফুল্লর চেষ্টা। আর অর্চনা—সে ছিলো আমাকে নিয়ে গর্বিত আর চিন্তিত, বন্ধুদের কাছে অন্য জগতের নমুনাস্বরূপ আমাকে উপস্থিত ক'রে তার আনন্দ যতটা ছিলো উদ্বেগ তার কম না ; আমাকে শুধু সহনীয়গোছের পরিষ্কার জামা-কাপড় পরতেই রাজি করায়নি সে, দু-জন অতি সুবেশ ভদ্রমহিলার মধ্যেও বসিয়ে দিয়েছে, আর আমার কথা শুনে (কেননা কথা আমাকে বলতেই হয়েছে) ভদ্রমহিলারা যখন কৌতুক অনুভব করেছেন, দূর থেকে দৃষ্টি পাঠিয়ে তার উৎসাহ আর সমর্থন জানিয়েছে আমাকে। আমি যেহেতু বানিয়ে কথা বলি না, যখন যা মনে হয় তা-ই বলি, আমার কথা অনেকের কাছেই কৌতুকাবহ মনে হয়েছে, আমার খোলামেলা ভাবটাকেই একটা ভঙ্গি ব'লে ধ'রে নিয়েছে তারা—অর্চনাকে বন্ধুদের কাছে লজ্জা পেতে হয়নি। ঘরের মধ্যে তার উপস্থিতি আমি ভুলতে পারিনি কখনো, ভুলতে দেয়নি সে ; চোখ ফিরিয়েই তার চোখ দেখতে পেয়েছি প্রায় সব সময়, কখনো পৌঁছতে দেরি হ'লে তার দিকে তাকিয়েই বুঝেছি কত অধীর হ'য়ে সে অপেক্ষা করছিলো। আর আমার বিষয়ে এই আগ্রহ তার—এটাকে গোপন করারও তার কোনো চেষ্টা ছিলো না, আমি যে একজন অতিথি মাত্র নই, বলতে গেলে এই বাড়িরই অন্তর্গত, তার ব্যবহার তা বুঝিয়ে দিতো সকলকে। শুধু তার নয়, প্রফুল্লেরও। এটা কি তাদের পরামর্শের ফল, না কি তারা যে যার মনে স্বাধীনভাবে আমার বিষয়ে একই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলো? জানি না, জানবার উপায় নেই আমার। কিন্তু এটা জানি তারা আগুন নিয়ে খেলা করছিলো, জাতিসাপ নিয়ে খেলা করছিলো। এও জানি, তারা নিজেরাও তা জানতো। তারা—অন্তত প্রফুল্ল—আশা করছিলো সে সাপটাকে খেলিয়ে-খেলিয়ে নির্বিষ ক'রে তুলতে পারবে, একটা শান্ত, শুভ্র পরিণামের দিকে নিয়ে যেতে পারবে এই দ্বন্দ্বকে। অদ্ভুত সাহস তার ; তার ক্ষমতার কথা ভাবলে আজও আমার গায়ে কাঁটা দেয়। কিছুদিন—কিছুক্ষণের জন্য এমনও মনে হয়েছিলো যে সে-রকম একটা পরিণাম অসম্ভব নয়। কিন্তু জাতিসাপটা জাতিসাপই : বার-বার শূন্যে ছোবল মারলেও বিষ তার ম'রে যায় না ; আর নীল গলা নিয়ে শুভ্রতার মধ্যে মাথা তুলে যে দাঁড়াতে পারে, সে-মহাদেব আমি নই।

আমি আমার পার্ট ক'রে গেছি, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে আমার স্বস্তি ছিলো না। তার প্রথম কারণ : প্রফুল্লর পার্টিতে আমাকে ভদ্রলোকের মতো পরিমিত মাত্রায় পান করতে হয় ; সেটা আমার পক্ষে পীড়াদায়ক। দ্বিতীয় কারণ : সব সময় আমার ইচ্ছে করে অন্য সবাই চ'লে যাক, প্রফুল্ল আর অর্চনার সঙ্গে আমি শুধু থাকি। সবচেয়ে বেশি ইচ্ছে করে অর্চনার সঙ্গে একা হ'তে। এই সমস্তটা সময় ভ'রে, মুহূর্তের জন্যও, তার জন্য কামনা থেকে নিষ্কৃতি ছিলো না আমার। সেইজন্য, অন্যদের কাছে যা ছিলো উপভোগ আমার পক্ষে তা ছিলো যন্ত্রণা। তাকে না-দেখে টিকতে পারি না তাই যেতেই হয়। গিয়ে ভোগ করি, আর কিছু না—শুধু যন্ত্রণা। এমনি, দিনের পর দিন।

অথচ, অর্চনাকে যখন একা পাই (পেয়েছি মাঝে-মাঝে, হয়তো কোনোদিন প্রফুল্লর ফিরতে দেরি হয়েছে, কি কোনো কাজে বেরিয়েছে সে—একবার আপিশের কাজে দু-দিনের জন্য দিল্লি যেতে হ'লো তাকে) —যখন একা পাই, তখন আমার অস্বস্তি আরো বেড়ে যায়। এমনকি, অর্চনাও একটু আত্মসচেতন হ'য়ে পড়ে যেন। তখন কি আমার তা-ই করা উচিত ছিলো, যা গৌরী করেছিলো আমাকে—সেই রাত্রে? তা'হলে, অন্তত, একরকমের নিষ্পত্তি হ'তো। কিন্তু না : হ'তো না—তখনই ভেবেছি আমি—তাতে আমার আগুন আরো প্রবল হ'য়ে উঠতো—যে-কোনো দিক থেকেই দেখা যাক, এই ব্যাপারের উপসংহার মানেই কোনো-এক পক্ষের সংহার। এবং সংহার যার প্রয়োজন সে-মানুষ নিঃসন্দেহে আমি। এ-বিষয়ে কি এখনো কোনো সন্দেহ আছে যে আমার চোখের

সামনে—আর আমারই জন্য—একটা সুন্দর জিনিশে ভাঙন ধরলো? জানি—অনেক আগেই জেনেছি পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নয়, শেষ পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য নয় ; হিমালয় গুঁড়ো হ'য়ে যাবে, সূর্য নিবে যাবে একদিন। কিন্তু ও-সব হ'লো দেবতার কথা, মানুষের নয় ; আমি একজন মানুষ মাত্র, যতদিন বেঁচে আছি, আমার কিছু এসে যায় না ওতে। সভ্যতার নাভিশ্বাস ওঠে, সাম্রাজ্য বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যায়। তা যাক, অন্তহীন সমুদ্র থেকে আবার এক রঙিন বুদ্বুদ জেগে ওঠে। বিশ্ব থাক তার নিজের মনে, জগৎ যেমন খুশি চলুক ; আমার এই মাত্র কয়েকটা বছরের আয়ুর মধ্যে তা নিয়ে কোনো মাথা-ব্যথা নেই। কিন্তু একটা ছোটো, ব্যক্তিগত এবং সেই জন্যই অপূরণীয় ক্ষতির দৃশ্য চোখে দেখলেই দুঃখ পেতে হয়। এক দিনের যুদ্ধে পাঁচ হাজার মানুষ যায়, সেটা একটা খবর মাত্র ; কিন্তু রাস্তায় কোনো একটি অচেনা যুবকের মৃতদেহ নিয়ে যেতে দেখলে মৃত্যু একটা অভিজ্ঞতা হ'য়ে ওঠে। প্রফুল্ল আর অর্চনার বিবাহের মধ্যে এই ফাটল—এও তেমনি। যার এখনো অনেক বাঁচার কথা, বেড়ে ওঠার কথা, সেই কোনো যুবকের বাস্তব ও প্রত্যক্ষ মৃত্যুর মতোই কষ্টের—আর তেমনি খাপছাড়া। বিয়ে জিনিশটা যে মানুষের গড়া নিয়ম মাত্র, প্রকৃতির কোনো বিধান নয়, তা আমার চেয়ে ভালো কে জানে। কিন্তু ওদের দু-জনকে অন্য চোখে দেখেছিলাম আমি। আমার বাবা আর মা-র মতো দম্পতী নয় তারা ; আমার চেনাশোনা অন্য কোনো দম্পতীর মতো নয়। শুধু যে তারা দেখতে-শুনতে মানিয়েছে তা নয়, তারা পরস্পরের ছন্দে বাঁধা, উপযোগী, সহযোগী, প্রয়োজনীয়। গরমিলের অভাবটাকেই তারা সুখ ব'লে জানেনি, সুখটাকে সৃষ্টি ক'রে নিয়েছে, তাদের পক্ষে প্রায় একটা প্রাকৃত পদার্থ সেটা, তাদের ঘরে পা দিয়েই বুঝেছিলাম। আমি জানি, প্রফুল্লর সঙ্গে চোদ্দ বছর কাটাবার পর আমার মতো উন্মাদ মানুষকে ভালো না-বেসে উপায় নেই ; জানি, তৃপ্তির পরের ধাপেই ক্লান্তি অপেক্ষা ক'রে থাকে, পরীক্ষার সামনে না-পড়া পর্যন্ত আমাদের সব চাহিদা আমরা জানতে পারি না ; জানি, পৃথিবীর প্রত্যেক রানীর মধ্যে দাসী হবার দুরন্ত বাসনা লুকিয়ে থাকে। সবই জানি—কিন্তু তাই ব'লে নষ্ট হবে এমন একটা সুন্দর জিনিশ! আমারই বা এত শক্তি থাকবে কেন, এত দুর্বল হবে কেন অর্চনা। আমি যে প্রায় সেটাকে স্থায়ী ব'লে ভেবেছিলাম, প্রায় বিশ্বাস রেখেছিলাম তাতে! কিন্তু ভেঙে যাচ্ছে—দিনে-দিনে আমি তা দেখতে পেয়েছি ; দেখেছি অর্চনার চোখে, আর মাঝে-মাঝে প্রফুল্লর আকস্মিক চোখ ফিরিয়ে নেয়ায়। তাদের পার্টি, তাদের আমোদ উৎসব—তারই তলে-তলে ধ্বংসে পড়ছে যা তাদের সবচেয়ে মূল্যবান। তারা জানে তা, আমিও জানি। —কিন্তু আমার এই 'জয়ে' আমি উল্লসিত হ'তে পারিনি ; আমার মন মূঢ়ের মতো বলেছে—'তাহ'লে এও সম্ভব!' কবি প্রফুল্ল রায়কে সাপ্লাই-আপিশের ডিরেক্টরের চেয়ারে দেখে প্রথম যে-রকম লেগেছিলো, সেই রকম মোহভঙ্গের আঘাত যেন, কিন্তু তার চেয়েও আরো অনেক তীব্র। আর এজন্যেই আরো বেশি অস্বস্তি আমার, আরো বেশি যন্ত্রণা। এজন্যেই অর্চনাকে একা পেয়েও পেলাম না আমি।

শুধু তখনই এই যন্ত্রণা আমি কিছুটা ভুলে থাকতে পেরেছি, যখন—শীত কেটে গিয়ে গরম পড়ি পড়ি ততদিনে—যখন প্রফুল্ল মাঝে-মাঝে তার গাড়িতে বেড়াতে বেরিয়েছে আমাদের নিয়ে। রাত্রে, ছেলেমেয়ে দুটি ঘুমিয়ে পড়ায় পর, নিজেরা খেয়ে নিয়ে (তার মধ্যে আমিও) প্রফুল্লর এক-একদিন বেড়াতে যাবার ইচ্ছে হ'তো। বড়ো আমেরিকান গাড়ি তার, সামনের আসনেই তিন জনের জায়গা হ'য়ে যায়, অর্চনা মাঝখানে : ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারে ছুটতো তার গাড়ি, লেকে, ময়দানে, খিদিরপুরে গঙ্গার ধারের রাস্তায়, কখনো জ্যোছনা-রাত্রে এমনকি বজবজ পর্যন্ত। এর জন্য—তেলের তখনো কড়াক্কড় ব'লে—অনেক দিন ট্যাক্সি ক'রে বা বাস্-এ ক'রেও আপিশে যেতে হয় তাকে, কিন্তু এই নৈশ ভ্রমণের উপর কী-রকম একটা ঝোঁক প'ড়ে গেলো তার। এখন বুঝতে পারি, নিজেকে শান্ত করার জন্য এই উপায় সে বেছে নিয়েছিলো—সে, প্রফুল্ল রায়, তারও শান্ত হবার প্রয়োজন ঘটছে ততদিনে। কিন্তু তখন এ-কথাটা বুঝেও বুঝিনি ; তার কারণ, গাড়ি যতক্ষণ চলেছে আমি দেহে-মনে আধো ঘুমের মতো আরাম অনুভব করেছি। মসৃণ গতি, স্তব্ধতা, অন্ধকার ; তার মধ্যে

অর্চনার দেহের উষ্ণতাও সহ্য করা কঠিন হয়নি। শুধু ঐ সান্নিধ্যের জন্যই একরকমের নিভৃত অবকাশ গ'ড়ে উঠেছে তার সঙ্গে আমার ; অথচ, প্রফুল্ল কাছেই আছে ব'লে, কাঁটাগুলো এড়াতে পেরেছি তখনকার মতো। যেন অর্চনার সঙ্গে একা আছি, আবার তারই মধ্যে প্রফুল্ল একজন অংশিদার। একই সঙ্গে অন্তরঙ্গ আর নৈর্ব্যক্তিক সেই গতির চেতনার মধ্যে ডুবে গেছি আমি, অন্ধকারের ভাঁজ খুলে-খুলে মিশিয়ে দিতে চেয়েছি নিজেকে। কেউ বেশি কথা বলেনি, পথে লোক নেই, প্রফুল্ল স্পীড দিয়েছে গাড়িতে, অর্চনার ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে আমি জানলার কাচ তুলে দিয়েছি। 'সাবধান, যা অন্ধকার। একটু আস্তে চলো না।' অর্চনার কথায় প্রফুল্ল ফিরে তাকিয়েছে ; অন্ধকারে তার মুখটা কেমন শাদা লেগেছে আমার চোখে। 'ভেবো না, আমি খুব ভালো চালাই।' এমন ভাবে বলেছে যেন অর্চনা তার নতুন-চেনা কেউ। আর আমার হঠাৎ মনে হয়েছে যে এই তো প্রফুল্লর সুযোগ। সে কি পারে না হঠাৎ কোনোরকম কায়দা ক'রে আমাকে চলন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দিতে?

এই সব ভ্রমণের শেষে তাদের বাড়িতেই ফিরেছি, গরম কফি বা কোনো লিকিয়ার নিয়ে গল্প করতে-করতে রাত্তির দুটো বেজে গেছে। ভোর হ'লেও আমার আপত্তি ছিলো না, কিন্তু কোনো-এক জায়গায় থামতেই হয়। প্রফুল্ল আবার আমাকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেছে, অর্চনাও সঙ্গে এসেছে কখনো। একদিন—পরিষ্কার চাঁদ ছিলো আকাশে, আমার সঙ্গে ওরাও নেমে জ্যোছনায় দাঁড়ালো একটু। ওদের গাড়ি চোখের বাইরে চ'লে যাওয়া পর্যন্ত আমি তাকিয়ে থাকলাম। কড়া নাড়ার আগেই সুধা দরজা খুলে দিলে। জিগেস করলে :

'উনি কে?'

'কার কথা বলছো?'

'একজন মেয়েছেলে দেখলাম।'

'মেয়েছেলে' কথাটা শুনে আমার বমি পেলো। কিন্তু সুধা ঐ রকমই বলে।

'ওঁর নাম জানতে চাও? অর্চনা রায়। তুমি কি জেগেই ছিলে?'

'আর ভদ্রলোকটি?'

'ওঁর স্বামী।'

'ও, বিয়ে হয়েছে?'

'শুনলেই তো।'

'আর স্বামীর নাম?'

'প্রফুল্ল রায়। আমার ছেলেবেলার বন্ধু।'

'ও। তুমি খাবে?'

'না।'

'প্রায়ই খেয়ে আসো আজকাল?'

'ওঁদের বাড়িতেই খাই।'

'এত রাত্রে খাও?'

'খাওয়ার পরে ওঁদের সঙ্গেই বেড়াই।'

সুধা আর-কিছু বললে না। বাড়িতে না খাওয়া, রাত ক'রে ফেরা— এগুলো অবশ্য নতুন নয় তার কাছে, কিন্তু আমার এই সত্যভাষণের পরে এটাও তো বলতে পারতো যে আমার স্ত্রী হিশেবে তারও নিমন্ত্রিত হবার অধিকার আছে। কিন্তু না—আর-কিছুই বললে না, গোরুর মতো সহিষ্ণু আর মন্থর ভঙ্গিতে বিছানায় উঠলো। আমি আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম তার পাশে ; অর্চনার কথা ভাবতে-ভাবতে তাকে জড়িয়ে ধ'রে আদর করলাম।

এগারো

যতদিন ধ'রে এই পাতাগুলো লিখছি, ততদিনে আমার 'অবস্থা'র আরো 'উন্নতি' হয়েছে, মাঝে-মাঝে আমাকে ঘরের বাইরেও যেতে দিচ্ছেন এঁরা ; ভয় হচ্ছে কবে না এঁরা ব'লে বসেন আমি 'সেরে গেছি।' তার আগে দু-একটা কাজ সেরে নিতে হবে। প্রফুল্লর কথাও আরো একটু বলতে চাই।

বলতে চাই এই কথাটা যে শেষে যা ঘটলো তাতে প্রফুল্লরও অনেকখানি হাত ছিলো। নিজের উপর থেকে দায়িত্ব আমি সরিয়ে নিতে চাচ্ছি না—সেটা সম্ভবই নয় ; কিন্তু অদ্ভুত কথাটা—আর সত্য কথাটা —এই যে প্রফুল্ল আমারই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিলো ; যে-অস্ত্র নিয়ে আমার মুখোমুখি সে দাঁড়িয়েছিলো, তার একটা মুখ তারই দিকে উদ্যত ছিলো সব সময়। সব সময় আমাকে যার সঙ্গে লড়তে হয়েছে সেটা প্রফুল্লর—সন্দেহ নয়, ঈর্ষা নয়—তার ভালোত্ব। আমার স্ত্রীর মতো 'ভালো' ছিলো না সে ; নিষ্ক্রিয়, নিঃসাড়, নির্বোধভাবে ভালো হয়— সক্রিয়, সচেতন, চিন্ময়ভাবে ভালো ; অন্যকে প্রায় পাগল ক'রে দিতে পারে, এমনি একগুঁয়ে অবিচল, ক্ষমাহীন ভালোত্ব তার। আমার বাবার মতো প্রবলের সঙ্গে বোঝাপড়া করা যায়, সুধার মতো আধা-মানুষকে মাড়ানো যায় পায়ের তলায়—কিন্তু যে-মানুষ একই সঙ্গে আমার মা-র কথা আর বাবার কথা মনে পড়িয়ে দেয় আমাকে, তার বিরুদ্ধে আমি কী করতে পারি? আমার বাবার মতোই তার স্নায়ুর জোর, মনের জোর, আর প্রখর সম্মানবোধ ; আমার মা-র মতোই তার লজ্জা, মৃদুতা, সহনশীলতা। অর্চনার প্রতি আমার আসক্তি বুঝতে তার দেরি হয়নি—কেনই বা হবে? ভালোবাসা লুকোনো যায় না ; ও জিনিশটা রোদের তাপের মতো ; তৎক্ষণাৎ পৌঁছে যায় ; কোনো ভাষার দরকার করে না। কোনো মেয়েকে কেউ যখন ভালোবাসে সে-মেয়ে আধখানা চোখে তাকিয়েও তা বুঝতে পারে, আর, হয়তো, তার চেয়েও আগে বোঝে সেই অন্য পুরুষ, যে তাকে ভালোবাসে। বুঝে, প্রফুল্লর উচিত ছিলো আমাকে অপমান করা, তাড়িয়ে দেয়া : অন্তত, খুব গম্ভীর, নিপুণ, ভদ্রভাবে, ডাক্তারের অপারেশন করার মতো, আমাকে তাদের জীবন থেকে উপড়ে ফেলা। ঈশ্বর জানেন, সেটা আমার মনোমতো হ'তো। সহজ হ'তো আমার পক্ষে, যদি প্রফুল্ল আমার বাবার মতো বলতো, 'এ-মুহূর্তে বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে!' মনে-মনে তাকে অশেষ ধন্যবাদ দিতুম তার জন্য। কিন্তু প্রফুল্ল সে-রকম কিছু করলে না ; উল্টে আমাকে ধ'রে রাখার জন্যই তার স্নিগ্ধ উদ্যম অনবরত খরচ ক'রে চললো। কেন?— সোজা কারণ : সে মাথা উঁচু রাখতে চেয়েছে, আমাকে ত্যাগ ক'রে ছোটো হ'তে চায়নি স্ত্রীর কাছে আর নিজের কাছে। আমি জানি না, এই সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে অর্চনার সঙ্গে কী-রকম কথা হয়েছিলো তার, কিংবা কোনো কথা হয়েছিলো কিনা, আমার উপন্যাস লেখার অভ্যেস সত্ত্বেও ও-রকম কোনো আলাপের খশড়া বিশ্বাসযোগ্যভাবে ধরা দেয় না আমার মনে। কিন্তু প্রফুল্ল মনে-মনে কী ভেবেছে তা আমি অনুমান করতে পারি। ভেবেছে : 'বীরেশ্বরকে সরিয়ে দিয়েই বা আমার লাভ কী, যখন দেখছি অর্চনার মন ইতিমধ্যেই ওর দিকে ঝুঁকেছে? মানুষকেই সরানো যায়, ভাবনাকে তো নয়।' ভেবেছে : 'তিনজনের পক্ষেই কষ্টকর হ'য়ে উঠছে ব্যাপারটা, কিন্তু অন্যের কষ্ট কাটাবার জন্য আমি কি আত্মসম্মান খোয়াতে পারি? বিশেষত, বীরেশ্বরকে ঈর্ষা করার সত্যিই যখন কারণ ঘটলো, তখন ওর কোনোরকম বিরুদ্ধতা করা তো একেবারেই অসম্ভব।' আর ভেবেছে : 'বীরেশ্বরকে আমার ভালো লাগে ; আমাকে কি তার বন্ধুতা থেকে বঞ্চিত হ'তে হবে, যেহেতু আমার স্ত্রী তাকে ভালোবাসে?' বুদ্ধি দিয়ে এমনি ভেবেছে প্রফুল্ল ; আর, এদিকে, দিনের পর দিন, তার হৃদয়টাকে পোকার ঝাঁক খুঁটে-খুঁটে খেয়েছে। আমি তা দেখতে পেয়েছি তার মুখে ; অর্চনার মুখেও দেখেছি তার বেদনা। কিন্তু অর্চনার মুখেই এও দেখেছি যে আমাকে চোখে না-দেখলে তার বাঁচা অসম্ভব। অন্তত সে তা-ই ভাবছে।

অতএব আমাকেই এটা শেষ ক'রে দেবার উপায় ভাবতে হ'লো। ভালোর বিরুদ্ধে একটিমাত্র

অস্ত্র জানা ছিলো আমার : বর্বরতা। সুধা আর প্রফুল্ল (দুটো নাম একসঙ্গে লিখতেই আমার খারাপ লাগছে) : একজনের নির্বোধ শহীদপনা (যেটা সংসারে 'ভালো' নামে চলে), আর অন্য জনের বিষয়ে আমার এই ভয় যে সে হয়তো আমাকে বদলে দিতে পারে—ঐ দুটোরই বিরুদ্ধে আমার আত্মরক্ষার উপায় ছিলো—আগেই বলেছি—নিজেকে অপ্রীতিকর ক'রে তোলা। সুধার বেলায় হাতে-হাতে ফল পেয়েছিলাম, কিন্তু প্রফুল্ল আমাকে অনেক দূর পর্যন্ত হারিয়ে দিলে। প্রথমে ভেবেছিলাম সোফায় পা তুলে ব'সে আর গায়ে-জামায় সিগারেটের ছাই ঝেড়ে আর রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কথা ব'লেই তাকে (আর অর্চনাকে) আমার উপর বিরাগ শেখাতে পারবো। ভেবেছিলাম, যন্ত্রটা সূক্ষ্ম ব'লেই অল্প আঘাতেই বিগড়ে যাবে। কিন্তু—এটা বুঝতে অল্প একটু দেরি হ'লো আমার—শুধু সূক্ষ্মই নয়, এমন মজবুত যে তার ছিঁড়তে হ'লে ছোটোখাটো উপদ্রবে কুলোবে না, রীতিমতো অত্যাচার চাই। তাছাড়া, একবার 'শিল্পী' ব'লে পরিচিত হ'তে পারলে—দুঃখের বিষয়—রূঢ়তাকেও প্রতিভারই লক্ষণ ব'লে চালানো যায়—অন্তত, সে-রকম ভাববার লোকের অভাব ঘটে না। আর তাছাড়া, কিছুদিনের মধ্যে, অন্য সব কথাই শুকিয়ে ঝ'রে গেলো ; জেগে রইলো শুধু এই অনুভূতি যে আমাকে না-হ'লে তাদের চলে না, তাদের না-হ'লে আমার।

আর এমনি ক'রেই, শেষ পর্যন্ত, আমি এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে পৌঁছলুম যে প্রফুল্লকে স্থূলতম একটা আঘাত দিতে হবে ; আমার যে পরিচয় সুধা পেয়েছে, তার চেয়েও প্রকাণ্ড কোনো স্থূলতার আঘাত। প্রফুল্লর ভালোত্বটাই জবরদস্তিতে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে—কিন্তু আমিও তার যোগ্য জবাব দিতে পারি! আমার প্রতি বিতৃষ্ণায় তাকে মূর্ছিত ক'রে দেবো আমি, এমন করবো আমার নাম শুনলে তার বমি পাবে—তখন দেখবো আমাকে ছুঁড়ে না-ফেলে কেমন ক'রে পারে সে!

অবশ্য সেটাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো না। আমার মনে এ-রকম একটা আক্রোশও ছিলো যে প্রফুল্ল একটা বিরাট প্রলোভনের সামনে নিত্য ছেড়ে রাখছে আমাকে, অথচ আশা করছে আমি তাতে ধরা দেবো না। আর চেয়েছিলাম—যদিও তার কোনো প্রয়োজন আর ছিলো না—তবু চেয়েছিলাম অর্চনাকে এই কথাটা বলতে যে তাকে আমি চাই।

এক পাব্লিশরের কাছে হঠাৎ কিছু টাকা পেয়েছিলাম সেদিন। সন্ধ্যা তখন, সময়টা বোধহয় ফেব্রুয়ারির আরম্ভ বা মাঝামাঝি—সেই কয়েকটা বিরল দিনের একটি, যখন কলকাতায় নতুন ক'রে শীত নামে, আর তার পরেই দপ ক'রে আকাশ তেতে ওঠে। কলেজ স্কোয়ার থেকে বাস্ ধ'রে ধরমতলার মোড়ে নামলাম। ভরপুর যুদ্ধের সময়, জাপানিরা আসামে হানা দিচ্ছে, হিটলার রাশিয়াতে—আর সন্ধে হ'লেই কলকাতার অন্ধকারে জেগে উঠছে অদ্ভুত, অগুনতি, ফেনিল, উদ্দেশ্যহীন ভিড়। সেই একটা সময়, যখন আধ-মরা, মরচে-পড়া বাঙালির জীবনেও কিছু তীব্রতা এসেছিলো। বোমার ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত ছেলেখেলা ব'লে প্রতিপন্ন হ'লেও সাইরেন শুনলেই আশঙ্কায় ও আশায় বুক কাঁপে সকলেরই—তবু তো একটু অনিশ্চয়তা, নিয়মের ভাঙন, বাঁধা রুটিনের বদলে হঠাৎ পাগলামি—এক মুহূর্তে ম'রে যাবার, খোঁড়া হবার, যন্ত্রণা পাবার সম্ভাবনা, ইংরেজের নাকানিচুবুনির দৃশ্য দেখার রোমাঞ্চ, বুঝি বা ইংরেজকে তাড়ানো যাবে এবার, জাপানি আসবে, রুশ আসবে, নেতাজী আসবেন, এই সব জল্পনার উত্তেজনা—আর অন্ধকারে, বোমা-ঠেকানো দেয়ালের আড়ালে, বোমা ঠেকানো সিঁড়ির তলায়, এমনকি বোমা-ঠেকানো গর্তের মধ্যে—নতুন, অদ্ভুত, কল্পনাতীত যৌন সুযোগের মানস চিত্র। যা ভাবা যায় না, এমন যে-কোনো ঘটনা যে-কোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে : বন্ধ হ'তে পারে কলের জল, বিকল হ'তে পারে ইলেকট্রিসিটি, হাতে আসতে পারে লাখ টাকা, সাইরেন বাজলে অর্ধেক সিঁড়িতে পাশের ফ্ল্যাটের ন্যাকা মেয়েটা ঢ'লে পড়তে পারে গায়ের উপর। অবশ্য এর মধ্যেও বাঙালি তার সাবধানতা হারায়নি, রাত একটু ভারি হ'লেই সম্পূর্ণ রঙ্গমঞ্চ খাকি কোর্তাকে ছেড়ে দিয়ে বাবুরা স'রে পড়েন তাঁদের গৃহদুর্গে, আর বঙ্গললনারা সিনেমা দেখতেও রাত ক'রে চৌরঙ্গিতে আসেন না। তবু, অন্তত সন্ধেবেলার ভিড়ের মধ্যে স্পষ্ট দেখা যায় ছত্রিশ জাতের তালগোল পাকানো উন্মাদনার ছবি।

আমি সেই ভিড়ের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিলাম। কলকাতার ভিড় বরাবর ভালো লাগে আমার : কোনো-কোনো রাত্রে, পকেটে মাত্র কয়েক আনা পয়সা নিয়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে বেড়িয়েছি পথে-পথে, নিঃসঙ্গতার ইন্দ্রিয়বিলাসে অবগাহন করেছি। নগরের ভিড়ে মানুষ যেমন একা হ'তে পারে তেমন আর কোথাও নয়। পরিচয় নেই, নাম নেই, শুধু একটা অস্তিত্ব, চারদিকে খুলে-থাকা, ছড়িয়ে-পড়া, স্বেচ্ছাচারী চেতনা। এখানে কেউ কারো স্বামী নয়, বাবা নয়, চাকুরে নয়, অমুক তারিখের মধ্যে অমুক পত্রিকার লেখা দিতে বাধ্য নয়—এই একটা জায়গা, যেখানে আমার আমিত্ব, সব রকম সামাজিক সংযোজন ঝেড়ে ফেলে, বিশুদ্ধ আর সম্পূর্ণ হ'য়ে উঠতে পারে। আর সেদিন—পকেট ভরা ছিলো, মন ভরা ছিলো, রাস্তাটাও যেন আবর্তের মতো বুদ্বুদ তুলছে : নিজেকে রাজার মতো মনে হয়েছিলো সেদিন।

রাজা না-ব'লে সেনাপতি বলা উচিত। চরম আক্রমণের প্ল্যান ক'রে ফেলেছি ততক্ষণে, শত্রুকে আজ রাত্রেই বিনাশ করা চাই, কাল থেকে প্রফুল্ল আর আমাকে দেখবে না, দেখতে চাইবে না, পারবে না—কাল থেকে আমার যন্ত্রণার অবসান হবে। খুঁটিনাটি কিছুই ভাবতে বাকি রাখিনি। কেমন ক'রে কাটাবো এই কয়েক ঘণ্টা, কত দূর পর্যন্ত মাতাল হবো, কেমন ক'রে আঙুলের গাঁটে প্রচণ্ড টোকা দেবো দরজায়। গিয়ে কী বলবো, কী করবো, শুধু এ-বিষয়ে মনস্থির করতে পারিনি ; অনেক রকম ক'রে ভেবেছি, অনেক রকম কথা সাজিয়েছি মনে-মনে, তার মধ্যে কোনো-একটাকে বেছে না-নিয়ে সবগুলোকেই সম্ভাবনার মধ্যে রেখেছি। সেনাপতি শিবিরে ব'সে যতই সাবধানে চিন্তা করুন, যুদ্ধক্ষেত্রের প্রেরণার উপরেও অনেকটা নির্ভর করে বইকি। আমরা কি কখনো কোনো গল্প পুরোপুরি ভেবে নিতে পারি? লেখার সময় অপ্রত্যাশিত লাফিয়ে ওঠে, লিখতে বসার আগে তা ভাবাও যায় না—শত্রুর মুখোমুখি না-হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের বিষয়ে ধারণাই অস্পষ্ট থেকে যায়।

দুটো শস্তা বার্-এ দুটো বিয়ার খেয়ে আস্তে-আস্তে এস্‌প্লানেডের কাছে বোখারায় এলাম। নাম শুনে কেউ যেন না ভাবেন উঁচু জাতের ব্যাপার। ভারত-উদ্ধারকারী সৈনিক পুরুষের বিনোদনের জন্য চৌরঙ্গী ছেয়ে কত জায়গাই কেঁপে উঠছিলো তখন! এও তারই একটা ; পর্দা-ঢাকা কেবিন আছে, কাংসবাদ্যের ব্যবস্থা আছে, নাচের জায়গা আছে মেঝেতে। বলতে গেলে খাকিধারীদের একচেটে, আমার মতো দু-একজন কড়া আদমি ছাড়া ধুতি-পরা বাঙালি কেউ আসে না। মাঝে অনেকদিন যাইনি, কিন্তু বেয়ারা দেখেই চিনতে পারলে, সেলাম ক'রে দূরের দিকে একটা ছোটো টেবিলে বসতে দিলে।

আটটা বেজে গেছে তখন, সিনেমার শো ভাঙতেই জায়গাটা জ'মে উঠলো। ইংরেজ, মার্কিন, নিগ্রো সেপাই—তাদের হল্লা আর পিয়ারিদের মধ্যে ব'সে দু-ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম। গবাশ ক'রে খাচ্ছে তারা, চোঁ ক'রে গিলছে, বাঁ হাতে টাকা ফেলে দিয়ে হনহন ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছে অন্য কোথাও অন্য কোনো আমোদের খোঁজে। আমি ব'সে আছি এক কোণে ; আস্তে-আস্তে, ভেবে-ভেবে অ্যালকহলটাকে নিজের মধ্যে কাজ করতে দিচ্ছি। খাঁটি স্কচ, দেরিতে ধরে, সেটাই চাই আমি। শস্তা রাম গিলে বেহুঁশ হ'লে চলবে না আজ ; নিজের উপর নজর রাখা চাই, জরুরি কাজ আছে। আমি যতক্ষণ ছিলাম, ততক্ষণে অনেক দল এলো গেলো, কিন্তু সকলকেই এক লাগলো আমার চোখে, সকলেই যেন এক মুখস্থ-করা পার্ট ক'রে যাচ্ছে, কারো কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, বেছে নেবার কিছু নেই, ইচ্ছা বা অনিচ্ছা ব'লে কিছু নেই। সৈনিক ওরা, নম্বর-বসানো সৈনিক : এই ওদের ধর্ম। এদের মধ্যে অনেকেই হয়তো আগামী মাসে ম'রে যাবে, কিন্তু কে মরলো আর কে বাঁচলো, তাতে যুদ্ধের কিছু এসে যায় না। তেমনি : রাম্ খেলেও যা জিন খেলেই তা-ই ; এ-মেয়েটাকে বগল-দাবা করা যে-কথা, ও-মেয়েটাকে শুড়শুড়ি দেয়াও তা-ই। কিন্তু আমার অবস্থা অন্য রকম। আমার যুদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির।

ন-টার পরে বাদ্য বেজে উঠলো ; ভুতুড়ে-মতো নীলচে আলোয় ভুতুড়ে-মতো পোশাক-পরা চার মূর্তি হাত-পা ছুঁড়লো খানিকক্ষণ ; তারা যে মানুষ, এবং স্ত্রীলোক, তা বোঝা গেলো তখন,

যখন ঢনাৎ ক'রে বাজনা থামলো, আর তারা একটু আড়ালে গিয়ে লম্বা নাকওলা মুখোশ আর পালক-গোঁজা টুপি ছেড়ে খদ্দেরের টেবিলেই বিশ্রামের জায়গা খুঁজলো। হঠাৎ দেখি, তাদের একজন আমাকেই পছন্দ করেছে।

—'Hullo, dearie!'

আমি মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, তার রং-জ্বলা সাটিনের জামাটা যে অমন ভরপুর দেখাচ্ছে, তার কারণ কি তুলোর প্যাড, না কি ওটা সত্যি?

মেয়েটা আমার পাশের চেয়ারে ব'সে প'ড়ে চুনো গলির ইংরেজিতে জানালে যে তার তেষ্টা পেয়েছে।

আমার নিজের গ্লাশ তখন তলানিতে ঠেকেছে। আর-একটা কি নিতে পারি? হ্যাঁ, একটা, ঠিক আর-একটা। জীবনের সমস্ত ভার উবে যাবে, ঝাপসা হবে চারদিক, কিন্তু অন্ধকার নামবে না। ঠিক এই অবস্থায় পৌঁছতে চাই। তার দেরি নেই, কিন্তু আরো-একটা চলতে পারে। বাতও আরো ভারি হবে তাতে, ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারবো। এ-সময়টায় ওরা খেতে বসে, তারপর একটু বিশ্রাম, কি বইয়ের পাতা ওল্টানো—ঠিক যখন ওদের শোবার সময়, তখনই আমি ধাক্কা দেবো দরজায়। ঠিক আছে। চমৎকার। ইশারা ক'রে আরো দু গ্লাশ দিতে বললাম। চাইবার আগেই সিগারেট দিলাম মেয়েটাকে।

গ্লাশ হাতে নিয়ে এলিয়ে ব'সে আমার হাঁটুর উপর একটা পা তুলে দিলে মেয়েটা। আমি বললাম, 'পা নামাও।'

কাছে স'রে এসে হাতের উল্টো পিঠটা বুলিয়ে গেলো আমার গালে। বললে, 'আমি যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি এটা বেআইনি। সোলজার হ'লে আলাদা কথা, কিন্তু অন্য কারো সঙ্গে দেখলে অ্যারেস্ট করতে পারে। You don't like me?'

আমি জবাব না-দিয়ে মেয়েটাকে শুধু দেখতে লাগলাম। এর পরে সে বললে, 'আমার এগারোটা অবধি ছুটি। ইচ্ছে করলে বেরোতে পারি।' আমার ঘাড় থেকে আস্তে আস্তে পিঠের উপর দিয়ে হাত নামিয়ে আনলো।

আমি ব্যর্থ হ'য়ে চোখ সরিয়ে নিলাম। ব্যর্থ : কেননা, এতক্ষণ ধ'রে চেষ্টা ক'রেও নিজেকে এক কণা চেতিয়ে তুলতে পারলাম না আমি। আমি চেয়েছিলাম তা-ই, তা সম্ভব হ'লে সুখী হতাম, তাতে আমার আত্মসম্মান যেমন বেড়ে যেতো, তেমনি আরো তীব্র অপমান করা হ'তো প্রফুল্লকে। সে জানতো না—কিন্তু আমি তো জানতাম, কেমন উল্লাসে হাসতাম মনে-মনে। বীরেশ্বর গুপ্ত, যাকে ভালোবেসে নিজের স্ত্রীকেও হারাতে পারে প্রফুল্ল, সে যখন সগৌরবে তার দাবি জানাতে যাচ্ছে, তার আধ ঘণ্টা আগে সে পোকার মতো আটকে ছিলো একটা ময়লা, পচা, নারীমাংসের পিণ্ডের উপর। এত বড়ো তামাশা কি আর-কিছু!

কিন্তু পারলাম না। আমার রক্তমাংস জোচ্চোরি করলো আমার সঙ্গে ; কিছুতেই, মুহূর্তের জন্যও, সাড়া দিলো না। আমি, যার কাছে এ-সব ব্যাপার এক গ্লাশ জল খাওয়ার মতো, আমি ফেল হ'য়ে গেলাম, এ-কথা লিখতেও লজ্জা করে, আজ পর্যন্ত ভাবতে ভালো লাগে না। আজ পর্যন্ত, ঐ চুনো গলির মেয়েটার লোল ভঙ্গি আমার মনে পড়ে। আমার পালাবার একটা ছোটো দরজা খুলে দিয়েছিলো সে ; যে-বাঁধনে অর্চনা আমাকে আর নিজেকে জড়িয়েছে, তার বাধ্যতা থেকে পালাবার একটা সরু রাস্তা। তার সঙ্গে যদি যেতাম, হয়তো আমার প্রতিজ্ঞা টিকতো না, শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে বাড়ি ফিরেই যেতাম, কিংবা একেবারে নৃসিংহমূর্তিতে সারা রাতটাই কাটিয়ে দিতাম বাইরে। আর তারপর—তারপর থেকে হয়তো শক্তি পেতাম নিজেকে দূরে সরিয়ে নেবার—ঐ গলিবাসিনীরা সাহায্য করতো। অনেক মূঢ়তার পর এই চরম মূঢ়তা করতাম না তাহ'লে, আর শেষ পর্যন্ত সেই ভয়ংকরও ঘটতো না।

—কিন্তু কী লাভ এখন এ-সব ভেবে। আমরা ভবিতব্যের শিকলে বাঁধা, আর তা আমাদের

নিজেদেরই রচনা। সেই রাত্রে, সেই বোখারা রেস্তোরাঁয় ব'সে, আমার শরীরের প্রতিটি রক্তকণিকা উন্মাদ সুরে একটি কথা জপ করছিলো—শুধু একটি কথা : অর্চনা। ঐ মেয়েটাকে দেখতে দেখতে, তার প্রস্তাবে রাজি হবার যখন চেষ্টা করছি, তখন আমি বুঝলাম যে এতক্ষণ ধ'রে ব'সে-ব'সে আসলে আমি শুধু অর্চনাকেই ভেবেছি, একটা অন্ধ জোয়ারের মতো আমার কামনা এগিয়ে গেছে তার দিকে, চরাচরে ছড়িয়ে গিয়ে বিন্দু-বিন্দু ক'রে চুঁইয়ে পড়েছে। পৃথিবীর অন্য সব নারী তখনকার মতো ম'রে গিয়েছিলো আমার কাছে ; এই জন্ত শরীরটাও জবাব দিলো না।

বিল্ চুকিয়ে দেবার সময় এক মুঠো নোট তুললাম পকেট থেকে। মেয়েটা তাকিয়ে রইলো। তার হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম।

বাইরে একটি আশ্চর্য কালো রাত্রি আমার নেশা-ধরা চোখের সামনে সমুদ্রের মতো দুলে উঠলো। বেশ ঠাণ্ডা, উত্তর থেকে ধারালো হাওয়া দিচ্ছে মাঝে-মাঝে, কুয়াশার স্যাঁৎসেঁতে গামছাটাকে বুলিয়ে-বুলিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর মুখের উপর। ঠিক সেই ঋতু, যখন ঠাণ্ডা দেশে যক্ষ্মারোগীরা মরে, গরম দেশে বাতের কষ্ট বেড়ে ওঠে, আর সারা পৃথিবীতে চাপা-পড়া প্রাণের বীজাণুগুলো কিলবিল ক'রে বেরিয়ে আসে মাটির উপর। আমার ভিতরে নেশা, এই হাওয়াতেও নেশা ; সৈনিকের ঝাপসা ভিড়ের মধ্য দিয়ে আমি আস্তে হাঁটছি আর এদিক-ওদিক চোখ ফেলছি।

ট্র্যাম-বাস্ বন্ধ ; ট্যাক্সি দুর্লভ। খালি একটা যেই দেখা দিচ্ছে, ভালো ক'রে থামার আগেই খাকি-কোর্তারা লাফিয়ে উঠে পড়ছে। তিন বার হেরে গেলাম তাদের কাছে, ট্যাক্সিওলা আমার দিকে দৃষ্টিপাতও করলে না। —নির্বোধ। জানে না পৃথিবীর একমাত্র নারী অপেক্ষা ক'রে আছে আমার জন্য।

এর পরের ট্যাক্সিটাকে আমি ছুটে গিয়ে ধ'রে ফেললাম, নিজেকে প্রায় ছুঁড়ে দিলাম ওর মধ্যে। অবজ্ঞার সুরে সর্দারজী জিগেস করলেন,—'কাঁহা যানা?'

'বালিগঞ্জ।'

'আট রুপেয়া পড়েগা।'

'দস্ মিলেগা। চলো!'

আর ট্যাক্সির হাওয়া উজানে বইলো আসন্ন থেকে উপস্থিতে : যে-কথা আমি বলবো, যে-কথা সে বলবে, সব আমি কানে শুনতে পেলাম। মনে হ'লো, যাওয়ামাত্র তাকে দেখবো, দেখামাত্র তাকে পাবো, তারপর এই রাত্রি আর ভোর হবে না।

কিন্তু দরজা খুলে দিলে প্রফুল্ল।

'এই যে, আসুন। আমরা আপনার কথাই—' বলতে-বলতে প্রফুল্ল থেমে গেলো। আমি তাকে ঠেলে সরিয়ে ঘরে এলাম।

'প্রফুল্ল আমি তোমার কাছে আসিনি। অর্চনাকে ডাকো।' সামনের সোফাটায় এলিয়ে প'ড়ে আবার বললাম, 'ডাকো অর্চনাকে। তার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

প্রফুল্ল আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। 'আপনি আজ অসুস্থ আছেন। বাড়ি যান।'

'আমি যাবো না। তুমি চ'লে যাও এখান থেকে প্রফুল্ল। তোমার চোখের তলে শিরা ফুলে উঠছে। লাল হ'যে উঠছে চোখ। তোমার দিকে তাকাতে কষ্ট হচ্ছে আমার। তুমি যাও। তাকে পাঠিয়ে দাও।'

.চোখে ঝাপসা দেখছি তখন, কথা জড়িয়ে আসছে, তবু—যেমন কোনো-কোনো স্বপ্ন আমাদের বহুদিন পর্যন্ত স্পষ্ট মনে থাকে—তেমনি সেই রাত্রিরও সব কথা মনে পড়ে আমার। মনে পড়ে ব'লে মনে হয়, অন্তত। এখনো চোখের সামনে দেখতে পাই প্রফুল্লর পাজামা আর পাঞ্জাবি পরা চেহারাটা, তার নিঃশব্দ আর ঈষৎ উদ্বিগ্ন চলাফেরা, তার কপালের রেখা, তার ঈষৎ বড়ো-দেখানো চোখ।

'আপনি শুয়ে থাকুন—এখানে শুয়ে থাকুন একটু—' ফিশফিশ ক'রে সে বললে, 'একটু সুস্থ হ'লে বাড়ি যাবেন।'

আমি বললাম, 'প্রফুল্ল, তুমি কাপুরুষ। তোমার স্ত্রীকে কেন আসতে বলো না এখানে? আমাকে কেন ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দাও না? যদি তুমি পুরুষ হ'তে, তাহ'লে এ-দুটোর একটা কাজ নিশ্চয়ই করতে তুমি!'

'আপনি চুপ করুন। আর কথা বলবেন না। এই যে—আমাকে ধরুন। উঠুন তো। চলুন আপনাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।'

'না—' তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম আমি—'তোমার ও-সব ভালো ব্যবহার আমি চাই না। তোমার করুণার জন্য আমি আসিনি আজ রাত্রে, তোমাকে ধ্বংস করতে এসেছি।'

'উঠুন। একটু শান্ত হোন। আজ রাত্রে ভালো ক'রে ঘুমোন—কাল কথা হবে।'

'আমি যাবো না যতক্ষণ না অর্চনাকে দেখতে পাই।' ব'লে আমি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু মুখ ফেরাতেই অর্চনা আমার চোখে পড়লো। পাশাপাশি বসার ঘর আর শোবার ঘর, মাঝখানে দরজায় নীল রঙের পরদা ঝুলছে, সেই পরদা পিছনে রেখে শাদা শাড়ি প'রে দাঁড়িয়ে আছে অর্চনা। আমার যেন চোখ ধাঁধিয়ে গেলো, মনে হ'লো মূর্ছিত হ'য়ে প'ড়ে যাবো। আমার গলা দিয়ে অস্পষ্ট আওয়াজ বেরোলো, 'অর্চনা!'

প্রফুল্ল তাকে চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করল, কিন্তু সে কয়েক পা এগিয়ে এলো আমার দিকে। লম্বা সোফাটায় আমি প্রায় শুয়ে পড়েছি, তখন, জুতো ফেলে দিয়েছি পা থেকে, একটা হাত অসহায়ভাবে ঝুলছে। শরীরটাকে আর নিজের ব'লে মনে হচ্ছে না। তবু বলতেই হবে, কথা আমাকে বলতেই হবে।

'প্রফুল্ল, তুমি এ-ঘর থেকে চ'লে যাও। যাবে না? তাহ'লে চোখ বুজে থাকো। দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকো। তোমার এই লজ্জার দৃশ্য চোখে দেখো না, প্রফুল্ল। অর্চনা, তুমি কি বলবে তোমার স্বামীকে এ-ঘর থেকে চ'লে যেতে?'

ওরা দু-জন আমার দু-দিকে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো, দু-জনেই আমার দিকে তাকিয়ে, নিঃশব্দ। আমি বলতে লাগলাম, 'অর্চনা, তুমি এত ভীরু? এত কপট? এখনো তোমার স্বামীর আশ্রয় চাও? কেন তুমি তোমার মনের কথা খুলে বলো না? কেন দিনের পর দিন তোমার প্রতারণা—প্রফুল্লর সঙ্গেও, আমার সঙ্গে?'

আমি দেখলাম অর্চনার মুখ পাথরের মতো, চোখ দুটো কঠিন কোনো মণির মতো জ্বলছে। মুহূর্তের জন্য প্রায় মনে হ'লো সে আমার কথার জবাব দেবে, কিন্তু সে আস্তে-আস্তে তার হাতের কাছের চেয়ারটায় ব'সে পড়লো—ভেঙে পড়লো—নিচু হয়ে মুখ ঢাকলো হাতের পাতায়। একটা অস্ফুট আওয়াজ আমার কানে বাজলো, ফাঁদে-পড়া জন্তুর কান্নার মতো। তারপর হঠাৎ একটা মস্ত নীরবতা ঘিরে ফেললো আমাকে।

সে-রাতেও সেই একটি দাঁড়ানো আলো জ্বলছিলো, কিন্তু তা-ই আমার মনে হচ্ছিলো বড়ো বেশি উজ্জ্বল। চোখের পাতা ভারি হয়ে নেমে আসছে, মনে হচ্ছে অন্ধকারের চেয়ে আকাঙ্ক্ষার বস্তু আর নেই মানুষের। প্রফুল্ল-যে ঘর থেকে চ'লে গেছে তা বুঝতে একটু দেরি হ'লো আমার। প্রফুল্ল নেই ; অর্চনা ব'সে আছে—ঠিক তেমনি, নিচু হ'য়ে হাতে মুখ ঢেকে। আমি আমার দুই হাত বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে, কিন্তু হাত দুটো অসাড় হ'য়ে ঝুলে রইলো। উঠে এগিয়ে গেলাম, কিন্তু আমার শরীর প'ড়ে রইলো নিশ্চল। চীৎকার ক'রে ডাকলাম, কিন্তু নীরবতায় রেখাপাত হ'লো না। তবু আমার মৃত শরীর প্রতি রোমকূপে অনুভব করলে তার উপস্থিতি, আমার আহত চেতনার পরতে-পরতে সেই উপলব্ধি প্রবেশ করলো। মুহূর্তের জন্য এই পাপচিন্তাও ঝিলিক দিলো আমার মনে—'তার সঙ্গে একা আমি আছি, কী হয়েছিলো আমাদের মধ্যে, বা কী হয়নি, প্রফুল্ল কোনোদিন জানবে না, হয়তো জিগেসও করবে না কোনোদিন, কিংবা সত্য জবাব পেলেও বিশ্বাস করবে না—এই কাঁটা সারা জীবন বিঁধে থাকবে ওকে। এইখানেই আমার জিৎ।' কিন্তু আমি কী করছি—অর্চনা কোথায় —আর এই অন্ধকারে লাল, নীল, সবুজ রং, আর কানের মধ্যে বাঁশির মতো

আওয়াজ—আমি কি জেগে আছি—আমি কি ঘুমিয়ে পড়ছি—অর্চনা!

যখন জেগে উঠলাম, তখনো অন্ধকার। কোথায় আছি তা ধারণা করতেই অনেকক্ষণ কেটে গেলো। ধীরে ভেসে উঠলো ঘরের দেয়াল, দেয়ালের কোণে রেডিওগ্রামের আকৃতি, আলমারির মাথায় অদ্ভুত পুতুলের সারি। আমি কান পাতলাম, চারদিক মৃত্যুর মতো স্তব্ধ ; পাশের ঘর থেকে নিশ্বাসপাতের শব্দ নেই। সেই সোফাটাতেই শুয়ে আছি দেখলাম ; মাথাটা যেন থান-ইট, জিভ চামড়ার মতো শুকনো হাৎড়ে-হাৎড়ে জুতো খুঁজে পেলাম না ; আস্তে উঠে, আলো না-জ্বেলে, খোলা পায়েই বাইরে এলাম। ফ্ল্যাটের দরজা খোলার টুক ক'রে শব্দ হ'লো। একটু দাঁড়ালাম, কোথাও সাড়াশব্দ নেই। দরজা ভেজিয়ে, অন্ধকারে হোঁচট খেতে-খেতে নেমে এলাম সিঁড়ি দিয়ে। হাওয়ায় শীত ; ভোর হ'তে দেরি নেই। খানিক হেঁটে, তারপর রিকশ নিয়ে বাড়ি এলাম। অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর আলো জ্বললো।

সুধাকে পাশ কাটিয়ে দরজা থেকেই সোজা বিছানার দিকে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সুধা স'রে এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। টেবিলের উপর টাইমপীসটাতে একবার চোখ ফেললো, একবার আমার দিকে তাকালো। ঘুম-ভাঙা গোল-গোল সরল চোখে তাকালো আমার দিকে —যেমন ক'রে শিশুরা চিড়িয়াখানার জানোয়ার দ্যাখে। খালি গায়ে শোয়া তার অভ্যেস ; মস্ত, ভারি বুকের উপর খাটো আঁচল এলিয়ে, শরীর নিয়ে আমার দিকে তাকালো সে।

'সাড়ে-চারটে।'

'দেখছি তো।'

'এত রাত হ'লো?'

'হ'য়ে গেলো।'

'তোমার পায়ে জুতো দেখছি না?'

'স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে গেলো—ফেলে দিলাম।'

'ফেলে দিলে? সত্যি?'

'না, মিথ্যে। এখন ঘুমোতে দাও।'

'শোনো—' সুধা আবার পথ আটকালো। 'কোথায় গিয়েছিলে? ছিলে কোথায়?'

আমি জবাব দিলাম না।

'মদ খেয়ে চুর হয়েছো তা তো বুঝতে পারছি—-কিন্তু ছিলে কোথায়?'

'জানতে চাও?'

'হ্যাঁ, জানতে চাই। বলো, বলো কোথায় ছিলে তুমি।' আমাকে কাঁধে ধ'রে ঝাঁকুনি দিলে সে—বলো! তোমাকে বলতেই হবে!'

হঠাৎ আমার একটু কষ্ট হ'লো সুধার জন্য। বেচারা। কী জীবন তার! আর-কোনো উপায় নেই ব'লেই তো প'ড়ে আছে এখানে।

'বলছো না?' সুধা একটু দূরে স'রে দাঁড়ালো। 'তাহ'লে আমিই বলছি। অর্চনার বাড়িতে ছিলে। ঠিক না?'

'ঠিক। এখন থামো। শুতে দাও।' ব'লে আমি আর-একবার পা বাড়ালাম, কিন্তু সে ছুটে এসে একটা ভালুকের মতো লাফিয়ে পড়লো আমার উপর ; আমাকে খামচে, খাবলে, গায়ের জামা ছিঁড়ে দিয়ে বলতে লাগলো, 'অর্চনা! অর্চনা রায়! ঘুমের মধ্যেও তার নাম বলো তুমি! ছি-ছি-ছি! কী ঘেন্না! আবার নাকি বিয়েও হয়েছে! বেশ্যবাড়িতে গিয়ে প'ড়ে থাকো তা বুঝি—ঐ কাজ ওদের—পুরুষেরও ঐ কাজ—কিন্তু একজন ঘরের বৌ! যার বিয়ে হয়েছে! যার স্বামী আছে! ছেলেপুলে আছে! মদ খেয়ে, জুতো হারিয়ে—ঘেন্না! ঘেন্না! ঘেন্না!' বলতে-বলতে তার ঠোঁটে ফেনা উঠলো, আঁচল খ'সে পড়লো গা থেকে, বুকের দুটো মোটা মাংসপিণ্ড লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠলো তার হাত নাড়ার তালে-তালে। একটু দম নিয়ে আবার বললে—'আর ঐ লোকটা—ঐ প্রফুল্ল রায়—'

—'চুপ!'

'—ওটা কি একটা পাঁঠা, না কি তার বৌকে ভাড়া খাটায়?'

'চুপ করো!' আমার গলা ছিঁড়ে আওয়াজ বেরোলো, আর সঙ্গে-সঙ্গে এক ধাক্কায় সুধাকে ফেলে দিলাম মেঝের উপর। ছেলেমেয়েগুলো ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে উঠলো।

এই প্রথম প্রতিবাদ সুধার। এই শেষ। বেচারা সুধা।

বারো

আবার নিঃসঙ্গতা—আবার শূন্যতার মরুভূমি। না—'আবার' বলাটা ঠিক হ'লো না ; কেননা এতদিন আমি শুধু নিঃসঙ্গ ছিলাম, তৃষিত ছিলাম না। কিংবা, তৃষ্ণা যদি বা ছিলো, সে-বিষয়ে চেতনা ছিলো না আমার। নিঃসঙ্গতাকেই আমার স্বাভাবিক অবস্থা ব'লে আমি ধ'রে নিয়েছিলাম, মেনে নিয়েছিলাম অনিবার্য ব'লে। মাছ যেমন জলে, তেমনি ঐ অবস্থাটার মধ্যেই স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছি। সেটা কষ্টের কিছু নয়, আপত্তি করবার কিছু নেই তাতে ; বরং আমার স্বভাবের পক্ষে সেটাই সবচেয়ে অনুকূল। নিঃসঙ্গতা, স্বাধীনতা, দায়িত্বহীনতা : এ-ই সবচেয়ে কাম্য ছিলো আমার ; আমি ঘৃণা করেছি সাংসারিকতাকে, বোকার মতো তার ফাঁদে একবার মাথা পেতে, তারপর ভণ্ডের মতো সেটারই জয়ধ্বনি করিনি, অবিলম্বেই গারদ ভেঙে বেরিয়ে এসেছি। সেই বাইরেটাকে নোংরা ব'লে থাকে লোকেরা, কিন্তু আমি দেখেছি সেটা অন্তত ভণ্ডামি আর চালিয়াতি থেকে মুক্ত ; সেখানে যে যা নয় তা-ই ব'লে চালাতে চায় না নিজেকে—যা ভদ্রলোকেরা অনবরত ক'রে থাকেন ; টাকার জন্য দেশের কাজ, নিজেদের বোতল ভরতি রেখে প্রহিবিশনের বক্তৃতা করা, সমাজে 'জলচল' হবার জন্য সাহিত্যের বুলি আওড়ানো, নিজের কামে ব্যর্থ হ'য়ে প্রতিশোধের জন্য 'পতিতা ভগিনী'দের উদ্ধার করা—অন্তত এ-সব পাপ নেই সেখানে ; নেশাটা সেখানে নেশাই, আর জুয়োটা জুয়ো, আর বেশ্যারা খোলাখুলিভাবে শরীর বেচে—এগুলোকেই অন্য কোনো মিনিমুখো শৌখিন নামে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা নেই—এক হিশেবে অনেক বেশি পরিষ্কার জগৎ, আমার স্ত্রীপুত্রের বিড়ম্বনা-ভরা সংসারের চাইতে ভিতর-দিক থেকে অনেক খাঁটি আর পরিষ্কার। আর এই জগৎ নিয়ে—যেহেতু আর-কিছু আমার জানা নেই, আর যেহেতু আমি নিজের জীবনকে কোনোদিনই মূল্যবান ব'লে জানিনি—এই সব দাগি, কড়া, চকচকে, ছটফটে উপাদান নিয়ে একরকম নির্বিকারভাবেই বছরগুলো কাটিয়ে এসেছি আমি। সুখ ছিলো কিনা জানি না ; কিন্তু মনস্তাপ ছিলো না, অভাববোধ ছিলো না, নকল-সাধু, নকল-পীর নকল-পণ্ডিতকে সেলাম জানাবার আত্মগ্লানি ছিলো না। ভালো ছিলাম।

কিন্তু এখন—এখন সব অন্য রকম। শুধু নিঃসঙ্গতা নয়, শূন্যতা—একটা অন্তহীন 'নেই' গহ্বরের মতো গ্রাস করেছে আমাকে। কী নেই? আলো নেই, গতি নেই, উদ্যম নেই, বেদনা নেই, জীবন নেই। একমাত্র যাতে এসে যায়, তা-ই নেই। অবশেষে কিছু-একটা পেয়েছিলাম, যাতে এসে যায়। যাকে, নিজে না-বুঝেও, মূল্য দিয়েছিলাম আমি। অন্য কোনো জীবন, কোনো—ব'লেই ফেলি কথাটা—কোনো সুন্দর জীবন। ভদ্র নয়, শোভন নয়, সামাজিক নয়, স্বাভাবিক এবং সুন্দর। স্বাভাবিক অথচ সুন্দর। যে-জীবন আমার নয়, কিন্তু হ'তে পারতো। যাকে আমি প্রায় নিজের ক'রে এনেছিলাম। কিন্তু আমাকেই ধ্বংস করতে হ'লো ; ভেবে-চিন্তে, পরিশ্রম ক'রে নিজের হাতে ধ্বংস কবতে হ'লো। ধ্বংস করেছি, অথচ সেটাকে ভুলতে পারছি না। নেকড়ের পালের মতো, তৃষ্ণা আমার পিছনে ছুটছে। কোনো মদ নেই, সে-তৃষ্ণা যা মেটাতে পারে।

আমি রাত্রে ঘুমোচ্ছি, ঘুম থেকে উঠছি, আপিশে যাচ্ছি, বাড়িও ফিরছি এক সময়ে, কিন্তু আমার শরীরটা আমাকে বাদ দিয়ে কাজগুলো ক'রে যাচ্ছে কোনোরকমে। স্নানের সময় নিজের একটা হাতের দিকে তাকিয়ে ভাবি : 'এই হাত আমার? সত্যি কি আমি এই শরীরটার মধ্যে আছি?'

খাবার সময়ে মনে হয় : 'খিদে যার পায় সে তো এই শরীর ; আমি এর মধ্যে কোথায়?' শরীরের সঙ্গে এই বিচ্ছেদবোধের ফলে অন্য কোনো উপায়েও ভুলিয়ে রাখতে পারি না নিজেকে। আমার এতদিনকার সহায়গুলো অকেজো হ'য়ে উঠলো। আমার শেষ সম্বল—যার জন্য পকেটে কয়েকটা টাকা মাত্র প্রয়োজন হয়—তাও পাছে হারাতে হয় ভেবে আতঙ্কে হিম হ'য়ে গেলাম। জোর ক'রে নিয়ে যাই নিজেকে ও-সব পাড়ায় ; কিন্তু তাদেরও তেমন খাঁটি ব'লে মনে হয় না আর, বিকট সন্দেহ দেখা দেয় যে ওরাও বদলিমাত্র, বই লেখার মতোই বদলি, আসল নয়, বাঁচা একে বলে না, আসলে আমি অন্য কিছু চাই।

এই সময়েই ইচ্ছার অসহযোগ কাটিয়ে নিজের উপর বলাৎকার করতে শিখলাম আমি। এটাই আমার বিষয়ে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কথা। এতদিন যা উন্মাদনার জন্য করেছি, এখন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাতে আমার মাথা ঠাণ্ডা থাকে। নিষ্ঠুরভাবে ঠাণ্ডা। তেতো পাঁচনের মতো ব্যবহার করতে যাই ওটাকে, কোনো বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার মতো ; কিন্তু ওষুধে কাজ হয় না। নিজেকে ভুলতে পারি না মুহূর্তের জন্য।

কিন্তু নিজের কথা বেশি ভাবতেও পারি না, ওদের কথাই মনে পড়ে। মনে পড়ে প্রফুল্লকে, অর্চনাকে। কিন্তু 'মনে পড়ে' কথাটা কি ঠিক হ'লো? আর-একটা প্রশ্ন : কাকে? প্রফুল্ল—না অর্চনা : কার কথা ভাবি আমি? দু-জনকেই ভাবি : একজনকে আলাদা ক'রে নেয়া অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। নিজের আমি কী-ক্ষতি করেছি ভাবি না কখনো : ওদের জীবনটাকে কী-রকমভাবে ভেঙে দিলাম, কতখানি ভেঙে দিলাম—এই চিন্তা ঘুমের মধ্যেও আমাকে নিষ্কৃতি দেয় না। একটা পাথর বেঁধে নিয়েছি গলায়, সিনবাদ চেপে বসেছে কাঁধে : অনুক্ষণ, সারাক্ষণ, প্রতিক্ষণ তার বোঝা টেনে-টেনে চলেছি ; একটা বোবা, ভারি, বিক্ষত জন্তু অফুরন্তভাবে মারা যাচ্ছে অথচ যেন কখনোই পুরোপুরি ম'রে যাচ্ছে না। আমি তো গুণ্ডামি ক'রে চ'লে এলাম, পালিয়ে এসে বাঁচলাম— কিন্তু ওরা কেমন আছে? আমার তো জীবন ব'লে কিছু নেই—কোনোকালেই ছিলো না— বানের জলে কুটোর মতো ভেসেছি—কিন্তু ওদের ছিলো সুগঠিত নৌকো, স্থির লক্ষ্য, অনুকূল স্রোত। কেমন ক'রে ওরা তাকিয়েছে পরস্পরের দিকে—সেই রাত্রে, পরের দিন, আরো পরে? কেমন ক'রে কথা বলেছে, কী-কথা বলেছে? ওরা কি এড়িয়ে গেছে পরস্পরের চোখ, ফাঁকা গলায় বাজে কথা বলেছে—আমার নাম আর মুখে না-এনে আমাকে আরো বেশি ঘাতকরূপে উপস্থিত রেখেছে নিজেদের মধ্যে? না কি সোজাসুজি আক্রমণ ক'রে আমাকে নষ্ট করতে পেরেছে এতদিনে—অনেক কথা ব'লে, অনেক কথা শুনে, হয়তো কিছু কেঁদে এবং কাঁদিয়ে? না কি এটাকে ধুলোর মতো ঝেড়ে দিতে পেরেছে গা থেকে : তারা, চোদ্দ বছরের বিবাহিত, সন্তানের মা-বাবা—এতে সত্যি বলতে কী বা এসে যায় তাদের, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোনো পাগল যদি ঢিল ছোঁড়ে তাতে বড়ো জোর যে শার্শিটা ভাঙবে সেটা সারিয়ে নিতে কতক্ষণ! এমন কি সম্ভব হয় না যে তারা এতদিনে এটাকে ভুলে গিয়ে তাদের পুরোনো, তাদের স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়েছে?

—যদি তা সম্ভব ব'লে একবারও ভাবতে পারতাম তবে তো আর ভাবনাই ছিলো না। কিন্তু আমি জানতাম সেটা হবার নয়। ফিরে পাবে কারা? আর কে-ই বা কাকে ফিরে পাবে? সেই পুরোনো অর্চনা আর প্রফুল্ল তো আর নেই। দু-জনেই বদলে গেছে এর মধ্যে। শুধু অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি হ'তে পারে, কিন্তু প্রাণপদার্থ প্রথমে ম'রে যায়—তবে যদি আবার বেঁচে উঠতে পারে।

আমি জানতাম ওদের আঘাত কত গভীর। সবচেয়ে বেশি ওরা যা করতে পারে তা একটা অভিনয় মাত্র। যেন কিছুই হয়নি, এই ভান। কিন্তু ওটা থাকবে সব সময়, ছায়ার মতো, অদৃশ্য উপস্থিতির মতো ;—একবার যে এ-রকম হ'তে পারলো তাতেই তো ওরা বুঝেছে ওদের ভিৎ কত ভঙ্গুর। তার চেয়ে বড়ো লজ্জা আর কী হ'তে পারে ওদের—নিজেদের কাছে, আর পরস্পরের কাছে?

দোষী কে? অর্চনা? না, দোষ আমার। কিন্তু অর্চনার কিছু দোষ না-থাকলে আমারই বা দোষ

হয় কেমন ক'রে? আবার মনে হয় : আসল অপরাধী প্রফুল্ল, সে কেন অঙ্কুরেই এটাকে বিনাশ করেনি, সব জেনেও কেন সে এখানে পৌঁছতে দিলো আমাকে?

—কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর জীবনের কথা কী জানি আমি, সুখী দম্পতীর কথা কিছুই জানি না। যা করেছি, ভালোই করেছি ; আমার হাতে ওর বেশি ছিলো না—এর পরে সময়ের হাত।

—কিন্তু তবু, তবু আমি নিশ্চিত হ'তে পারি না যে ওরা আমাকে ঘৃণা করতে পেরেছে, ফেলে দিতে পেরেছে মন থেকে, নৌকোতে ভার-বাড়ানো বাজে মালের মতো। আর এখানেই নতুন ক'রে সব ভাবনার আরম্ভ হয়।

আমার মনে একটা পাগল ইচ্ছে জেগে উঠলো আর-একবার ওদের দেখে আসতে। শুধু একবার চোখে দেখবো—আর কিছু না। প্রফুল্লর আপিশের সময় ওর বাড়ির রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকি যদি? কি ছুটির সময় আপিশের বাইরে? ও-সব করবার কোনো বাধাই ছিলো না আমার, কিন্তু মুশকিল এই যে দু-জনকে একসঙ্গে দেখতে চাই। একবার দূর থেকে দেখা যায় না কোনোরকমে? গরম পড়েছে : লেকে আসে না? সিনেমায় যায়? যদি একবার, মুহূর্তের জন্যও, ভাবতে পারতাম ওরা ভালো আছে!

এই রকম যখন ভাবছি—মাস দুই কেটে গেছে ততদিনে—কড়কড়ে শুকনো গরম কলকাতায়—একদিন সকালে আমার দরজায় মৃদু টোকা পড়লো। পাওনাদার ছাড়া কেউ বড়ো আসে না এই বাড়িতে—তেলওলা, বাড়িওলার হাফ-প্যান্ট-পরা ঢ্যাঙা ছেলেটা, আর তাদের সামনে (দৈবাৎ বাড়ি থাকলে) সুধাকেই যেতে দিই আমি, কেননা সে বেশ নরম ক'রে ফেরাতে পাবে তাদের, আমি এক কথার পর দু কথাতেই রেগে যাই। কিন্তু তাবা সবাই কড়া নাড়ে—ঝনঝন ক'রে ঘোষণা করে তাদের দাবিতে ভরা আগমন, হঠাৎ ঐ মৃদু টোকাটা আমার কানে নতুন লাগলো ব'লে আমি নিজেই উঠে গিয়ে দরজা খুললাম।

বাইরে প্রফুল্ল দাঁড়িয়ে।

ঘরে বসবার জায়গা নেই, আমি গেঞ্জি গায়েই তার সঙ্গে রাস্তায় এলাম। নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলাম দু-জনে, গলির মোড়ে এসে প্রফুল্ল থামলো। প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট-কেস বের ক'বে বাড়িযে দিলে।

রাস্তায়, আকাশের তলায়, রোদ্দুরে, তাকে দেখে আমি তখনই বুঝলাম যে সংশযের কোনো কারণ নেই। আমি যা করেছি, সেই ক্ষতির পরিমাণ তার মুখেই লেখা আছে। ক্লান্ত দেখলাম তাকে, যেন হঠাৎ বয়স বেড়ে গেছে। আগে কখনো বুঝিনি তার মাথার চুল এত ধূসর, নাকের পাশে রেখা এত গভীর। এতদিন তাকে ঘরের মধ্যে দেখেছি, প্রায় সব সময় রাতের ম্লান আলোয়, এখন রোদ্দুর তার সব গোপন দুর্বলতা নিষ্ঠুরভাবে উদ্ঘাটন ক'রে দিলে। কিন্তু রোদ্দুরকে দিয়ে কী হবে।

বললাম, 'একটু স'রে আসুন। এদিকে ছায়া আছে।'

একটা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালাম দু-জনে। টুংটুং ক'রে একটা রিকশ চ'লে গেলো।

প্রফুল্ল বললে, 'আমি আবার এলাম আপনার কাছে। একটা কথা বলতে এলাম।'

'বলুন—' আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো—'আমি কী করতে পারি, বলুন। আদেশ করুন আমাকে। আপনি বললে আমি এ-মুহূর্তে কলকাতা ছেড়ে চ'লে যাবো। আমি সব পাবি। তোমার জন্য আমি সব পারি, প্রফুল্ল।'

'আপনাকে আর-একবার আসতে হবে।'

'কোথায়?'

'আমি—আমরা যেখানে থাকি। আর-একবার। তারপর আর বলবো না।'

আমার মুখ কঠিন হ'য়ে গেলো, চোখ দুটো নিবদ্ধ হ'লো তার মুখের উপর। সে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আস্তে-আস্তে বললে, 'কথাটা এই যে আপনার অভাব ভুলতে পারি না আমরা। মস্ত একটা ফাঁকা —অন্য কিছুতেই তা ভরানো যায় না। জানি, আপনার পক্ষে আরো অনেক কঠিন সেটা।

কিন্তু, উপায় কী।'

'একমাত্র উপায়,' আমি ব'লে উঠলাম, 'আর কখনো দেখা না হওয়া।'

'জানি। কিন্তু আমি তা চাইনি কখনো। এখনো চাই না।'

'এখনো চান না? যা-কিছু হ'য়ে গেলো তার পরেও না?'

'তার পরেও না। অর্চনা বলে, ''আমার জন্যেই এ-সব হলো, আমি না-থাকলে সুন্দর বন্ধুতা হ'তো তোমাদের। সব নষ্ট হ'য়ে গেলো—আমারই জন্য।'' আমি তাকে বলি, ''তুমি না-থাকলে বন্ধুতা হ'তো না। কিছুই হ'তো না।'' '

'এ-সব কথায় কী লাভ এখন?' একটু অসহিষ্ণুভাবে আমি বললাম, 'আপনারা—ভালো থাকুন—যে ক'রে হোক চেষ্টা করুন তার জন্য—আর-কিছুরই কোনো অর্থ হয় না।'

'আমিও ভেবেছি সে-কথা। কিন্তু মুশকিল এই, আমরা প্রত্যেকেই অন্য দু-জনকেই চাই। সোজাসুজি বেছে নেবার কিছু নেই এখানে। কেউ কারো জায়গা নিতে পারে না। সে-ই তো মুশকিল।'

'কিন্তু আগে ছিলেন না আপনারা? এতদিন ধ'রে একসঙ্গে একই জীবন কাটাবার পর—'

'সেটা আর নেই।' আমার কথার বাধা দিলো প্রফুল্ল, যেটা তার পক্ষে অস্বাভাবিক।

'আছে! নিশ্চয়ই আছে! আমাকে বাদ দিয়ে দিন ; এ-বকম একটা বাজে ব্যাপারটাকে এত মূল্য দেবেন কেন আপনারা? আমি খারাপ লোক ; আমার মধ্যে ভালোবাসা নেই, শুধু জন্তুর চাহিদা আছে। যে-কোনো, যে-কোনো উপায়ে আমার বিরুদ্ধতা করুন—এই আমার প্রার্থনা আপনার কাছে।'

'নিজের বিরুদ্ধতা আপনি তো কম করলেন না। তাতে কি ফল হ'লো?'

'কিন্তু সময় আছে এখনো। আপনি ফিরে যান, যেখানে ছিলেন সেখানেই ফিরে যান ; আস্তে-আস্তে সব ঠিক হ'য়ে যাবে।'

'তা-ই মনে হয় আপনার?' হঠাৎ যেন ঠাট্টা ঝিলিক দিলো প্রফুল্লর ঠোঁটে। 'কিন্তু যেখানে ফিরে যেতে বলছেন সেই জায়গাটা কি আর সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে?'

'হয়তো সেটা অপেক্ষা ক'রে আছে সামনে। আমি স'রে গেলেই তার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আমাকে তুমি আর ডেকো না, প্রফুল্ল!'

একটু চুপ ক'রে রইলো সে, হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে জুতোর তলায় মাড়িয়ে দিয়ে।—'বেশ, তা-ই হবে। আর ডাকবো না আপনাকে। কিন্তু আজ একবার আসবেন। অর্চনা কাল দারজিলিং চ'লে যাচ্ছে ছেলেমেয়েদের নিয়ে।'

'তুমি যাচ্ছো না?'

'এখন ছুটি পেলাম না। পারি তো পরে যাবো।'

'তাহ'লে সবাই মিলে পরে গেলেই হয়।'

'না। এই ব্যবস্থাই ভালো ; আমাদের সকলেরই একা থাকার দরকার হয়েছে।' প্রফুল্ল তার হাত-ঘড়িতে চোখ ফেললো। 'তাহ'লে আসছেন আজ সন্ধেবেলা?'

'তুমি বলছো আসতে?'

প্রফুল্ল নরম ক'রে হাসলো। অন্য রকম গলায় বললে, 'আসবেন। ওখানেই খাবেন রাত্রে। এখন চলি—আপিশের বেলা হ'লো।'

'গাড়ি কোথায়?'

'আনিনি। বাস্ নেবো।'

তার সঙ্গে বড়ো রাস্তা অবধি এলাম। মুহূর্তের জন্য হালকা হ'য়ে গেলো আমার মন, প্রায় সুখী মনে হ'লো নিজেকে। খুব ইচ্ছে করলো তার হাত দুটো একবার জড়িয়ে ধরতে ; কিন্তু লজ্জায় পেছিয়ে গেলাম। লজ্জাটাকে উপভোগ করলাম মনে-মনে।

তেরো

নতুন আরম্ভের মতো মনে হ'লো, যখন তাদের ফ্ল্যাটে গেলাম সন্ধের পরে। বসবার ঘরের ব্যবস্থার একটু বদল হয়েছে, পিকাসোর বদলে একটা দিশি ছবি ; চ্যাপ্টা টেবিলে সারি-সারি কিছু নতুন বই চিৎ ক'রে সাজানো। প্রফুল্লর মুখ দেখে সকালে আমার যা-ই মনে হ'য়ে থাক, এই সব জড় বস্তুগুলি—দরজার পরদা থেকে প্রত্যেকটি চকচকে অ্যাশট্রে পর্যন্ত—শৃঙ্খলাই শুধু প্রচার করছে। ভাঙচুরের তিলতম লক্ষণ নেই কোথাও, কিছু নেই মলিন বা উদাসীন, বরং সবই যেন নতুন কোনো উজ্জীবনের দিকে উন্মুখ ; আমি পর্যন্ত ধোপ-দুরস্ত জামা-কাপড় প'রে, চুলে তেল-জল দিয়ে, নম্র আর সহাস্যভাবে ব'সে আছি। আশ্চর্য শান্ত একটা ভালো-লাগার আবহাওয়া সেদিন পেয়েছিলাম ; যেন ওরা আমার বহুদিনের পুরোনো বন্ধু যাদের সঙ্গে বহুদিন পর দেখা হ'লো ; অল্প একটু লজ্জা আছে পরস্পরের মধ্যে, কিন্তু কোনো আড়ষ্টতা নেই—পরস্পরকে গ্রহণ ক'রে নিতে এক মুহূর্ত দেরি হয়নি।

এই অদ্ভুত কেমন ক'রে সম্ভব হয়েছিলো আজ পর্যন্ত আমি তা জানি না। সুন্দর একটা হালকা-নীল শাড়ি পরেছে অর্চনা। আগের চেয়ে একটু বেশি উপস্থিত সে, একটু বেশি কথা বলছে : যদি তা ভিতরকার কোনো অপ্রতিভতা লুকোবার জন্য হয়, তার ব্যবহারে তা ধরা পড়েনি। সোজা তাকালো আমার দিকে (আমিও তার দিকে তাকাতে পারলাম) ; নানা রকম ছোটো-ছোটো কথা হ'লো ; ছেলেমেয়ে দুটিকে আসতে দেয়া হ'লো কিছুক্ষণের জন্য, ঘরের মধ্যে একটা সুগন্ধি হাওয়া রেখে গেলো তারা। খাবার আগে প্রফুল্ল ইটালিয়ান ভার্মূথ বের করলে, খাবার সঙ্গে এলো হালকা ফরাশি শাদা ওয়াইন। এগুলো গ্রহণ করতে প্রথমে একটু সংকোচ হ'লো আমার ; কিন্তু আমার লজ্জা কাটাবার জন্য ওরা যখন সৌজন্যের রাজা হ'য়ে উঠলো, তখন আমিই বা কাঙালের মতো মুখ ফিরিয়ে থাকবো কেন। ওদের সঙ্গে যোগ দিতেই হবে আমাকে—প্রফুল্লর কোনো কথা অমান্য করতে পারি এমন শক্তি আমার কোথায় আজ।

বোঝা গেলো, প্রফুল্ল অনেক যত্নে আজকের এই সন্ধ্যার ব্যবস্থা করেছে। শুধু খাওয়া নয়, রীতিমতো একটি অনুষ্ঠান। যুদ্ধের অনটনের মধ্যে বহু চেষ্টায় সংগ্রহ করেছে এ-সব পানীয় ; তার টেবিল প্রাচুর্যে উচ্ছল ; সেখানে, তাদের দু-জনের মাঝখানে ব'সে, আমি ভুলে গেলাম পৃথিবীতে কোথাও কোনো দুঃখ আছে, বিকৃতি আছে। পৃথিবীতে নেই, এখানেও নেই ; এখানে যারা উপস্থিত তাদের কোনো দুঃখ নেই আর। কী সুস্বাদু খাবার, কী শীতল আর মসৃণ মদ, কী সুন্দর অর্চনা, আর প্রফুল্ল কী দেবতার মতো মানুষ। খাওয়া যত অগ্রসর হ'লো, ততই আরো স্বচ্ছন্দে আমি কথা বললাম ; একেবারে নতুন মানুষ মনে হ'লো নিজেকে ; শেষ পর্যন্ত প্রফুল্লরই জয় হ'লো এ-কথা ভাবতে আমার অস্তিত্বটাকে সার্থক মানলাম। সব ভুল ভেবেছিলাম—মনে-মনে বললাম আমি—প্রফুল্ল আজ সকালে সব ভুল বলেছিলো—কিছুই হয়নি, সব ঠিক আছে, পরস্পরকে হারিয়ে ফেলেনি, ওরা, আর সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে আমাকেও ওরা বাঁচিয়ে তুললো আবার। এর প্রতিদানে কী করতে পারি আমি, কী আমার দেবার আছে, আমার সকল সত্তা নিংড়ে বের ক'রে দিলেও এর কাছে তার মূল্য কতটুকু।

খাওয়া শেষ হ'লো, হাত-ধোবার বাটিও সরানো হ'য়ে গেলো ; প্রফুল্ল বললে, 'আসুন এটা ক'রে ফেলা যাক।'

'ও-ঘরে গিয়ে বসলে হয় না?' অর্চনা ওঠার মতো ভঙ্গি করলে, কিন্তু প্রফুল্ল বাধা দিলে তাকে। 'বোসো। এখানেই বসা যাক। বেশ লাগছে। তুমি নেবে আর-একটু?'

'না। আর ওটা না-ই বা শেষ করলে।'

'আর অল্পই আছে।' দুটো গ্লাশ ভরতি ক'রে দিলে প্রফুল্ল। আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'এই ওয়াইন ভালো লাগলো আপনার?'

'খুব ভালো। সবই ভালো। জানি না আর কখনো আমার এত ভালো লেগেছে কিনা।'

'রাতটিও সুন্দর হয়েছে,' প্রফুল্ল জানলার বাইরে তাকালো। 'খুব জ্যোছনা আজ, জানেন? আর কী-রকম হাওয়ার শব্দ বাইরে।'

আমি বললাম, 'তার জন্যে কিছু হয়নি ; আপনাদের জন্যই সব ভালো লাগছে আমার।'

'কিন্তু রাতটার দিকে তাকানো উচিত। দেখুন।' প্রফুল্ল উঠে আলো নিবিয়ে দিলে। হঠাৎ জ্যোছনার দুটো বড়ো-বড়ো ফালি জেগে উঠলো ঘরের মধ্যে। বাইরের গাছপালার কালো পুঞ্জ আমার চোখে পড়লো। তার উপরে আকাশের একটা নীল টুকরো। আর, একই সময়ে, অর্চনাকে আমি অনুভব করলাম, এত কাছে আমার। শুনলাম তার নিশ্বাসের শব্দ, অন্ধকারে ঝিলিক দিলো তার চোখ।

তারপর অর্চনা উঠে আলোটা আবার জ্বেলে দিলে। আমাকে বললে, 'চলুন ঘরে গিয়ে বসবেন।'

'যাবেন?' জানলায় কনুই রেখে প্রফুল্ল দাঁড়িয়ে, হাতে সরু-ডাঁটের গ্লাশ, তার পিছনে চাঁদের আলোর রাত্রিটাকে এখন ইলেট্রিক আলোতেও বোঝা যাচ্ছে। আবার তাকে তরুণ দেখাচ্ছে, প্রায় কিশোরের মতো, ফিরে এসেছে তার মুখের লালচে আভা, তার গলার আওয়াজ মখমলের মতো মসৃণ। 'না, ঘরে গিয়ে কাজ নেই। চলুন, বেরোনো যাক। চলো, অর্চনা। গাড়িতে তেল ভরতি আছে আজ। চলো।'

'এখন আবার বেরোতে চাও তুমি?' অর্চনা এ-কথা বলামাত্র আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'আজ থাক। মিসেস রায় কাল চ'লে যাচ্ছেন—গোছগাছ আছে—আজ একটু শিগগির শুয়ে পড়া ভালো।'

'কাল? কালকের অনেক দেরি আছে এখনো।'

'বেশ তো ; তুমি ঘুরে এসো এঁকে নিয়ে। আমি থাকি।'

'সে কী হয়!' প্রফুল্ল হেসে উঠলো। 'তার কোনো মানেই হয় না।' গ্লাশের তলানিটুকু এক ঢোঁকে শেষ ক'রে সে একটু পাইচারি করলে ঘরের মধ্যে। 'এখন না-হ'লে আর হবে না কখনো। আবার কবে দেখা হবে এই তিনজনের!'

'হবে বইকি? নিশ্চয়ই হবে! আপনারা তো এখানেই রইলেন,' অর্চনা আমার দিকে তাকালো, 'আর আমিও ফিরে আসবো।' হাসতে চেষ্টা করলো সে, কিন্তু আমি দেখলাম তার মুখ ম্লান।

'তাহ'লে আর দেরি কিসের,' প্রফুল্ল এগিয়ে এলো অর্চনার কাছে। তার কাঁধে হাত রেখে আস্তে বললে, 'লক্ষ্মী তো, চলো!' তার স্পর্শ থেকে ঈষৎ পিছনে স'রে গেল অর্চনা। কিন্তু প্রফুল্লর উদ্দীপনাকেও সে ঠেকাতে পারলে না ; কয়েক মিনিট পরে আমরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম।

নিচে এসে প্রফুল্ল বললে, 'একটু দাঁড়াও তোমরা। গাড়িটা বের করি।' সে অদৃশ্য হ'লো গারাজের দিকে ; রাস্তার গাছগুলো নিশ্বাস ফেললো হাওয়ায় ; আধো জ্যোছনায়, আধো ছায়ায় অন্য একটা জগৎ জেগে উঠলো। ব্ল্যাক-আউটের রাত্রে অন্ধকার যেমন ঘন, জ্যোছনা, তেমনি উজ্জ্বল ; কাকগুলো বোকার মতো চ্যাঁচামেচি করছে ; এপ্রিল অথবা মে মাসের ছড়ানো মেঘের ঝোড়ো আকাশে একটা গোল, চ্যাপ্টা, দাগ-ধরা চাঁদ ছুটে-ছুটে কোনোখানেই থামতে পারছে না।

একটু অপেক্ষা করতে হ'লো আমাদের। বাড়ির পিছন দিকে গারাজ, সামনে খানিকটা জমি, গাড়ির জন্য রাস্তা করা আছে। সিঁড়ির ঠিক বাইরে আমরা দাঁড়িয়েছি, মাথার উপরে বাড়ানো একটু ছাদের জন্য ছায়া করেছে সেখানে। তার মধ্যে অর্চনার নীল শাড়িটা ঢেউ তুলে এগিয়ে এলো আমার দিকে।

আমি বললাম, 'দারজিলিঙে কি অনেকদিন থাকবেন?'

'যতদিন ছেলেমেয়ের স্কুল না খোলে। তারপর জানি না।'

'প্রফুল্ল যাবে না?'

'উনিও ছুটির চেষ্টা করছেন, কিন্তু—' আমি একটা খশখশানি শুনলাম, অর্চনা আমার আরো কাছে স'রে এলো। 'আপনাকে একটা কথা বলতে চাই আমি।'

'বলুন।'

'প্রফুল্ল আপনাকে ভালোবাসে।'

'তা আমি জানি।'

'আর আপনি?'

'সে-কথা কি মুখে বলা যায়।'

'তারও দরকার আছে। প্রফুল্লকে ভালোবাসেন না আপনি?'

'বাসি।'

'আর আমাকে?'

আমি নিরুত্তর।

'থাক। বলতে হবে না। জানি আমি সব। জানি, আমাকে ভালোবাসেন। একটা কাজ করবেন আমার জন্য?'

'প্রফুল্লকে আমি বলেছি তার জন্য সব করতে পারি। তা নাহ'লে আবার আসতাম না।'

'সব পারেন? বেশ। তাহ'লে এই কথা দিন আমাকে যে প্রফুল্লকে আপনি কখনো ছেড়ে যাবেন না। আমি যখন এখানে থাকবো না তখনো ছেড়ে দেবেন না তাকে।'

'কিন্তু আপনি থাকবেন না কেন? দু-মাস পরেই তো ফিরে আসবেন।'

'আমি সে-কথা ভাবছিলাম না।'

'তবে?'

'আমি ভাবছিলাম—আমি চাই—আমি থাকি বা না থাকি তাতে যেন আর এসে না যায়। আমি—চাই প্রফুল্ল ভালো থাক। তার জন্যেই সব। তার জন্যেই আপনাকেও চাই আমি।'

'আর সেইজন্যেই নিজেকে আপনি আড়ালে রাখতে চান।' আমার এতক্ষণের সব ভালো লাগা মুহূর্তে চুরমার হ'য়ে ভেঙে গেলো। দপ ক'রে জ্ব'লে উঠলো সব পুরোনো ঈর্ষা, আমার হিংস্রতার বিষ, ডাইনির চুল্লির মতো কামনা। ব'লে উঠলাম, 'না, অর্চনা, না! তুমি না-থাকলে কিছুরই কোনো মানে হয় না আমার কাছে। তুমি—তুমি—তুমি আমার সব!' ব'লে আমি দু-হাতের মধ্যে জাপটে ধরলাম তার নীল-শাড়ি-পরা শরীর, তার সুগন্ধি মুখটাকে ভেঙে ফেললাম আমার মুখের উপর। সে স'রে গেলো না—না, অর্চনা সরিয়ে নিলো না নিজেকে, আমার বুকের উপর ধ্বকধ্বক ক'রে বাজতে লাগলো তার হৃৎপিণ্ড।

তারপর আমি দেখলাম মস্ত কালো গাড়িটা এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। অর্চনা উঠলো, সম্মোহিতের মতো আমিও উঠে তার পাশে বসলাম।

প্রফুল্ল এক পলক তাকালো তার স্ত্রীর দিকে। 'তোমার শাড়িটা কুঁচকে গেছে। বদলে আসবে নাকি?'

'থাক। ওতে আর কী হবে।'

'তাই তো। ওতে আর কী হবে।' প্রফুল্ল নিচু হ'য়ে গাড়ির খোপে হাৎড়ালো, একটা বেঁটে চ্যাপ্টা বোতল হাতে তুলে বললো, 'বীরেশ্বরবাবু, একটা নতুন জিনিশ খাওয়াই আপনাকে। আসুন। বোতল থেকেই খেতে হবে কিন্তু।'

অর্চনা বললে, 'ওটা কি গাড়িতেই ছিলো?'

'তা-ই তো দেখছি।'

'ওটা ফেলে দাও। আর খেয়ো না।'

'ভাবছো নেশা হ'য়ে যাবে? জানো না আমার মাথা কত শক্ত। —নিন। সুন্দর হয়েছে রাত্রিটা—না?'

তার হাত থেকে বোতল নিতে হ'লো। খানিকটা ঝাঁঝালো আগুনে পুড়ে গেলো ভিতরটা। ও-রকম কিছুই আগে খাইনি কখনো।

'প্রফুল্ল, তুমি আর খেয়ো না!'

'এই—একটু।' প্রফুল্ল ঘাড় উঁচু করলো, বোতলটা শূন্যে উঠে গেলো তার হাতে। বাঁ হাতে ঠোঁট মুছে, ছিপি এঁটে ওটা সরিয়ে রেখে গাড়িতে স্টার্ট দিলে।

অবিশ্বাস্য একটা রাত্রি। কলকাতার রাস্তা চাঁদের আলোয় গ'লে গেছে, ধাবমান গাড়ির দু-পাশে ব'য়ে যাচ্ছে নদীর মতো। কখনো ঝকঝকে রুপোলি, কখনো মেঘের ছায়ায় ইস্পাত-রঙের। আকাশে ছাড়া-ছাড়া মেঘ, ঝোড়ো চাঁদ, আর হাওয়ায় গাছগুলোর এমন অবস্থা যেন শিকড় ছিঁড়ে উড়ে চ'লে যাবে। ল্যান্সডাউন রোড নিঃশব্দে প'ড়ে রইলো পিছনে, লেকের জল চিকচিক ক'রে মিলিয়ে গেলো।

অর্চনা বললে, 'এবার ফিরি চলো।'

'এখনই? তোমার ভালো লাগছে না? এমন একটা রাত্রি জীবনে ক-বার পাওয়া যায়! চলো ডায়মণ্ড হার্বর।'

'অত দূরে?'

'দূর কী? চল্লিশ মিনিটে ফিরে আসতে পারি।' টালিগঞ্জের দিকে বেগে ছুটলো গাড়ি ; খানিক পরেই দেখলাম শহর আর নেই, দু-দিকে ধানখেত আর ঝোপঝাড় আর প্রকাণ্ড একটা ধনুকের মতো আকাশ। মস্ত একটা মুক্তির জোয়ার ভাসিয়ে নিয়ে গেলো আমাকে। মাতাল ছিলাম, সুখী ছিলাম—আশ্চর্য সেই অনুভূতি।

অর্চনা আবার বললে, 'আর না। ফিরে চলো। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'ঘুম পাচ্ছে? এখানেই ঘুমোও না। আমার কাঁধে মাথা রাখো।' অর্চনার মুখের উপর চকিতে একবার চোখ ফেললো প্রফুল্ল। গাড়ির এঞ্জিন বোঁ ক'রে উঠলো ; ষাট মাইল, সত্তর মাইলে কাঁপতে লাগলো স্পীডোমিটারের কাঁটা, নৌকোয় দাঁড়ের মতো ছপছপ শব্দে বাড়ি লাগলো হাওয়ায়। 'বীরেশ্বরবাবু, আপনার ভালো লাগছে না?'

'চমৎকার! একেবারে ঠিক সময়, ঠিক জায়গা। কিন্তু প্রফুল্ল, তুমি আর দেরি করছো কেন?'

'দেরি করছি?'

'না, আর দেরি না!' আমি চীৎকার ক'রে বললাম, 'আমাকে ফেলে দাও গাড়ি থেকে। শোনো—এই আমি দরজা খুলছি—ধাক্কা দিয়ে ফেলে দাও আমাকে—আমি আর ব'সে থাকতে পারছি না এখানে, আর সহ্য করতে পারছি না।'

ব'লে আমি গাড়ির দরজায় হাত দিলাম। প্রফুল্ল বললে, 'ওঁর নেশা হয়েছে। ওঁকে ধ'রে রাখো, অর্চনা। শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে রাখো।'

'কী পাগলামি!' অর্চনার আর্ত স্বর বেজে উঠলো—'আস্তে! আস্তে চলো! ফিরে চলো! বাড়ি চলো!'

আমি বলতে লাগলাম—'আর না! আর আমি সহ্য করতে পারি না! প্রফুল্ল, গাড়ি থামাও—আমি রাস্তার উপর শুয়ে থাকি—আমার উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাও। আমি যদি ভয় না করি, তুমি কি ভয় করবে?'

'ও-সব নাটকের কথা আপনার মুখে মানায় না।'

'নাটকের কথা? না, না—সত্যি, সত্যি, সত্যি! আর কী আমি করতে পারি—আর কেমন ক'রে আমি প্রমাণ করতে পারি—'

'চুপ করুন—আপনার পায়ে পড়ি আপনি চুপ করুন।' অর্চনা আমার হাত চেপে ধরলে—আমি বুঝলাম সে থরথর ক'রে কাঁপছে।

'ঠিক! এই ঠিক! অর্চনা—তুমি থামিয়ে রাখো ওঁকে। এমন সুন্দর রাত্রিটাকে নষ্ট হ'তে দিয়ো না!'

'কিন্তু তুমি গাড়ি ঘোরাও। ফিরে চলো।'

'হ্যাঁ—সামনে একটা মোড় পেলেই ঘুরিয়ে নেবো। যা দেখছি, ফিরতেই হবে।'

গাড়ি মসৃণ বেগে ছুটতে লাগলো যেন অনন্ত শূন্যের মধ্য দিয়ে। অর্চনার হাত ছাড়িয়ে সোজা হ'য়ে বসলাম, ব'লে উঠলাম—'প্রফুল্ল, শোনো আমার কথা—গাড়ি থামাও, আমি নেমে যাই—আমাকে থেঁৎলে দিয়ে চ'লে যাও তুমি! তা যদি না পারো তাহ'লে তুমি অর্চনাকে আর পাবে না। প্রফুল্ল—'

আমি অর্চনার গায়ের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে প্রফুল্লর হাত ধ'রে জোরে ঝাঁকুনি দিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে অর্চনাও ঝুঁকে পড়লো তার স্বামীর গায়ের উপর ; গাড়ি বেঁকে গেলো। তারপর কী হ'লো মনে নেই—শুধু নারীকণ্ঠের চীৎকার দীর্ঘ হ'য়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেলো।

সব শান্ত, নির্মল চাঁদ, উদার আকাশ—তার তলায় ধানখেতের মধ্যে শুয়ে আছি। মনে হ'লো একটু দূরে কী-একটা দেখা যাচ্ছে, কালো একটা পুঞ্জ, হয়তো কোনো মানুষ। বুকে হেঁচড়ে, হামাগুড়ি দিয়ে, একটা অকথ্য যন্ত্রণার বোঝা টেনে-টেনে, আস্তে এগিয়ে গেলাম সেদিকে। গাড়িটা উপুড় হ'য়ে তুবড়ে প'ড়ে আছে, তার তলা থেকে বেরিয়ে আছে অর্চনার নিটোল মুখ, আর তার পরিপূর্ণ পিষ্ট যৌবন কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত। পাশে, হাঁটু ভেঙে ব'সে, প্রফুল্ল উপুড় হ'য়ে পড়েছে সেই মুখের উপর, পাগলের মতো ডাকছে, 'অর্চনা! অর্চনা! অর্চনা!'

কোনো উত্তর নেই। পাথরের মতো স্থির হ'য়ে গেছে অর্চনার চোখ, মৃতের দৃষ্টির মতো স্থির ও চিরন্তন—সেই চোখ, যা আমি মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারি না।

আমাকে দেখে প্রফুল্ল বিকট আওয়াজে ব'লে উঠলো, 'বীরেশ্বর, তুমি এই করলে!'

আমি কথা বলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তার আগেই আমার সারা আকাশ অন্ধকার হ'য়ে গেলো।

পরে শুনেছি, একটা মিলিটারি লরি আমাদের দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে নিয়েছিলো। আমি দু-মাস হাসপাতালে ছিলাম। প্রফুল্ল সেই হাসপাতালেই ছিলো শুনেছি, কিন্তু তাকে আমি দেখতে পাইনি ; পরে সে কোথায় গেলো তাও জানি না। আর অর্চনার কথা আর-কিছু বলবাব নেই।

*　　　*　　　*

—কিন্তু কিছুই বলা হ'লো না।

রাত ভ'রে বৃষ্টি

এক

হ'য়ে গেছে—ওটা হ'যে গেছে—এখন আর কিছু বলার নেই। আমি, মালতী মুখোপাধ্যায়, একজনের স্ত্রী আর একজনের মা, আমি ওটা করেছি। করেছি জয়ন্তর সঙ্গে, জয়ন্ত আমাকে চেয়েছে, আমিও তাকে। নয়নাংশু হয়তো ভাবছে আগেই করেছিলুম, কিন্তু না—আজই প্রথম। আজ রাত্রে—চার ঘণ্টা আগে। এই বিছানায়। যেখানে মালতী এখন শুয়ে আছে।

কেমন ক'রে হ'লো? খুব সহজ। সত্যি বলতে আগে কেন হয়নি জানি না—আমার সংযমে, জয়ন্তর ধৈর্যে, আমি অবাক হ'য়ে যাচ্ছি। রাত্তির ন-টা নাগাদ জয়ন্ত এলো, আর তক্ষুনি এমন বৃষ্টি নামলো যে আধ ঘণ্টার মধ্যে জল দাঁড়িয়ে গেলো আমাদের গলিতে। দশটা, সাড়ে-দশটা—বৃষ্টি আর থামে না। অংশু গেছে তার মুমূর্ষু পিসিমাকে দেখতে বেলেঘাটায়, বুন্নি আমার মা-র কাছে থাকছে আজ, দুর্গামণি ভাঁড়ার ঘরে মাদুর বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। আমি ফ্ল্যাটের দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে শোবার ঘরে এলুম—বৃষ্টির ছাঁটে কিছু ভিজে-টিজে যাচ্ছে কি না দেখার জন্য। 'আমার সিগারেট ফুরিয়ে গেলো. নয়নাংশুর দেরাজে আছে নাকি দু-এক প্যাকেট?' বলতে বলতে জয়ন্তও এলো শোবার ঘরে। আমি নিচু হ'যে যখন দেরাজ ঘাঁটছি তখন জয়ন্ত পিছন থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরলো, আমি মুখ তুলে তাকিয়ে বললুম, 'তাহ'লে সিগারেট চাও না?' সে আমার কানের উপর ঠোঁট চেপে ডাকলো, 'লোটন!' আমি তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে আলো নিবিয়ে দিলুম। এমনি ক'রে হয়ে গেলো ব্যাপারটা।

ভালো লাগছে, এখন বেশ ভালো লাগছে আমার। বুঝতে পারছি এতদিন এটা ঠেকিয়ে রেখে ভালো করিনি।

গা-ভরা আরাম নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, হঠাৎ চোখ খুলে দেখি আলো জ্বলছে আর চুপচুপে ভেজা জামা-কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছে নয়নাংশু। আমি বললুম, 'এই এলে?' 'হ্যাঁ—আমার পাজামাগুলো কোথায় আছে জানো নাকি?' 'ঐ যে বাঁ দিকের দেরাজে' ব'লে আমি আবার একটু চোখ বুজলুম, অলস লাগছিলো, উঠতে ইচ্ছে করছিলো না। অংশু বললে, 'এত রাতে ফ্ল্যাটের দরজা খোলা রেখে ভালো করোনি, তুমি আর দুর্গামণি ছাড়া কেউ বাড়ি নেই, দু-জনেই অঘোরে ঘুমুচ্ছো—যাকে বলে চোরকে ডেকে আনা, এ হলো তাই-ই। 'খোলা ছিলো নাকি দরজা?' নয়নাংশু কাপড় ছাড়তে বাথরুমে ঢুকলো, আমি হঠাৎ তাকিয়ে দেখলুম ওর খাটের উপর আমার ব্লাউজটা প'ড়ে আছে, আমি শুয়ে আছি কোনোমতে শুধু শাড়িটা জড়িয়ে—তড়াক ক'রে উঠে ব্লাউজ প'রে নিলুম, শাড়িটা ঠিকমতো ঘুরিয়ে দিয়ে, চুল আঁচড়ে, মুখে একটু পাউডারও বুলিয়ে নিলুম তাড়াতাড়ি—আয়নায় মনে হ'লো না মালতীকে অন্য দিনের চাইতে কিছু আলাদা দেখাচ্ছে। কিন্তু কী রকম ভুল হয়, আশ্চর্য—তখন আমি ভালোবাসতে গিয়েও দরজা বন্ধ করতে ভুলিনি (প্রেম তাহ'লে বেপরোয়া উদ্দাম নয়?), কিন্তু জয়ন্ত চ'লে যাবার পর হাট হ'য়ে রইলো ফ্ল্যাটের দরজা, ঘরের দরজা, জামাটা পর্যন্ত গায়ে দিতে মনে থাকলো না, তক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়লুম। নয়নাংশু কিছু লক্ষ করেছে নাকি? তা করুক গে—একজন বিবাহিতা মহিলা তাঁর শোবার ঘরে যে-ভাবেই শুয়ে থাকুন, তা নিয়ে কার কী বলবার আছে?

খেতে ব'সে অংশু জিগেস করলে, 'এত রাত অবধি না-খেয়ে ছিলে কেন?' 'রাত অনেক বুঝি?' 'বারোটা। খেয়ে নিলেই পারতে।' বারোটা শুনে অবাক লাগলো আমার, জয়ন্ত আসার পর থেকে ঘণ্টাগুলি ছিলো কি ছিলো না তখন যেন মনে করতে পারছিলুম না, যদি বুঝতুম এত রাত হয়েছে তাহ'লে আমার নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তা হ'তো অংশুর জন্য, আর সে ঘরে ঢোকামাত্র বলতুম, 'কী কাণ্ড!

এত শত করলে! ঐদিকে আমি ভেবে-ভেবে সারা!' অংশুর দিকে তাকিয়ে মনে হ'লো সে এখনো ঐ রকম কিছু শুনতে চাচ্ছে আমার মুখে ; তাই বললুম, 'তোমার এত দেরি হ'লো কেন?' 'বাঃ, কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ! কী তুমুল বৃষ্টি আজ কলকাতায়—বেলেঘাটা গঙ্গা হয়ে গেছে, হেঁটে-হেঁটে শেয়ালদার মোড়ে এলুম, তারপর রিকসাতে জোড়াগির্জে অবধি এসে তবে একটা ট্যাক্সি জুটলো।' বেশ তৃপ্তির সঙ্গে কথাগুলো বললে নয়নাংশু, যেন সুন্দরবনে বাঘ মেরে এসেছে—আমার মনে পড়লো কয়েকদিন আগে বাথরুমে একটা বিছে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলো সে, তারপর কোত্থেকে একটা লাঠি জোগাড় ক'রে খুব সাবধানে দূর থেকে মেরেছিলো ঐ একরত্তি প্রাণীটাকে। আমার কাছে এসে বলেওছিলো, 'ওটাকে মেরেছি।' আমি ওর দিকে না তাকিয়ে জবাব দিয়েছিলুম, 'খুব বীরত্ব করেছো!' (যেন চার বছর আগেকার বুন্নি বলছে, 'মা, মা, শোনো—জানালায় একটা কাক বসেছিলো, আমি তাড়িয়ে দিয়েছি!') ওকে মাঝে মাঝেই বালকের মতো লাগে আমার, বাচ্চা ছেলের মতো—আর, একজন পূর্ণ যুবতীর বালক স্বামী হ'লে কেমন লাগে? জয়ন্ত হ'লে কী করতো ওখানে? কথাটি বলতো না—নিঃশব্দে পিষে দিতো স্যান্ডেলের তলায়।

মুর্গির ঝোল দিয়ে ভাত মেখে নিয়ে নয়নাংশু বললে, 'তোমাকে অনেকদিন বলেছি—আমার জন্যে ব'সে থেকো না, সময়মতো খেয়ে নিয়ো।' আমি জবাব দিলুম, 'একা-একা খেতে বিশ্রী লাগে আমার।' কথাটা কিন্তু খাঁটি—একটুও বানানো নয়—নয়নাংশুর ফিরতে যত দেরিই হোক ওকে ফেলে খেতে পারি না আমি, ওটা আমার অভ্যাস—হয়তো একেই সংস্কার বলে—ছেলেবেলায় মা-কে দেখতুম বাবার জন্যে ব'সে থাকতে, হয়তো তা'ই থেকে এসেছে। অংশু মুহূর্তের জন্য খাওয়া থামিয়ে জিগেস করলে, 'কেউ এসেছিলো?' আমি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলুম, 'জয়ন্ত—জয়ন্তবাবু এসেছিলেন ন-টা নাগাদ। তোমার জন্য অনেকক্ষণ ব'সে ছিলেন।' (এই এক ঝামেলা--অন্যদের সামনে 'বাবু' বলা, 'আপনি' বলা!) 'আমার জন্য কেন?' 'কী যেন দরকার ছিলো ওঁর পত্রিকার ব্যাপারে।' 'তা ওকে বসিয়ে রাখলে না?' বলে নয়নাংশু আমার চোখে চোখ ফেললো। আমি চোখ নামিয়ে নিলুম না, বরং বেশ স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে বললুম, 'বেশ কথা! বারোটা অবধি বসিয়ে রাখা যায় নাকি কাউকে! আর আমি বললেই বা উনি থাকবেন কেন—নিজের বৌ ছেলেপুলে নেই!' এর পর নয়নাংশু বললে 'কী করে গেলেন এই বৃষ্টির মধ্যে?' এর উত্তরে আমি অনায়াসে ঝাঁঝিয়ে উঠে বলতে পারতুম, 'কী ক'রে গেলেন তার আমি কী জানি!' কিন্তু আমি তা করলুম না, মুখে হাসি টেনে বললুম, 'জানো তো জয়ন্তবাবু কী রকম মানুষ—ও-সব বৃষ্টিফৃষ্টিকে উনি পরোয়া করেন না।' আমার হাসির উত্তরে আরো একটু স্পষ্ট ক'রে হেসে বললো, 'ঠিক বলেছো। মনে আছে বুন্নির জন্মদিনে—কাল-বোশেখির ঝড়ে এমন হ'লো যে ট্রাম-বাস সব বন্ধ, রসা রোড জলে থৈ-থৈ, জয়ন্তবাবু তারই মধ্যে হেঁটে-হেঁটে চ'লে এলেন টালিগঞ্জ থেকে। সত্যি আশ্চর্য!' আমি কোনো জবাব দিলুম না ও-কথার, কেননা সেই সন্ধ্যাটা আমি ভুলিনি নয়নাংশু তা ভালোই জানে—এমন দু-একটা ঘটনা ঘটে যা ভোলা যায় না; আমি সেদিন বুঝেছিলুম যে জল ভেঙে তিন মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে বুন্নির জন্য আসেনি জয়ন্ত, নয়নাংশুর জন্যও আসেনি—আমার জন্য, আমারই জন্য এসেছে। আর তা অংশুও বুঝে নিয়েছিলো—বোকা তো নয়, প্রথম থেকে বুঝে নিয়েছিলো কী হচ্ছে বা হ'তে যাচ্ছে, আর ঐ একটা বিষয়ে টনটনে জ্ঞান নেই এমন কোন স্বামী আছে পৃথিবীতে?

খাওয়ার পরে নয়নাংশু যখন সিগারেট ধরিয়েছে আমি জিগেস করলুম, 'ও, হ্যাঁ -- তোমার পিসিমাকে কেমন দেখলে?' 'হ'য়ে এসেছে—আর দু চারদিনের ব্যাপার হয়তো।' 'অজ্ঞান হ'য়ে আছেন?' 'না কিন্তু—বেশ জ্ঞান আছে, দুটো-একটা কথাও বলেন মাঝে মাঝে, সলতে ভেজানো গঙ্গাজল চুষে নেন আর টুলটুলে চোখে তাকিয়ে থাকেন লোকের দিকে।' 'তোমাকে চিনতে পারলেন?' 'তা কেন পারবেন না?' আমি হঠাৎ বললুম, 'আমাকে নিয়ে গেলে না কেন?' 'আমি তো বললুম তোমাকে—তুমি যেতে চাইলে না।' 'তুমি জোর করলে না কেন?' 'আমি তো বুঝিনি এ-রকম

এখন-তখন ব্যাপার।' নয়নাংশু আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে জবাব দিলে, 'ইচ্ছে করলে কালও যেতে পারো—এক্ষুনি কিছু হ'য়ে যাচ্ছে না। কোনো অসুখ তো নয়—নেহাত বুড়ো হয়েছেন ব'লেই—যেমন একটা গাছ ম'রে যায়, তেমনি।' এর পরে আর কথা বললুম না আমরা, যে যার বিছানায় শুয়ে পড়লুম।

পাশাপাশি দুটো খাট, ছোটো ঘর, হাত বাড়ালে হাত ছোঁয়া যায় এতটাই কাছাকাছি, যদি নয়নাংশু ঘুমিয়ে পড়ে আর আমি জেগে থাকি তাহ'লে ওর নিশ্বাস আমি শুনতে পাবো। কাল অন্য রকম ক'রে সাজাবো ঘরটাকে, দুটো খাট অত কাছাকাছি থাকা স্বাস্থ্যকর নয়—জেগে জেগে আর-একজনের ঘুমন্ত ভারি নিশ্বাস শুনতে কার ভালো লাগে? বা বুল্লির ঘরে আমার খাট পেতে নেবো—ওটা আরো ছোটো কিন্তু দক্ষিণ খোলা, সারাক্ষণ পাখার হাওয়া ভালো লাগে না আমার, মাথার মধ্যে যেন জাম্‌ ধ'রে থাকে সকালে। এ-ঘরটা গুমোট, এই তো একটু বৃষ্টি থেমেছে আর গরম, বনবন পাখার শব্দ পোকার মতো মাথার মধ্যে—আমরা দু-জনেই জেগে আছি, দু-জনেই জানি অন্য জন ঘুমোয়নি, একই ঘরে, অন্ধকারে, দুই অনিদ্র মাকড়সার মতো জাল বুনে যাচ্ছে। মস্ত মোটা দুটো মাকড়সা, মাথার উপর জ্বলজ্বলে চোখ—একটা জাল অন্যটাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে, জড়িয়ে যাচ্ছে অন্যটার মধ্যে—ঘর ছেয়ে গেলো। এখন আর বৃষ্টি নেই, কিন্তু আমি এখনো বৃষ্টির শব্দ শুনছি, একটা আবছা নীল সুড়ঙ্গের উপর বৃষ্টি, ছাদ ফেটে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে জল পড়ছে—বড্ড গরম—আমার চোখের তলার অন্ধকার ছিঁড়ে হলদে লাল ফুটকি বেরিয়ে এলো, সুড়ঙ্গটা কোথায় শেষ হয়েছে কেউ জানে না, আমার দম আটকে আসছে। তোমরা ভাবছো আমি ভয় পেয়েছিলাম? তাহ'লে তোমরা মালতীকে চেনো না।

আজকাল—অনেকদিন ধ'রে—মালতী এড়িয়ে চ'লে ওর স্বামীকে। স্বামী তাকে চায়—কেনই বা চাইবে না? কিন্তু নয়নাংশুর ঐ বেঁটে বেঁটে আঙুলগুলো ওর ভালো লাগে না, তার নিশ্বাসের শব্দ ওর ভালো লাগে না, সে ওর গা ঘেঁষে শুয়েছে ভাবতে ও শিউরে ওঠে, সে ওর গায়ে হাত রাখলে ও কাঠ হ'য়ে যায়। কী করতে পারে মালতী, যেমন আমরা গায়ে পিন ফুটলে 'উঃ' বলি এও তেমনি। ও স্বামীকে বোঝায় যে ও সব আর ভালো লাগে না ওর, পুরো ব্যাপারটাতেই অরুচি ধ'রে গেছে, বয়স হ'লো, মেয়ে বড়ো হচ্ছে, ইত্যাদি সব টালবাহানা শুনিয়ে শুনিয়ে তাকে ঠাণ্ডা ক'রে দেয়। কিন্তু মালতীর বয়স বত্রিশ মাত্র, নয়নাংশুর সাঁইত্রিশ, আর ওদের মেয়ে সবে চার পেরোলো। কেমন কাতর হ'য়ে যায় নয়নাংশুর মুখ যখন গুটিগুটি পায়ে ফিরে যেতে হয় নিজের বিছানায়, আর তখন মালতীর আরো বিশ্রী লাগে তাকে, পুরুষমানুষের ঐ কাতর চেহারা ওর দু-চক্ষের বিষ। আসল কথা, জোর নেই। ভারি ভদ্রলোক। সে যাকে বুর্জোয়া বলে ঠাট্টা করে তাই। জেনেশুনে যাকে পুরোনো ব'লে ঘেন্না করে তা-ই। যখন কাপড়-চোপড় প'রে থাকে, স্যুট প'রে আপিসে বেরোয়, পাতলা পাঞ্জাবি গায়ে ব'সে থাকে বাড়িতে, তখন আমার বেশ লাগে ওকে—কথাবার্তায় চৌকশ, অনেক বই পড়েছে, সুশ্রী, লোকজনের সঙ্গে ব্যবহার নিখুঁত, মেয়েরা এখনো প্রেমে পড়তে পারে ওর সঙ্গে (ওর আপিসের অপর্ণা তো মুগ্ধ), আমিও একটা বয়সে পড়েছিলুম। বিয়ের সময় ভেবেছিলুম খুব জিতেছি, কিন্তু তার পর দশ বছর, বারো বছর কাটলো, যৌবনের প্রথম ঝাপটা কেটে যাবার পরেই ও যেন বালকের মতো হ'য়ে যেতে লাগলো দিনে দিনে—অন্তত আমার তা-ই মনে হ'লো—স্বামী হিসেবে, প্রেমিক হিসেবে ওকে যেন ভাবতে পারছি না আমি—আমার শরীর যেন আমাকে ফেলে আলাদা হ'য়ে রেগে উঠলো নয়নাংশুর উপর, আমি রোগা হ'য়ে গেলুম, অসুখে পড়লুম একবার, সেই অসুখটাও যেন নয়নাংশুকে দূরে রাখার একটা উপায়। আগে ছিলো একটা গুমরানো ধোঁয়ানো গোছের রাগ, কেন রেগে আছে জানে না; কিন্তু জয়ন্তর সঙ্গে দেখা হবার পর আমি হঠাৎ কারণটা বুঝে ফেললাম।

আমার বিয়ের পর পিসিমা বলেছিলেন 'সোয়ামীর মতো ধন আর নেই, বুঝলি?' নয়নাংশুর পিসিমার কথা বলছি। ওর মুখে ও-কথা শুনে আমার একটু হাসি পেয়েছিলো কেননা শুনেছিলুম

উনি তেরো বছর বয়সে বিধবা হয়েছিলেন (বিয়ে হয়েছিলো বারোতে)—'স্বামী' ব্যাপারটা গোল না চৌকো না তেকোনা তাও উনি ঠাহর করবার সময় পাননি—একটা ফাঁকা আওয়াজ, একটা ফ্যাকাশে, ময়লা, মর্চে-পড়া, রং-চটা, ঝুলকালি-মাখা ধারণা—ওঁর কাছে 'স্বামী' কথাটা হ'লো তা-ই, অথচ তারই কী সাংঘাতিক প্রতাপ! বিয়ের প্রথম বছরটা বেলেঘাটাতেই ছিলুম আমরা—নয়নাংশুর পৈতৃক বাড়ি সেটা—শ্বশুরবাড়িতে ঐ বুড়ি পিসিমা আমাকে বিশেষ একটু ভালোবেসেছিলেন, আদর ক'রে 'তুই' বলতেন, হঠাৎ-হঠাৎ নয়নাংশুর ঢাক পিটিয়ে যেতেন কখনো আমাকে একা পেলে—'জানিস, পরীক্ষায় মেডেল পেয়েছিলো!'—'ওর সঙ্গে সাহেবদেরও আলাপ আছে, জানিস!'—আমি তখন সবেমাত্র রক্তের স্বাদ পেয়েছি, ওঁর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতুম এই চিরবিধবা চিরকুমারী চিরদুঃখী মহিলাটিকে দুঃখী কেন মনে হয় না, তিনি কি কখনো নিজের জীবনের কথা ভাবেন না, কী ব্যর্থ কী শূন্য কী নিষ্ফল—কিন্তু সত্যি বলতে তাঁর মতো শান্ত হাসিখুশি মেজাজের মানুষ আমি কমই দেখেছি; একবেলা খেয়ে, মাসে দুটো একাদশী ক'রে, শিবরাত্রি অম্বুবাচীর লম্বা উপোসে টাটিয়ে থাকে—দিব্যি তো কাটিয়ে দিলেন এতগুলো বছর আর কী কাজের, কখনো দুপুরে ঘুমোন না, ডালের বড়ি দেন, আমসত্ত্ব আচার তৈরি করেন, বুড়ো চোখ নিয়েও কাঁথা সেলাই করেন চমৎকার, নিরিমিষ রান্নায় তাঁর হাতের তার চমৎকার—তাঁকে কখনো দেখিনি খালি হাতে ব'সে থাকতে—কোনো নালিশ নেই, নালিশের কোনো কারণ তাঁর থাকতে পারে তা জানেন না বলেই নালিশ নেই—অদ্ভুত! কিন্তু যদি কেউ এসে তাঁর কানে জপাতো, 'শুনুন বামাসুন্দরী, আপনি দুঃখী, আপনি বঞ্চিত, আপনার বিদ্রোহ করা উচিত'—তা'হলেই হয়তো অন্য রকম হ'তো তাঁর জীবন—কিন্তু জানি না হঠাৎ পিসিমার কথা এত ভাবছি কেন—ও, হ্যাঁ, তাঁর অসুখ, আর দু-চারদিনের ব্যাপার, আমি কাল তাঁকে দেখতে যাবো, আজ যাইনি পাছে জয়ন্ত এসে ফিরে যায়, কিন্তু কাল নিশ্চয়ই।

আমি 'বৌ' হ'তে পেরে খুব খুশী হয়েছিলুম, বিয়ের পরে প্রথম প্রথম চেষ্টা করেছিলুম রীতিমতো 'ভাল বৌ' হতে, বেলেঘাটার বাড়ির সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে চেয়েছিলুম, কিন্তু নয়নাংশু আমার সেই চেষ্টা বানচাল ক'রে দিলে। আমাকে বলে, 'মা যখন রান্নাঘরে যান তুমিও সঙ্গে সঙ্গে যাও কেন?' 'বাঃ যাবো না!' 'ওটা উত্তর হ'লো না—কেন যাও বলো, সত্যি তো ওখানে তোমার করার নেই কিছু।' আমি মনে-মনে খুশী হলুম, এ-কথা ভেবে যে অংশু সব সময় আমাকে কাছে পেতে চায়, একটু দুষ্টুমি ক'রে বললুম, 'আমার ইচ্ছে তাই যাই—হ'লো?' 'উঁহু, ঠিক বললে না, ভালো দেখাবে তাই যাও, বৌদি যান তাই যাও, ও-সব হ'লো তোয়াজ, মন যোগানো।' 'না-হয় তা'ই হ'লো—দোষ কী?' 'দোষ এই যে ওটা অনেস্ট নয়, আসলে যা ভালো লাগে না তা-ই করছো যেহেতু অন্যেরা তাতে খুশী হবে, আবার ভাবটা এমন দেখাচ্ছো যে সেটাই ভালো লাগছে তোমার।' আমি হেসে বললুম, 'অনেক ছেলে স্কুলে যেতে ভালোবাসে না, তাদের কি তবে না-যাওয়াই উচিত?' 'সেটা আর এটা এক কথা নয়, স্কুলে না-গেলে ছেলেটার নিজেরই ক্ষতি, কিন্তু শাশুড়িকে তোয়াজ করে তোমার আত্মার কোনো উন্নতি হচ্ছে না। তাছাড়া, বাচ্চাদের শাসনে রাখতে হয়, কিন্তু তুমি ত সাবালক।' ওর এ-সব কথা আমি প্রথম-প্রথম ঠিক বুঝতে পারতাম না; খানিকটা চমক লাগতো যখন ও নিজের খুড়তুতো ভাইকে বলতো, 'Lout।' (যেহেতু সে কথায়-কথায় আজেবাজে রসিকতা করে আর ধড়াশ ক'রে শুয়ে পড়ে যে-কোনো সময়ে যেকোন বিছানায়)—ভাবতুম এ আবার কী রকমের কথা, হাজার হোক ভাই তো, আবার মনে-মনে অংশুকে তারিফ না ক'রে পারতুম না ওর মতামত অমন স্পষ্ট আর নতুন ধরনের ব'লে। আমার মন থেকে ছাত্রীর ভাবটা একেবারে কেটে যায়নি তখনও—আমি দেখতুম ও শুয়ে-শুয়ে যে-সব বই পড়ে আমি তাতে দাঁত বসাতে পারি না, আমার চেয়ে বুদ্ধিও ওর বেশি ব'লে ধ'রে নিয়েছিলুম—তবু মনের তলা থেকে অন্য একটা ভাবও *ঠেলে ওঠে* মাঝে-মাঝে, আমি দেখতে পাই কোনো-কোনো বিষয় একেবারেই বোঝে না নয়নাংশু, বোঝে না আমার মন, আমার নারীত্বকে; কেন আমি জায়ের সঙ্গে রান্নাঘরে যেতে

ভালোবাসি, কেন ওর মা-র কাছে রান্না শিখি মাঝে-মাঝে, আর শ্বশুরবাড়ির সকলের সঙ্গে যে মিলে-মিশে বন্ধুভাবে থাকতে চাই তা অন্য কোনো সাংসারিক কারণে নয়, সত্যি আমার ভালো লাগে ব'লেই—এই সহজ কথাগুলো কিছুতেই বোঝে না নয়নাংশু, বোঝার চেষ্টাও করে না। এই যে বিয়ে হ'লো—এ থেকে সে চায় পুরোপুরি আস্ত তার স্ত্রীটিকে শুধু, আর আমি চাই—শুধু স্বামীকে নয়, স্বামীকে কেন্দ্র ক'রে এক নতুন জীবন, চাই নিজেকে ছড়িয়ে দিতে ওদের বেলাঘাটার বাড়ির সব-কিছুর মধ্যে, অংশিদার হ'তে, এমনকি অধিকারিণী হ'তে। কিন্তু অংশু আমাকে আস্তে-আস্তে কিছুটা ওর ধরনে ভাবতে শেখালে; বোঝালে, যে বেলেঘাটার জনবহুল মস্ত তেতল বাড়িতে অসুবিধে হচ্ছে আমাদের; যে যৌথ পরিবারের মতো কুৎসিত ব্যাপার আর নেই, ওতে মানুষগুলো পরস্পরের মধ্যে লেপটে পিণ্ড পাকিয়ে যায়, কেউ আলাদাভাবে, সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে পারে না। কিছুদিনের মধ্যে আমিও ওর মতো স্বপ্ন দেখতে লাগলাম, কবে আমরা আলাদা বাড়িতে উঠে গিয়ে নিজেদের ইচ্ছেমতো স্বাধীনভাবে থাকতে পারবো। 'প্রত্যেক সাবালক মানুষই আলাদা, আলাদা এক-একজন ব্যক্তি, তোমার ভিতরকার সেই ব্যক্তিত্বকে তুমি ফুটিয়ে তুলবে—অন্যদেব ছাঁচে গড়া হবে না।' এই ধরনের কথা বার-বার আমি শুনেছি নয়নাংশুর মুখে, যখনই ননদ-জায়েদের সঙ্গে দল বেঁধে বেরিয়েছি শাড়ি-জামা কিনতে বা কোনো হিন্দী ফিল্ম দেখতে, বা গান গেয়েছি শাশুড়ির বেস্পতিবারের লক্ষ্মীপুজোয়, বা ক্যারাম খেলেছি আমার সেই বোকাসোকা ভালোমানুষ দেওবের সঙ্গে। আর-একটা কথা প্রায়ই বলে নয়নাংশু—'শাড়ি-গয়না-হিন্দি সিনেমা—ও-সব মেয়েলিপনা ছাড়ো তো।' আমি জবাব দিই, 'বাঃ আমি তো মেয়েই—মেয়েলি হবো না তো কী হবো!' 'মেয়ে হওয়া আর মেয়েলি হওয়া এক কথা নয়।' 'সূক্ষ্ম তফাতটা কোথায় তা বুঝিয়ে দেবেন, স্যার।' আমার ঠাট্টার উত্তরে আমাকে জাপটে ধরলো অংশু; তখনকার মতো তর্ক ফুরালো, কিন্তু আবার কোনো উপলক্ষ ঘটলে ও আমাকে একই কথা শোনায়—যার সারাংশ হ'লো এই-এই জিনিস, এই-এই কাজ ওর 'ভালো লাগে না।' অর্থাৎ—অন্যেরা আমাকে যে-ভাবে চায় সে-রকম আমাকে হ'তে দেবে না নয়নাংশু, কিন্তু নিজের মনোমতো ক'রে ঢেলে সেজে নেবে ; আমি অন্যের ছাঁচে গড়া হবো না, অর্থাৎ শুধু নয়নাংশুর ছাঁচে গড়ে উঠবো, ও যাকে আমার 'ব্যক্তিত্ব' বলে সেটা হ'লো আসলে তা-ই। এই কথাটা তখন আমি ভাবিনি অবশ্য, অনেক পরে সেই দিনগুলির কথা ভাবতে গিয়ে মনে হয়েছিলো, কিংবা হয়তো এইমাত্রই ভাবলুম। তখন আমার পক্ষে এমন কিছু ভাবা সম্ভব ছিলো না যা অংশুর পক্ষে, আর আমার পক্ষেও, গৌরবের নয়—ও যে আমাকে পুরোপুরি দখল ক'রে নিতে চেয়েছিলো সেটাতেও ওর অসামান্য ভালোবাসারই প্রমাণ আমি পেয়েছিলুম—তখন পর্যন্ত ও আমাকে মুগ্ধ ক'রে রেখেছিলো।

মুগ্ধ, তবু—যেহেতু আমার স্বাভাবিক বুদ্ধিসুদ্ধি খানিকটা আছে, তাই সেই তখনই, যখন পর্যন্ত আমার গা থেকে নতুন বিয়ের গন্ধ কাটেনি, তখনই আমার মনে হয়েছিলো অংশু যেন বড্ড বেশি বই-পড়া মানুষ, যা-কিছু বইয়ে প'ড়ে তার ভালো লেগেছে তা-ই যেন তার জীবনেও খাটাতে চায়। কলেজে শেষ কয়েক মাস ওর ছাত্রী ছিলুম আমি—প্রথম দেখা সেখানেই—টাটকা-পাশকরা ছোকরা মাস্টার, চেহারা ভালো, কথাবার্তায় ঝকঝকে, আমাদের ক্লাসের উনতিরিশটি মেয়ের মধ্যে এমন কেউ ছিলো না যার বুকের মধ্যে মলয়সমীরণ ঝিরঝির ক'রে ব'য়ে যায়নি; আমি একদিন অন্যদের সঙ্গে বাজি রেখে আলাপ ক'রে এলুম পড়াশুনোরই কিছু একটা ছুতো ক'রে—তারপব দেখি হঠাৎ একদিন আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছে কয়েকটা বই হাতে নিয়ে, ওগুলো নাকি পরীক্ষার পক্ষে বিশেষ জরুরী। আমি মনে মনে বললুম, 'ও, তাহ'লে তোমারও মনে এই কথা!' দিন দশেক পরে বই ফেরত নিতে এলো, আমি তখনও পড়িনি শুনে কয়েকটা বাছা বাছা অংশ নিজে প'ড়ে শোনালে আমাকে, ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিলো—আমি খুব মন দিয়ে শুনলুম কিন্তু কিছুই শুনলুম না, শুনলুম ওর গলার আওয়াজ আর দেখলুম ওর মুখের ভাব, ঠোঁটেব নড়াচড়া, আর তারপর যখন আমরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ায় পৌঁছে যাচ্ছি আর আমার বাড়ির সবাই

বুঝে নিয়েছে ব্যাপারটা,—আর তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হচ্ছে (কুমারী মেয়ের সঙ্গে কোনো যুবকের ঘনিষ্ঠতা দেখলে মা-বাবারা এখনো উদ্বিগ্ন না-হ'য়ে পারেন না, অথচ একবার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে সারা জীবনের মতো কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে যান, যেন বিয়ে একটা সর্বজ্বরহর অব্যর্থ মাদুলি!)—তখনও অংশু আমাকে যত কথা বলে তার মধ্যে বইয়ের কথা ঘুরে-ফিরে চ'লেই আসে। বিয়ের পরেও তেমনি; রাত্রে ঘরে এসে, কি রোববার দুপুরে খাওয়ার পরে, সে আমাকে ইংরেজি কবিতা প'ড়ে শোনায়—প্রেমের কবিতা—ডি.এইচ.লরেন্সকে নিয়ে সে খুব মেতেছে তখন—কিন্তু তখন তো আর কোর্টশিপের অবস্থা নেই যে যে-কোনো ভাবে তাকে কাছাকাছি পেলেই খুশী হবো আমি, খুব স্বাভাবিকভাবেই অন্য রকম ব্যবহার আশা করছি তার কাছে, অন্য কিছুতে মন দিতে পারছি না, আমার অবাক লাগছে যে-মানুষ হাতে-কলমে প্রেম করতে পারে সে প্রেমের কবিতা পড়বে বা শোনাবে কেন, বা কথা বলবে কেন তা নিয়ে—আর অবশেষে সে যখন আমাকে কাছে টানে সেটাও এমন নরম হাতে আর সন্তর্পণে যে আমার এক-এক সময় মনে হয় এই প্রেম করাটাকেও সে যেন মনে-মনে কোনো বই থেকে তর্জমা করে নিচ্ছে—অবশ্য মুখে আমি প্রায়ই বলি, 'উঃ, কী অসভ্য! বর্বর! এই বুঝি দস্যিপনা শুরু হ'লো আবার।'—ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা যা যুগে-যুগে মেয়েরা ব'লে এসেছে পুরুষটিকে আরো বেশি তাতিয়ে তোলার জন্য—কিন্তু ওর 'দস্যিপনা'র চরম মুহূর্তেও হঠাৎ খুব আবছাভাবে আমার মনে হয় যে অংশু ঠিক আমাকে ভালোবাসছে না, ও যে আমাকে ভালোবাসে সেই ধারণাটাকে ভালোবাসছে। অথচ এই 'ভালোবাসা' নিয়ে কতই না লম্বা-চওড়া বক্তৃতা ওর।

আমাদের বিয়ের পাঁচ মাস পরে একটা ঘটনা ঘটলো যা নিয়ে সে সময়ে বেশ সোরগোল হয়েছিলো কলকাতায়। একজন নামজাদা ব্যারিস্টার, বয়স পঞ্চান্ন, হঠাৎ একটি এম.এ ক্লাশের বিবাহিতা ছাত্রীকে নিয়ে কলকাতা ছেড়ে বম্বাইতে পালিয়ে গেলেন। ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত উঠেছিলো, কিন্তু মামলা টেকেনি—শোনা গেলো মেয়েটি ডিভোর্স পেয়েছে আর ব্যারিস্টারটি তাকে বিয়ে করেছেন, আর আগের স্ত্রীকে লিখে দিয়েছেন কলকাতার বাড়ি আর পাঁচশো টাকা মাসোহারা। লোকেরা তুড়ে গাল দিতে লাগলো দু-জনকেই, কয়েকটা কাগজও স্পষ্টভাবে নাম না-করে ব্যারিস্টার সাহেবকে তুলো ধুনে ছাড়লো। আমাদের বেলেঘাটার বাড়িতে বেশ জটলা হচ্ছে এ নিয়ে, সবাই দুয়ো দিচ্ছে, ছি ছি বলছে আর সকলের বিরুদ্ধে একলা লড়াই করছে নয়নাংশু। আমি একদিন রেগে গিয়ে বললুম, 'তা তুমি যা-ই বলো, ব্যারিস্টারটিকে লম্পট ছাড়া আর কিছু বলা যায় না!' 'কী যে বলো! লম্পটের কি জায়গার অভাব আছে কলকাতায়? আর ভদ্রলোকের ত্যাগটা তুমি কি দেখছো না? কলকাতার জমজমাট প্র্যাকটিস হারালেন, আর এই জঘন্য লোকনিন্দা।' 'রেখে দাও তোমার ত্যাগ—একটা বুড়ো হাবড়া, এদিকে মেয়েটারও বিয়ে হয়েছিলো—দুটোকে ধ'রে চাবকে লাল ক'রে দিলে ঠিক হয়।' নয়নাংশু গম্ভীর চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমি ছেলেমানুষ, কিছু বোঝো না।'

এর পর থেকে নয়নাংশুর সঙ্গে মাঝে-মাঝেই তর্ক হতে লাগলো আমার। স্বামী-স্ত্রী, বা স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসাই হ'লো আসল কথা, ভগবানের চোখে বিয়ে ব'লে কিছু নেই, দাম্পত্যের নামে লাম্পট্য চলছে ঘরে-ঘরে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা না-থাকলে তাদের একত্র বসবাস গর্হিত, যেখানে মেয়েরা স্বামী আর আত্মীয়স্বজন ছাড়া অন্য পুরুষের সঙ্গে মেলামেশার কোনো সুযোগই পায় না সেখানে তাদের তথাকথিত সতীত্বও একদম ঝুটা মাল এমনি সব তত্ত্বকথা আমাকে শোনায় নয়নাংশু, সবিস্তারে, অনেক উদাহরণ দিয়ে, যেন ক্লাশ পড়ানোর লেকচার দিচ্ছে। বলে, 'ভালোবাসারও পরীক্ষা হওয়া দরকার, কিন্তু অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা না-থাকলে তা সম্ভব হয় না ; যেহেতু অমুক মানুষটা কারো স্বামী, অথবা স্ত্রী, শুধু সেইজন্যে তাকে নিয়েই জীবন কাটাতে বাধ্য নয় কেউ, সম্পর্কটা যদি ব্যক্তিগত না হয়, যদি হয় মুখস্থ-করা নামতার মতো, কিংবা যদি অন্য কোনো উপায়ের অভাবেই তা আঁকড়ে থাকে লোকেরা, তা'হলে সেটাকে লোকেদের ওপর

চাপানোর নাম জুলুম, আর তা মেনে নেয়ার নাম ভণ্ডামী। আর বেশির ভাগ মানুষ—বিশেষত এই সনাতন ভারতবর্ষে—বিয়ে বলতে এখনো এ-ই বোঝে।' নয়নাংশুর এ-সব কথার কোনো সাফ জবাব আমার মুখে তক্ষুনি যোগায় না, কিন্তু শুনতে-শুনতে রাগ হয়—কেননা আমি তখন বিয়ে হওয়া নতুন বৌ, ক্ষুধিত কুমারীত্ব থেকে আরো ক্ষুধিত নারীত্বে প্রমোশন পেয়েছি, বিয়ে ব্যাপারটা আপাতত খুবই ভালো লাগছে আমার, এমনকি প্রায় বিশ্বাস ক'রে ফেলেছি যে এটা জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ। একদিন বললুম, 'তাহ'লে তোমার মতে মানুষেরও কুকুর-বেড়ালের মতো হওয়া উচিত? ইচ্ছেসুখ চ'রে বেড়াবে—এই তো?' 'পশুর সঙ্গে মানুষের তুলনা হয় না—পশুরা ভালোবাসে না, তাদের শুধু শরীর আছে, মন নেই।' আমি হঠাৎ বললুম, 'ঐ এক কথা তোমার মুখে ভালোবাসা! ভালোবাসা ব্যাপারটা কী বলতে পারো?' আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে জবাব দিলো, 'তা তুমি নিজে না-বুঝলে কেউ বোঝাতে পারবে না।'

আমি বিয়ের আগের নয়নাংশুর প্রেমে পড়েছিলুম, কিন্তু বিয়ের পর থেকে আমার মনে হ'তে লাগলো যে 'প্রেমেপড়া' ব্যাপারটা তেমন জরুরী নয়, বিয়েটাই আসল, বন্দেজি, একবার বিয়ে হ'য়ে গেলে সারা জীবনের মতো ভাবতে হয় না, আর সেইজন্যই—যা-ই বলুক না নয়নাংশু—পাতানো বিয়ের বিরুদ্ধে কোনো সত্যিকার যুক্তি নেই। আমি একদিন জিগেস করেছিলুম, 'তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ এলে তুমি কি বিয়ে করতে না?' 'পাগল নাকি—যাকে চিনি না তাকে কী ক'রে বিয়ে করা যায়!' 'কিন্তু ধরো—এক সময়ে আমাকে তোমার ভালো লাগলো, অন্য সময়ে অন্য কাউকে আরো বেশি ভালো লাগে যদি?' নয়নাংশু একটু হেসে জবাব দিলে, 'সে-সম্ভাবনা সর্বদাই আছে, তাকে ভয় পেলে চলবে কেন?' আমার খারাপ লাগলো ওর কথা শুনে, জোর গলায় বললুম, 'আমি কিন্তু কল্পনাই করতে পারি না যে তুমি ছাড়া আর-কেউ আমার স্বামী হ'তে পারতো, বা আমি ছাড়া আর-কেউ তোমার স্ত্রী।' আবার হাসলো নয়নাংশু, পিঠ-চাপড়ানো সুরে বলল, 'ছেলেমানুষ।'

এই কথাবার্তার কয়েকদিন পরে আমরা একটা গানের জলসায় গেলুম—আমার মা ছিলেন সঙ্গে—মুক্তিপদ ঘোষ প্রথমে একটা মালকোশ আর তারপর একটা লক্ষ্ণৌ চালের ঠুংরি গাইলেন—অপূর্ব! নয়নাংশু একদম গান ভালোবাসে না, নেহাত আমার জন্য গিয়েছিলো আর কাঠের মতো মুখ ক'রে ব'সে ছিলো সারাক্ষণ; বেরিয়ে এসে মা যখন ওকে জিগেস করলেন, 'নয়নাংশু, তোমার কেমন লাগলো? চমৎকার—না?' তখন ও শুকনো গলায় জবাব দিলো, 'চমৎকার।' —কিন্তু আমার মন গানের রেশে ঝিম ধ'রে আছে, মনে পড়ছে ওস্তাদ গাইয়ের চোখ মুখ হাত নাড়া ইত্যাদি, হঠাৎ ব'লে উঠলাম, 'মুক্তিপদ ঘোষের স্ত্রী কী ভাগ্যবতী!' শুনে আমার মা তক্ষুনি বললেন, 'কী বোকার মতো কথা!' —কথাটা কেন বোকার মতো, তা বাড়ি ফিরে এসে অনেকক্ষণ পরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম—'অমুকের স্ত্রী কী ভাগ্যবতী।' এ-কথা বলা মানেই ঐ মহিলাটিকে হিংসে করছি, অর্থাৎ আমি সেই অমুকের স্ত্রী বা প্রেমিকা হ'তে চাচ্ছি—আর এ-কথা, কখনো মনে মনে ভাবলেও, কোনো বিবাহিতা মেয়ের মুখ ফুটে বলা উচিত নয়, বিশেষত তার স্বামী কাছাকাছি থাকলে। আর তখনই আমি বুঝেছিলাম বিয়ে জিনিশটা মানুষের কী-আশ্চর্য আবিষ্কার—ধরা যাক আমার যদি এখনো বিয়ে না হ'তো, তাহ'লে যে-আমি আজ নয়নাংশুর প্রেমে পড়েছি সেই আমি যে কাল গান শুনে মুক্তিপদর প্রেমে প'ড়ে যেতুম না তার বিশ্বাস কী? কিন্তু আমি বিবাহিত ব'লেই ও-রকম ভাববো না, ভাবলেও চাপা দিয়ে দেবো, আমার মায়ের সঙ্গে একমত হবো যে ও-রকম ভাবা উচিত নয়। এই তো আমাদের 'প্রেম,' নয়নাংশুর ফলাও ক'রে তোলা 'ভালবাসা'—তার উপর ভরসা রাখলে প্রত্যেকটা মানুষ কি ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যেতো না, যদি না বিয়ে তাদের মজবুতভাবে বেঁধে রাখতো?

আবার বৃষ্টি এলো—ঠাণ্ডা ভেজা বাতাসের ঝাপট—তুমি এখন কী করছো, জয়ন্ত? ঘুমিয়ে পড়েছো? না চোখ বুজে আমার কথা ভাবছো? না খোলা চোখে তাকিয়ে আছো অন্ধকারে? না, তুমি নয়নাংশু নও, তুমি জয়ন্ত, স্বাস্থ্যবান জোরালো পুরুষ তুমি, ম্লান বক্তের ভাবুনে মানুষ নও,

তুমি ধারণায় চলো না, যে-জিনিশটা যা সেটাই তোমার কাছে ঠিক, খিদে পেলে খেতে হয়, প্রেম পেলে প্রেম করতে হয়, ও-সব কোনো তর্কের ব্যাপার নয় তোমার কাছে—আমি জানি তুমি কী করছো এখন। এতদিন তুমি ছটফট করেছো রাত্রে, কল্পনা করেছো রাত্রে, কল্পনা করেছো অন্য এক বিছানায় অংশুর সঙ্গে আমাকে, ঈর্ষা তোমাকে এক ঝাঁক মশার মতো যন্ত্রণা দিয়েছে, কিন্তু আজ তুমি পেয়েছো তোমার লোটনকে, ডাক্তারের ছুঁচের মধ্যে রক্তের মতো আমি তোমার হাতে উঠে এসেছি, তাই আজ অঘোরে ঘুমুচ্ছো তুমি, সারাদিন যারা গতর খাটে তারা যেমন অচেতন ঘুমোয় তেমনি এক ময়লা কাপড়ের বস্তার মতো উঁচু হ'য়ে প'ড়ে আছে তোমার বৌ। কাল সকালে তুমি নতুন উদ্যমে কাজে বেরোবে—প্রেসে ব'সে হুড়মুড় ক'রে পাঁচ কলম লিখে ফেলবে, ঘোরাঘুরি করবে বিজ্ঞাপনের জন্য—না, জয়ন্ত, এয়ার-কণ্ডিশন আপিশে ব'সে তুমি দিন কাটাও না, তুমি রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে ট্রামে-বাস্-এ ঘোরাঘুরি করো সারাদিন, তুমি স্বাধীন, তুমি নির্ভীক—আমার জয়ন্ত! আমার প্রাণ! আমার আলো! তোমার জন্য আমার তেষ্টা পাচ্ছে, এই বৃষ্টির শব্দে তেষ্টা পাচ্ছে আমার—চলো সেই সুড়ঙ্গে আবার, যার ছাদ ফেটে স্রোত নেমে আসে—আমার তেষ্টা পাচ্ছে, কিন্তু জল আছে খাবার ঘরে আমি কেমন ক'রে উঠে যাই, যদি নয়নাংশু ন'ড়ে ওঠে, কিছু বলে, বা কোনোভাবে আমাকে বুঝতে দেয় যে সেও ঘুমোয়নি—যদি বাধ্য হই কিছু বলতে, যদি খোলাখুলি কিছু জিগেস করে নয়নাংশু—না, এখন চাই না, কোনো কথা কাটাকাটি চাই না এখন, আমি এখন ভালোবাসছি,—আমাকে ভালোবাসতে দাও, শুয়ে-শুয়ে তোমাকে ভালোবাসছি, জয়ন্ত—না, এই ভালো, এই ভান, এই তেষ্টা নিয়ে শুয়ে থাকা নিঃশব্দে।

দুই

কিছু এসে যায় না। যাতে সত্যি এসে যায় তা হ'লো ইচ্ছে—ইচ্ছেটা মেটানো গেলো কি গেলো না সেটা একটা দৈব ঘটনা মাত্র। সুযোগ পেলে মিটবে, না পেলে মিটবে না; কোনো তফাত নেই। শিকলে বাঁধা কুকুরের মতো আমাদের শরীর, মন তাকে টেনে নিয়ে যায়—মন যখন যেদিকে ছোটে কেউ ঠেকাতে পারে না, কিন্তু শরীরটা জবড়জং জড় পদার্থ ব'লে পিছনে প'ড়ে থাকে। নতুন কিছু হয়নি, শুধু মনের হুকুম তামিল করেছে তোমার শরীর। মালতী, তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না, আমার দিক থেকে একই কথা, একই রকম আছে সব—কিছু এসে যায় না।

আলো জ্বেলে দেখলুম সুন্দর একটি ছবি। মালতী ঘুমিয়ে আছে, শাড়িটা উঠে গিয়ে নিটোল একটি পা দেখা যাচ্ছে হাঁটু থেকে পাতা পর্যন্ত, আঁচল স'রে গিয়ে একটি স্তন সম্পূর্ণ বেরিয়ে পড়েছে—সম্পূর্ণ গোল, নধর, উর্ধ্বমুখ। একটি শ্যামবরণী ভেনাস—বত্তিচেলির সদ্যতরুণী নয়, বরং টিৎসিয়ানোর কোন ছাত্রের আঁকা পক্বযুবতী, সারা ঘুমন্ত শরীরের মধ্যে ঐ অনাবৃত স্তন যেন চোখ মেলে তাকিয়ে আছে, রূপের চেতনা ও স্পর্ধা নিয়ে, লোকেদের অভিনন্দন নেবার জন্য। চুপচুপে ভেজা শিটোনা শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে আমার বেশ লাগছিল যেন চোখ দিয়েই কিছুটা তাপ কুড়িয়ে নিচ্ছিলাম ঐ ঘুমিয়ে-থাকা শরীর থেকে—কিন্তু মনে হ'লো হঠাৎ জেগে উঠলে হয়তো লজ্জা পাবে, তাই কাছে গিয়ে ওর গা-না-ছুঁয়ে, আস্তে নামিয়ে দিলাম গোড়ালি পর্যন্ত শাড়িটা, স্তনটিকে ঢেকে দিলাম আঁচল দিয়ে। দেখলাম ওর চাদরটা নানা জায়গায় কুঁচকানো, ও ঘুমিয়ে আছে একটি বালিশে মাথা রেখে, অন্যটা মধ্যিখানে গর্ত নিয়ে পাশে প'ড়ে আছে। তারপর চোখে পড়লো আমার খাটের উপর ওর ব্লাউজ আর ব্রা—যেন তাড়াতাড়ি আন্দাজে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিলো।

ভেজা কাপড় ছাড়তে বাথরুমে এসে আমার হঠাৎ মনে হ'লো আমি অনেকদিন পর উজ্জ্বল আলোয় মালতীর শরীর দেখলাম, মনে হ'লো আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছে তার শরীর—না কি লোভনীয়? না কি সুন্দর? না কি দু-ই? টান চামড়া, ভরপুর মাংস, চিক্কণ মেদ, যৌবনের মধ্যাহ্ন

বলা যায়, এর পরেই হেলবে, হয় রোগা হ'য়ে যাবে নয় তো মোটা, হয় চামড়া ঢিলে হবে নয় তো চর্বি জ'মে-জ'মে আকার-আকৃতি কিছু থাকবে না, আর তারপরেই আমার মনে হ'লো যে ও-রকম যে হ'তেই হবে তা নয়, মোটামুটি একই চেহারা নিয়ে (খাওয়া-দাওয়া ও প্রসাধন বিষয়ে এখনকার মতোই যত্ন নেয় যদি) মালতী আরো দশ বছর—কুড়ি বছরও কাটাতে পারে, আমি এমন পঞ্চাশ বছরের মহিলাও দেখেছি যিনি বেশ—বেশ রমণীয়া (অবশ্য জানি না সাজগোজের জারিজুরি কতটা) —কিন্তু বুঝতে পারলুম আমি চাচ্ছি ওর রূপ নষ্ট হ'য়ে যাক, হয়ে যাক বেঢপ মোটা, বা বিতিকিচ্ছিরি রোগা, চাচ্ছি কোনো পুরুষ যেন ওর দিকে আর ফিরে না তাকায়;—কিন্তু আপাতত ওর শরীরের আকর্ষণ আমাকে মানতেই হ'লো, যে-শরীর, শাড়ি-জামার খাপ-ছাড়ানো অবস্থায় পরিষ্কার আলোয়, অনেকদিন পর, এক্ষুনি আমি দৈবাৎ দেখতে পেলুম। সেই একটি স্তন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো আবার, কোথাও একটু ভাঁজ পড়েনি, বোঁটা ঘিরে কালো মণ্ডলটির রং একটু গাঢ় হয়েছে বোধ হয় (ওর বুকের দুধ ছিলো প্রচুর, বুন্নিকে ও ছ-মাস পর্যন্ত বুকের দুধ খাইয়েছিলো), তালের মতো কালোর তলায় ঈষৎ গোলাপি তাকিয়ে আছে, যেন শিশুর মতো, কোনো চিরসুখী নিষ্পাপ চোখের মতো, যেন বলছে, 'এই আমি, আর-কিছু জানি না।'—কেন আমি আরো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকিনি, কেন আমি আঁচল দিয়ে ঢেকে দেবার সময়ও ওকে ছুঁলুম না? কেন আবার?—আমার ভব্যতাবোধ, শালীনতাজ্ঞান, বেম্মপনা! আমার বই-প'ড়ে শেখা আগড়ুম-বাগড়ুম! আমি—হাজার হোক ওর স্বামী—আমি ঐ মাংসপিণ্ড মুচড়ে দিয়ে জাগিয়ে দিতে পারতাম ওকে, ওর নরম গলাটাকে দু-আঙুলে চেপে ধ'রে খুলে দিতে পারতাম ঘুমোনো চোখ, ওকে জাপটে ধ'রে গড়াতে পারতাম আমাদের ছ-ফুট চওড়া মেঝেতে। কিন্তু না—আমার মতো ফুলবাবুর পক্ষে ও-সব কিছুই সম্ভব নয়। তা ব'লে এমন নয় যে ও-সবে আমার ইচ্ছে নেই, লোভ নেই,—পুরোমাত্রায় আছে, আর জানি ও-সব শ্রীমতীরও অপছন্দ নয়, আর তাই জয়ন্তকে দোষ দিতে পারি না, শুধু যদি জয়ন্ত না-হ'য়ে অন্য কেউ হ'তো, আমার কোনো বন্ধু, যার সঙ্গে কান্ডিনস্কির ছবি নিয়ে কথা বলা যায়!

বাথরুমে আমি ইচ্ছে ক'রে দেরি করলাম, যাতে ও জামা-টামা প'রে নিয়ে, বিছানাটাকে টান ক'রে নেবার সময় পায়। রাতের অন্ধকারে ছাড়া বিছানায় শাদা চাদর-বালিশ আমি সহ্য করতে পারি না, কিন্তু বেরিয়ে এসে দেখলুম মালতী তার বিছানাটা টেনে-টুনে দিয়েছে, কিন্তু সুজনিতে ঢেকে দেয়নি। ওর মুখোমুখি খেতে ব'সে জোরে-জোরে নিশ্বাস পড়ছিলো আমার, মাঝে-মাঝে দম আটকে আসছিলো, কিন্তু আমি চেষ্টা ক'রে কথা বলতে লাগলুম আর ভালো লাগলো যে মালতীও জবাব দিলে সঙ্গে-সঙ্গে (দু-জনেই জানি কোন খেলা খেলছি) —চেষ্টা ক'রে খেতে লাগলুম আস্তে আস্তে আর সত্যি বেশ খিদেও পেয়েছিলো বৃষ্টিতে জলে অতটা পথ হেঁটে এসে—অন্তত পাওয়া উচিত। এও ভাবলুম যে পেট ভ'রে খেলে তক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়া যাবে—কিন্তু না, আমি ক্লান্ত কিন্তু ঘুম নেই, আজকের বৃষ্টিতে আমি যেন বিধ্বস্ত হ'য়ে গিয়েছি, আমার গায়ের জোড়ে জোড়ে ব্যথা যেন বাড়ি ফেরার পথে শেয়ালদায় কোনো গুণ্ডার হাতে মার খেয়েছিলাম।

একবার সত্যি আমি মার খেয়েছিলাম, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি তখন, আমার কলেজের বন্ধু সুরতর সঙ্গে বাড়ি ফিরছি সন্ধেবেলা, এইমাত্র দেখা 'ব্লু এঞ্জেল' ছবিটা নিয়ে কথা বলতে-বলতে। বেলেঘাটা তখনো পাড়াগাঁর মতো ছিলো, সব রাস্তায় ইলেকট্রিক আলো হয়নি, অনেক মাঠ ডোবা ঝোপঝাড় অন্ধকার ছিলো, হঠাৎ কোত্থেকে দুটো ষণ্ডামতো ছেলে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমাদের উপর 'স্কাউন্ড্রেল। আর যাবি ওখানে? আর ইতরামো করবি?' এই ব'লে আমাদের পিঠে মাথায় দমাদম কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়ে মাঠের মধ্যে শাদা ছায়ার মতো মিলিয়ে গেলো। তাদের মুখে ছিলো রুমাল বাঁধা, যাবার সময় রুমাল খুলে নিয়ে ঘাড়ের ঘাম মুছতে লাগলো—শুধু এইটুকু আমি দেখেছিলাম তাদের।

আমাদের হাতে বই-খাতা ছিলো, সন্ধের মিটমিটে আবছায়ায় খুঁজে-খুঁজে কুড়িয়ে নিলুম

সেগুলো—একটা বই পাওয়া গেলো না, কিন্তু সেজন্যে সময় নষ্ট না-ক'রে নিঃশব্দে যে যার বাড়ি চ'লে গেলুম। আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি এ-রকম একটা ঘটনা ঘটবে বা ঘটতে পারে, এর আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গিয়েছিলুম একেবারে—কী যে হ'লো তা বুঝে নেবার সময় পাইনি। এই অবাক হবার, বোকা ব'নে যাবার অনুভূতিটা আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখলো অনেকক্ষণ—গায়ের ব্যথা ভালো করে টের পেলুম না। আরো বেশি অবাক লাগলো যেহেতু ব্যাপারটা আমার দিক থেকে একেবারে অর্থহীন, এর কোনো সুদূরতম কারণও আমি ভাবতে পারছি না, সুব্রতকে বা আমাকে কেউ যে কেন মার দিতে চাইবে আমার পক্ষে তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। শুয়ে-শুয়ে অনেকক্ষণ ভেবেছিলুম সেই রাত্রে—কে ওরা? ওদের রাগটা কিসের? আর সেই সূত্রে ঘটনাটা মনে-মনে আবার সাজাতে গিয়ে আমার হঠাৎ এ-কথা ভেবে চমক লাগলো যে আমরা চেঁচিয়ে উঠিনি, ফিরে মারা দূরে থাক আত্মরক্ষার কোনো চেষ্টা করিনি পর্যন্ত। ওরাও দু'জন ছিলো, আমরাও তা-ই—ধরা যাক ওদের গায়ে জোর ছিলো বেশি, কিন্তু অন্তত বাধা তো দিতে পারতাম, হয়তো বা দেখেও নিতে পারতাম লোক দুটো কারা। অথচ আমি মনে মনেও যেন মারতে পারলুম না ওদের, আমি কাউকে হাত তুলে মারছি তা ভাবতেই কেমন ঘেন্না করলো আমার, মারতে হ'লে অন্য একটা ঘেমো শরীরকে ছুঁতে হয়, এক বস্তা সম্পূর্ণ অচেনা মাংসপেশীর সঙ্গে পাতাতে হয় একধরনের আত্মীয়তা—না, আমি তা পারবো না। এ-সব কথা তখনই আমি ভাবিনি হয়তো—পরে, ধীরে ধীরে এগুলো আমার মনে হয়েছিলো; কিন্তু একটা কথা অস্পষ্টভাবে সেই রাত্রেই আমি অনুভব করেছিলাম, দুটো শরীরের যে কোনোরকম ঘনিষ্ঠ ছোঁয়াছুঁয়ি হওয়াটাই কুশ্রী।

অবশ্য এর একটা খুব বড়ো ব্যতিক্রম আছে, আর তাও আমার বুঝতে দেরি হয়নি, যদিও মেনে নিতে বেশ সময় লেগেছিলো। দু-বছর পরে—আমরা তখন থার্ড ইয়ারে—সুব্রত আমাকে একদিন চুপি-চুপি বললে, 'ঐ কাণ্ডটা কে করেছিলো জানো?' 'কোন কাণ্ড?' 'ঐ যে—তোমাকে আমাকে মেরেছিলো? বিমল—ইকনমিক্স অনার্সের বিমল গুপ্ত। সে আর-একটা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে—' 'কী ক'রে জানলে?' 'বিমল বলেছে আমাকে! ওর রাগটা ছিলো তোমার ওপর, যেহেতু ও ভেবেছিলো তুমি বেনামীতে ওর বোনকে প্রেমপত্র লেখো আর ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকো তাকে দেখার জন্য। আমাকে ফালতু মেরেছিলো।' 'ওর যে বোন আছে আমি তো তা-ই জানতুম না।' 'আছে আছে' ব'লে সুব্রত জিভ, দিয়ে একটা শব্দ করলো।

আমি তখনই জানলুম যে সম্প্রতি বিমলের সঙ্গে সুব্রতর বেশ ভাব জ'মে উঠেছে. সুব্রত মাঝে-মাঝে ওর বাড়িতেও যায়। এর পরে মাঝে-মাঝে এমনও হ'লো যে সুব্রত আর বিমলের সঙ্গে আমিও লিলি কেবিনে গিয়ে চা খেয়েছি, আড্ডা দিয়েছি। বিমলের উপর রাগ হয়নি আমার, বিমলের সঙ্গে ভাব করার জন্য সুব্রতর উপরেও রাগ হয়নি—আমার শরীরে রাগ এত কম কেন জানি না। কিংবা হয়তো রাগটা আমার মনের মধ্যে জমা হ'য়ে থাকে, আমি শরীর দিয়ে সেটা অনুভব করি না; মনে-মনে বলি, 'তোমাকে চিনে রাখলুম, তোমাকে আর ভালোবাসবো না—', আমার রাগের প্রকাশটা বোধহয় এই রকম। তাতে অন্য লোকটার কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু আমি নিশ্চিন্তে নিজের মনে থাকতে পারি ; আমার মনে হয় আমি যে ওকে মনে-মনে ক্ষমা করছি না এতেই ওকে যথেষ্ট শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

বিমলের বাড়িতে সুব্রতর আকর্ষণ বিমল নয়, তার তিনটি বোন—চো'দ, পনেরো, সতেরো তাদের বয়স। আমাকে একা পেলে মাঝে মাঝে ওদের গল্প করে সুব্রত। বড়োটির নাম মণিকা, সুব্রতর মতে 'খাশা চেহারা।' তিন বোনকে নিয়ে সে আর বিমল সিনেমায় যায় মাঝে-মাঝে, অন্ধকারে মণিকার পাশে ব'সে হাতে হাত রাখে সুব্রত, জুতো খুলে পায়ের উপরে পা দিয়ে চাপ দেয়, বসার ভঙ্গি বদল করায় সময় দৈবাৎ গালে গাল ঠেকে যায় তাদের, ইত্যাদি। 'আমি ওর বোনকে প্রেমপত্র লিখি সন্দেহ ক'রে আমাকে মেরেছিলো বিমল, আর সে-ই এখন বোনেদের সঙ্গে মেলামেশায় সুব্রতকে সাহায্য করছে—' এই কথাটা আমার তখন মনে হওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু তা হয়নি,

আসলে বিমল বা তার বোনেদের বিষয়ে এক ফোঁটা কৌতূহলও আমার ছিলো না, নেহাৎ ভদ্রতা ক'রে সুব্রতর কথা শুনে যেতুম। একদিন সুব্রত আমাকে বললে কাল রাত্রে ছাতে হঠাৎ একা পেয়ে সে কেমন ক'রে চুমু খেয়েছে মণিকাকে—অনেক, অনেকক্ষণ ধ'রে—মণিকাও সোৎসাহে তা ফিরিয়ে দিয়েছে ; তার সেই বিস্তারিত বর্ণনা শুনে আমি অবাক হলাম, কেননা তখন পর্যন্ত আমি জানতাম না যে কবিরা যাকে চুম্বন বলেন তার মধ্যে মানুষেব লালাসিক্ত জিহ্বারও কোনো অংশ আছে। একটু লজ্জাও করলো আমাব, কেননা ঐ বর্ণনা শুনতে-শুনতে কুসুমকে আমার মনে পড়লো।

জানি না সব ছেলেরই ও-রকম হয় কিনা, কিন্তু বয়ঃসন্ধিব সময়টাতে আমি বড্ড কষ্ট পেয়েছিলুম। কী যন্ত্রণা আমার যখন চৌদ্দ বছব বয়সে প্রথম টের পেলুম যে আমার শরীরের মধ্যে আর-একটা শবীর লুকিয়ে আছে—চোখ নেই কান নেই কিন্তু ভীষণভাবে জ্যান্ত, কাপড়েব তলায় ওত পেতে-থাকা জন্তু একটা, আমারই অংশ কিন্তু হাত-পায়ের মতো আমার বাধ্য নয়, স্বাধীন, নিজের একটা আলাদা ইচ্ছে আছে. হঠাৎ যখন মাথা চাড়া দেয আমি যেন চোখে অন্ধকার দেখি। আরম্ভ হয়েছিলো খুব মৃদুভাবে, এমনকি মধুরভাবে—আমাকে হানা দেয় সব নারী মূর্তি, হাওয়ার মতো সুরের মতো সুগন্ধেব মতো. ভূগোলেব খাতায় মেয়েদের মুখ আঁকি ব'সে ব'সে, ক্যালেন্ডাবের ছবির তরুণীর সঙ্গে মনে মনে কথা বলি। কিন্তু এই মধুব খেলা ভেঙে দিয়ে আমার দ্বিতীয় শরীব আরো জোরালো হ'য়ে উঠলো, তার হিংস্রতায় আমি ভয় পেয়ে গেলুম, কিন্তু পাবলুম না মাঝে-মাঝে নিজের হাতে তার দাবি না-মিটিয়ে, আর তার ফলে মনে হ'লো অপরাধ কবেছি, মা-বাবাব চোখের দিকে তাকাতে পারি না, আড়ষ্ট হ'যে থাকি —এদিকে স্কুলে এক মাস্টাবমশাই, আর বাড়িতে এক পূর্ণযুবক আত্মীয়, আমাকে ঘুবিযে ফিবিয়ে অথচ স্পষ্টভাবে এমন সব ভুল উপদেশ দিতে লাগলেন যাতে আমার অপরাধবোধ আর অপরাধবোধেব কাবণ দুটোই আরো বেড়ে গেলো। শবীব-মনেব এই রকম অবস্থা নিয়ে আমি স্কুল থেকে কলেজে উঠলাম।

ম্যাট্রিক পবীক্ষার পরে কেষ্টনগরে পিসিমাব কাছে বেড়াতে এসে আমি প্রথম সচেতনভাবে কোনো মেয়েকে ছুঁতে পাবলুম—জাঁক ক'বে বলার মতো কিছু নয. দুই বোন, তেরো-চৌদ্দ বযস, গযনা আব ছুটকি তাদের নাম, কবিতায় লেখার মতো কিছু নয, গয়না ট্যাবা, গোলগাল, আর ছুটকি হ্যালহ্যালে লম্বা, তার মুখের মধ্যে সবচেযে আগে চোখে পড়ে তাব বড়ো বড়ো দাঁত যা না-হাসলেও খানিকটা বেবিয়ে থাকে,—জজকোর্টেব কোন-এক টাইপিস্টবাবুর মেয়ে তারা, পিসিমাদের পাড়ায থাকে, বিযেব সম্বন্ধ দেখা হচ্ছে ব'লে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়েছে। দিনের মধ্যে তাবা অনেকখানি সময় কাটায় পাড়া বেবিয়ে; যখন-তখন পিসিমার বাড়িতে চ'লে আসে. দারিদ্র্যের জন্যই হোক বা বহুসন্তানবতী মাযের অমনোযোগের জন্যই হোক, তাদেব জামাকাপড় সর্বদাই ময়লা আব শহুরে চোখে শোভনও নয়, তাছাড়া তবিবতও তেমন শেখেনি। হুট ক'বে ঢুকে পড়ে আমি যেখানে ব'সে পুরোনো বাঁধানো 'ভাবতী' পড়ছি। আমার ঘড়ি বই ফাউন্টেনপেন নিযে নাড়াচাড়া করে; 'ঘড়িটা কোথায় পেলে?' 'কলমটা তোমাকে কে দিযেছে?' 'অত বড়ো চুল রাখো কেন?' —এই বকম তাদেব কথাবার্তার নমুনা; 'ওটা কী বই পড়ছো?' ব'লে মাঝে-মাঝে যখন নিচু হয় তখন ঢিলে শেমিজেব মধ্য থেকে ঠেলে ওঠে তাদেব যৌবনের প্রমাণ, কখনো-কখনো এমন গা ঘেঁষে দাঁড়ায যে তাদের নোংবা ঘেমো গায়ের বা আঁচলের গন্ধে আমাব নাক চুলবুল কবে ওঠে। পিসিমা মাঝে-মাঝে দেখতে পেযে বলেন, 'এখান থেকে ভাগ, অংশুকে বিরক্ত কবিস না—।' ওরা তাড়া খেযে খিলখিল ক'বে হেসে উঠে পালিয়ে যায, কিন্তু সময়ে-অসময়ে ফিবে আসে. একা গযনা, একা ছুটকি, মাঝে-মাঝে দু-বোন একসঙ্গে: এমনি হ'তে-হ'তে আমি একদিন গয়নার শেমিজেব উপব হাত রাখলুম. সে হাতটা তুলে নিযে শেমিজেব মধ্যে সেঁধিয়ে দিলে। তাবপর এই খেলা ছুটকির সঙ্গেও খেলতে হ'লো আমাকে, মাঝে-মাঝে দু-বোনের সঙ্গে একই সমযে। কিন্তু এ থেকে কোনো সত্যিকার সুখ পেলুম না আমি—আসলে আমার অনেক ভালো লাগে মণীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা' বা সত্যেন্দ্র দত্তের কবিতা পড়তে—মেয়ে দুটোর প্রতি এমন অবজ্ঞা আমার যে তাদের

ঠিক 'মেয়ে' ব'লেই ভাবতে পারি না— 'মেয়ে' কথাটার মধ্যে যত স্বপ্ন আর কবিতা আমি ধীরে-ধীরে ভ'রে দিচ্ছিলাম তার কিছুরই সঙ্গে মিল নেই এদের, আমি চুমু খাই না পর্যন্ত, লুব্ধও হই না (কেননা চুম্বন হ'লো প্রেমের ঘোষণা, স্বাক্ষর, চুক্তিপত্র, আর এদের সঙ্গে আমার 'প্রেম' হওয়া অসম্ভব), এদের গায়ের দুর্গন্ধ কষ্ট দেয় আমাকে, এদের বোকা, অমার্জিত কথাবার্তায় আমি বিরক্ত হই, আমি এদের গায়ের মাংসে খাবলে দিচ্ছি নেহাত একটা জন্তুর তাড়নায়। কিন্তু জন্তুরও তৃপ্তি নেই এতে ; সে ঠিক কী চায় সে-বিষয়ে আমার ধারণাও তখন পর্যন্ত অস্পষ্ট ; এদিকে মনে-মনে একটু ভয়ও আছে পাছে পিসিমা বা অন্য কারো কাছে 'ধরা প'ড়ে' যাই। অথচ মেয়ে দুটো ঠিক এমন সময়ে আসে যখন আমি একা আছি, কাছাকাছি অন্য কেউ নেই, যেন সুযোগের জন্য ঘুরঘুর করে আশেপাশে, আর ভাবটা যেন আমি ওদেরই অপেক্ষায় ব'সে আছি। শেষটায় এই ব্যাপারটা কেমন ভোঁতা আর বিস্বাদ হ'য়ে উঠলো আমার কাছে, কলকাতায় ফিরে আসার সময় ভাবতে ভালো লাগলো যে গয়না আর ছুটকিকে আর দেখবো না।

কলেজে এসে একটা পরিবর্তন হ'লো আমার। আমি ছেলেবেলা থেকেই পড়তে ভালোবাসি ; 'চয়নিকা'র অর্ধেক কবিতা আমার মুখস্থ, শরৎচন্দ্রের কোনো-কোনো বই পনেরো-কুড়িবার ক'রে পড়েছি, একবার সারারাত জেগে গোকুল নাগের 'পথিক' পড়েছিলুম—আর ঐ ঝড়ঝাপটার সময় আমি যে কোনো ভাবেই বেসামাল হ'য়ে পড়িনি তার কারণই তা-ই। কলেজের লাইব্রেরীতে আরো বড়ো একটা আশ্রয়ের আমি সন্ধান পেলুম, আমার চোখ আর মন খুদে-খুদে ছাপার অক্ষরগুলোকে চেটেপুটে খেয়ে নিতে লাগলো, আর সেই খোরাক থেকে জোর পেয়ে-পেয়ে আমার মনে হ'লো আমি বয়ঃসন্ধির জ্বালাযন্ত্রণা কাটিয়ে, স্বাবলম্বী যুবক হ'য়ে উঠছি। আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগলো দু-জন রুশ লেখককে—টুর্গেনিভ আর চেখভ, এঁদের বই থেকে যেন উঠে এসে আমার পাশে দাঁড়ালো আমার কৈশোরের স্বপ্ন—হাওয়ার মতো সুরের মতো সুগন্ধের মতো—মধুর, মধুর এক মেয়ে; পুরোনো বাড়ির বড়ো-বড়ো অন্ধকার ঘরে সে ব'সে থাকে শাদা পোশাক প'রে আমার জন্য, চাঁদের আলোয় ছায়াভরা বাগানে পাইচারি করে, ট্রেন ছাড়ার আগের মুহূর্তে তার বড়ো-বড়ো করুণ চোখে সারা আকাশ দেখতে পাই আমি—এই মেয়ে, কিছুটা আমার মন-গড়া আর কিছুটা সাহিত্য থেকে তুলে নেয়া, সে আমাকে হানা দিতে লাগলো দিনে-রাত্রে, আমি বুঝে নিলুম যে এই বুকের দুরুদুরু, দীর্ঘশ্বাস, চোখের চাউনি, এই যে কথা বলতে গিয়ে থেমে যাওয়া আর চিঠি লিখতে গিয়ে ছিঁড়ে ফেলা, আর রাত ভ'রে মাথার মধ্যে এক গুনগুন গান—এরই নাম প্রেম, আর এই প্রেম আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর ও সবচেয়ে পবিত্র সম্পদ। এই 'প্রেম'কে একটা বাইরের চেহারা দেবার জন্য আমি কুসুমকে বেছে নিলুম।

'কুসুম, আমি তোমাকে ভালোবাসি।' এই না-বলা কথাটা তাকে ঘিরে-ঘিরে ঘুরতে লাগলো কোনো বিগ্রহের সামনে ধূপের ধোঁয়ার মতো, সে বুঝে নিলো আমার কথাটা, চোখ দিয়ে সায় দিলো তাতে, বুঝিয়ে দিলো সেও আমাকে 'ভালোবাসে'। আমাদের দু-জনের মধ্যে একটা গোপন ব্যবস্থা এটা, একটা অলিখিত চুক্তিপত্র, প্রেমে পড়বো স্থির করেছি ব'লেই প্রেমে পড়েছি আমরা। কুসুম বয়সে আমার ছোটো হ'লেও সম্পর্কে এক ধরনের মাসি, সম্পর্ক নিকট নয় কিন্তু দু-বাড়িতে যাতায়াত মেলামেশা আছে, তার সঙ্গে আমার দেখাশোনার কোনো বাধা নেই। কিন্তু সুব্রত যে-ভাবে তার মণিকার সঙ্গে এগিয়েছে, সে-রকম কিছু কুসুমের সঙ্গে আমার হয় না কখনো—সাহস বা সুযোগের অভাবে নয়, ইচ্ছে করি না ব'লেই হয় না। মধুর, সুন্দর, পবিত্র এই প্রেম—আমরা কি পারি শরীর দিয়ে তাকে কলঙ্কিত করতে? দেখা হয় কথা হয়, দুরুদুরু করে বুক, চোখে-চোখে জ্বলে আলো, সে পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে ঝাপসা একটা গন্ধ পাই, বৃষ্টিপড়া বিকেলে ব'সে ভাবি তার কথা—এ-ই যথেষ্ট, এর বেশি হ'লে সব নষ্ট হবে।

তবু—তবু—আমার শরীরটাকে বাগাতে পারি না আমি। জন্তুটাকে পোষ মানাতে পারি না। আমার নির্জনতম, মধুরতম মুহূর্তে সে আক্রমণ করে আমাকে —অন্ধ, বধির, লালাঝরা হাঁ-করা

একটা মুখ, ঝোপের আড়াল থেকে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ে আমার অতি কোমল ভাবনাগুলির উপর। এক এক সময় এত কষ্ট পাই যে জন্তুটার খিদে মেটাবার জন্য রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি, কিন্তু বড়ো রাস্তা ছেড়ে গলিতে ঢুকতে সাহস হয় না।

একবার আষাঢ় মাসে বৃষ্টি শুরু হ'য়ে আর থামে না, টানা সাতদিন বাড়িতে আটকে আছি—কলেজে তখন গ্রীষ্মের ছুটি চলছে—কোনো কাজ নেই, ধোপাব দেখা নেই, ধুতি-জামা ময়লা, কোনো বই ভালো লাগছে না, সেই বিশ্রী বিরক্তিকর দিনগুলি ভ'রে আমার মনের মধ্যে শরীরের মধ্যে যে দাপাদাপি করতে লাগলো সে কোনো মানসপ্রতিমা নয়, কোনো কুসুমও নয়, একটা স্থূল জ্যান্ত মাংসল মূর্তি যার নিঃশ্বাস ঘন আর গরম, ঠোঁট ফেনায় ভেজা, হাত দুটো সাপের মতো প্যাঁচালো, যার মুখের মধ্যে চোখ নেই আর নাকের ফুটো দুটো অত্যন্ত বড়ো—এমন কোনো-কোনো সময় এলো যখন ও ছাড়া আমি আব-কিছুই ভাবতে পারি না, অবশেষে অসহ্য হ'য়ে উঠলো আমাব, প্রথম যেদিন বৃষ্টি থামলো সেদিনই বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে, কোনো বন্ধুর খোঁজ কবলাম না, কোথাও থামলাম না, একেবারে সোজা চ'লে এলাম সন্ধের পরে হাড়কাটা লেনে। আগে আর কখনো ঢুকিনি ঐ গলিব মধ্যে, এক অদ্ভুত দৃশ্য আমার চোখের সামনে খুলে গেলো। আঁকাবাঁকা সরু গলির দু-দিকে দাঁড়িয়ে আছে শরীর নিয়ে স্ত্রীলোকেরা—ছড়িয়ে, সাব বেঁধে, ঘেঁষাঘেঁষি, আবছায়ায়, ল্যাম্পোস্টের তলায়, আরো সরু কোনো গলির ফাঁক ভর্তি ক'রে—আব পুরুষেরা তাকাতে-তাকাতে এগিয়ে যাচ্ছে ফিরে আসছে; ছোটো-ছোটো দলে, কেউ বা গোমড়ামুখে একা, কেউ ছাতার তলায় মুখ লুকিয়ে, কেউ ছায়ার মধ্যে ছায়ার মতো মিশে গিয়ে, কেউ বা বিকশাতে—কেউ ঈষৎ টলছে, কেউ গুনগুন গাইছে, কাবো হাতে বেলফুলের মালা জড়ানো—কেউ বা কখনো বসিকতা ছুঁড়ে দিচ্ছে আব তক্ষুনি তাব জবাব আসছে টিনের মতো ক্যানকেনে গলায়—আর ভিতব থেকে উড়ে এসে পড়ছে গান, ঘুঙুর, হার্মোনিয়াম, হল্লা। বৃষ্টি টিপটিপ, কাদা, গলিটা এত সরু আব লোক এত বেশি আব ঘেঁষাঘেষি যে আমার মনে হচ্ছে যেন মাথার উপরে আকাশ নেই আমার, যেন প্রকাণ্ড একটা পোড়ো বাড়িতে ঢুকে পড়েছি আর আমার সাড়া পেয়ে ন'ড়ে উঠছে ছাতাপড়া দেয়াল থেকে উইযেব স্রোত, ফাটা মেঝের গর্ত থেকে সারি সারি পিঁপড়ে, ঝাপট দিচ্ছে দুর্গন্ধি চামচিকে, ঠাণ্ডা ব্যাং লাফিয়ে উঠছে পায়ে—যেন পৃথিবীর যাবতীয় জীবন্ত নোংরাব মধ্যে হঠাৎ পথ হারিয়ে ফেলেছি। বমি পাচ্ছে আমার, হৃদপিণ্ড উঠে আসছে গলায়, চোখ ঝাপসা, কোমরের তলাটা প্রচণ্ড চাপে ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু আমি মনস্থির ক'রে এসেছি আজ ফিবে যাবো না—যে-কোনো একটা মেয়েব সামনে থেমে পড়লুম। সে আমার গালে হাত বুলিয়ে বললো, 'একেবারে কচি ছেলে দেখছি। তা এসো ভাই এসো!' খানিকটা দুর্গন্ধ আর আবর্জনা পেরিয়ে তার ঘরে এলুম—একতলাব ঘব, একটি মাত্র জানলা, খাটে বিছানা, মেঝেতে ফবাশ, দেয়ালে ছবিতে তিনটি মোটাসোটা যুবতীর শাড়ি উড়ে যাচ্ছে—আমি বেশ বয়স্কভাব ধারণ ক'রে মেয়েটাকে পাশে নিয়ে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসলুম, কিন্তু ভেবে পেলুম না এখন আমার কী বলা উচিত বা কবা উচিত, কানেব মধ্যে পিঁপিঁ আওয়াজ হ'তে লাগলো। বোধহয় আমাকে উৎসাহ দেবার জন্যই মেয়েটি ডিবে থেকে পান বের ক'রে বললে, 'খাবে?' আমি বিজ্ঞের মতো বললুম—কথা বলতে গিয়ে বড্ড মোটা শোনালো আমার গলা—'কী মসলা দিয়েছো তোমার পানে?' 'কী মসলা দিয়েছি পানে?' মেয়েটা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে, তার শাড়িটাকে দু-হাতে ধ'রে বুক পর্যন্ত তুলে ফেললে, কোমর ঢুলিয়ে বললে, 'এই মসলা!' আব মুহূর্তে আমাব সাবা শবীব হিম হ'য়ে গেলো, বরফের মতো ঠাণ্ডা। তারপর দেখলুম মেয়েটা শুয়ে পড়েছে হাঁটু উঁচু ক'রে, শুনলুম একটা ভাঙা গলার আওয়াজ—'কী হ'লো? ব'সে আছো কেন?' —কিন্তু আমি কিছুতেই আর জন্তুটাকে খুঁজে পাচ্ছি না। সে কুঁকড়ে গা ঢাকা দিয়েছে গর্তেব মধ্যে, আমি তাকে যতই বলছি, 'বেরিয়ে আয়! বেরিয়ে আয়, জোচ্চোব!' ততই সে গুটিয়ে যাচ্ছে পোকাব মতো। আমাকে দবজাব কাছে দেখে তড়াক ক'বে উঠে দাঁড়ালো মেয়েটা, আমি কয়েকটা টাকা ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

ঘেন্না—কিন্তু ভোলা যায় না যে ব্যাপারটা, ঐ সব মেয়েরই শাড়ি-জামার তলায় শরীর আছে। কুসুম—এমনকি কুসুমেরও। হয়তো ক্লাশে বসে আছি, মাস্টারমশাই ফরাশি বিপ্লব পড়াচ্ছেন, হঠাৎ আমার মনের সামনে ভেসে উঠলো একটা ছবি: বাথরুমে কুসুম খুব নির্দোষ ও প্রয়োজনীয় ও স্বাস্থ্যকর কাজ করছে, ও-সব তাকেও করতে হয়, আর অমনি ক'রেই শাড়ি তুলে ধরতে হয় তখন। আমি মনে-মনে চীৎকার করি—'না, না, এ আমি মানবো না, এ মিথ্যে, এ অসহ্য!' —দুই হাতে আঁকড়ে ধরি বাতাসের মতো অন্য এক কুসুমকে—শাদা লম্বা পোশাক তার পরনে, এক পুরোনো বাড়ির বড়ো-বড়ো অন্ধকার ঘরে স্বপ্নের মতো তার ঝিলিমিলি। কুসুম, তুমি আমার প্রেম, তুমি আমার স্বপ্ন।

অন্য একটা কারণে আমি কষ্ট পেতুম মাঝে-মাঝে, যখন আমার সন্দেহ হ'তো, যে অন্য ছেলেদের তুলনায়—ধরা যাক সুব্রতর তুলনায়, আমি যথেষ্ট তুখোড় নই। আমি পরীক্ষায় উঁচু নম্বর পাই, অনেক দেশের অনেক বই পড়েছি, কিন্তু ওরা যে-সব খিস্তি বুলি আওড়ায়, যে-সব কথা বলাবলি ক'রে চায়ের টেবিল ফাটিয়ে দেয় এক-এক সময়, আমি সেগুলো বুঝতেই পারি না, আর ওরা যখন অনেক চেষ্টা ক'রে আমার মগজের মধ্যে সেঁধিয়ে দেয় অর্থটা, তখন আমি লাল হ'য়ে হাতের পাতায় মুখ লুকোই। আমি যখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ছি তখনও আমি জানি না স্ত্রী-পুরুষের মিলনের পদ্ধতিটা ঠিক কী-রকম, আর মাতৃগর্ভ থেকে সন্তানই বা ঠিক কোন রাস্তায় বেরিয়ে আসে, আর এ-সব ব্যাপার আড্ডায় শোনা, বাড়িতে বয়স্কদের মুখে শোনা নানা কথা মনে-মনে জোড়াতালি দিয়ে, আমি যেদিন সত্যি বুঝতে পারলুম সেদিন আমার লজ্জায় ম'রে যাবার দশা হ'লো। ছি! কী কুৎসিত! কী জঘন্য! এই কি করতে হয়েছে সকলকে, করতে হবে সকলকে— শুধু বেশ্যাদের সঙ্গে নয়, নিজের স্ত্রীর সঙ্গেও—আমার মা বাবা, তাঁরাও? ছি! অন্যরকম কেন হ'লো না। ঠোঁটে ঠোঁটে চুমু খেলে যদি সন্তান হ'তো, নিশ্বাসের সঙ্গে নিশ্বাস মেশালে, বা কোনো মেয়ে বা পুরুষ যদি একা-একা জন্ম দিতে পারতো, যেমন লেখা আছে মহাভারতে, বাইবেলে—যে-কোনো, অন্য যে-কোনো উপায় কি সম্ভব ছিলো না? এই একটা ব্যাপার একেবারে মেরে রেখেছে আমাদের কেমন ক'রে অমাদের প্রেম হবে সুন্দর—আর পবিত্র—আর মধুর—যখন তার তলায় এই পাঁক, এই নোংরা, এই ঘেন্না? ধরা যাক কুসুমের সঙ্গে যদি কোনোদিন আমার বিয়ে হয় তাহ'লেও কি—না, কিছুতেই না, অসম্ভব!

কুসুমের যখন বিয়ে হ'লো আমি তখন এম.এ পড়ছি। আমি কিছুটা কষ্ট পেলুম যেহেতু ইচ্ছে হ'লেই তাকে আর দেখতে পাবো না (তার স্বামী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, মফস্বলে থাকেন) কিন্তু মনের তলায় সুখীও হলুম এই ভেবে যে চেখভের গল্পের মতো আমার এটাও ব্যর্থ প্রেম হ'লো। মনে মনে বললুম, 'যে প্রেম বিয়োগান্ত সেটাই বেশি গভীর, কুসুম আমারই রইলো—সুর, স্বপ্ন, সুগন্ধ হ'য়ে।' শরীরটাকে বাদ দিলেই প্রেম সত্য হয়, আর যাতে শরীরের অংশ আছে সেটা প্রেম হ'তেই পারে না, এই ধারণা তখনও আমাকে ছেড়ে যায়নি। কিন্তু একবার একটু অন্য রকম অভিজ্ঞতা হ'লো আমার—কুসুমের সঙ্গেই।

বিয়ের কয়েক মাস পরে কুসুম কলকাতায় এলো, ওর স্বামী ইস্টারের ছুটি কাটিয়ে দিনাজপুরে ফিরে গেলেন। আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসে কুসুম—বিয়ের পর স্বাধীনতা অনেক বেড়ে গেছে তার, আমার সঙ্গে ব্যবহার অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ, আমি তাকে মনে-মনে 'প্রেমিকা' ব'লে ভাবি আর ঐ ভূমিকা মেনে নিতে তারও আপত্তি নেই—চোখে চোখে এই বার্তা বিনিময় করি আমরা। একদিন—সে-রাতটা আমাদের বাড়িতেই ছিলো সে—রাত্রে খাওয়ার পর কুসুম আমার ঘরে এলো—তেতলার কোণের ঘর সেটা—আমার বিছানায় বসে আজে বাজে গল্প করলো অনেকক্ষণ, আস্তে-আস্তে নিঝুম হ'য়ে এলো বাড়ি, কুসুম বললে, 'আমার ক্লান্ত লাগছে, একটু শুয়ে নিই।' বালিশে মাথা রেখে বললে, 'সুন্দর জ্যোছনা, আজ আলোটার কি দরকার আছে?' -চৈত্রমাস, জলের মতো জ্যোছনা, পাগলের মতো হাওয়া, চাঁদের আলো তার ঠোঁটে আর গালে, চোখ আরো কালো আর

গভীর—শুধু চুমো খেয়ে খেয়ে সেই রাতটা কাটিয়ে দিলুম আমরা, সুব্রত যে রকম বর্ণনা দিয়েছিলো তেমনি। আমি তাকে জড়িয়ে ধরলুম না, আমার হাত দুটো একেবারে বেকার রইলো, শুধু ঠোঁট খুলে শুষে নিলাম তার মুখের নিশ্বাস—সুগন্ধি ভেজা ফেনা যেন অফুরন্ত, শিয়রে ব'সে নিচু হয়ে ডুবিয়ে দিলাম আমার মুখ ঐ সুস্বাদু উৎসের মধ্যে—শুধু এ-ই, আর-কিছু নয়—কামনা ও সংযম, সাধ্বিতা ও সম্ভোগ, ব্রহ্মচর্য ও ইন্দ্রিয়-বিলাসের এক অদ্ভুত মিশ্রণে কেটে গেলো সেই হাওয়া আর জ্যোছনায় উতল রাত্রিটা। আশ্চর্য এই যে অন্য কোনো ইচ্ছে-জাগলো না আমার, কুসুমও এমন কোনো ভঙ্গি করলে না যে আরো কিছু চায়, হয়তো ভাবছিলো ওইটুকুই নিরাপদ কিংবা হয়তো নিরাশ হয়েছিলো আমার ব্যবহারে—তারপর সে আর রাত কাটায়নি আমাদের বাড়িতে, পাছে আরো এগোতে হয় সে-কথা ভেবে ইচ্ছে ক'রেই এড়িয়ে গেছে হয়তো—কিন্তু আরো এগোবার কথা, আশ্চর্য, আমার মাথাতেই খেলেনি, আমার কোনো অতৃপ্তি ছিলো না, আমি তখনও ছেলেমানুষ তখনও রোমান্টিক--তারপর কয়েকটা দিন যেন সারাক্ষণ ঘোরের মধ্যে কাটলো আমার, স্নায়ুতন্ত্রে এক নতুন শিহরন, মুখের মধ্যে এক নতুন সুগন্ধ, যেন আমার স্বপ্নকে আরো কাছে পেয়েছি, প্রমাণ পেয়েছি, স্বপ্নটা নেহাত বইয়ে পড়া ব্যাপার নয়।

আমার বিয়ের রাত, আজকের মতোই রাত ভ'রে বৃষ্টি, আজকের মতোই পাশাপাশি শুয়ে নির্ঘুম ছিলো সেই রাত্রি, কিন্তু ঠিক আজকের মতো নয়। এক বছরের মেলামেশা উৎকণ্ঠিত আশার পরে কাছে পেয়েছি মালতীকে, তার পাশে শুয়ে আছি মেঝের উপর নতুন জাজিমের বিছানায়, জাজিমের উপর চিকনপাটি পাতা, ঘরের কোণে তেলের দীপ জ্বলছে৷ হিন্দুমতে বিয়ে হয়েছিলো আমাদের (আমার তাতে মত ছিলো না), ভবানীপুরের হরিশ মুখার্জি রোডে ভাড়া বাড়িতে লগ্ন রাত দেড়টায়, পালা যুবোতে আরো কত বাড়লো কে জানে—মালতীকে আবার উপোস করিয়েও রেখেছিলেন তার মা আগে ভাবতুম ক্লান্তিকর, বিরক্তিকর, সময়ের এ-রকম অপব্যয় আর কিছু নেই, কিন্তু ঘণ্টাগুলি কেমন ক'রে কেটে গেল টের পেলুম না, আমি শুয়ে আছি মেঝের উপর নতুন জাজিমের বিছানায় ঘরের কোণে পিলসুজে পিতলের প্রদীপ, সারা ঘরে ছায়া, সারা ঘরে জুঁইফুলের গন্ধ, টাটকা নতুন বেনারসির ফিশফিশে আওয়াজ আমি তাকে ভালো দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু অনুভব করছি প্রতিটি রক্তকণিকায় একটা প্রকাণ্ড পাকা আতার মতো ফেটে যাচ্ছি আমি, যেন সব বীজ ছিটকে বেরিয়ে আসছে—স্তব্ধতা, রাত্রি নিবিড়, বৃষ্টির শব্দ আমি একবার চুমু খেলাম তাকে, ঠিক চুমু নয় শুধু ঠোঁটের উপর ঠোঁট ছোঁয়ালাম একবার, পালকের মতো হালকা, একবার হাত রাখলাম তার স্তনের উপর—পাখির মতো নরম, আর উষ্ণ, আর জীবন্ত—মনে হ'লো আমার হাতের তলাতেই তার হৃৎপিণ্ড ঢিপঢিপ করছে, মনে হ'লো তার এলিয়ে-থাকা হাতের মুঠোয় আমার হৃৎপিণ্ড—শুধু এ-ই, আর কিছু নয়, রাত ভ'রে বৃষ্টি, বৃষ্টির শব্দ, আমরা একজনও ঘুমোইনি শুধু পাশাপাশি শুয়ে অনুভব করেছি পরস্পরকে—আমরা এখন বিবাহিত, স্বামী-স্ত্রী, প্রাণ যা চায় রক্ত যা বলে তাই আমরা করতে পারি এখন, কিন্তু কিছু না করাটাই আমার মনে হলো ভালো—সুন্দর—আনন্দময়—আমি এখন তাকে পেয়েছি তাই অপেক্ষা করাটাই চরিত্রবান—বলো, মালতী, তুমি কি নিরাশ হয়েছিলে?

বিয়ে ক'রে আমি সুখী হয়েছিলাম—সচেতনভাবে, পরিপূর্ণভাবে সুখী। মালতীর সঙ্গে আমার চেনা হবার কিছুদিন পরেই টের পেলুম যে আমি ওর শরীরটাকে আকাঙ্ক্ষা করছি আমার কাছে অন্তহীনরূপে কাম্য হ'য়ে উঠেছে ওর চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সমস্ত শরীর--অথচ আমার প্রেমের স্বপ্নকে তা মলিন ক'রে দিচ্ছে না বরং গাঢ় ক'রে তুলছে। যে-সব অবস্থায় কুসুমকে কল্পনা ক'রে আমি আঁতকে উঠেছি সবই যেন মালতীর পক্ষে শোভন ওর শরীরের কোনো প্রকাশ নেই যা অসুন্দর, আমার মনে হয় ওর গালের ঘাম আমি চেটে নিতে পারি, ওর চিবানো খাবার খেয়ে নিতে আমার বাধবে না যেদিন গিয়ে দেখি ও মাসিকের ব্যথায় কাতর হ'য়ে শুয়ে আছে সেদিন ওর প্রতি আমার আকর্ষণ আরো বেড়ে যায়। এই সেই মেয়ে, যাকে আমি একই সঙ্গে ভালোবাসতে

আর ভোগ করতে পারবো—তা-ই আমার মনে হ'লো তখন—ওরই কাছে এসে এতদিনে আমার শরীর-মনের ঝগড়া মিটে গেলো। এতদিন যেন দু-টুকরো হ'য়ে অস্থিরভাবে বেঁচে ছিলাম, এবারে আমার দুই অর্ধেকে জোড়া লেগে গেলো, আমি আস্ত একটা মানুষ হ'তে পারলাম। আমার বিয়েতে, আর মালতীর মধ্যে, এইটেই আমার মনে হ'লো সবচেয়ে আশ্চর্য আর সবচেয়ে সুন্দর—এই যে আমার মন এখন জন্তুটার সঙ্গে দোস্তালি পাতিয়েছে, জন্তুটাও রোগা হ'য়ে যাচ্ছে না অথচ আমার মনের মধ্যে গুনগুন সুর, আর সুগন্ধ আমাকে বাতাসের মতো ঘিরে আছে—জীবনে এই প্রথম আমার নিজেকে মনে হ'লো পুরোপুরি মানুষ, পুরোপুরি পুরুষ, স্বাধীন, আত্মস্থ, স্বাবলম্বী।

কিন্তু তা-ও, তা-ও তোমার ছেলেমানুষি, নয়নাংশু, প্রথম থেকেই তোমার বিয়ে ছিলো ফাঁকি—আর তা মালতীর নয়, তোমারই দোষে। অসীম তোমার অবজ্ঞা সেই সব বাঙালি যুবকদের উপর যারা লাভের জন্য হিশেব ক'রে বিয়ে করে—রূপ, শ্বশুরের টাকা, সামাজিক মর্যাদা, সব এক বঁড়শিতে গাঁথার আশায় এম.এ. পাশ ফ্যাশনেবল চাকুরে হ'য়েও বিজ্ঞাপন দেয় খববকাগজে, কিংবা যারা 'প্রেম বিবাহ' ক'রে বন্ধুদের কাছে তাদের রাত্রিবেলাব নতুন-নতুন অভিজ্ঞতার গল্প করে রসিয়ে। কিন্তু তুমি, পঁচিশ বছরের টগবগে যুবক, তুমিই বা কি-রকম প্রেমিক আর স্বামী ছিলে জিগেস করি? মনে আছে—বিয়ের আগে মালতী যখন কালিম্পঙে বেড়াতে গেলো তাব মা-র সঙ্গে, তুমি যে-সব লম্বাচওড়া চিঠি লিখতে সেগুলিকে মালতী কেমন ঠাট্টা ক'বে বলতো 'আবহাওয়া-সংবাদ'! যে উপন্যাস তুমি কখনো লিখতে পাববে না তারই কয়েকটা ছেঁড়া পাতা ছিলো সেই চিঠিগুলো—মেঘলা দিন, সেদিনকার কাগজেব কোনো খবর, চৈত্রের দুপুরে চৌরঙ্গির ট্রাম—এমনি সব বিষয়ের ছুতোয় তুমি নিজের মনটাকে খুলে দেখাতে যেন মালতী তোমার কোনো পুরুষ-বন্ধু—মেয়ে নয়, প্রণয়িনী নয়, যেন তোমার চিঠিতে সে এই কথাটা শুনতে চাচ্ছে না যে তার অভাবে তুমি খুব কষ্ট পাচ্ছো! কিন্তু ঐ কথাটা তুমি কখনো লিখবে না—যদিও সেটাই সত্য—তা লিখতে তোমার আত্মসম্মানে বাধে, সেটা সাধারণ, সেটা 'অন্যদের মতো'! ভেবে দ্যাখো বিয়ের পরে প্রথম ক-মাস, তুমি তাকে কবিতা পড়ে শোনাও, বেছে-বেছে বলো পুরাণ ইতিহাস সাহিত্য থেকে বাছা-বাছা প্রেমের কাহিনী, বুঝেও বোঝো না সে বিরক্ত হচ্ছে, শুনছে না, হাই চাপছে—যখন তোমার প্রেম করার কথা তখন প্রেম বিষয়ে কথা ব'লে-ব'লে অমূল্য সময় হেলায় নষ্ট করো, লক্ষও করো না যে তোমার স্ত্রীকে যথেষ্ট ভালোবাসতে পারছো না তুমি, তাকেও যথেষ্ট সুযোগ অথবা অবকাশ দিচ্ছো না তোমাকে ভালোবাসার। আর আজ—আজ তো দেখছো যে প্রেম নিয়ে চোদ্দ বছর বয়স থেকে এত কথা তুমি ভেবেছো আর বলছো তার সত্যিকার চেহারাটা কী—ঐ জয়ন্ত, স্থূল, অশিক্ষিত, বেপরোয়া, তারই জন্য আজ খুলে গেল টিৎসিয়ানোর কোনো ছাত্রের আঁকা পক্বযুবতী শ্যামাঙ্গী এক ভেনাসেব শরীর। আব, তুমি, শুয়ে শুয়ে ভাবছো, শুধু ভাবছো—যেমন ভেবেছো জীবন ভ'রে, বড্ড বেশি ভেবে-ভেবে তুমি অক্ষম হ'য়ে গিয়েছো, নয়নাংশু, তা না-হ'লে এতদিনে কি অপর্ণার দিকে আর একটু বেশি মনোযোগ দিতে না?

কী করতে বলো আমাকে? মালতীকে ছেড়ে দিয়ে অপর্ণাকে বিয়ে করবো? বোকা—বিয়ে কেন করতে হবে? আব কত স্পষ্ট ক'রে একজন ভদ্রমহিলা জানাতে পারে যে সে এমনিতেই রাজী? স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হবার পর থেকে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে অপর্ণা, নিজে চাকরি ক'রে চালায়, ছেলে-পুলে নেই ঝামেলা নেই, চমৎকার—তোমাকে তাব পছন্দ, আর তোমারও যে ওকে খারাপ লাগে তা তো নয়। তাহ'লে কেন ক্ষণিকের মধু লুটে নেবে না ফুল যদি এগিয়ে আসে? কিন্তু আখেরে যদি প্রেমে প'ড়ে যাই, যদি সত্যি ভালোবেসে ফেলি? তবে তো আরো ভালো; বেশ খানিকটা দুঃখ নিয়ে বিলাস করতে পাববে। না, আমি আর ঝাড়-ঝাপট চাই না, আমি নিরিবিলি নিজের মনে থাকতে চাই, ঐ নৈশ অনুষ্ঠান বাদ দিয়েও কাটাতে পারবো জীবনটা, বাদ দেওয়াটাই অভ্যেস হ'য়ে গেছে মালতীরই সৌজন্যে। —ভীতু, অক্ষম! শরীরকে তোমাব ভয়, ভালোবাসাকে তোমার ভয়। ভালোবাসাকে নয় হয়তো। একই—ও-দুটো জিনিস একই, নয়নাংশু। ভালোবাসায়

শরীরই আসল—আরম্ভ, শেষ, সব ঐ শরীর। আধা-বয়সী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অত ঝগড়াঝাঁটি খিটিমিটি কেন? যেহেতু তাদের শরীর প'ড়ে আসছে। বুড়ো স্বামী-স্ত্রীরা নানাভাবে উৎপীড়ন করে কেন পরস্পরকে? যেহেতু তাদের শরীর ম'রে গেছে। প্রতিহিংসা—প্রকৃতির উপর প্রতিহিংসা। ভালোবাসা জৈব, ভালোবাসা যৌন, শরীর না-থাকলে কিছুই থাকে না ভালোবাসার। বিদ্যুতের মতো, বৈদ্যুতিক সংস্পর্শের মতো—শরীরের সঙ্গে শরীরের প্রেম। ঘরে সব সময় আলো জ্বালতে হয় না কিন্তু সুইচ টিপলেই জ্ব'লে ওঠে, যেহেতু তারের মধ্যে বিদ্যুৎ চলছে সব সময়। এও তেমনি। আছে শরীরে শরীরে বৈদ্যুতিক যোগ, তাই যখন প্রেম করো না তখনও থাকে প্রেম, শিরায়-শিরায় ব'য়ে চলে সারাক্ষণ—তাই কথা মধুর, হাসি মধুর, কাছে থাকা মধুর, দূরে যাওয়া মধুর, কলহ মধুর, কলহের পরে মিলন আরো বেশি মধুর। সবই শরীর। সেই যোগ আজ নষ্ট হ'য়ে গেছে তোমার সঙ্গে মালতীর, শরীরে-শরীরে বিদ্যুৎ আর ব'য়ে যায় না, তাই—যতই তুমি সুইচ টেপো মিস্ত্রি ডাকো আলো আর জ্বলবে না, পাওয়ার-হাউস ফতুর হ'য়ে গেছে। কিন্তু অন্য কোথাও তৈরি হচ্ছে বিদ্যুৎ, তোমার আর অপর্ণার মধ্যে, খোরাক না-পেয়ে ম'রে যাচ্ছে তোমার শরীর, তাকে আবার জাগাতে পারবে অর্পণা, সে পারবে তোমার যৌবন ফিরিয়ে দিতে—ওঠো, জেগে ওঠো, নয়নাংশু, মনস্থির করো, কাল তুমি অপর্ণাকে ডিনারে বলবে পার্ক স্ট্রীটের কোনো রেস্তোরাঁয়, প্রচুর মদ খাবে এবং খাওয়াবে—তারপব যাবে তার ফ্ল্যাটে, তাকে ট্যাক্সিতে পৌঁছিয়ে দেবে, আর সে বলবে একটু আসুন এক পেয়ালা কফি খেয়ে যান—তোমার ভীরুতা ছাড়া কোনো বাধা নেই, নয়নাংশু, তোমার চল্লিশ হ'তে আর দেবি কী, এখনো কী শক্তপোক্ত পুরুষ হবে না?

তিন

যেন একটা বাঁধ ভেঙে গেলো—বন্যা—বন্যা আমাকে নিয়ে গেলো ভাসিয়ে, কিংবা যেন মস্ত কালো মেঘ সকাল থেকে জ'মে ছিলো স্তব্ধ—কালো, আরো কালো, একটা আবছা নীল গুমোট গরম সুড়ঙ্গেব মতো হ'য়ে উঠলো দিনটা, তাবপর সন্ধেবেলা হঠাৎ গর্জনে ফেটে পড়লো অঝোর, মুচড়ে ছিঁড়ে নিংড়ে নিলো আমার শরীরটাকে—নিঃশেষে। এই তুমি করেছো আমাকে, জয়ন্ত, আমি তোমার জন্য একশো লোটন হ'য়ে উঠেছিলাম, আমার ছোট্ট শরীরটার তলায় অমন প্রকাণ্ড একটা কালো মেঘ কোথায় লুকিয়ে ছিলো এতদিন? তবে কি নয়নাংশুকে আমি কখনোই ভালোবাসিনি? বাসিনি তা নয়, কিন্তু ওকে আমি পুরোপুরি কখনো দিইনি নিজেকে—এতদিনে সেটা বুঝতে পারছি—একটা অংশ সরিয়ে রেখেছি না জেনে—সেই গোপন গভীর চরম অংশ তোমারই জন্য আমি জমিযে রেখেছিলাম, জয়ন্ত! সে আমার স্বামী, রাতের পব রাত বছরের পর বছর আমি শুয়েছি তার পাশে, তার আর আমারই সন্তান বুন্নি—কিন্তু ও-সবে কিছু এসে যায় না। কয়েক মিনিট সময়ের মধ্যে, বিনা চিন্তায় বিনা ইচ্ছায বিনা ভালোবাসায় কি স্ত্রীলোকের গর্ভে সন্তান আসে না? আমি এখন বুঝতে পারছি যে সাত সন্তানের মা হ'য়েও কোনো মহিলা কুমারী থেকে যেতে পাবেন—হয়তো ঘবে ঘবে এমন গৃহিণী অনেক আছেন যাঁরা একটা বোবা শরীর নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন তিরিশ বছরের বিবাহিত জীবন, আর তা তাঁরা জানেন না পর্যন্ত। আমিও কি জানতাম আমার গোপন রহস্য, জয়ন্তর সঙ্গে দেখা না হ'লে? অংশু পারেনি—নতুন বিয়ের পরেও কখনো পারেনি আমাকে নিজের মধ্য থেকে এমনি ক'রে টেনে বের ক'রে আনতে, ভাসিয়ে নিয়ে ডুবিয়ে দিতে যেন অঝোর মেঘ ঝ'রে ঝ'রে পড়লো—নিঃশেষে, নিঃশেষে।

মেয়েরা কখন জানতে পারে যে তারা মেয়ে, মেয়েমানুষ? সকলের বোধহয় একরকম হয় না, আমি ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলেছিলুম হঠাৎ একদিন আমার ফ্রকে রক্তের দাগ দেখে। স্কুলে ছিলুম তখন, টিফিনে লুকোচুরি খেলছি। শাড়ি-পরা মেয়েরা হাসলো আমার কান্না দেখে, হেডমিসট্রেস

সঙ্গে দাই দিয়ে আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। ভেবেছিলুম আমার কোনো সাংঘাতিক অসুখ করেছে, হয়তো মরেই যাবো, মা আমাকে শান্ত করলেন, আদর করলেন। তাঁর মুখের দু-একটা কথা শুনে হঠাৎ একটা ঝাপসা অনুভূতি হ'লো আমার; সেই বারো বছর বয়সেই যেন বুঝে নিলুম যে সব স্ত্রীলোক সমবয়সী, এক রহস্যময় জগতের সমান অংশিদার, যাতে পুরুষের কোনো অংশ নেই কিন্তু অধিকার আছে, যা আসলে পুরুষেরই জন্য তৈরি হয়েছে, হচ্ছে, অথবা হয়েছিলো। আমার অবাক লাগলো ভাবতে যে আমাকেও খুঁজে পেয়েছে সেই রহস্য, এই ক্লাস সিক্স-এর বেণী-দোলানো বাচ্চা মেয়েকে—একটু গর্বও হ'লো। তেরোতে পড়ার আগেই আমাকে শাড়ি ধরিয়ে দিলেন আমার মা—বাঙালি মেয়েদের জীবনে সেটা একটা বিরাট দীক্ষা, সেকেলে বামুন ছেলেদের পৈতে হওয়ার মতো—শাড়ি; প্রথমে যতই বিশ্রী লাগুক, মনে হোক স্কিপিং রোপ-এর ছুটোছুটির শত্রু, তবু—সেটাই নারীত্ব, সেটাই রূপ, সেটাই সম্মান। কী করুণ চেষ্টা আমার ফুটে-ওঠা বুকের রেখা ঢাকতে—কী লজ্জা তা নিয়ে, ঘুমোবার আগে নিজেকে মুড়ে রাখি আঁচলের এনভেলপে, ভিতরে একটা লাখ টাকা দামের চিঠি আছে তা জানি ব'লেই। হঠাৎ একদিন আমার চোখে পড়লো—যা বাড়ির আর কেউ লক্ষ করেনি—যে আমাদের বাথরুমের দরজায় ছোট্ট একটা ফুটো আছে, একরত্তি, আমার কড়ে আঙুলের ডগাও তাতে ঢোকে না, কিন্তু—আমি নিরিবিলি সময়ে অনেক পরীক্ষা ক'রে প্রমাণ পেলুম—এক চোখ বুজে অনেকক্ষণ ধ'রে চেষ্টা করলে সেই ফুটো দিয়ে ঝাপসাভাবে ভিতরটা দেখা যায়। আর তখন থেকে আমি নিয়ম ক'রে নিলুম যে কাগজের ছিপি দিয়ে ফুটো বন্ধ না-করে স্নান করতে ঢুকবো না—যদি বা কোনো অসাধু লোক ওত পেতে থাকে আমাকে দেখার জন্য—আমার কোনো মামাতো বা খুড়তুতো ভাই, বা বাবার কোনো ছাত্র যারা সব সময়ে আসা যাওয়া করে—তারপর, সেই নীরন্ধ্র গোপনতায়—স্নানের আগে কিংবা পরে—মাঝে মাঝে আয়নায় দেখতুম নিজেকে—যেদিন ছুটি, তাড়া নেই—আমার সূর্যি-চাঁদের উদীয়মান সৌন্দর্য, আমার রোগা, নগ্ন, ভয়-পাওয়া, উল্লসিত শরীর, আমার প্রথম বর্ষার কদমফুল, আমার সরু কাঁধ, ডিমের মতো তলপেট। আমি কোমল হাতে আদর করি তাদের, মনে-মনে বলি 'তোরা ভালো, তোরা আমার, তোরা আর একজনেরও। সবুর কর।' কলেজে যখন উঠলুম তখন আর আমার শরীর নিয়ে লজ্জা নেই, আমি লম্বায় মা-কে ছাড়িয়ে গিয়েছি, আমাকে আর রোগা দেখায় না, লোকেরা বলাবলি করছে আমি দেখতে ভালো।

এক ধরনের সরলভাবে আমি সুখী ছিলাম তখন—মেয়ে হ'য়ে জন্মেছি ব'লে সুখী, নানা রঙের নানা ফ্যাশনের শাড়ি জামা পরতে পারছি বলে সুখী; মা আমাকে একদিন তাঁর গয়নার বাক্স খুলে খুঁটে-খুঁটে সব দেখালেন—বিছে-হার, মটরদানা-হার, হাঁসুলি, জড়োয়া নেকলেস, জড়োয়া কঙ্কন, টায়রা, আরো কত কিছু যা মা-কে খুব কমই পরতে দেখেছি—আমি মুখে বললুম, 'ওরে বাবা, কী জবরজং, ভাগ্যিশ এখন আর অত গয়না পরার চল নেই!'—কিন্তু মুগ্ধ হলুম এ কথা ভেবে যে একটামাত্র শরীর সাজাতে অত কিছু দরকার হতে পারে, বা দরকার বলে ভাবতে পারে লোকেরা—তারপর কোনো বিয়ে-বাড়িতে বা বন্ধুর জন্মদিনে যেতে হলে মা যখন আমাকে এটা-ওটা পরিয়ে দেন আমি আপত্তি করি না, মনে হয় গয়নাগুলো আমাকে তা-ই করে তুলেছে যা আমি হতে চাচ্ছি, নিজেকে যা মনে-মনে ভাবছি তা-ই। আরো প্রমাণ পাই ছেলেদের চোখে আর ব্যবহারে, অনেককেই বোকা বা হ্যাংলা ব'লে মনে হয় আমার, কিন্তু অনিবার্যভাবে কয়েকটা খুচরো ব্যাপার ঘটে গেলো আমার চোদ্দ থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত—একটাতে প্রায় গুটি পেকে আসছিলো কিন্তু ছেলেটা হঠাৎ বিলেত চ'লে গেলো আর আমিও দু-এক পশলা কান্নার পরে তাকে ভুলে গেলাম। যখন বি.এ. পড়ি কলেজে আমার বেশ একটু খ্যাতি ছড়ালো—'স্মার্ট' মেয়ে ব'লে, সুশ্রী বুদ্ধিমতী সপ্রতিভ বলে (পড়াশুনোতেও গবেট ছিলুম না) যে-কোনো অনুষ্ঠানে সকলের আগে আমার ডাক পড়ে। নয়নাংশু যখন পড়াতে এলো আর আমি দেখলুম ক্লাসের সব ক-টা মেয়ে জিলজিল ক'রে উঠেছে, আমার মনে অচেতনভাবেই একটা রেষারেষির ভাব জাগলো—খেলাচ্ছলেই

এগিয়ে গিয়ে আলাপ করেছিলুম ওর সঙ্গে, কিন্তু গম্ভীর স্বভাবের নয়নাংশু সেই খেলায় এমন মোড় ফিরিয়ে দিলে যে মাস দু-তিন পরে আমারও মনে হ'তে লাগলো যে এটা মরণ-বাঁচনের ব্যাপার, আর আমার ভাগ্যে মা-বাবারও মত হতে বেশি দেরি হলো না, যদিও মা-র ঝোঁক ছিলো অন্য এক পাত্রের উপর, তাঁর এক বাল্যসখীর পুত্র, কিছু দূর নাকি কথাবার্তাও গড়িয়েছিলো। আর বিয়ের পরে রাতারাতি যেন অন্য একটা মানুষ জেগে উঠলো আমার মধ্যে, অংশুর মা ও অন্যান্য বয়স্কা আত্মীয়াদের মুখে শোনা 'বৌ' কথাটা যেন একটা জাদুমন্ত্রের মতো—ঐ ছোট্ট বাংলা কথাটার যা-কিছু অর্থ, যা-কিছু রস, যা-কিছু সুর, তা-ই যেন ভ'রে তুলতে লাগলো আমাকে; যেন এতদিন, বাইরের চিকচিকানি সত্ত্বেও, আমি একটা ফাঁপা খোলশমাত্র ছিলুম। ঐ ভাবেই কেটে যেতে পারতো আমার জীবন, যদি না অংশু—যদি না জয়ন্ত—না, আমি—আমিই এটা ঘটিয়েছি।

মনে আছে, জয়ন্ত, তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা? শীতকাল, অংশু আপিশ থেকে ফিরলো তোমাকে সঙ্গে নিয়ে। ছাইরঙা প্যান্টের উপব টুইডের কোট তাব পরনে, পরিষ্কার একটি নেকটাই, আট ঘণ্টা আপিশের পরেও পোশাকে বা মুখে যেন পরিশ্রমের ছায়া নেই। আর তুমি—আধ ময়লা ধুতি-পাঞ্জাবির উপর বিবর্ণ একটা জহর-কোট, স্যান্ডেলে পায়ে সাত বাজ্যির ধুলো, আর লম্বা কালো বলিষ্ঠ শরীর, চশমার পিছনে চোখ দুটো উজ্জ্বল। আমাকে চা দিতে হলো, বসে থাকতে হ'লো সেখানে, অংশু যখন স্নান করতে গেলো (শীতকালেও সন্ধেবেলা তার স্নান করা চাই, ভারি ফিটফাট মানুষ) কথা চালাতে হলো তোমার সঙ্গে। এটাই নিয়ম এ-বাড়ির— আমার স্বামীর বন্ধু-বান্ধবদের আমিও বন্ধুর মতো হবো, তাদের আমার ভালো লাগুক আর না-ই লাগুক। বিয়ের ঠিক এক বছর পরে নয়নাংশু কলেজের মাস্টারি ছেড়ে ক্লাইভ স্ট্রীটে এক বিজ্ঞাপনের আপিশে চাকরি নিলো, মাইনে হলো একলাফে আড়াইশো থেকে সাড়ে-চারশো, আর সঙ্গে-সঙ্গে উঠে এলো বেলেঘাটা থেকে এই ঝাউতলা রোডের নতুন তৈবি ঝকঝকে ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাটটিকে মনোমতো করে সাজিয়ে নিলে নয়নাংশু (বা তার ইচ্ছেমতো আমি সাজিয়ে নিলুম), তাব মতে আমাদেব সত্যিকার বিবাহিত জীবন শুরু হলো এবাব। ওব বন্ধু-বান্ধব অনেক, প্রায় রোজই সন্ধ্যায়, কেউ-না-কেউ আসে, রোববার সকালে দেড়টার আগে আড্ডা ভাঙে না, এক-এক রাতে সাড়ে-দশটা এগারোটা বেজে যায়। বেলেঘাটায় ওর বন্ধুবা এসে একতলায় বসতো, আমি থাকতুম দোতলায়, আমার শাশুড়ি চা পাঠিয়ে দিতেন চাকবেব হাতে, কিংবা ওরা বেরিয়ে গিয়ে বসতো ফেভারিট কেবিনে, বা আড্ডা জমাতো অন্য কাবো বাড়িতে। এই ব্যবস্থা আমার মনে হতো স্বাভাবিক ও সংগত, কিন্তু অংশুর আপত্তি ওতে, আমাব কাছে তাব বন্ধুদের গল্প করে সে, অমুকে ব্রিলিয়েন্ট, তমুকে চমৎকার কথা বলে, আমার সঙ্গে তাদেব যে আলাপ হচ্ছে না সেটা একটা আপশোষ তার। আমি বলি, 'আমার অত আলাপে-সালাপে কাজ নেই বাপু, বেশ আছি।' সেটা আমার মনের কথাই, আমি অংশুকে নিয়েই ভরপুর তখন, কিন্তু সে আমায় বোঝায় যে পুরুষদের সঙ্গে না-মিশলে বোকা থেকে যায় মেয়েরা, অশিক্ষিত থেকে যায়, নেহাত ঘর-সংসারে আত্মীয় মহলে আটকে থাকলে নাকি মানুষ হিসেবে 'বিকাশ' হয় না মেয়েদের। আলাদা ফ্ল্যাটে এসে অংশু প্রায় জোর করেই আমাকে তার আড্ডায় মেম্বার করে নিলে! বন্ধুরা সস্ত্রীক আসেন খুব কম, কারো-কারো বিয়েও হয়নি—সুন্দর সাজানো ফ্ল্যাট, শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর সংসারের স্বাধীনতা, অঢেল চা, উপুরি একজন মহিলার সঙ্গ ও সেবা—এমন বাড়িতে গুলজার করতে কার না ভালো লাগবে? কিন্তু—সেই ঘরভর্তি নতুন-চেনা অল্প-চেনা পুরুষমানুষের মধ্যে, সুধীন্দ্র দত্তর কবিতা থেকে আফ্রিকার রাজনীতি পর্যন্ত এন্তার অচেনা বিষযে তর্কাতর্কির মধ্যে ব'সে থাকতে আমার কেমন লাগতো তা কি নয়নাংশু ভেবেছে কখনো? আমার অস্বস্তি হয, হাঁফ ধ'রে যায়, চুপ ক'রে থাকতে থাকতে ব্যথা করে চোয়াল, আমাব মন-কেমন করে মা-র জন্য, বাবার জন্য, বেলেঘাটার বাড়ির মেয়েলি মজলিশের জন্য, তাছাড়া খুব খারাপ লাগে যেহেতু স্বামীর অবসরের সময় আমি তাকে কখনোই প্রায় একা পাচ্ছি না, আর তা-ই যদি না পেলুম তাহলে যৌথ পরিবার ছেড়ে এসে লাভটা কী হলো? আমি প্রতিবাদ করেছিলুম, 'তোমার

বন্ধুদের মধ্যে আমাকে কেন টেনে নিয়ে যাও সব সময়?' 'কেন, তুমি কি পর্দানশিন?' 'পর্দানশিন না-হলেই বেদরকারে বসে থাকতে হবে?' 'বেদরকারে কেন বলছো—এটা তো তোমারও বাড়ি। তাছাড়া সব সময় বসে থাকতে হবে তারও মানে নেই—ভালো না লাগলে উঠে যেয়ো কিন্তু চেহারাটা দেখিয়ো অন্তত।' 'কেন, তোমার স্ত্রী কি জনে-জনে দেখাবার জিনিশ?' 'কী যে বলো!' ছায়া পড়লো নয়নাংশুর মুখে, 'তুমি না-থাকলে অসম্পূর্ণ লাগে, এই আর কি।' আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'কখনো কি তোমার ইচ্ছে করে না আমার সঙ্গে একা থাকতে?' 'তোমার আমার একা থাকার জন্য সময়ের তো অভাব নেই!' আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, 'তার মানে—তোমার বৌ শুধু তোমার রাতের সামগ্রী?' নয়নাংশু গম্ভীর চোখে তাকিয়ে বললো, 'তুমি একজন ভদ্রমহিলা, মালতী—এ-সব ঠাট্টা তোমার মুখে মানায় না।' একটু পরে আবার বললে, 'তোমার আমার বিয়ে হয়েছে বলে জগতে আর কারো অস্তিত্ব নেই তা তো নয়।' ঠিক এই যুক্তিটাই ব্যবহার করা যেতো বেলেঘাটার যৌথ পরিবার বিষয়ে, কিন্তু তখন আমার মুখে তা জোগালো না।

নয়নাংশুর সঙ্গে শিক্ষার কোনো তুলনাই হয় না আমার, সে যে কত বিষয়ে কত কিছু জানে তার ইয়ত্তা নেই, এই ধরনের কোনো তর্ক উঠলে শেষ পর্যন্ত আমাকে হার মানতে হয়। কিন্তু আমার মনের মধ্যে একটা অভিযোগ জমে ওঠে—কোনো রোববারেও আমাকে নিয়ে সিনেমায় যায় না কেন নয়নাংশু, শহরে কত কিছু হয় যাতে সবাই যায় তাতে নিয়ে যায় না কেন, ওর ও-সব ভালো লাগে না ব'লে আমি কেন শখ মেটাতে পারবো না? অবশ্য কোনো মহিলা প্রতিবেশী বা বাপের বাড়ি বা শ্বশুরবাড়িব কাউকে সঙ্গী ক'রে আমি যেতে পারি নানা জায়গায় এবং গিয়েও থাকি—কিন্তু অংশু কেন যাবে না, আশে পাশে সব ভদ্রলোকই স্ত্রীকে নিয়ে সিনেমায় যান শুধু নয়নাংশুই যাবে না কেন—কেন সবই শুধু তার ইচ্ছেমতো হবে, আমি যদি হিন্দী ফিল্ম ভালোবাসি সে হিন্দী ফিল্মেই যাবে না কেন—নিজের ভালো না লাগলেও আমাকে খুশী করার জন্যই?

আর তাছাড়া, তার ঐ আড্ডা, যাতে সে ঘণ্টাব পর ঘণ্টা মশগুল হয়ে থাকে—আমাব তাতে কী সুখ? আমি অনেক সময় উঠে চলে আসি ওরা বিশেষ লক্ষ্যও কবে না, শোবার ঘরে আলো নিবিয়ে শুয়ে থাকি একলা—আমার খিদে পায়, ঘুম পায়, কান্না পায়, ওদের হাসিব শব্দে রাগ হয় আমার, ওদের সিগারেটের গন্ধে মাথা ধরে—রাত বাড়ে ওরা ওঠার নাম করে না, বাড়িটা যেন বাড়ি নয় হোটেল, আর সেই হোটেল চালানোই আমার কাজ। কিন্তু তখন অবশ্য এই অভিযোগের কোনো স্পষ্ট চেহাবা ফোটেনি আমার মনে, তখন আমি এই সুখে মজে আছি যে অংশু আমাকে 'পাগলের মতো' ভালোবাসে (পরে বুঝেছিলাম সেই ভালোবাসা কী ভীষণ স্বার্থপর—আমি এক রাত মায়ের কাছে থাকতে চাইলে ওর মুখ ভারি হয়, কখনো দু-দিনের জন্য আমার পিসিমার কাছে আসানসোলে বেড়াতে যেতে চাইলে ও নানারকম ছুতো করে বাধা দেয়; অথচ ও-সব জায়গায় আমার সঙ্গী হতেও রাজী নয় সে; অর্থাৎ, ওর যা এতটুকুও অপছন্দ, তা আমার ভালো লাগে বলে ও কখনোই করবে না, অথচ আশা করবে যে যা-কিছু ওর প্রিয় তা আমারও প্রিয় হবে; আমাকেই হতে হবে সারাটা পথ উজিয়ে ওর মনোমতো, কিন্তু ও কোনো ত্যাগ করবে না আমার জন্যে—ওর 'ভালোবাসা'র অর্থ হলো এই, কিন্তু তখন তা বুঝিনি)—তখনও আমার বিবাহিত জীবন এমন মসৃণ, স্বচ্ছন্দভাবে চলেছে যে আমি টের পাচ্ছি না মাস আর বছরগুলির উড়ে চলা। 'শীত পড়লো, এবার পর্দার রং বদলাও,' 'কুশানের ঢাকনাগুলো ময়লা হয়েছে', 'আমাব পাঞ্জাবিগুলো ছিঁড়ে আসছে এবার—' এই ধরনের ফরমাশ ছাড়ে নয়নাংশু আব আমি ছুটি দোকানে-দোকানে, ওর সব দাবি মিটিয়ে চলি, কিন্তু ও কখনো একখানা শাড়ি হাতে করে নিয়ে আসে না আমার জন্য, কখনো জিগেসও করে না আমার কিছু দরকার কিনা—ও আপিশ করে, তাছাড়া আর-কিছুই করে না সংসারের জন্য, ওর জামা-কাপড়ের দোকানে ঢুকতে 'বমি পায়,' পর্দার রং পছন্দ করার জন্য এক ঘণ্টা সময় 'নষ্ট করতে' রাজী নয়, কিন্তু রংটা চোখে না ধরলে খুঁতখুঁতানি ওরই বেশি—এই সবই আমি স্নেহের চোখে দেখছি তখনও, ধ'রে নিচ্ছি যে এটাই ওর পক্ষে

ঠিক, এ-রকম না-হ'লেই ওকে মানাতো না। ও যে আমাকে সব সময় কাছে পেতে চায়, সেটা একটা গর্বের বিষয় আমার পক্ষে; মাঝে-মাঝে দুপুরে খাওয়ার পরে মার কাছে চ'লে যাই (তাঁরা থাকেন বালিগঞ্জ প্লেসে, ঝাউতলা রোড থেকে দূরে নয়), কিন্তু বিকেল হ'তেই পড়ি-মরি ফিরে আসি অংশুর আগে বাড়ি পৌঁছবার জন্য—আপিশ থেকে ফিরে আমাকে না দেখলে খুব খারাপ লাগে ওর—সেটা স্বাভাবিক—কিন্তু কখনো যদি বলি আপিশ থেকে বালিগঞ্জ প্লেসে চ'লে যেয়ো, সেখানেই চা খেয়ে চ'লে আসবো দু-জনে একসঙ্গে, তাতে ও রাজী নয় কখনো, মা-র কাছে আরো কিছুক্ষণ থাকতে যতই ইচ্ছে হোক আমার—ও চায় ওর নিজের বাড়ির অভ্যস্ত আবহাওয়া অভ্যস্ত আরাম, চায় ওর নিজের নিজত্ব, যার একটা অংশ হলাম আমি—আর আমার সেই ভূমিকাই আমি সানন্দে মেনে নিয়েছি তখন। ওর সান্ধ্য আড্ডাতেও আমি না-থাকলে ওর যে 'সম্পূর্ণ' লাগে না এতে আমার কখনো-কখনো কষ্ট হ'লেও সেই কষ্ট ছাপিয়ে অনেক বড়ো হ'য়ে উঠেছে এই গর্ব আর আনন্দে মেশানো অনুভূতি যে আমি নয়নাংশুর পক্ষে কত প্রয়োজন, কত মূল্যবান। আর ধীরে ধীরে আমার নিজেরই অজান্তে, একটা পরিবর্তন হ'লো আমার জীবনে: নয়নাংশুর দলবলের সঙ্গে মেলামেশায় আমি পুরোপুরি অভ্যস্ত হ'য়ে গেলুম, শিখে নিলুম ওদের কথা-বার্তায় যোগ দেবার কায়দাটা, লক্ষ করলুম আমার কথাগুলো নেহাৎ বোকার মতো হয় না, ওদের কাছে বাহবাও পাই মাঝে মাঝে। শুধু তা-ই নয়, আমার মনে হ'তে লাগলো ওদের মধ্যে কেউ-কেউ শুধু নয়নাংশুর কাছেই আসছে না আজ-কাল, আমারও কাছে আসছে, আমি ওদের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা মর্যাদা পাচ্ছি—শুধু বন্ধুর স্ত্রী বলে নয়, আমার নিজেরই জন্য! আমার ভালো লাগলো সেটা—মনে হ'লো অংশু যেমন চেয়েছিলো তেমনি ভাবেই আমি হ'য়ে উঠেছি আলাদা একজন মানুষ—ব্যক্তি—আর অংশুও সুখী হয়েছে আমি যে তার বন্ধুদের মধ্যে নিজের একটি জায়গা ক'রে নিতে পেরেছি। ওর কোনো-কোনো ধারণা আর ব্যবহার আমার একটু অদ্ভুত লাগছে তখনও, কেমন বাড়াবাড়ি মনে হয়—যেমন একদিন বীরেন তালুকদারের বাড়িতে রাত্রে খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিলো আমাদের, ফেরার সময় বীরেনবাবুই আমাদের পৌঁছিয়ে দিলেন তাঁর গাড়িতে, তাঁকে নিয়ে ছ-জন ছিলুম আমরা—কী ভাবে বসা হবে সেটা স্থির করতে একটু সময় লাগলো। অংশু আমাকে বললো বীরেনবাবুর পাশে বসতে, আমার ইচ্ছে ছিলো না কিন্তু বেশি আপত্তি করতে লজ্জা করলো, আমার পাশে বসলো একটি মোটাসোটা চোদ্দ বছরের মেয়ে—ঘেঁষাঘেঁষিতে অস্বস্তি লাগছে আমার, পিঠ খাড়া ক'রে ব'সে আছি, বীরেনবাবু আমাকে বার-বার বলছেন আপনি ভালো হ'য়ে বসুন, মিসেস মুখার্জি, আমার চালাতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না, আর আমি বার-বার বলছি আমি বেশ আছি। বাড়ি এসে অংশুকে বললুম, 'তুমি তখন আমাকে বললে কেন বীরেনবাবুর পাশে বসতে?' 'তাতে কী হয়েছে?' 'বড্ড ঘেঁষাঘেঁষি হচ্ছিলো।' 'আমাদেরও তা-ই।' 'কিন্তু' কী-ভাবে কথাটা বলা যায় ভাবছিলুম, কিন্তু নয়নাংশু তা বুঝে নিয়ে বললো, 'তুমি কি এমন সাংঘাতিক সতী যে গাড়িতেও স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের পাশে বসবে না? আমার তো মত অন্যরা থাকলে স্বামী-স্ত্রীরই কখনো পাশাপাশি বসা উচিত নয়।' —শোনো কথা, কী-রকম সব সৃষ্টিছাড়া ধারণা! আর-একদিন অংশু আপিশের কাজের জন্য তৈরি হচ্ছে ঠিক তক্ষুনি ওর এক পুরোনো বন্ধু এসে উপস্থিত, তার সঙ্গে কয়েকটার বেশি কথা বলার সময় পেলো না অংশু, ব্রিফকেস গোছাতে গোছাতে বললো, 'তুমি এক্ষুনি যেয়ো না, অসিত—বোসো, চা খাও।' অসিতবাবু বিব্রত হ'য়ে বললেন, 'আমি ভেবেছিলুম তোমারও আজ রথের ছুটি—তা আমি না-হয় সন্ধের দিকে আবার আসবো, এখন চলি।' 'আরে একটু বোসো না—অত দূর থেকে এলে, এক্ষুনি যাবে কী।' ভদ্রলোক বসে গেলেন, আমি তাঁকে চা-বিস্কুট খাওয়ালুম, কথা বলতে বলতে সাড়ে-দশটা বাজিয়ে দিলেন তিনি। রাত্রে আমি নয়নাংশুকে বললুম, 'তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই? অসিতবাবুকে তখন বসতে বলেছিলে কেন?' নয়নাংশু বললে, 'বাঃ, মফস্বলে থাকে, কতকাল পরে এসেছে—তক্ষুনি ফিরে যাবে তা কি হয়?' 'তুমি বাড়ি না-থাকলে কী হতো?' 'আমি না থাকলে তুমি ওকে আপ্যায়ন করতে, তোমারও তো অচেনা নয়

অসিত।' 'আমি যে একা বাড়িতে, বুন্নিও স্কুলে ছিলো তখন।' 'তাতে কী হয়েছে।' আমার দিকে তাকিয়ে একটু চুপ ক'রে রইলো নয়নাংশু, একটু পরে আবার বললো, 'অসিত না হয়ে যদি হতো কোনো সুপ্রভা কি তপতী তা'হলে কী করতে? 'সে আলাদা কথা।' 'আলাদা কেন? মেয়ে-পুরুষের তফাতটা কি কখনোই ভুলতে পারবে না তুমি?' আমি মনে মনে বললুম, 'তা কি ভোলা যায়?'

শুধু সেদিনই নয়—অনেক, অনেক দিন এমন হয়েছে যে অংশু বাড়ি নেই আর আমি তার কোনো বন্ধুকে আপ্যায়ন করছি—গৃহকর্ত্রী হিসেবে সেটাই আমাব কর্তব্য হয়তো, কিন্তু এই কর্তব্য—যা শুরুতে আমি দায়ে পড়ে মেনে নিয়েছিলুম—তা ক্রমশ দেখলুম, আমার বেশ ভালো লাগছে। আমার যে-সব কথা নয়নাংশু আর মন দিয়ে শোনে না (কেননা তা পুরোনো হয়ে গেছে তার কাছে), সেগুলো ভালো লাগে অন্যদের; আমি যদি কোনো ঘটনার বিবৃতি দিই, তাহলে অংশু প্রায় সব সময় বলে ওঠে, 'তুমি ঠিক বলছো না, এটা এ-রকম হয়নি, ও-রকম হয়েছিলো—' কিন্তু অন্যেরা উপভোগ করে সেটা, আর অংশু কাছে না-থাকলে আমারও বলার স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে যায় আর বন্ধুরাও যেন একটু বেশি মন খুলে কথা বলে তখন। অবশেষে এমনও হলো যে অংশু উপস্থিত থাকলেও কেউ-কেউ আমার দিকেই বেশি মনোযোগ দেয়, সেটা কিন্তু ভালো লাগে না তার—যদিও সে আমাকে এতদিন ধ'রে স্ত্রী-পুরুষের সাম্যের মন্ত্র জপিয়েছে।

নয়নাংশুর বন্ধু-বান্ধব নানা ধরনের—কেউ-কেউ তার ছাত্রবয়সের পুরোনো, কারো-কারো সঙ্গে বিজ্ঞাপনের সূত্রে তার আলাপ, কেউ বা সাংবাদিক বা সাহিত্যিক গোছের। কাউকে অল্প একটু ভালো লাগলেই বাড়ি আসতে বলা তার বরাবরকার অভ্যেস, আর-একটা অভ্যেস যে-কোনো নতুন আগন্তুকের আগেভাগে অত্যন্ত বেশি প্রশংসা করা। যাদের সে অপছন্দ করে তাদের যেমন 'লাউট্' কিংবা 'স্কাম্' বলতে তার বাধে না, তেমনি কারো মধ্যে একটুখানি ভালো দেখতে পেলে তাকে সে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে আকাশে তোলে। ব্যোমকেশ ভাদুড়ীর বিষয়ে সে বলেছিলো, 'অতি সজ্জন—কালচার্ড—ব্যবসায়ীদের মধ্যে এমন মানুষ বড়ো দেখা যায় না—' আব কিছুদিন পবে কী-একটা রাজনৈতিক কারণে ব্যোমকেশবাবুর যখন জেল হলো তখনও নয়নাংশু বললো যে ও-রকম একজন চমৎকার ভদ্রলোককে ধরে জেলে পাঠানো অত্যন্ত অন্যায়, কিন্তু হঠাৎ যখন আলিপুর জেলের ছাপ-মারা মোটা চিঠি এলো আমার নামে তখন আমি তার মুখে ছায়া দেখলুম। আমি তাকে পড়তে দিলুম চিঠিটা—সম্পূর্ণ 'নির্দোষ' চিঠি—আমাদেব এখানে এসে তাঁর কত ভালো লেগেছিলো, আর সব প্রিয় পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখন অনেক ছোটো জিনিশকেও মূল্য দিতে শিখেছেন—পড়তে বেশ লাগলো আমার, একটু কষ্টও হলো ব্যোমকেশবাবুর জন্য, কিন্তু নয়নাংশু পড়ে শুকনো গলায় শুধু বললে, 'বেশ বাংলা লেখেন ভদ্রলোক।' অথচ—আমি জানি—চিঠিটা যদি আমার বদলে তাকে লেখা হতো, তাহলে ওটার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতো সে, খেতে বসে সারাক্ষণ আমাকে ব্যোমকেশ ভাদুড়ীর গুণগান শুনতে হতো। আর-একবার—আমাদের নিমন্ত্রণ ছিলো লেকের রঞ্জনী ক্লাবে, সাহিত্যিক গুণময় দেব নয়নাংশুকে দেখেই বলে উঠলেন, 'মালতী দেবী কোথায়?' পরমুহূর্তে আমাকে দেখতে পেয়ে হেসে বললেন, 'আসুন মিসেস মুখার্জি, আপনাকে ছাড়া আপনার স্বামীকে সম্পূর্ণ মনে হয় না।' সেদিন আবার সেই ছায়া দেখলুম নয়নাংশুর মুখে; বাড়ি ফিরে বললে, 'গুণময়বাবু ভারি সরল মানুষ, মনের সব কথাই মুখে বলে ফ্যালেন।' আমি একটু চতুরভাবে বললুম, 'আমার কিন্তু গর্ব হতো যদি কেউ বলতো তোমাকে ছাড়া আমি অসম্পূর্ণ।' 'কোনোটাই ঠিক নয়—মানুষেব যদি কোনো মূল্য থাকে সে তার নিজেরই মধ্যে—আমরা অমুকের স্বামী অথবা স্ত্রী, এ ছাড়াও আমাদের পরিচয় আছে, ও-রকম ক'রে বলাটা অভদ্রতা —এবং বোকামি।' আমি তর্ক তুললাম, 'তাহ'লে আমি কেন তোমার মিসেস ব'লেই নানা জায়গায় নিমন্ত্রণে যাবো?' 'ইচ্ছে না-হলে যেয়ো না।' আর কথা বললো না নয়নাংশু, বিছানায় এসে পাশ ফিরে গুম হ'য়ে রইলো, যেন আমিই কোনো অপরাধ করেছি। আমিও মুখ ফিরিয়ে রইলুম, আমার মনে পডলো সে-ই একদিন বলেছিলো, আমি না থাকলে তার আড্ডা

'অসম্পূর্ণ', আজ যদি ও-রকম কথাই অন্য কেউ ব'লে থাকে এমন কী দোষ করেছে? কেন অমন মেজাজ খারাপ হ'লো নয়নাংশুর? অথচ গুণময় দেবের লেখার প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ—ওঁর নতুন উপন্যাস নিয়ে এক ঘণ্টা ধ'রে কথা বলতেও তাকে শুনেছি। আসলে গুণময় দেব ওর চাইতে আমার প্রতি বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন, আমি না-গেলে অত্যন্ত নিরাশ হতেন উনি, আমাকে দেখামাত্র ওঁর মুখে-চোখে খুশী ফুটে উঠলো, এই ব্যাপারটা নয়নাংশু তার একজন প্রিয় লেখকের মধ্যেও ক্ষমা করতে পারছে না। কিন্তু কেন এটা অন্যায়? কেন অভদ্রতা? রঞ্জনী ক্লাবে আমরা দুজনেই নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম, সেই দু-জনের যে-কোনো একজন অনুপস্থিত থাকলে সেটা লক্ষণীয় হবে—এ তো সোজা কথা। আর—'আপনাকে ছাড়া আপনার স্বামীকে সম্পূর্ণ মনে হয় না—' এই কথাটায় আসলে তো কম্‌প্লিমেন্ট দেয়া হচ্ছে আমাদের দু-জনকেই, একটি সুখী দম্পতিরূপে দেখা হচ্ছে আমাদের—তা-ই নয় কি? আমাদের বাড়িতে কয়েকবার এসেছেন গুণময়বাবু, অন্যান্য জায়গাতেও দেখা হযেছে, সর্বদা একসঙ্গে দেখেছেন অংশুকে আর আমাকে, সেইজন্যেও ও-রকম কথা তাঁর মনে হওয়া স্বাভাবিক—তা-ই নয় কি? কী দোষ আছে এতে? অংশু এতে রেগে গেলো কেন? আমি যখন ওর আপিশ সংক্রান্ত কোনো অনুষ্ঠানে বা নিমন্ত্রণে যাই মিস্টারের সঙ্গে মিসেসরূপী লেজুড় হ'য়ে, যেখানে স্ত্রী ছাড়া আর কোনো পরিচয় নেই আমার—সেটা তো সে দিব্যি মেনে নয়। আসল কথা—স্বামী মশাই যে কর্তা তা ভুলতে পারে না, স্ত্রী যে অধীন তা ভুলতে পারে না; আসল কথা—যতই আমরা আধুনিকতার বড়াই করি—পুরুষের পুতুল হ'য়ে থাকতে হবে মেয়েদের। অথচ মুখে কতই না গালভরা বুলি নয়নাংশুর। কিন্তু ওর মনের তলার কথাটা কি এই নয় যে সকলেই সব সময় আমার চাইতে ওর দিকেই বেশি মনোযোগ দেবে? আর তার মানে কি এই দাঁড়ায় না যে ও-ই স্বার্থপর, আত্মম্ভরি, হিংসুক? ভাবতে-ভাবতে আমার মাথার মধ্যে চিড়বিড় ক'রে উঠলো, ওর পাশে শুয়ে থাকতে বিশ্রী লাগলো সেই রাত্রে।

জয়ন্তকে নিয়েও সেই একই ব্যাপার—অংশু যেদিন প্রথম তাকে নিয়ে এলো সে চলে যাবার পব তার অনেক প্রশংসা শুনতে হ'লো আমাকে। 'ইনি টাকার অভাবে কলেজের পড়া শেষ করতে পারেননি, কয়েকবছর ডেটিন্যু ছিলেন, বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিও চালিয়েছেন কলকাতায়—তেমন উচ্চশিক্ষিত এঁকে বলা যায় না হয়তো, কিন্তু যাকে বলে কর্মবীর ইনি তা-ই।' আমি জিজ্ঞেস কবলুম, 'কী বকম?' উত্তরে শুনলুম ইনি পাঁচ বছর আগে প্রায় বিনা মূলধনে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছিলেন, এক হাতে খেটে দাঁড় করিয়েছেন সেটাকে, তাইতে কোনোরকমে সংসার চালান—পত্রিকার অর্ধেক উনিই লেখেন, প্রুফ দ্যাখেন, বিজ্ঞাপন জোগাড় করেন ঘুরে-ঘুরে— 'ভেবে দ্যাখো, এইভাবে একটা সাপ্তাহিক চালানো কি সোজা কথা!' 'কর্মবীরে'র এই বর্ণনা শুনে একটু হাসি পেলো আমার—কিন্তু আমি জানি অংশু সহজেই মেতে ওঠে কাউকে বা কোনো-কিছুকে নিয়ে, তার উৎসাহের সামনে আমাকে মনের ভাব গোপন করতে হ'লো। 'তোমার কাছে বিজ্ঞাপনের জন্য গিয়েছিলেন বুঝি?' অংশু মাথা নেড়ে জবাব দিলো, 'আমি ভাবছি যতটা পারি করবো ওঁর জন্যে। ওঁর কথাবার্তা শুনে আমার ভালোই লাগলো মোটের উপর।' 'কেমন দুমদাম কথা বলেন ভদ্রলোক' যেন তার এই নতুন 'আবিষ্কারে'র কোনো নিন্দে করা হচ্ছে, এমনি সুরে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করলো অংশু—'হ্যাঁ, ওঁর বাইরেটা তেমন মোলায়েম নয়, কিন্তু ভিতরে পদার্থ আছে।' সেই থেকে শুরু হ'লো আমাদের বাড়িতে জয়ন্তর আনাগোনা, নয়নাংশুই তাকে বহাল করলে।

কয়েকদিনের মধ্যেই বোঝা গেলো জয়ন্ত অংশুর চাইতে আমারই দিকে অনেক বেশি মনোযোগী। এটাকে গোপন করার কিছুমাত্র চেষ্টা করলো না সে, কোনো ছলছুতোর সাহায্য নিলে না—প্রতিটি ব্যাপারে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে যে সে আমারই জন্য এ-বাড়িতে রোজ হাজিরা দেয়। মাঝে-মাঝে সে সকাল বেলাতেও চ'লে আসে, ঠিক যখন নয়নাংশুর আপিশে বেরোবার সময়—আরাম ক'রে সোফায় পিঠ এলিয়ে বলে, 'আচ্ছা মিস্টার মুখার্জি, আপনি তাহ'লে আপিশ ক'রে আসুন—আমার তো চাকরি-বাকরি নেই, আমি একটু শ্রীমতীর সঙ্গে গল্প করি।' একজন সদ্য-চেনা পুরুষের কাছে

এ-রকম ব্যবহার কোনো বিবাহিতা মহিলার ভালো লাগার কথা নয়, কিন্তু আমি যে বারো বছর ধ'রে অংশুর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছি তার তো কিছু ফলাফল আছে, তাছাড়া অংশু কোনো আপত্তি না-করলে আমার মাথা-ব্যথা কিসের, আর আমি জয়ন্তর সঙ্গে কোনো রূঢ় আচরণ করলে অংশুই যে আমার উপর রেগে যাবে না তা-ই বা আমি কেমন ক'রে জানবো?

একদিন—জয়ন্ত প্রথম আসার মাসখানেক পরে, আমি অংশুকে বললুম, 'তোমার এই নতুন বন্ধুকে নিয়ে তো মুশকিল হ'লো'। অংশু বুঝেও বললো, 'কার কথা বলছো?' 'জয়ন্তবাবু মাঝে-মাঝে সকালে এসে ব'সে থাকেন—এদিকে আমার কত কাজ থাকে সংসারে, বুন্নি স্কুল থেকে ফেরে, রাঙাদি আসেন, তোমার চারুমামা এসেছিলেন আজ—আর এইটুকু বাড়ি, আমার অসুবিধে হয়।' 'তা তুমি যদি ওঁর দিকে মন না দাও তাহ'লে হয়তো সকালে আসা ছেড়ে দেবেন।' 'আমি আবার আলাদা ক'রে মন দেবো কী? একটা মানুষ ব'সে থাকলে এমন তো আর ভান করা যায় না যে মানুষটা সেখানে নেই।' 'উনি যদি নিজে না বোঝেন তোমার অসুবিধে হচ্ছে তাহ'লে বুঝিয়ে দিতে হবে।' আমি একটু চুপ ক'রে থেকে বললুম, 'তুমি একবার কথা বলবে নাকি ওঁর সঙ্গে?' 'উনি তো আমার কাছে আসেন না, আমি কেন কথা বলতে যাবো?' ব'লে অংশু একটা বই খুলে বসলো।

—না, কেন আর মিথ্যে মিছিমিছি, এখন আর কোনো ভয় নেই আমার। বলো, মালতী, সত্য বলো, তোমার কি 'অসুবিধে' হ'তো জয়ন্তর জন্য, না কি সেই সব আত্মীয়ের জন্য, যারা মাঝে-মাঝে এসে ব্যাঘাত ঘটাতো তোমাদের আলাপে? আর ঐ যে তোমার স্বামীকে বলেছিলে, 'উনি এসে ব'সে থাকেন—' তার মানে তুমি যেন কিছু জানো না, যেন তোমার কোনো দায়িত্ব নেই, আড়ে-ঠারে যাচাই ক'রে নিলে অংশুকে, দেখে নিলে তার মনের গতিটা কোনদিকে—এই তো? পাছে তোমার স্বামী রেগে যান, পাছে তাঁর 'শিক্ষা'র তুমি অসম্মান করো, তুমি কি তা-ই ভেবে ব'সে থাকতে জয়ন্তর কাছে, জয়ন্তর মুখোমুখি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনে রাত্রে প্রায় যে-কোনো সময়ে? তার সাড়া পেলে তোমার অতি প্রিয় বিকেলের ঘুম ছেড়ে তখুনি উঠে পড়ো তুমি, সে যদি রাত্তির একটা অবধিও কাটিয়ে যায় কক্ষনো তোমার ঘুম পায় না, পাছে কোনো অসময়ে এসে সে ফিরে যায় সেই ভয়ে বাড়ি থেকে বেরোনো প্রায় ছেড়েই দিয়েছো—এসবের অর্থ কে না বোঝে মালতী? অন্য কাউকে টেনে এনো না এর মধ্যে—বলো, কেউ শুনছে না, এই গভীর রাত্রে, বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে মিশিয়ে-মিশিয়ে বলো যে তুমি প্রায় প্রথম দিন থেকেই নিজেকে তুলে দিয়েছিলে জয়ন্তর হাতে—তোমার যে অংশটিকে নয়নাংশু কখনো ছুঁতে পারেনি, সেখানে তুমি রক্তে মাংসে টকটকে রঙে একই সঙ্গে দাসী আর রানী হ'তে চাও, সেইখানটায় জয়ন্ত এসে নাড়া দিলো, আর সঙ্গে-সঙ্গে উথলে উঠলো তোমার সমস্ত যৌবন আর নারীত্ব।

—কিন্তু নয়নাংশু কেন আপত্তি করেনি? কেন কিছু বলেনি কখনো? বলেনি তা নয়, তোমাকে সতর্ক ক'রেও দিয়েছিলো সে। —ঈর্ষা, বিশুদ্ধ ঈর্ষা। আমাকে আলাদা ক'রে কেউ মূল্য দেবে, এটা নয়নাংশুর সহ্য হয় না। একদিন বললো, 'আমার মনে হয় জয়ন্তবাবু তোমার প্রেমে পড়েছেন।' আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, 'সে আবার কী?' 'আমি তাঁকে দোষ দিচ্ছি না, তাঁর পারিবারিক জীবন সুখের নয়, কিন্তু এর পরিণাম কী হবে বা হবে না তা তোমারই উপর নির্ভর করছে।' ওর এই পাদ্রিসাহেবের মতো কথা অসহ্য লাগে আমার, ঝাঁঝিয়ে উঠে বললাম, 'তুমি কী বলতে চাচ্ছো শুনি?' 'যা বলতে চাচ্ছি তা একজন ভদ্রলোকের পক্ষে বলা খুব শক্ত—নিজে বুঝে নিয়ো।' আমি ক্ষিপ্ত হ'য়ে বললাম 'নিজেকে তুমি ভদ্রলোক বলো—তোমার লজ্জা করে না নিজের স্ত্রীকে কুৎসিত ইঙ্গিত ক'রে কথা বলতে! জয়ন্তবাবু তোমারই বন্ধু, আমার নন। তুমিই ওঁকে আসতে বলো বার বার—আমি বলি না!' 'ওঁকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের ক'রে দিলেই পারো!' 'ওঁকে বের ক'রে দিলে তুমি সুখী হবে?' 'আমি সুখী হই বা না হই তাতে তোমার কী এসে যায়?' 'তার মানে—সুখী হবে না?' 'এত রাত্রে আর ইতরের মতো চ্যাঁচামেচি কোরো না—আমাকে ঘুমুতে দাও।' রাগে গা কাঁপছিলো আমার, নয়নাংশুকে বিষের মতো লাগছিলো। পরের দিন আমি সন্ধে

থেকে শোবার ঘরে লুকিয়ে রইলুম, টের পেলুম বসার ঘরে লোকজন আসছে—একটু পরে জয়ন্তর গলা পেলুম, 'শ্রীমতী কোথায়? তাঁকে দেখছি না?' নয়নাংশু কী জবাব দিলে শুনতে পেলুম না, কিন্তু হঠাৎ দেখি পর্দা ঠেলে শোবার ঘরে এসে ঢুকছে জয়ন্ত! 'এ কী! শুয়ে যে?' আমার মুখ দিয়ে একটা মিথ্যে বেরিয়ে গেলো 'মাথা ধরেছে।' 'মাথা ধরেছে? জ্বর হয়নি তো?' ব'লে জয়ন্ত আমার কপালের উপর হাত রাখলো—থাবার মতো মস্ত তার হাতটা। আমি তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে বললুম, 'চলুন ও ঘরে।' 'কেন, এই তো বেশ।' অংশুর লেখার চেয়ারটা খাটের কাছে এনে গল্প জুড়ে দিলো আমার সঙ্গে।

এই জন্যেই আমি ভালোবাসি তোমাকে, তুমি মিনিমুখো নও, ভীরু নও, সাবধানী পর্যন্ত নও—হাতের সব তাস টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে খেলছো তুমি, আর সেইজন্যেই কেউ তোমাকে ঠেকাতে পারছে না, পারবেও না। আমার আলো, আমার রোদ, আমার জয়ন্ত। কেমন করে তুমি জেনেছিলে নয়নাংশুর কাছে কী-কী আমি পাইনি, কিসের অভাবে ভিতরে ভিতরে আমি শুকিয়ে যাচ্ছিলাম। নয়নাংশু চেয়েছে নিছক তার যুবতী স্ত্রীটিকেই, নিজের সুখের জন্য আরামের জন্য, আমার মনের দিকে তাকায়নি কখনো, আমার পারিপার্শ্বিক আত্মীয় স্বজন বিষয়ে উৎসাহ নেই তার—কিন্তু তুমি, জয়ন্ত, তুমি জানতে চেয়েছো আমার ছেলেবেলার কথা, আমার মা-বাবা ভাইবোনেদের কথা, আমার বাপের বাড়ির পুরোনো চাকর গঙ্গার গল্পও মন দিয়ে শুনেছো। নয়নাংশুর যেন আমার বিষয়ে একটা স্নেহ মেশানো মাস্টারি ভাব—আমাকে সে অন্য কিছু করে নিতে চায়—কিন্তু আমি নিজে যা, আমি যা কিছু করি আর বলি, তা-ই তোমাকে আনন্দ দেয় জয়ন্ত। কত কথা আমি বলেছি তোমাকে, বলতে পেরে খুশী হয়েছি—নেহাত ঘরোয়া সাধারণ কথা, মেয়েলি কথা, যা নয়নাংশুকে কখনো বলা হয়নি সে শুনতে চায়নি বলেই। একদিন তুমি আমাকে জিগেস করলে, 'আপনার কোনো ডাকনাম নেই?' 'আছে একটা।' 'কী, শুনি?' 'লোটন। আমার বাপের বাড়িতে আমার ঐ নাম।' একটু পরেই তোমার জীবনের একটা ঘটনা আমাকে শোনালে তুমি—লোটন নামে একটি নায়িকার আমদানি করলে, আমি বুঝতে পারছিলুম গল্পটা তুমি তখন-তখন মুখে-মুখে তৈরি করছো, শুধু লোটন নামটা বার-বার উচ্চারণ করার সুখের জন্য। অথচ নয়নাংশু আমাকে সভ্যভব্য মালতী ব'লেই ডাকে, আদরের সময় নিজে অনেক কিছু বানিয়ে নেয় কিন্তু লোটন বলে ডাকে না, তার মতে ওটা নাকি মানায় না আমাকে, ওটা 'ন্যাকা' নাম, অর্থাৎ আমার বিয়ের আগেকার কুড়ি বছরের জীবনটাকে সে উড়িয়ে দিতে চায়। কিন্তু তুমি নিলে আমার জীবনের অংশ, আমার অতীতের আর বর্তমানের, আমার কথা শুনে-শুনে ক্লান্তি নেই তোমার, আমি বুঝতে পারলুম তোমার জীবন এখন আমাকে ঘিরে-ঘিরে ঘুরছে, সেটা তুমি খুব সরলভাবে সহজভাবে মেনে নিয়েছো, তা নিয়ে কোনো ভয় নেই তোমার, লজ্জা নেই—কত সহজে আমার হাত ধরেছিলে তুমি, কানে কানে 'লোটন' বলে ডেকেছিলে, আড়ালে যখন 'তুমি' বলো মনে হয় যেন চিরকাল আমি তা-ই শুনেছি, আর তাই তো যেদিন প্রথম আমাকে জাপটে ধরে চুমু খেলে আমি অবাক হলাম না, ভাবলাম না এটা ভালো হলো না মন্দ হলো, শুধু সারা শরীরে থরথর করে কেঁপে উঠলাম যেন আমি ষোলো বছরের কুমারী।

কবে, কতদিন, কেমন করে ঐ অবস্থায় আমরা পৌঁচেছিলাম? একদিন, রাত প্রায় দশটা, আমাদের বসার ঘরের আড্ডা তখনও ভাঙেনি, তিব্বত, চীন আর নেহরুকে নিয়ে কথা বলছে অংশু আর তার দু-জন বন্ধু, অংশু বলছে এই একটা বিরাট ভুল করলেন জহরলাল—এমন সময় দরজায় টুকটুক টোকা পড়লো। আমি সন্ধে থেকে উশখুশ করছিলাম, ছটফট করছিলাম মনে মনে—সকলের আগে উঠে গেলাম ফ্ল্যাটের দরজায়। দরজাটা আধখানা খোলা ছিলো, আমি কাছে গিয়েই দেখতে পেলাম শাদা-কালো লম্বা একটা ছায়ার মতো মানুষ: তক্ষুনি —কিংবা তার অনেক আগেই একটুখানি অংশ মাত্র দেখেই, শুধু মাত্র দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটুকু থেকেই, চিনতে পারলাম সেই তাকে, যে আসেনি ব'লে সব আমার ফাঁকা লাগছে। সেদিন সকালেও আসেনি জয়ন্ত, সারাদিনের

মধ্যে একবার আসেনি—কত মাসের মধ্যেও এ-রকম দিন একটাও কাটেনি, সন্ধে যত এগিয়ে যাচ্ছে তত আমি উৎকণ্ঠায় এলিয়ে পড়ছি—বুন্নিকে খাওয়াবার জন্য মাঝে একবার উঠে গিয়েছিলাম, শুয়েছিলাম বুন্নির পাশে অন্ধকারে, একটি চেনা গলার আওয়াজের জন্য কান দুটোকে পাহারায় রেখে—বুন্নি ঘুমিয়ে পড়ার পর আবার এসে চেষ্টা করেছিলাম অংশুদের কথাবার্তা শুনতে, আমার অবাক লাগছিলো, যে চীন তিব্বত ইত্যাদি দেশ, যা ম্যাপে ছাড়া আমরা কখনো দেখবো না, তা নিয়ে এত উত্তেজনার সৃষ্টি হ'তে পারে ঝাউতলা রোডে কলকাতায়। আজ কি ট্রাম-বাস সব বন্ধ? ট্যাক্সি অচল? অসুখ? অন্য কোনো বিপদ? কিন্তু এমন কি কোনো কথা আছে যে রোজই তাকে আসতে হবে? তা যদি নাই থাকবে তাহ'লে এতদিন ধ'রে আমাকে জ্বালিয়েছে কেন, আমার সময় নষ্ট করেছে কেন, কেন অশান্তি ঘটিয়েছে অংশু আর আমার মধ্যে, কেন এসেছিলো তিন মাইল রাস্তা জল-কাদা উজিয়ে বুন্নির জন্মদিনে? এ-সব কি ছেলেখেলা হচ্ছে—তার খেয়ালমতো আসবে কিংবা আসবে না? মনে রাখে যেন, আমাদের কোনো দরকার নেই তাকে দিয়ে, আমরা তাকে যে-কোনো মুহূর্তে ছেড়ে দিতে পারি—আমি একজন সুখী, বিবাহিত ভদ্রমহিলা, স্বামী আছে সন্তান আছে, মা-বাবা আত্মীয়স্বজন সবাই আছেন, ভরপুর আমার জীবন, আমি থোড়াই পরোয়া করি এক বাজে সাপ্তাহিকের সম্পাদক মশাইকে, মানুষ হিসেবে আমার স্বামীর সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না যার —কিন্তু তারও পক্ষে আশ্রয় হয়েছি আমরা, নেহাৎই আমার স্বামী অত্যন্ত ভালো ব'লে ঢুকতে পেরেছে আমাদের বাড়িতে, প্রায় আমাদেব বাড়ির একজন হ'তে পেরেছে! এর মূল্য সে যদি না বোঝে তো আমার ভারি ব'য়ে গেলো।

ঠিক এই রাগের মুখেই জয়ন্তর ছায়া দেখলাম দরজায়। দরজা খোলা পেয়েও সে যে টোকা দিয়েছিলো তাতে আমি একটু অবাক হলাম, আরো অবাক হলাম যে আমাকে দেখেও সে ভিতরে এলো না। তাকে পথ দেবার জন্য আমি স'রে দাঁড়ালাম, কিন্তু সে একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। সিঁড়ির আলোটা তেমন উজ্জ্বল নয়, তবু আমার মনে হ'লো জয়ন্তকে আজ অন্য বকম দেখাচ্ছে। আমার দিকে তাকালো সে, কিন্তু —যদিও আমি অত কাছে দাঁড়িয়ে আছি, তবু আমার মুখের উপর দৃষ্টিটাকে আটকে দিতে বেশ একটু সময় লাগলো তার, যেন হঠাৎ কোনো কারণে ভালো দেখতে পাচ্ছে না। তার চোখ একটু লাল মনে হ'লো আমার, আর ঠোঁটে একটা অদ্ভুত হাসি, নীচের ঠোঁটটা যেন বড্ড বেশি ভেজা আব চকচকে, আমি আবার অবাক হলাম সে অমন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে কেন, কেন কিছু কথাও বলছে না। তারপব হঠাৎ সে দু-পা এগিয়ে এলো আমার দিকে, হাত বাড়িয়ে দিলো—কিন্তু তার হাতটা পড়লো গিয়ে দরজার উপব, একেবারে অন্যরকম গলায় জড়িয়ে-জড়িয়ে বললো, 'লোটন! তুমি একা একবার দেখা করবে আমার সঙ্গে? কাল দুটোর সময়—মেট্রো সিনেমার সামনে?' আমি আন্দাজে বুঝলাম সে কী বলছে, আমার বুকের মধ্যে দুরদুর করতে লাগলো, ভেবে পেলাম না এখন আমার কী করা উচিত, হঠাৎ দেখি অংশু এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। অংশু আমার দিকে তাকালো না; গম্ভীর গলায় বললো, 'জয়ন্তবাবু, আপনি আসুন আমার সঙ্গে—' ব'লে তাকে হাতে ধরে নামাতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। জয়ন্ত একটু বাধা দিলে প্রথমে, 'লোটন, লোটন' ব'লে ডেকে উঠলো আরো কয়েকবার, আমি সেখানে আর না-দাঁড়িয়ে শোবার ঘরে চ'লে এলাম। সেই একবার মনে-মনে বলেছিলাম, অংশুর বন্ধুরা যেন আরো অনেকক্ষণ কাটিয়ে যায়, কিন্তু মিনিট দশেক পরে অংশুর ফিরে আসার আওয়াজ শুনলাম কিন্তু মনে হলো তিব্বত-চীনে কারোরই আর উৎসাহ নেই, বাড়ি নিঃশব্দ হতে দেরি হলো না।

নিঃশব্দে আমরা খেয়ে উঠলাম সে রাতে, খাওয়ার পরে অংশু আমাকে কিছু কথা বললো। আমি কষ্ট পাচ্ছিলাম মনে-মনে, প্রায় কান্না পাচ্ছিলো, ব্যাপারটা কি ঘটে গেলো তা ঠিকমতো বুঝিনি তখনও, কিন্তু ঝাপসভাবে মনে হয়েছিলো এর জন্য আমাকে শাস্তি পেতে হবে। অংশু আমাকে বুকে টেনে নিয়ে শান্ত করতে পারতো, তার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে পারলে আমার মন হালকা হ'য়ে যেতো, হয়তো আমাদের জীবনের ধারাই বদলে যেতো সে-মুহূর্ত থেকে—কিন্তু অংশু তা

করলো না, ওর লেখার চেয়ারে ব'সে, টেবল ল্যাম্প জ্বেলে, সিগারেট ধরিয়ে, কয়েকটা কথা বললো, 'জয়ন্তবাবু মাতাল ছিলেন, আমি ওঁকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে এলুম।' আমি শিউরে উঠে বললাম, 'মাতাল!' 'কেন, তুমি বোঝোনি?' 'না।' 'বোঝোনি?' অংশু চোখ তুলে তাকালো কিন্তু সোজাসুজি আমার মুখে চোখ ফেললো না। আমার জবাব দেবার ইচ্ছে হ'লো না; মনে মনে ভাবলাম অংশু হয়তো বিশ্বাস করছে না আমার কথা, কিন্তু ওর বোঝা উচিত আমি জন্মবয়সে মদ কিংবা মাতাল দেখিনি (সিনেমায় ছাড়া), দেখে থাকলেও চিনতে পারিনি, ছেলেবেলা থেকে এমন আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছি যাতে 'মদ' কথাটা শুনলেই আমার ভয় করে। একটু পরে অংশু আবার বললো (ঠোঁট বাঁকিয়ে, আমার দিকে না-তাকিয়ে), 'প্রেমিক পুরুষটি তেমন বীর নয় কিন্তু মালতী, প্রেমনিবেদন করার জন্য মাতাল হ'তে হয়।' আমি হাঁটু মুড়ে বিছানায় বসেছিলাম, হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে তাকিয়ে রইলাম মেঝের দিকে, আমার শরীর যেন পাথর হয়ে গেলো। একটু পরে আবার অংশুর গলা পেলাম, 'আমি ওঁকে বলেছি এ-বাড়িতে ওঁর আর আসা-যাওয়া না-করাই ভালো—কথাটা ওঁর মগজে ঢুকলো কিনা তা অবশ্য বুঝলাম না।'

অংশু টেবল-ল্যাম্পটা এমনভাবে ঘুরিয়ে দিলে যাতে বিছানার দিকে ছায়া পড়ে, তারপর একটা বই সামনে রেখে কী লিখতে লাগলো—বোধহয় কোনো বিদেশী গল্পের তর্জমা, উপার্জন বাড়াবার উপায় হিসেবে সে যেটাকে বেছে নিয়েছে। রাত বোধহয় দেড়টা বা দুটো অবধি লিখলো সে-রাত্তিরে (কতটা লিখলো জানি না, অন্তত বসে রইলো, সিগারেট পোড়ালো) ; আমি চোখ বুজে-বুজে শুনলাম তার দেশলাই জ্বালার শব্দ, মাঝে-মাঝে খাতার পাতা ওল্টাবার শব্দ, কখনো বা চোখ মেলে দেখলাম তার আধখানা মুখ, যেন অচেনা কারো মুখ, যেন আমার কেউ নয়, মনে-মনে বললাম, 'অংশু, আমার একা লাগছে, খারাপ লাগছে, কষ্ট পাচ্ছি, তুমি এসো।' জয়ন্তর কথা ভাবলাম না, সাবধানে এড়িয়ে গেলাম কেননা ভাবতে গেলেই শিউরে উঠছি তখনও—মদ, ঘেন্না! মাতাল, ঘেন্না! জয়ন্তর কথা ভাবতে যে আমার খারাপ লাগছে সেই কষ্ট ঠেকাবার জন্য মনের একটা অংশকে বোবা করে রাখলাম। অবশেষে অংশু বই খাতা বন্ধ করে চেয়ার ছেড়ে উঠলো (খুব সন্তর্পণে—ও কি ভাবছিলো আমি ঘুমুচ্ছি?), পা টিপে-টিপে বাথরুমে গেলো, আমি তার মুখ ধোবার শব্দ পেলাম (শোবার আগে দাঁত মাজতে ওর ভুল হয় না কখনো), ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লো আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে। অবশেষে এক সময়ে সত্যি আমি আর না-কেঁদে পারলাম না, কিন্তু তাতেও অংশুর কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না—হয়তো সে সত্যি লিখছিলো, মাথা খাটিয়ে ক্লান্ত করেছে নিজেকে, ঘুমিয়ে পড়েছে, আমার অন্তত মনে হ'লো না আমার অস্তিত্ব বিষয়ে সে সচেতন।

কিন্তু আমার চোখে আর ঘুম এলো না সে-রাত্রে।

একদিন, দু-দিন, তিনদিন কাটলে, মনে-মনে বললাম আপদ চুকলো, আর হাঙ্গামা পোয়াতে হবে না। সন্ধেবেলা রোজই আমি বেরিয়ে যাচ্ছি—কোনোদিন বুন্নিকে নিয়ে মা-র কাছে, কোনোদিন কোনো আত্মীয় বা পড়শীর বাড়িতে, বা কোনো বান্ধবীকে জুটিয়ে সিনেমায় বা অকারণে কিছু কেনাকাটা করি গড়িয়াহাটে। ফিরে এসে বসার ঘরে ঢুকি না, অংশুও খোঁজ করে না আমার, জিগেস করে না কোথায় গিয়েছিলাম। 'প্রেমিক পুরুষটি তেমন বীর নয় কিন্তু, প্রেমনিবেদন করার জন্য মাতাল হতে হয়—' অংশুর এই কথাটা ঘুরে বেড়ায় ঘরের মধ্যে, শীতকালে বন্ধ ঘরে সিগারেটের ধোঁয়ার মতো, আমার যেন দম আটকে আসে কেননা ঐ কথাটা আমারও কথা, আমি কখনো ভাবিনি যে জয়ন্ত—আমার বুকের মধ্যে ফাঁকা-ফাঁকা লাগে—না, জয়ন্তকে আর ভাববো না। আমি কুকুর পুষবো, বেড়াল পুষবো, গানের কলেজে ভর্তি হবো আবার, গীতভারতী উপাধি নিয়ে নিজেই খুলবো গানের স্কুল। কত কিছু আছে জীবনে, বুন্নি আছে, আমার আরো সন্তান হ'তে পারে, অংশু যদিও কিছুতেই তা চায় না তবু আমি জোর করবো। সাতদিন কেটে গেলো, হয়তো বা পনেরো দিন, হঠাৎ আমার মনে হ'লো হয়তো বা অন্যায় করছি জয়ন্তর উপর। যে একদিন মদ খেয়েছে

তাকেই কি মাতাল বলা যায়? এতদিন ধ'রে রোজ এসেছে জয়ন্ত, নেশাখোর হ'লে আগেই কি ধরা পড়তো না? আমাকে মনের কথা বলতে চাচ্ছে অনেকদিন ধ'রে—যদিও মুখ ফুটে বলার দরকার নেই, এমনিতেই বোঝা যায়, তবু পুরুষদের স্বভাবই এমন যে মুখের কথায় না-বলে পারে না—কিন্তু সাহস পাচ্ছিলো না, আমি বিবাহিত, আমি মা, আমার স্বামী তার উপকার করেছেন—সাহস না-পাবার কারণ আছে প্রচুর, তার এই ভীরুতাকে নিন্দে করা যায় না, এটা তার বিবেকবুদ্ধিরই প্রমাণ দিচ্ছে, আর সেই ভীরুতা কাটাবার জন্য সে যদি এমন কোনো উপায় নিয়ে থাকে যাতে মনের শাসন আলগা হয়ে যায়, সেটাই বা এমন কী অপরাধ? আমার বিবাহিত জীবনকে সে শ্রদ্ধা করে বলেই তো ও-রকম অশোভন আচরণ তাকে করতে হলো সেদিন? আর তাছাড়া—মদ জিনিশটাকে আমি যে অমন ভয়ের চোখে দেখি সেটাই কি ঠিক যুক্তিসংগত? কত রকম কুসংস্কারে ভোগে মানুষ: আমরা এদেশে গোমাংস খাই না, কিন্তু যারা খায় তারা তো দিব্যি আছে, আমাদের চাইতে অনেক বেশী ভালো আছে তারা। আর তাদের দেশেই ঘরে-ঘরে চলছে মদ, যার নাম শুনলে আমি শিউরে উঠি। যেহেতু আমি অনভ্যস্ত, তাই। যেহেতু জিনিশটা অজানা, তাই। আমার মনে পড়লো বিয়ের পরে প্রথম প্রথম অংশু যখন আমাকে কবিতা পড়াবার চেষ্টা করছিলো, কবিদের জীবনের কথাও শোনাতো সে আমাকে (তোমার মাস্টারি করাই উচিত ছিলো, অংশু, তুমি কথা বলতে বড্ড ভালোবাসো) --কেউ মদে মরেছে, কেউ বা তার মাস্টারমশায়ের বৌকে নিয়ে পালিয়েছিলো—তাদের প্রতি তো ভক্তি-ভালোবাসার অভাব দেখিনি অংশুর, তাব কথায় এমন কোনো ইঙ্গিতও ছিল না যে ঐ কাজগুলি অন্যায়। কেন, তাঁরা কবিতা লিখেছিলেন বলেই সাতখুন মাপ? আর ঐ জয়ন্ত একদিন একটু বেসামাল হয়েছিলো বলেই তাকে আর দেখতে পাবো না আমি? জয়ন্ত কবি না-হতে পারে কিন্তু তার কি কোনও গুণ নেই? অংশুই তো কত প্রশংসা করেছে তার, সে কিছুদিন ডেটিন্যু ছিলো আর স্বাধীনতার পরে দণ্ডকারণ্যে আর আন্দামানে গিয়েছিলো রেফিউজীদের অবস্থা দেখতে, তাই তার জীবনটাকে অ্যাডভেঞ্চার বলতেও দ্বিধা করেনি—মোটের উপর অংশু কিছু কম গুণগান করেনি জয়ন্তর, যতদিন না—যতদিন না—কিন্তু- -কী হয়েছে? আজ পর্যন্ত কী ক্ষতি করেছে জয়ন্ত এই পরিবারের? বরং অনেক কাজে লেগেছে অনেক সময়, অনেক সাংসারিক কাজ করে দিয়েছে যেগুলি আসলে অংশুরই কর্তব্য। যদি তার মনে কিছু থাকে — ধরা যাক আমার প্রতি কোনো দুর্বলতা—সে তো তার মনেই আছে, তাতে কারো গায়ে ফোসকা পড়ছে না। অন্তত তাকে করুণা তো করা যায়?

—মিথ্যা—কত মিথ্যা আমরা বানাই মনে-মনে, বুনে যাই মাকড়সাব মতো, নিজেরাই জড়িয়ে থাকি সেই জালে যতক্ষণ না কোনো-এক হাওয়ার ঝাপটে তা ছিঁড়ে যায়, বা নিজের সঙ্গে এই প্রতারণায় নিজেরাই ক্লান্ত হয়ে পড়ি একদিন। সেই দিনগুলি ভ'রে—জয়ন্ত যতদিন শারীরিকভাবে অনুপস্থিত ছিলো—আমি তার সপক্ষে কত না যুক্তি সাজিয়েছি সাত রাজ্যি থেকে কুড়িয়ে-কাচিয়ে, বাচ্চারা যেমন তাসের পর তাস সাজিয়ে বাড়ি বানায়—দোতলায় পর তেতলা তোলে, তেমনি; কিন্তু সবচেয়ে বড়ো যুক্তিটা কখনো উচ্চারণ করিনি নির্জনে, মনে-মনে ঘুমিয়ে পড়ার আগে—কখনোই না।

সেদিন রবিবার, দুপুরে খাওয়ার পরে অংশু বললো, "চণ্ডালিকা'র তিনটে টিকিট পেয়েছি, বুন্নিকে নিয়ে যাবে নাকি তুমি?" 'চতুর্মুখের "চণ্ডালিকা"?'

'হ্যা, তাদেরই—বোধহয় ভালোই হবে।' আমার জবাব না-পেয়ে আবার বললো, 'তুমি যেতে না চাও তো আমি যাই বুন্নিকে নিয়ে—বুন্নির জন্যই যাওয়া।' আমি হঠাৎ বললাম, 'তুমি কি চাও না আমি যাই?' 'তোমার অন্য কোথাও যাবার থাকতে পারে— আমি কি করে জানবো?' জবাব দিলাম, 'আমার অন্য কোথাও যাবার নেই।' 'তবে চলো। ঠিক সওয়া-পাঁচটায় বেরোতে হবে।' অংশু যথারীতি একটা বই খুলে ধরলো মুখের সামনে। (যদি সে একটু কম পড়তো, একটু বেশি মন বুঝতে পারতো!), আর আমার মনে হ'লো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ-ধরনের কথাবার্তা বোধহয়

অ-সাধারণ, এমনকি হয়তো অস্বাভাবিক, তারপর ভাবলাম কিছুদিন ধরে এই ধরনেরই কথাবার্তা অংশুর সঙ্গে আমার—রক্তমাংস নেই, কঙ্কালের মতো, আর এর বেশি বলার কোনো ইচ্ছে নেই কোনো পক্ষেরই, যেন সামর্থ্যও নেই।

মঞ্চসজ্জা তেমন ভালো ছিলো না, বেশবাস নিতান্ত গতানুগতিক, ছোটো ভূমিকাগুলির অভিনয় চলনসইমাত্র, কিন্তু চমৎকার জোরালো যন্ত্রসংগীত চলছিলো নেপথ্যে, বেহালা বাঁশি ঢোল কর্তালের অর্কেস্ট্রা—মাঝে-মাঝে বৃষ্টির মতো শরোদ—সেই বাজনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুরগুলোর একটা উত্তর প্রত্যুত্তরের খেলা চলছিলো যেন—আর প্রকৃতি আর তার মা দু-জনেই নাচে অতি নিপুণ, তাদের টানা চোখ, বাহুর ভঙ্গি, আঙুলের লীলা, তাদের মুখের আশ্চর্য দ্রুত ভাব পরিবর্তন—সব মিলিয়ে মুগ্ধ করে দিলো আমাকে, আমি চেয়ারে বসে শরীরটি দোলাতে লাগলাম আস্তে আস্তে; ঠোঁট নেড়ে, শব্দ না-ক'রে প্রতিটি কথা গাইতে লাগলাম মনে-মনে, এক আশ্চর্য আশাতীত সুখ হঠাৎ আমার বুক ছাপিয়ে উপচে পড়লো। হয়তো সেইজন্যেই সেই রাত্রিটিকে এমন স্পষ্ট মনে আছে আমার, পরে অংশুর সঙ্গে আমার কথাবার্তা তারপর বাড়ি ফিরে যা-কিছু হয়েছিলো কিছু মনে হয় ভুলিনি, যেন পর-পর সাজানো আছে সব, যেন আমাদের ভুলে যাওয়ায় ভরা জীবনের স্রোতের মধ্যে রাত্রিটি একটি দ্বীপ হয়ে জেগে আছে। অন্য এক জগৎ, যেখানে দুঃখ কষ্ট দ্বন্দ্ব সবই আছে কিন্তু কিছুই কষ্ট দেয় না, যেখানে কিছুই মলিন নয়, কোনো জোড়াতালি নেই, কোনো মিথ্যে নেই, যেখানে সব মিলে যায়, সব উজ্জ্বল সব স্বাধীন—যে-জগৎ একদিন ছিলো আমারও বা হতে পারতো, আমার গানের কলেজে এই প্রকৃতির ভূমিকায় আমিও একবার নেমেছিলাম। বিয়ের পরেও অনেকদিন পর্যন্ত আমরা আসতাম মাঝে-মাঝে—অংশু আর আমি— বিশেষ কোনো নাটকে বা গানের জলসায় (নাটকে উৎসাহ আছে অংশুর, আর একমাত্র যে-গান সে ভালোবাসে তা হলো রবীন্দ্রসংগীত); কবে থেকে এমন হলো যে আর আসি না, কবে থেকে এমন হলো যে রেডিওতে কান পাতি না, মাঝে-মাঝে—ওটা চালায় শুধু বুন্নি। একবার একটা ঢোঁক গেলার মতো শব্দে মুখ ফেরালাম, মনে হলো শব্দটা অংশুর গলার, হঠাৎ একবার আবছা আলোয় লক্ষ করলাম সে হাতের তেলোতে চোখ মুছলো। নাটক শেষ হলো; বেরিয়ে আসার গলিতে দু-তিনজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলো আমাদের। একজনের কথার উত্তরে অংশুকে বলতে শুনলাম, Well, that old man! রাস্তায় বেরিয়ে অনেকটা আপন মনে বললে, 'আশ্চর্য! আশ্চর্য! অত সহজ, সরল, মাঝে-মাঝে সেন্টিমেন্টল—কিন্তু হঠাৎ এক-একটা ঝাপটে কোন উঁচুতে উঠে যায়।' যদিও মাসের শেষ, নয়নাংশু ট্যাক্সি নিলে, যেতে-যেতে বুন্নি ঘুমিয়ে পড়লো ওর বাবার কোলে মাথা আর আমার কোলে পা রেখে; হঠাৎ যেতে-যেতে অংশু বললো, 'তুমি কি লক্ষ করেছো মায়ের মুখে একেবারে ঘরোয়া ভাষা বসানো হয়েছে, কিন্তু মেয়ের মুখের ভাষা অনেকটা পোশাকি—তোমার কি মনে হয় এটা ঠিক হয়েছে?' আমি জবাব দিলাম, 'কী যেন, ভেবে দেখিনি কখনো—আমি সুরের দিকে এত মন দিই যে কথাগুলো ঠিক শুনতে পাই না!' 'সেটা ভুল—রবীন্দ্র-সংগীতে কথাগুলোতেই ম্যাজিক।' একটু পরে অংশু আবার বললো, 'না—বোধহয় ঠিক বললাম না—বিশেষতঃ এই নৃত্যনাট্যগুলিতে কথাগুলো সুরের মধ্যে এমনভাবে গলে যায় যে কিসের জন্য কী হচ্ছে তা-ভেবে দেখারই সময় পাই না আমরা। তবু-তা ভেবে দেখারও দরকার আছে।' বাড়ি ফিরে এসেও অংশু এ-প্রসঙ্গ ছাড়তে পারলো না, অনর্গল কথা বলতে লাগলো রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে, 'চণ্ডালিকা' বের করে পাতা ওল্টাতে লাগলো, তার মুখে-চোখে এক অন্য ধরনের উজ্জ্বলতা আমি দেখতে পেলাম। 'এই যে পেয়েছি—এই জায়গাটা—

হে পবিত্র মহাপুরুষ,
আমার অপরাধের শক্তি যত
ক্ষমার শক্তি তোমার
আরো অনেকগুণ বড়ো।

তোমারে করিব অসম্মান,
তবু প্রণাম, তবু প্রণাম, তবু প্রণাম,

—হঠাৎ এখানে মা-ও সাধু ভাষায় কথা বলছে। ছাপার অক্ষরে একটু বেসুরো লাগছে—বিশেষতঃ ঐ "করিব" শব্দটা—কিন্তু সুরে গাইলে—আচ্ছা, তোমার মনে আছে সুরটা?' ব'লে অংশু আমার দিকে তাকালো—ইদানীং কখনো এমন হয় না যে ও আমার গান শুনতে চায়—আমি গেয়ে শোনালাম। অংশু একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'না—কিছু বলার নেই, এর উপরে কোনো কথা নেই।'

সে রাত্রে শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়লাম দু-জনেই—গভীর নরম সুন্দর ঘুম—কিন্তু অনেক রাত্রে আমার ঘুম খুব কোমলভাবে ভেঙে গেলো, আমি অনুভব করলাম অংশুর হাত আমার কাঁধের উপর। চোখ মেলে অন্ধকারে দেখতে পেলাম ও তাকিয়ে আছে আমার দিকে—আমার মুখের উপর নিচু হয়ে, আমার গালের উপর ওর নিশ্বাস টের পেলাম। ছোট্ট একটা সুখের স্রোত বয়ে গেলো আমার শরীরে—অনেকদিন পর অংশুর স্পর্শে—কিন্তু একটু পরেই সেই সুখের বদলে একটা কষ্ট যেন আমার গলা ঠেলে উঠলো—একটু অভাববোধ—হাহাকার—যেন আমার বুকের ভিতরটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছে আর আমি তা এইমাত্র টের পেলাম। অংশু আমার পাশে শুয়ে পড়লো, আমার মুখটা টেনে নিলো ওর মুখের উপর ; আমার মন সাড়া দিলো না তবু যথোচিত অঙ্গভঙ্গি করলাম, ওকে সমর্পণ করলাম কিছুক্ষণে মতো এই শরীর। জানি না অংশু ও থেকে কী পেলো, কিছু পেলো কিনা—কিন্তু আমার মনে বিশ্রী একটা ভাব জেগে উঠলো, আমার উপর, আমার এই শরীরের উপর অংশুর যে দাবি আমি সেজন্যে ওকে ক্ষমা কবতে পারলাম না যেন, আবার অংশুর প্রতি এই বিরুদ্ধতার জন্য নিজেরও উপর রাগ হতে লাগল।

আমার ঘাড়ে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়েছিলো অংশু—যেন উপন্যাসে বর্ণিত একটি সুখী প্রেমিক, ভারি শান্ত ওর নিশ্বাস, শিশুর মতো, ভাবটা যেন হারানো সুখ ফিরে পেয়েছে। আমি ওকে ঠেলা দিয়ে বললাম, 'ওঠো, নিজের বিছানায় যাও।' 'কেন থাকি না এখানে।' 'তারপর যদি ঘুম না ভাঙে। যদি সকালে বুন্নি এসে দ্যাখে?' ঘুমে ভারি শরীর নিয়ে উঠে গেলো অংশু। আমার মনের তলা থেকে একটা কথা আস্তে-আস্তে ভেসে এলো উপরে। আমার রাগ, কষ্ট—অংশুর প্রতি বিরুদ্ধতা: সবই জয়ন্তর জন্য। তাকে ভুলতে পারিনি মুহূর্তের জন্য, তাই কষ্ট। একসঙ্গে—'চণ্ডালিকা' দেখলাম অংশু আর আমি, একটা অন্য ধরনের আনন্দ পেলাম একসঙ্গে—ইন্দ্রিয়ের, তবু ইন্দ্রিয়ের নয়—তাতে জয়ন্তর কোনো অংশ ছিলো না। কোনো-কিছু সুন্দর—আমাদের লাভের বাইরে, লোভের বাইরে—যাকে হয়তো বা পবিত্র বলা যায়,—তার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য মিলিত হয়েছিলাম অংশু আর আমি; জয়ন্ত বাইরে প'ড়ে ছিলো। একটু আগে আমার শরীরও আমি অংশুকে দিলাম, অংশু নিজেকে সুখী ভেবে ঘুমিয়ে পড়লো, আর জয়ন্তকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে এই বাড়ি থেকে, যেহেতু অংশু আমার স্বামী সে তাড়িয়ে দিয়েছে জয়ন্তকে—আমার দিকে তাকায়নি, আমার কথা ভাবেনি। রবীন্দ্রনাথের সুর একটা সম্মোহন ছড়িয়ে দিয়েছিলো তখন, আমি যেন নিজেকে ভুলে ছিলাম, অংশুকে আমার মনে হচ্ছিলো ভালো, খুব বুদ্ধিমান, 'চণ্ডালিকা' বিষয়ে ওর কথাবার্তা অসাধারণ মনে হচ্ছিলো—কিন্তু ঘুমের ঘণ্টাগুলির মধ্যে গানের পাখিরা আমাকে ছেড়ে উড়ে চ'লে গেছে, আমি হারিয়ে ফেলেছি আমার তখনকার মন—যে মন নিয়ে দেখলে অংশুকে ভালো আর বুদ্ধিমান বলে মনে হয়—হঠাৎ জেগে অংশুর স্পর্শে সব বাস্তব ফিরে এসেছে। অংশু নিজেকে সুখী ব'লে ভাবছে আর আমিই তার কারণ, এটাকে আমি কেমন করে মেনে নিই, বা সহ্য করি—যখন জানি যে জয়ন্ত কষ্ট পাচ্ছে আমার জন্য, আমারই মতো কষ্ট পাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে, কিন্তু আমার জীবনে সান্ত্বনার কারণ যেটুকু আছে তাও নেই তার। আমার হিংসে হলো অংশুকে, নিজেরই উপর হিংসে হলো, যেহেতু আমরা এমন কোনো-কোনো সুখ পেয়েছি, বা পেয়েছিলাম, বা ভবিষ্যতে পেতে পারি, যা জয়ন্তকে মঞ্জুর করেনি তার জীবন। রুগ্ন এবং অতি সাধারণ স্ত্রী, ঈষৎ মাথা-খারাপ হওয়া বুড়ি

বিধবা মা, ছেলেপুলে, অভাব-অনটন—এ-সবের মধ্যে দিয়ে দিন কাটে জয়ন্তর, বা কাটছিলো, যতদিন না দেখা হয়েছিলো আমাদের সঙ্গে। আর যেহেতু তার জীবন সম্বন্ধে আমি শুধু সেটুকুই জানি যা সে নিজে আমাকে বলেছে, যেহেতু তার বাড়িতে বা কর্মস্থলে আমি তাকে দেখিনি কখনো, তাই প্রথম উৎসাহের ঝোঁকে অংশু যা বলেছিলো তারই উপর নির্ভর করে—আমি তাকে দেখতে পেলাম যেন জীবনযুদ্ধের এক সৈনিক প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে চলেছে, বাঁধা চাকরি নেই, উশকোখুশকো চুলে রোদে বৃষ্টিতে ঘোরে উপার্জনের চেষ্টায়, দেশের কাজ ক'রে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সপ্তাহে-সপ্তাহে—আমার মনে হলো তারও অনেক গুণ আছে যা দারিদ্র্যের তলায় চাপা পড়ে যাচ্ছে, কিংবা লোকেরা যা দেখেও দেখছে না। মনে হ'লো জয়ন্তকে আমি আনবো এ-বাড়িতে—যে করে হোক—আমি তাকে ফুটিয়ে তুলবো, আশ্রয় দেবো, মনে হলো এ সংসারে আমিই তার শ্রেষ্ঠ বন্ধু, আমি তার পক্ষে প্রয়োজনীয়, তাকে বঞ্চিত করা আমার অধর্ম হবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছটফট করে অবশিষ্ট-রাত কাটিয়ে দিলাম,—এই ঘরে, আমার স্বামীর পাশাপাশি এই বিছানায়।

পরের দিন নিরিবিলি দুপুরে আমি একটা প্যাডের কাগজে লিখলাম, 'জয়ন্ত, ফিরে এসো।' নিজের হাতের লেখায় ঐ তিনটে শব্দের দিকে তাকিয়ে রইলাম খানিকক্ষণ, যেন ভাবতে লাগলাম কথাগুলোর কী অর্থ, কেন ওখানে লেখা হয়েছে, দাগ বুলিয়ে-বুলিয়ে মোটা করে তুললাম কথাগুলিকে। হঠাৎ অন্য একটা সম্ভাবনায় চমকে কেঁপে উঠলাম আমি—জয়ন্ত কলকাতা ছেড়ে চলে যায়নি তো? দৈব—নিতান্ত দৈবের উপরে নির্ভর করে যাকে আমরা এই জীবনে সুখ বলে থাকি। স্বাধীন মানুষ সে, তার উপর বেপরোয়া—চলে যাবার বাধা কী? নয়নাংশু আর তার স্ত্রীর জীবনে যাতে ভাঙন না ধরে, হয়তো সেইজন্যই নিজে মাথা পেতে নিয়েছে কষ্ট, অপমান, পরাজয় তার—'বর্তমান' পত্রিকা কি বেরোয় এখনো? সে তো পাঠায় একটা করে এ-বাড়িতে, সম্প্রতি এসেছে কি? বসার ঘরে র‍্যাকটাতে আমি খুঁজতে লাগলাম—নানারকম পত্রিকা সেখানে রেখে দেয় অংশু, কিন্তু না—একটাও 'বর্তমান' নেই। তাহলে কি উঠে গেলো, না কি হাত-বদল করেছে? অংশু নিশ্চয়ই জানে কিন্তু আমাকে বলেনি। হয়তো অংশুই চেষ্টা করে তাকে কোনো কাজকর্ম জুটিয়ে দিয়েছে পাটনায় কি ভুবনেশ্বরে। সে-মুহূর্তে আমার ধারণা হলো যে অংশু তলায়-তলায় চক্রান্ত করেছে জয়ন্তকে উচ্ছেদ করার জন্য—সে চায় না আমার কোনো নিজস্ব বন্ধু থাক, চায় না আমার দিকে কেউ একটু বেশি মনোযোগ দিক, স্বার্থপর, হিংসুক নয়নাংশু। —কিন্তু জয়ন্ত, তুমিও কি আমার কথা ভাবলে না?

ঠিক তখনই জয়ন্তকে দেখতে পেলাম—আমার সামনে বসার ঘরে পত্রিকার র‍্যাক থেকে চোখ ফেরানো মাত্র। বিশ্বাস করতে একটু সময় লাগলো।

পরিষ্কার ধুতি-পাঞ্জাবি পরনে, পরিপাটি সিঁথি করে চুল আঁচড়ানো, একটু যেন রোগা হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললো, 'আবার না এসে পারলাম না, আর-একবার চোখে না-দেখে পারলাম না। কিন্তু তুমি যদি না চাও—তোমরা যদি না চাও—তাহলে আমি এক্ষুনি চলে যাবো, সারা জীবনে আর দেখতে পাবে না আমাকে।'

আমি সারা শরীরে কেঁপে উঠলাম, অসহায়ভাবে বসে পড়লাম একটা চেয়ারে, আমার হৃদপিণ্ড দপদপ করে লাফাতে লাগলো। অনেকক্ষণ কাটলো কথা না-বলে, পরস্পরের দিকে না-তাকিয়ে, শুধু পরস্পরের উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ হয়ে। তারপর জয়ন্ত বললে, 'লোটন, আমাকে ক্ষমা করবে না? আমার দিকে তাকাবেও না?' আমি তাকিয়ে দেখলাম তার কালো চোখ আগুনে ভরা।

বুন্নি স্কুল থেকে ফিরে লাফিয়ে উঠলো তার জন্তি-কাকাকে দেখে, জয়ন্ত তাকে চুমু খেয়ে আদর করলে। অংশু আপিশ থেকে ফিরে হঠাৎ একটু থমকালো, তারপরেই সহজভাবে বললো, 'এই যে জয়ন্তবাবু, কেমন আছেন?' আরো সহজভাবে জয়ন্ত জবাব দিলো, 'মিসেস মুখার্জি, আপনার স্বামী একটি অসাধারণ মানুষ—আমার মতো দুর্বৃত্তকেও সহ্য করছেন'—এমনি করে আমাদের স্বাভাবিক জীবন বা অস্বাভাবিক জীবন, আবার শুরু হলো, আর তখন থেকেই আমি দ্রুত এগিয়ে এলাম

আজকের এই পরিণামের দিকে।

আমি দোষ করেছি? কিন্তু কী করতে পারতাম আমি, আমিও তো রক্তমাংসের মানুষ, কেমন করে আমি ফেরাবো তাকে, আর কেনই বা ফেরাবো যে চায় আমাকে, তার মন-গড়া বা হাতে-গড়া কোনো পুতুলকে নয়—আমাকে, আমাকে, আমাকেই? যে-কদিন জয়ন্ত এ-বাড়িতে আসেনি (সব সুদ্ধ পনেরো বা কুড়িদিন হবে হয়তো), সেগুলি অতি সহজে মুছে গেলো আমার মন থেকে, যেন তাদের অস্তিত্ব কখনো ছিল না, যেন জয়ন্ত চিরকাল ধ'রে ছিলো এ বাড়িতে, চিরকাল ধ'রে থাকবে। কত অসংখ্য উপায়ে সে জানিয়েছে যে আমি তার জীবনের কেন্দ্র, তার সর্বস্ব—সেই নিষ্ঠার কোনো মূল্য আমি দেবো না—আমি কি হৃদয়হীন? কতদিন এমন হয়েছে যে বাড়িতে লোকজনের ভিড়, আত্মীয়েরা এসেছেন, আমি কত ব্যস্ত হ'য়ে এ-ঘর ও-ঘর করছি, জয়ন্ত ধৈর্য ধরে বসে থেকেছে ঘণ্টার পরে ঘণ্টা আমাকে অবশেষে মিনিট পনেরো একা পাবার জন্য। (একা পাওয়া মানে অন্য কিছু নয়—হয়তো শুধু চোখে-চোখ তাকানো, হয়তো কিছু কথা—আমারই সংসারের কথা—বা জয়ন্তর জীবনের কোনো টুকরো, ডেটিন্যু ক্যাম্পের, দণ্ডকারণ্যের কোনো গল্প) আমাদের আত্মীয়দের সঙ্গে মেলামেশায় সে স্বচ্ছন্দ, বুন্নির সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছে, আমার সংসারের খুঁটিনাটি কিছুই তার চোখ এড়ায় না, কেমন ক'রে যেন বাড়ির সঙ্গে সে মিশিয়ে দিয়েছে নিজেকে। আমি বুঝতে পারি নয়নাংশু এটাকে ভালো চোখে দেখছে না, তা এই দেখবে বলে আশা করা যায় না তাও মানি, আমি দেখতে পাই দিনে-দিনে একটা থমথমে মেঘ জমে উঠছে তার মনে, বুঝতে পারি তার সঙ্গে আমার মিলিত জীবনটায় আমরা কেউ মজবুত হ'যে দাঁড়াতে পারছি না, দুঃখের—কিন্তু প্রতিবিধান কি আমার হাতে ছিলো! না, এ-বাড়ির কর্তা তো অংশুই, সব সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে হবে—সে কেন হাল ছেড়ে দিয়েছিলো, জয়ন্তকে একবার বিতাড়িত ক'রেও আবার কেন মেনে নিয়েছিলো, কেন আরো রূঢ় হয়নি, জবরদস্ত শাসন করেনি আমাকে—কেন, কেন তার দিক থেকে ছিলো শুধু অভিমান, মেয়েলীপনা, রক্তহীন ভদ্রলোক হবার চেষ্টা শুধু?

না—আমি ভুল—ভাবছি, সব ভুল। এক হাজার একশো উপাযে নিজেকে আর অন্যাকে আমবা ঠকাতে পারি, সেই চালুনির ছিদ্র দিয়ে কখন গ'লে বেরিয়ে যায় আমরা যাব নাম দিয়েছি ভালো আর মন্দ, ন্যায় আর অন্যায়। না—ও-সব কিছু নেই, আছে শুধু ইচ্ছে, ইচ্ছেই আমাদের চালিয়ে নেয়, আর প্রতিটি মানুষ এমনিভাবেই তৈরি যে একজনেব ইচ্ছের সঙ্গে আর একজনেব ইচ্ছে কিছুতেই পুরোপুরি মেলে না। স্বামী-স্ত্রীকে সব সময একসঙ্গে থাকতে হয় বলে এই গরমিলগুলো সবচেয়ে বেশী ধরা পড়ে তাদের জীবনেই—অধিকাংশ ব্যাপারে তাতে খুব কিছু এসে যায় না, অধিকাংশ ব্যাপারেই আপোশ চলে, মেনে নেয়া, মানিয়ে নেয়া সম্ভব হয়, কিন্তু কখনো কোনো ইচ্ছে যদি প্রকাণ্ড হয়ে ওঠে, যদি ছায়া ফ্যালে সমস্ত জীবনের উপব, তাহলে কেউ কি বলতে পারে কোনটা 'উচিত' বা 'অনুচিত'! কে ঠেকাবে সে অদম্য বেগ, সেই এঞ্জিনের বয়লারে পোড়া বাষ্প! কথাটা হচ্ছে: এই বারো বছর ধ'রে অংশুর ইচ্ছেমতোই সব হয়েছে, এবার কি আমার ইচ্ছেমতো কিছু হ'তে পারে না? আমি কি শুধু নয়নাংশুর স্ত্রী, একজন স্বাধীন মন-সম্পন্ন মানুষ নই?

কেউ যেন না ভাবে আমি নয়নাংশুর দুঃখ দেখতে পাইনি বা চেষ্টা করিনি তাকে সান্ত্বনা দিতে। তখন পর্যন্ত জয়ন্তর সঙ্গে কিছুই হয়নি আমার, কিন্তু আমি দেখছি নযনাংশু কেমন অদ্ভুত বদলে যাচ্ছে, হাসি কমে গেছে মুখের—আমি কিছু জিজ্ঞেস করলে ভালো কবে জবাব দেয় না—অন্তত একজন মানুষের কাছে আমি যে তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছি এইটেই ভালো লাগছে না তার। আমি কি তখন কম চেষ্টা করেছি নয়নাংশুকে খোশমেজাজে রাখতে। রাঁধতে আমি ভালোবাসি না, উনুনের আঁচে আমার মাথা ধরে, কিন্তু এই সময়ে আমি নিজের হাতে রান্না করেছি যা-যা তার বিশেষ পছন্দ, ঝি-চাকর থাকা সত্ত্বেও তার শার্ট-প্যান্ট ইস্ত্রি ক'রে দিয়েছি নিজের হাতে, জুতো পালিশ ক'রে দিতেও পরোয়া করিনি। সে আরামপ্রিয় মানুষ, তার উপর একটু পরিচ্ছন্নতার বাতিক

আছে—আমি অনেক খেটে অনেক যত্নে ঝকঝকে রেখেছি ফ্ল্যাটটিকে, আলোয় নতুন শেড আর সোফায় নতুন ঢাকনা পরিয়ে উজ্জ্বল রেখেছি বসার ঘর—কিন্তু সে-সব যেন চোখেই পড়েনি তার। অথচ আমার হাতের কোনো একটি ছোটো কাজও জয়ন্তর চোখ এড়ায় না, যদি কোনোদিন কানের দুল বদল করি তা পর্যন্ত লক্ষ করে সে, আমি যখন টীপট থেকে চা ঢালি তখন্ টের পাই তার দৃষ্টি আমার হাতের উপর।

আমার কি উচিত ছিল নয়নাংশুকে শরীর দিয়ে ভুলিয়ে রাখা? কিন্তু সেটাই কি হ'তো না সত্যিকার কদর্য আচরণ? কী করবো, ঐ রকমই হ'য়ে গিয়েছি আমি, ওকে আমি সুখী করতে চাই অথচ ওর শরীরটাকে আমি আর সুনজরে দেখি না, ও কখনো খালি গায়ে বাথরুম থেকে বেরোলে আমি চোখ ফিরিয়ে নিই, ওর সঙ্গে এখনো আমাকে এক ঘরে ঘুমোতে হচ্ছে তাতেই আমার দম আটকে আসে মাঝে-মাঝে। যদি ভালোবাসায় শরীর না-থাকতো—যদি ভালোবাসায় শরীর না-থাকতো, তাহলে কতই না সুখী হ'তে পারতাম আমি আর নয়নাংশু। সে কি ঐ দুটোকে আলাদা ক'রে নিয়ে সুখী থাকতে পারে না? আমি একটু আশা পেয়েছিলাম যেদিন ওর আপিশের অপর্ণা ঘোষকে ও চায়ে বলেছিলো; পার্ক স্ট্রীটের মেক-আপ, স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে, কথাবার্তায় চটপটে—নয়নাংশুর বিষয়ে ভাবটা বেশ গ'লে যাওয়া—কিন্তু না, ও বেশি দূর এগোবে না, ও বড্ড গুমরানো মানুষ, বাঁকাট্যারা, কিছুই ও সহজে নিতে পারে না, সহজভাবে সুখী হবার ক্ষমতা ওর নেই।

তোমরা কি শুনতে চাও যে আমি অংশুকে ভালোবাসি না—এখন আর বাসি না—আর জয়ন্তকে ভালোবাসি? না, ও-সব ভালোবাসাবাসি অংশুর মতো লোকদের বানানো ব্যাপার—একটা ধারণা, কল্পনা, হয়তো একটা আদর্শ যার কাছাকাছি পৌঁছতে পারে না কেউ, আর সেই আপশোষে তা নিয়ে শুধু কথা বলে। এমন মানুষ কে আছে যে অন্য একজনের সব ইচ্ছে মেটাতে পারে? অল্প বয়সে এক ধবনের মন থাকে, চনচনে চাঙ্গা থাকে অব্যবহৃত শরীর, হঠাৎ কোনো একজনের সব-কিছুই ভালো লেগে যায়। অন্য সব মানুষ থেকে আলাদা ক'রে নিই তাকে, মনে হয় তাকে পেলে আর-কিছু চাই না— কিন্তু যখন তাকে পাওয়া গেলো, ধরা যাক তারই সঙ্গে বিয়ে হ'লো যখন, তখন মোহাচ্ছন্ন ভাবটা এক গ্রীষ্মেই ঝ'রে পড়ে, এক বর্ষার জলেই ধুয়ে যায়। তারপর থাকে স্বার্থ, থাকে একত্র বসবাসের ফলে মমতা, থাকে অভ্যাস, পুরোনো চটিজুতোর আরাম—আর থাকে শরীর। কিন্তু শরীরও কত সহজে ক্লান্ত হয় বিমুখ হয়, কত সহজে অন্য সুখের স্বপ্ন দ্যাখে—যদি না কারো বোকা হ'য়ে জন্মাবার মতো সৌভাগ্য হয়, কিংবা চোখে থাকে এমন ঠুলি যাতে সামনের মানুষটিকে ছাড়া আর-কিছুই সে দেখতে পায় না, জয়ন্ত আমাকে যত কথা বলেছে, তারমধ্যে 'ভালোবাসা' কথাটা একবারও উচ্চাবণ কবেনি—আমি সেজন্য কৃতজ্ঞ তার কাছে; এদিকে অংশু আমাকে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে পাগল ক'রে দিয়েছে আমি তাকে 'ভালোবাসি' কিনা তা জানার জন্য।

ধবো আমি যদি ঝর্নার মতো হতাম—আমার কলেজের বন্ধু ঝর্না। বিয়ের পরে একদিন এলো ওর এঞ্জিনিয়ার স্বামীকে নিয়ে, যতক্ষণ ছিলো ওর স্বামীর মুখ থেকে প্রায় চোখ সরালো না, তিনি যে-কোনো একটা কথা বললে কলের পুতুলের মতো মাথা নাড়ে আর আমাদের সকলের দিকে এমনভাবে তাকায় যেন কোনো গভীরতম জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। ওর স্বামী বললেন, 'কালোবাজারিদের ধ'রে-ধ'রে গুলি ক'রে মারা উচিত।' তক্ষুনি ঝর্নার মাথা ন'ড়ে উঠলো—'নিশ্চয়ই। মারাই উচিত।' স্বামীটি বললেন, 'আমাদের দেশে, মশাই, গণতন্ত্র-ফনতন্ত্র চলবে না। ডিক্টেটবশিপ চাই।' সঙ্গে-সঙ্গে ঝর্না ব'লে উঠলো, 'তা কিন্তু সত্যি। ডিক্টেটরশিপ দবকার আমাদেব।' আবার : 'কী-সব পাগলের মতো কথা! বাংলায় কি আর ফিজিক্স কেমিস্ট্রী পড়ানো যায়।' নয়নাংশু বললো, 'কেন যাবে না? জাপানিরা তো তাদের ভাষাতেই পড়াচ্ছে।' 'ও-সব ছেড়ে দিন—আমাদের ইংরিজি ছাড়া চলবে না' 'তাই তো! ইংরিজি ছাড়া চলে কী করে?' ব'লে ঝর্না মাথা নেড়ে-নেড়ে আমাদের সকলের দিকে তাকালো। —এমনি সারাক্ষণ। আমি মনে-মনে বললুম, ঝর্নাটা এত বোকা

তা জানতাম না তো—তা একটু বেশি বয়সে বিয়ে হয়েছে, নতুন বিয়ের ঘোর চলছে এখনো, কেটে যাবে। কিন্তু পাঁচ বছর পরেও দেখলুম ঝর্না সেই একই আছে—মোটা হয়েছে এর মধ্যে, তিনটি বাচ্চার মা হয়েছে, স্বামীর গাড়িতে আসে আমার কাছে হঠাৎ-হঠাৎ, যতক্ষণ থাকে ঘুরে-ফিরে ওর স্বামীর কথাই বলে: 'উনি এই বলেন, এই করেন, এই ভালোবাসেন, উনি রোজ সন্ধেবেলা 'ড্রিঙ্ক' করেন আজকাল, রোববার দশটার আগে ঘুম থেকে ওঠেন না।' —সবই যেন ভারি জাঁক করার মতো, দশজনকে ডেকে শোনাবার মতো ব্যাপার। আমি মনে-মনে অনেক হেসেছি ঝর্নাকে নিয়ে, কিন্তু কে জানে ওর বোকামিটাই হয়তো ঠিক, হয়তো সে-সব বিয়েই সারাজীবন ঠিকমতো চলে যেখানে এক পক্ষ নিজেকে ছোটো আর অধীন ব'লে মেনে নেয় —আর সাধারণত ঐ পার্টটা মেয়েদেরই নেবার কথা, তাদেরই মানায় ওটা —আর জীবনে যদি সুখটাই লক্ষ হয় তাহ'লে সে-সুখ কেমন ক'রে পাওয়া গেলো তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী? বেশ আছে ঝর্না তার 'উনি'কে নিয়ে, কোনো জ্বালা-যন্ত্রণা জানবে না ওরা কোনোদিন, শেষ হিসেবে ওরাই কি জিতে গেলো না? —কিন্তু মুশকিল এই যে আমি ঝর্না নই, আর নয়নাংশুও যে-রকম আইডিয়াবাজ মানুষ তারও বড্ড পানসে লাগতো ঝর্নার মতো বৌ হ'লে।

একদিন কথা হচ্ছিলো জয়ন্তর পত্রিকা নিয়ে; নয়নাংশু বললো, 'আপনার ''বর্তমান'' এর ব্লকটা এবার বদলে নিন —দন্ত্য 'ন'টাকে মূর্ধণ্য 'ণ'-র মতো দেখায়। জয়ন্ত বললো, 'সত্যি কি কিছু এসে যায় তাতে?' 'ক-টাকাই বা খরচ—বদলে নেয়াই ভালো। একেবারে মলাটে তো—খারাপ দেখায়।' জয়ন্ত একটু বাঁকা হেসে সিগারেট ধরালো, নয়নাংশু আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে আবার বললে, 'আর একটা কথা ; আপনার পত্রিকায় ''কুৎসিত'' কথাটা প্রায়ই ভুল ছাপা হয়—খণ্ড ত দিয়ে, আর 'হাসপাতাল'-এ থাকে চন্দ্রবিন্দু। এগুলিও ঠিক ক'রে নিলে পারেন।' এর উত্তরে কিছু বলার আগেই আমি বললুম, 'কেন, 'কুৎসিত' তো খণ্ড ত দিয়েই লেখে।' 'প্রথমটা— পরেরটা নয়।' এবারে জয়ন্ত মৃদু হেসে বললো, 'আমি কিন্তু বরাবর ঐ রকমই লিখি—দুটো খণ্ড ত দিয়ে।' 'আরো অনেকে তা-ই লেখেন বটে, কিন্তু ভুলটা ভুলই।' 'ভুল কেন?' 'ওটা খাঁটি সংস্কৃত শব্দ, সংস্কৃত বানানেই লিখতে হবে।' 'না লিখলে ক্ষতি কী? দুটো খণ্ড ত দিয়ে ''কুৎসিত'' লিখলে অর্থটা কি বোঝা যাবে না? 'তাহলে কি আপনি বলছেন শুদ্ধ আর অশুদ্ধ ব'লে কিছু নেই?' 'আপনার মতে আছে, কিন্তু আমার মতটা অন্য রকম। আমি তো বলি হাঁচি-টিকটিকির মতো বানানও একটা কুসংস্কার।' 'কিন্তু বাংলা ভাষা কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়—আপনি আমি যা খুশি তা-ই করতে পারি না তা নিয়ে।' এর উত্তরে জয়ন্ত বললো, 'দেখুন মশাই, আমি খেটে খাই, প্রতি সপ্তাহে পনেরো কলম ক'রে লিখতে হয় আমাকে, বানান নিয়ে অত মাথা ঘামালে আমার চলে না। ও-সব আপনাদের মতো বাবুদের বিলাসিতা।' আমি দেখলাম নয়নাংশুর মুখটা লাল হ'য়ে উঠলো, 'আপনারা বসুন আমার একটু কাজ আছে' ব'লে শোবার ঘরে চ'লে গেলো।

ঝগড়াঝাঁটি বিচ্ছিরি লাগে আমার, নয়নাংশুর মেজাজ খারাপ দেখলে তাই চুপ ক'রে থাকি, কিন্তু, সে-রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে আমি কথা-না-বলে পারলাম না। 'তখন ও-রকম হঠাৎ উঠে গেলে কেন তুমি?' 'আমার ভালো লাগছিলো না ওখানে ব'সে থাকতে।' 'তাই ব'লে অভদ্রতা করবে?' 'কেন, আমি না-থাকাতে জয়ন্তবাবুর কোনো অসুবিধে হচ্ছিলো?' কথাটাকে সে কোনদিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে তা না-বোঝার ভান ক'রে আমি বললাম, 'ভারি তো একটা বানান নিয়ে কথা, তা-ই অত রেগে যাবে! তুমি কি ছেলেমানুষ?' 'তোমাদের কাছে বানান ব্যাপারটা হালকা হ'তে পারে, আমার কাছে সাংঘাতিক জরুরী।' যে-ভাবে ও 'তোমাদের' বললো সেটা আমার পছন্দ হ'লো না, কিন্তু আমি ধৈর্য ধরে বললাম, 'বেশ তো, তুমি তো আর বানান ভুল করছো না—তাহ'লেই হ'লো। অন্যদের উপর মাস্টারি করার তোমার কী দরকার।' 'তাই তো! কোনো দরকার নেই।' —নয়নাংশু চেয়ার ছেড়ে উঠে সরু মেঝেতে পাইচারি করতে লাগলো, 'কিছুতেই কিছু এসে যায় না—ছাপার ভুল, বানান ভুল, কুৎসিত বাংলা—''মেহনতি জনতা'' ''মজদুরি সংগ্রাম''—এমনি

আরো কত কী— কেউ কোনো ভুল দেখিয়ে দিলে তা মানবে না পর্যন্ত—হাঃ!' 'কিন্তু তুমিই জয়ন্ত রায়কে "কর্মবীর" বলে আকাশে তুলেছিলে—তোলোনি? তুমিই এই "বর্তমান"-এ অনেক টাকার বিজ্ঞাপন দিয়েছো —দাওনি?' 'তখনও আমি পড়িনি পত্রিকাটা—ওঁর কথা শুনে মনে হ'লো ওঁকে আমার সাহায্য করা উচিত।' 'সাহায্য? তার মানে দয়া? তার মানে বিজ্ঞাপনদাতাদের টাকা নিয়ে তুমি ছিনিমিনি খেলো।' 'যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বোলো না তো!' নয়নাংশুর চোখ লাল হ'য়ে উঠলো, মাথার চুল টানতে টানতে আবার বললো, 'এদিকে মতামতেরও কোনো মাথামুণ্ডু নেই—আজ কংগ্রেস, কাল কম্যুনিস্ট, পর্শু স্বতন্ত্র পার্টি, যখন যেদিকে হাওয়া দিচ্ছে!' এবার আমিও গলা চড়িয়ে বললাম, 'তুমি এখন খুঁজে খুঁজে দোষ ধরছো জয়ন্তবাবুর, কেন বলো তো? হয়েছে কী?' নয়নাংশু তার নিজের ভাবনার জের টেনে বললো, 'কাগজের কাটতিটাই আসল কথা। কী ক'রে দুটো পয়সা বেশি আসবে তা ছাড়া আর ভাবনা নেই। বানান ভুলেও কাগজ কেটে যাবে, অতএব থাক বানান ভুল। কোনো মিথ্যে খবর ছাপালে যদি বেশি বিক্রি হয়, তাহ'লে মিথ্যে খবরই ছাপা হোক। একটা সাধারণ বিবেক পর্যন্ত নেই!' 'রেখে দাও তোমার বিবেক!' আমার রক্ত চ'ড়ে গেলো, সে মুহূর্তে যা মুখে এলো তাই বলতে লাগলাম —'আর তুমি যে ডান হাতে বিজ্ঞাপন দিয়ে বাঁ হাতে নিজের লেখাটি চালিয়ে যাও—সেটাকেই কি বিবেক বলে? উপুরি দুটো পয়সা কামিয়ে নিচ্ছো, এই তো?' 'তার মানে?' তীব্র ভঙ্গিতে আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালো নয়নাংশু। 'তার মানে? যে-সব কাগজে বিজ্ঞাপন দাও তাদের কাছ থেকে টাকা পাও না তুমি?' 'কখ্‌খনো না।' নয়নাংশুর গলা ছিঁড়ে চীৎকার বেরিয়ে এলো—'আমি লিখি, লেখার জন্য সকলেই টাকা পাচ্ছে আজকাল, এর সঙ্গে বিজ্ঞাপনের কোনো সম্পর্ক নেই!' 'তাও তো শুধু আজেবাজে তর্জমা করো—নিজে কিছু লিখতে পারো না?' আমার মুখ থেকে কথাটা বেরোনোমাত্র ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো নয়নাংশু, জোরে-জোরে তার নিশ্বাস পড়লো কয়েকবার, তারপর হঠাৎ দেখলাম তার মুখটা ভেঙে-চুরে দুমড়ে যাচ্ছে, দু-হাতে মুখ ঢেকে সে ধ্ব'সে পড়লো চেয়ারটার উপর, আমি তার ফুঁপিয়ে ওঠা কান্নার শব্দ শুনলাম।

তখন বোধহয় ফেব্রুয়ারি মাস, জয়ন্তর সঙ্গে মাস দুই আগে চেনা হয়েছে আমাদের—তখনও তাকে 'মাতাল' নাম দিয়ে তাড়িয়ে দেবার সুযোগ পায়নি অংশু, তখনও আমি আমার মনের চেহারা দেখতে পাইনি, আমার ভালো লাগছে জয়ন্তকে, কিন্তু বুঝিনি কোন পথে এগোচ্ছি, সে যে দিনে-দিনে আমার আরো বেশি ভক্ত হ'য়ে পড়ছে এইটে বেশ উপভোগ করছি মনে মনে, জীবনে একটা নতুন ধরনের স্বাদ পাচ্ছি যাতে আমার লাভ আছে, কিন্তু অন্য কারো কোনো ক্ষতি নেই। এ-ই আমি ভাবছিলুম তখন, কিন্তু সে রাত্রে নয়নাংশুর সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে আমার মনের একটা লুকানো কোণে হঠাৎ আলো পড়লো। যুক্তির দিক থেকে তথ্যের দিক থেকে নয়নাংশু হয়তো ঠিকই বলেছিলো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই—কিন্তু সে যে ঠিক বলেছিলো সেটাই আমি সইতে পারছিলাম না, আমার মনে হচ্ছিলো তার বিদ্যে বেশি ব'লে, টাকা একটু বেশি ব'লে, আর এ-মুহূর্তে জয়ন্তর উপকার করবার একটা সুযোগ তার আছে বলে, সে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করছে জয়ন্তকে; একজন মানুষ—যার জীবনটা তেমন সুখের নয়, স্ত্রী নেহাৎ বেচারাগোছের জীব, তার উপর অসুস্থ (আলাপ হবার কয়েকদিনের মধ্যেই এই খবরগুলি সে জানিয়ে দিয়েছিলো আমাদের), যে কোনো বাঁধা চাকরি করে না, দশ হাতে যুদ্ধ ক'রে স্বাধীনভাবে টিকে আছে এই সংসারে—এইরকম একজন মানুষের প্রতি নয়নাংশুর অবহেলার ভঙ্গিতে আমি মর্মান্তিক রেগে গিয়েছিলুম। কিন্তু 'অবহেলিত মানুষটি' যদি জয়ন্ত না-হ'য়ে অন্য কেউ হ'তো? না—আমার রক্তকণিকা নেচে উঠে জবাব দেয়—জয়ন্ত ব'লেই, জয়ন্ত ব'লেই, জয়ন্ত ব'লেই।

সে সময়ে আমি কল্পনাও করিনি যে এর কোনো ফলাফল হ'তে পারে, আমি যে, একজন পুরুষকে 'জয়' করেছি শুধু এটুকু ভেবেই খুশী ছিলুম মনে-মনে—ভাবিনি এর কোনো প্রতিদান দিতে হবে কখনো। অংশুর বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে আমার ভাবভঙ্গি অনেক বদলে গিয়েছে

ততদিনে—বেলেঘাটার 'ভালো বৌ'-টিকে প্রায় করুণার চোখে দেখছি, কোনো পুরুষকে আমার প্রতি আকৃষ্ট বুঝলে সেটা উপভোগ করি—উপভোগ করাতে কোনো দোষ আছে ব'লেও ভাবি না; আর নানা জায়গায় নানা মানুষ দেখে এটাও বুঝেছি যে এমন কোনো বিবাহিত মেয়ে নেই একটি অনুগত পুরুষ পেলে যার ভালো না লাগে, নির্দোষ নির্বিষ কোনো ভক্ত পুরুষ। কিন্তু হঠাৎ সেদিন বুঝেছিলাম যে অংশু এতে আহত হচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে, নিজের অজান্তেই, অংশুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা যেন ক'মে গিয়েছিলো, মনে হয়েছিলো ও ভণ্ড, কপট, আমার যে-'ব্যক্তিত্ব' নিয়ে অত বোলচাল ওর সেটা সত্যি কখনো প্রকাশ পেলে ওর সহ্য হয় না।

বিশ্রী লেগেছিলো সেদিন, নয়নাংশু যখন কেঁদে ফেললো। আমি ভুল বলেছিলাম, অন্যায় বলেছিলাম—অনুবাদক হিসেবে খানিকটা খ্যাতি আছে ওর, অনেকেই ওর লেখা চেয়ে পাঠায়, ওর নিজের লেখা গল্পও বেরোয় মাঝে-মাঝে, আপিশেও ওর সুনাম খুব, চটপট উন্নতি হয়েছে চাকরিতে—সবই জানি আমি। কিন্তু কথাগুলো আমি ইচ্ছে ক'রেই বলেছিলাম, যারে ওর আঁতে ঘা লাগে, ওর ধরনে যারা ভাবে না তারাই বোকা অথবা মূর্খ, ওর এই দম্ভ যাতে ভেঙে যায়। কিন্তু এই আঘাতে এতটা ভেঙে পড়বে তা আমি কল্পনাও করিনি—এর আগে ওকে কাঁদতে দেখিনি কখনো, একজন বয়স্ক পুরুষমানুষেব কান্নার সামনে অন্যদের যে কী-রকম অসহায় আর দুর্বল আর বিশ্রী লাগে তাও আমার ধারণা ছিল না। শুয়ে-শুয়ে ভারি মন খারাপ লাগলো আমার, অনেক রাত্রে উঠে ওর বিছানায় গেলাম—মেয়েদের হাতে ঐ এক বিশল্যকরণী আছে, আর তখনও আমি এই ধারণায় চলছি যে আমি অংশুকে 'ভালোবাসি'—তখনকার মতো শান্তি স্থাপিত হ'লো।

তুমি যে একটা বিপদের মুখ দাঁড়িয়েছো তা তো সেদিন বুঝেছিলে মালতী—কেন সাবধান হওনি? আমি কী করতে পারতাম, আমার হাতে তো কিছু ছিলো না। ছিলো না? এদিকে বলছো তুমি একজন স্বাধীন মন-সম্পন্ন মানুষ, অথচ সত্যিকার দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চাও তোমার স্বামীরই উপর? জয়ন্তকে আঁকড়ে থাকবে তুমি, আর অংশু তোমাকে বিপদ থেকে বাঁচাবে, এটা একটু বেশি আশা করা নয় কি? কিন্তু তা-ই তো করেছিলো অংশু, তাকে 'মাতাল' নাম দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলো। তুমি তাতে খুশী হয়েছিলে? আমার সুখ দুঃখে কী এসে যায় অংশুর—সে আজকাল কেমন হ'যে গেছে, কত দূরে ঠেলে দিয়েছে আমাকে, সে-কথা আমি কাকে বলি কাকে বোঝাই, কে বুঝবে আমার কথা?

সেই যে জয়ন্ত চ'লে গিয়েও ফিরে এলো, আর অংশু তাতে বাধা দিলে না আপত্তি করলে না, তখন থেকে ধ্বসে পড়তে লাগলো আমার বারো বছরের বিবাহিত জীবন। যেন একটা খেলা খেলছি অংশু আর আমি, রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ক'রে যাচ্ছি, যথাসম্ভব এড়িয়ে চলি পরস্পরকে, খুব ভদ্রভাবে কথা বলি, পারতপক্ষে কথা বলি না —তবু এক এক সময় হঠাৎ আগুন জ্ব'লে ওঠে, যে-কোনো তুচ্ছ কারণে বা অকারণে, কখনো বা বুন্নিরই সামনে, দুর্গামণির সামনে, বেরিয়ে আসে বুকের তলার লুকানো বিষ, গোপন আক্রোশ। পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলে অংশু, জয়ন্তর নাম করে না—যদি মাছের ঝোলে ঝাল বেশি হয় বা কোনো বই খুঁজে না পায়, তা'হলে সেই সুতো টেনে-টেনে অতিষ্ঠ ক'রে তোলে আমাকে, কিন্তু আমি তো জানি ওর মনের কথাটা কী, আমার মাথার শির ছিঁড়ে যায়, আমার গলা চ'ড়ে, আমি ওকে গালিগালাজ করি, ওর ঠোঁটের কোণ বেঁকে যায় কুৎসিত হয়ে, তার পর হঠাৎ বুক-চাপা স্তব্ধতা নামে বাড়িতে। —কুৎসিত, কর্কশ সে সব কলহ! এর আগে তবু শরীরে কিছু সান্ত্বনা ছিলো, কিন্তু হায়, সেই সম্বলটুকুও আর নেই আমাদের, সেই সময় থেকেই এমন হ'য়ে উঠলো যে অংশুর শরীরটাকে আমি সহ্য করতে পারি না। অংশু মাঝে মাঝে চেষ্টা করে না তা নয়—অতি কাতর করুণ সে-সব চেষ্টা, আমি ওকে রূঢ়ভাবে ফিরিয়ে দিই, কখনো হয়তো এমন হয় যে আমি সাড়াও দিই না স'রেও যাই না, অতি কষ্টে তৈরি করি নিজেকে, প্রাণপণে চেপে রাখি আমার বিতৃষ্ণা—আমার ভিতরটা যেন ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়, ঠাণ্ডা, পাথর, আমি নিজেই বুঝতে পারি যে আমি চোখ বুজে মিনিট গুনছি, আর হয়তো সেইজন্যেই

নয়নাংশুও নেতিয়ে যায় একটু পরেই, আর ব্যাপারটা চুকে যাওয়ামাত্র আমি হাঁপ ছেড়ে নিজের বিছানায় উঠে আসি। সব বুঝে—সব বুঝেও আমি কোনো সমাধানের কথা ভাবি না—আমি জানি কোনো সমাধান নেই এর; আমার পক্ষে জয়ন্তকে বলা, 'তুমি আর এসো না' বা অংশুকে বলা, 'এসো আমরা কলকাতা ছেড়ে চ'লে যাই—' এই সবই নাটুকে, অবাস্তব, কোনোটাই কোনো কাজের কথা নয়। তাছাড়া—কেনই বা জয়ন্তকে ছাড়বো আমি, যখন তারই জন্য আমার জীবনে যেন নতুন ক'রে জোয়ার এসেছে?

—আমি চেষ্টা করিনি তা নয়, যুদ্ধ করিনি তা নয়, কত রাত্রে মনে মনে বলেছি, 'আমি অংশুর কাছে ক্ষমা চাইবো, ওর পায়ে পড়বো; ও কষ্ট পাচ্ছে—কার দোষে জানি না—সেই কষ্ট আমি মুছে নেবো।' —কিন্তু তক্ষুনি অন্য একজনের চশমা-পরা চোখ ভেসে উঠেছে আমার সামনে, আর নয়নাংশু একটা বিন্দু হয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে, আমার মনের দরজা বন্ধ হ'য়ে গিয়ে আটকে দিয়েছে নয়নাংশুর পথ। তারপর ভেবেছি: আমি তো অংশুর সংসার দেখছি, তার মেয়েকে মানুষ করছি, বাজারের হিসেব লিখছি, ধোবাবাড়িতে কাপড় পাঠাচ্ছি—তার সুখের দিকে আরামের দিকে আমাব তো মনোযোগের অভাব নেই—এই সব-কিছুর মজুরী হিসেবে আমি এটুকু চাইতে পারি না যে আমি কোথাও কিছুটা ব্যক্তিগত তৃপ্তি খুঁজে নেবো। বিয়ের পরে আমরা তো বাবাকে ভুলে যাই না, দাদাকে ভুলে যাই না, যদি অন্য কোনো পুরুষ আমাকে এমন কিছু দিতে পারে যা স্বামী পারে না, বা দিতে চায় না, তাহ'লে কেন আকাশ ভেঙে পড়বে? আমি অন্যায় ভাবছি? আমার অধর্ম হচ্ছে? কিন্তু নয়নাংশু যে এই বাড়িটাকে বিষ ক'রে তুলেছে তা কি কেউ দেখছে না? মাঝে-মাঝে সাধারণত কোনো বিস্ফোরণের পরে—মাঝে-মাঝে এমন হয় সে কুঁকড়ে গুটিয়ে যায় নিজের মধ্যে, আপিশ থেকে দেরি ক'রে ফেরে, আমার সঙ্গে প্রায় চোখাচোখি করে না, বাড়ি থেকে খামকা বেরিয়ে যায়, সে আর আমি সহজভাবে কথাবার্তা বলি শুধু বুন্নি কাছাকাছি থাকলে—তাও আসলে সহজভাবে নয়, বাড়িতে তার গলার আওয়াজ বা এক-আধটু হাসি শোনা যায় শুধু তাব বন্ধুরা আসে যখন (এককালে তার উচ্চহাসি পাশেব তিনটে ফ্ল্যাট থেকে শোনা যেতো) —আর বন্ধুরাও বেশি আসে না আজকাল। আমি বুঝতে পারি জয়ন্তর উপর তারাও বিরূপ, এ-বাড়িতে সে অতটা জুড়েছে ব'লে তাকে হিংসে করছে অন্যেরা—আমি, একটা সুস্থ স্বাভাবিক মেয়ে, নয়নাংশুর মতো মন-গুমরোনো নই—আমার কি দম আটকে আসে না এই আবহাওয়ায়? আবার কখনো স্বাভাবিকভাবে দিন কাটে, মনে হয় যেন কোথাও কোনো গোলমাল নেই, কিন্তু আমরা দু-জনেই বুঝি সেই স্বাভাবিকতাও অস্বাভাবিক, বানানো, তার পিছনে আছে এত বেশি মানসিক শ্রম যে বেশিদিন সেটা বজায় রাখা অসম্ভব। সারা জগৎসংসারের উপর আমার রাগ হয় তখন—মনে হয় জয়ন্ত ছাড়া আমার কেউ নেই, আমার স্বামী আমাকে ত্যাগ করেছে, সে আমাকে ফিরে পাবার একটুও চেষ্টা করছে না, সে আমাকে ঠেলে দিচ্ছে—ঠেলে দিচ্ছে—এই যেখানে এখন আমি পৌঁচেছি, সেখানে। আমি হাজারবার বলবো যা হয়েছে তারই দোষে হয়েছে—তারই দোষে—অবিবেচনায়, অক্ষমতায়—কেন—কেন সে আমাকে ছিনিয়ে এনেছিলো নিরাপদ যৌথ পরিবার থেকে, ওর বন্ধুদের মধ্যে আমাকে টেনে এনেছিলো কেন, কেন সে আমাকে শিখিয়েছিলো যে 'ভালোবাসা'র উপরে সত্য নেই (যদিও কেউ জানে না, এই 'ভালোবাসা' ব্যাপারটা কী), কেন প্রথম থেকে সব বুঝেও—সে চুপ ক'রে ছিলো, প্রশ্রয় দিয়েছিলো, কেন কখনো জোর করেনি—শুধু মাঝে-মাঝে কথার ইস্কুরুপ চালিয়েছে আমার উপর—কেন সময় থাকতে থেঁতলে পিষে দেয়নি ব্যাপারটাকে, কেন—যখন অশান্তির ডিগ্রি চ'ড়ে যাচ্ছে—তখনও জয়ন্তর কাছে এক ধরনের 'ভালোত্বে'র ভড়ং বজায় রেখেছিলো। তার কাছে কি স্ত্রীর চাইতে বেশি হ'লো চক্ষুলজ্জা, সুখের চাইতে ভদ্রতা বড়ো হ'লো? তবে তো বলতে হয় আমার জন্যে ওর সত্যিকার দরদ নেই, আমি শুধু ওর শরীরের খিদে মেটাবার উপায়, শুধু আরামের যন্ত্র—আর সেটা বুঝে ফেলার পরেও আমাকে ওর লক্ষ্মী সীতা বৌ হ'য়ে কি থাকতেই হবে? না—আমি চাই প্রেম—সব অর্থে প্রেম—আমি চাই পূজা স্তুতি আনুগত্য, চাই

নিজেকে নিজের চেয়ে বড়ো ক'রে দেখতে—আমি তো নয়নাংশুর মতো বই পড়া ভাবুনে নই যে কতকগুলো ধারণার মোহে ফাঁকি দেবো অন্যকে আর নিজেকে? আমি কী করতে পারি—আমার কী দোষ—আমার জন্যে যে-মানুষটা পাগল হ'য়ে আছে তাকে আমি কেমন করে ফিরিয়ে দেবো, অতটা জোর একলা আমার কাছে কেন আশা করা হবে—আমি তো মানুষ, আমি তো মেয়ে, আমারও তো রক্তমাংসের শরীর। আর যদি বা আমারই দোষ হয়—না হয় মানছি আমারই দোষ, নয়নাংশু আমার ভালো ছাড়া কিছুই করতে চায়নি, মানছি সে আমাকে ভালোবাসে—অন্তত সে 'ভালোবাসা' বলতে যা বোঝে সেটা তার আছে আমার জন্য—কিন্তু তার ভালোবাসার ধরনটা আমার পছন্দ হয় না; মানছি এটা আমারই—কী বলে গিয়ে—বিশ্বাসঘাতকতা— যদিও ও-সব গালভরা বুলি শুনলে কার না হাসি পাবে আজকাল? বেশ, সব মানছি আমি, কিন্তু এর পর—এর পর কী? বিশ্বাসঘাতিনীকে শিক্ষা দিতে চাও, নয়নাংশু? বেশ তো, এসো আমার প্রাপ্য শাস্তি দাও আমাকে, আমি টু শব্দটি করবো না। শোনো নয়নাংশু—আমি ডাকছি তোমাকে, তোমাকে বলছি, উঠে এসো, তুমি তো বুঝেছো তোমার স্ত্রী অসতী, এখন তুমি যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারো, তাকে বের ক'রে দাও রাস্তায়, গলা টিপে মেরে ফ্যালো তাকে, বসিয়ে দাও ছোরা তার বুকের মধ্যে।—প্রতিশোধ নাও। প্রতিশোধ নাও, নয়নাংশু, প্রমাণ করো তোমার স্বামীত্ব। না—ও-সব আগডুম-বাগডুম বলে লাভ নেই, ও-রকম আর হয় না আজকাল! তাহ'লে কী হবে? ডিভোর্স? না—ও-সব বড্ড গোলমেলে ব্যাপার। আর তাছাড়া—বুন্নি আছে, বুন্নি, আমার বুন্নি, আমার সোনা! বুন্নিকে আমি ছাড়বো না, কিছুতেই না, ওর জন্য সব করবো আমি, নয়নাংশুর পা জড়িয়ে বলবো, 'আমাকে তাড়িয়ে দিয়ো না, শুধু থাকতে দাও এখানে—আর নয়তো আলাদা হয়ে যাবো বুন্নিকে নিয়ে, চাকরি ক'রে চালাবো; আমার গয়না আছে, আমি বি.এ. পাশ করেছিলাম—নয়নাংশু বেশি তেজ দেখালে আমিও জবাব দিতে পারি। শুধু বুন্নিকে আমার চাই, বুন্নিকে আমার চাই! কিন্তু ও যদি দিতে না চায়? কে জানে কী ভাবছে নয়নাংশু। আমি কি ওকে ডেকে তুলে বলবো, 'শোনো, আমি এই-এই করেছি, তুমি এখন কী করবে বলো।' ন্যাকামি কোরো না, মালতী, বোকামি কোরো না। না কি বলবো—'অংশু, তোমার বিখ্যাত "ভালোবাসা" বাজে, ঝুটা মাল, আসল হ'লো সংসার। তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে, আমরা স্বামী-স্ত্রী—এখনো আছি, এক বিছানায় শুতে হয় না, একসঙ্গে বেরোতে হয় না, বেশি কথাবার্তা বলার দরকার নেই—এমনি কেটে যাক না আমাদের সারা জীবন, যেমন ক'রে অসংখ্য মানুষের কেটে যায়।' তা কি সম্ভব? তা কি সম্ভব নয়? তাহ'লে? তাহ'লে কিছু ভাবনার নেই, কী এমন হয়েছে যা নিয়ে এত ভাবছো, দেখছো তো বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়েনি তোমার মাথার উপর, বজ্রপাত হয়নি, কাল সকালে সূর্য উঠবে—সব ঠিক আছে। চুপ ক'রে থাকো, কেটে যেতে দাও দিনের পর দিন—ঘটনাচক্রে কিছু একটা সমাধান হবেই, অথবা হবে না, ও-সব ভাগ্যের হাতে, সময়ের হাতে ছেড়ে দেয়াই ভালো। যদি নয়নাংশু এখন উঠে এসে জানতে চায় সে যা সন্দেহ করছে তা সত্য কিনা, যদি হাজারবার জিগেস করে আমি তা হ'লে হাজারবার বলবো—'ভগবান সাক্ষী, আমি বুন্নির মাথা ছুঁয়ে বলছি তুমি যা ভাবছো তা ভুল, তা মিথ্যে!' —তারপর ভোর হবে—আবার একটা দিন—দিনের পর দিন—যার সঙ্গে আমার শরীর মেলে না মন মেলে না তার সঙ্গে, লোক-দেখানোর জন্য তার সঙ্গে, শুকনো একটা কাঠামো আঁকড়ে একসঙ্গে—আরো কতকাল কত বছর বাঁচতে হবে—কেমন ক'রে বেঁচে থাকবো হাসবো কথা বলবো নিশ্বাস নেবো—হা ভগবান, কেন এই শাস্তি দিলে আমাকে!

চার

কোনো-কোনো কথা বাংলা ভাষায় বলা যায় না। বিদেশী গল্প অনুবাদ করার সময় বার-বার আমি থমকে গিয়েছি যখনই কেউ কাউকে বলেছে— 'I love you' 'Do you love me?' বাধ্য হয়ে লিখেছি, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি', 'তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?' —কিন্তু নিজের কানেই খাপছাড়া শুনিয়েছে, বানানো, কৃত্রিম—ওটা আমাদের কাছে বইয়ের ভাষা, ভাবনার ভাষা—মুখের নয়। আমরা অনেক কিছুই ভঙ্গি দিয়ে বোঝাই, 'গুড্ মর্নিং' না ব'লে একটু হাসি শুধু, আমাদের প্রেমের প্রকাশ চোখে-চোখে, হাতের ছোঁওয়ায়, সাধারণ কথার মধ্যে লুকিয়ে রাখা গভীরতর কথায়। আর যে-দেশে এখনো অসংখ্য লোক পাতানো বিয়ে করছে, আর সেই বিয়েটাকে মেনে নিচ্ছে অবশিষ্ট জীবনের মতো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব'লে, সে-দেশে 'তুমি কি আমাকে ভালোবাসা'র মতো উৎকট প্রশ্ন মুখে আনার উপলক্ষ ঘটে শুধু একমুঠো দুর্ভাগা মানুষের জীবনে।

আমি সেই দুর্ভাগাদের একজন, ঠিক ঐ প্রশ্নটি সম্প্রতি আমাকে কয়েকবার মুখে আনতে হয়েছে। কিন্তু বলবার ভাষা ঠিক খুঁজে পাইনি—এত শক্ত ওসব কথা বাংলায় বলা। 'মালতী, তুমি কি আমাকে আর ভালোবাসো না?' —বাজে, বিশ্রী, নাটুকে, কিন্তু ঢোঁক গিলে ঐ কথাগুলোই আমি মুখে এনেছিলাম বা ওরই কাছাকাছি কিছু—একবার নয়, অনেকবার। মালতী প্রথমে বলেছে, 'এ আবার কী-রকম বোকার মতো প্রশ্ন!' কিন্তু আমি যখন অনেকদূর পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গিয়েছি প্রশ্নটাকে তখন মালতী ঝাঁঝালো গলায় ব'লে উঠেছে 'হ্যাঁ, বাসি বাসি! হলো? যাও এবার নিজের কাজ কবো, আর গোয়েন্দার মতো জেরা করো না।'

হায় ভালোবাসা! যেন তা মুখেব কথার উপর নির্ভর করে—যেন তা চোখে ভেসে ওঠে না, ধরা পড়ে না গালের রঙে, হাতের নড়াচড়ায়, এমনকি পর্দা ঠেলে ঘরে ঢোকার ধরনে, নিচু হ'য়ে চা ঢেলে দেবার ভঙ্গিটুকুতে পর্যন্ত! তা আলোর মতো সহজ, রোদের মতো নির্ভুল—সেখানে কোনো তর্ক নেই, তা চিনে নিতে এক মুহূর্ত দেরি হয় না। এই কথাটাই আমি বলার চেষ্টা করেছিলাম মালতীকে অনেক কষ্টে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে—তুমি যদি সত্যি আমাকে ভালোবাসো আমি কেন তা অনুভব করি না? কেন করো না তা আমি কী ক'রে বলবো! ব্যস, এর উপর আর কথা নেই। একটা দেয়াল, বোবা দেয়াল, মাথা ঠুকলে শুধু মাথা ঠোকার প্রতিধ্বনি বেরোবে।

জয়ন্ত তখন মাসখানেক ধ'রে আসছে এ-বাড়িতে—ওরই মধ্যে কায়েমি হ'য়ে বসেছে—এক রাত্রে আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম। জয়ন্ত, মালতী, আমি—আমরা তিনজনে বাস্-এর জন্য দাঁড়িয়ে আছি—ভিড়ের জন্য দুটো বাস ছেড়ে দিতে হ'লো, আর-একটা এসে দাঁড়াতেই মালতী উঠে পড়লো তাড়াতাড়ি, তারপর জয়ন্ত, কিন্তু আমি হাতল ধরা মাত্র ছেড়ে দিলো বাস্টা, জয়ন্ত হাত নেড়ে কেমন একটু হাসলো আমার দিকে—আমি তক্ষুনি বুঝলাম ওটাই ওরা চেয়েছিলো, মালতী আমাকে ছেড়ে চ'লে গেলো জয়ন্তর সঙ্গে—মালতী আমাকে ছেড়ে চ'লে গেলো। আমি ছুটলাম সেই বাস্-এর পিছনে, কিন্তু প্রকাণ্ড দোতলা বাসটা মুহূর্তে হারিয়ে গেলো আমার চোখ থেকে। আমি স্বপ্নের মধ্যে বুক-ভাঙা একটা কষ্ট অনুভব করলাম যেন আমার সর্বস্ব হারিয়ে গেলো,—যেন আমার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড আর নেই, ওরকম একটা বিরাট ক্ষতির অনুভূতি আর কখনো হয়নি আমার—সেই কষ্ট নিয়েই জেগে উঠলাম অন্ধকারে। অন্ধের মতো হাত বাড়িয়ে দিলাম মালতীর দিকে (তখনও আমরা জোড়া খাটে শুচ্ছি) আমার হাত তাকে স্পর্শ করলো। তবু আমি আশ্বস্ত হ'তে পারলাম না, ঠেলা দিয়ে ডেকে বললাম, 'মালতী শোনো।' ঘুমের গলায় জবাব এলো, 'কী হয়েছে?' আমি বিছানায় উঠে ব'সে বললাম, 'আমি এইমাত্র স্বপ্ন দেখলাম জয়ন্তবাবু তোমাকে নিয়ে পালিয়ে গেছেন।' 'সে আবার কী!' আর-কিছু বললো না মালতী, আমি অন্ধকারে চোখ সরু করে তার চোখ দেখার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে উল্টো দিকে পাশ ফিরে বললে, 'ঘুমোও' তারপর আর তার সাড়াশব্দ পেলাম না, খানিকক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়লাম। জানি না মালতীর মনে আছে

কিনা, কিন্তু আমি এই স্বপ্নটা এখনো ভুলিনি, ভুলবো না কোনোদিন। এই স্বপ্নের কথা ভাবলে এখনো ভীষণ কষ্ট হয় আমার, এখনো মনে হয় আমার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড আর নেই, সে তুলনায় আজ কোনো কষ্টই পাচ্ছি না, আজ আর কিছু এসে যায় না কিছুতেই।

মালতী ভালোবাসে জয়ন্তকে, এই কথাটা ও নিজে বোঝার আগেই আমি বুঝেছিলাম। বুঝেছিলাম ওর চোখের দিকে তাকিয়ে, ও যখন জয়ন্তর দিকে তাকায় সেই তাকানোর দিকে তাকিয়ে। ভেজা-ভেজা চোখ, যেন দূরের কিছু দেখার চেষ্টায় ঈষৎ সংকুচিত, মাঝে-মাঝে আধো বুজে আসে যেন ঘুম পেয়েছে। ওর ঐ দৃষ্টি আমার চেনা; বিয়ের আগে, বিয়ের পরেও কয়েক মাস, ঠিক অমনি করেই আমার দিকে ও তাকাতো—বা আমার দিকে তাকালে ওর দৃষ্টি হ'য়ে যেতো ও-রকম—ঐরকমই সজল দেখাতো ওর দাঁত হাসতে গেলে বা কথা বলতে গেলে। স্পষ্ট—সব স্পষ্ট আমার কাছে, যেন প্রকাণ্ড ব্যানার দিয়েছে কাগজে, যেন আমার ঘরের দেয়ালে বিরাট হরফের প্ল্যাকার্ড আঁকা। কিন্তু মালতী নিজেকে দেখতে পায় না, তার নিজের চোখ অচেনা তার কাছে, তাই আমি প্রথম কিছুদিন ওকে লক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলাম—যেন নিশ্চিন্তে, যেন ব্যাপারটায় আমার কোনো অংশ নেই। কিন্তু আস্তে-আস্তে দেখলাম ওর চোখের সরলতা মুছে যাচ্ছে, দেখলাম সূক্ষ্ম রেখা মাঝে-মাঝে ওর কপালে, জয়ন্তর সঙ্গে কথা বলার সময় ঠোঁটের কোণ কেমন বেঁকে যায় একটু, আমার খাওয়া-দাওয়া জামাকাপড়ের দিকে হঠাৎ বড্ড বেশী মনোযোগী হয়ে উঠলো। এতদিন ও ভেবেছিলো ও শুধু জয়ন্তর পুজো নিচ্ছে, বিনিময়ে কিছুই দিচ্ছে না বা দিতে হবে না, কিন্তু এবারে ওর নিজের মনের চেহারা আর লুকোনো রইলো না ওর কাছে, আর তখন থেকেই শুরু হ'লো, চলতে লাগলো—এই ঝাউতলা রোডের দেয়ালের মধ্যে, এই সুন্দর ক'রে সাজানো ফ্ল্যাটে, দিনের পর দিন —একটা যুদ্ধ!

'ঠাণ্ডা' যুদ্ধ, ঘোষিত হয়নি, চোখে-চোখে যুদ্ধ, পা ফেলার যুদ্ধ, কথার তলে লুকিয়ে-থাকা কথার তীরন্দাজি। অনেক কথা আছে যা বলা যায় না—বাংলায় না, অন্য কোনো ভাষাতেও না—যা বলার জন্য অন্য কিছু বলতে হয় আমাদের, কিংবা যা বলা না-হলেও সবাই বুঝে নেয়। একবার এক ধোপা ভারি মুশকিল বাধিয়েছিলো; মালতীর দু-খানা সিল্কের শাড়ি নিয়ে আর ফেরত দিচ্ছে না সে—একমাস, দেড়মাস, প্রায় দু-মাস কেটে গেলো। মালতী দু-বার কেষ্টকে পাঠালো—একবার শোনা গেল জগাই ধোপা জ্বরে ভুগছে, আর একবার তার দেখা পাওয়া গেলো না। 'চাকর দিয়ে কি আর সব কাজ হয়! বাড়ির কর্তা একেবারে ন'ড়ে বসবে না—আর শাড়ি দুটো খোয়া গেলেই বা তার কী!' মালতীর এ-সব স্বগতোক্তি কয়েকবার কানে আসার পর বললুম, 'কেষ্টকেই আর-একবার পাঠিয়ে দ্যাখো না।' এবারে কেষ্ট ফিরে এসে বললো—কালই আসবে জগাই ধোপা, কিন্তু তার পরেও যখন দশ-বারোদিন কেটে গেলো তখন একদিন সন্ধেবেলা মালতী একটি বক্তৃতা দিলো ধোপাদের অসভ্যতা বিষয়ে—জয়ন্ত ছিলো, আরো অনেকে—কেমন নির্বিবাদে তারা কাপড় হারায়, ছেঁড়ে, আটকে রাখে, নিজেরা ব্যবহার করে, জমিয়ে রেখে পচিয়ে দেয়, ভালো জিনিশগুলো ভাড়া খাটায়, ইস্ত্রি করতে গিয়ে পুড়িয়ে ফ্যালে, অথচ পাওনা আদায়ের সময় একটা ফুটো পয়সা কম নেবে না—এ-সব কথা সাত কাহন হ'লো সেদিন, অন্যেরাও যোগ দিলো মাঝে-মাঝে, দেখা গেলো অনেকেই ধোপার অত্যাচারের ভুক্তভোগী। জয়ন্ত জিজ্ঞেস করলে, 'ব্যাটাচ্ছেলের নাম কী? যে আপনার শাড়ি নিয়ে ফেরত দিচ্ছে না?' 'জগাই।' 'জগাই ধোপা—কোথায় থাকে?' 'ঢাকুরেতে'। আর কিছু বললো না জয়ন্ত, অতক্ষণ ধ'রে ধোপাচর্চা শুনে বিরক্ত লাগছিলো আমার, এই সুযোগে কথা ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করলুম, 'আচ্ছা চণ্ডীদাসের রামী কি সত্যি ধোপানি ছিলো?'

পরের দিন ছিলো রোববার, বেলা প্রায় দুটো, আমরা একটু আগে খেয়ে উঠেছি, হঠাৎ শীত চ'লে গিয়ে গরম পড়েছে কলকাতায়, পাখা চলছে, জানালা বন্ধ, মালতী পাটি পেতে কয়েকটা পত্রিকা নিয়ে শুয়ে পড়েছে, আমি হেমিংওয়ের একটা গল্প তর্জমা করতে বসেছি, এমন সময় বসার ঘরে পায়ের শব্দ পাওয়া গেলো। প্রথমে মালতী, তারপর আমি উঠে এলুম। জয়ন্ত এসেছে, সঙ্গে

একটি কালোকেলো লোক যাকে আমি ঠিক চিনতে পারলুম না, কিন্তু অনুমানে বুঝলাম সে-ই জগাই ধোপা। জয়ন্ত বলল, 'মিসেস মুখার্জী, এই নিন আপনার শাড়ি। ঠিক আছে তো?' তারপর জগাইয়ের কাঁধে একটা গুঁতো দিয়ে বললে, 'দ্যাখ তোর সামনে কে!' মালতীর দিকে তাকিয়ে জগাই বিড়বিড় ক'রে কী বললো বোঝা গেলো না —বোঝার কোনো দরকার ছিলো না অবশ্য —আমি দেখলুম মালতী কেমন একদৃষ্টিতে জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে আছে, জয়ন্তর চোখ লাল, ঘামছে দরদর ক'রে—এক পলকে বুঝে নেওয়া যায় কত হাঙ্গামা ক'রে এই শাড়ি সে উদ্ধার করেছে, শুধু শাড়ি নয়, অপরাধী ধোপাকেও সশরীবে এনে উপস্থিত করেছে মালতীর কাছে। 'তাকিয়ে দ্যাখ কে এসেছে!' যেন রানীর সামনে চোর ধ'রে আনা হয়েছে বিচারের জন্য, মালতী যেন জগাই-ধোপার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী, যেন আশা করা হচ্ছে জগাই মালতীর পায়ে পড়ে হাঁউমাউ ক'রে কেঁদে উঠবে—আর মালতী, সেও দিব্যি রানীর পার্টের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে নিজেকে, যেন ধ'রে নিচ্ছে অধীন জয়ন্ত তাব জন্য না-করতে পারে এমন কাজ নেই, যেন ইচ্ছে কবলে এই ধোপার অস্তিত্ব-সুদ্ধ সে মুছে দিতে পাবে এখন—এই সবই আমি এক মুহূর্তে দেখে নিলাম, বুঝে নিলাম। মালতীর সেদিনকার চেহারাটা গাঁথা হ'য়ে আছে আমার মনে— তার পিঠেব চুল ছিলো খোলা, পরনে টুকটুকে লাল পাড়ের শাড়ি, পানের রঙে টুকটুকে ঠোঁট, দাঁড়িয়েছে একটি দয়া আর গর্ব মেশানো সুন্দর ভঙ্গিতে, আর তার চোখ—তার চোখ জয়ন্তর মুখ থেকে নড়ছে না, আর তাব গালে ছড়িয়ে পড়েছে এক গভীরতর আভা, তাব রক্ত চঞ্চল হ'য়ে সাবা মুখে আভা ছড়িয়ে দিচ্ছে—লাল, উজ্জ্বল, বিজয়ী।

আর-একদিন আপিশ থেকে ফিরে দেখি বুন্নির জ্বর, জযন্ত তার মাথা টিপে দিচ্ছে শিয়রে ব'সে। আমি ঘরে ঢোকামাত্র মালতী বললো, 'স্কুল থেকেই জ্বর নিয়ে ফিবেছে, গলাব্যথা আছে—একবার কুমুদ ডাক্তাবকে ডেকে আনবে নাকি?' আমি বললুম, 'পাশেব ফ্ল্যাট থেকে ফোন ক'রে দাও না'। 'করেছিলুম--ডাক্তাব ছিলেন না তখন, আর অন্যেব বাড়ি থেকে বার-বার ফোন করা যায় না তো।' 'কুমুদ ডাক্তার সাতটার আগে চেম্বাবে আসেন না, আমি চট ক'রে স্নানটা সেবে নিই।' বাথরুম থেকে বেবিযে দেখি জয়ন্ত নেই। 'জযন্তবাবু কোথায় গেলেন?' এর উত্তরে মালতী বললো, 'তাঁর শুযে-ব'সে দিন কাটে না, তিনি কাজেব লোক, ডাক্তাব ডাকতে গেলেন।' ঠাণ্ডা গলায বললো এই কথাটা—রাগের ভাবে নয়, খুব সাধারণ সুবে। সে-মুহূর্তে কিছু-একটা ঘটে গেলো আমাব মধ্যে—অন্ধ বাগে দুঃখে আক্রোশে অন্ধ, আমার মগজে একটা বিষাক্ত পোকা বনবন ক'রে ঘুরতে লাগলো 'তুমি শুয়ে-ব'সে দিন কাটাও, তুমি শুয়ে-ব'সে দিন কাটাও!' আমি নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম, বড়োবাস্তায এসে হঠাৎ ট্রামে উঠে পড়লাম; নামলাম গড়িয়াহাটের মোড়ে, একটা চাযেব দোকানে ঢুকে চা খেলাম এক পেযালা, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ভিড় দেখলাম, হাঁটতে লাগলাম লেকের দিকে, ফিরে এলাম, সিগাবেট আর দেশলাই কিনলাম, লেকে এসে একটা বেঞ্চিতে ব'সে রইলাম খানিকক্ষণ, আবাব আস্তে-আস্তে গড়িযাহাটেব মোড়ে এসে বাড়িমুখো ট্রাম ধবলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে ক্লান্ত লাগছিলো আমার, অসম্ভব ক্লান্ত, বসার ঘরের দরজার কাছে দম নেবার জন্য দাঁড়ালাম একটু। ভিতব থেকে চাপা গলাব আওযাজ আসছে, কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না, শুধু গলার আওয়াজ--কোনো বিষাক্ত পোকাব উড়ে-চলা খসখসানির মতো, সূক্ষ্ম, খুব মৃদু, অস্পষ্ট মাঝে-মাঝে।

আমাকে দেখতে পেয়ে ওরা দুজনেই হঠাৎ চুপ ক'বে গেলো।

জয়ন্ত ফূর্তির সুরে বললো 'এই যে মশাই—হঠাৎ কোথায গিযেছিলেন আপনি। কিছু ভাববেন না—আমি একেবারে বাড়ি থেকে ধ'রে এনেছিলাম ডাক্তাবকে, বুন্নি ভালো আছে, ওষুধ খেযে ঘুমিয়ে পড়লো এইমাত্র।'

ভিতর থেকে অস্ফুট আওয়াজ এলো, 'মা!'

'এই যে আমি।' মালতী উঠে বুন্নির কাছে চ'লে গেলো, একটু পরে জয়ন্তও উঠলো, শোবার ঘবের দবজাব কাছে দাঁড়িয়ে বললো, 'মিসেস মুখার্জি, আমি চলি আজ। এগাবোটার সময় ওষুধটা

আর-একবার দেবেন কিন্তু।' আমার প্রায় ইচ্ছে হ'লো জয়ন্তকে আরো খানিকক্ষণ ধ'রে রাখি, প্রায় ভয় করলো ভাবতে যে এই ফ্ল্যাটটার মধ্যে মালতী আর আমি একা থাকবো সমস্ত রাত। ভাগ্যিশ বুন্নির আজ অসুখ—কোনো কথাবার্তা না-বলার একটা অছিলা আছে অন্তত। এর কয়েকদিন পরে মালতী আমাদের খাট দুটোকে আলাদা করে দিয়ে শোবার ঘরটা একটু অন্যভাবে সাজালো। আমি কোনো উচ্চবাচ্য করলুম না।

এটা সেই সময়, যখন পর্যন্ত আমি চেষ্টা করছি মালতীর সঙ্গে 'বোঝাপড়া' করতে। খুব কষ্টের কাজ, দু-পক্ষেই কষ্টের, কেউ কারো কথা বোঝে না, বলতে গিয়ে কথাগুলো ভেঙে যায়, বা ফেরত আসে অচল সিকি-আধুলির মতো। বোবা দেয়াল, ঠাণ্ডা দেয়াল, মাথা ঠুকলে শুধু মাথা ঠোকার প্রতিধ্বনি বেরোয়। বাঁধা বুলি মালতীর মুখে: 'এই যদি তোমার মনের কথা তাহ'লে জয়ন্তবাবুকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেই পারো। দাও না কেন?' 'দিই না এইজন্য যে তাতে আমার কোনো লাভ নেই, তাতে আমি ফিরে পাবো না তোমাকে, কেননা মানুষের মনই সব, ইচ্ছেটাই আসল, সেটাকে কাজে খাটানো গেলো কি গেলো না তা অবান্তর। ধরো জয়ন্তকে আমি তাড়িয়ে দিলুম, তারপর তুমি জয়ন্তর অভাবে আধমরা হ'য়ে থাকলে, তাতে আমার লাভ কী, বলো।' এ-সব কথা মুখে আনা যায় না, মনে-মনে গুছিয়ে চমৎকার ভাবা যায়, চিঠিতে লেখা যায় হয়তো। কিন্তু মুখে বলা যায় না—অন্তত নিজের স্ত্রীকে বলা যায় না, ব'লে কোনো লাভও নেই কেননা কথাটা এতই সত্য যে মালতীও পারবে না প্রতিবাদ করতে, আর পারবে না ব'লেই ওর আক্রোশ আরো বেড়ে যাবে আমার উপর। হয়তো শেষ পর্যন্ত না-শুনেই ব'লে উঠবে—যেমন মাঝে মাঝেই বলে: 'আসল কথা কী জানো? তুমি ভীষণ হিংসুক, ভীষণ স্বার্থপর, তুমি চাও সকলে সব সময় তোমার মন জুগিয়ে চলবে—আমি তো আমি, বুন্নির দিকেও কেউ একটু বেশি মনোযোগ দিলে তোমার তা ভালো লাগে না।'

ঐ আর-এক কথা তোমার মুখে, মালতী, হিংসে—যেন সেটা আমারই একচেটে সম্পত্তি বা স্বামীদের বা পুরুষজাতির কোনো বৈশিষ্ট্য—দাড়ি-গোঁফের মতো কিছু-একটা, যা তোমার বা মেয়েদের মধ্যে কখনোই বর্তাবে না। মনে আছে, বিয়ের পরের বছর দার্জিলিঙে বেড়াতে গিয়ে দরিয়ার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমাদের? পাঞ্জাবী মেয়ে, চোদ্দ বছরে আঠারোর মতো দেখায়, চমৎকার চেহারা, চমৎকার ইংরিজি বলে—আমাদের ফেরার দিন সে আমাদর সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত এলো, আমি তারই সঙ্গে কথা বললুম হাঁটতে-হাঁটতে, আমার ভালো লাগছিলো ওর সঙ্গটা, অনভিজ্ঞতাবশত বুঝতে পারিনি যে তুমি তাতে রেগে যাচ্ছো। আর সেইজন্যে ট্রেনে তুমি সারারাত কথা বললে না আমার সঙ্গে, তোমার মুখ আঁচ-প'ড়ে-যাওয়া উনুনের মতো কালো আর বোবা হ'য়ে রইলো, আমি সেই নির্জন কুপেতে অনেক সাধ্য-সাধনা ক'রেও তোমার রাগ ভাঙাতে পারলাম না—মনে আছে? অথচ কে এই দরিয়া যার জন্যে সেই ট্রেনের সুন্দর রাত্রিটাকে, আর দার্জিলিঙের সুন্দর স্মৃতিকে, তুমি বিষ ক'রে দিয়েছিলে? কী বলে একে? স্বামী হ'লে হিংসে, আর স্ত্রী হ'লে সুবুদ্ধি, তাই না? 'আমার কিছু এসে যায় না, কিন্তু পাছে তোমাকে কেউ কিছু খারাপ ভাবে'—তা-ই না?

একবার, তোমার বাবার এলাহাবাদে গিয়ে স্ট্রোক হ'লো, তুমি টেলিগ্রাম পেয়ে চ'লে গিয়েছো—আমি একা বাড়িতে, হঠাৎ সন্ধেবেলায় ফ্ল্যাটের দরজায় টোকা পড়লো। একটি মেয়ে ঘরে ঢুকে বললে 'আমাকে বোধহয় চিনতে পারছেন না—আমি নীলিমা।' আমার মনে পড়লো মেয়েটি তোমার কী-রকমের আত্মীয়, তোমার বাপের বাড়িতে কয়েকবার দেখেছিলাম তাকে, তুমি বলেছিলে বিয়ের পর থেকেই স্বামীর সঙ্গে গোলমাল চলছে তার, আরো যেন কী কী বলেছিলে ঠিক মনে পড়লো না! আমি আমতা-আমতা ক'রে বললুম, 'মালতী এখানে নেই—এলাহাবাদে গেছে—তা আপনার কি কোনো—' 'হ্যাঁ, আমার একটু দরকার ছিলো—বিশেষ দরকার—আমি একটা কাজে কলকাতায় এসেছিলাম। কালই বাবার কাছে গৌহাটিতে যাবো—আমার কলকাতায়

কোনো থাকার জায়গা নেই এখন, আজ রাতটা যদি—যদি এখানে থাকতে দেন আমাকে।' কথাটা শোনামাত্র আমার মনে প'ড়ে গেলো তুমি বলেছিলে নীলিমা 'খারাপ মেয়ে', বিয়ের আগে অনেক ছেলের মুণ্ডু চিবিয়েছে, কলেজের হস্টেল থেকে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো একবার, বিয়ের পরেও ও-রোগ সারেনি বলেই গোলমাল। তাছাড়া আমি ততদিনে কিছুটা অভিজ্ঞ স্বামী হয়েছি, আমার মনে হ'লো এই একা বাড়িতে একজন যুবতী মেয়েকে রাত কাটাতে দিলে তোমার সেটা ভালো লাগবে না। সবিনয়ে কিন্তু অল্প কথায় নীলিমাকে বিদায় দিয়েছিলুম সে-রাত্রে। তোমাকে লিখেওছিলুম খবরটা—উত্তরে তুমি পর-পর তিনখানা চিঠি লিখেছিলে আমাকে, নীলিমা যদি আবার আসে ওর সঙ্গে বেশি মেশামেশি যেন না করি, আর কিছুতেই যেন ওকে থাকতে না দিই বাড়িতে (আন্ডারলাইন ক'রে দিয়েছিলে), 'আমার নিজের জন্য বলছি না, কিন্তু পাড়ার লোকেরা ভুল বুঝতে পারে, আমার বাপের বাড়িতে একটা কথা উঠলে বিশ্রী হবে, তোমাকে কেউ এতটুকু খারাপ ভাবলে আমার তা সহ্য হবে না বোঝো তো।' —আমার হিতৈষী তুমি মালতী, হিংসুক নও, সন্দিহান নও—এও আমাকে মেনে নিতে হবে যেহেতু আমি পুরুষ আর তুমি স্ত্রীলোক। কিন্তু আমি জানি ঘটনাটা যদি উল্টো হ'তো, যদি আমি থাকতুম এলাহাবাদে আর আমার কোনো আত্মীয় বা বন্ধু নিরুপায় হ'য়ে একটা রাত কাটাতে চাইতো আমাদের ফ্ল্যাটে, তাহ'লে আমি এটাই আশা করতুম যে তুমি তাকে সিঁড়ি দেখিয়ে দেবে না, আর তাতে তোমার 'নিন্দে' হ'তে পারে এই ভাবনাটা খেলতোই না আমার মাথায়। পরে আমার মাঝে-মাঝে মনে হয়েছে আমি সেদিন অন্যায় করেছিলাম, সত্যি হয়তো বিপন্ন ছিলো নীলিমা, আমি বেশি কথাও বলিনি তার সঙ্গে, এক পেয়ালা চা খেয়ে যেতেও বলিনি—আমার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলো তোমার ছায়া, মালতী, সেটাকে আমি ভয় পেয়েছিলাম। ও-রকম ব্যবহারের সঙ্গে আমার নিজের স্বভাবের মিল ছিলো না, যেহেতু আমি তোমার স্বামী, শুধু সেইজন্যেই ও-রকম করতে হয়েছিলো আমাকে।

মালতী, এটা তো মানবে তোমার উপর আমার ছিলো অন্ধ বিশ্বাস, তাতে কোনো শর্ত ছিলো না সীমা ছিলো না, কিন্তু তুমি ছিলে নিজের অজান্তেই আমার বিষয়ে সতর্ক—যদি কোনোদিন কোনো মহিলার শাড়ির বা রান্নার বেশি প্রশংসা করেছি, তাহ'লেও তুমি বলেছো—'ও-রকম বাড়াবাড়ি কোরো না তো, লোকেরা ভাববে তুমি কোনোদিন কিছু দ্যাখোনি, খাওনি।' 'লোকেরা ভাববে—' ঐ এক বোকার মতো কথা তোমার মুখে, লোকেরা ভাববে! যেন লোকেরা কী ভাববে বা ভাববে না তা নিয়ে কোনো বুদ্ধিমান লোক কানাকড়িও পরোয়া করে কখনো! তাছাড়া পাছে আমাকে কেউ কিছু খারাপ ভাবে সে-বিষয়ে এতই যদি তুমি হুঁশিয়ার, তাহ'লে আজ কেন অর্পণা ঘোষের বিষয়ে তুমি এত সহনশীল? শুধু সহনশীল নয়, এমনকি একটু উৎসাহী। হয়তো ভাবছো আমি কোনোমতে যদি অর্পণার সঙ্গে জড়িয়ে যাই, তা'হলে আমার হাত থেকে পুরোপুরি নিস্তার পাও তুমি, আমার বিরুদ্ধে একটা অস্ত্র তোমার হাতে আসে, নিজের একটা নৈতিক সমর্থনও খুঁজে পাও। কিন্তু না, মালতী, তোমার এই আশা আমি মেটাবো না—তুমি তা চাও ব'লেই আমি সে রকম কিছু ঘটতে দেবো না, আমার জমিয়ে-রাখা রাগ আর কষ্টের ছায়া ফেলে-ফেলে তোমার জীবন আমি কালো ক'রে দেবো।

কিংবা হয়তো ভুল ভাবছি, হয়তো ভালোবাসা ছাড়াও ঈর্ষা সম্ভব—অন্তত মেয়েদের মধ্যে। ধরো যদি একদিন ঘরে ঢুকে দ্যাখো, আমি অর্পণার একটি হাত নিয়ে খেলা করছি, তাহ'লে তুমি কি টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলবে না আমাকে? যে-টাকাটা তুমি হেলাফেলা ক'রে রাস্তায় ফেলে দিলে সেটাই অন্য কেউ কুড়িয়ে নিলে তোমার সইবে না, হয়তো এমনি ক'রেই ভগবান তোমাকে তৈরি করেছেন। কিন্তু আমি একদিন ও-রকম অবস্থায় জয়ন্তকে দেখে ফেলেছিলাম তোমার সঙ্গে, তখন তুমি ভাবোনি প্রতিবেশীরা কী বলবে বা বলবে না, তোমার বাপের বাড়িতে কী-কথা উঠবে বা উঠবে না, ও-সব ভাবনা তুমিও ভুলে গেছো সম্প্রতি। তুমি ঠাণ্ডা গলায় বলেছিলে, আমি ভুল দেখেছি। আর তোমার কথাই সত্য ব'লে আমাকে মেনে নিতে হ'লো যেহেতু তুমি স্ত্রীলোক, আর যেহেতু আমি বেশি কিছু বললে 'জেলাস হাসবেন্ড' নামক ঘৃণ্য আর হাস্যকর জীবে

পরিণত হ'য়ে যাবো।

—বিয়ে! কী জটিল, কঠিন, প্রয়োজনীয়, সাংঘাতিক মজবুত একটা ব্যাপার, আর কী ঠুনকো! দু-জন মানুষ সারা জীবন একসঙ্গে থাকবে—পাঁচ, দশ, পনেরো বছর নয়, সারা জীবন—এর চেয়ে ভয়ংকর জুলুম, এর চেয়ে অমানুষিক আদর্শ, আর কী হ'তে পারে? সন্তানের সঙ্গে সারা জীবন একত্র থাকি না আমরা, বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন বন্ধু বেছে নিই, কিন্তু আশা করা হয় দাবি করা হয় যে একবার যারা স্বামী-স্ত্রী হ'লো তারা চিরকাল তা-ই থাকবে। এই অস্বাভাবিক অবস্থাটা সহ্য করা যায় এটাকে ঈশ্বরের বিধান ব'লে মেনে নিলে, আমাদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখলে। কিংবা যদি বিয়েটাকে শুধু একটা নিয়মমাফিক পোশাকি গোয়াল ব'লে ধ'রে নিয়ে, দূরে কাছে ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা থাকে দু-জনেরই। কিন্তু যদি কেউ বিয়ে ক'রে সুখী হতে চায়—যেমন আমি চেয়েছিলাম; যদি কেউ ভাবে একটিমাত্র স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে প্রণয় সম্বন্ধ আজীবন বজায় রাখবে—যেমন আমি ভেবেছিলাম; যদি কেউ বিয়ের মধ্যে মিশিয়ে দেয় 'হৃদয়' নামক ভীষণ কল্পনা, মারাত্মক বিষ—যেমন আমি দিয়েছিলাম, তা'হলে, কোনো-না-কোনো সময়ে, হয় বাইরের কোনো ঘটনার, নয়তো নিজের কোনো পরিবর্তনের ফলে, আর নয়তো নেহাতই সময়ের শত্রুতায় তাকে হ'তেই হবে ব্যর্থ, হতাশ, উচ্ছিন্ন, যেমন আজকে আমি এই রাত্রে এই বিছানায়, নিঃসঙ্গতায়, অন্ধকারে।

স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ নিয়ে আগে অনেক কথা হ'তো তোমার সঙ্গে আমার। তুমি সব সময় বলেছো—মেয়েরা উৎপীড়িত, নির্যাতিত, স্বামী বিমুখ হ'লে এখনো তাদের দাঁড়াবার জায়গা নেই আমাদের সমাজে, তাদের তিলতম স্খলনেরও ক্ষমা নেই, কিন্তু পুরুষ স্বেচ্ছাচারী হ'লে কেউ দোষ ধরে না। কে না জানে মেয়েদের অবস্থা আমাদের দেশে সাধারণভাবে কত শোচনীয়, এখনো কত অকথ্য অত্যাচার হচ্ছে তাদের উপর, কিন্তু তুমি কখনো ভেবে দ্যাখোনি যে এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য যাঁরা যুদ্ধ করেছেন তাঁরা সকলেই পুরুষ, আর আজকের তুমি আমি আর আমাদের মতো অসংখ্য স্বামী-স্ত্রী যে-ধরনের জীবন কাটাচ্ছে, সেটা সম্ভব হয়েছে পুরুষেরই উদ্যোগে, পুরুষেরই চেষ্টায়। অন্য একটা কথা তুমি মানোনি কখনো, আমি বোঝাতে পারিনি তোমাকে—যে সমাজ যেহেতু পুরুষের দ্বারা শাসিত, তাই পুরুষের কাছেই দাবি করা হয় বিশেষ এক ধরনের উদারতা ও সৌজন্য—আশা করা হয় সে স্ত্রীর সব কথা বিশ্বাস করবে, কোনো ছলনা টের পেলেও চেপে যাবে সেটা—মেয়েদের দুর্বলতার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তারা পেয়েছে এক অসাধারণ সম্মান, সব সময়ই এই ভান আমরা চালিয়ে যাবো যে আমাদের স্ত্রীরা সমালোচনার অতীত। ভেবে দ্যাখো, নাটকে উপন্যাসে এটাই হয় যে স্বামী একনিষ্ঠ না-থাকলে স্ত্রীরা হন লেখকের ও পাঠকের করুণার পাত্রী, বা এমনকি ট্র্যাজিক নায়িকা—কিন্তু উল্টো যখন ঘটে, যখন যথেষ্ট কারণ নিয়েই স্ত্রীর প্রতি সন্দিহান হয় স্বামী, ঈর্ষাতুর হয়, তখন—প্রায় সব সময়ই—তাকে দেখানো হয় ঈষৎ হাস্যকরভাবে—সেই চিরাচরিত 'জেলাস হাস্‌বেন্ড,' যে-ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার চাইতে লজ্জার ব্যাপার পুরুষের পক্ষে আর-কিছু নেই। সেইজন্যই নীরব থাকতে হয় আমাদের—থাকতে হয়েছে আমাকে—নিজের সম্মান, স্ত্রীর সম্মান বজায় রাখার জন্য।

বলতে পারো, মালতী, কবে আমরা প্রথম বুঝেছিলাম আমাদের বিয়ে ভেঙে গেছে? মনে পড়ছে না? শোনো, আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। সেই যে জয়ন্ত একদিন মদ খেয়ে এসে তোমাকে আবোল তাবোল কী বললে, আমি তাকে হাতে ধ'রে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে ট্যাক্সিতে তুলে এলাম, ফিরে এসে তোমাকে বললাম আমি ওঁকে বলেছি আমাদের এখানে যেন আর না আসেন—সেদিন নয়, না, সেদিনও নয়, কিন্তু তারই কয়েকদিন পরে। ও-কথা আমি বলেছিলাম ঠিকই, কিন্তু যথেষ্ট জোরের গলায় বলিনি, মিনমিনে গলায় বলেছিলাম, 'আপনি আমাদের এখানে আর না-এলেই বোধহয় ভালো হয়—' এই রকম ছিলো আমার ভাষাটা, নরম শোনাবার জন্য একটা 'বোধহয়' জুড়ে দিয়েছিলাম মনে আছে—যদিও ব্যাপারটা আমার কুৎসিত লেগেছিলো, ফ্ল্যাটের দরজায় মাতাল

জয়ন্তকে দেখে রাগে আমার গা কাঁপছিলো, তবু সেই রাগটা প্রকাশ করতে পারিনি—এমনি আমার স্বভাব, আমার দুর্বলতা। তবু আমি মনে প্রাণে চেয়েছিলাম জয়ন্ত যেন সত্যি আর না আসে, কয়েকদিন পর্যন্ত এও আশা করেছিলাম হয়তো আমাদের পুরোনো জীবন ফিরে পাবো। কিন্তু দিনের পর দিন কাটে, আমি দেখতে পাই তুমি যেন ম'রে গিয়েছো, তোমার মুখ ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না, তোমার চলাফেরা পুতুলের মতো। ক্রমে আমার সন্দেহ হয় যে—এটা হয়তো ভালো হ'লো না, একজন অর্ধমৃত স্ত্রীলোক নিয়ে সত্যি তো কোনো লাভ নেই আমার। আমি বেশি কথা বলি না তোমার সঙ্গে, কেননা কিছু বলতে গেলেই কেমন একটা ঝাঁঝালো ব্যঙ্গের সুর ফুটে বেরোয় যেটাকে আমি চাপতে পারি না, অথচ চাই না যে কোনো মুখোমুখি বচসা হোক, বরং ভাবি যে এই মন-খারাপ নিয়ে নিজের মনের সঙ্গে মুখোমুখি কথাটাই হবে তোমার পক্ষে চিকিৎসা। (বোকার মতো, দাম্ভিকের মতো এই 'চিকিৎসা' কথাটাই আমি ভেবেছিলাম তখন, যেন তোমার কোনো অসুখ করেছে, আর ওষুধের প্রেস্ক্রিপশন আমি খুঁজে পেয়েছি!) কিন্তু, যত দিন কেটেছে, যতবার তোমার মুখের দিকে তোমার অজান্তে আমি তাকিয়েছি, তত আমার মনে হয়েছে এটা ভোরের আগেকার অন্ধকার নয়, বরং এক ঠাণ্ডা ধূসরতা, শীতের দিনে বৃষ্টি হলে যেমন হয় তেমনি, এই আকাশ চুঁইয়ে কখনো যদি রোদ্দুরের ফোঁটা ঝ'রে পড়ে তাও হবে রোগা, ফ্যাকাশে, উত্তাপহীন। তুমি জানো না কেমন তোমাকে দেখাতো সেই সময়ে—কী-রকম বিবর্ণ শীর্ণ, নিষ্প্রাণ—বিষণ্ণ নয়, বিষাদও সৌন্দর্য দেয়। কিন্তু তখন তোমাকে দেখে কেউ বলতো না তুমি দেখতে ভালো, তোমার মুখের গড়নও যেন বদলে গিয়েছিলো। আর তা-ই দেখে-দেখে অন্য একটা শিউরানি উঠ'লো আমার মনে; আমি অনুভব কবলাম তুমি কত কষ্ট পাচ্ছো, আমার মনে হ'লো জয়ন্তও এই রকমই কষ্ট পাচ্ছে—তারপর ভাবলাম তিনজন মানুষ দুঃখী হবার চাইতে শুধু একজন দুঃখী হওয়া কি ভালো নয়? তোমার ঐ আর্ত মুখ ছোরা বিঁধিয়ে দিচ্ছে আমার বুকে—সমবেদনার অর্থে নয়, অন্য কারো অভাবে তোমার যে দশা হয়েছে সেটা আমারও পক্ষে মৃত্যুর মতো; কিন্তু এই অবস্থার কোনো প্রতিকার যদি না-ই থাকে তাহ'লে অন্তত তোমার মুখে হাসি ফুটুকু, প্রাণ ফিরে আসুক এই যেখানে আমি আপিশ থেকে ফিরি, রাত্রে ঘুমোই। আমি লুব্ধ হলাম জয়ন্তকে এ বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে; মনে-মনে বললাম—এ-অবস্থা অসহ্য, এর পর ভালো-মন্দ যা-ই হোক, অন্তত এই অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে আসতে চাই।

হঠাৎ শীত ভেঙে গিয়ে বসন্তের হাওয়া দিলো, মেঘ কেটে গিয়ে মাধুরী ফুটলো আকাশে—সেই যেদিন মালতী আর আমি একসঙ্গে 'চণ্ডালিকা' দেখেছিলাম। পবিত্র সেই অশ্রু যা দু-চার ফোঁটা ঝ'রে পড়েছিলো আমার গাল বেয়ে, চণ্ডালিকার বেদনার গান শুনতে শুনতে; পবিত্র সেই অমানিতার বেদনা, যা আমার মনকে ধুয়ে-মুছে নির্মল করে দিয়েছিলো, যেন নতুন উৎসাহে ও যৌবনে ভ'রে তুলেছিলো আমাকে। উৎসাহ, যৌবন: তার উৎস তো প্রেম; আমি মুহূর্তের জন্যে বুঝেছিলাম যে বৃদ্ধ হ'লেই যৌবন হারাতে হয় না, যদি হৃদয়ে থাকে প্রেম, যেমন ছিলো রবীন্দ্রনাথের, যাঁর রচিত শব্দগুলি, বিন্দুর পর বিন্দু, তরঙ্গের পর তরঙ্গ, ঝ'রে পড়ছে আমার উপর, ব'য়ে যাচ্ছে আমার উপর দিয়ে, সুরের মধ্যে গ'লে গিয়ে, নাচিয়েদের চোখে মুখে প্রতিধ্বনি তুলে—সুস্বাদু, ঘুম-ভাঙানো, মনোহরণ আমার ভালোবাসার শক্তিকে পুনর্জীবিত ক'রে—যেন ঐ কবিতাকে ভালোবেসেই আমি জগৎকে ভালোবাসতে পারছি। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরে, ঘুম-ভাঙা মুহূর্তে, অন্ধকারে, যখন আমার এই সদ্য-ফিরে-পাওয়া ভালোবাসা মূর্ত হ'লো মালতীর জন্য আকাঙ্ক্ষায়, যখন আমি শরীরে মনে উদ্বেল হ'য়ে নিজেকে মেলাতে চাইলাম তার সঙ্গে, আর তুমি, মালতী, হঠাৎ শক্ত হ'য়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে মিলিয়ে গেলে আমার আকাশ-ছোঁয়া হাতের বাইরে, নিজেকে নামিয়ে আনলে তোমার নারীত্বের উচ্চ চূড়া থেকে একতাল মাংসের কর্দমে—আমার তখনকার সেই ব্যর্থতা, লজ্জা, অপমান—সে কথা কি কখনো কাউকে বলবার? আমার শরীরের এঞ্জিনে তখন ড্রাইভার ছিলো না—একটুখানি চ'লেই খানায় প'ড়ে গেলো, থেমে গেলো। আমি তখন জানলাম—যে ভাবে আমরা অভিধান

খুলে কোনো নতুন শব্দের অর্থ জেনে নিই, ঠিক তেমনি নিশ্চিতভাবে জানলাম—যে তুমি জয়ন্তকে ভাবছো, ভাবছিলে, জয়ন্ত ছাড়া আর-কিছুতেই কিছু এসে যায় না তোমার। তবু আমি আরো একটুক্ষণ শুয়ে থাকলাম তোমার পাশে, উঠে আসার মতো শক্তি ফিরে পাবার জন্য, আর তখন তোমার চুলের গন্ধ-মাখা বালিশটা আমার প্রিয় মনে হ'লো, তোমার প্রতি এমন কোনো ঘৃণা অনুভব করলাম না যাতে জেদ ক'রে নিজের মনে বলতে পারি 'জন্মের মতো এই শেষ!' মনে হ'লো হয়তো এর পরেও আবার ফিরে আসবো তোমার কাছে—আর সবচেয়ে মর্মান্তিক লজ্জা সেইটাই।

পরের দিন আপিশ থেকে ফিরে জয়ন্তকে দেখে আমি বেশি অবাক হলাম না, প্রায় খুশি হলাম—আমি যেন প্রায় ধ'রেই নিয়েছিলাম যে তার পালা এখনো ফুরোয়নি।

সে-রাত্রেও খাওয়ার পরে আমি লিখতে বসলাম (আজকাল প্রায় নিয়ম ক'রে লিখি আমি, তর্জমা করি, নিজেও কিছু লেখার চেষ্টা করি মাঝে-মাঝে—ছাপা হোক আর না-ই হোক—কিছু-একটা করার জন্যেই, যাতে ক্লান্তির চাপে ঘুমিয়ে পড়তে পারি, সেইজন্যেই), কিন্তু লেখার প্যাড খোলামাত্র সাদা কাগজের উপর তিনটে শব্দ, সাতটি অক্ষর দেখতে পেলাম—তারা তাকিয়ে রইলো আমার দিকে একশো চোখে, এক হাজার চোখে, আমার সামনে দেয়ালে নাচতে লাগলো অক্ষরগুলো, সীলিঙে চামচিকের মতো উড়ে বেড়াতে লাগলো। 'জয়ন্ত, ফিরে এসো।' আমার নিশ্বাস খুব দ্রুত পড়ছিলো, আস্তে আস্তে নিজেকে সামলে নিয়ে পাতাটি ছিঁড়ে ভাঁজ ক'রে রেখে দিলাম আমার দেরাজে, খামে ভ'রে, নানা দরকারি কাগজপত্রের তলায়। অনেকগুলো চিন্তা এক ঝাঁক ভিমরুলের মতো হুল ফুটিয়ে দিলো আমার মগজে: মালতী কি চিঠি লিখেছিলো জয়ন্তকে আর তা পেয়েই সে চলে এসেছিলো আজ? না—তাহ'লে এই কাগজটাকে এমন অসাবধানে ফেলে রাখতো না সে, আর এমন একটা জায়গায় যেখানে আমার চোখেপড়া নিশ্চিত। কাতর, করুণ, আশাহীন মালতী—এটা লেখার সময় নিজের উপর কোনো শাসন ছিলো না, তার সাংসারিক বুদ্ধি, তার মেয়েলি চতুরতা একেবারে কাজ করেনি ; ঐ তিনটি শব্দ, সাতটি মোটা হয়ে-যাওয়া অক্ষর, যার উপর বোঝাই যায় অনেকবার কলম বুলিয়েছিলো মালতী—কত কথা তারা ব'লে দিলো আমাকে, কত স্পষ্ট ক'রে, কেমন সংশয়াতীত প্রাঞ্জলতায়। 'জয়ন্ত, ফিরে এসো—' এ যেন এক বিষাক্ত কবিতা আমি যার গভীর থেকে আরো গভীরে তলিয়ে যাবো ধীরে ধীরে, কোনো গ্যালিলিওর দূরবীনে দেখা নিষ্ঠুর চাঁদ, যার অবয়ব অধ্যয়ন ক'রে কাটিয়ে দেবো বাকি জীবন। তা যা-ই হোক, মালতীর বিরুদ্ধে একটা অস্ত্র এলো আমার হাতে, আমি তাকে শাসাতে পারবো এবার, ভয় দেখাতে পারবো, অন্ততপক্ষে নিজেকে বসাতে পারবো বিচারকের আসনে, অন্তত আমার ফুটো-হ'য়ে-যাওয়া অহমিকাকে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো তার সামনে। দারুণ, দারুণ লোভ হ'লো তখুনি মালতীকে ডেকে ঐ কাগজটা দেখাতে—শুধু তার মুখের চেহারাটা কেমন হয় তা দেখার জন্য—মনের সবটুকু অবশিষ্ট শক্তি জড়ো ক'রে পিষে দিলুম সেই প্রলোভন। আপিশে যাবার সময় কাগজটা নিয়ে বেরিয়ে যাই (বুক-পকেটে, অতি সন্তর্পণে, যেন কোনো তাবিজ, কোনো গুপ্তমন্ত্র), ফিরে এসে আবার রেখে দিই দেরাজে—আপিশে কোনো ফাঁক পেলে বা বাড়িতে বেশি রাত্রে, খুলে দেখি, তাকিয়ে থাকি মাঝে-মাঝে: এমন ক'রে অনেকগুলো দিন কেটে গেলো, যে-দিনগুলিতে জয়ন্ত আর মালতী ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে, আর আমি তা দেখেও দেখছি না, যেহেতু আমার শেখা হ'য়ে গেছে এক জাদুমন্ত্র, যা দিয়ে আমি নিমেষে ওদের ধ্বংস করতে পারি। কিন্তু ওটা নিয়ে আমি কী করবো সে-বিষয়ে মনস্থির করতে পারি না; কখনো ভাবি হঠাৎ একদিন মালতীর হাতে দিয়ে বলবো, 'এই নাও তোমার প্রেমপত্র তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি' (শস্তা ঔপন্যাসিকেরা যাকে 'ক্রূর হাসি' বলেন সেই রকম কিছু-একটা মুখে ফুটিয়ে); কখনো ভাবি ওর বাবাকে পাঠিয়ে দেবো, সঙ্গে একটা বিস্তারিত চিঠি লিখে (কিন্তু চিঠি লেখাটা এত শক্ত কাজ ব'লে মনে হয় যে প্রায় তক্ষুনি সেটা সরিয়ে দিই মন থেকে); আমার মনে হয় যে সব চেয়ে ভালো কোনো সুযোগের অপেক্ষায় থাকা—একদিন যখন বচসা হবে (মাঝে-মাঝে হচ্ছে আজকাল), দু-পক্ষের মেজাজ সপ্তমে চড়বে, তখন হঠাৎ ওটা বের

ক'রে ছুঁড়ে দেবো ওর মুখের উপর—রঙের টেক্কার মতো, আলো জ্বলা শহরের উপর অতর্কিত বোমার মতো—হঠাৎ নিবে যাবে ওর মুখের আভা, গলার তেজ, ভেঙে পড়বে ওর কুযুক্তির দেয়াল—অবশেষে ওকে হারিয়ে দেবার তৃপ্তিটুকু অন্তত পাবো আমি। কিন্তু তারপর ভাবি: ধরো ও যদি লুটিয়ে পড়ে, যদি আমার পায়ে প'ড়ে ক্ষমা চায়, যদি বলে, 'আমি আর-কিছু চাই না, তুমি যা ইচ্ছে হয় করো, শুধু আমাকে থাকতে দাও এই বাড়িতে, বুন্নির কাছে—' তাতেই বা কী লাভ হবে আমার, আমি যা চাই তা কি ওতে ফিরে পাবো? তাছাড়া ওর চোখে জল দেখে, ওর মিনতি শুনে, আমিও যদি গ'লে যাই, যদি মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে কল্পনা করি যে আমরা আবার যদি ফিরে যেতে পারি অতীতে? না—প্রথমে আমি যাকে দিব্যাস্ত্র ভেবেছিলাম, আসলে তা খোলামকুচি, তা দিয়ে আমার চিন্তার স্রোতে আঁচড় কাটা যায় কিন্তু আর-কোনো কাজে তা লাগবে না। ওটাকে পকেটে নিয়ে ব'য়ে বেড়াতে-বেড়াতে ক্লান্ত হয়ে গেলাম একদিন।

কোথায় সেই কাগজটা এখন? সেই চরম সাক্ষী, মহার্ঘ দলিল, দুর্দান্ত প্রমাণ? কোথায় শেষ রেখেছিলাম তাও ঠিক মনে পড়ছে না। হয়তো অন্য কোনো দেরাজে সরিয়েয়েছিলাম, অগুনতি বাজে কাগজপত্রের মধ্যে—সেখানে হয়তো ধুলোয় আর আরশোলায় দিনে-দিনে ক্ষয় পাচ্ছে সেই জড় কাগজ, না কি মনের ভুলে আপিশে ফেলে এসেছি, না কি দৈবাৎ হারিয়ে গেছে? কিন্তু সেটাকে উদ্ধার করার আর কি কোনো প্রয়োজন আছে, যখন মালতী আর আমি হয়ে উঠেছি পরস্পরের চক্ষুশূল, হৃদয়ের শেল, যখন ঐ কাগজে সে যা লিখেছিলো তার হাজারগুণ বেশি বলছে তার প্রতিটি ব্যবহার, প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি, আর আমি—দুর্বল আমি!—প্রতিশোধের অন্য কোনো উপায় না-পেয়ে কথা দিয়ে তাকে আঘাত করছি যতদূর করা যায়?

জানো, মালতী, এখন আমার কী মনে হয়? তোমার কথা শুনে আমি কষ্ট পেয়েছিলাম সেজন্যে নয়, আমার কথা শুনে তুমি কষ্ট পেয়েছিলে সেজন্যেও নয়, সেগুলি হয়তো মুছে যেতো বা আমরাই পারতাম অতি সহজে মুছে দিতে—যদি অন্তত তোমার আমার শরীরের মধ্যে বন্ধুতা থাকতো! অন্তত কেন বলছি—শরীরটাই আসল, চরম, সর্বস্ব, ওটাই স্বামী-স্ত্রীর নির্ভর, বিয়ের নির্ভর—তারই জোরে এমন একটা অসম্ভব আশা করা হয় যে দু-জন-মানুষ বরাবর একসঙ্গে থাকবে। অথচ সেটা আর নেই আমাদের মধ্যে, তাই আমরা পরস্পরের অচেনা হ'য়ে গিয়েছি, পরস্পরের ভাষাও আর বুঝি না। মুশকিল এই যে আমি তোমাকে এখনো—কী বলবো —ধবা যাক 'ভালোবাসি—' আর এই কথাটায় যদি তোমার আপত্তি থাকে তাহ'লে বলবো 'কামনা করি—হ্যাঁ আমি চাই তোমাকে, ঠিক পুরোপুরি শারীরিক অর্থেই কামনা করি বলা যাক—কিন্তু তোমার শরীর আমাকে আর সাড়া দেয় না। সেখানে কারো কিছু করার নেই—না আমার, না তোমার, না 'চণ্ডালিকা' নাটকের, না নিবিড় অন্ধকার কোনো রাত্রির। আমি অন্ধকারেও বুঝেছি তোমার তাচ্ছিল্য—অবজ্ঞা—অনিচ্ছা; বুঝেছি তুমি দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছো শুধু—আর তা বোঝামাত্র আমিও হিম হ'য়ে গিয়েছি—হিম, দুর্বল, রিক্ত, অক্ষম। কী প্রহসন! কী অপমান! তবু আমি চেষ্টা করেছি, বারবার চেষ্টা করেছি যদি বা কোনো দৈবক্ষণে বন্ধ দরজা খুলে যায়—কিন্তু কিছুদিন পরেই দাঁড়িয়ে গেলো একটা দেয়াল, বোবা দেয়াল, ঠাণ্ডা দেয়াল, পাশাপাশি বিছানা দুটো জেলখানার দুটো কুঠুরি হ'য়ে উঠলো, পাশাপাশি দুই কয়েদিকে শিকলে বেঁধে রাখা হয়েছে। তখনই বুঝলাম—না, বুঝেছিলাম আগেই—তখন থেকে মেনে নিয়েছিলাম আমাদের বিয়ের ভিত ফেটে গেছে, এ-বাড়ি আর বেশিদিন টিকবে না।

—কিন্তু কী বলছি আমি, কী ভাবছি? কেমন করে শরীরের সঙ্গে শরীরের বন্ধুতা থাকবে, মন যদি স'রে দাঁড়ায়? শরীর—যত জ্বালা এই শরীর নিয়ে, অথচ ওটাকে না হ'লেও চলে না, ভগবানের এই এক আশ্চর্য আর নিষ্ঠুর বিধান যে আমাদের মন, বা আত্মা, যা-ই হোক না, যে চায় আকাশ, অসীম, অমৃত ইত্যাদি অনেক-কিছু—সেই মন যখন ভালোবাসে তখন তার যন্ত্র হিসেবে ভাষা হিসেবে উপায় হিসেবে বেছে নেয় এই শরীরটাকেই, এই ছোট্ট নোংরা বুড়ো-হওয়া ঘেন্নায় ভরা শরীরটা! কোথায় তবে সেই 'প্রেম', কবিরা যার কথা বলেন? আমরা বন্দী হ'য়ে আছি শরীরের মধ্যে; মনে-

মনে ধ্যান ক'রে, চোখে-চোখে ইশারা ক'রে, বা এমনকি ঠোঁটে-ঠোঁটে চুমো খেয়ে তৃপ্ত হ'তে পারি না আমরা, আমাদের নেমে আসতে হয় এক ঘন অন্ধকারে, জন্তুর গুহায়, উৎকট ব্যায়ামে, একলা মন কিছুতেই ভালোবাসতে পারে না, একলা মনে মনের তৃপ্তি নেই, একলা শরীরও শরীরকে পারে না সুখী করতে। অন্তত আমরা চোখে দেখতে চাই, কানে শুনতে চাই, কিন্তু চোখের জ্যোতি, গলার সুর, ঠোঁটের হাসি—তারও যোগানদার হ'লো মন, আমরা মন দিয়ে সুন্দর দেখি, মন দিয়ে কামনা করি, তারপর বার্তা ছড়িয়ে পড়ে শরীরে। আমরা কোনো নারীকে যখন 'চাই' যখন 'ভোগ করি,' আসলে দখল ক'রে নিতে চাই তার সমগ্র সত্তাকে, খুঁজি সেই একনজরের মধ্যে আমাদের সব স্বপ্ন—পড়া বইয়ের স্মৃতি, বাস্-এ দেখা চোখ, কোনো প্রিয় কোনারক-ভঙ্গি, কোনো অভিনেত্রীর কণ্ঠস্বর, কিংবা আমাদেরই অজান্তেই আমদের কামনার তাপে, সেই সবগুলি লক্ষণ মিলে যায় সেই নারীর মধ্যে—মুহূর্তের জন্য—কী চপল কী ভঙ্গুর সেই মুহূর্ত!—আর তারপরেই বুঝতে পারি আমাদের মন যা চায় আমাদের শরীর তা কিছুতেই গ্রাস করতে পারে না, অথচ শরীর ছাড়া কোনো উপায় নেই আমাদের। কী সংকট! কী অদ্ভুত সমস্যা! কিন্তু তবু এইটুকুই আমার ভাগ্য যে মালতী তার শরীর দিয়ে মিথ্যে বলেনি—মন দিয়ে, কথা দিয়ে, ব্যবহার দিয়ে, এমনকি হয়তো চোখ দিয়েও মিথ্যে বলেছে, কিন্তু তার শরীর সত্যবাদী—ভালোবাসার গর্ভ, আর আঁতুড়ঘর, আর সরাইখানা, আর শ্মশান, তার শরীর। মালতী, আমাকে নির্ভুল জবাব দিয়েছে তোমার শরীর, জয়ন্তকেও নির্ভুল জবাব দিয়েছে, আমি তোমাকে দোষ দিই না, তুমি সত্য আচরণ করেছো।

আবার বৃষ্টি, পাশে গ্যারেজের টিনের ছাদে ঝম্‌ঝম্‌, কত রাত্রে শুনেছি এই বৃষ্টির শব্দ, তখনও এই দুই খাট আলাদা হ'য়ে যায়নি, তখন এ-পাড়ায় বর্ষাকালে মশা হ'তো, বুন্নি তখনও তিন মাসের, বুন্নির জন্যই মশারি খাটাতো মালতী—মশারির ভিতরে এসে বিছানাকে আমার মনে হ'তো দুর্গ—একটা গুহা—ছোটো আঁটো ঘনিষ্ঠ সহজ, একটা গন্ধ পেতাম—শরীরের গন্ধ, চুলের গন্ধ, বুকের গন্ধ, তোমার বুকের দুধের গন্ধ পেতাম সেই বিছানায়—প্রচুর দুধ ছিলো তোমার, বুন্নির ঠোঁট বেয়ে উপচে পড়তো বিছানার চাদরে, ঘরে পাতা পুরোনো দইয়ের মতো সেই ঝাঁঝালো গন্ধটা আমার নেশার মতো লাগতো, আমি নিশ্বাসে তা শুষে নিয়েছি, আমি ঠোঁট দিয়ে ছুঁয়েছি তোমার বুকের সেই উষ্ণ প্রস্রবণ—সব কেমন ছোট আর ঘনিষ্ঠ আর সহজ ছিলো—সব ছিলে তুমি, মালতী, গুহা, দুর্গ, আশ্রয় আমার—সব কি আমার বোঝার ভুল, সব কি শুধু অসার কবিতা, পড়া-বইয়ের স্মৃতি, সব কি আমি মনে মনে বানিয়ে নিয়েছিলাম?

মালতী, তুমি কি শুনতে পেয়েছো আমার কথা—উঠে বসলে কেন? বিছানা থেকে নেমে এলে কেন জানালার ধারে? আবছা আমি দেখছি তোমাকে, আবছা সাদা, তোমার শরীর যেন মাংসের স্থূলত্ব হারিয়ে হালকা, স্বপ্নের মতো, বাইরের দিকে মুখ ক'রে তুমি দাঁড়িয়ে, বোজা তোমার চোখ আমার মনে হচ্ছে, ধুয়ে দিচ্ছে বৃষ্টি আর বাতাসে তোমার মুখ, তোমার পিঠের ভঙ্গিতে অপেক্ষা আমি দেখতে পাচ্ছি। এতক্ষণে বাইরে বোধহয় ভোর কিন্তু মেঘের জন্য আলো ফোটেনি, এসো এই স্তব্ধ সুন্দর গভীর মুহূর্তে আমরা আবার—সব ভুলে যাও, সব ভুল, এসো আবার এসো আবার—'মালতী'! আমি উঠে গিয়ে আস্তে হাত রাখলাম তার কাঁধে, আমার আঙুলের তলায় তার রক্তের তাপ, আমার নিশ্বাসে তার গন্ধ, তার পুরোনো গন্ধ। নিশ্বাসের সুরে আবার ডাকলাম, 'মালতী!' হঠাৎ থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো সে, ফিরে দাঁড়িয়ে আমার বুকের মধ্যে মুখ লুকালো, আমি তার মুখ তুলে ধ'রে গালে চুমো, চোখের জলে লোনা তার গাল, চোখে গলায় বুকের খাঁজে চুমো, চোখের জল বৃষ্টির ছাঁটে মিশে গেলো, বৃষ্টি আর বাতাস আমাদের ধুয়ে দিচ্ছে—হালকা, নরম স্নিগ্ধতায় ভরা, আমাদের বারো বছরের জীবন যেন ভোরের বাতাস, স্মৃতি ছড়িয়ে গন্ধ ছড়িয়ে ব'য়ে গেলো, বুকের শব্দে বুকের শব্দ, নিশ্বাসে নিশ্বাস, আমরা স্বামী-স্ত্রী—আশ্চর্য—সন্তান বড়ো হ'য়ে দূরে, বন্ধু আর বন্ধু নেই—শেষ পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী শুধু, এসো আমরা একসঙ্গে বাঁচি, বেঁচে উঠি আবার, ঐ দ্যাখো জীবন আমাদের অপেক্ষায়—রাত ভ'রে অপেক্ষায়—এসো তাকে তুলে

নিই আমরা, জড়িয়ে ধরি পরস্পরের মধ্যে—এসো—তোমার ঠোঁট দুটি ফুলের মতো খুলে গেলো এগিয়ে এলো, অন্ধকারে তোমার কান্না ভেজা নরম হাসি—না, কথা না, ক্ষমা চেয়ো না, মালতী, এসো—

আমি নিচু হ'য়ে তার খোলা ঠোঁটের উপর—কিন্তু আমার ঠোঁট কোনো সজলতার স্বাদ পেলো না, মালতী যেন বাতাসের মধ্যে বাতাস আর আমি বালিশটাকে কামড়ে চাদরের একটা কোণ মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে, আর আমার ঘুমের উপর স্বপ্নের উপর জেগে ওঠার উপর ছড়িয়ে আছে করুণাময় অন্ধকার, ঝ'রে পড়ছে করুণাময় বৃষ্টি। নামো, বৃষ্টি আরো তুমুল হ'য়ে, আরো ঘন হও, অন্ধকার—লুকিয়ে রাখো তাদের যারা জেগে উঠতে ভয় পাচ্ছে আজ, লুকিয়ে রাখো এই লজ্জা যে তারা এখনো একই ঘরে শুয়ে আছে। ভোর, দূরে স'রে যাও—আলো, আমাদের দয়া করো।

পাঁচ

ভোরের দিকে দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছিলো, উঠলো বেলায়। আর মেঘ নেই, ঝকঝকে রোদ্দুরের দিন।

চায়ের টেবিলে বসলো এসে দু'জনে। জানালা দিয়ে ট্যারচা রোদ টেবিলে, চায়ের পেয়ালাগুলো ঝকঝকে আর সাদা।

দুর্গামণি চা নিয়ে এলো। নয়নাংশু খবর-কাগজ খুললো।

—'আজ বড্ড বেলা হ'য়ে গেছে। দুর্গামণি, শিগগির বাজারে যাও।'

—'দ্য গোল দেখেছি মহা মস্তান হ'য়ে উঠেছে। আমার আজ আপিশ নেই। মহরমের ছুটি।'

('ওর আজ ছুটি। আমাকে কিছু করতে হবে আজ। কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে সারাদিন। আলমারি থেকে সব শাড়ি নামিয়ে আবার গোছাবো। দেয়ালে ঝুল। পাখায় ধুলো। রান্নাঘরে ঘষামাজা। বাথরুমে ঘষামাজা। ভেজা কাগজ ঘ'ষে-ঘ'ষে জানালার কাঁচ ঝকঝকে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব করাবো কেষ্টকে দিয়ে। নিজের হাতে করবো সব। সবচেয়ে ভালো হাতের কাজ, গতর খাটা। কিছু ভাবার ফুরসত নেই। মনের বালাই ঝেঁটিয়ে দূর। খিদে। ক্লান্তি। ঘুম। বস্তির ঝিয়েরা কখনো কি ভালোবাসা নিয়ে মাথা ঘামায়? মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘর মোছা, বাসন ধোয়া, কাপড় কাচা, সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত রোজ, তাব তলায় চাপা প'ড়ে যায় শাশুড়ির লাথি, স্বামীর হুংকার, ছেলেপুলের সংখ্যা ও অপমৃত্যু। সুখের সময় নেই, শোকের সময় নেই: পরম চিকিৎসক খাটুনি।')

—'এই আনাবসের জ্যামটা বেশ। চেখে দেখবে নাকি?'

—'না। আবার একটা ট্রেন-দুর্ঘটনা। কী যে হচ্ছে!'

—'কেমন শরৎকালের মতো হয়েছে আজ দিনটা।' মালতীর চোখ বাইরে থেকে ঘরে ফিরে এলো— বাতাবি-রঙের দেয়াল, আলমারিতে কাচের বাসন, কার যেন আঁকা সূর্যমুখী ফুলের ছবি। সব ঝকঝক করছে, সারা রাত বৃষ্টির পরে ঝকঝকে রোদ্দুরে।

—'তোমার আজ ছুটি?'

—'আমার আজ ছুটি।'

('আমার আজ ছুটি। মুশকিল। কী করি আজ বাড়ি ব'সে সারাদিন? মালতী। আর আমি। এক বাড়িতে একা বাড়িতে সারাদিন। কী করি? বিবাহবিচ্ছেদ? আদালত? ছোঃ! নাটুকেপনা। বাজে হৈ-চৈ। কিন্তু মালতী যদি চায়? চাইবে কি? সে-ই বা তাতে এমন কী পাবে যা এখন পাচ্ছে না! মোহ—কেটে যাবে। জয়ন্ত—কেটে পড়বে একদিন। তারও আছে স্ত্রী ছেলেপুলে সংসার। আর মালতীর আছে বুঝি বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়ি। আর—শেষ পর্যন্ত—কে কী বলবে সেই ভাবনা। আর আমি—কিন্তু না! এ সহ্য করা যায় না। আমি অপমানিত হয়েছি। মাসের পর মাস, দিনের

পর দিন—অসম্মান, অপমান, লাঞ্ছনা। আমি সহ্য করবো না। আমি প্রতিশোধ নেবো। ডিভোর্স। বুম্নিকে দেবো না। এক পয়সা খেসারত দেবো না। বুম্নিকে শেখাবো—তোমার মা খারাপ, তোমার মা-কে তুমি ভুলে যাও। যাক যেখানে খুশি; চুলোয় যাক; গোল্লায় যাক। আবার বিয়ে করুক। আমি কিছু জানি না। আমি প্রতিশোধ নেবো।')

চা গিলতে গিয়ে বিষম ঠেকলো নয়নাংশুর। মালতী বললো, 'এক ঢোঁক জল খাও।' নয়নাংশু জলের গ্লাশে চুমুক দিয়ে দিয়ে খবরের কাগজের পাতা ওল্টালো।

—'কলকাতায় আরো পাঁচশো ট্যাক্সি ছাড়া হবে। ভালো।'

—'বুম্নিকে অনেকদিন ধ'রে কথা দিয়ে রেখেছি চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবো। হ'য়ে আর উঠছে না।'

('সেই ভালো। বেরিয়ে পড়ি চিড়িয়াখানায় বুম্নিকে নিয়ে। সঙ্গে অংশু, আর—জয়ন্ত। কী দোষ তাতে—বেশ তো, ভালো। অনিদ্রায়, অন্ধকারে বৃষ্টির শব্দে—সব কেমন প্রকাণ্ড হ'য়ে উঠেছিলো কাল, আমি ভয় পেয়েছিলাম, হঠাৎ মনে হয়েছিলো অচেনা দেশে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আজ এই শরতের মতো রোদ্দুরে সব কেমন সহজ মনে হচ্ছে—সহজ, আর স্বাভাবিক কী হয়েছে? কিছুই হয়নি। নয়নাংশুরই বন্ধু জয়ন্ত—আমারও বন্ধু। বুম্নিও ভালোবাসে জয়ন্তকে। জয়ন্ত কাছে থাকলে নিশ্চিন্ত লাগে আমার—এই সংসারে ও আমার মস্ত সহায়। আর এই সংসার কার? নয়নাংশুর।')

—'চৌরঙ্গিতে দ্বারভাঙা বাড়িটা ভেঙে ফেলেছে। একটা স্কাইস্ক্রেপার উঠবে সেখানে।'

—'ভাবছিলাম আজ নিয়ে যাবো। দিনটা বেশী গরম হবে না আজ। বৃষ্টিও নেই।'

—'বেশ তো। কেষ্টকে পাঠিয়ে দাও বুম্নিকে নিয়ে আসুক।'

—'পাঠিয়ে দিয়েছি। বুম্নি এসে পড়বে এক্ষুনি। তুমি তো জীবজন্তু দেখতে ভালোবাসো। তুমি কি যাবে?'

—'আমি? না। আমি যাবো না।'

('নির্লজ্জ! ''তুমি কি যাবে?'' চোখে মিথ্যা, মুখে মিথ্যা, প্রতিটি পা ফেলায় মিথ্যা। কিন্তু আমি ক্ষমা করবো না। আমি ক্ষমা করবো না। আমি যন্ত্রণা দেবো ওকে, ছোটো-ছোটো যন্ত্রণা, সূক্ষ্ম নির্যাতন—দিনের পর দিন বছরের পর বছর, সারা জীবন! আমি ভুলবো না, আমি ছাড়বো না ওকে, আমি ক্ষমা করবো না। কষ্ট পাবো, কষ্ট দেবো—সারা জীবন বুম্নি বড়ো হ'তে-হ'তে ওর মা-র কাছে শুনবে ওর বাবা এক নিষ্ঠুর খামখেয়ালি অত্যাচারী মানুষ। বুম্নি আমাকে ভালোবাসবে না। সকলেই ওর পক্ষ নেবে, যেহেতু ও স্ত্রীলোক। আর যেহেতু ও স্ত্রীলোক, আমি কিছু বলতে পারবো না কখনো, সারা জীবন মুখ বুজে থাকতে হবে, বজায় রাখতে হবে আমার স্ত্রীর সম্মান। আর স্ত্রীলোককে অবলা বলি আমরা! কী মারাত্মক অবলার বল, আর পুরুষ —যদি ভদ্রলোক হয়—সে কি সাংঘাতিক অসহায়!')

—'একটা সাদা ভালুক এসেছে চিড়িয়াখানায়। বরফের ঘরে রেখেছে। যাবে নাকি?'

—'আমার অন্য কাজ আছে। বরং জয়ন্তকে খবর পাঠিয়ে দাও। সে বেশ বুম্নিকে কাঁধে তুলে দেখাতে পারবে সব।'

'জয়ন্তবাবুর কি সময় হবে এক্ষুনি?'

'তুমি বললেই সময় হবে। কেষ্টকে পাঠিয়ে দাও।'

চোখাচোখি হ'লো তাদের, সকালে ওঠার পরে এই প্রথম। দুটো দৃষ্টি ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো।

('এটা কেন বলতে গেলাম? কী বোকামি! না, এই আমার প্রতিশোধ। তুমি যা চাও আমি তা-ই দিচ্ছি তোমাকে। তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। অথচ ছাড়ছি না। আমি তোমাকে যন্ত্রণা দেবো, ছোটো-ছোটো সূক্ষ্ম যন্ত্রণা, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর—তাই আমি তোমাকে চাই। তাই তোমাকে দরকার আমার! —শুধু তা-ই? একটা স্মৃতি কি নেই? কিন্তু সেই স্মৃতিও আমি মুছে ফেলবো মন থেকে, উপড়ে ফেলবো, থেঁতলে দেবো পায়ের তলায়। কিন্তু যদি আমি মনস্থির করি

ওকেই ভালোবাসবো? সব নিয়েও, সব সত্ত্বেও, ওকেই? বিনা আশায়, বিনা প্রতিদানে, কষ্ট ভুলে গিয়ে? তা কি সম্ভব নয়? মনস্থির করলে সবই পারা যায়। ভালোবাসতে পারাটাই সুখের—যদি শুধু ভালোবাসাকেই ভালোবাসি, ধরাছোঁয়ার মতো আর-কিছু যদি নাও থাকে, তবু।—কিন্তু না, আমি উল্টোরকম মনস্থির করবো। উপড়ে দেবো শিকড়শুদ্ধ গাছ, যাতে একদিন ফুল আর ফল ধরেছিলো। প্রতিটি পাতা ছিঁড়বো নিজের হাতে; পায়ের তলায় মাড়িয়ে মাড়িয়ে থেঁতলে দেবো ফুল, ফল, পাতা, শিকড়। সেই জমিতে ফুটে উঠবে আমার কষ্ট, আমার ঘৃণা, এক আশ্চর্য বিশাল বিদেশী কোনো ফুলের মতো। ক্যাক্টাসের মতো সুন্দর ও কাঁটায় ভরা, ক্যাক্টাসের ফুলের মতো, মহার্ঘ, সাপের ফণার মতো বিষাক্ত ও সুন্দর। এই আমার প্রতিশোধ।')

নয়নাংশু বসার ঘরে এলো; সোফায় ব'সে 'আর্ট অ্যাণ্ড পাব্লিসিটি' নামে একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাতে লাগলো। কি চমৎকার বুক-কভার করে আজকাল আমেরিকায়। সিগারেটগুলি একদম নেতিয়ে থাকে বর্ষাকালে, ধোঁয়া বেরোয় না। আমার ফাউন্টেন পেনটা সারাতে দিতে হবে। আমি দাড়ি কামাইনি এখনো। কামাবো? থাক, ছুটির দিন। না-কামালে কুটকুট করে। করুক। কামাবো না? না, হ্যাঁ, না, হ্যাঁ, না। আজ সারাদিন ধ'রে একটা বই পড়লে হয়। উপন্যাস? নাটক? কোনো জীবনী? জীবনী ভালো হবে—না, নাটক—না, উপন্যাস। কোথাও ঘুরে আসবো চটি পায়ে আধময়লা পাজামা-পাঞ্জাবি প'রে? না—আজ বড্ড রোদ, আলো। আমার ভালো লাগে মেঘলা দিন, ছায়া, বৃষ্টি, আবছায়া, আমার ভালো লাগে শহর বৃষ্টি দোতলা বাস নিয়ন-বাতি, ঝাপসা শহর মানুষ ঝাপসা দিন।

চোখ মেলে দেখলো সামনে মালতী দাঁড়িয়ে। স্নান ক'রে এসেছে এইমাত্র, পিঠের উপর চুল খোলা, হাতে চিরুনি। নয়নাংশুর হঠাৎ সময়টা গোলমাল হ'য়ে গেলো—মনে হ'লো এটা অন্য কোনো দিন, অনেক আগেকার অন্য কোনো দিন। চোখ তুলে তাকালো মালতীর দিকে।

—'তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে ব'সে-ব'সে।'

—'তা-ই নাকি?'

—আমি ভাবছি বরং বেলেঘাটায় যাই।'

—'হঠাৎ বেলেঘাটায়?'

—'পিসিমাকে একবার দেখে আসি।'

পিসিমার কথা শোনামাত্র নয়নাংশুর সব মনে পড়ে গেলো। চোখ সরিয়ে নিলো।

—'চিড়িয়াখানার কী হ'লো?'

—'আর-একদিন হবে।'

—'বুন্নি এলে তাকে নিয়ে যেয়ো।'

—'হ্যাঁ, বুন্নিকে তো নেবোই। তুমি?'

—'আমি?'

—'তুমি কি যাবে?'

—'চিড়িয়াখানায়?'

—'না, বেলেঘাটায়। তুমি কি যাবে?'

—'আমি তো কাল গিয়েছিলুম।'

—'আজও যেতে পারো।'

—'না, আজ আমি যাবো না।'

('যাবে না?' আলবৎ যাবে। আমি মিষ্টি ক'রে বলবো দু-চারবার, চোখে মিনতি ফুটিয়ে বলবো, "চলো না"। একবার হয়তো হাত দেবো ওর চুলে—আর তখন ও গুটিগুটি পায়ে উঠে দাঁড়াবে। পুরুষ! দশটা পুরুষকে একসঙ্গে খেলাতে পারে একটা মেয়ে, মাথায় যদি ছিটেফোঁটা বুদ্ধি থাকে। অমন বোকা একটা দু পেয়ে জন্তু ভগবান আর তৈরি করেননি। ছিঃ! কী ভাবছি! অংশু তো কোনো

ক্ষতি করেনি আমার। ও ভালো, কিন্তু ওর ভালোত্ব তেমন কাজে লাগলো না—এই হয়েছে মুশকিল। কাজে লাগলো না—তারই বা অর্থ কী? আমি কি ওকে ছেড়ে গিয়েছি, না কি যেতে পারি, নাকি ও-ই আমাকে কখনো বলবে "চ'লে যাও"? না—কেউ যেন কল্পনাও না করে আমি সংসার ভেঙে দেবো। তা কি ক'রে হয়—আমি তো বুন্নির মা। আমার জামাই হবে একদিন, কুটম্ব হবে, নাতি-নাতনি হবে। এই সংসার আমার—তিলে তিলে আমি একে গড়েছি, সাজিয়েছি, বাড়িয়েছি। আমি অংশুর স্ত্রী—থাকবো চিরকাল—সব জেনে, সব বুঝেও অংশুকে থাকতে হবে আমার স্বামী সেজে। এই ওর শাস্তি, এই আমার শাস্তি। আর শান্তিও এতেই।')

—'শোনো, আমি আজ সারাদিন বেলেঘাটায় কাটিয়ে আসবো—অনেকদিন যাওয়া হয়নি ও-বাড়িতে।'

নয়নাংশু হাঁটুর উপর হাঁটু তুলে দিলো, চোখ নামালো 'আর্ট অ্যান্ড পাব্লিসিটি'র পাতার উপব। মালতী শোবার ঘরে অদৃশ্য হ'লো।

('চিড়িয়াখানায় বেলেঘাটায়, চিংড়িহাটায় উল্টোডাঙ্গায়। আমি কি ঘুমিয়ে পড়ছি আবার? না, ঘুমোলে চলবে না, আমাকে ভাবতে হবে। পাছে সন্ধেবেলা জয়ন্ত এসে ফিরে যায়, তাই এখনই পিসিমাকে দেখতে যাচ্ছে। কর্তব্যে ত্রুটি হ'তে দেবে না। বা হয়তো জয়ন্তকে এড়াতে চায় আজ। বা হয়তো সবই আমার ভুল। বা হয়তো ভুল নয়। বা হয়তো বাড়িয়ে দেখছি পুরো ব্যাপারটাকে। বা হয়তো যা ভাবছি তা-ই। সে যা হয় হোক, আমার আর এসে যায় না কিছু। ওর কথায় আমি রাজী হ'লেও কিছু এসে যায় না। জয়ন্ত, মালতী, আমি—একসঙ্গে বুন্নিকে নিয়ে চিড়িয়াখানায়, বেশ তো। আমার যাওয়া, আমার না-যাওয়া—একই ব্যাপার। কোনো তফাত নেই। দাড়ি কামিয়ে স্নান ক'রে ফিটফাট হ'য়ে যাই যদি "সপরিবারে" বেলেঘাটায় সারাদিন কাটিয়ে আসি? গেলে হয়, না-গেলেও হয়—কোনো তফাত হবে না। এটা ফরাশি বিপ্লব নয়, রুশ বিপ্লব নয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ নয়—পঞ্চাশ বছর পরে এর কী চিহ্ন থাকবে? দশ বছর পরে এর কী চিহ্ন থাকবে? পাঁচ বছব পরে এর কী চিহ্ন থাকবে? জীবন—স্টিম-রোলার, ভীষণ, ক্ষমাহীন, দয়াময়। এমনি চলবে। একদিন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠবে ওরা—মালতী আর জয়ন্ত। আর নয়নাংশু। কষ্ট ম'রে যাবে, ইচ্ছে ম'রে যাবে, শরীর ধ্বংসে যাবে, গনগনে রাগের উনুনে প'ড়ে থাকবে শুধু একমুঠো ছাই। এই তো; এখনই আর রাগ নেই আমার—দিনের আলো, খবর-কাগজ, ট্রামের শব্দ; সব মিলিয়ে কেমন সাধারণ, কেমন সাধারণ! রোজ এই দিনের আলো ট্রামের শব্দ খবর-কাগজ—রোজ-রোজ-রোজ—তারপর একদিন ধুমধাম ক'রে বুন্নির বিয়ে দেবে তোমরা, তুমি আর মালতী—ধীরে-ধীরে বুড়ো হবে—যেমন চারদিকে কোটি-কোটি মানুষ—অন্ধ মূর্খ অচেতন—তেমনি বেঁচে থাকবে বছবের পর বছর। কিন্তু একটা কথা ঠিক জেনো; ছেঁড়া তার আর জোড়া লাগবে না, হারানো সুর ফিরে পাবে না কখনো—যে তোমাকে ভালোবাসে না তার সঙ্গে, যাকে তুমি ভালোবাসতে ভুলে যাবে তার সঙ্গে—এমনি ক'রে বাঁচবে, এমনি ক'রে সুস্থ শরীরে বুড়ো হবে। কিন্তু কী এসে যায়, বলো—ভালোবাসা জরুরী নয়, স্বামী-স্ত্রী জরুরী, বেঁচে থাকাটা জরুরী। একটা হাত কাটা গেলেও বেঁচে থাকে মানুষ, একটা ফুসফুস নষ্ট হ'লেও বেঁচে থাকে—সে-তুলনায় কত ছোটো এই ক্ষতি, কত তুচ্ছ এই ঘটনা। ধূসর—কালো নয়, উজ্জ্বলও নয়, হিংস্র সুন্দর মহৎ নিষ্ঠুর ভোগী ত্যাগী কোনোটাই নয়—কোটি-কোটি মানুষ—জীবন—অফুরন্ত, মূর্খ, অন্তহীন। তুমি এমন কী মহাপুরুষ যে অন্য রকম পাবে? ওঠো নয়নাংশু, তাকিয়ে দ্যাখো আজকের এই ঝকঝকে দিনটির দিকে, তোমাদের এই নতুন জীবনকে অভ্যর্থনা জানাও।')

গোলাপ কেন কালো

১

আসুন। আমার বাগান দেখলেন? সব গোলাপ ফোটেনি এখনো, সবে তো মে মাস পড়লো। আমি সাত রঙের গোলাপ করেছি : দু-রকম হলদে, দু-রকম গোলাপি, দু-রকম লাল। আর শাদা, অবশ্য। আমার হাতের মুঠোর মতো বড়ো হয় এক-একটা। ফুলের মধ্যে গোলাপ আমার প্রিয়। কেন জানেন? ওটা বিদেশী, তবু এ-দেশের হ'য়ে গেছে। মোগলরা নিয়ে এলো ভারতে, ইরান থেকে দুনিয়ায় ছড়ালো। গোলাপ : কথাটাই অর্ধেক ফার্শি, অর্ধেক সংস্কৃত। যাকে বলে আন্তর্জাতিক মিলন, তারই একটা নিশেন যেন। আমি আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী।

না, না, আমার কোনো অসুবিধে নেই, কোনো কাজ নেই—আপনি বসুন, যতক্ষণ ইচ্ছে। আমার এই বাড়ি, বাগান অনেকেই দেখতে আসেন—উট-কামণ্ডের একটা দ্রষ্টব্য হ'য়ে গেছে এটা। ও-পাশের জাপানি বাগানটা দেখেছেন কি? আঁকাবাঁকা ঝিল, চেরি গাছে কুঁড়ি ধরেছে, দু-এক পশলা বৃষ্টি হ'লেই শালুক ফুটবে। অনেকে সূর্যাস্তের সময় বেড়াতে আসে সেখানে। আমি কাউকে বাধা দিই না, আমার এই দুটোমাত্র চোখ দিয়ে কত আর দেখবো; সুন্দর মানেই বহুভোগ্য—তা-ই নয়? আর আমার এখনো এটুকু দুর্বলতা আছে যে অন্যের মুখে প্রশংসা শুনলে ভালো লাগে। কিন্তু যে যা-ই বলুক, এতে অসাধারণত্ব কিছুই নেই, এ-রকম হাজার-হাজার বাগান আছে পৃথিবীতে। আমি তো সাতের পরে অষ্টম রং যোগ করতে পারিনি। জানেন, একবার আমার খেয়াল চেপেছিলো অন্য রঙের গোলাপ করবো। নীল, বা বেগনি, বা কালো—কালোই বা কেন হবে না? জাপান থেকে, হল্যাণ্ড থেকে বিস্তর বই আনিয়েছিলুম। উত্তেজনায় ঘুমোতে পারি না রাত্রে। কাঁপছি, যেন একটা চোরাকুঠরির চাবি আমার হাতে এসে যাচ্ছে। পৃথিবীতে কালো ফুল নেই কেন? ফুল, ফল, শস্য—যা-কিছু মাটি ফুঁড়ে বেরোয়, তাদের রং কেন রামধনুর সাতটির মধ্যেই বাঁধা প'ড়ে আছে? শাদা, যাতে সব রং মিলে-মিশে আছে, ফুলেদের মধ্যে তাও পাওয়া যায়, কিন্তু কালো—যাতে সব রং লুপ্ত, তা কেন নেই? সত্যি কি নেই, না কি আমরা এখনো খুঁজে পাইনি? সে কি হবে না ভগবানের চেয়েও বড়ো, যার হাতে প্রথম ফুটবে কালো গোলাপ? সে যদি আমিই হই? আপনি ভয় পাবেন না, আমি পাগল হ'য়ে যাইনি, যখন আমি নীল গোলাপের স্বপ্ন দেখছি তখনই আমি জানি ওটা হবার নয়। একরকমের খেলা আরকি নিজের সঙ্গে, সময় কাটানো—সামথিং ইন্টরেস্টিং টু ডু, দ্যাট'স অল।

মাপ করবেন, আপনার সঙ্গে ইংরেজি বলছি। হ্যাঁ, আমি বাঙালি বইকি। ঢাকার বাঙাল। কিন্তু বহুকাল বাইরে-বাইরে আছি, বহুকাল বাংলা বলি না, বাংলা বই পড়ি না। মাঝে-মাঝে যদি ইংরেজি ব'লে ফেলি, ধ'রে নেবেন সেটা সুবিধের জন্য, অভ্যেসের দোষে। আসলে আমি কথাবার্তাই খুব কম বলি আজকাল। বলবার দরকারও হয় না—সপ্তাহে একবার আমার গোমস্তার সঙ্গে ছাড়া। একা থাকি, কোথাও যাই না; আমি বিপত্নীক, দুই ছেলেই বিলেতে।

আজ্ঞে? আমার বাড়ির নাম? 'বন্-আর'—ফরাশি কথা ওটা, অর্থ হ'লো সুখ, আনন্দ। নামটা রেখেছিলো নেলি—মানে নলিনী, আমার স্ত্রী। শেষ পর্যন্ত কোথায় আমাদের আস্তানা হবে তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলতো আমাদের। প্রথমে ঠিক ছিলো মালাবার হিল্-এই থাকবো, নেলির বাবার কাছাকাছি, বাড়িটা তিনিই দিয়েছিলেন মেয়েকে। হঠাৎ একসময় রিভিয়েরার দিকে ঝুঁকেছিলাম। কিন্তু উটকামণ্ডে একবার বেড়াতে এসে নেলির খুব ভালো লেগে গেলো জায়গাটা। বাগানের নকশা,

বাড়ির প্ল্যান—সে-ই করেছিলো সব। বাড়ি তৈরি হ'লো, নাম রাখা হ'লো 'আনন্দ'। কিন্তু দু-বছরের মধ্যে এক রহস্যময় অসুখে তিলে-তিলে শুকিয়ে সে ম'রে গেলো। আমার জন্য রেখে গেলো স্মৃতি, আর অফুরন্ত টাকা, তার স্ত্রীধন। গুজরাটি বাবা, মা কাশ্মীরি —লোকেরা যাকে রূপসী বলে, তা-ই। তার ভালোত্বেরও তুলনা ছিলো না। অনেক ভাগ্যে ও-রকম স্ত্রী পেয়েছিলুম। একটু চা ইচ্ছে করেন? নীলগিরি, না দার্জিলিং?

বলুন, কলকাতার খবর বলুন, বাংলাদেশের। অনেক দুঃখকষ্ট, অশান্তি—তা-ই না? মাঝে-মাঝে দেখি কাগজে। তা সারা ভারতে কোথায় শান্তি আছে বলুন। কে কী চায় জানে না—যে-কোনো একটা ছুতো ক'রে হুলস্থুল বাধাচ্ছে। নিজেদের মধ্যে কোঁদল, কথায়-কথায় উপোশ, ট্রেন পোড়ানো, খুনোখুনি। তার ওপর ইংরেজি হঠাও, ফিরিয়ে আনো মধ্যযুগ, গ'ড়ে তোলে অচলায়তন হিন্দিস্থান। কী মনে হয় আপনার? ভারতবর্ষ কি টুকরো-টুকরো হ'য়ে যাবে আবার? তারপর আবার কেউ বাইরে থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসবে? আর সেই ইংরেজ, যাদের আমরা ঘটাপটা ক'রে দেশ থেকে তাড়ালুম, তারা সমুদ্রের ওপারে বসে কেমন হাসছে বলুন তো? তাদের বিরুদ্ধে যে-সব অস্ত্র আমরা চালিয়েছিলুম, সেগুলো দিয়েই পরস্পরকে আমরা জখম করছি এখন—পরস্পরকে, মানে নিজেদেরই। তামাশা—তা-ই না?

জানেন, আমিও একবার ভেবেছিলুম ইংরেজকে তাড়াতে পারলেই ভারতবর্ষ ভূস্বর্গ হবে। আমি তখন ঢাকায় এম. এ পড়ছি। আপনিও ঢাকায়....? আ-চ্ছা? কবে? ও, আমিও তো তখনই। বক্সিবাজার চেনেন? অনাথ আশ্রম? সে কী! আপনিও? বক্সিবাজারে ছিলেন, অনাথ আশ্রমের কাছে? আমিও তা-ই। বক্সিবাজারে, অনাথ আশ্রমের কাছে। খুব সাধারণ, মধ্যবিত্ত, বাঙালি হিন্দু পরিবার—সেখানেই জন্মেছি, বড়ো হয়েছি, কিন্তু সেখানকার অনেক-কিছুই আমার বিশ্রী লাগে। বড্ড ছোটো মনে হয় চারদিকটাকে—বড্ড গরিব, দম-আটকানো। শুধু টাকা নেই ব'লে গরিব নয়, মনগুলিও পানাপুকুর। পড়ি ইংরেজি সাহিত্য, ইতিহাস—মনে-মনে ভাবি এ-সব আশ্চর্য কাণ্ড কি তারাই করেছে, আমাদের দেশে যাদের পেশা হলো লুঠতরাজ? তারা জাঁদরেল ব'লে, না কি আমাদেরই কোনো মারাত্মক গলদের জন্য? জানেন, আমি 'ওদের মতো' হ'তে চেয়েছিলুম, স্বাধীন, বেপরোয়া, ক্ষমতাশালী। এই আমাদের পরিবারে-বাঁধা জীবন, যেখানে সুখদুঃগুলি এইটুকু-টুকু, আশা পর্যন্ত বেশি দূর বাড়তে পারে না, সেই অবরোধ থেকে মুক্তি চেয়েছিলুম। আর তার একটা উপায়ও আমার হাতের কাছে এসেছিলো—মিতু বর্ধনের সঙ্গে আলাপ হ'লো যখন, আর্থার জোন্সের সঙ্গে দেখা হ'লো যখন। এই যে, আপনার চা।

আপনি কখনো দেখেছিলেন আর্থার জোন্সকে? না? অনেকেই তাকে চিনতো তখন ঢাকায়। ছোকরা, টাটকা-পাশ-করা আই. সি. এস.। বাংলা বলে, বাঙালিদের সঙ্গে মেশে, য়ুনিভার্সিটিতে আসে ডীবেট করতে, কোনো-কোনো বাড়িতেও যায়। গানের ভক্ত। আমার সঙ্গে দেখা হ'লো মিতু বর্ধনের বাড়িতে। আপনি নাম শুনেছেন? আপনার কাছে অমিতা বর্ধনের রেকর্ড আছে এখনো? তা শুনুন, আমি অনেক ঘাটের জল খেয়েছি, একটা কথা বলি। ও-সব পুরোনো স্মৃতি আঁকড়ে থাকাটা কিছু নয়। যেমন বাত, শোথ, পক্ষাঘাত, তেমনি একটা ব্যামো হ'লো স্মৃতি : অচল করে দেয়। দেখুন না ভারতবর্ষের অবস্থা : সেই উপনিষদ, কালিদাস, তানসেন—এ-সবই আমরা জপছি এখনো। কিন্তু তার পরে? তারপরে যেটুকু ভালো তা কি ইংরেজেরই দৌলতে হয়নি?

মাপ করবেন, আমি চায়ে যোগ দিচ্ছি না আপনার সঙ্গে, আমি জিন খাচ্ছি। আপনি একটু...? না? আচ্ছা, আপরুচি খানাপিনা, এর ওপর কোনো কথা নেই। স্ত্রীলোক বিষয়েও সেই কথা—মাপ করবেন, স্ত্রী বলতে চেয়েছিলুম। প্রহিবিশন? তা মদ তো আর নীল গোলাপ নয় যে চাইলে পাওয়া যাবে না। আর আইন অন্যায় হলে সেটাকে মান্য করাই অন্যায়। একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবেই বলছি। এককালে আমরা স্কুলে-কলেজে পিকেটিং করেছি, তারপর পোস্টাপিশে আগুন ধরিয়েছি, এখন আবার ট্রেন থামিয়ে দিচ্ছি যেখানে-সেখানে : এগুলো হ'লো অন্যের

স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, অন্যের অধিকার কেড়ে নেয়া—সে-তুলনায় মদ তো একটা ছোটো ব্যাপার, ছোটো, এবং নির্দোষ—শান্তিপূর্ণ, নিভৃত, ব্যক্তিগত—কারো কোনো ক্ষতি করা হচ্ছে না এতে, অন্য কারো কিছুই এসে যায় না। আপনি বি. এ. পরীক্ষা দিতে চলেছেন, আমি আপনার পায়ের তলায় শুয়ে পড়লুম ; ট্রেনে চলেছেন মুমূর্ষু আত্মীয়কে শেষ দেখার জন্য, আমি দলবল জুটিয়ে আটকে দিলুম ট্রেন; আর, আপনার কোনো কাজে বা ইচ্ছেতে বাধা না-দিয়ে আমি শুধু ঘরে ব'সে মদ খেয়ে একটু সুখ পাচ্ছি—কোনটা বেআইনি আর কোনটা আইনমাফিক তা কি বলে দিতে হয় কাউকে? না—মদ বলুন, হেঁয়ালি-মতো কবিতা লেখা বলুন, সিনেমায় চুম্বন বলুন—ও-সব মামলা আখেরে কোনো হাইকোর্টে টিকবে না। ...আজ্ঞে? আমার পেশা? চাকরিতে ছিলুম মশাই, সরকারি চাকরি। পুরোনো পাপী, ইংরেজ আমলের আই. সি. এস.। র‍্যাঞ্জিট্ ডাটা, আই. সি এস., বার-অ্যাট-ল। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত, স্থাণু। ...আচ্ছা তা'হলে—চীয়র্স। আপনার চা ঠিক আছে তো?

আর্থার জোন্সের আগে আমি কোনো জ্যান্ত ইংরেজকে কাছাকাছি দেখিনি। কোনো মরা ইংরেজকেও দেখিনি অবশ্য —যদিও টেররিস্টদের গুলিতে তারা দুমদাম মরছে তখন। আমার কাছে ইংরেজ ছিলো বইয়ে-পড়া, সিনেমায় দেখা মানুষ। আর মাঝে-মাঝে, ঝাপসাভাবে কলকাতায় দেখা। মস্ত শহরের মধ্যে একবত্তি চৌরঙ্গি-পার্ক-স্ট্রিট পাড়া; একটি উজ্জ্বল দ্বীপ, সুখ সম্ভোগ ঐশ্বর্য সব সেখানে। আমাদের নাগালের বাইরে। টকটকে লাল গর্দানওলা লম্বা বলিষ্ঠ পুরুষগুলো, তাদের বাহুলগ্ন পেখম-তোলা স্ত্রীলোকেরা—অদ্ভুত, অত্যন্ত দূর, জমকালো। যেন অন্য জীব, মানুষ ছাড়া অন্য কিছু, যেন এই ঈশ্বরেব তৈরি সর্বজনীন বাতাসে তারা নিশ্বাস নেয় না। একদিকে এই : অন্যদিকে ইংরেজের লেখা যে-সব বই পড়ি—উল্টো এক ব্যাপার। ছেলেমানুষ ছিলুম, ঐ দুটোকে মেলাতে পারিনি। আমি মনে-মনে বানিয়ে নিয়েছি এক অসাধারণ ভালো ও মেধাবী ইংলণ্ড, যার পতাকা য়ুনিয়ন জ্যাক নয়, শেক্সপীয়র। যার জাহাজগুলো ভারতবর্ষ থেকে চা, পাট, তুলো, সোনা সরিয়ে নেয় না, ঘাটে-ঘাটে পৌঁছিয়ে দেয় শেলির কবিতা, ডিকেন্সের উপন্যাস। শেলি নিরিমিষ খেতেন, কীটস ছিলেন লম্বায় মাত্র পাঁচ ফুট, আর কী সুন্দর মুখশ্রী ছিলো দু-জনেরই, আর কী বেদনা তাঁদের কবিতায়, আমার বড্ড আপন জন মনে হয় তাঁদের। এও কি সম্ভব যে তাঁরাও ইংরেজ? তাঁদেরই স্বজাতি, যারা চৌরঙ্গিতে এমনভাবে চলে যেন আকাশের তারাগুলো পর্যন্ত তাদেরই হুকুমে ওঠে নামে? যাদের ফার্পো রেস্তোরাঁয় ধুতি পরে কেউ ঢুকতে পায় না? আসামে চায়ের বাগানে যাদের দেখামাত্র 'বাবু'দের (হয়তো আমারই মেসো-পিসেকে) সাইকেল থেকে নেমে পড়তে হয়? আমার ইচ্ছে হতো ঐ গোমুর্খ চায়ের সাহেব পাটের সাহেবগুলোকে বুঝিয়ে দিয়ে আসি যে তাদের দেশকে তারা যতটা জানে তার চেয়ে বেশি জানি আমি, যেহেতু শেলি কীটস ইত্যাদির সঙ্গে মাঝে-মাঝে আমার কথাবার্তা চলে।—কথাবার্তা? না—ঠিক তা নয়, কোনো বিনিময় নেই, সবই একতরফা। একটা ধারণা, আদর্শ, অর্থাৎ আমার নিজেরই তৈরি খেলনা—ঐ শেলি আর কীটস। আসলে হয়তো তেমনি ঝাপসা, অবাস্তব, যেমন চৌরঙ্গির জনবুলগুলো। কিন্তু আর্থার জোন্সকে দেখে আমি প্রথম বুঝলাম যে ইংরেজও আমাদের মতো মানুষ।

আপনি হাসছেন, কোন সালে জন্ম আপনার?... আরে, সে তো আমারই বছর। আপনার কি মনে নেই তখনকার অবস্থা? আপনি কি সব ভুলে গেছেন? শুনুন, আমি যখন বড়ো হচ্ছিলুম তখনও বৃটিশ সিংহের দাঁত পড়ে যায়নি। তাছাড়া আমার বাড়ির আবহাওয়াটাও ভেবে দেখবেন। সকলেই সরকারি চাকুরে, ছোটো বা মাঝারি গোছের। আমার বাবা, কাকারা, আশে-পাশে অন্যান্য আত্মীয়, প্রায় সবাই। ঐ তাঁদের চিচিং-ফাঁক, জীবনের লক্ষ্য, আরম্ভ ও পরিণাম : সরকারি চাকরি। 'চাকরি যায় না, বছর-বছর মাইনে বাড়ে, পেন্সন আছে, আর সাহেবদের আণ্ডারে কাজ করেও সুখ! 'অন্য কোনো চাকরি, কোনো ব্যাবসা, পেশা—যাতে কোনোরকম অনিশ্চয়তা আছে, বা একটু বেশি উদ্যম ও বুদ্ধি খাটাবার দরকার হয়—সেগুলিকে সন্তর্পণে এড়িয়ে চলেছেন এঁরা।—জঘন্য!

আমার নাড়ি উল্টে আসে। আমি অনেকগুলো তরুণী আত্মীয়ার বিয়ে দেখেছি মশাই, অনেকবার 'মেয়ে দেখানো' দেখেছি। আমাদেরই বাড়িতে। জাত গোত্র বংশ ঠিকুজি, অত হাজার নগদ আর অত ভরি সোনা, কুলীন না বঙ্গজ না ভগ্নকুলীন, বিক্রমপুর না পাড়জোয়ার, ভরাকরের ঘোষেদের চাইতে আঠারোবাড়ির মিত্তিররা উঁচু না নিচু—এ-সব কথা অনেক শুনেছি ছেলেবেলায়। আমার আই. এ-পাশ দিদি, ইডেন কলেজের ভালো ছাত্রী, তাকেও সেজে-গুজে আসতে হয়েছে কতগুলো অচেনা অজানা স্ত্রীলোক আর পুরুষের সামনে, যাদের কাঁড়ি-কাঁড়ি খাবার খাইয়েছেন আমার মা, আর বাবা হেঁ-হেঁ করে হাত কচলে কথা বলেছেন। ঘেন্না আর কাকে বলে।

একটা ব্যক্তিগত সমস্যাও ছিলো আমার। 'আই. সি. এস. দে. আই. সি. এস. দাও—' বি. এ. পাশ করার পর থেকে এ-কথা শুনতে-শুনতে ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছি। যেহেতু পরীক্ষায় উচু নম্বর পাওয়া আমার একটা বদভ্যাস, তাই ও ছাড়া কোনো আত্মীয়ের মুখে কথা নেই। ভেবে দেখুন—তাঁরা নিজেরা কেউ পেশকার, কেউ পোস্টমাস্টার, কেউ কেরানি; তাঁদেরই মধ্য থেকে কেউ একজন একটা আস্ত জেলার কর্তা হয়ে বসবে, এমনকি হাইকোর্টের জজও হতে পারে কোনো-একদিন—এটা কল্পনা করতেই তাঁদের শরীরে নাকি 'সাত হাতির বল আসে', 'বুকের ছাতি সাতগুণ বেড়ে যায়।' যেন সেটা কোনো স্বর্গের সিঁড়ি, যার শেষ ধাপটি তাঁদের চোখে পর্যন্ত মালুম হয় না: আমি ভাবটা দেখাই যেন আচ্ছা, সবাই যখন বলছেন, কিন্তু মনে-মনে জানি দুটো কাজ আমি কখনোই করবো না—সরকারি চাকরি, আর পাতানো বিয়ে। ... তাহলে? নসিব, মশাই, নসিব : ভেবেছিলাম এক, তালেগোলে অন্য রকম হ'য়ে গেলো।

আপনি প্রথম সিনেমা কবে দেখেছিলেন? মনে নেই? আমার মনে আছে—আমি খুব ছোটো তখন, জর্মান যুদ্ধ চলছে, প্রথম যুদ্ধ। করোনেশন পার্কে বিনি পয়সায় দেখানো হ'লো। প্রথমে কতগুলো আবোলতাবোল কামান ট্যাঙ্ক জঙ্গি জাহাজ, মার্শাল ফশ, লর্ড কিচনারের গোঁফ—তারপর হঠাৎ কয়েকটা ভয়াবহ দৃশ্য। বাচ্চাদের শূন্যে ছুঁড়ে সঙিনে বেঁধাচ্ছে, ফুটফুটে মেয়েগুলোকে শেকলে বেঁধে সারা গায়ে চালিয়ে যাচ্ছে চাবুক—জর্মানদের কীর্তি অবশ্য। ভয়ে আমি শিউরে উঠেছিলাম, তবু জর্মানদের রাক্ষস বলেও ভাবতে পারিনি, কেননা বাড়িতে দেখি জর্মানদের কথা উঠলে গুরুজনদের মুখে হাসি আর ধরে না। 'এমডেন' যখন ফুটফাট বিলিতি জাহাজ ডোবাচ্ছে তখন প্রায় হরিলুট দেবার অবস্থা তাঁদের। 'ব্যাটারা নিপাত যাবে এবার!' 'বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে ইংরেজগুলোকে!' 'শক্ত পাল্লায় পড়েছো বাছাধন! আর জারিজুরি টিকলো না।'—কিন্তু এ-সব কথা ফিশফিশ করে বলেন তাঁরা, ঘরের মধ্যে তক্তাপোশে তাকিয়া ঠেশ দিয়ে। আর বাইরে? দিনের আলোয়, রাস্তায়, দূর থেকেও কোনো সাহেব বা সাহেবতুল্য বাঙালি, কোনো শাদা চামড়া বা উঁচুদরের সরকারি চাকুরে—এমন কাউকে চোখে পড়ামাত্র তাঁদের শিরদাঁড়া নিজে-নিজেই বেঁকে যায়, মুখ ফ্যাকাশে, কোথায় যাচ্ছিলেন তা ভুলে গিয়ে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়েন হয়তো। যখন ঐ লড়াই চলছে, যখন ঘরে-ঘরে ইংরেজের বাপান্ত করছে সবাই, তখনও দেখেছি অনেক বাড়িতে দিল্লি দরবারের ছবি, আর এক গুষ্টি ছানাপোনা সমেত রাজদণ্ড হাতে সস্ত্রীক পঞ্চম জর্জ। আমার ঠাকুমার ঠাকুরঘরে মহারানী ভিক্টরিয়ার একটি ছবিও ছিলো। আপনি হাসছেন? আমি বানিয়ে বলছি না—সত্যি। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি—'ওঁ' অক্ষরের মধ্যে লতিয়ে আছেন দু-জনে—গলায়-সাপ-জড়ানো মহাদেব, রামকৃষ্ণ, চৈতন্য, লক্ষ্মীর সরা—এই সবের মধ্যে একটি ত্রিবর্ণ হাফটোনে ছাপা ছবি—সেই মোটা, মৃত মহিলা, যিনি বহু দূরে এক ঠাণ্ডা দ্বীপে রাজত্ব করতেন, যাঁকে এক ফরাশি ভদ্রলোক বলেছিলেন 'হলদে দাঁতওলা বুড়ি', তিনি। 'মহারানীর আমল'—আমার ঠাকুমার মতে সেটাই ছিলো স্বর্ণযুগ, রাম-রাজত্ব। অসহযোগ আন্দোলনের সময় দিল্লি দরবারের ছবিটা আমি সরাতে পেরেছিলুম বাড়ি থেকে, কিন্তু ঠাকুমা তাঁর ঠাকুরঘরের মহারানীকে সস্নেহে আঁকড়ে রইলেন—'আহা থাক না, যেন সাক্ষাৎ ভগবতী!' কিন্তু আমাকে ও জনমতকে খুশি করার জন্য, আর তিনি স্বভাবতই ভক্তিমতী ব'লে, ভিক্টরিয়ার পাশেই গান্ধীর একটি ছবি নতুন আমদানি করলেন। দেবতার সংখ্যা বেড়ে যায়

তো ভালো, কিন্তু একটিকেও হারাতে তিনি নারাজ।

একটা মজার গল্প বলি, শুনুন। আমি একবার লাটসাহেবকে স্যালুট করেছিলাম। ঢাকায়, নবাবপুরের রাস্তায়। স্কুলে নিচের ক্লাশে পড়ি তখন। ঢাকায় এসেছেন লাটসাহেব, সদরঘাটে স্টিমার থেকে নেমে রমনার গভর্মেন্ট হাউসে যাচ্ছেন—রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে আমিও দাঁড়িয়ে আছি। ঘোড়ায়-চড়া চাপদাড়িওলা পাঠান সেপাই, মোটর-সাইকেলে গোরা সার্জেন্ট, এই সবে ঘেরাও হয়ে মস্ত কালো মোটরগাড়িটা কাছে এলো। আমি এক ঝলক দেখলাম একটা টকটকে লাল মুখের আধখানা, খাড়া নাক, ফুলকো গাল, ঠোঁটের ওপর ছাইরঙা গোঁফ—সোজাসুজি দেখলে মনে হ'তো অন্য সব চোখে না পড়া মুখের চাইতে একটুও আলাদা নয়। কিন্তু—ঐ ভিড়ে আর রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে, পলকের জন্য আধখানামাত্র দেখতে পেয়ে, আমার কেমন যেন চোখ ঝলসে গেলো—গাড়িটা যখন কাছে এসে চ'লে যাচ্ছে, আমি হঠাৎ টান হয়ে দাঁড়িয়ে স্যালুট ক'রে ফেললাম। কেন করেছিলাম? অন্য কেউ করেনি, কেউ আমাকে ব'লে দেয়নি, আমার নিজের ভেতর থেকেই এলো ওটা। বাড়ি এসে লাফাতে-লাফাতে মা-বাবাকে বললাম, তাঁরা হাসলেন।

আজ্ঞে? আপনি বলছেন এটা নেহাৎ ছেলেমানুষি, এতে কিছুই প্রমাণ হয় না, গণ্য করার মতো কিছু নয় এটা? কিন্তু জানেন, যখন মিত্র বর্ধনের বাড়িতে আসা-যাওয়া করছি সেখানে আরো দু-একজনের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, যখন আমি নতুন ক'রে অনেক কিছু ভাবছি, নতুন চোখে দেখতে পাচ্ছি যা কিছু এতদিন প্রায় স্বতঃসিদ্ধ ব'লে ধ'রে নিয়েছিলাম—তখন এই তুচ্ছ ঘটনাটা-ও আমার মনে পড়েছে মাঝে মাঝে। হঠাৎ মনে হয়েছে, আমাদের জীবনে অপমান ছাড়া কিছু নেই। আমরা ভাতের সঙ্গে অপমান খাই, জলের সঙ্গে অপমান গিলি। সেই যে আমি লাটসাহেবকে স্যালুট করেছিলাম, তা কি অবোধ শিশু ছিলাম বলে? না কি আমিই বিশেষভাবে খারাপ, পাপিষ্ঠ যার জন্যে ঐ হীনতা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো? না কি এই রকমই আমরা, ছেলে বুড়ো মুর্খ শিক্ষিত সবাই হাতে কলমে না হোক, মনে মনে স্যালুট চালাচ্ছি সব সময়? নয়তো আমাদের য়ুনির্ভার্সিটিতে এক্সট্রা পাঠ্য বই কেন 'কিম—সেই কিপলিঙের লেখা, যার কাছে বাঙালিরা হ'লো বান্দরলোগ' আর পেশোয়ার থেকে রেঙ্গুন পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে শুধু জীবজন্তু সহিস মাহুত বৃটিশ টমি? এমনি অনেক ভাবনা তখন ছেঁকে ধরেছিলো আমাকে আমি কষ্ট পাচ্ছিলাম, অনেক কারণেই কষ্ট পাচ্ছিলাম। এক-এক সময় এও ভেবেছি যে ঐ যারা ইংরেজের বুকে গুলি বেঁধাচ্ছে, হয়তো এই অপমানেরই জবাব দিচ্ছে তারা। যোগ্য জবাব। কী সব কাণ্ড তখন হচ্ছিলো সারা দেশে তা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি? প্রথমে চাটগাঁয় তারপর এই ঢাকাতেই। মিটফোর্ড হাসপাতালে। তারপর খোদ রাইটার্স বিল্ডিংএ, কলকাতা। বলুন আপনি যাদের হৃৎপিণ্ড সব সময় শুধু ধুকপুক করে ধুকপুক, ধুকপুক, হঠাৎ তাদের বুকের মধ্যে কি ঘণ্টা কাঁসর দামামা শাঁখ বেজে ওঠে না, যখন তাদের চোখের সামনে একটা দুর্দান্ত ইংরেজ মাটিতে প'ড়ে যায়—জর্মান যুদ্ধে নয়, এই ভেতো বাঙালির গুলিতে?

২

উটকামণ্ডে কেমন লাগছে আপনার? সুন্দর, না? খুব সবুজ, আর খুব ছড়ানো। নেলির পছন্দ হয়েছিলো এইজন্যেই। আমারও। বা হয়তো আমার পছন্দ ব'লেই নেলিরও চোখে ধ'রে গেলো। দার্জিলিং ভালো লাগে না আমার, বড্ড আঁটোসাঁটো, পাহাড়গুলো যেন পিষে মারবে, এত কাছে, আর আপনাদের ঐ কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন এক বিনিদ্র বিচারক। আরে মশাই জজিয়তি করেছি তো বিশ বছর, বিচারকের চোখের সামনে অপরাধীর কেমন লাগে তা তো জানি। কিন্তু উটকামণ্ড বেশ খোলামেলা, বেশ সহজে নিশ্বাস নেয়া যায়। কী বললেন? ইংলণ্ডের মতো? কিন্তু সেখানেও কান্ট্রিসাইড নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে—আপনি শেষ করে গিয়েছিলেন? কখনো যাননি?—ও, তাও তো

বটে। তবে, হ্যাঁ—যে-রকম শোনা যায়,পড়া যায়। হ্যাঁ, খানিকটা। হঠাৎ মনে হয় ওঅর্ডস্বার্থের কবিতার দৃশ্য—সবুজ পাহাড়ের গায়ে ভেড়া চরে, ড্যাফোডিলও ফোটে। কিন্তু এমন রোদ্দুর ইংলন্ডে কোথায় পাবেন মশাই? দেখুন বাইরে তাকিয়ে, কী ঝকঝকে রোদ, দুপুরবেলা রাস্তায় হাঁটলে গরমও লাগে, কিন্তু ঘরে ঢুকলেই সুশীতল। বারো মাস ধরনটা প্রায় একই—না-গরম, না-ঠাণ্ডা। হৈ-হৈ মনসুন নেই, গুমোট হয় না কখনো। আমার মতে আইডিয়েল আবহাওয়া। আমি গরমকে যমের মতো ডরাই, বেশি ঠাণ্ডাও আমার অসহ্য। ঐ ঠাণ্ডার ভয়েই ইংলণ্ডে বাস করার কথা কখনো ভাবিনি। তাছাড়া, ভারতের আর যে-দোষই থাক, এখানে অন্তত চাকরবাকর পাওয়া যায় এখনো। চাকর ছাড়া কি বাঁচা যায়, বলুন!

নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন শহরটা যেন পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয়? নানা দেশের ফুল, নানা ঋতুর ফল। যেন গ্যেটের শকুন্তলা, শোপেনহাওয়ারের উপনিষদ। একসঙ্গে কলা আব স্ট্রবেরি। আমলকি আর আপেল। ভাবতে পারেন, সাত হাজার ফুট উঁচুতে কলাগাছ! তাছাড়া ছোটোখাটো সুবিধেও আছে দু-একটা। কারখানা নেই যে ধোঁয়া হবে, ধর্মঘটের মিছিল বেরোবে। ব্যাবসা আপিশ বেশি নেই ব'লে ছা-পোষা কেরানিও অল্প। কাছাকাছি তিব্বত কি পাকিস্তান নেই যে রেফিউজী আসবে দলে-দলে। কিছু ইংরেজ এখানে বাড়ি কিনে থেকে গেছে, কিছু ধনী পরিবার যাওয়া-আসা করে মান্দ্রাজ মাইসোর ব্যাঙ্গালোর থেকে। শান্ত, ভদ্র সব-কিছু। কী বললেন? মান্দ্রাজের মারো-বামুন পলিটিক্স? তা মশাই, পৃথিবীটা তো আর স্বর্গরাজ্য নয়। তাছাড়া, আমার কী এসে যায়? আসাম থেকে বাঙালি খেদাক, টুকরো হ'য়ে যাক পঞ্জাব, তামিল থেকে সংস্কৃত শব্দগুলোকে ঝেঁটিয়ে বেব ক'রে দিক, বাঁদর, ইঁদুর, গোরু ইত্যাদি মা-বাবাদের বাঁচাবার জন্য মানুষগুলোকে না-খাইযে মারুক—আমার কী এসে যায়? আমি ভালো আছি। আমি সুখে আছি। আমার এই বারান্দায় ব'সে মনেই হয় না যে ভারতবর্ষ জনসংখ্যর চাপে ফেটে যাচ্ছে। মনেই হয় না হিমালয়ের উত্তবে ওৎ পেতে আছে চীনেরা। মনেই পড়ে না কাশ্মীর আর নেফা নিয়ে কী টালমাটাল চলছে। মনেই পডে না দিল্লির হেডলাইন, কলকাতার হৈ-হল্লা। রেডিও, খবর-কাগজ—এমনি দু-একটা বেদরকাবি জিনিশ বাদ দিলে সহজেই ভেবে নেয়া যায় আমি ভারতবর্ষে নেই। আর ধরুন, চীনেরা যদি ঢুকেও পড়ে, তাহ'লেও এই দূর দক্ষিণে পৌঁছতে একটু দেরি হবে তো। আর ততদিনে আমি হয়তো আব ভারতে থাকবো না, জগতেও থাকবো না।—জায়গাটা ভালো বাছিনি?·

আপনি উঠতে চান? কেন, বসুন না খানিকক্ষণ। যতক্ষণ ইচ্ছে বসুন। বেড়াতে এসেছেন, কোনো তাড়া নেই তো। না, আমার কোনো কাজ নেই, কখনোই কোনো কাজ থাকে না। আমি কোথাও যাই না, কিছু করি না, একা থাকি। বারান্দাটি ভালো লাগছে আপনার? একটু ঘুরিয়ে নিন চেয়ারটা, ঐ দিকের দৃশ্যটা মন্দ না। ঢেউ-খেলানো সবুজ, দূরে সারি-সারি নীল পাহাড়। বোদ, আলো, আকাশ,—গাছের শব্দ হাওয়ার শব্দকে আটকে রেখেছে কাচের জানলগুলো—মনে হয় যেন পৃথিবীতে শান্তি আর উজ্জ্বলতা ছাড়া কিছু নেই। আর আমার বাগানের ফুলগুলো—তারাও বোকার মতো হাসছে সব সময়, জন্মাতে পেরেই খুশি তাবা, কোনো নালিশ নেই। এক-এক সময় আমার ইচ্ছে করে কী, জানেন? একদিন একটা লাঠি হাতে নিয়ে বেরোই, পিটিয়ে-পিটিয়ে ছারখার ক'রে দিই বাগান, গাছগুলোকে উপড়ে ফেলি, ফুলগুলোকে থেঁৎলে দিই পায়ের তলায়। ভারি মজার একটা খেলা হয়, তা-ই না?

আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় ভারতবর্ষ সত্যি ভেঙে যাবে—যাচ্ছে, হয়তো আমরা পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নতুন ক'রে অঙ্গ-বঙ্গ-গুজবাট-কর্ণাটে পরিণত হবো? অসম্ভব? কেন? ভারত বলতে আমরা যা বুঝেছিলাম তা তো আর নেই; দুটো দূর টুকরো নিয়ে আলাদা একটা মুলুক হ'য়ে গেলো—যা ছিলো অবিশ্বাস্য তা-ই হ'লো বাস্তব, তাহ'লে এর পর আরো ভাঙচুর হবার বাধা কী? কোনো বাধাই নেই—'ভারতবর্ষ' নামে একটা ধারণা ছাড়া। লোকেরা যাকে 'দেশ' বলে তা তো আসলে একটা ধারণা মাত্র, রহস্য, কবিকল্পনা, যাকে বলে মিস্টীক—তা টিকে থাকে শুধু মানুষের বিশ্বাসের

ওপর। ধরুন না, ঐ একটা এক রত্তি জায়গা বৃটেন, সেখানেও ধ'রে নিতে হয়েছে, বিশ্বাস করতে হয়েছে যে ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড আর ওয়েলস মিলে একটাই দেশ। তেমনি, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদিরাও এককালে আমাদের জপিয়েছিলেন যে এক মহামানবের সাগরতীরের নাম ভারত। অবশ্য পেছনে ছিলো ইংরেজের শক্তি, জঙ্গি-জাহাজ, অস্ত্রশস্ত্র। শুধু তা-ই নয়—'বৃটিশ সাম্রাজ্য' নামক কল্পনাতেও ইংরেজের বিশ্বাস ছিলো প্রথমে—নযতো কি আর ভারত-বর্মা-সিংহল সুদ্ধ এক রাজ্য ব'লে কল্পনা করা যায়? সেই বিশ্বাস যেদিন হারিয়ে ফেললো ইংরেজরা, সেদিনই তাদের পতন শুরু হ'লো। ওরা গেছে আপদ গেছে, কিন্তু আমি ভাবি, যে-ধারণার ওপর ইংরেজের নিশেন উড়েছিলো, রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছিলেন, তা কি আমাদের মনের কাছেও এখন অস্পষ্ট হ'য়ে যায়নি?

না মশাই, আমি স্বদেশীওলা ছিলুম না কোনোদিন। সমস্ত ছেলেবেলাটা ঢাকায় কাটিয়েও কোনো দাদার দলে ভিড়িনি, মহাত্মা গান্ধীর চ্যালা হ'য়ে খদ্দরও পরিনি কখনো। চেয়েছিলুম নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, নিজের জোরে কিছু-একটা হ'তে, বড়ো কিছু হ'তে। আমি যে আমি, শুধু এতেই আমার পরিচয় হবে, কোনো দলে ভিড়েছি ব'লে নয়, কোনো গদিতে বসেছি ব'লে নয়। কিন্তু কেমন ক'রে? কী করবো আমি? কী করতে চাই জীবনে? কখনো ভাবি, বই লিখে নামজাদা হবো; কখনো ভাবি, কোনো জাহাজে যে-কোনো রকম চাকরি জুটিয়ে ভেসে পড়বো সমুদ্রে—জগৎটাকে দেখবো, জানবো। কনরাড পড়েছিলুম—ঘুমের আগে মশারির তলায় দূর বন্দরের গন্ধ পাই মাঝে-মাঝে। সব ছেলেমানুষি ভাবনা আরকি। একটা বিশাল আশা দুলে ওঠে বুকের মধ্যে; পরমুহূর্তেই মনে হয় আমি কিছুই পারবো না, কিছুই হবে না আমাকে দিয়ে।

নিশ্চয়ই ভুলে যাননি, দেশের কী অবস্থা তখন? দুনিয়া-জোড়া ব্যবসা-মন্দার ঢেউ এই বাণিজ্যহীন দূর দেশেও পৌঁচেছে; ছাঁটাই, বেকার, হাহাকার, ত্রাহি-ত্রাহি রব চারদিকে। ঢাকায় মাঝে-মাঝে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা। তার ওপর লবণ-আন্দোলন, গুলিগোলা, ডেটিন্যু। চাকরি আর ছুকরি—এই দুটি হ'লো আমার বয়সী ছেলেদের কথাবার্তার প্রধান বিষয়। ক্লাশের মেয়েরা, পাড়ার মেয়েরা—যে সব ললনাকে অন্তত কিছুটা চোখে দেখা যায়, তাদের বিষয়ে খুদকুঁড়ো খবর পিঁপড়ের মতো চেটে নেয় তারা। কোনো পঁচাত্তর টাকার মাষ্টারির গন্ধে সেরা ছাত্রেরা চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। কেউ-কেউ দিস্তে জুড়ে ষোড়শী প্রেয়সীর উদ্দেশে পদ্য লেখে। কেউ বলে, আহা, যদি অন্তত ডেটিন্যু ক'রে ধ'রে নিয়ে যায় তা'হলে মাসোয়ারাটা পাবো তো! কেউ রোববার বিকেলে সেজে-গুজে ব্রাহ্ম সমাজে গিয়ে চোখ বুজে নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান করে, মাঝে-মাঝে মিটিমিটি তাকায় সমবেতা ব্রাহ্মিকা ভগিনীদের দিকে, আর ঘাড় কাৎ ক'রে মুগ্ধ হ'য়ে শোনে, যখন লাল শালুর আড়াল থেকে নারীকণ্ঠে ব্রহ্মসংগীত নিঃসৃত হয়। কেউ, যদিও একৃশ ছোঁয়-ছোঁয়, বাবার হুকুমে নির্দিষ্ট তারিখে চুল ছাঁটে, সন্ধের পরে বাড়ির বাইরে থাকে না। আবার কেউ বা সমবয়সীদের চরিত্ররক্ষার ভার নিয়েছে, কোনো ছেলে কোনো তরুণীর সঙ্গে মেলামেশার চেষ্টা করছে এমনতর সন্দেহ হ'লেই দমাদ্দম মারধোর করে।... কিছু বললেন? হ্যাঁ, তা তো বটেই—শুধু এ-ই নয়, আনন্দও ছিলো। উঠতি বয়সে আনন্দের কি অভাব? ঐ তো কয়েকটা বছব প্রকৃতির সহৃদয়তা ভোগ করি আমরা। ঐ তো কয়েকটা বছর পৃথিবীকে বন্ধু ব'লে মনে হয়, বোকাকে প্রতিভাবান, চালিয়াৎকে মহাপুরুষ। দেখছেন তো, কত বড়ো ফাঁকি ঐ আনন্দ। তা, হ্যাঁ—তখনকার মতো। ঠিক বলেছেন, জীবনে সবই তখনকাব মতো। কতগুলো মুহূর্ত, জোনাকির মতো, একটা অসংলগ্ন ক্লান্তিকর নাটক, এক দৃশ্যের সঙ্গে অন্যটাব কোনো সম্পর্ক নেই। না কি আছে, কিন্তু সম্পর্কটা আমরা ধরতে পারি না? আপনি কখনো বের্গসঁ পড়েছিলেন? স্মৃতি? ঐ তো মশাই, ওখানে মতভেদ হ'লো আপনার সঙ্গে। আমি অতীতের জঞ্জাল জমাই না; আমি হেনরি ফোর্ডের সঙ্গে একমত: 'History is bunk.'

হ্যাঁ, ভালোও কিছু ছিলো বইকি। চায়ের দোকানে আড্ডা, খামকা হো-হো হাসি, নদীর ধারে বেড়ানো, ঘাসের ওপর গোল হ'য়ে ব'সে চীনেবাদাম খাওয়া, বুড়োর-দাড়ি খাওয়া। আর ভ্যালেনটিনো, ভিল্মা ব্যাঙ্কি, পোলা নেগ্রি—হলিউডের বিশ্বমোহিনীরা, হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি!

কিন্তু মাঝে-মাঝে অন্য এক জগতের জন্য ইচ্ছে জাগে আমার। বড়ো, উদার, খোলা হাওয়ার জগৎ—সেখানে আর 'মেয়ে দেখানো' হবে না, পাতানো বিয়ে বরপণ উঠে যাবে, সহপাঠিনীর চেহারা নিয়ে তেলতেলে ভাষায় চোর-চোর চর্চা করবে না ছেলেরা, এই বুড়িগঙ্গার ধারেই হাতে হাত ধ'রে জোড়ে-জোড়ে ঘুরে বেড়াবে যুবক-যুবতী। আরো অনেক কিছু বদলে যাবে: কেউ আর হাত দেখাবে না, ধন্না দেবে না সন্নেসির পায়ে, হন্নে হবে না চাকরির জন্য—আমরা কেউ-কেউ পর্যটক হ'য়ে চ'লে যাবো সাহারায়, কেউ কোনো সোনার খনি খুঁজে পাবো মানভূমে, কেউ ব্যাঙের ছাতার চাষ ক'রে কোটিপতি হবো, কেউ বা একলা একটা এরোপ্লেন নিয়ে উড়ে যাবো কলকাতা থেকে টোকিও—ছেলেরা, আর মেয়েরাও। আমার মনে হয় কোনো লুকোনো ম্যাজিক আছে, কেমিস্ট্রির কোনো অনাবিষ্কৃত ফর্ম্যুলা—আমারই মাথা থেকে সেটা বেরোবে কোনোদিন, তখন আমিই সারা দেশে রোশনাই জ্বালবো। বুঝেছেন তো, আমি মনে-মনে অসুখী ছিলাম, যৌবনের বিলাস ঐ দুঃখ, নিজেকে নিজের চেয়েও বড়ো ব'লে ভাবছি ব'লে যন্ত্রণা—কিন্তু আমি যেন বাড়তে পারছি না এখানে, যেন যথেষ্ট আলো নেই, হাওয়া নেই।—কিন্তু এরই মধ্যে একটু বৈচিত্র্য দেখা দিলো যখন ফটিক-মামা পাঁচ বছর পরে বিলেত থেকে ফিরলেন। আর, তাঁর ফেরার খবর পেয়েই মা কাজলকে আনিয়ে নিলেন তাঁর কাছে। কাজল-মামি, ফটিক-মামার স্ত্রী।

আমার মা তাঁর বিয়ের আগেই মাতৃহীন হয়েছিলেন, একমাত্র ভাই ফটিক তখন বছর পাঁচেকের। মেয়ের বিয়ে দিয়ে আমার দাদামশাই—গ্রামের পোস্টমাস্টার তিনি—দ্বিতীয় পত্নী সংগ্রহ ক'রে নিলেন; মা তাঁর নিজের সংসারে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েই ভাইকে নিয়ে এলেন নিজের কাছে। দশ বছরের ছোটো ভাই, মা নেই, দুরন্ত, ডনকুস্তি সাঁতার সাপ ধরায় ওস্তাদ, পড়াশুনোয় মন নেই তেমন—আমার মা তাকে অস্বাভাবিক ভালোবাসেন, কোনো বঙ্গমহিলার পক্ষে যতটা স্বাভাবিক, মাতৃহীনতার জন্য তার চেয়েও বেশি। ফটিক-মামাকে দেখে কেউ বলতো না বাঙালি ছেলের স্বাস্থ্য বা বাহুবল নেই, কলেজের স্পোর্টস-এ অনেকগুলো প্রাইজ তাঁর বাধা, কিন্তু দু-বারের চেষ্টাতেও বি. এস সি পরীক্ষায় উৎরোতে পারলেন না তিনি। তৃতীয়বার চেষ্টা না-ক'রে হঠাৎ বিলেতে চ'লে গেলেন। ঠিক হঠাৎও নয়—ফটিক-মামারই জেদ চাপলো বিলেতে যাবেন। মা ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন ফটিকের এই আব্দার মেটাতে। নিজেদের সামর্থ্য নেই, কিন্তু অন্য একটা উপায় আছে তো। আরে মশাই সেই পুরোনো কাসুন্দি আরকি : শ্বশুরের টাকা। আমার মা আর দাদামশাই একজোট হলেন এ-ব্যাপারে; যেতে চায় যাক, কিন্তু বিয়ে ক'রে যেতে হবে, নয়তো আবার একটা ধিঙ্গি মেম ধ'রে আনবে কোত্থেকে। টাকায় টাকা, নিশ্চিন্তিতে নিশ্চিন্তি। আমার বাবার একটু আপত্তি ছিলো—'আগে বরং এখান থেকে গ্র্যাজুয়েট হোক, তারপর—' কিন্তু বাবা একটু মৃদু মানুষ, মা তাঁকে এক দাবড়িতে থামিয়ে দিলেন। একবার যাক না বিলেতে, একটা মানুষের মতো মানুষ হ'য়ে ফিরে আসবে ফটিক।' 'বিলেত' : কী জাদুমন্ত্র কথাটায় ভেবে দেখুন! দেশের ছাই-চাপা আগুন নাকি বিলেতের বাতাসে, দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠবে। আর বিয়ে—আর-একটি মোক্ষম বড়ি! স্ত্রী—অচেনা একটা মানুষ, সে রইলো ছ-হাজার মাইল দূরে, তবু নাকি তারই টানে 'স্বভাবচরিত্র' ঠিক থাকবে ছেলের। ধন্য আমাদের মাদার ইণ্ডিয়া!

দু-মাসের চেষ্টায় ফটিকের জন্য যথোপযুক্ত শ্বশুর জোটানো গেলো। জলপাইগুড়িতে লরির ব্যবসা করেন ভদ্রলোক, চা-বাগানে শেয়ার আছে, যাকে বলে শাঁসালো। আর তাঁর কন্যাটি? তার মুখ-চোখ কেমন, চুল কত বড়ো, গড়নপেটন ভালো কিনা, গায়ের রং উজ্জ্বলশ্যাম না মধ্যমশ্যাম—এ সব নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনার পরে আমাদের বাড়ির মহিলামহল তাকে গ্রহণযোগ্য ব'লে ঘোষণা করলেন। হাত উপুড় ক'রে টাকা ঢাললেন তার বাবা - ফটিকমামার মতো উচ্চকুলীন জামাই পেতে হ'লে ওটুকু নাকি করতেই হয়। বিয়ের একমাস পরে ফটিক-মামা বম্বাই থেকে জাহাজ ধরলেন, সদ্যবিবাহিত মেয়েটি ফিরে গেলো জলপাইগুড়িতে পিত্রালয়ে।

মামা গিয়েছিলেন দু বছরের জন্য—গ্লাসগোর কোন পলিটেকনিকে পড়তে—কিন্তু পাঁচ বছর

ধ'রে তিনি কী করলেন আমি ঠিক জানি না। একবার শুনলাম চাকরি নিয়ে জর্মানিতে গেছেন, পরে শুনলাম আমেরিকায়। মা হাঁটুর ওপর কাগজ রেখে চারপাতা-জোড়া চিঠি লেখেন মাঝে-মাঝে, জবাব আসে অনেক দেরিতে, দু-চার ছত্রে—'তোমরা ভেবো না আমি ভালো আছি। সুবিধে হ'লেই ফিরে আসবো।' দীর্ঘ বিরহ, দীর্ঘ পথ-চেয়ে থাকা—তারপরে মামা যেদিন সত্যিই ফিরলেন, সেদিন তাঁর সঙ্গে আমার মা-র পুনর্মিলনের দৃশ্যটা হ'লো যাকে বলে মর্মস্পর্শী। ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন মা, তাঁর চোখের জল দরদর ক'রে পড়তে লাগলো; মামাও কাঁদছেন, চুমো খাচ্ছেন দিদির গালে, তাঁর কাঁধের ওপর মাথা এলিয়ে দিচ্ছেন। (একজন বিলেতফেরৎ শক্ত সমর্থ জোয়ান পুরুষকে ও-রকম কাঁদতে দেখে আমি একটু অবাক হলাম, কিন্তু পরে জেনেছিলাম ওটা শুধু পুলকাশ্রু নয়, অন্য একটা কারণও ছিলো।) দিদির সঙ্গে সম্ভাষণ শেষ ক'রে মামা অন্যদের দিকে তাকালেন। বাবাকে প্রণাম করলেন; 'রঞ্জু, কত লম্বা হ'য়ে গেছিস—দেখি কেমন জোর হয়েছে,' ব'লে আমার বাইসেপস-এ এমন চাপ দিলেন যে আমার মুখ দিয়ে 'উঃ' বেরিয়ে গেলো। 'মিনু, একেবারে লেইডি হয়ে গেছিস যে!' বলে আমার বোনকে কোমরে ধ'রে উঁচু ক'রে তুলে ধরলেন শূন্যে। মা একগাল হেসে বললেন, 'ফটিকের দস্যিপনা দেখছি তেমনি আছে।' মামা হঠাৎ বললেন, 'দিদি, এই মেয়েটি কে?' আমার বোন হেসে উঠলো খিলখিল ক'রে, কাজল-মামি লাল হ'য়ে উঠে মাথা নিচু করলেন, আর মা বললেন, 'ও মা, ও-ই তো তোর বৌ, কাজল! তুই যা, ফটিক, বিছানায় একটু গড়িয়ে নে—আর কাজল, তুমি দ্যাখো তো ওর কী লাগবে না-লাগবে। রাত্রে কী খাবি, ফটিক? কী-রকম ইচ্ছে?' 'সব খাবো, দিদি, তুমি যা রাঁধবে তা-ই খাবো, তোমার হাতের রান্না খাবার জন্যেই ফিরলাম।' 'দেখছো তো, কী-রকম পেটুক,' কাজলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন আমার মা। 'তোমাকে এবার রান্নায় হাত পাকাতে হবে।' একটু চোখে পড়ার মতো সমারোহ ক'রে তিনি যুগলশয্যা পেতে দিলেন ভাইকে, কিন্তু মামা অর্ধেক রাত্রি কাটিয়ে দিলেন মা-র বিছানায় শুয়ে-ব'সে গল্পে-গুজবে।

ফটিক-মামাকে নিয়ে খুব খানিকটা মাতামাতি হ'লো সেবারে, আমার দাদামশাই এলেন, দিদি আর জামাইবাবু এলেন মৈমনসিং থেকে, আত্মীয়ের ভিড় লেগে গেলো, আর মিনু জনে-জনে ব'লে বেড়াতে লাগলো যে মামা 'ঠিক সাহেবদের মতো দেখতে হয়েছেন, তাঁর সুটকেস খুললেই বিলিতি গন্ধ পাওয়া যায়।' মামাকে দেখে আমিও বেশ উত্তেজিত হলাম, কেননা আমার আত্মীয়-মহলে তিনিই একমাত্র ছিটকে বেরিয়েছেন সরকারি চাকরির বেড়াজাল থেকে, একমাত্র তাঁরই জীবনে ঘটেছে যাকে বলে অ্যাডভেঞ্চার, সেই কোন দূর আমেরিকাতেও গিয়েছেন, আর এখন বলছেন চাকরি নেবেন না, ব্যাবসা করবেন। আমি তাঁকে খুঁটে-খুঁটে জিগেস করি, তিনি প্যারিসে গিয়েছেন কিনা, ভেনিসে গিয়েছেন কিনা, ইংলণ্ডে থাকতে শেক্সপীয়রের কোন-কোন নাটক দেখেছিলেন, কিন্তু এ-সব প্রশ্নের যে-রকম উত্তর পাই তাতে আমার মন ভরে না; 'হ্যাঁ, লণ্ডনে থিয়েটার আছে অনেকগুলো', 'প্যারিস খুব সুন্দর সত্যি', 'রোমে গিয়ে যা বৃষ্টি পেয়েছিলুম!' —এই ধরনের কথাবার্তা, আমি যা শুনতে চাই, জানতে চাই, তার অনেক পেছনে প'ড়ে থাকে। তিনি ফ্র্যাঙ্কফর্টে ছিলেন শুনে আমি জিগেস না-ক'রে পারলুম না, নিশ্চয়ই গ্যেটের বাড়িটা দেখেছো সেখানে?' আর তক্ষুনি আমার মা ব'লে উঠলেন, 'তোর বইয়ের কথা রাখ তো, রঞ্জু—ফটিক এঞ্জিনিয়র মানুষ, ও-সবের কী জানে! 'এঞ্জিনিয়র' · কথাটা শোনামাত্র আমার মগজে অন্য কতগুলো বীজাণু জন্মালো; মামাকে আমি সেই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ফেললাম, যারা মাটির তলায় রেলগাড়ি চালায়, ব্রিজ দিয়ে বাঁধে এপার-ওপার মস্ত নদীকে, যাদের কেরামতিতে ফিল্মেও নাকি কথা বলছে আজকাল। আমার খারাপ লাগলো এ-কথা ভেবে যে ও-সব বিষয়ে আমি এতই অজ্ঞ যে মামাকে কোনো প্রশ্ন করার মতো যোগ্যতাও আমার নেই। আমাদের সঙ্গে মাসখানেক কাটিয়ে মামা চ'লে গেলেন কলকাতায়—ব্যাবসার জন্য সেখানেই থাকতে হবে তাঁকে; আমি ধ'রে নিলুম তাঁর ব্যাবসার সঙ্গে নদীর ওপরে ব্রিজ তৈরির কোনো সম্পর্ক থাকবে। মাঝে-মাঝে আসেন ঢাকায়, কয়েকদিন থেকে আবার চ'লে যান—এইভাবে বছরখানেক কাটলো। 'এবার কাজলকে নিয়ে যা, ফটিক'·· মা-র এই আর্জির জবাবে

মামা বলেন, দিদি, এখনো ঠিক সুবিধে হচ্ছে না—দিনকাল বড্ড খারাপ তো আর ক-টা দিন যাক। যে-দেশে 'বিলেতফেরৎ' হ'লেই কেউ-কেটা হবার দরজা খুলে যায়, সে-দেশে ফটিকের এখনো সুবিধে হচ্ছে না ব'লে বাবা যদি কখনো উদ্বেগ প্রকাশ করেন, মা সহাস্যে আশ্বাস দেন তাঁকে, 'তুমি ভেবো না তো। ত্রিগুণা নন্দ ব্রহ্মচারী ওর হাত দেখে কী বলেছিলেন মনে নেই? ফটিক বস্তা-বস্তা টাকা আনবে।

আমার মা-বাবার মতে আমি 'ছেলেমানুষ', কোনো পারিবারিক ব্যাপারে কথা বলার আমার অধিকার নেই, তা আমি চাইও না বলতে— কিন্তু আমার মনের মধ্যে একটা না-বলা নৈরাশ্য আস্তে-আস্তে জ'মে ওঠে, 'যেহেতু মাসের পরে মাস ফটিক-মামা কাজল-মামিকে নিয়ে যাচ্ছেন না। আমি মনে-মনে ছবি দেখি: কলকাতায় স্বামী-স্ত্রীর সংসার, নির্ঝঞ্ঝাট, পরিচ্ছন্ন—ভবানীপুরের হেশাম রোডে একটা ছোট্ট গোলাপি রঙের একতলা বাড়ি ঠিক ক'রে রেখেছি তাঁদের জন্য, একবার আমি পথ চলতে-চলতে দেখেছিলাম সকাল দশটার রোদ্দুরে, 'টু-লেট' ঝুলছিলো, ভেবেছিলাম কী সুখী তারা, যারা এই বাড়িটায় থাকবে। আমি চেয়েছিলাম একটি সুখী দম্পতিকে দেখতে, বয়সে আমার বড়ো কিন্তু বুড়ো নয়, আমি মাঝে-মাঝে বেড়াতে যাবো তাদের কাছে, নেবো তাদের সুখের অংশ, একটু হয়তো উঁকি দিতে পারবো দাম্পত্য জীবনের রহস্যে। ফটিক-মামা ফেরার পরে এই রকম একটা রূপকথা আমি বুনেছিলাম তাঁকে আর কাজল-মামিকে ঘিরে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, আমার এই স্বাভাবিক আর খুবই সংগত ইচ্ছেটা পূরণ করার জন্য মামার কোনো গরজ নেই; কেন নেই তাও আমি ভেবে পাচ্ছি না। আমার মনে হয় মা ফটিক মামাকে আরো পিড়াপিড়ি করলে পারেন, কিন্তু কেন তিনি তা করেন না, তার কারণটা আমি বোধহয় আঁচ করতে পারি। পাছে ফটিক ভাবে তিনি তার বৌয়ের ভার আর বইতে চাচ্ছেন না, এই ভাবনাটা কাজ করে তাঁর মনের তলায়। তাছাড়া, কাজলকে তার স্বামীর 'মনোমতো' ক'রে তুলতে হবে তো। আমার মা-ই সেই দায়িত্ব নিয়েছেন, কেননা তাঁর মতে কাজলের বাবার টাকা আছে কিন্তু 'হালচাল' নেই, অনেকগুলো ছেলেপুলে নিয়ে কেমন 'হ্যালহেলে' সংসার তাঁর, দ্যাখো না মেয়েকে ম্যাট্রিকটা পর্যন্ত পাশ করাননি—তিনি কি ইচ্ছে করলে পারতেন না এই পাঁচ বছরে কাজলকে পড়াশুনো করিয়ে, কার্সিয়ঙের কোনো কনভেন্টে রেখে, 'তৈরি' ক'রে তুলতে? না—ও-সব তাঁর মাথায় খেলে না। মা তাই সস্নেহ সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে ঘিরে রেখেছেন কাজলকে; তাকে কিনে দেন হালকা রঙের হালফ্যাশনের শাড়ি, কোন শাড়ির সঙ্গে কোন গয়না ঠিক মানায় তা বুঝিয়ে দেন, চুল বেঁধে দেন নিত্যি-নতুন কায়দায়, রান্না শেখান, পরিপাটি ক'রে ঘর গুছিয়ে নেন তাকে দিয়ে, নিয়ে যান এ-বাড়ি ও-বাড়ি বেড়াতে, আমাদের য়ুনিভার্সিটির নাটক দেখতে— চেষ্টা করেন চলনে-বলনে কাজলকে বেশ ঝকঝকে করে তুলতে, এমনকি আমাকেও অনুযোগ করেন আমি কেন মামিকে ইংরেজি শেখাই না, অন্তত খানিকটা কনভার্সেশন। কিন্তু কাজলের যেন কিছুতেই মন নেই, আগ্রহ নেই; বাপের বাড়িতে এই পাঁচ বছর আবশ্যিক আলস্যে কাটিয়ে সে যেন জীবনের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে। খেয়ে ঘুমিয়ে কিছু না-ক'রে মোটা হ'য়ে গেছে একটু; হয়তো বা একটু ভোঁতা। তার মুখের ভাবটি কেমন ঝিমোনো, যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলো; তাব হাসি তার ঠোঁটের বেখা ছাড়িয়ে সারা মুখে ছড়াতে পারে না; তার বড়ো-বড়ো চোখ দুটি যেন কুয়োর জলেব মতো নিশ্চল। আস্তে চলে, আস্তে কথা বলে। মা যা-কিছু বলেন সবই করে সে; সাজে, বেড়াতে যায়, ঘরের কাজ করে; কিন্তু ঐ ঝাপসা, ঝিমোনো, উদাস ভাবটি কখনোই যেন কাটাতে পারে না। একদিন মা জানতে পারলেন কাজলের শরীর ভালো যাচ্ছে না; মাথা ধরে, ভালো ঘুম হয় না রাত্রে। ব্যস্ত হ'য়ে ডাক্তার ডাকলেন।

৩

কিছু মনে করবেন না, আমি আর-একটু জিন নিচ্ছি। আপনি? এবারেও না? এক ফোঁটা সিন্‌ৎসানো? কী বললেন—বেলা হ'লো? এমন আর বেলা কী—বারোটাও বাজেনি। আর বেলা হ'লেই বা কী এসে যাচ্ছে বলুন। কোনো কাজ তো নেই। আপনি এখানে বেড়াতে এসেছেন, আর আমি—আমি কিছুই করি না, কোথাও যাই না, একা থাকি। আপনাকে হোটেলে ফিরতে হবে? কেন বলুন তো? তা শুনুন, আমার সঙ্গে লাঞ্চ খেয়ে যান না। প্লীজ। না, না, অসুবিধে কেন—কিচ্ছু অসুবিধে নেই। আমি সবই সুবিধে ক'রে নিয়েছি: একটা মানুষের জন্য দশটা চাকর, এই বাড়ি, বাগান, গোলাপফুল, অ্যালসেশান কুকুর। আর নেলির সম্পত্তি। ....আপনি রাজি তাহ'লে? থ্যাঙ্কস। থ্যাঙ্কস এ লট। সত্যি খুব ভালো লাগবে আমার। আপনি ঢাকায় ছিলেন, আপনি আমারই বয়সী, আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি সমজদার, দরদী। আসুন, কথা বলা যাক। আরাম ক'রে বসুন, বেশ হাত-পা ছড়িয়ে। পর্দাটা একটু টেনে দিই বরং, বাইরে রোদ্দুরটা কড়া হ'য়ে উঠছে। আচ্ছা, অন্য একটা জিনিশ দিই আপনাকে—চুমুক দিয়ে দেখুন, কেমন লাগে। ভালো না-লাগলে ফেলে দেবেন। অ্যানিস, মৌবিগন্ধী মদ।—এ-সব কোথায় পাই? আরে মশাই, জোগাড় ক'রে দেবার লোক আছে। অন্য একটা জিনিশও চাই আমার, রোজ রাত্রে। রাত্রে ভয় করে আমার, জানেন। দু-জোড়া অ্যালসেশান পুষি, বাঘের মতো দেখতে, সিংহের মতো গর্জন। সারাদিন খাঁচায় বন্ধ থাকে তারা, অন্ধকারে, সারাদিনে একবার খায়, রাত্রে ছেড়ে দিই। কোনো চোর ডাকাত খুনে গুণ্ডার সাধ্যি নেই আমাকে তাক করে। তবু—কুকুব তো জন্তু, তার আর আমার জগৎ তো এক নয়। রাত্রে আমার একা লাগে জানেন, বড্ড একা। তখন একজন মানুষ চাই আমি, একজন সঙ্গী—সঙ্গিনী। তার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোবো, তার বুকে মুখ চেপে ঘুমোবো। এক উষ্ণ শরীর, নিশ্বাসের তালে উঠছে পড়ছে, জীবন্ত—তার স্পর্শে আমার ভয় কেটে যায়। ভাগ্যিশ স্ত্রীলোক আছে পৃথিবীতে। ভাগ্যিশ তারা সকলেই কুসংস্কারেব ঢিপি নয়।—আপনি যেন চমকে উঠলেন কথাটা শুনে? আরে মশাই ওতে কী আছে, আমি তো জোর করছি না কারো ওপর। তারা স্বেচ্ছায় আসে, ব্যাগ ভর্তি টাকা নিয়ে চ'লে যায়। পরিষ্কার দেনা-পাওনা, ঝামেলা নেই। যেমন আমরা অসুখ করলে ডাক্তারে ওষুধে খরচ করি, এও তেমনি। কেউ-কেউ ঘুমোবার জন্য ওষুধ খায় রোজ—তেমনি আমার পক্ষে, এটা। না-হ'লে চলে না। ..অবাক হচ্ছেন? ভাবছেন এই বুড়ো বয়সে—? ঐ তো, আপনি দেখছি সবগুলো পুবোনো কুসংস্কার এখনো কাটাতে পারেননি। যৌবনে ব্রহ্মচর্য চলে, তখন জীবন এমন চারদিক থেকে ছেঁকে ধবে যে দু-এক দফা বাদ পড়লেও কিছু এসে যায় না; কিন্তু বেলা যখন পড়ন্ত, যখন ভীষণ লম্বা রাতগুলো বুকের ওপর পাথরের মতো ভারি, তখন কী ক'রে নিশ্বাস নেয়া যায় বলুন, যদি না পাশে থাকে অন্য কোনো শরীর—প্রাণ নিয়ে, স্পর্শ নিয়ে, জন্তুর কোমলতা নিয়ে? আর তাছাড়া—একটা বহুকালের অভ্যেস আমাব, হঠাৎ ছেড়েই বা দেবো কেন? অনেক অভ্যেস নিজেরাই ছেড়ে যায় আমাদের, যেগুলো বিশ্বস্তভাবে টিকে থাকে শেষ পর্যন্ত, আমাদের শরীরের মরণ-দশাকে পরোয়া না-ক'রে, সেগুলোর মতো সতীলক্ষ্মী আর কী আছে?—আজ্ঞে? দ্বিতীয়বার কেন বিয়ে করিনি? হাসালেন মশাই! শুনুন তাহ'লে, একটা সাফ কথা বলি আপনাকে। আমার মনে·হয় এ-ই ভালো, এই নগদ টাকার সম্পর্ক, ঝাড়ঝাপটা, কোনো জের টানতে হয় না। যদি আমাদের জীবন হয় শুধু পর-পর মুহূর্ত, সারি-সারি জোনাকি, অসংবদ্ধ, অর্থহীন—তা'হলে কি আজকের ব্যাপারে আগামী কালকে রঙিন বা কালো ক'রে তোলার কোনো মানে হয়? আপনি একমত নন? আপনি আইডিয়েলিস্ট? রোমান্টিক? কিন্তু আপনিই বলুন, এই যাকে আমরা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বলি, তারও পেছনে কি টাকা নেই? তোমার টাকা আমার হোক, আমার দেহ তোমাব হোক : এই হলো আসল বিয়ের মন্ত্র। এরই ওপর দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীরা। একটু রকমফেরও হয় কখনো-কখনো : আমার টাকা তোমার হোক, তোমার টাকা

আমার হোক। যেমন আমার বেলায় হয়েছিলো। আরে মশাই, আই. সি. এস. চাকুরে না-হ'লে আমি কি রতনদাস ব্রোকারের মেয়ের টিকি ছুঁতে পারতুম! মস্ত কারবারি লোক, বম্বাইতে একডাকে চেনে সবাই। হ্যাঁ, প্রেমে পড়েছিলুম বইকি। কিন্তু প্রেমে পড়া সম্ভব হয়েছিলো। মালাবার হিল্-এর নলিনী ব্রোকারের সঙ্গে। মনে-মনে তৈরি ক'রে নিয়েছিলুম লোকেরা যাকে প্রেম বলে। তাকেও বোঝাতে পেরেছিলুম সে আমার প্রেমে পড়েছে। কয়েক দিন মেলামেশার পরেই। ইচ্ছে করলে কী না পারে মানুষ? আমাদের ইচ্ছে, আমাদের বুদ্ধি: সাংঘাতিক যন্ত্র সব। বিয়ে তো করবোই, তা'হলে নেলিকেই করা যাক না। রূপ আছে দেখতে পাচ্ছি, বেশ নরম-তরম স্বভাব, একেবারে কোনো গুণ নেই তা হ'তে পারে না। অন্তত বাড়ির শোভা হবে, অঙ্গের ভূষণ হবে পার্টিতে। আব রতনদাসের টাকা। এর চেয়ে ভালো কোথায় পাবো? ক-টাই বা ধনীকন্যা আছে সারা দেশে। তাছাড়া ঘুরে-ঘুরে কোর্টশিপ করার সময় নেই আমার, চাকরিতে যোগ দিতে হবে শিগগিরই। বড়ো ক্লান্তিকর ব্যাপার, এই কোর্টশিপ। এখানে যাও, সেখানে যাও, মিটিমিটি হাসি, খুচরো কথা, উঠে দাঁড়াও, টান হ'য়ে বোসো, কোলের ওপর প্লেট নিয়ে শব্দ না-ক'রে ডালমুট খাও খুঁটে-খুঁটে—ন্যাকামি, সময় নষ্ট। আসলে সব বিয়েই পাতানো বিয়ে, বানানো বিয়ে। হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে একে, একেই ধ'রে ফেলা যাক। আর, বিয়ে করবো স্থির করামাত্র প্রেমের সমীরণ বইতে লাগলো আমার মনে। সহজেই আমার শিকার হ'লো নেলি।

কিন্তু একটা বিষয়ে আমার হিশেবে ভুল হয়েছিলো। বিয়ের পরে যত দিন যায়, তত দেখি নেলি আমাকে সত্যি ভালোবাসছে। ভাবটা যেন ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্। আমার হাসি পায়, মনের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম বিরক্তি চুলকোনির মতো গজিয়ে ওঠে। আমি যা-কিছু বলি তাতেই সে মুগ্ধ, সব বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত, আমাকে সুখী করার জন্য, খুশি করার জন্য ঘর সাজায়, দেহ সাজায়, নতুন-নতুন খাবার তৈরি করায় বাবুর্চিকে দিয়ে। আর অত রূপ আর ঐশ্বর্য নিয়েও অমন সরল, করুণ, অসহায় ভঙ্গি তার—সত্যি যেন লতার মতো পেঁচিয়ে থাকতে চায় আমাকে, আমার আশ্রয় ছাড়া একদিনও সে বাঁচবে না। আশ্চর্য উল্টোপাল্টা জিনিশ মানুষের মধ্যে থাকে মশাই। দেখুন না, এই নেলি—ছেলেবেলায় স্কুলে পড়েছে সুইৎসার্লাণ্ডে, কত রকম লোক দেখেছে বাচ্চা বয়স থেকে, তার বাবার বাড়ির এক-একটা পার্টিতে বম্বাইয়ের মাস্তান লোকেরা কেউ বাদ যায় না, কত ফ্যাশন জানে, কতগুলো ভাষা বলতে পারে—অথচ তার মন, তার চিন্তা-ভাবনা, এগুলো এখনো ছেলেমানুষির স্তরে প'ড়ে আছে, তার ভালোত্বের ধরনটা যেন বাংলাদেশের গ্রাম্য বালিকার মতো, অনেক-কিছু জানে না ব'লেই সে সহজে সব বিশ্বাস করে। পরে আমি বুঝেছিলুম যে আমাদের অনেক ধনী পরিবারের এটাই ধরন, বাইরে যেমন চটকদার, ভেতরটা তেমনি সনাতনী। মালাবার হিল-এ রতনদাসের বাড়িতে আছে অটোম্যাটিক লিফট, ঘরে-ঘরে টেলিফোন, কিন্তু মেয়েকে মানুষ করেছেন, এমনভাবে যাতে কোনো নতুন চিন্তার ছোঁয়া না লাগে। নেলি ফরাশি জানে, অথচ মোপাসাঁর কোনো গল্প পড়েনি, আনাতোল ফ্রাঁসের পাতা ওল্টায়নি, এ-কথা শুনে প্রথমে আমি একটু অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু পরে বুঝলাম বইয়ের জগতে ঘোরাঘুরি করার অভ্যেসটাই তার হয়নি কখনো। স্কুলে-পড়া লামারতিনের লাইন এখনো মনে আছে তার, দোদের গল্পও ভোলেনি; কিন্তু ঐটুকু যে ভূমিকা মাত্র, এক বিশাল জটিল মহাদেশের দিকে প্রথম পদক্ষেপ, তা সে জানে না, হয়তো ঐ নানা দেশের ধনীকন্যাদের জন্য স্থাপিত রোমান ক্যাথলিক স্কুলে কেউ তাকে তা ব'লেও দেয়নি। বাড়িতেও না। মফস্বলে থাকি আমরা, নেলির হাতে অনন্ত অবসর—সে তা কাটায় মাঝে-মাঝে টুংটাং পিয়ানো বাজিয়ে, মাঝে-মাঝে প্যাস্টেলে ছবি এঁকে, আর রাজ্যের ছবিওলা মেয়েলি পত্রিকার পাতা উল্টে। লণ্ডন থেকে, প্যারিস থেকে, ন্যুয়র্ক থেকে সে আনায় ও-সব ফ্যাশনের পত্রিকা, ঘরকন্নার পত্রিকা, বাগান করার পত্রিকা, রান্নার বই। একজন সুখী, ধনী, বিবাহিত মহিলার পক্ষে আদর্শ জীবন বলতে এটাই বোঝায়, এই শিক্ষাই তার মা-র কাছে সে পেয়েছে। একদিকে এই ফ্যাশনের জৌলুশ, বাথরুমে বিপুল সরঞ্জাম, ড্রেসিংটেবিলে অগুনতি শিশি-কৌটো, আর-একদিকে তার সরলতা,

যাকে প্রায় অশিক্ষা বলা যায়, আমি তার স্বামী হয়েছি ব'লেই অন্ধ আস্থা আমার ওপর—যেন সত্যি সে আমাকে তার সমস্ত হৃদয় দান ক'রে ব'সে আছে,আমাকে আঁকড়ে আছে তার বালিকা-মনের সবটুকু ক্ষীণ ও দুরন্ত শক্তি দিয়ে। আমার দম আটকে আসে তার ভালোবাসা; আমার মনে প'ড়ে যায় ঢাকার কথা, যখন কোনো রাত্রে বাড়ি ফিরতে দেরি হ'লে, আমি দেখতাম মা লণ্ঠন জ্বেলে না-খেয়ে ব'সে আছেন জানলার ধারে, ঠাকুমা বিছানা ছেড়ে মালা জপছেন চৌকাঠের কাছে, বাবাও ঘুমোননি। আর শুধু আমারই জন্য নয়—আমার দুই বোন, জামাইবাবু, ফটিক-মামা, কাজল-মামি, সকলের জন্যই এই ব্যাকুলতা তাঁদের, আমার মা যেন সহস্র দিকে সহস্র বাহু বাড়িয়ে দিয়েছেন আমাদের বাঁচাবার জন্য; রোগ, জরা, দারিদ্র্য—তাঁর কাছে এ-সবের চেয়েও অনেক বেশি কষ্টের ছিলো কোনো প্রিয় মুখের অদর্শন, যে-কষ্ট, জীবনের সাধারণনিয়ম অনুসারে, রোগের চেয়ে অনিবার্য, দারিদ্র্যের চেয়ে প্রতিকারহীন। আমি তখন থেকেই ভালোবাসার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, কিন্তু নেলিকে তা কেমন ক'রে বোঝাই? তা ব'লে এমন নয় যে আমি কখনো ভালোবাসতে চাইনি। চেয়েছিলাম, পারিনি। তাই আমার বিদ্রোহ।

আপনি যা ভাবছেন তা নয়, আমি কাজলের প্রেমে পড়িনি। বা হয়তো পড়েছিলাম। কোনো-এক সময়ে, কোনো-একদিন, কোনো-এক রাত্রে—কিন্তু সেটা ছিলো অন্য এক উত্তপ্ত প্রেমপিণ্ড থেকে ছিটকে-পড়া উল্কা। বা হয়তো একের ঋণ অন্যের কাছে শোধ করেছিলুম—ঠিক জানি না। সেই পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার আমি তো আর নেই, কেমন ক'রে বলবো? ধ'রে নিন এই 'আমি' আসলে আমি নই, অন্য কেউ—এক যুবক, আপনার সঙ্গে একই বছরে যে জন্মেছিলো, ছিলো একই শহরে, একই পাড়ায়, একই সময়ে। কিন্তু আপনার দেখছি অনেক-কিছুই মনে নেই, আমি কি আপনাকে মনে করিয়ে দেবো? আপনি তো দেখেছিলেন কাজলকে; তার সুন্দর ঠোঁট, যার ফাঁক দিয়ে কথা বেশি বেরোতে না; তার বড়ো-বড়ো চোখ, যাতে নিষ্প্রাণ আস্তরণের তলায় লুকিয়ে ছিলো জল আর আগুন—তাও কি মনে নেই আপনার? ...কী কাণ্ড দেখুন, কেমন ভুল হ'লো হঠাৎ, মুহূর্তের জন্য মনে হ'লো আপনি সবই জানেন, সকলকেই দেখেছিলেন—শুধু আর-একবার শুনতে চাচ্ছেন আমার মুখে। না—আমার মা যা ভেবে উৎফুল্ল হয়েছিলেন, তা ঘটেনি; কাজলের গর্ভে পত্নীপ্রেমের নিদর্শনস্বরূপ সন্তান বেখ যাননি ফটিক-মামা; ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে বললেন—স্নায়বিক গোলযোগ। অনেকগুলো ওষুধ লিখে দিলেন ডাক্তার, কিন্তু মা-বাবা দু-জনেই হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাসী, তাঁদের ধারণা অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ বড্ড কড়া, আখেরে তাতে ক্ষতি হয় শরীরের, বা এক অসুখ সারাতে গিয়ে আর-একটার সৃষ্টি করে। তাছাড়া, যা দাম! ভেবে-চিন্তে অনাদি বর্ধনকে ডাকলেন তাঁরা। অনাদি বর্ধন—আমার বাবার কোনো-এক রকম আত্মীয়—অন্তত তা-ই শুনেছি আমি—ছেলেবেলায় গ্রামে থাকতে কিছুটা নাকি চেনাশোনাও ছিলো তাঁদের। আত্মীয়তার রহস্য-উদঘাটনে আমার বাবাকে বলা যায় একটি ছোটোখাটো আইনস্টাইন : মাঝে-মাঝেই এমন হয় যে কোনো অচেনা লোকের নাম আর অল্প একটু পরিচয় শোনামাত্র তিনি ব'লে দেন সে অমুকের মামাতো বোনের দেওর, বা তমুকের পিসেমশাইয়ের ভাইঝি। ও-বিষয়ে যেমন তীক্ষ্ণ তাঁর স্মরণশক্তি, তেমনি ক্লান্তিহীন তাঁর উৎসাহ, কোনো নাম ভোলেন না, কার ছেলের সঙ্গে কার মেয়ের বিয়ে হয়েছিলো, কে কোথায় থাকে, কী কর্ম করে, ছেলেপুলে ক-টি, কার ঠাকুর্দা কোন অসুখে মরেছিলেন—এই ধরনের তথ্যের একটি বিপুল ভাণ্ডার হ'লো তাঁর মস্তিষ্ক; অথচ শুনি তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ইতিহাসে ফেল করেন একবার, পরের বারে কান ঘেঁষে উৎরে যান। শুধু তা-ই নয়; যে-সব মানুষকে তিনি চোখে দ্যাখেননি কখনো, বা শুধু চোখেই দেখেছেন, বা বড়োজোর একদিন কোনো বিয়ে-বাড়িতে পাঁচ মিনিট কথা বলেছেন যাদের সঙ্গে, তাদের প্রতিও একটু মমতা অনুভব করেন আমার বাবা, তারা ধূসর, সুদূর, অস্পষ্টভাবে তাঁর আত্মীয় ব'লেই। কিন্তু অনাদি বর্ধনের সঙ্গে বাবার আত্মীয়তাটা বোধহয় চার-পাঁচ ডিগ্রি দূরে সরানো, তাছাড়া অন্য ব্যবধানও আছে। বাবার মতো চাকুরিজীবী নন অনাদিবাবু, একজন নামজাদা ডাক্তার, ঢাকার একমাত্র এম. বি. পাশ হোমিওপ্যাথ, ব্যস্ত মানুষ। ডাক্তারি পেশায়

তাঁর কৃতিত্বের একটি প্রমাণ হ'লো তাঁর হলদে-আর-সবুজ রঙের এক-ঘোড়ায় টানা পাল্কি-গাড়িটা, একটাই ঘোড়া, কিন্তু জাতে উঁচু, টগবগে, ঢাকার ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়াগুলোর মতো মিরকুট্টে নয়। মস্ত কালো ঘোড়ার পেছনে হলদে-সবুজ গাড়িটা আমার মনে কিছুটা শ্রদ্ধার উদ্রেক করে, কিন্তু বাবা বলেন, 'অনাদির চার-ঘোড়ায় টানা ব্রুহামে চ'ড়ে বেড়াবার কথা—অবস্থার ফেরে কী না হয়? ওলগঞ্জের ছ-আনি বাড়ির ছেলে, সে কিনা আজ হোমিওপ্যাথি ক'রে খাচ্ছে!' (ঐ 'ছ-আনি' কথাটার মানে বুঝতে আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিলো।) ছ-আনির জমিদারি চাল বাবা কিছুটা দেখেছিলেন তাঁর ছেলেবেলায়, সে নাকি এলাহি কাণ্ডকারখানা; কিন্তু গুপী বর্ধনের সাত ছেলের এগারো বৌয়ের একুশটি পুত্রের মধ্যে পত্নীদের নিমন্ত্রণ হ'লো মিতুর জন্মদিনে। ততদিনে, আমার মা-র ব্যাকুল চিঠি পেয়ে, ফটিক-মামাও এসে গেছেন—প্রায় পাঁচ মাস পরে এলেন তিনি এবারে। বেশি চিঠিপত্র লেখার অভ্যেস নেই তাঁর, তিনি ঠিক কী করছেন তা আমাদের কাছে অস্পষ্ট, এদিকে দেশে ফিরেছেন তাও এক বছর হ'তে চললো। প্রথমে শুনেছিলাম, তিনি লোহার কারখানা খুলেছেন হাওড়ায়, কিছুদিন পরে জানা গেলো ইলেকট্রিক বালব তৈরি করার জন্য শেয়ার বিক্রির চেষ্টায় আছেন। আমি, যে মনে-মনে ভাবছিলো ফটিক-মামা হয়তো পদ্মার ওপরে ব্রিজ বেঁধে দেবেন যাতে ঢাকায় ট্রেনে চেপে আট ঘণ্টা পরে কলকাতায় নামা যায়, সেই আমার মনটা বেশ দ'মে যাচ্ছিলো, ফটিকের কথা উঠলে বাবার কপালেও রেখা পড়তে দেখি মাঝে-মাঝে। কিন্তু মামাকে দেখামাত্র আমার মা অন্য কারণে আঁৎকে উঠলেন—'এ কী ফটিক, এ কী চেহারা হয়েছে তোর?' ততদিনে মামার বিলেতি চেকনাই ঝ'রে গেছে অবশ্য, কিন্তু দুর্গাপ্রতিমার অসুরের মতো তাঁর ঐ পেশীবহুল স্বাস্থ্যটি কোথায় যে টোল খেয়েছে তা অন্য কারো চোখে মালুম হ'লো না। মামা হেসে বললেন, 'দিদি, তুমি দেখছি সকলেরই অসুখ বাধাতে ভালবাসো। কই, কাজলকে তো দিব্যি মোটাসোটা দেখছি। আমারও কিছু হয়নি।' কিন্তু কাজলের অসুখের ভাবনা ততক্ষণে উবে গেছে মা-র মন থেকে (অনাদিবাবুর ওষুধে বোধহয় উপকারও হয়েছিল তার); ফটিক রোগা হ'য়ে গেছে, ফটিকের শরীর ভালো যাচ্ছে না—এ ছাড়া মা-র মুখে আর কথা নেই। এ-জন্যে অবশ্য আর ডাক্তার ডাকা হ'লো না; মা নিজেই ডাইগনসিস করলেন, প্রেস্ক্রুপশনও তাঁর। ও-সব চাকর-বাকরের রান্না খেলে শরীর টিকবে কী ক'রে? কলকাতায় কি ছাই খাঁটি দুধ পাওয়া যায়, না কি মাছই তেমন স্বচ্ছন্দ! অতএব বাবা বিপুল পরিমাণে বাজার ক'রে আনছেন (হয়তো ধার করতে হচ্ছে), ততোধিক বিপুল বেগে রান্না করছেন মা, আর মাঝে-মাঝে বলছেন, 'এই মাছ-পাতুরিটা কাজল করেছে। মুর্গি-রোস্ট কিন্তু কাজলের রান্না আজ। ঐ কাঁচা টকটা চেখে দেখিস ফটিক, কাজলের তৈরি।' আর কখনো বা নিরিবিলি সময়ে বলেন, 'ফটিক কাজলকে এবার নিয়ে যাবি নাকি? কিচ্ছু ভাবিস না, আমি তোদের সঙ্গে যাবো, সংসার গুছিয়ে দিয়ে চ'লে আসবো। কেমন ফ্ল্যাট রে তোর? দু-খানা ঘর? তা ওর বেশি আর লাগবেই বা কিসে? পাঁচতলায়? বাঃ, অত উঁচুতে যখন নিশ্চয়ই খুব আলো-হাওয়া? দেখছিস তো, কাজল চমৎকার রাঁধতে শিখেছে আজকাল; একটা ছোকরা চাকর কি ঠিকে ঝি রেখে নিস, দিব্যি চ'লে যাবে।' 'আঃ দিদি, থামো তো!' ব'লে ফটিক-মামা সাত-পদের মধ্যাহ্নভোজনের পরে দিবানিদ্রায় তলিয়ে যান। এইভাবে চলছে।

৪

আচ্ছা, আজকাল নাকি আর কইমাছ পাওয়া যায় না বাংলাদেশে—মানে, পশ্চিম বাংলায়? মাগুরও না? অ্যাঁ—ইলিশ পর্যন্ত স্বপ্ন হ'য়ে গেছে? হাসালেন আপনি। ...তা ভালো, আমরা সব আলালের ঘরের দুলাল হ'য়ে ছিলুম তো, এবারে একটু শিক্ষা হ'লে ক্ষতি নেই। নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে খাওয়া নিয়ে কী-রকম হুলুস্থুল ছিলো ঢাকায়—যারা মোটামুটি মধ্যবিত্ত তাদের বাড়িতেও—কত

ফেলাছড়া, সময় নষ্ট, হৈ-চৈ? এক-একটা ছোটোখাটো নেমন্তন্নেও শুধু পাতে যা প'ড়ে থাকতো তা ভেবে হয়তো সেই সব নিমন্ত্রণকর্তারই চোখে জল আসে আজ, বুড়ো বয়সে কোথাও কোনো গান্ধী-কলোনি বা সুভাষ-পল্লীর চালাঘরে ব'সে। ধরুন না আমার মামার অনারে ভোজের পালা—ফটিকের 'শরীর সারাবার' জন্য যজ্ঞির আয়োজন। শুরু হ'লো উচ্ছে-আর-মৌরলামাছের তেতো চচ্চড়ি দিয়ে, তারপর ডালের সঙ্গে পটলভাজা আর মুড়মুড়ে কাচকিমাছের ঝুড়ি, তারপর কুচকুচে কালো কইমাছ আবির্ভূত হলেন, টুকটুকে লাল তেলের বিছানায় ফুলকপির বালিশের ওপর শোয়ানো—এক-একটা এত বড়ো যে কাঁসারিতে প্রায় ধরে না। আবার কোনোদিন হয়তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইলিশ : ভাজা, সর্ষেতে ভাপানো, কলাপাতায় পোড়া-পোড়া পাতুরি, কচি কুমড়োর সঙ্গে কালোজিরের ঝোল, ল্যাজা-মুড়োর সদগতি হলো কাঁচালঙ্কা-ছিটোনো লেবুর রসের পাৎলা অম্বলে। কোনোদিন রুই মাছের মুড়ো দিয়ে রাঁধা মুগডাল, নারকোল-চিংড়ি, চিতলের পেটি। কোনোদিন ধনেপাতা আর ডালের বড়ির সুগন্ধে মাখা বিশাল পাবদা, কোনোদিন আদা-পেঁয়াজে খণ্ড-খণ্ড আলুর সঙ্গে মাংসালো মাগুর। আসছে লালবাগের মালাইওলা দই, কালাচাঁদের প্রাণহরা সন্দেশ, ছানার অমৃতি। সকালে চায়ের সঙ্গে মা থরে-থরে সাজান ডিম, টোস্ট-মাখন, তিন রকম জ্যাম, রসগোল্লা, ক্ষীরের মালপো; কোনোদিন বা ফুলকো লুচির সঙ্গে চাক-চাক বেগুনভাজা আর কিসমিস-ছিটোনো মোহনভোগ; আবার কোনোদিন হয়তো কল্লু মিঞার খাস্তা বাখরখানি—যার সুগোল আকৃতিব ওপরটি হ'লো ব্রাউন, হালকা, মুড়মুড়ে, আর তারপর যা স্তরে-স্তরে ক্রমশ হ'য়ে আসে মোলামেয ও সারবান—আর সেই সঙ্গে স্নিগ্ধ পান্তুয়া, আর নেহাৎ একটা 'কিছুমিছু' হিশেবে চিনিতে বসানো চীনেবাদাম। তাছাড়া আমার ঠাকুমার নিরিমিষ রান্না—সে আবার অন্য এক জগৎ, মশাই, সেখানকার বাসিন্দাবা ভারি বিনয়ী, ছেঁচকি ঘন্ট শাক শুক্তো এই সব অনুজ্জ্বল নামে বিরাজ করে, কুমড়ো-বীচি লাউয়ের খোশার মতো ওঁচা জিনিশও সেখানে সম্মানিত। কিন্তু ঐ সব বিজ্ঞাপনহীন সৃষ্টি থেকে যা আস্বাদ বেরিয়ে আসে তা প্যারিসের সেরা রাঁধুনির কল্পনাতীত। যেমন রামধনুর সাতটাকে মিশিয়ে-মিশিয়ে অসংখ্য রং বের ক'রে আনেন চিত্রশিল্পীরা, তেমনি মাত্র তিনটে-চারটে মোটা আস্বাদের মধ্যেই জিভের জন্য বিপুল বৈচিত্র্য রচনা করেন আমার মা-ঠাকুমারা, সেই তাঁদের স্টুডিওতে, যার সরঞ্জাম অত্যন্ত মামুলি, আর পেছনে অর্থবলও নেই। কী ক'রে পারতেন? আপনি বলছেন ভালোবাসা? বঙ্গললনার বিখ্যাত স্নেহবৃত্তি? দুঃখিত, আপনার সঙ্গে একমত হ'তে পারছি না। খাটুনি, গাধা-খাটুনি—যে-উপায়ে যন্ত্রযুগের অনেক আগে মিশরী পিরামিড তৈরি হয়েছিলো, এও তা-ই। বলা যেতে পারে দাসপ্রথা। মেয়েদের দাসী ক'রে রাখলে অনেক বিষয়েই সুবিধে পুরুষের, তা তো বোঝেন। ভাবতে আমার এখন ভির্মি লাগে মশাই, মাথা ঘুরে যায়। আপনাকে বলবো কী—এত দেশে গিয়েছি, বিলাসিতাও ভোগ করেছি খানিকটা, কিন্তু খাওয়ার এমন ঘটাপটা আর কোথাও দেখিনি। কিন্তু কী অপব্যয় বলুন, কী অত্যাচার! ও-সব উঠে গেছে, আপদ গেছে। ... সত্যি কি উঠে গেছে একেবারে? আপনি জানেন, বাংলাদেশে কেউ কি আজকাল সর্ষে-ধনেপাতা-নারকোল মিশিয়ে কচুবাটা রাঁধতে জানে? শালুক ফুলের ডাঁটা দিয়ে খেঁসারি ডাল? কুচি-কুচি নিমপাতা-ভাজার সঙ্গে গিমার বড়া? কোনো বাড়িতে কাসুন্দি তৈরি হয়? তাহ'লে কি পুরোপুরি হারিয়ে গেলো এই ললিতকলা, জগতের সভ্যতায় বাঙালির বা বঙ্গনারীর এই বিশেষ অবদান? ...আজ্ঞে? না, আমি বহুকাল বাংলার বাইরে, বহুকাল। একবার বেরিয়ে আসতে পেরেছিলাম, আর ফিরে যাইনি।

একেবারে যাইনি তা নয়, কিন্তু থাকিনি। ইচ্ছে ক'রেই থাকিনি, থাকতে ইচ্ছেও হয়নি। কিছু মনে করবেন না, আপনাদের সোনার বাংলায় আমার আর চিত্ত নেই। কর্তব্য সবই করেছি; পার্টিশনের পর বাবাকে বাড়ি কিনে দিয়েছি দমদমে, মাসে-মাসে টাকা পাঠিয়েছিলুম, গিয়েছি মাঝে— মাঝে মা-বাবা দিদির সঙ্গে দেখা করতে। ছোটো বোনকে ইকনমিক্স পড়তে লণ্ডনে পাঠিয়েছিলুম, এখন সে আমাদের এক এম্বাসির ফার্স্ট সেক্রেটারির স্ত্রী। যাকে বলে পরিবারকে টেনে তোলা, আমি

তা করেছি বইকি। কিন্তু, সেই অনেক আগে—যেদিন চাঁদপাল ঘাট থেকে 'সিটি অব ক্যালকাটা' জাহাজ ধরেছিলুম, সেদিনই আমি মনে-মনে বিদায় বলেছিলুম বাংলাদেশকে। ভালো করিনি? যাকে বলে সুবুদ্ধির কাজ? কলকাতার কী অবস্থা দেখছেন তো। যেন ম'রে যাচ্ছে শহরটা, বঙ্গোপসাগরে ডুবে যাচ্ছে। না, ওটা কবিত্ব হ'লো—ডুবে যাচ্ছে নিজেরই নোংরায়, নর্দমায়, মাটির তলার বড়ো-বড়ো পাইপগুলো ফেটে গিয়ে একদিন ভাসিয়ে নেবে কলকাতাকে। আমি চাকরির জন্য বেছে নিয়েছিলুম সেন্ট্রাল প্রভিন্স—মানে, মধ্যপ্রদেশ; তখনও বেশ নিরুপদ্রব ছিলো অঞ্চলটা। বৌ বেছে নিয়েছিলুম গুজরাটি।। মেলামেশা ছিলো যাদের সঙ্গে তারা কেউ তামিল কেউ মরাঠী কেউ পঞ্জাবি, কেউ ইংরেজ—মানে সব 'ব্রাদার-অফিসার' আরকি, বা মিলিটারির হোমরাচোমরা—সেই সব লোক, যাদের চওড়া কাঁধে হেলান দিয়ে ভারতমাতা কোনোমতে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখছেন তো আমার জীবনটা কী-রকম আন্তঃপ্রাদেশিক (ঠিক হ'লো কি বাংলাটা?), কী-রকম আন্তর্জাতিক। তিন বছর পর-পর ফার্লো নিয়ে বিলেতে যাওয়া, রোম ভেনিস প্যারিস জেনিভায় বেড়ানো—চাকরিটা মন্দ ছিলো না তা মানতেই হবে।—আপনি হাসছেন? আপনার মনে প'ড়ে যাচ্ছে সরকারি চাকরির ওপর আমার ঘেন্না? ভাবছেন আমিও কেমন বোলচাল ভুলে খাঁচায় ঢুকে পড়েছিলুম? কী, জানেন—যেটা ঘেন্নার, ঠিক সেইটে করার মধ্যে বিশেষ একটা সুখ আছে—অদ্ভুত, অসাধারণ একটা স্বাদ—যেন নিজের ওপর দিয়ে একটা চমৎকার ঠাট্টা চালাচ্ছি—প্রহসন, যার দর্শক আমি, আবার অভিনেতাও আমি। যাকে বলে বেজায় রগড়, আমার পক্ষে চাকরিটা ছিলো একাধিক অর্থে তা-ই।

কখনো-কখনো কৌতুকটা অবশ্য একটু বেশি কড়া মনে হ'তো, সরকারি কেষ্ট-বিষ্টুদের জীবন অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠছিলো কোথাও-কোথাও। চালাও গুলি নিরীহ লোকেদের ওপর, তারপর ভয়ে-ভয়ে থাকো কখন গুলিটা নিজেরই বুকে ফিরে আসে। জওহরলাল নেহরুর গ্রেপ্তারের জন্য পরোয়ানা লেখো।—বিশ্রী সব কাজ। আমি, মশাই, ও-সব হাঙ্গামার মধ্যে ছিলুম না কোনোদিন। জুডিশল লাইন বেছে নিয়েছিলুম। নিরাপদ মধ্যপ্রদেশে। জমিদারির মামলাও বেশি নেই সেখানে। জীবনখানা মন্দাক্রান্তা তালে কেটে যায়। শুধু একবার ভাবি ফ্যাশাদে পড়েছিলুম এক খুনের আসামিকে নিয়ে। লোকটা নাকি তার বৌয়ের মাথায় লাঠি মেরেছিলো। বৌটাও এমন—এক বাড়িতে অক্কা। লোকটা ভয় পেয়ে পালিয়ে ছিলো জঙ্গলে, পুলিশ ধ'রে আনলো সেখান থেকে, চালান করলো। এইটুকু পুঁচকে একটা মানুষ, নিরক্ষর, দিন-মজুরি ক'রে পেট চালায়—রোজ এসে কাঠগড়ায় দাঁড়ায় আর ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকায় চারদিকে, উকিলের জেরার উত্তরে যা বলে তার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। লোকটা যেন বুঝতেই পারছে না কী হচ্ছে তাকে নিয়ে হঠাৎ---কেন তাকে আটকে রেখেছে, নিয়ে আসছে এই জমকালো দোতলা বাড়িটায়, আর কেনই বা এত সেপাই-সান্ত্রী লোকজন গুমগুম আওয়াজ, এ-সব কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না। সে মনে রাখতে পারে না তার উকিলের পরামর্শ, জানে না যে এখানে তার জীবন নিয়ে খেলা হচ্ছে, এমন কথাও বললে না যে ঐ বাঁশের লাঠিটা তার নয়, তার বৌয়ের রক্তমাখা শাড়িটা দেখে হাঁউমাউ ক'রে কেঁদে উঠলো। নিশ্চয়ই সে মেরে ফেলতে চায়নি বৌটাকে, শুধু একটু শিক্ষা দিতে চেয়েছিলো (যেমন আমরা অনেকেই চাই মাঝে-মাঝে)—নেহাৎ মূর্খ আর জংলি ব'লেই ওর চাইতে কোনো সুসভ্য উপায় খুঁজে পায়নি। বা এমনও হ'তে পারে যে হার্ট খারাপ ছিলো ওর বৌয়ের, হ'তে কি পারে না? কিন্তু ইংরেজের আইন, ব্যাপারটা পুরোপুরি কাল্‌পেবল হমিসাইড অ্যামাউন্টিং টু মার্ডার, শতকরা একশো পরিমাণে প্রমাণ হ'য়ে যাচ্ছে—এ-অবস্থায় নিস্তার নেই কারো, যদি না অবশ্য হত্যাকারীটি হয় মাইকেল ও'ডায়ার বা এমনকি কোনো চা-বাগানের পিলে-ফাটানো সাহেব। আমি দেখছি জুরি ওকে অপরাধী ব'লে শাব্যস্ত করবেই, আর তখন—আমি কী করবো? লোকটা কি ফাঁসিকাঠে ঝুলে যাবে শেষ পর্যন্ত, আর ওর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা আমাকেই বের করতে হবে মুখ দিয়ে? না। না। না। কিছুতেই না। কিছুতেই পারবো না আমি। আমার নিজেরই গলায় যেন ফাঁস লেগে যাচ্ছে, বাতাস নেই, সূর্য নিবে গেলো, অন্ধকার —আমাকে

বাঁচাও! দেখছেন তো, আমার বিবেক কী সুকুমার, হৃদয়বৃত্তি কী কোমল। হ'লো কী জানেন? আমি অসুস্থ হ'য়ে পড়লুম। হঠাৎ যেন একটা কান বন্ধ হ'য়ে গেলো। ভালো শুনতে পাই না। সিগারেট ধরাতে গিয়ে আঙুল কাঁপে। পিঠে একটা ব্যথা টের পাই সব সময়। স্বাস্থ্যের কারণে ছুটি নিতে হ'লো আমাকে। কাশ্মীরে গিয়ে শরীর সারলো। খুন অন্যায়, খুনিকে খুন করা তেমনি অন্যায়। আমি নির্বিবোধী। আমি অহিংস। হোক আইনের ওজুহাতে, যুদ্ধের ওজুহাতে—খুন কখনো ভালো হতে পাবে না, এই হ'লো আমার মত। আমি ভালোকে ভালোবাসি, আমি ভালো হ'তে চাই।

কিন্তু মুশকিল কী জানেন? 'ভালো' বলতে সকলে এক জিনিশ বোঝে না। যেমন বুলবুল ব'লে, অবস্থাভেদে ভালোও আলাদা। বা তাকে তা-ই শেখানো হয়েছে, জপানো হয়েছে। আর অনাদিবাবুর মতে 'ভালো' মানে হ'লো সেই শেষ, পরম ফল, যার জন্য মানবসভ্যতা বহুকাল ধ'বে চেষ্টা করছে। আপনি কি অনাদিবাবুকে চিনতেন—মিতুব বাবা, খদ্দর-পরা হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, অনাদি বর্ধন? আপনাব সঙ্গে দেখা হয়নি কখনো? ঐ এক অদ্ভুত মানুষ দেখেছিলুম, মশাই—অসাধারণ। লোকে তাঁকে বলে খামখেয়ালি, বাতিকগ্রস্ত, কিন্তু আমাব তাঁকে মনে হ'লো জীবন্ত, উৎসাহী—সেই উৎসাহটা আশাতীতভাবে অনেক দিকে ছড়ানো তাঁর মতো কথাবার্তা বলতে তখন পর্যন্ত অন্য কাউকে আমি শুনিনি। রুসো, টলস্টয়, থবো, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী—এই সব-কিছুর এক আশ্চর্য খিচুড়ি যেন রান্না হচ্ছে তাঁব মগজে, 'স্বাধীনতা'ব অর্থ কী, স্বাস্থ্য কাকে বলে—এই ধরনের প্রশ্ন তাঁকে ভাবায়। তিনি বলেন, স্বাধীনতা মানে স্বাবলম্বিতা (শুধু ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ তাড়ানো নয়), আর স্বাবলম্বিতা আসলে একটি নৈতিক গুণ—অন্তত মানুষের পক্ষে। বনের পশুদের দেখতে মনে হয় স্বাবলম্বী, কিন্তু আসলে তাবা প্রকৃতিব আশ্রিত, প্রকৃতির দাস। মানুষকে অসহায় ক'রে পৃথিবীতে পাঠানো হয়, যেহেতু শুধু তাবই আছে ইচ্ছাশক্তি, যা খাটিয়ে নিজেকে সে নিজের মনোমতো ক'রে গ'ড়ে তুলতে পাবে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ভিতু আব দুর্বল; তাই প্রকৃতিব শাসন থেকে অনেকখানি মুক্ত হ'য়েও সে অন্য শাসন চাপিয়ে দিয়েছে নিজেব ওপর—যার নাম গবর্মেন্টি, মনুসংহিতা, পীনাল কোড, ইত্যাদি। মানুষকে অর্জন করতে হবে সেই শক্তি, সেই সাহস, যাতে সে বোঝে যে স্বাবলম্বিতাই তাব স্বাভাবিক অবস্থা, যাতে দিশি-বিদেশী যে-কোনোবকম সরকারের ওপর সর্বব্যাপারে নির্ভব কবাটাকে তাব মনে হয় আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর। প্রত্যেক মানুষ যখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে, মাথাব ওপবে বিবাট কোনো কর্তৃপক্ষ থাকবে না, তখন সকলেই এই সহজ কথাটা বুঝে নেবে যে একেব স্বার্থ অন্যেব সঙ্গে জড়িত, যে নিজের স্বার্থ বজায় রাখার জন্যই অন্যেব ক্ষতি কবা চলে না। একমাত্র এই অবস্থাতেই মানুষ 'ভালো' হ'তে পারবে, 'সুখী' হ'তে পারবে—এই হ'লো অনাদিবাবুর ধাবণা। যে 'ভালো' সে সুখীও বটে'—অতএব অনাদিবাবুর আদর্শ জগতে মানুষে-মানুষে বিবোধ আব থাকবে না ('সকলেই সুখী হ'লে আর ঝগড়াঝাঁটির কারণ কী রইলো?') পবস্পবকে উৎপীড়ন করাব বৃত্তিটাই তার ম'রে যাবে ধীরে-ধীরে—ধর্মোপদেশেব ফলে নয়, ব্যবহাবেব অভাবে, যে-কাবণে মানুষেব ল্যাজ খ'সে পড়েছে, নখে আর ধার নেই, সেই একই কাবণে। এই অবস্থায় পৌছতে হয়তো আরো বহুকাল লাগবে মানুষের—লক্ষ বছবও হ'তে পাবে—কিন্তু মানুষ যদি ধ্বংস হ'তে না চায় তাহ'লে এ-ই তার ভবিষ্যৎ।

অনাদিবাবুর অন্য একটি ধারণা হ'লো যে মানুষ স্বভাবতই নীরোগ, আমরা যাকে 'অসুখ' বলি সেটা 'ইম্ব্যালান্স' মাত্র, ভারসাম্যে কোনো বিচ্যুতি—দুশ্চিন্তা, মনেব কষ্ট, অনাহাব, অতিভোজন, এমনি কোনো ঘটনাচক্রের ফলাফল। শরীব আমাদেব সুস্থ বাখার জন্য অনবরত সচেষ্ট; কিন্তু সেই চেষ্টা পুবোপুবি সফল হ'তে পারে না, আমাদেব মন যদি সাহায্য না করে। (মনোবল মানেই অটুট স্বাস্থ্য এই ফর্মুলার উদাহরণস্বরূপ তিনি অবশ্য বর্নার্ড'শ আব মহাত্মা গান্ধীর উল্লেখ করেন—আব বলেন, বৃদ্ধ গ্যেটে কেমন শুধু ইচ্ছার জোরে বেঁচে ছিলেন, যতদিন না দ্বিতীয় 'ফাউস্ট' শেষ হয়েছিলো, আব বৃদ্ধ টলস্টয—যাঁর কামরিপুর কখনো নিবৃত্তি হয়নি, স্বাস্থ্য ছিলো পাথবের মতো

অটুট—তিনি কেমন শান্ত ও সুন্দরভাবে ইচ্ছামৃত্যু ঘটিয়েছিলেন, তীব্র শীতে, রেল-স্টেশনের বেঞ্চিতে গা এলিয়ে।) আসলে আমাদের মনই আমার শরীরটাকে চালায়, কিন্তু যেহেতু এখন পর্যন্ত ডাক্তারের চোখে শরীর হ'লো একটা সপ্রাণ জড়পদার্থ যা কোনো বীজাণুর দ্বারা আক্রান্ত হ'লেই রুগ্ন হয় তাই স্বাস্থ্যের অনেক গূঢ় তত্ত্ব মানুষ এখনো আবিষ্কার করতে পারেনি। তথাকথিত 'চিকিৎসা'র সঙ্গে গবর্মেণ্টের একটা তুলনাও টানেন অনাদিবাবু; মানুষ ভিতু ব'লেই, যেমন সাংসারিক ব্যাপারে সরকারের ওপর, তেমনি শরীরের ব্যাপারে চিকিৎসকের ওপর নির্ভর ক'রে—রোগের প্রবণতা দূর করে দেবার ক্ষমতা তার নিজেরই আছে, আর সেই ক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলাই সত্যিকার 'চিকিৎসকে'র কাজ।

আপনি হাসছেন? খুব পুরোনো শোনাচ্ছে কথাগুলো? এলোমেলো, খাপছাড়া? নাঈভ? তা মশাই, কোন সময়ের কথা তা তো মনে রাখবেন। আর কোন দেশ, কোন পরিবেশ। ধরুন আমাদের য়ুনিভার্সিটির মাষ্টারমশাইরা : কোনো বিষয়ে কিছু জিগেস করলে উত্তর পাই, 'অমুক বইয়ের তমুক চ্যাপ্টারটা পড়ো।' এক-একটি খুপরির মধ্যে ব'সে আছেন এক-একজন : আর্টস, সায়েন্স, পলিটিক্স, ফিলজফি, সাহিত্য—আলাদা নাম, আলাদা খোপ, আর সেগুলোর যেন সৃষ্টি হয়েছিলো এইজন্যেই, যাতে মাষ্টারমশাইয়ের মাষ্টারি করার আর ছাত্রদের ডিগ্রিলাভের সুযোগ ঘটে। অনাদিবাবুর কথাবার্তা শুনেই আমার প্রথম সন্দেহ হয়েছিলো যে এই ভিন্ন-ভিন্ন বিষয়গুলো পরস্পরসম্পৃক্ত, আর এগুলো আমাদের জীবনেরই অংশ, দৈনন্দিন বাস্তব ঘটনার সঙ্গে যোগ আছে এদের। সব সময় তাঁর যুক্তি অবশ্য বুঝি না আমি, তাঁকে কখনো-কখনো মনে হয় স্ববিরোধী—কিন্তু তিনি অন্তত ঠুঁটো জগন্নাথ হ'য়ে ব'সে নেই, নড়াচড়া করেন, মনের মধ্যে একটা ছটফটানি আছে তাঁর। খনিকটা মরুভূমিতে ওয়েসিসের মতো আমার মনে হয়েছিলো তাঁকে—তাঁর লার্মিনি স্ট্রিটের দোতলা বাড়ি বকুল-ভিলাকে, বাড়ির লোকেদের। তাঁদের চালচলন আমাদের চেনাশোনা অন্য কোনো বাড়ির মতো নয় ঠিক—আমার বাবা যাকে বলেন 'কলকাত্তাই' আর ঠাকুমা বলেন 'সাহেব-সাহেব' খেলা, অনেকটা সেই ভাবের। বাড়িতে আছে সোফা-সেটি দিয়ে সাজানো 'ড্রয়িংরুম', ইলেকট্রিক আলো, সীলিঙে ঝোলানো পাখা পর্যন্ত চলে। লোকজনের যাওয়া-আসা চলে দু-বেলা—রোগী, রোগীর আত্মীয়েরা, আর যারা গীতসুধার জন্য পিপাসু। বাইরের হাওয়া সব সময় বইছে, বাইরের জগৎ স্বীকৃত। আমার ভালো লাগে অনাদিবাবু আমাদের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের 'আত্মীয়তা'র কোনো উল্লেখ করেন না, আমাকে গ্রহণ করেছেন আমারই জন্য, আর কথাবার্তা চালান এমন সুরে যেন আমি তাঁর সমবয়সী, সমকক্ষ।

স্পষ্টভাবে হোমিওপ্যাথি নিয়ে, বা তাঁর মেয়ের গান নিয়ে, অনাদিবাবু কিন্তু বেশি কথা বলেন না। বলেন না এইজন্য যে ও-দুটো বিষয় তাঁর কাছে স্বতঃসিদ্ধ, প্রমাণসাপেক্ষ নয়। অন্য সব ডাক্তাররা জবাব দেবার পর তিনি কবে কার উদরী সারিয়েছিলেন, কার কলেরা তাঁর একটি মাত্র ডোজে আরাম হয়েছিলো, বা কলকাতার কোন-কোন নামজাদারা মিতুর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন, কে-কে তাকে চিঠি লেখেন লক্ষ্ণৌ বা পণ্ডিচেরি থেকে—এ-সব কথা তাঁর মুখে কখনোই শোনা যায় না তা নয়, কিন্তু তাঁর মুখে ও গলার আওয়াজে এমন একটা নৈর্ব্যক্তিক ভাব থাকে যেন, 'লণ্ডনে আবার গোল-টেবিল বৈঠক বসবে', বা 'ব্র্যাডম্যান এবারে তিনটে সেঞ্চুরি করলো', এই ধরনের কোনো খবর দিচ্ছেন শুধু। কেউ-কেউ অবশ্য এটুকুর জন্যেই আড়ালে তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করে, কিন্তু আমার কখনো মনে হয় না তিনি 'নিজের ঢাক নিজে পিটোতে' চান। যে-অতিসূক্ষ্ম ভেষজশিল্পের তিনি সেবক, যে-কর্ণসেব্য ললিতকলার তিনি প্রেমিক, তাদেরই গৌরব বাড়ানো তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি যে মাঝে-মাঝে বাড়িতে অত লোক ডেকে মেয়ের গান শোনান, প্রচুর খাইয়ে আপ্যায়ন করেন, কাউকে গানের সমজদার পেলে বারে-বারে আসতে বলেন বাড়িতে, তার কারণ কোনো অন্ধ পিতৃস্নেহ বা বিজ্ঞাপনের ইচ্ছে নয়—আসলে তিনি চান অন্যদের সঙ্গে ব'সে গান শোনার সুখ ভোগ করতে, তাঁর এই বিশুদ্ধ আনন্দে অন্যদেরও অংশ দিতে চান। যেটা ভালো ও উপভোগ্য—হোক টাকা,

হোক বিদ্যা, হোক কোনো শিল্পকলা—সেটা নিজের অধিকারে এলে অন্যদের সঙ্গে ভাগ ক'রে নেবার ইচ্ছেটাকেই বলে সহৃদয়তা, আর অনাদিবাবুর এই গুণটি তাঁর রোগীদের কাছেও স্পষ্ট ছিলো। অনেককে তিনি ওষুধ দেন বিনামূল্যে, টানাটানির সংসারে ফী নেন না বা অর্ধেক নেন: তাঁর চিকিৎসায় লোকেরা যে সেরে উঠছে, আর মিতুর গান শুনে আনন্দ পাচ্ছে, এতে তিনি অনুভব করেন, তাঁর নিজের বা তাঁর কন্যার ব্যক্তিগত কৃতিত্ব নয়—মনস্বী হানেমান-এর বিজয়, রাগ-রাগিণীর অফুরন্ত আবেদন। অন্তত আমার তা-ই মনে হয়, কেননা আমি অনাদিবাবুর চরিত্রে কিছুই খারাপ দেখতে পাই না, হয়তো তা চাই না ব'লেই। তিনি যে মিতু বর্ধনের বাবা, এ-জন্যেও আমি তাঁকে ভালোবাসছি।

মেয়েকে গাইয়ে বানাতে গিয়ে কিছুটা লাঞ্ছনাও সইতে হয়েছিলো অনাদিবাবুকে। একজন ভদ্রঘরের মেয়ে—ওলগঞ্জের ছ-আনি বংশে যার জন্ম—সে কিনা খ্যামটাউলির মতো মুসলমান ওস্তাদের কাছে গলা সাধবে, হার্মোনিয়ম বাজাবে. তবলার সঙ্গে তাল রেখে গান গাইবে এক হাট লোকের সামনে—এই ব্যাপারটা প্রথমে অনেকেই বরদাস্ত করতে পারেননি। মাঝে-মাঝে ঢিল পড়েছে বকুল-ভিলায়, কদর্য বা ক্রুদ্ধ ভাষায় বেনামি চিঠি এসেছে; আমাদেরই য়ুনির্ভার্সিটির ছাত্র শামসুদ্দীন একদিন বাত্রে বকুল-ভিলা থেকে ফেবাব পথে প্রচণ্ড মার খেয়েছিলো। কিছু কুৎসাও রটেছিলো মিতু বর্ধনের নামে, অনাদিবাবুকে শুনতে হয়েছিলো শুভানুধ্যায়ীর অযাচিত সদুপদেশ—কিন্তু গান্ধীভক্ত হোমিওপ্যাথের মনে কিছুই আঁচড় কাটলো না, গান চলতে লাগলো সমানে। আস্তে-আস্তে শহরসুদ্ধ সবাই মেনে নিলে এই গাইয়ে মেয়েকে, ঘরে-ঘরে নাম পৌঁছলো তার, কলকাতায় তার রেকর্ড বেবোবার পর থেকে তাকে নিয়ে কিছুটা গর্বিতও হলেন ঢাকার কোনো-কোনো বিশিষ্ট নাগরিক। আজকাল নানা অনুষ্ঠানে গান গাইবার জন্য ডাক পড়ে তার—আমাদের য়ুনির্ভার্সিটিতে, নর্থব্রুক হল-এ সুভাষ বসুর সংবর্ধনায়, তার গান ছাড়া ঢাকাব বাৎসরিক স্বদেশী মেলার উদ্বোধন হয় না। এই উনিশ বছবেব মেয়েটি নিমন্ত্রিত হয বমনাব উঁচুদরের প্রোফেসর-পাড়ায়, হলদিয়ার চৌধুরী বাড়িতে। আর মাঝে-মাঝে সন্ধেবেলায়, মিতু তখন তাব ওস্তাদজী আর তবলচির সঙ্গে রেওয়াজ করে, তখন দু-চারটি যুবক দাঁড়িয়ে থাকে পাঁচিল-তোলা বকুল-ভিলার বাইরে—মস্ত কম্পাউণ্ড পেরিয়ে ভেসে আসে সুর, মাজা গলায়, তানের ঢেউয়ে, যেন পাখির ঝাঁক ঘুবে-ঘুরে ওড়ে, যেন উছলে ঝ'রে পড়ে ফোয়াবা। কেউ তাকে বলে পাপিয়া, কেউ ইংরেজি ক'বে নাম দিয়েছে সোনালি-কণ্ঠী। কোনো ছেলে সাহস ক'রে ভেতবে ঢুকে পড়লে অনাদিবাবু খুশি হয়ে বলেন, 'তা এসো, বাইবে কেন, গান শুনবে তাতে আর কী আছে।' এমনি করে একটি গোষ্ঠী গ'ড়ে উঠেছে মিতুকে আব অনাদিবাবুকে ঘিরে, আর তাতে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে আর্থার জোন্স—মিতুব জন্মদিনেব সন্ধ্যায় আমি তাকে প্রথম দেখলাম।

৫

জোন্সকে দেখে প্রথমে কেমন বিমূঢ় হ'য়ে গিয়েছিলাম আমি; তার কাবণ তার সবুজ চোখ। একেবারে সবুজ, বেড়ালের চোখের মতোও নয়, পান্নাব মতো, চোখের তবলতা যেন কঠিন হ'য়ে গেছে ঐ রঙের জন্য। আমার মনে হয়েছিলো অস্বাভাবিক, অমানুষিক, কোনো মনুষ্যাকৃতি শরীরের মধ্যে ও-রকম চোখ সত্যি ব'লে বিশ্বাস হয়নি; অস্বস্তি হচ্ছিলো তার দিকে তাকাতে। অথচ অন্য কোনো বিষয় জন-বুল্-বংশোদ্ভূত তাকে মনে হয় না; মাঝারি লম্বা, চুলের রং কালচের দিকে ব্রাউন, গায়ের রং ভয়াবহভাবে টকটকে লাল নয়, বোধগম্য ভাষার বদলে গাঁ-গাঁ আওয়াজ বেরোয় না তার গলা দিযে। বসার ঘর ভর্তি ছিলো লোকজনে; অনাদিবাবু আমাকে জোন্সের পাশে বসিয়ে দিলেন, জোন্স আলাপ শুরু করলো, পাৎলা ঠোঁটে হাসলো—আস্তে-আস্তে তার সবুজ চোখ সহনীয় মনে হ'লো

আমার, অস্বস্তির ভাবটা কেটে গেলো, তাকে মনে হ'লো সুশ্রী, ব্যবহার ভারি ভদ্র, ভাবটা যেন লাজুকমতো। ভালো লাগলো তার নিচু, নরম কথা বলার ধরন, তাছাড়া এক-একটা ইংরেজি শব্দ সে যে-ভাবে উচ্চারণ করে তাতেও আমার কৌতূহল জেগে উঠলো। আমি সাহিত্যের ছাত্র শুনে সে আমাকে জিগেস করলে ইংরেজিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো জীবনী আছে কিনা, শরৎচন্দ্রের গল্প আমার কেমন লাগে, রবীন্দ্রনাথের নাটক বিষয়ে আমার মত কী। বাংলা ভাষা নিয়ে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করলে দু-একটা। যেমন : 'তুমি তাকে এ-কথা বলবে', আর 'তুমি তাকে এ-কথা বোলো'—এই দুটোতে তফাৎ কী। প্রশ্নটা শুনে আমি একটু অবাক হলাম (কেননা মাছের পক্ষে যেমন জল আমাদের পক্ষে মাতৃভাষা ঠিক তেমনি, তার অনেক অদ্ভুত আচরণ আমরা লক্ষ করি না); একটু ভাবতে হ'লো জবাব দেবার আগে। 'তফাৎ বোধহয় এই যে প্রথমটায় আদেশ বোঝায়, বা ভবিষ্যৎ বচনে কোনো সাধারণ উক্তি, আর পরেরটায় আছে অনুরোধের সুর।' 'দিনের ঠিক কোন সময়টাকে "ঝাঁ-ঝাঁ দুপুর" বলে?' এটার জবাব দিতে বেশ বেগ পেতে হ'লো আমাকে, আব তখনই আমি প্রথম বুঝলাম যে বাংলাভাষার এক আশ্চর্য ক্ষমতা আছে কানের মধ্য দিয়ে ঢুকে চোখে-দেখা ছবি হ'য়ে বেরিয়ে আসার : ঝাঁ-ঝাঁ দুপুব, খাঁ-খাঁ নির্জন।

আমি জিগেস করলাম সে দেশে থাকতেই বাংলা শিখেছিলো কিনা। 'খানিকটা—চাকরিব জন্যেই শিখতে হয়েছে—কিন্তু সে আর কতটুকু। এখন ভালো ক'রে শিখতে চাই, কিন্তু আপনাদের ভাষা বড়ো শক্ত।' 'আমাদের পক্ষে ইংরেজি যতটা তার চেয়ে বেশি নয়।' 'আপনাদেব ভাষা শেখায় দক্ষতা আছে, আমাদের তা নেই। জগৎ ভ'রে আমাদের দুর্নাম সেজন্য।' তার এই কথাটা খুব পছন্দ হ'লো না আমার, মনে হ'লো আসল কথাটা সে এড়িয়ে যাচ্ছে। বললাম, 'কিন্তু আমরা তো ছেলেবেলা থেকে বাধ্য হই ইংরেজি শিখতে, সে-রকম কোনো দায় থাকলে আপনারাও কি পারতেন না?' 'তা সত্যি', জোন্স হাসলো একটু। 'সেটাও একটা অসুবিধে আমাদের যে আপনারা অনেকেই ইংরেজি বলেন, এ-দেশের কোনো ভাষা না-শিখেও দিব্যি চ'লে যায় আমাদেব। জানি, এ-জন্যে আমরাই দায়ী', আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তক্ষুনি জুড়ে দিলো সে, 'কিন্তু মোটের ওপর এটা লজ্জাব কথাই যে হাজার-হাজার ইংরেজ ভারতবর্ষে জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে, অথচ তাদের ভাষাজ্ঞান কয়েকটা হিন্দুস্থানি শব্দেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এ-কথা কি সত্যি যে প্রথম বাংলা গদ্য বই একজন ইংরেজ মিশনারি লিখেছিলেন?' আমি জবাব দিলাম, 'তা ঠিক নয়, একজন বাঙালির বইও বেরোয় সেই একই বছরে, তাছাড়া আপনাদের কাছে যেমন "বাবু-ইংলিশ" আমাদের কাছে তেমনি মিশনারির বাংলা।' জোন্স প্রতিবাদ করলো তক্ষুনি, 'না, না, নিশ্চয়ই ভারতীয় ইংরেজি অনেক ভালো।' তার এই কথাটা একটু কপট শোনালো আমার কানে।

আমি কিপলিঙের কথা তুললাম। জোন্সের কি ভালো লাগে কিপলিংকে? আমার? জিগেস করাই বাহুল্য, কোনো ভারতীয়ের পক্ষে কি কিপলিং-ভক্ত হওয়া সম্ভব? একটু সচেতনভাবে বললাম কথাটা, জোন্সের সবুজ চোখে ঈষৎ যেন কৌতুক ফুটলো। 'কিপলিংকে ঠিক ভারতবিদ্বেষী বলা যায় না কিন্তু, লোকটা লেখেও মন্দ না—তবে বড্ড সেন্টিমেন্টল।' 'ভারতবিদ্বেষী নয়!' আমি উত্তেজিত হলাম, 'আপনার মনে আছে "গঙ্গা দীন" কবিতা? সেই মহাপ্রাণ ভিস্তিওলা, নিজে মরার আগে এক বৃটিশ টমিকে জল দিয়েছিলো ব'লেই যে পুণ্যাত্মা? "For all 'is dirty hide, 'E was white, clear white inside!" ভারতবর্ষকে এমন অপমান আর কে করেছে!' জোন্স তক্ষুনি জবাব দিলো, আমি ওকেই সেন্টিমেন্টল বলছি। কিন্তু কবিতাব বক্তা কী-রকম স্থূল চরিত্রের অশিক্ষিত মানুষ, তাও মনে রাখবেন।' কিন্তু ভারতের প্রতি ঘৃণাটা আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না? "Ship me somewhere East of Suez where the best is like the worst—"' আমি একটু থামতেই জোন্স পরের লাইনটা আওড়ালো, '"Where there aren't no Ten Commandments and a man can raise a thirst!" আপনার মনে হয় এতে ভারতের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পাচ্ছে?' 'নিশ্চয়ই।' নিজের অজান্তেই আমার গলার আওয়াজ চ'ড়ে গেলো, 'আর কত স্পষ্ট ক'রে বলা

যায় যে ভারতবর্ষ বর্বরের দেশ!' একটু চুপ করে থেকে জোন্স বললে, 'বোধহয় ঠিকই বলছেন আপনি—' আন্তরিকভাবে, না ভদ্রতা ক'রে, ঠিক বুঝলাম না, 'তবে কী জানেন, একটা নস্টালজিয়া আছে, এক ধরনের রোমান্টিক ছবি এ-দেশের, এশিয়ার, যা আসলে চারশো বছর ধ'রে—বা আরো বেশি—মার্কো পোলোর পর থেকেই—চলতি ছিলো য়োরোপে, সেটাই শেষ ধরা পড়লো কিপলিঙের লেখায়। বাসি রোমান্টিসিজম, তার স্বর্গীয় সুবাস আর নেই, একটু ট'কে গেছে বলতে পারেন, তবে তারই মধ্য দিয়ে কিপলিং কিন্তু ভারতবর্ষকে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন ইংলণ্ডের ঘরে-ঘরে। আমি ছেলেবেলায় তাঁর লেখা প'ড়েই প্রথম ভারতের দিকে ঝুঁকেছিলাম।' আমি সজোরে ব'লে উঠলাম, 'এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কিপলিঙের ছবি কত মিথ্যে!' 'হ্যাঁ, অনেক ব্যাপারেই মিথ্যে, তবু—এই রোদ, এই আকাশ—' 'তা তো বটেই!' জোন্সকে কথা শেষ করতে দিলাম না আমি—'রোদ, আকাশ, গাছপালা জীবজন্তু—সবই ভালো।' কলকাতায় বসেই একজন বিশপ লিখেছিলেন না '"Where every prospect pleases and only man is vile"?' একটু লাল হ'লো আর্থার জোন্স, আস্তে-আস্তে বললো, 'হ্যাঁ, আমি ভারতীয় হ'য়ে জন্মালে আমারও অসহ্য মনে হতো কিপলিংকে। তবে অন্য একটা দিকও আছে। ভেবে দেখুন লণ্ডনের ঠাণ্ডা, ধোঁয়া, কুয়াশা, বরফ—তারই মধ্যে কোনো ব্যাঙ্কের কেরানি, ফ্যাক্টরির মজুর, অশিক্ষিত, কুনো, জগতের কোনো খবরই রাখে না—হঠাৎ ভারতবর্ষের আকাশ দেখে সে কী-রকম চমকে উঠবে তা তো বোঝেন। সেই চমকটা কিপলিং বেশ ফুটিয়ে তুলেছেন তা কিন্তু মানতেই হবে। তাঁর দোষটা এই যে ভারতবর্ষকে স্বপ্ন করে তুলতে গিয়ে তিনি বাস্তবকে বিকৃত করেছেন তবু—আপনি হয়তো হাসবেন শুনে—সেই স্বপ্নটা আমাদের মনে নাড়া দিয়েছিলো।'

আমার আরো অনেক তর্ক ছিলো, কিন্তু জোন্সের শেষ কথাটা শুনে আমি একটু থমকালাম। ইংলণ্ডের 'অশিক্ষিত, কুনো' লোকদের কাছে ভারতবর্ষ যে একটা স্বপ্ন হ'য়ে উঠতে পারে, এই কথাটা নতুন শোনালো আমার কানে। আমিও মনে-মনে পোষণ করছি এক স্বপ্নের ইংলণ্ডকে, টুকরো-টুকরো সাহিত্যের স্মৃতি গেঁথে তৈরি করেছি এক অলৌকিক লণ্ডন—টেমস নদী বললেই স্পেনসারের লাইন মনে পড়ে আমার, ফ্লীট স্ট্রিট বললেই জি. কে. চেস্টার্টনকে, হ্যাম্পস্টেড মানে কীটস, চেলসী মানে রোজেটি—এক-এক সময় এও মনে হয়েছে যে সেই দেশকে আমি এতদূর পর্যন্ত আপন ক'রে নিয়েছি যে কোনোমতে সেখানে একবার পৌঁছতে পারলে 'তাদেরই একজন' হ'য়ে যেতে পারবো। কিন্তু জোন্সের কথা শুনে আমার উপলব্ধি হ'লো যে আমার এই ইংলণ্ড তেমনি অলীক, যেমন কিপলিঙের ভারতবর্ষ। আমি আঁকড়ে ধরেছি ইংলণ্ডের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশকে, যাতে ব্যাঙ্কের কেরানির, কারখানার মজুরের, কোটি-কোটি মানুষের কিছুই এসে যায় না—সেই যারা সেপাই হ'য়ে আমাদের দেশে আসে, অবাক হ'য়ে যায় আলো, আকাশ, আকাশ-ভরা ঝকঝকে তারা দেখে—ফিরে গিয়ে ঠাণ্ডা বরফে স্বপ্ন দ্যাখে আমাদের নারকোল গাছের। আমাদের এই জীবন—মলিন, গরিব, দম-আটকানো—সে বিষয়ে কিছুই জানে না তারা, যেমন আমি পারি না কোনো গোরা টমিকে গোরা টমি ছাড়া আর কিছু ব'লে ভাবতে, পারি না তার স্ত্রী, সন্তান, সংসার কল্পনা করতে, আমার স্বরচিত ইংলণ্ডে তার জন্য এক ইঞ্চি জায়গাও আমি রাখিনি। আমার তখনও এতটা বোঝার মতো বুদ্ধি হয়নি যে সব স্বপ্নেরই নির্ভর হ'লো আংশিক সত্য; (সেখানেই ইতিহাসের সঙ্গে কবিতার তফাৎ); প্রাচীন গ্রীস, প্রাচীন ভারত, উজ্জয়িনী, রোম, রেনেসাঁসের ফ্লরেন্স—সবই তা-ই; স্বপ্নগুলো অনর্থক নয় তবু, তারা যে-সব ফুল ফোটায়, ফল ফলায় তাতেই তাদের মূল্য। কিন্তু ইংলণ্ডের ভারতবর্ষীয় স্বপ্নে বিস্তর ভেজাল ছিলো—সাম্রাজ্য, অর্থলোভ, আমাদের সকলকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে চাওয়ার পাগলামি—আর তাই সেই ডিম ফুটে বেরোলো—গোটের ইটালি বা শাতোব্রিয়াঁর আমেরিকা নয়, নেহাৎই একটি ছেলে-ভুলোনো 'জাঙ্গল বুক' মাত্র, নেহাৎই একমুঠো সেপাইব্যারাকের ছড়া—যার কুচকাওয়াজি তালের ফাঁকে-ফাঁকে চুইয়ে পড়ছে খাকির গন্ধ, সেক্রেটারিয়েটের বালি-কাগজের গন্ধ, আর এক দূর দেশের অসংখ্য অদ্ভুত মানুষ আর আরো অদ্ভুত দেবদেবীর সামনে

এক ধরনের মফস্বলি ইংরেজিয়ানা বজায় রাখার কসরৎ।

যেহেতু ছেলেবেলায় কিপলিঙের কবিতা আমার প্রিয় ছিলো, অনেক লাইন এখনো মুখস্থ আছে, সেইজন্যেই কিপলিঙের ওপর এখন আমার আক্রোশ একটু বেশি; মনে হ'লো সেই অজ্ঞান বয়সের বোকামির কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হবে, যদি এক্ষুনি জোন্সের কাছে প্রমাণ করতে পারি যে কবি হিশেবে কিপলিং অকিঞ্চিৎকর, এমনকি ইংরেজি সাহিত্যের একটি কলঙ্ক। মনে-মনে একটা প্রশ্ন তৈরি ক'রে বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়লো জানলার কাছ থেকে ফটিক-মামা হাত নেড়ে ডাকছেন আমাকে, চোখে চোখ পড়তেই আরো স্পষ্ট ইশারা করলেন। 'মাপ করবেন, একটু আসছি', ব'লে উঠে গেলাম আমি, ফটিক-মামা আমাকে কাঁধের নিচে ধ'রে দূরে নিয়ে গেলেন। নিচু গলায় বললেন, 'এই তোর চমৎকার সুযোগ, রঞ্জু, জোন্সের কাছে সব তুকতাক জেনে নে।' আমি অবাক হ'য়ে বললাম, 'কিসের তুকতাক?' 'তুই আই. সি. এস. দিবি তো—ও-ছোকরা টাটকা পাশ ক'রে এসেছে, অনেক ভালো-ভালো টিপ্ দিতে পারবে তোকে।' 'আমি আই. সি. এস. দেবো কে বললো?' 'যদি নাও দিস, তবু জোন্সের সঙ্গে আলাপ রাখা ভালো—কাজে লাগতে পারে।' ব'লেই, আমাকে ফেলে, ফটিক-মামা হঠাৎ ছুটে গেলেন অনাদিবাবুর কাছে, বোধহয় কোনো বৈষয়িক আলাপ শুরু করলেন তাঁর সঙ্গে : 'শাই ক্যাপিটেল', 'শেয়ার' 'সিক্স পার্সেন্ট', এই ধরনের কয়েকটা কথা আমার কানে এলো।

এতক্ষণ আমার খেয়ালই ছিলো না যে জোন্স একজন জ্বলজ্যান্ত আই. সি. এস. চাকুরে, ঢাকার অ্যাডিশনেল ম্যাজিস্ট্রেট—অর্থাৎ, তাদেরই একজন, যাদের আমরা 'হর্তাকর্তা', ব'লে থাকি, মনে-মনে কখনো বিশ্বাস করি না, কিন্তু সুযোগ পেলেই প্রার্থী হ'য়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে এমন একটা পরিবেশে যে ও-সব মনে থাকার কথাও নয়। জোন্সের সঙ্গে আমার যে-বন্ধুতা কয়েক মিনিট আগে সম্ভবপর হ'য়ে উঠছিলো, সেটাতে হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গেলেন ফটিক-মামা। চারদিকে তাকিয়ে আমার মনে হ'লো অতিথিদের মধ্যে অনেকেই জোন্সের উপস্থিতির জন্য আরাম পাচ্ছে না (যদিও হয়তো গৌরবান্বিত হচ্ছে মনে-মনে)—যেন ভুলতে পারছে না আজকের এই প্রীতিসম্মেলনে ঐ মানুষটা কী-রকম বিজাতীয়, অনাত্মীয়, অবান্তর। প্রতাপান্বিত বৃটিশ রাজ, দুর্গম ইংরেজি ভাষা, কিছু ভয়, কিছু ভক্তি, কিছু সন্দেহ—এই সব তাকে শত যোজন দূরে সরিয়ে রেখেছে। নিশ্চয়ই জোন্স নিজেও বোঝে যে আমাদের মধ্যে তার সত্যিকার কোনো জায়গা নেই, হবেও না কোনোদিন, যতদিন ইংরেজ রাজত্ব আছে এ-দেশে; তাহ'লে তাদের ঢাকা ক্লাবে না-গিয়ে, টেনিস গল্ফ বল্-নৃত্যে সময় না-কাটিয়ে, এখানে আসে কেন? শুধু গান ভালোবাসে ব'লে?

'এই যে রঞ্জু, কী ব্যাপার?' আমার পেছনে একটি মৃদু গলার আওয়াজ পেলাম; সেই কণ্ঠস্বরের অধিকারীকে দেখে পুলকিত হ'তে পারলাম না। অমূল্য, আমারই মতো য়ুনিভার্সিটির ছাত্র, এটুকু ছাড়া তার সঙ্গে কিছুই মিল নেই আমার। পুষ্ট গালে হাসির ভাঁজ ফেলে সে বলতে লাগলো, 'জানতাম না তো তুমি জোন্স সাহেবের ফ্রেণ্ড, একটা কাপ্তান লোক! বাপস্, কী-রকম ইংরেজি চালাচ্ছিলে এতক্ষণ! একেবারে ফায়ার!' আমার খুব লজ্জা করলো অমূল্যর কথা শুনে, কিন্তু তার ধরনধারণ আমার অচেনা নয়, যেন তার কোনো কথাই আমার কানে ঢোকেনি এমনি সুরে, ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'তোমার কী খবর? কেমন আছো?' 'আর আছি!' মুখভঙ্গি ক'রে ব'লে উঠলো অমূল্য, পিতার আদেশে ধনবিজ্ঞানে পাঠ নিচ্ছি, কিন্তু আচার্যগণের উপদেশ আমার মনে হচ্ছে যেন প্রপঞ্চের মতোই প্রহেলিকা। অথবা যেন মহাষ্টমীর দিনে ছাগশিশুর করুণ আর্তনাদ। বুঝেছো রঞ্জু, কোনো মতে একটা চাকরি জোগাড় করতে পারলে আর নগেন চাটুয্যের ব্যা ব্যা শুনতো কোন শালা! কিন্তু কোথায় চাকরি? দ্যাশে নাই যা পোলার চাই তা! দণ্ডকারণ্যে রামের মতো অবস্থা আমাদের, "হা সীতা, হা সীতা" ব'লে বিলাপ করছি! সীতা মানেই চাকরি, বুঝেছো তো—ও-দুটো একই আসলে—হোক না বখা, ফাৎরা ছেলে, চাকরি পেলেই ছুকরি মেলে!' আমি বললাম, 'তোমার বেশ স্বভাবকবিত্ব

আছে দেখছি।' 'কী যে বলো! আমি তো আর তোমার মতো পোয়েট নই, ছড়াফড়া বানাই আরকি মাঝে-মাঝে, আবার সুরও দিই সেগুলোতে। শুনবে একটা?' অমূল্য নিচু গলায় গুনগুন করলো:

'গেণ্ডারিয়ার ছেমরিগুলি আইল যেদিন নারিন্দায়
লণ্ডভণ্ড কাণ্ড হৈল ঢোলগোবিন্দের বারিন্দার।
ঢোলগোবিন্দের দশটা পোলা, লম্বা চোখা লাঙুল-ঝোলা,
চক্ষু মাইরা মাইয়াগুলির—

—থাক। বাকিটা পরে শোনাবো তোমাকে।' স্বরচিত অনুক্ত লাইনগুলি যেন জিভের ওপর দিয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে চেখে নিয়ে গিলে ফেললো সে, তারপর বললো, 'জানো, আমার আসল লাইন বোধহয় গান-বাজনা, খাঁ সাহেবের কাছে গলাও সাধছি, কিন্তু আমার গলা দানাদার নয়, খেয়াল হবে না আমাকে দিয়ে, ধরো এই মিতুর এক-একটা তান আমি কিছুতেই আনতে পারি না গলায়। মিতুর গান কেমন লাগে তোমার?' 'ভালো'। 'মাইরি'—শুধু ভালো! সুপার্ব—ওয়াণ্ডারফুল—ডিভাইন—পর-পর অনেকগুলো ইংরেজি বিশ্লেষণ আউড়ে গেলো অমূল্য—'আমি, জানো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে গান শুনতাম, তারপর বুক ঠুকে ঢুকে পড়লাম একদিন। মিতুর কাছে নওরোজের গান শিখছি এখন—তোমাদের সেই দিলদার নওরোজের কথা বলছি।' (কী-অর্থে দিলদার নওরোজ 'আমাদের' হলেন আমি তা বুঝলাম না।) 'ঠুংরি-গজল-ভজনের লাইনে চ'লে যাবো কিনা ভাবি মাঝে-মাঝে। কিন্তু আসল কথা, ডাল-ভাত আসবে কোত্থেকে? ঐ যে, ওস্তাদজী এলেন—আমি যাই।' আমার হাত ধ'বে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে আমাকে আরো দূরে নিয়ে এলো অমূল্য, একেবারে দেয়ালের কোণ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ফিশফিশে গলায় বললো, 'শোনো রঞ্জু, আমার একটা উপকার করবে? জোন্সের কাছ থেকে একটা সুপারিশ এনে দেবে আমাকে? সাহেব এক ছত্তর লিখে দিলে আমাকে আর পায় কে? আমাব তো আবার ইংরিজি বলতে গেলেই কাশি ওঠে—তুমি একটু বলো যদি আমার হ'য়ে। কেমন, বলবে তো? আর শোনো—'এবার আমার কব্জিটা শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরলো অমূল্য, কেমন একটু বাঁকা চোখে তাকালো আমার দিকে—'একটু সাবধানে কথা বোলো কিন্তু জোন্সের সঙ্গে, দেখছো দিব্যি ভালোমানুষ, কিন্তু আসলে সাংঘাতিক টিকটিকি! মনে রেখো কথাটা। কেউ না একদিন বোমফট্টাশ ক'রে দেয় ওকে, তার আগে একটা সুপারিশ যদি বাগাতে পারি—আচ্ছা—পরে কথা হবে।' আমাকে মুক্তি দিয়ে অমূল্য ছুটে গেলো দরজার কাছে, ওস্তাদ ইব্রাহিম খাঁকে অভ্যর্থনা করতে, ঘরের মধ্যে নড়াচড়া শুরু হ'লো। অনাদিবাবু ঘুরে-ঘুরে বলতে লাগলেন, 'আসুন আপনারা, আসুন সবাই—ওস্তাদজী—জোন্স—রঞ্জু, এখানে একা দাঁড়িয়ে কেন—চলো, চা তৈরি।'

—আমাদের লাঞ্চও প্রায় তৈরি মনে হচ্ছে, দূতী সমাগত। ইনি গায়ত্রী গ্রেগরি, আমার হাউসকীপার। ওয়াইন কোনটা দেবে? বলুন আপনি, আপনার কী পছন্দ? আপনার অভ্যেস নেই? আচ্ছা, একটু শাব্লি চেখে দেখুন, বিশুদ্ধ দ্রাক্ষারস, কোনো ক্ষতি হবে না। ঠিক আছে, গায়ত্রী, আমরা আসছি এক্ষুনি। ... কী বললেন? গায়ত্রী গ্রেগরি নামটি বেশ সুন্দর? হ্যাঁ—সুন্দর নাম, মানুষটিও অসুন্দর নয়। কঙ্কানি মেয়ে, গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক ব্রাহ্মণ। নামের মধ্যেই দুই ধর্মের অনুপ্রাস। বিচিত্র দেশ এই ভারতবর্ষ। গায়ত্রী বিধবা, দ্বিতীয়বার জাত-ধর্ম মিলিয়ে পাত্র জোটানো গেলো না। আমার কাছে আছে, ভালোই আছে। চমৎকার সেবাপরায়ণা মেয়ে, আমিও ওর সব রকম প্রয়োজন মিটিয়ে চলি। ঐ লাঞ্চের ঘণ্টা। আসুন।

৬

এই ছবিটা? এটা নেলির হস্তশিল্প—আমার স্ত্রীর কথা বলছি।...ভালো? মশাই, আমি সে-রকম লোক নই যে আপনি আজ আমার বাড়িতে অতিথি ব'লেই আপনার মুখে স্তোক শুনতে চাইবো। খোলাখুলি

কথা বলতে পারেন আমার সঙ্গে। আমাকে দেখে চলনসই গোছের রুচিবান লোক ব'লে মনে হচ্ছে, অথচ এই ছবি ঝুলিয়ে রেখেছি কেন খাবার ঘরে—এই তো আপনার মনের কথা? তা মশাই, নেলি মারা যাবার পরে একটু কষ্ট হ'লো ওর জন্য, ওর আঁকা গাদা-গাদা ছবি থেকে এই একটা বের ক'রে নিয়ে বাঁধিয়ে রাখলুম। স্মৃতিচিহ্ন হিশেবে। অন্যগুলো প'ড়ে আছে কোথাও, ধুলোর ধন ধুলোয় ফিরে যাচ্ছে।...না, উটকামণ্ড নয় জব্বলপুরের দৃশ্য এটা। সেখানকার বন-জঙ্গল ঝর্না ইত্যাদি দেখার ফলে নেলির স্কন্ধে চিত্র-সরস্বতী ভর করলেন। সকালে দুপুরে ছবি আঁকে ব'সে-ব'সে, কেউ-কেউ বেড়াতে এসে তারিফও করে। কিন্তু তাতে তৃপ্তি নেই নেলির, বার-বার আমার মত জানতে চায়। একটা নির্দোষ আমোদ ভেবে আমি অনেকদিন চুপচাপ ছিলুম, কিন্তু যখন দেখলুম নেলির প্রায় ধারণা হ'য়ে যাচ্ছে সে ছবি আঁকতে পারে, তখন একদিন বলতে বাধ্য হলাম, 'এ-সব দৃশ্য তো বাইরেই আছে, এগুলো আবার আঁকছো কেন?' 'মানে?' 'মানে হলো—তোমার ছবিতে পাহাড়টা পাহাড়ই, ঝর্নাটা ঝর্না, অন্য কিছু নয়, তুমি নতুন কিছু যোগ করোনি।' ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, বুঝতে পর্যন্ত পারে না কী বলছি—হাঁঃ! প্যাস্টেল ছেড়ে পিয়ানো ধরলো এর পরে, সামনে স্বরলিপি রেখে কসরৎ ক'রে রোজ, একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ের কাছে নতুন গৎ তুলে নেয় মাঝে-মাঝে—আমাকে আবার শোনাতেও চায়। ছবিটা তবু নীরব থাকে মশাই, চোখ দুটোকে সরিয়ে নিলেই মুশকিল আসান, কিন্তু কান দুটোর তো আত্মরক্ষার কোনো উপায় নেই—ঐ পিয়ানো বাদ্যি ঝালাপালা ক'রে তুললো আমাকে। কোনো ভুল নেই বাজনায়, কোনো রসও নেই—অসহ্য। একদিন ঐ ফিরিঙ্গি মেয়েটির সামনেই নেলিকে বললুম, 'এখানে বড্ড গোলমাল, আমি বরং ওপরে গিয়ে কোনো বই-টই পড়ি।' এমনি করে ছুঁচোর কেত্তন থামালুম।

ও-রকম ক'রে তাকালেন কেন আমার দিকে? বলতে চান আমার কাজটা ঠিক স্বামীজনোচিত হয়নি? নেলিকে উৎসাহ দেয়া উচিত ছিলো আমার? কিন্তু আমি যে বড়ো দুর্ভাগা, মশাই—আমি নির্বোধ নই, হ'তে পারিনি কোনোদিন। অন্তত এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি আমার ছিলো যে নেলির কোনো ট্যালেন্ট নেই—না ছবিতে, না গান-বাজনায়, না অন্য কিছুতে। আর তা যার নেই তাকে তা বুঝিয়ে দেয়াই সৎকর্ম, সে আপনার বক্ষলগ্ন সহধর্মিণী হ'লেও। বা সেইজন্যেই, আরো বেশি সেই জন্যেই। সেটাই স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য, নিজের প্রতি, সমাজের প্রতি। নলিনী ব্রোকার যে আর-একজন মিতু বর্ধন নয়, তা বুঝতে কি আমার আধ মিনিটের বেশি সময় লেগেছিলো ভেবেছেন? তা হ'তেই বা হবে কেন বলুন, আমি তা চাইওনি, ও-সব বাজে বাবুগিরি নেই আমার। কিন্তু নেলি ভাবে, ওর ও-সব গুণপনা দেখে আমি বুঝি ওকে আরো বেশি ভালোবাসবো। কী ছেলেমানুষ বলুন তো! কখনো ওকে সাবালক ক'রে তোলা গেলো না, খুকি হ'য়েই কাটিয়ে দিলো জীবনটা। তাছাড়া, মশাই, গুণপণাই যথেষ্ট নয়, ভাগ্যও চাই। ঐ মিতুর কথাই ধরুন না : কিছুর মধ্যে কিছু না, হঠাৎ কপ ক'রে ধ'রে হিজলি ক্যাম্পে চালান ক'রে দিলে। কোথায় গেলো তার গান, কোথায় বা ভক্তের দল।

কিন্তু সেই সন্ধ্যাটিতে ভবিষ্যৎ কোনো ছায়া ফ্যালেনি। ওয়াড়িতে, লার্মিনি স্ট্রিটের বকুল-ভিলায়, সেই ভাদ্র মাসের সন্ধ্যায়। আকাশ ছিলো সূর্যাস্তে রঙিন, কিন্তু আমার মনে যেন পা টিপে-টিপে কুমারী উষা উঠে আসছেন। এক নতুন জগতে ছাড়পত্র পেয়েছি, যেখানে আত্মীয় মানেই স্বজন নয়, আর কেউ আমাদের মাসিমার ভাসুর-পো না-হ'লেই 'পর' ব'লে গণ্য হয় না। যেখানে স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে সব সময় একটা দেয়াল দাঁড়িয়ে নেই—সূক্ষ্ম, দুরতিক্রম্য দেয়াল। বসার ঘর পেরিয়ে পেছন দিকে একটা চওড়া খোলা বারান্দা, ছোটো-ছোটো টেবিলে ভাগ হ'য়ে চায়ের ব্যবস্থা সেখানে। সকলের পেছনে আমি যখন এলাম তখনও অমূল্যর কথাগুলো ঝিমঝিম করছে আমার মাথার মধ্যে, মুখটা যেন তেতো হ'য়ে আছে—কিন্তু বারান্দায় এসে দাঁড়ানোমাত্র আমার মনের অবস্থা বদলে গেলো। হঠাৎ মিতুকে দেখতে পেলাম আমার মুখোমুখি। মিতুই প্রথম কথা বললো, 'এই যে আপনি।' ব'লেই থমকালো একটু, কেননা ও-রকম অন্তরঙ্গ স্বরে কথা বলার মতো চেনাশোনা

তার সঙ্গে আমার হয়নি এখনো, এই তো সবে তৃতীয়বার দেখা। 'আপনি এদিকে আসুন, এই কোণের টেবিলটায়। আমি আপনাকেই—' হয়তো বলতে চেয়েছিলো, 'আপনাকেই খুঁজছিলাম', কিন্তু এক সেকেণ্ড থেমে বদলে দিলো কথাটা, 'আমি আপনাকে একটা কথা বলবো ভাবছিলাম।' 'কী, বলুন?' "মহুয়া" বইটা পেয়ে খুব খুশি হয়েছি, কিন্তু কাজল-মামির হাত দিয়ে কেন?' আধ ঘণ্টা আগে জোঙ্গের কাছে যে-বাগ্মিতার পরিচয় দিচ্ছিলাম তা সে-মুহূর্তে ত্যাগ করলো আমাকে; আমার মনে প'ড়ে গেলো এই নিমন্ত্রণে আসার আগে আমি কত সময় নষ্ট করেছি, কত দুশ্চিন্তা ভোগ করেছি, যার ফলাফল—বেশি কিছু নয়, শুধু ঐ 'মহুয়া' বইটা। অনাদিবাবু আমাদের বাড়িতে ফী নেন না, হয়তো তারই প্রতিদানস্বরূপ আমার মা কিনেছিলেন মিতুর জন্য একখানা জামদানি শাড়ি, কাজল কিনেছিলো ওয়াটারম্যান কলম, আর আমার মনে হ'লো আমারও কিছু উপহার দেয়া উচিত, কেননা আমার আলাদা উপার্জন আছে, স্কলার্শিপ পাই। কিন্তু ইসলামপুর থেকে নবাবপুর পর্যন্ত সব ক-টা বড়ো-বড়ো মনোহারি দোকানে ঘুরে-ঘুরে আমি কিছুই খুঁজে পেলাম না, যা মিতুর যোগ্য। তাছাড়া জিনিশটাও এমন হওয়া চাই যাকে বলা যেতে পারে নৈর্ব্যক্তিক, গায়ে-পড়া নয়, গা-ঘেঁষা নয়, যাতে প্রকাশ পায়—কোনোরকম 'ভাব করার' ইচ্ছে নয়, শুধু সাধারণ সৌজন্য। আট-কোনা শিশিতে ফরাশি সেন্ট, যার ভেতরে টলটল করছে সবজে-হলুদ আভা-জাগানো এমন এক বর্ণহীন তরল পদার্থ, যার প্রতিটি বিন্দুতে স্বপ্নের প্রস্রবণ লুকিয়ে আছে; বাক্সবন্দি হেলিও ট্রোপ রঙের বিলেতি চিঠির কাগজ, সূক্ষ্ম পাটির মতো বোনা, ধারে-ধারে সরু সোনালি রেখার ঝিকিমিকি, খামগুলোর মধ্যে লুকোনো আছে কালচে-লাল জবা-রঙের ঝলক—যা দেখামাত্র চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে কিন্তু লেখার মতো মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না—এই ধরনের শৌখিন দ্রব্য একই কারণে বাদ দিতে হ'লো। অগত্যা সেই গতানুগতিক বই কিনতেই বাধ্য হলুম, সেই সনাতন রবীন্দ্রনাথের কবিতা। কিন্তু তারপর আর-এক চিন্তা আক্রমণ করলো আমাকে : কী ক'রে দেবো বইটা মিতুর হাতে? কী বলবো? 'একটা ছোট্ট উপহার এনেছি'—'এই কবিতার বইটা'—'আপনার জন্যে একটা—নাঃ!' প্রত্যেকটাই বোকা শোনাচ্ছে, আর এমন কী ব্যাপার যে ঘটা করে ঘোষণা করতে হবে? বইটা আছেও হয়তো মিতুর, হয়তো আমার পক্ষে আলাদা কোনো উপহার দেয়াটাই অশোভন। শেষ মুহূর্তে কাজল-মামিকে বললুম, 'এটা তোমার কলমের সঙ্গে দিয়ে দিয়ো।'

আপনি হাসছেন? বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আমি লাজুক ছিলুম তখন—মেয়েদের ব্যাপারে বড্ড লাজুক, মনে-মনে এখনো আছি। না, শুধু আমার বয়স বা সময়ের জন্য নয়, ঢাকা শহরের বাঁধাবাঁধি আবহাওয়ার জন্যও নয়—আমার স্বভাবই ঐ। আমি চিন্তাশীল, আমি দ্বিধান্বিত; জগতের সঙ্গে আমার ব্যবহারে তাই স্বাচ্ছন্দ্য নেই। ... অবাক হচ্ছেন? তা শুনুন, আমি চেষ্টা ক'রে এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছিলুম, মনের জোরে, প্রায় গায়ের জোরে—উপড়ে দিয়েছিলুম ঐ সব লতাপাতা যা গাছটাকে বেড়ে উঠতে দেয় না, বুঝেছিলুম যে শক্ত একটা মুখোশ না-আঁটলে কৃতী হ'তে পারবো না জীবনে। আমার চাকরি, আমার বিয়ে, নেলির স্ত্রীধন, এই বাড়ি, বাগান, যা-কিছু দেখছেন, সবই আমার মুখোশ।

কিন্তু সেদিন কোনো ঢাকনা ছিলো না আমার, খোলশ ছিলো না, আমার দুর্গ গ'ড়ে ওঠেনি তখনও, জগতের সব বৃষ্টি রোদ বাতাসের সামনে একেবারে খোলা প'ড়ে আছি, অসহায়। আমাকে কাজল-মামির সঙ্গে এক টেবিলে বসিয়ে দিয়ে মিতু চ'লে গেলো। বারান্দার পরে পাঁচিল-ঘেরা খানিকটা বাগান—'সাজানো বাগান নয়', কয়েকটা পুরোনো আম-কাঁঠাল গাছ, কিছু ফুলের চারা, বর্ষায় ঘাস লম্বা হয়েছে। মেঘ ছিলো পশ্চিমের আকাশে—লাল, সোনালি, গোলাপি, হলদে, আর সেই মেঘেরই ফাঁকে-ফাঁকে এক ঠাণ্ডা নরম গভীর নীল ফুটে উঠছে এখানে-ওখানে; আমি দেখছি সেই মেঘ আর আকাশ, কিন্তু মাঝে-মাঝে, আকাশ আর আমার চোখের মধ্যে, সমুদ্রের তলা থেকে কোনো আশ্চর্য প্রাণীর মতো, ভেসে উঠছে এক তরুণীর মূর্তি, স'রে-স'রে যাচ্ছে এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে, সবুজ শাড়ি, হলদে ব্লাউজ, যেন আকাশের আর বাগানের রঙের সঙ্গে মেলানো,

পাতার ফাঁকে ঝিরিঝিরি হাওয়ার মতো হালকা। হঠাৎ কাজল-মামিকে বলতে শুনলাম, 'মিতুকে সুন্দর দেখাচ্ছে—না?' আমার চোখ স'রে এলো কাজলের দিকে, তার ঠোঁটের কোণে ঝাপসা একটু হাসি দেখলাম। নরম গলায়, ঘুমেল সুরে কাজল আবার বললো, 'তোমার উপহার মিতুকে দিয়েছি আমি। হাতে নিয়ে তক্ষুনি উল্টেপাল্টে দেখলো বইটা, তারপর বললো, "অদ্ভুত, লিখে দেয়নি তো।" সত্যি—লিখে দাওনি কেন?' আমি একটু লাল হলাম বোধহয়, লজ্জা চাপা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়লাম, 'এই বাগানটুকু বেশ লাগছে আমার।' তারপর, কাজল মামির সঙ্গে আলাপ করার জন্যই আবার বললাম, 'কলকাতায় ফটিক-মামার ফ্ল্যাটে নাকি ঘরের সঙ্গেই ছাত আছে? তুমি গিয়ে টবে বাগান করতে পারবে।' 'তুমি কি আমাকে বাগান-বিশারদ ঠাওরালে?' না, তা নয়—আর তাছাড়া ঐ চারতলায় ঠিক বোধহয় সুবিধেও হবে না তোমার। জানো, আমি মনে-মনে অন্য একটা বাড়ি ঠিক করে রেখেছি তোমাদের জন্য।' 'আমাদের জন্য? মানে?' আমি সেই হেশাম রোডের টু-লেটঝোলানো একতলা বাড়িটার কথা বললাম, একদিন হাঁটতে-হাঁটতে দৈবাৎ যেটা চোখে পড়েছিলো আমার, বেলা দশটার ঝকঝকে রোদ্দুরে। ভেবেছিলাম, কাজল হাসবে, আমার ছেলেমানুষিতে, কিন্তু তার মুখে কোনো রেখা পড়লো না। আর তখন আমি ঠিক তা-ই বললাম, যা কাজলের কাছে কখনো বলা উচিত ছিলো না, যা আমি ফটিক-মামাকে বা আমার মা-কেও বলিনি কখনো, শুধু নিজের মনে অনেকবার ভেবেছি। 'আচ্ছা, বলো তো, ফটিক-মামা তোমাকে নিয়ে যাচ্ছেন না কেন তাঁর কাছে? তোমরা কলকাতায় থাকলে চমৎকার হয়, আমি মাঝে-মাঝে—'আমার কথা শেষ হ'লো না, কাজল-মামির চোখে ফুলকি জ্বলে উঠলো হঠাৎ, একটি গভীর রং ছড়িয়ে পড়লো তাঁর সারা মুখে। আর সেই মুহূর্তে কাজলকে আমি আবিষ্কার করলাম।

আমার কাছে তখন জগতের স্ত্রীলোকেরা দুই অংশে বিভক্ত : 'মেয়ে' ও 'ভদ্রমহিলা।' 'মেয়ে' তারাই, যারা আমার কাছাকাছি বয়সী (সাধারণত দু-পাঁচ বছরের ছোটো), আর 'ভদ্রমহিলা'দের সরিয়ে রেখেছি আমার মায়ের দলে—তাঁরা আলাদা একটা সম্প্রদায়। 'মেয়েরা' আমার মনোযোগের যোগ্য (তাদের কোনো-একটিকে আমি বিয়েও করতে পারি কোনো-একদিন) কিন্তু অন্যদের সঙ্গে (আমার প্রাপ্য সেবাটুকু ছাড়া) কোনো সম্পর্ক নেই আমার। এই ধারণার জন্য আমি চেহারা দেখে মহিলাদের বয়স ঠিক বুঝতে পারি না, বিবাহিত হ'লেই আমার কৌতূহলের সীমানার বাইরে ঠেলে দিই তাদের, আর কেউ যদি 'কাকিমা', 'মাসিমা', 'মামিমা' বলে আখ্যাত হয় তাহ'লে তার দিকে ঠিক তাকিয়েও দেখি না, বা তাকালেও দেখতে পাই—বাস্তব মানুষটাকে নয়, 'কাকিমা' বা 'মামিমা' নামাঙ্কিত একটা চিহ্নকে। তাছাড়া আমি কাজলকে এতদিন দেখেছি শুধু বাড়িতে, সেই বক্সিবাজারের অত্যন্ত চেনা দেয়াল ক-খানার মধ্যে—সেখানে সে ফটিক-মামার স্ত্রী, আমার মা-র অনুগত ছায়া, মা-কে আর মামাকে বাদ দিয়ে তার যেন অস্তিত্বই নেই। যদিও প্রায় এক বছর ধ'রে কাজল আমাদের পরিবারভুক্ত, আমার মনে পড়ে না তার সঙ্গে আজকের আগে আলাদা ক'রে গল্প করেছি কখনো, সে যে আমার গেঞ্জি কেচে দেয়, আমার নিজেরই দোষে হারিয়ে-যাওয়া বই কিংবা জুতোর পাটি খুঁজে বের করে, তারও বিশেষ মূল্য দিইনি আমি, ধ'রে নিয়েছিলুম এ-সবই তার কাজ, এইভাবেই দিন কাটাবে সে যতদিন না ফটিক-মামা তাকে কলকাতায় নিয়ে যান। সে কলকাতায় সংসার পাতলে আমার সুবিধে হবে, বাড়ির বাইরে আর-একটা বাড়ি হবে—আমার মনে এটাই ছিলো বড়ো কথা, কাজলের শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনা ও পরিচয়। আমি তাকে জেনেছি এক সেবাপরায়ণ, সুবিধাজনক আত্মীয়া হিশেবে—যে কখনো ভোলে না যে আমি চায়ে মাত্র এক চামচে চিনি খাই, বিকেলে আমাদের চায়ের আসরে যে জনে-জনে এগিয়ে দেয় তারই তৈরি শিঙাড়া বা পাঁচ রকম কেক-বিস্কুট; যে আমাকে মনে করিয়ে দেয় (যেহেতু চা খেতে-খেতে বই পড়তে আমি ভালোবাসি) যে শিঙাড়া ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে, বা কেকটা এসেছে আমারই প্রিয় আবেদ-এর দোকান থেকে—সংক্ষেপে, আমার আরামে যে নানাভাবে জোগান দেয়, কিন্তু আমার জীবনে যে স্থান পায় না। কিন্তু সে-মুহূর্তে, বকুল-ভিলার বারান্দায় যখন মেঘের রং মিলিয়ে যাবার আগে গাঢ় হ'য়ে উঠছে আর সন্ধেবেলার বাতাস

যেন হলদে-সবুজ আঙুরের মতো গোল হ'য়ে উঠে কাঁপছে আমার চোখের সামনে, তখন আমি 'মামিমা'টা বাদ দিয়ে তাকে শুধু কাজল বলে ভাবলাম, আর তখনই দেখতে পেলাম সে বয়সে খুব বড়ো নয় আমার চাইতে, আর তার মুখে বসানো আছে একজোড়া কালো, তরল, গভীব চোখ, যা ফোলা-ফোলা পাতার তলায় সম্পূর্ণ খুলে গিয়ে, ঘুমেব পর্দা ছিঁড়ে ফেলে, আমার দিকে এক ঝলক বিদ্যুৎ ছুঁড়ে দিলো।

টেবিলে-টেবিলে চা আর খাবার যখন পরিবেষণ করা হচ্ছে তখন একটা চাঞ্চল্যেব ঢেউ উঠলো, শোনা গেলো অনেকের গলায় ফিশফিশে গুঞ্জন—'বিভাবতী—'বিভাবতী দত্ত।' তাকিয়ে দেখি, একজন সুশ্রী খদ্দর-পরা মহিলা দরজার ধারে দাঁড়িয়েছেন, মিতুর মা-বাবা এগিয়ে গেছেন তাঁকে অভ্যর্থনা করতে, অনেক চোখ তাঁর দিকে ফেরানো। সকলেব উদ্দেশে হাত তুলে নমস্কার করলেন মহিলাটি, তাবপর মিতুকে বললেন, 'আমি কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না, তোমাব গান শোনাও আজ আমার ভাগ্যে নেই, তোমাকে শুধু একবার দেখতে এলাম এই শুভদিনে।' মিতু আনন্দে লাল হ'লো, অনাদিবাবু বললেন, 'আপনি এখানে বসবেন আসুন। মিস্টার জোন্সের সঙ্গে চরকা নিয়ে তর্ক হচ্ছিলো আমার, আপনার মতটা জানতে চাই।' 'যদি অপরাধ না নেন, আমি বরং মিতুর সঙ্গে একটু গল্প কবি—আমাকে এক্ষুনি চ'লে যেতে হবে।' মহিলাটির সঙ্গে একটি মেয়েও এসেছে, দু-জনকে আমাদেরই টেবিলে নিয়ে এলো মিতু, আলাপ করিয়ে দিলো। 'আমার বন্ধু, বুলবুল চৌধুরী, স্কুলে একসঙ্গেপড়তাম আমরা। আর এঁকে নিশ্চয়ই চিনিস, বুলবুল?' 'ঠিক চিনি বলা যায় না, মুখচিনি।' বলে বুলবুল ঈষৎ মাথা নোয়ালো আমার দিকে। 'আর ইনি আমাদের কাজল-মামি।' কথাটা শুনে আমার আবার মনে হ'লো যে মিতু ভুলে যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে তাব আলাপ কত নতুন। 'বসুন, বিভা-দি, বুলবুল, বোস। রণজিৎ, আপনি বিভা-দিকে চেনেন তো?' আমি উঠে দাঁড়িযে বললাম, 'আমি ববং ওদিকটায় গিযে বসি।' বুলবুল নামের মেয়েটি তক্ষুনি বলে উঠলো, 'কেন, এটা মহিলাদেব জন্য বিজার্ভড নয় আশা কবি? মিতু, তুই একটা চেয়ার টেনে আন না এখানে।' এমনি ক'রে চাবজন মহিলার মধ্যে বসে আমাকে চা খেতে হ'লো সেদিন।

বিভাবতী দত্ত . নামটা আমাব মগজেব মধ্যে ঘোরাঘুবি করে বেড়াতে লাগলো, কিন্তু বিশ্রাম পেলো প্রায মিনিট পাঁচেক পবে, যখন 'মহিলা-বিদ্যালয', আর 'স্বদেশী মেলা', এই কথা দুটো আমাব কানে এলো। আমাব অবাক লাগলো যে নামটা শোনামাত্র আমি বুঝতে পাবিনি যে ইনিই সেই বিভাবতী দত্ত, ঢাকা শহবে মিতু বর্ধনের চেয়েও অনেক বেশি বিখ্যাত যিনি, যিনি প্রায় একটা প্রবাদ বাক্যে পবিণত হযেছেন। বুঝতে পারিনি, তার কারণ আমার মন তখন ব্যাপৃত ছিলো একটা নতুন দেশে পথঘাট চিনে নেবার চেষ্টায, যে-দেশে আমি একটু আগে অতিথিব মতো ঢুকেছি, কিন্তু যাব বাসিন্দা হওযা হযতো বা অসম্ভব নয় আমার পক্ষে। আর-এক কাবণ বিভাবতীব খ্যাতির সঙ্গে তাঁব চেহারার মিল ছিলো না, অন্তত আমাব চোখে ছিলো না। ঢাকা যুনিভার্সিটিব একজন প্রথমতম মহিলা এম এ., বিযে করেননি; তাঁরই স্থাপিত মহিলা-বিদ্যালয়, স্বদেশী মেলা, 'মুক্তধারা' পত্রিকা, এই সব নিয়ে দেশের কাজে উৎসর্গিত তাঁর জীবন। ঢাকায তিনিই বোধহয় একমাত্র মহিলা যিনি বেরিযে এসেছেন পুরোপুরি অন্তঃপুর থেকে, আর তিরিশের কাছাকাছি বযস পর্যন্ত অবিবাহিত থেকেও এড়িযে গেছেন লোকনিন্দা—ঢাকাব মতো শহবে, যেখানে মেয়েদের নামে কুৎসা রটানো লোকেদের একটি প্রধান ব্যসন, সেখানেও বিভাবতীব বিষয়ে কোনো ছায়াচ্ছন্ন উক্তি অত্যন্ত অস্পষ্টভাবেও কেউ করেনি কোনোদিন। আমি তাই ধ'বে নিয়েছিলুম তাঁর ব্যক্তিত্বে একটা দূরত্ব থাকবে—রুক্ষ চুল, তীক্ষ্ণ চোখ, শরীরটি ছিপছিপে, প্রায় শীর্ণ, এক কথায় একজন 'ইন্টেলেকচুয়েল' মহিলা বলে তাঁকে কল্পনা কবেছিলুম। কিন্তু আমার এই মানসমূর্তিকে সবিযে দিয়ে সে-জাযগায আস্তে-আস্তে অন্য একজনকে বসাতে আমি বাধ্য হলাম—যাঁর চেহারাটি নারীত্বমণ্ডিত, গোল ধাঁচেব মুখ, একটু ভারি শরীর, যাঁকে কাজলেব পাশে দেখে আমায মনে হচ্ছিলো যেন কাজলেবই এমন কোনো দিদি যিনি দৈবাৎ কোনো পূর্বপুরুষের ফর্শা রং পেয়েছেন। শাদা খদ্দবের শাড়ি-জামা তাব

পরনে, কিন্তু এতেই বেশ সুসজ্জিত দেখাচ্ছে তাঁকে—যেন তাঁর মুখের স্বাভাবিক লাবণ্য যে-কোনোরকম সাজগোজ বা তার অভাবের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে নিজেকে। আমার কল্পনায় তখন তিরিশ বছর বয়স যদিও প্রায় প্রাচীনতার শামিল, তবু বিভাবতীর মধ্যে আমি সেই সব লক্ষণই দেখতে পেলাম যা এতদিন শুধু আমারই কাছাকাছি বয়সী মেয়েদের মধ্যে আবদ্ধ ব'লে ভেবেছি আমি। 'মেয়ে' ও 'মহিলা'র মধ্যে যে-ভেদরেখা আমি বানিয়ে নিয়েছিলাম, যা একটু আগে টলিয়ে দিয়েছিলো কাজল, এবার তা চুরমার হয়ে ভেঙে গেলো।

৭

আজ্ঞে? ... না, আমি বেশি কিছু খাই না, যেটুকু দরকার নিয়ে নিচ্ছি, আপনি আমার জন্য ভাববেন না। চিবোতে ক্লান্ত লাগে আমার, আমি লিকুইড ডায়েটেরই বেশি পক্ষপাতী। হ্যাঁ, সকাল থেকেই। নেশা? আরে মশাই, নেশা যদি অত শস্তা জিনিশ হ'তো তাহ'লে মানুষের সুখী হবার বাধা ছিলো কী? হয় না, কিছুই হয় না, কিছুতেই কিছু হয় না। দু-এক মিনিটের ব্যাপার শুধু, বুদ্বুদ, ফুলকি জ্বলে উঠে নিবে যায়। হয়তো কখনো রক্ত একটু চনচন করে ওঠে, মন থেকে ভয় চলে যায়, মনে হয় এবার ঘুমোতে পারবো। কিন্তু না, যখনই মনে-মনে ভাবি এবার আমি ঘুমিয়ে পড়ছি তখনই ঘুম ছুটে যায় চোখ থেকে। ঘুমের জন্য তাই অন্য দাওয়াই খুঁজে নিতে হয়, জোটাতে হয় নানা জায়গা থেকে, হাতের পাঁচ গায়ত্রী গ্রেগরী। তা এমন কী খারাপ আমার জীবনটা, বলুন। বেশ তো কেটে যাচ্ছে। আছি নিজের মনে, কারো সাতে-পাঁচে নেই, কেউ বলতে পারবে না আমি তার ক্ষতি করেছি। তাছাড়া, একটু বীরত্বও আমি দাবি করতে পারি হয়তো;—আসলে আমার কিছুই ভালো লাগে না, না মদ না মেয়েমানুষ না গোলাপ ফুল, কিন্তু ভান করছি, নিজের কাছেই ভান করছি, যেন ভালো লাগছে। ভান ছাড়া কেউ কি বেঁচে থাকতে পারে?

কিন্তু আপনার সব ঠিক আছে তো? কাঁকড়ার সুপটা ভালো লাগলো? কন্যাকুমারিকার কাঁকড়া, এ-অঞ্চলে এর রসজ্ঞ ব্যক্তি বেশি নেই অবশ্য—প্রতাপান্বিত ভেজিটেরিয়ান সব। ওরা মুর্গি দিয়ে স্প্যানিশ রাইস রেঁধেছে দেখছি, বুদ্ধি করে তবু ভাত করেছে যা হোক। আপনাকে মাছের-ঝোল-ভাত খাওয়াতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু ও-সব তো আর গোয়ান রাঁধুনির হাত দিয়ে বেরোয় না। যেমন স্কটল্যাণ্ডের জল আর ঠাণ্ডা ছাড়া সত্যিকার হুইস্কি হয় না, তেমনি সত্যিকার বাঙালি রান্নার জন্যেও চাই বাংলার স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়া, বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার নারী। ওটা একটা ম্যাজিকের মতো ব্যাপার, মশাই, কিমিয়ার মতো, কোনো কুক্-বুকে লেখা যাবে না কখনো, কোনো এক 'রহস্যময় এক্স' আছে ওর মধ্যে যাকে আমরা বলি 'হাতের তার', সেটুকু বাদ পড়লেই সব পণ্ড হ'লো। ভেজাল আমার দু-চক্ষের বিষ, আমি দিশি খানার লোভে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া ক্লাবে ঢুকি না, সাহেবদের মুখে 'কারি' কথাটা শুনলে আমার ব্রহ্মতালু জ্বলে যায়। তামিল থেকে ঐ কথাটাকে তুলে নিয়ে ইংরেজরা কী জুলুম চালাচ্ছে ভেবে দেখুন—শুক্তোও 'কারি', চচ্চড়িও 'কারি', মুড়িঘণ্টও 'কারি'! বিসমিল্লা!

তা জানেন, নেলির কেমন একটা করুণ আস্থা ছিলো তার কুক্‌বুক্‌গুলোতে। রান্না নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো দরকারই নেই তার, বাবুর্চি বাঁধা-ধরা যা রাঁধে দিব্যি খেয়ে নেয়া যাচ্ছে, কিন্তু নেলির ভাবটা যেন সুখে-থাকতে-ভূতে-কিলোয় গোছের। বই দেখে-দেখে নিত্যি নতুন রেসিপি লিখে দেয় বাবুর্চিকে, কিন্তু জমকালো ফরাশি নামগুলোর তলায় স্বাদে-সোয়াদে তফাৎটা ঠিক টের পাওয়া যায় না। আমি আপত্তি করি না তবু—বেশ তো, নেলির এই যখন এক শখ চেপেছে, ক্ষতি কী? কিন্তু মুশকিল এই যে নেলি তারিফ শুনতে চায় আমার মুখে—যেমন তার ছবি আঁকায়, পিয়ানো বাজানোয়, তেমনি—যেন গুণপনার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই, বিশেষ কোনো-একজন মানুষের প্রশংসা

পাওয়াতেই তার সার্থকতা। হাসি পায় আমার, মেজাজ বিগড়ে যায়, যখন নেলি খেতে বসে জিগেস করে ভালো হয়েছে কিনা, এমনভাবে তাকায় যেন সম্পাদককে কোনো লেখা পড়তে দিয়ে তরুণ লেখক দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করছে। শেষটায় একদিন না-বলে পারলুম না, 'বাংলায় বলে যেচে মান, কেঁদে সোহাগ। তেমনি হ'লো বই প'ড়ে রান্না।'

সহজ হয়নি অবশ্য ঐ বাংলা বচনটার ইংরেজি তর্জমা ক'রে ওকে বোঝানো। তা মিনিট পাঁচেক চেষ্টা করে নেলির মাথায় সেঁধিয়ে দিয়েছিলুম রসিকতাটা। না, বাংলা আমি শেখাইনি ওকে, আমিও ওর গুজরাটি শিখিনি—কী দরকার? কী হবে ও-সব গেঁয়ো ভাষা শিখে—কী আছে ও-সবে? ইংরেজি আছে আমাদের, জগতের ভাষা, তা-ই যথেষ্ট। ইংরেজি ভাষার জন্যেই তবু মাঝে-মাঝে ভারতবর্ষ নামে একটা ব্যাপার অনুভব করা যায়, উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণের সঙ্গে তামিল চেট্টির কথাবার্তা চলে, বিয়ে হ'তে পারে বাঙালির সঙ্গে গুজরাটির। শুধু কি ভাষা? যাকে আমার ঠাকুমা বলতেন 'সাহেব-সাহেব খেলা', সেটাই হ'লো আসল মিলনমন্ত্র। নয়তো দেখুন বামুন-শুদ্দুব, আমিষ-নিরিমিষ, ছোঁবো কি ছোঁবো না, খাবো কি খাবো না—ঝামেলা কত! এ-সবের ওপরে উঠতে পারে শুধু তারাই, যারা মনে-মনে ও আচারে-ব্যবহারে আধা-সাহেব ব'নে গেছে—ঠিক না? আমি নেলিকে বরং উৎসাহ দিয়েছিলুম জর্মান শিখতে, ওর মরচে-পড়া ইটালিয়ানটা ঝালিয়ে নিতে—দেশভ্রমণের সময় খুব কাজে লাগে ওগুলো, দু-চারখানা পড়ার যোগ্য বইও আছে, যদি কেউ পড়তে চায়। তাছাড়া আমি চাইওনি নেলিকে 'বাঙালি' ক'রে তুলতে,' আমি বাংলাদেশকে আমার মন থেকে কেটে দিয়েছিলুম। আমি ভারতীয়, আমি আন্তর্জাতিক, আমি জগতের বাসিন্দা।

নেলি আবার আর-এক ফ্যাশাদ বাধিয়েছিলো যখন তার সাজগোজের ব্যাপারেও আমাকে বিশেষজ্ঞ ব'লে ধ'রে নিলে। 'বলো তো এটা মানাচ্ছে আমাকে? এই শাড়ি, এই চোলি, এই গয়না? এই পিঙ্কের সঙ্গে সিলভার-গ্রে? এই সানফ্লাওয়াবের সঙ্গে মিডনাইট-ব্ল্যাক? এই ইণ্ডিয়ান রেডের সঙ্গে এমরাল্ড-গ্রীন? নির্ভুলভাবে রংগুলোর পারিভাষিক নাম বলে সে—বোধহয় ছবি আঁকায় তার শিক্ষা বা কুশিক্ষাব ফল ওটা—যদিও আমি চোখেই দেখতে পাচ্ছি সে কী পবেছে, আর আমার চোখে কেমন লাগছে তা-ই সে জানতে চায়। 'বাঃ' চমৎকার! খুব সুন্দব দেখাচ্ছে তোমাকে। 'বা' মাঝে-মাঝে—নেহাৎ তাকে খুশি করার জন্য—'চোলিটা একটু হালকা রঙের হ'লে ভালো হয় না?' 'মুক্তো বোধহয় মানাবে এর সঙ্গে।' আমি এতদূর পর্যন্ত গিয়েছিলুম মশাই, যে কখনো কোনো পার্টিতে বেবোবার আগে, তাকে দিযে খামকা তিনবার সাজগোজ বদলাই—বেচারা ঘেমে যায়, টাল-টাল শাড়ি নামাতে হয় আলমারি থেকে, আমি একটা ছোট্ট কৌতুক উপভোগ কবি নিজের সঙ্গে, একটা ছোট্ট প্রতিশোধের রিহার্সেল চালাই।

তা বলে ভাববেন না যে মেয়েদের রূপ, বেশভূষা, এ-সবেব মর্ম আমি বুঝি না। নেলিকে আমি যে মনোনীতা করেছিলুম তার একটা কারণ রূপ বইকি। ঠিক সেই ধরনের রূপ, যা বাংলাদেশে কখনো দেখা যায় না, কিন্তু এখনো উত্তরভারতে যা আর্য জাতির স্মৃতিকে চাক্ষুষ করে তোলে মাঝে-মাঝে। যেমন মহাভারত থেকে কুন্তী বা দ্রৌপদী উঠে এলেন, হঠাৎ দেখে এমনি মনে হয় নলিনী ব্রোকারকে। 'কাশ্মীরি ঘোটকীর মতো'—আপনার মনে আছে সুদেষ্ণার মুখে দ্রৌপদীর বর্ণনা?—তার সঙ্গে মিলিয়ে নিন। কিন্তু হায়, আমার তো আর তখন একুশ বছর বয়স নেই, তিন বছর বিলেতে কাটিয়ে ঝানু হয়েছি, নিজেকে তৈরি ক'রে তুলেছি অন্যভাবে—ছেঁটে দিয়েছি সেই সব দুর্বলতা, বোকামি, যা আমাকে ধ্বংসের প্রান্তে নিয়ে গিয়েছিলো কোনো-এক সময়ে। অতএব আয়তলোচনা ক্ষীণমধ্যমা বরবর্ণিনী নলিনীর সাধ্য কী যে আমার মাথা ঘুরিয়ে দেবে? অনেক আগেই নারীকে আমি আবিষ্কার করেছিলুম, লার্মিনি স্ট্রিটের বকুল-ভিলায় ভাদ্রমাসের এক সন্ধেবেলা। পেয়েছিলুম নারীত্বের সেই স্বাদ, সৌরভ, যা এই শাব্লির মতোই স্নিগ্ধ, উদ্বায়ী, বা মদও নয়, মদের যে-নিশ্বাসটুকু ইয়েটসের মতে প্রেতেরা পান ক'রে থাকে, সেই নিশ্বাস। যদি সেখানেই থেমে যেতাম, সেই নিশ্বাসে ও সৌরভে, তাহ'লে আমার জীবনটা আজ অন্য রকম হ'তো—ভালো হ'তো না, বড়োজোর কোনো

য়ুনিভার্সিটির প্রোফেসর হ'য়ে এতদিনে কষ্টেসৃষ্টে একটি বাড়ি তুলতাম সেই বিরাট বস্তিনগরে, যার নাম কলকাতা। ভাগ্যে আমার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিলো ঐ মেয়েরা, যাদের সঙ্গে সেদিন আমি চায়ের টেবিলে জুটে গিয়েছিলাম।

জানেন, সেই সন্ধ্যায় আমি যেন এক নতুন চোখ পেয়েছিলুম। আমার পক্ষে অনভ্যস্ত ঐ নারীসান্নিধ্যের জন্য, আর হয়তো বাইরের ঐ আঙুর-রঙের আভার জন্যেও। মেয়েদের চেহারা ও বেশভূষার যে-সব খুঁটিনাটি আমি আগে কখনো লক্ষ করিনি, সেগুলি—কবিতায় কোনো আশাতীত মিল বা রবীন্দ্রনাথের চমকপ্রদ 'রডোড্রেনড্রন' শব্দটার মতোই—আমার চোখে পড়ছে এখন, এমনকি প্রায় সেইরকমই মূল্যবান ব'লে মনে হচ্ছে। মিতুর কালো চুলের ফাঁকে টুকটুকে লাল দুল—যা মাঝে-মাঝে ঝাপসাভাবে ন'ড়ে উঠছে : কাজলের গলার নিচে বুকের অনাবৃত অংশটিকে চাঁদেব মতো সোনার নেকলেস ; বিভাবতীর সুগোল কব্জিতে একটিমাত্র চিকবি-কাটা কলি ; বুলবুলের কালো ফ্রেমের চশমার পেছনে ছোটো তীক্ষ্ণ কাঠবিড়ালি-চোখ—তাদেব মাথার গড়ন, গালেব ডৌল, ঠোঁটের রেখা, অর্থাৎ, মেয়েদের সাজসজ্জা ও দেহের ভঙ্গি—তার ভাবার্থ যেন এই প্রথম ধরা পড়লে আমার মনে। 'নারী' নামক যে-আক্ষরিক ধারণাটাকে নিয়ে আমি এতদিন খেলা করেছি মনে-মনে, তা যেন ছিলো পাঠ্যবইয়ের ভূগোল ; কিন্তু আজ স্কুলের ছাত্র পর্যটক হ'যে ভৌগোলিক বাস্তবের সামনে দাঁড়িয়েছে—দেখছে নিজের চোখে হ্রদ পাহাড় গহ্বর যোজক অন্তরীপ, দেখছে এক অফুরন্ত বৈচিত্র্য, এক বিপুল সম্ভাবনা, ম্যাপের বইয়ে যার গুজব পর্যন্ত শোনা যায়নি। দৈবাৎ—বা হয়তো মিতুর ইচ্ছে অনুসারেই—যে-টেবিলটিতে বসতে পেয়েছিলুম, সেখানেই আমাব সমস্ত মনোযোগ সংহত হ'লো। অন্যান্য টেবিলে যাঁরা আছেন আর যা-কিছু হচ্ছে—অনাদিবাবু আব জোন্সের চরকা-বিষয়ক তর্ক, মিতুর ওস্তাদজীর বাজখাঁই গলায় উর্দু-ঘেঁষা বাংলা, ফটিক-মামা, অমূল্য, অন্যান্য অতিথিরা, সবাই যেন অস্পষ্ট হ'য়ে গেলো তখনকার মতো ; এক আশ্চর্য নতুন অনুভূতির তলায় চাপা পড়লো দৈনন্দিন বাস্তব—প্রেক্ষাগৃহে যখন আলো নিবে যায় আর রঙ্গমঞ্চে পর্দা ওঠে, তখন আশে-পাশে যাঁরা মনোহারিণী আছেন তাঁদের অস্তিত্ব আমরা যেমন ভুলে যাই, তেমনি। যেন শুধু এই টেবিলেই কিছু ঘটছে, যাকে প্রায় নাটক বলা যায়, আর—সবচেয়ে যা আশ্চর্য, সেই নাটকে আমাকেও একটি ভূমিকা দেয়া হচ্ছে যেন, আমি যেন অন্যদের দেখতে-দেখতেই আমার নিজের পার্ট শিখে নিচ্ছি।

পুজোর ছুটিব মধ্যে স্বদেশী মেলা হবে এবার, তা-ই নিয়ে কথা বলছিলেন বিভাবতী। মিতু বুলবুল দু-জনেই ছাত্রী ছিলো তাঁর, আর বুলবুল মনে হ'লো রীতিমতো একজন সহকর্মিণী এখন, কিন্তু নতুন-চেনা কাজলকেও কথাবার্তার অন্তর্ভূত ক'রে নিলেন তিনি ; কাজল সহজেই রাজি হ'লো কিছু শেলাইয়ের কাজ ক'রে দিতে, মেলায় বিক্রির জন্য। নতুন স্টল কী-কী খোলা যায়, কোন-কোন কোরাসের গান শিখিয়ে দেবে মিতু, কোন-কোনটা সোলো গাইবে, এই সব নিয়ে কথা চলছে তখন, বিভাবতী এক ফাঁকে আমার দিকে তাকালেন। 'আমরা তোমার কোনো সাহায্য কি পেতে পারি, রণজিৎ?' তিনি, বিখ্যাত বিভাবতী দত্ত, আমার সঙ্গে ও-রকম অনুরোধের সুবে কথা বলছেন, এতে আমার এমন অপ্রস্তুত লাগলো যে তক্ষুনি আমার মুখে কোনো জবাব জোগালো না। বুলবুল কথা থামিয়ে আমার দিকে তাকালো, আমি চেষ্টা ক'রে বললাম, 'বলুন, আমি কি করতে পারি?' বিভাবতী আমাকে একটা চার্ট তৈরি ক'রে দিতে বললেন, ভারতের ইতিহাস বিষয়ে, বৈদিক যুগ থেকে অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত সব প্রধান তথ্য আর তারিখ থাকবে তাতে। 'পারবে না?' 'চেষ্টা করতে পারি।' 'আর-একটা জিনিশ চাই তোমাব কাছে—''মুক্তধারা''র জন্য একটা লেখা।' আমি? 'আমি কী লিখবো?' 'কী লিখবে তাও ব'লে দিচ্ছি—এবার কিছুটা আদেশের সুর বিভাবতীর—''রবীন্দ্রনাথের গোরা চরিত্র।'' গোরাকে উনি কেন আইরিশ করলেন, এই প্রশ্ন নিযে আলোচনা। আমি জানি তুমি কবিতা লেখো, কিন্তু আমার প্রবন্ধই দরকার।' এবারে আমি সম্পূর্ণ অভিভূত হলাম, কেননা আমার যে-ক'টা কবিতা (সংখ্যায় শোচনীয়রূপে অল্প) কলকাতার ছোটো-

ছোটো কাগজে এ-পর্যন্ত বেরিয়েছে, তাও যে বিভাবতী দত্তর মতো একজন ব্যস্ত ও নামজাদা লোকের চোখে পড়তে পারে তা আমার কল্পনাতীত ছিলো। আমার বিব্রত ভাবটা চাপা দেবার জন্য আমি একটু অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললাম, 'আচ্ছা—একটা কথা জিগেস করতে পারি কি? আপনাদের মেলায় জিনিশপত্রের দাম এত বেশি হয় কেন? চার পয়সার রুমাল চার আনা?' 'কারা তৈরি করছে সেটা দেখবে না?' ব'লে কাজল একটু হাসলো আমার দিকে তাকিয়ে, আর বুলবুল বলে উঠলো, 'বাঃ, টাকা তোলার জন্যই তো মেলা।' কিন্তু, কেন টাকা তোলার প্রয়োজন, সেটা আমার কাছে রহস্য থেকে গেলো, বিভাবতী অন্য কথা পাড়লেন।

'আচ্ছা, দিলদার নওরোজ নাকি ঢাকায় আসছেন, মিতু কিছু জানো?' 'আমিও তা-ই শুনেছি। 'তাঁর কোনো চিঠিপত্র পাওনি শিগগির?' 'দুটো নতুন গান পাঠিয়েছেন—স্বরলিপি সুদ্ধ।' বুলবুল জিগেস করলো, 'আজ গাইবি ও-দুটো?' 'আজ কী ক'রে গাইবো, আমি তো স্বরলিপি থেকে ঠিক-ঠিক সুর তুলতে পারি না,' সরলভাবে আমার মনে হ'লো মধুরভাবে নিজের এই অক্ষমতাটুকু স্বীকার করলো মিতু। 'কলকাতায় গেলে দিল-দার কাছেই শিখে নেবো।' 'আশ্চর্য মানুষ!' বললেন বিভাবতী, 'আমার সঙ্গে একবার আলাপ হয়েছিলো কেষ্টনগরে—একই কনফারেন্সে গিয়েছিলুম আমরা। যেমন হাসি, তেমনি গান, তেমনি আনন্দ। একেবারে প্রাণের ফোয়ারা।' 'হ্যাঁ', মিতু সোৎসাহে মাথা নাড়লো, 'দিল-দা যেখানেই যান উনি একাই একশো। আর কী-রকম চা ভালোবাসেন! আর গান একবার শুরু হ'লো তো অন্য কিছু খেয়াল থাকে না। মাঝে-মাঝে চা আর পান-জর্দা পেলেই হ'লো—ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায়।' 'দেখতেও অসাধারণ', ব'লে উঠলো বুলবুল। 'বাবরি চুল মাঝখান দিয়ে সিঁথি-করা, বড়ো-বড়ো টলটলে চোখ, চোখের কোণ দুটি লালচে, হলদে বা গেরুয়া রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবি আর চাদর পরেন—ফুর্তিতে মাতোয়ারা সব সময়, এদিকে জেলে যাচ্ছেন, অনশন করছেন, গান দিয়ে মাতিয়ে দিচ্ছেন সারা দেশ। —অসাধারণ!' 'দিল-দাকে দেখতে হয় যখন হার্মোনিয়মের সামনে ব'সে গান লেখেন', আমার দিকে ঝাপসাভাবে একটু তাকিয়ে মিতু বলতে লাগলো, 'খাতা আর কলম থাকে সামনে, বাজাতে-বাজাতে এক লাইন গেয়ে ওঠেন, খাতায় লেখেন, "আহা-হা"। ব'লে ভাঙা-ভাঙা গলায় নিজেই হেসে ওঠেন চেঁচিয়ে, তারপর আর-একটা লাইন—এমনি ক'রে দেখতে-দেখতে পুরো গানটি লেখা হ'য়ে যায়, তারপর গেয়ে শোনান সকলকে—চোখ থেকে হাসি যেন উপচে পড়ে, ঝাঁকড়া চুল ঢেউয়ের মতো দুলে ওঠে—এক আশ্চর্য ব্যাপার।' আমার মনে হ'লো নওরোজ যেন অশরীরীভাবে এখানে উপস্থিত, তিনিই দখল করে নিয়েছেন এই মহিলাদের, যাঁদের সঙ্গে আমি ব্যর্থ বাস্তবে ব'সে চা খাচ্ছি। একটু পরে বিভাবতী বললেন, 'আমি ভাবছিলাম, মিতু, আমাদের মেলার উদ্বোধনের জন্য নওরোজকে এবার আমন্ত্রণ জানাবো। 'বেশ তো! খুব ভালো হয়'! 'শুনেছি ওঁকে ধরা খুব শক্ত?' 'তা তো জানি না, তবে ঢাকায় একবার আসার ওঁর ইচ্ছে আছে তা জানি।' 'তাহ'লে, মিতু, তুমি একবার লিখে দেখবে নাকি?' মিতু বিনীতভাবে জবাব দিলো, 'আপনি বলেন তো লিখতে পারি।' 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই— উনি মোটামুটি রাজি থাকলে আমি স্কুলের পক্ষ থেকে সব ব্যবস্থা করবো, ওঁর সুবিধেমতো তারিখও বদলাতে পারি।—রণজিৎ, তোমার সঙ্গে নওরোজের আলাপ নেই?' বিভাবতী এমন সুরে কথাটা জিগেস করলেন যেন আমার দুটো-চারটে পদ্য, ছাপা হয়েছে বলেই আমি নওরাজের বন্ধু হবারও যোগ্য। ব্যস্ত হ'য়ে বললাম, 'না, না, আমার সঙ্গে আলাপ থাকবে কী করে?' মিতু আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমার কিন্তু মনে হয় উনি আপনার নাম জানেন।' 'সে কী!' 'সে-সব পরে বলবো, কিন্তু উনি এলে নিশ্চয়ই আলাপ করবেন—খুব ভালো লাগবে আপনার।'

আমার অনুভূতি হ'লো আমাকে হঠাৎ কেউ এক তুঙ্গ পাহাড়ের চূড়ায় ছুঁড়ে দিয়েছে, এখানে বাতাস এত হালকা যে সহজে নিশ্বাস নিতে পারছি না। শেলির মতো ছবিতে দেখা মুখ নয়, কালিদাসের মতো কিংবদন্তী নয়, আমারই দেশের আমারই সময়ের কবি, যাঁকে চোখে দেখা, কানে শোনা যায়, যাঁর সঙ্গে—এইমাত্র জানলাম—কোনো সময়ে আমার চেনাশোনাও হতে পারে। সেই

দিলদার নওরোজ—একদল সুস্থ সবল ফুর্তিবাজ শিশুর মতো যাঁর কবিতা আর গান এখন খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে বাংলাদেশে—মিতুর পক্ষে তিনি কাছের মানুষ, তাকে 'তিনি নিজের গান শেখান, তাঁর সঙ্গে চিঠিপত্র চলে তাঁর, কত সহজে মিতু তাঁর বিষয়ে বলে—'আপনি বলেন তো লিখতে পারি', 'আলাপ করলে ভালো লাগবে আপনার!' কিন্তু সেই পাহাড়ের চূড়ায় একটি ছোট কাঁটাও বিধঁলো আমাকে—ঈর্ষা, যেহেতু মিতুর কাছে এই কবি ঘরোয়া 'দিলদা'তে পরিণত হয়েছেন, আর যেহেতু তিনি গান দিয়ে জয় করে নিয়েছেন শুধু মিতুকে নয়, বুলবুলকেও, বিভাবতীকেও; গান—যা কবিতার অত কাছাকাছি, অথচ কবিতার চেয়ে ঢের বেশি ঋজু, সরল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সত্যি-সত্যি যা কানের মধ্য দিয়ে তক্ষুনি মর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছয়—যখন কবিতা তার চিন্তাব ভারে বুদ্ধির ভারে ভাষার শাসনে অনেক পেছনে প'ড়ে থাকে—সেই সুরশিল্পকেই ঈর্ষা হ'লো আমাব। আমার মনে এই কথাটা ঝিলিক দিলো যে আমি যে-রকম কবিতা লিখতে চাই তা যদি লিখেও উঠতে পারি কোনোদিন, তাহ'লেও তা মহিলাদের সে-বকম প্রিয় হবে না, বা কারোবই হবে না খুব সম্ভব—যে-রকম প্রিয় এ-মুহূর্তে আমার প্রতিবেশিনীদের কাছে নওরোজের গান। কিন্তু সেইজন্যেই আমার বুকের ভেতরটা টগবগ ক'রে উঠলো নওরোজ বিষয়ে আবো অনেক-কিছু জানার জন্য—সত্যি কি তাঁকে চা, পান, হার্মোনিয়ম আর খাতা-পেন্সিল দিয়ে বসিয়ে দিলেই একঘর লোকের মধ্যে, হাসি গল্প বাহবার ফাঁকে-ফাঁকে, গান রচনা করতে পারেন তিনি? সত্যি কি মোহনবাগানের খেলা দেখে ফিরে, দার্জিলিঙের ট্রেন ধরার আগে, মাঝের পনেরো কিংবা কুড়ি মিনিট সময়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন একবার? সত্যি কি 'কল্লোল'-এর সম্পাদক, অনেক চেষ্টাতেও লেখা আদায় করতে না-পেবে, নওবোজকে তাঁরই আপিশঘরে তালা বন্ধ ক'রে রেখেছিলেন, আর ঐ রকম বন্দী অবস্থাতেই নওরোজ লিখে উঠেছিলেন তাঁর বোলবোলাও 'জয়ধ্বনি'—যে-কবিতা পড়ামাত্র পুরোটি আমার প্রায় কণ্ঠস্থ হ'য়ে গিয়েছিলো? এই অসাধারণ, সচ্ছল, ফোয়ারার মতো কবি, গল্প শুনে যাঁকে মনে হয় আমাব একেবারে উল্টো স্বভাবের মানুষ, মিতু বর্ধনকে মীডিয়ম ক'রে তাঁব কাছাকাছি পৌঁছবাব ইচ্ছায় আমি অস্থির হ'য়ে উঠলাম, মনে হ'লো মিতুব মুখে আবো অনেক কথা শুনতে পেলে আমি নওরোজের কবিত্বশক্তির গোপন উৎসের সন্ধান পাবো। কিন্তু তক্ষুনি ছোটো একটা ঘটনা কবি ও কবিতা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিলো আমাকে। বকুল-ভিলায় ইলেকট্রিক আলো জ্ব'লে উঠলো।

আমাদের বাড়িতে সন্ধের পর কেরোসিন-লণ্ঠন জ্বলে, বড়ো-বড়ো ছায়া লাফিয়ে ওঠে দেয়ালে, কাঁপে হাওয়ায়, ঘরের মধ্যেও অনেকখানি রাত্রিকে নিয়ে আমরা বাস করি; সন্ধেবেলার মুমূর্ষু আলোর সঙ্গে লণ্ঠন-জ্বলা মুহূর্তটির কোনো তীব্র তফাৎ থাকে না। কিন্তু আকস্মিক বৈদ্যুতিক আলোয় বারান্দার দৃশ্যটি সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হ'য়ে গেলো। আকাশ, মেঘ, আর গাছপালা নিয়ে যে-বায়বীয় দৃশ্যপট ঝুলছিলো এতক্ষণ, তা সরিয়ে দিয়ে স্পষ্ট ফুটে উঠলো শক্ত ইটেব তৈরি চুনকাম-করা দেয়াল, চেয়ার- টেবিলের ঘন আকৃতি, টেবল-ক্লথে চায়ের দাগ; আমার প্রতিবেশিনী মহিলারাও বদলে গেলেন। নতুন আলোয় নতুন ছায়াতে আমি সজ্জিত দেখলাম তাঁদের; চা খাচ্ছেন তাঁরা খেতে-খেতে গল্প করছেন; তাঁদের হাত, আঙুল, গ্রীবার নড়াচড়ার ফলে কখনো আমার চোখে বিঁধছে কাজলের নেকলেসের লাল আর সবুজ পাথরগুলো, কখনো এক ঝলক গাঢ়-বাদামি আভা বেরিয়ে আসছে বুলবুলের চশমার ফ্রেম থেকে, আর হঠাৎ কোনো-একটি ভঙ্গির ফলে বিভাবতীর গলায় সেই তিনটি বিখ্যাত রেখা আমি দেখতে পেলাম—সংস্কৃতে যাকে বলে 'ত্রিবলী', আমি এতদিন যাকে কাল্পনিক ব'লে ভেবেছিলাম।

কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত গাইয়ে মেয়েটির অন্য এক চেহারা আমার চোখে ছিলো, আগের দিনের গানের আসর থেকে সেই ছবিটি আমি তুলে নিয়েছিলাম। হার্মোনিয়মের সামনে যে-ভাবে সে হাঁটু মুড়ে বসে, গাইবার সময় ঠোঁটের যে-সব ভঙ্গি হয়, দাঁতের যে-আভাস দেখা যায়, হার্মোনিয়মের শাদা-কালো চাবির ওপর যে-ভাবে তার সরু সরু আঙুলগুলি খেলা করে—সেইগুলো জানা ছিলো

আমার। কিন্তু আজ এসে অন্য এক মিতুকে দেখছি। সেদিন যখন মেরুন রঙের শাড়ি পরে গান গাইছিলো, তখন কেমন গম্ভীর ভাব ছিলো তার মুখে, কেমন সহজে মেনে নিয়েছিলো জোড়া জোড়া চোখের দৃষ্টিভরা প্রশংসা; একটু আগে সূর্যাস্তের আলোয় তাকে দেখেছিলাম যেন সামুদ্রিক গাছপালায় জড়ানো কোনো জলকন্যা; কিন্তু এখন তার সবুজ শাড়িটা ময়ূরের মতো নীল দেখাচ্ছে, একটু টেনে-টেনে নিশ্বাস নিয়ে সে কথা বলছে, ছোট্ট করে সন্দেশ ভেঙে থেমে আছে বুলবুলের কথা শোনার জন্য—তার গানের গৌরব ভুলে গিয়ে এখন যেন প্রায় বালিকা হয়ে গেছে সে, কোনো উন্মুখ ফুল, এখনো ভীরু, সব পাপড়ি খোলেনি। আর এদিকে কাজল, যে এই চারজনের মধ্যে সবচেয়ে গৌরবহীন, যে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পাশ করেনি, বিয়ের পরে পাঁচ বছর বাপের বাড়িতে ঘুমিয়েছে, যার বিষয়ে আমার আগ্রহের একমাত্র কারণ শুধু এটুকুই ছিলো যে ফটিক-মামা তাকে কলকাতায় নিয়ে গেলে আমার চমৎকার একটা থাকার জায়গা হবে সেখানে—সেই কাজল 'হঠাৎ বড়ো' হ'য়ে উঠলো যেন, ভরপুর, শুধু মেয়ে বলেই অন্যদের সমকক্ষ ও প্রতিযোগী। এও এক বিস্ময় আমার পক্ষে। আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনের মধ্যে দিলদার নওরোজও বদলে গেলেন—বা বলা যায় সরে গেলেন আমার মন থেকে দূরে; এখন আর আমি ঈর্ষা করছি না তাঁকে, তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ও উৎস বিষয়েও কৌতূহল হারিয়েছি; কেননা তাঁর সুন্দর চোখ, ঢেউ-খেলানো চুল, রঙিন চাদর, মন-মাতানো হাসি, আনন্দ, গান, এমনকি তাঁর অসামান্য কবিত্বশক্তি, এমনকি আমার নিজের কবিতা লেখার ক্ষীণ চেষ্টা—এই সব-কিছুর চাইতে অনেক বড়ো জরুরি, অনেক বেশি অভিনিবেশ ও গবেষণার যোগ্য আমার কাছে এই ইলেকট্রিক আলো-জ্বলা-মুহূর্তটি, যা আমার কাছে প্রত্যক্ষ কিন্তু নওরোজের কাছে নয়, আর সেই আলোয় দেখা এই চারটি মহিলা, তাঁদের বসন, তাঁদের ভূষণ, তাঁদের দেহের আঁকাবাঁকা রেখার চাঞ্চল্য, যা প্রতিটি ভঙ্গির সঙ্গে আমাকে যেন স্পর্শ ক'রে যাচ্ছে। আর চায়ের পরে মিতু যখন নওরোজের গান গাইলে, তখন সব প্রতিযোগিতাবোধ ভুলে গিয়ে, নওরোজকে ভ'লোবাসলুম আমি, যেহেতু তারই গানের মধ্য দিয়ে মিতুকে যেন আরো একটু কাছে পাচ্ছি আমি—অন্তত আমার তা-ই মনে হ'লো তখন।

মিতুকে? ... না, মিতু তখনও চেহারা নিয়ে স্পষ্ট হয়নি, শুধু আকাঙ্ক্ষার ঢেউ উঠছে আমার মনে, কোনো অস্পষ্ট নামহীনার জন্য আকাঙ্ক্ষা। ছেলেমানুষ ছিলুম, ভগবানের দয়ায় আমরা সকলেই একটা সময়ে ছেলেমানুষ থাকি। তা জানেন, সে-রাতে বাড়ি ফিরে আমি অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোতে পারিনি, আমার অন্ধকারকে নাড়া দিচ্ছিলো কয়েকটি মুখ, মেয়েদের মুখ, ভিন্ন-ভিন্ন, কিন্তু স্থির নয়, যেন একটা নাগরদোলা আস্তে-আস্তে ঘুরছে আমার মগজে। ঘুরছে নাগরদোলা, সঙ্গে-সঙ্গে ঝ'রে পড়ছে সুর, আকাশ-জোড়া সূক্ষ্ম কোনো গান—মিতুর গলায়, মিতুর চেয়েও হাজার গুণ সুকণ্ঠী কোনো কিন্নরীর তান হয়তো, নওরোজের চেয়েও হাজার গুণ প্রতিভাশালী কোনো কবির নিঃসরণ—মিশে যায় গানের মধ্যে ছবি, ছবির মধ্যে গান, মিশে যায় এক মুখ অন্যটির মধ্যে, ধার ক'রে নেয় পরস্পরের অবয়ব—কারো নাকের দু-পাশে দেখতে পাচ্ছি অন্য কারো চোখ, কোনো ঠোঁটে অন্য কারো হাসি, কারো মাথার পেছনে অন্য কারো খোঁপা—যেন আমার জীবনবৃক্ষে হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলি নারী মুঞ্জরিত হ'লো, অনেক বলেই আমার নাগালের বাইরে। আমি চেষ্টা করলাম কোনো একজনকে বেছে নিতে, ধরে ফেলতে, আমার চোখের মধ্যে পুরোপুরি ভ'রে ফেলতে কিন্তু আমরা যেমন জলে গা ডুবিয়েও হাতের মুঠোয় জল ধরতে পারি না, তেমনি সেই 'এক' যেন অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে, তাকে চোখে বেঁধার চেষ্টা করতে গিয়েই আমি তাকে হারিয়ে ফেলছি। তারপর আধো-ঘুমের মধ্যে আমার মনে হ'লো যে হয়তো এক বিশ্বনারীত্ব আছে কোথাও—বস্তুহীন, বর্ণনাতীত—যার আভাসমাত্র ধরা পড়ে মাঝে-মাঝে, কখনো একজনের, কখনো অন্যজনের মুখে—তাও সব সময় সকলের চোখে নয়, বিশেষ-কোনো মুহূর্তে বিশেষ এক দর্শকের চোখে—কিন্তু দাঁড়ায় না, তক্ষুনি মিলিয়ে যায়। কিন্তু নিশ্চয়ই এমন মুহূর্ত ও এমন অবস্থা সম্ভব, যখন সে বিশ্বনারীত্বের নির্যাস বা সারাংশকে আমরা সংহত করতে পারি একটিমাত্র নারীর মধ্যে,

হয়তো তাকে আমাদেরই জীবনের অংশ করেও নিতে পারি? আর তখনই অন্য একটা ভাবনা ঠেলে উঠলো আমার প্রায় ঘুমিয়ে-পড়া অন্ধকার থেকে : আমার মনের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে যে-অতৃপ্তি, যে-ব্যর্থতাবোধ, সেই কষ্টকে অন্য এক সরল ভাষায় তর্জমা করে নিতে পারলাম—মনে হ'লো, আমার এই ক্ষুদ্র ভীরু মলিন পরিবেশ, এই অশিক্ষা আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজ, আমাদের দাসমনোভাব আর ইংরেজের ঔদ্ধত্য—সব সত্ত্বেও হয়তো সহজে নিশ্বাস নেয়া যায়, এমনকি হয়তো সুখী হওয়াও সম্ভব, যদি পাই একটি বন্ধু—বান্ধবী—সঙ্গিনী, একটি মেয়ে যাকে আমি মনের কথা বলতে পারবো, আমার কথা যে শুনবে মন দিয়ে, বুঝবে আমি কী বলতে চাচ্ছি।

৮

আসুন, এই ঘরটায় ব'সে খাওয়া যাক। এটা আমার 'স্টাডি', তা-ই হবার কথা ছিলো অন্তত, কেননা আমি এক সময়ে রটিয়েছিলুম আমি একটা অভূতপূর্ব আত্মজীবনী লিখছি, সেই মহৎ পরিশ্রমের জন্য ছোটো ঘরই আমার দরকার, আর তা-ই শুনে নেলি কোনো বিশালতর বালজাকের আন্দাজ সরঞ্জাম দিয়ে আমাকে সাজিয়ে দিয়েছিলো এই ঘরটা। এমনিতেও ছোটো ঘর ভালো লাগে আমার, অনেক বেশি নিরাপদ মনে হয়। আমার একটা কষ্ট এই যে প্রকাণ্ড সব বাংলোতে জীবন কাটাতে হয়েছে, পুরোনো দিনের ইংরেজের তৈরি বাংলো, প্রকাণ্ড ঘর, উঁচু সীলিং, বিশাল জানলা, দূরে-দূরে দেয়াল, বিরাট কম্পাউণ্ড। সব জায়গায় ইলেকট্রিসিটি পাইনি, দেয়াল-জোড়া ভুতুড়ে ছায়া, জন্তুর কঙ্কালের মতো কড়িকাঠগুলো ফাঁস বেঁধে ঝুলে পড়ার পক্ষে আইডিয়েল। রাতে হাওয়ার শব্দ, বাইরে পাহাড়ের মতো অন্ধকার। তারপর—এই বাড়ি, নেলির প্ল্যান, নেলির রচনা—মালাবার হিল-এ রতনদাসের প্রাসাদে গড়ে উঠেছিলো তার মন—সে খাবার-ঘর তৈরি করালে যাতে একসঙ্গে পঞ্চাশজনকে বসিয়ে খাওয়ানো যায়, ড্রয়িংরুমের আসবাবপত্র আনালে লণ্ডন থেকে, আমার জন্যে বর্মি সেগুন কাঠের প্যানেল-দেয়া লাইব্রেরি-ঘর—ইত্যাদি, ইত্যাদি, এই একটা ব্যাপারে নেলির উৎসাহ উথলে উঠেছিলো একেবারে, হাঙ্গামাও কম করেনি। 'বন্-আর', আনন্দ—এখন একটা দুঃসহ ভার আমার মনের ওপর, কোনো কাজে লাগে না, সুখভোগের বিপুল উপকরণ নিয়ে শূন্য পড়ে আছে। আমি ঐ পুব-খোলা বারান্দায় ব'সে সকালবেলাটা কাটিয়ে দিই, বিকেলে চলে আসি এই ছোটো ঘরটায়—এটার পশ্চিম খোলা, দিনের শেষতম মুহূর্ত পর্যন্ত রোদ পাই এখানে—সূর্যের অনুসরণ করি বলতে পারেন, আমি রোদ চাই, আমি আলো চাই, অন্ধকারে আমার ভয় করে। কিন্তু এই ঘরে দেয়ালগুলি ঘনিষ্ঠ, এই ঘরের ধুলোময়লা আমার সান্ত্বনা।

বুঝতেই পারছেন, নেলি যে-ভাবে ঘরটা সাজিয়ে দিয়েছিলো, তার সঙ্গে কিছুই মেলে না এখন। আমি এটাকে সাজিয়ে নিয়েছি নিজের ধরনে, বা না-সাজিয়ে নিয়েছি। দেখছেন তো মেঝেতে বই, টেবিলে কাগজপত্র ছড়ানো (বেদরকারি, কিন্তু ফেলে দিতে আমরা আলস্য), আর ঐ সোফার কুশানটার দিকে তাকিয়ে দেখুন, কারো মাথার চাপে টোল খেয়ে আছে এখনো, খুঁজলে, হয়তো লম্বা কালো চুলও পাওয়া যাবে দু-একটা। এই ঘরটা চাকরদের এক্তিয়ারের বাইরে, যেমন আছে তেমনি পড়ে থাকে, আমি দিনে-দিনে দেখি কেমন জমে উঠছে অজেয় ধুলো, আদিম আবর্জনা—এই জগতের ও জীবনের স্বাভাবিক অবস্থাটাকে যেন চোখে দেখতে পাই। মাঝে-মাঝে ঘরটার চেহারা ফেরে শ্রীমতী গায়ত্রীর স্বকরস্পর্শে, কিন্তু গায়ত্রীকেও আমার রোগের ছোঁয়াচ দিয়েছি আমি, তারও এই অগোছালো ভাবটা ভালো লাগছে আজকাল, আস্তে-আস্তে সেও এই আদিসত্যটা উপলব্ধি করছে যে গা ছেড়ে দেবার মতো আরাম আর নেই। জীবন মানেই প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধ—নিজের সঙ্গে, বাইরের সঙ্গে, অবস্থার সঙ্গে—এমন কোন মানুষ আছে যে মুক্তি চায় না তা থেকে, চিন্তা থেকে মুক্তি, স্বপ্ন থেকে মুক্তি—জড়ের মতো নিশ্চেষ্টতার সেই আরাম যা আমার বহুকালের আকাঙ্ক্ষা, জীবনের

শ্রেষ্ঠ উপার্জন? কী কষ্টের ছিলো আমার পক্ষে আমার চাকরি—দুর্দান্ত আঁটোসাঁটো ব্যাপার, বাপের বয়সী লোকেদের মুখে 'স্যর স্যর' শুনে চুল পাকার অনেক আগেই হাড় পেকেছে, আঙুল নাড়ামাত্র ছুটে এসেছে লাল কোমরবন্ধ আঁটা মহিমান্বিত চাপরাশি। বিচারকের মুখোশ আমার মুখে, চোখে যেন পলক পড়ে না, গালের পেশী মূর্তির মতো অনড়, আমি ন্যায়ের প্রতিনিধি, আমি ধর্মাবতার। যখন আমার লাল-শালু-ঘেরা এজলাসের সিংহাসনে বসি, তখন আমি ষড়রিপুর ঊর্ধ্বে, ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তির ঊর্ধ্বে, বীতরাগ, বীতভয়, বীতমন্যু। যেন ইস্পাতের ফ্রেমে আটকে দিয়েছে আমাকে, হাতেপায়ে পেরেক ঠুকে দিয়েছে—কতদিন নিঃশব্দ চীৎকারে ব'লে উঠেছি, 'আমি আর সহ্য করতে পারছি না, আমাকে ছেড়ে দাও।' কিন্তু কেউ শুনতে পায়নি সেই চীৎকার, কেউ কিছু সন্দেহ করেনি, টের পায়নি যে আসামিদের চোখের দিকে তাকাতে আমার ভয় করে, বোঝেনি আমি বেরোবার পথ খুঁজছি মনে মনে, দরজায়-দরজায় পুলিশ পাহারা দেখে থমকে যাচ্ছি। আমিই বুঝতে দিইনি, পাথরের মতো ঠাণ্ডা রেখেছি চোখ, কথা বলেছি মৃত্যুর মতো স্থির কণ্ঠে—এটুকুই আমার কৃতিত্ব, আমার বীরত্ব। আর তার ওপর—এজলাসের বাইরে, বাড়িতে, বা যেখানেই যাই, আমার সঙ্গে আছেন রতনদাস ব্রোকারের কন্যা, আমার প্রিয়তমা পত্নী। যেন নবকুলে দেবতা আমরা, আমাদের দিকে তাকাতে গেলে ক্ষুদ্র মানবের ঘাড় ব্যথা হয়ে যায়—এমনি আমাদের জীবন। শুভ্র, বিবর্ণ, নিষ্কলঙ্ক, নিয়মাবদ্ধ, অণুপরিমাণ ধুলো নেই কোথাও, নেই জল, হাওয়া, শ্যাওলা, মর্চে—নিশ্চিন্ত, সম্ভ্রান্ত, নির্বীজ। আমি যে সব সহ্য করেছিলুম তাতেই বুঝবেন আমি কী-রকম নিপুণ অভিনেতা। আমার বুজরুকি, আমার হাত-সাফাই, আমার জীবন। যেন আমি গরিব ছিলুম না কোনোদিন, যেন আমার বাবা পঁচাত্তর টাকা পেনশন পান না, যেন আমি নেলির মতোই আজন্ম ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করেছি, যেন আমি কাঁদিনি কখনো, উড়ে যাইনি টুকরো ছেঁড়া কাগজের মতো হাওয়ায়, দুলিনি ঢেউয়ের সঙ্গে তোলপাড়। – কিন্তু বলুন, ক্লান্তি কি আসে না একটা সময়ে? ইচ্ছে করে না কি নিচে নামতে- অন্য অর্থে নিচে, ইচ্ছে করে না কি সব গোলাপ মাড়িয়ে দিতে, সব আলো কালো করে দিতে, নেলির অতি যত্নে গড়া ঝকঝকে জগতের মধ্যে আমদানি করতে একটি ক্ষত, একটি ব্যাধির বীজাণু সূক্ষ্ম বিষের প্রস্রবণ? অবশেষে মন কি চায় না আশ্রয় অবলম্বন—পাশে কোনো নির্ভেজাল স্ত্রীলোকের শরীর, আমার গুহা, দুর্গ—এই ঘরে, ঐ সোফায়, যেটা দু-জনের আন্দাজ বিছানা হয়ে যায় রাত্রে, নেলির ঐশ্বর্য থেকে দূরে, উটকামণ্ডের দ্রষ্টব্য এই বাড়িটার উজ্জ্বল আক্রমণ থেকে দূরে, গোলাপ বাগানের প্রহসন থেকে দূরে—জন্তুর সৌন্দর্যে ও সরলতায়? আমি চেয়েছিলাম নেলির ভালোবাসার প্রতিদান দিতে, প্রতিশোধ নিতে তার আর আমার ওপর—আর এমনি করেই—যেহেতু অন্য কোনো উপায়ে আমি নেলিকে আমার মনের কথাটা বোঝাতে পারিনি—আমার স্ত্রীলোক নিয়ে খেলা শুরু হয়েছিলো।

অনুমতি করুন, মন খুলে কথা বলি আপনার সঙ্গে। আপনাকে আমার বহুকালের চেনা মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে আমার কথা আপনি সবই জানেন, বা জানতেন এককালে—কিন্তু আপনি ভুলে গেছেন, আমি ভুলিনি। নেলি, ছেলেমানুষ নেলি, সুখের কাঙাল—কী সরলভাবে স(বিশ্বাস করে যে সুখী হবার জন্যই পৃথিবীতে জন্ম নেয় মানুষ, কী করুণভাবে সুখী করতে চায় আমাকে। যেন সুখ একটা বম্বাই আম বা ভীমনাগের সন্দেশ যা কেউ কারো হাতে তুলে দিতে পারে। যেন স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসা কোনো ধ্রুব বিশ্ববিধান, সৌরমণ্ডলের আবর্তনেরই মতো। কী ক'রে আমি তাকে বোঝাই যে আমি সুখী হতে পারি না, চাই না? ভালোবাসতে চাই না, পারি না? ক্ষমতাও নেই, ইচ্ছেও নেই। কী করে বোঝাই আমার জীবনের প্রতিটি ঘণ্টা লজ্জা দেয় আমাকে- যদিও আমি চুরি করিনি, নারীধর্ষণ করিনি, খুব পরোক্ষেও ঘুষ নিইনি কখনো-- বরং সাধুতা আর সুবিচারবোধের জন্য সরকারি মহলে রীতিমতো সুনাম আছে আমার? কী ক'রে বোঝাই, তার সঙ্গে আমার আসল গরমিলটা কোথায়। সুখ অসম্ভব, অন্তত আমার জীবনে অসম্ভব, তা জেনে নিয়েই আমি বিয়ে করেছিলুম তাকে, যে-কোনো মেয়েকেই বিয়ে করতে পারতুম-- দৈবক্রমে, আমর পক্ষে

সুবিধাজনকভাবে, সে জুটে গিয়েছিলো। আর 'সুখ' বলতে নেলি যা বোঝে তার মাল-মশলা প্রায় সবই সে জন্মসূত্রে পেয়েছিলো—অঢেল অর্থ, সামাজিক গৌরব, ইচ্ছে হ'লেই হাওয়া বদলাতে ব্ল্যাক ফরেস্টে বেড়াতে যাবার স্বাধীনতা; এগুলি তার কাছে নিশ্বাসের বাতাসের মতো, যাদের সঙ্গে তার পরিবারের মেলামেশা তারা সকলেই প্রায় এই শ্রেণীর, এ-রকম না-হ'য়ে অন্য রকম যে হ'তে পারে তাও যেন নেলির ধারণার বাইরে। শুধু একটি উপাদান বাইরে থেকে জোটাতে হ'লো, তার 'সুখে'র বেশ বড়ো একটা অংশ বলা যায় : 'স্বামী'—সুশ্রী, বিদ্বান, সচ্চরিত্র স্বামী। ঐ বিশেষণগুলিতে ভূষিত ছিলাম আমি—তার চোখে, তার মা-বাবার চোখেও। অভাব ছিলো না আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর, তারা কেউ-কেউ তিনশোবার কিনতে পারে আমাকে, কোনো-এক নেটিভ রাজ্যের রাজার দুলালকেও জামাই পেতে পারতেন রতনদাস, কিন্তু—রমণীরতন আমারই ভাগ্যে জুটলো। কেন, কী করে? একটা কারণ এই যে রতনদাস, যাঁর বিরাট ব্যাবসা প্রায় তাঁর নিজেরই সৃষ্টি, আমার প্রতি ঈষৎ অনুকূল ছিলেন—আমি 'নিচু থেকে উঁচুতে' উঠেছি ব'লে। আর-একটা—আর এটাই হয়তো বেশি জরুরি—আমি প্রেমিকের ভূমিকাটিতে চমৎকার মানিয়ে নিয়েছিলুম নিজেকে, যেন অচেতনভাবেই বুঝেছিলুম নেলির মনের কোন তন্ত্রীটি সবচেয়ে বেশি স্পর্শকাতর। 'আত্মার ভগিনী', 'হৃদয়ের বাঞ্ছিতা', 'জন্ম-জন্মান্তরের সুহৃদ'—এই সব সুবচন আমি শোনাই তাকে, যা সারা জগতে বাসি হয়ে গেছে, কিন্তু নলিনী ব্রোকারের কাছে চমকপ্রদ, যা অন্য কোনো যুবক তাকে আমার আগেই জপিয়ে যায়নি (কেননা কোনো বাউণ্ডুলে কবিভাবাপন্ন ছোকরা তার সান্নিধ্যেই পৌঁছতে পারবে না)—আমি, যার নেকটাইগুলি সুচারু, নিখুঁত বিলেতি আদবকায়দা যার আয়ত্ত, ইন্ডিয়ান পীনাল কোডের সঙ্গে রোমান আইনের সম্পর্ক নিয়ে যে আধ ঘণ্টা ধ'রে কথা বলতে পারে—সেই আমার মুখে শেলি উগো রবীন্দ্রনাথের লাইন শুনে গ'লে গেলো এই সুইৎসার্লন্ডের স্কুলে-পড়া সেন্টিমেন্টল নির্বোধ বালিকা। ধ'রে নিলো আমার ভালোবাসা অতি উচ্চ স্তরের—'নক্ষত্রের জন্য পতঙ্গের বাসনা', ইত্যাদি। রোমান্টিক কবিরা আমার জন্য জয় করলেন রতনদাসের বিপুল বিত্তের একটি অংশ এবং একটি জাঁক ক'রে দেখাবার মতো সুন্দরী স্ত্রী। এর পরে কেউ যেন আর না বলে যে কবিতা কোনো কাজে লাগে না।

বিয়ের পরেও আমি বছরখানেক প্রেমিকের ভূমিকা বজায় রেখে চললুম, একটি সুরক্ষিত, পুরুষের-দ্বারা-অস্পৃষ্ট কুমারীর টাটকা নধর শরীরটাকেও পয়লা দফায় মন্দ লাগলো না। কিন্তু ঐটুকু সময়ের মধ্যেই নেলি হ'য়ে উঠলো মারাত্মকরকম স্ত্রী—তার 'সুখ' আর 'স্বামী', এই দুটো ধারণা প্রায় এক হ'য়ে গেলো। 'সুখী' হবে, আমাকেও 'সুখী' করবে—হা ঈশ্বর! বিয়ের পরে কিছুদিন তার ঝোঁক চাপলো বাঙালি হবে—ধ'রে নিলে সেটাই হবে আমার পছন্দসই: স্ল্যাক্স, বিলেতি ড্রেস, সালওয়ার-কামিজ—তার কুমারী অবস্থার বিবিধ সাজসজ্জা, সব তুলে রেখে শুধু শাড়ি ধরলে সে; আমার মা-বাবা একবার আমাদের কাছে বেড়িয়ে যাবার পর শাঁখা-সিঁদুর পর্যন্ত; এমনকি আমার মা-র মতো 'ঘরোয়া' ধরনে শাড়ি পরারও চেষ্টা করলে কয়েকদিন; ভারি আপশোষ চুল সে কখনোই লম্বা রাখেনি ব'লে। আমি বাধ্য হ'লুম ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিতে যে তার আধো-আধো বাংলার ভুল উচ্চারণ আমার পক্ষে যেমন অসহ্য, তার সাজগোজের মেকি বাঙালিয়ানাও তেমনি। মিষ্টি ক'রে বললুম 'তুমি যেমন আছো তেমনি আমার ভালো লাগে, অন্য কিছু তোমাকে হ'তে হবে না।' আমি তাকে বোঝাই যে সিঁদুরে পারদের বিষ মেশানো থাকে, লম্বা চুল অস্বাস্থ্যকর, পার্টির পক্ষে শাড়ি যতই চটকদার হোক, চলাফেরার সময় ওর মতো বিড়ম্বনা আর নেই।—মুশকিল এই যে আমার সব কথা সে অন্ধের মতো মেনে নেয়; ভাবে, সে এ-রকম না-হ'য়ে ও-রকম হ'লেই, এটার বদলে ওটা করলেই, দুটি হৃদয়ে একটি আসন পেতে কোনো হৃদয়নাথ এসে বসবেন। ক্রমশ আমাকে এমন সব উপায় খুঁজতে হ'লো যাতে তার ভুল ভাঙে, মোহাবেশ কেটে যায়, যাতে রোমান্টিক কবিতার এই মূল তত্ত্বটা সে ধরতে পারে যে স্বপ্নে ছাড়া সুখ নেই ব'লে মানুষের ভাগ্যে শুধু অতৃপ্তি। বলেছি তো আপনাকে, তার ছবি আঁকার বদভ্যাস আমি না-সারিয়ে পারিনি—সেখানেই

শুরু, মৃদু হাতে। সে যদি বাজে ছবি এঁকে সুখী হ'তো, আমার কী ক্ষতি ছিলো বলুন? নিজেই ক্লান্ত হ'য়ে ছেড়ে দিতো একদিন, আমার উপদেশে এমন কী সুফল হয়েছিলো যা এমনিতেই হ'তে পারতো না? অথচ আমার ওপর এতই ভক্তি তার, যে আমার 'অপছন্দ' ব'লে বন্ধ হ'য়ে যায় তার প্যাস্টেল বোলানো, পিয়ানোয় টুংটাং, ফরাশি মেনু, বাঙালি প্রসাধন। আমি তাকে আঘাত দিতেই চাচ্ছি, কিন্তু আহত সে হচ্ছে না, রবারের বলের মতো মাটিতে প'ড়েই লাফিয়ে উঠছে। অতএব আমাকে আর-একটু রূঢ় হ'তে হ'লো, তার সুযোগ পেলাম নেলির মাতৃত্বে।

আমাদের প্রথম পুত্রের জন্মের পরে নেলির মুখে দেখলাম গর্ব আর স্নেহ-মেশানো মাতৃত্বের বিখ্যাত হাসি—যেন কী বৃহৎ কর্ম ক'রে উঠেছে—জগৎ জুড়ে চলছে এই মাতৃপূজা—বলবো কী মশাই, আমার গা-ঘিনঘিন করে, বমি পায়। আপনিই বলুন, একটা শিশু কি এলিফ্যান্টার ত্রিমূর্তি, না কি মৎসার্টের 'দন হুয়ান' যে তা সৃষ্টি করাতে কোনো বাহাদুরি আছে? যে-কাজ কেঁচো পারে, ছারপোকা পারে, তা নিয়ে অত জাঁক কিসের? নেলি অপলক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে তার সন্তানের দিকে—যে-ভাবে, ধরুন, বহুকাল ধ'রে শুধু ছাপা ছবি দেখার পর অবশেষে আমস্টার্ডামে গিয়ে মূল রেমব্রান্টের দিকে তাকিয়ে থাকি আমরা, বা প্রথমবার পুরীতে গিয়ে সমুদ্রের সামনে বিহ্বল হ'য়ে যাই। আমাকে বলে, 'তুমি সুখী হয়েছো? বলো, তুমি সুখী হয়েছো? দ্যাখো, কেমন তাকিয়ে আছে তোমার দিকে!' এমনি সব সনাতন বুলি, যা জপিয়ে-জপিয়ে মানুষ-মায়েরা পুরুষ-জন্তুকে 'পিতা' হ'তে শিখিয়েছে, এমনকি তার স্বভাবশত্রু সন্তানের জন্য ভালোবাসারও সঞ্চার করেছে তার মনে। পৃথিবীতে মায়েরা যা পারে খৃষ্টান মিশনারিও তা পারে না। আমি দেখলুম এই একটা রাস্তা হ'লো যা দিয়ে আমি পালাতে পারি নেলির কাতর 'ভালোবাসা' থেকে, সে ছেলেকে নিয়ে মশগুল হ'লে আমার দিকে তার মনোযোগ ক'মে যাবে, আমি স্বস্তি পাবো খানিকটা—কিন্তু যেহেতু নেলি সর্বস্বভাবে সন্তানকেই চাচ্ছে এখন, ঐ নোংরা মাংসপিণ্ডকে বুকে চটকেই স্বর্গসুখ অনুভব করছে, তাই মাতা-পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন ব'লে আমার মনে হ'লো। আলাদা ঘরে আয়ার কাছে থাকবে, দুধ খাবে একটি মাইনে-করা স্বাস্থ্যবতী গরিবের বৌয়ের বুক থেকে, তিন মাস বয়স থেকে বিলেতি বেবি-ফুড, দিনে চারবার বাচ্চাটিকে বেশ সমারোহ ক'রে মা-র কাছে নিয়ে আসা হবে পনেরো-কুড়ি মিনিটের জন্য—এই সব উত্তম বিলেতি ব্যবস্থা চালু করা হলো। এদিকে নেলির বুক টনটন করে—শারীরিক, মানসিক দুই অর্থেই, কিন্তু আমার সহায় সিভিল সার্জন আর আধুনিক বিজ্ঞান (মানে, তখন যেটা আধুনিক নামে চলতো): শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে এটাই ভালো, মায়ের স্বাস্থ্য আর রূপযৌবনের পক্ষেও, এই যুক্তির কাছে হার মানলো সে, কিংবা হয়তো আমি চাচ্ছি ব'লেই আপত্তি করলো না। এইভাবেই মানুষ হয়েছে নেলির দুই ছেলে—শৈশবে আয়া, পাঁচে পড়তেই কোনো দূর স্বাস্থ্যকর শহরে মিশনারি স্কুল, সতেরোয় পড়তে-না-পড়তে বিলেত। ছোটোটিকে কাছে রাখার জন্য বড্ড পিড়াপিড়ি করেছিলো নেলি, অনেক করুণ চাহনি ছুঁড়েছিলো আমার দিকে, রাত্রে অনেকবার তার দীর্ঘশ্বাস আমাকে শুনতে হয়েছে—বিলেতি শিক্ষার পাৎলা আবরণ ফুঁড়ে বেরিয়ে-আসা তার সেকেলে, অনগ্রসর, আলোকহীন ভারতীয় মাতৃত্বের দীর্ঘশ্বাস, কিন্তু আমি ছিলুম কর্তব্যের পথে অটল। আমরা কি চাই ন্যাম্বি-প্যাম্বি বাঙালি খোকন, চোদ্দ বছর বয়সে মায়ের কোলে ব'সে মায়ের হাতে ভাত-খাওয়া মেরুদণ্ডহীন মলিকড্‌ল্‌, আমরা কি চাই এমন মা, যারা জন্ম থেকে রাক্ষুসে স্নেহে ঢেকে রেখে চিরকাল শিশু ক'রে রাখে সন্তানকে? না—একশোবার, হাজারবার না! ছেলে সুশিক্ষা পাবে, ডিসিপ্লিন শিখবে, সত্যিকার মানুষ হ'য়ে উঠবে সময়মতো—অন্তত পক্ষে বিশাল চাকুরে—এর চেয়ে বড়ো কথা আর কী?

কিন্তু একটা মুশকিল এই হ'লো যে—ছেলেরা যেহেতু কাছে নেই— নেলির জীবন হ'য়ে উঠলো নতুন ক'রে পুরোপুরি স্বামীকেন্দ্রিক, আমাকে ঘিরেই ঘুরছে, পৃথিবীর সংলগ্ন একটি পাংশু, ছোটো চাঁদ যেন, আঁকড়ে আছে আমাকে, আটকে আছে কাঁটা হ'য়ে গলায়, কোনো অচিকিৎস্য দাঁত-ব্যথার মতো সারাক্ষণের সঙ্গী সে আমার। আমি তার ভাবে-ভঙ্গিতে বুঝতে পারি যে ছেলেদের জন্য

কষ্ট সে ভুলতে পারছে না, কিন্তু সে মুখ ফুটে কিছু বলে না কখনো, আমার ওপর কোনো অভিমান, কোনো অভিযোগ নেই তার—রাগ তো দূরের কথা—সে শুধু এই চায় (আর সেটা একটা অসম্ভব চাওয়া!) যে তার সন্তানের বিচ্ছেদবেদনা, তার নিপীড়িত মাতৃত্ব, তার সব দিশি, মেয়েলি, আদিম আকাঙ্ক্ষা, যা ধনরত্ন ফ্যাশনের জৌলুশ দিয়ে মেটানো যায় না—সেই সব-কিছুর আমি পরিপূরণ করবো আমার 'ভালোবাসা' দিয়ে! ভেবে দেখুন, কী অন্যায় আবদার! ভেবে দেখুন, কী জীবন আমাদের, দু-জনে মুখোমুখি কপোতকপোতী, আছি মফস্বলে, সেই একঘেয়ে একমুঠো সমপদস্থ সরকারি মহলের বাইরে মেলামেশা নেই, কোনো সাংসারিক বা পারিবারিক সমস্যা পর্যন্ত নেই যে তা নিয়ে মনটা বিক্ষিপ্ত থাকবে—আর সেইটেই ভযাবহ সমস্যা। কিছু বৈচিত্র্য আসতো মাঝে-মাঝে এক-আধ পশলা ঝগড়াঝাঁটি হ'লে—বজ্রপাত না হোক শিলাবৃষ্টি হ'তে পারতো, কিন্তু না—নেলির পক্ষে তা অসম্ভব, সে যাকে শালীনতার বিরোধী ব'লে জানে (আর তার কাছে সুখেরই একটি উপাদান হ'লো শালীনতা), সে-রকম কোনো আচরণ সে যে-কোনো অবস্থায় এড়িয়ে যাবে; আমি তাকে খুঁচিয়ে তোলার চেষ্টা ক'রে বার-বার বিফল হয়েছি। আমার বিষ-মাখানো কূট বাক্যগুলিকে সে ফিরিযে দিয়েছে আমারই কাছে—প্রত্যাঘাত ক'রে নয়, আস্তে স'রে গিয়ে, বিরোধের সম্ভাবনাকে অস্বীকার ক'রে। অথচ, লোকেরা যে কখনো-কখনো নিজেদের সুখী ব'লে ভাবতে পারে তার কারণ কি এই নয় যে অনেকগুলো বিরুদ্ধ জিনিশে পরিবৃত হয়ে থাকে তারা—কখনো দারিদ্র্য, কখনো রোগ, কখনো কোনো চেষ্টার ব্যর্থতা? জগৎকে যা টিকিয়ে রাখছে, জীবনকে যা কোনো-এক রকম অর্থ দিচ্ছে, তা সদ্ভাব নয়, অভাব; মিলন নয়, বৈপরীত্য। স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থলাভ, যে-কোনোরকম সাফল্য—এই গতানুগতিক সুখগুলোর সত্যিকার স্বাদ শুধু তারাই জানে, যারা বিছানায় বন্দী থেকেছে অসুখে, আগামীকালের বাজারখরচার জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছে, দেখেছে তাদের বহু প্রয়াসের ভরাডুবি, কুকুর পুষে হৃদয়বৃত্তি তৃপ্ত করেছে। বিরুদ্ধ কিছু নেই, শুধু সুখ—এই অবস্থায় দেবতারাই টিকে থাকতে পারেন না মশাই, মানুষের কথা ছেড়েই দিন। ভেবে দেখুন ঐ গ্রীক দেবদেবীদের কাণ্ড—অমরতায় অভিশপ্ত, মৃত্যুর নিষ্কৃতিও নেই বেচারাদের, আমাদের ইন্দ্র যম বরুণের মতো প্রলয়কালেও ধ্বংস হবে না, অনন্তকাল ধ'রে কিছুই তাঁদের করার নেই আসলে, তাই তো ঐ কৃমিকীটের মতো মানুষগুলোর ব্যাপারে নাক গলাচ্ছেন তাঁরা, কোথাকার কে হেক্টর আর আকীলিসকে নিয়ে মেছোনির মতো কোঁদল, স্বর্গে-মর্তে উর্ধ্বশ্বাস ছুটোছুটি, গলা দিয়ে অমৃত নামিয়ে ঢেঁকুর তুলছেন ঈর্ষাবিষ—পরস্পরকে হিংসে ক'রে, অপমান ক'রে, নাজেহাল করে কোনোরকমে কাটিয়ে দিচ্ছেন স্বর্গীয় জীবন। তাহ'লে বুঝুন, নিরবচ্ছিন্ন সাধ্বী নেলিকে নিয়ে ক্ষুদ্র মানুষ আমার কী শোচনীয় অবস্থা! আমি চাই তাকে কষ্ট দিতে, তার মনে আমার প্রতি ঘৃণা জাগাতে, তার ভালোবাসার নাগপাশ থেকে মুক্তি চাই—কিন্তু অবোধ বালিকা এ-সব কিছুই বোঝে না, বা বুঝেও বোঝে না। সে যত বেশি ধৈর্যশীলা গ্রিজেল্ডা সাজে তত আমার আক্রোশ বেড়ে যায়, ইচ্ছে করে তার পাতিব্রত্যের উচ্চ চূড়াকে ধুলোয় লুটিয়ে দিই, মনে হয় ভদ্রতার বা কূটনীতির আব্রুটুকুও আর রাখবো না, রাষ্ট্রদূতের মতো পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কথা না-ব'লে সরাসরি যুদ্ধে নেমে যাবো, যদি বোমা ফেলে পিলে চমকে দিতে হয় তাতেও পেছ-পা হবো না। হলোও তা-ই—অবশেষে উশকে তুলতে হ'লো আমার ধমনীকে, শুরু হলো আমার স্ত্রীলোকের শরীরে ডুবে যাওয়া—আমি নিজে তা চাই ব'লে নয়, নেলির জ্ঞাননেত্র উন্মীলনের জন্য। সেই ঢাকা—বকুল-ভিলার বারান্দায় সূর্যাস্তের ও ইলেকট্রিসিটির আলোয় দেখা মহিলারা, আমার জীবনে ভালোবাসার ইচ্ছার জাগরণ—সেখান থেকে অনেক দূরে চ'লে এলাম।

৯

আপনার সময়ে ঢাকা য়ুনিভার্সিটির ছাত্রীসংখ্যা কী-রকম ছিলো? মাপ করবেন, আমি ভুলে যাচ্ছিলাম আপনি আমারই বয়সী, একই সময়ে ছিলুম আমরা ঢাকায়। মনে আছে হস্টেলের মেয়েদের চাল-চলন, সাজগোজ? শাদা শাড়ি, আধখানা মাথা আঁচলে ঢাকা, সারবন্দী হ'য়ে হস্টেল থেকে কলেজে আসে, সৈনিকের মতো সমান তালে পা ফেলে, সামনে-পেছনে দু-তিন সারিতে বিভক্ত হ'য়ে—ডাইনে-বাঁয়ে কোনোদিকে তাকায় না। জন পনেরো মেয়ে, তরুণী, ছাত্রী, কিন্তু দেখায় বয়স্ক ও গম্ভীর, ধরনটা প্রায় খৃষ্টান নান্‌দের মতো; এমনভাবে তারা আবৃত, সংবৃত, যূথচারী—যেন কোনো মঠ থেকে নির্গত হয়েছে এই শুভ্রবসনা সারস্বত ভগিনীরা, কয়েক ঘণ্টা মন্দিরে ঘণ্টা নেড়ে ফিরে যাবে বিকেলে, ডাইনে-বাঁয়ে কোনোদিকে না-তাকিয়ে। আমাদের পক্ষে কল্পনা করা শক্ত যে এই দুর্গবাসিনীরা আমাদেরই সহপাঠিনী, যে আমাদের মতো সাধারণ মনুষ্যের সঙ্গে কোনো মিল আছে তাদের, তারা যে কখনো হাসে বা রসিকতা করে, বা এমনকি অধ্যয়ন ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে কখনো কৌতূহলী হয়, তাও যেন ধারণা করা শক্ত। কলেজে একটি দুর্ভেদ্য অন্তঃপুর তৈরি আছে তাদের জন্য—যার নাম 'লেডিজ কমনরুম'—সেখানে পর্দানশিন হ'য়ে দিন কাটায় তারা, মাস্টারমশাইরা সেখান থেকে নিয়ে আসেন তাদের, ক্লাশের শেষে ফেরৎ রেখে আসেন বিশ-পঁচিশ গজ বিপদসংকুল করিডর পার ক'রে দিয়ে। সে এক দৃশ্য, তামাশা, যখন ঘণ্টা বাজলে হঠাৎ মিনিট দুয়েকের জন্য করিডরগুলি ললনাকীর্ণ হ'য়ে ওঠে—মেষপালকের অনুবর্তিনী ভেড়ীর পাল—মাপ করবেন, বলতে চেয়েছিলাম গজরাজের অনুগামিনী হস্তিনীযূথ—না, এটাও ঠিক হ'লো না —বলা যাক 'ছাত্রী' নামক এই বিরল ও সুকুমার প্রাণীটিকে অতি যত্নে রক্ষা করছে আমাদের বিদ্যালয়—বেড়া তুলে, পাহারা বসিয়ে, গণ্ডি টেনে—হাজারখানেক মাংসাশী জন্তুর মধ্যে গুটি পঞ্চাশ ভীরু হরিণী যেন, যেন মুহূর্তের অসতর্কতা ঘটলে শ্বাপদেরা তক্ষুনি তাদের নধর গ্রীবায় দাঁত বসিয়ে দেবে। ক্লাশেও তাদের বসার ব্যবস্থা আলাদা —ছাত্রদের সঙ্গে এক সারিতে নয়, মাস্টারমশাইয়ের ডেস্কের ডাইনে-বাঁয়ে গৌরবান্বিত চেয়ারে। অবশ্য এমন নয় যে ক্লাশের মধ্যেই কখনো কোনো হরিণ-চক্ষু বইয়ের পাতা থেকে ছুটে আসে না আমাদের দিকে, বা কোনো রঙিন শাড়ি করিডরে এক ঝলক চঞ্চলতা ছিটিয়ে দেয় না; তাছাড়া বিদ্যালয়ের নানা অনুষ্ঠানওে এই মহীয়সী সন্ন্যাসিনীদের দেখা যায়; বোকা ছেলেরা মাঝে-মাঝে আলাপও করে লেডিজ কমনরুমের বনাতে ঢাকা পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে—আলাপ মানে হেঁ-হেঁ, হুঁ-হুঁ, ঘাড় দোলানো, কোমর মোচড়ানো—কোনো-কোনো সাহসী ছেলে আরো একটু এগোবারও চেষ্টা করে, কিন্তু—লক্ষ্মৌয়ের খোলা চিড়িয়াখানায় খালের-জলে-ঘেরা ব্যর্থকাম বাঘেদের মতো, তাদেরও চেষ্টা পর্যবসিত হয় শুধু ভঙ্গিভঙ্গায়, লোলুপ দৃষ্টিতে, মানসিক ওষ্ঠলেহনের প্রহসনে। কিছুতেই ভাবা যায় না যে এই দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় জীবের মধ্যে সহজভাবে মেলামেশা কখনো সম্ভব।

আমি অবশ্য একটি উচ্চ উদাসীন ভাব বজায় রেখে চলি, যেন এই যত্নলালিত আশ্রমবালিকাদের বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই আমার, কিন্তু সেদিন করিডরে বুলবুলকে দেখতে পেয়ে আমি মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালাম। ফিলজফির রেবতী মুখুজ্জে ক্লাশে যাচ্ছেন, পেছনে অনিবার্য লেজুড় নিয়ে—কয়েকটি নতচক্ষু লতিয়ে-চলা ছাত্রী, তাদেরই মধ্যে বুলবুল। কিন্তু সে বোধহয় আমাকে দেখতে পেলো না, বা ইচ্ছে ক'রেই আমার চোখ এড়িয়ে গেলো; বা হয়তো অমনি ক'রেই আমাকে বুঝিয়ে দিলো যে অনাদিবাবুর বাড়িতে যার সঙ্গে সে প্রায় এগিয়ে এসে আলাপ করেছিলো, এই পবিত্র বিদ্যাপীঠে তার অস্তিত্ব সে স্বীকার করতে চায় না। আমার পক্ষে অসম্মানজনক এই ঘটনাটা আমি ভুলে যাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু টিফিনের ছুটির পরে আমি যখন লাইব্রেরির স্ট্যাকে এসে বই ঘাঁটছি তখন হঠাৎ একটা মৃদু শব্দ শুনলাম আমার পেছনে। তাকিয়ে দেখি, বুলবুল। একবার দৃষ্টিগত হবার ফলে আমি ধ'রে নিলুম যে সেও এখানে কোনো বইয়ের খোঁজে এসেছে, আমারও ভুল

করা উচিত যে তাকে চিনি না। কিন্তু জায়গাটা নির্জন, সে আর আমি ছাড়া কাছাকাছি কেউ নেই কোথাও, চোখাচোখি হ'তেই হ'লো, আর পরস্পরকে পরিচিত ব'লে মেনে না-নিয়েও উপায় রইলো না। সত্যি বলতে কী, বুলবুল এমনভাবে তাকালো যেন সে আমারই জন্য এসেছে এখানে, ছোট্ট ক'রে হেসে বললো, 'বিভা-দি এই বইটা আপনার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন।' 'বিভা-দি মানে—বিভাবতী দত্ত?' 'আমরা বিভা-দি বলি—আপনিও তা-ই বলবেন।' আমার মনে হ'লো আমাকে বিশেষ একটু খাতির করা হচ্ছে; মিতু ও বুলবুল—যারা বিভাবতীর বহুকালের চেনা প্রিয় ছাত্রী—তাদেরই সমস্তরে যেন স্থান দেয়া হ'লো আমাকে; যেন ঐ তরুণীদের জগতে, আমার সদ্য-আবিষ্কৃত নারীত্বের জগতে, আমি আরো একটু এগিয়ে গেলাম বুলবুলের মুখের ঐ একটি কথায়। কিন্তু সেটা বুঝতে দেয়াটা আমার পক্ষে গৌরবের নয়, তাই বললাম, 'আমাদের দেশে এই এক মুশকিল—মহিলারা আত্মীয় না-হ'লেও আত্মীয়তা পাতিয়ে নিতে হয় তাঁদের সঙ্গে।' আমার কথার চপল সুরে বুলবুল খুশি হ'লো না, গম্ভীরভাবে বললো, 'বিভা-দির কথা আলাদা। তিনি সত্যিকার দিদির চেয়েও অনেক বেশি। তা এই বইটা একটা ছোট্ট ভারতবর্ষের ইতিহাস—বিভা-দি পাঠিয়ে দিলেন যদি আপনার কোনো কাজে লাগে।' আমি, যাকে তিন দিনের মধ্যে সুইনবার্নের নাটক বিষয়ে ট্যুটরিয়াল দাখিল করতে হবে, কেন উনিশ শতকের কোনো ইংরেজ কবি একখানাও সত্যিকার নাটক লিখতে পারেননি, এই প্রশ্ন নিয়ে কয়েক মিনিট আগেও যে চিন্তিত ছিলো, সেই আমার কেন ভারতবর্ষের ইতিহাস কাজে লাগবে, তা মনে আনতে একটু সময় লাগলো আমার। বোধহয় আমার মুখ থেকে সেটা আঁচ ক'রে নিয়ে বুলবুল বললো, 'সেই হিস্টরিকল চার্টের জন্য—নিশ্চয়ই ভুলে যাননি?' 'ভারতের অতীত গৌরব জাহির করতে হবে?' একটু হাসি বেরিয়ে গেলো আমার গলা দিয়ে, বুলবুল ঠোঁটে আঙুল রেখে শাসনের ভঙ্গি করলো। 'আস্তে! এটা লাইব্রেরি, এখানে কথা বলা বারণ।' তারপর নিচু গলায়, প্রায় ফিশফিশ ক'রে বললো, 'জাহির করা নয়—মনে করিয়ে দেয়া। যারা মনে রাখে তারাই মনে রাখার মতো কাজ করে।' এই শেষ কথাটা সে কি তার নিজের অনুভূতি থেকে বলছে, না কি এটা তার শোনা কথা, বইয়ে-পড়া কথা, তা বুঝে নেবার জন্য আমি তার চোখের দিকে তাকালাম; চশমার পেছনে তার ছোটো-ছোটো চঞ্চল চোখ দুটি মুহূর্তের জন্য স্থির হ'লো। 'আর-একটা কথা বলার আছে আপনাকে—'বুলবুলের ঠোঁট খুলে গেলো, কিন্তু কোনো কথা শোনা গেলো না, ঠিক তক্ষুনি একটা ট্রেনের শব্দ শুরু হ'লো। লাইব্রেরির গা ঘেঁষেই রেল-লাইন, ঝকাঝক খটাংখট আওয়াজে বুঝলাম মালগাড়ি, সেই কর্কশ, ভারি, টেনে-চলা শব্দটা অল্পেই শেষ হ'লো না—প্রায় পাঁচ মিনিট আমাকে অপেক্ষা করতে হ'লো বুলবুলের মুখোমুখি, নিঃশব্দে, তার অসমাপ্ত কথাটা শোনার আশায়। ফাঁকটা ভরাবার জন্য আমরা বাধ্য হলাম দু-একবার পরস্পরের দিকে তাকাতে, হাসতে। আমি বুকের মধ্যে ঈষৎ চঞ্চলতা অনুভব করলাম। একটি নির্জন স্থানে একটি সদ্য-চেনা তরুণীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি, তার কিছু বলবার আছে আমাকে—এটা যে একটা বিশেষ ঘটনা আমার বুদ্ধি তা মানতে না-চাইলেও আমার হৃদয়ে তার সাড়া জাগলো। আমার মনে হ'লো যেন বুলবুলের মুখেও আমার প্রতি একটু ঔৎসুক্যের ভাব দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সেটাকে আমার মনোমতো অর্থের সঙ্গে মানিয়ে নেয়া যাচ্ছে না; বয়সের পক্ষে এত বেশি আত্মস্থ তার মুখের ভাবটি, যেন তার ও আমার যৌবন বিষয়ে সে সচেতন নয়, কিংবা যেন সেই তথ্যটার কোনোরকম মূল্য নেই তার কাছে।

আমি বাইরের দিকে চোখ সরিয়ে নিলুম। সেখানে ঘাস সবুজ, মাঠ বিস্তীর্ণ, মেঘলা বিকেলের হাওয়ায় নড়ছে ডালপালা, কয়েটা শালিখ লাফালাফি করছে মাটিতে। ঐ মাঠে, গাছের ছায়ায় ব'সে গল্প করা যায় না বুলবুলের সঙ্গে? সন্ধেবেলার প্রথম-তারা-ফোটা আকাশের তলায় ঘুরে বেড়ানো যায় না? নিশ্চয়ই কোথাও, কোনো নেপথ্যে, একটি নারী অপেক্ষা করছে আমার জন্য—আমার কল্পিত সেই বান্ধবী ও সঙ্গিনী—শুধু একটি দৈব ঘটনার অপেক্ষা, কোনো যোগাযোগ, ভাগ্যের কোনো ইঙ্গিত, আর তখনই সে পর্দা ঠেলে বেরিয়ে আসবে? কিন্তু ট্রেনেব শব্দ মিলিয়ে যাবার পর বুলবুল

যা বললো তা শোনালো না ঘাসের মতো সবুজ, তার ফাঁকে-ফাঁকে শালিখ পাখি নেচে উঠলো না। 'আর-একটা কথা—স্বদেশী মেলার জন্য কাজ করতে আপনার কোনো অনিচ্ছা নেই তো?' 'বাঃ, আমি তো বলেছি ক'রে দেবো।' 'যদি নেহাৎ দায়ে প'ড়ে রাজি হ'য়ে থাকেন বিভা-দির কাছে, তাহ'লে বরং থাক।' আসলে, ঐ বই ঘেঁটে-ঘেঁটে তথ্য আর তারিখ সাজানোর কাজটি কল্পনা করতে একটুও সুখ হচ্ছিলো না আমার, কিন্তু আমি তো অপাঠ্য 'ফেইরি কুইন'ও প'ড়ে উঠেছিলাম পরীক্ষা পাশ করার জন্য। 'এর মধ্যে আর দায় কী আছে? আর এমন কিছু শক্ত কাজও তো নয়।' 'না—এমন আর শক্ত কী। বিশেষত আপনার পক্ষে—' বুলবুল হঠাৎ থেমে গেলো, যেন আমার পক্ষে প্রশংসাসূচক কোনো কথা এক্ষুনি কবুল করতে সে রাজি নয়। 'তা এই বইটা বিভা-দি পাঠালেন আপনার জন্য—অবশ্য লাইব্রেরিতে বইয়ের অভাব নেই, তবে এটা একটু আলাদা ধরনের. লেখকের নাম জানেন নিশ্চয়ই?' বইটা খাড়া ক'রে ধ'রে বুলবুল আমাকে পুটে ছাপা ছাপা লেখকের নাম দেখালো, স্বদেশী যুগের একজন নামজাদা নেতা তিনি। 'যদি দরকার বোধ করেন—' 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!' ব'লে বইটা তার হাত থেকে নিলাম আমি, 'এর লেখা দ্বীপান্তরের কথা খুব ভালো লেগেছিলো আমার, এটাও ভালো লিখেছেন নিশ্চয়ই?' 'এটা ও-রকম হালকা ধরনের লেখা নয়, কিন্তু প্রতিটি কথা দেশপ্রেমে ডোবানো।' বুলবুলের শেষ কথাটা শুনে আমি একটু থমকালাম, মনে হ'লো ওটা কোনো পত্রিকার সমালোচনা থেকে তুলে নেয়া হয়েছে; আমার জানতে ইচ্ছে হ'লো বুলবুল বইটা নিজে পড়েছে কিনা, প'ড়ে থাকলে তার সত্যি কেমন লেগেছে। কিন্তু বুলবুল তক্ষুনি আবার বললো, 'ও—ভুলে যাচ্ছিলাম, "মুক্তধারা"র দুটো সংখ্যাও এনেছি আপনার জন্য। আপনার লেখাটা পনেরো দিনের মধ্য চাই কিন্তু।' একটা ভঙ্গি হ'লো বুলবুলের কাঁধে, যেন কাজের কথা শেষ ক'রে চ'লে যাবে এবার। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'আপনি কোন ইয়ারে পড়েন? কোথায় থাকেন?' 'সেকেণ্ড' ইয়ার বি. এ. ফিলজফি অনার্স। থাকি কায়েৎটুলিতে।' 'তাহ'লে আমাদের কাছেই?' 'বাড়িতে কমই থাকি আমি। পরে কথা হবে—চলি।' যাওয়ার ভঙ্গিতে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলো যে আমার সঙ্গে অকারণে গল্প করার ইচ্ছে অথবা সময় তার নেই। কিন্তু কয়েকদিন পরে সে আমাদের বাড়িতে এলো একদিন, কাজল-মামিকে শেলাইয়ের জন্য কাপড় দিতে। আমি তাকে আসতে দেখিনি, শুনছিলাম পাশের ঘরে কাজলের সঙ্গে অন্য একটি মেয়ের গলা, চেনা লাগছিলো কিন্তু ঠিক যেন ধরা যাচ্ছিলো না। 'রুমাল', 'টীপয়ের ঢাকনা', 'এমব্রয়ডারি', 'হেমিস্টিচ'—এমনি কয়েকটা কথা কানে এলো আমার, কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ শুনলাম, 'রণজিৎ বাড়ি আছে নাকি?' কাজল ও-ঘর থেকেই ডাকলো 'রঞ্জু, একটু আসবে এখানে?' আমি উঠে গেলাম, বুলবুল বিশেষ লক্ষ্য করলো না আমাকে, কিছুক্ষণ পরে উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসবেন?'

তখন প্রায় সন্ধে, রাস্তায় বেরিয়ে বুলবুল বললো, 'চলুন ঢাকেশ্বরী বাড়ির দিকটায় বেড়িয়ে আসি একটু।' আমি একটু অবাক হলাম তার প্রস্তাব শুনে, কেননা ঢাকায় তরুণ-তরুণীর (এমনকি রমনা পাড়ায় ছাড়া বিবাহিত দম্পতির) দ্বৈত বিহার একটি অসাধারণ ঘটনা। জিগেস না-ক'রে পারলাম না, 'বাড়ি যাবেন না?' 'আমার বাড়ি ফেরার তাড়া নেই।' 'আপনি কি একাই ঘুরে বেড়ান এ-রকম?' 'সাধারণত—তবেমাঝে-মাঝে কোনো সঙ্গীও জুটে যায়, এই যেমন আপনি এখন।' 'বাড়িতে কেউ কিছু বলে না?' 'নাঃ! মা-বাবা আমার আশা ছেড়ে দিয়েছেন,' ঠোঁটের কোণে হাসলো বুলবুল। তার কথা, তার ব্যবহার—সবই একটু ঝাপসা লাগলো আমার, একটু অদ্ভুত। হঠাৎ অনেকদিন আগেকার একটা কথা মনে প'ড়ে গেলো। আমি তখন স্কুলে পড়ি—ক্লাস নাইন-এ—সতীনাথ নামে একটি ছেলে মাঝে-মাঝে আসতো আমার কাছে। ল পড়ছে, বছর সাতেকের বড়ো আমার, আমার তখনকার বয়সের পক্ষে অনেকটাই বড়ো। প্রথম দিন, প্রথমে আমার স্কুল-ম্যাগাজিনের প্রবন্ধের প্রশংসা ক'রে, তারপর অন্য দু-একটা কথার পরেই আমাকে বলেছিলো তার পকেটে এখন এমন-কিছু আছে যা নিয়ে ধরা পড়লে অন্তত পাঁচ বছর জেল হ'য়ে যাবে তার।

আমি ভেবেছিলুম চালিয়াতি, বিশ্বাস করিনি। পটুয়াটুলিতে কোনো-এক ঠিকানায় আমাকে একটা চিঠি দিয়ে আসতে বলেছিলো, আমি রাজি হইনি। রাজি হইনি, যেদিন সতীনাথ সন্ধের পরে আমাকে নিয়ে রেসকোর্সের কাছে বেড়াতে যেতে চেয়েছিলো। আমি তাকে তাদেরই একজন ব'লে সন্দেহ করেছিলুম, যারা অন্য অর্থে 'ছেলে-ধরা'—দু-একবার যাদের পাল্লায় পড়েছিলুম ব'লেই যাদের কথা ভাবতেই আমার ঘেন্না করে। নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে ওটার কী-রকম চল ছিলো ঢাকায়? হাল আমলের বিলেতি ধরনের নয় কিন্তু—ওটাই বেশি পছন্দ ব'লে নয়, বলা যেতে পারে বিকল্প, নেহাৎই দায়-সারা গোছের ব্যাপার। মেয়েরা ধরাছোঁয়ার বাইরে, এমনকি তাদের চোখে দেখাও সহজ নয়, ইডেন ইস্কুলের দেয়াল জেলখানার সমান উঁচু, কয়েকটি বিশিষ্ট পাড়ায় ছাড়া রাস্তায় পা দেন না মহিলারা, গাড়িতে চলেন খড়খড়ি তুলে দিয়ে। আর ঐ ব্যাপারটা নিয়ে আভাসে-ইঙ্গিতে এত উপদেশ শুনতে হয় যে ছেলেরা মাঝে-মাঝে নিজেদের মধ্যেই কৌতূহল না-মিটিয়ে পারে না। না মশাই, আমি ও-লাইনে ছিলুম না কোনোদিন—আমি নারীপ্রেমিক, তখনও ছিলুম, এখনো আছি। তা সতীনাথকে বালক-শিকারী ভেবে হয়তো ভুল করেছিলুম, কিন্তু তার চোর-চোর তাকানো, এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিচু গলায় কথা বলা, যেন একটা গা-ছমছম-করা রহস্য পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই ধরনের ভাবভঙ্গি তার—এগুলো আমার এত বিশ্রী লাগলো যে তাকে দেখলেই আমি নিজের চারদিকে পাহারা বসিয়ে দিই, তার কোনো প্রস্তাবে রাজি হই না কখনো। আস্তে-আস্তে আমার কাছে যাওয়া-আসা ছেড়ে দিলে সে, আমি নিশ্চিন্ত হলুম।

কিন্তু বুলবুল মেয়ে—আমার চাইতে বেশি বয়সের সন্দেহজনক পুরুষ নয়—একটি ছিপছিপে তরুণী, মিতুর বন্ধু, বিখ্যাত বিভাবতীর দূত, তাই তার মধ্যে ঐ ঈষৎ গোপনতার ভাব লক্ষ ক'রে আমার বরং ভালোই লাগলো, আর তার স্বাধীন সাবলীল চাল-চলন দেখেও কিছুটা প্রশংসা-মেশানো বিস্ময় অনুভব না-ক'রে পারলুম না। সে কি জানে না এই নির্জন পথে তার আর আমার একসঙ্গে হেঁটে বেড়ানো কত বিপজ্জনক? কত রকম কথা ছড়াতে পারে, আমার মাথায় কোনো চরিত্ররক্ষকের ডাণ্ডা পড়তেই বা কতক্ষণ। কিন্তু আমি পুরুষ, এই ভীরু ভাবটা আমার মনে জাগলেও তা মুখে আনা অসম্ভব। কথা বলতে-বলতে বুলবুল আমাকে নিয়ে এলো ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পেছনকার আমবাগানে—নানারকম অখ্যাতি আছে জায়গাটার, চারদিকে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বুলবুলের মুখের দিকে তাকিয়ে কোনো আশঙ্কার ছায়া দেখতে পেলাম না আমি; সে বললে, 'এখানে ঘাস বেশ পরিষ্কার, একটু বসা যাক আসুন। আজ বড্ড হেঁটেছি, স্বদেশী মেলার তোড়জোড় শুরু হ'য়ে গেছে তো।' 'আপনিই করছেন সব?' 'কী ক'রে ভাবলেন আমি একাই সব ক'রে উঠতে পারি?' আস্তে হাসলো বুলবুল। 'অনেকে মিলেই করা হচ্ছে—আপনিও আছেন। বিভা-দি আশ্চর্য —ঠিক বুঝে নেন কাকে দিয়ে কোন কাজ হবে।' আমি জিগেস করার সুযোগ পেলাম, 'আচ্ছা, সেদিন আপনি বলছিলেন টাকা তোলার জন্যই এই মেলা। তা-ই কি?' 'খানিকটা তা-ই। তাছাড়া লোকেদের মনে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলারও একটা উপায় এটা।' 'কী হয় টাকা দিয়ে?' 'সে কী! এই যে বিভা-দি স্কুল চালাচ্ছেন, টাকা লাগে না? রাজবন্দীদের মামলা চালাবার খরচই কম নাকি ভেবেছেন? এ-সব আসে কোত্থেকে? এমনি ক'রে জোগাড় হয়—সারা দেশ ভ'রে অনেক মানুষের অনেক চেষ্টায়। নবেম্বর মাসে দমদম কন্সপিরেসি কেস আসছে হাইকোর্টে। বারোজন আসামি। বিভা-দি বলেন ভালো উকিল-ব্যারিস্টার লাগাতে পারলে অনেকেই খালাশ পেয়ে যাবে।' আমি হঠাৎ জিগেস করলাম, 'অপরাধ করেনি ব'লে খালাস পাবে, না কি উকিলের জারিজুরিতে?' বুলবুল সরু চোখে তাকিয়ে বললো 'দেশের কাজ করাকে আপনি অপরাধ বলেন?' 'আমি বলি না, কিন্তু যারা বিচার করছে, তাদের কাছে অপরাধ নিশ্চয়ই? তাদের আইনের বিরুদ্ধে কাজ করা হয়েছে, সেটা তো ঠিক?' গম্ভীর চোখে, শাসন করার ধরনে আমার দিকে তাকালো বুলবুল। 'আইন অতি সূক্ষ্ম ব্যাপার। কে কী করেছে সেটা নয়—আদালতে কী প্রমাণ হয় সেটাই আসল কথা। সেজন্যেই তো ভালো উকিল চাই।' 'তার মানে— এমন উকিল, যিনি মিথ্যেটাকেই সত্য ব'লে প্রমাণ

করবেন?' গভীর রং ছড়িয়ে পড়লো বুলবুলের মুখে, যেন খুব রেগে গেছে আমার ওপর, যেন আমি তার বক্তৃতার সম্মান রক্ষা করছি না। একটু পরে শান্তভাবে বললো, 'সত্যি-মিথ্যে অত সোজা ব্যাপার নয় তো। ধ'রে নিতে হবে আপনার যাতে কাজ এগোবে সেটাই সত্য, আর মিথ্যে সেটাই যা আপনাকে বাধা দেয়।' 'গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ কিন্তু তা বলে না। তাতে সত্য বড়ো কথা।' 'ও, আপনি তাহ'লে গান্ধীবাদী?' 'না, না, আমি কোনোরকমই বাদী বা বিবাদী নই—সুযোগ পেলেই তর্ক করি, এই একটা বদভ্যাস আমার,' ব'লে আমি হাসলাম। 'আমি আবার তর্ক ভালোবাসি না, এতে বড়ো কাজের ক্ষতি হয়। তাছাড়া—দু-জনে একমত হ'তে পারলে খুব ভালো লাগে, তা-ই না?' আমি বলতে যাচ্ছিলাম সকলেই সব ব্যাপারে সব সময় একমত হ'লে পৃথিবীটা আর বাসযোগ্য থাকতো না, কিন্তু সে-মুহূর্তে বুলবুলের সরলতায় আর উৎসাহে ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম, 'নিশ্চয়ই'।

বুলবুল আমাকে জিগেস করলে 'মুক্তধারা'র সংখ্যা দুটো আমার কেমন লাগলো। 'তা, ভালোই তো।' 'তার মানে—বেশি ভালো না? ঢাকার কাগজে ভালো লেখা পাওয়া সহজ নয় তো—বিভা-দি লেখেন ব'লেই চলছে।' বুলবুলের কথায় তার এই ধারণাটি ধরা পড়লো যে, বিভাবতীর লেখা নিঃসন্দেহে 'ভালো', কিন্তু তাঁর লেখা প'ড়েই সবচেয়ে নিরাশ হয়েছিলাম আমি, ছোটো অথচ রূঢ় একটি আঘাত পেয়েছিলাম। আইরিশ বিপ্লবীদের জীবনী লিখছেন ধারাবাহিকভাবে, কিন্তু সবটাই যেন বই প'ড়ে লেখা, লেখকের মনের কোনো স্পর্শ নেই (যদিও, ধ'রে নেয়া যায়, বিভাবতীর মতো দেশপ্রেমিকের পক্ষে বিষয়টা খুবই উৎসাহজনক)। 'রক্তের তর্পণ', 'স্বাধীনতার সূর্যোদয়', 'দধীচির অস্থি'—মাসিকপত্রে অনবরতই যা পাওয়া যায়—সেই সব শব্দ, বা 'তোমার শঙ্খ ধুলায় প'ড়ে, কেমন ক'রে সইবো'-র মতো অসংখ্য বার দাগা-বুলোনো কোটেশন—আমি ভাবতেই পারিনি বিভাবতী তাঁর লেখার মধ্যে স্থান দেবেন এগুলিকে। যাঁর চেহারা অত ভালো, ব্যবহার অত মার্জিত, যিনি কোনো নিমন্ত্রণে এলে লোকেরা কথা থামিয়ে চেয়ে দ্যাখে, যিনি তাঁর কর্মক্ষমতা ও চরিত্রের জন্য সকলেরই শ্রদ্ধেয় হয়েছেন,—আমি ধ'রেই নিয়েছিলাম তাঁর লেখা হবে উঁচু তারে বাঁধা, তাঁর পরনের খদ্দরের মতোই সাত্ত্বিক, তাঁব মুখের হাসির মতোই প্রসন্ন। আমার ভেবে কষ্ট হ'লো যে তাঁর অমন সুন্দর ব্যক্তিত্বের ছিটেফোঁটাও তিনি পৌঁছিয়ে দিতে পারেননি আরো অনেকের কাছে, যারা হয়তো কখনো তাকে চোখে দেখবে না তাদেরও জন্য, ঐ আইরিশ বিপ্লবীদের উপলক্ষ ক'রে। কিন্তু আমাব এই মোহভঙ্গের কথা বুলবুলেরর কাছে অবশ্য উচ্চার্য নয়, আমি একটু ঘুরিয়ে বললুম, 'আচ্ছা, আপনি জানেন, এগুলো সত্যি কি বিভা-দিরই লেখা?' 'সে কী, আপনি কি ভাবছেন অন্য কেউ তাঁর নামে লিখে দিয়েছে? এমন একটা অদ্ভুত কথা কী ক'রে মনে হ'লো আপনার?' 'শুনেছি নামজাদারা নাকি সেক্রেটারি দিয়ে লিখিয়ে নেন অনেক সময়? তাতে দোষ নেই—কত জরুরি কাজ থাকে তাঁদের, বিভা-দি কখন লেখার সময় পান তা-ই ভাবছিলাম।' আমার কথাটার কপটতা বুলবুলের কানে ধরা পড়লো না, সে খুশি হ'য়ে বললো, 'আপনি এখনো জানেন না কী অসাধারণ মানুষ আমাদের বিভা-দি।' হঠাৎ থেমে, আমাকে চোখে বিঁধে বললো, 'আপনি বুঝি খুব সিনেমায় যান?' 'কী ক'রে জানলেন?' 'বাঃ, ছাত্রমহলে কে না জানে আপনার কথা। আর আমি আপনাকে দেখেওছি কয়েকদিন সদরঘাটের সিনেমা-হাউস থেকে বেরোতে।' আমি জানতাম না আমার গতিবিধি লক্ষ করার মতো সময় বা কৌতূহল কারো থাকতে পারে—বিশেষত কোনো তরুণীর; ঈষৎ গর্বিত হলাম মনে-মনে, কিন্তু সেই গর্ব ফুটো ক'রে দিয়ে বুলবুল বললো, 'সিনেমা দেখে সময় নষ্ট করেন কেন?' 'সময় নষ্ট কেন হবে —ভালো লাগে, তাই যাই।' একটু ভেবে বুলবুল বললো, 'আপনার কাছে ভালো লাগাটা বড়ো কথা হ'তে পারে—আমি কিন্তু তা ভাবি না।' 'আপনি কি কখনোই যান না কোনো ফিল্ম দেখতে?' 'গিয়েছি দু-একবার, বিভা-দিই আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই যে এক কমিক অ্যাক্টর, মজার গোঁফ, পায়ে ঢলঢলে বুটজুতো—''চ্যাপলিন!' আমি চেঁচিয়ে ব'লে উঠলাম, 'আপনি চ্যাপলিনের নাম মনে করতে পারছিলেন না? আশ্চর্য!' 'আশ্চর্য

কেন?' এবার একটু ভারিক্কি চালে, একটু বিদ্যে ফলাবার ধরনে আমি বললাম, 'ফিল্ম-অ্যাক্টরদের মধ্যে কেউ যদি থাকেন সত্যিকার প্রতিভাবান, আর্টিস্ট, তাহ'লে এক চার্লি চ্যাপলিনেরই নাম করতে হয়। "গোল্ড রাশ"-এ তিনি প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন যে তাঁর ধারে-কাছে কেউ এগোতে পারে না—ফেয়ারব্যাঙ্কস, ভ্যালেনটিনো, লন চ্যানি—কেউ না। আশ্চর্য কান্না-মেশানো হাসি—যেন অলিভার টুইস্ট, না—আরো ভালো, যেন কিং লিয়রের ফুল—যদি অবশ্য এমন হ'তো যে ঐ ফুলই শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করলে লিয়রকে আর কর্ডেলিয়াকে, যদি সুখের সমাপ্তি হ'তে পারতো নাটকটার।—তা কি সম্ভব নয়—চ্যাপলিনের লিয়র, যাতে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা হবে ফুল-এর?' হঠাৎ বুলবুলের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কথার স্রোত থেমে গেলো, তার চোখে দেখলাম সেই সূক্ষ্ম ক্লান্তির ছায়া, যা কোনো অজানা বিষয়ের আলোচনার দ্বারা আক্রান্ত হ'লে আমাদের ভব্যতাবোধ চাপা দিতে পারে না। আমার উৎসাহে রাশ টেনে বললাম, 'আপনি বুঝি "গোল্ড রাশ" দ্যাখেননি?' 'না', মাথাটি একটু পেছনে হেলিয়ে জবাব দিলো বুলবুল। 'তাছাড়া—আপনার ঐ চ্যাপলিন যত বড়োই অভিনেতা হোন তাতে আমাদের কী লাভ? তাতে কি আমাদের অন্নবস্ত্রের অভাব মিটবে? বন্ধ হবে ইংরেজের জুলুম? দেশ স্বাধীন হবে?' তার এই কথা শুনে আমার চোখ বিস্ফারিত হ'লো, এক ঝলক রক্ত উঠে এলো মাথায়, এটা তার পরিহাস কিনা তা বোঝার চেষ্টায় তার চোখের দিকে তাকালাম। না—কৌতুকের কোনো লক্ষণ নেই, স্থির গম্ভীর তার দৃষ্টি —তাতে মিশে আছে যেন আমার জন্য কিছু আবেদন, কিছু ভর্ৎসনা। পাছে রাগের ঝোঁকে কোনো অন্যায় কথা ব'লে ফেলি, তাই চেষ্টা ক'রে নিচু গলায় বললাম, 'আপনি কি সত্যি বলছেন যে ভারতবর্ষ যাতে স্বাধীন হবে না সে-রকম কোনো-কিছুরই কোনো মূল্য নেই?' 'আমি সে-রকম কিছু বলিনি, বলতে চাইনি। কিন্তু—'একটু থামলো বুলবুল, দু-আঙুলে এক ফালি ঘাস ছিঁড়লো,—'আমি দিভা-দিকে দেখেছি, তাঁকে আমি দেবীর মতো ভক্তি করি, তিনি আমাকে জীবনের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সেই পথের দু-পাশে যে-সব নানা রঙের ফুল ফুটে আছে সেদিকে আমার তাকাবার সময় নেই, মনও নেই।' 'দেবীর মতো', 'জীবনের পথ'—এই দুটো কথাই খট ক'রে বাজলো আমার কানে, একটু শস্তা শোনালো, কিন্তু যখন দেখলাম বুলবুল দু-চোখ ভরা বিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, যে-বিশ্বাস সে বুদ্ধি দিয়ে অর্জন করেনি, হৃদয়ের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে, তখন আমি আমার তর্কের দানোকে চাপা দিয়ে দিলাম। 'এখানে অন্ধকার হ'য়ে হয়ে আসছে, যাবেন নাকি এবার?' 'অন্ধকারকে আমার ভয় নেই—তাছাড়া আপনি তো আছেন।' 'আমার একটু অবাক লাগলো যে আমিই যে তার পক্ষে আশঙ্কার কারণ হ'তে পারি এটা তার কল্পনার ত্রিসীমানায় নেই। হেসে বললাম, 'আমি তেমন বলবান নই কিন্তু, কোনো দুর্বৃত্ত আক্রমণ করলে আপনাকে বাঁচাতে পারবো না।' 'তখন না-হয় আমিই আপনাকে বাঁচাবো।—কিন্তু চলুন, আমাকে আবার আরেক জায়গায় যেতে হবে।' আমবাগান থেকে বেরিয়ে, বুলবুলের পাশে হাঁটতে-হাঁটতে, তার ঠোঁটে হঠাৎ একটি ছোট্ট হাসি ফুটে উঠতে দেখলাম। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, 'আসল কথা কী, জানো? আমি তো তোমার মতো কবি নই, সাহিত্যিক নই, আমি অতি সাধারণ—আমি শুধু এটুকু বুঝি যে ঘরে আগুন লেগেছে, আর তাতে যদি এক বালতি জলও ঢালতে পারি তাহ'লেই আমার বেঁচে থাকা সার্থক। —এই রে, "তুমি" ব'লে ফেললাম, কিছু মনে করলেন না তো? না—মনে করার কী আছে, এই ভালো, আপনিও আমাকে "তুমি" বলবেন। কেমন—রাজি?' বুলবুল চলতে-চলতে আমার হাতটা ধরলো একবার, তক্ষুনি ছেড়ে দিলো।

১০

আমি চমকে উঠেছিলাম বুলবুলের মুখে হঠাৎ 'তুমি' শুনে, তার হাতের ছোঁয়ায় কেঁপে উঠিনি তাও নয়, আমার বয়সে ও অবস্থায় তা অনিবার্য ছিলো। আপনার তো মনে আছে তখনকার বাংলা উপন্যাসে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে বদলটা কী-বিরাট একটা ঘটনা ছিলো, লেখককে কত কাঠখড় পোড়াতে হ'তো তরুণ-তরুণীকে ঐ স্তরে নিয়ে আসার জন্য, আর হাত থেকে জলের গ্লাস নিতে গিয়ে আঙুলে আঙুল ঠেকে যাবার ফলে, বা রোগশয্যায় কোনো নারীহস্তের স্পর্শে (নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন নায়ক-নায়িকার কেমন ঘন-ঘন অসুখ বাধাতেন লেখকেরা, তাদের কাছাকাছি আনার আর কোনো উপায় না-পেয়ে!) যত বিদ্যুৎ ছাপার অক্ষরে ব'য়ে গেছে তা দিয়ে ভারতবর্ষের পাঁচ লক্ষ গ্রামে ইলেকট্রিক আলো জ্বেলে দেয়া যায়। আমাকে মানতেই হবে, আমারও শিরায় একটি ফুলকি জ্বলেছিলো বুলবুলের ঐ আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত আচরণে, কিন্তু তার দিক থেকে একেবারেই কোনো বিকার দেখলাম না, তার আর আমার মধ্যে যে অগ্নি ও দাহ্যবস্তুর একটি সম্বন্ধ বদ্ধমূল, তা যেন তার খেয়ালই নেই। মাঠ পেরিয়ে আলো-জ্বলা রাস্তায় পড়লুম আমরা, হাঁটতে-হাঁটতে কথা বলতে লাগলো সে, খুবই সমতল ও সাধারণ সুরে, আর এমন স্বচ্ছন্দে নির্ভুলভাবে 'তুমি' ব'লে চললো যেন সে আর আমি বাচ্চা বয়স থেকে এক বাড়িতে বড়ো হয়েছি, যেন আমরা ভাইবোনের মতো পরস্পরের অত্যন্ত বেশি পরিচিত। তার এই মেকি অন্তরঙ্গতা আমাকে অবশ্য পীড়া দিচ্ছিলো; এক-একটি ল্যাম্পোস্ট পার হবার সময় আমি আড়চোখে তাকিয়ে দেখছি তার মুখের দিকে—যেন বুঝে নেবার চেষ্টা করছি এর কতটা অংশ ছলনা বা আত্ম-প্রতারণা। মিতু বর্ধনের কথা তুললো সে, আমার সঙ্গে সেদিনের পরে আর দেখা হয়নি শুনে বললো, 'আমি পর্শু বিকেলে যাচ্ছি মিতুর কাছে—মানে শনিবার—ইচ্ছে হ'লে তুমিও আসতে পারো। অবশ্য আমার মধ্যস্থতার কোনো দরকার নেই, তুমি যা ভাবছো তাব চেয়ে ঢের বেশি সে চেনে তোমাকে। অনেকদিন ধ'রেই চেনে। ...অবাক হচ্ছো? মিতুকে আবার বোলো না যে আমি বলেছি—তোমার যেখানে যা লেখা বেরোয় সব সে খুঁজে-খুঁজে জোগাড় করে—বোধহয় দিলদার নওরোজকেও তোমার কবিতা পাঠিয়েছিলো।' আমি ব'লে উঠলাম, 'যাঃ!' 'কেন, এতে অবাক হবার কী আছে? মিতু আমার মতো কাঠখোট্টা নয়—কবিতা ভালোবাসে, নিজেও গল্প লেখে লুকিয়ে-লুকিয়ে। কিন্তু ভীষণ লাজুক, কাউকে দেখাতে চায় না, তা তুমি পিড়াপিড়ি করলে রাজি হ'তে পারে—তার সঙ্গে খুব মিলবে তোমার। ঐ যে, তোমার বাড়ি এসে গেছে, আচ্ছা—'তার বিদায় নেবার ভঙ্গি দেখে আমি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলাম, 'চলুন আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।' 'কোনো দরকার নেই—তাছাড়া আমি বাড়িও যাচ্ছি না এক্ষুনি। কিন্তু ঐ ''আপনি''টা কি তুমি ছাড়বে না কিছুতেই? বয়সেও তো একটু ছোটো আমি, যদিও আসলে—' 'আসলে তুমিই বড়ো, যেহেতু তুমি মেয়ে,' আমি তার কথায় বাধা দিলাম, 'তা-ই না? প্রায় আমার দিদিমার বয়সী!' 'দেখলে তো, রাগিয়ে দিয়ে কেমন 'তুমি' বলালুম তোমাকে, নিজেদের মধ্যে ''আপনি'' আমার বিশ্রী লাগে।' ''নিজেদের মানে?''—কিন্তু প্রশ্নটা আমার মুখ দিয়ে বেরোবার আগেই বুলবুল আবার বললো, আচ্ছা, আর-একটু আসতে পারো আমার সঙ্গে —ঐ লেভেল ক্রসিং পর্যন্ত। তা শোনো,' 'আমার মুখের ওপর তার দৃষ্টি অনুভব ক'রে আমিও ফিরে তাকালাম, 'মিতুকে আমি ভালোবাসি খুব, কিন্তু সব কথা বলি না তাকে—হয়তো তার সহ্য হবে না, তাই।' 'আমি হাঁটা থামিয়ে বললাম, মানে? কী সহ্য হবে না?' 'তা তোমাকে পরে একদিন বলবো, কেমন? এখন তো দেখা হবে মাঝে-মাঝে স্বদেশী মেলার ব্যাপারে।' বুলবুলের এই কথাটায় দুটো অনুমান ছিলো যা আমাকে ভাবিত করলো; এক, তাদের স্বদেশী মেলার সঙ্গে আমিও যেন রীতিমতো যুক্ত হ'য়ে গিয়েছি ('নিজেদের' অর্থ কি তা-ই?) : দুই, যেন এই মেলা হ'য়ে গেলেই তার সঙ্গে আর দেখা হবে না আমার।' 'তাহ'লে তুমি আসছো বকুলভিলায় শনিবারে?' অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলাম, 'শনিবার? আচ্ছা দেখি।' (আসলে মিতুর বাড়িতে যাবার ইচ্ছে আমার

ষোলো ছেড়ে আঠারো আনা, কিন্তু বুলবুলকে তা জানতে দিতে চাই না আমি।) 'ও, না—শনিবার আমার অন্য একটা—'আমি হঠাৎ থেমে গেলাম, কোনো অজ্ঞাত কারণে আমার মনে হ'লো যে শনিবার আমার অন্য কোথায় যাবার কথা তা বুলবুলকে বোধহয় না-বলাই সমীচীন। মিতুর জন্মদিনে গানের আসর ভেঙে যাবার পর জোন্সের সঙ্গে আমার আবার দু-মিনিট কথা হয়েছিলো ; খানিকটা সংস্কৃত পড়েছিলো ব'লে বঙ্কিমের বাংলা সে বুঝতে পারে, কিন্তু শরৎচন্দ্রকে নিয়ে অসুবিধে হচ্ছে তার, আমার পক্ষে কি সম্ভব হবে মাঝে-মাঝে তাকে সাহায্য করা? যদি সময় হয়? অসুবিধে না হয়? আমি রাজি হয়েছিলুম, জোন্স বলেছিলো তাহ'লে শনিবার যদি পাঁচটা নাগাদ চা খাই গিয়ে তার সঙ্গে।—তক্ষুনি এই ব্যাপারটা আমার মনে প'ড়ে গেলো। আমি সঠিকভাবে রাজি হয়েছিলুম কিনা মনে পড়লো না (কেননা আমার চোখ সে-মুহূর্তে স'রে গিয়েছিলো কাজলের দিকে, মিতুর কাছে বিদায় নিচ্ছিলো সে—'চলি, মিতু, খু—ব ভালো লাগলো, একদিন এসো আমাদের ওখানে।' 'আপনারা আবার আসবেন,' ব'লে মিতু চোখ ফিরিয়েছিল—ঠিক আমার দিকে নয়, আমি যেখানে জোন্সের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলুম সেদিকে)—কিন্তু 'না' বলিনি এটা নিশ্চিত, জোন্স হয়তো ধ'রে নিয়েছে আমি যাবো, তাই আমাকে যেতেই হবে, নয়তো আমিও তার চোখে তেমনি একজন ভারতীয় ব'নে যাবো যারা নিমন্ত্রণ নিয়ে, বা ক'রে, ভুলে যায়, আর সময় বিষয়ে যাদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। 'আপনি ক-টার সময় যাবেন?' 'ফের আপনি!'—বুলবুলের চোখে কৌতুক ভেসে উঠলো—'আমি কি কখনো ঘড়ি দেখে চলি ভেবেছো? যাবো সন্ধের দিকে কোনো সময়ে।' 'আমার একটু দেরি হ'তে পারে।' 'তোমার ইচ্ছে না-হ'লে আমি তোমাকে জোর করছি না—একটু স'রে দাঁড়াও।' আমাদের পেছনে একটা ঝংকৃত আত্মঘোষণা বেজে উঠলো, একদল বাচ্চার উচ্চহাসির মতো সাইকেলের ঘুন্টি, ফিরে তাকিয়ে আবছা আলোয় আমার মনে হ'লো অন্ধকারে চাঁদের মতো অমূল্যর গোলগাল সদাপ্রফুল্ল মুখখানার উদয় হয়েছে। 'ঠিক চিনতে পেরেছি পেছন থেকে,' ব'লে অমূল্য কোমর থেকে পা পর্যন্ত একটি লীলায়িত ভঙ্গি ক'রে সাইকেল থেকে নেমে পড়লো। আমি ধ'রে নিয়েছিলুম তার কথাটা আমারই উদ্দেশে বলা, ভেবেছিলুম আমার সঙ্গে একটি মেয়েকে দেখেই সে সাইকেলের ঘুন্টিকে তূর্যনাদে পরিণত না-ক'রে পারেনি, তাই যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হলুম যখন বুলবুল কথা বললো উত্তরে। 'আরে, অমূল্য! অমন অসভ্যের মতো ঘণ্টা বাজাও কেন?' 'আমি সাইকেলের বেল্-এ গিটকিরি প্র্যাকটিস করছিলাম। জানো, আমি আজ জগন্নাথ হল-নিবাসী যুববৃন্দের দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়েছি তাদের কর্ণকুহরে গীতবর্ষণের জন্য। অবশ্য দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারও আছে। —তুমি যাচ্ছো নাকি, রণজিৎ, সুধাংশুর ম্যানেজারিতে আয়োজিত এই তুঙ্গ ভোজসভায়? থুড়ি, মাফ কিজীয়ে, আই বেগ ইওর পার্ডন, ভুলেই যাচ্ছিলাম ও-সব ভালগার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তুমি নেই—হস্টেলের কোনো ফীস্টে কেউ কখনো দ্যাখেনি তোমাকে। তুমি ফুলের মধু চাঁদের সুধা পান করো—' আমি ঝাঁঝালো গলায় ব'লে উঠলাম, 'তোমার এই রদ্দি রসিকতাগুলো এবার ছাড়ো তো, অমূল্য—গর্দভের রাগিণী যদি বা শোনা যায় তার রসিকতা অসহ্য!' কথাটা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ামাত্র একটু খারাপ লাগলো আমার (কেননা সাধারণত আমি কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলি না), তাছাড়া একটু লজ্জা করলো পাছে বুলবুল ভাবে সে সামনে আছে ব'লেই আমি অমূল্যকে 'জব্দ করতে' চাচ্ছি। কিন্তু অমূল্যর মুখে হাসি আরো বিস্তীর্ণ হ'লো আমার কথা শুনে (তার চামড়ায় বেঁধাবার মতো তীর বোধহয় তৈরি হয়নি), আর বুলবুল খানিকটা হাসি, খানিকটা শাসনের সুরে ব'লে উঠলো, 'তুমিও যেমন! অমূল্যর কথায় কেউ আবার রাগ করে নাকি! ওর শাদা মনে কাদা নেই।—চলো অমূল্য, আমিও রমনার দিকে যাচ্ছি, আমার সঙ্গে একটু হাঁটবে চলো।' একবার ফিরে তাকিয়ে, ছোট্ট হেসে, বন্ধুভাবে হাত নেড়ে, আমার কাছে বিদায় নিলো বুলবুল।

আমি আস্তে-আস্তে বাড়ি ফিরে এলাম, এক ঝাঁক প্রশ্ন আমাকে ঘিরে ধরলো। কয়েকদিন আগে, ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরির স্ট্যাকে দাঁড়িয়ে, যখন চলন্ত ট্রেন বুলবুলের আরম্ভ-করা কথা থামিয়ে দিয়েছিলো, তখন, যাতে বার-বার তার দিকে তাকাতে না হয়, তাই বাইরে মাঠের ওপর দৃষ্টি ছড়িয়ে

যে-সুখস্বপ্নটিকে আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য প্রশ্রয় দিয়েছিলাম, তা-ই যেন বাস্তব হ'লো আজ : সন্ধেবেলা, প্রথম-তারা-ফোটা ঠাণ্ডা নীল আকাশের তলায়, একটি সঙ্গিনীকে আমি পেয়েছিলাম। এর আগে কখনো এমন হয়নি যে এতটা সময় একান্তে কোনো তরুণীর সঙ্গে আমি কাটিয়েছি। আরো কথা : আমি তাকে খুঁজে বের করিনি, তার পেছনে ছুটিনি, সে-ই আমার কাছে এসেছে। নির্জনতা, তার চোখে-মুখে ঔৎসুক্য যা লুকোবার কোনো চেষ্টা সে করেনি, তার কোনো-কোনো কথায় ও ভঙ্গিতে গোপনতার ভাব, শেষ পর্যন্ত 'তুমি' বলা, হাতে হাত রাখা—একটা প্রেমের কাহিনী গ'ড়ে ওঠার মতো উপাদানের অভাব ছিলো না। রোমাঞ্চিত হওয়া উচিত ছিলো আমার, প্রায় হয়েওছিলুম একটা সময়ে, কিন্তু আখেরে এই অবসাদ কেন, এই অস্বস্তি? বুলবুলের সঙ্গে যে-সময়টুকু আমি কাটালাম, তার মধ্যে আমার ভূমিকা কত তুচ্ছ তা চিন্তা ক'রে আমার অহমিকায় আঘাত লাগলো। মনে ক'রে দেখলাম, তার ইচ্ছেমতোই সব-কিছু হয়েছে, আমি যেন শুধু তারই হুকুম তামিল করলুম এতক্ষণ। 'আমাকে এগিয়ে দিয়ে আসুন—চলুন ঐ আমবাগানে—আসুন বসা যাক—এবার উঠুন—ঐ লেভেল ক্রসিং পর্যন্ত—তোমার ইচ্ছে না-হ'লে আমি জোর করছি না।' যেন জোর করার কোনো প্রশ্ন ওঠে, যেন এই এক ঘণ্টার মধ্যেই তার কোনো দাবি জ'ন্মে গেছে আমার ওপর। আর তারপর—অমূল্যকে দেখামাত্র আমাকে ফেলে তার সঙ্গে চ'লে যাওয়া। তাহ'লে অমূল্যর সঙ্গেও তার বন্ধুতা, তাকেও সে 'তুমি' ব'লে, 'শাদা মনে কাদা নেই' বলে প্রশংসাও করে। সে কি চাচ্ছে এভাবে ঈর্ষা জাগাতে আমার মনে? জানে না, অমূল্যর মতো একটা বাজে ছেলেকে ঈর্ষা করা আমার পক্ষে কত অসম্ভব? আর তারপর অন্য একটা কথা আমার মনে হ'লো, যেন এক ঝলকে বুলবুলের ভেতরটা দেখতে পেলাম। না—ঈর্ষা জাগানো নয়, নারীর চিরাচরিত মনোমুগ্ধকর ছলাকলা নয়, ও-সবের বিরুদ্ধেই নিজেকে ঘিরে একটি চতুর ব্যূহ সে রচনা করেছে। তার 'তুমি' বলা, হাত ছোঁয়া, প্রায় বালকের মতো সহজ ভঙ্গি—এই সবই হ'লো প্রতিষেধক, বসন্তের টিকার মতো—অন্তত তার দিক থেকে তা-ই, অন্তত সে ভাবছে যে অমনি ক'রেই প্রেমের বীজাণুগুলিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে সে, পারবে 'নির্দোষ'ভাবে মেলামেশা করতে যুবকদের সঙ্গে। কথাটা ভেবে একটু মন-খারাপ হ'লো আমার, একটু অপমানিত বোধ করলুম, যেহেতু—আমি যদি তাকে ভুল না-বুঝে থাকি—তাহ'লে আমার পৌরুষের কোনো মূল্য নেই তার কাছে, তার নিজের নারীত্বেরও কোনো মর্যাদা নেই: প্রেম, যার জন্য সেই বকুল-ভিলার সন্ধ্যা থেকে শুরু ক'রে আমার আকাঙ্ক্ষা দিনে-দিনে আরো প্রবল হ'য়ে উঠছে, তার সম্ভাবনাকেও স্বীকার করতে সে রাজি নয়। আমার মনে হ'লো, দুটো মিষ্টি কথা ব'লে আমাকে ঠকিয়ে দিয়ে গেলো মেয়েটা, অনুতাপ হ'লো তাকে অতটা কাছে ঘেঁষতে দিয়েছিলুম ব'লে, স্থির করলুম পরে কখনো তাকে বুঝিয়ে দেবো যে তার সঙ্গে ভ্রাতৃভাবে বিচরণ করার মতো গোবরগণেশ ছেলে আমি নই।

—কিন্তু কে জানে, এটাও হয়তো নারীত্বের ঘোষণা তার, ছলাকলারই উল্টো পিঠ—আমি যুবক ব'লেই আমার সঙ্গ চাচ্ছে সে, কিন্তু নিজের কাছে তা স্বীকার করছে না, ভান করছে এটা 'নির্দোষ', দেখাতে চাচ্ছে তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা দু-জন সহকর্মীর, সজ্ঞানে সে যার বিরুদ্ধে বেড়া তুলে দিলো, অচেতন মনে সেটাই হয়তো তার লক্ষ্য। কিন্তু এই অনুমান—আমার নিজের পক্ষে চাটুকারী হ'লেও—পুরোপুরি মেনে নিতে যেন পারলাম না , নির্জনে একটি তরুণীর সঙ্গ পেলে যে-সুখ আমার অনুভব করার কথা, তা মনের কোথাও খুঁজে পেলাম না আমি; লেগে রইলো অস্বস্তি, ঈষৎ বিরক্তির ভাব, বুলবুলের প্রতি একই সঙ্গে আকর্ষণ ও সংশয়।

শনিবার সন্ধের পরে আমি যখন খান কয়েক বই হাতে নিয়ে বকুল-ভিলায় পৌঁছলুম, বুলবুল তখন যাবার মুখে। আমাকে দেখে সে ব'লে উঠলো, 'বেশ ছেলে! আমিও যাচ্ছি আর উনিও এলেন। কত বই হাতে! বিদ্যের জাহাজ। মিতুর সঙ্গে কথা হচ্ছিলো একটু আগে—বিভা-দি ভাবছেন মেয়েদের দিয়ে একটি নৃত্যনাট্য করাবেন মেলায়, বারো-চোদ্দটি স্বদেশী গান গেঁথে-গেঁথে একটি নাটিকার মতো হবে আরকি। বঙ্কিম থেকে দিলদার নওরোজ পর্যন্ত বাছা-বাছা গান থাকবে। কোন-কোন

গান, পর-পর কী-ভাবে সাজালে ভালো হয়, তা-ই নিয়ে কথা হচ্ছিলো। তোমার কী মনে হয়, রণজিৎ?' আমি কোনো জবাব দিলাম না, বুলবুল দরজার দিকে এগোলো। 'চলি মিতু, সত্যি আর সময় নেই আমার, আমার ছাত্রী আমার অদর্শনে কাতর হ'য়ে পড়েছে এতক্ষণে। রণজিৎ, একটু ভেবে দেখো যা বললাম—ঐ স্বদেশী গানের ব্যাপারটা; মিতু, তুই জেনে নিস ওর কাছে, তুই আর রণজিৎ মিলে করলে সবচেয়ে ভালো হয়।—আরে, আর্থার জোন্সের নাম লেখা দেখছি!' আমি আমার হাতের বইগুলোকে একটা জানলার তাকে নামিয়ে রেখেছিলাম, সেখানে একটু থেমে বুলবুল একটার মলাট উল্টোচ্ছিলো, তার শেষ বিস্ময়বোধক বাক্যের সেটাই কারণ। আমাকে বলতে হ'লো,' 'উনি পড়তে দিলেন আমাকে।' 'কে? আর্থার জোন্স? তুমি তার বাড়ি গিয়েছিলে নাকি?' আমি, জানি না কেন, খানিকটা আত্মসমর্থনের সুরে বললাম, 'কেন, গেলে কোনো দোষ আছে?' 'না, না, দোষ কেন থাকবে, আমরা সকলেই জানি জোন্স খুব ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চায়। তা সাহেবের সঙ্গে কী কথা হ'লো তোমার?' ও-রকম প্রশ্ন করাটা যে সৌজন্যসম্মত নয়, বুলবুলকে তা মুখ ফুটে বলতে পারলাম না, সংক্ষেপে জবাব দিলাম, 'নানা কথা হ'লো।'

আসলে নানা কথা হয়নি, জোন্সের সঙ্গে আমার আলাপের বিষয় ছিলো শুধু ভাষা ও সাহিত্য। রমনার প্রায় শেষ প্রান্তে তার বাংলোতে ঢুকে প্রথম কয়েকটা মুহূর্ত আমি আরাম পাইনি। ঘরের মেঝে এত ঝকঝকে আর পালিশ-করা যে আমার ঢুকতে গিয়ে পা হড়কে যাচ্ছিলো, আসবাবপত্র এতই সুশোভন যে বসতে প্রায় সংকোচ বোধ হয়, চায়ের পেয়ালা এত বেশি সুন্দর যে মনে হয় না সত্যি ওগুলো ঠোঁট ঠেকিয়ে চা খাবার জন্য তৈরি—অন্তত তখন তা-ই মনে হয়েছিলো আমার, কেননা তখনও আমি জানি না যে এর চেয়ে অনেক বেশি বিলাসিতায় উন্নীত হবো আমি—আর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে। কিন্তু জোন্সের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু হবার পর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার অনভ্যাসজনিত দ্বিধার ভাবটা কেটে গেলো। বাংলা আর ইংরেজি ভাষার মেজাজ যদিও এত আলাদা, তবু কোনো-কোনো শব্দে কেমন অতি দূর ঐতিহাসিক আত্মীয়তার প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়, এই ব্যাপারটা দেখলাম তাকে বেশ উত্তেজিত ক'রে রেখেছে : 'জন্ম' শুনে তার মনে পড়ে যায় '**genesis**', '**generation**' ; 'জ্ঞান' শুনে '**ignorant**', '**cunning**'; 'স্থান' শুনে '**stand**'; 'তৃষ্ণা'র সঙ্গে '**thirst**'-এর আর 'স্মৃতি'র সঙ্গে '**martyr**'-এর সম্পর্ক না-টেনে সে পারে না, আর 'বিদ্যা'র মধ্যে সেই মূল সে খুঁজে পায় যা থেকে তৈরি হয়েছে '**wise**' '**witch**', '**ideal**' '**idea**'। আমি তখন, আমার পয়লা নম্বরি বি. এ. ডিগ্রি সত্ত্বেও, ভাষাতত্ত্ব অল্পই জানি; 'স্মৃতি' কেমন ক'রে 'মাটার' শব্দের আত্মীয় হ'লো, আমার তা ধারণার অতীত, কিন্তু আমি আমার বিস্ময় বেশি প্রকাশ করলুম না, পাছে জোন্স আমাকে নেহাৎ অজ্ঞ ব'লে ভাবে। কিন্তু সে যখন কথায়-কথায় বললে যে ইংরেজি '**crimson**' শব্দ সংস্কৃত 'কৃমি' থেকে এসেছে তখন আমি ব'লে না-উঠে পারলুম না, 'সত্যি? আশ্চর্য!' 'আশ্চর্য না! "**Same**" আর ''সম'', "**name**" আর ''নাম''—এ-ধরনের নিকট সম্পর্ক কানেই ধরা পড়ে; শর্করা থেকে, "**sugar**," বা ''খণ্ড'' থেকে "**candy**," এগুলোও বোঝা শক্ত নয়—এ-সব শব্দের উচ্চারণ খুব কাছাকাছি থেকে গেছে, আর অর্থের কোনো বদলই হয়নি—কিন্তু কোথায় 'কৃমি'—একটা ঘেন্নার ব্যাপার—আর কোথায় গোলাপের "**crimson**" রং! "**Candy**" বলতে আর-একটা কথা মনে পড়লো। "**Candid**", "**candle**," "**candidate**" ইত্যাদি শব্দগুলোর তলায় আছে ল্যাটিন "**candor**", ''শাদা''—আর এরই সংস্কৃত জ্ঞাতি হ'লো ''চন্দ্র'' ও ''চন্দ্রন''—দুটোরই ধাতুগত অর্থ উজ্জ্বল, দীপ্তিশালী। তেমনি, ইংরেজি "**scene**"-এর সঙ্গেও সংস্কৃত ''ছায়া''র সম্পর্ক আছে। ''ছায়া'', গ্রীক ''স্কিয়া''—বাংলায় আপনারা যাকে ''ছায়া'' বলেন তা-ই, কিন্তু সংস্কৃতে ''ছায়া'' বলতে দীপ্তিও বোঝায়—সেই ''মেঘদূতম্''-এ আছে না—'জোন্স উঠে গিয়ে একটা বই নামালো তাক থেকে, পাতা উল্টে বললো, 'এই যে, পূর্বমেঘে—''রত্নচ্ছায়াব্যতিকর ইব...'' দৃশ্য, দীপ্তি, রঙ্গমঞ্চ—এমনি অনেক ভিন্ন-ভিন্ন অর্থ লুকোনো আছে এই "**scene**"-এর মধ্যে, আর তা থেকে যে আরো কত শব্দ বেরিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।' আমি জিগেস করলাম,' 'কিন্তু

"কৃমি" থেকে "crimson" হ'লো কী ক'রে?' 'বলছি—বেশ একটু কৌতুকের ব্যাপার। "কৃমি" মানে পোকা, আর একরকম পোকার মৃতদেহ থেকে লাল রং তৈরি হ'তো আগে, আরবরা তার নাম দিয়েছিলো 'কিরমিজ'—যা "কৃমি"র আরবি উচ্চারণ ছাড়া কিছু নয়; তা-ই থেকে, মাঝে আরো কয়েকটা ভাষা ঘুরে, ইংরেজি "crimson"-এ পৌঁছনো গেলো। আর-একটা খুব মজার কথা হ'লো "banyan"—ওটার মূলে আছে সংস্কৃত 'বণিক', তাই থেকে পর্তুগীজ বানিয়ান—আপনাদের 'বানিয়া', 'বেনে'—গাছটার ঐ নাম হ'লো যেহেতু ভারতবর্ষে বটতলায় কেনাবেচা চলে। সত্যি—ভাষার মতো এমন আশ্চর্য ব্যাপার আর-কিছু নেই। মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস লুকোনো আছে ভাষার মধ্যে, সব জাতি একত্র হয়েছে সেখানে, ঋণ নিয়েছে পরস্পরের কাছে। যারা বিশেষ কোনো জাতি বা ধর্মের শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাস করে—যেমন মধ্যযুগে রোমান ক্যাথলিকরা করতেন, বা আমরা ইংরেজরা করতুম উনিশ শতকে, আর এখন হিটলার শুরু করেছে জর্মানিতে, তাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো যুক্তি পাওয়া যাবে ভাষাতত্ত্বে।'

আমি তাকে জিগেস করলাম এখনকার ইংরেজ কবিদের মধ্যে কাকে তার ভালো লাগে। সে এমন একটা নাম করলে যা তখন আমার শুধু ঝাপসাভাবে শোনা ছিলো: টি.এস. এলিয়ট, একজন আমেরিকান, আমি তাঁর কিছু পড়িনি শুনে তখনই 'প্রুফক' ব'লে একটা কবিতা প'ড়ে শোনালো। আমি যখন জিগেস করলুম বইটা আমি কয়েকদিনের জন্য ধার পেতে পারি কিনা তখন সে সোৎসাহে ব'লে উঠলো, 'নিশ্চয়ই! . ইয়েটসের শেষ বইটা পড়েছেন?—একেবারে নতুন এক কবির জন্ম হয়েছে এটাতে। জেমস জয়সের এটা...?' আমি বিদায় নিলাম সাইকেলের কেরিয়ারে কয়েকটি সদ্য-বেরোনো বই আর মগজে অনেক সদ্য-গজানো ভাবনা নিয়ে।

বুলবুল চ'লে যাবার পর আমি মিতুকে বললাম, 'আপনার বন্ধুটি আমাকে হঠাৎ "তুমি" বলতে শুরু করেছেন কেন জানি না। আর ঐ এক স্বদেশী মেলা ছাড়া আর কি কোনো কথা নেই?' মিতু সস্নেহে বললো, 'হ্যাঁ, বুলবুলকে একটু পাগলাটে মনে হয় প্রথমে, তবে ও খুব ভালো—আপনি কিছু মনে করেননি তো?' আমি বললাম, 'বুলবুলও খুব প্রশংসা করে আপনার, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো কলেজে (পুরো সত্যটা বললাম না), আপনারা দেখছি পারস্পরিক-অনুরাগ-সমিতি গঠন করেছেন।' 'সমিতি কেন হবে—বন্ধুতা।' বুলবুলের সঙ্গে মিতুর বন্ধুতার ভিত্তিটা কী, তা জানার জন্য কৌতূহল হ'লো আমার, জিগেস করলাম, 'বুলবুলকে আপনি কি অনেকদিন ধ'রে চেনেন?' 'প্রায় ছেলেবেলা থেকেই। ট্যুশনি ক'রে পড়া-খরচ চালায়, কত রকম স্বদেশী কাজ করে—অসাধারণ মেয়ে।' 'কত মেয়ে তো জেলেও যাচ্ছেন আজকাল, এতে আর অসাধারণ কী আছে?' মিতু জবাব দিলো, 'ওর কথা আরো একটু জানলে আপনি ও-কথা বলতেন না। ওদের বাড়ির অবস্থা তেমন ভালো নয়, বাবা চান যে-কোনো রকম একটা বিয়ে দিয়ে মেয়েকে পার করতে, বুলবুল জেদ ক'রে য়ুনিভার্সিটিতে পড়ছে, এদিকে মা-র হাঁপানির টান উঠলে বাড়িতে রান্নাবান্নাও করে, তার ওপর বিভা-দির "মুক্তধারা" পত্রিকার প্রুফ দ্যাখে রাত জেগে-জেগে—আমার ভারি অবাক লাগে ওকে। আর তাছাড়া---' মিতুর ঠোঁটে ক্ষীণ একটু হাসি ফুটলো—'আমি নিজে তো পারি না ও-সব, আমি কিছুই করছি না, বাড়ি ব'সে দিন কাটাই—সেজন্যেও বুলবুলকে আমি প্রশংসার চোখে না-দেখে পারি না। আমার এখনো একা পথ চলতে বাধো-বাধো লাগে, মাথা ধরে রোদে বেরোলে—আসলে আমি একটু সেকেলে ধরনের আছি বোধহয়।' বুলবুলের সঙ্গে মিতুর স্বভাবের বা মতিগতির মিল নেই জেনে আমি মনে-মনে গভীর স্বস্তি পেলাম, একটু বেশি উৎসাহের সুরে ব'লে উঠলাম, 'সকলকেই সব পারতে হবে কেন---আপনি কিছুই করছেন না, এ কথাও ঠিক নয়—গান গাওয়াও অনেক কিছু করা, আর—আপনি এত ভালো গান করেন যে আর কিছুরই দরকার নেই আপনার।' আমার একটু অবাক লাগলো মিতু যখন লাল হ'লো আমরা কথা শুনে—তার গানের প্রশংসা তো সারাক্ষণ শুনছে সে, এখনো লজ্জা পায়? একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'মা-র সঙ্গে একবার দেখা করবেন আসুন, তাঁর শরীরটা বেশি ভালো নেই আজ—ওপরে গিয়ে বসবেন নাকি? বাবাও

এসে পড়বেন এক্ষুনি।' সে-রাতে আমি ন-টা অবধি কাটিয়ে এলাম বকুল-ভিলায়; ফেরার পথে, যেমন জলের ওপর ঝিরিঝিরি হাওয়া, বা শুকনো পাতা চৈত্রমাসে উড়ে চলে, বা দূর-থেকে-শোনা ঝাউবনের মর্মর, তেমনি, মাঝে-মাঝে, মৃদু ও ফিরে-ফিরে-আসা, অশান্ত ও মধুর, আমার মনের ওপর দিয়ে একটি ভাবনা ব'য়ে গেলো '—আমি কি প্রেমে পড়ছি?' 'আমি কি প্রেমে পড়ছি?'

১১

সেই তখনকার আমি, আর কয়েক বছর পর যার ছবি বেরিয়েছিলো বম্বাইয়ের সব ক-টা কাগজে, নলিনী ব্রোকারের সঙ্গে বাহুবদ্ধ অবস্থায়, নব দম্পতি, সুখী, সহাস্য, সমপদস্থের ঈর্ষাভাজন আর সাধারণের ইচ্ছাপূরণের উপায়—এ-দু'জন কি এক মানুষ? জানেন, নলিনীকে নিয়ে আমার প্রথম কর্মস্থলে যখন পৌঁছলুম, অচেনা মধ্যপ্রদেশের ছোটো শহরে, বাংলাদেশ থেকে দূরে, অন্য ভাষার মানুষের মধ্যে, আর তারপর আমার এমন এক জীবন শুরু হ'লো যেখানে আমাকে অন্যেরা প্রায় কখনোই ভুলতে দেয় না যে আমি একজন উর্ধ্বতন রাজপুরুষ, ন্যায়দণ্ডধারী বিচারক—তখন আমি আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছিলুম এই ভেবে যে এবারে নিজের সম্পূর্ণ রূপান্তর আমি ঘটাতে পেরেছি। চাকুরে হিশেবে, প্রকাশ্য জীবনে, যা-কিছু ভঙ্গি আমার কাছে প্রত্যাশিত, সেগুলি এমন নিখুঁতভাবে আয়ত্ত ক'রে নিলুম যে কয়েক বছরের মধ্যেই 'ব্রিলিয়েন্ট অফিসার' ব'লে আমার খ্যাতি ছড়ালো প্রাদেশিক গবর্নর থেকে নয়াদিল্লির দপ্তর পর্যন্ত। আমি মনে-মনে হাসলাম নিজের এই সাফল্যে, আমার কৌতূহল হ'লো অন্য দিক থেকে নিজেকে যাচাই করতে, আমি আমার অতীত থেকে কত দূরে স'রে আসতে পারি, তা নিয়ে একটা পরীক্ষা করার ইচ্ছে হ'লো। পরীক্ষা—মানে এক্সপেরিমেন্ট। তার ল্যাবরেটরি আমার মন, যন্ত্রপাতি আমার বুদ্ধি, তার গিনি-পিগ্ আমার স্ত্রী।

সম্ভব কি ছিলো না আমার পক্ষে নেলিকে ভালোবাসা? নিশ্চয়ই ছিলো। মন করলে কী না পারা যায়—আর এ তো কিছু শক্ত কাজ নয়, শুধু নেলির রূপযৌবনকে সেটুকু সুযোগ দেয়া যাতে শরীরের মন্থন থেকেই উঠে আসতে পারে সেই সুঘ্রাণ নবনী, চলতি কথায় যাকে 'স্নেহ' ব'লে থাকে। স্নেহ—মমত্ববোধ—যার বেশি অধিকাংশ স্বামী-স্ত্রীর ভাগ্যে আখেরে জোটে না—সেটুকু জন্মাবার বাধা ছিলো কী? আমাদের হৃদয় তো ম'রে যায় না সত্যি, শুধু ঘুমিয়ে পড়ে মাঝে-মাঝে, কখনো কোনো আঘাতে জেগে ওঠে আবার—কিন্তু বাইরে থেকে কেউ তাকে জাগাতে পারে না, যদি না আমরা নিজেরা ইচ্ছুক হই, সহযোগী হই, এগিয়ে আসি। নেলিকে ভালোবাসতে আমি ইচ্ছুক ছিলুম না, প্রতিরোধী ছিলুম—এই আরকি মোদ্দা কথাটা। এমন একটা উপায় আছে যাতে কামনার বিহ্বল মুহূর্তেও হিম হাওয়া বইয়ে দেয়া যায়—তা হ'লো নিজেকে দু-অংশে ভাগ ক'রে নেয়া, সেই উপনিষদের দুই পাখির মতো। তা-ই করেছিলুম আমি; যখন আমি নেলির আলিঙ্গনে গ'লে যাচ্ছি, ঠিক তখনই আর-একজন আমি পাশে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছে দু-জনকে, বাঁকা ঠোঁটে মিটিমিটি হেসে, হয়তো দেড়-ইঞ্চি-ছাই-সমেত একটা মোটা চুরুট মুখে নিয়ে—দেখছে এক মজার ডনকুস্তি, সার্কাসের খেলা, হাঁপানি, গোঙানি, মুমূর্ষুর মতো নাভিশ্বাস—কিন্তু বড্ড পুরোনো, গতানুগতিক, ক্লান্তিকর। পরে আমি যখন স্ত্রীলোক নিয়ে খেলা শুরু করলুম তখনও ঠিক এই ব্যাপার। ছেনে, ছিঁড়ে, খুঁড়ে, মেঝেতে গড়িয়ে, দু-পাশে দুই মেদ-মাংস ঢাকা কঙ্কালকে নিয়ে রাত কাটিয়ে—আমার উদ্ভাবিত নানারকম উৎকট ব্যায়াম থেকে যেটুকু সুখ আমি নিংড়ে নিতে পেরেছি তা হ'লো নিজেকে লক্ষ করার, ধাপে-ধাপে নিজের উন্নতির দৃশ্য দেখার বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তৃপ্তি। উন্নতি বইকি—আমি ঘৃণা লজ্জা ভয় কাটিয়ে উঠছি, ম'জে আছি ঠিক তা-ই নিয়ে আমার রুচির পক্ষে যা বীভৎস, আমার মধ্যে মহাপুরুষের সম্ভাবনা আছে—অন্তত আরো অনেক কিছু সম্ভব হ'তে পারে আমাকে দিয়ে। কিন্তু না—তুমি একটু বেশি জাঁক করছো, রণজিৎ—এই খেলার রসদ জোগাতে এখনো বিস্তর

বেগ পেতে হয় তোমাকে, তুমি এখনো সাংসারিক সুবুদ্ধি হারাওনি, কটাক্ষপাত করো না কোনো কমিশনারের পত্নী কিংবা কর্নেলের বান্ধবীর দিকে, কোনো রাজাবাহাদুরের হীরেয়-মোড়া রক্ষিতাকেও এমনতর আনতশির অভিবাদন জানাও যেন তিনি কোনো মহীয়সী মহিলা—এক কথায়, যাঁদের সঙ্গে তোমার সামাজিক মেলামেশা নির্ধারিত—ক্লাব, রেসকোর্স, বল্‌-নাচের আসর, গবর্নরের পার্টি, এই সব নির্দিষ্ট জায়গায় যাঁরা কিছুক্ষণের জন্য হৃদ্যতার চর্চা ক'রে থাকেন—তাঁদের সঙ্গে একেবারে নিয়মমাফিক মাজাঘষা ব্যবহার ক'রে তুমি নেলির সাজানো বাড়ির মতোই নিষ্কলঙ্ক রেখেছো বাইরের জগতে তোমার সুনাম।—এমনি, নিজেকে আমি গঞ্জনা দিই মাঝে-মাঝে, শাসন করি, উস্কে দিই, যখন কোনো ছুতো ক'রে আমি নেলিকে পাঠিয়ে দিই তার মা-র কাছে, আর আমার অনুগত অর্থগৃধ্নু ভৃত্যেরা সন্ধের পরে এনে হাজির করে কোনো গাঁয়ের বধূ, বন্য যুবতী, কোনো হাভাতের কুমারী মেয়ে, বা হয়তো কোনো ধিকিধিকি-জ্বলা মধ্যবয়সী বিধবা। ভাববেন না কোনো ক্ষতি করেছি কারো, আপনাকে তো বলেছি এটা বিশুদ্ধ লেনদেনের ব্যাপার, কোনো কুমারী কান্নাকাটি করলে আমি ছেড়েও দিয়েছি (তাও খালি হাতে নয়)—যদি কোনো অন্যায় ক'রে থাকি তা করেছি শুধু নিজেরই ওপর। তবু—আমার কৌতূহল, আমার আত্মজ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা আমাকে থামতে দেয়নি; আস্তে-আস্তে আমি নিজেই পথঘাট চিনে নিলুম, বুঝে নিলুম আমার গবেষণার উপাদানগুলো এমন-কিছু বিরল পদার্থ নয়; যে-কোনো শহরে ছুটি কাটাতে যাই—দেশের মধ্যে, বা য়োরোপে—সেখানেই দেখি লীলাসঙ্গিনীরা অপেক্ষা ক'রে আছে আমার জন্য—কেউ দশ টাকা পেলেই খুশি, কারো খাঁকতি পঞ্চাশ পাউন্ড, এই যা তফাৎ। বিনামূল্যে, শুধু খানিকটা ফুর্তির জন্য যারা রাজি, তাদের আমি সভয়ে এড়িয়ে চলেছি, পাছে পরে অন্য ধরনেব ঋণশোধের দাবি তুলে আমাকে ফাঁসিয়ে দেয়। আমি হ'য়ে উঠেছিলুম ততটাই চতুর যতটা নেলি ছিলো সরল ও বিশ্বাসপ্রবণ; তাই এটা সম্ভব হ'লো যে সে কিছুই টের পায়নি, যদিও দেশভ্রমণের সময় আমার সঙ্গেই থাকতো সে।

একেবারে টের পায়নি? সন্দেহ করেনি কিছু? তা কি সম্ভব? কিন্তু আমার ওপর আস্থা হারালে সে বাঁচবে কী নিয়ে? তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা ছিলো তার বিয়ে, ভেবেছিলো সেটাই বহু শাখাপ্রশাখায় ছড়িয়ে গিয়ে, পল্লবিত হ'য়ে, তাকে আশ্রয় দেবে বাকি জীবনের মতো, তা-ই সে দেখেছে তার মায়ের জীবনে, তার সমবয়সী অনেক মেয়ের জীবনেও—হঠাৎ তার বেলায় যে একটা ব্যতিক্রম ঘটতে পারে তা যেন তার ধারণার বাইরে। তাই সে প্রাণপণে ঠেকিয়ে রাখে সন্দেহ, অনবরত নিজেকে বোঝায় যে সব ঠিক আছে, আঁকড়ে থাকে তার বালিকাবয়সের 'সুখে'র ধারণাকে, একই অমূল তরুতে জল ঢালে প্রতিদিন। আর আমি এদিকে নিজের কাছে দোষী হ'য়ে আছি এখন পর্যন্ত গোপনতার দুর্বলতাটুকু কাটাতে পারছি না ব'লে—যদি নেলির কাছেই লুকিয়ে রইলুম তাহ'লে আমার এক্সপেরিমেন্টের চরম ফলাফল তো জানা যাবে না, যে-আত্মজ্ঞান আমি এতদিন ধ'রে অর্জন করেছি তার অংশ আমার সহধর্মিণীকে দিতে হবে, আমার কৃতিত্বের নির্ভুল প্রমাণ শুধু তারই কাছে আমি পেতে পারি। তাই, সে যখন তার সুখের স্বপ্নকে একটা মূর্ত রূপ দেবার জন্য তৈরি করলে উটকামণ্ডে এই বাড়ি, এই বিখ্যাত বাগান, তার সাধের 'আনন্দ', 'বন্‌-অ্যর'—আমি তখনই স্থির করলাম যে এই আমাব সুযোগ, আর বেশি দেরি করা চলবে না।

আমার প্রথম কাজ হ'লো হতচ্ছাড়া চাকরি থেকে কেটে পড়া। অবশ্য অন্য একটা কারণও ছিলো; ইংরেজের গৌরবরবি অস্ত যাবার পর খদ্দরধারী মন্ত্রীদের তাঁবেদারি বেশিদিন আমার ধাতে সইলো না। টিকে গেলে হয়তো স্বাধীন ভারতে ক্ষুদ্র একটি জ্যোতিষ্ক হ'তে পারতুম—কিন্তু না মশাই, পলিটিক্স আমার ঘেন্না, ওর কেউটের ছোবল একবার প্রায় খেয়েছিলুম তো। নেলিরও ও-সব বাজে ভড়ং নেই; কংগ্রেসি মহলে তার বাবার অগাধ প্রতিপত্তি তার যে কোনো কাজে লাগতে পারে, সে যে চাইলে হ'তে পারে লোকসভার সদস্য বা কোনো নিষ্প্রয়োজনীয় উপমন্ত্রী, এ-সব তার মগজেই খেলে না; স্ত্রী মা, গৃহিণীর ছাঁচেই ঈশ্বর তাকে গড়েছেন। আমি অকালে রিটায়ার করাতে খুশি হ'লো সে; ভাবলে এবার দ্বিতীয় যৌবনে দ্বিতীয় হানিমুন শুরু হবে। সেজন্যে যা-কিছু দরকার

সবই আছে আমাদের: স্বাস্থ্য, অর্থ, অবসর, আর এই নতুন রমণীয় পরিবেশ। ছেলেরা একবার উড়ে এসে মাসখানেক কাটিয়ে গেলো আমাদের সঙ্গে, খুব তারিফ করলে বাড়ি দেখে; তারা বিলেতে ফিরে যাবার পর তাদের প্রতিটি মন্তব্য (যার অধিকাংশ আমি স্বকর্ণে শুনেছিলাম) আমাকে আরো অনেকবার নেলির মুখে শুনতে হ'লো। যৌবনপ্রাপ্ত ছেলেদের দেখে সে মুগ্ধ; কবে তারা দেশে ফিরবে, বিয়ে করবে, নাতি-নাৎনি উপহার দেবে আমাদের, এই নতুন স্বপ্নে রঙিন হ'য়ে উঠলো তার দিনগুলি। যে-পুত্রবধুরা এখনো অনিশ্চিত, যে-পৌত্রপৌত্রীরা এখনো শুধু দুর্নিরীক্ষ্য জীবাণু ছাড়া কিছু নয়, তাদের কল্পনাতেই নেলি দেখলাম উচ্ছল—এমনি অসাধারণ তার স্নেহবৃত্তি। তা হোক, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু তার এই স্বপ্নের অংশ আমাকেও দিতে চায় সে, যেন ওটা এমন কোনো অভিনব সুখাদ্য যা থেকে আমি বঞ্চিত হ'লে তার নিজের ভোগ সম্পূর্ণ হয় না। সব মিলিয়ে এমনি তার ভাবভঙ্গি যেন হঠাৎ কোনো মলয়সমীরণ ব'য়ে যাচ্ছে, আমার পুরোনো চোখেও মাঝে-মাঝে নেলিকে সুন্দর মনে হয়, বাগানের গোলাপগুলো যেন সুখের পরামর্শ দেয়, এমনকি বহুকাল পরে নেলির সঙ্গে কয়েকটা প্রণয়রজনীও যাপন করলুম। কিন্তু তারপরেই ভয় হ'লো পাছে শেষ মুহূর্তে সত্যি হেরে যাই, পাছে এই অফুরন্ত অবসরের সুযোগে নেলি আমার অনেক দিনের অনেক কষ্টের সাধনাকে বানচাল ক'রে দেয়। পেরেকের মাথায় হাতুড়ি ঠুকে দিলাম এবার, বাড়িতে মেয়েমানুষ আনা শুরু হ'লো। নেলির চোখের ওপর, নাকের তলা দিয়ে।

আমি অবশ্য এমন ব্যবস্থা করেছিলুম যাতে হঠাৎ একটা ভাঙচুর না হয়, ব্যাপারটাকে রসিয়ে-রসিয়ে অনেকদিন ধ'রে উপভোগ করতে পারি। প্রথমে জ্বলন্ত কয়লা, তারপর স্নিগ্ধ মলম। পায়ে প'ড়ে ক্ষমা চাওয়া, 'তুমি দেবী, আমি নরকের কীট,' দু-চার ফোঁটা চোখের জল পর্যন্ত। নেলি জানে—এতদিনে জেনেছে—আমার সত্যিকার চেহারাটা কী, তবু আমার মুখের কথা চোখের জল একেবারে উড়িয়ে দেবে এমনও তার মনে জোর নেই। মাঝে-মাঝে বিরাম দিই—যাতে নেলি একেবারে আশা ছেড়ে না দেয় আমার বিষয়ে, যাতে আবার কোনো দুপুর-রাতে আধো-ঘুমে-শোনা মেয়েলি গলায় বেলেল্লা হাসি ছোরা হ'য়ে বিঁধতে পারে তাকে। তারপর আবার ক্ষমা চাওয়া, মূর্ছিতের মুখে বারিসিঞ্চন। এমনি চালাতে লাগলুম আমার চমৎকার টেকনীক—পর-পর ব্যভিচার আর ন্যাকামি। অবাক হচ্ছেন? ভাবছেন শ্রীমতী নলিনী কী ক'রে সহ্য করেছিলো, কেন বিদ্রোহ করেনি, চ'লে যায়নি, আইনের শরণ নিয়ে কঠিন কোনো শাস্তি দেয়নি আমাকে? সে, রতনদাসের কন্যা, কিসের অভাব তার, কার তোয়াক্কা রাখে সে, আমাকে পথের ভিখিরি ক'রে ছেড়ে দেয়াও তার সাধ্যে কুলোতো না তা নয়। কিন্তু কেন কিছু করেনি, এ-বাড়ি ছেড়ে চ'লে যায়নি পর্যন্ত, তার কারণটা তো সোজা। না—সে পারবে না, কিছুতেই জানাতে পারবে না জগৎকে, তার নিকটতম মা-বাবাকেও না, যে তার সুখের প্রাসাদ চুরমার হ'য়ে ভেঙে গেছে, কোনোদিন গ'ড়েই ওঠেনি, যে তার সমস্ত জীবন একমুঠো ধুলোর চেয়ে বেশি কিছু নয়, আর সে নিতান্ত অবোধ ব'লেই এতদিন তা বোঝেনি। এই পরাজয়—যা আমি তাকে অবশেষে মেনে নিতে বাধ্য করলুম—তা অন্যের কাছে উদ্‌ঘাটন করতে পারলে না সে; সেই অপমান এড়াবার জন্য মৃত্যু বেছে নিলে। না—আত্মহত্যা নয়, বরং আত্মরক্ষা, জীবের সেই আশ্চর্য ক্ষমতা, যা শরীরের মধ্যে ফলিয়ে তোলে কোনো রোগ, মনের কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য। নিঃশব্দ হ'য়ে গেলো, নিঃসাড় হ'য়ে গেলো, যেন আস্তে-আস্তে ফুরিয়ে এলো মোমবাতির মতো—ডাক্তারি ভাষায় তার নাম হ'লো মারাত্মক অ্যানেমিয়া। আমি তার চিকিৎসা নিয়ে হুলুস্থুল করেছিলুম, আনিয়েছিলুম বম্বাই আর কলকাতা থেকে বিশারদ—কিন্তু তার শরীর কোনো সহযোগিতা করলে না চিকিৎসার সঙ্গে, নেলি তার বিদ্রোহ ঘোষণা করলো—কোনো কথায় নয়, কাজে নয়—তার রক্তে অফুরন্তভাবে বেড়ে-চলা শ্বেতকণিকায়, বিকল হৃৎপিণ্ডে, যকৃতের অক্ষমতায়। জানেন, এক রাত্রে—আমি যখন অসহ্য সময় কাটাবার জন্য কালো গোলাপের গবেষণা করছি, অনেক রাত্রে হল্যান্ড থেকে আনানো বই পড়ছি এই ঘরে ব'সে—সে এসেছিলো আমার কাছে। বই থেকে চোখ তুলে হঠাৎ দেখলাম তাকে। গায়ের রং একেবারে বদলে

গেছে—কালো, ছাইয়ের মতো, গালে ঠোঁটে কোথাও এক ফোঁটা লাল নেই। 'আমাকে তাড়িয়ে দিলে কেন?' পরিষ্কার বাংলায় বললে কথাটা, খুব নরম গলায়। তিনবার, চারবার তাকে দেখলাম; সে আসে, দাঁড়ায় আমার কাছে এসে, আমার চোখে চোখ রেখে ঐ একটি কথা ব'লে মিলিয়ে যায়। অগত্যা কাগজে বিজ্ঞাপন দিলুম একজন হাউসকীপারের জন্য; গায়ত্রীকে খুঁজে পাওয়া গেলো।

আজ্ঞে? আমি হত্যাকারী? আগেভাগেই রায় দেবেন না মশাই, পুরো মামলাটা শোনেননি এখনো। আসুন কিছুক্ষণের জন্য ঢাকায় ফিরে যাই। আপনার আমার যৌবনের দিনে। আপনি কি যুবক আছেন এখনো? ...আজ্ঞে? ঐ তো ভুল করছেন, বয়স দিয়ে বার্ধক্যের হিশেব হয় না। আমার বার্ধক্য শুরু হয়েছিলো পঁচিশ বছরে—বহুদিন ধ'রে একই রকম বৃদ্ধ আছি, দেখে বোঝা যায় না, কিন্তু আমি জানি আমার পঁচিশে আর পঁচানব্বুইতে কোনো তফাৎ নেই। তবু—আমিও একবার যৌবন পেয়েছিলাম—কয়েক বছর, কয়েক মাস, অন্তত কয়েকটা দিনের জন্য। সেই বকুল-ভিলার দুপুরবেলাগুলো। মাস আশ্বিন. আকাশ মিনিটে-মিনিটে বদলে যাচ্ছে। কালো মেঘ, রুপোলি মেঘ. ঝিরিঝিরি বৃষ্টি আর রোদ, কখনো এমন আশ্চর্য নীল যেন ওপিঠে সত্যি স্বর্গ আছে, কখনো আবার বিকেলের দিকে ঝোড়ো। আর যেন ঐ দূর, প্রকাণ্ড আকাশেরই একটি ঘনিষ্ঠতর রূপের মতো, মিতু। তার আস্তে-আস্তে, টেনে-টেনে কথা বলার ধরন। তার কোমল সলজ্জ ভাব, নিজের কিছুটা অংশ গুটিয়ে রাখার, লুকিয়ে রাখার ভঙ্গি। তার ঈষৎ দূরত্ব, তার চোখ, কালো, ধূসর, বাদামি, কিন্তু ঝোড়ো নয় কখনো—শান্ত, ভরপুর। কী-কথা বলতাম? মনে নেই কী-কথা, কেমন ক'রে কেটে যেতো ঘণ্টাগুলো তাও মনে নেই। সন্ধেবেলা আছে তার গানের রেওয়াজ, লোকজনের আনাগোনা—আমি তাই দুপুরবেলাটা বেছে নিয়েছি; সোজা কলেজ থেকে দেড়টা নাগাদ পাড়ি দিই ওয়াড়িতে, যখন বেবিয়ে আসি পশ্চিমের সূর্য বকুল-ভিলার লম্বা ছায়া ফেলেছে সামনের কম্পাউন্ডে। যে-প্রশ্নটা আমাকে দোলা দিয়েছিলো কয়েকদিন আগে, তার উত্তর আমার হৃদয়ের শব্দে বেজে উঠলো, কোনো প্রথম অন্তঃসত্ত্বার মতোই আমি অনুভব করলাম আমারই মধ্যে নতুন এক জন্মের সূচনা—শুধু ইচ্ছা নয়, কল্পনা নয়—বাস্তব, নির্ভুল, বাড়ন্ত : প্রেম।

কিন্তু আমাদের জীবনে বিশুদ্ধ কিছু নেই—সবই মিশোল, যাকে আমরা মহৎ বৃত্তি বলি তারও মধ্যে কিছু-না কিছু ভেজাল থাকেই। এক অদম্য আবেগ আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে যায় মিতুর কাছে—কলেজের ক্লাশ শেষ হওয়ামাত্র; কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরে যখন বেরিয়ে আসি তখন আর আমি ভাবে বিভোর প্রেমিক থাকি না, আমি টের পাই নিজের মধ্যে কোথায় একটু বিরক্তিবোধ—ক্লান্তি, অতৃপ্তি। প্রকৃতি, আমার অনুমতির অপেক্ষা না-ক'রে আমার মধ্যে কাজ ক'রে যাচ্ছে; একটি তরুণী, যে বুলবুলের মতো অত্যন্ত বেশি খোলামেলা হ'য়ে তার নারীত্বকে বরবাদ করে দেয়নি, বরং সেটাকে কিছুটা আড়ালে রেখে আরো প্রস্ফুট ক'রে তুলেছে—তেমনি একটি তরুণীর সঙ্গলাভের ফলে আমার রক্তে ফণা তুলছে কামনা—মাঝে-মাঝে এমনকি একটু অসহিষ্ণুভাবে। এটা নিজের কাছে স্বীকার করতে আমি লজ্জা পাই, চেষ্টা করি ভুলে থাকতে—ভুলে থাকা কঠিনও হয় না, কেননা সেই একই সময়ে, একই কারণে, অন্য একটা ঘটনাও ঘটছিলো, যাকে হয়তো বলা যায় আমার সত্তার সম্প্রসারণ। আমি যেন খুলে যাচ্ছি, ছড়িয়ে যাচ্ছি চারদিকে, হ'য়ে উঠছি নিজের চাইতে অনেক বড়ো, অনেক ভালো, ক্ষমতাশালী, যেন পৃথিবীতে সকলেই আমার বন্ধু। আমি বুলবুলকে আর অপছন্দ করি না, কেননা আমার কাছে নারী হিশেবে তার অস্তিত্ব আর নেই, নারীত্বের সব লক্ষণ, সব সুঘ্রাণ আমার জন্য গুচ্ছ ক'রে ধ'রে রেখেছে অন্য একজন। বুলবুল আমাকে যা-কিছু বলেছিলো সব আমি ক'রে দিয়েছি—তাদের মেলার জন্য ঐতিহাসিক চার্ট, 'মুক্তধারা'র জন্য গোরা-চরিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ, 'নৃত্যনাট্যের জন্য স্বদেশী গানও বেছে দিয়েছি—আর এগুলো ক'রে উঠতে কোনো কষ্টও হয়নি আমার, বিরক্ত লাগেনি—এখন সবই যেন সহজ হ'য়ে গেছে আমার কাছে। অমূল্যকেও আর অসহ্য লাগে না আমার—বকুল-ভিলায় সব সময় যাওয়া-আসা করে সে, যাকে বলে 'বাড়ির ছেলের মতো'; মিতুর মা-বাবাকে মাসিমা-মেসোমশায় ডাকে, দরকারমতো ফরমাশ খাটে তাঁদের, মিতুর ওস্তাদজীকে

কোনো খবর পাঠাবার দরকার হ'লে সাইকেল নিয়ে তড়িঘড়ি ছুটে যায়, মিতুকে কিনে এনে দেয় সদরঘাট থেকে 'প্রবাসী', 'বিচিত্রা', 'নবশক্তি'। আমি, আমার প্রেমে-পড়া নতুন ব্যক্তিত্ব নিয়ে, অমূল্যর বোকামি আর বদ রসিকতাগুলোকে ক্ষমা করতে পারি এখন, একটু করুণাও করি তাকে—যেহেতু মিতুর শুধু একটুখানি আশে-পাশে থাকার জন্য তাকে এত বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছে, এত বিভিন্নভাবে কাজে লাগতে হচ্ছে এই পরিবারের। আমি এমনকি ইতিমধ্যে আর্থার জোন্সের কানেও অমূল্যর কথাটা তুলেছি—আমার এক বন্ধুকে কোনোরকম একটা সুপারিশ দিতে সে পারে কিনা—সে-কথা বলতে পারার মতো সদ্ভাব জোন্সের সঙ্গে আমার হয়েছে ততদিনে। সপ্তাহে একদিন বাকী দু-দিন বিকেলবেলাটা আমি জোন্সের সঙ্গে কাটাই; আমার জিভ থেকে কিছুতেই কেন 'th'-এর ঠিক উচ্চারণ বেরোয় না, আর সে-ই বা কেন, সংস্কৃত জানা সত্ত্বেও, 'ঠ' ও 'ঢ' উচ্চারণ করতে সীমাহীনরূপে অক্ষম, এই ধরনের কয়েকটা মৃদু ঠাট্টা চলে তার সঙ্গে আমার; কিন্তু তার বাংলা পড়ায় আমি যেটুকু সাহায্য করছি সে-তুলনায় অনেক বেশি ফেরৎ পাই তার কথাবার্তা থেকে, কেননা এমন কোনো কথাই সে বলে না যা ব্র্যাডলি অথবা ম্যাথু আর্নল্ড থেকে তুলে নেয়া: আর তার কাছে ধার-পাওয়া বইগুলো প'ড়ে-প'ড়ে সাহিত্য বিষয়ে আমারও ধারণা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আমি চেষ্টা করছি একেবারে অন্য ধরনে কবিতা লিখতে, ভাবছি যে অমিত রায় হয়তো ঠাট্টার ছলে ঠিক কথাই বলেছিলো, সত্যি এখন 'কড়া লাইনের খাড়া লাইনের' রচনা চাই—অমিত রায়ের কথাটাকে মনে-মনে সংশোধন ক'রে নিয়ে এও ভাবি (কেননা নারীর মুখ আমার কাছে এখন জগতের এক অপরিহার্য উপাদান) যে গোলাপফুল বা নারীর মুখ যদি 'ন্যুরেলজিয়ার ব্যথা' হ'য়ে পাঠকের মনে পৌঁছয় তাহ'লেই হয়তো মনের ভাবটা ভাষায় ঠিক ধরা পড়ে; এই যে আমার মিতুকে ভাবলেই বুকের মধ্যে টনটন করে, এটাকে বলার জন্য বোধহয় এমন ভাষাই দরকার, যা আঁটো, ঘন, ধারালো, খুব বেশি মসৃণ নয়, ঈষৎ ভাঙাচোরা, যেন আবেগের চাপে কথাগুলো মাঝে-মাঝে ফেটে যাচ্ছে। আমার মনের মধ্যে, আমার ভালোবাসারই সহোদর যেন, আস্তে-আস্তে একটা আশা গ'ড়ে উঠছে যে আমি শেষ পর্যন্ত লেখকই হবো—হ'তে পারবো: হঠাৎ আমার সঙ্গে এই যে একজন সাহিত্যরসিক ইংরেজের আলাপ হ'য়ে গেলো, এতেও যেন তারই ইঙ্গিত পাচ্ছি।

আরো একজনের সঙ্গে আমি কিছুটা ঘনিষ্ঠ হলাম এই সময়ে—সে কাজল। কিন্তু এর পেছনে একটু বেদনার ইতিহাস আছে।—বেদনা? না কি সেই মামুলি গল্প, বাংলাদেশের সনাতন সম্পত্তি, মরুভূমিতে গোলাপের মতো নারী-হৃদয়ের ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস? আমি নেলিকে যা করেছিলুম তার পেছনে ছিলো আস্ত একটা জীবনদর্শন—আমার কোনো স্বার্থ নয়, অন্য কারো প্রতি আসক্তি নয়, বিশুদ্ধ কৌতূহল শুধু—প্রেম, বিবাহ, পরিবার ইত্যাদি বিখ্যাত ভূতগুলোকে মেরে ফেলার চেষ্টা। কিন্তু সব সময় সে-রকম কিছু থাকে না—নেহাৎ ঘটনাচক্রে কষ্ট পায় লোকেরা, সমাজ অনড় ব'লে, পাহারাওলারা দুর্ধর্ষ ব'লে। যারা শুধু প'ড়ে-প'ড়ে মার খায়, প্রতিবাদ করে না, প্রতিবাদ করতে শেখেনি কখনো—বলুন তো, তাদের জন্য কি ব্যথিত হওয়া যায়, তারা কি সহানুভূতিরও যোগ্য?...আজ্ঞে? আমার স্ত্রীর কথা? তা তার সপক্ষে অন্তত এটুকু বলার আছে যে সে আমাকে ভালোবাসতো, আর মানুষের হৃদয়ের ওপর তার নিজেরও হাত নেই। তার সঙ্গে কাজলের তুলনা করলে খুব ভুল করবেন। কাজলের জীবন কোন দিক থেকে ভেঙেছিলো, তা আপনি অনেক আগেই বুঝেছেন নিশ্চয়ই? বুঝেছেন, যে জলপাইগুড়ির সেই বাস্-লাইনের মালিক, যাঁর টাকায় তিনি বিলেত যাবার সাধ মিটিয়েছিলেন, তাঁর কন্যাটির প্রতি একেবারেই মন ছিলো না ফাটক-মামার? যে খুব সম্ভব তিনি বিদেশে পাঁচ বছর ব্রহ্মচর্য পালন করেননি, হয়তো বা কোনো 'ধিঙ্গি মেম' তাঁর পুরোপুরি গিলেও নিয়েছিলো? এটা তো কিছু শক্ত কথা নয়, বাড়ির বয়স্করা চোখের পলকে বুঝে নিয়েছিলেন, মামা প্রথম ফেরার পর দু-দিনের জন্য বেড়াতে এসেও টের পেয়েছিলেন আমার দিদি—শুধু আমারই, অনেকদিন পর্যন্ত, কিছু খেয়াল হয়নি। ছেলেমানুষ—সদ্যযুবক—সাংসারিক ব্যাপারে কোনোই খেয়াল নেই—এ-ই আমি ছিলুম তখন। বাড়ির সবাই ভালোবাসে আমাকে—সেটা উল্লেখযোগ্য নয়,

স্বতঃসিদ্ধ, আমাকে কিছু দিতে হবে না বিনিময়ে, অন্য কারো হৃদয়ের দিকে তাকাতে হবে না—এই ছিলো আমার ধারণা তখন। কী স্বার্থপর জীবনের সেই বসন্তঋতু—কবিতায় বিখ্যাত ও বন্দিত যৌবন! তবু—হঠাৎ একদিন কাজলকে আমি তার নিজের দিক থেকে দেখতে পেলাম, যখন ফটিক-মামা ঘোষণা করলেন যে তাঁকে শিগগিরই কলকাতায় ফিরতে হবে। মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—'সে কী? সামনে পুজো, এটা কি একটা যাবার সময়?' কিন্তু মা-র অনুরোধ, অনুনয়, চোখের জল কোনো কাজে লাগলো না; ফটিক-মামাকে যেতেই হবে, তাঁর ব্যাবসার পার্টনারেব চিঠি পেয়েছেন কলকাতা থেকে—জরুরি কাজ। তাছাড়া কী-বা হবে ঢাকায় ব'সে থেকে, এতদিন ধ'রে এত চেষ্টা ক'রে মাত্র তিনজনকে রাজি করাতে পেরেছেন তাঁদের কোম্পানির শেয়ার কিনতে—একজন অনাদিবাবু, আর অনাদিবাবুরই সূত্রে আরো দু-জন—কাউকে বোঝানো যায় না যে ইলেকট্রিক বাল্‌ব এমন একটি দরকারি জিনিশ যে এই ব্যাবসায় ফেল হবার কোনো কথাই ওঠে না, দিশি বাল্‌ব বিলিতির চাইতে শস্তা হবে, লোকেরা স্বদেশী ব'লেও কিনবে তাঁদের 'জ্যোতি' বাল্‌ব—এর পরে পাখাও তৈরি হবে, পাখার নাম হবে 'মলয়'—দু-বছরের মধ্যেই ডিভিডেন্ড দিতে পারবেন তাঁরা। কিন্তু না—ঢাকার লোকেরা ইন্ডাস্ট্রি-মাইন্ডেড নয়, ঝাড়কে-ঝাড় চাকুরে, সেই মামুলি 'গাভ্‌মেন্ট পেপার' ছাড়া কিছু বোঝে না, জমিদার-শ্রেণী বংশানুক্রমে তুলোর বাক্সে জীবন কাটাবার ফলে পাই-পয়সা রিস্ক নিতে নারাজ, আর সাহা-বসাকদের মধ্যে যারা লাখ টাকার কারবারি তারা এখনো ঘরে-ঘরে সিঁদুর-লেপা গণেশ-বসানো সিন্দুকে পাঁজা-পাঁজা নোট রেখে দেয়, আর ব্যাবসা বলতেও তাদের মৌরসিপাট্টা শাঁখা শাড়ি মনোহারি দোকানই বোঝে শুধু। কী হবে এই দেশের—যেখানে মেডিয়াভল অন্ধকার বিরাজমান, যেখানে এখনো কারো-কারো ধারণা যে ইলেকট্রিক আলোয় চোখ খারাপ হয়, যেখানে বিপুল পরিমাণ টাকা গণেশের ভুঁড়ির মধ্যে প'চে যায়, আর মেয়েদের গায়ের কিংবা হাতবাক্সের সোনা হ'য়ে আটকে থাকে? 'ভারত-ললনাদের স্বর্ণালংকার কেড়ে নিয়ে ইণ্ডাস্ট্রিতে খাটানো উচিত, তা'হলে দেশে আব অভাব থাকবে না।' শেষ কথাটা ব'লে ফটিক-মামা সমর্থনের জন্য আমার দিকে তাকালেন। কিছুদিন আগে হ'লে আমি তৎক্ষণাৎ সর্বান্তঃকরণে একমত হতুম, কিন্তু সে-মুহূর্তে আমাব চোখে ভেসে উঠলো কাজল-মামির চাঁদের মতো নেকলেসটা, যার চুনি-পান্নার ঝিলিকের সঙ্গে কাজলের চোখ একবার অন্তত পাল্লা দিয়েছিলো। সেদিন, মিতুর জন্মদিনের সন্ধ্যায়, আমি যখন মহিলাদের সঙ্গে ব'সে চা খাচ্ছিলুম, আমার চোখ কয়েকবার স'রে এসেছিলো কাজলের মুখ থেকে ঐ নেকলেসটাতে, আমি ভাবছিলাম তার গলা আর বুক আরো কত সুন্দর দেখাচ্ছে ওটার জন্য, আর ঐ ঠাণ্ডা সোনা আর পাথরগুলোতে কি সঞ্চারিত হচ্ছে না তার শরী'রের কিছুটা উত্তাপ? তাছাড়া, ততদিনে আমি টের পেয়েছি যে আমার মা, তাঁর অগাধ স্নেহবৃত্তি সত্ত্বেও, কাজলের প্রতি তার স্বামীর উদাসীনতার জন্য মনে মনে কাজলকেই দায়ী করেন—আড়ে-ঠারে কোনো কথায় তা হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে; সে নাকি যথেষ্ট 'চৌকশ' নয়, স্বামীর ওপর দাবি খাটাতে জানে না। আমার মনে হয় এটা অবিচার, আর এজন্যেও আমি কাজলের কিছুটা পক্ষপাতী হ'য়ে পড়েছি, এমন কিছু বলতে চাই না যা ঘুরিয়ে-ফিরিয়েও তার বিরুদ্ধে যেতে পারে। তাই, ফটিক-মামার কথার উত্তরে আমি একটু সাবধানে জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো ফটিক-মামা, তবে মেয়েদের সুন্দর দেখালে ভালো লাগে তা মানবে নিশ্চয়ই?' ''Ah, young man!' ব'লে ফটিক-মামা আমার পিঠ চাপড়ে হেসে উঠলেন, কিন্তু তারপরেই যেন মুহূর্তের জন্য তাঁর মুখে একটা হালকা ছায়া পড়লো, নিচু গলায় বললেন, 'গয়না ছাড়াই সুন্দর দেখায় এমনও আছে।

আমি বরাবরই রাত-জাগা পাখি; সে-রাতেও জেগে-জেগে একটা চিঠি লিখছিলাম। টুকটাক আওয়াজ আসছে পাশের ঘর থেকে—সেটা ফটিক-কাজলকে ছেড়ে দিয়েছেন আমার মা—মামা কাল চ'লে যাচ্ছেন, তাঁর জিনিশপত্র গোছানো হচ্ছে। গোছগাছ হ'য়ে যাবার পর অনেকক্ষণ কেটে গেলো, চারদিক নিশুতি নীরব, আমার ঠোঁট নিঃশব্দে নড়ছে, কলম চলছে, এমন সময় আবার কথাবার্তা শুরু হ'লো পাশের ঘরে, মামার বিরক্তি-ভরা ঘুমেল গলা শুনলাম, 'আঃ! থামো তো!

ঘুমুতে দাও।' যাকে বলা হ'লো সে কিন্তু থামলো না, গুনগুন ক'রে কী-যেন-কী বলতে লাগলো—মনে হ'লো কিছু একটা তর্কাতর্কি হচ্ছে। স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয় কথা শোনা উচিত নয়, এই চিঠিটা অনেক বেশি জরুরি, কিন্তু মাঝে-মাঝে দু-জনেরই গলা চ'ড়ে উঠছে ব'লে নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে সেই শান্ত নীরব আবহাওয়া, যা এই চিঠি লেখার জন্য দরকার আমার। 'গয়নার টিপি,' 'তোমার বাবা', এই কথা দুটো ফটিক-মামার গলায় বেশ রাগি আওয়াজে ছুটে এলো আমার কানে—তবে কি উনি সত্যি কাজলের গয়নাগুলো নিয়ে যেতে চাচ্ছেন ব্যাবসায় তা খাটাবার জন্য, না কি চাচ্ছেন কাজল তার বাবার কাছ থেকে স্বামীর জন্য মূলধন এনে দিক? 'তোমার লজ্জা করে না' বলে কাজল একটা কথা আরম্ভ করলো, তার ঐ নরম গলা অত তীক্ষ্ণ হ'তে পারে আমার ধারণা ছিলো না (যেমন মিতুর কথা শুনে ভাবা যায় না গাইবার সময় তার গলা কেমন অতি সহজে উঁচু থেকে আরো উঁচু পর্দায় ঢেউ তুলে-তুলে খেলা করতে পারে)—কিন্তু এর পরে কাজল কী বললো বোঝা গেলো না। আরো কিছুক্ষণ নিচু গলায় কথা চললো দু-জনের মধ্যে—নিচু, চাপা, কিন্তু তলায়-তলায় তীব্র (আমি পাশের ঘর থেকেও তা টের পাচ্ছিলাম)—তারপর হঠাৎ একটা কথা যেন কাজলের গলা চিরে বেরিয়ে এলো—'বলো, ঐ ছবিটা কার! বলতেই হবে!' ফটিক-মামা বাঘের মতো গর্জন ক'রে উঠলেন, 'চুপ!' তারপর নিথর স্তব্ধতা নামলো।

আমি বিরক্ত হলাম চিঠি লেখায় এই ব্যাঘাত ঘটলো ব'লে, কিন্তু ওটাতে তক্ষুনি আবার মন দিতে পারলুম না, আমার মনে প'ড়ে গেলো কয়েকদিন আগেকার একটা ছোট্ট ঘটনা। সাইকেলটা সারাতে দিয়েছিলাম সেদিন, হেঁটে-হেঁটে ফিরছিলাম রাত দশটা নাগাদ, বাড়ির কাছে এসে দেখি, আমার বিশ-পঁচিশ গজ আগে-আগে ফটিক-মামাও চলেছেন। আস্তে হাঁটছিলেন, একটু ক্লান্তভাবে, মাথা নিচু ক'রে। আমি তাড়াতাড়ি পা চালালাম তাঁকে ধ'রে ফেলার জন্য, কিন্তু ফটিক-মামা একটা ল্যাম্পোস্টের তলায় থামলেন, পকেট থেকে কিছু-একটা বের ক'রে দেখতে লাগলেন মন দিয়ে—ছোটো এক টুকরো কাগজ, কোনো চিঠি বা ফোটো বোধহয়—এত মন দিয়ে পড়ছিলেন বা দেখছিলেন যে পেছনে আমার পায়ের শব্দ তিনি শুনতে পেলেন না, আমার 'ফটিক-মামা' ডাক শুনে এত বেশি চমকে উঠলেন যে কাগজটা তাঁর হাত থেকে প'ড়ে গেলো। বিদ্যুৎবেগে সেটা তুলে নিয়ে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'রঞ্জু, আড্ডা দিয়ে ফিরছিস? চল শিগগির, বাড়ি চল, জবর খিদে পেয়ে গেছে, আর দিদি বোধহয় মাংসের রেজেলা করেছেন আজ।' কথা বলার এই ধরনটাই ফটিক-মামার পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু সে-মুহূর্তে সেটা ঠিক যেন মানালো না তাঁকে, যেন চেষ্টা ক'রে হাসছেন, তাঁর কপালে আমি চিন্তার রেখা দেখলাম, অন্তত এটুকু স্পষ্ট বোঝা গেলো যে আমার সঙ্গে দেখা হবার আগে তিনি বাড়ি ফিরে খাওয়ার কথা ভাবছিলেন না। ব্যাপারটা আমি পরের দিনই ভুলে গিয়েছিলাম অবশ্য, কিন্তু সে-রাতে শুয়ে-শুয়ে মনে পড়লো—হঠাৎ মনে হ'লো আমি যেন চকিতে দেখতে পেয়েছিলাম মামার হাত থেকে প'ড়ে-যাওয়া কাগজটাকে—কোনো ফোটোগ্রাফ, কোনো মুখ, কোনো মেয়ের মুখ?

কখনো বা মা-কে দেখতাম ফিশফিশ ক'রে কিছু বলছেন ফটিক-মামাকে—কোনো সাংসারিক সদুপদেশ দিচ্ছেন বোধহয়—আর আমার ফুর্তিবাজ বিশালবক্ষ ভোজনবিলাসী ফটিক-মামা কপালে হাত দিয়ে কী যে ভাবছেন বোঝার উপায় নেই। মাঝে-মাঝে বিদেশী টিকিটওলা চিঠি আসে মামার নামে—সেটা খুবই স্বাভাবিক, নিশ্চয়ই নানা দেশে বন্ধুবান্ধব আছে তাঁর, কিন্তু মিনু যখন জমাবার জন্য স্ট্যাম্পগুলি চেয়ে নেয়, আমি দেখি সেগুলো সবই জর্মানির। মামাকে অনেকবার বলতে শুনেছি যে-দেশটা তাঁর সবচেয়ে ভালো লেগেছিলো তা হ'লো জর্মানি; গ্যেটের বিষয় বেশি কিছু না-জানলেও জর্মানদের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ; আর, যদিও পলিটিক্স নিয়ে এমনিতে কখনো কথা বলেন না, তবু এক-একদিনের কাগজ পড়ে উত্তেজিত হ'য়ে ওঠেন।—'দেখছিস রঞ্জু, কী-রকম গুণ্ডামি চালিয়ে যাচ্ছে হিটলার। কী অত্যাচার ইহুদিদের ওপর! এই দৈত্যকে আরো বাড়তে দিলে কিন্তু সর্বনাশ হ'য়ে যাবে। নাঃ, আর-একটা যুদ্ধ না-হ'য়ে উপায় নেই, দেখছি।' সে-সময়ে, আমাদের দেশের অন্য

অনেকেরই মতো, হিটলারকে নিয়ে আমি চিন্তিত ছিলুম না; তাই আমি ধরতে পারিনি মামার এ-সব কথায় এই সত্যিকার দুশ্চিন্তার সুর কেন, যদি ধরা যাক জর্মানির কোনো ক্ষতিও করে হিটলার, তাতে তাঁর কী এসে যায়? আমি জানতাম আমাদের ইংরেজ-বিদ্বেষের একটা উল্টো পিঠ হলো জর্মান-প্রীতি, এঞ্জিনিয়রদের পক্ষে জর্মানি একটি আদর্শ দেশ তাও শুনেছিলাম; কিন্তু এটা আমার মাথায় কখনো খেলেনি যে জর্মানির সঙ্গে অন্য কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে ফটিক-মামার, বা হিটলাব বিষয়ে ভীত হবার কোনো ব্যক্তিগত কারণ। এও লক্ষ করিনি যে বিদেশী চিঠি যেদিনই আসে সেদিনই একটু বিষণ্ণ হ'য়ে থাকেন ফটিক-মামা।

এবারেও কাজলকে নিয়ে যাবার কথা তুলেছিলেন আমার মা, খুব মৃদুভাবে অবশ্য। ফটিক-মামা সহাস্যে বলেছিলেন, 'আর ভাবনা নেই দিদি, এবারে গুছিয়ে আনা গেছে, ফ্যাক্টরির কাজ শুরু হ'লেই বাড়িটা বদলাবো, তারপর—' মা বাধা দিয়ে বললেন, 'আমি তো তোকে কতবার বলেছি, বাড়ি বদলাবার জন্যে ভাবিস না—দুটি প্রাণীর সংসার তো, ওতেই চমৎকার চ'লে যাবে। কাজল এখন পাকা গিন্নি হয়েছে, ছবির মতো গুছিয়ে নেবে, দেখিস।' মামা একটা পচা রসিকতা করলেন এর উত্তরে, 'ওঃ দিদি, তোমার কাজলের প্রশংসা শুনে-শুনে জেরবার হয়ে গেলাম, এর পরে আমার হিংসে হবে কিন্তু বলে দিচ্ছি!'—একটু থেমে, একই রকম হালকা সুরে—'শোনো দিদি, আমি ভাবছি কাজলের গয়নাগুলো আমার সঙ্গে নিয়ে যাবো এবার—ও-সব জবড়জং ভারি গয়নার দিন তো আর নেই, কলকাতায় নিয়ে চমৎকার হালকা হালফ্যাশনের ডিজাইনের গড়িয়ে দিলে হয় না?' মা একটু ভেবে বললেন, 'তা বেশ, কিন্তু তুই পুরুষমানুষ ও-সবের তো বুঝিস না কিছু, স্যাঁকরা যদি ঠকিয়ে দেয় তোকে? বরং এখানে আমাদের গদাধর স্যাঁকরা পুরোনো লোক, ওর হাতের কাজও খুব পরিষ্কার, আর তাছাড়া কাজলের নিজের পছন্দমতো ডিজাইন হওয়া চাই তো।' মামা একটু গম্ভীর হ'য়ে বললেন, 'বেশ, যা ভালো বোঝো।' একটু আগে যে-ক'টা কথা দৈবাৎ আমাব কানে এসেছিলো, তার সঙ্গে এমনি কয়েকটা তুচ্ছ ব্যাপার মিলিয়ে নিতে-নিতে যেন একটা সন্দেহের ছায়া পড়লো আমাব মনে, কিন্তু এ নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবলাম না আমি, ভাবতে ইচ্ছেও করলো না, যেহেতু মনে-মনে আমি ক্ষুব্ধ ছিলাম মিতুকে লেখা চিঠিটা আজ রাত্রে শেষ হ'লো না বলে।

পরের দিন আমি স্টেশনে এলাম মামাকে তুলে দিতে; মীটার-গেজের ছোট্ট ট্রেনটা যখন টিকশ-টিকশ করে টিকাটুলির বাঁকে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো, তখন একটা গভীর নিশ্বাস পড়লো আমার। রোজ এগারোটা-পঞ্চাশে ঢাকা স্টেশন থেকে ছাড়ছে এই ট্রেন, তৈরি থাকছে নারানগঞ্জের ঘাটে স্টিমার—কেন আমি একটা টিকিট কেটে চেপে বসি না, পরের দিন ভোরবেলা নামি না কেন গমগমে আধো-অন্ধকাব মস্ত-বড়ো-ঘড়ি-বসানো শেয়ালদা স্টেশনে, সেই শহরে, সময় যেখানে বত্রিশ মিনিট এগিয়ে আছে, ভোরের রোদে চিকচিক করে জলে-ধোয়া অ্যাস্‌ফল্টের রাস্তা, যেখানে সব বই, সব পত্রিকা কিনতে পাওয়া যায়, লোকেরা পরিষ্কার উচ্চারণে বাংলা বলে, আর—সবচেয়ে বড়ো কথা—যেখানে মিতু আছে এখন? এর চেয়ে সহজ আর কী হ'তে পারে, কেন যাই না, কেন আমি বঞ্চিত রাখছি নিজেকে? ভাগ্য যেন খেলা করছে আমাকে নিয়ে; ঠিক এই সময়ে—যখন বকুল-ভিলার দুপুরগুলো হয়ে উঠছে আমার অস্তিত্বের কেন্দ্র, দিন-রাত্রির অন্য সব সময়ের তলায় তারই অনুরণন আমি শুনতে পাচ্ছি—ঠিক তখনই মিতুর ডাক পড়লো কলকাতায়, দিলদার নওরোজের নতুন গান রেকর্ড করার জন্য। নওরোজ, যাঁর কবিতার আমি ভক্ত, আর এডিসনের উদ্ভাবিত ঐ গোল, ভঙ্গুর চাকতিগুলো, যা গেঁথে দিয়েছে আমার স্মৃতিতে কনক দাশের গলায় 'আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে' লাইনটা—তারা আমার এমন শত্রুতা করবে কে জানতো? যদি চ'লে যাই কোনো ছুতো করে কলকাতায়, তারপর মিতুর সঙ্গে একই তারিখে ফিরে আসি? ভোরবেলা গোয়ালন্দের স্টিমার, নদীর বুকে শরতের কুয়াশা, ট্রেনে-রাত-জাগা ক্লান্তির পরে চায়ের আস্বাদ, রেলিঙে ভর দিয়ে দেখা পদ্মার জল, যা রোদ্দুরে রুপোলি হ'য়ে উঠলো, একতলায় এঞ্জিন-

ঘরের গরম ধোঁয়া, সারেঙের ঘণ্টার নির্দেশ, সিংহের মাথার মতো পিস্টনগুলোর অবিরাম ওঠা-পড়া, জলের গন্ধ, স্টিমারের চাকায় ফেনিয়ে-ওঠা ঘূর্ণি, খালাসিদের রান্নার গন্ধ, ধোঁয়া-ওঠা গরম ভাতের সঙ্গে মুর্গির ঝোল, কোনো স্টেশনে তক্তা পাতার সময় খালাসিদের সুরেলা চীৎকার—এই সব দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ যদি তার সঙ্গে ভাগ ক'রে নিতে পারি, তার চেয়ে বড়ো সুখ আর কী হ'তে পারে আমার জীবনে? পদ্মার বুকে দোতলা স্টিমার—'এমু' কিংবা 'অস্ট্রিচ' যার নাম, যেখানে আমরা সাত ঘণ্টার জন্য ছুটি পেয়েছি অন্য সব দায়িত্ব থেকে, যেখানে সময় কাটানো ছাড়া আর-কিছুই করার নেই, আর চারদিকে অনেক-কিছু আছে যা অভ্যেস এখনো পচিয়ে দেয়নি—সেখানে নিশ্চয়ই মিতুর আরো একটু কাছে আমি আসতে পারবো, যেন আমার মুঠোর মধ্যে প্রায় এসে যাবে সেই রহস্য, যার জন্য আমি তাকে ভালোবাসছি, অথচ সঠিক কোনো উপলব্ধি এখনো আমার ঘটেনি। কিন্তু না—মিতু লিখেছে তার রেকর্ডিঙের তারিখ আগামী সপ্তাহে স্থির হয়েছে, তার বাবাও তাঁর রোগীদের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন, তাদের ফিরতে আর বেশি দেরি হবে না।

'মিতু লিখেছে' : এই কথাটা কতই না সহজে বলা হ'য়ে গেলো, কিন্তু—তারা চ'লে যাবার পর তৃতীয় দিনেই যখন মিতুর প্রথম চিঠি এসে পৌঁছলো আমার হাতে, তখন পত্রপ্রাপকের সঙ্গে নিজেকে পুরোপুরি একাত্ম ক'রে তুলতে আমার কেটে গিয়েছিলো সারাটা সন্ধ্যা আর অর্ধেক রাত্রি। আমি আশা করিনি সে চিঠি লিখবে, একেবারেই আশা করিনি তাও নয়—হয়তো আমরা চোখে-চোখে কিছু বলেছিলাম, কিন্তু সেই নিঃশব্দ বিনিময়কে স্পষ্ট ভাষায় রচিত, নির্ভুল নাম-ঠিকানা লেখা চিঠিতে তর্জমা ক'রে নেবার মতো সাহস আমার ছিলো না। শুধু বার্তা বা সারাংশ নয়, চিঠিটার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমার পক্ষে গবেষণার বিষয় হ'য়ে উঠলো যে-ভাবে একজন সমালোচক কোনো কবিতার ছন্দ, উপমা, শব্দব্যবহার, কমা-সেমিকোলন, আর সম্ভব হ'লে তার পরিত্যক্ত পূর্বলেখনগুলো সব খুঁটে-খুঁটে পরীক্ষা করেন, আর অমনি ক'রেই টেনে বের করেন তার নিহিত অর্থ, যা শব্দগুলো অর্ধেক লুকিয়ে রেখেছে পাঠককে আরো উত্তেজিত করার জন্য, ঠিক সেইভাবে আমি লক্ষ করলাম নীলচে রঙের কাগজের ওপর ভায়োলেট কালিতে আঁকা অক্ষরগুলিকে, একটু বড়ো-বড়ো, ডানদিকে হেলানো হাতের লেখা, তার ই-কার উ-কারের লম্বা টানগুলো, যা ওপরের ও নিচের কথাটাকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যেন এক নতুন লিপি রচনা করছে, কমার বদলে ড্যাশ-এর অত্যধিক ব্যবহার (বোধহয় কোনো সদ্য-নামজাদা তরুণ লেখকের প্রভাব), দুটো-একটা মজার বানান ভুল (যেমন চিহ্নে মূর্ধণ্য ণ দিয়ে অকারণে 'সুস্থে' একটা য-ফলা বসিয়ে দেয়া)—এই সব-কিছু জোগান দিলো আমার সুখে, আমার রসবোধকে উস্কে দিলো, আর তাছাড়া, যে-কথাগুলোকে সে লেখার পরে দুটো আড়াআড়ি লাইন টেনে কেটে দিয়েছে, তা থেকেও আমি বুঝে নেবার চেষ্টা করলাম সে তার মনের ভাব কতটা লুকিয়েছে, আর সেই লুকোনো ভাবটা কী। আমি খুব আস্তে ছুঁলাম চিঠিটাকে, নিচু হ'য়ে গন্ধ নিলাম, হালকা করে ঠোঁটে ছোঁয়ালাম একবার, যেন ঐ এক টুকরো কাগজ খুব কোমল ও মূল্যবান কোনো সামগ্রী, যেন আমি হাত দিয়ে জোরে চাপ দিলে হঠাৎ লেখাগুলি শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে।

আমি যে ভাবছিলাম মিতুর সঙ্গে এক স্টিমারে ভ্রমণ করতে পারলে আশ্চর্য কোনো ফলাফল ঘটবে, সেটাই হয়তো ভুল আসলে—স্টিমারেও অন্য লোক থাকবে, অন্য কাজ, খিদে পাবে, বেলা বেড়ে উঠলে ঘুমও পেতে পারে ক্লান্তিতে, ডেক্-এর বাক্স-তোরঙ্গ শিশু নিয়ে শুয়ে-ব'সে-থাকা সারি-সারি যাত্রীর ভিড়ে চলাফেরাও সহজ হবে না—মিতুর বা তার মা-বাবার চেনা অন্য যাত্রীও বেরিয়ে পড়া অসম্ভব কী? তাছাড়া এমন যদি হয় যে অনাদিবাবুরা সেকেন্ড ক্লাশের যাত্রী, তা'হলে আমি তো সেখানে পৌঁছতেই পারবো না। কিন্তু চিঠি—চিঠি একেবারেই ব্যক্তিগত, অন্তরঙ্গ, চিঠি আর আমার মধ্যে জগতের কোনো সাধ্য নেই কোনো দেয়াল তোলে—সকলের চোখের আড়ালে, দূরে-দূরে থেকেও, মিলিত হয়েছে দু-জন মানুষ, মুখোমুখি, যেন প্রায় ছুঁতে পারছে

পরস্পরকে। অন্য একজন মানুষের সঙ্গে সত্যিকার সহৃদয় সংস্পর্শ—কত কম ঘটে সেটা আমাদের জীবনে; কত বিরল সেই মুহূর্ত, যখন সে আর আমি ছাড়া আর-কেউ নেই, আর দু-জনেরই মন এক সুরে বাঁধাল, এক পথের যাত্রী। কত বিপদ—কত খানা খন্দ গর্ত খাদ ঘিরে রেখেছে আমাদের; দুই বন্ধুর মধ্যে একজন যখন 'ওঅর অ্যাণ্ড পীস' প্রায় শেষ ক'রে এনে টলস্টয় ছাড়া আর-কিছু ভাবতে পারছে না, ঠিক তখনই অন্য জন কোনো অভিনেত্রীর চতুর্থ বিবাহ নিয়ে উত্তেজিত ; রেস্তোরাঁয় ব'সে প্রেমিকটি যখন নিভৃত আলাপের সুযোগ খোঁজে, তখন প্রেমিকাটির কান ও মন কেড়ে নেয় মঞ্চনিঃসৃত গীতবাদ্য; তরুণী স্ত্রী যখন বিকেলে চুল বেঁধে স্বামীর অপেক্ষায় ব'সে আছে, স্বামী তখন বাড়ি ফিরে শোনায় তার এইমাত্র দেখা টেনিস খেলার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, যায় বিন্দু-বিসর্গ তার স্ত্রীর মাথায় ঢোকে না;—এমনি ক'রে, তুচ্ছতম কারণে, অনবরত ব্যর্থ হ'য়ে যার মনের সঙ্গে মন মেলাবার চেষ্টা। কিন্তু চিঠির এ-সব বিপদ নেই;—আমরা যাকে ভালোবাসি তার নির্যাস যেন ধরা পড়ে তাতে, শুধু আমাদেরই জন্য; মাথা ধরা, খিদে পাওয়া, অন্য লোকের সংসর্গ, অন্য কোনো উপসর্গ—এই সব আকস্মিকতার উৎপাত থেকে তা মুক্ত; এমনকি বলা যায় সেটা দৈবের অধীন পর্যন্ত নয়, যদি না অবশ্য ডাকবিভাগ বিলি করতে ভুল করে।

আর-একটা কথা আমার মনে হয়েছিলো মিতুর প্রথম চিঠি প'ড়ে, পরে যার অনেক প্রমাণ পেয়েছি আমার জীবনে। মানুষের উপস্থিতি আর চিঠি প্রায়ই একরকম হয় না; অনেকের সঙ্গেই মেলামেশা ক'রে বোঝা যায় না তার চিঠি কেমন হবে; কখনো এমন হয় যে সাক্ষাৎমতো যাকে বেশ ভালো লেগেছিলো, তার একটি চিঠি পাওয়ামাত্র তার বিষয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলি আমরা, কেননা তার রচিত শব্দগুলো ফাঁস ক'রে দিয়েছে তার এমন কোনো বোকামি বা ন্যাকামি বা অশিক্ষা বা স্থূলতা, তার মধ্যে যার অস্তিত্ব আমরা সম্ভব ব'লে ভাবিনি। আবার এমনও হয় যে কথা শুনে যাকে খুব সাধারণ ভেবেছিলুম, চিঠিতে সে নিজেকে প্রমাণ করে বুদ্ধিমান ও সুরসিক ব'লে। আর যাদেব উপস্থিতি ও চিঠি সমান ভালো, তাদেরও একটি নতুন ব্যক্তিত্ব বেরিয়ে আসে চিঠিতে—তারই উদাহরণ আমাব কাছে এখন মিতু। আমি দেখলাম, মিতুর ব্যবহার যতটা লাজুক তার হাতের লেখা ততটাই নিঃসংকোচ, মুখের কথায় সে অত্যন্ত বিনীত হ'লেও তার লিখিত ভাষায় দুর্বলতা নেই—'আপনাব চিঠির আশায় থাকবো'—এ-রকম একটা কথা মুখ ফুটে সে কিছুতেই বলতো না আমাকে। চিঠিও সাহিত্যজাতীয় জিনিশ—অন্তত সম্ভাব্য সাহিত্য (মাদাম দ্য সেভিন্যে শুধু তাঁর কন্যাকে চিঠি লিখেই সাহিত্যিক ব'লে গণ্য হয়েছেন) ;—চোখের তাকানো, কণ্ঠস্বরেব ওঠা-নামা, হাতের বা ভুরুর ভঙ্গি—ভাব-প্রকাশের এ-সব গৌণ উপায় সাহায্য করছে না ব'লে শুধুমাত্র ভাষা দিয়েই সব বলতে হয় চিঠিতে; তাছাড়া পরস্পরকে দেখা যাচ্ছে না ব'লে, কোনো কথা শুনে লাল বা ফ্যাকাশে হবার মতো কোনো শ্রোতা মুখের সামনে ব'সে নেই ব'লে, বলা একটু সহজও হয়। মিতুর চিঠি পেয়ে সেই রাত্রেই জবাব লিখলাম আমি, বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পরে, রাত দুটো অবধি জেগে; পরের দিন কলেজে যাবার পথে নিজের হাতে ডাকে দিলাম রমনার পোস্টাপিশে। অন্য এক স্বাদ এলো আমার জীবনে, যেন আমাকে ফুঁড়ে নতুন এক হাওয়া বইছে, আমাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে এক নতুন রোমাঞ্চ ও উত্তেজনা। মিতুর জন্য আমার যে-অভাববোধ, তারই তলা দিয়ে সুখের ফল্গু বইতে লাগলো। আমি বিকেলে ডাকপিয়নের আশায় বাড়ি সামনে পাইচারি করি (এমনও হ'লো পর-পর দু-দিনে দুটো চিঠি এলো মিতুর); খাম খোলার আগেই ভেবে ফেলি আমার উত্তরের প্রথম লাইনটা (যদিও লিখতে ব'সে তা অনিবার্যভাবে বদলে যায়); আর যেদিন সে নীলচের বদলে শাদা কাগজে আর ভায়োলেটের বদলে কালো কালিতে চিঠি লিখলে, সেদিন আমার তেমনি বিস্ময়ের অনুভূতি হ'লো, যেমন হয়েছিলো সবুজ শাড়ি হলদে ব্লাউজে সূর্যাস্তের আলোয় তার নতুন এক চেহারা দেখতে পেয়ে।

একদিন কলেজ থেকে দেরি ক'রে ফিরেছি: কাজল-মামি আমার হাতে একটা পুরু খাম দিয়ে বললেন, 'মিতুর চিঠি—তা-ই না?' সাধ্যমতো উদাসীনভাবে বললাম, 'তা-ই তো মনে হচ্ছে।' 'এইমাত্র

দিযে গেলো ডাকপিযন,' খানিকটা জবাবদিহি দেবাব ধবনে কাজল আবাব বললো, 'তোমাকে বুঝি বোজই চিঠি লিখে মিতু?' 'না, না, বোজ লিখবে কেন। এই—মাঝে-মাঝে।' আমাব কেমন একটু অপ্রস্তুত লাগলো কাজলেব সামনে, হঠাৎ মনে পডলো ফটিক-মামা কলকাতা থেকে কাজলকে কখনোই চিঠি লেখেন না—মাঝে-মাঝে আমাব মা-কেই লেখেন দু-চাব লাইন, আব এটা এ-বাডিব সবাই এমনভাবে মেনে নিযেছে যে এ-নিযে কেউ কোনো মন্তব্য কবে না পর্যন্ত, আমাবও এ-মুহূর্তেব আগে মনে হযনি এটা কত অস্বাভাবিক, সাধাবণ সাংসাবিক দিক থেকেও কত বডো অন্যায়। 'আব তুমি বুঝি পাওযামাত্র জবাব দাও?' ব'লে কাজল ঠোঁটেব কোণে হাসলো। আমি একটু লাল হযে বললাম, 'আমাব এই এক বদভ্যাস জানো তো, কিছু লেখাব জন্য হাত নিশপিশ কবে, আব কিছু না পাবি তো চিঠিই সই।' কাজলেব মুখ গম্ভীব হ'লো, আমাব চোখে চোখ ফেললো মুহূর্তেব জন্য, তাবপব হঠাৎ—কিন্তু অতর্কিতে না সুচিন্তিতভাবে— তাব ঠোঁট থেকে আস্তে একটি প্রশ্ন খ'সে পডলো, 'তুমি মিতুকে বিযে কববে?' মুহূর্তেব জন্য যেন আলপিন ফুটলো আমাব সাবা মুখে নিজেকে সামলে নিযে বললাম, 'কী যে বলো, আমাব মনেব ত্রিসীমানায বিযেব চিন্তা নেই। তুমি বুঝি ভাবো কাউকে চিঠি লিখলেই তাকে বিযে কবতে হবে?' থাক থাক, আব বলতে হবে না, যে বকম লাল হ'যে উঠেছো তাতেই সব বোঝা গেছে। চা খাবে এসো।'

এব পব থেকে কাজল মাঝে-মাঝেই আমাকে শোনাতে লাগলো মিতুব সঙ্গে আমাব বিযে হ'লে কী ভালোই না হয। 'চমৎকাব মানাবে তোমাদেব দু-জনকে—আহা, এক্ষুনি কেন বিষ্ণু এম এ পাশ কবে বেবোতে তো বেশি দেবি নেই তোমাব, চাকবিও পাবে এখন থেকে ঠিক হযে থাক না। আমি নিশ্চযই জানি মিতুব মা বাবাব আপত্তি হবে না, তাব তাই চাচ্ছেন মনে মনে আব আমবাই বা এব চেযে ভালো পাত্রী কোথায পাবো তোমাব জন্য? কী বলো ওবা ফিবে এলে ওঁদেব কানে তুলে দেবো নাকি কথাটা? মিতুকে তোমাব বৌ ব'লে ভাবতে আমাব এত আনন্দ হয যে কী বলবো। অন্য কেউ এ ধবনেব কথা বললে আমি ভীষণ বেগে যেতাম, হযতো আব কথাই বলতাম না তাব সঙ্গে, কিন্তু- যেহেতু মিতুব হৃদযেব ভাষা আমি তাব চিঠিব মধ্যে শুনতে পেযেছি, তাই যেন আমাব কাজলেব কাছে অপবাধী লাগছে নিজেকে যেন কাজলেব প্রাপ্য ভালোবাসাই তাব বদলে আমাব কাছে চ'লে এলো—এমনি একটা অস্বস্তি আমি অনুভব কবি, সে যখন আমাব কাছে মিতুব সঙ্গে আমাব বিবাহিত জীবনেব বঙিন ছবি আঁকে, বা বলা যায প্রেমে পডাব ফলে আমাব চবিত্রেব এটুকু উন্নতি হযেছে যে কাজলকে আমি করুণা কবতে শিখেছি এখন, তাকে প্রশ্রয দিতে আমাব আপত্তি নেই, মিতুকে আব আমাকে নিযে তাব জল্পনা কল্পনা শুনতে আমাব খুব খাবাপও লাগে না সত্যি বলতে—হযতো এই ভাবটাকেই চলতি ভাষায বলে 'সহানুভূতি'। আমাব ভালো লাগে ভাবতে যে অন্য একজন মানুষ আমাব ভালোবাসাকে সমর্থন কবে, ভালো লাগে যে সেই অন্য মানুষটিকে আমি কিছুটা সুখীও কবতে পাবি দু দণ্ড তাব কাছে ব'সে গল্প ক'বে। এমনি ক'বে কাজলেব সঙ্গে আমাব অন্য একটা সম্পর্ক গ'ডে উঠলো, আমি কলেজ থেকে এলে সে-ই আমাকে চা দেয, খাবাব দেয , আমি (তাকে সুখী কবাব জন্যই) তাকে বলি আমাব রুমালে তাব ও-ডি-কলোন থেকে কযেক ফোঁটা মাখিযে দিতে, একদিন বলাব পবে বোজই আমাব রুমালে সুগন্ধ পাই। মিতু যেদিন লিখলে তাবা সামনেব শুক্রবাব ফিবছে, সেদিনও আনন্দেব আতিশয্যে খববটা কাজলকে না-জানিযে পাবলুম না। কিন্তু তাব পবেব দিনই—পুজো প্রায এসে গেছে তখন- -ঢাকায হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধলো।

১৩

এই যে, চা দেবী আবির্ভূতা হয়েছেন—আসুন। আমার প্রথম প্রেম, আর এখন পর্যন্ত সবচেয়ে টেকসই। শুরু করেছিলুম আট বছর বয়সে, তারপর এখনো, বিকেল পাঁচটা নাগাদ, আমার অ্যাঙ্কহলে ডোবানো স্নায়ুগুলো কাৎরে ওঠে কয়েক ফোঁটা ট্যানিন রসের জন্য। ধন্য বলি এই অভ্যেসকে যা পঞ্চাশ বছরেও আমাকে ছেড়ে যায়নি, অনেক দুঃখের দিনে বন্ধুর মতো যে পাশে ছিলো। ধরুন না সেই দাঙ্গার সময়—আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই? য়ুনিভার্সিটি ছুটি হ'যে গেছে, শহর অচল, রোজ রাত্রে যুদ্ধের হুংকার, আর্তের চীৎকার, আগুনের উল্লাস, ঘুম নেই। আমি ঢাকার ছেলে, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা নতুন নয় আমার কাছে, কিন্তু আগে যাকে মনে হ'তো শুধু উপদ্রব, বিশ্রী একটা অসুবিধের ব্যাপার, এবারে তা রীতিমতো যন্ত্রণা দিচ্ছে আমাকে—যেহেতু এরই জন্য দিনের পর দিন মিতু আটকে আছে কলকাতায়। কাগজের হেডলাইন, ইতিহাস—আর আমাদের জীবন : এ-দুয়ের মধ্যে গরমিলটা কখনো ভেবে দেখেছেন কি? পার্ল হার্বরে যেদিন বোমা পড়লো, সেদিনও কি হিরোশিমায় ছিলো না অনেক তরুণ-তরুণী, যারা বাগ্‌দত্ত, বা সেই তারিখেই বিয়ে হ'লো যাদের—তারা কি পলকের জন্যও ভেবেছিলো ঐ ঘটনার কী-রকম সব ফলাফল হ'তে পারে তাদের জীবনে, আর তাদের সন্ততিরও জীবনে? তেমনি, আমাকেও যদি কোনো ভবিষ্যৎদ্রষ্টা তখন বলতেন, 'এই দাঙ্গার শেষ পরিণাম কী, জানো? ভারতবর্ষ তিন টুকরো হ'য়ে যাবে!'—তাহ'লে আমিও ক্লান্তির নিশ্বাস ফেলে জবাব দিতাম, 'তা যা-ই হোক, কিন্তু মিতু কবে ফিরবে তা বলতে পারেন?' যাদের ঘর পুড়ছে, স্বামী-পুত্র খুন হচ্ছে, যার রাস্তায় ছোরা খেয়ে হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না, যে-চাষির বৌ শহরে সব্জি বেচতে এসে আর ফেরেনি, যে-সব দিন-মজুরের রোজগার বন্ধ—আমার যন্ত্রণা তাদের জন্য নয়, নিজের অসহায়, আশাহীন, হাত-পা-বাঁধা অবস্থার জন্য—যেহেতু আমার এমন কোনো সাধ্য নেই যে বাঞ্ছিতার ফিরে আসার তারিখটিকে একটি দিনও এগিয়ে আনতে পারি। যে-মানুষ প্রেমে পড়েছে, যে-তরুণ কবির প্রথম বই ছাপা হচ্ছে, যে-বিজ্ঞানী কোনো আবিষ্কারের প্রান্তে এসে রাত ভ'রে ল্যাবরেটরিতে অনিদ্র—এদের কাছে দাঙ্গা, যুদ্ধ, বিপ্লব ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনা ছাপিয়ে তখনকার মতো বড়ো হ'য়ে ওঠে তাদের প্রেম, কবিতার বই, প্রায়-খুঁজে-পাওয়া নতুন জ্ঞান। যারা চায় আদর্শ সমাজ গ'ড়ে তুলতে, যেখানে কারোর কোনো অহংবোধ আর থাকবে না, থাকবে শুধু এক সর্বব্যাপী সমষ্টিচেতনা, তাদের তাই প্রথমেই লক্ষ্য হওয়া উচিত কবিতার হত্যা, ভালোবাসার ধ্বংস; জ্ঞানের স্পৃহা বা সৌন্দর্যপ্রীতির মতো প্রবণতা—যা মানুষকে অন্যদের থেকে আলাদা করে দেয়—তার অবলুপ্তি। কিন্তু এ-সব কথা তখন আমি ভাবিনি, আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে ছিলো অনুপস্থিত মিতু। সেই ক্লান্ত বিরস বিরক্তিকর কুৎসিত দিনগুলোর মধ্যে শুধু কয়েকটা মুহূর্ত সহনীয় হ'য়ে উঠতো, যখন কাজল আমাকে এনে দিতো, অসময়ে, জেগে-ব'সে-থাকা বা ঘুম-ভেঙে-যাওয়া কোনো রাত্তির দুটোতে হয়তো—সোনালি সুগন্ধি এক পেয়ালা চা। শুধু চায়ের জন্য নয়, কাজলের সঙ্গও আমার ক্রমশ একটু বেশি ভালো লাগছিলো—অন্য কোনো সঙ্গী নেই ব'লে, আর কিছু করার নেই ব'লে। দিন-রাত আটকে আছি বাড়ির ক-খানা দেয়ালের মধ্যে—বড়োজোর পাড়ার মধ্যে একটু পাইচারি করি কখনো বা, কিন্তু কাছাকাছি কথা বলার মতো কেউ নেই, কোনো লেখাতে মন বসে না, বই পড়াতেও অরুচি ধ'রে যাচ্ছে—এ-রকম অবস্থায় কাজলকেই আমার মনে হচ্ছে মরুভূমিতে ছোট্ট ওয়েসিসের মতো, অন্তত একটু ছায়া, একটু জল, একটু বৈচিত্র্য। আগের মতো নিঃশব্দ আর শিথিল আর নেই কাজল, এখন সে কথা বলে, তার চলাফেরাও বেশি স্বচ্ছন্দ, সন্ধেবেলা মাঝে-মাঝে আমাকে ছাদে ডেকে নিয়ে যায় সে, আমি তাকে তারা চেনাবার চেষ্টা করি, গ্রহ আর নক্ষত্রের তফাৎ বোঝাই; কখনো বা দুপুরে খাওয়ার পর নিজের ঘরে বিছানায় গা ঢেলে না-দিয়ে আমার ঘরে ডেকচেয়ারটায় ব'সে গল্প ক'রে সে। কথাবার্তার বিষয় তার বেশি নেই, কিন্তু পাড়ার ছেলেরা—যারা রাত্রে লাঠিসোটা নিয়ে পাহারায় থাকে আর

দিনের বেলা বাড়ি-বাড়ি ঘুরে চাল ডাল শাকসব্জি জোগান দেয়—কখনো এমনকি কিছু মাছ কিংবা হাঁসের ডিম—সেই কর্মিষ্ঠ, সাহসী ও পরোপকারী ছেলেদের মুখে মুসলমান-নিধনের নিত্যি-নতুন প্ল্যান শুনে-শুনে আমি এমন অবসন্ন হ'য়ে পড়ি যে সে-তুলনায় আমার বরং ভালো লাগে কাজলের জলপাইগুড়ির বাল্যস্মৃতি, আর আমাকে আর মিতুকে ঘিরে তার ভবিষ্যতের স্বপ্ন, যাতে নিজের একটি অংশ সে তৈরি ক'রে নিতে চাচ্ছে দূতী হ'য়ে, ঘটকালি ক'রে। আমি সাবধান থাকি যাতে ফটিক-মামার কোনো প্রসঙ্গ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে না পড়ে (দাঙ্গার খবরে উদ্বিগ্ন হ'য়েও কাজলকে আলাদা কোনো চিঠি লেখেননি ফটিক-মামা, আমারও আর ভালো লাগে না তাঁর কথা ভাবতে), যাতে আচমকা কখনো আঘাত না-দিয়ে ফেলি কাজলকে। আমার এই সুশ্রী ও বঞ্চিতা আত্মীয়াটিকে দয়া করা আমার কর্তব্য, এমনি একটা দাম্ভিক মনোভাব আমি এড়াতে পারি না; আবার অন্য দিক থেকে মনে হয় আমি রীতিমতো কৃতজ্ঞ তার কাছে, যেহেতু অনুপস্থিত মিতু আর আমার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম সেতুর মতো যেন হ'য়ে আছে সে, মিতুর অভাবের কিঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণের মতো। কাজের অভাবে, শূন্যতার চাপে যখন হাঁপিয়ে উঠি, তখন আমি মাঝে মাঝে একটু খেলাও করি তাকে নিয়ে, আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝতে দিই যে অন্য দু-একটি তরুণীকেও আমার মন্দ লাগে না—এই যেমন আমাদের য়ুনিভার্সিটির বিজয়া সেন। এই খবর শুনে কাজল রীতিমতো অস্থির হ'য়ে ওঠে—প্রাগুক্ত কাল্পনিক বিজয়া সেন দেখতে কেমন, কোন ইয়ারে পড়ে, বয়স কত, চশমা আছে কিনা—তার এই ধরনের কৌতূহল আমাকে মেটাতে হয়, এম. এ পড়ে শুনে আঁৎকে ওঠে কাজল—'ওরে বাবা, তাহ'লে তো বুড়ি।' 'তা কেন—আমারই বয়সী—ছোটোও হ'তে পারে।' 'বোকা ছেলে—একুশ বছরের ছেলেরা হলো কচি ডাব, আর মেয়েরা একদম ঝুনো না'রকোল, তাও জানো না।' আমার মজা লাগলো কাজলের উপমা শুনে—'কই, তোমার তো একুশেরও বেশি, কিন্তু তোমাকে কি বুড়ি মনে হয়?' 'কী পাকা ছেলে রে বাবা! ফাজিল!' একটু লাল হ'লো কাজল, তারপর আর একটা আপত্তি খুঁজে পেলো, 'বিজয়া সেন—তার মানে বদ্যি? তাহ'লে তো বিয়ে হ'তে পারবে না।' 'কেন পারবে না? ও-সব কায়েৎ-বদ্যি কেউ আবার মানে নাকি আজকাল!' 'বলো কী তুমি? জাতে না-মিললে তো হিন্দুমতে বিয়েই হবে না।' 'তাতে কী? আইনের মতে হবে।' এবারে গম্ভীর হ'লো কাজল, একটু চুপ ক'রে বললো, 'আমি জানি তুমি বানিয়ে বলছো, বিজয়া সেন ব'লে কেউ নেই।' 'বা রে, থাকবে না কেন—রোজ দেখা হয় কলেজে, আর তুমি বলবে মানুষটাই নেই! ভালো ছাত্রী—ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হ'য়েছিলো ঢাকা বোর্ডে মেয়েদের মধ্যে।' 'আচ্ছা, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলো—আমাকে ছুঁয়ে বলো, তাহলে বুঝবো।' আমার দিকে একটি হাত বাড়িয়ে দিলো কাজল, আমি হেসে উঠলাম, সেও হাসলো তার সুন্দর আঁটো দাঁতে ঝিলিক তুলে—মিতুর প্রতি আমার নিষ্ঠায় যে সত্যি কোনো চিড় ধরেনি তা জানতে পেরে তার মন হালকা হ'লো। কিন্তু পরমুহূর্তেই যেন আশঙ্কার ছায়া পড়লো তার মুখে, হঠাৎ আমার হাত চেপে ধ'রে ব'লে উঠলো, 'বলো—কথা দাও আমাকে, মিতু ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে ভাববে না কখনো!' যে-রকম তীব্রভাবে সে বললে কথাটা তাতে আমি অবাক হলাম; তার মাংসল নরম মুঠো থেকে নিজের হাতটা আস্তে-আস্তে ছাড়িয়ে নিতে-নিতে আমার মনে হ'লো যে কাজলের জন্যই মিতু হ'য়ে উঠছে আমার জীবনে আরো বেশি বড়ো, আরো বেশি সত্য। আমার লজ্জা করলো সহপাঠিনী-সংক্রান্ত রসিকতাটা উদ্ভাবন করেছিলুম ব'লে, কাজলের চোখের দিকে তাকিয়ে যেন বিশ্বাস হ'লো যে হৃদয়ের সব আকাঙ্ক্ষা একান্তভাবে একজনকে সমর্পণ করাকেই বলে সার্থকতা। আমাকে অন্যমনস্ক দেখে কাজল বললো, 'কী ভাবছো? আজ চিঠি আসার তারিখ বুঝি? কিন্তু পিয়ন আসার এখনো সময় হয়নি।'

মিতুর চিঠি! ঐ এক নতুন ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে আমার মনে। দাঙ্গার শুরুতে শহরের এমন অবস্থা হয়েছিলো যে দু-দিন ডাক পর্যন্ত বিলি হয়নি, তারপর একই সঙ্গে তিনটে চিঠি এলো মিতুর। ঢাকা থেকে এক আত্মীয়ের টেলিগ্রাম পেয়ে তার বাবা ফেরার তারিখ পেছিয়ে দিয়েছেন—'কাগজ

পড়ে মনে হচ্ছে সাংঘাতিক ব্যাপার, আপনারা ভালো আছেন তো? খুব সাবধানে থাকবেন, বেশি আর কী বলবো। এদিকে মা-বাবা অস্থির হ'য়ে আছেন বাড়িটা খালি আছে ব'লে, লুঠতরাজ না হ'যে যায়, কেন যে এ-সব গোলমাল বাধে কে জানে। শহরের অবস্থা একটু ভালো হ'লেই আমরা আর এক মুহূর্ত দেরি করবো না।' তিনটে ছোটো-ছোটো চিঠি, প্রায় একই কথা প্রত্যেকটিতে, শেষেরটায় লিখেছে, 'পারেন তো রোজই চিঠি লিখবেন, দুশ্চিন্তায় আমি ঘুমোতে পারি না।' অনেকগুলো ডাকটিকিট পাঠিয়ে দিয়েছে চিঠির মধ্যে, যাতে ঐ বস্তুটি সংগ্রহের জন্য আমাকে বিপদের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে বেরোতে না হয়।

আমি প্রায় রোজই চিঠি লিখে চলেছি, কিন্তু ক্রমশ আমার মনে হচ্ছে আমার লেখার কথা ফুরিয়ে গেছে, মিতুর চিঠিও আর যেন আমাকে নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে না। চিঠি যা নিয়ে আমি মনে মনে এত বাড়াবাড়ি করেছিলুম, এমনকি ভেবেছিলুম উপস্থিতির চেয়েও ভালো, এখন দেখি সেটা ধোঁয়াটে ছায়ামাত্র, এক ম্লান অশরীরী বিকল্প—ক্ষণিক, আংশিক, খণ্ডিত, বা যেন এক মন্থর গোযান, যাকে ছাড়িয়ে আমার আকাঙ্ক্ষা ঘোড়ার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আমার উপলব্ধি হ'লো যে পুরো মানুষটার একটিমাত্র মুহূর্তের প্রতিনিধি হলো চিঠি সেটা লিখতে তার যে দশ মিনিট বা এক ঘণ্টা সময় লেগেছিলো, শুধু সেটুকুই আমি পেলাম ব'লে ধরা যায়—দিন-রাত্রির অবশিষ্ট সময় সে কী-ভাবে কাটায় আমি তা জানি না সে আমাকে কী-খবর দেবে কিংবা দেবে না, তা সম্পূর্ণ তারই মর্জির ওপর নির্ভর করছে। ঈর্ষা হানা দিলো আমার মনে —কলকাতায় মিতুদের যারা চেনাশোনা, তার গানের যারা ভক্ত, আর যাদের সঙ্গে এবারে নতুন আলাপ হ'লো তার ওদের সকলের প্রতি ঈর্ষা, কত হাসি আনন্দ, বন্ধুতার বিনিময় হচ্ছে নিরাপদ, সুসভ্য, হাজার আকর্ষণে ভরা কলকাতায়, যা'র সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র সংস্রব নেই, যার বদলে আমি পাচ্ছি—শুধু এক টুকরো কাগজ কয়েকটি শব্দ, কয়েকটি কঙ্কালের মতো অক্ষর। আমার চিঠি থেকে স্বাচ্ছন্দ্য চ'লে গেলো আবারো ছোটো হ'তে লাগলো দিনে দিনে, তারপর একদিন (যেহেতু প্রেমে-পড়া অবস্থাতেও মাঝেমাঝে ভঙ্গিধারণ করার লোভ হয় আমাদের) পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে একটা কৃত্রিম চিঠি লিখলাম, প্রচ্ছন্ন অভিযোগের সুরে, যেন দাঙ্গা মিটে যাবার পরেও, ইচ্ছে ক'রে, আমার কাছে অপ্রকাশ্য কোনো কারণে, বা আমার প্রতি উদাসীনতাবশত, সে ফিরতে দেরি করছে। এর উত্তর এলো -'আমরা সামনের বেস্পতিবার পৌঁচচ্ছি, তখন সব কথা হবে। আপনি কিচ্ছু বোঝেন না।'

ততদিনে প্রায় তিন সপ্তাহ তাণ্ডবের পর, পুজোর সব ক-টা তারিখ পার ক'রে দিয়ে, এক বিমর্ষ বিস্বাদ থমথমে শান্তি নেমেছে ঢাকায়। এ রকম সময়ে প্রথম যে বাড়ি ব'য়ে আমার খবর নিতে এলো, সে বুলবুল। আমি খুশি হলুম তাকে দেখে, কিন্তু তার মুখে এমন কিছুই শুনলুম না, যা আমার পক্ষে উৎসাহজনক আমি যখন এই দাঙ্গা ব্যাপারটাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করছি, ভাবছি ওটা একটা অপলাপমাত্র, দুঃস্বপ্নের মতো অলীক, যে আসলে সভ্যতাই আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা, তখন বুলবুল ওটাকে আরো বেশি বাস্তব করে তুললো কতগুলো বীভৎস ঘটনা শুনিয়ে, যার কিছু-কিছু কায়েৎটুলিতে তার স্বচক্ষে দেখা। 'ভাগ্যিস ও-রকম কিছু চোখে দেখতে হয়নি আমাকে।' আমার এই কথা শুনে বুলবুলের মুখ কঠোর হলো। 'তুমি না দেখলেই হ'লো বুঝি? তাহলেই সব ঠিক আছে?' 'তা বেঠিকটাকে ঠিক করার ক্ষমতা তো নেই আমার, তাই এড়িয়ে চলা ছাড়া উপায় কী?' 'ক্ষমতা নেই কে বললো?' আমি হেসে জবাব দিলাম, 'তোমার থাকতে পারে, আমার নেই।' 'সকলে তা-ই ভাবে ব'লেই তো এই দশা আমাদের।' এর উত্তরে আমি বললাম, 'চলো একটু বাইরে ঘুরে আসি।'

রেল-লাইন পেরিয়ে রমনায় এসে একটা নর্দমার বাঁধের ওপর বসলাম তাকে নিয়ে। কার্তিকের বিকেল, য়ুনিভার্সিটি ছুটি থাকার জন্য পথে লোক নেই, বাতাসে এক নতুন ঠাণ্ডার আমেজ, ঋতু-বদলের ইশারা। এতদিন পরে নির্ভয়ে বেড়ানো যাচ্ছে, দুশ্চিন্তা হচ্ছে না এ-কথা ভেবে যে আমাদের শরীরের একটা পৃষ্ঠদেশ আছে, যা আমাদের নিজেদের পক্ষে অদৃশ্য, যেখানে হঠাৎ কেউ ছোরা

বিঁধিয়ে দিলে আমরা ঘুরে দাঁড়াবারও সময় পাবো না। কিন্তু এই নবলব্ধ নিরাপত্তাবোধ, মাঠের ওপরে নুয়ে-পড়া প্রকাণ্ড গোল আকাশ, ঘাসের ওপরে রোদ্দুরের হলুদ—যার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমার মনে পড়ছিলো প্রি-র‍্যাফেলাইটদের কবিতা, রসেটির কোনো ছবিতে দেখা গাল-ভাঙা, গর্তে-বসা-চোখ, পিঠে-লম্বা-হলুদ-চুল-ছড়ানো মেয়েকে—সে-সবের দিকে মুহূর্তের জন্যও চোখ ফেরালো না বুলবুল, কথা বলতে লাগলো। তার কথা যেন খবর-কাগজের সম্পাদকীয়, যেন জনসভার উদ্দীপক বক্তৃতা—ফুটন্ত কেটলির মতো আবেগে ভরা, কিন্তু বিষয়বস্তু ঠিক তা-ই, যা ছাড়া এ-ক'দিন ধ'রে পাড়ায়-পাড়ায় কেউ কিছু বলেনি। আমি কি ভেবে দেখেছি কী অন্যায়, কী অত্যাচার ঘ'টে গেলো এই শহরে? দাঙ্গা তো কতবারই হয়েছে, কিন্তু এ-রকম হিংস্রতা আর কখনো দেখা যায়নি—যেন পশুর স্তরে নেমে এসেছিলো মানুষগুলো। পুজোটা পর্যন্ত হ'তে পারলো না—যার জন্য কত লোক সারা বছর ধ'রে পথ চেয়ে থাকে, সেই কয়েকটা আনন্দের দিনও বরবাদ হ'য়ে গেলো। দু-মাস পরে ঈদ—এখন থেকেই লোকেরা ভয় পাচ্ছে, পাছে আবার একটা গোলমাল বাধে সেই সময়, পাছে একটা পাল্টা জবাবের চেষ্টা হয়। কিন্তু কার দোষে এ-রকম হচ্ছে বার-বার? দায়ী কে? হিন্দু? মুসলমান? কেউ না। দায়ী তৃতীয় পক্ষ—ইংরেজ—সেই ধূর্ত শয়তান, যে একের বিরুদ্ধে অন্যকে খেলাচ্ছে, ভুলিয়ে দিচ্ছে আমাদের আসল শত্রু কে। এমনি ক'রে এ-দেশের মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে ওরা, আমাদের শেষ রক্তবিন্দু শুষে নেবে। আমি কি জানি পুলিশ কী করেছে এবার? ঘরে আগুন দেবার পেট্রল জুগিয়েছে, দাঙ্গা জীইয়ে রেখেছে কারো-কারো হাতে বল্লম ছোরা তলোয়ার তুলে দিয়ে, আবার অনেক গৃহস্থের ঘরে ঢুকে কেড়ে নিয়ে গেছে বান্নাঘরের বঁটি থেকে মশারি খাটাবার লাঠি পর্যন্ত, যা-কিছু আত্মরক্ষার জন্য কাজে লাগানো যায়। আর্মানিটোলার দিগেন মজুমদারের দুই ছেলে বাধা দিতে গিয়েছিলো, তাদের চাবুক মেরে অজ্ঞান ক'রে দিয়েছে গোরা সার্জেন্ট। ফরাশগঞ্জের শিবেশ্বর পালের পুত্রবধূ ছিলো অন্তঃসত্ত্বা, তার পেটে লাথি মেরেছে জানোয়ারগুলো। এও কি মুখ বুজে মেনে নিতে হবে? আমরা কি প্রতিশোধ নেবো না? আমরা কি ওদের বুঝতে দেবো না যে আমরাও মানুষ?

বুলবুলের মুখ লাল হ'লো, নিশ্বাস ঘন, তার বুকের দ্রুত ওঠা-পড়া আমি লক্ষ করলাম। একটু পরে নিচু গলায় বললো, 'তোমার কিছু বলার নেই, রণজিৎ? তোমার রক্ত গরম হয় না?' তার কথা শুনে আমি যেন নিজের জন্য লজ্জা পেলাম—লজ্জা, যেহেতু আমি তার উত্তেজনায় অংশ নিতে পারছি না, পারছি না প্রতিহিংসায় গরম হ'য়ে উঠতে : একদিকে তার বর্ণিত বীভৎস ব্যাপারগুলো, আর অন্যদিকে—কী বলবো?—আমার অবাধ্য অন্যমুখী মন এ-দুয়ের মধ্যে প'ড়ে গিয়ে এক অসহায় অবস্থা হ'লো আমার। তবে কি আমারও উচিত অন্য সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে ইংরেজের উচ্ছেদের জন্য প্রাণান্ত করা? তাছাড়া আর কি নেই কর্তব্যবোধের, হৃদয়বৃত্তির পরিচয়? কিন্তু আমার হৃদয় যদি অন্য কথা ব'লে, তাহ'লে? আমার মনে পড়লো সেই যেদিন জোন্সের সঙ্গে কিপলিং নিয়ে তর্ক করেছিলাম। তখনও একটা জ্বালা ছিলো আমার মনে ইংরেজের বিরুদ্ধে; তখনও, গান্ধী যাকে বলেছেন দাস-মনোভাব, আমাদের জীবনের সর্বত্র আমি তার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। তখনও আমার বন্দী মনে হচ্ছে নিজেকে, এক ক্ষুদ্র মলিন অচল সমাজের গণ্ডির মধ্যে বন্দী। কিন্তু তারপর থেকে—এই মাত্র মাস দুয়েক সময়ের মধ্যে—দেশের অবস্থা যদিও একই আছে, বা আরো খারাপ হয়েছে বলা যায়—কোনো-কোনো বিষয়ে পরিবর্তন হয়েছে আমার। জোন্সের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে আমার ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রশমিত হয়েছে, ইতিহাসকে একটু অন্যভাবে দেখতে শিখেছি। আমার মনে এই কথাটা উঁকি দিচ্ছে যে ইংরেজ যদি আজ সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট হ'য়ে থাকে তার পেছনে তাদের কিছু যোগ্যতা নেই তা নয়, আর আমাদের এই হতচ্ছাড়া অবস্থা হয়েছে আমাদেরও অনেক দোষের জন্য। তাছাড়া আমি জীবনে এখন অন্য এক প্রেরণা পেয়েছি—প্রেম : আমার চোখের সামনে দিগন্ত খুলে গেছে, আমার পক্ষে পানাপুকুর ছেড়ে প্রখর নদীতে নৌকো ভাসানো আর অসম্ভব নয়। আমি চাই না এখন ঘৃণা করতে, ক্রুদ্ধ হ'তে, জগতে

যেখানে যেটুকু ভালো আছে সেটুকুই দেখতে চাই, আমি জানি না আমাদের দেশের সমস্যার কী ক'রে সমাধান হবে, কিন্তু আমি আমার জীবন নিয়ে কী করতে চাই তা আমি জেনে গিয়েছি, তারই জন্য সবটুকু সময় আমি খাটাতে চাই। আমি বুলবুলকে জিগেস করলাম তাদের স্বদেশী মেলার কী হলো।

'আর স্বদেশী মেলা।' নিশ্বাস ছাড়লো বুলবুল, 'এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম—সব পণ্ড হ'লো। কিন্তু এটাও এখন ছোটো কথা হ'যে গেছে। বিভা-দি বলছেন মেলাটা বাদ দেবেন এ-বছর. আরো কঠিন কাজ হাতে নেবার সময় হলো। বিষাক্ত ঘায়ে মলম লাগিয়ে আর লাভ নেই—অস্ত্রোপচার চাই। ওরা কি এখনো ভাবছে জেলে পুরে, ফাঁসিতে লটকে ঠেকাতে পারবে আমাদের? মেদিনীপুরে তিনটে ম্যাজিস্ট্রেট নিপাত হবার পরেও? ঢাকাতেও একটি ছোট্ট নাটক তৈরি হচ্ছে।' জোরে নিশ্বাস ফেললো বুলবুল, মুহূর্তের জন্য তার চোখ স্থির হ'লো আমার চোখের ওপর। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, 'বুলবুল, তুমি কী বলছো আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু - ' 'কিন্তু তুমি এর মধ্যে নেই—এই তো?' নরম ক'রে হাসলো বুলবুল। 'ভয় নেই, তোমাকে কোনো ফ্যাশাদের মধ্যে জড়াবো না। চারদিকে কী রকম ধর-পাকড় হচ্ছে দেখছো তো? দাঙ্গার মধ্যেই পঞ্চাশটি ছেলেকে ডেটিন্যু ক'রে ধ'রে নিয়ে গেছে, কবে কার ঘরে নেকড়ে হানা দেবে কেউ জানে না। আমি বরং আর তোমার কাছে না এলাম।' 'তার শেষ কথাটায় আমার পৌরুষে আঘাত লাগলো, তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলাম, 'সে কী। আসবে না কেন? অত ভয় পাবার কী আছে?' এর উত্তরে বুলবুল বললে, 'আমার জন্য কোনো ভয় নেই, কিন্তু তোমার কথা আলাদা। তুমি হয়তো আশ্চর্য কোনো বই লিখবে কোনোদিন - মিত্রকেই তোমার দরকার, আমাকে নয়।' আমি—মূঢ় যুবক—মনে মনে একটু খুশি না হ'য়ে পারলুম না এ কথা ভেবে যে বুলবুলের কাছেও আমার কিছু মূল্য আছে, আমার সাহিত্যিক উচ্চাশাকে সেও শ্রদ্ধা ক'রে, যদিও আমি তাকে আসলে তেমন পছন্দ করি না।

'চলি এখন', বুলবুল দ্রুত ভঙ্গিতে উঠে দাড়ালো। সূর্য অস্ত যাচ্ছে তখন. অর্ধেক পৃথিবীতে ছায়া, রমনার মাঠ খাঁ খাঁ করছে চারদিকে, হঠাৎ এক বিষাদ নামলো আমার মনে, এক জগৎ জোড়া শূন্যতার অনুভূতি যেন আর তারই ফাঁকে ফাঁকে, সন্ধেবেলার ঠাণ্ডা আকাশে মিটমিটে তারার মতো, ফুটে উঠলো অসংলগ্ন কয়েকটি স্মৃতি। 'বুলবুল, একটু বোসো, এসো অন্য কথা বলি।' 'কী, বলো?' 'ইংরেজ নয়, হিন্দু মুসলমান নয়—হঠাৎ আমার অন্য সব কথা মনে পড়ছে। তুমি হয়তো হাসবে শুনে, তবু বলি। বুলবুল, কোনো চৈত্রমাসের দুপুরবেলায় শাঁখারিবাজারের মধ্য দিয়ে হেঁটেছো কোনোদিন? কী আশ্চর্য সেই সব, ছোট্ট, পুরোনো গলিটি, দু-দিকে গায়ে গা ঠেকানো তেতলা চারতলা চকমিলানো বাড়িগুলি, রোদ কখনো ঢুকতে পায় না সেই গলিতে—পা দেয়ামাত্র কেমন একটা সোঁদা, ভ্যাপসা, স্যাৎসেঁতে গন্ধ, শাঁখের করাতের ধারালো আওয়াজ সব সময়, হয়তো দু শো বা তিনশো বছর ধ'রে এই একই শাঁখা-তৈরির কাজ ক'রে যাচ্ছে এরা, রোদের অভাবে শিটিয়ে শাদা হয়ে গেছে গায়ের রং, ঐ একটি গলির মধ্যে চলছে তাদের বংশানুক্রমে সমস্ত জীবন—জীবিকা—অস্তিত্ব। অবাক লাগে না ভাবতে? আর ঢোকামাত্র ঐ গন্ধটা। আর-একটা কথা বুলবুল। ছেলেবেলায় ঘোড়ার গাড়িতে চড়তে যখন, তোমার অবাক লাগতো না লাল নীল সবুজ কাচের মধ্য দিয়ে বাইরে তাকিয়ে? আমি, জানো, মুগ্ধ হ'য়ে দেখতুম সারাক্ষণ—রাস্তা, বাড়ি, লোকজন সব রঙিন হয়ে গেছে— অন্য রকমের রোদ—ভারি নরম, আকাশ আরো গভীর হ'য়ে আরো কাছে স'রে এসেছে যেন, আর তারই সঙ্গে ঘোড়ার খুরের ঠকঠক শব্দ, গাড়োয়ানের শিস- চাবুক -ঘণ্টা- যে গদিতে ব'সে আছো তার চামড়ার ঠাণ্ডা গন্ধ—সব মিলিয়ে কেমন নেশার মতো যেন—এ-সব তোমার মনে পড়ে না কখনো? তুমি কি সব সময় শুধু দেশের কথা ভাবো, সব সময় তোমার বিভাদির কথামতো কাজ করো শুধু—তুমি নিজে কি কেউ নও, তুমি কি তোমার নিজের মধ্যে বাঁচো না কখনো? আমার কী মনে হয় বলবো তোমাকে? ওগুলোই যেন সত্যিকার সুখের মুহূর্ত আমাদের জীবনে, সত্যিকার মনে রাখার মতো ব্যাপার ঐ যে ঢুকেছিলুম দুপুরের

রোদ্দুর থেকে শাঁখারিবাজারের স্যাঁৎসেঁতে ঠাণ্ডায়, দেখেছিলুম রঙিন কাচের মধ্য দিয়ে এক রূপকথার মতো আকাশ।' বুলবুল চুপ করে শুনলো আমার কথাগুলো, তার মুখের ভাব ঈষৎ যেন করুণ হ'লো মুহূর্তের জন্য, তারপরেই গা-ঝাঁকানি দিয়ে সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো আবার। ক্ষীণ হেসে বললো, 'কিছু মনে কোরো না রঞ্জু, তোমার ঐ ভাবলোকে উড়ে বেড়ানো আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার জীবনে কাজ ছাড়া আর কিছু নেই।' বুলবুলের কাছে এ-রকম উত্তরই আমি আশা করেছিলাম, কিন্তু কথাগুলো বলতে পেরে আমার নিজের মন হালকা হ'লো; মনে পড়লো মিতু আসছে পর্শু, আমার এই কী-যেন-কী হারিয়ে-ফেলা ভাবটা এখন অনর্থক, আমি আছি পুনর্মিলনের প্রান্তে।

বুলবুলের সঙ্গে আমার আবার দেখা হ'লো বকুল-ভিলায়, মিতুরা সেখানে পৌঁছবার তিন ঘণ্টা পরে। আমার আগেই এসে ব'সে ছিলো সে, আমি যখন গেলুম তখন একতলার বারান্দায় ব'সে সপরিবারে চা খাচ্ছিলেন অনাদিবাবু। বুলবুল একই কথা বলছিলো—দাঙ্গা, পুলিশ, 'তৃতীয় পক্ষ'; আমার মনে হ'লো, স্বাধীনতা আনার শ্রেষ্ঠ উপায় কোনটা তা নিয়ে একটা তর্ক চলছে তার সঙ্গে অনাদিবাবুর; তিনি গান্ধীর পথে চলতে বলছেন, আর বুলবুল বোধহয় আরো দ্রুত এবং কিছুটা ভয়াবহ কোনো উপায়ের পরামর্শ দিচ্ছে। সে-মুহূর্তে যে-স্বাধীনতায় আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিলো—মিতুকে একটু নিরিবিলি পাবার স্বাধীনতা—তাকে যেন সুদূরপরাহত ক'রে তুললো বুলবুল। আমি বুঝলাম আমার মুখের ভাব ক্রমশ কঠিন হ'য়ে উঠছে, আমার রাগ হ'লো—শুধু বুলবুলের নয়, মিতুরও ওপর, যেহেতু ওসব তর্কাতর্কি মন দিয়ে শুনছে সে—অন্তত শোনার ভান করছে—আমার চোখ এড়িয়ে তাকিয়ে আছে অন্য দিকে। অথচ এই তর্কে সে যোগও দিচ্ছে না—তার মুখের ভাব ক্লান্ত, অন্যমনস্ক। বুলবুলের একটি কথা আমার কানে এলো—'গান্ধীজী আসলে ইংরেজ-ভক্ত, নয়তো যুদ্ধের সময় সাহায্য করেছিলেন কেন তাদের? শত্রুকে যে-কোনো উপায়ে উপড়ে ফেলতে হয়, পলিটিক্সে ভালোমানুষির কোনো জায়গা নেই।' এবারে আমি কথা না ব'লে পারলাম না—'কিন্তু কে জানে ইংরেজের জন্যই আমরা কি আজ পতিত, না কি আগে থেকেই পতিত ছিলুম ব'লে ইংরেজ অত সহজে কেড়ে নিতে পারলে দেশটা? আমাদের দারিদ্র্য, কুসংস্কার, অশিক্ষা—এ সবের জন্য আমাদেরও কি দায়িত্ব নেই?' 'নিশ্চয়ই আছে! খুব ভালো কথা বলেছো, রণজিৎ—হয়তো আমরা নিজেদের পাপেই ডুবে যাচ্ছি, আমাদের অস্পৃশ্যতা, নিষ্ক্রিয়তা, অদৃষ্টবাদ—কী না? রামমোহন থেকে গান্ধী পর্যন্ত এ-সবের বিরুদ্ধে কম চেষ্টা তো হ'লো না, কিন্তু দেশটা কতটুকু বদলেছে?' অনাদিবাবুর কাছে উৎসাহ পেয়ে আমি জোর গলায় বলতে লাগলাম, 'আমরা কী করেছি—গত পাঁচশো বছর, এক হাজার বছরের মধ্যে কী করেছি আমরা, যার জন্য আজ সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকার দাবি করতে পারি? আমরা কি আটলান্টিক পেরিয়ে আমেরিকার মাটি ছুঁয়েছিলাম, আবিষ্কার করেছিলাম কোনো ক্ষুদ্রতম দ্বীপ, কোনো নতুন ফসল? বাষ্প আর বিদ্যুৎ যে মানুষের এত বড়ো কাজে লাগতে পারে তা কি আমাদের কল্পনাতেও ছিলো কখনো? আমরা কি শিখেছিলাম মাটি খুঁড়ে পেট্রোল বের করতে? বেশি আর কথা কী—আমাদেরই পাহাড়ে জঙ্গলে আগাছার মতো রাশি-রাশি চা গজিয়েছে খুব সম্ভব ঋগ্বেদের সময় থেকেই—তাও আমবা চিনতে পারিনি, এতই আমবা অন্ধ ও নির্বোধ। এই সবই করেছে শাদা চামড়ার মানুষ, তারাই এ-যুগেব বীর, অতএব তারা যে পৃথিবীর অধীশ্বব হবে সেটা আব আশ্চর্য কী'? বুলবুল হাততালি দিয়ে ব'লে উঠলো, 'তাহ'লে তুমি বলছো আমাদেরও বীর হ'তে হবে, ক্ষমতাশালী হ'তে হবে?' তার দিকে তাকিয়ে আমি হঠাৎ থমকে গেলাম, অন্য বকম সুরে বললাম, 'আমি কিছুই বলছি না। আমি নগণ্য জীব, দেশোদ্ধারের কোনো প্রেস্ক্রপশন আমার জানা নেই। অনাদিবাবু বললেন, 'কিন্তু কী-ধরনের বীরত্ব, কী-ধরনের ক্ষমতা সেটা ভেবে দেখা দরকার।' বুলবুল মাথা ঝেঁকে বললো, 'অত ভাবলে কোনো কাজ হয় না, মেসোমশাই!' অনাদিবাবু হেসে বললেন, 'ঐ তো আবার আর-এক তর্ক তুললে, বুলবুল—আমরা যাকে সভ্যতা বলি তা কি ভাবুকের সৃষ্টি, না কর্মীর? দুয়েরই নিশ্চয়ই, কিন্তু—' অনাদিবাবুর চেয়ারের শব্দ হ'লো, 'আজ আমার সময় নেই, আর-একদিন তোমাকে বুঝিয়ে দেবো যে সব কাজ চিন্তা

থেকেই জন্ম নিয়েছে। আমি বেরোচ্ছি,' স্ত্রী আর কন্যার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আমার দুই রোগী জরুরি খবর পাঠিয়েছে—গাড়িটা তৈরি হ'লো কিনা দেখি। মিতু তুই এত চুপচাপ কেন—শরীর খারাপ হয়নি তো?' 'মিতু অন্য কথা ভাবছে—'আমার দিকে একটা কটাক্ষ ক'রে বুলবুলও উঠলো। 'আমিও যাই এখন—মেসোমশাই আমাকে রাজার দেউড়িতে নামিয়ে দেবেন?'

মিতু আমাকে দিয়ে দোতলায় এলো—সেই বারান্দাটিতে, যেখানে কয়েক সপ্তাহ আগে অনেক ভরপুর দুপুর আমরা কাটিয়েছি। কিন্তু এই বহু-প্রতীক্ষিত পুনর্মিলনের মুহূর্তটিকে কল্পনায় যে-উচ্চ শিখরে বসিয়েছিলুম, বাস্তব তার অনেক নিচে প'ড়ে রইলো। বেসুরো হ'য়ে আছে আমার মন, আমার আবেগ যেন শুকিয়ে গেছে, নিজেকে তেমনি বিস্বাদ লাগছে যেমন লাগে গ্রীষ্মের দুপুরে লম্বা ঘুম দিয়ে উঠলে; আজ এক্ষুনি—আর কয়েক দিন আগে রমনায় বেড়াতে বেরিয়ে—বুলবুলের মুখে যে-সব কথা শুনেছিলুম, যা আমার পরমুহূর্তেই ভুলে যাওয়া উচিত ছিলো, আমার রুচিকে যা আহত করে, আমার স্বভাবের যা বিরোধী, আমার সুখের পক্ষে যা হানিকর, সেই কথাগুলোই যেন আটকে আছে আমার মনের তলায়, চিরতার জলের সারাদিন-ধ'রে-জিভে-লেগে-থাকা তেতো স্বাদের মতো, যেন কালো-কালো ছায়া হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার চারদিকে, বা কোনো সূক্ষ্ম বিষ, যা ভুল ক'রে গিলে ফেলে এখন আর উগরে তুলতে পারছি না আমি, থামাতে পারছি না আমার রক্তে তার ছড়িয়ে পড়া। আমি চেয়েছিলাম স্মৃতি দিয়ে, স্বপ্ন দিয়ে বুলবুলকে স্পর্শ করতে—পারিনি; আমার মন তার পক্ষে এক অচেনা দেশও, কিংবা এক নিষিদ্ধ প্রকোষ্ঠ, যেখানে সে কিছুতেই পা বাড়াবে না। আমার কিছু এসে যায় না তাতে, আমি বুলবুলকে ভালোবাসি না; কিন্তু তার জন্য আমার দরদ নেই তাও নয়, হয়তো কোনো বিপদের পথে সে এগিয়ে যাচ্ছে, এমনি একটা আশঙ্কা হানা দিচ্ছে আমাকে। আর আমার পক্ষে সবচেয়ে যা কষ্টের তা এই যে আমার মনের এক গোপন অংশ যেন মেনে নিয়েছে যে বুলবুলের কথাগুলো তেতো হ'লেও সত্য, আর সেখানে মাঝে-মাঝে এমনও একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছে যেন ভালোবাসার, ভালোবাসা পাবার, সুখী হবার এই ইচ্ছের জন্য আমি অপরাধী, ছেলেবেলায় ঘোড়ার গাড়ির রঙিন কাচের মধ্য দিয়ে দেখা আকাশের কথা ভেবে আমি যে আজও উন্মন হ'য়ে যাই, সেটাও আমার অপরাধ। এদিকে মিতুও, হয়তো আমাকে অন্যমনস্ক দেখেই, কথা বলছে বাধো-বাধো ভাবে, কিংবা যেন এক নতুন লজ্জা হেমন্তের সন্ধেবেলার এই কুয়াশার মতো জড়িয়ে আছে তাকে, আমরা কেউই অন্যজনের কাছে পুরোপুরি উপস্থিত হ'তে পারছি না।

খুচরো বিষয়ে কথা চললো খানিকক্ষণ; কলকাতায় কেমন কাটলো তাদের, তার নতুন রেকর্ড কবে বেরোবে, দিলদার নওরোজ নতুন আর কী বই লিখলেন, ছাদ-খোলা দোতলা বাস্ কি তুলে দিলো সত্যি? কিন্তু কলকাতার প্রসঙ্গ শিগগিরই ফুরিয়ে গেলো, কেননা প্রায় সব খবরই চিঠিতে সে লিখেছিলো আমাকে, তাছাড়া মিতু ঢাকায় ফিরে আসার সঙ্গে-সঙ্গে আমার পক্ষে কলকাতার আকর্ষণ তেমন প্রবল নেই আর, সেখানে কী-ভাবে তার সময় কেটেছে সে-বিষয়েও আমি কৌতূহল হারিয়েছি। আর ঢাকার খবর মানেই দাঙ্গা, সে-প্রসঙ্গ বুলবুল একেবারে চটকে রেখে গেছে। মিতু আমাকে জিগেস করলো আমাদের য়ুনিভার্সিটি কবে খুলবে। 'সামনের সোমবারই খুলে যাচ্ছে।' 'আপনার এম. এ. পরীক্ষা কবে।' 'দেরি আছে এখনো—সামনের বছর, জুলাই মাসে।' একটু চুপ ক'রে থেকে মিতু বললো, 'এবার কলকাতায়- ' 'কী? থামলেন কেন?' 'বলছি।' হঠাৎ আমার ভেতরকার প্রেমিক-সত্তা জেগে উঠলো, যেন একটা বোবায়-ধরা তন্দ্রার অবস্থাকে দুই হাতে ঠেলে সরিয়ে আমি তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকালাম। 'এবার কলকাতায় এক ভদ্রলোক জানিয়েছিলেন তিনি আমাকে বিয়ে করতে চান।' আমার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠলো তার কথা শুনে, শুকনো গলায় বললাম, 'তারপর?' 'মা-বাবার অমত ছিলো না—ভদ্রলোকটি সব দিক থেকেই চমৎকার।' তার ক্রিয়াপদের অতীত বচন লক্ষ না-করে আমি বলে উঠলাম, 'তাহ'লে ঠিক হ'য়ে গেছে?' 'ঠিক কেন হবে? কেউ চমৎকার হ'লেই তাকে বিয়ে করতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই।' 'তুমি

রাজি হওনি?' 'রাজি হবার কথা ওঠে নাকি?' মিতু একবার তাকালো আমার দিকে, তার চোখে তার মনের ভাষা আমি প'ড়ে নিলাম। 'তোমার মা-বাবা যদি জোর করেন?' 'তুমি তো জানো, তাঁরা ও-রকম নন। আমি যা বলবো তা-ই হবে।' তারপর নিশ্বাসের স্বরে বললো, 'তুমি একবার বাবার সঙ্গে কথা বলবে নাকি?' আমি স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলাম, যেন নিশ্বাস প'ড়ে না, আমার বুকের শব্দে অন্য সব আওয়াজ চাপা প'ড়ে যাচ্ছে। আস্তে আমার হাতের ওপর হাত রাখলো মিতু, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি অপেক্ষা করবো—তুমি যতদিন বলবে, ততদিন।'

মাথার মধ্যে ঘূর্ণি নিয়ে ফিরে এলাম বাড়িতে। প্রেমে পড়া নয়, চিঠি লেখালেখি নয়, গল্প ক'রে দুপুর কাটানো নয়—বিয়ে। অন্য একজনের সুখদুঃখ ভবিষ্যৎ সব আমার হাতে! আমার সুখদুঃখ ভবিষ্যৎ অন্য কারো হাতে তুলে দেয়া! এত বড়ো দায়িত্ব আমি কি নিতে পারি—আমি, যে এখন পর্যন্ত বলবার মতো কিছুই করিনি, এক দরিদ্র, অনিশ্চিত, পরিচয়হীন, একুশ বছরের যুবক! মিতু—বিখ্যাত অমিতা বর্ধন, কত গুণীমানীর স্নেহের পাত্রী, দিলদার নওরোজ যাকে গানের বই উৎসর্গ করেছেন—সে কিনা এই আমারই জন্য ফিরে তাকাবে না অন্য সব কৃতী পুরুষের দিকে, যারা 'সব দিক থেকেই চমৎকার!' আমার মনে হ'লো আমি যেন আনন্দ আর উৎকণ্ঠার চাপে পিষ্ট হ'য়ে যাচ্ছি, যেন হঠাৎ আমার ওপর এমন একটা প্রকাণ্ড দাবি এসেছে যা আমি ফেরাতেও পারি না, সহ্য করতেও পারি না; রাত্রে বালিশে মুখ ঘ'ষে-ঘ'ষে নিঃশব্দ চীৎকারে বলতে লাগলাম, 'মিতু, আমাকে তোমার যোগ্য ক'রে নাও, আমাকে তোমার যোগ্য ক'রে নাও।'

১৪

দেখেছেন, রোদের রং কেমন বদলে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে? হলদে, গোলাপি লালচে : সূর্যদেব পাটে নামছেন। ঐ দুটো পাহাড়ের মধ্যিখানে সূর্য ডোবে আজকাল, আমি ব'সে-ব'সে দেখি, যতক্ষণ না শেষ বিন্দু আলো মিলিয়ে যায়। কিন্তু উটকামণ্ডে সূর্যাস্তের তেমন বাহার নেই, জানেন। মেঘ নেই, তাই রঙের খেলা জমে না; এই গ্রীষ্মেও মাঝে-মাঝে পাৎলা কুয়াশা আঁকড়ে থাকে বাতাসে; এক-একদিন এমন হয় যে আমাদের আকাশের ঐ অগ্নিপিণ্ড, তেজ হারিয়ে, পার্ট ভুলে গিয়ে, কোনো গোলগাল মুখের বোকাশোকা অভিনেতার মতো, শেষ বক্তৃতাটি অসমাপ্ত রেখেই মুখচোবাভাবে নেপথ্যে চ'লে যায়। কিন্তু তবু—এই পড়ন্ত বেলার দিকে তাকিয়ে থাকতে মন্দ লাগে না আমার; ঐ জানলার কাচের বাইরে পৃথিবীটাকে মনে হয় এক সাজানো রঙ্গমঞ্চ, পাহাড়গুলো ফাঁপা হ'য়ে যায়, হালকা, যেন থিয়েটারের পট, আর দূরে-দূরে ছড়ানো ঐ বাড়ি ক-টাও যেন সত্যি নয়, কোনো বাসিন্দা নেই, দৃশ্যটিকে ভ'রে তোলা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই তাদের। নিশ্চযই আপনি লক্ষ করেছেন সকালের চাইতে বিকেলের আলো বেশি উজ্জ্বল? আসলে হয়তো তা নয়, কিন্তু বিকেল এত কোমল হ'য়ে নামে, এমন একটি গোপন দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে দেয় তার রোদ্দুরে, এমন সব শান্ত রং বেছে নেয় যে আমাদের চোখের পক্ষে তারই উজ্জ্বলতা অনেক বেশি দর্শনীয় হ'য়ে ওঠে, অনেক বেশি রমণীয়। বিদায়—অবসান—বেদনা : তার মতো সুন্দর আর-কিছু নেই ব'লেই সন্ধ্যা এমন মায়াবিনী। কিন্তু তারপর? তারপরেই ধূসর—কালো—রাত্রি—আমি এক, কেউ কোথাও নেই, আমার ভয় ক'রে তখন, রাত্রে আমার ভয় ক'রে। আমি ঘুমোতে পারি না, যদিও ঘুম নেই, কিছু নেই আমার—অন্ধকারের বুকের মধ্যে অনেক উঁচুতে যে-সব ফুল ফুটে থাকে তাদের সঙ্গে আমাদের চোখাচোখি হয় না, অত বিরাট রাত্রির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার মতো শক্তি নেই আমার চোখের—আমি চাই ঘন দেয়াল, এই ছোটো ঘর, যেখানে এই সোফাটারই ভাঁজ ভেঙে দু-জনের মতো বিছানা পেতে নেয় গায়ত্রী—বা বিছানাও পাতে না, মদে চুর হ'য়ে পরস্পরের গায়ে বিনা চেষ্টার ঢ'লে পড়ি আমরা।

না—আপনার যাবার জন্য ইঙ্গিত নয় এটা। বলেছি তো, স্ত্রীলোকে আমার বিতৃষ্ণা আসলে, শুধু রাত্রে একা ভয় ক'রে ব'লেই আমি চাই তাদের। ভয় কেন? নেলিকে ভয়, কাজলকে ভয়, বাঙালদেশের টেররিস্টদের গুলিকে ভয়। 'সাবধান, রণজিৎ ভুলেও ভেবো না আমাদের প্রতিহিংসা থেকে নিস্তার পাবে,' বলেছিলো বুলবুল কোনো-এক সময়ে—সত্যি কি বলেছিলো, না কি আমি নিজের মনে বানিয়ে নিয়েছি? 'রঞ্জু, আমাকে ভুলো না,' বলেছিলো কাজল কোনো-এক সময়ে—সত্যি কি বলেছিলো, না কি আমি নিজের মনে বানিয়ে নিয়েছি? বলুন তো, যারা ম'রে যায় তারা কি সত্যি ম'রে যায় একেবারে—চিরকালের মতো? আর কখনো —কখনো দেখা হবে না? বলুন তো, মৃত্যু কী? যে ছিলো কোনো-একদিন সবচেয়ে আপন, তারপর যাকে পঁয়ত্রিশ বছর দেখিনি, দেখলেও চিনতে পারবো না, আজ দেখা হ'লে যাকে মনে হবে অত্যন্ত দূর, মঙ্গলগ্রহের অধিবাসীর মতো, সে-ও কি মৃত নয় আমার কাছে, তার কাছে আমিও কি মৃত নই? আর এই যাকে আমরা 'আমি' বলছি, তাও তো বদলে যাচ্ছে বছরে-বছরে, দিনে-দিনে ; যেমন আমাদের শরীরের কোষগুলি অবিরাম ম'রে-ম'রে অবিরাম আবার জন্ম নিচ্ছে, তেমনি আমাদের আমিত্বও কোনো স্থির বস্তু নয়—সাময়িক, আপতিক, চঞ্চল—এই ধরুন না আমার সেই একুশ বছরের 'আমি' আজ ব্যাবিলনের কোনো সম্রাটের মতোই মৃত, টিকে আছে তার উত্তরাধিকারী অন্য একজন, একই নামে, একই শরীর নিয়ে। তাহলে দাঁড়ালো এই যে আমরা প্রত্যেকেই আংশিকভাবে অনবরত ম'রে যাচ্ছি, অনেক ছোটো-ছোটো মৃত্যুর সমষ্টিব নাম দিয়েছি জীবন, আর যখন অন্যদের সঙ্গে একেবারে সব সম্পর্ক চুকে যাচ্ছে, সেই অবস্থাটাকে মৃত্যু বলছি। কিন্তু আমাদের নিজেদের মৃত্যু আমরা উপলব্ধি করি না, অন্যদেরটাও ভুলে থাকি যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্ব থাকে: কিন্তু সেই অস্তিত্ব যার যখনই ফুরোয, তখনই তাকে মৃত ব'লে ঘোষণা করি আমরা, যেহেতু তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কের সম্ভাবনাও আর রইলো না। কিন্ত সেই অর্থে আমিও কি মৃত নই, এই আমি, যে আপনার সামনে ব'সে আছে, কথা বলছে? ... আজ্ঞে? আপনি বলেছেন আমারও অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, স্মৃতি আছে যেহেতু? তাহ'লে তো যারা ম'রে গেছে তারাও মরেনি, পঁয়ত্রিশ বছর যাদের চোখে দেখিনি তারাও আমার সঙ্গে আছে এখনো, তা'হলে তো স্মৃতির নামই অমরতা। দেখছি আপনি সবই বোঝেন, আপনি জ্ঞানী—আমারই মতো; জ্ঞানপাপী—আমারই মতো। আমি কৃতার্থ হবো—সত্যি যাকে কৃতার্থ ব'লে তা-ই—আপনি যদি আজ রাত্রিটা এখানে কাটাতে রাজি হন। এমনি মুখোমুখি ব'সে, সারারাত আমি কথা বলি তা'হলে। মুখোমুখি, যেন আয়নার সামনে। আপনি আমারই বয়সী, একই সময়ে ঢাকায় ছিলেন, একই পাড়ায়, মুখ দেখে দরদী মনে হয় আপনাকে। বলুন তো, আপনি কি আমাকে চিনতেন না ঢাকায়? হয়তো আপনার জানা কথাই আমি শোনাচ্ছি আবার—শুধু এই তফাৎ, আপনি ভুলে গেছেন, কিন্তু আমি ভুলিনি। ভুলিনি, মিতু যেদিন কলকাতা থেকে ফিরে এলো, তারপর, প্রায় এক মাস ধ'রে, কেমন একটা হাঁপ-ধরা, দম-আটকানো, স্নায়ু-ছেঁড়া অবস্থায় আমি কাটিয়েছিলাম। বহুরূপী সেই যন্ত্রণা, ছলনায় ভরা।... অবাক হচ্ছেন? 'আমি অপেক্ষা করবো, তুমি যতদিন বলবে, ততদিন,' মিতুর মুখে এই কথা শুনে স্বর্গ হাতে পাওয়া উচিত ছিলো আমার? নিশ্চয়ই! তা আমি পাইনি তা তো নয়, আমারও মনে হয়েছে আমি যেন আর আমাতে নেই, যেন এমন কোনো নেশা করেছি যা চিরস্থায়ী, ভেসে বেড়াচ্ছি মেঘে-মেঘে আকাশে-আকাশে, পেয়ে গেছি আমার কল্পনার সোনার খনি, আমার সাহারার গোলাপের বাগান, সেই আশ্চর্য কিমিয়ার সূত্র যা দিয়ে জগৎটাকে বদলে দেয়া যায়। কিন্তু হাজার হোক, আমরা তো মরণশীল মানুষ মাত্র, স্বর্গ আমাদের সহ্য হবে কেন? একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো আমার মধ্যে; মিতুর সঙ্গে আমার বিয়ে হ'তে পারে, এটা কাজলের কপোলকল্পনা ছাড়িয়ে যখন বাস্তব হ'য়ে উঠলো, এমনকি মনে হ'লো অনিবার্য, তখনই এই পরিণতির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেয়া যেন কঠিন হ'য়ে উঠলো আমার পক্ষে। কে যেন প্রতিরোধ করছে আমার ভেতরে ব'সে, প্রতিবাদ করছে। অদ্ভুত, যে এক বছর পরে হোক, পাঁচ বছর পরে হোক, মিতুর হাতে আমি বাঁধা প'ড়ে

যাবো, সত্যি বলতে আজ থেকেই সেই বাঁধন শুরু হ'লো। অদ্ভুত, আমার প্রেম, যাকে এতদিন আমি ভেবেছি একটি গানের সুর, সুগন্ধি হাওয়া, স্নায়ুর কম্পন—তাকে আজ মেপে নিতে হচ্ছে সাংসারিক ফিতে দিয়ে, যেন তা দর্জির দোকানের একখানা কাপড়, যা দিয়ে, কালক্রমে, তৈরি হবে ব্যবহারযোগ্য একটি আচ্ছাদন, যার তলায় মিতু আর আমি, একদিন আগেও যারা ছিলো প্রেমিক-প্রেমিকা, স্বাধীন, অনন্য (কেননা, কোনো তরুণী মায়ের কাছে তার সন্তান যেমন, তেমনি যুবকের কাছেও তার প্রেম অভূতপূর্ব ও অতুলনীয়—এ যে এক চির-পুরোনোর পুনরাবৃত্তি তা তার ধারণার মধ্যে আসে না)—সেই আমরা রাতারাতি সাধারণ স্বামী-স্ত্রীতে রূপান্তরিত হ'য়ে জগতের কোটি-কোটি মানুষের মধ্যে মিশে যাবো। কোলের শিশু যখন বড়ো হ'য়ে স্কুলে যায়, প্রেমের ওপরে যখন সামাজিক শীলমোহর পড়ে, তখনই অন্যদের সঙ্গে তুলনা আর ঠেকানো যায় না; ছেলে স্কুলের পরীক্ষায় বা স্বামী-স্ত্রী তাদের কর্তব্যপালনে পাছে ফেল হয়, সেই ভাবনা যেন ভালোবাসার বিশুদ্ধ দুধে জল মিশিয়ে দেয়। আপনি অবাক হচ্ছেন? ভাবছেন আমি মিতুকে সত্যি ভালোবাসিনি, সবই ছিলো ছেলেমানুষি, ভাবোচ্ছ্বাস, গ্যাসে-ভর্তি বেলুন? আমি তর্ক করবো না আপনার সঙ্গে : শুধু এটুকু বলি, মিতুর কথা ভাবতে এখনো আমার বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে মাঝে-মাঝে, এখনো আমি জানি যে জীবনে সেই একবারই কোনো মেয়েকে আমি ভালোবেসেছিলাম—একবার, মাত্র কয়েকদিনের জন্য। আর তাই—যেহেতু নিজের মধ্যে টের পাচ্ছি একটা অনুচিত দ্বিধা, একটা অন্যায় অনিশ্চয়তার দোটানা, এমন কোনো দুর্বলতা যার অস্তিত্ব আমার মধ্যে কখনো সন্দেহ করিনি—তাই আমার কষ্ট। কল্পনা নয়, বানানো গল্প নয়—জীবন, সত্যিকার জীবন এগিয়ে এলো আমার দিকে, কিন্তু আমি তাকে দু-হাত বাড়িয়ে জাপটে ধরতে পারছি না কেন? যে-আমি ঈর্ষা করেছি কলকাতার শহরসুদ্ধ লোকেদের—মিতু ঢাকায় ফেরার আগের দিন পর্যন্ত—সেই আমি কেন এখন ভাবছি যে একটু দূরত্ব, একটু সংশয় না-থাকলে ভালোবাসা সম্পূর্ণ হয় না?

আরো একটা কষ্টের কারণ ছিলো আমার, আরো বেশি লজ্জার সেটা। মিতু আমারই সঙ্গে থাকবে—একই বাড়িতে—সারাক্ষণ, এই কথাটা মাথায় ঢোকামাত্র যেন দ্বিগুণ বেগে উদ্ধত হ'য়ে উঠলো আমার সত্তার সেই অংশ, যা অতি স্থূল রক্তমাংস দিয়ে তৈরি। মিতু, নিজে না-জেনে, হয়তো কিছু না-বুঝে, আমাকে দীক্ষিত করলো কামনায়, অচরিতার্থ কামনার দহনে। এই আমার প্রথম চোখে পড়লো তার স্তনের বোঁটা দুটি কেমন ফুটে ওঠে মাঝে-মাঝে :—তার ব্লাউজ আর বার-বার টেনে-দেয়া আঁচল যতই চাপা দিক, তারা যেন, কৌতুকে আর কৌতূহলে মেশা ভঙ্গিতে, জগতের কাছে জানান না-দিয়ে পারে না যে তারা আছে, তারা প্রস্তুত। এই যেন আমি প্রথম বুঝলাম যে নারীর রূপের উপাদান শুধু মুখ নয়, তার শরীরও। মিতুর সজল ঠোঁটের নড়াচড়ার দিকে তাকিয়ে তার কথার জবাব দিতে আমি ভুলে যাই : সে যখন তার বসার ভঙ্গি বদল ক'রে বা উঠে দাঁড়ায়, বা হেঁটে যায় এ-ঘর থেকে ও-ঘরে, তখন আমার মনে হয় তার শরীর যেন আঁকাবাঁকা চঞ্চল কয়েকটা রেখার সমষ্টি, যা কখনো-কখনো তার চারদিকে ছিটিয়ে যাচ্ছে, ছুটে আসছে আমারই দিকে, যেন আমার কাছে কোনো উত্তর দাবি ক'রে। তার স্তন দুটি যেখানে পৃথক হ'য়ে গেছে, সেই রেখাটি মুগ্ধ ক'রে আমাকে; আমি তার উপমা খুঁজি দ্বিতীয়ার চাঁদে, জলের স্রোতে ভেঙে-যাওয়া জ্যোছনায়, কিন্তু পারি না তাকে পুরোপুরি কবিতায় রূপান্তরিত করতে, স্পর্শের আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তি পাই না। মনে হয় চোখের দেখা অনেক হ'লো, সব কথা ফুরিয়ে গেছে—শরীর দিয়ে শরীরকে জানতে হবে এবার। আমার মধ্যে যে কামনার অস্তিত্ব আছে এই উপলব্ধি অবশ্য নতুন নয় আমার পক্ষে, কিন্তু এতদিন তাকে সৌন্দর্যবোধের ঢাকনার মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলাম; কাজলের গলার নেকলেসের উজ্জ্বলতা, সবুজ শাড়িতে জলজ উদ্ভিদের মতো মিতু—এই সব ছিলো স্বয়ংসম্পূর্ণ এক-একটি অভিজ্ঞতা, যা আমাকে মুগ্ধ করেছে, উন্মন করেছে, কিন্তু উত্তাল করেনি। হায় সেই সুন্দর ভাবনা আমার, স্বপ্নের বিলাসিতা, তা কেন আজ ইন্দ্রিয়ের কাম্য হ'য়ে উঠলো?

এক-এক সময় অসহ্য লাগে আমার, যখন তীব্র হ'য়ে ওঠে ইচ্ছে—মিতুকে ছুঁতে, বুকে জড়াতে, চুমু খেতে; এমনকি এই পাপিষ্ঠ চিন্তাও মাঝে-মাঝে আমার মনের তলায় ন'ড়ে ওঠে যে সে, মিতু, এখনই আমাকে দেহ দান ক'রে তার ভালোবাসা প্রমাণ করুক। কিন্তু আমি জানি মিতু কত পবিত্র, কত স্পর্শভীরু, সুকুমার, কী মর্মান্তিক আহত হবে সে, যদি কখনো কোনো রূঢ় ভঙ্গি দেখতে পায় আমার মধ্যে। 'বাবার সঙ্গে কথা বলবে নাকি একদিন?' তার মানে—মন্ত্রপূত মিলন, অন্তত তার প্রতিশ্রুতি : 'আগে বিয়ে হোক, তারপরে সব, কিন্তু তা না-হওয়া পর্যন্ত আমরা দু-জনেই উপোসি থাকবো—' এই সংস্কারের প্রাচীন ডালেই তার ভালোবাসার সুন্দর ফুল ফুটে আছে, সেখানটায় ঝাঁকুনি দেবার মতো সাহস আমার নেই, না-দেবার মতো বিবেক এখনো অবশিষ্ট আছে। কিন্তু, তার এই মনোভাব—যা তার বয়স, সময় ও অবস্থার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক—তা আমাকে পীড়া দেয় গোপনে, মনে হয় সে পুরোপুরি বিশ্বাস করছে না আমাকে, তার এই ধৈর্যকে আমার মনে হয় সাংসারিক সুবুদ্ধি, এমনকি ভালোবাসার অভাব। আবার, এই কামাতুর অবস্থার জন্য নিজেকেও আমি ক্ষমা করতে পারি না, মনে হয় আমি মিতুর অযোগ্য, দিনে-দিনে ছোটো হ'য়ে যাচ্ছি, আর মিতুকেও নামিয়ে আনছি আমার আবেগের প্রকাণ্ড আকাশ থেকে একটা ছোট্ট হাঁপ-ধরা কুঠুরির মধ্যে। এমনি ক'রে, ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের ঝাপটে, এক-একটি দিন কেটে যায়, আমি পায়ের তলায় মাটি পাই না, পাই না সেই প্রত্যয়ের মুহূর্ত যার অনুকূল হাওয়ায় জীবনটাকে অন্য তীরের দিকে ভাসিয়ে দিতে পারি। রোজ যাওয়া-আসা করছি, কিন্তু অনাদিবাবুকে বলা হয় না যা বলতে চাই, যা আমাকে বলতেই হবে—যা তাঁরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন; কোন না একদিন, আমাদের দেশের প্রথা অনুসারে, এবং আমাকে লজ্জা দিয়ে, তাঁরাই উত্থাপন করেন প্রসঙ্গটা। মিতুকে বলি, 'যাক না কিছুদিন, তাড়া কিসের, তুমি আমি নিজের মনে তো নিশ্চিন্ত—' সে জবাব দেয় না, শুধু চোখে চোখ রাখে, আর তার সেই দৃষ্টির সামনে আমার মাথা যেন নিচু হ'য়ে যায়।

আমার কষ্টের একটি প্রতিষেধক আমাকে জুগিয়ে যাচ্ছিলো বুলবুল। প্রতিষেধক—চিকিৎসা—কিন্তু সেই চিকিৎসাই আবার অন্য একটা অসুখ। বিচক্ষণ ডাক্তার যেমন এক অসুখ সারাবার জন্য রোগীর দেহে অন্য অসুখ উৎপন্ন করেন—পাগলের নাড়িতে একশো-তিন ডিগ্রি জ্বর, বা হাঁপানির কষ্ট ঠেকাতে গিয়ে একজীমা—কিংবা যেমন দুই বিপরীত বিষের প্রতিক্রিয়ায় শরীর মাঝে-মাঝে এক ধরনের ভারসাম্য খুঁজে পায়, আট পাত্র হুইস্কির পর দু-পেয়ালা কালো কফি গলায় ঢাললে নিজে গাড়ি চালিয়ে নির্বিঘ্নে বাড়ি পৌঁছবার বাধা হয় না—তেমনি দুই উল্টো রকমের ব্যামোতে যেন ভুগছিলাম আমি—কখনো এটা, কখনো ওটা, দুটোই সমান ক্ষতিকর, কিন্তু যে-ক্ষতি একটার দ্বারা হচ্ছে তারই পরিপূরণ করছে অন্যটা। বুলবুল মাঝে-মাঝে আসে আমার কাছে; ঢাকেশ্বরী বাড়ির পেছনকার সেই আমবাগানটা সে বেছে নিয়েছে আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য; তার সঙ্গে দেখা হ'লে আমার ভালোই লাগে যেহেতু আমার প্রণয়ের পাত্রী নয় সে, তার কাছে কোনো অবৈধ বা বৈধ চাহিদাও নেই আমার; আমার পক্ষে সে মিতুর মতো প্রয়োজনীয় নয়, বা এমনও নয় যে একমাস তাকে না-দেখলেও তার খোঁজ নেবার জন্য কোনো তাগিদ জাগবে আমার মনে। বুলবুল, একজন মেয়ে, তরুণী (হ'লোই বা সচেতনভাবে নারীত্ব-বর্জিত)—সে যে আমার প্রতি মনোযোগী (দু-জনের স্বভাবের গরমিল সত্ত্বেও), এটা আমার আত্মসম্মানের পক্ষে চাটুকারী; তার সঙ্গে একা রাস্তায় বেড়াতে পারছি আমি (যে-স্বাধীনতা মিতুর সঙ্গে সম্ভব নয়), পারছি সহজভাবে ঢিলে-ঢালাভাবে কথা বলতে, এগুলোও নেহাৎ মন্দ লাগে না আমার। তবু—বুলবুলের সংসর্গে আমি যা পাই তা সুখ নয়, শুধু আমার কষ্ট থেকে, আবেগের চাপ থেকে নিষ্কৃতি—তাও ক্ষণিকের জন্য; যেমন রোগশয্যায় পাশ ফিরে হঠাৎ মনে হয় বেশ লাগছে, কিন্তু পরক্ষণেই একইভাবে তেতে ওঠে বিছানা, টের পাওয়া যায় গাঁটে-গাঁটে ব্যথা, তেমনি বুলবুলের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু হ'লেই আমার মেজাজ বিগড়োতে দেরি হয় না, পদে-পদে ধরা প'ড়ে যে তাকে আমাকে এক দেবতা তৈরি করেননি। একদিন—মিতুরা তখন সবে ফিরেছে কলকাতা থেকে—বুলবুল হঠাৎ আর্থার

জোন্সের কথা তুললো। জোন্সের সঙ্গে আমার কি দেখা হয়েছে শিগগির? আমি বললাম, 'জোন্স তো দার্জিলিঙে।' 'ফিরে এসেছে জানো না?' 'এসেছে বুঝি? তা'হলে তো যেতে হয় একদিন। তার কয়েকটা বই অনেকদিন ধ'রে প'ড়ে আছে আমার কাছে।' একটু চুপ ক'রে থেকে বুলবুল খুব নিচু গলায় বললো, 'তোমাকে একটা কথা বলি, রণজিৎ। জোন্সের সঙ্গে মেলামেশা ছেড়ে দাও। ওর বইগুলো ফেরৎ দিয়ে আসতে পারো, কিন্তু আর কখনো যেয়ো না।' আমি হেসে বললাম, 'বুলবুল, কী ক'রে তুমি এমন কথা ভাবতে পারলে যে তোমার কথামতো আমি কিছু করবো বা করবো না?' 'তোমারই ভালোর জন্য বলছি।' আমার মনে প'ড়ে গেলো বকুল-ভিলায় অমূল্য আমাকে যে-পাঁচালি শুনিয়েছিলো জোন্সের বিষয়ে, আর পরমুহূর্তেই তেলতেলে গলায় বলেছিলো, 'আমাকে একটা সুপারিশ জোগাড় ক'রে দেবে?' বললাম, 'থাক, জোন্সের কথা থাক। আমার একটা আর্জি আছে তোমার কাছে।' 'আর্জি? তোমার? আমার কাছে?' বুলবুলের গলার আওয়াজ অন্য রকম শোনালো, যেন মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় তার নারীত্বকে সে প্রকাশ ক'রে ফেললো। 'বাস্টার কীটনের একটা ফিল্ম চলছে এখন—আমার ইচ্ছে তোমাকে আর মিতুকে নিয়ে দেখতে যাই। তুমি রাজি?' 'মিতুকে নিয়ে যেতে চাও—এই তো? তাকে আর বাড়ি থেকে তোমার সঙ্গে একা যেতে দেবে না, তাই একজন শিখণ্ডী দরকার? তা কাজল-মামিকে নিয়ে যাও না।' আমি রূঢ়ভাবে জবাব দিলাম 'কাজল-মামিকে নিয়ে যেতে হ'লে তোমার অনুমতি দরকার নাকি?' একটু ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো বুলবুল, তারপরেই যেন নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, 'তুমি মিতুকে নিয়ে যেতে চাইলে আমার সাহায্য দরকার তাও তো আমি নতুন শুনলাম।' ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলো সে, তার চোখে একটা অস্বাভাবিক হলদে আভা দপ ক'রে জ্ব'লে উঠলো। হঠাৎ অন্য একটা কথা ঝিলিক দিলো আমার মগজে, যা এর আগে কখনো ভাবিনি, কিন্তু সে-মুহূর্তে তার চোখের দিকে তাকিয়ে যা নির্ভুল বলে জানলাম : মিতুকে সে হিংসে ক'রে, আমি তাকে ভালোবাসি ব'লে হিংসে ক'রে। আমি একটা টোপ ছুঁড়ে দিলাম বুলবুলকে, 'তুমি কি বিশ্বাস করতে পারো না যে তুমি গেলে আমার ভালো লাগবে?' আমার কথাটায় কপটতা ছিলো, আসলে বুলবুল ঠিক ধরেছিলো আমার অভিসন্ধি, 'শিখণ্ডী' হিসেবেই তাকে আমি চাচ্ছিলাম, কিন্তু ধরা প'ড়ে গিয়ে আমাকে এমন ভাব দেখাতেই হ'লো যেন বুলবুল না-গেলে আমার আনন্দ সম্পূর্ণ হবে না। কিন্তু আরো বেশি ধরা প'ড়ে গেলো বুলবুল, যখন বললো 'আমি একা গেলেও?' আমার কপটতা আর-এক ডিগ্রি চ'ড়ে গেলো এর উত্তরে, 'মিতু তোমার বন্ধু, আমি ভাবলাম সে থাকলে তুমিও খুশি হবে।' আস্তে মাথা নাড়লো বুলবুল—আর তার চোখে আর গলার আওয়াজে তার অভ্যস্ত নীরস নারীত্বহীনতা সে-মুহূর্তে ফিরে এলো—'না রণজিৎ, সিনেমায় আমি যাবো না, আমার সময় নেই। সময় যদি বা থাকে, কোথাও গিয়ে আমোদ করার মতো মনের অবস্থা নেই। তুমি জানো না, আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে।' 'তাই তো বলছিলাম, বাস্টার কীটনকে দেখে খুব খানিকটা হাসলে তোমার মন ভালো হ'য়ে যাবে।' 'আমার মন অত সহজে ভালো হবার নয়।' 'তাই বুঝি অন্যদেরও মন-খারাপ ক'রে দাও?' এর উত্তরে কঠিন গলায় বুলবুল বললো, 'এ-দেশে কারো সুখী হবার অধিকার নেই—' তারপর, হঠাৎ নরম সুরে—'তুমি ছাড়া।'

মাঝে অনেকগুলো দিন কেটে গেলো। য়ুনিভার্সিটি খুলে গেছে, দিন ছোটো হ'য়ে এলো, শীত আসতে দেরি নেই। কলেজ, বকুল-ভিলা, কখনো বা জোন্সের সঙ্গে বিকেল কাটানো, মাঝে-মাঝে বুলবুল, মাঝে-মাঝে বাড়িতে কাজলের সঙ্গে গালগল্প—সেই একইভাবে কাটছে আমার সময়, অন্তত পক্ষে বাইরে থেকে দেখলে। কিন্তু একদিন একটা ছোটো ঘটনায় আমাকে চমকে উঠতে হ'লো। বিকেলবেলা বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়েই দেখি, বুলবুল। সে দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে বললো, 'তোমাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখবো না, জানি তুমি মিতুর কাছে যাচ্ছো। শুধু একটা কথা বলতে এলাম।' 'কী, বলো?' 'তুমি কাল আবার জোন্সের কাছে গিয়েছিলে?' 'কী ক'রে জানলে?' আমার প্রশ্নের জবাব না-দিয়ে বললো, 'এখনো সময় আছে, এখনো আমার কথাটা রাখো, রণজিৎ, জোন্সের

বাড়িতে আর যেয়ো না।' 'তুমি কোনো অন্যায় অনুরোধ করলে তা রাখি কী ক'রে?' 'কিন্তু কেন এ-কথা বলছি তা কি তুমি জানো?' 'অনুমান করতে পারি হয়তো—কিন্তু, বুলবুল, আজ আর তর্ক করবো না তোমার সঙ্গে, সত্যি আজ ব্যস্ত আছি।' 'আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিতে পারো—দু-মিনিট?' তার দিকে তাকিয়ে আমার করুণ মনে হ'লো তাকে, উশকোখুশকো চুল, আধ-ময়লা আটপৌরে জামা-কাপড়, কোনো জৌলুশ নেই চেহারায়; আমার মনে হ'লো তার ভেতরে কোনো উত্তেজনা চলছে, আমাকে তার অংশ দিয়ে হালকা হ'তে চায়। 'কী হয়েছে?' 'নতুন কিছু হয়নি, রণজিৎ। আমার খুব কষ্ট হয় যখন ভাবি আমাদের দেশের এক শত্রুর সঙ্গে ব'সে তুমি চা-বিস্কুট খাও। 'আমি বাঁকা ঠোঁটে বললাম, 'ও-সব বুলি আমার কাছে আউড়িয়ো না।' 'এত অহংকার কেন তোমার, যে যা-কিছু তোমার মনোমতো নয় তাকেই "বুলি" ব'লে উড়িয়ে দাও? তুমি কি ভেবে দেখেছো জোন্স কেন এত মেলামেশা ক'রে বাঙালি-মহলে? কেন বাংলা শিখছে, বাংলা বই পড়ছে, আসে য়ুনির্ভার্সিটিতে ডীবেট করতে, বকুল-ভিলায় গানের আসরে? না—আমি জানি তুমি কী বলবে, আমাকে একটু বলতে দাও। হ'তে পারে সে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, হ'তে পারে সে গান ভালোবাসে, হ'তে পারে সে চটপট বিদেশী ভাষা শিখতে পারে, কিন্তু এই সব গুণ সে কোন কাজে লাগাচ্ছে তা কি ভাববে না তুমি? অমনি ক'রে সে ঘরে-ঘরে ঢুকে হাঁড়ির খবর টেনে বের করছে, সর্বনাশ করছে আমাদের! তুমি কি ভুলে থাকবে যে জোন্সই এই দাঙ্গা বাধিয়েছিলো ঢাকায় তাবপর হাওয়া খেতে দার্জিলিঙে চ'লে গিয়েছিলো, তারই জালে আটকে যাচ্ছে আমাদের ছেলেগুলো—সাপের মুখে ব্যাঙের মতো কপ্‌কপ্ ধরা প'ড়ে চালান হ'য়ে যাচ্ছে হিজলিতে বক্সারে? স্পাই—সাংঘাতিক স্পাই—ধূর্ত, জাহাঁবাজ শয়তান—এ-ই হ'লো তোমার আর্থার জোন্স!' আমি চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলাম, 'বিশ্বাস করি না।' 'আমরা জানি—আমরা প্রমাণ পেয়েছি।' 'ঠাণ্ডা গলায় কথাটা বললো বুলবুল,' কিন্তু আমি তার চোখে-মুখে রাগের আগুন দেখতে পেলাম। জবাব দিলাম, "আমরা" বলতে তুমি কী বোঝো জানি না। আমার কাছে কেউ "আমরা" নেই—সকলেই এক-একটি "আমি।" "আমরা" মানে আমরা—দেশের লোক। 'তাহ'লে তো আমিও তার মধ্যে পড়ি ব'লে মনে হচ্ছে। সেই আমি বা "আমরা" তোমাকে বলছি যে "তোমাদের" সব প্রমাণ একেবারে ভুয়ো, আর তোমার এই ধারণা একেবারে মিথ্যে। জোন্স অত্যন্ত খাঁটি মানুষ—আমি জানি—ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের জন্য সে মনে-মনে লজ্জিত, সে যে এই চাকরি নিয়েছে তাও দেশটাকে জানার জন্য, বোঝার জন্য, সে সজ্ঞানে এমন কিছু করতেই পারে না যাতে এ-দেশের কোনো ক্ষতি হবে। ইংরেজ শাসন একটা যন্ত্র, আর জোন্স একজন মানুষ, একজন ব্যক্তি—এ-দুটোর তফাৎ বোঝার মতো বুদ্ধি কি তোমার নেই?' হাসলো বুলবুল আমার কথা শুনে। 'তুমি নিজে ভালো, তাই সকলকে ভালো দ্যাখো। কতটুকু চেনো তুমি জোন্সকে? দু-চারটে বইয়ের কথা বলে, আর তাইতে তুমি গ'লে যাও। তুমি ভাবের জগতে ভেসে বেড়াও, তাই ভাবতেই পারো না যার মুখে মধু তার মন গরলে ভরা হ'তে পারে! কিন্তু দোহাই তোমার জোন্সের সঙ্গে মেলামেশা আর কোরো না তুমি, রমনার ঐ নির্জন পথে কবে কী হ'য়ে যায় বলা যায় না, 'আমি তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি।' আমি ঝাঁঝিয়ে উঠে বললাম, 'আমাকে ভয় দেখাচ্ছে?' 'ভয়ের কারণ নেই কী ক'রে বলি? জোন্স তোমাকে ব্যবহার করছে না, অন্যেরা যদি তা বিশ্বাস না ক'রে?' 'বলতে চাচ্ছো আমি তাকে খবর জোগাচ্ছি—অর্থাৎ, আমিও স্পাই।' হেসে উঠলাম আমি, বুলবুল চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। আবার বললাম, 'তুমি কি পাগল হ'য়ে যাচ্ছো, বুলবুল? তোমার হয়েছে কী?' নিশ্বাস ফেলে বললো, 'তাহ'লে আমার এই কথাটা রাখবে না তুমি?' আমি জবাব দিলাম না, বুলবুলও কথা বললো না, চুপচাপ কাটলো অনেকক্ষণ। বৃথা তর্ক; যা-কিছু আমার কাছে জোন্সের ভালোত্বের প্রমাণ, সেগুলোই তাকে অপরাধী করেছে বুলবুলের চোখে। জোন্স সাহিত্যপ্রেমিক, ভাষাতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনো করছে, এটা বুলবুলের মতে তার মুখোশ। সে যে স্বচ্ছন্দে সহজভাবে চলাফেরা ক'রে বেড়ায়, বন্ধু খোঁজে বাঙালিদের মধ্যে—আর তাও এই বিখ্যাত ও কুখ্যাত ঢাকায়, যেখানে এক বছর আগে লোম্যান

লোপাট হ'য়ে গিয়েছিলো, ষণ্ডামার্কা হুডসনও নিস্তার পায়নি—এটা, বুলবুলের ভাষায়, তার সবচেয়ে কুটিল চালাকি—অমনি ক'রেই সে ধাপ্পা দিচ্ছে আমার মতো, অনাদিবাবুর মতো ভালো মানুষদের। সে নাকি দেখাতে চাচ্ছে সে অন্য ইংরেজদের মতো নয়—বডিগার্ড নিয়ে পথে বেরোয় না, একজন 'ভারত-বন্ধু'র ভেক ধ'রে নিজের কাজ হাসিল ক'রে নেবে, এই তার আসল মৎলব। —কিন্তু সত্যি কি আমাকেও সন্দেহ ক'রে বুলবুল? না—তা অসম্ভব, সে যা কিছু বলছে সবই যেন শেখানো কথা, বানানো কথা —প্রাণপণে সে আঁকড়ে আছে এই কথাগুলোকে যেন এ-ই তার জীবনের সর্বস্ব। 'বুলবুল,' আমি হঠাৎ অন্য একটা যুক্তি খুঁজে পেলাম, 'তুমি বলছো জোন্সের কারসাজিতে ঢাকায় ছেলেরা সব ধরা পড়ছে। কিন্তু তুমি যে এখনো জেলের বাইরে আছো তাতেই কি প্রমাণ হয় না যে জোন্স নির্দোষ?' একটু চুপ ক'রে থেকে বুলবুল খুব নিচু গলায় বললো, আর বেশিদিন বাইরে থাকবো না। সেইজন্যেই, তোমার চোখের বাইরে চ'লে যাবার আগে, এই কথাগুলো তোমাকে বলতে এলাম। রণজিৎ, তুমি মিতুকে এত ভালোবাসো, আর তোমার দেশের এই মানুষগুলো, যারা ইংরেজের বুটের তলায় গুঁড়ো হ'য়ে যাচ্ছে, তাদের কি একটুও ভালোবাসতে পারো না?' আমি জ্বলে উঠে বললাম, 'আর যা-ই করো, মিতুকে টেনে এনো না এর মধ্যে!' 'কী! আমার মুখে মিতুর নামও তোমার সহ্য হয় না?' 'আমি আর্তভাবে ব'লে উঠলাম, 'বুলবুল, তোমার সঙ্গে কিছুই মেলে না আমার, তুমি আমাকে রেহাই দাও।' রেহাই? মানে—আমাকে আসতে বারণ করছো?' আমি কঠিন হ'য়ে বললাম, 'যদি দেখা হ'লে শুধু ঝগড়া বেধে যায়, তাহ'লে তো দূরে-দূরে থাকাই ভালো।' 'ও! এই তোমার মনের কথা?' নিশ্বাস ছাড়লো বুলবুল। 'বেশ, তা-ই হবে।' স্তব্ধতা নামলো আমবাগানে (আমরা প্রায় অচেতনভাবেই অভ্যস্ত স্থানটিতে চ'লে এসেছিলাম)—পাশাপাশি, কেউ কারো দিকে না-তাকিয়ে, রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। আর একটিও কথা বললাম না কেউ, আমার বাড়ির মোড়ে এসে অমি বুলবুলের কাছে বিদায় নেবার জন্য দাঁড়ালাম না।

তারপর—আধ ঘন্টার মধ্যে—আমি বকুল-ভিলায়। লগ্ন আমার অনুকূল ছিলো; মিতুকে পেলাম দোতলার বারান্দায় তার মা-বাবার সঙ্গে, কাছাকাছি আর-কেউ নেই। আমি দেরি করলাম না, আমার সব দ্বিধা ঝ'রে প'ড়ে গেলো, সেই বহুজল্পিত কয়েকটি শব্দ খুব সহজে বের ক'রে দিলাম মুখ দিয়ে : 'আমি মিতুকে বিয়ে করতে চাই।' ধরা দিলাম সে বন্ধনে যা আমার মুক্তি, যা আর ফিরিয়ে নেয়া যাবে না কোনোদিন। আমার মন শান্ত হ'লো; সে-রাত্রে অঘোরে ঘুমোলাম।

১৫

আপনার হাতের কাছে ঐ বোতামটা টিপবেন একবার?—ঐ যে, আপনার বাঁ দিকে। থ্যাঙ্কস। সন্ধে হ'য়ে এলো—আমার হুইস্কি-সন্ধ্যা। ব্যেরা, ড্রিঙ্কস। আপনার? কিছু না? না, না, তা কী ক'রে হয়, একটু কিছু নিন, এক ফোঁটা মিষ্টি শেরি অন্তত। ... চীয়ার্স। আঃ, গলাটা ভিজিয়ে বেশ লাগছে। আসুন তাহ'লে এই সন্ধ্যাকে অভ্যর্থনা জানাই, মদের গ্লাশ নিশেনের মতো তুলে ধ'রে, নির্ভয়ে। রোজ এই সন্ধেবেলাটাকে আপনার কি মনে হয় না একটা জন্মান্তরের মতো? দিন থেকে রাত্রি, আবার রাত্রি থেকে দিন—কী বিরাট এই বদলগুলো, অথচ কী সহজে মেনে নেয় লোকেরা, হনুমানের মতো এক লাফে সমুদ্রলঙ্ঘন ক'রেও ক্লান্ত হয় না। কিন্তু আমার মনে হয় বড্ড খাটুনি, যেন অনেকক্ষণ ধ'রে অনেক চেষ্টা ক'রে তবে পেরোতে পারি এক-একটা সন্ধিক্ষণ, পারি উঠে আসতে রাত্রি থেকে দিনে, তলিয়ে যেতে দিন থেকে রাত্রিতে। শেষরাত্রে ঘুম পায় আমার, কিন্তু ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েও টের পাই যে ঘুমুচ্ছি, টের পাই ভোর হ'লো, গায়ত্রী উঠে গেলো ড্রেসিংগাউন জড়িয়ে, আমি পাশ ফিরি, আর হঠাৎ আমাকে অতল ঘুম টেনে নেয়, কিন্তু যতক্ষণ ঘুমোই তার চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগে জেগে উঠতে। মনে হয় যেন সাঁতার কাটছি, ডুবে যাচ্ছি, মাথা তুলে নিশ্বাস নিচ্ছি মাঝে-

মাঝে। চোখ মেলে বুঝতে পারি না কোথায় আছি, যে-সব আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখছিলুম সেগুলি যেন আঁশের মতো জড়িয়ে থাকে চোখে; কখনো মনে হয় বক্সিবাজারে বাড়িতে শুয়ে আছি (পাশের ঘরে কাজল তাও মনে পড়ে), কখনো আথেন্সের জর্জ দি ফিফ্‌থ্‌ হোটেলে আধো-ঘুমে মিতুর চুলের গন্ধ, জানলার বাইরে পার্থেনন, মনে পড়ে, কিন্তু চোখ মেলে দেখি যাকে মিতু ভেবেছিলাম সে নেলি। কখনো শুয়ে-শুয়ে ভাবি, এটা কান্‌, আমি দু-দিনের জন্য বেড়াতে এসেছি, আমার এখনই ভূমধ্যসাগরের নীলিমার সঙ্গে চোখাচোখি করা উচিত। না—সকাল নয়, গভীর, গভীর রাত্রি, কেউ কোথাও জেগে নেই, আমার মাথার মধ্যে সমুদ্রের তোলপাড়, অন্ধকারে তাবার মতো মিতুর চোখ, ফেনায় ভেজা জলকন্যার মতো কাজলের শরীর। কিন্তু ঐ টুংটাং আওয়াজটা কিসের? জব্বলপুর, নেলির পিয়ানো, আমার কি কোর্টে যাবার সময় হ'লো, ঘড়িটায় কি অনন্তকাল ধ'রে আটটা বাজবে?—এমনি লুকোচুরি খেলে এই ঘরটা সকালবেলায়, আমার মনে হয় আমার জীবনটা যেন হাজার জায়গায় টুকরো হ'য়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, সেগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে জোড়া দিতে চাচ্ছে এই জেগে ওঠার মুহূর্ত—বড়ো পরিশ্রম—আমি ক্লান্ত—নিজেকে পুরোপুরি ফিরে পাবার চেষ্টায় আমি যেন নতুন ক'রে খানখান হ'য়ে যাচ্ছি। কী এসে যায় আর যদি না জাগি, আমার ঘুমের এখনো যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাইতে গুটিসুটি মুড়ি দিয়ে যদি চ'লে যাই এক অন্ধকার থেকে আর-এক অন্ধকারে? কিন্তু না—যতক্ষণ শরীর আছে ততক্ষণ সময় থেকে নিষ্কৃতি নেই; আমাকে কফি খেতে হয়, বাথরুমে যেতে হয়, দাড়ি না-কামালেও চলে না, তারপর ঐ পুবের বারান্দায় বসে মনে হয় আলো ভালো, আমি আলো চাই, প্রাঞ্জল দিন আমাকে ফিরিয়ে দেয় আমার বেঁচে থাকার সাহস; আমি কে, কোথায় আছি, আজকের তারিখ কত, ক-টা বাজলো, এ-সব বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। আর সেইজন্যেই সন্ধেবেলা আর-এক দফা যুদ্ধ চালাতে হয় আমাকে; অনেকগুলো ঘণ্টা আলোয় কাটাবার পরে অচেনা মনে হয় অন্ধকারকে; জীবনের যে-টুকরোগুলোকে গুছিয়ে নিয়েছিলাম সেগুলি আবার আলগা হ'য়ে যায়, যেন গলে যায় রাত্রির জোয়ারে—চিরকালের মতো নয় (তাহ'লে কোনো ভাবনাই ছিলো না), মাত্র বারো ঘণ্টার জন্য। তাই আমার ঘুমিয়ে পড়া নিয়ে এত সতর্কতা, আমি জানি একেবারে হারিয়ে গেলে চলবে না, কোনো-একটা কুটো আঁকড়ে থাকতে হবে এমনকি ঘুমের মধ্যেও, যাতে জেগে উঠে, হাৎড়ে-হাৎড়ে, সেই কুটো থেকেই আবার তৈরি ক'রে নিতে পারি এই বাড়ি, উটকামণ্ড শহর, এই জগৎ—আর আমার আমিত্বকে। বলুন তো, জীবনটা এমন কী মনোরম যার জন্য এত খাটুনি খাটা যায়?

কিন্তু না—এ-সব পরিশ্রমের কোনো পুরস্কার নেই তাও নয়। ঐ দুটি সময় আমাদের জীবনে, ঘুমিয়ে পড়া আর জেগে ওঠার আগেকার মুহূর্ত, যখন আমরা প্রায় অলৌকিক ক্ষমতা পাই, প্রায় হাতের মুঠোয় ধরতে পারি অতীতকে—জলবিন্দুর মতো ভঙ্গুর সেই মুহূর্ত, আমরা যার নাম দিয়েছি স্বপ্ন, কিন্তু আসলে যা আমাদেরই স্বরচিত—কোনো আহ্বান, কোনো উত্তর, কোনো সংলাপ, কোনো পুনরভিনয়। আমাদের হৃদয় স্বচ্ছ চোখে তাকিয়ে থাকে তখন—সব বোঝে, সব ক্ষমা করে। তখন ফিরে আসে তারই একটি সোনালি দিন যখন আমি নিশ্চিত জানি মিতুর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, তার মা-বাবা শিগ্‌গিরই আসবেন আমার মা-বাবার সঙ্গে কথা বলতে—আমি সুখী, কিন্তু অধৈর্যহীন, শান্ত, দীর্ঘ, সুদীর্ঘ বছর ভরে আমি অপেক্ষা করতে পারি মিতুর জন্য, আমার জীবনের লক্ষ্য আমি পেয়ে গিয়েছি, আর আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত হ'তে হবে না। বাতাস আমার বন্ধু, রোদ আর নক্ষত্র আমার সহায়, আমি নির্ভয়, আমি নিরাপদ। বাড়িতেও একটি বন্ধু আছে আমার, শুধু তাকেই আমি বলেছি সেই কথাটি—না-ব'লে পারিনি—যাতে আমি ভরপুর হ'য়ে আছি আজকাল—এই হেমন্তের সকালে আকাশ যেমন আলোয় ভ'রে যায়। 'কাজল-মামি, অন্য কাউকে বোলো না কিন্তু, আমি মিতুকে...' শোনামাত্র এক আশ্চর্য সুখ ছড়িয়ে পড়লো কাজলের মুখে, তার চোখ আরো উজ্জ্বল আর গাল আরো লাল দেখালো; আমার গালে হাত বুলিয়ে, চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে, তবু যেন তৃপ্তি হ'লো না তার, দু-হাতে আমার দু-হাত ধ'রে চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলো একটুক্ষণ। সে-

মুহূর্তে এই স্বার্থপর যুবকটিও বুঝেছিলো কাজল তাকে কত ভালোবাসে; বুঝেছিলো, নিজে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হ'য়েও অন্যের সুখে এতদূর পর্যন্ত সুখী হ'তে যে পারে, সে-মানুষ কত ভালো, কত নির্মল; হয়তো সেও তখন কাজলকে ভালোবেসেছিলো। সেই ক-টি দিন, সেই ক-টি সোনালি দিন আমার জীবনের! কাজল বোকা, কাজলের হালচাল নেই, ব্যক্তিত্ব নেই—এ-রকম কথাই বাড়িতে শুনে এসেছি বরাবর; আমিও, বকুল-ভিলার সেই সন্ধ্যার উন্মোচনের পরেও, দাঙ্গার মধ্যে বাধ্য হ'য়ে তার কিছুটা কাছে আসার পরেও—তার বিষয়ে অবজ্ঞা-আর-করুণা-মেশানো মনোভাব পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারিনি; তাকে আর ফটিক-মামাকে ঘিরে আমার যে-একটি স্বপ্ন ছিলো, তাও স্বার্থপর কারণে। কিন্তু সেই সময়ে কাজল আমার কাছে তার নিজেরই জন্য মূল্যবান হ'য়ে উঠেছে, একট নতুন সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছে তার সঙ্গে আমার, সে আমার সুখ অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে, হ'য়ে উঠেছে আমার অন্তরঙ্গ। রোজ রাত্রে, বকুল-ভিলা থেকে ফিরে, খাওয়া-দাওয়ার পরে মা-বাবা যখন শুয়ে পড়েন, তখন কাজলের সঙ্গে কিছুক্ষণ গালগল্প করি আমি—হালকা, ছেলেমানুষি কথা, আমার সুখের উচ্ছ্বাস, যা কাজল তার নিজের ক'রে নিয়েছে, যার মধ্য দিয়ে তার সঙ্গে আমার মনে-মনে ছোঁয়াছুঁয়ি চলে, কোনো তুচ্ছ কথায়, কখনো বা একসঙ্গে শব্দ ক'রে হেসে ওঠায়। আমি ভুলে গিয়েছি কাজলের পক্ষে এগুলো তার দুঃখী জীবনের ইচ্ছাপূরণ মাত্র, যেন প্রক্সিতে প্রেমের সুখ ভোগ করা, হয়তো কাজলও সে-কথা ভুলে গিয়েছে, এমনভাবে সে মিলিয়ে দিয়েছে নিজেকে আমার জীবনের এই সুন্দর মুহূর্তটির সঙ্গে, মিতুর আর আমার যৌথ ভবিষ্যতের সঙ্গে। তার সেই আধো-ঘুমন্ত শিথিল চেহারা এখন আর মনে প'ড়ে না আমার, সে যেন পেয়েছে এক নতুন সত্তা, যেন এইমাত্র পুরোপুরি জেগে উঠলো তার অন্তরের নারী—যাকে এর আগে চকিতে দেখেছিলাম একবার মাত্র, সেই বকুল-ভিলার সন্ধ্যায়, প্রথমে সূর্যাস্তের, তারপর ইলেকট্রিক আলোয়। কিন্তু যখন সে ছিলো অন্য তিনটি নারীর সঙ্গে মিলে-মিশে, তার স্বাতন্ত্র্য আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি—কিন্তু আজ সে অন্য কারো সংলগ্ন আর নেই; তার সঙ্গে আমার এমন একটি নিভৃত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে যে আমি তাকে মনে-মনে আমার ভবিষ্যতের অংশিদার না-ক'রে পারছি না। সেই হেশাম রোডের গোলাপি রঙের বাড়িটাকে নিয়ে এখনো খেলা ক'রে আমার কল্পনা, কিন্তু সেখানকার বাসিন্দা এখন আমি আর মিতু—আর আমার পূর্বতন ভূমিকাটি এখন আমি দিয়েছি কাজলকে, সে আসে মাঝে-মাঝে আমাদের কাছে বেড়াতে, হয় আমাদের নর্মসখী, আনন্দের সঙ্গিনী। সেই শহরেই যে ফটিক-মামা বাস করেন, সেই ভবানীপুরেই, কাজল যে ফটিক-মামার স্ত্রী, আপাতত আমার মা-বাবার অধীন, এ-সব কিছুই মনে প'ড়ে না আমার, তার সব সামাজিক পরিবেশ থেকে আমি কাজলকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়েছি—তার স্নেহে, তার মনোযোগে যেন আমারই অধিকার সকলের আগে—আমার, আর মিতুর। যেমন সূর্যোদয়ের সময়, শুধু দিগন্ত নয়, অনেকখানি পুবের আকাশ লাল হ'য়ে যায়, এমনকি, বায়ুমণ্ডলের কোনো চাতুরীর ফলে, পশ্চিমেও রঙিন আভা ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি মিতুর জন্য আমার ভালোবাসা মিতুকে পেরিয়ে কাজল পর্যন্ত পৌঁচেছিলো সেই সময়; আর কাজলও, তার দিক থেকে, মিতুর মাড়ানো পথ বেয়ে-বেয়ে, আমার হৃদয়কে স্পর্শ করতে পেরেছিলো। তাই আমি এখনো মাঝে-মাঝে দেখতে পাই কাজলকে, আমার আধো-ঘুমের চঞ্চল, জলের তলায়, কোনো সিক্ত কোমল জলকন্যার মতো, একটি রুপোলি রেখা যেন অন্ধকারকে ফুটো ক'রে দিয়ে, তক্ষুনি—কোনো জাল-ছিঁড়ে-পালিয়ে-যাওয়া বিদ্যুৎগতি মাছের মতো—আবার ডুবে যায় আরো অন্ধকারে, দূরতম, গূঢ়তম পাতালে। আবার মাঝে-মাঝে সেই আলোর মধ্যিখানে কালো একটি বিন্দু ফুটে ওঠে, কালো বড়ো হয় ক্রমশ, ছড়িয়ে পড়ে; আমি দেখতে পাই বুলবুলকে, আমাদের বাড়ির বাইরে রাস্তায়। 'আমি আবার এলাম—আসতেই হ'লো।' আমি কিছু না-ব'লে তাকালাম তার দিকে, মুহূর্তকাল দেরি ক'রে সে বললো, 'বিয়ে করছো? মিতুকে?' আমার মাথা নিচু হ'লো, হঠাৎ যেন লজ্জা পেলাম। 'ভাবছো আমি কী ক'রে জানলাম?' তোমাকে দেখেই বুঝেছি—তোমাকে সুন্দর দেখাচ্ছে আজ। আর তাছাড়া—এটাই তো আশা করা যাচ্ছিলো কিছুদিন ধ'রে, আমিই তো প্রথম

বলেছিলাম মিতুর সঙ্গে ঠিক মিলবে তোমার।' আমি বললাম, 'তোমার কী খবর?' 'খবর?' 'ঠোঁটের কোণে হেসে বললো.' 'একটু বেড়াবে আমার সঙ্গে? কয়েক মিনিট?' আমি ভদ্রতা ক'রে বললাম, চলো।'

হেমন্তের রোগা-হ'য়ে-যাওয়া সন্ধ্যা ছিলো সেদিন, পাৎলা শিশিরে ভেজা ঘাস ছিলো পায়ের তলায়, ছিলো আমবাগানে নিথর নির্জনতা, আর গাছগুলির ফাঁকে-ফাঁকে ফালি-ফালি আকাশ—হলদে, নীল, মলিন। বুলবুল আলগোছে কথা আরম্ভ করলো, 'কার্জন হল-এ আর্থার জোন্সের বক্তৃতা হচ্ছে কাল, তুমি যাবে না?' 'বক্তৃতা শুনতে ভালো লাগে না আমার।' 'আমি যাবো, ভারতীয় সভ্যতা বিষয়ে জোন্স কী ব'লে শুনতে চাই। তুমিও এসো না—ভারি একটা তামাশা হবে কাল।' 'তামাশা কেন?' 'জোন্স যদি আজ্ব ভারতবর্ষের স্তবগান ক'রে সেটা তামাশা ছাড়া আর কী?' আমি বললাম, 'শোনো বুলবুল, আবার যদি ও-সব বাজে কথা তোলো তাহ'লে আমি আর এক দণ্ড দাঁড়াবো না এখানে।' একটু সময় নীরব রইলো বুলবুল, মাথা নিচু ক'রে; আমি দু-একটা পাখির ডাক শুনলাম। তারপব দ্রুত ভঙ্গিতে মুখ তুলে খড়খড়ে গলায় বলে উঠলো, 'না—আর কথা নয়, এবার কাজ! দেখবে একটা জিনিশ?' হঠাৎ তার ব্লাউজের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বুলবুল বের করলো একটা—একটা—আমি সারা শরীরে কেঁপে উঠলাম, আমার চোখ ঝাপসা হ'লো, যখন দেখলাম সে তার ছোট্ট রোগা হাতের মুঠোয় একটা পিস্তল ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। ফিশফিশ ক'রে বললাম, 'বুলবুল, খেলনা দিয়ে ভয় দেখাচ্ছো আমাকে?' 'বীরের খেলনা, জর্মানিতে প্রস্তুত। দেখছো? এটা জোন্সের জন্য।' 'আমার গলা ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো,' 'বুলবুল! কী বলছো তুমি!' 'চুপ! চেঁচিয়ো না।' 'আমাব মুখে হাত চাপা দিলো সে, আমি তার কব্জি মুচড়ে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিলাম। বুলবুল ব'লে উঠলো, সাবধান! কার্তুজ পোরা আছে।' কিন্তু আমি কথা বলার মতো শক্তি হাবিয়ে ফেলেছি, আমার গলা দিযে যেন নিজেরই অজান্তে শুধু একটা আওয়াজ বেরোচ্ছে, 'না! না! না! না! না! না! না!, বুলবুল! জোন্স না! তুমি না!' হাসি ছড়িয়ে পড়লো বুলবুলের মুখে, বিজয়ের হাসি—উদ্ধত, উজ্জ্বল। 'এখন তো বুঝতে পারছো কেন আমি আবার এসেছি—তুমি বারণ করা সত্ত্বেও। এসেছি বিদায় নিতে। জোন্স ভালো হ'তে পারে, সাধু হ'তে পরে, কিন্তু সে ইংরেজ, ভারতবর্ষকে যারা শ্মশান ক'রে দিচ্ছে তাদেরই প্রতিনিধি, সেইজন্য—শুধু সেইজন্যই এটা দরকার। ওদের আর-একবার বুঝিয়ে দেয়া যে আমরা ওদের চাই না—ওরা যে-ভাষা বোঝে সেই ভাষাতেই। প্রতিমা দেবতা নয কিন্তু আমবা প্রতিমা পুজো করি—এও তেমনি। ছবি মানুষ নয়, কিন্তু ছবিতেও মাইকেল ও ডায়ারকে দেখলে আমাদের মধ্যে কার না ইচ্ছে ক'বে থুতু-ছিটাতে, লাথি মারতে? এও তেমনি। আর জোন্স যদি সত্যি নিবপরাধ হয় সেটা বরং আরো ভালো, তাহ'লে বোঝানো হ'বে ওবা ভালো হ'লেও ভুলবো না আমরা, আমরা দয়া চাই না, উপকার চাই না, ওদের তাড়াতে চাই, তাড়াতে চাই!' পাথরে ছুরি শান দেবার মতো আওয়াজ বেরোলো বুলবুলের গলা দিয়ে, কোনো আহত জন্তুর মতো তার নিশ্বাস। ঝাঁকে-ঝাঁকে কথা উড়ে এসে পোকার মতো আমার মগজের মধ্যে আটকে রইলো, মুখে শব্দ নেই—স্তব্ধ—সমস্ত শরীর-মন দিয়ে অনুভব করছি এমন এক উত্তেজনা যা আমাব কল্পনাতেও ছিলো না কখনো, আমার রক্তে যেন আগুন, লোমকূপে জ্বালা, আমার চোখ আটকে আছে পিস্তলটাতে, যা আমি হাতে ধ'রে আছি—ঠাণ্ডা ইস্পাত, কিন্তু বুলবুলের বুকের তাপে এখনো উষ্ণ, ভেতরেও আগুন পোরা, ঐ যুগ্ম তাপ ছড়িয়ে পড়ছে আমার শিরায়, কোন-এক মায়াবী স্পর্শে আমি জগৎসংসার ভুলে যাচ্ছি। ছোঁয়া দূরে থাক, পিস্তল আমি চোখেও দেখিনি কোনোদিন—সিনেমায় ছাড়া—খুব সম্ভব আমার সাত পুরুষে কেউ দ্যাখেনি—সেইটে আমার মুঠোর মধ্যে এখন, আশ্চর্য যন্ত্র, কী সুন্দর, কী নিটোল গড়ন, সুন্দর চোখা নল বসানো যার মধ্য দিয়ে মারাত্মক বেগে বেরিয়ে আসে বীরের বীর্য, অবরুদ্ধ তেজ, আক্রমণ, লুণ্ঠন, জয়।' আমি যেন মাতাল হ'য়ে উঠলাম এ-কথা ভেবে যে অতখানি শক্তিকে ভ'রে দেয়া যায় ঐটুকু একটা জিনিশের মধ্যে, যা একটি ছোটোখাটো রোগা মেয়ে ব্লাউজের তলায় লুকিয়ে ব'য়ে বেড়াতে পাবে, আর যা দিয়ে নিমেষের মধ্যে, কাউকে

কিছু বুঝতে না-দিয়ে, একটা পুরোপুরি জীবন্ত মানুষকে পুরোপুরি মেরে ফেলা যায়। আশ্চর্য, যে আমাদের এই জগতে, যেখানে ভালোবাসা এত দুর্লভ, এত কষ্টসাধ্য, এত রকম জটিলতার কাঁটায় ঘেরা, সেখানে হিংসা এমন অসাধারণ সরল, আর এত সহজ সেই হিংসার চরিতার্থতা। আমার যে-চোখ পিস্তল দেখে ধাঁধিয়ে গিয়েছে, তা দিয়ে বুলবুলের দিকে তাকালাম একবার; আধো-অন্ধকারে তার চোখের মণি জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো। সে-মুহূর্তে আমি অন্য রকম দেখলাম তাকে, আরো লম্বা, তার মুখে এক অদ্ভুত, দুর্বার আকর্ষণ, মাটিতে পা রেখে তার দাঁড়াবার ভঙ্গিটি এমন যেন তারই হাতে কর্তৃত্ব, দণ্ডনীতি, বিচারের বিধান।

'তুমি কাঁপছো, রণজিৎ, ওটা আমাকে দিয়ে দাও।' আমি এগিয়ে গেলাম তার দিকে, খুব কাছে দাঁড়িয়ে নিশ্বাসের স্বরে বললাম, 'সত্যি? ... সত্যি পারবে তুমি?' 'তোমাকে কাল আসতে বলছি তো সেইজন্যেই। দেখবে।' নিজের অজান্তেই তার ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়ে জিগেস করলাম, 'আর-কেউ নেই?' 'তাদের ধ'রে নিয়ে গেছে, রণজিৎ, কেউ-কেউ ফেরার। তাছাড়া—আমি চাই এটা—এটা আমারই কাজ—আমাকেই করতে হবে। এতেই সার্থকতা আমার জীবনের। আমি কারো স্ত্রী হবো না কোনোদিন, কারো মা হবো না, অন্য কিছুই হবে না আমাকে দিয়ে—আমার সাধ স্বপ্ন আশা ধ্যান যা-ই বলো তা শুধু এই—একটি ইংরেজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলা : "এই নাও তোমার ন্যায্য পাওনা চুকিয়ে দিচ্ছি।" মুখের কথায় নয়, তার বুকটাকে ফুটো ক'রে দিয়ে। 'যদি না পারো? যদি ফসকে যায়?' 'তবু—চেষ্টা তো করা যাক। তা-ই বা কম কী? তবু তো জানানো হবে কী চেয়েছিলাম।' 'আর যদি—যদি—' 'আন্দামান? ফাঁসি? ও-সব তো বাঁধা গৎ। কী বা মূল্য আমার জীবনের যার জন্য তা পুষে-পুষে রাখতেই হবে।' ঝাপসা হাসলো বুলবুল, আমি মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইলাম। তার কথাগুলো যেন আশ্চর্য মধুর কোনো মর্ফিয়া, আমি অবশ হ'য়ে যাচ্ছি, আমার যেন কিছুই বলার নেই এর উত্তরে;—বুদ্ধির, নীতির, বিবেকের যা-কিছু অতি স্পষ্ট পরামর্শ, সব মনে হ'লো অর্থহীন, অবান্তর; রোদ ওঠার পরে লণ্ঠনের মতো আমার সব যুক্তি এখন ফ্যাকাশে। আস্তে আমার হাত থেকে পিস্তলটি নিয়ে নিলো বুলবুল, ব্লাউজের মধ্যে ফিরিয়ে বেখে আঁটো ক'রে আঁচল গুঁজে দিলো। 'আমার যা বলার ছিলো বললাম। এবার তোমার ছুটি। কেন তোমাকে বললাম জানি না—কিন্তু ইচ্ছে করলো, ভীষণ ইচ্ছে করলো।—রণজিৎ, চলি তাহ'লে?' আমবাগান থেকে বেরিয়ে এসে বললো, 'তুমি আর এসো না আমার সঙ্গে। আমি চলি।' একটু সময় তাকিয়ে রইলো আমার দিকে; আমার মনে হ'লো তার দৃষ্টি আমার রক্তমজ্জা শুষে নিচ্ছে। তারপব দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলো, আমি তাকে বড়ো রাস্তার মোড়ে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে যেতে দেখলাম।

কিন্তু সে অদৃশ্য হওয়ামাত্র যেন মূর্ছা থেকে জেগে উঠলাম আমি। এ আমি কী করলাম, তাকে চ'লে যেতে দিলাম? পারতাম না কি আমি তাকে ফেরাতে, এখনো কি পারি না? আমার বুক ফেটে একটা নিঃশব্দ চীৎকার বেরিয়ে আসতে চাইলো, কুলকুল ক'রে ঘাম নামলো আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। না—এ আমি ঘটতে দেবো না, এ অসম্ভব! আমি বাড়ি এসে সাইকেল নিলাম, পুরো দমে চালিয়ে প্রথমে গেলাম কায়েৎটুলিতে বুলবুলের বাড়িতে—না, সে ফেরেনি। তারপর রাজার দেউড়িতে বিভাবতীর বাড়িতে। বিভাবতী কলকাতায় গেছেন, বুলবুল সারাদিনের মধ্যে সেখানে আসেনি। সে কি কোনো গোপন জায়গায় কাটাবে আজ রাত্রিটা, কালকেও সন্ধে পর্যন্ত সারাদিন—আমি কি আর তাকে খুঁজে পাবো না? তাহ'লে আমি কী করি এখন? থানায় খবর দিয়ে আসবো?—ছি! জোন্সের কাছে যাবো?—তাও অসম্ভব। আমাকে বাঁচাতে হবে—শুধু জোন্সকে নয়, বুলবুলকেও। কী তার উপায় তা কে আমাকে ব'লে দেবে? মুহূর্তে আমার সব-কিছু কী-রকম ওলোটপালট ক'রে দিয়ে গেলো বুলবুল। এটা কোন জায়গা? ঐ তো কলেজিয়েট স্কুলের মোটা-মোটা থামগুলো, সামনে ঘড়ি-বসানো হলদে রঙের গির্জে—ঐ ঘড়ির পড়ন্ত-রোদে-জ্বলা মুখের দিকে, স্কুলে যখন পড়তাম, বিকেলের ক্লাশে ব'সে-ব'সে কতবার গলা বাড়িয়ে তাকিয়েছি চারটে কখন বাজবে সেই আশায়—কেন আর ছেলেমানুষ নেই আমি, কেন বড়ো হলাম, কেন এই যন্ত্রণা

আজ, কেন এই বিরাট দায়িত্ব বুলবুল চাপিয়ে গেলো আমার ওপর? আমি অন্ধের মতো সাইকেল চালালাম খানিকক্ষণ, এলোপাথাড়ি দিগবাজার বাংলাবাজার সদরঘাট ঘুরে আবার সামনে দেখলাম কলেজিয়েট স্কুল, ভিক্টরিয়া পার্ক—নেমে পড়লাম সাইকেল থেকে, পার্কের বেড়ার ওপর দিয়ে তুলে আনলাম সাইকেলটা, ঘাসের ওপর লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়লাম। ভেজা ঘাস, টুপটাপ ঝ'রে পড়ছে শিশির, আর আকাশে—হঠাৎ চমকে উঠলাম আমি—চাঁদ, ডিমের মতো হালকা-সোনালি, শান্ত। সঙ্গে-সঙ্গে ধ্বক ক'রে উঠলো আমার বুকের মধ্যে, যাকে এতক্ষণ একেবারে ভুলে ছিলাম, সেই মিতুকে মনে পড়লো।

রাত বেশ এগিয়ে গেছে তখন, লার্মিনি স্ট্রিট নির্জন। পাৎলা কুয়াশায় মেশা জ্যোছনা ছড়ানো চারদিকে, ঠাণ্ডা চাঁদ, ম্লান আকাশ, গাছগুলি চাঁদের আলোয় অবয়ব হারিয়ে কালো ও ঝাপসা—সব শান্ত ও সুন্দর, বিষাদে আর স্তব্ধতায় ভরা। এ-রকম জ্যোছনা দেখলে নিজের মধ্যে খুব গভীরভাবে ডুবে যেতে ইচ্ছে ক'রে আমার, কিন্তু আজ যেন আমাকে নিজের মধ্য থেকে বের ক'রে নিয়ে আসা হয়েছে, আমি যেন আমার নিজেরই কাছে অনুপস্থিত। পার্কের ঘাসে শুয়ে চাঁদ দেখে মুহূর্তেরা জন্য যে-সান্ত্বনা পেয়েছিলাম, তাকে তাড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের ওপর চেপে বসেছে এই জগৎসংসার—আমি যার কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না; চাঁদের আলো যেন আমার পক্ষে এখন অবান্তর, আমার বরং অবাক লাগছে যে আজ রাত্রে, যখন মানুষের জগতে একটি ভীষণ ঘটনা তৈরি হচ্ছে, তখনও চাঁদ আর কুয়াশা এমন নির্বিকার, এমন গতানুগতিকভাবে সুন্দর। আমি ব্যাকুলভাবে ছুটে গেলাম না বকুল-ভিলার দিকে, বরং সাইকেলের বেগ কমিয়ে দিলাম, যেন মিতুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আর নিটোল নেই, তার কাছে যাবার আমি যোগ্য কিনা সে-বিষয়ে আমি নিজেই সন্দিহান। দু-দিকে বাড়ি, ঘরে-ঘরে নিশ্চিন্ত লোকজন, কেউ কিছু জানে না—কিন্তু আমি—আমাকেই জানতে হ'লো কেন, কেন এই ভীষণ ভার আমারই ওপর নেমে এলো, কেন এই অসহায় কষ্টের মধ্যে আমাকে ফেলে গেলো বুলবুল? সত্যি কি আমার সুখী হবার অধিকার আছে, যখন আমারই জীবনের প্রান্ত ঘিরে-ঘিরে জ'মে উঠতে পারে এত বড়ো বিরাট বিষাক্ত বেদনা, ফেটে যেতে পারে অমানুষিক বিস্ফোরণে? প্রাণ—দু-জন মানুষের প্রাণ, আর এমন দু-জন, যারা আমার কাছে অতি বাস্তব, জাজ্বল্যমান—সেই প্রাণ আজ বিপন্ন, এ আমি কেমন ক'রে ভুলে থাকবো? হত্যা—ভয়াবহ শব্দ, অকথ্য, অনুচ্চারণীয়! আর তাতে উদ্যত হয়েছে—অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য—কোনো গুণ্ডা নয়, ডাকাত নয়, লোভে বা আক্রোশে উন্মত্ত কোনো মানুষও নয়, একটি মেয়ে, তরুণী, মিতুর বন্ধু, নিঃস্বার্থ কর্মিষ্ঠ দেশপ্রেমিক বুলবুল। অথচ এমনও নয় যে তাকে দোষী ব'লে শাব্যস্ত ক'রে নিজের দায়িত্ব এড়ানো যায়—সে তো তার নিজের জীবনও বিকিয়ে দিচ্ছে: চরম পাপ, চরম ত্যাগ—এই দুটোকে নিজের মধ্যে মিলিযে দিয়ে সে সমালোচনার ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। ন্যায়-অন্যায়ের কোনো কথাই নেই এখানে,— আমি কষ্ট পাচ্ছি, বুলবুলের জন্য, জোন্সের জন্য সমান কষ্ট—আমি যদি তাদের বাঁচাতে না পারি তাহলে কোন মুখে আবার দাঁড়াবো মিতুর কাছে, ভালোবাসবো, বিয়ে করবো?

বকুল-ভিলায় বসার ঘরে ঢুকেই মা-মেয়েকে দেখলাম। স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে আছে দু-জনে, মুখ থমথমে। আমাকে দেখামাত্র মিতুর মা বলে উঠলেন, 'একটা সাংঘাতিক কাণ্ড হয়েছে, রণজিৎ। ওঁর পিস্তলটি চুরি গেছে।' আমার গলা দিয়ে যেন বমি উঠে এলো কথাটা শুনে, অস্ফুটে বললাম, 'কী বললেন?' 'ওঁর শিকারের বন্দুক-টন্দুক অনেক আগেই বেচে দিয়েছিলেন, শুধু একটি জর্মান পিস্তল হাতছাড়া করেননি—ওঁর বাবার খুব শখের জিনিশ ছিলো ওটা, তাঁরই স্মৃতি হিসেবে রেখেছিলেন। আমি কতবার বলেছি দিনকাল ভালো না, ও-সব আপদ বিদেয় করো, অন্তত ট্রেজারিতে জমা দিয়ে দাও, কিন্তু—' মিতুর মা-র গলা ধ'রে এলো, কথা শেষ হ'লো না। আমি জিগেস করলাম, 'সত্যি চুরি হ'য়ে গেছে? কোথাও নেই বাড়িতে?' 'কোথাও নেই। থাকতো ওঁর শিয়রে লোহার সিন্দুকে, চাবি নিজের কাছে রাখতেন, কিন্তু উনি তো একটু ভুলো মানুষ, কখনো হয়তো অসাবধানে

রেখেছিলেন—কী ক'রে হ'লো কে জানে।' 'উনি শেষ ক'রে দেখেছিলেন পিস্তলটা?' 'শেষ কবে...? তা তো ঠিক জানি না আমি—ও প'ড়েই থাকে সিন্দুকে মাসের পর মাস, হঠাৎ খেয়াল হ'লো তো একদিন খুলে পরিষ্কার করলেন—ঐটুকু তো সম্পর্ক।' 'শিগগির বের করেছিলেন কি —পরিষ্কার করতে?' 'হ্যাঁ, দিন দশেক আগে বের করেছিলেন বাবা,' জবাব দিলো মিতু। 'আজই ধরা পড়লো যে নেই?' 'আজই। এই খানিক আগে—সিন্দুক থেকে অন্য একটা জিনিশ বের করতে গিয়ে। উনি গেছেন থানায় রিপোর্ট করতে—ওঁকে নিয়েই না পুলিশে টানাটানি ক'রে এখন।' 'মিতু এক গ্লাশ জল দেবে?' ব'লে আমি তার পেছন-পেছন উঠে এলাম। ঢকঢক ক'রে জলের গ্লাশ খালি ক'রে বললাম, 'এসো এই সিঁড়িতে একটু বসি।' সেই বারান্দা—যেখানে আমার জীবনে প্রথম নারী-সত্তার উপলব্ধি। সেই বাগান, যার গাছপালার ফাঁক দিয়ে মিতুর মুখে সূর্যাস্তের আলো এসে পড়েছিলো। চাঁদের আলোর এখন অচেনা দেখালো গাছগুলোকে, যেন অনাত্মীয়, মানুষের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, কুয়াশায় মোড়া কোমল রাত্রিটি যেন কোনো নাটকহীন, নায়কহীন মঞ্চের অবাস্তব দৃশ্যপট মাত্র। আর মিতু, আমার ভাবী স্ত্রী, যাকে আমি সবচেয়ে ভালোবাসি, যে আমার পাশে ব'সে আছে—তাকে মনে হচ্ছে দূরের কোনো মানুষ, যেহেতু তাকে বলতে পারছি না যা আমি জানি, বলতে পারছি না তার বাবার পিস্তলটি আমি দেখেছিলাম, ছুঁয়েছিলাম—মাত্র ঘণ্টা তিনেক আগে। সুখ, তুমি কি কখনো ফিরে আসবে আবার? সে কোন সোনালি দেশ, স্বপ্নের দেশ, যেখানে ভালোবাসা সহজ? মিতু বললো, 'আমার ভয় করছে, রঞ্জু। বাবাকে কিছু করবে না তো ওরা?' চেষ্টা ক'রে বললাম, 'কী আশ্চর্য! যাঁর জিনিশ চুরি গেছে, তাঁকে কিছু করবে কেন? শোনো—বুলবুল এসেছিলো নাকি আজ? আমাদের এখানে?' 'না তো। অনেকদিন দেখা নেই বুলবুলের।' 'অনেকদিন? ক-দিন?' 'তা আট-দশ দিন হবে। মাঝে একদিন এসেছিলো, আমরা কেউ বাড়ি ছিলাম না তখন।' আমাব মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, 'ও'। 'কী বললে? তুমি কী ভাবছো বলো তো?' 'না, কিছু না। মিতু—' 'কী?' আমার মনের মধ্যে একটি সংকল্প গ'ড়ে উঠছিলো ধীরে-ধীরে, প্রথমে ঐ জোছনা-মাখা কুযাশাব মতো ঝাপসা, তারপর—যেমন কোনো নামহীন অস্বস্তি থেকে হঠাৎ একটি ছন্দে-বাঁধা সুন্দর পঙ্‌ক্তি লাফিয়ে ওঠে কবির মনে, আর তখন তিনি জানতে পারেন যে একটি কবিতাকে তিনি পেয়ে গেছেন—তেমনি আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমাকে এখন কী করতে হবে। আমি তাকালাম মিতুর দিকে, আমার বুকের মধ্যে চীৎকার উঠলো, 'মিতু, এসো আমরা অনেক দূবে কোথাও চ'লে যাই, এখানে বুলবুল আমাদের বাঁচতে দেবে না।' কিন্তু না—কিছু বলার উপায় নেই—একটি ছাড়া সব রাস্তা বন্ধ—আমি বোধহয় দম আটকে ম'রে যাবো। মিতু বললো, 'তুমি যেন কী বলতে গিয়ে থেমে গেলে?' 'না—অমনি ডাকলাম তোমাকে, ডাকতে ভালো লাগলো।' আমি মিতুর একটু কাছে স'রে এলাম, তার চুলের সূক্ষ্ম সুবাস মুহূর্তের জন্য উড়ে এলো। আবার বললাম, 'মিতু! কী সুন্দর নাম, কী সুন্দর তুমি!' বাইরে ঘোড়ার খুরের শব্দ হ'ল, আমরা বসার ঘরে এলাম। অনাদিবাবু ঘরে ঢোকামাত্র মা-মেয়ে একসঙ্গে ব'লে উঠলো, 'কী হ'লো?' 'কী আবার হবে। থানায় ডায়েবি ক'রে এলাম।' 'তারপব? কোনো হাঙ্গামা হবে না তো এ নিয়ে?' 'হাঙ্গামা হবে কেন? কে না চেনে আমাকে ঢাকায়? বন্দুকের লাইসেন্স আমাকে আর দেবে না অবশ্য—তা ভালোই ও-সব পাপ ঘরে পুষতে চাই না আমি। ছিলো একটা পুরেনো জিনিশ—গেলো।' মিতুর মা খুঁটে-খুঁটে জিগেস করলেন পুলিশের লোকের সঙ্গে কী কথাবার্তা হ'লো তাঁর, কিন্তু অনাদিবাবু হাত নেড়ে বললেন, 'থাক এ-সব কথা। এই যে রঞ্জু, কতক্ষণ? তোমরা অত গম্ভীর হ'য়ে আছো কেন সবাই? এবারে একদিন লোকজন ডাকতে হয় বাড়িতে, এখনই কাউকে কিছু বলা হবে না অবশ্য—' একবার মেয়ের দিকে, একবার আমার দিকে চোখ ফেললেন তিনি—তবে উৎসব এখন থেকেই শুরু হ'তে পারে। জানিস মিতু, কানাই বসাকের চোদ্দ বছরের ছেলেটির নাকি আশ্চর্য তবলার হাত, তের সঙ্গে সঙ্গত করার জন্য তাকে ডাকবো একদিন।' মা-মেয়ের মন হালকা ক'রে দেবার চেষ্টা করলেন অনাদিবাবু, কিন্তু থেকে- থেকে একটি মেঘ ভেসে যেতে লাগলো তাঁর মুখের ওপর দিয়ে। আমি

তাঁর লুকোনো উৎকণ্ঠা টের পেলাম; তিনি—গান্ধীভক্ত, অহিংসবাদী, পরোপকারী হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, তাঁরই পিস্তল দিয়ে কোনো হত্যাকাণ্ড সাধিত হ'তে পারে, এই আশঙ্কা তিনি কাটাতে পারছেন না। ঢাকায় আজকের দিনে পিস্তল চুরি হওয়ার আর তো কোনো অর্থ নেই। আমার দুরন্ত লোভ হ'লো তাঁকে আলাদা ডেকে নিয়ে একটা কথা বলি—কিন্তু না, তিনি, তাঁর স্ত্রীর, তাঁদের নিরুপমা, প্রিয়তমা কন্যা—এঁরা অন্তত শান্তিতে ঘুমোন আজ রাত্রিতে, সব জ্বালা আমার, সব কষ্ট আমার হোক। মুহূর্তের জন্য নিজেকে আমার মনে হ'লো দেবতার মতো শক্তিশালী —অন্যদের ভাগ্য আমার হাতে, অন্যদের সুখশান্তি জীবন মৃত্যুর আমি অধীশ্বর—অন্তত কয়েক ঘণ্টার জন্য, আগামীকালের সন্ধ্যা পর্যন্ত। যারা পিস্তল হাতে ইংরেজ হত্যায় এগিয়ে যায়, তাদের ত্যাগ ও দম্ভের উন্মাদনা আমি অনুভব করলাম সেই মুহূর্তে; মনে হ'লো কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে দেবতায় রূপান্তরিত করতে পারলে, নীতি, ধর্ম, বিবেক, এমনকি মৃত্যুভয়ের ঊর্ধ্বে উঠতে পারলে, কে না রাজি হবে এই জীবনটাকে জঞ্জালের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিতে? কিন্তু তারপরেই মিতুর চোখে চোখ পড়লো আমার; আমি দেখলাম তার মুখ ফ্যাকাশে, ঠোঁট শুকনো—আমার শরীব, আমার মন, আমার আত্মা, যা-কিছু দিয়ে তৈরি এই আমি—সব যেন উন্মাদ বেগে তার দিকে ছুটে গেলো; আমি চোখ সরিয়ে নিলাম অন্যদিকে, আমার হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি স্পন্দন অনবরত আমাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলতে লাগলো, 'মিতু, তুমি ভালো থেকো। তুমি ভালো থেকো।' অনাদিবাবু আমাকে খেয়ে যেতে বললেন. আমি রাজি হলাম—শুধু মিতুর সঙ্গে আরা কিছুক্ষণ থাকার জন্য। কিছু খাওয়ার অভিনয় করতে হ'লো আমাকে, কথাও বলতে হ'লো। তারপর—বকুল-ভিলার কম্পাউন্ড, কুয়াশা-মাখা জ্যোছনা, মিতু আর আমি পাশাপাশি হাঁটছি, সে আমাকে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছে। একটু দাঁড়ালাম। বেবিয়ে আসার আগে। মিতু বললো, 'কাল এসো কিন্তু।' আর-একবার তাকালাম আমি তার দিকে—আমার স্বপ্ন, আমার আশ্রয়, আমার যৌবন, নিরপরাধ পুণ্যময় জীবন আমার—সেই সব-কিছুকে পেছনে ফেলে এক ঝটকায় উঠে পড়লাম সাইকেলে।

বাড়ি এলাম, বাত বাড়লো, ঘরে-ঘবে ঘুমিয়ে পড়লো সবাই। কিন্তু ঘুম আমাকে ছেড়ে চ'লে গেছে, ক্লান্তি আমাকে ছেড়ে চ'লে গেছে। আমি শুধু ভাবছি কালকেব সন্ধের কথা—যখন আমি কার্জন হ'ল-এ যাবো, চোখে-চোখে রাখবো বুলবুলকে, ঠিক মুহূর্তটিকে বাধা দেবো তাকে। সহজ—এব চেয়ে সহজ আর কী? ফলাফল? যা হয় হোক। অদৃষ্টের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই, নয়তো এ-কাজ আমাকেই কেন করতে হবে, যে-আমি এর সবচেযে অযোগ্য? বার-বাব দৃশ্যটিকে সাজাচ্ছি মনে-মনে—এই শুই, এই উঠে বসি, এই পাইচারি করি মেঝেতে; অন্য যা-কিছু ভাবাব চেষ্টা কবি তাসের বাড়িব মতো ধ্ব'সে প'ড়ে সব। মনে প'ড়ে আর্থার জোন্সকে—তার সুশ্রী চেহারা, লাজুক ভঙ্গি, নরম কথা বলার ধরন। মনে প'ড়ে ছোট্ট রোগা বুলবুলকে, কুয়াশার মধ্যে অস্পষ্ট হ'যে তার মিলিয়ে যাওয়া। ফেরার পথে আর-একবার থেমেছিলাম বুলবুলের বাড়িতে, শুনলাম সে কুর্মিটোলায় মাসির কাছে বেড়াতে গেছে, কাল ফিরবে। অর্থাৎ—সকলের নাগালেব বাইবে সে লুকিয়ে থাকবে, কাল সন্ধে পর্যন্ত। কালকেই আমি মুখোমুখি হবো তার সঙ্গে। কিন্তু —সত্যি কি আমি পারবো এ-কাজ? নিশ্চয়ই—পারতেই হবে। তারপর? যদি কোনো বোঝার ভুল হয যদি আমাকেও দাঁড়াতে হয় কাঠগড়ায়, যদি আইনের প্যাঁচে প্রমাণ হ'য়ে যায় আমিও অপরাধী? যদি এমন হয় যে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে পিস্তলের গুলি ছুটে গিয়ে ঠিক জোন্সকেই বিঁধলো? আমি তখন কী ক'রে প্রমাণ করবো যে আমিই খুনে নই? জেল? আন্দামান? ফাঁসি? না—না—আমি পাববো না, আমি পারবো না। আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও, বুলবুল—আমি মিতুকে চাই, আমি মিতুকে ভালোবাসি। আমি ভালোবাসি কবিতা, ভালোবাসি আকাশ—মেঘ —বইয়ের গন্ধ। আমি বাঁচতে চাই—তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, বুলবুল। বলো, আমি কি তোমার কোনো কাজে লাগতে পারি, যার বিনিময়ে অনাদিবাবুর পিস্তলটি তুমি ফিরিয়ে দেবে আমাকে? বুলবুল, তোমার কি ইচ্ছে ক'রে না সুখী হ'তে, অন্যকে সুখী করতে—তুমি কি কাউকে কোনোদিন ভালোবাসোনি? আমি

তো কোনো ক্ষতি করিনি তোমার, আমাকে এই শাস্তি দিলে কেন? ...আমি টেবিলে লণ্ঠনটা জ্বেলে রেখেছিলাম, উস্কে দিয়ে একটা বই খুলে বসলাম, কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টা ক'রেও একটি কথার মানে বুঝতে পারলাম না। এখনো কি আছে সেই জগৎ, যেখানে লোকেরা কবিতা পড়ে, গান শোনে, কবিতা লেখে, গান গায়? যদি পিস্তলের গুলি আমাকেই ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়, ঠিক এখানটায়, আমার হৃৎপিণ্ড ফেটে যাচ্ছে যেখানে? আমি কি ম'রে যাবো? এ-ই কি শেষ রাত্রি আমার জীবনের? আমি ঠেলে দিলাম বইটাকে, চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলাম, হঠাৎ মনে হ'লো এখনো অনেক সময় আছে, এখনো অনেকগুলো, অনেকগুলো ঘণ্টা আমি বেঁচে আছি। আমার কি দু-একটা চিঠি লিখে রাখা উচিত—একটা মিতুর, আর-একটা আমার মা-বাবার জন্য? পরে যদি আর সময় না হয়? শোনো—আমি বোধহয় বড্ড বাড়িয়ে তুলছি ব্যাপারটাকে; ইচ্ছে করলে—শুধু ইচ্ছে করলেই আমি তো বেরিয়ে আসতে পারি এই আগুনের বেড়া থেকে। কাল বাড়িতে ব'সে কাটিয়ে দেবো সারাদিন? চ'লে যাবো সকালের প্রথম লঞ্চে পিসিমার কাছে মুন্সীগঞ্জে? আমার স্নায়ুতন্ত্রী মুচড়ে-মুচড়ে কেউ যেন বার-বার বলতে লাগলো, 'বুলবুল—আর্থার জোন্স— এদের নিয়ে এত ভাবছো কেন তুমি? তারা কি তোমার মা-বাবার চেয়ে বেশি? মিতুর চেয়ে বেশি? মিতু, তোমার মিতু, যাকে তুমি কথা দিয়েছো, যে অপেক্ষা করবে তোমার জন্য যতদিন তুমি বলবে, যার সুখ, জীবন, ভবিষ্যৎ সব নির্ভর করছে তোমার ওপর—তুমি কি তাকে বলি দেবে একটা গোঁয়ার মেয়ের খেয়ালের কাছে, তোমার জীবনে যার কোনো অর্থ নেই, যার ধ্যান-ধারণা ক্রিয়াকর্ম সবই তোমার একেবারে উল্টো? কোনো উন্মাদ যদি কোনো নির্দোষ মানুষকে হত্যা করে, তুমি কী করতে পারো? খুব সম্ভব বুলবুলের হাত কেঁপে গুলি ফশকে যাবে, জোন্সের গায়ে আঁচড়ও লাগবে না, বা হয়তো শেষ পর্যন্ত সাহস পাবে না বুলবুল, বা জেগে উঠবে তার মনুষ্যোচিত দয়া, নিজের জীবনের প্রতি মমতা—হয়তো বা তার ধুম জ্বর আসবে কাল, বা তার বাবা হঠাৎ মারা যাবেন—কত কিছু হ'য়ে যেতে পারে এখন থেকে কাল সন্ধের মধ্যে। তুমি শান্ত হও, ঘুমোও, মিতুকে ভাবো—যদি তুমি আর মিতু সুখী হও, যদি তুমি কখনো কিছু ভালো কবিতা লিখে উঠতে পারো, তাতেই কি সত্যিকার লাভবান হবে না এই জগৎ, বুলবুলের এই ভারতবর্ষ?' ...বুদ্বুদ— বুদ্বুদের মতো ভাবনা এ-সব, ভেসে উঠেই মিলিয়ে যায়; জেলখানার কয়েদি যেমন স্বপ্নে তার গ্রামের বাড়িতে ফিরে যায়, এও তেমনি; আমি বাধ্য, কে আমাকে বাধ্য করেছে জানি না; আমি আর স্বাধীন নেই, আমার ইচ্ছেগুলো পাথরের তলায় চাপা প'ড়ে গেছে। যতবার যেদিক থেকেই ভাবি, সেই একই জায়গায় পৌঁছে যাই শেষ পর্যন্ত—কার্জন হল, বুলবুল, আর্থার জোন্স। না—পারি না, আর ভাববো না আমি, আর ভাবতে পারি না—ভগবান, আমাকে দয়া করো!

একটা খশখশে শব্দ হ'লো আমার পেছনে, চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি—দরজার কাছে কাজল। মনে পড়লো কাজল শুতে যাবার আগে একবার আমার ঘরে এসেছিলো—রোজকার মতো গল্প করার জন্য—আমি বলেছিলুম আমার জরুরি পড়া আছে আজ। এতক্ষণ একেবারে ভুলে ছিলুম তাকে, দেখে অবাক লাগলো—মনে হ'লো কোনো প্রেতলোকে জীবিত মানুষের আবির্ভাব। কাজল এগিয়ে এসে বললো, 'কী হয়েছে রঞ্জু, তুমি এখনো ঘুমোওনি?' 'এই শুতে যাচ্ছিলাম, তুমি উঠে এলে কেন?' 'হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেলো, তুমি কি পাইচারি করছিলে একটু আগে? এক্ষুনি একটা গোঙানির মতো শুনলাম যেন।' আমি জবাব না-দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম; কাজল বললে, 'এ কী চেহারা হয়েছে তোমার! অসুখ করেনি তো? দেখি—' আমার কপালে, গালে হাত রেখে তাপ অনুভব করলো সে। 'না—জ্বর ব'লে তো মনে হচ্ছে না—কিন্তু কিছু-একটা হয়েছে আমি বুঝতে পারছি। কী ভাবছো—কী ভাবছিলে—এত রাত অবধি জেগে ব'সে আছো কেন?' আমি তাকালাম কাজলের দিকে—ঘুম-ভাঙা ফোলা-ফোলা চোখ তার, তার ভরপুর শরীরটিকে ঢাকতে গিয়ে ফুলে উঠেছে তার শাড়ির আঁচল; আমি তার মধ্যে দেখলাম যা-কিছু আমি হারাতে বসেছি—স্বাস্থ্য, স্বাভাবিকতা, জীবন, জীবনের স্বাদ; আমার জন্য উৎকণ্ঠা, স্নেহ, মমতা নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে

আমার সামনে, কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে শেষ সৈনিকের হাতে স্বদেশের নিশান যেন তার গায়ের আঁচল, বা যেন ডুবন্ত নৌকো থেকে দেখা কোনো আলোকস্তম্ভ সে, বা যেন, আমি যখন অগাধ জলে হাবুডুবু খাচ্ছি, কেউ নৌকো থেকে রশি বাড়িয়ে দিয়েছে আমার দিকে। একটা পাগল ইচ্ছার ঢেউ উঠলো আমার মনে, পাথর ফেটে বেরিয়ে এলো স্রোত : বলবো, তাকে আমি সব বলবো, আমার কষ্টের একজন সাক্ষী রাখবো অন্তত, অন্তত একজনের সঙ্গে ভাগ ক'রে নেবো এই মর্মান্তিক রাত্রিটিকে। নির্বোধ অসহায় শিশুর মতো আমি হ'য়ে গেলাম সেই মুহূর্তে, বিহ্বল কোনো মাতালের মতো; আমি দুই হাতে কাজলকে জাপটে ধ'রে তার কাঁধের ওপর মাথা রাখলাম, কেঁপে উঠলাম সারা শরীরে থরথর করে, কথা বলতে গিয়ে আটকে গেলো গলা, তারপর আমার চোখ ফেটে বুক ফেটে গলা ছিঁড়ে কান্না নেমে এলো। আরাম— আমি বেঁচে গিয়েছি— নৌকাডুবির পরে স্যাঁৎরে-স্যাঁৎরে বিধ্বস্ত হ'য়ে পায়ের তলায় মাটি পেয়েছি এতক্ষণে। কাজলের আঙুলগুলি আমার চুলের মধ্যে, আমার কানের কাছে ফড়িঙের পাখার মতো তার গলার আওয়াজ— 'কী? কী? কী হয়েছে, রঞ্জু? কী হয়েছে?' আমার কান্নার বেগ ক'মে এলো, আমি মুখ তুললাম, সে হাত দিয়ে আমার চোখের জল মুছে দিলো। 'বলো। আমাকে বলবে না?' কিন্তু ততক্ষণে অন্য এক পিস্তলের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে আমার রক্তে, আমি কাজলকে আর দেখতে পাচ্ছি না, শুধু অনুভব করছি এক স্পর্শময়ীকে, আমার গলার ওপরে তার নিশ্বাস, আমার শূন্যতা ভ'রে তার শরীর। যদি তা-ই হয়, যদি কালকের পরে হারিয়ে যায় আমার চেনা পৃথিবী, যদি আমাকে কালকেই মরতে হয়, তাহ'লে কি আমি কখনো জানাবো না নারীর স্বাদ—প্রেমের স্বাদ—ঐ আমার গভীরতম এক বাসনাকে অপূর্ণ রেখেই কি বিদায় নিতে হবে? আমার এতদিনে রুদ্ধ কামনা অদম্য হ'য়ে উঠলো, আমি কাজলকে টেনে নিয়ে এলিয়ে পড়লাম বিছানায়। 'রঞ্জু, রঞ্জু, রঞ্জু, রঞ্জু—' দুর্বলভাবে সে বাধা দিলো আমাকে, তারপর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, ঝড়ের মতো তার নিশ্বাস, হাতুড়ির মতো বুকের শব্দ, আমার মুখের মধ্যে এক অলৌকিক ফেনিল আগুনের শিখার মতো তার জিভ, আমার ঠোঁটের ওপর তার সজল দাঁত থেকে ঝরে পড়ছে এক বিশাল মূর্ছা, আমি তার বুকের মধ্যে বৈদ্যুতিক পরমাণুতে বিচূর্ণ হ'য়ে যাচ্ছি। কিছু নেই—জগৎ নেই দায়িত্ব নেই, যন্ত্রণা নেই—সে আর আমি শুধু—না, আমরাও নেই আর : এরই নাম মুক্তি, নির্বাণ, মৃত্যু।

১৬

দেখলেন, এরই মধ্যে রাত ভারি হ'লো, অন্ধকার। অচেনা এক জগৎ বাইরে। কিন্তু—আমি নিশ্চিন্ত। দেখুন কেমন ছোটো আমাব ঘর। দেয়ালে ঘেরা, আলো জ্বলছে, ভারি পর্দা জানলায়। প্রচুর মদ আছে আমার, গায়ত্রী আছে। আমার ভয় নেই। গুর্খা দারোয়ান, অ্যালসেশান দুটো সারা রাত টহল দেয়। আমার ভয় নেই।...আজ্ঞে? আমার মদ্যপানের ক্ষমতা দেখে অবাক হচ্ছেন? থ্যাঙ্কিউ, ও-বিষয়ে সত্যি আমি ছোটোখাটো একটি চ্যাম্পিয়ন। আপনি চিন্তিত হবেন না তাই ব'লে। কিছু হয় না আমার। দেখুন, পরীক্ষা ক'রে দেখুন, যে-কোনো কঠিন শব্দ উচ্চারণ করতে বলুন, জিগেস করুন বানান, ভূগোলের প্রশ্ন, ইতিহাসের তারিখ—যা আপনার ইচ্ছে। কী? এই ফিকিরে জেনে নিতে চাচ্ছেন পুরোনো কথা, গোপন কথা? আপনি তো ভারি চালাক লোক, মশাই; যা জানেন, বহুদিন ধ'রে জানেন, তা-ই আবার বলিয়ে নিতে চান আমাকে দিয়ে? কেন, আপনি কি ছিলেন না সেদিন কার্জন হল্-এ, দূর থেকে কি দেখছিলেন না আমাকে, বুলবুলকে—এতক্ষণে সব কি আপনার মনে প'ড়ে যায়নি? একেবারে সামনের সারিতে ব'সে আছে বুলবুল, আমি দাঁড়িয়ে থামের আড়ালে করিডরে, বুলবুল আমাকে দেখতে পাচ্ছে না, তার চোখে একমাত্র দৃশ্য এখন আর্থার জোন্স, যেমন আমার চোখে—সে। আমি আমার চোখ দুটোকে আটকে রেখেছি বুলবুলের

ওপর—ভীষণ, ভীষণ মনোযোগে। ঝাপসা আওয়াজ—জোন্সের বক্তৃতা—হাওয়ার শব্দ, পাতার শব্দ, অর্থহীন। ঝাপসা অন্য সব মুখ, অস্তিত্বহীন। পাখির মুণ্ডটি ছাড়া আর-কিছু দেখতে পাননি অর্জুন, তেমনি খেলা বুলবুলের সঙ্গে জোন্সের, আবার আমার সঙ্গে বুলবুলের। আমার চোখ ফেটে যাচ্ছে, এক-একটি মিনিটকে মনে হচ্ছে অনন্তকাল। তারপর—ঐ বুলবুল উঠলো, তার হাত নেমে এলো তার ব্লাউজের দিকে—আমি ছুটে গিয়ে তাকে জাপটে ধরেছি। একটা প্রচণ্ড শব্দ, ধোঁয়া, বারুদের গন্ধ, লোকজনের চীৎকার।

আচ্ছা, আমি কয়েকদিন হাজতে ছিলাম—তা-ই না? ঠিক মনে আছে আপনার? তারপর?...ও, হ্যাঁ। বেরিয়ে এসে শুনলাম, জোন্স অনেক ধরাধরি করেছিলো আমার হ'য়ে, কিন্তু তার চেষ্টাও মিতুকে বাঁচাতে পারেনি। মিতু এখন ডেটিন্যু, আপাতত আছে ঢাকা জেলে, শিগগিরই বদলি হবে অন্য কোথাও। দেখা করার অনুমতি চাইলাম, পেলাম না। তারই বাবার পিস্তল, তারই বন্ধু বুলবুল; অতএব তাকে আটকে না-রাখলে পঞ্চম জর্জের সাম্রাজ্য নাকি টেকে না। বিভাবতী ধরা পড়লেন কলকাতায়; জোন্স বদলি হ'লো রাজসাহীতে। আমি দু-মাস প'রে চাঁদপাল ঘাটে 'সিটি অব ক্যালকাটা জাহাজে উঠলাম। বিলেতে আমাকে যেতেই হ'লো। দেশে থাকলে পুলিশের দৃষ্টি এড়ানো যাবে না। অবিলম্বে আমাকে বিলেতে পাঠিয়ে দিলে আমার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ প্রত্যাহার করা হবে—এমনি একটা আশ্বাস নাকি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট দিয়েছিলেন আমার বাবাকে। তাছাড়া—বেনামী চিঠিও পাচ্ছিলাম মাঝে-মাঝে : 'আর্থার জোন্সকে তুমি বাঁচালে, কিন্তু ভেবো না আমাদের প্রতিহিংসা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে। বুলবুল তোমারই জন্য ধরা পড়লো, আমরা তোমাকে নিস্তার দেবো না।' একদিকে পুলিশ, আর-একদিকে বুলবুলের 'আমরা'। কোথাও সুবিচার নেই, মশাই। কাজল তার যে-সব গয়না স্বামীর জন্য হাতছাড়া করেনি, সেগুলি সে বন্ধক দিলে আমার জন্য; সেই টাকায় এক হাড়-কাঁপানো শীতের রাত্তিরে ইংলন্ডের মাটি ছুঁলাম।

আমার কি কষ্ট হয়েছিলো দেশ ছেড়ে যখন চলে আসি? একটুও না। জাহাজ ছেড়ে দিলো, আমার চোখ থেকে মিলিয়ে গেলো বাংলাদেশের মাটি, আমি অবাক হ'য়ে দেখলাম আমার মনে কোনো কষ্ট নেই— বুলবুল, কাজল, মিতু —এমনকি মিতু—সব যেন ছায়া হ'য়ে গেছে এরই মধ্যে। কাজলও এসেছিলো মা-বাবার সঙ্গে জাহাজ-ঘাটায়, কিন্তু তার কান্নায়-লাল হ'য়ে যাওয়া চোখ সেই দুপুরবেলার আকাশে কোনো ছায়া ফেললো না; আর—সেই সেই রাত্রিটি, যখন দুই স্রোতের মতো সে আর আমি মিলিয়ে গিয়েছিলাম পরস্পরে—তাও যেন একেবারে লুপ্ত হ'য়ে গেছে আমার জীবন থেকে, কোনো চিহ্ন, কোনো অনুরণন না-রেখে। যে-তীর ছেড়ে যাচ্ছি তার জন্য কোনো খেদ নেই; যে-দেশে যাচ্ছি তার জন্যও কোনো ঔৎসুক্য নেই; যদি বঙ্গোপসাগরে লাফিয়ে পড়ি তাতেই বা কী এসে যায়। কিন্তু সে-রকম কিছু করার মতো উদ্যমও আর অবশিষ্ট নেই আমার; নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছি, বিধ্বস্ত। কত ভাগ্যে কেউ জখম হয়নি, কোনো শারীরিক মৃত্যু ঘটেনি, শুধু কার্জন হল-এর জমকালো সীলিঙ থেকে চাক-চাক সীমেন্ট চুন খসে পড়েছিলো। কিন্তু আমি ম'রে গিয়েছিলাম একুশ বছর বয়সে—সেদিনের সেই সন্ধেবেলায়। আমার স্বভাবের যেটা প্রাণকেন্দ্র, যাকে ঘিরে-ঘিরে গ'ড়ে উঠছিলো আমার জীবন, সেই কেন্দ্র থেকে ছিটকে খ'সে পড়েছি; আমাদের পৃথিবী যদি সৌরমণ্ডল থেকে বেরিয়ে যায় তাহ'লে যেমন এক ফালি ঘাসও আর জন্মাবে না, আমার সত্তার পক্ষে এও যেন তেমনি। যেদিন পা রাখলাম আমার স্বপ্নের ইংলন্ডের মাটিতে, দেখলাম বৃটিশ ম্যুজিয়মে ব্লেকের মূল পাণ্ডুলিপি, বডলিয়ানে শেলির কবিতার খাতা, সিব্‌ল্ থর্নডাইক-এর অভিনয়ে বর্নার্ড শ-র 'সেইন্ট জোন'—সে-সব দিনেও কোনো রোমাঞ্চ আমি টের পেলাম না; আমার মনে হ'লো যেখানেই মানুষ আছে সেখানেই হাঁ ক'রে আছে পাতাল, নানা রূপ ও নানা নাম নিয়ে মৃত্যু—অতএব এক দেশের সঙ্গে আর-এক দেশের কোনো তফাৎ নেই। মনে হ'লো আমার পুরোনো জীবন ফুরিয়ে গেছে, অথচ কোনো নতুন জীবনও শুরু হ'লো না—শুধু, কোনো ভুতুড়ে কণ্ঠস্বরের মতো, কোনো আধো-চেনা আঁধার মহাদেশের বার্তার মতো,

মাঝে-মাঝে মা-র চিঠি পৌঁছয়। একদিন দুটো চিঠি এলো একসঙ্গে : একটা মা-র, আর-একটাতে হিজলি ডিটেনশন ক্যাম্পের ছাপ মারা। মিতু—মিতুর চিঠি। বকুল-ভিলার মিতু। সোনালিকণ্ঠী গায়িকা। হোমিওপ্যাথ অনাদিবাবুর কন্যা। আমার প্রেমিকা। আমার ভাবী স্ত্রী। শেষ কথা লিখেছে, 'দুঃখ কোরো না, আবার দেখা হবে।' বৃষ্টির শব্দে, বা ভোরের হাওয়ায়, বা কোনো নতুন ওষুধের অস্থায়ী প্রভাবে, মুমূর্ষুরও যেমন মনে হয় সে সেরে উঠছে, তেমনি, মিতুর চিঠি প'ড়ে আমিও মুহূর্তের জন্য ফিরে পেয়েছিলাম আমার বাঁচার ইচ্ছা, মনে হয়েছিলো আবার জীবন নতুন ক'রে শুরু হ'তে পারে। কিন্তু মা-র চিঠি প'ড়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না কী লেখা আছে তাতে। 'হতভাগিনী তার পাপের বোঝা নিয়ে আমাদের ছেড়ে চ'লে গিয়েছে।' কে? .. কী পাপ? ... কোথায় চ'লে গিয়েছে? ভীষণ শীত, ছুরির মতো হাওয়া, বেগে বরফ পড়ছে, এক তুষারে-মোড়া অস্পষ্ট নৈশ লন্ডন, যাকে দখল ক'রে নিয়েছে বেশ্যা, লম্পট, মাতাল আর নিঃসঙ্গেরা—আমি বেরিয়ে এসেছি রাস্তায়, মাইলের পর মাইল হাঁটছি, হাঁটছি আর মনে-মনে বলছি, 'কাজল ম'রে গেছে, তার গর্ভে সন্তান ছিলো—স্বামী কাছে নেই তবু সন্তান—তাই গলায় দড়ি দিয়েছিলো কাজল।' বিরাট শহর, কাউকে চিনি না; বিরাট পৃথিবী, কাউকে চিনি না; শবের মতো ঠাণ্ডা এই রাত্রি, আমার হাত-পা অসাড় হ'য়ে যাচ্ছে। আমি গরম হবার জন্য একটা শুঁড়িখানায় ঢুকে পড়লাম—সেই আমার মদের সঙ্গে প্রথম মোকাবিলা—সে-রাত্রে কেমন ক'রে বাড়ি ফিরে এলাম, ঘুমিয়েছিলাম কিনা, কিছু মনে নেই।

আপনার কি কষ্ট হচ্ছে কাজলের জন্য? চেপে যান, ও-সবের কোনো মানে হয় না। আমাকে দোষ দিচ্ছেন? কী আশ্চর্য, আমি কি কাজলকে ম'রে যেতে বলেছিলাম? .. জানেন, একবার খুব ইচ্ছে হয়েছিলো মা-কে সব খুলে বলি, লম্বা চিঠি লিখি একটা—ভাগ্যিশ শেষ মুহূর্তে সামলে যাবার মতো সুবুদ্ধি হ'লো। কাজলকে ভালোবাসতেন আমার মা, শোকার্ত আছেন, তার ওপর আবার আর-এক দুঃখ কেন চাপাই। কাজলের নাম আর কখনো বেরোয়নি তাঁর কলম থেকে, কি মুখ থেকে—আমিও ছিলাম নিঃশব্দ। কেউ জানে না কাজলকে ঐ ভ্রূণটি কে উপহার দিয়েছিলো—জানবে না কোনোদিন—আমি ছাড়া—আর আপনি ছাড়া। আপনি তো জানেন কেমন একটা অস্বাভাবিক অবস্থায় ওটা ঘ'টে গিয়েছিলো—হঠাৎ এক বিপুল আবেগের ঝোঁকে—পাঁচ মিনিট আগেও ভাবিনি আমি—আমার সেই মুহূর্তের অশান্তিকে করুণা করেছিলো কাজল, চেয়েছিলো তার ক্ষুধিত নারীত্বের হৃদয়মন্থন মমতা দিয়ে আমাকে ঢেকে রাখতে, আর তাই সে হারিয়ে ফেলেছিলো কাণ্ডজ্ঞান, অত সহজে সাড়া দিয়েছিলো আমার কামনায়। কেনই বা দেবে না বলুন—কী পেয়েছিলো সে জীবনে, কী পেয়েছিলো তার স্বামীর কাছে নির্লজ্জ অবহেলা ছাড়া—সে কি মানুষ নয়, তারও কি মন নেই, শরীর নেই, অধিকার নেই জীবনের কাছে একবার অন্তত ক্ষতিপূরণ ছিনিয়ে নেবার? আর আমি—আমি তার মরুভূমিতে বৃষ্টি নামিয়েছিলাম; পারস্পরিক সান্ত্বনার জোয়ারে ভেসে গিয়েছিলাম দু-জনে সেই রাত্রে। আপনি তো সব জানেন, সব বুঝে নিয়েছেন এতক্ষণে : আপনি কি বলবেন এটা অপরাধ?

সত্যি যদি কেউ দোষী থাকে সে কে জানেন? বুলবুল। সে মেয়ে ব'লে, আর বয়স অত অল্প ব'লে, হাইকোর্টের জজেরা তাকে দয়া করেছিলেন, চোদ্দ থেকে আট বছরে নেমে এসেছিলো তার কারাদণ্ড। কিন্তু তার সত্যিকার বিচার কখনো হ'লো না—একমাত্র আমারই মনের মধ্যে ছাড়া। 'মিতুকে তুমি এত ভালোবাসো, আর তোমার দেশের লোককে তুমি একটুও ভালোবাসতে পারো না?'—এই কথাটার অর্থ বুঝতে কি এক মিনিটও সময় লাগে আপনার কি আমার মতো অভিজ্ঞ লোকের? বুলবুল ভালোবেসেছিলো আমাকে, কিন্তু নিজের কাছে তা কিছুতেই স্বীকার করেনি, তাই চালিয়ে দিয়েছিলো তার আবেগটাকে অন্য এক ভয়াবহ রাস্তায়। চেয়েছিলো হত্যা করতে—জোন্সকে নয়, আমার ভালোবাসাকে; প্রতিশোধ নিতে, ইংরেজের নয়, মিতুর আর আমার ওপর, যেহেতু আমরা পরস্পরকে ভালোবেসেছিলাম। তার আসল লক্ষ্যে নির্ভুলভাবে তার হিংসার গুলি সে

বিঁধিয়েছিলো—একেবারে বুল্'স্ আই! তা-ই যদি না হবে, তাহ'লে কেন সে আমার কাছে ফাঁস করেছিলো তার ভীষণ অভিসন্ধি? ও-রকম কাজে যে এগিয়ে যায় সে কি তার প্রাণের বন্ধুকেও ব'লে সে-কথা? না কি কোনো বন্ধুই কখনো থাকে তার, থাকতে পারে? কী ক'রে থাকবে—সে যে এক মহামান্য ও ভয়াবহ 'আমার মধ্যে বিকিয়ে দিয়েছে নিজেকে। 'দ্যাখো এবার—কেমন তোমার স্বপ্নের বেলুন ফুটো ক'রে দিলাম, আর কি তুমি তোমার ভাবের জগতে, প্রেমের জগতে বুঁদ হ'য়ে থাকতে পারবে!' আপনিই বলুন, এ কি নয় জুলুম, ব্ল্যাকমেইল, নিষ্ঠুরতা, মানুষের হৃদয়ের ওপর, বিবেকের ওপর অত্যাচার? দুঃখের মতো অত্যাচারী আর কী আছে বলুন, আর কিসের অমন দুধর্ষ ক্ষমতা আছে নির্দোষকে দোষী ক'রে তোলার—এমন ভোগী, সুখান্বেষী, স্বার্থপর মানুষ আপনি কোথায় খুঁজে পাবেন যে কুঁকড়ে যাবে না কোনো মুমূর্ষুর চোখের সামনে, ক্ষুধিতের কান্নার সামনে, কোনো শান্তি-প্রীতি-শৃঙ্খলা-ভাঙা অমানুষিক বীরত্বের দৃশ্যে?... আজ্ঞে? আমি ভুল বলছি, আপনার মনে হয়? বুলবুলের দেশপ্রেম? তার মৃত্যুপণ? আরে মশাই, আমার কথাই আমাকে শোনাচ্ছেন কেন? আমি তো মানছি আমার মাথা ঘুবে গিয়েছিলো তার হাতে পিস্তল দেখে, আমি অভিভূত হয়েছিলাম ঐ রোগা মেয়েটির ত্যাগে ও দুঃসাহসে, মুহূর্তের জন্য নিজেকে ছোটো মনে হয়েছিলো তার তুলনায়, মুহূর্তের জন্য প্রায় একমত হয়েছিলাম তার সঙ্গে যে আর্থার জোন্স এই পৃথিবীর বাতাসে নিশ্বাস নেবার যোগ্য নয়। না—বুলবুলকে দোষ দিয়ে কী হবে, আমারই দোষ; বোকামি—বোকামি—যাকে বলে ডাহা বোকামি, তা-ই। বুঝিনি আমি, কত সহজ হ'তো আমার পক্ষে তাকে ফেরানো, শুধু একটি কথা তাকে বলতাম যদি—'বুলবুল, তোমার জীবন আমারও কাছে মূল্যবান, আমি তোমাকে ভালোবাসি।' যদি সেই আমবাগানের নির্জনতায়, যখন ফোঁটা-ফোঁটা সূর্যাস্তের আলো চুঁইয়ে পড়ছে ডালপালার ফাঁক দিয়ে, আর আমি হাতে ধ'রে আছি বুলবুলের বুকের তাপে উষ্ণ-হ'য়ে-ওঠা মারণাস্ত্র, যদি তখনই আমি অন্য হাতে তার হাত ধ'রে বলতাম, 'না বুলবুল, তুমি এই দেশের তেত্রিশ কোটিকে এত ভালোবাসো, আর তোমাকে সব বুঝিয়ে বলছি।' বা যদি তারই কথা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলতাম, 'বুলবুল, এ আমি হ'তে দেবো না, তুমি চলো আমার সঙ্গে, আমি আমাকে কি একটুও ভালোবাসো না?' কিন্তু না, আমি তা কী ক'রে বলি, আমি যে সাধু, সত্যবাদী, আমি যে মিতুকে ভালোবাসি—বুলবুলকে নয়। আমি যে ভান করতে পারি না, আমি যে ভণ্ড হ'তে শিখিনি; আমি যে পুরোপুরি আমার মূর্খ হৃদয়ের দ্বারা চালিত। ঐ একটি ছোটো মিথ্যে ব'লে আমি পিস্তলটি রেখে দিতে পারতাম আমার কাছে, পারতাম তা অনাদিবাবুকে ফিরিয়ে দিতে—কী অগাধ সুখের না সমাপ্তি হ'তে পারতো এই কাহিনীর। আর, যদি তা নাও করেছিলাম, তবু পরে ঐ হিমালয়তুল্য বোকামির ভূত কেন নামাতে পারলাম না কাঁধ থেকে—কেন ছুটে গেলাম পরোপকার করতে, প্রাণ বাঁচাতে? ফোঁপরদালালি, অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো, অনধিকারচর্চা! কী-দায় পড়েছিলো আমার—বুলবুল, আর্থার জোন্স—এরা আমার কে? কেউ নয়—মিতুর তুলনায় কেউ নয়। কেন ভাবতে পারিনি : যে যার পথে যাক না, আমার কী এসে যায়? ওদের বাঁচাতে গিয়ে কাজলকে আমি মেরে ফেললাম। ধ্বংস ক'রে দিলাম আমার জীবন, মিতুর জীবন।

কিন্তু, জানেন, ঠিক এই সময়েই, ঠান্ডা লণ্ডনে ব'সে, আমি টের পেলাম আমার বুদ্ধি বেশ খটখটে শুকনো আর ধারালো হ'য়ে উঠছে—ব্যারিস্টারি পড়ছি, এদিকে তৈরি হচ্ছি আই. সি. এস.-এর জন্য, ক'ষে প্রেস চালাচ্ছি ইকনমিক্স, পলিটিক্‌ল্ সায়ান্স (হা ভগবান, ও-সব লম্বা-চওড়া সম্পূর্ণ অকেজো বোলবোলাও থিওরিকেও কিনা 'সায়ান্স' বলে!) আর আইনের সঙ্গে, মাঝে-মাঝে পার্লামেন্টে গিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক শুনছি; উত্তরোত্তর অধিকতর তারিফ করছি মানুষের বুদ্ধিকে—সেই শয়তান বুদ্ধি, যার জোরে রক্তাক্ত খুনেকে বেকসুর খালাস পাইয়ে দেয় উকিল; জোরালো জাতিরা হেসে-খেলে জবাই ক'রে ছোটোদের, তারপর সাজে তাদেরই উদ্ধারকর্তা; যার ওপর নির্ভর ক'রে বিভাবতী বুলবুলকে শিখিয়েছিলেন যে আসলে সত্য ব'লে কিছু নেই, যখন যেটাতে আমাদের সুবিধে সেটাকেই সত্য ব'লে ধ'রে নিতে হবে; যা আমিও পরে করাতের মতো

চালিয়ে গিয়েছিলুম আমার পত্নী শ্রীমতী নলিনীর ওপর, যা আজও আমার অস্তিত্বের সাফাই ও অবলম্বন, কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা আর তাল-তাল নারীমাংসের ওপর আমি যার বিজয়ধ্বজা উড়িয়েছি—সেই বুদ্ধি। জানেন, আমি ক্রমশ নিষ্কলঙ্ক ক'রে তুলছিলুম নিজেকে—প্রায় বলতে পারেন নিরঞ্জন—ইংলন্ডে কৃতী ছাত্র, ভারতভূমিতে ব্রিলিয়েন্ট অফিসার, চাল-চলন আদবকায়দার অতুলনীয়—কিন্তু আসলে কিছু নই, একটা যন্ত্র, কতগুলো অঙ্গভঙ্গির সমষ্টি, যার ভেতরটা একেবারে শূন্য।—কিন্তু আসলে তো শূন্য ব'লে কিছু নেই, সবচেয়ে ছোটো পূর্ণসংখ্যা যে-এক, সেটাকে অবিরল ভগ্নাংশে ভাগ ক'রে চললে যেমন কোনোকালেও শেষ হবে না, তেমনি আমাদের মনের মধ্যেও লুকিয়ে আছে কোনো-এক অমর অজেয় অফুরন্ত দশমিক, রক্তে-মিশে-থাকা। মৃত হৃদয়ের বীজাণু—হয়তো তারই নাম স্মৃতি, তারই নাম মহাকাল—সেই যোগসূত্র, যা কখনো লুপ্ত হ'তে দেয় না অতীতকে, যা হ'য়ে গেছে তাকে ফিরিয়ে আনে, ভুলতে দেয় না।

না, মিতুর সেই চিঠির আমি জবাব দিইনি, আমার আবেগের সর্বশেষ স্ফুলিঙ্গ হরণ ক'রে নিয়েছিলো কাজল। দেশে ফিরেও মিতুর খোঁজ করিনি আর। মাঝে-মাঝে তার খবব পাই আমার মা-র মুখে—নিঃশব্দে শুনে যাই, কোনো মন্তব্য না-ক'রে। চার বছর পরে ছাড়া পেয়েছিলো মিতু, বাড়ি ফিরে তার মা-কে দেখতে পায়নি। মনের কষ্টে ভেঙে পড়েছিলেন ভদ্রমহিলা, খেতেন না, পেটে ট্যুমার হ'লো। হয়তো অপারেশন করলে বাঁচানো যেতো, কিন্তু অনাদিবাবুর জেদে বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক মতে মারা গেলেন—মিতু ফিবে আসাব মাত্র মাসখানেক আগে। অনাদিবাবু প্র্যাকটিস ছেড়ে দিলেন, তাঁর জীবনের ভিৎ ফেটে গেলো। মিতু, অতি যত্নে লালিত, মা-বাবার একমাত্র সন্তান, নিভৃত, লাজুক, কোমল স্বভাবের মেয়ে, রোদে বেরোলে যার মাথা ধরতো, রাত্রে মা-র সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমোতো যে, সেই মিতু তার রূপ যৌবন গানের গলা হারিয়ে ফিরে এলো এক নিষ্ক্রিয় নির্জীব বুড়ো-হ'য়ে যাওয়া নিঃশব্দ বাবার কাছে। তার প্রাক্তন গৌরবের সম্মান রেখে তাকে বিয়ে করলো—কে জানেন? বলিষ্ঠ, বোকাসোকা, বদ রসিকতায় ওস্তাদ সেই অমূল্য। সে-ও ধরা পড়েছিলো মিতুর সঙ্গে একই সময়ে; প্রায় চেষ্টা ক'রে ধরা পড়েছিলো, বিভাবতীকে একটা আগড়ুম-বাগড়ুম চিঠি লেখাব ফলে—সে-চিঠি পুলিশের হাতে পড়বে, তা নিশ্চিন্ত জেনেই লিখেছিলো—এমনি ক'রে কেটে পড়েছিলো বাবার শাসন, পড়াশুনোব জুলুম, আর বেকার হবার দুর্নাম থেকে, তার চেয়ে অনেক উন্নত লোকেদের 'সমকক্ষ' ব'লে ভাবতে পেরেছিলো নিজেকে। বন্দী অবস্থায় সে কোনো উপন্যাস লেখেনি, হেগেল, মার্ক্স, ইয়ুং অথবা আধুনিক কবিতা পড়েনি, কপালে হাত রেখে ইজি-চেয়ারে ব'সে নিশ্বাস ফ্যালেনি আকাশের দিকে তাকিযে; হাসিতে গানে গল্পে-গুজবে 'মাতিযে রেখেছিলো' সারা বক্সার ক্যাম্প; প্রচুর খেয়ে, প্রচুর ঘুমিয়ে, তাস খেলে, ভলি-বল খেলে, স্বাস্থ্য আরো ভালো ক'বে বাক্সভর্তি তাঁতের ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি নিয়ে বেরিযে এসেছিলো। ...আপনি অবাক হচ্ছেন যে মিতু তাকে ... কেন? এতে অবাক হবার কী আছে? মা নেই, বাবা অথর্ব, বিয়ে না-ক'রে উপায় কী মিতুর? আমি? আরে মশাই অমি যে ততদিনে রতনদাসের জামাই হযেছি. তা কি আর জানতে বাকি ছিলো কারো? তা ভাববেন না অমূল্য একটা ফ্যালনা লোক। কলকাতায় 'কবি অমূল্যচরণে'র নাম শোনেননি? 'আধুনিক' গানের নক্ষত্র, রবীন্দ্রনাথের গাযেব উকুন হ'য়ে যে 'গান রচনা' করে? যার কণ্ঠনিঃসৃত ন্যাকামিব বন্যায় বাংলাদেশের চিরন্তন বালকবালিকাবা হাবুডুবু খাচ্ছে? সেই অমূল্য। গাড়ি-হাঁকানো, 'ফাঙ্কশন'-জমানো, তরুণী-মজানো অমূল্যচবণ, ফিল্মের প্লে-ব্যাকে নামজাদা মধুক্ষরা মজুমদারের সঙ্গে যার বিয়ের খবর শুনে অনেকেই খুশি হযেছিলো কলকাতায়। তার প্রথম স্ত্রী নাকি যোগ্য ছিলো না তার, বড্ড সাধারণ ছিলো। সময়ের জাবিজুরি আশ্চর্য : মাত্র দশ বছর, বারো বছর—তারই মধ্যে সবাই ভুলে গেছে এককালেব বিখ্যাত গাযিকা অমিতা বর্ধনকে, যার রেকর্ড থেকে দিলদার নওরোজের গান প্রথম সারা দেশে ছড়িয়েছিলো, যার সঙ্গে চিঠি-লেখালেখি চলতো কলকাতা লক্ষ্ণৌ পণ্ডিচেরি-বাসী মনীষীদের, আর এখন যে গানের বিষয়ে এতদূর পর্যন্ত উৎসাহ হারিয়েছে যে তার হৃষ্টপুষ্ট জমকালো স্বামীর সঙ্গে কোনো আসরে

পর্যন্ত যায় না! ... আজ্ঞে? না, বিপত্নীক হবার মতো সৌভাগ্য হয়নি অমূল্যর;—কী হয়েছিলো, আদালতে ডিভোর্স, না এমনি ছাড়াছাড়ি, অমূল্য কি যোগ্যতর স্ত্রী ঘরে আনার জন্য পাকে-প্রকারে তাড়িয়েছিলো তাকে, না কি সে-ই একদিন বেরিয়ে এসেছিলো তার দশ বছরের ছেলের হাত ধ'রে, সে-সব ঠিক জানি না আমি। না, কিছুই জানি না, কোনো বাতাসে মিতুর নাম আর ভেসে আসেনি আমার কানে—তবু মন, আমার মন, আমার সর্বস্ব-লুঠ-হ'য়ে-যাওয়া তহবিল!

বেশ মজার ব্যাপার—তা-ই না? যে-আবর্তে অনেক জীবন ডুবে গেলো, তা-ই থেকে লক্ষ্মী উঠে এলেন অমূল্যর জন্য। আর আমার ফটিক-মামা, তাকে মনে আছে তো আপনার? যে তার স্ত্রীকে ঠেলে দিয়েছিলো অন্য পুরুষের আলিঙ্গনে, আত্মহত্যায়—সেও পুরস্কৃত হ'লো। বিলেতে আমার প্রথম বছর পোরার আগেই আমাকে একটি সুখবর দিয়েছিলেন আমার মা। ফটিকের ব্যবসা জ'মে উঠছে এতদিনে, তার জর্মান বৌকে আর মেয়েকে সে আনিয়ে নিয়েছে কলকাতায়, ভালো আছে, বৌটির চুল কালো, চোখ কালো, সুশ্রী। হঠাৎ একটা গরম হলকা ব'য়ে গিয়েছিলো আমার বুকের মধ্যে, তারপরেই ভাবলাম : এই যে অন্তত একজন ইহুদি নাৎসিদের কবল থেকে মুক্তি পেলো, তার ভারতীয় স্বামীর সৌজন্যে ছেড়ে আসতে পারলো ভস্মবহ জর্মানি, অনেক উদ্বেগের পরে নিশ্চিন্ত হ'লো কন্যাকে নিয়ে, ধরা যাক বাকি জীবনের মতো—এই ব্যাপারে আমারও একটু অংশ আছে বইকি। কাজলের মৃত্যু না-হ'লে চক্ষুলজ্জার দায়ে হয়তো আরো কিছু দেরি করতেন ফটিক-মামা, আর ততদিনে তাঁর জর্মান বৌকে যে গ্যাসের চুল্লিতে সেঁধিয়ে দেয়া হ'তো না, তার নিশ্চয়তা কী? বা হয়তো ফটিক-মামারই তাত জুড়িয়ে যেতো; আগের দুই স্ত্রীকেই অদৃষ্টের হাতে সমর্পণ ক'রে তিনি আবার তৃতীয় পক্ষ ক'রে বসতেন। অন্তত এটুকু সুখের ব্যাপার হ'লো—পৃথিবীতে অবিমিশ্র অমঙ্গল ব'লে কিছু নেই।

আপনি উঠতে চান? একটু, আর-একটু বসুন। বড্ড নিঝুম এই উটকামণ্ডের রাত্রি—শীত বাইরে, সন্ধের পরে কারোরই কিছু করার থাকে না, যে যার গর্তে ঢুকে পড়ে। শুনছেন স্তব্ধতার আওয়াজ, কানের মধ্যে, ঝিঁঝির মতো? অসহ্য লাগে আমার—আসুন আমরা কথা ব'লে-ব'লে স্তব্ধতার ঝিঁঝিগুলোকে ডুবিয়ে দিই। ভাবছেন আমার কথা শেষ হয়েছে? না। আমি সারারাত ধ'রে বলতে পারি, চিরকাল ধ'রে বলতে পারি। কিন্তু আপনি কিছু বলুন এবার, কিছু বলুন। আমার কাছে জবাবদিহি চাইবেন না? জিগেস করবেন না কেন আমি মিতুর কাছে ফিরে যাইনি? কেন তার দুঃখের দিনে আমি দাঁড়াইনি তার পাশে গিয়ে? কেন অমূল্যর স্ত্রী হ'তে তাকে বাধ্য করেছিলাম? দেশে ফিরে কেন অপেক্ষা করিনি তার মুক্তির জন্য, কোনো যোগাযোগ করিনি, তার শেষ কথা—'দুঃখ কোরো না, আবার দেখা হবে'—তা কি আমি ভুলে গিয়েছিলাম? আপনাকে আর বলতে হবে না, আমি সবই জানি। জানি, আমি পারতাম তাকে জীইয়ে রাখতে, জীইয়ে তুলতে—যদি বিলেত থেকে চিঠি লিখতাম নিয়মিত, ফিরে এসেই চ'লে যেতাম তার কাছে—যদি—যদি—যদি সবই তবে অন্য রকম হ'তো, অন্য এক জীবন হ'তো আমার। কিন্তু কেন তা হয়নি তাও কি আমাকে ব'লে দিতে হবে? আপনি বোঝেন না? বাধা ছিলো : প্রকাণ্ড বাধা, অনতিক্রম্য—কাজল। কোন মুখে দাঁড়াবো আবার মিতুর কাছে—বিশ্বাসে ভরা সোনালি হৃদয়ের মিতু? নলিনী ব্রোকার আমার কেউ নয়, তাকে আমি যেমন খুশি ঠকাতে পারি—কিন্তু তাই বলে মিতুকে? অসম্ভব তাকে কাজলের কথা খুলে বলা, তা গোপন রেখে তার চোখের দিকে তাকানো তেমনি অসম্ভব। অতএব—এই তো দেখছেন আমাকে। আর তাছাড়া, ততদিনে আমি সেই আমিও আর ছিলাম না; দিনে-দিনে, চেষ্টা ক'রে, সচেতনভাবে, আমি নিজেকে অন্য এক চেহারা দিয়েছি, অন্যভাবে তৈরি ক'রে নিয়েছি। আবেগে আমার ঘেন্না, ভালোবাসায় আমার ঘেন্না; মহত্ত্ব, বীরত্ব, আদর্শ—এই বিখ্যাত কথাগুলোতে আমার ঘেন্না। আমি বুঝে নিয়েছি, ওগুলো এক-একটা রঙিন মোড়ক, যার তলায় লুকিয়ে আছে বিষ, ছোরা, আগুন, সর্বনাশ। বুঝে নিয়েছি, তারাই ধন্য, যারা শুধু নিজের জন্য বেঁচে থাকে। তারাই জ্ঞানী, যারা ভালোবাসে না, করুণা ক'রে না, মাথা ঠাণ্ডা রাখে সব সময়,

যে-কোনো অবস্থায়। আমি তো সেইভাবেই জীবন কাটাতে চেয়েছিলাম—প্রাণপণ, চেষ্টায়। তারই জন্য তিলে-তিলে মেরে ফেললাম আমার স্ত্রীকে, হ'য়ে উঠলাম নারীমাংসের বনেদি খদ্দের। আমার অপ্রেমকে, প্রতিশোধকে চরমে টেনে নিয়ে গেলাম। তবু—পারলাম কই? তবু ভোলা গেলো না, জানেন। ফিরে যাইনি, কিন্তু ফিরে যে যাইনি তা এখনো ভুলতে পারি না কেন? কাজল কেন ফিরে-ফিরে আসে? এই কি আমার শাস্তি তাহ'লে? শাস্তি কেন? আমি তো কোনো দোষ করিনি, শুধু ভালো করতে চেয়েছিলাম, ভালোবাসতে চেয়েছিলাম। সেটাই অপরাধ? না কি যথেষ্ট ভালোবাসতে পারিনি, তাই কষ্ট? বলুন, যাবার আগে কিছু ব'লে যান আমাকে। আমি দোষী? আমি দুর্ভাগা? কোনটা? আমি ঘৃণ্য? আমি প্রেমিক? কোনটা? আমি হত্যাকারী? না কি শহীদ? কোনটা? আসামির জবানবন্দি শুনলেন, এবারে একটা রায় দেবেন না? ...আচ্ছা, জোর করবো না, এখনই রায় দিতে হবে না আপনাকে, আরো কিছুদিন চলুক না এই মামলা—দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, আপনার আব আমার মধ্যে—জেরা, তর্ক, যুক্তির প্যাঁচ, ছিঁড়ে-খুঁড়ে, উল্টে-পাল্টে নাড়িভুঁড়ি বের ক'রে আনা—তবু শেষ নেই, শেষ কথা বলার মতো কেউ নেই। আচ্ছা তাহ'লে, আর আপনাকে আটকে রাখবো না, আমার ড্রাইভার আপনাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবে। নমস্কার। কাল আবার আসবেন।

আয়নার মধ্যে একা

১

সকাল আটটা। আকাশ নীল, আকাশে রোদ্দুর, অঘ্রান মাস। মাঝে-মাঝে নরম হ'য়ে শানাই। লোকজন, ব্যস্ততা। কিন্তু তার কিছু করার নেই, সে বিয়ের কনে। পুরো হিন্দুমতে বিয়ে, শেষরাত্রে গায়ে-হলুদ থেকে শুরু, বেশ ঘটাপটা। তাকে বসিয়ে রেখেছে তেতলার এই ঘরটায়, বার্নিশের গন্ধওলা নতুন খাট, কোরা কাপড়ের গন্ধওলা নতুন জাজিম, খয়েরি-কাজ-করা চিকনপাটি। এই ঘরেই বাসর হবে রাত্রে। তার বিয়ে। আমার বিয়ে। নায়রীরা আসছে একে-একে, আমাকে দেখে যাচ্ছে। অন্য মেয়েদের বিয়ে হয় বাপের বাড়িতে, ও-সব দান-সামগ্রীও মা-বাবাই দেন, কিন্তু আমার তো সবই উল্টো ব্যাপার, এটাই বা কেন ঠিকমতো হবে। আমার কোনো বাপের বাড়ি নেই, মা নেই, বাবা কোথায় হারিয়ে গেলেন জানি না—পার্টিশনে ভণ্ডুল হ'য়ে গেছে সব। আমার লজ্জা করছে—নানা কারণে। কিন্তু লজ্জা কেন—আমি তো আজ সম্মানিত, গৌরবান্বিত। আমি আজ একজন পরলোকগত সব-জজের পুত্রবধূ হ'তে চলেছি। আমার খুড়শ্বশুর একজন নামজাদা উকিল। বীডন স্ট্রিটের এই তেতলা বাড়ি, আমার দাদাশ্বশুরের তৈরি—এখানে আমরা থাকবো না অবশ্য, বালিগঞ্জে ফ্ল্যাট নিয়েছে অবনী—কিন্তু এই বাড়ি আমারও তা তো মানতেই হবে। আহা, মা কেন বেঁচে নেই, বাবা কি সত্যি আছেন কোথাও, আবার তাঁকে দেখতে পাবো কোনোদিন, না কি তাঁরও জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান হয়েছে, কোনো রেফিউজী ক্যাম্পে, কলেরায়? কিন্তু সেই আমার কান্নাভরা দিনগুলি, যখন মনে হ'তো আর কখনো ভোর হবে না, ফুটবে না আকাশে আলো—সব কেমন ঝাপসা মনে হচ্ছে আজ। আজ যেন নতুন ক'রে জন্ম হ'লো আমার। আজ থেকে আমি একজন বিবাহিতা স্ত্রী, ভদ্রমহিলা। অবনীর স্ত্রী, যে-অবনী আমাকে ভালোবাসে, যাকে আমি ভালোবাসি। এই দিনটি তোমার স্বপ্ন ছিলো, কমলা। জনতা-স্টোভে রান্না চাপিয়ে এই দিনটির কথা ভেবেছো। দুপুরবেলায় একলা ব'সে-ব'সে ভেবেছো। অবনীর পাশে শুয়ে, অন্ধকারে, তার চওড়া বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে—কতবার। এই দিন? এ-রকম একটি দিন? না—এ তোমার কল্পনাতেও ছিলো না। রেজিস্ট্রার ডেকে কাগজে দুটো সই বসালেই ব'র্তে যেতে তুমি। বা চলনসই শাঁখায় শাড়িতে, যেমন তোমার হয়েছিলো সেবারে, সেই প্রথম বার। তোমাদের মাদারিপুরে। তার বেশি সাধ্য ছিলো না তোমার বাবার, তার বেশি আশা তোমার ছিলো না। কিন্তু তাও টিকলো না—এমনি কপাল। তুমি কেঁদেছিলে, সেই অল্প-চেনা মানুষটির জন্য নয়, তোমার হারিয়ে-যাওয়া শাঁখা-সিঁদুরের জন্য, তোমার যে-সব সন্তান জন্মাতে পারলো না, তাদের জন্য। এবারেও, পুরোপুরি সধবার জীবন পেয়েও, তুমি ভুলতে পারোনি তোমার বিয়ে হয়নি, তুমি এখনো মা হ'তে পারছো না—কত তর্ক করেছো এই নিয়ে অবনীর সঙ্গে।

অবনী কোথায়? আছে এই বাড়িতেই, কিন্তু আজ সারাদিন তার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। রাত দশটায় লগ্ন, তার আগে দেখা হবে না। আর তাও তো চোখের দেখা শুধু। সাত পাক ঘোরা, শুভদৃষ্টি, মন্ত্র-তন্ত্র, কড়ি খেলা, চাল খেলা—সোর ভাঙতে-ভাঙতে কোন না রাত দুটো বেজে যাবে। তা আমাদের আর তাড়া কিসের, আমরা তো পুরোনো। অনেকেই জানে সে-কথা, নায়রীরা সকলেই জানে, অনেকেই মুখ টিপে হাসছে। আমার এক কলেজে-পড়া মামাতো ননদ তো আমার সামনেই ব'লে গেলো, 'কী যে একটা ফার্স করছেন পিসিমা!' ফার্স—তামাশা, হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার। আর সত্যি তো তা-ই, তাছাড়া আর কী। প্রায় এক বছর স্বামী-স্ত্রীর মতো ঘর করার পরে। কিন্তু স্বামী-

স্ত্রীর 'মতো', আর স্বামী-স্ত্রী—এ-দুয়ে আকাশ-পাতাল তফাৎ। 'মতো' হ'লে ইজ্জৎ থাকে না। কেউ-কেউ কানাঘুষো করে, আড়চোখে তাকায়—এই মস্ত বড়ো কলকাতাতেও এই স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগেও। 'মতো' হ'লে সিঁদুর পরা যায় না। রাস্তায় বেরোলে বেল্লিকগুলো চোখ টেপে, পিছু নেয়। কিন্তু আজ আমার শাঁখা-সিঁদুর আমি ফিরে পাচ্ছি। আমার কথার ধরন বদলে যাবে, চলার ধরন বদলে যাবে, সকলের সঙ্গে ব্যবহার বদলে যাবে। আমাকে পেছন থেকে দেখেও সবাই বুঝবে আমি বিবাহিত, তেমন-তেমন বখা ছোঁড়াও মুখোমুখি পড়লে চোখ নামিয়ে নেবে। আমি তাই আমার শ্বশুরবাড়ির এঁদের সঙ্গে একমত। এ-সবের দরকার ছিলো—চাল খেলা কড়ি খেলা, সব-কিছুর। আত্মীয়-কুটুমের মুখ বন্ধ করার জন্য। এই বিয়ে যে সত্যিকার বিয়ে, পুরোপুরি বিয়ে, কোথাও কোনো গলতি নেই, ফাঁকি নেই, সেইটে বোঝাবার জন্য। আমার সব খুঁত ঢেকে দেবার জন্য। সত্যি—এঁদের ছেলের তুলনায় আমি কী? বিধবা (এঁরা সেটা জানেন না যদিও), নিচ্ছন গরিব, পাশ-টাশ কিছু করিনি, জাতকুল-খোয়ানো ভিটেমাটি-ওপড়ানো রেফিউজী। যেন একটা ভূমিকম্প হ'য়ে গেলো হঠাৎ—দেখলাম আমি কলকাতায়, রাস্তায়, একা। তার ওপর, এই ন-মাস ধ'রে—না, পুরুষের পক্ষে কিছু না, কিন্তু মেয়েদের তো কলঙ্ক। আমাকে কেউ একটা 'রাখা মেয়ে' বললে কী জবাব ছিলো আমার? আজ আমার সব কলঙ্ক এঁরা মুছে দিচ্ছেন। যেমন, শুনেছি, আগেকার দিনে বিলেতা-ফেরতা ছেলেকে গোরুর চনা খাইয়ে মাথা মুড়িয়ে শুদ্ধি ক'রে নেয়া হ'তো, তেমনি। আমাকে এঁরা ঘরে তুলছেন, জাতে তুলছেন—তারই জন্য সকাল থেকে শানাই, লোকজন, আয়োজন। এঁরা ছেলের মুখ চেয়ে আমাকেও মেনে নিলেন—যে-আমার এত খুঁত, এত কলঙ্ক। আমি এঁদের পায়ের ধুলো নিচ্ছি, আমি কৃতজ্ঞ।

—কিন্তু আমার কলঙ্ক যে কত, তা আমি ছাড়া আর কে জানে।

২

কমলার মনে পড়লো শান্তি-মাসির বাড়িতে তার দিনগুলি। টানাটানির সংসার, বাড়ি বলতে ছোট্ট দু-খানা ঘর আর এক চিলতে বারান্দা, ছেলেপুলের সংখ্যা পাঁচ—তাদের বয়স আঠারো থেকে তিন। শেষেরটি হবার পর থেকে মাসি অম্বলে ভুগছেন, মাথার চুল উঠে যাচ্ছে, দেখতে বয়সের চাইতে বুড়ো হ'য়ে গেছেন। এর ওপর আবার একটা উটকো গলগ্রহ—আপদ আর কাকে বলে! তবু মাসি তাকে প্রথম দেখে আহা বাছা বলেছিলেন, দু-চার ফোঁটা চোখের জল ফেলেছিলেন রাঙা-দির, অর্থাৎ কমলার মায়ের কথা বলতে-বলতে, নিজের দু-একখানা পুরোনো জামা-কাপড়ও দিয়েছিলেন তাকে। কৃতজ্ঞতায় গ'লে গিয়ে কমলা বলেছিলো, 'শান্তি-মাসি, আমি আপনার সব কাজ ক'রে দেবো, আমাকে এক কোণে একটু প'ড়ে থাকতে দিন।' ভোর থেকে রাত্তির পর্যন্ত নিজেকে ব্যস্ত রাখে কমলা—রান্না, ঝাঁটপাট, ঘর গোছানো, কাপড় কাচা—কিছু বাদ দেয় না। তার ভালো লাগে এই খাটুনি, অন্য কিছু ভাবার সময় থাকে না, দুঃখ ভুলে থাকা যায়। এতে মাসিরও সুবিধে হচ্ছে সন্দেহ নেই, তাঁর শরীর ভালো না, লোক বলতে একটিমাত্র ঠিকে ঝি, আর ছেলেপুলে নিয়ে হাঙ্গামা তো কম নয়। মাসিকে মনে হয় খুশি, অথচ যেন খুশিও নন, মাঝে-মাঝে হঠাৎ তাঁর মুখ আঁধার হ'য়ে যায়, যেন কী-একটা কথা মনের মধ্যে গুমরোচ্ছে, কমলার বুক দুরদুর করে পাছে এই আশ্রয়টুকু খ'সে পড়ে। একদিন কাচা কাপড়ের বালতি নিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়েই মানিকের মুখোমুখি প'ড়ে গেলো, মাসির বড়ো ছেলে, মানিক। তাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো ছেলেটা, নিচু গলায় বললো, 'কমলা-দি, আমাকে বালতিটা দাও, আমি নিয়ে যাচ্ছি।' হঠাৎ মাসির গলা

শোনা গেলো, 'থাক, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। তোর মা যে খেটে-খেটে কঙ্কালসার হ'লো, কখনো তাকিয়ে দেখিস? আর তোকেও বলি, কমলা, ও-রকম ভেজা গায়ে বেরিয়েছিস কেন লোকের সামনে? লাজলজ্জা নেই?' এই প্রথম সে রূঢ় কথা শুনলো মাসির মুখে, সেটাকে মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করলো, কিন্তু মাসি যেন দিনে-দিনে আরো বিগড়ে যাচ্ছেন, কেমন অদ্ভুত ব্যবহার করেন এক-এক সময়। মেসো যদি কখনো বলেন, 'তা কমলা এসে পড়ায় ভালোই হ'লো, শান্তি, তুমি খানিকটা বিশ্রাম পাবে,' মাসি তক্ষুনি ঠোঁট বাঁকান—'ওঃ, আমার জন্যে যে দরদ উথলে উঠছে হঠাৎ! তোমাদের বাঁদিগিরি ক'রেই জনম কাটলো, আমার আবার বিশ্রাম!' মেসো যদি বললেন, 'কমলা, দুটো পান সেজে আনো তো,' মাসির মন্তব্য—'যা, যা, শিগগির পান সেজে আন, তুই না-সাজলে তোর মেসোর আবার রোচে না আজকাল।' কমলা মনে-মনে বুঝে নিলো ব্যাপারটা—সে যে দু-বেলা দু-মুঠো খায় সেজন্যে রাগ নয় মাসির, সে যে বুড়ো হয়নি, তার স্বাস্থ্যও ভালো, এটাই তার প্রধান অপরাধ মাসির চোখে। অথচ তাকে হুট ক'রে তাড়িয়ে দিতেও পারছেন না তিনি, এমন বিনি-মাইনের চাকরানি আর পাবেন কোথায়?

একদিন মেসো বললেন, 'তুমি কী ভাবছো, শান্তি? কমলার কী ব্যবস্থা করা যায়?' 'তোমার নিজের ব্যবস্থা কে ক'রে দেয় তারই ঠিক নেই, তোমাকে ও নিয়ে ভাবতে হবে না।' তখন রাতের খাওয়া হচ্ছে, মেসো বসেছেন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে, মাসি পরিবেষণ করছেন, কমলা দাঁড়িয়ে আছে তাঁর পেছনে। মেসো এক গ্রাস ভাত খেয়ে বললেন, 'আমি ভাবছিলাম কী, কমলার বিয়ে দিলে কেমন হয়?' 'শোনো কথা—বিধবার আবার বিয়ে!' 'ও-সব কড়াক্কড় তেমন নেই তো আজকাল। আমাদের আপিশে, জানো—' মাসি বাধা দিয়ে বললেন, 'তুমি চুপ করো তো! তোমার নিজের তিনটে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে সে-খেয়াল আছে?' তার তো দেরি আছে এখনো। জানো, আমাদের আপিশে বিনোদ ব'লে একটি ছেলে নতুন ঢুকেছে—ভারি ভালো ছেলেটি, স্বাধীনচেতা, মনটা উদার—তার হয়তো বিধবাতে আপত্তি হবে না।' মাসি কমলার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বললেন, 'ওর কপালে যদি বিয়েই থাকবে তাহ'লে জলজ্যান্ত সোয়ামিটা মরবে কেন? ফাটা হাঁড়ি কি আর জোড়া লাগে!' মেসো এর পরেও বললেন, 'আমি বিনোদের কাছে কথাটা একটু তুলেওছিলাম—সে মেয়েটিকে দেখতে চায় একবার। আমি বলি কী, কমলা দেখতে ভালো তো, বিনোদের চোখে ধ'রে যেতে পারে।' 'শুনে রাখ, কমলা, এ-বাড়িতে এসে তুইও সুন্দরী হলি! ধন্যি তোমাদের পুরুষমানুষের চোখ বাপু! বাব্বাঃ —খেতে পায় না, তবু গতরখানা কী দুরমুশে! গেরস্ত ঘরের মেয়ে ব'লে মনে হয় না। তা তোমাদের তো ঐ হ'লেই হ'লো—মুখের ছিরি-ছাঁদ দিয়ে দরকার কী?' মেসো আর মানিক একসঙ্গে মুখ তুললো খাওয়া থেকে, দু-জনেই চকিতে একবার কমলার দিকে তাকিয়ে তক্ষুনি চোখ নামিয়ে নিলো। মেসো নিঃশব্দে খাওয়া শেষ ক'রে উঠে গেলেন।

তবু হয়তো কমলা আরো কিছুদিন কাটাতে পারতো মাসির বাড়িতে, হয়তো মেসো চেষ্টাচরিত্র ক'রে ঐ বিনোদের বা অন্য কারো সঙ্গে তার বিয়েও দিয়ে দিতেন শেষ পর্যন্ত। কিন্তু হঠাৎ কমলার জীবনটাকে আর-একবার উল্টে-পাল্টে দিলো অম্বু।

একদিন -- বেলা সাড়ে দশটা তখন—মেসো আপিশে বেরিয়ে গেছেন, সকালের পাট চুকে যাবার পর ক্লান্ত হ'য়ে একটু শুয়েছেন মাসি, তাঁর মেয়ে তিনটি স্কুলে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে, হঠাৎ বাণী চেঁচিয়ে উঠলো, 'মা, দ্যাখো, কে এসেছে দ্যাখো।' ফিরে তাকানোমাত্র হাসি ফুটলো মাসির মুখে, উঠে বসতে-বসতে বললেন, 'ও মা, অম্বু! এসো, এসো—তোমার যে আর দেখাই নেই, ব্যাপার কী?' 'আর বলবেন না, মাসিমা, যা ব্যস্ত থাকি!' ব'লে একটি জোয়ান চেহারার যুবক ঘরের মধ্যে এগিয়ে এলো। মাসির অন্য দুই মেয়ে ছুটে এলো সাড়া পেয়ে, তিন বোন একসঙ্গে কলকলিয়ে উঠলো। একজন বললো, 'অম্বু-দা, এবারে আমাদের সরস্বতী পুজো কেমন হবে, বলো।

ডোভার লেনের চাইতে সুন্দর প্রতিমা হবে তো?' আর-একজন বললো, 'আমি কিন্তু এবারে একটা গান গাইবো —কেমন, অম্বু-দা?' আর ছোটোটি আর-কিছু ভেবে না-পেয়ে বললো, 'আমি ফুল চুরি করবো শেষরাত্রে উঠে —কী মজা!' মাসি ব'লে উঠলেন, 'আঃ, তোরা এত জ্বালাসনে তো অম্বুকে, বসতে একটা চেয়ার দে। তারপর, অম্বু —কী খবর-টবর, বলো।' বাণী আবার কথা বললো, 'সরস্বতী পুজোর তো দেরি আছে এখনো, তার আগেই একটা ফাঙ্কশন করো না, অম্বু-দা।' 'আধুনিক গান!' 'কমিক!' 'ক্যারিকেচার!' 'তোরা কি গল্প ক'রেই বেলা কাটিয়ে দিবি —স্কুলে যেতে হবে না?' 'যাচ্ছি তো,' গলা ভার শোনালো বাণীর ; তিন বোন আরো কয়েকবার আয়নায় মুখ দেখে বইখাতা নিয়ে বিমর্ষ মুখে বেরিয়ে গেলো। ছোটো বাচ্চাটি মেঝেতে ছুটোছুটি করছিলো এতক্ষণ, মাসি হঠাৎ তাকে কোলে টেনে নিয়ে আদর করতে লাগলেন, চুমো খেলেন। 'কমলা, এখন একবার ঘুম পাড়িয়ে দে না খোকাকে, দস্যিপনা ক'রে-ক'রে রোগা হ'য়ে যাচ্ছে।' কমলা পাশের ঘরে চ'লে এলো বাচ্চাটিকে নিয়ে, খানিক পরে মাসি আবার হাঁক দিলেন, 'কমলা, এক পেয়ালা চা দিয়ে যা তো এখানে।' চায়ের পেয়ালা নিয়ে দরজার ধারে একটু থমকালো কমলা ; মাসি শুয়ে আছেন আর অম্বু পাশে ব'সে মুখ নিচু ক'রে তাঁর মাথা টিপে দিচ্ছে। মাসি খুব সহজ গলায় বললেন, 'আর দরকার নেই, অম্বু। এবার চা খাও। উঃ, আমার এই মাথা-ধরা আর রেহাই দেবে না আমাকে। চা-টা এখানে রাখ, কমলা।' অম্বু উঠে এসে চেয়ারে ব'সে হাত বাড়িয়ে পেয়ালাটা নিলো ; কমলার মনে হ'লো ঐটুকু সময়ের মধ্যে তাকে এক ঝলকে দেখে নিলো সে, যেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে গেলো। বেরিয়ে আসতে-আসতে একটা কথা তার কানে এলো, 'মাসিমা, এই মেয়েটি কে?' উত্তরে মাসি নিচু গলায় কী বললেন বোঝা গেলো না।

হঠাৎ সময়ে-অসময়ে চ'লে আসে অম্বু, তার সাড়া পেলে মাসির হাতের কাজ থেমে যায়, সে যতক্ষণ থাকে অন্য দিকে মন দেন না। আজে-বাজে গল্প করে সে, মাসি হাঁ ক'রে গেলেন সে-সব ; 'আজকালকার' মেয়েদের নিন্দের কোনো গন্ধ পেলে প্রবলভাবে মাথা নেড়ে সায় দেন। সেবক বৈদ্য স্ট্রিটের অমুক বাবুর স্ত্রী, স্বামী ট্যুরে গেলে, দেওরের সঙ্গে কী-রকম লীলাখেলা চালান; কোন যোলো বছরের ছেলের বালিশের তলায় তার মামাতো বোনের বডিস পাওয়া গেছে ; কোন মেয়েদের হস্টেল খানাতল্লাশি ক'রে একগাদা বাচ্চা না-হবার ওষুধ পেয়েছে পুলিশ---এ-সব শুনতে-শুনতে মাসির মুখ জ্বলজ্বল ক'রে ওঠে, লম্বা একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'বলো তো, অম্বু, এ-রকম হ'লে আর জাতধর্ম রইলো কোথায়?' 'যা বলেছেন, মাসিমা! জানেন, একটা নভেল বেরিয়েছে, তাতে যা আছে না—ছি-ছি-ছি, ও কি মা-বোনের হাতে দেয়া যায়, না কি শ্বশুরই প'ড়ে শোনাতে পারে ছেলের বৌকে! জঘন্য!' 'তা-ই নাকি? সত্যি?' ঠোঁটে একবার জিভ বুলিয়ে মাসি বলেন, 'আমাকে একবার পড়াতে পারো বইটা?' অম্বু গম্ভীর হ'য়ে বলে, 'আমাকে মাপ করবেন, মাসিমা, আমি এ-বাড়িতে ও-রকম বই আনতে চাই না। মানিক-বাণীরা আছে তো।' 'আহা সে-খেয়াল যেন আমারই নেই! আমি লুকিয়ে রাখবো, ওরা কেউ জানতেই পাবে না। আমার ছেলেমেয়েদের আমি কী-ভাবে মানুষ করছি, দেখছো তো। আমার কথায় ওঠে, আমার কথায় বসে।' 'তা-ই তো।' হঠাৎ একটু অদ্ভুত ধরনে হেসে ওঠে অম্বু।

অম্বুর ধরন-ধারণ থেকে মনে হয় সে যাকে বলে করিৎকর্মা ছেলে, আর বাণীরা যা বলাবলি করে তা থেকেও বোঝা যায় এই গর্চা-লেন পাড়ার পাণ্ডা বলতে অম্বুকেই বোঝায়। দরকার হ'লে রাত-বিরেতে ডাক্তার ডেকে আনা, কোনো বাড়িতে চুরি হ'লে থানা-পুলিশ, বিয়ে হ'লে দলবল জুটিয়ে খাটা-খাটনি, অম্বু থাকতে এ-সবের জন্য নাকি ভাবতে হয় না। খোলা বাজারে যা পাওয়া শক্ত —কোনো ওষুধ বা শিশুর পথ্য বা রোগীর জন্য বেগুনবিচি চাল —তাও জোগাড় হ'য়ে যায় অম্বুকে বললে। একবার বেপাড়ার এক ছোকরা নাকি উনিশ নম্বর বাড়ির মেয়ের দিকে তাকিয়ে

চোখ টিপেছিলো —অম্বু এক থাপ্পড়ে নাক ফাটিয়ে দিয়েছিলো তার। পাড়ার ক্লাব তারই জন্য জমজমাট, পুজোর সময় চাঁদা তোলা থেকে লরিতে ক'রে বিসর্জন পর্যন্ত সব তার হাতে। এ-সব শুনে, আর মাসির হাবভাব দেখেও, কমলা বুঝে নিয়েছিলো যে তাকে বেশ সাবধান থাকতে হবে অম্বুর বিষয়ে, কিন্তু ঐটুকু বাড়িতে আড়ালে থাকার উপায় নেই, কমলা প্রায়ই সামনাসামনি প'ড়ে যায় ; বোঝে, তার চোখে চোখ ফেলার চেষ্টা করছে অম্বু, কোনো-কোনো কথা মাসিকে কাটিয়ে তাকেই বলতে চাচ্ছে ; আলগোছে সেখান থেকে স'রে যায় কমলা। সেদিন রোববার, অম্বু দুপুরবেলা এসে বললো, ' /রজনীগন্ধা* দেখতে যাবেন আজ? আমি কয়েকটা পাশ পেয়েছি।' মাসি চোখ বড়ো ক'রে বললেন, 'ও মা, তুমি সিনেমাতেও পাশ পাও! আগে তো কখনো বলোনি।' ' /রজনীগন্ধা!* উত্তম-সুচিত্রা! কিশোরকুমার!' হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো মেয়েরা—'চল চল এক্ষুনি খেয়ে-টেয়ে নিয়ে তৈরি হই।' মাসি একগাল হেসে বললেন, 'লক্ষ্মী ছেলে অম্বু, মাসির জন্যে পাশ নিয়ে এসেছে! তাহ'লে আমরা আজ দোতলায় বসবো —অ্যাঁ?' 'দোতলায় বইকি। তা —আপনার বোন-ঝি —উনিও যাবেন তো?' 'কমলার কথা বলছো?' মাসির গলা গম্ভীর শোনালো, 'অতগুলো পাশ কি দিতে চাইবে ওরা?' 'তার জন্যে আটকাবে না।' 'না, না, কমলা কী ক'রে যাবে —ওর কত কাজ!' একটু চুপ ক'রে থেকে অম্বু বললো, 'আচ্ছা, আপনারা তাহ'লে তিনটের একটু আগে পৌঁছবেন, আমি /বিজলী*তে থাকবো।' অম্বু চ'লে যাওয়ামাত্র স্নান-খাওয়ার হুড়োহুড়ি প'ড়ে গেলো বাড়িতে, তারপর সাজগোজের পালা, মাসি একটি সিল্কের শাড়ি পরলেন, পাৎলা চুলে খোঁপা বেঁধে মুখে পাউডার বুলোলেন, কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ি ফাঁকা হ'য়ে গেলো।

মেসো ঘুমোচ্ছেন, মানিক সারাদিনের মতো আড্ডা দিতে বেরিয়ে গেছে, জগার মা বাসন ধুয়ে বেখে তাড়াতাড়ি বিদায় নিলো। সারা পাড়া চুপচাপ, এ-বাড়িতেও সোরগোল নেই। এই প্রথম এ-বাড়িতে একা হ'লো কমলা, কেমন একটু ভালো লাগলো তার। এখনো তার হাতের কাজ ফুরোয়নি, রান্নাঘব ধুয়ে রাখতে হবে —মাসি আবার ধোয়া-মোছার ব্যাপারে পিটপিটে, আর জগার মা-ও কাজে বড্ড ফাঁকি দিচ্ছে আজকাল। কেনই বা দেবে না ; জানে তো, সে না-করলেও কোনো কাজ প'ড়ে থাকবে না। কমলা রান্নাঘরে এসে ঝাঁটা হাতে নিলো, হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলো। বান্নাঘবের পেছনে সরু গলিতে সারি-সারি কাপড় ঝুলছে তারে, তার ওপব আড় হ'য়ে রোদ্দুর পড়েছে। মনে পড়লো মাদারিপুরের বাড়ি, উঠোনে জামগাছের ছায়া, ডালে-পাতায় হাওয়ার শব্দ মাঝে-মাঝে। নিশ্বাস পড়লো কমলার। একটা হলদে রঙের কুকুর ছিলো না, প'ড়ে থাকতো সব সময়, তাকে দেখলেই তিরতির ক'রে ল্যাজ নাড়তো? স্বপ্ন —সব স্বপ্ন হ'য়ে গেছে। কমলার হঠাৎ মনে হ'লো সে যেন পর-পর অনেকগুলো আলাদা-আলাদা মানুষ হ'য়ে যাচ্ছে : প্রথমে মা-বাবাব মেয়ে, তারপর নিতাই ভটচাযের বৌ, তারপব রেফিউজী ক্যাম্পের জঞ্জাল, তাবপর এই শান্তি-মাসির বাড়িতে— তারপর—তারপর কী? আরো কিছু আছে কি তার ভাগ্যে, না কি এখানেই শেষ? মুহূর্তের জন্য যেন আলস্য নেমে এলো কমলার শরীরে, তক্ষুনি গা-ঝাড়া দিয়ে রান্নাঘর ধুয়ে ফেললো, বাসনগুলো গুছিয়ে রাখলো তাকে, তারপর ,তোয়ালে কাঁধে নিয়ে স্নান করতে চলেছে, এমন সময় টুনটুন শব্দ হ'লো বাইরে। কেউ কড়া নাড়ছে? এই অসময়ে কে? আবার শব্দ, এবাব একটু জোরে। জগার মা ফিরে এলো নাকি কোনো দরকারে? কমলা দরজা খুলে দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে পেছিয়ে এলো কয়েক পা। অম্বু ঘরে ঢুকে বললো, 'আমাকে দেখে ভয় পেলেন নাকি?' 'না, না—কিন্তু আপনি হঠাৎ এ-সময়ে? সিনেমায় যাননি? অন্যেরা কোথায়?' 'আমি ওঁদের সিনেমায় বসিয়ে দিয়ে এলাম। আমি আপনার কাছেই এসেছি,' ব'লে অম্বু একটা চেয়ার টেনে বসলো। এবারে সত্যি একটু ভয় পেলো কমলা, অথচ সেই ভয়ে যেন সুখেরও কিছুটা অংশ আছে, একটা না-জানা প্রতিযোগিতায় হঠাৎ যেন সে জিতে গেলো। তার কি চ'লে যাওয়া উচিত এখান থেকে? মেসোকে

ডেকে তোলা উচিত? কিন্তু কেন —অম্বু এ-বাড়িতে স্বচ্ছন্দে যাওয়া-আসা করে, শুধু তার সঙ্গে কথা বললেই দোষ? কমলার হঠাৎ খেয়াল হ'লো তার পরনের শাড়িটা বড্ড ময়লা, চুল খোলা, কাঁধে একটা তোয়ালে ঝুলছে ; তোয়ালেটা হাতে নিয়ে মুখ মুছে বললো, 'আমি —স্নান করতে যাচ্ছিলাম।' 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু আমার একটু দরকার আছে আপনার সঙ্গে, দু-মিনিট সময় দেবেন?' 'আমার সঙ্গে আপনার দরকার?' 'দরকারটা হয়তো আপনারই আসলে, শুনলে বুঝবেন।' তারপর, কিছুমাত্র ভূমিকা না-ক'রে অম্বু বললো, 'আপনি সিনেমায় নামতে চান?' 'সে কী!' কমলা আকাশ থেকে পড়লো কথা শুনে, ঝোঁকের মাথায় ব'লে ফেললো, 'এমন একটা অসম্ভব কথা আপনি ভাবলেন কী ক'রে?' 'সম্ভব না অসম্ভব তা পরে দেখা যাবে, আপনি রাজি কিনা তা-ই বলুন।' চোখ সরু ক'রে অম্বু তাকালো তার দিকে, অস্বস্তি হ'লো কমলার। 'না।' 'না কেন?' 'কী আশ্চর্য—আমি— আমি কী ক'রে —আমাকে কেউ নেবেই বা কেন?' 'সে-ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন না।' 'আমাকে মাপ করবেন, আমি পারবো না ও-সব।' 'আপনার কথা আমি কিছু-কিছু শুনেছি শান্তি-মাসির কাছে,' নিচু গলায় বলতে লাগলো অম্বু, 'আর এ-বাড়িতে আপনার দিন কী-ভাবে কাটছে তা তো চোখেই দেখি যখনই আসি। এই তো, সাড়ে-তিনটে বাজতে চললো, এখনো আপনার স্নান-খাওয়া হয়নি। একে কি একটা জীবন বলে! আপনার ইচ্ছে করে না এ থেকে বেরিয়ে আসতে?' কমলার মনটাকে কোথায় যেন ছুঁয়ে গেলো এই কথাগুলো, একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আমার উপায় নেই।' 'শান্তি-মাসির জন্য ভয় পাচ্ছেন।' অম্বুর ঠোঁট দুটো কুঁকড়ে গেলো হাসিতে। 'আমি ওঁকে সামলাতে পারবো—ভাববেন না। তাহ'লে—রাজি?' 'আমাকে একটু ভাবার সময় দিন।' 'এ নিয়ে আর ভাবার কী আছে। কথাটা হচ্ছে, ফিল্মের লাইনে কিছু চেনা-শোনা আছে আমার, চেষ্টা করলে কিছু হ'য়ে যেতে পারে, এই আরকি। ...চলি এখন, কাল আবার আসবো।'

৩

অম্বু চ'লে যাওয়ার পর কমলার মনে হ'লো তার মাথা ঘুরছে, পা কাঁপছে। এ কি সত্যি, এ কি সম্ভব— সে সিনেমায় নামবে, সে, কমলা? অম্বু কি ধাপ্পা দিয়ে গেলো আমাকে, একটা বাত-কে-বাত ব'লে গেলো? আমি তো সত্যি বলতে তাকে চিনিও না —সে কী, কেমন, পাড়ার সর্দারি ছাড়া আর কী করে বা কিছু করে কিনা, কিছুই জানি না আমি। বিশ্বাস কী তার কথায়? বাজে —ও-সব ভুলে যাওয়াই ভালো, ও-সবের কোনো মাথামুণ্ডু নেই। কিন্তু কেন হঠাৎ ও-রকম একটা ফালতু কথা আমাকে বলতে যাবে অম্বু, তাতে তারই বা লাভ কী? সত্যি কি কিছু আছে এর পেছনে? এই ফিল্মের কথা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি —কত হাভাতে মেয়ের কপাল খুলে গেছে দেশে-বিদেশে, যার পেট চলতো না সে নাকি রাজার ধনের মালিক হয়েছে। কিন্তু ক-টা হয় ও-রকম? লাখে একটা —কোটিতে একটা? কিন্তু —কোনোমতে বেঁচে থাকার সংস্থানটুকু কি হ'তে পারে না আমার? খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নেবে, অন্য কারো গলার কাঁটা হ'তে হবে না —এইটুকু? 'একে কি একটা জীবন বলে! এ থেকে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছে করে না আপনার?' সত্যি —আমিও তো মানুষ, আমাকে চিরকাল কেন পায়ের তলার কাদা হ'য়ে থাকতে হবে? 'আমার উপায় নেই।' কিন্তু আছে হয়তো, আমি জানি না, খুঁজে দেখিনি, খুঁজতে শিখিনি। কী জানি আমি —এই মস্ত বড়ো জগতের, মস্ত বড়ো কলকাতা শহরের কতটুকু খবর রাখি? সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে বাণীরা তিন বোন পরস্পরের গলা ডুবিয়ে সদ্য-দেখা ফিল্মটার কথা বলতে লাগলো—ভাবটা এমন যেন

ওখানে যারা নায়ক-নায়িকা সাজে তাদের মতো আশ্চর্য মানুষ আর ধরাধামে নেই। শুধু টাকা নয়, ঘরে-ঘরে এই ডামাডোল। তাহ'লে —চেষ্টা করবো? পাগল —আমি একটা কী? আমার না আছে রূপ, না কোনো গুণযোগ্যতা। কিন্তু যদি কিছুই না-থাকবে, তাহ'লে অম্বু বলবে কেন হঠাৎ? এটা তো ঠিক সে আমার উপকার করতে চাচ্ছে, কেন আমি তাকে এক কথায় ফিরিয়ে দেবো? মনের মধ্যে এমনি তোলাপড়া চলতে লাগলো আমার —কখনো জোনাকির মতো আশার ঝিলিক, আবার কখনো একটা আবছা ভয় —অজানা পথে পা বাড়িয়ে কোনো বিপদে পড়বো না তো?

পরদিন দুপুরবেলা মাসির ঘরে আমার ডাক পড়লো ; গিয়ে দেখি অম্বু ব'সে আছে। মাসি গম্ভীর গলায় বললেন, 'কমলা, অম্বু কী বলছে শোন।' অতি বিনীত আর নরম সুরে অম্বু বললো, 'যদি অভয় দেন রাগ করবেন না তাহ'লে বলি।' 'আহা, যার চালচুলো নেই তার আবার রাগরঙ্গ! শোন—' এর পরে মাসিই তুলে নিলেন কথাটা, আমি বুঝলাম অম্বু তাঁকে যা জপিয়েছে তা-ই তিনি শোনাচ্ছেন আমাকে — 'তোর জন্য খুব একটা ভালো কাজ জোগাড় করেছে অম্বু।' 'খুব ভালো কিনা জানিনা, ঠিক জোগাড়ও এখনো হয়নি, তবে আপনাদের আপত্তি না-থাকলে—' 'সিনেমার কাজ,' অম্বুর কথা কেড়ে নিয়ে মাসি আবার বলতে লাগলেন। 'আজকাল ওতে কারা পার্ট করছে জানিস তো? সব ভদ্রঘরের মেয়ে, বড়ো-বড়ো ঘরের মেয়ে। টাকা পায় অনে-ক—' মাসির চোখ দুটি চকচক ক'রে উঠলো — 'কেউ-কেউ হাজার-হাজার টাকাও ঘরে আনে!' 'হাজার কেন, লক্ষও পায় অনেকে, কিন্তু সকলের কি আর তা হয়, মাসিমা? তা ছোটোখাটো পার্টের জন্যও লোক দরকার হয়, আমি সেই ধরনের কিছু ভাবছিলুম', ব'লে অম্বু আমার দিকে এক পলক তাকালো। 'তা টাকা দেবে তো ওতেও?' 'অল্প-সল্প দেবে, ধরুন মাসে চার-পাঁচশোমতো হ'তে পারে।' 'কী যে বলো, অম্বু, পাঁচশো কি অল্প হ'লো? বলতে নেই, কমলা—' আমার দিকে তাকিয়ে অকারণে গলা নিচু করলেন শান্তি-মাসি, 'তোর মেসোর কথাই ধর না, বি এ পাশ, একটা আপিশের বড়োবাবু, তাও তো দ্যাখ মাসের শেষে যা ঘরে আনে তাতে এদিক টানতে গেলে ওদিক ফেঁশে যায়। তা তোর নিজের আর খরচ কী, বল, আছিস তো আমাদের কাছেই, আর আমরা ছাড়া আপনজন বলতে কে বা আছে তোর। শোন, এখনই ব'লে রাখছি, টাকা নিয়ে ছানভান করিস না, হাতে পেয়েই আমাকে এনে দিস, আমি বুঝে-সুঝে বিলিব্যবস্থা করবো।' মাসি মিষ্টি ক'রে হাসলেন একটু, তারপর অম্বুর দিকে ফিরে বললেন, 'তাহ'লে, অম্বু, তুমি কাল সকালে এসে ওকে নিয়ে যেয়ো।' এতক্ষণে একটু ফাঁক পেয়ে আমি বললাম, 'কিন্তু আমি কি পারবো?' 'আহা, হাত-মুখ নেড়ে দুটো কথা বলা —তা আবার কে না পারে।' 'তা তো ঠিকই!' হঠাৎ বেখাপ্পারকম শব্দ ক'রে হেসে উঠলো অম্বু, তার চোখ থেকে একটা দৃষ্টি ছুটে এলো আমার দিকে। আমি আবার বললাম, 'আমি পারবো না, শান্তি-মাসি।' 'কথা শোনো মেয়ের! রাজরানী হ'য়ে জন্মেছেন কিনা, পারবেন না! তোকে জন্ম ভ'রে খাওয়াবে কে, শুনি?' অম্বু তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো, 'থাক মাসিমা, আপনি জোর করবেন না মিছিমিছি। আমি বরং চলি।' মাসির চোখে রাগের ফুলকি জ্ব'লে উঠতে দেখলাম, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'বুঝছো না, ন্যাকামি হচ্ছে —একেই বলে পেটে খিদে মুখে লাজ। কমলা অত বোকা মেয়ে নয় যে সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবে। তুমি কাল এসো, অম্বু।' অম্বু উঠলো, মাসি তার সঙ্গে বেরোতে-বেরোতে বললেন, 'দেখো, আবার যেন বদনাম-টদনাম না হয়। আমাকে তিন মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, বোঝো তো।' অম্বুর উত্তর আমার কানে এলো, 'আমি থাক'তে ও-সবের জন্য ভাববেন না।'

খবর শুনে মানিক-বাণীদের মধ্যে হৈ-চৈ প'ড়ে গেলো, কিন্তু মেসো গম্ভীর হলেন। 'এটা কি ভালো হবে? বরং বিয়ের চেষ্টাই করা যাক না।' 'ঐ এক কথা তোমার মুখে। বিয়ে মানে তো বাচ্চা বিয়োনো আর হাঁড়ি ঠেলা —আর এতে কত টাকা জানো?' 'ভাবছিলাম —লোকেরা কত কী বলে তো —শেষটায় আবার একটা থেকে আর-একটা না হয়।' 'ছোঃ! ও-সব বাজে কথায় আবার কান পাতে নাকি কেউ! তাছাড়া তোমার নিজের মেয়েকে তো দিচ্ছো না —অত ভাবনা

কিসের? শোন, কমলা,' মাসি আমাকে দুটো উপদেশ দেয়া কর্তব্য মনে করলেন, 'মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলিস, ও-রকম একটা আওতায় প'ড়ে আবার বিগড়ে যাসনে। আর —ঐ যা বললাম, টাকা-পয়সা বিষয়ে খুব হুঁশিয়ার!' 'কমলা, তোমার নিজের কী ইচ্ছে?' ব'লে মেসো আমার দিকে তাকালেন। মাসি ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'ওর আবার ইচ্ছে অনিচ্ছে কী? আমরা ওর অভিভাবক, আমরা যা ঠিক ক'রে দেবো তা-ই হবে।' মেসো আরো দু-একবার প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু মাসি তখন টাকার স্বপ্নে বিভোর, কোনো যুক্তিতর্ক কানেই তুললেন না। পরদিন সকালে মাসি তাঁর একখানা জামদানি বের ক'রে দিলেন আমাকে, সেইটে প'রে অম্বুর সঙ্গে রাস্তায় বেরোলাম। সেই রাস্তা আমাকে শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌঁছিয়ে দেবে তা তখন কল্পনাও করতে পারিনি।

৪

এর পরের দিনগুলি ঠিক যেন মনে আনতে পারলো না কমলা, কেমন ঝাপসা হ'য়ে গেছে। এই যে সে নতুন বৌ সেজে ব'সে আছে, বীডন স্ট্রিটের এই তেতলার ঘরে, হাসছে মিষ্টি ক'রে, কথা বলছে অতি মৃদু গলায়, আর এই যে ভোজবাজির মতো গজিয়ে উঠছে লতায়-পাতায় কত নতুন আত্মীয় —এর সঙ্গে কেমন ক'রে মেলানো যায় সেই অস্থির দিনগুলিকে, যখন সে নিজে না-বুঝে এক কূল ছেড়ে এসেছে কিন্তু অন্য কূলও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে না? প্রথমে কি অবাক লেগেছিলো তার— এটা কোন জায়গা, সে কেন এসেছে এখানে, ঠাউরে উঠতে পারেনি! কিন্তু দু-দিনেই কেমন অভ্যেস হ'য়ে গেলো—এমনকি তার ভালোই লাগলো এই নতুন আবহাওয়া। আশায়-ধুকপুক-বুক আরো কত মেয়ে, অনেকবার 'কিছু হবে না' শোনার পরেও আবার যারা ফিরে আসে —সেও আজ তাদেরই একজন। ছেলেরা যেমন চাকরির জন্যে দোরে-দোরে ঘোরে, তেমনি। কত নতুন মুখ, নতুন মানুষ, নতুন কথা, কত ঝকঝকে গাড়ি, ঝকঝকে শাড়ি, কত হাসি, কত ক্লান্তি, কত হতাশা। এটা বাইরেব জগৎ, চোখ তুলে তাকালে আকাশ পর্যন্ত দেখা যায়, গায়ে লাগে হাওয়া ধুলো রোদ্দুর —হোক না সে অতি দরিদ্র, তবু সে আলাদা একটা মানুষ এখানে, শাড়িতে জড়ানো জীবন্ত বস্তা নয়। অবশ্য ওখানে পা দেয়ামাত্র চিচিংফাঁক হ'লো না, কিন্তু অম্বু অনবরত আশা দিয়ে যাচ্ছে, মাসি টাকার জন্য হাঁ ক'বে আছেন, আর সকালে উঠে তারও মনে হচ্ছে মাসির খেজমৎ খাটার চাইতে বাইরে ঘুরে আসা ভালো। অবশেষে একটা ভিড়ের দৃশ্যে দাঁড়াতে পেলো সে, তারপর দৈবাৎ একটা আধ মিনিটের পার্ট জুটে গেলো, কিছুদিন পর আরো একটা। নিজের হাত-খরচের জন্য অল্প কিছু রেখে সে সব টাকাই মাসির হাতে দিলো, মাসির মুখে হাসি আর ধরে না, তাঁর মেয়েদের নতুন জামা-কাপড়ের সঙ্গে তাকেও একখানা মাঝারিগোছের শাড়ি কিনে দিলেন। কমলার মনে হ'লো তার দুখনিশি ভোর হ'লো বুঝি, হয়তো কোনো-একদিন সে স্বাধীনভাবে আলাদাও থাকতে পারবে, কিন্তু এমন সময় ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটলো যা তার ঠিক হিশেবের মধ্যে ছিলো না।

বোকা ছিলাম তখনও, বুঝতে পারিনি অম্বু কেন এগিয়ে এসে আমার উপকার করছে। বোকা —না কি ন্যাকা সেজেছিলাম? আমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হচ্ছে অম্বুর —হঠাৎ সে স্টুডিওতে চ'লে আসে এক-একদিন, হয়তো বা আমারই জন্য তদ্‌বির কবতে, মাঝে-মাঝে সন্ধেবেলা আমাকে ট্যাক্সিতে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেয়। প্রথম দিন বলেছিলো, 'আমি শহরের দিকে যাচ্ছি, আপনাকে নামিয়ে দিতে পারি কি?' 'না, না, আপনি কেন অসুবিধে করবেন, আমি বাস্‌-এই যেতে পারবো।' কিচ্ছু অসুবিধে নেই —ট্যাক্সিতে জায়গা আছে প্রচুর, আর আপনাকে নিলে ভাড়াও বেশি লাগছে না।' আমি সংকোচ কাটিয়ে উঠে বসলাম তার পাশে, যেতে-যেতে বেশ খোলামেলাভাবে গল্প করতে লাগলো অম্বু,

যেন আমার অনেকদিনের চেনা। 'ও। ...তা হবে। ...তা-ই নাকি?' আমার মুখে এর বেশি কথা জোগালো না, আমাকে নামিয়ে দেবার সময় অম্বু বললো, 'উহুঁ, অমন লাজুক হ'লে চলবে না তো, ফিল্মে আরো চটপটে মেয়ে চাই।' তার সঙ্গে ট্যাক্সিতে ফেরার ইচ্ছেটা আরো ক'মে এলো আমার, কিন্তু সরাসরি 'না' বলতেও পারি না, পাছে সে কিছু মনে করে —আর তার খুব স্পষ্ট কোনো দোষও আমি খুঁজে পাচ্ছি না তখনও। আমাকে সে 'তুমি' বলতে শুরু করেছে —তা বলুক, এতে তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না আমার। তার কথাবার্তা আমার মনে হয় একটু বোকার মতো —এই যেমন সে প্রায়ই আমাকে অভিনেত্রীদের ঐশ্বর্যের গল্প শোনায় —কে দেড় লক্ষ টাকা ইনকামট্যাক্স' দিয়েছে, কার পুরো বাড়িটা এয়ার-কন্ডিশন্ড আর কে-ই বা তাল-তাল সোনা কিনে লুকিয়ে রেখেছে বাথরুমের দেয়ালের মধ্যে —এ-সব কথার বুড়বুড়ি ফোটে তার মুখে। 'ইনকাম ট্যাক্স'' কাকে বলে, 'এয়াব-কন্ডিশন্ড' ব্যাপাবটা বা কী, তা আমি দু-দিন আগেও জানতাম না, আমার কাছে এ-সবের কোনো অর্থ নেই তাও কি বোঝে না অম্বু? আমার হাসি পায়, যখন সে বলে যে আমিও একদিন 'স্টার' হ'যে যেতে পারি, আমাব 'ফিগার' নাকি চমৎকার, আমার চোখে নাকি খুব 'অ্যাপীল' আছে। হাসি পায়, কিন্তু কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিতেও পারি না, আমার মুখ দিয়ে বেবিয়ে যায়, 'কী যে বলেন।' 'বাঃ, সুন্দর দেখায় তো তোমাকে লজ্জা পেলে।'

মাঝে-মাঝে অম্বু এমনভাবে তাকায়, বা হাসে, বা এমন সুরে কথা বলে, বা এমন কোনো-কোনো বিষয় টেনে আনে, যাতে আমি কুঁকড়ে যাই ভেতরে-ভেতরে, আর এও আমার অবাক লাগে যে আমাকে সে বাড়িব দরজা অবধি পৌঁছিয়ে দেয না কখনো গলির মোড়ে নামিযে দেয। আমি যদি ভদ্রতা ক'রে বলি, 'একটু আসবেন নাকি আমাদের ওখানে?' সে জবাব দেয়, 'নাঃ, শান্তি-মাসিব ভ্যানভ্যানানি আর ভালো লাগে না। বড্ড গোলমেলে মানুষ।' শান্তি-মাসিকে আমি মনে-মনে যা-ই ভাবি না, অম্বুব মুখে এ-ধবনের কথা আমাব কানে অভদ্র ঠেকে, মাসির কথা উঠলে সে সাবা মুখে ভাঁজ ফেলে যে-ভাবে হাসে, সেটা সত্যি বলতে কুৎসিত লাগে আমার। কিন্তু আমি চেষ্টা কবি তাকে খাবাপ ব'লে না-ভাবতে, কিংবা ভাবি ভালো-মন্দ বিষয়ে আমার ধাবণাগুলি বড্ড পুবোনো, পাড়াগেঁয়ে, আমাব বোধহয কলকাতাব চাল-চলন শিখে নেয়া উচিত।

সেদিন বেশ শীত ছিলো, ট্যাক্সিতে উঠে অম্বু বললো, 'তুমি কোনো গাযের কাপড় আনোনি, দেখছি —-আমারটা নাও।' আমি ত্রস্তে ব'লে উঠলাম, 'না, না, কোনো দরকার নেই— আমার শীত কবছে না।' অম্বু তার ভাঁজ-করা আলোয়ানটা ছড়িয়ে দিলো আমার পিঠের ওপর, আমি আবার বললাম, 'সত্যি আমার দরকার নেই।' 'কী আশ্চর্য —আমাকে না-হয় তোমার পছন্দ হয় না, কিন্তু আলোয়ানটা দোষ কবলো কী?' আমার তর্ক করতে ইচ্ছে কবলো না, তাছাড়া মনে হ'লো বোধহয় একটা ছোট্ট ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি করছি, কোণ ঘেঁষে ব'সে বইলাম চুপ ক'বে। একটু পরে অম্বু বললো 'বাগ করলে? আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না?' যেন তার এই ঘনিষ্ঠ হবাব ভাবটা লক্ষ কবিনি, এমনি সুরে বললাম, 'কিছু বললেন?' 'ব'লে আব কী হবে —আমার কোনো কথাই তো বাখলে না এ-পর্যন্ত। একটা ফিল্মে নিযে যেতে চাইলাম —/না*! চিড়িয়াখানা —ডায়মন্ড হার্বরে পিকনিক— /না*! মাঝে-মাঝে /হ্যাঁ* বলতে হয, জানো তো। যেমন ধরো, এই যে তুমি ফিল্মে কাজ করছো —এটা ভালো হয়নি?' আমি হঠাৎ বললাম, 'আমি যা কবছি তাকে কি আব কাজ বলে। এ তো এক ধরনের উঞ্ছবৃত্তি।' অম্বু যেন খুব খুশি হ'লো আমাব কথা শুনে, টেনে-টেনে বললো, 'সবুর করো, কমলা, সবুব করো, এক লাফে তো মগডালে ওঠা যায় না।' একটু পরে আবার বললো, 'একটা খবর আছে, কমলা। শুনবে নাকি?' 'বলুন'। 'আবে একটু তাকাও না আমার দিকে। অমন জবুথবু হ'য়ে ব'সে আছো কেন? শোনো, আমাব এক বন্ধু সিনেমার ব্যাবসায় নামছে, তার প্রথম ফিল্মের হীরোয়িন হবার জন্য নতুন মেয়ে চাই,' ব'লে অম্বু

চুপ করলো। আমার বুকের মধ্যে আশার কাঁপুনি অনুভব করলাম, মুখে কিছু বললাম না। 'আমি তোমার কথা তাকে বলেছি, জানো। সে একবার দেখতে চায় তোমাকে। তোমার আপত্তি নেই তো?' 'আপত্তি কেন থাকবে?' 'তাহ'লে চলো না কাল আসানসোলে আমার সঙ্গে।' 'আসানসোলে কেন?' 'আমার বন্ধু সেখানেই থাকে, একটা কয়লা-খনির ম্যানেজার সে।' 'তিনি কলকাতায় আসেন না কখনো?' 'সামনের মাসে আসবে, কিন্তু আমি চেয়েছিলাম এক্ষুনি সব ঠিক ক'রে ফেলতে। দেরি করলে ফসকে যেতে পারে, বোঝো তো।' আমি তখন স্বাধীন উপার্জনের স্বাদ পেয়েছি, স্বাধীন জীবনের স্বপ্ন দেখি মাঝে-মাঝে, তাই অম্বুর কথাটাকে একেবারে অবিশ্বাস করতে পারলাম না। অজান্তে আমার মনের কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, 'কিন্তু আসানসোলে কী ক'রে যাই?' 'ট্রেনে যাবে, ট্রেনে ফিরে আসবে —মুশকিলটা কী? শান্তি-মাসিকে বললেই হবে আউটডোর শুটিং-এ যাচ্ছো।' 'আমি মিথ্যে বলতে পারবো না।' 'মিথ্যেটা না-হয় আমিই বলবো —তাহ'লে হবে?' 'না, থাক! আপনার বন্ধু কলকাতায় আসুন —তখন যা হবার হবে।' 'তুমি তো ভারি ছেলেমানুষ দেখছি। আচ্ছা, চলো, এই কাছেই থাকে প্রফুল্ল নাগ, আমার বন্ধুর পার্টনার হবে সে, তার কাছে তোমাকে নিয়ে যাই।' কিছুক্ষণ পরে একটা গলির মধ্যে সে ট্যাক্সি' থামালো।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে অম্বু বললো, 'প্রফুল্ল বাড়ি নেই দেখছি। তা এসেই যখন পড়েছি একটু ব'সে যাওয়া যাক।' পকেট থেকে চাবি বের ক'রে দরজার তালা খুললো অম্বু, ঘরে আলো জ্বেলে দিলো। তাকে অন্যের বাড়ির তালা খুলতে দেখে আমি অবাক হলাম, আরো অবাক হলাম ঘরে ঢুকে। এ কি সম্ভব যে কোনো ফিল্ম-কোম্পানির পার্টনার বাস করে এখানে? কোনো ভদ্রলোকের বাসা ব'লেও তো মনে হয় না। হতচ্ছাড়া চেহারার একটা ঘর, দেয়াল ঘেঁষে খাট, টেবিলে কয়েকটা কাচের গেলাশ সাজানো, এলোমেলো দু-তিনটে চেয়ার, জানলার তাকে কয়েকটা খালি বোতল দাঁড়িয়ে আছে। আমার গলা চিরে আওয়াজ বেরোলো, 'এখানে আমাকে নিয়ে এলেন কেন?' 'আর খুকিপনা কোরো না তো, কমলা, তোমার তো একবার বিয়েও হয়েছিলো শুনতে পাই,' ব'লে অম্বু দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে সারা মুখে ভাঁজ ফেলে হাসলো। ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেলো, তবু মনে জোর এনে বললাম, আমি আর এক মুহূর্ত থাকবো না এখানে!' 'ভয় কী, আমি তোমাকে খুন করার জন্য নিয়ে আসিনি এখানে —দ্যাখো আমার পকেট, ছোরাটোরা কিচ্ছু নেই, বরং একটা ভালো জিনিশ আছে।' পকেট থেকে একটা চ্যাপ্টা বোতল বের ক'রে অম্বু গেলাশে ঢাললো খানিকটা, সেটা হাতে নিয়ে আমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো, 'শোনো কমলা, ছটফট ক'রে কিচ্ছু লাভ নেই। এটা তো জানো, তোমার শান্তি-মাসিকে আমি যা বোঝাবো তিনি তা-ই বুঝবেন? আর আমার কথামতো চললে তোমার ভালো ছাড়া মন্দ হবে না। এসো, একটু আনন্দ করা যাক।' অম্বু বাঁ হাতে আমার কোমর জড়িয়ে ধ'রে লম্বা চুমুক দিলো গ্লাশে, তারপর গ্লাশটি আমার ঠোঁটের কাছে তুলে ধ'রে বললো, 'একটু চেখে দেখবে নাকি? খাশা!' আমার মনে হ'লো আমি জলে ডুবে যাচ্ছি, নিশ্বাস নিতে পারছি না, কিন্তু হঠাৎ ভগবান আমাকে বলবুদ্ধি জোগালেন। আমি আস্তে গ্লাশটা ওর হাত থেকে নিয়ে চুমুক দেবার ভান করলাম, হাসলাম একটু, ওর চোখে চোখ ফেললাম, তারপর একটু পেছনে স'রে গিয়ে সেটা ছুঁড়ে মারলাম ওর মুখের ওপর। ঝনঝন কাচের শব্দ —অম্বুর গলার একটা অস্ফুট চীৎকার —কিন্তু আমি ততক্ষণে অন্ধের মতো নেমে এসেছি রাস্তায়, আমার বুকের ভেতরটা যেন ফেটে যাচ্ছে, কেমন ক'রে বাড়ি পৌঁছলাম মনে নেই।

'শান্তি-মাসি, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে আর ফিল্মে কাজ করতে বলবেন না। ...না, পারবো না আমি, কিছুতেই না, আপনি আমাকে দয়া করুন।' আমি যতই কাঁদি, মেসো যতই বোঝান, মাসি অনড়। 'অম্বু বললো তোর জন্য একটা বড়ো পার্ট জোগাড় করেছে —হাজার-হাজার টাকা হবে তাতে, আর তুই সেটা ছেড়ে দিতে চাস! কেন, হয়েছে কী?' 'কিছু হয়নি —আমার ভালো

লাগে না।' 'ভা-লো লা-গে না।' মাসি ভেংচিয়ে উঠলেন, 'ঢং দ্যাখো মেয়ের! তোর কী ভালো লাগে আর লাগে না তাতে কার কী এসে যায় রে? তোর কি ভাতার আছে, না মা-বাপ আছে, না মাথা গোঁজার জায়গাটাই আছে একটা! ভাবছিস আমার অবাধ্যতা ক'রে এ-বাড়িতে তিষ্ঠোতে পারবি? তোকে আমি ঘাড়ে ধ'রে রাজি করাবো।' এমনি কাটলো দু-তিন দিন, তারপর হঠাৎ একদিন মাসির চীৎকারে বাড়ি ফেটে পড়লো —'হারামজাদি! তোর পেটে এত বিদ্যে! লুকিয়ে-লুকিয়ে পিরিত চালাচ্ছিস অম্বুর সঙ্গে! আমারটা খেয়ে আমারই ঘরে সিঁদ কাটবি, এত আস্পর্ধা তোর! নচ্ছার মেয়ে —বেলেল্লাপনার আর জায়গা পাসনি! দ্যাখ —তোর নাঙ তোকে কী লিখেছে দ্যাখ!' মাসি একটা দোমড়ানো কাগজ ছুঁড়ে মারলেন আমার মুখের ওপর, আমি সেটা খুলে দেখলাম। 'কমলা, আসানসোলে এসে অবধি শুধু তোমাকেই মনে পড়ছে। সেদিন যা হ'য়ে গেছে তার জন্যে তোমার কাছে মাপ চাইছি। কলকাতায় ফিরেই দেখা করবো তোমার সঙ্গে, তখন সব বুঝিয়ে বলবো। ইতি তোমারই অম্বু।' আমি তক্ষুনি বুঝলাম মাসি-বাড়ির পাট আমার চুকলো, একটি কথাও বের করতে পারলাম না মুখ দিয়ে, পারলেও মাসির কানে তা পৌঁছতো না —তাঁর চোখ তখন আগুন, গা থেকে কাপড় খ'সে পড়ছে, ঠোঁটে ফেনা তুলে চীৎকার করছেন, 'বেরো, এক্ষুনি বেরো আমার বাড়ি থেকে, জাহান্নমে যা!' সঙ্গে-সঙ্গে স্রোতের মতো গালি-গালাজ বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে। আশে-পাশে জানলায়-জানলায় ভিড়, বাচ্চাটি গড়িয়ে-গড়িয়ে কাঁদছে, ছোটো মেয়েটিও কেঁদে ফেলেছে ভয় পেয়ে, মেসো না-খেয়ে আপিশে চ'লে গেলেন— সেই রণচণ্ডী মূর্তির সামনে এগোবার মতো কলজে কারোরই হ'লো না। অবশেষে নেহাৎই ক্লান্ত হ'য়ে শুয়ে পড়লেন মাসি, যা-হোক কিছু খেয়ে নিয়ে মানিক আর বাণীরা স্কুলে-কলেজে পালিয়ে বাঁচলো, একটা সময়ে নীরব হ'লো বাড়ি। আমি সেই সুযোগে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম।

৫

তোমার মনে পড়ে, অবনী, সেই রাত্তিরটা, কুয়াশা, টালিগঞ্জের নির্জন গলি? ভাবলে এখনো একটু শীত শীত করে আমার, গা যেন শিরশির করে। সন্ধের পরে মহালক্ষ্মী স্টুডিও থেকে বেরিয়েছি। হ্যাঁ, সেখানেই আবার —আর কোনো উপায় জানা নেই ব'লে সেখানেই। যদি কিছু হয়, যদি এক্ষুনি কিছু জুটে যায়। কিছু হ'লো না, কিন্তু দিনটা কাটিয়ে দেয়া গেলো ঘুরে-ঘুরে। কিন্তু এখন? হঠাৎ মনে পড়লো আজ আমি গর্চা লেন-এ ফিরবো না, কোনোদিনই আর ফিরতে পারবো না। আসলে হঠাৎ নয়, আসলে দিন ভ'রে ঐ কথাটা ছিলো আমার সঙ্গে-সঙ্গে, মাথার মধ্যে পোকার মতো, বা যেন দাঁত-ব্যথা, বা আধ-কপালে মাথা-ধরা —অ্যানাসিনের বড়ি গিলে-গিলে দাবিয়ে রাখছি, কিন্তু আছে সব সময়, ভোঁতা, চিনচিনে, নাছোড়। আমি চেষ্টা করেছি ভুলে থাকতে, ভান করেছি যেন কিছু হয়নি, আর এখন দেখছি রাত হ'য়ে গেছে, এটা রাস্তা, আমি কোথায় যাবো জানি না। এতক্ষণে মেসো বাড়ি ফিরেছেন —তিনি কি চেষ্টা করবেন না আমার একটা খোঁজ নিতে? মুখ বুজে এত বড়ো একটা অন্যায় মেনে নেবেন? কিন্তু অন্যায় তো আমার, সব দোষ আমার, যেহেতু আমি একটা নেওয়ারিশ যুবতী মেয়ে। কিন্তু মেসো লোক ভালো, পুরুষমানুষ, তাঁকে সব খুলে বললে তিনি বুঝবেন না তা কি হ'তে পারে? ফিরে যাবো? ছি, কমলা! তোমার একটা আত্মসম্মান নেই!

কিন্তু কোথায় যাই? কী করি আমি এখন?

মাঘ মাস, ঘন কুয়াশা, আবছা আলো গলিতে, চারদিক শুনশান। এতক্ষণ টের পায়নি, কমলা, কিন্তু এবারে তার সারা শরীর ছেয়ে ক্লান্তি নামলো। যেমন পাড়াগাঁয়ে বর্ষাকালে, সূর্যাস্ত হবার

সঙ্গে-সঙ্গে, গাছপালায় ডোবায় পুকুরে শেয়ালে জঙ্গলে জড়িয়ে-জড়িয়ে ঝামরে অন্ধকার নামে, তেমনি। খিদে পেয়েছে তার, বড্ড। শীত, একটা পাৎলা পুরোনো কম্বু তার গায়ে, কেঁপে উঠছে, চলতে পারছে না। তাহ'লে সে সত্যি আজ রাস্তায় দাঁড়িয়েছে, এই লক্ষ-লক্ষ মানুষের শহরে তার কোনো জায়গা নেই? না, কিছু হবে, হ'তেই হবে, সে তো আর ম'রে যেতে পারে না। পেছনে কোনো পায়ের শব্দ? তা-ই তো মনে হচ্ছে। ভারি জুতোর শব্দ, পুরুষের পায়ের। বলিষ্ঠ কোনো পুরুষ। পুরুষটির তাকে অনেক আগে ছাড়িয়ে যাবার কথা, কিন্তু কেমন পিছু-পিছু আসছে, তারই চলার তালে তাল মিলিয়ে। অম্বু না তো? একটা শিউরানি নামলো কমলার মেরুদণ্ড বেয়ে, তারপরেই যেন ভয়ের ভাবটা কেটে গেলো তার, কোনো ভয় অনুভব করার মতো শক্তিও তার নেই এখন। সে যেন হাওয়ায় ঝুলছে ; অম্বু, শান্তি-মাসি, আজ সকালের ঘটনা, সব অস্পষ্ট —সে শুধু একটু বসতে চায় কোথাও, শুতে চায়, আর-কিছু চায় না। কিন্তু না, অম্বু না, পায়ের শব্দটা অন্য রকম, আর তাছাড়া অমন পিছু নেবারই বা দবকার কী অম্বুর, সে তো এখন মুখোমুখি এসে বলতে পারে, 'কেমন, শুনলে না তো আমার কথা! এবার?' তাহ'লে গুণ্ডা? ছেনতাই? হাসি পেলো কমলার —কী বা আছে তার বটুয়ায়, কিছু খুচরো আর বড়ো জোর একটা-দুটো টাকা ; তার কী ভয়? কিন্তু অন্য ভয় নেই? সে তো মেয়েমানুষ। অম্বুর মতো কত আছে এই কলকাতায় তা কে জানে। 'ভগবান, রক্ষা করো!' একটা নিঃশব্দ চীৎকার উঠলো কমলার বুক থেকে, তারপরেই মনে-মনে বললো, 'আর ভগবান! রাস্তায় যে দাঁড়িয়েছে সে মেয়েও নয়, পুরুষও নয়, মানুষও নয়। আমাকে শক্ত হ'তে হবে, শক্ত হ'তে হবে।'

কড়কড় শব্দে একটা লরি চ'লে গেলো, প্রায় তার গা ঘেঁষে। দ্যাখো কাণ্ড, আর-একটু হ'লেই হয়েছিলো আরকি। তা, এমন আর ক্ষতি হ'তো কী, বরং ভালোই, আধ মিনিটে ভাবনা-চিন্তা শেষ। না, অমন এলিয়ে পড়লে চলবে না —শুনেছে দমদমে তার এক দাদু থাকেন, তাঁর কাছে চ'লে যায় যদি? মনে জোর এনে দ্রুত পা ফেললো সে, পট ক'রে স্যান্ডেলের স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে গেলো, বাধ্য হ'লো থামতে। দেখতে পেলো সামনে ট্রাম-ডিপো, লোকজন, দোকানপাট, উজ্জ্বল। পর-পর কয়েকটা আলো-জ্বলা ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে, বাঁকা ভঙ্গিতে, যেন কোন সুখের দেশে যাচ্ছে ওরা, ডাকছে সকলকে 'এসো এসো', তাকেও। কলকাতার ট্রাম —না কি মাদারিপুরের স্টিমার-ঘাটে সারি-সারি নৌকো, সে তার বাবার হাত ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে জেটিতে, ঐ আসছে স্টিমার, সারা গায়ে বাতি জ্বেলে, কালো নদী কাৎরে উঠছে সার্চ-লাইটের আলোয়, তার ঘুম পাচ্ছে। আমার চোখ ঝাপসা হ'লো, গা দুলে উঠলো, আমি কোথায় আছি তা যেন ভুলে গেলাম, আর ঠিক তখনই দেখতে পেলাম তোমাকে, আমার পাশে, আমার দিকে তাকিয়ে।

'মাপ করবেন, মনে হচ্ছে আপনাকে মহালক্ষ্মী স্টুডিওতে দেখেছি?'

অচেনা লোকের সম্ভাষণে চমকাইনি আমি, সোজাসুজি তোমার দিকে তাকিয়েছিলাম। তুমি কি আমাকে নির্লজ্জ ভেবেছিলে, খারাপ মেয়ে ভেবেছিলে? কিন্তু আমি তো খারাপই, আমি সব বুঝেও নিজের স্বার্থে অম্বুকে প্রশ্রয় দিয়েছিলাম, চেয়েছিলাম তাকে ধ'রে ফিল্মের ওপর-তলায় উঠতে। সে যদি আচমকা ও-রকম একটা কাণ্ড না-করতো, যদি ভয় পাইয়ে না-দিতো আমাকে, তাহ'লে —কী হ'তো কে জানে। আর যদি সেই মুহূর্তে অম্বু এসে আমার পাশে দাঁড়াতো, তাহ'লে আমি তার সঙ্গেই চ'লে যেতাম, যেখানে সে বলতো —হয়তো ঐ দোতলার কুৎসিত ঘরটাতেই, এমনি আমার অবস্থা তখন। কিন্তু কত ভাগ্যে অম্বু আসেনি, তুমি এসেছিলে। তুমি, অবনী। আমার উদ্ধারকর্তা, আমার জীবনদাতা, আমার স্বামী।

সেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রথম দুটো-চারটে কথা —তোমার মনে আছে? 'আপনি কি কাজের চেষ্টায় স্টুডিওতে গিয়েছিলেন? ...হ'লো না?' 'কই আর হ'লো।' 'তাহ'লে—' তুমি কথা শেষ করলে

না, আমিও কিছু বললাম না, কিন্তু তুমি বুঝে নিলে। সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়েছো, চওড়া বুক, গায়ের রং কালো, মুখের ছাঁদ পুরুষালি ধরনের সুশ্রী। আমি ছেঁড়া স্যান্ডেলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখছিলাম, তুমি বললে, 'ছিঁড়ে গেলো বুঝি? তা আমি একটা ট্যাক্সি নিচ্ছি, আপনাকে নামিয়ে দিতে পারি কি কোথাও?' ট্যাক্সি শুনেই অম্বুকে মনে পড়লো, আমার, কাঁপা গলায় ব'লে উঠলাম, 'না! আমি ট্রামেই যাচ্ছি। আমি অনেক দূরে থাকি।' 'অনেক দূরে? কোথায়?' আমার মনে প্রথমে যে-নামটা এলো সেটাই ব'লে ফেললাম, 'দমদমে।' 'দমদমে কিন্তু ট্রামে যাওয়া যায় না।' আবছা আলোয় তোমার চোখে আমার চোখ পড়লো, আমি মাথা নিচু করলাম। একটু পরে তুমি বললে, 'আমার একটা আস্তানা আছে, ইচ্ছে করলে আজকের রাতটা সেখানে কাটাতে পারেন।' কেমন সহজে বললে কথাটা, যেন এতে অসাধারণ বা অস্বাভাবিক কিছু নেই। 'আর আপনি?' নিজের অজান্তেই কথাটা বেরিয়ে গেলো আমার মুখ দিয়ে, বলামাত্র বুঝলাম এক অচেনা অজানা পুরুষের বাড়িতে রাত কাটাতে আমি রাজি হয়েছি। আর তারপর ট্যাক্সিতে ব'সে—আরামে, অন্ধকারে, গাড়ি চলার দুলুনিতে —আমি প্রায় ঘুমিয়ে পড়লাম, কোনো-কিছু ভাবার ক্ষমতা আর রইলো না। একবার জিগেস করলাম, 'আপনিও কি ফিল্মে কাজ করেন?' 'তেমন কিছু করি না —এই সীন-টীন আঁকি মাঝে-মাঝে।' ''আর?'' মানে?' 'আপনার কথা কিছুই জানি না।' 'আমিও তো আপনার কথা কিছুই জানি না। তার কোনো দরকার আছে আপাতত?' 'না, দরকার কিছু না।' ট্যাক্সির কোণে হেলান দিয়ে আমি চোখ বুজলাম, উঠে এলাম তোমার সঙ্গে অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে, অন্ধের মতো। খেলাম তুমি যা নিয়ে এলে, পশুর মতো ঘুমোলাম সারা রাত। জানলাম না যে এই বিছানা তোমার, আমার গায়ে তোমার কম্বল, তুমি পাশের ঘরে মেঝেতে শুয়ে রাত কাটাচ্ছো · তোমার অস্তিত্ব, আমার অস্তিত্ব, সব ভুলে রইলাম। সকালে উঠে বুঝলাম এটা হাজরা রোডের মোড়, একটা তেতলা বা চার-তলার ফ্ল্যাটে আছি আমি, অবাক হ'য়ে গেলাম ঘর দেখে, তোমাকে দেখে। কী সহজে সব হ'য়ে গেলো, স্বপ্নের মতো।

৬

একটু আগে তারই বয়সী একটি মেয়ে এসে তার সামনে দাঁড়ালো। 'আমি তোমার খুড়তুতো জা, আমার নাম মল্লিকা। তোমার হাতটা দেখি একটু,' ব'লে লাল মখমলের বাক্স থেকে একটি আংটি বের করলো, ছোট্ট তারার মতো তিনটে হীরে বসানো। নিজের আংটি-পরা আঙুলের দিকে তাকালো কমলা, তাকালো ঘরের চারদিকে, ড্রেসিং-টেবিলে কত রকম প্রসাধন সাজানো, কত রঙের শাড়ি ঝুলছে আলনায়। রাত হ'তে-হ'তে আরো কত জ'মে উঠবে। সব তার জন্য। সত্যি কি এরই মধ্যে তাকে এত ভালোবেসেছে সবাই? না, ভালোবাসা নয়, নিয়ম। নতুন বৌয়ের জন্য বরণ-ডালা, আশীর্বাদ। তার বিয়ের চিঠির তলায় লেখা আছে, 'লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়।' কিন্তু আশীর্বাদেরও একটা চিহ্ন চাই, যা চোখে দেখা যায়, ছোঁয়া যায়, যা শুধু মুখের কথা নয়। যেমন সিঁদুর, যেমন শাঁখা, যেমন পুরুতের মন্ত্র। সেইজন্যেই এত শাড়ি, গয়না, আসবাবপত্র। চিহ্নের ওপরেই জীবন চলে, চিহ্নই সব। কমলার মেরুদণ্ড বেয়ে একটা সুখের শিউরানি নেমে গেলো —এর পর থেকে সে দু-একটা ছোটো-ছোটো বিলাসিতা ভোগ করতে পারবে সে-জন্যে নয়, যে-কারণে এই সব উপহার সে পাচ্ছে সে-কথা ভেবে। 'আমি তোমার পিসতুতো জা', 'ইনি তোমার মাস্-শাশুড়ি'—এই কথাগুলো ঘুরছে তাকে ঘিরে-ঘিরে। সে আজ রাতারাতি কারো জা হ'তে চলেছে, কারো বৌদি, কারো বা কাকিমা, অন্য কারো নাতবৌ। এরই মধ্যে যেন তার শেকড় ছড়িয়ে পড়ছে

চারদিকে, এই সংসারে ; আশে-পাশে অনেক নতুন মানুষ একটু স'রে-স'রে গিয়ে, একটু বদলে গিয়ে, তাকে নিয়ে অন্য একটা ছবি তৈরি করছে। এই ছবিতে সে আর অবনী পাশাপাশি, এ-মুহূর্তে ঠিক মাঝখানটিতে, কিন্তু অন্য কাউকে বাদ দিয়ে নয়। পুনর্মিলন হ'লো অবনীর সঙ্গে তার বাড়ির লোকেদের, একটা বিজ্ঞাপনের আপিশে ভালো চাকরিও হ'লো তার —চাকরি ঠিক ক'রে দিয়েছেন তার সেই কাকাবাবু, যাঁর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে সে দেড় বছর আগে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো। ভালোই হ'লো, রোদে বৃষ্টিতে অবনীকে আর ঘুরতে হবে না কাজের খোঁজে, টাকা আদায়ের চেষ্টায়, সারা রাত জেগে সিনেমার সীন আঁকতে হবে না। ভদ্র জীবন, স্থিতি, সচ্ছলতা। আজ কেউ-কেউ ঠোঁট বাঁকাচ্ছে অবশ্য, বলছে এ কী বিশ্রী একটা বিয়ে করলো অবু —কিন্তু ও-সব আর ক-দিন। সব ভুলে যাবে সবাই, না-ভুলে উপায় থাকবে না। 'বৌমা,' 'বৌদি,' 'কাকিমা,' 'মামিমা' —ও-সব নামের মধ্যেই জাদু আছে। বেশিদিন নিন্দে করা যায় না, তাতে যে নিজেদেরই নিন্দে। আর যদি বা নিজেদের মধ্যে একটু-আধটু চুকলি কাটে, অন্য কেউ কিছু বললেই রুখে উঠবে —এরই তো নাম আত্মীয়তা। তাছাড়া সে, কমলা —যেহেতু সে আনকোরা নতুন বৌ নয়, বাসি, বলতে গেলে ডবল-বাসি—তাই সেও চেষ্টা করবে এঁদের মনোমতো হ'তে, এঁদের খুশি করতে —কাজে, সেবায়, মিষ্টি কথায়, নম্র ব্যবহারে। না, তাকে চেষ্টাও করতে হবে না, ও-সব আপনিই আসবে— এখনই সে ভালোবাসছে এই বাড়ির লোকেদের, আত্মীয়-স্বজন সকলকেই —যে-ননদ 'ফার্স' ব'লে গেলো এমনকি তাকেও। কমলা জানে এর প্রতিদান পেতেও দেরি হবে না তার, এঁরা আজকে যেটা 'লৌকিকতা' করছেন, তা-ই থেকেই আস্তে-আস্তে ভালোবাসা জন্মাবে এঁদের মনে ; যত দিন যাবে তত সে আরো বেশি হবে এ-বাড়ির বৌ, এঁদেরই একজন, যাকে বাদ দিয়ে কিছুই আর ঘটবে না —না কোনো বিয়ে, না কোনো শিশুর জন্ম, না কোনো মৃত্যু।

অবশ্য এই বিয়ে নিয়ে তুমুল হুলুস্থুল গেছে কিছুদিন —এই বীডন স্ট্রিটের বাড়িতে। সব কথা তাকে বলেনি অবনী, কিন্তু কমলা তার মুখ দেখে, আর দুটো-একটা কথা শুনেই বুঝে নিয়েছে। বোঝা তো শক্ত নয় —এ-বাড়ির ছেলে একটা তিন-কুল-খোয়ানো রাস্তায়-কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়েকে ঘরে আনতে চাচ্ছে, এটা এঁদের পক্ষে বজ্রাঘাত ছাড়া আর কী। তিন পুরুষ ধ'রে শাঁসালো এই বীডন স্ট্রিটের মুখুয্যেরা, চারদিকে আত্মীয়-কুটুমের মধ্যে গরিব কেউ নেই, এঁদের কাছে বিয়েটাও হ'লো মান-সম্মান টাকা বাড়াবারই একটা উপায়— এরই মধ্যে অবনী হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড ক'রে ফেললো যা এঁদের প্রায় কল্পনার পরপারে। সত্যি বলতে, অবনী শুরু থেকেই অবাধ্য ; কাকার কথামতো আইন পড়তে রাজি হয়নি কিছুতেই, জোর ক'রে ভর্তি হয়েছিলো আর্ট-কলেজে, শেষটায় রাগ ক'রে বেরিয়ে এসেছিলো বাড়ি থেকে কিছু কাপড়চোপড় আর ছবি আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে। ছবি আঁকবে সে, আর-কিছু করবে না : এই তার জেদ। তা শেষ পর্যন্ত তার এই আবদারটা নিশ্চয়ই মেনে নিতেন বাড়ির সবাই —বিধবা মায়ের এক ছেলে সে, এমন নয় যে চালচুলো নেই বা রোজগার না-করলে দিন চলবে না, না-হয় রং-তুলি নিয়ে খেলাই করতো অবনী, যতদিন তার ভালো লাগতো। কিন্তু —বিয়ে! ও-রকম একটা হাড়-হাভাতে জাতগোত্রহীন মেয়েকে! বলছে ভদ্রঘরের মেয়ে, রেফিউজী—কিন্তু কে জানে। বেজন্মা কিনা তারই বা ঠিক কী? না কি তার চেয়েও খারাপ কিছু? কাকা বলেছিলেন (বিয়ের তারিখ ঠিক হ'য়ে যাবার পর এ-সব অবনী তাকে বলেছিলো), 'কুছ্‌পরোয়া নেই, বয়সকালে ও-সব ফুর্তি-ফার্তি অনেকেই ক'রে থাকে, এবারে তুই মেয়েটাকে ছেড়ে দে, আমি ওর হাতে হাজারখানেক টাকা গুঁজে দিচ্ছি। তোর একটা খুব ভালো সম্বন্ধ আমাদের হাতে আছে এক্ষুনি।' শুনে অবনী বলেছিলো, 'আপনি ভুল করছেন, আমি বাগানবাড়ির বাবু নই, টাকা দিয়ে শরীর কিনি না।' মা তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে অনেক বুঝিয়েছিলেন, চোখের জল ফেলেছিলেন, শেষ পর্যন্ত একটা মিথ্যে বলার মতো বুদ্ধি জুগিয়েছিলো অবনীর —'মা, আমি ওকে রেজিস্ট্রি

মতে বিয়ে করেছি, কাজেই এ নিয়ে কথা বলা বৃথা।' অগত্যা, ছেলেকে ফিরে পাবার জন্য বিধবা মা নরম হয়েছিলেন, আর অবনীও, মা-কে কিছুটা খুশি করার জন্য, তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলো কমলার সেই মাসিকে, যিনি তাকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, আর অনেক খুঁজে-খুঁজে দমদম থেকে তার দাদুকে, যাঁর কাছে চ'লে যাবার কথা কোনো-এক সময়ে ভেবেছিলো সে, আর যিনি সাত বছর পর কমলাকে দেখে চিনতে পর্যন্ত পারেননি। এঁদের কাছে এ-বাড়ির লোকেরা অন্তত তার বাবার নাম, গ্রামের নাম জানতে পেরেছিলেন, এটুকুও নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন যে তারা চাটুয্যে বামুন, জাতে-গোত্রে মিলে যাচ্ছে অন্তত, বংশ নিচু নয়। মাসির চোখ কপালে উঠেছিলো কমলার ভাবি শ্বশুরবাড়ির জাঁক-জমক দেখে, তার বাপের বাড়ির এমন একটি রঙিন ছবি তিনি এঁকেছিলেন যেন মাদারিপুরে তাদের তালুক-মুলুক কিছুরই অভাব ছিলো না, তারপর তেলতেলে গলায় অবনীর মা-কে বলেছিলেন, 'নিজেদের মেয়ে ব'লে বলছি না, দিদি, কমলা সত্যি খুব ভালো মেয়ে, আর ছেলে যখন নিজে পছন্দ করেছে তখন তার ওপরে আর কথা কী।' তারপর ট্যাক্সিতে উঠে কমলাকে চুপি-চুপি বলেছিলেন, 'এবারে তুই বড়োলোক হলি কমলা, আমাকে মনে রাখিস —আমি তোর মা-র আপন খুড়তুতো বোন, সম্পর্ক তো ফ্যালনা নয়। আর শোন, বাণী এই ষোলোয় পড়লো, ওর জন্যে একটা ভালো সম্বন্ধ—' ইত্যাদি। কমলার যে আগে একবার বিয়ে হয়েছিলো, সে-বিষয়ে মাসি, দাদু টুঁ শব্দটি করেননি, অবনী তাঁদের আগে-ভাগেই জপিয়ে এনেছিলো (দাদু তা জানতেন না খুব সম্ভব —বা শুনে থাকলেও মনে ছিলো না) ; আর সে যে একবার সিনেমার নটী হ'তে গিয়েছিলো, সে-কথাটাও বিলকুল চেপে গিয়েছিলেন মাসি। কমলার জন্যে এখন মিথ্যে বলতে রাজি তাঁরা, কেননা সম্পর্ক যত দূরই হোক বড়োলোকের সঙ্গে সদ্ভাব রাখা ভালো, কখন কোন কাজে লেগে যায় কে বলতে পারে। ঐ দাদুই আজ সম্প্রদান করবেন তাকে, মাসি আসবেন সগৌরবে সপরিবারে কন্যাপক্ষ হ'য়ে। উকিল-কাকার শেষ পর্যন্ত মত ছিলো না, কিন্তু ছেলের মুখ চেয়ে অবনীর মা জোর দিলেন। এমনি ক'রে, কিছু ছলনা, কিছু দয়া, কিছু লোভ, আর সবচেয়ে বেশি বিধবা মায়ের দুর্বলতা —এই সবের ওপর দাঁড় করানো হ'লো তার এই দেড় বছর ধ'রে মনে-প্রাণে আকাঙ্ক্ষিত বিয়েকে। কিন্তু কী এসে যায় ঐটুকু ছলনায়, মাসির চোখের চকচকে লোভে কী এসে যায় —সে নিজেও ভুলে যাবে যে আগে একবার তার বিয়ে হয়েছিলো, ছিলো মাদারিপুরে গরিব ঘরের মেয়ে, তারপর কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলো —এখনই ভুলে যাচ্ছে, এখনই সে হ'য়ে উঠছে পুরোপুরি বীডন স্ট্রিটের মুখুয্যে-বাড়ির বৌ, যার আলমারিতে থরে-থরে সাজানো থাকবে বেনারসি কাঞ্চীপুরম মুর্শিদাবাদ, মাঝে-মাঝে যার অঙ্গে শোভা পাবে হীরের আংটি, মুক্তোর মালা, জড়োয়া ব্রেসলেট। এত সুখ সে কি কল্পনাও করেছিলো কখনো?

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো কমলার, মনে পড়লো টালিগঞ্জের সেই বাড়িটা। দু-খানা ঘর, বারান্দা, পেছনের দিকে ছোট্ট উঠোন। যেখানে অবনী তাকে নিয়ে উঠেছিলো, তখনও মাঘ মাস চলছে, শীত ফুরিয়ে এলো, সরস্বতী পুজো কাছেই। ভাড়া কম, হাজরা রোডের তুলনায় জায়গাও বেশি। শস্তা চেয়ার-টেবিল, দুটো-চারটে হাতা খুন্তি বাসন, অবনীর ছবি আঁকার সরঞ্জাম। আর দু-ঘরে দুটো তক্তাপোশ, একটাতে শোওয়া, আর-একটায় ছবি আঁকে অবনী, আশে-পাশে ছড়িয়ে থাকে রং তুলি কাগজ পেন্সিল আরো কত কী। এই জগৎ-সংসারের কোনো আনাগোনা নেই সেখানে, কমলাকে 'কাকিমা' বা 'বৌদি' ব'লে ডাকার কেউ নেই —সে আর অবনী, অবনী আর সে, এই দিয়ে তৈরি সেখানে সব-কিছু —সেই বাড়ি, যেখানে তারা মিলিয়ে দিয়েছিলো জীবনের সঙ্গে জীবন, একের সঙ্গে এক যোগ ক'রে আরো বড়ো আশ্চর্য এক খুঁজে পেয়েছিলো। সেই বাড়ি —তা কি সে ভুলতে পারে কোনোদিন?

আজও আমার ভাবতে অবাক লাগে, কেমন ক'রে সেটা হ'তে পেরেছিলো, অবাক লাগে অবনীর

কথা ভাবতে। ওর নিজেরই কষ্টে চলে, তার ওপর আর-একটা মানুষের ভার, দায়িত্ব। আর কী-রকম মানুষ? রাস্তায় কুড়িয়ে-পাওয়া একটা মেয়ে, যে জানে না আজ রাত্রে সে কোথায় ঘুমোবে। যার বিষয়ে এটুকু পর্যন্ত জানার উপায় নেই সে সত্যি কে, কী, দুঃখী না অতি ধূর্ত মেয়ে-জোচ্চোর, অভাগী না দুশ্চরিত্র। দয়া? দয়া ক'রে কিছু দান করে লোকেরা, কেউ হয়তো দু-চার দিন আশ্রয়ও দেয়, কিন্তু তাই ব'লে এমনি ক'রে বিকিয়ে যাওয়া, বোকার মতো, অন্য কোনোদিকে না-তাকিয়ে! তবে কি পুরুষের যে-লোভ সবচেয়ে সহজে জেগে ওঠে, তা-ই? ছি! কী ক'রে ভাবতে পারলাম কথাটা, আমি তো চিনি অবনীকে। সেই হাজরা রোডে : তার ঘর ছেড়ে দিয়েছে আমাকে, নিজে ঘুমিয়েছে কম্বল পেতে ছোটো ঘরটায়, আমার জন্য সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে বেশি কথা না-ব'লে, ভঙ্গিটা লাজুক অথচ সহজ, যেন ব্যাপারটা বিশেষ-কিছু নয়, রোজই ঘটছে এ-রকম। সেদিন, সেই প্রথম রাত্রির পরে, আমার একটু বেলায় ঘুম ভাঙলো, চোখ মেলে কয়েক মিনিট লাগলো ঘটনাটা বুঝে নিতে, আর তারপর লজ্জায় আমি কোনোদিকে তাকাতে পারি না, নড়তে পারি না বিছানায়, শরীর যেন পাথর। কিন্তু অবনী দরজার ধারে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমাকে বেরোতে হচ্ছে এক্ষুনি, নিচের রেস্তোরাঁ থেকে আপনাকে চা দিয়ে যাবে, দুপুরবেলা খাবার দিয়ে যাবে। যদি বেরোতে হয় দরজায় তালা দেবেন কিন্তু —এই যে তালা-চাবি। আর ঐ বইটার মধ্যে কিছু টাকা —মানে হঠাৎ যদি কিছু দরকার হয়। দোকানপাট সব কাছেই।' দিনের বেলায় একটু অন্য রকম দেখলাম অবনীকে, দাড়ি কামিয়ে স্নান ক'রে এসেছে এইমাত্র, চোখের কোণ দুটো লালচে, ভাঁজ ভাঙা শার্টটা ফুলে উঠেছে বুকের ওপর —হাঁটার ভঙ্গিটা টগবগে। সে বেরিয়ে যাওয়ার পর ভাবলাম —'ছি! আমি একটা কথাও বললাম না, দুপুরে উনি খেতে আসবেন কিনা তাও জিগেস করলাম না —আর কিছু না হোক, ভদ্রতা আছে তো।'

মাসখানেক ছিলাম সেখানে। ঐটুকু বাড়িতে দু-জন মাত্র মানুষ, বেশিক্ষণ লজ্জা টেকে না, এক ধরনের চেনাশোনাও শুরু হ'য়ে যায়। দু-দিন কাটলো, তিন দিন কাটলো, আমি নিজের কথা একটু-একটু বলি—আমার একটা যে-কোনোরকম কাজকর্ম কি জোটে না কোথাও? 'চেষ্টা করবো—নিশ্চয়ই।' 'দমদমে আমার এক দাদু আছেন, আমার মা-র মামা, কিন্তু তাঁর ঠিকানা জানি না এই হ'লো মুশকিল।' 'কেন? এখানে আপনার অসুবিধে হচ্ছে?' 'অসুবিধে কিছুই নেই সেটাই অসুবিধে বলতে পারেন।' 'তার মানে?' 'এ-ভাবে তো বেশিদিন চলতে পারে না।' 'কিছুদিন চলতে পারে তো? কোথাও কোনো কাজকর্ম হ'লে চ'লে যাবেন।' 'চ'লে যাবেন—' অবনী যে অত সহজে বললো কথাটা, সেটা যেন খচ ক'রে বিঁধলো আমাকে, একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'আমি ম্যাট্রিক অবধি পড়েছিলাম, বাচ্চাদের পড়াতে পারি, আমি শেলাই জানি. শুনেছি কলকাতায় ঘরে ব'সে শেলাইয়ের কাজ পাওয়া যায়?' 'খোঁজ নেবো।' আমার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে অবনী হঠাৎ বললো, 'আমার একটা উপকার করবেন? মহিলাদের জামা-কাপড় বিষয়ে কিছুই জানি না আমি, আপনি কি খান দুই শাড়ি আর কয়েকটা ব্লাউজ কিনে আনতে পারবেন?' আমার সারা মুখে আলপিন ফুটলো এই কথা শুনে, কিন্তু একখানা মিলের শাড়ি, একটা দেড় টাকা দামের ব্লাউজ, আর অন্য দু-একটা মেয়েলি জিনিশ না-কিনেও পারলাম না, কেননা আমার শাড়ি-জামার দুর্গন্ধ আমার নিজেরই অসহ্য লাগছিলো —এক কাপড়ে বেরিয়ে এসেছিলুম মাসি-বাড়ি থেকে। অগত্যা আমাকে হাত পেতে টাকাও নিতে হ'লো —যে আমার কেউ নয়, যাকে মাত্র তিন দিন আগে প্রথম চোখে দেখলাম, তারই কাছে। সারাটা দিন ছটফট ক'রে কাটলো আমার ; সন্ধের পরে অবনী বাড়ি ফিরে বললো, 'আমি নিজের বুদ্ধিতে কয়েকটা জিনিশ আনলুম, দেখুন তো কোনো কাজে লাগবে কিনা।' প্যাকেট খুলতে বেরোলো তোয়ালে সাবান পাউডার ইত্যাদি প্রসাধনের টুকিটাকি, এমনকি একটা মেয়েদের মোটা চিরুনি আর চুলের ফিতে-কাঁটা পর্যন্ত। জিনিশগুলো দেখে আমার

মনের মধ্যে নাড়া দিয়ে উঠলো —আমার জন্য, আমার কথা ভেবেও কেউ কিছু আনতে পারে তাহ'লে! কিন্তু তক্ষুনি আমার বুদ্ধি আমাকে বললে যে আমার রাগ করা উচিত, অপমানিত বোধ করা উচিত, খুব কঠিন সুরে কিছু বলা উচিত অবনীকে, তাকে জানিয়ে দেয়া উচিত যে আমি যদিও নিরুপায় হ'য়ে তার আশ্রয় নিয়েছি, আমার জন্য শৌখিন উপহার আনার অধিকার তাকে আমি দিইনি। আমাকে চুপ দেখে অবনী বললো, 'কী, কোনোটাই কাজে লাগবে না আপনার?' আমি রাগের ঝোঁকে বললাম, 'আপনি কি আমাকে পোষা পাখি ক'রে রাখতে চান?' অবনী ফ্যাকাশে হ'য়ে বললো, 'কী আশ্চর্য, হাতি-ঘোড়া ব্যাপার নয় তো কিছু, সামান্য কয়েকটা —এ-সব তো দরকার হয়।' মুহূর্তের জন্য তার চোখে চোখ পড়লো আমার, সেই চোখে আমি সরলতা আর বিশ্বাস ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না। হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, 'কিন্তু আমি আপনার ঋণী হ'য়ে থাকতে চাই না, আপনাকেও কিছু নিতে হবে আমার কাছ থেকে।' ব'লেই ভয় হ'লো, পাছে অবনী এর অন্য রকম কোনো অর্থ করে, তাই তক্ষুনি আবার বললাম, 'রোজ-রোজ কেনা খাবার খাওয়া বড্ড খরচ, আমি তো রাঁধতে পারি।' 'না—না— ও-সব হাঙ্গামা আবার কেন?' 'হাঙ্গামা কিছুই নয় —আমি সারাদিন শুধু আইঢাই করি শুয়ে-ব'সে, তবু একটা কাজ হবে আমার। আর-এক কথা—' 'বলুন!' 'মানে, বলছিলাম কী —আপনি আপনার ঘরেই থাকুন, ঐ ছোটো ঘরটায় কোনো কষ্ট হবে না আমার।' 'আমারও কোনো কষ্ট হয় না ওখানে।' 'কিন্তু আপনার বাড়িতে আপনি মেঝেতে শুয়ে রাত কাটাবেন, এ কী-রকম কথা?' 'আমি ইচ্ছে করলে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে রাত কাটাতে পারি, কিন্তু আপনি আবার একা বাড়িতে ভয় পাবেন না তো রাত্তিরে?' 'সে কী! আমার জন্যে একেবারে ঘরছাড়া হবেন? এমনিতেই তো রাতটুকু ছাড়া বাড়ি থাকেন না। করেন কী সারাদিন?' 'কাজ —আড্ডা —কাজ —কত কী।' 'অন্তত দুপুরবেলা খেতেও তো আসতে পারেন। আমার কথা এতই যদি ভাবেন, তাহ'লে—' কথাটা আমি শেষ করলাম না, হঠাৎ মনে হ'লো বড্ড বেশি এগিয়ে যাচ্ছি, এই ধরনের হালকা খোলামেলাভাবে আমার কথা বলা উচিত নয় অবনীর সঙ্গে, নিজেকে যথাসম্ভব গুটিয়ে না-রাখলে কিসে থেকে কী হ'য়ে যায় কে জানে। গম্ভীর হ'য়ে বললাম, 'যা-ই হোক, কাল থেকে আমিই রান্না করবো।' অবনী হেসে বললো, 'বেশ, তা-ই হবে।'

কেনা হ'লো জনতা-স্টোভ, কেরোসিন, কিছু বাসন-কোশন, আমার রান্না খেয়ে 'বাঃ' বললো অবনী। আমি সকালে উঠে চা করি, চা খেয়ে অবনী বাজার এনে দেয়, ব'সে-ব'সে কাগজ পড়ে কিছুক্ষণ, আমি রান্না চাপাই, অবনী আগের রাত্রে শুরু-করা কোনো ছবিতে তুলি চালায় কি পেন্সিল নিয়ে নতুন কোনো ড্রয়িং করে —এগারোটা নাগাদ খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে যায়। এই যে কিছু করার আছে আমার, সকালে উঠে চা করতে হবে কারো জন্য, কাউকে রেঁধে খাওয়াতে হবে, এতে যেন অনেকটা হালকা হ'লো আমার মন, দিনগুলো তেমন শূন্য আর মনে হ'লো না। আস্তে-আস্তে, প্রায় অজান্তে, অবস্থার চাপে, পরস্পরের ওপর কিছু-কিছু নির্ভর করা শুরু হ'লো আমাদের, আমি তাকে মনে করিয়ে দিই যে চা ফুরিয়ে এলো, সেও হয়তো একদিন লাজুক মুখে বলে, 'আজ জলপাই আনলুম, চাটনি বানানো কি সম্ভব?' —কিন্তু অস্বস্তি, তবু অস্বস্তি, আমার শান্তি নেই। আমি যেন ভেবে পাই না ঠিক কী-রকম সুরে কথা বলবো অবনীর সঙ্গে ; কেমন ক'রে বললে ভদ্রতা বোঝাবে কিন্তু আগ্রহ ফুটবে না। নানা বিষয়ে কথা হয়, এক কথা থেকে আর-এক কথা ওঠে, কিন্তু কখনো যদি হাসিঠাট্টার সুর লাগে, কি আমি মন খুলে হেসে উঠি কখনো, তক্ষুনি আমি যেন নিজের মধ্যে কুঁকড়ে যাই, আমার মনের মধ্যে কে যেন ব'লে ওঠে, 'সাবধান!' অথচ সারাক্ষণ গোমড়ামুখ ক'রে থাকাও যায় না —আর কেনই বা তা থাকবো আমি, অবনী আমার জন্য যা করেছে, যা করছে, তার প্রতিদানে আমি সত্যি কিছু দিতে চাই —আর মাঝে-মাঝে এমন মুহূর্ত আসেই যখন আমি ভুলে যাই নিজেকে, প্রায় 'আপন জনে'র মতো কথা বলি

তার সঙ্গে, আর সেও সেটা সহজে মেনে নেয়। আর সেই মুহূর্তগুলোই পরে আমাকে লজ্জা দেয়, এক বলতে-না-পারা অপরাধবোধে আমার নিশ্বাস যেন বিষিয়ে ওঠে। 'আর কতদিন চলবে এ-ভাবে?' যতবার এ-কথা জিগেস করি, অবনীর সেই একই জবাব, 'দেখা যাক।'

আমার সবচেয়ে অস্বস্তি হয় রাত্রে, যখন শুতে যাই। যেই আলো নিবিয়ে দিই, তখনই অবনী যেন অচেনা হ'য়ে যায় আমার কাছে— অন্য এক মানুষ যেন —দুঃখ লজ্জা রাগ আর অক্ষমতা মেশানো একটা ছটফটানি আমাকে দখল ক'রে নেয়, মনে হয় আমি সত্যি খাঁচার পাখি, জেলখানার কয়েদি, অন্ধকারকে মনে হয় পাথরের দেয়াল. আমি মাথা ঠুকছি, বৃথাই মাথা ঠুকছি —হয়তো এর চেয়ে শান্তি-মাসির লাথি-ঝাঁটাও ভালো ছিলো। নানারকম অদ্ভুত ভাবনা ঘিরে ধরে আমাকে। আমি শোবার আগে দরজা বন্ধ করি, খুব আস্তে তুলে দিই ছিটকিনিটা, কিন্তু টুক ক'রে যেটুকু শব্দ হয় তাতে যেন নিজেই চমকে উঠি —অবনী শুনলো না তো, সে ভাবছে না তো আমি তাকে অবিশ্বাস করছি? সে —এমন উদার, পরোপকারী, সচ্চরিত্র, এই নির্জন বাড়িতে, আমাকে পুরোপুরি তার মুঠোর মধ্যে পেয়েও যে কখনো এমন কোনো ব্যবহার বা ভঙ্গি করেনি যাকে বলা যায় অশোভন, আমার পক্ষে অসম্মানজনক, তাকে অবিশ্বাস করা কি অন্যায় নয়, তাতে কি আমি নিজেই ছোটো ব'লে প্রমাণ হচ্ছি না? আমি শুয়ে-শুয়ে শুনি অবনীর নড়াচড়া, সিগারেট ধরাতে দেশলাই জ্বালার শব্দ, আমার অসহ্য লাগে যে আমি তারই ঘরে, তারই বিছানায় শুয়ে আছি, আর তাকে শুতে হচ্ছে মেঝেতে একটা কোনোরকম বিছানা পেতে. আমার সন্দেহ হয় কোনো-একটা ধূর্ত উদ্দেশ্য নিয়েই এই ব্যবস্থার বদল হ'তে সে দিচ্ছে না, তার বিরুদ্ধে কেমন-একটা আক্রোশে আমি অস্থির হ'য়ে উঠি। বালিশ কম্বল চাদর থেকে উঠে এসে একটা ভোঁটকা কড়া পুরুষালি গন্ধ যেন জাপটে ধরে আমাকে, আমার কান গরম হ'য়ে ওঠে, গা থেকে কম্বল ফেলে দিই, ইচ্ছে করে রাস্তার ধারের ছোট্ট ঝোলানো বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা হই, কিন্তু বেরোতেও পারি না, পাছে অবনী আমাকে দেখে ফ্যালে, কিছু বলে, পাছে এই নিশুতি রাতে ভদ্রতার দায়ে তার সঙ্গে কোনো কথা বলতে বাধ্য হই। এক-এক রাতে এই অস্থিরতা এত বেড়ে যায় যে আমি একলা ঘরে, বন্ধ ঘরে সারা গায়ে আঁচল টেনে নিঃসাড় হ'য়ে প'ড়ে থাকি —চোরের মতো, মড়ার মতো, যেন নিশ্বাস পড়ে না —শুয়ে-শুয়ে ভাবি, 'হে ভগবান, আর না, এই রাত্তিরটা ভোর হোক কোনোমতে, কালই আমি চ'লে যাবো —যেদিকে দু-চোখ যায় চ'লে যাবো —এই যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।' রাত বাড়ে, নীরব হ'য়ে আসে রাস্তা, আমি টের পাই অবনীর সুইচ টেপার শব্দ —আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লো সে, তারপর কখন যেন আমিও ঘুমিয়ে পড়ি, আর সকালে উঠে, দিনের আলো দেখে, চায়ের জন্য স্টোভ ধরিয়ে, অবনীকে দেখে, তার গলার আওয়াজ শুনে, আমি তখনকার মতো অশান্তি ভুলে যাই, এমনকি আমার এও মনে হয় আমি ভালো আছি।

৭

কিন্তু, কমলা, তুমি খুকি নও, অজ্ঞান কুমারী নও, কলকাতায় এসে, মাসির বাড়িতে, অম্বুর খপ্পরে প'ড়ে, ফিল্ম-স্টুডিওর দোরে-দোরে ঘুরে, কিছু সারবান নতুন জ্ঞানও পেয়েছো। তুমি কি বোঝোনি কেন রাত্তিরে এই কষ্ট তোমার, কেন ভুলতে পারো না পাশের ঘরে অবনীর অস্তিত্ব, ভুলতে পারো না কম্বলের তলায়, আঁচলের তলায় তোমার শরীরটাকে? তুমি আর অবনী —তোমাদের বয়সী দুটি ছেলে-মেয়ে একই ছাতের তলায় রাতের পর রাত কাটাতে থাকলে তার শেষ পরিণাম কী হ'তে পারে তা কি তুমি নিজের মনে বোঝোনি? শুধু হ'তে পারে নয়, হ'তে বাধ্য, সেদিকেই এগিয়ে চলেছো তোমরা। আর —সবচেয়ে যা ভয়ের কথা, সেই পরিণাম ভীষণ কিছু ব'লে মনে

হচ্ছে না তোমার, তুমি যেন তা-ই চাচ্ছো মনে-মনে, অপেক্ষায় আছো কবে সেটা ঘটবে। অবনী খুব ভদ্র হ'তে পারে, কিন্তু কী ক'রে জানো তারও এটা মনের কথা নয়? সে তো পুরুষ, টগবগে যুবক, সে কি আর বেশিদিন নিজেকে বেঁধে রাখতে পারবে ভেবেছো? করছো কী, কমলা, কোথায় তুমি নামিয়ে আনছো নিজেকে —কেটে পড়ো এখান থেকে, এখনো সময় আছে।

এমনি সব ভাবনা আমাকে ঘিরে ধরেছিলো সেদিন— তখন দুপুর, অবনী বেবিয়ে গেছে, যত ভাবছি তত মনে হচ্ছে এই অবস্থা অস্বাভাবিক, অমানুষিক, অসহ্য —এক্ষুনি এব অবসান চাই। আমি রাস্তার ধাবের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ফুটপাতে ভিড়, দোকানে-দোকানে কেনাবেচা চলছে, দলে-দলে ছেলেমেয়েরা স্কুলে-কলেজে যাচ্ছে বা বাড়ি ফিরছে। কাজ, সকলেই ব্যস্ত —শুধু আমারই কিছু করার নেই, আমি একটা ফালতু মানুষ, বেঁচে আছি অন্যের দয়ায়, আর সেই দয়াও যাকে ব'লে বিপজ্জনক —অত্যন্ত। কিন্তু কী করতে পাবি, কী করতে পারি আমি, কেমন ক'রে বাঁচাতে পাবি নিজেকে, আমার তো সত্যি কেউ নেই কোথাও। আমি বারান্দা থেকে ঘরে এলাম, চেষ্টা করলাম খুব ঠাণ্ডা মাথায় পুরো ব্যাপারটা ভেবে দেখতে। মাসির বাড়িতে আবার? অসম্ভব। তবে? 'যেদিকে দু-চোখ যায়' বললেই তো হ'লো না, কেউ পারে না পথে-পথে সারাক্ষণ ঘুরতে, রাস্তায় বেরোতে হ'লে যাবার কোনো জায়গা চাই, ফেরার কোনো জায়গা চাই। চাকবি, কাজকর্ম? নাঃ, কোনো আশা নেই। কী বা যোগ্যতা আমার, আর কাকেই বা চিনি যে ধরাধরি করবো। আবার মাথা ঠুকবো ফিল্ম-স্টুডিওতে? কী হবে—সেখানেও অগুনতি মেয়ে ঘুরঘুর কবছে, আমার চাইতে অনেকে তারা অনেক বেশি যোগ্য। তবে? শুনেছি কয়েকটা আশ্রম হয়েছে কলকাতায় —অনাথ উদ্বাস্তু মেয়েদের জন্য, সেখানে তারা বেত বোনে, সোয়েটার বোনে, তাঁত চালায়, আচার-আমসত্ত্ব তৈরি কবে, সে-সব জিনিশ বিক্রি হয দোকানে-দোকানে, মেয়েগুলো থাকতে পায়, খাওযা-পরা পায়। সুখের নয়, সম্মানেব নয়, কিন্তু অন্ততপক্ষে ভদ্র জীবন, অন্তত দুটো কথা বলার লোক পাওয়া যাবে, কোনো লোভ, কোনো ভয় সেখানে ছায়া ফেলবে না। নিশ্চয়ই ও-বকম কোনো আশ্রমে আমার জায়গা হবে? কিন্তু তার জন্যেও জোগাড়যন্ত্র চাই, হুট ক'রে গিয়ে দাঁড়ালেই তো হবে না —আর আমার কোনো ঠিকানাও জানা নেই। আমাকে পালিয়ে যেতে হবে, অবনীকে না-ব'লে— কিন্তু এক্ষুনি একটা রাত কাটাবার জায়গা না-পেলে কী ক'রে যাই? আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? যদি চ'লে যাই দমদমে দাদুর কাছে —তিনি বুড়োমানুষ, আমাকে ছেলেবেলায় অনেক দেখেছেন, কয়েকটা দিন থাকতে কি আর না দেবেন? আমি কিছু চাইবো না, শুধু বলবো, 'আমাকে একটা আশ্রমে ঢুকিয়ে দিন, অন্তত একটা ঠিকানা জোগাড় ক'রে দিন, আমি নিজেই সেখানে চ'লে যাচ্ছি।' প্রথমে শ্যামবাজার, বাস্-বদল ক'রে দমদম, সুভাষ-পল্লী, নিশ্চয়ই কেউ-না-কেউ দেখিয়ে দেবে? হ্যাঁ —এই ঠিক, এ-ই কবতে হবে আমাকে, আজই, এক্ষুনি।

আশ্চর্য —অল্প ক-দিনেই কেমন মমতা জ'মে যায় মানুষের। যে-মানুষকে মাত্র কয়েক দিন ধ'রে দেখছি, তার জন্য মমতা, এই ছোট্ট বাসাটার জন্য মমতা, এমনকি অল্প-ব্যবহৃত বাসনকোশন হাতাখুন্তির জন্য। অবনী অন্য দিনের মতোই বাড়ি ফিববে, আমাকে দেখবে না। তা কী আর করা যাবে, সে ঝোঁকের মাথায় করেছিলো এই কাজটা, নিজের গলায পাথর ঝুলিয়েছিলো, আমি চ'লে গেলে সেও হাঁফ ছাড়বে। সে ভালো ঘরের ছেলে (অন্তত হাবে-ভাবে তা-ই মনে হয়), আমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে তার জীবনটাও নষ্ট হ'তে পারে, আমার কি উচিত নয় আমার হাত থেকে তাকে বাঁচানো? তার জন্য, আর নিজের জন্যও আমাকে চ'লে যেতে হবে। পাছে আবার অবনীকে দেখে আমার মনের জোর ক'মে যায়, তাই আর দেরি করলাম না আমি, তক্তাপোশেব তলায় খুঁজে পীসবোর্ডের একটা বাক্স পেলাম, তাতে গুছিয়ে নিলাম শাড়ি, জামা, তোয়ালে, চুলের কাঁটা

চুলের ফিতে ইত্যাদি —যা-কিছু অবনী সেদিন নিয়ে এসেছিলো।

'আমি চ'লে যাচ্ছি, আপনি আমাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন না। আপনার কাছে আমি কত কৃতজ্ঞ তা মুখে ব'লে কী হবে।

পাঁচটি টাকা নিয়ে যাচ্ছি।'

বেরিয়ে এসে দরজায় তালা দিলাম, চাবিটাকে চিঠির মধ্যে জড়িয়ে হুড়কোর ফাঁকে গুঁজে নেমে এলাম রাস্তায়। তখন পড়ন্ত বেলা ; শীতের শেষে মাঝে-মাঝে যেমন হয়, আকাশটা মেঘলামতো, বাতাস মন-কেমন-করা। বেশ লাগছিলো পিঠের ওপর রোদ্দুরটা —পর-পর তিনটে বাস্ চ'লে গেলো, ইচ্ছে ক'রেই ছেড়ে দিলাম। আর-একটা এসে দাঁড়ালো, আমি উঠতে যাচ্ছি, হঠাৎ আমার পেছন থেকে কে ডেকে উঠলো —'কমলা!' আমার অবাক লাগলো রাস্তায় আমার নাম শুনে —কলকাতায় কেউ যে আমার চেনা আছে, তা যেন মনে পড়লো না। ফিরে তাকিয়ে যাকে দেখলাম তাকে চিনতে একটুক্ষণ দেরি হ'লো আমার। একটু তাকিয়ে থেকে বললাম, 'আরে! দোলন!' 'বা-ব্বাঃ! কতকাল পর দেখা বল তো!' দোলন এগিয়ে এসে আমার হাত ধরলো, একবার চোখ বুলিয়ে গেলো আমার ওপর দিয়ে, আমি বুঝলাম আমার পরনের শস্তা শাড়িটা তার নজর এড়ায়নি। মনে একটু আঘাত লাগলো আমার, এ-রকম শাড়িতে সেও অনেক ঘোরাঘুরি করেছে তা কি সে ভুলে গেলো? সহজ হবার চেষ্টা ক'রে বললাম, 'তুই বুঝি শাড়ি কিনতে বেরিয়েছিলি?' 'হ্যাঁ, কিনলুম কয়েকটা,' শাড়ির দোকানের নাম-ছাপানো বাক্সটাকে একটু আদর করলো দোলন। 'তোর হাতে ঐ বাক্সটা কিসের? কোথায় যাচ্ছিলি?' 'এই —একটু কাজ আছে ও-পাড়ায়। তা তুই কেমন আছিস বল। বেশ ভালোই তো দেখছি।' দোলন একটু টেনে-টেনে বললো, 'হ্যাঁ, ভালো আছি —খু-ব ভালো।' একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ আবার বললো, 'আয় না আমার সঙ্গে একটু চা খাবি।' 'আমার সময় নেই, দোলন। আমাকে শ্যামবাজার যেতে হবে।' 'আয়, আয়,' দোলন আমাকে হাতে ধ'রে টানলো। 'আমি তোকে এস্প্লানেড অবধি ট্যাক্সিতে পৌঁছে দেবো, কতটুকুই বা সময় লাগবে এক পেয়ালা চা খেতে! আয়।' সত্যি বলতে, দোলনকে দেখে আমার এমন চমক লেগেছিলো যে মনের সেই অবস্থাতেও কৌতূহল সামলাতে পারলাম না, এলাম তার সঙ্গে বসুশ্রী সিনেমার দোতলার রেস্তোরাঁয়। কোণের একটি নিরিবিলি টেবিলে বসলাম দু-জনে ; আমার মনে পড়লো আমার চুপসে-যাওয়া হাওয়ার বেলুন, ফিল্মে অভিনয় ক'রে স্বাধীন হবার স্বপ্ন। সেই সময়ে, মহালক্ষ্মী স্টুডিওতেই, দোলনের সঙ্গে ঘন-ঘন দেখা হ'তো আমার— একটা ফিল্মে একই ভিড়ের দৃশ্যে সে আর আমি দাঁড়িয়েছিলুম —একই আশায় দুলছে দু-জনের বুক। আমারই মতো উদ্বাস্তু মেয়ে, এক হিশেবে আমার চেয়েও খারাপ অবস্থা, কেননা তার আছে মা, বাবা আব চারটি ছোটো-ছোটো ভাই-বোন। যাদবপুরের কোন কলোনিতে একটা চালাঘর তুলে আছে কোনোমতে, বাবা একটা ছোট্ট কারখানায় কেরানিগিরি ক'রে যা পান তাতে এ-বেলা হ'লে ও-বেলা খাওযা হয় না। সমদুঃখী ছিলাম আমি আর দোলন, তাই অল্প সময়েই বেশ বন্ধুতা হ'য়ে গিয়েছিলো আমাদের ; এক-এক দিন সাবা দুপুর গল্প ক'রে কাটিয়েছি সে আর আমি, স্টুডিওর কোনো নিরিবিলি কোণে, গাছের তলায় —কিছু করার নেই ব'লেও, ভালো লাগছে ব'লেও। আমাদের ছেলেবেলার কথা বলতাম আমরা —যা স্বপ্ন হ'য়ে গেছে ; আর যা বলতাম তাতে আমাদের এখনকার কষ্ট আর দুশ্চিন্তা যেন কিছুক্ষণের জন্য হালকা হ'য়ে যেতো। দোলন বলতো, 'আমিই বাবার বড়ো সন্তান, আমাকেই ছেলের কাজ করতে হবে—যে ক'রে হোক, টেনে তুলতে হবে সংসার। জানিস তো, অনেকেই সিনেমা শুনলে নাক শিঁটকোয়, কিন্তু তারা তো একবেলাও খিদের কষ্ট পায়নি, আর আমি কখনো একটা পুঁচকে অ্যাকট্রেস হ'তে পারলেও সেই মহোদয়েরা আমার দর্শন পেলে ধন্য হবেন!' ওর সাহস, উদ্যম, সপ্রতিভতা দেখে আমার মনে প্রশংসা জাগতো ও'র জন্য —দেখতেও

সুশ্রী, সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়, কথাবার্তায় আড়ষ্টতা নেই। আমি ওকে বলতাম, 'ভাবিস না, তুই নিশ্চয়ই স্টার হ'তে পারবি।' কিন্তু হঠাৎ ও মহালক্ষ্মী স্টুডিও থেকে হারিয়ে গিয়েছিলো, মাঝে-মাঝে আমার মনে পড়েছে ওর কথা, কিন্তু ওর বাড়ি চিনি না, খোঁজ নেবার উপায় নেই, তাছাড়া নিজের ধান্দায় সব সময় যে উদ্ব্যস্ত সে অন্যের কথা ভাবার বেশি সময় পায় না। আজ হঠাৎ দোলনকে দেখতে পেয়ে আমার মনে হ'লো আমার ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়েছে। আশ্চর্য বদল দেখছি তার। পরনের শাড়িটা চোখে পড়ার মতো, সাটিনের ব্লাউজ এঁটে বসেছে গায়ের ওপর (দেখেই বোঝা যায় ভালো দর্জি দিয়ে করানো), চুলের ঢৌল চটকদার, নখগুলো মিনের মতো ঝকঝকে, গাল দুটো এমন ধরনের গোলাপি যে তার নিজের রং ব'লেই ভুল হয়। ওর দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললাম, 'দোলন, তুই তাহ'লে বড়ো পার্ট পেয়েছিস? কী-নাম ফিল্মটার?' দোলন উত্তর দিলো, 'না রে, আমি আর সিনেমায় নেই।' 'তবে? বিয়ে করেছিস? খুব ভালো। খুব সুখের কথা।' 'আমার কথা পরে বলছি। তোর খবর কী, বল। তুই ফিল্মের লাইনে আছিস এখনো?' 'কোথায় আর?' 'কী করছিস তবে?' 'বেঁচে আছি।' আমি হালকা সুরেই বলতে চেয়েছিলাম কথাটা, কিন্তু আমার গলা ক্লান্ত শোনালো, করুণ। 'সেই মাসির বাড়িতেই আছিস?' 'না। আমি এখন--' 'থামলি কেন? কোনো গোপন কথা? তা না-বলতে চাস আমি জোর করবো না, কিন্তু —তোকে দেখে আমার মনে হচ্ছে তুই কষ্টে আছিস।' আমি মাথা নিচু করলাম, দোলন তক্ষুনি আবার বললো, 'বল, আমি কি কিছু করতে পারি তোর জন্য? জানিস, আমি তোর কথাই ভাবছিলাম ক-দিন ধ'রে, কী ভাগ্যে আজ দেখা হ'য়ে গেলো।' তার এই সহানুভূতির সুরে আমার চোখে প্রায় জল এলো, বললাম, 'আমারও ভাগ্য, দোলন। শোন, তুই কোনো আশ্রমের ঠিকানা জানিস— যেখানে উদ্বাস্তু মেয়েরা থাকতে পায়?' 'আশ্রম?' ঠোঁটের কোণে হাসলো দোলন, 'নিজেকে জ্যান্ত কবর দিতে চাস?' 'তা কেন?' আমি ক্ষীণস্বরে প্রতিবাদ করলাম, 'অন্তত একটা ভদ্র জীবন তো।' 'আর ভদ্র!' ফোঁশ ক'রে নিশ্বাস ফেললো দোলন, 'ঢের ঢের ভদ্রলোক দেখেছি, কমলা, আমার আর ওতে চিত্ত নেই।' 'কিন্তু আর কোনো উপায় যদি না থাকে—' 'উপায় কেন থাকবে না? ক'রে নিলেই আছে।' আস্তে, অনেকটা আপন মনে কথাটা বললো দোলন, আমি তার দিকে হাত বাড়িয়ে ব'লে উঠলাম, 'কী উপায়? বল আমাকে, কী-উপায়?' 'বলছি। আগে আমার একটা কথা শোন। আমার হাতে টাকা আছে, তোর দরকার? নিবি?' দোলন ব্যাগের মুখ খুলতে গেলো, আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'পাগল নাকি! আমি তোর টাকা নেবো কেন?' 'নিলিই বা। দোষ কী? আমি কি তোকে দিতে পারি না কিছু? আচ্ছা, একটা শাড়ি উপহার দিচ্ছি তোকে --না-নিলে রাগ করবো কিন্তু।' নতুন-কেনা শাড়ির বাক্সটার ডালা তুললো সে, পর-পর তিনখানা শাড়ির কোণ তুলে বললো, 'দ্যাখ, কোনটা তোর পছন্দ। এই কটকি শাড়িটা? না, নীলরঙের নাইলনটা বরং নে তুই, তোকে মানাবে।' আমি অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকালাম, সে চায়ের পেয়ালায় মুখ নামালো। একটু পরে বললো, 'নিবি না তাহ'লে? আমার কিন্তু ধারণা ছিলো তুই আমাকে বন্ধু ব'লে ভাবিস?' আমি আবেগের ঝোঁকে ব'লে উঠলাম 'দোলন, আমার সমস্যা অনেক বড়ো, একখানা শাড়ি বা কিছু টাকায় তার সমাধান হয় না।' 'কারোরই হয় না, কমলা। টাকা ফুরোয়, শাড়ি ছিঁড়ে যায়, অনবরত চাই ওগুলো। তার ব্যবস্থা আমি তোকে ক'রে দিতে পারি— তুই যদি রাজি থাকিস।' 'এর মধ্যে আবার রাজি-অরাজির কথা ওঠে নাকি? বল, কী করতে হবে।' আমার হৃৎপিণ্ড আশায় দুলে উঠলো, দোলনের উত্তর শোনার জন্য তার চোখে চোখ রাখলাম। তার চোখ দুটি সরু হ'তে-হ'তে বুজে এলো প্রায়, একটুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো সে, তারপর ফিশফিশে গলায় বললো, 'আমি যা করছি, তা-ই।' তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেমন ভয় করলো আমার, মুখে কথা সরলো না, মনে একটা বিকট সন্দেহ উঁকি দিলো, কিন্তু তক্ষুনি সেটাকে সবলে ঠেলে দিলাম। 'অভিনয়, কমলা, এটাও এক ধরনের অভিনয়,'

নিচু গলায়, ফিশফিশ ক'রে বলতে লাগলো দোলন। 'আমাকে ওরা বলেছিলো কোন সাবানের বিজ্ঞাপনের জন্য ফিল্ম তৈরি করছে, আমাকে স্নানের টবে বেশ কিছুটা গা খুলে ব'সে থাকবে হবে, অঙ্গভঙ্গি ক'রে বোঝাতে হবে আমি ঐ সাবান মেখে স্বর্গসুখ অনুভব করছি —বেশিক্ষণ না, মাত্রই দু-তিন মিনিট। পাঁচশো টাকা দেবে বলেছিলো, আগাম দিয়েছিলো দু-শো। কিন্তু—' দোলন চায়ে গলা ভিজিয়ে নিলো, 'কিন্তু সেই ফিল্মে ওরা আমাকে নেয়নি শেষ পর্যন্ত, তবে আমাকে ব্যবহার করেছিলো—অন্যভাবে। সেখানেই শুরু।' আমার গলা চিরে আওয়াজ বেরোলো, 'দোলন, তুমি বলছো কী!' 'আস্তে!' আমার কাঁধে টোকা দিলো দোলন, 'ওদিকে লোক আছে। তা সেই দু-শো টাকা খুব কাজে লেগে গিয়েছিলো, ছোটো ভাইটার টাইফয়েড চলেছে তখন। আর তারপর থেকে—' দোলন থামলো, মোটা গলায় হাসলো একটু। 'হঠাৎ আমার চোখ খুলে গেলো জানিস, আমি বুঝলাম যে এই একটা শরীর ছাড়া আমার আর-কিছু নেই —এই আমার সম্পদ, সম্পত্তি, মূলধন। জানতাম না এমন তামাশা চলে কলকাতায়, জানতাম না টাকা রোজগার এত সহজ! জানিস, আমি গ্র্যান্ড হোটেলেও রাত কাটিয়েছি— আঃ, কী বিছানা, কী আরাম! বাড়িতে বলেছি, আমি একটা সমাজ-সেবার কাজ পেয়েছি, কাজের কোনো বাঁধা-ধরা সময় নেই, মাঝে-মাঝে কলকাতার বাইরে যেতে হয়। নিশ্চয়ই ওঁরা অন্য কিছু সন্দেহ করেন, কিন্তু—বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, আর সংসারের হাল তো ফিরে যাছে। বাবা বাস্ থেকে প'ড়ে গিয়ে পা ভেঙেছিলেন, সারতে পুরো তিনমাস লাগলো, ফ্যাক্টরি থেকে মাইনে দিচ্ছে না—কী যে অবস্থা! যে টাকা আনছে, তার কথায় বিশ্বাস করা খুব সহজ হ'য়ে যায় ও-রকম সময়ে। তা এক ধরনের সমাজ-সেবা বইকি —আনন্দ-বিতরণ, সুখ, ফুর্তি, আমোদের কারবার —তুই যা ইচ্ছে বলতে পারিস, কিন্তু এও তো চায় লোকেরা, আর এর মধ্যে কোনো চুরি-জোচ্চোরি নেই, কারো কোনো ক্ষতি করা হচ্ছে না, আমারও গায়ে ফোস্কা পড়ছে না, এদিকে আমার ভাইবোনগুলোর জামা-কাপড় হয়েছে, পড়াশুনো চলছে, দুধ ডিম মাছ মাংসের চেহারা দেখছি আমরা, আস্তে-আস্তে বাড়িটাও সারাই করিয়ে নেবো। তুই অমন ক'রে তাকিয়ে আছিস কেন, কমলা? তোর ঘেন্না করছে আমাকে? কিন্তু আমার তাতে কী এসে যায়, বল। ধর, তুই আর আমি একসঙ্গে কোনো বিয়ে-বাড়িতে গিয়েছি —সেখানে আমার দিকেই অনেক বেশি মনোযোগ দেবে লোকেরা, যদিও তুই খুব ভালো হ'তে পারিস আর আমি হ'তে পারি যারে বলে /খারাপ মেয়ে।* সবই সাজগোজ, বাইরের চটক, ভেতরটা কেউ দেখতে পায় না। কাজটা কিন্তু শক্ত নয় মোটেও—যা একটু কষ্ট ঐ প্রথম ক-দিন, তখন দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বুজে প'ড়ে থাকলেই হ'লো, কয়েক মিনিটেরই তো ব্যাপার। আর তারপর একবার অভ্যেস হ'যে গেলে দিব্যি সোজা। খদ্দেরেরা বেশির ভাগ হ'লো আধ-বয়সী, বাড়িতে বৌ ছেলেপুলে সবই আছে, কিন্তু রোজগার আর সংসারের ঘানি ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে এখন ক্লান্ত, একটু রং চায়, নেশা চায়, কিন্তু ব্যামোর ভয়ে অলিতে-গলিতে যেতে নারাজ—এরা প্রায়ই বেশি মদ খেয়ে নিষ্কর্মা হ'য়ে পড়ে, মস্ত বাঁচোয়া! আর আছে কিছু ছেলে-ছোকরা, নেহাৎই আর সামলাতে পারছে না নিজেকে, তারা কেউ /অভিজ্ঞতা অর্জন* করতে চায়, কেউ বন্ধুদের দেখাতে চায় সে কত ওস্তাদ, কেউ বা আসল ভুলে কাব্যি-কথা শোনাতে শুরু করে —বেচারাদের ফাঁকি দেবার মতো সহজ আর-কিছু নেই। আর কক্ষনো কোনো ষাট-পেরোনো বুড়ো, আসলের বালাই আর নেই তাদের —শুধু চোখ দিয়ে গেলে, হাত দিয়ে চটকায় —খুব নিরাপদ!' খড়খড়ে গলায় একটু হেসে উঠলো দোলন, তারপর আবার বলতে লাগলো, 'মাঝে-মাঝে দু-একটা ভালুক-উল্লুক জুটে না যায় তা নয়, কিন্তু বেশির ভাগই যাকে বলা যায় /উঁচু দরের*—কেউ কোম্পানির খরচে জাপান যাচ্ছে পর্শু, কেউ তিনটে মোটর গাড়ির মালিক। এরা তোর গলা কাটবে না, ঘুমিয়ে পড়লে গয়নাগাঁটি চুরি করবে না —বরং কয়েক পাত্র পেটে পড়ার পর অনেক মন-গলানো বাক্যি শোনাবে। যদি একটু দূরে থেকে, বাইরে থেকে দেখা যায়

ব্যাপারটাকে, যদি ধ'রে নেয়া যায় এর মধ্যে আমি নেই, ঐ মেয়েটা অন্য একজন, তাহ'লে বেশ মজাও লাগে, জানিস —কত রকম বোকামি, ন্যাকামি, হাম্বড়া ভাবের তলায় অল্প-পরানী কিপটেমিই বা কত। আর তাছাড়া, যেটা আসল ব্যাপার, তাতে তো আর বিয়ের সঙ্গে তফাৎ নেই, এমন তো নয় যে স্বামী-স্ত্রীরা বাতাস হ'য়ে এ ওর মধ্যে মিশে যায়, হাজারবার সংস্কৃত মন্ত্র আওড়ালেও নোংরা জিনিশটা নোংরাই থাকে। তবে —হ্যাঁ —শেষ পর্যন্ত বিয়েই ভালো, একমেবাদ্বিতীয়ম-এ সাংসারিক সুবিধে আছে। আমি ভাবছি কী, জানিস, আমার বয়স এই একুশ হ'লো, আর বছর পাঁচেক করবো এই কাজ, তার মধ্যে আমার পরের বোনটির বিয়ে দিয়ে দেবো—এখন থেকেই টাকা জমাচ্ছি তার জন্য—ভাই দু-জন পাশ-টাশ ক'রে দাঁড়িয়ে যাবে —সবচেয়ে ছোটো বোনটিকে তারাই চালাতে পারবে তখন। আর তখন আমি দেখে-শুনে বিয়ে করবো কাউকে, একটি ঠাণ্ডা-মাথার আধ-বয়সী বাঁধা-চাকুরে ভদ্রলোক —দোজবর, অবাঙালি, কিছুতেই আপত্তি নেই আমার —ব্যস, যাকে বলে সুখের সমাপ্তি, নববধূ সেজে বাসর ঘরে গল্প শেষ। সব মুছে যাবে তখন, মাঝখানকার এই কয়েকটা বছর মুছে যাবে। কেউ জানবে না, আমিও ভুলে যাবো। কী বলিস, ভালো ভাবিনি?' চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে মুখ তুললো দোলন, আমি চোখ সরিয়ে নিলাম। 'কিছু বলছিস না? আমি এতক্ষণ ধ'রে কথা বললাম, আর তুই কিছু বলছিস না?'

আমি ঢোক গিললাম। আমার গা কাঁপছিলো, গলা শুকিয়ে গিয়েছিলো।

'কী? আমার দিকে তাকাবিও না? এত ঘেন্না? কিন্তু কেন? আমি কি আমার সারা পরিবারকে টেনে তুলছি না? আমারই চেষ্টায় কি মানুষ হচ্ছে না ভাইবোনগুলো? অনেক কষ্টের পর মা বাবা একটু আরাম পেয়েছেন, তা কি আমারই জন্য নয়? তুই কি বলবি এর চাইতে ভিক্ষে করা ভালো? দড়ি-কলসি ভালো? কিন্তু কেন? আমি তো আমার মা বাবা ভাইবোনেদের ভালোবাসি, তাদেরই জন্য বেঁচে থাকতে হবে আমাকে —আর যদি এটা খারাপ হয়, পাপ হয়, সেই পাপও তো আমারই একলার, যদি এটাকে জাহান্নাম বলিস তার আঁচ তো ওদের গায়ে লাগবে না। আর তাছাড়া, জাহান্নামই বা কেন—আমার এই নিজের জীবন, সেটা কি কিছু নয়, সেটা কি একটা ফুটো পয়সার মতো রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলার জিনিশ? আমার কি প্রাণ নেই, মন নেই, আত্মা নেই, আমারও কি সুখের ইচ্ছে নেই? আমি বাঁচতে চাই কমলা, কিন্তু পোকার মতো নয়, মানুষের মতো, আমি মাথা তুলতে চাই, মাথা তুলে দাড়াতে চাই— আর যা না থাকলে কিছুতেই মাথা তোলা যায় না, আজ সেই টাকা আমার ব্যাগ-ভর্তি—এই দ্যাখ, চুরি নয়, জোচ্চুরি নয়, আমার স্বাধীন উপার্জন।'

শেষ কথাগুলো বলতে বলতে দোলনের গলা ভেঙে এলো, অদ্ভুতভাবে বেঁকে গেলো ওপরের ঠোঁট, তার সুন্দর মুখটিতে এমন দু একটা রেখা পড়লো, যা কান্নার মতো। কিন্তু এবারেও আমার মুখে কোনো কথা ফুটলো না, কয়েক মিনিট চুপচাপ কাটলো। বড়ো একটা নিশ্বাস ফেললো দোলন, কম্প্যাক্ট খুলে আয়নায় একটু দেখলো নিজেকে, আস্তে-আস্তে মুখে পাউডার বুলোলো, তারপর মোটা গলায় বললো, 'চলি তাহ'লে। তুই আমার কোনো কথাই রাখলি না, তবু—আমি তোর ভালো চাই ব'লেই আর একবার বলছি, ভেবে দেখিস। তোর ঠিকানাটা দিবি নাকি আমাকে? না? আচ্ছা, আমারটা রাখ অন্তত—আর একটা ফোন-নম্বরও দিচ্ছি, কখনো কোনো সাংঘাতিক দরকার হ'লে আমাকে মনে করিস।' দোলন আবার নিঃসাড় হাতের মুঠোয় এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিলো, দু জনে উঠে দাঁড়ালাম। 'আমার সঙ্গে আসবি নাকি এসপ্লানেড পর্যন্ত, না তাতেও আপত্তি?' আমি আস্তে তার হাত ধ'রে বললাম, 'দোলন, আমি আজ আর শ্যামবাজারে যাবো না, অন্য একটা কথা ম'নে প'ড়ে গেলো।' 'তার মানে —আমাকে এড়াতে চাস? বেশ।' আমাকে পেছনে ফেলে হনহন ক'রে এগিয়ে গেলো দোলন, আমি ফুটপাতে এসে তাকে আর দেখতে পেলাম না। আস্তে-আস্তে রাস্তা পার হ'য়ে আবার সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলাম, দরজার হুড়কো থেকে বের ক'রে

কুচি-কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেললাম সেই চিঠি, যা আধ ঘণ্টা আগে আমিই লিখেছিলাম ; —ভেতরে দেখলাম চেনা ঘর, চেনা জিনিশপত্র, মনে হ'লো বহুদিন পর নিজের বাড়িতে ফিরেছি।

আমার মনে নতুন ক'রে তোলপাড় শুরু হ'লো। চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছি দোলনকে —তার মুখ, পোশাক, ঠোঁটের ভঙ্গি, চোখের তাকানো। তার কথাগুলি ঘুরছে আমার মগজের মধ্যে —বার-বার, বার-বার। আমি কি সত্যি ঘৃণা করেছিলাম তাকে? কিন্তু কই, আমি তো রাগের ঝোঁকে উঠে আসিনি, শেষ পর্যন্ত বলতে দিয়েছিলাম তাকে, শুনেছিলাম। আমি কি ভয় পেয়েছিলাম তার কথা শুনে, তার জন্য দুঃখ পেয়েছিলাম? কিন্তু কই, আমি তো একবারও বলিনি, 'দোলন, তোর পায়ে পড়ি, ঐ জঘন্য জীবন ছেড়ে দে, ফিরে আয়।' সে যে-পথে গেছে তা যে কত ভীষণ, কত কুৎসিত, তা তো আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করিনি, তার সামনে তুলে ধরিনি এমন কোনো আশা, এমন কোনো ছবি, যাতে তার মনের ভাব বদলে যেতে পারে। একটা ভালো মেয়ে, আমার বন্ধু, আমার চোখের সামনে উচ্ছন্নে যাচ্ছে, এ আমি নিঃশব্দে সহ্য করেছিলাম। কেন? এইজন্যে, যে আমি প্রথমে যদিও স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলাম, তবু, সে যত বলছে, আমি যেন ততই মেনে নিচ্ছি তার কথা, মনে-মনে অক্ষরে-অক্ষরে একমত হচ্ছি তার সঙ্গে। আশ্চর্য তার শক্তি, সাহস, মনের জোর—এমনি মনে হচ্ছিলো আমার, তার তুলনায় আমি যেন ভিতু, বোকা, দুর্বল। তার উপহার আমি হেলায় ঠেলে দিয়েছিলাম, কিন্তু সে যে আমার জন্য কিছু করতে চাচ্ছে, আর করার মতো ক্ষমতাও যে আজ আছে তার, এ-জন্যে মনে-মনে তাকে প্রশংসা না-ক'রে পারিনি। 'আমার কি মন নেই, প্রাণ নেই, আত্মা নেই, সুখের ইচ্ছে নেই? আমি বাঁচতে চাই, পোকার মতো নয়, মানুষের মতো!' তার এই কথা-গুলি কাঁপিয়ে দিয়েছিলো আমাকে, যেন আমারই মনের তলাকার কথা টেনে নিয়ে আরো জোরালোভাবে, সুন্দরভাবে বলছে সে। দোলন যদি দোষী হয়, আমিও তো তা-ই। ওরই মতো অবস্থা প্রায় হ'তে চলেছিলো আমার —সেদিন রাত্রে, যখন আমার পায়ের তলায় রাস্তা ছাড়া আর-কিছু ছিলো না। ধরা যাক তখন যদি অম্বু —বা ওরই মতো অন্য কেউ এসে দাঁড়াতো আমি কি পারতুম তাকে ফেরাতে? আমিও কি মনে-মনে ভাবিনি—যে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে সে মেয়ে নয়, মানুষও নয়, কিছুতেই কিছু এসে যায় না তার? ভাগ্য—নেহাৎ ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেলাম। —বেঁচে গেলাম? কিন্তু অবনীর সঙ্গে যে-ভাবে আছি সেটাকেই কি ভালো বলবে লোকেরা? কিন্তু কারা সেই অচেনা অদৃশ্য নাম-না-জানা লোকেরা, যাদের চোখে 'ভালো' হবার জন্য আমি নিজেকে জ্যান্ত কবর দেবো অনাথ-আশ্রমে? না, আমি চাই না ভিখিরির জীবন, জলে ডুবে মরতেও চাই না। দোলনের প্রতিটি কথা সত্য—সত্য—অথচ মর্মান্তিক, অথচ অসহ্য। আর তক্ষুনি, সেই চায়ের টেবিলে ব'সে-ব'সেই, দোলনের কথা শেষ হবার আগেই, আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমার ভবিষ্যৎ। যদি আজ বেরিয়ে যাই, সত্যি যদি ছেড়ে দিই অবনীকে, তাহ'লে—কী হবে কে জানে। তাহ'লে আরো অনেক লাথি-গুঁতো খেয়ে হয়তো শেষ পর্যন্ত দোলনেরই শরণাপন্ন হ'তে হবে আমাকে। আর নয়তো—নয়তো—হ্যাঁ, সেটাই ভালো, অনেকগুলোর চাইতে অনেক ভালো একজন পুরুষ। অবনী ছাড়া কেউ নেই আমার, অবনীর সঙ্গেই আমার নিজের জীবনটাকে জড়াতে হবে। তাকে আমি ছাড়বো না, তাকে আমি ধ'রে থাকবো, তাকে আমি—না, এখন আর বলতে লজ্জা নেই আমার —তাকে আমি ভালোবেসেছি।

সন্ধে হ'য়ে এলো, গুরুগুরু মেঘের শব্দ শুনলাম, জানলা দিয়ে দেখলাম বিদ্যুতের চমক। একটু পরে বৃষ্টি নামলো ঝর্ঝর শব্দে। জোর নেমেছে, বর্ষাকালের মতো, বাতাসে ঠকঠক করছে খড়খড়িগুলো। আমি জানলা বন্ধ ক'রে আলো জ্বাললাম, হঠাৎ বড্ড ফাঁকা মনে হ'লো বাড়িটা। এমনি সময়ে অবনী ফেরে আজকাল, আগে দেরি করতো, কিন্তু আমি যেদিন থেকে রান্না করছি সেদিন থেকে তারও নিয়মকানুন বদলেছে। 'আগে', 'আজকাল' ; ক-দিনেরই বা ব্যাপার। বারো—

চোদ্দ—না, এরই মধ্যে তিন সপ্তাহ হ'য়ে গেলো। মাত্র তিন সপ্তাহ, কিন্তু মনে হচ্ছে কতকাল। এবারে ফিরে এলেই পারে অবনী, আমার ভালো লাগছে না। সে কি বৃষ্টিতে আটকে গেলো কোথাও? রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজছে? এই একটানা একঘেয়ে বৃষ্টির শব্দে একা লাগছে আমার। আমি অনেকদিন ধ'রেই একলা, কিন্তু আজকের একা লাগাটা অন্য রকম। বৃষ্টি থামলো, আমি ঝোলানো বারান্দাটিতে এসে দাঁড়ালাম। রাস্তা থই-থই করছে জলে, সারি-সারি ট্রাম অচল হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে, জলের ওপর দিয়ে শপ্‌শপ্ শব্দে এক-একটা বাস্ এসে দাঁড়াচ্ছে, তাতে বাদুড়ের মতো ঝুলে আছে মানুষগুলো। নিশ্চয়ই ওরই একটা থেকে এক্ষুনি নামবে অবনী? কত লোক নামছে, কিন্তু তারা কেউ অবনী নয়। ঘবে, বাবান্দায়, কখনো বসা, কখনো পাইচারি— অদ্ভুত মানুষ, এত রাত অবধি করছে কী? 'কাজ, আড্ডা—আড্ডা, কাজ।' আড্ডাই বেশি বোধহয়? গল্পে-গুজবে মেতে গেলে কাউকে আর মনে থাকে না। না কি কোনো বিপদ হ'লো? বাস্-এ উঠতে গিয়ে প'ড়ে গেলো? রোজ কত কী হচ্ছে কলকাতায়—ট্যাক্সি উল্টে যাচ্ছে, বাস্-এ ট্রামে ধাক্কা, রাস্তায় চাপাও পড়ে মাঝে-মাঝে —আর বৃষ্টির পবে তো পাগলের মতো ছোটে সবাই। ভাবতে-ভাবতে যেন দম আটকে এলো আমার, মনে-মনে বললাম, 'হে ভগবান, আর-কিছু চাই না, অবনী যেন ফিরে আসে।' আর তারপব, অবশেষে, যেন অনন্তকাল পবে, দবজায় সেই তিনটি চেনা টোকা। তাকে দেখামাত্র আমি ব'লে উঠলাম, 'বেশ লোক! এত দেরি!' সে যেন একটু অবাক হ'য়ে আমার দিকে তাকালো, আস্তে বললো, 'দেরি হয়েছে নাকি? মাত্র সাড়ে-ন'টা তো। আপনাব কি ভয় করছিলো?' 'হ্যাঁ, আমি তো আমাবই জন্য ভয় পাচ্ছিলাম!' অবনী একটু গম্ভীর হ'লো আমার কথা শুনে, আমার মনে পড়লো তার সঙ্গে আমার ও-রকম সুরে কথা বলার মতো সম্পর্ক নয়। কিন্তু না—এখন আর নিজেকে লুকিয়ে রাখাব মানে হয় না, মনে-মনে আমি অনেক দূব এগিয়ে গিয়েছি। 'শুনুন, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।' টেবিলের ওপব একটা কাগজের বাক্স বেখে অবনী হালকা গলায় বললো, 'চীনে বেস্তোরাঁ থেকে ফ্রাইড বাইস নিয়ে এসেছি, এখনো গরম আছে, আগে খেয়ে নেবেন নাকি?' 'আমার কথাটা শুনবেন দযা ক'রে?' একটু চুপ ক'রে থেকে অবনী বললো, 'এখানে আপনি আর থাকতে চান না—এই তো?' 'না, তা নয়। কিন্তু আমি তো এখানে চিরজীবন থাকতে পাববো না।' 'কী ক'রে জানলেন, পারবেন না?' 'তাও কি বুঝিয়ে বলতে হবে? আপনি কি ছেলেমানুষ?' 'আমি কিন্তু অন্যরকম ভাবছিলাম।' 'অন্যরকম মানে? কী-রকম?' 'ভাবছিলাম—ভাবছিলাম—' অবনী থেমে গেলো হঠাৎ, আমার দিকে তাকালো, আমি তার চোখে দেখলাম বিশ্বাস আর সরলতা। খুব নিচু গলায় বললো, 'কিছু ভেবো না, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।' আস্তে হাত রাখলো আমার কাঁধের ওপর, আব আমি যেন নিজেব অজান্তে এগিয়ে এলাম তাব দিকে —আমার দুঃখময় অতীত, অনিশ্চিত বর্তমান, মাসিমা, অম্বু, আর সব-শেষে তার ত্যাগ, সাহস, উজ্জ্বলতা নিয়ে ভয়-পাওয়ানো দোলন—সব যেন আমাকে ঠেলে নিয়ে এলো আমাব জীবনের এই একমাত্র সম্ভবপব আশ্রয়েব দিকে, আমি অবনীর বুকে মুখ গুঁজে কান্নাব বেগে কেঁপে উঠলাম। সে-রাতে আমাদের দুই বিছানা এক হ'য়ে গেলো।

৮

শান্তি পেয়েছিলো কমলা—সেই রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ার আগে পায়ের তলায় মাটি ঠেকলো যেন। ভাসছিলো, ডুবে যাচ্ছিলো, আর হঠাৎ—এই নৌকো, এই শুকনো ডাঙা, এই সবুজ নরম পদ্মার চর। শুরুতে যা ছিলো দয়া মহত্ত্ব এখন তা হাওয়ার মতো সহজ। হাওয়ার মতো, রোদের মতো,

খিদের সময় ডাল-ভাতের মতো। সেটা যে ভালো, তা বুঝিয়ে দিতে হয় না। দয়া বিশ্রী ; যে নেয় তার মন ছোটো হ'য়ে যায়, যে দেয় সে দেমাকে ফুলে ওঠে। কিছু বিনিময় চাই জীবনে, নিলে কিছু দিতেও হয়, এখানেই আলো-হাওয়ার সঙ্গে তফাৎ। একবার লটারিতে একটা আশ্চর্য উপহার উঠে আসতে পারে, কিন্তু তারপর উপার্জন করা চাই। তার যা আছে সে তা-ই দিয়েছে, আর তাকে মাথা নিচু ক'রে থাকতে হবে না।

হয়তো ব্যাপারটা আসলে তা-ই, আজকালকার উপন্যাসে যাকে 'প্রেমে পড়া' বলে। প্রেম : যেন একটি গোলগাল নধর ফল, কোনো গাছের উঁচু ডালে ঝুলে আছে, আঁকশি দিয়ে পেড়ে ফেললেই হ'লো। সত্যি কি আছে 'প্রেম' ব'লে কিছু, কোনো-কোনো উপন্যাসে যেমন ক'রে লেখে সে-রকম সত্যি কি হয় কখনো? না কি সবই আসলে শরীরের উশকোনি? এই যে ঘরে-ঘরে পাতানো বিয়ে হচ্ছে —দুটো মানুষ, কেউ কাউকে চেনে না, আগে চোখেও দ্যাখেনি কোনোদিন, দুম ক'রে এক বিছানায় শুইয়ে দিলেই হ'লো, তারপর ভগবানের কাজ ভগবান করেন। তবে, হ্যাঁ—ভালো লাগা ব'লে একটা ব্যাপার আছে, সেটা খাঁটি, চিনতে ভুল হয় না। তা-ই হয়েছিলো আমাদের। ভালো লাগছিলো —আমার ওকে, আমাকেও ওর, দিনে-দিনে একটু-একটু বেশি। চোখে-চোখে, ছোটো-ছোটো কথায়, বিনি কথায় ; দূরত্ব বজায় রেখে চলা শক্ত হ'য়ে উঠছিলো ক্রমশ। আমি যে চ'লে যেতে চেয়েছিলাম তা এইজন্যই। কতগুলো নিয়ম গেঁথে দেয়া হয় আমাদের মনের মধ্যে, কতগুলো ভালো-মন্দের ধারণা নিয়ে আমরা বড়ো হ'য়ে উঠি—অনেক বিপদ থেকে তা বাঁচায় আমাদের, আবার কখনো-কখনো সেগুলোই কষ্টের কারণ হ'য়ে ওঠে, তারই জন্যে বিরাট কোনো ভুল ক'রে ফ্যালে কেউ-কেউ। যেমন আমি প্রায় করতে যাচ্ছিলাম সেদিন, যখন অবনীকে ছেড়ে চ'লে যাবার মতো পাগলামি আমার মাথায় ঢুকেছিলো। আমি ফিরে এলাম, আমি অবনীর হাতে তুলে দিলাম নিজেকে ; নিয়ম হিশেবে এটা ভালো নয়, কিন্তু সত্যি কি এটা খারাপ? আমি কি শরীর দিয়ে লুব্ধ করেছিলাম অবনীকে, নিজে বাঁচাব জন্য? কিন্তু অবনীও তো চেয়েছিলো আমাকে ; কেমন আমরা এক মুহূর্তে বুঝে নিয়েছিলাম আমাদের দু-জনেরই মনের কথা এক। এ-রকম ক'রে চাওয়া কি ভালো নয়? জানি না, আর আজ সে-কথা ভেবেই বা কী হবে, আজ তো সেই চাওয়ার ওপরেই বিয়ের শীলমোহর পড়লো, আমরা পদ্মার চর থেকে উঠে এলাম নিজের দেশে—চোরের মতো চুপি-চুপি নয়, সগৌরবে। আজ জয় হ'লো আমার, যাকে বলে চূড়ান্ত জয়, সেই রাত্রেই এর বীজ বুনেছিলাম আমরা, সেই বৃষ্টি-পড়া শীতের রাত্রে, ন-মাস আগে। তাহ'লে কেন আর আমি নিজেকে দোষ দেবো, আর এই আমার শরীর, যার ওপর অবনী এত আদর বর্ষণ করেছে, সেটাকেই বা দোষী করবো কেন?

সব কথা তোমাকে বলিনি এখনো, অবনী, এর পরে আস্তে-আস্তে বলবো। জানো, আমার মন আবার নতুন ক'রে অশান্ত হয়েছিলো, টালিগঞ্জের বাড়িতে যখন গুছিয়ে বসেছি, আর তোমার প্রতিটি কথায়, প্রতিটি ভঙ্গিতে টের পাচ্ছি যে তুমি আমাকে —ঐ যাকে বলে —ভালোবাসো। কিন্তু 'ভালোবাসা'য় আমার তেমন আস্থা নেই, আমার মন ছোটো। জানো, আমি আঁৎকে উঠেছিলাম যখন শুনলাম তোমাদের পৈতৃক বাড়ি আছে বীডন স্ট্রিটে, তোমাব মা-র দশ কাঠা জমি আছে বালিগঞ্জে, তুমি তোমার মায়ের এক ছেলে, তোমার কাকা নামজাদা উকিল, মামা মস্ত ডাক্তার, যাকে বলে 'বড়ো ঘর' তা-ই হ'লে তোমরা। তুমি বেরিয়ে এসেছো কাকার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে, যেহেতু তিনি চেয়েছিলেন তুমি আইন পাশ ক'রে তোমার বাবার মতো মুন্সেফিতে ঢোকো, বা কাকারই হেপাজতে ওকালতিতে নাম লেখাও, আর তুমি চাইলে আর্টিস্ট হ'তে —আর্টিস্ট মানে ছবি-আঁকিয়ে, রেডিওর গাইয়ে নয়, সিনেমার অ্যাক্টর নয়। একদিনে শুনিনি সব, টুকরো-টুকরো ক'রে কথায়-কথায় বেরিয়ে পড়েছিলো তোমার মুখ দিয়ে—খানিকটা আমারই পিড়াপিড়িতে, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কেননা তোমার বাড়ির অবস্থা যে রমরমে তা আমাকে জানাতে কেমন লজ্জা তোমার। সুখবর, সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার পক্ষে সত্যি কি তা-ই? জানো, আমি লক্ষ্মী কালী মা-দুর্গার পায়ে হাজার-হাজার পেন্নাম ঠুকতাম, যদি তুমি হ'তে আমারই মতো বাতাসে-ওড়া খড়কুটো, তিন কুলে

যার কেউ নেই। আমি চালাক, আমি স্বার্থপর, আমি কুচিন্তা ঠেকাতে পারিনি, বিশ্বাস করিনি তোমাকে—যে-তুমি আমার জন্য সব করলে। 'অবনী সুখের সংসারে মানুষ হয়েছে, এই গরিবিয়ানা আর কতদিন সহ্য হবে তার?' ও-সব অল্প বয়সের জেদ বড়ো ঠুনকো, ধোপে টেকে না। আপন কাকা, ও-বাড়িতেই মানুষ, তাঁরাই বা আর কতকাল রাগ ক'রে থাকবেন? মা-র মনে দাগা দেবে আর কতকাল? আর কতকালই বা তার ভালো লাগবে আমাকে, আমার মতো অত্যন্ত সাধারণ একটা মেয়েকে? হয়তো আমিও তার জেদেরই একটা অংশ, সে যে তার বাড়ির লোকেদের কতদূর পর্যন্ত অমান্য করে, তারই একটা ঘোষণা। পরোপকারে শুরু, অরুচিতে শেষ : সবই হয়তো বড়োলোকের ছেলের খেয়াল, বিধবা মা-র আদুরে ছেলের চড়ুইভাতি। এই ব্যাপারটা ওর আত্মীয়েরা কি আর টের না পাবেন। তারপর? তাঁদের তুলনায় আমি তো একটা পোকার মতো, চাইলে আমাকে চোখের পলকে উচ্ছেদ ক'রে দেবেন তাঁরা। বা হয়তো তার দরকারও হবে না, হয়তো অবনীরই লজ্জা করবে একদিন, আমাকে ছেড়ে দেবে হঠাৎ, কিছু না-ব'লে, ফিরে যাবে গুটিগুটি পায়ে বীডন স্ট্রিটে, যেখানে তার বাড়ি, তার শেকড়। এর চেয়ে সহজ আর কী হ'তে পারে, সত্যি তো তার আমার কাছে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।' —এমনি আমি ভাবি মনে-মনে, তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে ভুলে যাই, কিন্তু তুমি যখন বাড়ি থাকো না তখনই আমার মনে প'ড়ে যায় আসলে আমি কত অসহায় এখনো—যদি তুমি কাজে বেরিয়ে এখানে আর ফিরে না আসো, কখনো আর ফিরে না আসো, তাহ'লেও আমার কিছুই করার নেই। একটু-একটু ক'রে কথা তুলি, বলি, তোমাকে দিয়ে বলাই, সুকৌশলে, আড়চোখে তোমার মুখের ভাব লক্ষ ক'রে-ক'রে। আমি বাজিয়ে নিচ্ছি তোমাকে, যাচাই ক'রে নিচ্ছি, তুমি বুঝতে পারো না। আমি বিয়ের কথা তুললে তুমি বলো, 'এই আমরা যে-ভাবে আছি, একসঙ্গে, এক হ'য়ে, অথচ মন্ত্র প'ড়ে সাক্ষী ডেকে কোনো দেখানোপনা করিনি —এটা বিয়ের চেয়েও ভালো, অনেক খাঁটি।' আমি হাসি মনে-মনে, আবার ভয়ও পাই। কী ছেলেমানুসি! সবই হ'তে পারছে শুধু বিয়ের নমো নমোটুকুই বাদ, সবচেয়ে বেশি দেখানোপনা তো এটাই। আমি তার মনের তলায় ছিপ ফেলি—'তুমি কি কখনোই বিয়ে করবে না?' 'তা করবো না কেন, আগে অন্য দিকগুলো সামলে নিই তো।' আমি চতুরভাবে বলি, 'নিশ্চয়ই তুমি সুন্দরী বৌ চাইবে, অন্তত বি.এ.পাশ, গান জানে? তোমার মা মেয়ে দেখছেন না?' 'ছি! ও-ধরনের বিশ্রী কথা আর বলবে না, আমি বারণ ক'রে দিচ্ছি।' 'বিশ্রী কেন? বৌ হ'লো সারা জীবনের সঙ্গী, তাই বেশ ভেবে-চিন্তে—' 'আমার সারা জীবনের সঙ্গী আমার ঠিক করা আছে, তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না!' অবনীর ঠোঁটের হাসি দেখে আমার বুকের মধ্যে ছলছল ক'রে ওঠে, কিন্তু বিলকুল ন্যাকা সেজে বলি, 'কে সে? কেমন দেখতে? তার নাম বলো না!' —আর তখন অবনী অন্য উপায়ে বন্ধ ক'রে দেয় আমার মুখ, আর অমনি ক'রে আমাকে বুঝিয়ে দেয় কে তার মনোনীতা পাত্রী। কিন্তু তা-ই যদি, তাহ'লে দেরি কেন? মাঝে-মাঝে ভাবি, হঠাৎ যদি কিছু হ'য়ে যায় আমার, তাহ'লে তো অবনী বাধ্য হবে বিয়ে করতে —অন্তত সন্তানের জন্য, তাছাড়া বাচ্চাকাচ্চা না-হ'লে কি ভালো লাগে সত্যি, আমার বয়সও তো পঁচিশ হ'লো প্রায়। কিন্তু না—সেখানেও অবনীর ছেলেমানুষি জেদ, সে এখনই সন্তান চায় না, সে ঠেকিয়ে রাখছে আমার মা হবার দিন —মাসের পর মাস। আগে রোজগার, ভালো ফ্ল্যাট, নানান আয়োজন, আগে সে দেখিয়ে দেবে কাকাকে যে সে অপদার্থ নয়, তিনি দেখবেন কাগজে-কাগজে তার ছবির সুখ্যাতি : তারপর বিয়ে, তারপর সন্তান। 'এই বস্তির মধ্যে কি একটা নতুন মানুষকে ডেকে আনা যায়!' আমি কষ্ট পেয়েছি তার এ-কথা শুনে, না-জেনে সে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে তার সঙ্গে আমার 'ঘরে-বরে' মেলে না, তার কাছে যা 'বস্তি' আমার কাছে তা-ই স্বর্গ—প্রায়। গরিব আছি তো কী হয়েছে, আর কি কেউ গরিব নেই? তাদের কি ছেলেপুলে হচ্ছে না? কিন্তু অবনী বলে, 'জন্তুর মতো ছানাপোনা হয় ব'লেই তো এই দুর্দশা আমাদের। একটি মানুষের বাচ্চাকে বড়ো ক'রে তুলতে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়।' অবনী বোঝে না, ফুটপাতে ধুলোয় গড়ানো একটা ভিখিরির বাচ্চাকে দেখলেও আমার কোলে

নিতে ইচ্ছে করে। বোঝে না, তাকে পুরোপুরি পাবার জন্যেও, পুরোপুরি ধ'রে রাখার জন্যেও, আমার সন্তান দরকার। কী ক'রে বুঝবে, সে তো পুরুষ, সে তো কখনো সত্যিকার কষ্টে পড়েনি, আমাকে নিয়ে তার তো কোনো দুশ্চিন্তা নেই। ঐ যে একটা 'ভালোবাসা' নামে কথা, একটা ধারণা, তা-ই নিয়েই মশগুল হ'য়ে আছে সে। যেন ভালোবাসলেই ফসল ফলবে, জীবন কাটবে, যেন জীবন মানে অনেক বড়ো অনেক-কিছু নয়, যেন বেঁচে থাকতে হ'লে শেষ পর্যন্ত একটা নিয়মকেই আঁকড়ে ধরতে হয় না।

এমনি সব বিশ্রী কথা আমি ভেবেছি, তোমার বিরুদ্ধে— তোমার মন কত উদার, চরিত্র কত খাঁটি, সব জেনেও। তোমার সরলতাকে আমি বিশ্বাস করিনি, তোমার সততায় আমি সন্দেহ করেছি। আমাকে ক্ষমা করো। কোত্থেকে আমাকে কোথায় তুমি নিয়ে এলে আজ, যা চেয়েছিলাম তার হাজারগুণ পুরিয়ে দিলে। এবারে আমি সব বলবো তোমাকে, কত পাপ ছিলো আমার মনে, কত ছলনা, কত অন্যায়—একেবারে মন খুলে, কিছু লুকোবো না। আমি যে প্রায় অম্বুর ফাঁদে পড়েছিলাম, প্রায় ট'লে গিয়েছিলাম দোলনের প্ররোচনায়—সব বলবো। আমি জানি তুমি রাগ করবে না এ-সব শুনে, হাসবে, তারপর সেই পুরোনো দিনগুলোর কথা বলতে-বলতে—আধো প্রেমে, আধো ঘুমে, আধো জাগরণে, অর্ধেক রাত কাটিয়ে দেবো আমরা। আমার কি অন্য কিছু মনে পড়বে মাঝে-মাঝে? মাঝে-মাঝে অন্যমনস্ক হ'য়ে যাবো? তুমি কি হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অন্য রকম দেখবে আমাকে?

না, সেই একটি কথা কাউকে আমি বলতে পারবো না কখনো। অবনী, তোমাকেও না।

৯

আজ তাকে উপোস করতে হচ্ছে, অবশ্য নিরম্বু নয়। এক পেয়ালা চা খেয়েছিলো সকালে, একটু আগে পাতিলেবুর জলে গলা ভিজিয়েছে। শাশুড়ি (এত ভালো এঁরা, এত যত্ন করছেন তাকে!) ফল-মিষ্টিও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু কমলা ইচ্ছে ক'রেই অন্য কিছু খাচ্ছে না। কী এসে যায় একটা দিন না-খেলে—আর এমন একটা দিনের মতো দিন! খুব ভালো—এই সব খুঁটিনাটি নিয়মকানুন আচার-অনুষ্ঠান, বোঝা যায় কিছু হচ্ছে, কিছু-একটা ঘটছে তোমার জীবনে, মস্ত বড়ো কিছু ; এই দিন অন্য সব দিন থেকে আলাদা। খিদের কষ্ট কাকে বলে সে জানে—জেনেছিলো একটা সময়ে—কিন্তু আর দু-দিন পরে সে-ই খাওয়াবে দু-দশজনকে বাড়িতে ডেকে, হবে এক সচ্ছল সংসারের কর্ত্রী। আজ তার বেশ লাগছে উপোস করতে, শরীর ঝরঝরে হালকা, মন উদাস-মতো। কত বড়ো আকাশ জানলার বাইরে, হাওয়া। একটা রাজহাঁসের মতো শাদা ধবধবে পাখা মাথার ওপর ঘুরছে। আসলে ওটার দরকার নেই ; কিন্তু বেলা তো একটু তেতে উঠেছে এখন, তাই কে যেন চালিয়ে দিয়ে গেলো পাছে 'নতুন বৌ'য়ের গরমে কষ্ট হয়। কী সুন্দর ভান করছেন এঁরা যেন এঁদের বৌ এমনি সুখে প্রতিপালিত হয়েছে। এঁরা তো তাদের টালিগঞ্জের বাড়িও দ্যাখেননি। শীতের পরে যখন গরম পড়লো অবনী একটা টেবল-ফ্যান ভাড়া ক'রে আনলে, তাতে হাওয়ার চাইতে আওয়াজ বেশি, ছুঁলে শক্ লাগে মাঝে-মাঝে। গরমে কষ্ট হয় অবনীর—আরামের অভ্যেস তার—মুখে কিছু বলে না যদিও। বীরের মতো যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে সে, তার ছবি আঁকার জন্য, এখন কমলার জন্যেও। তার ভাবটা বেশ বেপরোয়া, জোরদার—এই যে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছে, এই যে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় একটা মেয়েকে এনে ঘরে তুলেছে, এই সবই যেন খানিকটা গর্বের ব্যাপার তার কাছে, তার পৌরুষের প্রমাণ। হাতে কিছু টাকা এলে সে দিলদরিয়া, তক্ষুনি কমলাকে নিয়ে সিনেমা, ট্যাক্সি নেয়া চাই, কোনো দোকানের জানলায় দেখে রংটা চোখে ধরলো ব'লে হুট ক'রে চল্লিশ টাকার মাদ্রাজি শাড়ি কিনে ফেললো, যা না-হ'লেও আপাতত স্বচ্ছন্দে চ'লে যেতো। খরচে স্বভাব অবনীর, পাওনা টাকার জন্য বেশি তাগাদা করতে পারে না, বেশ টানাটানি

হয় মাঝে-মাঝে, আর সেটারই শোধ নেয় সম্ভব হ'লেই বেহিশেবি টাকা উড়িয়ে, আর তার ফলে টানাটানি আরো বেড়ে যায়। নিজেকে অপরাধী লাগে কমলার—সে যদি উড়ে এসে জুড়ে না-বসতো তাহ'লে কার তোয়াক্কা রাখতো অবনী—কিন্তু ও-সব বাজে খরচে বাধা দিতে গিয়েও সে পেছিয়ে যায়, বুঝতে পারে যে আসলে ওগুলো 'বাজে' নয়, ঐটুকু খোলা হাওয়া গায়ে না-লাগালে অবনীর স্বাস্থ্য টিকবে না, মন ভেঙে যাবে। তাছাড়া, অবনীর সঙ্গে ঘর বাঁধার পর থেকে সেও বদলে যাচ্ছে আস্তে-আস্তে ; জেনে না-জেনে আয়ত্ত করছে অবনীর রুচি, অবনীর শিক্ষা। প্রায়ই দুপুরবেলাটা একলা থাকে কমলা ; অবনী তাকে সময় কাটাবার জন্য গল্পের বই আর পত্রিকা-টত্রিকা এনে দেয় ; সে সব প'ড়ে-প'ড়েও নানা দিকে তার চোখ-কান খুলে যাচ্ছে। সেই যে প্রথম বারো টাকা দিয়ে মিলের শাড়িখানা কিনেছিলো, যেটা দেখে অবনী বলেছিলো, 'ঝিয়েদের কাপড়' (শুনে কষ্ট পেয়েছিলো কমলা, কেননা তার মা-কে সে ও-রকম শাড়ি পরতে দেখেছে) —এখন তার পক্ষেও অসম্ভব মনে হয ওটা প'বে রাস্তায বেরোনো। অবশ্য কলকাতায় আসার অল্পদিন পরেই সে সাজগোজের তুকতাক বুঝে নিয়েছিলো—ফিল্ম-স্টুডিও এ-বিষয়ে চমৎকার ইস্কুল—তাছাড়া ট্রামে-বাস্-এ ঘোরাঘুরি করলেও জানা যায় লোকেরা যাকে 'ইজ্জৎ' বলে তার কতটা অংশ চাল-চলন ফ্যাশনের ওপব নির্ভব করে। তবে এতদিন সে ধ'রে নিয়েছিলো যে ও-সব তার নাগালেব বাইরে, কিন্তু অবনী এক অন্য হাওযা বইয়ে দিয়েছে তার মনে। অবনী যে বলেছিলো মেয়েদেব সাজগোজের সে কিছুই বোঝে না সেটাও ঠিক নয়—কমলাকে কোন-কোন রঙে মানাবে, কেমন ক'রে চুল বাঁধলে ভালো দেখাবে, এ-সব বিষয়ে বেশ স্পষ্ট তার মতামত, কোনোদিন বাড়ি ফিরে কমলার পবনে ময়লা শাড়ি দেখলে রাগও করে। কিছু-কিছু সুখের ইচ্ছে কমলার মনেও উঁকি দেয় আজকাল, মাঝে-মাঝে তার মন চায় বেরোতে, সিনেমা দেখতে, ঝকঝকে রেস্তোরাঁয় ঝকঝকে কতগুলো লোকেব মধ্যে আরামে ব'সে নতুন ধরনের খাবার খেতে, মনে হয় একটা রেডিও থাকলে বেশ হ'তো, একটা নতুন ধরনেব শাড়ি দেখলে নজব না-ক'রে পাবে না। অথচ, এব যে-কোনো একটি ইচ্ছে মেটাতে গিযে বাজাব-খরচে টান পড়ে দু-দিন পবে। কমলার খারাপ লাগে যে তার নিজের কোনো স্বাধীন উপার্জন নেই ; তার জন্য শুধু খরচ হয়, সে কিছু ঘরে আনে না।

এক-একদিন অবনীর চোখে সে ক্লান্তি দেখতে পায়—বিকেলবেলা বাড়ি ফিরে যখন তক্তাপোশে শুযে পড়ে সে, চোখ বুজে থাকে কযেক মিনিট, তারপর হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে ব'সে বলে, 'চা দাও।' এর মানে—অনেক ঘোরাঘুবি ক'রেও সে আজ টাকা পায়নি কোথাও, হয়তো পাঁচ-দশ টাকা ধার ক'রে এনেছে কারো কাছে। 'জোচ্চোবের দল! দু-শো ব'লে পঞ্চাশ টাকা হাতে দিলো, তারপর নিখোঁজ!.. ঠিকানা আছে আপিশ নেই, আপিশ আছে তো মালিক নেই—যাকে বলে ভূতের নেত্ত!' —এমনি কিছু-কিছু কথা বেরিয়ে যায় অবনীর মুখ দিয়ে, তারপব চা খেতে-খেতে সারাদিনের ফিরিস্তি দেয় : কোথায়-কোথায গিয়েছিলো, কোন দেনাদারকে ধবতে পাবছে না আজ দশদিন ধ'রে চেষ্টা ক'রেও, কত অল্প টাকায় দুটো পোস্টার আঁকতে রাজি হ'যে এসেছে—যেহেতু পার্টি ভালো, পেমেন্ট হাতে-হাতে। এই একটা ব্যাপারে কমলার মন যেন ভ'রে ওঠে—এই যে অবনী সব কথা তাকে খুলে বলে, তার আর্থিক অসুবিধের কথাও, জীবিকা-যুদ্ধের কাঁটাগুলো লুকোবার কোনো চেষ্টা করে না, এমনকি অনেক সময় তার পরামর্শও চায় (অমুক কাজটা নেবো কিনা বলো তো ; অনেক টাকা বলছে—কিন্তু দেবে কি শেষ পর্যন্ত?' 'ভাবছি ঐ ননীগোপাল ম্যানেজারের বাড়িতেই হানা দেবো একদিন—তুমি কী বলো?') ; এ-সব থেকে কমলা বুঝে নেয় যে অবনী তাকে সত্যিকার জীবনসঙ্গিনীর মর্যাদা দিচ্ছে—অর্থাৎ স্ত্রীর। এমনি ক'রে অবনীর সব সুখ-দুঃখের, এমনকি তার অতীতের অংশিদার হ'য়ে উঠছে সে : যাকে বলে অন্তরঙ্গতা, এ কি তা-ই নয়? অতীতেরও, কেননা অবনী তার বীডন স্ট্রিটের বাড়িব গল্পও করে কখনো-কখনো (কমলাকে কোনো ছলাকলা করতে হয় না সেজন্য) তার মা, কাকিমা, ফড়েপুকুরে তার মামাবাড়ি, তার যে-দিদির কাছে তার ছবি আঁকায় হাতে খড়ি হয়েছিলো, যাব উৎসাহে কাকাকে অমান্য ক'রে

আর্ট-কলেজে ভর্তি হয়েছিলো সে। শুনতে-শুনতে অন্য একটা জগতের ছবি ভেসে ওঠে কমলার মনে, মানুষগুলোকে যেন চেনা মনে হয়—অথচ তাঁদের কাছে সে কতই অচেনা, তার যে কোথাও অস্তিত্ব আছে তাও জানেন না তাঁরা। সেই জগৎ, যেখানে চারদিকে আছে আত্মীয়স্বজন, শিশুরা বড়ো হচ্ছে, নানা কাজের মধ্য দিয়ে অতি সহজে কেটে যায় দিনগুলো, একলা ব'সে-ব'সে নিজের কথা ভাবতে হয় না—সে কি সেখানে ঢুকতে পাবে না কোনোদিন? 'তুমি কখনো যাও না বীডন স্ট্রিটে?' একদিন জিগেস করলো কমলা। 'বাঃ, যাই বইকি মাঝে-মাঝে—দুপুরবেলা, কাকা যখন কোর্টে থাকেন মা-র সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।' অবনীর এই সহজ উত্তর শুনে কমলার যেন গলা শুকিয়ে গেলো, আলতোভাবে জিগেস করলো, 'তিনি কিছু বলেন না তোমাকে?' 'কে? মা? তাঁর সঙ্গে আমার খোলাখুলি কথা হ'য়ে গেছে, একটু সুবিধে হ'লেই তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আসবো।' 'তোমার কাছে? —' কমলার ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে অবনী তক্ষুনি আবার বললো, 'মানে—ঐ বিয়ের ফর্ম্যালিটিটা চুকিয়ে ফেলার পরে আরকি।' 'তুমি কি তাঁকে আমার কথা বলেছো?' 'বলিনি এখনো, সময়মতো বলবো।' 'তোমার আত্মীয়েরা কেউ যদি একদিন হানা দেন এখানে?' 'তাঁরা জানেনই না আমি কোথায় থাকি,' হাসলো অবনী, 'এক বন্ধুর বাড়ির ঠিকানা দিয়েছি, আমার চিঠিপত্রও সেখানেই আসে। ...তুমি কিছু ভেবো না, সব ঠিক হ'য়ে যাবে, আমার সব ভাবা আছে।' কথাটা শুনে কেঁপে উঠলো কমলা, তার মনে হ'লো যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে তা শক্ত মাটি নয়, কাদা, চোরাবালি, এই হঠাৎ-ভেসে-ওঠা পদ্মার চর বন্যায় তলিয়ে যেতে পারে আবার—যে-কোনো দিন, যে-কোনো মুহূর্তে। এ-ধরনের ছলনা, চোরের মতো লুকিয়ে থাকা—এ-সব কি আর অবনীর মতো নির্মল মনের মানুষের কাজ? কতদিন এই লুকোচুরি চালাতে পারবে সে? আর চালাবেই বা কেন? সত্যি তো তার কিছুরই অভাব নেই। সে কোনো ফেরার আসামিও নয় যে লুকিয়ে থাকবে। হঠাৎ কমলা জিগেস করলো, 'তোমার মা তোমাকে টাকা নিতে সাধেন না?' 'তা কি আর না সাধেন, তবে আমার নিতে খুব খারাপ লাগে।' 'সে কী! তোমার মা-র টাকা আর তোমার টাকা কি আলাদা নাকি?' 'নিশ্চয়ই! একুশের পরে আর মা-বাবার টাকা নিতে নেই, এ-ই হ'লো আমার মত। তাছাড়া আমার ছোটো বোনের বিয়ে হয়নি এখনো, আর আমার কাকা সাংঘাতিক লোক—বাবা যা রেখে গিয়েছিলেন সব চড়া সুদে খাটাচ্ছেন কোথায়-কোথায়, আসলে হাত দিতে দেন না।' তুমি কি কক্‌খনো কিছু নাও না তোমার মা-র কাছ থেকে?' 'ক্বচিৎ কখনো অল্পস্বল্প-- খুব বেশি মুশকিলে পড়লে। কিন্তু মা-কে কোনো মুশকিলের কথা বলি না আমি, বরং ভাবটা দেখাই আমার কোনো অভাব নেই। আমার বোনকে আমি তানপুরো কিনে দিয়েছি, সে কলেজে ওঠার পর পেলিকান কলম।' 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব টাকা তো তোমারই হবে। তুমি তো এক ছেলে।' 'ঐ এক-ছেলে এক-ছেলে শুনতে-শুনতে ঝালাপালা হ'য়ে গেলাম। বিশ্রী! সুদ—সম্পত্তি—বাপের টাকা—এগুলোকে আমি ঘৃণা করি, জানো? আমি চাই না অন্য কারো টাকার মালিক হ'তে, পায়ে পা তুলে নিশ্চিন্ত হ'তে চাই না, আমি বোহেমিয়ান জীবন কাটাতে চাই।' 'বোহেমিয়ান মানে?' 'মানে, বাউণ্ডুলে, কোনো চাকরি করে না, কোনো নিয়মকানুন মানে না, যা রোজগার করে হাতে-হাতে উড়িয়ে দেয়, সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আরকি।' 'সে কী! ও-ভাবে কি সারা জীবন কাটানো যায়?' 'কেন যাবে না? প্যারিসে, জানো, আর্টিস্টরা ও-ভাবেই থাকেন।' 'প্যারিসের কথা শুনে আমার কী হবে, আমি তো এ-দেশের মানুষ।' 'আমরাও কি আর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, কমলা? দুনিয়া বদলে যাচ্ছে, এক হ'য়ে যাচ্ছে। এই ধরো না দ্বিতীয় যুদ্ধের পর থেকে—' এর পরে অবনী অনেক জ্ঞানের কথা ব'লে গেলো, ধৈর্য ধ'রে শেষ পর্যন্ত শুনে কমলা সেই পুরোনো কথাতেই ফিরে এলো আবার, 'একটা কথা বলবো, অবনী? বাড়ির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক নেই তা তো নয়, তোমার মা-বোনেদের তুমি ভালোবাসো, তাহ'লে ঝগড়াটা মিটিয়ে ফ্যালো না কেন?' 'ঝগড়া তো কিছু নয়। কিন্তু কাকা বলেছিলেন, "ছবি আঁকবি? তার মানে ফ্যা-ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াবি?" —সেই কথাটার জবাব দিতে হবে আমাকে। প্রমাণ করতে হবে আমি আর্টিস্ট—নিজের কাছেও, অন্যের

কাছেও। এগ্‌জিবিশন করবো—ছবি বিক্রি হবে—আমার নাম ছড়াবে চারদিকে, তখন কাকার গলাতেই অন্য রকম আওয়াজ বেরোবে!'

এই কথাটায় প্রথম-প্রথম ধাঁধা লাগতো কমলার—'আর্টিস্ট' বলতে অবনী ঠিক কী বোঝে। ছবি-আঁকিয়ে? কিন্তু ছবিই তো আঁকছে অবনী, টাকাও পাচ্ছে তার জন্য। সে যখন আঁকে কমলা কাছে ব'সে থাকে অনেক সময়—তার অবাক লাগে কত সহজে সে ফুটিয়ে তোলে পেন্সিলের টানে তুলির টানে রঙের ছোপে যা-কিছু আছে এই ধরাধামে : মেঘ পাহাড় নদী জন্তু মানুষ গাছপালা; কোনটা দূর কোনটা কাছে কোনটা আকাশ কোনটা সমুদ্র সব বোঝা যায় ; একটু-একটু টানের তফাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, পুরুষ মেয়ে শিশু যুবা বৃদ্ধ—যেন হাত-সাফাইয়ের মতো ব্যাপার, কী ক'রে পারে? আরো অবাক হয় যখন কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রীর ফোটো সামনে রেখে অবনী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মস্ত একটা রঙিন ছবি এঁকে ওঠে—হুবহু সেই-সেই মানুষ, নাক চোখ ঠোঁট চুল শাড়ির ভাঁজ গালের ডৌল সব অবিকল, ফিল্মেব গল্প অনুসারে চেহারাগুলোকে সাজিয়েও দেয়, মুখের ভাবে স্পষ্ট ফুটিয়ে তোলে ঘৃণা, হিংসা, রাগ, ভালোবাসা—সব। দিনের বেলাটা বাইরে-বাইরে ঘুরতে হয় অবনীকে—কাজ পাবার, টাকা আদায়ের চেষ্টায় ; তাই সে ছবি আঁকার সময় ক'রে নিয়েছে রাত্রে—খাওয়ার পরে—একটা কড়া বাল্‌বে তার টেনে কাছে নামিয়ে আনে, এন্তার সিগারেট টানে তখন, বলে 'তুমি শুয়ে পড়ো, আমার রাত হবে—' কিন্তু কমলার ব'সে-ব'সে দেখতে ভালো লাগে। 'কী সুন্দর আঁকো তুমি! আশ্চর্য!' এক-একদিন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ব'লে উঠেছে কমলা, কিন্তু অবনী তা শুনে খুশি হয়নি, বরং একটু ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছে, 'এ আর কী! এ-সব আব কে না পারে!' 'বলো কী! সবাই পারে?' 'সবাই মানে—অনেকেই। এগুলোকে ছবি বলে না।' 'কাকে বলে তবে?' যেহেতু এটা অবনীব প্রিয় কাজ, তার জীবিকাবও উপায়, তাই ছবির বিষয়ে সব কথা জানতে ইচ্ছে করে কমলার—কী সেই রহস্যময় 'সত্যিকার' ছবি, যা আঁকার জন্য অবনীব এই প্রতিজ্ঞা। তক্তাব দেয়ালের দিক ঘেঁষে অনেকগুলো পুরোনো ছবিওলা বিলেতি পত্রিকা সাজানো থাকে অবনীব, আর কয়েকটা খুব বড়ো মোটা-মোটা বই— সেই স্তূপ থেকে অবনী একটা পত্রিকা আব একটা মোটা বই বের ক'রে খুললো। 'দ্যাখো, এটা বিজ্ঞাপনের ছবি—সমুদ্রে ঝড়, জাহাজ ডুবে যাচ্ছে, কিন্তু সব বিপদ থেকে বীমা তোমাকে বাঁচাতে পারে। আর এটা দ্যাখো—এই বইয়ের ছবিটা—ওঃ, পাগল হ'যে যেতে হয় এ-সব দেখলে।' কমলা দুটোর দিকেই তাকিয়ে দেখলো কয়েকবাব ক'রে, তার মনে হ'লো বিজ্ঞাপনের ছবিটার সমুদ্র, ঝড়, জাহাজ সব একেবারে জ্বলজ্বল করছে চোখের সামনে, আর অবনী যেটাকে ভালো বলছে সেটাতে সবই ঝাপসা, জাহাজটা এইটুকু ছোট্ট, আকাশ যেন উল্টে গেছে, সমুদ্র আছে কি নেই। আরো দুটো ছবি সেদিন দেখিয়েছিলো অবনী, একটাতে একটি সুন্দরী মেয়ে ঢিলে জামা প'রে বালিশে কনুই চেপে শুয়ে আছে, তার সারা শরীরে আরাম, চোখে ঘুমের আমেজ (বিছানার বিজ্ঞাপন ওটা, আর ছবিটা এমন যে সত্যি লোভ হয় ও-রকম বিছানায় শুতে), আর অন্যটা— অন্যটার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিলো কমলা, লাল হ'য়ে ব'লে উঠলো, 'ছি! কী অসভ্য ছবি!' ও-কথা শুনে গম্ভীর মুখে একটি ছোটোখাটো বক্তৃতা দিলো অবনী, যা থেকে কমলা বুঝে নিলো যে অবনী যাকে 'আর্ট' বলে ঐ ছবি তার একটি চরম নমুনা, সারা জগতে বিখ্যাত, যে তাকানো-যায়-না-এমন নারী বা চেনা-যায় না-এমন সমুদ্র —ও-সবের মতো, বা ওর কাছাকাছি, দশ যতটুকু একশোর, অন্তত সেটুকু কাছাকাছি পৌঁছতে পারলেও অবনী ধন্য মনে করবে নিজেকে। নিজের অজ্ঞতায় লজ্জিত হ'য়ে (যদিও সেই বিবসনাব দিকে তক্ষুনি সে দ্বিতীয়বার তাকাতে পারলে না) কমলা জিগেস করেছিলো অবনী তাহ'লে তার নিজের ইচ্ছেমতো আঁকছে না কেন ; কেন, তার মতে যা 'ভালো' নয়, সেগুলো নিয়েই এত খাটছে। 'যেহেতু আমার টাকার দরকার, তাছাড়া আর কী?' 'ও-সবের জন্য কেউ টাকা দেয় না বুঝি?' 'শস্তা জিনিশের হাতে-হাতে নগদ দাম জোটে, কিন্তু আর্টের কদর হ'তে দেরি হয়। যেমন ধরো—' হঠাৎ, মোটা বইটা থেকে, কোনো সুন্দরী নয়, কোনো সমুদ্র নয়, অবনী একজোড়া

ছেঁড়া বুট-জুতোর ছবি খুলে দেখালো। 'এটা চিত্রকর বেচে দিয়েছিলেন একশো টাকায়, এখন এর দাম দশ লক্ষ টাকা—কি তারও বেশি।' কমলার মাথা ঘুরে গেলো সংখ্যাটা শুনে, এই ছবি ব্যাপারটা বিষয়ে তার কৌতূহল আরো বেড়ে গেলো। এর পর থেকে এ নিয়ে সে প্রায়ই কথা বলে অবনীর সঙ্গে, মাঝে-মাঝে উল্টে-পাল্টে দ্যাখে ঐ বড়ো-বড়ো মোটা বইগুলো ; ঐ নির্লজ্জ ছবিগুলো, অবনী যাকে 'ন্যুড' বলে, যাতে সারা-গায়ে-একছিটে-কাপড়-নেই এমন মেয়েরা নানা ভঙ্গিতে শুয়ে ব'সে থাকে, সেগুলোর দিকেও সাহস ক'রে তাকিয়ে দ্যাখে সে—ভাবতে চেষ্টা করে কী সেই রহস্য, যা ধরার জন্য অবনী এত ব্যাকুল, যার জন্য সে বেরিয়ে এসেছে বাড়ি ছেড়ে, এই দারিদ্র্যে, বাউণ্ডুলেপনায়। আর তারপরেই তার নিজের চিন্তায় ফিরে আসে কমলা—অবনী হাত বাড়ালেই সব সুখ পেতে পারে ; হয়তো, কাকার আপত্তি সত্ত্বেও, তার মনোমতো ছবি আঁকতেও পারবে তখন—কিন্তু তার, কমলার, ত্রিভুবনে কেউ নেই, কিছু নেই—একমাত্র এই অনিশ্চিত অবনী ছাড়া।

১০

পেরিয়ে গেলো দুপুর, দেড়টা-দুটো বেলা মনে হচ্ছে, বাড়ির লোকেরা একতলায়, খাওয়াদাওয়ার সময়। মাথার ওপরে ছাদেও আর সোরগোল নেই : শামিয়ানা খাটানো, চেয়ার-টেবিল সাজানো সাঙ্গ হ'লো। বিয়ের লগ্ন এগিয়ে আসছে, কাল সকাল থেকে সে অন্য মানুষ। ঝিমুনি এলো কমলার, একলা ব'সে, চুপচাপ দুপুরে ; জেগে উঠে বুঝলো ঐ আধো ঘুমে, কয়েক মিনিটের মধ্যে, সে একটি স্বপ্ন দেখে উঠেছে। মেঘলা দিন, টিপটিপ বৃষ্টি, ম্যুজিয়মের কাছে বাস্ থেকে নামলো, হাঁটছে, বাড়ির গায়ে নম্বর দেখে-দেখে। স্বপ্ন, না সত্যি? উঠে এলো দোতলায়, ঢুকেই একটা সুগন্ধ পেলো ঝাপসা, কেমন ঠাণ্ডা—কী আরামের, কী ক'রে এত ঠাণ্ডা হ'লো হঠাৎ? উজ্জ্বল ঘর, উত্তরে সারি-সারি জানলায় বরফের মতো ঝকঝকে কাচ, মাথার ওপরে ঢাকনা-পরানো লম্বা-লম্বা টিউবের বাতি, যেন রোদের আভা, কোনো শান্ত নরম সকালের পরে সময় আর নড়েনি। এত বড়ো ঘর, এত ছবি—মানুষটিকে প্রথমে দেখতে পায়নি কমলা।

আমার মন অস্থির, একটা হারাই-হারাই ভাব হয়েছে অবনীকে নিয়ে। সে যদি ছেড়ে দেয় আমাকে, তার আত্মীয়েরা কোনো ফাঁদ পাতে, বা অন্য কোনো মেয়েকে দেখে অবনী আমাকে ভুলে যায় (সেটা হ'তেই পারে, আমি তো তার যোগ্য নই সত্যি), তাহ'লে! তাছাড়া যদি ধরে নেয়া যায় যে আমরা স্বামী-স্ত্রী তাহ'লেই বা আমি ঘরে ব'সে থাকবো কেন নিষ্কর্মা হ'য়ে, আমাকে তো ছেলেপুলে মানুষ করতে হচ্ছে না, আমার ঘরকন্নাও খেলা-খেলা ব্যাপার। এটা কলকাতা, চারদিকে সব উল্টে-পাল্টে যাচ্ছে, কত রকম কাজ করছে মেয়েরা—পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে আপিশেও যাচ্ছে অনেকে। আমি কি কোনো শেলাইয়ের কাজ পেতে পারি না, বোনার কাজ, কোনো দোকানে জিনিশ-বিক্রির জন্য নেয় না আমাকে? কলকাতায় নিশ্চয়ই কোনো অসুস্থ মহিলা আছেন, যাঁকে দেখাশোনার জন্য, বই প'ড়ে শোনাবার জন্য, লোক চাই? কিন্তু অবনী এ-সব কথা কানেই তোলে না, ওগুলো তার মতে 'ছোটো কাজ'। 'বরং প্রাইভেটে স্কুল-ফাইনেল পাশ করো না, তারপর কলেজে পড়বে।' 'কিন্তু চার বছর লাগবে যে বি.এ. পর্যন্ত পাশ করতে।' 'লাগলেই বা, তাড়া কিসের?' কেন আমার তাড়া তা অবনীকে বলা যায় না অবশ্য : আমি তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না, আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই। শান্তি-মাসির বাড়িতে যে-পোকাটা আমার মাথায় ঢুকেছিলো (মাসি আর অম্বু মিলেই ঢুকিয়েছিলো, সত্যি বলতে), সেটাই আবার ফড়ফড় করছে আমার মগজের মধ্যে। আমি 'আনন্দবাজারে' বিজ্ঞাপন দেখি রোজ, এক-আধটা চিঠিও লিখি কখনো বা—জবাব আসে না। তারপর একদিন সেই বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়লো : 'চিত্রশিল্পীর জন্য মহিলা মডেল চাই...'

'মডেল' কাকে বলে তা, অন্য অনেক-কিছুর মতোই, আমি নতুন জেনেছিলাম। অবনীর সঙ্গে

এ নিয়ে একদিন কথাও হয়েছিলো। সত্যিকার জ্যান্ত মানুষকে সামনে বসিয়ে দেখে-দেখে ছবি আঁকেন শিল্পীরা, তাদেরই সাজান দেব-দেবী ইন্দ্র বেহুলা ইত্যাদি, অবশ্য সঙ্গে অনেকটা কল্পনা মিশিয়ে—সেই মানষগুলোকে 'মডেল' বলে, ব'সে থাকার জন্য টাকাও পায় তারা। বিলেতে (অবনী 'বিলেত' বলে না, বলে 'য়োরোপ') নাকি এটাই নিয়ম, আমাদের দেশে আগে ওটার রেওয়াজ ছিলো না, আজকাল ব্যবহার করছেন কেউ-কেউ। আরো অনেক-কিছু বলেছিলো অবনী, অনেক ইংরেজি বুলি ছিটিয়ে, আমি ভাবটা দেখাচ্ছিলাম যেন সবই বুঝতে পারছি। 'ঐ বইগুলোতে যে-সব ছবি দেখছো, মডেল কারা ছিলেন জানো তো? শিল্পীদেরই স্ত্রী বা প্রেমিকারা।' 'সে কী!' আঁৎকে উঠেছিলাম আমি, 'কোনো ভদ্রমহিলা কি কখনো রাজি হবেন ঐ...ঐ...' 'কেন হবেন না?' হালকা ক'রে হেসেছিলো অবনী। 'তাঁবা তো আব অমুক-অমুক মহিলা থাকছেন না, ছবি হ'য়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া অত লজ্জা-শরমের বালাইও নেই ও-সব দেশে।' তার কথা শুনে আমি থ ব'নে গেলাম ; স্ত্রী, সন্তানের মা, সব বড়ো-বড়ো ঘবের বৌ-ঝিও নাকি—তারা গা খুলে, পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত হাট ক'রে, মাথায় হাত তুলে, বিছানায় গা এলিয়ে—ছি! 'ছবি হ'য়ে গেলো' —তার মানে কী? ছবিটা তো দেখছে সবাই, দুনিয়ার লোক দেখছে, চেনা তো যাচ্ছে মানুষটা কে! কিন্তু অবনী আমাকে বোঝায় ঐ 'ন্যুড' ছবি নাকি দারুণ উঁচু দরের ব্যাপার, আঁকিয়েরা নাকি তা-ই দিয়ে বোঝান তাঁরা কতদূর ওস্তাদ—আর সত্যি বলতে 'ন্যুড' নারীমূর্তির মতো 'সৌন্দর্যের প্রতিমা' নাকি আর-কিছু নেই। আমি রেগে জবাব দিয়েছিলাম, 'তার কারণ —আঁকিয়েরা সবাই পুরুষ, আর সব পুরুষেরই কামরিপু উগ্র।' অবনী হেসে বলেছিলো, 'তা হ'তে পারে, কিন্তু ছবি অন্য জিনিশ, তাতে কামগন্ধ থাকে না।'

অবনী, তোমারই কাছে আমার সব শিক্ষাদীক্ষা, তুমিই আমার চোখ খুলে দিয়েছো, মনে দিয়েছো বল-ভরসা। আমি মানুষ হয়েছিলাম একেবারে অন্য আওতায় ; সেখানে এগারোয় পড়ার পর থেকে, 'চোখে-চোখে' রাখা হয় মেয়েদের, মুহূর্তের জন্য তাদের বুকের আঁচল স'রে যাওয়াটা দোষের, ঘুমের মধ্যেও সারা গা ঢেকে রাখা চাই। শহরে এসে, মাসির বাড়িতেও, বুঝেছি যে স্ত্রীলোকের শবীরটাই পাপের আকর। এই শরীর থেকে সুখের আস্বাদ, তাও প্রথম তোমারই কাছে আমি পেয়েছি ; মাদারিপুরে যাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিলো তিনি তা দিতে পারেননি আমাকে, বড্ড হঠাৎ, বড্ড কড়া, চৈত্রমাসের ধুপধাপ শিলাবৃষ্টির মতো হয়েছিলো সেটা। আমি পেয়েছি শরীরের সুখ তোমার কাছে, কিন্তু সেজেন্য লজ্জা করেছে, জানো—যেন ওটা উচিত নয়, ভালো নয় ; ব্যাপাবটা আসলে পুরুষেরই, মেয়েরা শুধু দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে (সন্তান পাবার জন্য,) আমার ছেলেবেলার শিক্ষার মধ্যে এটাও ছিলো। সে-সব ভুলিয়ে তুমি আমাকে নতুন ক'রে গড়লে, অবনী, সেই কয়েক মাসে, টালিগঞ্জের টালির ছাদওলা বাড়িটায়। তুমি যা বলো তা সবই আমার কাছে নতুন, কোনো-কোনোটা পিলে-চমকানো—আমি ঝাঁঝিয়ে উঠি, রেগে যাই, কিন্তু—যেহেতু তোমাকে নিজেব চাইতে অনেক বড়ো ব'লে ভাবি, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, অনেক বেশি খোলা মনের মানুষ—তাই তোমার কথাগুলো, কখন বুঝি না, গেঁথে যায় আমার মনের মধ্যে, নিজে না-জেনে তোমারই পায়ে পা ফেলে চলতে শুরু করি। তুমি ছবি আঁকো, আঁকতে চাও, আমিও তাই ছবি ভালোবাসছি ; তুমি বলো আর্টিস্টরা সমাজ-সংসারের নিয়মের বাইরে, তাঁরা বিয়ে না-ক'রে ঘর করলে দোষ হয় না, এমনকি তাঁদের সামনে গা খুলে ব'সে থাকাও কোনো মহিলার পক্ষে কলঙ্কের কথা নয়—আমি এগুলো মানতে পারি না কিছুতেই, কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেবো, এমনও আমার শক্তি নেই, যেহেতু তা তোমার মুখে শুনেছি। তাই আমার এত সাহস হয়েছিলো যে সেই মেঘলা দিনে উঠে এসেছিলাম সদর স্ট্রিটের দোতলায়, তোমাকে লুকিয়ে, তোমাকে পালিয়ে, তোমার মতের বিরুদ্ধে।

'কে? আলোক পাল? নামটা চেনা মনে হচ্ছে। ...আরে, আলোক পাল তো নামজাদা ছিলেন এককালে, আমি স্কুলে পড়ি তখন, একেবারে নতুন ধরনের ছবি এঁকে কিছুটা হৈ-হৈ তুলেছিলেন। আমি দেখেওছি তাঁর সে-সময়কার দু-একখানা ছবি : অবনবাবুদের স্কুল, শান্তিনিকেতন, যামিনী

রায়, কারোরই সঙ্গে মেলে না—ছবির মধ্যে নাটক আনার চেষ্টা করছিলেন, একটা তোলপাড়, মোটা-মোটা তুলির আঁচড় যেন ফ্রেমের সীমা ছাপিয়ে যাচ্ছে। ...তা উনি তো শুনেছি প্যারিসে চ'লে গিয়েছিলেন সেখানেই থাকবেন ব'লে, ফিরেছেন নাকি? ...না, না, তোমাকে মডেল হ'তে হবে না, কিন্তু ঠিকানাটা রেখে দাও, এমনি একদিন যাবো তোমাকে নিয়ে, আমিও দেখা করতে চাই, তাঁর নতুন ছবি দেখতে চাই।' আমি বললাম, 'আমার চেষ্টা করার মানেও হয় না সত্যি, আমি তো সুন্দরী নই।' 'এই একটা বোকার মতো কথা বললে। মডেল সুন্দরী না-হ'লেও ছবিটা সুন্দর হ'তে পারে, আর তাছাড়া—তুমি দেখতে তো সত্যি ভালো।' একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'গিয়ে দেখবো নাকি একবার? যদি বা লেগে যায় সংসারে কিছুটা হাল ফেরে হয়তো, তোমাকে অত বেশি খাটতে হয় না। কী বলো?' 'পাগল নাকি?' কথাটা সেখানেই চাপা পড়লো, তোমার তাড়া ছিলো, তক্ষুনি খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে গেলে।

১১

'পাগল নাকি!' —কথাটা কোথায় যেন বিঁধলো আমাকে, সারাদিন ভুলতে পারলাম না। তার মানে, অবনী রাজি নয়, এক মিনিট ভেবেও দেখলো না, তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলো। অথচ, এই ছবি নিয়ে, আঁকিয়েদের নিয়ে, মডেলদের নিয়েও, কতই না উচ্ছ্বসিত হ'য়ে, আব বিজ্ঞেব মতো কথা বলে সে, তারও সব আশা ও চেষ্টার লক্ষ্য সেইদিকেই। আব ঐ আলোক পাল, যিনি বিজ্ঞাপনটি দিয়েছেন, তিনিও আজে-বাজে কেউ নন, অবনী তাঁর নাম জানে, তাঁকে ভক্তি করে। তাহ'লে আপত্তি কেন? মানে হ'লো—অন্যদের বেলায় সবই ধন্যি-ধন্যি, কিন্তু নিজের বৌকে ঘেঁষতে দেবে না ধাবে-কাছে। বোঝা যাচ্ছে অবনী আমাকে সত্যি ভালোবাসে, সম্মানও করে ; আমার খুশি হওয়া উচিত ; তাকে বিশ্বাস ক'রে—বিয়ে সে আমাকেই করবে এটাতে বিশ্বাস ক'রে শান্ত মনে অপেক্ষা করাই উচিত আমার। হ্যাঁ, খুশি আমি হচ্ছি বইকি, কিন্তু তবু একটা তর্ক ঠেলে উঠছে আমার মনে : তবে কি সত্যি মডেল হওয়াটা খারাপ কিছু, ঐ-ছবিগুলোর সুন্দরীরা কি নষ্ট মেয়ে ছিলেন, আঁকিয়েদের স্বভাব-চরিত্র কি ভালো হয় না—না কি অবনীরই কাজে আর কথায় মিল নেই? যদি মডেলের কাজে কিছু অসম্মান না থাকে (অবনীর কথা থেকে আমি তা-ই বুঝেছি) আর অল্পস্বল্প রোজগারও তাতে হয় যদি, তাহ'লে কেন নেবো না? সারাদিন আমি একা-একা হাঁপিয়ে উঠি বাড়িতে—উপন্যাস প'ড়ে কত আর সময় কাটানো যায়, কলকাতায় পাড়া-পড়শি ব'লে কিছু নেই, আমার পক্ষে কেমন যেন হারেমের জীবন হয়েছে—বাইরের ঐ বড়ো জগৎটাকে জানতে আমারও কি ইচ্ছে করে না? আমাকে যে কী ভূতে পেলো জানি না, যেন পরখ করতে ইচ্ছে করলো ব্যাপারটা সত্যি কী ; একটু যত্ন নিয়ে সাজগোজ ক'রে রাস্তায় এসে বাস্ ধরলাম।

কিন্তু ও-রকম একটা কথা শুনেও আমি চ'লে আসিনি কেন, দ্বিতীয় কথাটি না-ব'লে তক্ষুনি কেন বেরিয়ে আসিনি? ও-রকম যে বলবেন তা আমার কল্পনাতেও ছিলো না। হঠাৎ, বোধহয় একটা বড়ো ছবির আড়াল থেকে উনি বেরিয়ে এলেন, আধ-বুড়ো মানুষ, মাথায় টাক, কম্বাটে তেকোনা-মতো মুখ, প্যান্টের সঙ্গে আঁটো একটা গলাবন্ধ গেঞ্জি পরেছেন, সেটার রং অপরাজিতা ফুলের মতো নীল। আমি মনে মনে বললাম, 'ইনি তাহ'লে তাঁদেরই একজন, অবনী যাঁদের বলে "সত্যিকার আর্টিস্ট"!' তাঁর পোশাক একটু অদ্ভুত লাগলো আমার চোখে। (অমন গাঢ় রং আমাদের দেশে শুধু বাচ্চারা আর মেয়েরা পরে), কিন্তু চেহারায় তেমন অসাধারণত্ব কিছু দেখলাম না, শুধু চোখ দুটো ভারি জ্বলজ্বলে। 'কী চান আপনি?... ও, মডেল হবার জন্য?' এক ঝলক তাকালেন আমার দিকে। 'আপনার বিয়ে হয়েছে?' এক সেকেণ্ড দেরি ক'রে জবাব দিলুম, 'হ্যাঁ।' 'স্বামীকে বলেছেন?' 'বলেছি।' 'তাঁর আপত্তি নেই তো?' 'তাঁর আপত্তি থাকলে আমি আসবো কেন?' 'আগে

কখনো মডেলের কাজ করেছেন?' 'না।' উনি চোখ দুটি একটু ছোটো ক'রে আর-একবার তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, গায়ের রংটা ঠিক আছে, শামলা-শামলা, এই রকমই খুঁজছিলাম। দেশ বোধহয় পূর্ববাংলায়?' 'ছিলো।' 'আপনার নাম কী?' 'আমার নাম...শ্যামলী।' 'নামও শ্যামলী? বাঃ। পদবি'' আমি বিনা দ্বিধায় জবাব দিলাম, 'সিংহ।' 'শ্যামলী সিংহ—' উনি একটা নোটবইয়ে লিখে নিলেন নামটা। 'ঠিকানা?' 'আমরা অস্থায়ীভাবে আছি এক জায়গায়, ঠিকানাব কি দবকার আছে?' 'আপনি যদি সময়মতো রোজ আসতে পারেন তাহ'লে দরকার নেই।' 'কখন আসতে হবে?' 'সকাল দশটা থেকে বারোটা আপনার সুবিধে হবে?' 'অন্য সময়ে হয় না? দুপুববেলায়?' 'দুপুব— আচ্ছা, দুটো থেকে চারটে? ঠিক আছে? সপ্তাহে তিন দিন, রোজ পঞ্চাশ টাকা ক'বে দেবো। ওতে হবে?' আমাব মাথায় যেন বাজ পড়লো। উনি কী বলছেন? আমি কি ঠিক শুনেছি? রোজ পঞ্চাশ, সপ্তাহে দেড়শো, মাসে...শুধু একটু সেজে-গুজে ব'সে থাকাব জন্য এত টাকা! আমি চেষ্টা ক'রে আওয়াজ বের করলাম গলা দিয়ে, 'কতদিন চলবে কাজটা?' 'তা বলতে পারি না এখন—একমাস, দু-মাস, বেশিও হ'তে পাবে। তবে আপনি কাজটা নিয়ে হঠাৎ ছেড়ে দিলে আমি কিন্তু মুশকিলে পড়বো। আপনি পাববেন কিনা ভেবে দেখুন।' 'পারবো না কেন?' 'আচ্ছা বেশ, তাহ'লে একটু দেখে নেয়া যাক—' আর তাবপরেই সেই সাংঘাতিক কথাটি তিনি উচ্চারণ করলেন যা শোনামাত্র আমাব মুখে যেন এক হাজার আলপিন ফুটলো, ঝাঁ-ঝাঁ আওয়াজ হ'তে লাগলো কানের মধ্যে।

কয়েকটা মিনিট কেটে গেলো, আমি উঠলাম না, নড়লাম না, কথা বললাম না। 'আমি যে-ছবি আঁকবো সেটা ন্যুড। তাই একবার দেখে নিতে চাই। কিন্তু আপনার অসুবিধে হ'লে থাক। আমি জানি এ-দেশের মেয়েদের পক্ষে খুব শক্ত ওটা। আপনি তাহ'লে—' উনি ঝাপসা একটা বিদায়েব ভঙ্গি করলেন, আমি মনে-মনে বললাম, 'রোজ পঞ্চাশ টাকা, রোজ পঞ্চাশ টাকা।' তাবপর যেন অচেতনভাবে উঠে এলাম পর্দা-ঘেরা ড্রেসিংরুমে, মস্ত লম্বা আয়নার মধ্যে আমি, সেই প্রথম পুরোপুরি নিজের চেহারাটা চোখে দেখলাম।

না, শ্যামলী —না, কমলা—শুধু টাকার জন্য নয়। তোমাকে পেয়ে বসেছিলো একটা অস্বাভাবিক, অস্বাস্থ্যকব কৌতূহল। তুমি চাপা দিয়েছিলে তোমার রক্তকণার বিদ্রোহকে, ভুলে গিয়েছিলে তোমাব আজন্মেব সব সংস্কার। যে-কারণে তুমি বিয়ের জন্য ব্যাকুল, যে-কারণে তুমি অবনীব ভালোবাসা পেয়েও অশান্ত—সেই সামাজিক স্বীকৃতি, সাংসারিক প্রতিষ্ঠা, সব ছাপিয়ে উঠেছিলো তোমাব মনে এক নতুন ইচ্ছা, নতুনের জন্য লুব্ধতা (যাব বীজ অবনী তোমাকে দিয়েছিলো)—এক নষ্ট, উজ্জ্বল, বাধন ছেঁড়া, নিষিদ্ধ জগতের জন্য, যার আভাস তুমি পেয়েছিলে সদব স্ট্রিটের ঐ ঘবটায় পা দেয়া মাত্র, ঐ ঝকঝকে কাচেব জানলাগুলোতে, সকালবেলার আভার মতো চারদিকে ছড়িয়ে-পড়া নরম আলোয়, পায়েব তলার কার্পেটে, নরম গভীব মেরুন রঙেব সোফাটায়, আর সেই টাক পড়া আধবুড়ো মানুষটিতে, যার চেহারায় প্রথমে কোনো অসাধারণত্ব তুমি দেখতে পাওনি। যেন একটা মোহের মধ্যে পড়েছো, যেন একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখছো আব সেই স্বপ্নকে সত্যি ক'রে তোলাব জন্য চেষ্টা কবছো প্রাণপণ। কত সহজে মিথ্যেগুলো বেরোলো তোমার মুখ দিয়ে! কত সহজে সন্ধেবেলা অবনীকে বললে, 'তুমি অ্যাশট্রের কথা বলছিলে ক-দিন ধ'রে, তাই আনতে বালিগঞ্জে গিয়েছিলাম। দুটো নতুন চায়ের পেয়ালাও এনেছি।' (আসলে ওগুলো মোড়ের মনোহারি দোকানে কেনা।) আব সেই পেয়ালায় চা ঢেলে দিয়ে বললে, 'জানো, আজ আমার মাদারিপুরের এক বাল্য-সখীব সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো রাস্তায়। বিরাট গিন্নিবান্নি হ'য়ে গেছে দেখতে, আমি চিনতে পারিনি, সে কিন্তু মুখের দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠলো, ''কমলা না?'' কাছেই থাকে, এক ট্রামেই ফিরলাম আমরা, আমাকে যেতে বললো বার-বার ক'বে। ভালোই হ'লো—মাঝে-মাঝে একটু গল্প-টল্প ক'রে আসা যাবে।' —তুমি কি কখনো ভেবেছিলে যে এত ছলনা তুমি পারো, তাও ঐ সরল বিশ্বাসে ভরা অবনীর সঙ্গে? বাল্যসখীটিকে তুমি উদ্ভাবন করলে সুদ্ধু, এইজন্যে যাতে কোনোদিন অবনী যদি একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে দ্যাখে তুমি নেই, তাহ'লে বলতে পারো, 'পারুলের ওখানে গিয়েছিলাম।' আর আজ—এই তোমার বিয়ের খাটের নতুন জাজিমে ব'সে-

ব'সে তুমি ভাবছো : 'আমি কী ক'রে পারলাম, কী ক'রে পেরেছিলাম?' একটু-একটু ভয় করছে তোমার, পাছে কখনো কেউ জেনে ফ্যালে। না, শ্যামলী—না, কমলা—ভয় নেই তোমার, কেউ জানবে না। আলোক পাল অনেক দূর দেশে চ'লে গেছেন, এতদিনে কলকাতার সেই বাঙালি মডেলটি মুছে গেছে তাঁর মন থেকে, আগেই মুছে গিয়েছিলো। তাঁর ছবির জন্য তুমি, তাঁর কাছে ছবিই সব, তুমি কেউ নও। আর সেই ছবিও এমন যে তা যদি কলকাতার লোকেরা দেখতেও পায় কখনো, কেউ সন্দেহ করবে না যে সত্যবতী আসলে এই বীডন স্ট্রিটের মুখুয্যে-বাড়ির বৌ, গোপেন সবজজের পুত্রবধূ। অবনী দেখলেও চিনবে না তোমাকে, কেননা অবনী যাকে 'তুমি' ব'লে জানে সে ঐ ছবির মেয়ে নয়, সে বেদব্যাসের মা হবে না।

১২

প্রথম তিন দিন ভীষণ কষ্ট পেলো কমলা। তার দুই হাত যেন হাজার হাত হ'য়ে তাকে রক্ষা করতে চায়, তার চুল চায় ছড়িয়ে-ছড়িয়ে তাকে ঢেকে দিতে, কোনো পুরোনো মন্দিরের গা-বেয়ে-ওঠা লতাগুল্ম আগাছার জঙ্গলের মতো। সে নড়তে পারে না, চোখ মেলে তাকাতে পারে না। কখনো, জীবনে কখনো, যেদিন সে ঝড়ের মুখে পাতার মতো উড়ে এসে পড়েছিলো মাদারিপুর থেকে শেয়ালদা স্টেশনে, যেদিন অম্বুর নোংরা হাত দুটো এগিয়ে এসেছিলো তার দিকে, আর যেদিন শান্তি-মাসির আশ্রয়টুকুও তার পায়ের তলা থেকে স'রে গিয়েছিলো—না, সেদিনও নিজেকে এমন অসহায় তার মনে হয়নি, এমনভাবে সারা জগতের পরিত্যক্ত, যেন আত্মরক্ষার কোনো উপায় আর নেই তার, সে যেন অন্য সব মানুষের অচেনা হ'য়ে গিয়েছে। রাস্তার ভিখিরিরও যা আছে তাও এখন নেই তার। 'সাজগোজেই সম্ভ্রম' —অবনী তাকে বলেছিলো সেই বারো টাকা দামের 'ঝিয়েদের কাপড়'টা দেখে। শুধু সম্ভ্রম কেন, মনুষ্যত্বও তাতেই। পশু কাপড় পরে না, মানুষ পরে। যাত্রায় কত সহজে চেনা যায় রাজা, মন্ত্রী, সেনা-পতিকে ; তেমনি আসলেও দেখামাত্র বুঝি কে বোষ্টমি, কে বাউল, কে জমিদারি-গিন্নি, কে চাষি-ঘরের বৌ। মুখে কিছু লেখা থাকে না, বাইরের আবরণটাতেই চিহ্ন, প্রমাণ। সেই চিহ্ন, যা আমাদের শরীরেরই অংশ হ'য়ে গেছে বলা যায়, যা বাদ দিয়ে নিজেদের চেহারা আমরা কল্পনাও করি না, তা যদি একেবারে সরিয়ে নেয় কেউ, তাহ'লে মানুষকে অন্য কোনো জীবে কি পরিণত করা হয় না, যেন কোনো ডাঙার প্রাণীকে হঠাৎ জলের তলায় ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে, যেখানে তার নিশ্বাসের বাতাস নেই?

এমনি ভেবেছে কমলা, সেই নরম মেরুন রঙের সোফাটায় উপুড় হ'য়ে প'ড়ে-প'ড়ে, হাতে মুখ ঢেকে, নিঃসাড়, মাঝে-মাঝে নিজেরই অজান্তে কেঁপে-কেঁপে উঠে। তারপর ভেবেছে : অথই জলে ঝাঁপ যখন দিলোই, তখন সাঁতার কাটার চেষ্টা করাই তার উচিত। যে-অবস্থায় কেউ তাকে কখনো দ্যাখেনি, তার স্বামী না, অন্ধকারে ছাড়া অবনীও না, সে অবস্থায়, এই ঝকঝকে উজ্জ্বল আলোয়, উনি যখন তাকে দেখলেনই, তখন আর পেছিয়ে গিয়ে, কুঁকড়ে থেকে কী হবে, বরং মনে সাহস আনা যাক, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা। মনে পড়লো তার এক জ্যাঠতুতো দিদি প্রথম সন্তান হবার পর কথায়-কথায় একদিন বলেছিলো, 'মেয়েদের আবার লজ্জা-শরম! বাচ্চা হ'তে গেলে কিছুই থাকে না।' প্রসবে কষ্ট পেয়েছিলো দিদি, দাইয়ে কুলোয়নি, পুরুষ ডাক্তার ডাকতে হয়েছিলো। কিন্তু, একটা সন্তান পাবার জন্য সবই করা যায়, শরীরের কষ্টে নাকি জ্ঞানও থাকে না তখন। কিন্তু—এটা কিসের জন্য? কেন সে মেনে নিচ্ছে এই কষ্ট, এই লজ্জা, এই ভীষণ, ভীষণ অপমান? কিসের জন্য এটা, কী জন্মাবে এ থেকে, কী পাবে কমলা? শুধু দৈনিক পঞ্চাশটা টাকার জন্য—ছি! সে এত লোভী, এত খারাপ!

—কিন্তু, এর পেছনে অন্য কিছু নেই তো? অতগুলো টাকা, তার বিনিময়ে আরো কিছু আদায়

ক'রে নেবার মৎলব নেই তো? গোড়ায় যদি নাও থেকে থাকে, পরে তা জেগে উঠতে কতক্ষণ? পুরুষ, মেয়েমানুষ : বাঘ আর হরিণ, আগুন আর ঘি, খাদক আর খাদ্য-- কতবার এ-সব কথা শুনেছে ছেলেবেলায়। তার জ্যাঠাইমা বলতেন, 'পুরুষ এক জাত। শ্বশুর-ভাসুর কাউকে বিশ্বাস নেই।' আর অম্বু—আর চারদিকে কত তেলতেলে চোখ, হ্যালহেলে হাসি—এ-সব তো সে নিজের চোখেই দেখেছে। তাহ'লে উনি—ঐ আধ-বুড়ো টাক-পড়া মানুষটি— উনিই বা কেন ধর্মপুত্র হ'তে যাবেন? একা থাকেন দেখছি, ঘরের দরজা বন্ধ, আমি চ্যাঁচামেচি করলেই বা কে শুনবে? অবনীর মত ছিলো না, সে কি এই ভয়েই? 'মডেলরা কারো স্ত্রী, কারো বা প্রেমিকা—' তবে কি শিল্পীদের মধ্যে এটাই রেওয়াজ, রথ দেখা কলা বেচা একসঙ্গে? ভয়ে কমলার গায়ে কাঁটা দিলো-- হায় হায়, এই সহজ কথাটা সে ভাবলো না আগে! না, আমার হাত আছে, আমার দাঁত আছে—আমি অম্বুকে টিট করেছিলাম—আমি দেখিয়ে দেবো, বুঝিয়ে দেবো আমার সঙ্গে কোনো চালাকি চলবে না, আমি বিবাহিত—হ্যাঁ, বলতে গেলে তো তা-ই—না, এ অসহ্য, আমি আর এক দণ্ড থাকবো না এখানে।

'ও-রকম করলে চলবে না তো, সহজ হ'তে হবে, মুখ তুলতে হবে, তাকাতে হবে আমার দিকে। যখন যে-রকম বলবো সেই ভাবে থাকতে হবে। ভয় কী—কিচ্ছু দেখা যায় না বাইরে থেকে, কেউ হঠাৎ এ-ঘরে ঢুকে পড়বে না। একটু সহজ হবার চেষ্টা করো। আমার যে সময় নষ্ট হচ্ছে, আমি যে কাজটা ধরতেই পারছি না এখনো। এদিকে ছবিটা ভেসে-ভেসে উঠছে আমার মনে—সারাদিন ধ'রে ভাবছি, বহুদিন ধ'রে ভাবছি, মডেলও ঠিক পাওয়া গেছে, আর দেরি করা যায় না। খুব অসুবিধে হচ্ছে তো? আচ্ছা, এবারে—' (কমলা টের পেলো একটা নরম চাদর তার ঘাড় থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো)—'এবারে বোধহয় ঠিক আছে? এখন মুখ তোলো, তাকাও। শ্যামলী, তুমি মহাভারত পড়েছো? ছেলেবেলায় পড়েছিলে, ছোটো মহাভারত? কোথায় ছিলে তুমি ছেলেবেলায়? কী বললে?. মাদারিপুর? সেখানে নদী আছে না? আমি যাইনি কখনো মাদারিপুরে, কিন্তু আমিও পদ্মাপারের মানুষ, পুজোর সময় যেতুম ছেলেবেলায়। আমাদের বাড়ির দুর্গা ছিলেন অর্ধ কালী, মুখের একদিক নীল, আর-এক দিক টকটকে লাল। রাগি চেহারা। মাদারিপুরে মজুমদার-বাড়িতেও তা-ই ছিলো? আশ্চর্য। আমি কিন্তু দুর্গাকে রাগি ব'লে ভাবি না, তিনি যে মহিষাসুর বধ করছেন তার পেছনে কোনো রাগ নেই—আমাদের প্রতিমায় অসুরের বুকে রক্ত এঁকে দেয় সেটা আমার বিশ্রী লাগে। দুর্গা, ছিপছিপে সুন্দরী দেবী, তাঁকে কি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করলে মানায়? তিনি টোকা দিলেই তো অসুর আর নেই। ঠিক এই ভাবটি দেখতে পাবে এলুরার একটি মূর্তিতে, দুর্গা সেখানে মহিষের পিঠের ওপর একটি পা রেখেছেন শুধু—আস্তে, খুব আলতোভাবে, আর-একটি হাতে ওর মুখটা যেন চেপে আছেন, আর জন্তুটা যেন ঐটুকুতেই নিঃসাড় হ'য়ে গেছে, প্রায় বলা যায় মৃত্যুর নেশায় বিহ্বল। কী শান্ত সেখানে দেবী, যেন অলস, নিশ্চেষ্ট, কিন্তু ওটুকুর বেশি তাঁর দরকার নেই তো সত্যি। এর উল্টো মূর্তিও আছে অবশ্য মহাবলীপুরমে—প্রায় একই সময়কার—দুর্গা সেখানে যাকে বলে রণরঙ্গিণী, ধনুক তুলে তীর ছুঁড়ছেন তিনি, তাঁর সিংহটি দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখাচ্ছে, আর ক্ষত্রিয়ের মতো শরীরের ওপর মহিষের মুণ্ড দিয়ে অসুরও রুখে দাঁড়িয়েছে গদা নিয়ে—কিন্তু দুর্গা এত ছিপছিপে, এমন তরুণ, এমন সতেরো বছরের মেয়ের মতো দেখতে, যে মনে হয় ওটা আসল যুদ্ধ নয়, একটা খেলা, অভিনয়, যাকে বলে মায়া, তা-ই। তা বাঙালির দুর্গাপূজাও একটা চমৎকার নাটক, মায়ার খেলা—আগমনী থেকে বিসর্জন পর্যন্ত—তিনটি মাত্র দিনের জন্য কী বিরাট আয়োজন ভেবে দ্যাখো, কিন্তু তারপর মাটির প্রতিমা জলে গ'লে-গ'লে মাটিতে ফিরে যান, একটি সুন্দর বিরহ ছড়িয়ে পড়ে আবার-নীরব-হ'য়ে-যাওয়া দশমীর রাতটিতে। তোমার মনে পড়ে, শ্যামলী, দশমীর জ্যোছনা? কেমন করুণ, অথচ আনন্দে মেশা। উঠোনে ছায়া, লোকেরাও যেন আস্তে চলাফেরা করছে, ছায়ার মতো। প্রণাম, কোলাকুলি, বাড়ি-বাড়ি ঘোরা, মিষ্টিমুখ, ভাবটা যেন সকলেই সকলকে ভালোবাসছে, কিন্তু দু-দিন পরেই আবার মামলা, মিথ্যে সাক্ষী, লাঠি দিয়ে ভাইয়ের মাথা ফাটানো। কিন্তু তাই ব'লে সেই মুহূর্তটি মিথ্যে হবে কেন? দশমীর

রাত, মাথার ওপরে আধখানা চাঁদ, উঠোনে ছায়া—যাকে ভালোবেসেছি, পুজো করেছি, যা নিয়ে এত আনন্দ করেছি, সেই জিনিশটিকে আমরা নিজের হাতে বিসর্জন দিয়ে এলাম নদীর জলে, আমাদের মন তাই শুদ্ধ, নির্মল, তখনকার মতো কারো ওপর আমাদের রাগ নেই, বিদ্বেষ নেই। আর সেই যে মুহূর্তের জন্য আমরা ভালো হয়েছিলাম, যেন তারই পুরস্কার এলো লক্ষ্মীপূর্ণিমায়—ফুটফুটে চাঁদের আলো, মস্ত-মস্ত উঠোন ভ'রে আলপনা—শ্যামলী, তোমার মা-ঠাকুমাও আলপনা দিতেন নিশ্চয়ই—তুমিও দিতে? —বাঃ, এই ঠিক আছে, চমৎকার হাসিটি, নোড়ো না, ঠিক অমনি ক'রে থাকো—এইবার আস্তে একটু চাদরটা ঠেলে দাও পা দিয়ে—এই রে, আবার শক্ত হ'য়ে গেলো।'

নরম গলার আওয়াজ, খুব নরম কথা বলার ধরন, আদরের মতো। উনি ধৈর্য হারাননি, কোনো অসহিষ্ণুতার ভঙ্গিও করেননি। বলতে তো পারতেন, 'চ'লে যাও, তোমাকে দিয়ে আমার কাজ হবে না—' কিন্তু আস্তে-আস্তে, ভুলিয়ে ভালিয়ে, যেন তুকমন্ত্র প'ড়ে আমাকে বশ ক'রে নিলেন— যেমন কোনো শিশুর অসুখ করলে সান্ত্বনা দেন মা, তুইয়ে-বুইয়ে তেতো ওষুধ গেলান, মাথায় হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে, গুনগুন গান ক'রে-ক'রে ঘুম পাড়ান—তেমনি। আমি বুঝি ও-সব কথা ওঁর জারিজুরি, সবই নিজের মনে বলা, অমনি ক'রে অন্যমনস্ক ক'রে দিচ্ছেন আমাকে, কিন্তু তবু—কথাগুলো শুনতে আমার ভালো লাগে, ভালো লাগে ওঁর মুখে 'শ্যামলী' ডাক শুনতে। আমি ওঁর অর্ধেক কথাই বুঝি না অবশ্য—কিন্তু যা বলেন, যে-ভাবে বলেন, তা যেন একটা সুরের মতো ঘুরে বেড়ায় আমার চারদিকে, আমার মনে প'ড়ে যায় ছেলেবেলার কথা, যখন আমি সুখী, সরল, নিষ্পাপ ছিলাম, যখন জল হাওয়া গাছপালা জীবজন্তু সকলেই বন্ধু ছিলো আমার। আমি কোথায় আছি, কী-ভাবে আছি, তা ভুলে গিযে মাঝে-মাঝে হঠাৎ তাকাই ওঁর দিকে —উনি হাসেন, আমিও একটু না-হেসে পারি না। 'এই রকম শামলা-শামলা গায়ের রংই খুঁজছিলাম।' —এদিকে আমি ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি আমি 'কালো মেয়ে', আমাকে 'পার করা' সহজ হবে না—আব সত্যিও বাবাকে তিন বিঘে জমি বেচে দিতে হয়েছিলো আমাব বিয়েতে পণ দেবার জন্য। ঐ 'শামলা-শামলা' কথাটা শুনেই হঠাৎ 'শ্যামলী' নাম বেবিযে গেলো আমার মুখ দিয়ে—মনে হ'লো ওটাই ঠিক, আমার পক্ষে মানানসই। 'ঠিকমতো মডেলও পেয়ে গিয়েছি—' তাহ'লে এমন-কোনো কাজ আছে যার পক্ষে আমি...বলতে গেলে শুধু আমিই যোগ্য? উনি প্যাবিসে ছিলেন, শুনেছি সে-দেশে রূপসীর মেলা—কিন্তু সেখানে সকলেরই দুধে-আলতা রং, আর উনি কালো মেয়ে চান। কিন্তু আর কি কেউ আসেনি ওঁর বিজ্ঞাপন দেখে? শামলা-শামলা রঙের মেয়ের কি অভাব কলকাতায়? কেমন একটু গর্ব হ'লো আমার, মনের এক গোপন কোণে এই ধারণা উঁকি দিলো যে হয়তো কিছু আছে আমার চেহারায় যা সহজে পাওয়া যায় না, কোনো বৈশিষ্ট্য যা অন্য কেউ তা দেখতে পায়নি?

'তুমি তো মহাভারত পড়েছো, শ্যামলী, সত্যবতীকে মনে আছে? না? তাও তো বটে, ছোটোদের মহাভারতে আর কতটুকুই বা থাকে। ভীষ্মের বিমাতা, বিচিত্রবীর্যের মা, সত্যবতী। আব কার মা, বলো তো? বেদব্যাসের —যিনি চতুর্বেদ ভাগ করেছিলেন, পুরো মহাভারতটা মুখে-মুখে ব'লে গিয়েছিলেন গণেশকে—সেই ব্যাসদেব। যাঁকে বলে 'দ্বৈপায়ন', 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন', যেহেতু তিনি দ্বীপে জন্মেছিলেন, আর গায়ের রং ছিলো ভীষণ কালো। মহাভারতের সেই অদ্ভুত চরিত্র, যিনি কোনো সাতে-পাঁচে নেই, দেখা দেন শুধু মাঝে-মাঝে, কোনো সংকটের সময়ে, ঠাকুর্দা-বাবা-ছেলে তিন পুরুষেরই যিনি সময়বসী, আসলে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের যিনি বাবা, যিনি কখনো যুবক ছিলেন ব'লে মনে হয় না, কখনো বৃদ্ধ হবেন ব'লে মনে হয় না—চঞ্চল সময়ের মধ্যে তিনি যেন একমাত্র স্থির। ব্যাসকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন তোলা যায়—কেন অমন ঘোর কালো তিনি, কেন তাঁর গায়ে অমন ভূত-ভাগানো দুর্গন্ধ (অথচ তাঁর মা সত্যবতীর গায়ের সুগন্ধে দশ দিক আমোদিত) —এ-সবের অর্থ কী? কিন্তু আপাতত তাঁর মায়ের কথাই বেশি ভাবছি আমি, বহুদিন ধ'রে ভাবছি, অত বড়ো মহাজ্ঞানী পুত্রের যিনি মা, তিনিও তো সহজ লোক নন। ব্যাসের কী ক'রে জন্ম হ'লো জানো তো?'

আমি মন দিয়ে শুনছি তাঁর কথা, তাকিয়ে আছি তাঁব দিকে, থেমে-থেমে বলছেন আর কথার ফাঁকে-ফাঁকে দ্রুত আঙুল চলছে তাঁর, কোলে একটা বড়ো খাতা খোলা, পেন্সিলের এক-একটা

টানের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর হাত ঘুরছে গোল হ'য়ে, বাঁকা হ'য়ে, ওপরে-নিচে ডাইনে-বাঁয়ে সব দিকে, মাঝে-মাঝে দেখছেন আমাকে, চোখাচোখি হচ্ছে। আমার কৌতূহল হ'লো উনি কী আঁকছেন তা দেখার জন্য, কিন্তু মাথা তুলতে গিয়ে চাদরটা স'রে গেলো কাঁধ থেকে, তক্ষুনি আবার সচেতন হ'য়ে টেনে দিলাম। তিনি কিছু লক্ষ করলেন না।

'সত্যবতী, জেলের মেয়ে, যমুনায় খেয়া-পারাপার করেন। কুমারী তিনি তখন, সদ্যযুবতী, মৎস্যগন্ধা। একদিন পরাশর মুনি সেই খেয়ায় উঠলেন নদী পেরোবার জন্য। নৌকো যখন মাঝনদীতে, মেয়েটি তাব সুন্দর শরীর দুলিয়ে-দুলিয়ে দাঁড় টানছে, মাথার ওপরে নীল আকাশ আর নীল যমুনায় মাছের আঁশের মতো চিকচিকে রোদ্দুর, তখন তার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে মুনি হঠাৎ বিহ্বল হলেন, নদীর চেয়েও অনেক বড়ো-বড়ো ঢেউ উঠতে লাগলো তাঁর দেহেব মধ্যে। জানো তো সেকালের মুনিঋষিরা কেমন ছিলেন. কোনো ওজর-আপত্তি কানে তুলতেন না, যা চাই তা চাই-ই, তক্ষুনি, সেই মুহূর্তে। সত্যবতী যাতে লজ্জা না পান মুনি নামিয়ে আনলেন দিনে-দুপুরে ঘন কুয়াশা, চারদিক ঝাপসা হ'য়ে গেলো, আঁধার-মতো, রইলো শুধু সময়ের গর্ভে ঐ একটি গোপন নৌকো। এমনি ক'রে মিলন হ'লো কনকবর্ণ ব্রাহ্মণ মুনি আর অনার্য শ্যামাঙ্গী ধরণীকন্যার—জলের ওপরে, যে-জলে প্রথমে প্রাণ জন্ম নিয়েছিলো। মৃত্তিকার মেয়ে সত্যবতী, জলে তার জীবিকা, আর অন্যদিকে মনস্বী পরাশর—এমনি ক'রে ধ্যানের সঙ্গে লৌকিকের মিলন হ'লো। ভাবতে গেলে আদর্শ মিলন : দুই বিপরীতকে মিলিয়ে দেবার শক্তির নামই তো মহত্ব। নদীব ওপাবে উঠে মুনি বর দিলেন জেলেনিকে, তার গা থেকে মাছের দুর্গন্ধ দূর হ'য়ে গেলো, ছড়িয়ে পড়লো পদ্মের সৌবভ চারদিকে। "যমুনার ঐ দ্বীপে তুমি আমাব পুত্রকে জন্ম দেবে," এই ব'লে পরাশর চলে গেলেন। এই পুত্র ব্যাসদেব, তিনি শাস্ত্রজ্ঞ হ'য়েই জন্মালেন, আর জন্মানোমাত্র সাবালক হ'য়ে চ'লে গেলেন মা-কে ছেড়ে পিতার সন্ধানে, জ্ঞানের সন্ধানে। কিন্তু গায়ের বঙে ও দুর্গন্ধে রইলো তাঁর মাতৃকুলেব চিহ্ন।

'আমি সেই মুহূর্তটিব কথা ভাবি, যখন পরাশর চ'লে গেছেন, আর সত্যবতী একা প'ড়ে আছেন খেয়ানৌকোয়, যা একটু আগে তাঁর বাসরশয্যা হয়েছিলো। তিনি জানেন তাঁর গর্ভে এখন ভবিষ্যৎ, কিন্তু এটা কি জানেন সেই ভবিষ্যৎ কত বড়ো, কত মহৎ, কত আবহমান ঐশ্বর্যে ভরা? ও-সব কি ধারণা করতে পেরেছিলেন এই সামান্যা নারী, এই পার্থিবা? তাঁব জন্যে তো কোনো অলৌকিক ভবিষ্যৎবাণী হয়নি, তিনি দ্যাখেননি কোনো অগ্রিম স্বপ্ন, কোনো দেবদূত দেখা দেননি তাঁকে। অন্য সব দিনের মতোই ছিলো সেই দিনটি তাঁর, নৌকো বাইছেন, রোজকার মতোই পারাপার কবছে বেসাতি নিয়ে হাটের পসারি, তাঁতি, কুমোর, শাকসব্জিব ঝুড়ি নিয়ে চাষি মেয়েরা। হঠাৎ কী হ'য়ে গেলো। কেমন লেগেছিলো তাঁর? কী মনে হযেছিলো? এই প্রথম প্রণয়ের স্বাদে তখনও তাঁব দেহ কি ছিলো পুলকে ভরা? যে-সুগন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিলো তাঁকে ঘিরে, তিনি কি বুঝেছিলেন সেটা তাঁরই শরীরের? না কি তিনি ভয় পেয়েছিলেন সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে দেখে, সূর্যেব সামনে কিশোরী কুন্তীর মতো? কী ভাবছিলেন তিনি, কিছু কি ভেবেছিলেন? না কি প'ড়ে ছিলেন, অবশ, মোহাচ্ছন্ন, শুধু ঝড়ের পরে গাছের ডালপালার মতো ঈষৎ কেঁপে উঠছিলেন মাঝে-মাঝে? এ-সব কিছুই লেখা নেই মহাভারতে, এই আশ্চর্য ঘটনাটি বলা হয়েছে কেজো সুরে, অল্প কয়েকটি কথায়। আর সত্যবতীর পরবর্তী জীবন, যখন তিনি রাজা শান্তনুর মহিষী হয়েছেন—তা থেকে তাঁকে মনে হয় একজন সাংসারিক বুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মহিলা, তার বেশি আর-কিছু নয়। তাঁর অন্য দুই ছেলের মধ্যে একজন বাচ্চা বয়সেই ম'বে গেলো, আব এ:্জন মরলো যক্ষ্মায়, সারাক্ষণ বৌয়েদের সঙ্গে লেপটে থাকার ফলে। পবে আর কখনো একটি সাধারণ সুপুত্রেরও মা হ'তে পাবেননি তিনি। কিন্তু সেই মুহূর্তে, জীবনে সেই একটিবার, তিনি প্রায় দেবী হ'য়ে উঠেছিলেন—অন্তত আমার তা-ই মনে হয়—নযতো পবাশর তাঁকেই কেন বেছে নিলেন ব্যাসের জন্ম দেবার জন্য, আর কি কোনো মেয়ে ছিলো না আর্যাবর্তে? আমি সেই মুহূর্তটি ভাবি, আমি সেই মুহূর্তটিকে আঁকতে চাই।

'কী-রকম ভাবছি জানো? মুনি বর দিয়ে চ'লে গেছেন, কিন্তু তাঁর তৈরি কুয়াশা তখনও কাটেনি।

জল, ডাঙা, আকাশ তখনও প্রায় পরস্পরে মিশে আছে। ছবির চারদিক ঝাপসা, হঠাৎ একটি উজ্জ্বল অংশে দেখা যাচ্ছে শুধু একটি নৌকো—না, নৌকোর আভাস—আর পাটাতনের ওপরে, স্পষ্ট, যেন সে-মুহূর্তে পৃথিবীতে আর-কিছু নেই, এক নারী, উন্মোচিত, আকাশের তলায় নদীর মতো উন্মোচিত, যিনি কিছুক্ষণ আগেও কুমারী ছিলেন, পরে আবার ঋষির বরে কুমারী হবেন, কিন্তু এ-মুহূর্তে যিনি পুরুষ-স্পৃষ্ট প্রকৃতি, সৃষ্টির উৎস। সুন্দর তাঁর শরীর, তা হ'তেই হবে, ঋষিরা কখনো কুরূপার গর্ভে জন্ম নেন না। কিন্তু তাঁর মুখের ভাবটি—আশা আনন্দ প্রতীক্ষা উৎকণ্ঠায় মেশা—সেই ভাবটি এখনো ঠিক ধরা দিচ্ছে না আমাকে। কিন্তু আসবে, চেষ্টা করতে-করতেই পেয়ে যাবো, এক-এক সময় যেন ঝলক দিয়ে মিলিয়ে যায়। শরীরটি হবে শান্ত, সুখী অলস, যেন সে আছে ব'লেই সুখী, কেননা সে এইমাত্র জানতে পেরেছে সে শুধু উপযোগী নয়, সুন্দর। শরীর সুন্দর হ'য়েই সুখী হ'তে পারে, কিন্তু মনের লক্ষ্য সুখ নয়, জ্ঞান। চিন্তা করে মন, উপলব্ধি করে মন, আর সেই মনের আয়না হ'লো মুখ। তাই সত্যবতীর শরীরে আর মুখে একটা সূক্ষ্ম তফাৎ দেখতে পাচ্ছি, যেন একটা তর্ক চলছে শরীরের সঙ্গে মুখের, যেমন রেমব্রান্ট তাঁর বাথশিবার ছবিতে ফুটিয়েছিলেন। ঐ বাথশিবা, আর রূবেন্সের এঞ্জেলিকা—এই দুটি ছবির মধ্যে একটি চমৎকার সংলাপ আমি শুনতে পাই। রূবেন্স বলেছেন, "দ্যাখো এই নগ্ন নারীকে, এই গোলাপি রঙের অসামান্য রূপসীকে, দ্যাখো এই ধরাধামে একটি স্বাস্থ্যবতী ভরপুর যুবতীর দেহ কত সুন্দর হ'তে পারে। কিন্তু সে এখন গাঢ় ঘুমে অচেতন, নিজেকে সে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে, তার রূপযৌবন এখন তাকে ছাড়িয়ে এক স্বাধীন সামগ্রী হ'য়ে উঠেছে। আর দ্যাখো এই গাল-ভাঙা বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে, মেয়েটির গায়ের কাপড় সরিয়ে দিয়ে তিনি অবাক হ'য়ে তাকিয়ে আছেন, ভয়ে, বিনয়ে, সম্ভ্রমে, অবিশ্বাসে—যেন ঈশ্বরের দেখা পেয়েছেন এমনি তাঁর মুখের ভাব—কিন্তু না, ঈশ্বর নন, ঐ পেছনের ছায়া থেকে এক খুদে শয়তান তাঁকে পাপের ভয় দেখাচ্ছে, অথচ তিনি পারছেন না ঐ রূপ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে।" আর রেমব্রান্ট বলেন, "বাথশিবার শরীর সুন্দর, কিন্তু তার মুখে দ্যাখো বেদনা, ভাবনা, সে কোনো অর্থেই ঘুমিয়ে নেই।" কেন বাথশিবার মুখে ঐ বিষাদ? তার সুন্দর শরীরটিকে ভোগ করার জন্য রাজা দায়ুদ তার স্বামীকে যুদ্ধে পাঠিয়ে মেরেছিলেন, আর কি তার নিজের শরীরকে সে ভালোবাসতে পারে? অথচ দায়ুদ তাকে গ্রহণ না-করলে বিখ্যাত সলোমনেরও জন্ম হ'তো না—কী-রকম উল্টোপাল্টা সব ব্যাপার নিয়ে তার জীবন! কিন্তু রূবেন্সের সুন্দরীর মুখে এ-ধরনের কোনো দ্বন্দ্ব নেই, অতীত বা ভবিষ্যতের কোনো ছায়া পড়েনি তাতে, তার নির্মল, মনোহীন রূপ যেন চারদিক আলো ক'রে আছে। রূবেন্স আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেন, রেমব্রান্ট আমাদের চিন্তা করতে বলেন। আমিও সেই ধরনের কিছু ভাবছি, আমি চাই যে সত্যবতীর মুখের ভাবটি হবে সচেতন, যেন সে বুঝতে পেরেছে তার জীবনে কয়েক মুহূর্ত আগে যা ঘ'টে গেলো তার সত্যিকার অর্থটা কী। এই তো একটি অলৌকিক মুহূর্ত তার জীবনের, এর পরেই তো তাকে হ'তে হবে এক সাধারণ নারী ও রাজমহিষী, যেমন বাথশিবাও পরে হয়েছিলেন, ভুলে গিয়েছিলেন নিষ্ঠুরভাবে নিহত স্বামীকে, মুমূর্ষু দায়ুদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে তর্কও করেছিলেন। আমি তোমার সাহায্য চাই, শ্যামলী, কেননা আপাতত, আমার চোখে, তুমিই সত্যবতী। তুমি কি পারবে না, আপাতত, নিজেকে একটু-একটু সত্যবতী ব'লে ভাবতে ; থিয়েটারে যেমন, কয়েক ঘণ্টার জন্য, আমাদের চেনাশোনা কোনো মহিলা সীতা বা শকুন্তলা হ'য়ে যান, তেমনি? পারবে না কি সেই দৃশ্য, সেই ঘটনা, সেই মুহূর্তটি মনে-মনে ভেবে মনে-মনে সেইমতো হ'তে? তোমার মন যদি একবার মেনে নেয় তাহ'লে তোমার শরীর আর আপত্তি করবে না।'

১৩

কখন যেন চনচনে খিদে পেয়েছিলো, এখন নেই, ভুলে গেছে। একটু ক্লান্ত, যেন ঝিম ধ'রে আছে শরীরে—কিন্তু বেশ ভালো, বোধহয় এই ভাবটাকেই 'পবিত্র' বলে। খুব ভালো নিয়ম, এই বিয়ের দিনে উপোস, মন স'রে আসে বাইরের সব ব্যাপার থেকে, সংসারের শরিক হবার পূর্বমুহূর্তে সংসারকে ভুলে থাকে কিছুক্ষণ, শুধু নিজেকে নিয়ে। তার অবশ্য পুরোনো, তবু—সেইজন্যেই—এমনি একটু নিভৃত সময়ের তার দরকার ছিলো। দুপুরবেলাটা তেতে উঠেছিলো, কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে শীত পড়ি-পড়ি। পাখা বন্ধ ক'রে দিয়েছে কমলা, একটু শুয়েছে, তন্দ্রা, মাঝে-মাঝে ঝাপসা, কিন্তু ঘুম নয়। বাঁকা আকাশ জানলার বাইরে, হলদে রোদে ফ্যাকাশে নীল : বিকেল হ'য়ে এলো। বিকেল : ঘরের মধ্যেও আলোর তেমন জোর নেই আর, দেয়ালের শাদা কোথাও-কোথাও ছাইরঙা। কিন্তু সেই ঘর সারাক্ষণ একরকম। উনি পর্দা টেনে দিয়েছেন উত্তরের জানলায়, সারা ঘরে শুধু টিউবের বাতির নকল রোদ, নীলচে শাদা, স্থির—বৃদ্ধি ক্ষয় বদল নেই। আমি আসি যখন, আবার যখন বেরিয়ে যাই—কখনো রোদ কখনো মেঘ কখনো তাপ কখনো ভেজা, কোনোদিন বাস্-এ বসতে পাই কোনোদিন পাই না। কিন্তু সেখানে, ঐ ঘরে, কিছু নেই যা সাময়িক বা অস্থায়ী বা অনিশ্চিত। বৃষ্টি রোদ শীত গ্রীষ্ম দুপুর সন্ধ্যা—সব হারিয়ে গেছে। ঋতুর বাইরে, বেলা-অবেলার বাইরে, এমনকি আমরা যাকে জীবন বলি তারও বাইরে যেন : এক মায়ালোক। উনি ঠাণ্ডাই যন্ত্র বসিয়েছেন, একটা সুগন্ধি ঠাণ্ডা জড়িয়ে ধরে ঢোকামাত্র, বাইরের কোনো শব্দ নেই, পায়ের শব্দটুকুও ডুবে যায় গালিচায়। এখন আর বেশি কথা বলেন না উনি, কিন্তু ঘরের কোথাও বোধহয় রেডিওগ্রাম চলে—নরম, খুব নরম হ'যে ভেসে বেড়ায় সুর, ঘুরে-ঘুরে, কখনো শোনা যায় কি যায় না, কখনো হঠাৎ ঝড়ের ঝাপটের মতো—শুনতে-শুনতে আমি যেন আরো গভীরে ডুবে যাই, ঐ নরম, গভীর মেরুনরঙের সোফাটার মধ্যে। অনেক যন্ত্র, অদ্ভুত, বিলেতি, আগে কখনো ও-রকম বাজনা শুনিনি। শুনতে কিন্তু ভালোই লাগে, যেন মনের ওপর সুগন্ধের মতো, যেন টুপটুপ শিউলি আর শিশির ঝ'রে-ঝ'রে আশ্বিনের ভোর হচ্ছে—ঘুরে বেড়ায় সুর, আমাকে ঘিরে-ঘিরে, আমাকে আদর ক'রে। এই মায়ালোক : এটা দু-ঘণ্টার জন্যে আমারও। তুমি, কমলা—মানে, শ্যামলী—তুমিও এখানে প্রতিদিন একরকম। নীল শাড়ি খয়েরি শাড়ি হলুদ শাড়ি, আলো ছায়া রোদ্দুর মেঘ, যাতে চেহারার কিছুটা উনিশ-বিশ হ'য়ে যায় (কখনো কারো ভালো লাগে বা লাগে না), সে-সব দৈব তোমাকে ছুঁতে পারে না এখানে, এখানে সাজগোজের বাইরে তোমার পরিচয়, যেমনটি তুমি ঠিক তা-ই, অবিকল, এক, ভোল-বদল নেই। তুমি 'সহজ' হয়েছো—তার মানে, ভুলে গিয়েছো নিজেকে, এসেছো বহুকালের খোলশ থেকে বেরিয়ে—নিজেরই মধ্য থেকে বলা যায়—তোমার যে একটা শরীর আছে এই চেতনা আর কষ্ট দিচ্ছে না তোমাকে। মিনিটের পর মিনিট : ফোঁটা-ফোঁটা শিশির, শিউলি, ঘন সবুজ দূর্বার গায়ে শিশির, উজ্জ্বল জল, শিউলির সুবাস, প্রথম নরম ভোরবেলার আলো। কিছু করার নেই তোমার, ভাবার নেই, তোমাকে শুধু তুমি হ'তে হবে, পুরোপুরি—তুমি যে আছো তা-ই যথেষ্ট। তোমাকে সত্যবতী হ'তে হবে, তুমি একটু-একটু ক'রে সত্যবতী হ'য়ে উঠছো—শুধু চুপ ক'রে থাকো, নিজেকে এলিয়ে দাও, ধরা দাও এই মায়ায়। আধ ঘণ্টা পর-পর কয়েক মিনিট বিশ্রাম কমলার পাওনা—তখন সে উঠে বসে (উনি একটা পা-পর্যন্ত-পড়া আলখাল্লার মতো জামা দিয়েছেন সেইটি গায়ে জড়িয়ে), আড়মোড়া ভাঙে, একটু দাঁড়িয়ে নেয় বা দু-চার পা হাঁটে—বা কখনো শুয়ে থাকে একই ভাবে, চুপচাপ। চারটে বাজামাত্র ছুটি তার, উনি তাকে এক মিনিটও বেশি থাকতে বলেন না, পঞ্চাশটি টাকা হাতে-হাতে দিয়ে দেন—তাতে কেমন অপমান লাগে কমলার, একদিনও কি এমন হ'তে নেই যে একটু বেশিক্ষণ তাঁর দরকার হ'লো তাকে, বা—আর্টিস্ট মানুষ, শুনেছে খুব ভুলো মনের লোক হন তাঁরা—কখনো কি টাকা দিতে ভুল হ'তে পারে না? কমলা সেজে-গুজে ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে এসে দ্যাখে, লম্বা নিচু কাচ-বসানো টেবিলটার ওপর চা তৈরি, তাই তাকে আর-একটু বসতে হয়, ঐ এক পেয়ালা চা আর দুটো বিস্কুটও তার রোজগার। উনি নিজেই চা ঢেলে দেন, তাতে লজ্জা করে কমলার ; সে মেয়ে, এ-সব তারই কাজ,

একদিন মুখ ফুটে ব'লেই ফেললো, 'আমি ঢালবো চা?' 'বেশ, আমাকে একটু পাৎলা দেবেন, দুধ চাই না, আধ চামচে চিনি।' (এই এক অদ্ভুত ব্যাপার, ছবির কাজ যতক্ষণ চলে ততক্ষণ 'তুমি' ছাড়া কিছু বলেন না, কিন্তু তারপরেই সে 'আপনি' হ'য়ে যায়, একজন অল্প-চেনা, প্রায় না-চেনা মানুষ, তাঁর চোখের দৃষ্টিও বদলে যায় তখন।) এক-একদিন চা খেতে-খেতে গুম হ'য়ে থাকেন, ভুরু কুঁচকে, কোনো-একটা পত্রিকা হাতে নিয়েই সরিয়ে রাখেন হয়তো, মাঝে-মাঝে ঠোঁট নড়ে কিন্তু আওয়াজ বেরোয় না, তাকে বিদায় দেন দরজার ধারে শুধু নিঃশব্দে একটু মাথা নেড়ে। অর্থাৎ, সেদিন কাজ তেমনি এগোয়নি, বা পছন্দ হয়নি, মেজাজ ভালো নেই। আবার কোনো-কোনোদিন, কাজ মনোমতো হ'লে, তিনি সিগারেট ধরিয়ে হেলান দেন চেয়ারে, এক-আধটু আলাপও করেন তার সঙ্গে, তাকে সিঁড়ির মাথা অবধি এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'আচ্ছা, পরশু আবার দেখা হচ্ছে তাহ'লে।' এ-রকম দিনে কমলা সাহস পেয়ে তাঁকেও দু-একটা কথা জিগেস করে। 'এত ছবি—সব আপনার আঁকা?' 'হ্যাঁ প্রায় তা-ই।' 'নিশ্চয়ই আরো অনেক ছবি আছে আপনার?' 'তা আছে।' 'আপনি কি সারাদিন ধ'রে আঁকেন শুধু?' 'তা, একরকম তা-ই। মাঝে-মাঝে একটু পড়ি, রেকর্ড শুনি, কিন্তু ছবি আঁকাই আমার কাজ। আর-কিছু করি না।' 'বেবোন না কখনো?' 'দিনে দু-বার বেরোতেই হয়—খাবার জন্য।' 'এখানে রান্নাব ব্যবস্থা নেই বুঝি?' 'আছে, কিন্তু আমি তো হাজার হোক বাঙালি মায়ের ছেলে, রাঁধতে শিখিনি। তার তাতে সময়ও নষ্ট।' 'রোজ বাইরে খেতে ভালো লাগে আপনার?' 'তা মন্দ কী। বহুদিন প্যারিসে কাটিয়ে ওটাই অভ্যেস হ'য়ে গেছে।' 'আপনার কেউ নেই কলকাতায়—আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব?' 'নেই তা নয়, তবে—ঐ আরকি।' 'আপনার বাঙালি রান্না খেতে ইচ্ছে করে না?' 'করে বইকি, কিন্তু এ-পাড়ায় কোথায় পাবো মাছের ঝোল-ভাত?' 'আমি, আমি খুব ভালো রাঁধতে পারি না, কিন্তু বলেন তো একদিন অন্য সময়ে এসে—' 'না, না, আপনি কেন কষ্ট করবেন আমার জন্য? আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।' 'আমি বাড়ি থেকেও রেঁধে আনতে পারি—' এই কথাটা বেধে যায় কমলার মুখে, আরো অনেক কথা ঠোঁটের কাছে মিলিয়ে যায়। এই আলাপ—একে কি আর আলাপ বলে! 'কেউ নেই তা নয়, তবে—ঐ আরকি—' এমনি সবটাতেই—আধখানা ব'লে চেপে যাওয়া, যেটুকু না-বললে অভদ্রতা হয় ঠিক সেটুকুই, তাব বেশি কিছু না, ভাবটা যেন তোমাকে মডেল করেছি ব'লে কি গল্প করা যায় তোমার সঙ্গে! মাঝে-মাঝে হাসেন—কিন্তু সব সময় ভাবটা যেন কোনো শিশুর অর্থহীন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। সে মনে ব্যথা পায়, তা বোঝেন না পর্যন্ত। কত কিছু জানতে ইচ্ছে করে কমলার, প্যাবিস শহর কেমন, কেমন সেখানকার খাওয়াদাওয়া, বাড়ি-ঘরদোর, লোকেরা, মেয়েরা, কেন তিনি অত দূরে চ'লে গেলেন নিজের দেশ আত্মীয়স্বজন সকলকে ছেড়ে, মা-বাবা বোধহয় নেই, কিন্তু ভাই-বোন? অন্য একটি কথা জানার জন্য ম'রে যাচ্ছে কমলা—তিনি কি বিয়ে করেছেন? করেছিলেন কখনো? বিপত্নীক? বাঙালি বৌকে ত্যাগ করেছেন? মেম-বৌয়ের সঙ্গে ডিভোর্স হয়েছে? স্ত্রীকে সঙ্গে আনেননি বোঝাই যাচ্ছে, কিন্তু—কোন দেশের মেয়ে তিনি? নিশ্চয়ই অসাধারণ সুন্দরী, এমন-কিছু কথা নয়, যা জিগেস কবাটা বেয়াদপি—বিয়েতে তো আর চোরাম-চোরাম নেই কিছু, কিন্তু না, মুখে আনতে পারে না, লজ্জা পায়, যেন ভয় করে, সময়ও পায় না, তার কোনো-একটা কথার মধ্যিখানেই হঠাৎ 'আচ্ছা—' ব'লে উঠে পড়েনি তিনি, দরজার ধার থেকে কমলা বোঝে তাঁর মন প'ড়ে আছে ছবিটাতেই, এক্ষুনি আবার ইজেলের সামনে দাঁড়াবেন রং তুলি নিয়ে, সেই একই জায়গায়, একই ঘরে, একই আলোয়—থাকবে না শুধু সে, শ্যামলী—মানে, কমলা। হঠাৎ যেন একটা অদৃশ্য দেয়াল উঠে যায়, খোলা দরজায় খিল পড়ে। অথচ এই মানুষই, সে যখন লজ্জায় ম'রে যাচ্ছিলো, চোখ মেলে তাকাতে পার'ছিলো না, কত মন-ভোলানো সুবচন তাকে শুনিয়েছিলেন—অর্ধ-কালী, দশমীর জ্যোছনা, সত্যবতী—আরো কত কী, যার প্রায় কিছুই সে মনে রাখতে পারেনি, যদিও তখন কেমন মুগ্ধ হ'য়ে শুনে গিয়েছিলো। বুজরুকি, ধাপ্পা, নিজের কাজ হাসিল করার ফন্দি। স্বার্থপর!

১৪

চারটের পরে রাস্তায় যখন বেরোয়, প্রথমে একটা গরমের ঝাপট লাগে কমলার গায়ে, রোদ্দুরে চোখের পাতা মিটমিট করে কয়েকবার। দু-এক মুহূর্ত যেন চিনতে পারে না চৌরঙ্গি রাস্তাটাকে। তারপর হঠাৎ তার পিঠের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বাস্তব জগৎ, ছুটে গিয়ে বাস্ ধরে সে, বাড়ি ফিরে অবনীর জন্য খাবার তৈরি করতে লেগে যায়। আবার সংসার, আবার স্বস্তি। কিন্তু অস্বস্তিও নেই তা নয়। কী ভালোই না হ'তো, যদি সে সব বলতে পারতো অবনীকে, যদি টাকাগুলো দিতে পারতো তার হাতে এনে, মাঝে-মাঝে দু-জনে মিলে কিছু ওড়াতে পারতো। কিন্তু না—শুরুতে যখন বলেনি, তখন এইভাবেই চালিয়ে যেতে হবে শেষ পর্যন্ত। টাকা নিয়ে কয়েকদিন বেশ ভাবনা গেছে তার, প্রথমে একটা ট্রাঙ্কের তলায় লুকিয়ে রেখেছিলো, এখন পাড়ার পোস্টাপিশে রাখছে। অল্পস্বল্প মিশিয়ে দেয় সংসারের টাকার সঙ্গে, চোখে পড়ার মতো নয় সেটা—কিন্তু সে যে ভেবেছিলো নিজে উপার্জন ক'রে অবনীর ভার লাঘব করবে, তা আর হ'য়ে উঠছে কোথায়। আর, যত দিন যাচ্ছে, ততই এই টাকা ব্যাপারটা গৌণ হ'য়ে যাচ্ছে তার কাছে, তার লজ্জা করে আলোক পাল যখন নির্ভুলভাবে একটি এনভেলাপ বাড়িয়ে দেন তার দিকে, এ নিয়ে কী করবে তা ভেবে পায় না। মাঝে-মাঝে ছোটো-খাটো উপহার নিয়ে যায় অবনীর জন্য—অবনী যা খেতে ভালোবাসে এমন কিছু, এক টিন ত্রিপুরার আনারস হয়তো, বা খাঁটি দার্জিলিং-চায়ের প্যাকেট ; আর অবনী যদি মৃদু প্রতিবাদ করে তক্ষুনি বলে, 'তুমি খরচের জন্য ভেবো না, আমি ঠিক চালিয়ে নেবো।' একদিন ঝোঁকের মাথায় একটা ফাউন্টেনপেন এনেছিলো। অবনী লিখে দেখে বললো, 'বাঃ, চমৎকার তো। তুমি কিনে আনলে?' 'আজ একবার পারুলের কাছে গিয়েছিলাম—তোমাকে বলেছিলাম, মনে নেই? আমার ছেলেবেলার বন্ধু—? হঠাৎ এক দোকানে কলমটা দেখে পছন্দ হ'য়ে গেলো।' 'কত দাম নিলো?' এক মুহূর্ত দেরি ক'রে সে জবাব দিলো, 'চেয়েছিলো দশ, আমি দরাদরি ক'রে পাঁচ টাকায় আনলাম।' 'আশ্চর্য! পাঁচ টাকায় এই কলম! ফুটপাতে ফেরি করছিলো বুঝি?' 'হ্যাঁ, রাসবিহারীর মোড়ে।' (আসলে চৌরঙ্গির একটা ছোটো দোকানে পঁচিশ টাকায় কিনেছিলো।) অবনী বললো. 'চোরাই মাল নয় তো? কে জানে কোন পকেটমারের কীর্তি।' 'তুমি বলছিলে তোমার কলমটায় আর লেখা পড়ছে না, তাই ভাবলাম—তুমি কি রাগ করলে এ-জন্য?' 'বাঃ, এতে রাগের কী আছে, আমার তো লাভই হ'লো, যার চুরি গেছে তাকে তো আর ফেরৎ দেয়া যাচ্ছে না। তা তুমি একজন বন্ধু পেয়ে গেলে কাছাকাছি, খুব ভালো হ'লো। সারাদিন একা-একা এই বাড়িতে—নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগে তোমার?' 'এতে আর খারাপ লাগার কী আছে, আজকাল অনেক সংসারই তো শুধু স্বামী-স্ত্রীর।' 'কিন্তু সকলেরই অন্যেরা থাকে আশে-পাশে।' এর উত্তরে কমলা বললো, 'আমি আর কাউকে চাই না, তুমি থাকলেই যথেষ্ট।'

মিথ্যা—কপটতা—প্রতারণা! প্রতিদিন আমি ঠকাচ্ছি অবনীকে, যে-অবনী এত ভালো, এত বিশ্বাসপরায়ণ, এত ভালোবাসে আমাকে। আমি একটা কী? আমি অন্যায় করছি, আমার পাপ হচ্ছে। অবনী আমার স্বামী, আমার সর্বস্ব ; যে কল্পনা করতে পারে না যে আমি তাকে লুকিয়ে এই কাজ করছি, স্পষ্টত তার মতের বিরুদ্ধে, তার অবাধ্যতা ক'রে। যদি সে ঘুণাক্ষরে কখনো টের পায় তাহ'লে কি ক্ষমা করতে পারবে আমাকে? তাহ'লে কি সেই মুহূর্তেই সে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে না, যেখান থেকে সে আমাকে কুড়িয়ে নিয়েছিলো সেই জঞ্জালের স্তূপে? যদি এমন হয় যে একদিন সদর স্ট্রিটের মোড়েই দেখা হ'য়ে গেলো তার সঙ্গে আমার? যদি এমন হয় সে তার নিজের কাজে দেখা করতে এলো আলোক পালের সঙ্গে, আমি সিঁড়িতে তার মুখোমুখি প'ড়ে গেলাম? কী হবে তাহ'লে? তখন আমি সব বুঝিয়ে বলবো তাকে, পায়ে পড়বো, কাঁদবো—আমার কান্না দেখে, কষ্ট দেখে সে ভুলে যাবে। আর সত্যি বলতে, আমি তো অবনীর পাওনার এক কণাও অন্যকে দিচ্ছি না, উনি তো একটি আঙুলের ডগা দিয়েও ছোঁননি আমাকে—অবনীর প্রতি যা-

কিছু আমার কর্তব্য সবই আমি ক'রে যাচ্ছি। যদি তার কোনো ক্ষতি না হয়, যদি তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক থাকে, তাহ'লে এটা দোষের হবে কেন? আর তাছাড়া—এই ছবি, মডেল, আর্টিস্ট, এ-সব মন্ত্র অবনীই দিয়েছিলো আমার কানে ; সে-ও আর্টিস্ট হ'তে চাচ্ছে, অথচ এ-ব্যাপারে আমাকে যদি বাধা দেয় তাহ'লে তারই বা কাজে আর ব্যবহারে মিল কোথায়?

মাঝে-মাঝে কমলা ভাবে, সে বোধহয় বড্ড বেশি সাহস করছে, তার ছেড়ে দেয়াই উচিত, এক্ষুনি, কাল থেকেই।... আচ্ছা, আর একটা দিন দেখা যাক, তারপর না-হয় ওঁকে ব'লে, বুঝিয়ে, কিছু ব্যবস্থা করা যাবে। ওঁর কাছে সে নাম ভাঁড়িয়েছে, কোনো ঠিকানা দেয়নি, উনিও তাকে বিশ্বাস করেছেন, ওঁর প্রতিও কিছু দায়িত্ব আছে তার। কিন্তু একদিনও মুখ ফুটে কিছু বলা হয় না ; মনেও থাকে না, সত্যি বলতে। সোম, বুধ, শুক্কুর—সপ্তাহের এই তিনদিন তার মন যেন সকাল থেকে উতলা, আড়চোখে ঘড়ি দ্যাখে বার-বার, অবনী তার সময়মতো বেরিয়ে যায়, কমলার অবাক লাগে যে এতক্ষণে মাত্র সাড়ে-এগারোটা...পৌনে বারোটা। তারপর, একটু যত্ন নিয়ে সেজে, অবনীর দেয়া তিনখানা ভালো শাড়ির একখানা প'রে, অবনীর দেয়া ব্যাগটি হাতে নিয়ে, গুটিগুটি পায়ে রাস্তায় বেরিয়ে ট্রাম ধরে কমলা। সেই ঘর যেন চুম্বকের মতো টানে তাকে, আর সেখানে ঢোকামাত্র—সেই দু-ঘণ্টা ক'রে সময়—সে সব ভুলে যায়, নিজেকে সুদ্ধু ভুলে যায়। কেমন-একটা ঘোর নামে যেন, সুরে আর সুগন্ধে মেশা, কোনো ভাবনা নেই তার, কোনো কষ্ট নেই, নদীর ওপরে নৌকোর মতো এই সোফাটা, তাকে কুয়াশার মতো ঘিরে আছে সুর, জলের তলায় মাছের মতো সে নির্মল। দুলছে নৌকো খুব আস্তে যমুনার জলে, একটু-একটু কেঁপে উঠছে সে, ঝড় হ'য়ে যাবার পরে গাছের ডালপালার মতো। মুনি তাকে ছেড়ে চ'লে গেছেন, কিন্তু তাঁর তৈরি কুয়াশা এখনো কাটেনি! কে? সত্যবতী। অনেক, অনেক আগেকার কথা, এক গল্প-কথা, বানানো। না—আজকের—এই মুহূর্তের—গল্প নয়, সত্যি। এখনো সেই কুয়াশা কাটেনি। সব ঝাপসা, শুধু সময়ের গর্ভে গোপন এক নৌকো, আর নৌকোর ওপরে—স্পষ্ট, উজ্জ্বল—কমলা নয়, শ্যামলীও নয়—সত্যবতী। না—সত্যবতী নয়, শ্যামলী—শ্যামলী নয়, কমলা। কেমন হবে মুখের ভাবটি তার? কোন আশা, কোন উৎকণ্ঠা, কোন রহস্য ফুটবে সেখানে—সেই আশ্চর্য মুহূর্তটিতে, যখন সে বুঝতে পারছে না কী হ'লো, কী হ'তে চলেছে, হঠাৎ এই পদ্মফুলের গন্ধই বা কেন। এ কি তবে আমারই দেহের সুবাস, যা ঘুরছে আমাকে ঘিরে-ঘিরে, আদরের মতো , এ কি তবে আমারই মনের তন্দ্রা—যা ঝ'রে পড়ছে, খুব মৃদু, খুব কোমল, দূর-থেকে-শোনা ঝিমঝিম ঝর্নার মতো, সুর হ'য়ে? কুয়াশা পেরিয়ে কতদূরে তার বাবার বাড়ি, বাবা জাল নিয়ে নদীতে যাচ্ছেন, কাঁধে চাদর ফেলে ছাত্র পড়াতে যাচ্ছেন, মাদারিপুর, উঠোনে সেই হলদে কুকুরটা, মা কুটনো কুটছেন রান্নাঘরের দাওয়ায় ব'সে, ঠাকুমা স্নান সেরে এলেন তামার ঘটিতে পুজোর জল নিয়ে, বলাই কোত্থেকে ছুটে এসে বলছে, 'দ্যাখো দিদি, কী কচি তালশাঁস!' জলে ডুবে মরেনি বলাই, কেউ মরেনি, হারিয়ে যায়নি, সব ঠিক আছে। সে পারে, ইচ্ছে করলেই পারে সেখানে ফিরে যেতে, তার ছেলেবেলায়, সেই নদীর ধারে সবুজ গাছপালার মধ্যে—কিন্তু না, আমাকে একটু সময় দাও, এটা অন্য এক নদী, এই নৌকো আর কুয়াশা এখন আমারই জন্য, আমি এদের ছাড়তে পারি না। তোমরা ভালো থেকো, আমি তোমাদের ভুলিনি।

মিনিটের পর মিনিট : সে তাকিয়ে থাকে, তাকিয়ে দ্যাখে। তেকোনা জাঁদের মুখ, টান, গম্ভীর, কখনো বা মূর্তির মতো নিশ্চল, আবার কখনো ঠোঁটের কোণে হাসি—আর তুলি-ধরা হাতের বড়ো-বড়ো জোরালো ভঙ্গি, ওপর থেকে নিচে, নিচে থেকে ওপরে, আড়াআড়ি, কোনাকুনি, যেন যুদ্ধ চলছে অদৃশ্য কোনো শত্রুর সঙ্গে। মাঝে-মাঝে থামেন, কপালে রেখা পড়ে, পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে যেন দোলেন একটু, পেছিয়ে যান, এগিয়ে আসেন, অদ্ভুত সব মুখভঙ্গি করেন—আবার কখনো তাঁর ডান হাত ছাড়া কিছুই নড়ে না। আর তাঁর দৃষ্টি—কী তীক্ষ্ণ, যেন বুকের মধ্যিখান দিয়ে ফুঁড়ে যাবে আমাকে। মাঝে-মাঝে ব্যস্ত হাতটি অলস হ'য়ে ঝুলে থাকে; আস্তে-আস্তে ছোটো

হ'য়ে যায় চোখ, প্রায় বুজে যায়, জেগে থাকে শুধু আলপিনের মাথার মতো দুটি ঝকঝকে বিন্দু, একবার আমার দিকে, একবার ছবির দিকে, একটু পরে সম্পূর্ণ বড়ো হ'য়ে খুলে যায়, তারপর হঠাৎ যেন প্রাণ ফিরে পায় তুলি-ধরা হাতটা, লাফিয়ে উঠে ছোবল মারে ক্যানভাসে। কিছু-একটা জন্ম নিচ্ছে, কিছু-একটা হ'য়ে উঠছে—এক মুনি আর এক জেলের মেয়েকে নিয়ে, এই জগৎ-হারানো নির্জনতায়। আমি বেরিয়ে এসেছি আবরণ থেকে, নিজের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছি—আমি এখন অন্য কেউ, লজ্জার অতীত, ভালো-মন্দের বাইরে। আমার কোনো অসুবিধে নেই আর। জলের তলায় মাছের মতো আমি নির্মল, আকাশে ওড়া পাখির মতো আমি স্বাধীন। উনি যেদিকে তাকাতে বলেন তাকাই, যে-ভাবে থাকতে বলেন থাকি। কিন্তু যখনই তাঁর চোখে চোখ পড়ে মনে হয় তিনি আমাকে পেরিয়ে অন্য কিছু দেখছেন ; যাকে তিনি খুঁজছেন ঐ ছুঁচের মতো তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে, সে যেন লুকিয়ে আছে কোনো দেয়ালের কোণে, পর্দার ভাঁজে—কিংবা যেন দেয়াল-টেয়াল কিছু নেই আর, ধূ-ধূ দূরে দৃষ্টির তীর ছুঁড়ে দিয়েছেন। কখনো বা তাঁর চোখ দেখে মনে হয় তাঁব ঘুম পেয়েছে, তাঁর সামনে যা-কিছু আছে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, খোলা চোখে স্বপ্ন দেখছেন। অনেক সময় তুলি নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে দ্যাখেন আমাকে, বুকের ওপর দু-হাত ভাঁজ ক'রে , আবার কখনো যেন ভুলে থাকেন আমার অস্তিত্ব, আমি দেখতে পাই শুধু তাঁর মুখের আধখানা, আর হাতের ভঙ্গি। কিন্তু—তিনি যা-ই করুন—আমাব মন একই রকম আচ্ছন্ন, আমাব নৌকো একই ভাবে দুলছে, তেমনি সুর, তেমনি সুবাস—যতক্ষণ না চারটে বাজে, আর আমি আবার ফিরে পাই আমার শায়া শাড়ি ব্লাউজ, ফিরে যাই আমার সাধারণ সাংসারিক আমিত্বে।

১৫

যেদিন তাকে সদর স্ট্রিটে যেতে হয় না, সে-দিনটা কেমন ফাঁকা লাগে কমলার। মাঝে-মাঝে সেই মস্ত মোটা বইগুলোব পাতা ওল্টায়, যা থেকে অবনী তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলো কাকে বলে 'সত্যিকাব' ছবি। ইংরেজি লেখা প'ড়ে ওঠার মতো বিদ্যে অবশ্য তার নেই, কিন্তু ছবি দেখে-দেখেই বেশ সময় কাটে, বার-বার দেখেও পুরোনো মনে হয না, কখনো এমন-কিছু চোখে প'ড়ে যায়, যা আগে লক্ষ করেনি। আর ছবির ঐ মেয়েরা—যদিও অন্য দেশের, বহু দূব দেশের, কমলাব সঙ্গে জাতে গোত্রে কিছুই মেলে না, তবু যেন তাদের সঙ্গে এক ধরনের আলাপ চলে তার, একটা গোপন কানাকানিব মতো। হঠাৎ একদিন ওরই একটা বইয়ের ভেতর থেকে অন্য একটা ছবি বেরিয়ে পড়লো—চিনতে এক মুহূর্ত দেরি হ'লো না, তারই ছবি, অবনীর আঁকা। তখন তারা সবেমাত্র হাজরা রোড থেকে টালিগঞ্জে উঠে এসেছে ; থোকে কিছু টাকা পেয়ে অবনী তার জন্য কিনে এনেছিলো একখানা তুঁতে রঙের সিল্কের শাড়ি, আর একটা নকল পাথরের মালা, তাকে জোর করেছিলো তখনই ও-সব পরার জন্য। 'সুন্দব দেখাচ্ছে তোমাকে। একটু বোসো তো চুপ ক'রে, তোমার একটা পোর্ট্রেট আঁকি।' —কিন্তু খানিক পরে অন্য এক জোয়ারে তাবা ভেসে গিয়েছিলো—সুখ, ভালোবাসার সুখ, শরীর নিয়ে বেঁচে থাকার সুখ।

ছবিটা অনেকক্ষণ ধ'রে দেখলো কমলা, অবনীব দাড়ি কামাবার গোল আয়নাটা হাতে নিয়ে মিলিয়ে দেখলো নিজের সঙ্গে। আশ্চর্য মিল, কার ছবি তা ব'লে দিতে হয় না—যদিও আধ ঘণ্টার বেশি সময় হয়তো দেয়নি অবনী। হঠাৎ কমলার মনে হ'লো অবনী যেন আর ছবির কথা বেশি বলে না আজকাল, কেমন বিমনা হ'য়ে থাকে, চিন্তিত। না কি আমিই আর তেমন মন দিচ্ছি না তার দিকে? সেদিন আমি খুব যত্ন ক'রে ঘর গোছালাম, একটি নতুন সুজনি পেতে দিলাম তক্তাপোশে, বিকেল পড়তে নিজে গা ধুয়ে, চুল বেঁধে পরলাম সেই তুঁতে রঙের শাড়ি আর নকল পাথরের মালাটি। ক্লান্ত চেহারা নিয়ে ফিরে এলো অবনী, এক পলক তাকিয়ে বললো, 'বেরিয়েছিলে নাকি?'

'না তো। বেরোবো কোথায়। আজ একটা জিনিশ খুঁজে পেয়েছি, জানো। এই দ্যাখো।' 'ও, সেইটে?' প্রথমে একটু উদাসভাবে ছবিটায় চোখ ফেললো সে, পরমুহূর্তে ভালো ক'রে তাকালো আমার দিকে, তারপর ছবিটা হাতে নিয়ে সেটার ওপর ঝুঁকে পড়লো। আমি বললাম, 'ছবিটা খুব জীবন্ত হয়েছে, তা-ই না? আমি হঠাৎ দেখে চমকে উঠেছিলাম। সত্যি—কী চমৎকার আঁকো তুমি!' 'না, না,' অবনী ছবিটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালো, 'এটা ঠিক হয়নি, আমি অন্য রকম ভেবেছিলাম, অন্যভাবে আঁকতে চেয়েছিলাম।' আমি জোর দিয়ে বললাম, 'কেন ঠিক হয়নি বুঝিয়ে দাও। আমার তো খুব ভালো লাগছে।' 'কী আশ্চর্য—ওটা তোমাব ছবি হয়নি, শাড়ির ছবি হয়েছে—তাও বোঝো না? অমন হেলাফেলা ক'রে কি আর ছবি হয়! একদিন, দেখো, তোমার এমন একটা পোর্ট্রেট আঁকবো—কিন্তু সময় লাগে, ও-সবে বড্ড সময় লাগে—সত্যি, কী-ভাবে দিনগুলি কেটে যাচ্ছে আমার—নাঃ, এ-সব বাজে কাজ আমাকে ছেড়ে দিতেই হবে।' 'তা-ই দাও, অবনী, সব ছেড়ে দাও, টাকার কথা ভেবো না, আমার কথা ভেবো না, তোমার প্রাণ যা চায় তা-ই কবো।' আমার গলার তীব্র সুরে অবনী যেন একটু অবাক হ'লো, ঝাপসা হেসে জবার দিলো, 'কী যে বলো! তোমার কথা ভাববো না তা কি হ'তে পারে?' একটু চুপ ক'রে থেকে অন্য রকম গলায় বললো. 'শোনো, কমলা, একটা কথা আছে। ওদিকে আমার মা এক মুশকিলে ফেলেছেন আমাকে।' 'কী-রকম?' 'আমার খুড়োমশাই নাকি একটা ভালো চাকরি জোগাড় করেছেন আমাব জন্য। আব তাছাড়া—' অবনীর গলায় বিদ্রূপ ফুটলো এবার—'আমার জন্য একটি মেয়েও দেখেছেন তাঁরা—একেবারে চমৎকা-র পাত্রী!' আমি অবাক হ'য়ে গেলাম যে শেষের কথাটা শুনে আমার বুকের মধ্যে কাঁপুনি উঠলো না, শান্তভাবে বললাম, 'তাঁদেব দিক থেকে ঠিক কাজই করেছেন।' 'আশ্চর্য! ওঁরা কি এখনো ভাবেন আমি ওঁদের হাতের পুতুল? সে জন্যেই কি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি? আমি মা-কে সাফ ব'লে দিয়েছি আমার পাত্রী আমি নিজেই ঠিক কবেছি, তাঁবা যেন ও নিয়ে মাথা না ঘামান। সব বলিনি এখনো, কিন্তু আব বেশি দেরি করাও চলবে না। একটা যুদ্ধ চালাতে হবে আমাকে, তারই জন্য মনে-মনে তৈরি হচ্ছি। যদি তাঁরা কিছুতেই তোমাকে ঘরে না নেন, জীবনে আর ও-মুখো হবো না! চাকরি দিয়ে ওঁরা লোভ দেখাচ্ছেন আমাকে, কিন্তু—' হঠাৎ থেমে গেলো অবনী, একটু নিচু গলায় বললো, 'চাকরিটা এক পাব্লিসিটি ফার্মে, খোদ কর্তা আবাব কাকাব মক্কেল। সাড়ে-সাতশোতে শুরু। তাই ভাবছিলাম। —কিন্তু আবার সেই বিজ্ঞাপনের ছবি! না, কিছুতেই না! তাব ওপর আবার কাকার সুপারিশে, যে-কাকা আমাকে—কিছুতেই না! আমাকে মনস্থিব করতে হবে, মনস্থির করতে হবে।' আমি উঠে গিয়ে চা আর খাবার নিয়ে এলাম ; অবনীর ওপর একটা নতুন ধরনের মমতা জাগলো আমার মনে, তার মন হালকা করাব জন্য বললাম, 'চলো আজ রাত্রে একটা ফিল্ম দেখে আসি।'

পরের দিন আমি যখন সদর স্ট্রিটে পৌঁছলাম তখন দুটো বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি। বেয়ারা বললে সাহাব আভি আয়েগা, আমাকে স্টুডিও খুলে দিলো। ঐ মস্ত বড়ো ঠাণ্ডা সুন্দর ঘবটায় এই প্রথম একলা আমি। আমার কৌতূহল হ'লো ঘুরে-ঘুরে একটু দেখি। বড়ো ছবি, যেটা আঁকছেন এখন, সেটাতে ঢাকনা পরানো আছে—কাজ থামানোমাত্র ওটাকে ঢেকে দেন উনি, কেমন-একটা হিংসের ভাব, বুড়ো স্বামী যেমন যুবতী স্ত্রীকে লুকিয়ে রাখে, তেমনি। দেয়াল-বরাবর লম্বা টেবিলে অনেক বই আর কাগজপত্রের স্তূপ, আমি সেখানে এসে দাঁড়ালাম। টেবিলের ওপর, ঠিক আমার চোখের সামনে, এক তাড়া ছবি। স্কেচ, মোটা কাগজের ওপর আঁকা—পেন্সিলে, কালিতে, রঙিন পেন্সিলে, কোনোটা শুধু রেখা, কোনোটায় আলো-ছায়াও আছে। নগ্ন যুবতী, আঁটো নিটোল শরীর তার, লম্বা কালো চুল—কত ভাব, কত ভঙ্গি, শুয়ে, ব'সে আধো শুয়ে, মুখোমুখি, আড়াআড়ি, পেছন থেকে, মুখ ফিরিয়ে, মুখ লুকিয়ে, মুখে হাসি বিষাদ কৌতুক বিস্ময় বেদনা—যেন একটা লম্বা গল্প বলা হচ্ছে, ভাঁজে-ভাঁজে খুলে যাচ্ছে কারো জীবন, মন, মনের ভাবনা। এই যে, একটা নৌকোও দেখা যাচ্ছে—বাঁকা জল, বাঁকাচোরা নৌকো, আঁধার-মতো, অনেক দূরে আকাশ নুয়ে

পড়েছে জলের ওপর—ছবির পর ছবিতে মেয়েটি যেন বদলে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে : কখনো তাকে মনে হয় জলকন্যা, কখনো কোনো অদ্ভুত গাছ যা সমুদ্রের তলে বেগনি আর হলুদ রঙের ফুল ফোটায়, কখনো এক ফুলে-ওঠা ঢেউ যা একটু পরেই নিজের ফেনায় মিলিয়ে যাবে, আর কখনো যেন কাঠের শক্ত পাটাতনের ওপর এলিয়ে থাকে এক অন্তহীন অতি কোমল আকাঙ্ক্ষা। এগুলো তাঁর আসল ছবিরই নকশা তাহ'লে, নাটকের আগে রিহার্সেলের মতো? হঠাৎ একটি ছবিতে আমি নিজের মুখের আদল পেলাম, আর-একটাতে —পর-পর অনেকগুলোতে। তবে কি এই ছবিগুলো আমারই, আমাকেই আঁকা হয়েছে? এই ছবির মেয়েটার শরীর—তা কি আমার? ঐ মেয়েটা, সে কি আমি? কিন্তু অবনী যেটা এঁকেছিলো সেটাতে আমাকে কত বেশি চেনা যায়। 'ওটা শাড়ির ছবি হয়েছে, তোমার ছবি হয়নি।' কিন্তু এটাও তো ঠিক আমার ছবি নয়। আমি—অথচ আমি নই ; আমারই মতো, অথচ আমাকে ছাড়িয়ে কোন দূরে চ'লে গেছে : মায়াবিনী, তুমি কে?

'ওখানে কী করছো, শ্যামলী?' —গম্ভীর গলা শুনলাম আমার পেছনে, কেঁপে স'রে এলাম। তিনি এগিয়ে এসে গুছিয়ে রাখলেন ছবিগুলো, আমার দিকে না-তাকিয়ে বললেন, 'এই টেবিলে হাত দিয়ো না।' তারপর একটু হালকা গলায়, 'এসো, কাজ শুরু করা যাক। আমার একটু দেরি হ'য়ে গেলো।' আমি কথা না-ব'লে চ'লে এলাম পর্দা-ঘেরা ড্রেসিংরুমে, উজ্জ্বল আলো জ্বেলে মস্ত লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়ালাম, আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এলাম জামা-কাপড় থেকে। প্রথম বার, জীবনে এই প্রথম বার নিজেকে দেখলাম, তাকিয়ে দেখলাম আযনার মধ্যে, মাথার চুল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত, উন্মোচিত, সম্পূর্ণ। অন্যদিন কোনোমতে আলখাল্লার মতো জামাটা জড়িয়ে বেরিয়ে আসি, তারপর নিজেকে ভুলে যাই (অন্তত তা-ই মনে হয় আমার), কিন্তু সেদিন আমি দেরি করলাম, যেন চোখ ফেরাতে পারছি না আয়না থেকে, মনে হচ্ছে এ তো আসলে ভুলে যাওয়া নয়, খুঁজে পাওয়া। নিজেকে খুঁজে পেলাম আমি, এতদিনে, জানলাম এই শরীরটা আমার অপরাধ নয়, গৌরব, জানলাম আমি সুন্দর—হ্যাঁ, আমি। কিন্তু সেই ছবির মেয়েটা : তার তুলনায়? কী আছে তার—কিন্তু কিছু কি নেই, যা আমার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না, আমার মধ্যে খুঁজে পাবো না কোনোদিন? কিন্তু—সে তো ছবি, শুধু ছবি, তার রূপ তো ভেল্কি, ভানুমতীর খেল —চোখে দেখে যতই না সত্যি মনে হোক। যা শুধু ও-রকম ব'লে 'মনে হয়', আর যেটা আসলেই তা-ই : এ-দুটোতে কত বড়ো প্রকাণ্ড তফাৎ! আমরা মেঘের মধ্যে দৈত্য দেখি কত সময়, ফাটা দেয়ালে মানুষের মুখ দেখতে পাই—ছবিও তেমনি, তা ছাড়া আর কী। কিন্তু আমি—শ্যামলী, শ্যামলী সিংহ—আমি বেঁচে আছি, আমার নিশ্বাস পড়ছে, আমাকে ছুঁলে টের পাওয়া যাবে তাপ, কোমলতা, শিহরন ; যা-কিছু ঐ অন্যজনে শুধু 'দেখানো' হচ্ছে , তার প্রাণপাখি লুকিয়ে আছে আমারই খাঁচায়। আমার গর্ব হ'লো, জয়ী মনে হ'লো নিজেকে, আর তারপরেই, আমাকে যেন বিদ্যুতের মতো ফেঁড়ে দিয়ে, আমার মনের মধ্যে লাফিয়ে উঠলো সেই পাপচিন্তা। আমি শিউরে উঠে স্তব্ধ হলাম, নড়তে পারলাম না।

—উনি, ঐ যে আলোক পাল না কী নাম, উনি কি মানুষ? উনি কি পুরুষ? ওঁর কি রক্তমাংসের শরীর আছে, না কি নেই? ঐ সব ঘেন্নার ব্যাপার, অম্বু, আর দোলন যাদের কথা বলেছিলো, আর ট্রামে-বাস্-এ বিতিকিচ্ছিরি এক-একটা লোক, যেন ছুলুম-ছুলুম কী ক'রে ছুঁয়ে দেবে, ভিড়ের সুযোগে হুমড়ি খেয়ে পড়বে গায়ের ওপর, নোংরা, গা-ঘিনঘিন করে ভাবতে—কিন্তু তাতেও তো বোঝা যায় ঐ একটা লোভ পুরুষের কী ভীষণ উগ্র ('শ্বশুর ভাসুর কাউকেই বিশ্বাস নেই'), যার জন্য একেবারে বুড়ো হ'য়ে না-যাওয়া পর্যন্ত অত সাবধানে থাকতে হয় মেয়েদের। কিন্তু উনি—জিগেস করি, উনি কি পাথর? রোজ দেখছেন আমাকে, সপ্তাহে তিনদিন, দু-ঘণ্টা ক'রে —যে-ভাবে কেউ আমাকে দ্যাখেনি কোনোদিন (না, অমন উজ্জ্বল আলোয় অবনীও না), যে-ভাবে আমি নিজেও নিজেকে আজকের আগে দেখিনি। দেখছেন, আর আঁকছেন : আঁকছেন, আর দেখছেন—আর-কিছু না, কিছুই না, অথচ কী অসহায় আমি এখানে, কী নীরব নির্জন এই স্টুডিও, জগৎ-সংসারের বাইরে। তীক্ষ্ণ চোখ, ছোটো-হ'য়ে-যাওয়া, ঝকঝকে ছুঁচের মতো, ছুরির মতো—

কাকে দেখছেন সেই চোখ দিয়ে? কী দেখছেন? রোগীর পেট চিরে ফেলে ছুরি হাতে নিয়ে ট্যুমারটা পরীক্ষা করছেন ডাক্তার— তেমনি। যেন আমি একটা জিনিশ, গাছের গুঁড়ি, শামুকের খোলা বা কোনো অদ্ভুত সামুদ্রিক জীব বা আলপিনে-বেঁধা চিত্র-বিচিত্র প্রজাপতি। অপমান — অসহ্য অপমান। এমন অপমান কখনো কেউ করেনি আমাকে —শান্তি মাসি না —না, আমি চীৎকার ক'রে বলবো এ কথা —অম্বুও না। অম্বু অন্তত স্বীকার করেছিলো আমার অস্তিত্বটাকে। আর এঁর কাছে —রং তুলি পেন্সিল ক্যানভাস, তেমনি আর-একটা সামগ্রী হলাম আমি। একটা পদার্থ বলতে গেলে জড়পদার্থ, তাকে উনি খেয়াল-খুশিমতো ব্যবহার করবেন। একটা জ্যান্ত মানুষকে নিয়ে এ রকম খেলা যে খেলতে পারে তার মতো অমানুষ আর কে আছে।

সেদিন যেন নতুন ক'রে লজ্জা হ'লো আমার—না লজ্জা নয়, রাগ, আক্রোশ। সেই মেরুন সোফাটায় আর আমার স্বস্তি নেই , নৌকো, জল মুনি, সত্যবতী, সব অর্থহীন হ'য়ে গেছে, আমি আর ভুলে থাকতে পারছি না নিজেকে, আমার এই শরীরটাকে। আমি তাকাতে পারছি না আমার বুকের মধ্যে ঝড় উঠছে, বিদ্রোহ করছে আমার শরীরের প্রতি রক্তকণা। আমার একটা জীবন ছিলো আছে, মোটের ওপর সুখের জীবন বলা যায়, অন্তত সুস্থ, স্বাভাবিক —সেটাকে, জিগেস করি সেটাকে উনি তছনছ ক'রে দিলেন কেন? আর আমিই বা কেন ঐ ক্ষমতা দিলাম তাঁকে, কেন আমার এমন অবস্থা হ'তে দিলাম যে প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারি না? না— আমি চুপ ক'রে থাকবো না—আমি প্রতিশোধ নেবো। ওৎ পেতে থাকবো কোনো দুর্বল মুহূর্তে আলোক পালকে ধ'রে ফেলার জন্য। একবার—অন্তত একবার আমি দেখতে চাই যে উনি পাথরে তৈরি নন ওর শরীরেও রক্ত-চলাচল করে। না —আমি ওঁর ছবি হ'তে চাই না, জগতের সব ছবির চাইতে আমার কাছে বেশি মূল্যবান কী? মনে মনেও এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারি না যেন আঁৎকে উঠে থেমে যাই হঠাৎ।

একটা ইচ্ছে ন'ড়ে উঠলো আমার মনে, দেখতে-দেখতে বেড়ে উঠলো জাদুকরের তৈরি গাছের মতো। তা ই করবো? তা ই করতে হবে। কখনো তো নির্দিষ্ট তিনটি দিনে ছাড়া দেখিনি তাকে কখনো তো এমন কোনো অবস্থায় দেখিনি যখন তিনি তাঁর ছবিতে বুঁদ হ'য়ে নেই। হঠাৎ গিয়ে পড়লে কেমন দেখবো? নিশ্চয়ই অন্য সময়ে তিনি সাধারণ মানুষ—অন্য সকলেরই মতো? ছল ছুতোর অভাব নেই বলা যায় আমার স্বামী শিলিগুড়িতে বদলি হলেন,' আমি আর আসতে পারবো না (তখন তাঁর মুখের চেহারা কেমন হবে?) এমনকি, একটু সাহস ক'রে, সত্যি কথাটাই বা বলা যাবে না কেন, 'হঠাৎ খুব ইচ্ছে করলো' (তখনই বা তাঁর মুখের চেহারা কেমন হবে?)। সেদিন বেস্পতিবার ছিলো, আমার যাবার কথা নয়- এ-ই সুযোগ। আমি বেশিক্ষণ ভাবলাম না পাছে ঝোঁকটা কেটে যায়, আমার মনে হ'লো বাস্ যথেষ্ট জোরে চলছে না, কিন্তু অবশেষে এলো ম্যুজিয়মের মোড়। সদর স্ট্রিটে ঢুকে কয়েক পা মাত্র হেঁটেছি, এক আশাতীত দৃশ্যে আমার চলা থেমে গেলো। উনি বেরোলেন বাড়ি থেকে, একা নন— সঙ্গে একটি—মহিলা, মেয়ে, স্ত্রীলোক, কী বলবো জানি না। খুব কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি দু-জনে, আস্তে হাঁটছেন, ঠোঁট নড়ছে, ঠোঁটে-চোখে হাসি। আমি একটা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালাম, ওঁরা কাছে এলেন, আমি আমার চোখের সবটুকু শক্তি দিয়ে দেখতে লাগলাম অন্যজনকে —ছাঁটা চুল, প্রসাধন একটু উগ্র ধরনের, শাড়িটা এমন ক'রে প্যাঁচানো যেন গা ফেটে যাবে। বয়স পঁচিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে যে কোনো একটা হ'তে পারে, বাঙালি না ফিরিঙ্গি না অন্য কোনো জাতের, তাও বোঝার উপায় নেই। আমার কানে দু-একটা কথা এলো —ইংরেজি —না, বোধহয় ইংরেজিও নয়, অন্য কোনো ভাষা যা আমার একেবারেই অচেনা। হঠাৎ আলোক পাল দেখতে পেলেন আমাকে —না, ওকে দেখতে পাওয়া বলে না, চলা না-থামিয়ে আধখানা চোখে তাকালেন কি তাকালেন না, ওপর থেকে নিচে ইঞ্চিখানেক নামলো তাঁর মাথা। অর্থাৎ, 'ভবসংসারে তোমার অস্তিত্ব আছে তা স্বীকার করছি।' চৌরঙ্গির মোড়ে ট্যাক্সি নিলেন ওঁরা, আমি দাঁড়িয়ে রইলাম একটুক্ষণ। কেন আমি এ-রাস্তায়, তাঁরই কাছে আসছিলাম কিনা —তাও কি মনে হ'তে নেই? একটা কথাও কি বলা যায় না সেই মানুষটার সঙ্গে, যাকে অতক্ষণ ধ'রে অমনভাবে তিনি দুই

চোখে লুঠ ক'রে নেন? —মিথ্যাবাদী! সারাদিন শুধু ছবি আঁকেন! ঘরে ব'সে থাকেন! কারো সঙ্গে মেলামেশা নেই! মিথ্যাবাদী! জোচ্চোর! সেদিন রাত্রে অবনীর বুকে মুখ চেপে কেঁদে ফেললাম আমি, সে অস্থির হ'য়ে উঠলো আমার কী হয়েছে তা জানবার জন্য, তাইতে আরো উদ্বেল হ'লো আমার কান্না। 'কেঁদো না, কমলা, কেঁদো না,' আমাকে আদর ক'রে-ক'বে বলতে লাগলো সে, 'আমি বুঝতে পারি তোমার কষ্ট, আমিও মানি বিয়েটা এবার হ'যে যাওয়া দরকার, মা-কে আমি বলবো সব কথা— শিগগিরই —কালই —এই টানাটানিও আর ভালো লাগছে না আমার, আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে, এবারে সব ঠিক হ'য়ে যাবে।' আমি শান্ত হবার পরে বললো, 'জানো, সেই চাকরির কথাটা এখনো ধ'রে ব'সে আছেন ওঁরা। ভাবছিলাম আপাতত নিয়ে নেবো নাকি। তুমি কী বলো?' সে আমার মুখে যা শুনতে চাচ্ছে তা-ই বললাম আমি, 'ভালো তো। খুব ভালো।' 'তুমি ভালো বলছো?' 'দ্যাখো না কেমন লাগে। পছন্দ না-হ'লে ছেড়ে দিতে তো মুশকিল নেই। আর তাছাড়া —যদি তুমি তোমার সত্যিকার ছবি আঁকতে চাও, তাহ'লে চাকরি ক'রেও কি আর সময় পাবে না?' 'ছবি? আমার সত্যিকার ছবি? কী জানি।' একটু চুপচাপ কাটলো, তারপর হঠাৎ আমি আকুল হ'য়ে ব'লে উঠলাম, 'না—ছবি না, আমি ছবি চাই না, আমি তোমাকে চাই!' বলতে-বলতে তার মাথাটা টেনে আনলাম আমার বুকের ওপর, সে-রাতে তাকে তীব্রভাবে ভালোবাসলাম।

১৬

কিন্তু থাক, কমলা, এ-সব আর কেন, এ-সব আর ভেবো না। দ্যাখো তোমার চারদিকে তাকিয়ে। সন্ধে হ'লো, আলো জ্বলছে, কথায় হাসিতে শাড়ির জৌলুশে রমরমে ঘর, তোমার আত্মীয়া এঁরা সবাই, আজ থেকে তুমি এঁদেরই। কাছে এলো বিয়ের লগ্ন, সারা বাড়ি মুখর, শানাই আরো জোরালো। তুমি বসেছো মেঝের ওপর চিকনপাটিতে, এঁরা তোমাকে গোল হ'য়ে ঘিরে আছেন, তোমাকে সাজানো হচ্ছে। কেয়ূরে কঙ্কণে কুঙ্কুমে চন্দনে। মুখ নিচু ক'রে থেকো না, তাকাও, আর তো তোমার লজ্জা পাবার কিছু নেই। সুখী হও, কমলা, কৃতজ্ঞ হও, তেত্রিশ কোটি দেবদেবীকে প্রণাম করো। এত হাসি, এত আনন্দ, আয়োজন —সব তোমার জন্য। কিন্তু একটু দুঃখও থাকে বিয়ের দিনে যেহেতু মেয়েদের পক্ষে বিয়ে মানে শুধু মিলন নয়, বিদায়, ছেড়ে যাওয়া। সেটুকু কষ্ট, সেটুকু কান্না, তাও নেই তোমার। এক তীর থেকে অন্য তীরে নয়, সমুদ্র থেকে ডাঙায় উঠলে। নয় পদ্মার চর, যা রাতারাতি বন্যায় ডুবে যেতে পারে, নয় কোনো অবিশ্বাসী চোরাবালি, এখন শক্ত মাটি তোমার পায়ের তলায়। ক-টা মেয়ের তোমার মতো ভাগ্য হয়?

আমার মতো ভাগ্য ক-টা মেয়ের হয়? সব পেরিয়ে, সব সত্ত্বেও, আমার জন্য এই সুখ জমা ছিলো। কোথায় আমি নামিয়ে এনেছিলাম নিজেকে, কত নিচে, নয়তো সেদিন একটি স্ত্রীলোকের হাত ধ'রে তাঁকে বেড়াতে দেখে আমার মনে শেল বিঁধবে কেন? কিন্তু শুধু শেলই বেঁধেনি, আশাও জেগেছিলো— এমনি আমার মনের বিকার। একেবারে ব্রহ্মচারী সন্নেসি নন তাহ'লে? তাই, যতই না ধিক্কার দিই নিজেকে, আবার সেখানে না-গিয়ে পারি না। তেমনি, সপ্তাহে তিন দিন। আমি টের পাই আমার রক্ত আমার সারা শরীরে তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে নিশ্বাস ঘন, টের পাই আমার বুকের মধ্যে দুরুদুরু। ভাবি সেই মুনির কথা, যখন নৌকোয় যেতে-যেতে তাঁর চোখ পড়লো জেলেনির ওপর, আকাশের তলায়, রোদ্দুরে মাখা প্রকাণ্ড সেই দিনটিতে। দাঁড় টানছে মেয়েটি, সুন্দর ভঙ্গিতে, তার উঁচু-নিচু শরীরটিকে দুলিয়ে-দুলিয়ে, জলের ছপাছপ শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। আর ভাবি সত্যবতীকে, মুনি যখন কুয়াশায় দশ দিক ঢেকে দিলেন, আর তার পরিশ্রমী সক্ষম শরীরটি অবশ হ'য়ে এলো আস্তে-আস্তে। আমার চোখ নিবদ্ধ হয় তাঁর মুখের ওপর —আশায়, অপেক্ষায়। এমন কি কখনো হবে না যে তিনিও দেখতে পাবেন আমাকে—এই আমার সুন্দর শরীর,

যার খবর আয়না আমাকে জানিয়ে দিয়েছে, যার ভেতরে ধ্বকধ্বক করছে এঞ্জিনের মতো হৃৎপিণ্ড? একদিন তিনি হঠাৎ বললেন, 'তোমার চোখের ভাবটি সুন্দর হচ্ছে আজকাল, এবার আমি পেয়ে গিয়েছি।' আমার চেঁচিয়ে ব'লে উঠতে ইচ্ছে করলো, 'কিন্তু আমি কী পেলাম, দিনের পর দিন চেপে-রাখা দীর্ঘশ্বাস আর বলতে-না-পারা কষ্ট ছাড়া আর কী পেলাম আমি?'

উলুধ্বনি, শাঁখের ফুঁ, সোরগোল, মেয়েদের দল ঢেউয়ে-ঢেউয়ে এগিয়ে আসছে। 'সুন্দর বৌ হয়েছে।' 'মস্ত খোঁপা—ভেতরে ফল্‌স্‌ নেই তো?' 'গড়নপেটন দিব্যি।' 'চোখ ভালো।' বাইরে পুরুষের গলা শোনা গেলো, 'কনেকে নিয়ে এসো, আসরে বর এসে গেছে।' 'এক মিনিট—আর দুটো ফোঁটা দিয়ে দিই—এই ওড়নাটা জড়িয়ে দে তো, বিনু, গাছকৌটো হাতে দিতে ভুলিস না।' 'এই পিঁড়িটায় এবার বসতে হবে, বৌমা —এসো।' আলপনা-আঁকা পিঁড়ি সুদ্ধু তাকে তুলে ধরলো চারটি জোয়ান ছেলে, ছাদে এনে বসিয়ে দিলো। এখানেও ভিড়, উজ্জ্বল আলো, আনন্দ। একপাশে পুরুৎঠাকুর, আর-এক পাশে সম্প্রদান করার জন্য তৈরি হ'য়ে ব'সে আছেন তার দমদমের দাদু। আর তার মুখোমুখি—নতুন বেশে অত্যন্ত চেনা একটি মানুষ। সব আজ নতুন। নতুন একটা জন্মের মতো মনে হচ্ছে, না কমলা? এখন কী এসে যায় তোমার, যদি কোনো-এক আলোক পাল (যাঁকে তুমি বলতে গেলে চেনোই না) অনেক দূরে অন্য শহরে চ'লে গিয়ে থাকেন? কী এসে যায়, যে সারা জীবনে আর কখনো তাঁকে চোখে দেখবে না তুমি?

বিয়ে, তার বিয়ে হচ্ছে। অবনীর সঙ্গে। জীবনের মতো বাঁধা পড়লো তারা, জীবনের মতো। আমি ভালোবাসি অবনীকে, সে আমাকে ভালোবাসে। পুরুৎঠাকুর মন্ত্র পড়ছেন। আমরা হাতের ওপর হাত রেখেছি। এবারে আমি মা হ'তে পারবো, অবনী আর আপত্তি করবে না। আমরা শিগগিরই উঠে যাবো বালিগঞ্জে, অবনী ফ্ল্যাট নিয়েছে সেখানে। আমরা গুছিয়ে বসবো, ঝকঝকে নতুন আসবাব দিয়ে বাড়ি সাজাবো, সোফার সঙ্গে কুশানের আর তার সঙ্গে পর্দার রং মিলিয়ে-মিলিয়ে। শোবার ঘরে রেডিও, খাবার ঘরে রেফ্রিজরেটর। ফ্ল্যাটটা আমাকে দেখিয়ে এনেছে অবনী, চমৎকার। অবনীর ইচ্ছে পর-পর দুটি সন্তান—একটি ছেলে, একটি মেয়ে ; কিন্তু যদি দুটিই মেয়ে হয়, বা ছেলে? তাহ'লে আর-একবার চেষ্টা করতে হবে বইকি। বেশ সুবিধে হয়েছে, ইচ্ছেমতো গোনা-গুনতি সন্তান পাওয়া যায়, ছেলে চাই না মেয়ে চাই সেটা বেছে নিতে পারলেই একেবারে নিশ্চিন্তি হওয়া যেতো। তাও নাকি পাবা যাবে শিগগিরই —কী কাণ্ড! অবনীর আপিশ সাড়ে-ন'টা থেকে সাড়ে-পাঁচটা, পুরো শনিবার ছুটি। আধা-বিলিতি আপিশ, টিকে থাকলে দু-হাজার আড়াই হাজার পর্যন্ত মাইনে হ'তে পারে। আমি দুপুরে শুয়ে-শুয়ে সিনেমা-পত্রিকার পাতা ওল্টাবো, অনুরোধের আসর শুনবো, ঘুমুবো, পাশের ফ্ল্যাটের বৌটির সঙ্গে ভাব হবে আমার, তার স্বামী অবনীর বন্ধু, ফ্ল্যাটের খবর ওরাই দিয়েছিলো। আমার এক অল্প-বয়সী মাস শাশুড়ি থাকেন হিন্দুস্থান রোডে, গড়িয়াহাটে এক পিসতুতো ননদ—তাদের সঙ্গেও ভাব হবে আমার। মাঝে-মাঝে নেমন্তন্ন হবে বাড়িতে—অবনীর বন্ধুবান্ধব, আমাদের আত্মীয়স্বজন, এমনি ভাগ ক'রে-ক'রে। মাঝে-মাঝে আমরা বীডন স্ট্রিটে বেড়াতে যাবো। ছুটি ছাটায় রাঁচিতে। পুরীতে। দার্জিলিঙে। মাঝে-মাঝে ঝগড়া হবে আমার সঙ্গে অবনীর, যেমন সব স্বামী-স্ত্রীতে হয় ; কোনো-এক রাত্রে ঝগড়া মিটে যাবে, যেমন সব স্বামী-স্ত্রীর মিটে যায়। আমার শাশুড়ি বলেছেন ভাগাভাগি ক'রে দু-বাড়িতেই থাকবেন এখন থেকে ; কখনো আমাদের কাছে, কখনো বীডন স্ট্রিটে। আমার খুড়শ্বশুরের ছেলে-মেয়েদেরও বড্ড ভালোবাসেন উনি, ভারি স্নেহশীল মানুষ, আমার খুড়শাশুড়ি তো 'দিদি' বলতে অজ্ঞান। সুন্দর পরিবার —বেশ মিল-মিশ আছে নিজেদের মধ্যে —আর কেনই বা থাকবে না, সকলেই সচ্ছল ; অল্পস্বল্প হিংসুটেপনা থাকলেও ঝগড়াঝাঁটি নেই। এরই মধ্যে অবনী একটু অন্য রকম—হ'তে চেয়েছিলো, কিন্তু আমার ভাগ্যে তারও সুবুদ্ধি জাগতে বেশি দেরি হ'লো না। আমার খুড়শ্বশুরের মেজাজ একটু কড়া, কিন্তু পাকা বুদ্ধির লোক —পৈতৃক বিত্ত রাখতে গেলে, বাড়াতে গেলে ঐ রকমই দরকার হয়, হাওয়ায়-ওড়া ফানুস হ'লে চলে না। আমি বুঝতে পারি অবনীর ওপর আসলে তেমন রাগ নেই ওঁর (কিছুটা

বাড়াবাড়ি অবনীব দিক থেকেই হয়েছিলো বোধহয়) , উনি শুধু চেয়েছিলেন অবনীবে একটা বাঁধা কাজেব মধ্যে ফেলে দিতে, আব সত্যিকাব হিতৈষীব পক্ষে সেটাই তো ঠিক কাজ। আমাব খুড়শ্বশুব নাকি আমাব শাশুড়িকে বলেছেন তাঁব বালিগঞ্জেব জমিতে আস্তে আস্তে এবাব বাড়ি তুলে নিতে —তাব মানে আমবা নিজেব বাড়িতে উঠে যেতে পাবি শিগগিবই তখন আমি শাশুড়িকে বলবো বাবোমাস আমাদেব কাছে থাকতে। কী হচ্ছে? ধোঁয়া কেন? ও, পাঁকাটি দিয়ে আগুন জ্বেলেছে বিয়ে হ'য়ে গেলো, যজ্ঞ হচ্ছে এবাব। কত কিছু ব্যাপাব, আড়ম্বব, ঘনঘটা—কিন্তু আসল কথাটা কী? একজন পুরুষ আব একজন মেয়ে একসঙ্গে শোবে —এ ছাড়া আব কিছু তো নয়। হঠাৎ একদিন সবাই মিলে ব'লে উঠলো 'যাও, ঢোকো ঐ ঘবে, কোনো ভয় নেই—আমবা বাইবে থেকে দবজা বন্ধ ক'বে দিচ্ছি।' কেমন মজা লাগে না ভাবতে? অথচ ঐ একই কাজ বিয়েব আগে কেউ ক'বে ফেললে কী কেলেঙ্কাবি! আমাবও কত ভয়—অবনীব সঙ্গে এমন-এমনি ছিলাম যতদিন। আজ নিশ্চিন্ত। সাবা জীবনেব মতো নিশ্চিন্ত। মাস কাটবে, বছব কাটবে আমাদেব ছেলে-মেয়ে দুটি স্কুলে যাবে, বড়ো হবে, তাদেব বিয়ে হবে। হয়তো, পঁচিশ বছব পবে, এই ছাতেই এমনি ধুমধাম ক'বে বিয়ে হবে আমাব মেয়েব। বা হয়তো বালিগঞ্জে আমাব শাশুড়িব, মানে অবনীব মাব, অমাব বাড়িতে। তখন আমি কেমন দেখতে হয়েছি? বেশ মোটা নিশ্চয়ই? হ্যাঁ, আমাব মোটা হব, আমাব মা-বও তা-ই ছিলো। আব ঐ যে অবনীব ঝাঁকড়া কালো চুলে ভবা মাথাটা সেখানেও হয়তো টাক পড়বে তখন—ওব কাকাবই মতো? কিন্তু আমবা দেখতে কেমন, সে-কথা তখন অবান্তব হ'য়ে গেছে। এখনই অবান্তব হ'য়ে গেছে। আমবা পবস্পবকে ভালোবাসি না বাসি না, তাও অবান্তব আমবা স্বামী-স্ত্রী। আমাব পিসতুতো ননদেব সঙ্গে তিনটেব শো-তে সিনেমা দেখে আমি যে বাড়িতে ফিবে আসি, অবনীও সেখানে ফেবে আপিশ থেকে। কোনো লুকোচুবি নেই, সমস্যা নেই। যে বিছানাব বাঁ দিকে আমি ঘুমোই, তাবই ডান দিকে ঘুমোয় অবনী। আমাব অসুখ কবলে অবনীব দুশ্চিন্তা আব অসুবিধে হয়, তাব মাইনে বাড়লে আমি কোনো শখ মেটাতে পাবি। আমি যাদেব জন্ম দেবো, অবনীও তাদেব জন্ম দেবে। স্বামী-স্ত্রী অমুক-অমুকেব বাবা আব মা। দেখামাত্র চিনে নেয় সবাই, শোনামাত্র মেনে নেয়। এ-ই যথেষ্ট, এ-ই সব, এব ওপবে আব কোনো কথা নেই আঃ—এতদিনে-এতদিনে সত্যিকাব জীবন।

সত্যিকাব জীবন, সত্যিকাব বিয়ে। গাঁটছড়া বেঁধে বাসব ঘবে তাবা সে আব অন্য। সেই তেতলাব ঘব, যেখানে সাবাদিন বসিয়ে বাখা হয়েছিলো কমলাকে। চাল খেলা কড়ি খেলা গোলাব ফুল জলে ভাসানো—কিছু বাদ গেলো না। কিন্তু অবশেষে সব শেষ হ'লো, বাত নিশুতি ক্লান্তি আব নীববতা নামলো বাড়িতে, এতক্ষণে অবনীব সঙ্গে তাব দেখা হ'লো। হাসলো অবনী তাব চোখে চোখ ফেলে। 'তোমাব কেমন লাগছে, কমলা?' 'কেমন লাগছে? বলতে পাববো না' 'এমন 'খুব ক্লান্ত—না। সত্যি, হিন্দু বিয়ে এক অত্যাচাব। এসো, শুয়ে পড়া যাক।' 'আসছি।' কমলা দাঁড়ালো ড্রেসিংটেবিলেব আয়নাব সামনে, ঝকঝকে নতুন আয়নায় নিজেকে দেখলো পুবোপুবি নতুন বৌ—সুখী, আনকোবা, ঝলমলে। তাব সব অতীতকে ঢেকে বেখেছে এই বিয়েব সাজ। গা থেকে গয়নাগুলো একে-একে খুলতে লাগলো কমলা। কানপাশা, নেকলেস, চিক, দু হাতে চুড়ি, বালা চুড়ি, বাঁ হাতে মোটা কঙ্কণ, কনুইয়েব ওপব আর্মলেট, মাথায় সোনাব সিঁথি পর্যন্ত যাকে বলে সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছে। মুড়ে দিয়েছে—সোনায়, সাটিনে, বেশমে সোনালি চুমকি বসানো টুকটুকে লাল বেনাবসিতে। এ-সবে সুন্দব দেখায়, এ-সবে আবো সুন্দব দেখায় মানুষকে। কিন্তু অন্য এক সুন্দবকে আমি দেখেছিলাম, অন্য এক আমাকে আমি দেখেছিলাম। অন্য কোথাও, অন্য কোনো আয়নায়। না কি একটা লম্বা স্বপ্ন দেখছিলাম জেগে-জেগে? কেমন হঠাৎ স্বপ্ন ভেঙে গেলো। কেমন হঠাৎ আলগোছে বললেন, 'শ্যামলী, আমি চ'লে যাচ্ছি।' আমি ভাবলাম কোথাও বেড়াতে টেড়াতে যাচ্ছেন বোধহয়। 'কোথায় যাচ্ছেন।' 'যেখানে ছিলাম, সেখানেই। প্যাবিসে।' আমাব মুখ দিয়ে বেবিয়ে গেলো, 'কেন, সেখানে কেন?' উনি বোধহয় শুনতে পেলেন না কথাটা। টেবিলেব সামনে

দাঁড়িয়ে একটা চিঠি পড়ছিলেন, সেটা নামিয়ে রেখে বললেন, 'পর্শু যাচ্ছি।' আমার বিশ্বাস হ'লো না কথাটা, একটু কাছে এগিয়ে বললাম, 'পর্শু কী ক'রে যাবেন?' 'প্লেনে উঠে বসবো, চ'লে যাবো।' আমি অবাক হলাম তাঁর হালকা সুরে, যেন দুম ক'রে অতদূরে চ'লে যাওয়াটা ভারি আনন্দের ব্যাপার। 'আপনার ছবি যে শেষ হয়নি?' 'তা একরকম শেষই বলা যায়, দু-একটা খুচরো কাজ বাকি রইলো, তা ওখানে গিয়েও করা যাবে।' 'আবার কবে আসবেন?' 'আবার—এই কলকাতায়? ঠিক নেই কিছু।' একটু পরে, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজই যাওয়া ঠিক করলাম, তাই আগে তোমাকে জানাতে পারিনি। কিন্তু তোমার কোনো অসুবিধে হবে না—এই একটা ঠিকানা দিচ্ছি, এখানে গেলে ভালো কাজ পাবে।' তাঁর নাম-ছাপানো কার্ডের পেছনে লিখে দিলেন এক লাইন। 'তুমি খুব ভালো মডেল, শ্যামলী, আমার ভাগ্যে তোমাকে পেয়েছিলাম। আচ্ছা, তাহ'লে...' এতক্ষণে আমার উপলব্ধি হ'লো যে আমি এতক্ষণ উপলব্ধি করিনি ব্যাপারটা, কিছু না-বুঝে কথা শুনছিলাম, বলছিলাম। চ'লে যাচ্ছেন—অন্য দেশে —অনেক দূরে —পর্শু। পর্শু...তার মানে...আজ শুক্রবার ..আজই শেষ, এই মুহূর্তই শেষ। আমি একটা চেয়ারের পিঠ ধ'রে দাঁড়ালাম, মনে হ'লো আমি খুব দুর্বল হ'য়ে গিয়েছি, আমার বুকের ভেতরকার কলকব্জাগুলো খুলে নিয়েছে, এই ঘরের আলোগুলো তেমন উজ্জ্বল নেই আর, অলোক পালের মুখটাও কেমন অস্পষ্ট। উনি কাশলেন একবার —অর্থাৎ, আমার যাবার জন্য ইঙ্গিত। অন্য একটা কথা আমার মনে প'ড়ে গেলো, চেষ্টা ক'রে কথা বের করলাম গলা দিয়ে—'ছবিটা দেখতে পারি একটু?' 'দেখতে চাও? আচ্ছা।' তিনি ঢাকনা খুলে দিলেন, আমি একটা চোখ ধাঁধানো ঝলক দেখতে পেলাম।

কী দেখেছিলাম, স্পষ্ট মনে নেই। আকাশ, কুয়াশা, নদী : ঝাপসা। ফোঁটা-ফোঁটা নীল, বেগনি, হলুদ : চুঁইয়ে-পড়া ফোঁটা-ফোঁটা রোদ্দুর, ঈষৎ কাঁপছে যেন, কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। কিছু-একটা ভেসে-ভেসে উঠছে, নৌকোর মতো, না কি নদীর ঢেউ কে জানে। কিন্তু সেই ঝাপসার মধ্যে কোথায় একটু ফুটো, যেন এক চিলতে আকাশ ছিঁড়ে গেছে, আর সেই ফাঁক দিয়ে দিনমণি সহস্র কিরণে ফুটিয়ে তুলেছেন পাটাতনের ওপর মেয়েটিকে। কালো-মেয়ে, জেলের মেয়ে, গর্ভে তার বেদব্যাস। শুয়ে আছে—সহজ, অলস, ভরপুর, উন্মোচিত, আকাশের তলায় যমুনার বুকে উন্মোচিত। সুন্দর তুমি, সত্যবতী, আমাকে ক্ষমা করো, আর আমি ঈর্ষা করি না তোমাকে, মুনি তোমাকে দেবী ক'রে তুলেছেন—মুহূর্তের জন্য। এই এক আশ্চর্য মুহূর্ত তোমার জীবনের—এর পরেই তুমি সাধারণ, সাধারণ। আমাকে অনুমতি দাও, মুহূর্তটিকে ভাগ ক'রে নিই তোমার সঙ্গে। আমাকে বলতে দাও যে ঐ রূপ আমারও, তোমার চোখের আলো আমারও। আমি জানি তোমাকে দেখতে গুণীমানীরা ভিড় করবেন, কিন্তু আমার দিকে কেউ ফিরে তাকাবে না কখনো। শুধু আমিই জানবো যে আমাকে দিয়েই তুমি তৈরি হয়েছিলে—দিনের পর দিন, তিলে-তিলে, আমাকে নিংড়ে নিয়ে, যেমন তোমাকে নিংড়ে নিয়েছেন পরাশর। আরো একটা কথা আমি জানলাম যা তুমি জানো না এখনো : এ-ই প্রথম, এ-ই শেষ, এর পরে আর মুনির কাছে তুমি কেউ নও, কিছু নও। বেদব্যাসের মায়ের নাম কে মনে রেখেছে?

'কমলা।'

'আসছি।' গয়নাগুলো দেরাজে তুলে রেখে কমলা উঠে দাঁড়ালো। লম্বা আয়নায় আর-একবার দেখলো নিজেকে, মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত, ঝলমলে লাল বেনারসিতে ঢাকা। মুহূর্তের জন্য হঠাৎ একা মনে হ'লো নিজেকে, আয়নার মধ্যে ছায়া যেমন একা, তেমনি। কিন্তু না—সেই বিষাক্ত স্বর্গ, বিপজ্জনক, সেই স্বার্থপর হৃদয়হীন ইন্দ্রজাল—ও-সব থেকে অনেক দূরে তুমি এখন। ভয় পেয়ো না—সত্যবতী পরাশরকে মনে রাখেননি ; তুমিও ভুলে যাবে।

'অবনী!' আস্তে এগিয়ে গেলো কমলা, অবনী ঘরের আলো নিবিয়ে দিলো।

বিপন্ন বিস্ময়

অমিয় দেব
স্নেহাস্পদেষু
উৎসাহদানের জন্য ধন্যবাদ

প্রথম খণ্ড

১

জুন মাসের এক বিকেলবেলায় শ্রীপতির ঘরে তার কয়েকটি বন্ধু হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়লো।

'তাহ'লে আছিস তুই! বাঃ বাঃ!' মোটা গলায় নিজের জানানি দিয়ে দুর্গাদাস এগিয়ে এলো ঘরের মধ্যে। 'শুয়ে আছিস যে? ঘুমুচ্ছিস?'

শ্রীপতি আগন্তুকদের দিকে একবার তাকালো, কিন্তু উঠে বসার কোনো লক্ষণ দেখালো না। পাজামা আর গেঞ্জি প'রে শুয়ে আছে সে, এক হাত কপালে রেখে। হাতটা কপাল থেকে সরালো না পর্যন্ত।

'বাঃ, কেমন সোঁদা সোঁদা গন্ধ দিচ্ছে রে,' আবার কথা বললো দুর্গাদাস, 'ঘরটা ড্যাম্প মনে হচ্ছে? তা জানলা দুটো খুলে দে না— একটু আলো আসুক।' দুর্গাদাস নিজেই খটাখট শব্দে জানলা দুটো খুলে দিয়ে, শ্রীপতির তক্তাপোশের কাছে ফিরে এলো, কিন্তু কথা বলা মুহূর্তের জন্যেও থামলো না। '—আমরা গিয়েছিলাম সিনেমা দেখতে, তিনটে হাউসে টিকিট না-পেয়ে তারপর যে-কোনো একটায় ঢুকে পড়লাম—ফিল্মটা জঘন্য— শেষ পর্যন্ত ব'সে থাকাই গেলো না, অন্ধকারে বেরোতে গিয়ে বন্দনা আবার মস্ত মোটা এক ভদ্রলোকের পা মাড়িয়ে দিলে— ভদ্রলোক জুতো-টুতো খুলে আরাম ক'রে ব'সে ছিলেন —হঠাৎ ইঁদুরের মতো গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, শুনে আমার এমন হাসি পেলো —হাঃ— হাঃ—'

ঘটনাটা মনে ক'রেই দুর্গাদাসের এমন হাসি পেয়ে গেলো যে সে-হাসি আর থামলো না, কথা থামাতে হ'লো। ভালো ক'রে হাসবার জন্য কোমরে হাত দিয়ে বেঁকে দাঁড়ালো সে, শ্রীপতি তাকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো।

বন্দনা, ফর্শা চেহারার ছিপছিপে মেয়েটি, কাছে এসে বললো, 'ওর কথা বিশ্বাস করবেন না, শ্রীপতি—সব বানিয়ে বলছে। আমি একবার হোঁচট খেয়েছিলাম শুধু—আসলে "শুধু" নয়, প্রায় প'ড়ে যাচ্ছিলাম, হিমেন্দু আমাকে পেছন থেকে ধ'রে ফেললে— আর তা-ই থেকে এতখানি বানিয়ে নিয়েছে ঐ হতভাগা। আসতে-আসতে বাস্ এই বানাচ্ছিলো আর বলছিলো, 'গিয়ে এটা শ্রীপতিকে খুব জমিয়ে বলা যাবে— আঃ!" আর ঐ দেখুন, লজ্জাও নেই, এখনো হাসছে। ঠিক বলছি কিনা জিগেস করুন হিমেন্দুকে- কলকাতাসুদ্ধু সবাই জানে যে হিমেন্দু তালুকদার কখনো ঠাট্টা ক'রেও মিথ্যে বলে না।'

'অঃ!' একটা অবজ্ঞার আওয়াজ করলো দুর্গাদাস, 'যা একখানা ব্যাপার, তা সত্যি হ'লেই বা কী, আর মিথ্যে হ'লেই বা কী! আজ দুপুরবেলার সিনেমায় বন্দনা সেন হোঁচট খেয়েছিলেন, না এক ঘাড়ছাঁটা ভদ্রলোকের পা মাড়িয়ে ছিলেন তা নিয়ে গবেষণা করবার মতো ঐতিহাসিক কেউ জন্মাবে ব'লে তো মনে হয় না।' ঠোঁট কুঁচকে হিমেন্দুর দিকে একবার আড়চোখে তাকালো দুর্গাদাস, তারপর হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে বলতে লাগলো, 'তা শ্রীপতি, তোর খবর কী বল তো? কতদিন হ'য়ে গেলো তোকে কফি হাউসে দেখি না, "সুনন্দা"য় দেখি না, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে দেখি না- —হয়েছে কী তোর? আর আচ্ছা ভদ্রতা শিখেছিস তো, আমরা এই রোদ্দুরে তেতে পুড়ে তোর কুশলচিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে ছুটে এলাম, আর তুই কিনা শুয়েই আছিস! ওঠ - বসতে দে আমাদের।'

'বোস তাহ'লে।' শ্রীপতি আস্তে-আস্তে উঠলো, গায়ে একটা পাঞ্জাবি চাপিয়ে চেয়ার এগিয়ে দিলো বন্ধুদের। নিজে তক্তাপোশে ব'সে ঝাপসাভাবে বললো, 'বন্দনা, হিমেন্দু— আপনারা বসুন।'

ঝুপ ক'রে শ্রীপতির পাসে ব'সে পড়লো দুর্গাদাস, চারমিনার বের করলো পকেট থেকে, কিন্তু শ্রীপতি হাত নেড়ে তা ফিরিয়ে দিলো। 'সে কী! খাবি না?'

ছেড়ে দিয়েছি।'

'ছেড়ে দিয়েছিস—কবে থেকে? কী মুশকিল—তুই না-খেলে আমার চলবে কী ক'রে? এই দ্যাখ—ঠিক দুটো আছে আর, এদিকে পকেট ফাঁকা—ভেবেছিলাম তোর ওপরেই চালিয়ে দেবো আজকের মতো, তা তুই—ছেড়ে দিলি এর মধ্যে!' হঠাৎ, একটু থেমে, শ্রীপতির মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে দুর্গাদাস বললো, 'তোর হয়েছে কী? অসুখ?'

'না, অসুখ করেনি। আমি হঠাৎ একটা আবিষ্কার করেছি।'

'কী আবিষ্কার?'

'যে জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ হচ্ছে শুয়ে থাকা।'

দুর্গাদাসের হাসির শব্দে ঘর ফেটে পড়লো।

'ওঃ! যা বলেছিস এটা! গ্র্যান্ড! ক্যাপিট্যাল। মাস্টরপীস! তোকে একটা পুরস্কার দেয়া উচিত এর জন্যে!'

পাশাপাশি দুটো বেতের চেয়ারে ব'সে ছিলো হিমেন্দু আর বন্দনা ; মেঝেতে প'ড়ে-থাকা খবর-কাগজের দুটো আলাদা পাতা টেনে নিয়ে বন্দনা দেখছিলো খেলার খবর, আর হিমেন্দু চাকরির বিজ্ঞাপন ; হাসির শব্দে দু-জনেই মুখ তুললো, কিন্তু কেউ কারো দিকে তাকালো না। 'কী? কী হয়েছে?' বাঁশির মতো আওয়াজে বন্দনা ব'লে উঠলো, 'কী বলেছে শ্রীপতি? আমি শুনবো।'

'শ্রীপতি একটা বিরাট আবিষ্কার করেছে। শুয়ে থাকাই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ।'

কথাটা শুনে বাঁকা হাসি ফুটলো হিমেন্দুর ঠোঁটে। তার চোখে চশমা, গায়ের রং ফ্যাকাশে, নিচু গলায় কথা বলে। এতক্ষণে প্রথম কথা বললো সে, 'আপনি কাজেও তা-ই করছেন?'

'আপনারা দেখলেন তো এসে,' তক্ষুনি জবাব দিলো শ্রীপতি। 'আজ সকাল থেকে শুয়ে আছি, কাল সারাদিন তা-ই ছিলাম, পরশুও তা-ই, আর তার আগের দিনও তা-ই। শুয়ে-শুয়ে অনেক কথা ভেবেছি। কিছু করতে গেলেই চেষ্টার দরকার হয়, আর চেষ্টা জিনিশটাই কুৎসিত। পাহাড়ে চড়া থেকে পেয়ালা মুখে তোলা পর্যন্ত এমন কোনো কাজ নেই, যার পেছনে চেষ্টা খাটাতে না হয়। আর চেষ্টা মানেই নিজেকে ভুলে যাওয়া, জগৎকে ভুলে যাওয়া, সব-কিছু ভুলে থাকা। সেই নারদ মুনির গল্প আছে না?—কৃষ্ণ তাঁর হাতে এক ভাঁড় তেল দিয়ে বলেছিলেন, "এটা নিয়ে ত্রিভুবন ঘুরে এসো, কিন্তু দেখো একফোঁটাও তেল যেন না পড়ে।" মুনি ত্রিভুবন ঘুরে এলেন, একফোঁটা তেলও পড়লো না, কিন্তু এতখানি সময়ের মধ্যে একবারও কৃষ্ণকে মনে পড়লো না তাঁর—আর তিনি হলেন গিয়ে সাধকশ্রেষ্ঠ, ভক্তচূড়ামণি! তবেই বোঝো কাজ ব্যাপারটা কী কদর্য!' আস্তে একবার হাসলো শ্রীপতি, তার দাঁতের সারি দিয়েই মিলিয়ে গেলো। তার শরীরের গড়ন নড়বড়ে-মতো, রোদে-পোড়া ধরনের গায়ের রং, কিন্তু চোখ দুটি গভীর। বয়সে অন্যদের চাইতে কিছু বড়োই হবে—সাতাশ, কি আটাশের কাছাকাছি, দেখতে আরো বেশি মনে হয়।

হিমেন্দু নিচু গলায় বললো, 'তাই আপনি স্থির করেছেন যে কিছুই করবেন না—শুধু শুয়ে থাকবেন?' বন্দনা পাশে থাকার জন্যে শ্রীপতিকে সোজাসুজি দেখতে পাচ্ছিলো না হিমেন্দু, ঘাড় বেঁকিয়ে তার দিকে তাকালো।

'শুধু শুয়ে থাকবো। ভারি আরাম, জানেন, আর ভারি—পবিত্র। "বড়ো ব্যস্ত আছি"—এই কথাটা প্রতিদিন কত লক্ষ বার উচ্চারিত হচ্ছে ভাবুন তো। বন্ধু তিন মাস ধ'রে অসুখে ভুগে-ভুগে মারা গেলো, একবার তাকে দেখতে যাওয়া হলো না—ব্যস্ত ছিলাম। বিধবা মাসি চিঠি লিখলে তার ছেলেটাকে কোথাও ঢুকিয়ে দিতে পারি কিনা—নয়তো আর চলছে না—জবাব দিতে ভুলে গেলাম, এত ব্যস্ত। রাস্তায় বেরিয়ে দেখলাম এক বাচ্চা ছেলেকে একটা ষণ্ডামার্কা লোক বেদম মারছে—তিন সেকেণ্ডও দাঁড়ালাম না সেখানে—ব্যস্ত। বাস্-এ চলেছি—এক গেঁয়ো বুড়ি টালিগঞ্জে যাবার জন্য চিৎপুরের বাস্-এ উঠে ব'সে আছে—কন্ডাক্টার তাকে এসপ্লানেডে নামিয়ে দিলে—কিন্তু বাস্-এর অতগুলো লোকের মধ্যে কেউ নেমে গিয়ে তাকে ঠিক বাস্-এ তুলে দিলে না—যদিও সকলেই বুঝলো যে হয়তো আর পয়সা নেই বুড়ির, হেঁটে-হেঁটেও পৌঁছতে পারবে কিনা সন্দেহ, হয়তো চাপাই পড়বে রাস্তা পার হ'তে

গিয়ে—এত ব্যস্ত সবাই। অথচ এরাই—মানে এই আমরাই—পাঁচ টাকা, পঞ্চাশ টাকা কি পাঁচশো টাকা বাড়তি পেলেই দিব্যি স্বচ্ছন্দে সব-কিছুরই সময় পাই—তা পাই ব'লেই অন্য কিছুর আর সময় থাকে না। যদি এমন আইন থাকতো যে কোনো বুড়িকে রাস্তা পার ক'রে ঠিক বাস্-এ তুলে দিলে পাঁচ সিকে পারিতোষিক দেয়া হবে—'

'উঃ!' বন্দনা সেই কাগজটাকেই উল্টে-পাল্টে দেখছিলো এতক্ষণ, হঠাৎ সেটা ছুঁড়ে ফেলে ব'লে উঠলো, 'বড্ড খিদে পেয়েছে আমার।'

বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়ালো হিমেন্দু। '—যাবে এখন? যেতে চাও?'

'গেলে হয়। মাথাটাও ধ'রে উঠলো এইমাত্র।' বন্দনা ন'ড়ে উঠলো, যেন উঠে দাঁড়াবে, কিন্তু দুর্গাদাস মাথায় টোকা দিয়ে তাকে বসিয়ে দিলে।

'আরে বোসো, বোসো, "সুনন্দা"র মীটিঙে যাবে না, সে কী হয়? আজ খুব জোর হবে শুনেছি। তা শ্রীপতি—ও-রকম কোনো আইন থাকলে আমি তো রোজ দশ বার ক'রে বুড়ি পার করতাম, সত্যিকার বুড়ি পাওয়া না-গেলে মনে-মনে বানিয়ে নিতাম কাউকে। বেশ হ'তো। কী জানিস—বন্দনা খুব একটা খাঁটি কথা বলেছে, একেবারে লাখ কথার এক কথা—মাঝে-মাঝে খিদে পায় যে। তুই কি খিদে পেলেও শুয়ে থাকছিস?'

'কাল রাত্রে আমার ভালো ঘুম হয়নি—' শ্রীপতি এমনভাবে বলতে লাগলো যেন দুর্গার কথাটা কানেই যায়নি তার, বা সেই কথারই উত্তর দিচ্ছে—'অনেকবার উঠেছি, অনেকবার জল খেয়েছি। আর, বেশি জল খেলে যেখানে যেতে হয় সেখানেও যেতে হয়েছে মাঝে-মাঝে। জানিস তো, আরশোলা দেখলেই আমি হিংস্র হ'য়ে উঠি ; ঐ জঘন্য জীবটাকে জুতোর তলার চেপ্টে বধ ক'রে একটি অনাবিল আনন্দ অনুভব করি। তা প্রথম বার গিয়ে দেখি, বাথরুমে প্যানের গায়ে, নোংরা জলের ঠিক গা ঘেঁষে, একটি পুষ্ট খয়েরি রঙের আরশোলা অবস্থান করছে—মাঝে-মাঝে শুঁড়গুলো নড়ছে তার—বেশ পরিতৃপ্ত চেহারাটি দেখলাম—আমার মনে হ'লো ঐ জায়গাটা তার প্রধান ভাঁড়ার ঘর। আমি ফ্লাশ টানলাম, তোড়ে জল এলো, আরশোলাটা পাগলের মতো কিলবিল ক'রে হাবুডুবু খেলো—ভারি মজার দেখতে—একটু সময় তাকে আর দেখা গেলো না, ভাবলাম এতক্ষণে নিশ্চিন্তে পাতালে পৌঁচেছে—কিন্তু ও হরি! জল স'রে যেতেই দেখি, যায়নি তো—ঠিক তেমনি আছে, পেছল বাটিতে মাছির মতো আটকে আছে, নোংরা জলের গা ঘেঁষে, শুঁড় নেড়ে-নেড়ে পথ্য চেটে নিয়ে মোটা হচ্ছে। আশ্চর্য—ওরা কি জলে ডোবে না?—নেংটি ইঁদুর হ'লে ম'রে যেতো ঐ জলে। ঘরে ফিরে ঘুমের চেষ্টা কবলাম—বৃথা চেষ্টা—ঘণ্টাখানেক পবে আবার বাথরুম। এবারেও সেই আরশোলা—ঠিক সেই একই জাযগায়! আমি ফ্লাশ টানলাম—কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে আবার—তেমনি জলের ঘূর্ণি, যদি হঠাৎ পঞ্চাশটা বড়ো-বড়ো সমুদ্রের ঢেউ অনবরত আমার ওপর দিয়ে গড়িয়ে যায় তাহ'লে আমার যা অবস্থা হবে আরশোলার অবস্থাও ঠিক তা-ই ;—কিন্তু দু-বারই দেখলাম বেশ বহাল-তবিয়তে টিকে আছে সে, মূর্ছা গেছে বা ক্লান্ত হয়েছে এমন কোনো লক্ষণও দেখলাম না। এবারেও ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম, কিন্তু এর পরে যখন বাথরুমে যেতে হ'লো মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে আরশোলাটা এখনো যদি ওখানে থেকে থাকে—'

বন্দনা শ্রীপতির দিকে মুখ ফিরিয়ে গালে হাত দিয়ে শুনছিলো তার কথা—হঠাৎ ব'লে উঠলো, 'আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না। আরশোলার গল্প বলছেন কেন?'

শ্রীপতি একটুক্ষণ বন্দনার দিকে তাকিয়ে রইলো ; লক্ষ করলো তার গালের গোলাপি রং, কপালের মসৃণ আভা। তারপর দুর্গাদাসের দিকে তাকিয়ে নিশ্বাস ছেড়ে বললো, 'কিন্তু পারলাম না। আমার যেন খুন চেপে গেলো মাথায়—গুমোট বাথরুমে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তিন, চার, পাঁচ বার ফ্লাশ টানলাম পর-পর—কিন্তু ঐ ক্লেদাক্ত নিঃশব্দ জন্তুটা যেন অমর। এক-একবার মনে হয় দম ফুরিয়েছে ওটার, মিনিটখানেক পরেই আবার শুঁড় ন'ড়ে ওঠে—একটু দুর্বলভাবে, তা ঠিক, কিন্তু ন'ড়ে তো ওঠে, সে যে বেঁচে আছে তার বিজ্ঞাপন দিতে তোলে না! কী অদ্ভুত জীব—একবার বলে না, "আমি তো তোমার

কোনো ক্ষতি করিনি, আমাকে মারতে চাও কেন?" একবারও তেড়ে আক্রমণ করে না আমাকে, মুখে কোনো ভয়, কষ্ট, যন্ত্রণা ফোটে না—কী অদ্ভুত! চোখ নেই, মুখ নেই, মনে হয় যেন বোধ বা আত্মাও নেই—শুধু এক টুকরো প্রাণ—বোবা, অন্ধ, মূঢ়, অমর, বীভৎস প্রাণ —শুধু প্রাণ! আমার ইচ্ছে করলো ঐ প্যানের গায়েই লাথি মেরে শেষ করি ওটাকে, ওকে বধ করার জন্য ভাবিও নেমে যাই ঐ নোংরার মধ্যে—কিন্তু ঘেন্না করলো, ভগবানের কথা ভেবে বড্ড ঘৃণা হ'লো আমার।' বলতে-বলতে ঠোঁটে ফেনা উঠে এলো শ্রীপতির, জামার হাতায় ঠোঁট মুছে সে চুপ করলো।

'এর মধ্যে আবার ভগবান এলেন কোত্থেকে? কী বলছেন আপনি? হিমেন্দু, এই গল্পটার অর্থ আমাকে বুঝিয়ে দাও।'

বন্দনার মুখের দিকে তাকিয়ে হিমেন্দুর স্বভাবত গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর হ'লো। হয়তো একটু পরে সে কিছু বলতো, কিন্তু দুর্গাদাস হঠাৎ বন্দনার পাশে ব'সে বললো, 'এর অর্থ আর কে না বোঝে?—তা শ্রীপতি, তুই কি সত্যি এই তিন দিন ধ'রে না-খেয়ে আছিস?'

'ব্যস্ত—ঐ একটা কারণেই পৃথিবীর লোক ব্যস্ত। মাস্টার, কেরানি, চাষি, মজুর, দালাল, উকিল, চাকুরে, শেয়ার-বাজারের রাজা-উজির থেকে শেয়ালদার ভিখিরি পর্যন্ত—সকলেরই ঐ এক কাজ, এক চিন্তা, এক ধ্যান—সকলেই বাঁচতে চায়, আঁচড়ে, কামড়ে, ছেঁচড়ে, কাৎরে, ছটফট ক'রে, কিলবিল ক'রে, নর্দমা ঘেঁটে, বিষ্ঠা চেটে—যেমন ক'রে হোক, সম্ভবপর শেষতম মুহূর্তটি পর্যন্ত বাঁচতে চায়, প্রথমে নিজে বাঁচতে, তারপর নিজেরই মতো আরো কতগুলো জন্তু ছড়িয়ে দিতে পৃথিবীতে। সেইজন্যই প্রত্যেকবার বাস্ থামা মাত্র ভিখিরি হাত বাড়িয়ে বিকট সুরে ককিয়ে উঠছে, আর কোম্পানির ডিরেক্টর মশাই এরোপ্লেনে সাত রাজ্যি সফর করছেন। সময় নেই—কারোরই সময় নেই। বাঁচার জন্য অনবরত এই চেষ্টা করতে গিয়েই অনবরত ভুলে থাকতে হচ্ছে আমরা বেঁচে আছি। যদি সত্যি আমরা বুঝতাম যে বেঁচে আছি, যদি বুঝতাম কী আশ্চর্য এই জীবন, কী অফুরানভাবে অমূল্য, তাহ'লে কি কেউ কখনো পারতাম মিথ্যে বলতে, চুরি করতে, অন্যকে বঞ্চিত করতে, কখনো একটু রূঢ় কথা ব'লেও কারো মনে ব্যথা দিতে পারতাম কি? জানিস দুর্গা, আজ সারাদিন শুয়ে-শুয়ে ভাবছিলাম, এই সংসারে এমন কোনো কাজ আছে কিনা, যাতে চুরি নেই, জোচ্চোরি নেই, মিথ্যা নেই, যাতে ঠকতেও হয় না, ঠকাতেও হয় না, হ'তে হয় না অপমানিত বা অপমানকারী, উৎপীড়িত বা উৎপীড়ক, ঈর্ষান্বিত বা ঈর্ষার লক্ষ্য—যেখানে সকলে মিলে-মিশে ভালোবেসে নির্মল হৃদয়ে কাজ করা যায়, মনে একরকম বুঝে মুখে অন্য রকম বলতে হয় না, কাউকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় না। বলতে পারো তোমরা, আছে এমন কোনো কাজ?'

'ও-রকম কোনো কাজ যারা খুঁজে পায় তাদেরই বোধহয় আমরা সাধু-সন্নেসি বলি,' হালকা হেসে জবাব দিলো হিমেন্দু। 'আর কখনো বলি কবি।'

'আর অন্যেরা? অন্য কোটি-কোটি, কোটি-কোটি মানুষ? যাদের একসঙ্গে পঞ্চাশজনকে কাজ করতে হবে? পঞ্চাশ, দু-শো, হাজার জনকে? আপিশে, কারখানায়, আদালতে, বাণিজ্যে, যুদ্ধে, রাষ্ট্রচালনায়? তারা জীবন ভ'রে মিথ্যাচরণ করবে, জোচ্চোরি করবে নিজের সঙ্গে আর অন্যের সঙ্গেও, এইটেই মেনে নিচ্ছো তাহ'লে? আর ঐ কবির কথা বলছো—তাঁরই বা আহার জুটবে কোত্থেকে? সন্ন্যাসী বলছো—কিন্তু সত্যি কি তিনি বনে গিয়ে বায়ুভক্ষণ ক'রে থাকবেন?'

'আপনি যা বলছেন সে-রকম কথা জৈন দর্শনে আছে শুনেছি,' বললো হিমেন্দু।

'জৈন? তা হবে—আমি ও-সব কিছু জানি না। তবে কোথায় একবার পার্শ্বনাথের কথা পড়েছিলাম—তীর্থংকর পার্শ্বনাথ।...দাঁড়াও, মনে করি। হ্যাঁ—পার্শ্বনাথ দেখলেন প্রাণীহত্যা না-ক'রে বেঁচে থাকা যায় না। আমরা মাটিতে একবার পা ফেললে কত ক্ষুদ্র কীট ধ্বংস হ'য়ে যায়। একবার হাত নাড়লে বিনষ্ট হয় কে জানে বাতাসে কত অদৃশ্য জীবাণু। এক বিন্দু জলপান করলেও অসংখ্য প্রাণীর হন্তা হ'তে হবে। অতএব তিনি পানাহার ত্যাগ করলেন, দেহের গতি রুদ্ধ করলেন—স্তব্ধ, নিশ্চল, নির্বাক ও কঠিন হ'য়ে থেকে মাত্র একুশ দিনের দিন লাভ করলেন তাঁর বাঞ্ছিত মৃত্যুকে। আশ্চর্য

না—ও-রকম ক'রে মরতে পারা—এর চেয়ে মহান আর কিছু হ'তে পারে? আর এই ধর্ম থেকেই নাকি এক বণিক জাতির সৃষ্টি হয়েছে, যারা তাদের গুদোমে হাজার-হাজার মণ চাল আটকে রেখে দেশে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে। কী পাপ করেছে মানুষ, কিছুতেই কোনো সত্যকে নিতে পারে না কেন মনের মধ্যে—যীশুর বাণী থেকে যোদ্ধা হ'তে শিখলো সে, শিখলো তিল-তিল ক'রে পাই-পয়সা জমিয়ে-জমিয়ে চার পুরুষ পরে আফ্রিকাতে হীরের খনি কিনতে, গীতার বাণী থেকে অন্ধতা শিখলো, বুদ্ধের বাণী থেকে নিষ্ঠুরতা, আর অবশেষে সাম্য আর বিশ্বমৈত্রীর বাণী থেকে শিখলো মানুষগুলোকে যন্ত্রে ফেলে নিংড়ে-নিংড়ে তার মনুষ্যত্বের মজ্জাটুকু বের ক'রে নেবার কৌশল। কেন মানুষ উপদেশ দিতে যায়, দীক্ষা দিতে চায়, কেন চায় অন্যকে ভালো করতে—সে নিজেকে নিয়ে একলা থাকতে পারে না কেন—কেন পারে না তিল তিল ক'রে নিজে ভালো হ'তে!'

'বাব্-বাঃ, তুই যা উপদেশ দিলি এতক্ষণ! এর পর আর—' কিন্তু শ্রীপতির মুখের দিকে তাকিয়ে দুর্গাদাস হঠাৎ থেমে গেলো। ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম জমেছে শ্রীপতির কপালে, এক গোছা চুল কানের পাশে ন্যাতার মতো লেপ্টে আছে, ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাকে। 'তোর অসুখ নাকি রে? বল তো সত্যি ক'রে?' হাত বাড়িয়ে তার কপাল ছুঁতে যাচ্ছিলো দুর্গাদাস, কিন্তু শ্রীপতি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'এখন কেটে পড়, দুর্গা, আমি শুয়ে পড়ি।'

'কেন? শোবেন কেন এখনই? এই সন্ধেবেলায়?'

বন্দনার এই কথা শুনে হা হা ক'রে হেসে উঠলো দুর্গাদাস।—'তা যা-ই বলো, ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি বন্দনা যেমন বলতে পারে তেমন আর কেউ পারে না। সত্যি শ্রীপতি—ঢের ঢের শোয়া হয়েছে তোর, এখন চল একটু ঘুরে আসবি আমাদের সঙ্গে। তোর কাছে কেন এসেছি তা-ই তো বলা হয়নি এতক্ষণ। "সপ্তর্ষির"র বৈঠক বসছে "সুনন্দা"য়, রথীন্দ্র রায় দারুণ কী-একটা পড়বে নাকি সেখানে—একেবারে বোমা ফাটাবে। তোকে নেবার জন্যেই এলাম আমরা—রথীটাকে ছাতু ক'রে দিতে হবে—বড্ড বাড় বেড়েছে ওর—তুই ছাড়া আর কেউ তা পারবে না। বিকাশ মালিনী, শঙ্কর, অভিজিৎ, পূরবী—সবাই আসছে। আর শোন—'

'আমার বড্ড খিদে পেয়েছে, আমি বাড়ি যাই।'

হিমেন্দু আবার উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু বন্দনা উঠলো না।—'বন্দনা, চলো।'

বন্দনা দুর্গাদাসের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি আজ আর যাবো না মীটিঙে—আমার মাথা ধরেছে, পা কামড়াচ্ছে। হিমেন্দুও যাবে না, ওর সঙ্গে আমার দরকার আছে একটু। আর শ্রীপতি, আপনি ঐ বিচ্ছিরি আরশোলার কথা এত ভাবেন কেন বলুন তো, সেইজন্যেই তো ঘুম হয় না রাত্রে। আর সেইজন্যেই বাড়িতে কেউ এলে দশ মিনিট পরে চ'লে যেতে বলেন,' বলতে-বলতে বন্দনা উঠে দাঁড়ালো।

তার পাশে দাঁড়িয়ে হিমেন্দু বললো, 'তাহ'লে আর দেরি কোরো না, চলো।'

'না, না, যাবে কোথায়—পাগল!' দুর্গাদাস খপ ক'রে বন্দনার একটা হাত ধ'রে ফেললো। 'খিদে পেয়েছে তো হয়েছে কী—বাড়ি ছাড়া আর কোথাও কি খাবার নেই? মাথা-ধরার জন্যে অ্যাস্পিরিনও আছে দোকানে। এই পাশেই আছে হালদার কেবিন—মোগলাই পরোটা ফেমাস ওদের। এখন কথা হচ্ছে—কার পকেটে কী আছে দেখাও।'

তিনজনের তহবিল মিলিয়ে তেরো আনা হ'লো। 'ধুশ!' মুখে একটা ভঙ্গি করলো দুর্গাদাস, 'বললাম তখন দশ আনার সীটেই চলো, ফশ ক'রে পাঁচ সিকের টিকিট কিনে ফেললো হিমেন্দু। কী? না বন্দনার মাথা ধরবে। আরে বাপু, সেই তো মাথা ধরলোই, ফিলিমটাও দেখা গেলো না—এখন টাকাটা থাকলে কী গ্র্যাণ্ড হ'তো ভাবো দেখি। শ্রীপতি, তুই-ই খাওয়া আমাদের!'

টেবিলের দেরাজ ঘেঁটে তিনটি একটাকার নোট বের করলো শ্রীপতি। প্রত্যেকটিই ময়লা, কুঁচকোনো, হাতে-হাতে ঘুরে কাগজ পাৎলা হ'য়ে গেছে। দুটো পাকিয়ে গুলির মতো ছুঁড়ে দিলো দুর্গার দিকে, আর-একটা ফিরিয়ে রাখলো দেরাজে।

নোট দুটো হিমেন্দুর হাতে দিয়ে দুর্গাদাস বললো, 'তুমি বন্দনাকে কিছু খাইয়ে দাও এ দিয়ে, আমি শ্রীপতিকে নিয়ে "সুনন্দা"য় আসছি।'

'আমি কোথাও যাবো না!'

'যাবি না মানে?'

'মানে—যাবো না!'

'তোকে যেতেই হবে। চ্যাংদোলা ক'রে তুলে নিয়ে যাবো, জানিস?'

'তোর ভাঁড়ামি আর ভালো লাগছে না। কেটে পড়।'

'কেন যাবেন না কেন?' বন্দনা অবাক হ'য়ে শ্রীপতির দিকে তাকালো, 'আপনার প্রাণের বন্ধু এত ক'রে বলছে, আর তবু আপনি—'

এমন সময় বাইরের দরজায় হাঁক শোনা গেলো—'শ্রীপতি আছো?' আর সঙ্গে-সঙ্গে আরো দু-জন মানুষ ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে। ততক্ষণে দিনের আলো আবছা হ'য়ে এসেছে, ঘরের ভেতরটা অস্পষ্ট, তবু সেই দু-জনকে চিনতে কারোরই এক মুহূর্ত দেরি হ'লো না। মিনিটখানেক চুপ ক'রে থাকলো সবাই, তারপর হঠাৎ সরু গলার আর্ত স্বরে স্তব্ধতা ফেটে গেলো। তক্তায় ব'সে প'ড়ে হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো বন্দনা।

২

হিমেন্দু ছুটে এসে বন্দনার পাশে ব'সে পড়লো, দুর্গাদাস কয়েক পা হেঁটে গিয়ে আলো জ্বেলে দিলে। বাল্‌বে শেড নেই, আকাঁড়া ইলেকট্রিক আলোয় দেয়ালের ঝুলকালিও স্পষ্ট দেখা গেলো।

'এই যে—তুইও এসে গেছিস, গৌতম—বাঃ। আরতি, তোমাকে কাল তিন বার টেলিফোন ক'রে পাইনি। কোথায় থাকো সারাদিন?'

'অত টেলিফোন কেন? জরুরি দরকার ছিলো?'

একটু লাল হ'য়ে হাসলো দুর্গাদাস। সুন্দর দাঁত তার, মুখখানাও কমনীয়, ঠোঁটের ওপর পাৎলা গোঁফ বেশ মানিয়েছে। রোগা, কিন্তু দেখতে তেমন রোগা লাগে না ; চলাফেরা কথাবার্তা সবই খুব চটপটে আর সপ্রতিভ ব'লে হ্যাণ্ডলুম চেক-শার্টে ঢাকা বুকটা বরং চওড়াই দেখায়।

'দরকার তেমন কিছু না—এই আজকের "সপ্তর্ষি"র বৈঠকের খবরটা দেবার জন্য। তা খবর তুমি পেয়ে গেছো দেখছি।'

'খবর দেবার তুমি ছাড়া কি লোক নেই আমার?'

'তা কেন থাকবে না—বাঃ। তা ওরা আমাকে বলেছিলো, তাই চেষ্টা করেছিলাম।'

'তার জন্যে তিনবার টেলিফোন! আর কোনো ব্যাপার তো এ-রকম কর্তব্যজ্ঞান তোমার দেখা যায় না, দুর্গাদাস। তা বাড়ির কাউকে ব'লে দিলে না কেন?'

'কী যেন—মনে পড়েনি, সে-কথা,' দুর্গাদাস মাথার চুল টেনে হাসলো। 'আসলে টেলিফোনে আমি কেমন নার্ভাস হ'য়ে যাই। বেশি কথা বলতে পারি না।'

'তা-ই নাকি? কিন্তু আমার সঙ্গে তো আধ ঘণ্টা ধ'রেও কথা বলেছো এক-একদিন!'

'তার মধ্যে কুড়ি মিনিটই অবশ্য তুমি বলেছো,' দুর্গাদাস মৃদু গলায় হেসে উঠলো।

আরতি নিঃশব্দে একবার চোখ ফেললো দুর্গাদাসের চোখে। কঠিন আর উজ্জ্বল সেই চোখ। লম্বা মেয়েটি, দোহারা গড়ন, গায়ের রং কালোর দিকে, কিন্তু মুখের চামড়া আঙুরের মতো মসৃণ। হালকা নীল শাড়ির সঙ্গে মান্দ্রাজি সিঁদুরের টিপ পরেছে কপালে, হাতের বটুয়া কালোতে জরিতে কাজ করা। দাঁড়িয়েছে কোমরের কাছে দুই হাত ভাঁজ ক'রে, সোজা হ'য়ে মাথা উঁচু রেখে। পাথরে মূর্তির মতো ভারি, মন্থর ও গর্বিত মনে হয় তাকে, কথা বলার সময় মুখে বেশি রেখা পড়ে না, শুধু মাঝে-মাঝে

চোখ দুটি ঝকঝক ক'রে ওঠে ; দেখে মনে হয় বাড়িতে আগুন লাগলেও সে আস্তে-আস্তে চলবে আর গলার আওয়াজও চড়াবে না। সব মিলিয়ে এমন-কিছু আছে তার মধ্যে, এক ধরনের ঝকঝকে ঠাণ্ডা আত্মস্থতা, যা মানুষকে চুম্বকের মতো টানে, আবার ধাক্কা দিয়ে ফেরৎ পাঠিয়েও দেয়।

'তাছাড়া, আব-একটাও কথা ছিলো—আমার সেই "বিনয় সরকারের বৈঠক" ব'লে বইটা—'

'তুমি কী করবে ও-বই দিয়ে?'

'পাতা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ঘুড়ি ওড়াবো বোধহয়।'

'পরীক্ষা দেবে ভাবছো নাকি?'

'দেবো না এমন কথা ভাবছো কেন?'

'কিন্তু—পড়ার সময় আর কি কখনো হবে তোমার?'

'সে-কথা বরং আমিই তোমাকে জিগেস করতে পারি।'

'তুমি আমার কথা কিছু জানো না, দুর্গাদাস। একটু ভেবে কথা বোলো।'

দুর্গাদাস এক পলক তাকালো আরতির দিকে, তক্ষুনি হাত নেড়ে বললো, 'ও-সব থাক। তাহ'লে বইটা কাল নিয়ে এসো কফি-হাউসে। নাকি তোমার বাড়ি গিয়ে নিয়ে আসতে হবে?'

'কিন্তু ও-বই তো আমি অন্য একজনকে দিয়ে দিয়েছি।'

'দিয়ে দিয়েছো? জন্মেব মতো?'

'ধ'রে নাও জন্মের মতোই।'

'কী মুশকিল—বইটা আমার নিজেরও নয, আজকাল আর ছাপাও নেই—তা যাকগে, ভালোই হ'লো, একটা অন্তত "জন্মের মতো" সম্বন্ধ পাতানো গেলো তোমাব সঙ্গে।'

'ভাবিসনে, দুর্গা, বইটা আমার কাছে আছে, ফেরৎ পাবি—' একটু দূর থেকে গৌতম মুখ ফেরালো ওদের দিকে।

আরতি আর দুর্গাদাস যতক্ষণ কথা বলছিলো, ততক্ষণ আবো দুটি ছোটো-ছোটো দৃশ্য অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো ঐ ঘবে। গৌতম এগিয়ে এসেছিলো শ্রীপতির কাছে, টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নিচু গলায় কথা বলছিলো তার সঙ্গে। টেবিলটাতে এক হাত চেপে শ্রীপতি শুনছিলো—বা শুনছিলো না—অন্তত পক্ষে কোনো জবাব দিচ্ছিলো না, তাকিয়ে ছিলো একমনে টেবিলটার দিকেই—যেন তার ঘাড়ে এমন ব্যথা হয়েছে যে মাথা তুলতে পারছে না। কান দুটো বড়ো-বড়ো তার, মাথা নিচু থাকার জন্য তা আরো বেঢপ দেখাচ্ছে, কপালের একদিকে নেমে এসেছে না-আঁচড়ানো চুল। ওদিকে তক্তাপোশে মুখ ঢেকে ব'সে আছে বন্দনা, পাশে অসহায় হিমেন্দু। প্রথমে খুব বেগে কান্না এসেছিলো বন্দনার—প্রায ডুকরে উঠেছিলো—আস্তে-আস্তে তা গুনগুনানিতে পরিণত হ'লো, এতক্ষণে থেমে এসেছে। ঘরের অন্য চাবজনকে তাকে লক্ষ না-করার ভান করতে হচ্ছে—তা ছাড়া আর কী করতে পারে তারা, এ-রকম অবস্থায় সমবযসী তরুণবা পরস্পরকে সান্ত্বনা দিতে পারে না—দুর্গাদাস তার কান্নার আওয়াজ কানে নিয়েও অবিরাম বকবক ক'রে গেছে। চোখ দিয়ে অনেক জল পড়েছে বন্দনার—এমন সত্যিকার কান্না বেশ কিছুদিন পবে কাঁদলো সে, কিন্তু মনে হচ্ছে আরো কিছুক্ষণ কাঁদতে পারলে মনটা বেশ হালকা হ'তো।

মুখ থেকে আস্তে-আস্তে হাত সরিয়ে নিলো বন্দনা, সোজা হ'য়ে বসলো। চুল ঠিক ক'রে নিলো হাত দিয়ে, বটুয়া থেকে রুমাল বের ক'রে চোখে, নাকে বুলিয়ে নিলো। হিমেন্দু তাব কানেব কাছে ফিশফিশ ক'রে বললো, 'চলো যাই এবার।'

তার দিকে মুখ ফেরালো বন্দনা।—'আমার দিকে তাকাও তো ভালো ক'রে। খুব বিশ্রী দেখাচ্ছে আমাকে?'

'না, না, বিশ্রী দেখাবে কেন?'

'কেন আবার কী? একে তো আমি দেখতে ভালো নই, তার ওপর কেঁদে-কেটে আরো বিশ্রী হ'য়ে গিয়েছি। কিন্তু তুমি কিছু বোঝো না—তোমাকে জিগেস কবা না-কবা সমান।'

'বন্দনা, তুমি আর থেকো না এখানে। চলো—'

'ও-রকম "চলো চলো" কোরো না তো, হিমেন্দু!' এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালো বন্দনা ; যেখানে গৌতম শ্রীপতির সঙ্গে কথা বলছিলো সেখানে গিয়ে গৌতমের মুখোমুখি দাঁড়ালো। গৌতম কথা বন্ধ ক'রে তাকালো তার দিকে, কিছু বললো না।

'কী মশাই, চিনতে পারছেন না আমাকে? আমি বন্দনা সেন, দশ মাস আগে পর্যন্ত যাকে একবেলা চোখে না-দেখলে রাত্রে ঘুম হ'তো না আপনার, যার বাড়িতে রাত এগারোটা অবধি প'ড়ে থাকতেন নানা ফিকিরে বন্ধুদের এড়িয়ে, যার মা-র হাতের বিস্তর পোলাও পায়েস কোপ্তা মুড়িঘণ্ট হজম করেছেন আপনি, আর যার সঙ্গে দেখা করার জন্য বৃষ্টির মধ্যে তিন মাইল রাস্তা হেঁটে-হেঁটে চ'লে এসেছিলেন একবার! হ্যাঁ—সেই বন্দনা সেন। চিনতে পারছেন না?'

মুহূর্তে বন্দনাকে ঘিরে কয়েকটি মনোযোগ গ'ড়ে উঠলো। হিমেন্দু উঠে এসে দাঁড়ালো তার পাশে, মনের কষ্টে নীলচে দেখাচ্ছে তার মুখ। শ্রীপতি—এতক্ষণ পর মাথা তুলে—একদৃষ্টে বন্দনাকে দেখছে, কেমন একটা অদ্ভুত হাসিতে তার ঠোঁট আর মুখ বিকৃত হ'য়ে আছে। দুর্গাদাস, আরতিকে ভুলে, ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখছে—শুধু বন্দনাকে নয়, শ্রীপতিকেও—তার সব-সময় হাসিখুশি মুখে যেন আস্তে-আস্তে বিষাদ ছড়িয়ে পড়লো। শুধু আরতি তাকিয়ে রইলো সামনের দেয়ালটার দিকে—স্তব্ধ, একা, কঠিন, আর গৌতমের ঠোঁট দুটি কিছু-একটা বলার জন্য ন'ড়ে উঠেই আবার বুজে গেলো।

'কী, কথা বেরোচ্ছে না মুখ দিয়ে? কিন্তু কথা তুমি বলতে পারো না তা তো না, ঐ তোমার ঠোঁট দুটি থেকে অনেক মধু ঝ'রে পড়তে শুনেছি আমি—"আমার সোনালি চাঁদ, আমার রুপোলি পাখি, আমার হরিণের দ্বীপ, আমার ময়ূরের বন, আমার রোদ, আমার আলো, আমার বৃষ্টি—"ঠিক বলছি না?' একটা বাঁকা হাসি যেন কান্নার মতো ভেঙে দিয়ে গেলো বন্দনার মুখ, তার হালকা শরীরটির মধ্যে ঝড় উঠলো, নিশ্বাস পড়লো জোরে-জোরে, চুল উড়ে পড়লো কপালে, ফর্শা রং লাল হ'তে-হ'তে প্রায় কালো দেখালো। 'আর ও-সব কথাই আরেকজনকে বলছো এখন—না কি নতুন কিছু বানিয়েছো? না কি নানা বই থেকে টুকে-টুকে খাতায় লিখে রাখো ও-সব?—ঠিক তেমনি, সকলের চোখের সামনে, আমার চোখের সামনে, নির্লজ্জের মতো জোড়ে ঘুরে বেড়াও! কিন্তু তোমাকে নির্লজ্জ বললে কিছুই বলা হয় না, গৌতম। তুমি পাষণ্ড, তুমি নরাধম, তুমি নরকের কীট। অন্ততপক্ষে কলকাতা ছেড়ে চ'লে যেতে পারো। অন্ততপক্ষে ঐ মেয়েটাকে বিয়ে ক'রে ভদ্র হ'তে পারো। আমি যেখানে যাই ভয়ে-ভয়ে থাকি পাছে তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায়। কিন্তু কখনো দেখা হ'য়ে যাক তা আমি চেয়েওছিলাম মনে-মনে। আজ এদের সকলের সামনে তুমি কাঁদালে আমাকে—কী বোকার মতো কাঁদলাম আমি, কী অপমান হ'লো আমার! কিন্তু এই অপমানের প্রতিশোধও আমাকে নিতে হবে—সব-কিছুর প্রতিশোধ আজ হ'য়ে যাক—এদের সকলের সামনে তোমার মুখে জুতো মারবো আমি, তারপর তুমি সখীকে নিয়ে এখান থেকে বেরোবে।'

বেগে নিচু হ'লো বন্দনা, তার হাতে এক পাটি লাল স্যান্ডেল ঝলসে উঠলো। হিমেন্দু আর দুর্গাদাস দু-দিক থেকে ধ'রে ফেললো তাকে। দুর্গাদাস গম্ভীর গলায় বললো, 'ছি বন্দনা, এ-সব কী হচ্ছে! ফ্যালো! মাথা-খারাপ হ'লো নাকি তোমার? গৌতম, তুই চ'লে যা!'

'আমাকে কারো পছন্দ না-হ'লে তিনি চ'লে যেতে পারেন, আমি কারো কথায় চ'লে যেতে বাধ্য নই।'

'এ আবার কী-রকম জবাব হ'লো? সত্যি তুই বাজে হ'য়ে যাচ্ছিস, গৌতম—তোর কি হৃদয় ব'লে কিছু নেই আর?' দুর্গাদাস হাত ধ'রে বন্দনাকে তক্তাপোশের কাছে নিয়ে এলো। 'একটু বোসো তুমি, বন্দনা। শান্ত হও। জল খাবে?'

ছুটে হিমেন্দু কুঁজো থেকে জল নিয়ে এলো। প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে একটা রুমাল বের করলো দুর্গাদাস। সেটা নেড়ে-নেড়ে হাওয়া দেবার চেষ্টা করলো।

'থাক—হাওয়া লাগবে না।'

'জল খাও তবে।'

'খাচ্ছি।' জল খেয়ে, চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে কিছুটা শান্ত হ'লো বন্দনা। দুর্গাদাস শ্রীপতির দেয়া সেই ময়লা নোট দুটো বের ক'রে বললো, 'হিমেন্দু একটা ট্যাক্সি ক'রে ওকে বাড়ি নিয়ে যাও।'

'আমি এখন যাবো না।'

'কী অদ্ভুত!' হিমেন্দু করুণ চোখে বন্দনার দিকে তাকালো, কিন্তু বন্দনা তা লক্ষ না-ক'রে বললো, 'আমিও কারো কথায় চ'লে যেতে বাধ্য নই। আমিও এখানে থাকবো।'

'কিন্তু আমরা যে মীটিঙে যাবো এক্ষুনি।'

'আমার কি সেখানে যাওয়া বারণ?'

'বাঃ, বারণ হবে কেন,' দুর্গাদাস খামকা একটু লাল হ'লো হঠাৎ, 'আমরা তো বলছিলাম—' দুর্গাদাস চেষ্টা করলো ঘরের আবহাওয়াকে আবার বেশ সহজ ক'রে আনতে—'তা বেশ হ'লো, সবাই মিলে যাওয়া যাবে—খুব ভালো—কিন্তু তুমি আবার হঠাৎ রেগে-টেগে যাবে না তো, বন্দনা?'

'না, এখন আর রাগ নেই আমার—আর কেনই বা রাগ—নিজের মনের ওপর সত্যি তো হাত নেই মানুষের। ওর দোষ কী বলো—আমিই অন্যায় করেছি, অভদ্রতা করেছি, যদি বলো ক্ষমা চাইতেও পারি ওর কাছে। চাইবো?'

দুর্গাদাস, যে দু-বছর ধ'রে বন্দনাকে অনবরত দেখে আসছে, সেও স্তম্ভিত হ'লো এই কথা শুনে। ব্যস্ত হ'য়ে বললো—'না, না, ক্ষমা চাইবে কেন, ক্ষমা চাইবার কী হয়েছে—আর-কিছু না, বেশ—বেশ সহজ হ'য়ে থাকো এই আরকি বলছি আমি।'

'ক্ষমা চাইবার কিছু হয়নি তা নয়,' ঘরের অন্য দিক থেকে আরতির গলা শোনা গেলো, 'কিন্তু আমরা তোমাকে ক্ষমা করলাম, বন্দনা। সত্যি ভারি অসভ্য মেয়ে তুমি—কিন্তু আমরা ক্ষমা করলাম।'

হিমেন্দু আরতির দিকে তাকালো একবার, একবার বন্দনার দিকে তাকালো। তারপর আস্তে-আস্তে কয়েক গজ মেঝে পার হ'য়ে আরতির সামনে দাঁড়িয়ে বললো, 'মাপ করবেন, আপনার সঙ্গে আমার বেশি আলাপ নেই, কিন্তু না-ব'লে পারছি না আপনার আজকের ব্যবহার অত্যন্ত অসংগত।'

ঠাণ্ডা চোখে হিমেন্দুকে বিদ্ধ করলো আরতি। একটু পরে কথা বললো, 'আমাকে বলছেন?'

হিমেন্দু ঢোক গিলে জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, আপনাকেই। কিছু বলার আগে কথাটা কী, তা ভেবে দেখা কি উচিত নয়?'

'আপনার কথাটা খাঁটি, বন্দনাকে বুঝিয়ে দিলে ওর উপকার হবে। বুঝিয়ে দিতে কিছু সময় লাগবে অবশ্য, কিন্তু আপনার ধৈর্য আছে দেখতে পাচ্ছি—আপনি পারবেন।'

হঠাৎ কানের মধ্যে শোঁ-শোঁ শব্দ শুনলো হিমেন্দু শুকনো গলায় চেষ্টা ক'রে উচ্চারণ করলো—'আপনি বন্দনার পায়ের নখের যোগ্য নন। তাকে অপমান করার চেষ্টা করলে আপনি নিজেই ছোটো হ'য়ে যাবেন—তাছাড়া কিছু লাভ হবে না।'

শরীরটিকে ঈষৎ পেছনে হেলিয়ে ছোট্ট ক'রে হেসে উঠলো আরতি। ছোটো, তীক্ষ্ণ হাসি ; থেমে যাবার পর একটুও রেশ রইলো না তার, সঙ্গে-সঙ্গে আরতির মুখে পাষাণের স্থৈর্য ফিরে এলো।

তাড়াতাড়ি কাছে এসে দাঁড়ালো দুর্গাদাস।—'কী মুশকিল, আবার ঝগড়া বাধালে নাকি তোমরা?—ঈশ, কেন যে এ-সব গোলমাল তোমরা ভালোবাসো!—এখন থামো সবাই—শোনো—তা আরতি, হিমেন্দুর সঙ্গে এই বোধহয় প্রথম দেখা হ'লো তোমার?'

'কিন্তু আশা করি এই শেষ নয়,' ঠোঁটের কোণে হাসলো আরতি।

'আমার বন্ধু, হিমেন্দু তালুকদার, আর ইনি আরতি মৈত্র।—আর কিন্তু ও-সব কথা না! চলো।'

সভ্য সমাজের প্রথা-অনুযায়ী হিমেন্দু আর আরতি নমস্কার বিনিময় করলে। হিমেন্দু বন্দনার কাছে ফিরে গিয়ে বললো, 'আমি বলছিলুম কী, তুমি বাড়ি ফিরলেই ভালো হয় এবার। সেই কখন বেরিয়েছো—'

'কী বললে তুমি আরতিকে?'

'বললাম যে সে তোমার পায়ের নখের যোগ্য নয়, আর—'

'আরতি দেখতে খুব সুন্দর, না? কী সুন্দর দাঁড়িয়েছে, দ্যাখো! আর গৌতম, সেও তো বেশ লম্বা, স্বাস্থ্য ভালো—কেমন কোঁচা লুটিয়ে ধুতি পরেছে আজ—চমৎকার মানাবে দু-জনকে। আচ্ছা, আমি যদি আজ থেকে আরতিকে ভালোবাসতে আরম্ভ করি, কেমন হয়? তাহ'লে নিশ্চয়ই আরতিও আমাকে ভালোবাসবে, আর আরতি যদি—'

'চলো, উঠে পড়ো এবার। বন্দনা!' ঘরে মধ্যে নড়াচড়া শুরু হ'য়ে গেলো, ঠিক বন্দনার পাশ দিয়ে গৌতম চ'লে গেলো দরজার দিকে, আর তাকে যেতে দেখামাত্র বন্দনাও উঠে দাঁড়ালো। দীর্ঘশ্বাস চেপে হিমেন্দুও উঠলো একটু পরে।

দুর্গাদাস পেছনে প'ড়ে শ্রীপতির কাছে ফিরে এলো। এখনো তেমনি দাঁড়িয়ে আছে সে, টেবিলে একটা হাত রেখে, এতক্ষণ তার ঘরের মধ্যে যা-কিছু ঘ'টে গেলো তা যে সে অনুধাবন করেছে এই মুহূর্তে তেমন কোনো চিহ্ন তার মুখে নেই। তার মুখটা গবম আব লালচে দেখাচ্ছে, যেমন হয় জ্বর হ'লে।

'শ্রীপতি, তুই যাবি না?'

'আমার কিছু ভালো লাগে না, দুর্গা। সাহিত্য ভাবতে ঘেন্না করে। রাজনীতি ভাবতে ঘেন্না করে। যা-কিছু নিয়ে মাতামাতি করিস তোরা—জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, দর্শন—সব ভাবতে ঘেন্না কবে। আমাকে তোরা ছেড়ে দে।'

শ্রীপতির চোখের মধ্যে একটু তাকিয়ে থাকলো দুর্গাদাস, তারপর তার হাত চেপে ধ'রে বললে, 'আরে চল, চল।'

শ্রীপতি স্যাণ্ডেলে পা ঢুকিয়ে দিলো।

৩

মনোহরপুকুর আর রসা রোডের মোড়ে 'সুনন্দা'। একতলায় চায়ের দোকান, দোতলাব একটি ঘবে (বাকি অংশে মালিক থাকেন) মাছের-ঝোল-ভাত পরিবেশন কবা হয, ফরমাশ দিলে ঢাকাই পবোটা চিংড়ির কাটলেট মাংসের কোপ্তা ইত্যাদি শৌখিন খানাও। এই দোতলার ঘরে আজ 'সপ্তর্ষি'ব বৈঠক বসেছে।

'সুনন্দা'র মালিকের নাম গিরীশ কুণ্ডু, কিন্তু দোকানটি আসলে চালায় 'সপ্তর্ষি'র তরুণ সাহিত্যিকেরা। 'সপ্তর্ষি' নামে পত্রিকা বের করে তারা—বছরে তিন বার কি চার বার বেরোয় ; কেউ কলেজে বা যুনিভার্সিটিতে পড়ছে, কেউ চাকুরে, আর কেউ বা চাকরি খুঁজছে—দু-চারজন বিয়ে ক'বে পুত্রমুখও দেখেছে এর মধ্যে ; কিন্তু যে যা-ই করুক আর যার অবস্থা যেমনই হোক, দিনরাত্রির মধ্যে কতগুলো ঘণ্টা তাদের 'সুনন্দা'য় কাটানোই চাই। দু-বছর আগে দোকানটির পত্তন হওয়ামাত্র সেটিকে তারা 'ক্যাপচার' করেছিলো ; এখন তাদের অবাধ গতিবিধি সেখানে, ধারের সুবিধে প্রচুর, এক-এক পেয়ালা চা নিয়ে দিব্যি দু-তিন ঘণ্টা কাটিয়ে দেয় ;—অনেক সম্পাদকীয় কাজ সেখানে সম্পন্ন হ'য়ে থাকে, অনেক তর্কাতর্কি হয়, কেউ-কেউ দোতলার ঘরে ব'সে কবিতাও লেখে ;—এই একটা বিষয়ে তারা হাল আমলের ফরাশি লেখকদের মতো, এ-কথা ভাবতে বেশ গর্ব হয় তাদের। গিরীশ কুণ্ডু এদের যথোচিত ভয়-ভক্তি ক'রে চলেন, নিজেই গরজ ক'রে সুব্যবস্থা ক'রে দেন এদের বৈঠকের জন্য ; কেননা মোটের ওপর এদের কাছ থেকে যা টাকা পাওয়া যায় সেটা তুচ্ছ নয়, আর তার ওপর—আর সেটাই বড়ো কথা—এদের সুবাদে অল্প সময়েই নাম ছড়িয়েছে 'সুনন্দা'র, ইন্টেলেকচুয়েলদের সংসর্গে থাকার একটা প্রেস্টীজ আছে তো।

সরু সিঁড়িতে বারকয়েক ঠোক্কর খেয়ে দুর্গাদাস তার সঙ্গীদের নিয়ে যখন দোতলায় পৌঁছলো তখন

সভা আরম্ভ হ'তে আর দেরি নেই।

মাঝারি ঘরে জন-চল্লিশ সাহিত্যচারী বসেছে। মাথার দিকে বক্তার জন্য টেবিল-চেয়ার, ঘরের অর্ধেক পর্যন্ত ভেনেস্তা চেয়ার পাতা হয়েছে, তারপর দু-সার বেঞ্চি, তারপর দাঁড়াবার জন্য ফাঁকা জায়গা খানিকটা। জুন মাসের সেই পরিষ্কার সন্ধ্যায় পাগলের মতো হাওয়া দিচ্ছিলো কলকাতায়, কিন্তু ঐ ঘরটার দক্ষিণ বন্ধ, পাখা যথেষ্ট নেই, বাইরে থেকে আসামাত্র প্রথমেই একটা ভারি আর জমাট উত্তাপ বন্দনাকে আঘাত করলো।

—'উঃ, কী গরম এখানে!' বন্দনা এগিয়ে গেলো পাখার কাছে, একটি ছেলেকে দেখে বললে, 'আমাকে বসতে দেবেন, অভিজিৎ?'

'দেরিতে এলে দাঁড়িয়ে থাকতেই হবে, এখানে লেডীজ সীট নেই।'

'এটা তো মানবেন যে দাঁড়িয়ে থাকার পক্ষে আমার চাইতে অনেক বেশি যোগ্য আপনি?'

'আপনি যদি নিজেই তা স্বীকার করেন তাহ'লে আর কথা কী,' মুচকি হেসে ছেলেটি চেয়ার ছেড়ে দিলো বন্দনাকে। আর বন্দনার ঠিক পেছনে লম্বা বেঞ্চিতে জায়গা ক'রে নিলো হিমেন্দু।

অন্য চ'রজন পেছনের দিকে দাঁড়িয়ে রইলো। আরতির সেই এক ভঙ্গি—ঋজু, হাত দুটি কোমরের কাছে ভাঁজ-করা, দেয়ালে ঠেশান দিলে না পর্যন্ত—সে যেন জানে দাঁড়িয়ে থাকলে তাকে বিশেষ ভালো দেখায়। গৌতম থাকলো তার পাশে, সকৌতুকে নিরীক্ষণ করতে লাগলো রথীন্দ্র রায়কে, যে তার স্বরচিত নিবন্ধের ছোটো-ছোটো পাতাগুলো গোছাতে-গোছাতে ততক্ষণে উঠে দাঁড়াচ্ছে। দেয়ালে ঠেশান দিয়ে, আরতি আর গৌতমের সঙ্গে খানিকটা ব্যবধান দেখে, পাশাপাশি দাঁড়ালো শ্রীপতি আর দুর্গাদাস, দুর্গাদাস শ্রীপতির কাঁধে হাত রাখলো।

রথীন্দ্র তার কাগজ থেকে পড়া শুরু ক'রে দিলো। কোনো ভূমিকা করলো না, কাগজ থেকে চোখও তুললো খুব কম, শুধু মাঝে-মাঝে হাত-নাড়ার দ্বারা বুঝিয়ে দিলো যে সে নিতান্তই স্বগতোক্তি করছে না। বেঁটে ছেলেটি, মুখখানা গোলগাল, ঠোঁট পাৎলা আর হাঁ-টা মস্ত, আর পড়ার সময় সেই ঠোঁটের কাজ অনাবশ্যক রকম বেশি হচ্ছিলো, অনেকে যেমন পান চিবোতে মুখ নাড়ে, তেমনি ভঙ্গি সহযোগে কথাগুলো বেরোতে লাগলো তার মুখ দিয়ে।

'আজ আমরা এক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা মানে বাংলাদেশের তরুণতর লেখকরা। জগতের কথা অনেক ভেবেছি আমরা ; ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়াকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন বুনেছি। ধূসর সেই স্বপ্নজাল, তা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা এখন আমাদের কর্তব্য। আমরা এখন স্বাস্থ্য ফিরে পেতে চাই।

'সুস্থ হ'তে হ'লে সকলের আগে দরকার নিজেদের বাঙালি ব'লে উপলব্ধি করা। বাংলা আমাদের দেশ ; জগতের মধ্যে, এমনকি ভারতের মধ্যেও আমাদের আছে একটি বিশিষ্ট বাঙালি জীবনধারা ; যুগ যুগ ধ'রে পদ্মা-গঙ্গা মেঘনার কোলে আমরা লালিত হয়েছি। ইংরেজ বণিকের তৈরি এই কলকাতা শহর, ইংরেজ বণিকের আমদানি এই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা, আর চায়ের টেবিলে এলিয়ট রিলকে পিকাসো শলোকহু হেমিংওয়ে ডালি-র নাম আওড়ানো—সেই যুগ-যুগ ধ'রে প্রবাহিত জীবনধারার কাছে এ-সবের মূল্য কতটুকু?'

'রাবিশ!' ব'লে উঠলো দুর্গাদাস। 'ঠিক সাত দিন আগে ডালি-র নাম শুনেছে। বাজে বকছে।'

শ্রীপতি কিছু বললো না, চোখও ফেরালো না দুর্গাদাসের দিকে। আরতি ঘাড় বেঁকিয়ে একবার দুর্গাদাসের দিকে তাকালো।

'আমাদের যুগসন্ধি আমাদেরই, আমাদের সমস্যাও আমাদের—অন্য কোনো দেশে তার উত্তর নেই। হতাশা, ক্লান্তি, অনাস্থা, দুরভিলাষ—পশ্চিমী রোগের এই সব উপসর্গ, যার সংক্রমণ এমনকি উপনিষদ-ভক্ত রবীন্দ্রনাথও এড়াতে পারেননি, তার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন থেকে আমাদের পূর্ববর্তীরা বহুকাল কাটিয়ে গেছেন—কিন্তু আমরাও কি তা-ই থাকবো? সুস্থ, সুখী, বলিষ্ঠ জীবন—তা কি আমরা নিজেরা কোনোদিন উপার্জন করতে পারবো না—তা কি আমাদের ধার ক'রে আনতেই হবে য়ুনেস্কো অথবা

মস্কো থেকে?'

ঘরের মধ্যে টিটকিরির মৃদু হাসি উঠলো, মাথা নেড়ে সমর্থন জানালো অনেকে, দু-একটা হাততালির শব্দ হ'লো ; কিন্তু বক্তা কোনোটাই লক্ষ করলো না।

'আমাদের তিরিশের কবিরা ছিলেন ভীরু ও কামুক, যে-স্বাধীনতার ধ্বজা তাঁরা উড়িয়েছিলেন তার সঙ্গে বাস্তবের কোনো যোগ ছিলো না। একজন তাঁর নিজের কামদাহ সহ্য করতে না-পেরে তার জন্য অপরাধী করলেন ভগবানকে, প্রেমিকার দেহের অন্তরালে কঙ্কালের দুঃস্বপ্ন দেখে শিউরে উঠলেন। আরেক জন এক আত্মঘাতীকে এমনতর রোমান্টিক রঙে চিত্রিত করলেন যেন এই বেঁচে থাকা নামক ব্যাপারটাই যুগপৎ হাস্যকর ও বীভৎস। আরেক জন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের খণ্ডপ্রলয়ের মধ্যে তাঁর বিদেশিনী এবং খুব সম্ভব অবৈধ প্রণয়িনীর স্বপ্নে নিমগ্ন হ'য়ে রইলেন। এই সব-কিছুর মূল কথাটা হ'লো জীবনবিদ্বেষ, স্বাভাবিক ও সুন্দরের প্রতি ঘৃণা, কিংবা আফ্রিকার ভুড়ু-বিদ্যার ধরনে অলীক ও অলৌকিকের অন্বেষণে সত্যিকার মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলা। কামের বৃত্তি তার কাছেই পাপ, যে উৎকটভাবে সেটাকে রুদ্ধ করতে চায় অথবা তা নিয়ে স্বেচ্ছাচার করে ; যে-মানুষ বিবাহের শৃঙ্খলার মধ্যে তৃপ্ত হ'তে শেখে তাকে তা পীড়ন করে না, বরং পুষ্টি দেয়। জীবন তারই কাছে অসহ্য যে তার কাছে অসম্ভবের প্রত্যাশা করে ; জীবন যা সহজে দিতে পারে তা গ্রহণ করার মতো বিনয় যার আছে, তার কাছে জীবন ভালো, জীবন সুন্দর।—কিন্তু এ-সব দূষিত ধারণা কোত্থেকে এসেছে তাও আমরা সহজেই বুঝতে পারি, যখন দেখি টি. এস এলিয়ট নামে এক অ্যাংলো-ক্যাথলিক মার্কিন ইংরেজ—সর্বান্তঃকরণে মার্কিন বা ইংরেজ বা ক্যাথলিক কোনোটাই হ'তে না-পেরে—অগত্যা জন্মানোটাকেই পাপ ব'লে ঘোষণা করেন, আর ইয়েটস, যিনি এককালে ছিলেন আইরিশ দেশপ্রেমিক, বৃদ্ধ বয়সে জীবন থেকে পলায়ন ক'রে আশ্রয় নেন আর্টের বৈজয়ন্তীধামে।'

একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেলো—'সাধু! সাধু!' হিমেন্দু নিশ্বাস ফেলে মনে-মনে বললো, 'কী বোকা!'

'চল্লিশের কবিরা এঁদের "এস্কেপিস্ট" আখ্যা দিয়েছিলেন—কিন্তু তাঁরা নিজেরাই বা কী? তাঁদের সব লেখাকে একটিমাত্র সরল বাক্যে অনুবাদ করা যায়—"রাশিয়ার মতো হও।" তাঁদেব কাছে স্বাস্থ্যের আদর্শ বাশিয়া, সুন্দরের আদর্শ রাশিয়া, জগতের আদর্শ রাশিয়া। কিন্তু একেই কি বলে স্বাস্থ্য? রুশীরা যুদ্ধ করেছে, অতএব আমাদেবও যুদ্ধ করতে হবে। রুশীরা জমিদারদের বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, আমরাও বাড়ি জ্বালিয়ে দেবো। তাদের মেয়েরা রেলের এঞ্জিন চালায়, আমাদের মেয়েরাও তা-ই চালাবে। তাদের শত্রু আমাদের শত্রু, তাদের মিত্র আমাদের মিত্র। যেন ভারতবর্ষ পুনর্বার এক উপনিবেশে পরিণত হ'লো, আর আমাদের নতুন প্রভুর নাম রাশিয়া।'

'ছোঃ!' 'হুশ!' 'ঠিক!' নানা ধরনের মন্তব্য হ'লো ঘরের মধ্যে, কেউ হাততালি দিলো, কেউ বা টিটকিরি।

'কিন্তু আজ সন্ধ্যায় রাজনীতির প্রসঙ্গে যাবো না আমি, সাহিত্যের দিক থেকেই বলতে চাই। রবীন্দ্রনাথের যৌবন কেটেছে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা-আন্দোলনের সূত্রপাতে, তিরিশের কবিদের যৌবন কেটেছে আইন-অমান্য ও সন্ত্রাসবাদের পটভূমিকায়, চল্লিশের কবিরা সাবালক হ'য়েই দেখেছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এঁদের সকলেরই মূল মানসিকতা পরাধীন দেশে লালিত হয়েছে। যে-কোনো পরাধীন বা আশাহীন দেশের লোকের মতো এঁরাও বিদ্রোহকে খুব বড়ো ক'রে দেখেছেন, নিষিদ্ধের প্রতি দুর্বার ও ছেলেমানুষি আকর্ষণ এড়াতে পারেননি। তাই এঁদের রচনায় উত্তেজনা এত বেশি, অশ্লীলতা এত বেশি, যা আমরা সকলেই ভালো ব'লে জানি সেই ডাল-ভাত তালপাতার হাওয়াকে উপেক্ষা ক'রে কোনো মন-গড়া আদর্শস্থাপনের চেষ্টা এত প্রকট। কিন্তু আমরা যারা পঞ্চাশের কবি, আমরা বড়ো হয়েছি এক স্বাধীন দেশে, প্রগতিশীল সমাজে, এক কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রে আশ্রয়ে ; আমাদের কাছে এই নতুন যুগ দাবি করছে এক নতুন সাহিত্য, তা আমাদেরই সৃষ্টি করতে হবে।

'পূর্ববর্তীদের নমস্কার, কিন্তু আমরা আজ পরামর্শের জন্য তাঁদের দ্বারস্থ হবো না। কিংবা আমাদের রচনার তাঁরা অনুমোদন করলেন কি করলেন না, সে-কথা ভেবেও চিন্তিত হবো না আমরা। তাঁরা

আমাদের সমবয়সী নন, আমাদের ভাবনা-সাধনা তাঁরা বুঝবেন না। তাঁরা যে-সব ভুল করেছেন তা থেকেই আমরা যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছি. তাঁদের দিয়ে আর-কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের। রামমোহন বিদ্যাসাগর ইত্যাদিকে আমরা অফুরন্তভাবে বাহবা দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু ভেবে দেখিনি যে তাঁরাই আমাদের সমাজের ভিৎ ফাটিয়ে দিয়েছিলেন, আর সেই সুযোগেই বিপ্লবের বিজাতীয় বীজ আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট হ'লো। ইংরেজি শিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা—এই সব বিখ্যাত বিলেতি বস্তুর কুফল যে কত গভীরে ব্যাপ্ত হয়েছে তা বোঝা গেলো যখন কর্ণ কুন্তী কচ দেবযানী সকলেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মোলায়েম ভাষায় য়োরোপীয় রোমান্টিক নায়ক-নায়িকার মতো ভাবাবেগে উদ্বেল হ'য়ে উঠলো। হিন্দু বিবাহের যে-আদর্শকে তিনি প্রবন্ধ লিখে গৌরবান্বিত করেছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে তাকেই ধূলিসাৎ ক'রে দিলেন "যোগাযোগে" কুমুদিনীর চরিত্রে। তাঁর লেখায় আমরা অনেক মণিমুক্তো পাই, কিন্তু আরো বেশি প্রয়োজনীয় অন্ন পাই না ; কালিঘাটের অশিক্ষিত পটুয়ারা যা দিতে পেরেছিলো, পাই না সেই বাংলাদেশের প্রাণস্বরূপ বাঙালি বধূর ছবি, যার হাতে শাঁখা, কপালে ঘোমটায় ঢাকা. আর শুধু মাত্র শাড়ির আঁচলে ও স্বাভাবিক ব্রীড়ায় স্বাস্থ্যে-ভরপুর দেহটি আচ্ছাদিত।'

মেয়েলি গলার খিলখিল হাসির শব্দ উঠলো ; বন্দনা ঘাড় ফিরিয়ে চোখাচোখির চেষ্টা করলো বন্ধুদের সঙ্গে, কিন্তু গৌতমের দিকে চোখ পড়া মাত্র মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো তার। গৌতম আরতির দিকে তাকিয়ে রসিকতা করলো, 'কী ভাগ্যে "বুক-ভরা মধু" বলেনি !' কিন্তু আরতি কোনো জবাব দিলো না।

'রবীন্দ্রনাথের হাতে বিচূর্ণিত উপনিষদ প্রত্যহ আহার করেছি আমরা ; তাঁর ভাষার জাদুতে, ছন্দের কৌশলে মুগ্ধ হ'য়ে সব কথাই সত্য ব'লে মেনে নিতে শিখেছি। কিন্তু ঐ উপনিষদ-সমূহ—তাও তো বিদেশী. প্রক্ষিপ্ত ; যে-শ্বেতবর্ণ, নীলচক্ষু. মাংসভোজী, মদ্যপ ও যুদ্ধপ্রবণ জাতি ঐ গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন. তাঁদের সঙ্গে আমাদের, এই আজকের দিনের বাঙালিদের, কতটুকু সম্বন্ধ? যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছিলো অনেক আগেই. এবং যে উপায়ে আমাদের জীবনে সেই দূরস্মৃতি ফিরে এলো, তাকে আজ সন্দেহের চোখে দেখতে হচ্ছে। যদি দেশে য়োরোপীয়রা না আসতো, যদি জর্মান পণ্ডিতেরা তাঁদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর এই পুরোনো আর পোকায়-কাটা পুঁথিগুলো আবিষ্কার ক'রে স্বজাতিগৌরবে উল্লসিত না-হতেন, আর উনিশ শতকের বাঙালিরা তাঁদেরই সুরে সুর মিলিয়ে নৃত্য না-করতো, তাহ'লে—সন্দেহ নেই— বাঙালি জীবনের সেই প্রাকৃত ধারাই অটুট থেকে যেতো আজ পর্যন্ত—সেই বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, পাঁচালি কীর্তন কথকতা, নবান্নের ধান আর আগমনী গান, ঠাকুমার শেলাই-করা কাঁথা, ঢেঁকির পাড়ের ছন্দ আর প্রদীপের আলোয় বাতাসা ছড়িয়ে হরিলুট। এর আগেও তো কত আক্রমণ হয়েছে এই দেশে, বিদেশীর তলোয়ারের খোচায় হাজার মাথা লুটিয়ে পড়েছে, কিন্তু জীবনের আবহমান বুনোন তাতে ছিঁড়ে যায়নি আমাদের। সে-সব লড়াই ছিলো এক রাজার সঙ্গে আর-এক রাজার. দেশের সাধারণ্য তাতে বিচলিত হয়নি। কিন্তু ইংরেজ এসে শুধু যে আমাদের ধনে-প্রাণে মেরেছে তা নয়, আমাদের মনটাকেও বিকৃত ক'রে রেখে গেছে, নিজেদের সুবিধের জন্য আমাদের কানে জপিয়ে গেছে যে আমরা এক মস্ত বড়ো আধ্যাত্মিক জাতি।—কিন্তু উপনিষদের সেই দ্বিতীয় পাখিকে নিয়ে আমরা কী করবো—আমরা যারা ডালে ব'সে শুধু দেখতে চাই না, চাই বাঁচতে, চাই লোকায়তকে, গাছের ডালে পেকে-ওঠা ফলটিকে জঠরেও চালান করতে চাই। এবং চাই আমাদের নিজস্ব লোকায়তকে, তার কোনো রুশীয় বা চৈনিক প্রকরণকে নয়।

'ভাবতে অবাক লাগে যে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে খাঁটি বাঙালির জীবন কী-রকম বিরলভাবে ধরা পড়েছে। বৈষ্ণব কবিতার রাধাকৃষ্ণ স্বর্গের দেবদেবী হ'তে পারেন, কিন্তু তাঁরা বাঙালি নন, কোনো ধলেশ্বরী বা ইছামতীর ধারে, জামরুলের ছায়ায় কোনো খড়ের ঘরে, তাঁদের কোনো জন্মেও কল্পনা করা যায় না। রাধা স্তন্য দেন না কোনো শিশুকে, কৃষ্ণ আমাদের সংসার থেকে দূরে থাকেন ; তাঁদের পুজো ক'রে যেটুকু সুখ আমাদের তার চেয়ে অনেক, অনেক গভীরতর তৃপ্তি বাংলার স্বরচিত অন্নপূর্ণা আর গাজনের মেলার বাবা মহাদেবকে ভালোবেসে। বিদ্যাসাগর তাঁর নিখুঁত সাহেবিয়ানা চাদরে চটিতে

ঢেকে রাখলেন, মধুসূদনে সেই প্রচ্ছদটুকুও টিকলো না ; বঙ্কিম তাঁর লেখনীকে ক্ষয়িত করলেন বাদশাহি ঐশ্বর্যের বিবরণে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে য়োরোপের ও য়োরোপের কাছে তাদেরই শেখানো ভারতের যশোগান ক'রে জীবন কাটালেন—এঁদের পরবর্তীদের কথা আর না-ই বললাম। এই তো আমাদের বিখ্যাত বাংলা সাহিত্য! কত ভাগ্যে মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হয়েছিলো, আর মেয়েলি ছড়া, আর পূর্ববঙ্গের গাথাসাহিত্য, কত ভাগ্যে কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্তের মতো দু-চারজন কবি জন্মেছিলেন ; নয়তো সমগ্র বাংলা সাহিত্য প'ড়ে উঠেও আমরা ঠিক জানতে পারতাম না বাঙালি জীবনের গড়নটি ঠিক কী-রকম, কী খায় তারা, কী-রকম বাড়িতে থাকে, কেমন ক'রে বসে, হাসে, কলহ করে, ভালোবাসে। জানতে পারতাম না, ঠিক তা নয়, কিন্তু বাঙালি ধরনে জানতে পারতাম না। রবীন্দ্রনাথ বিদেশীর চোখে বাংলাদেশকে দেখেছেন, নিজে তাঁর সোনার তরীতে প্রচ্ছন্ন থেকে কৌতূহলে যা নিরীক্ষণ করেছেন তা-ই তাঁর গল্পগুচ্ছ ; কিন্তু কৃত্তিবাসের হাতে রাম সীতা কৈকেয়ী শূর্পণখাও খাঁটি বাঙালি চরিত্র হ'য়ে ওঠে, আর মুকুন্দরাম ছত্রে-ছত্রে আমাদের বুঝতে দেন যে তিনি যাদের কথা লিখছেন তিনি তাদেরই একজন।'

'এসো, কেটে পড়া যাক!' আরতির কানের কাছে ফিশফিশ করলো গৌতম, আরতি তার শরীরের তার ডান থেকে বাঁ পায়ে বদলি করলো।

'বন্ধুগণ, আজ আমরা যারা তরুণ তাদের ওপর ভার পড়েছে বাংলা সাহিত্যের সেই আদিগঙ্গাকে বাঁচিয়ে তোলার। শুধু পুনরুজ্জীবন নয়, তার সম্প্রসারণ, পরিবর্ধন ও পরিশীলন—এই সবই আজকের দিনে আমাদের দায়িত্ব। বাংলার লোকায়ত ইতিহাস, বাংলার লোকায়ত সাধনা, যুগ-যুগ ধ'রে তার লোক-মানসের অভিব্যক্তি—এই সবই আলোচ্য ও চিন্তনীয় হবে আমাদের। এই কাজে কোনো রাষ্ট্র আমাদের বাধা দিতে পারবে না, হোক তা ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত। প্রেরণার জন্য বাইরে যাবার প্রয়োজন হবে না, কলকাতার দশ মাইল দূরের কোনো গ্রামে কোনো বেড়ার গায়ে ফুটে-থাকা অপরাজিতার নীল চোখেই তা পাওয়া যাবে। আমরা যাবো না দিল্লিতে বা প্যারিসে, মস্কো, রোম, ন্যুয়র্কেও যাবো না, এমনকি জীবিকার চাপে এই কলকাতায় আবদ্ধ থেকেও কলকাতাকে মনে মধ্যে গ্রহণ করবো না। ঔপনিষদিক অকর্মকতা ও গীতায় কথিত নিষ্কাম কর্ম দুটোই আমাদের বর্জনীয় হবে, এদিকে পাশ্চাত্ত্য জাতির চাঞ্চল্য, হিংস্রতা ও কর্মোন্মাদনাও সযত্নে পারিহার ক'রে চলবো। বীর, সন্ন্যাসী, ঋষি বা অবতারের জন্য আর প্রার্থনা নয় আমাদের ; এঁরা প্রত্যেকেই জীবনের শত্রু, নিজে বড়ো হবার জন্য সর্বজনীনকে দলিত করেন। তীব্র ও চরম, অলৌকিক ও আশ্চর্যকে আর খুঁজবো না আমরা, চাইবো স্বাভাবিক হ'তে, সহজ ও সাধারণ হ'তে, সংসারের সামান্যতার সঙ্গে যুক্ত থেকেই নিজেদের সার্থক ক'রে তুলবো। স্বর্ণমৃগের প্রতারণায় ম'জে প্রাণপ্রতিমা সীতাকে আমরা হারাতে চাই না ; দৈবাৎ কোনো পরশপাথর হাতে এলেও সেটাকে জলে গুলে জঠরানলে হজম ক'রে ফেলবো ;—আমরা তা-ই চাই, যা শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকে ; সেই-সব দিয়েই আমাদের জীবন ও কবিতাকে গ'ড়ে তুলতে চাই যা একাধারে বাস্তব ও সনাতন—গৃহ, স্ত্রী, সন্তান, অন্নজল, সকাল সন্ধ্যা বেলফুল কলমিলতা, সুখ, শ্রম, স্বাস্থ্যময় ঘুম, আর সন্ধ্যেবেলায় ঘরে-ফেরা সেই "মা" ব'লে ডাক।

'এ-ই আমার বক্তব্য। এখন আপনাদের কারো যদি কিছু বলবার থাকে আমি তা সাগ্রহে শুনতে প্রস্তুত আছি।'

রথীন্দ্র রায় এই শেষের কথাটাও তার হাতের কাগজ দেখে আবৃত্তি করলো ; মনে হ'লো এটাও সে লিখে এনেছিলো। তারপর শ্রোতাদের দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত ক'রে ব'সে পড়লো সামনের চেয়ারটায়। বোঝা গেলো, লিখে তার যতটা অভ্যেস কথা ব'লে ততটা নেই, এতক্ষণ একটানা কণ্ঠনালী ব্যবহার ক'রে শ্রান্ত হয়েছে। আসলে বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রেই নিবন্ধটি রচনা করেছিলো সে, তর্ক উঠলে অনেকেই তার পক্ষ নেবে এই বিষয়ে আগেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিয়েছিলো ; তবু যদি হঠাৎ কেউ অতর্কিতে তাকে আক্রমণ করে তাহ'লে ওরা সামলে নিতে পারবে কিনা সেই সন্দেহ, পড়ার ফাঁকে-

ফাঁকেই, তাকে হানা দিচ্ছিলো।

পেছনের দেয়াল ঘেঁষে পাশাপাশি দুর্গাদাস আর শ্রীপতিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আরো মন-খারাপ হ'য়ে গিয়েছিলো তার। তারা ঘরে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই সে লক্ষ করেছিলো তাদের, আর সেটাও একটা কারণ, যার জন্য পড়ার সময় একবারও মাথা তুলে তাকাতে পারেনি। দুর্গাদাস তার প্রধান শত্রু, যদিও মৌখিক বন্ধুতার অভাব নেই, আর ওর চরিত্র এমন খোলামেলা যে কিছুতেই ওর ওপর রাগ করা যায় না। রথীন্দ্র জানে যে সমবয়সীদের মধ্যে দুর্গাদাসই একমাত্র, যে তার কবিতার ভক্ত নয়। সব সময় বলে, 'কী বাজে লিখছিস! পানসে। চিনি আর লেবুপাতার গন্ধ মেশানো বার্লির মতো। ফেলে দে!' হেসেই বলে অবশ্য, কিন্তু কখনোই অন্য কিছু বলে না। তা এও না-হয় মেনে নিতে পারতো রথীন্দ্র, যদি তার এমন সন্দেহ না হ'তো যে মতটা আসলে দুর্গার নয়—শ্রীপতির। ঐ শ্রীপতি ভদ্র—লোকটার এত সাহস যে তিরিশের নিচে বয়স নিয়েও সে রথীন্দ্র রায়ের লেখার বিষয়ে কিছুই বলেনি, ভালো-মন্দ নিন্দা-প্রশংসা—কোনো কথাই না। আর তার ওপর ছাত্রমহলে বেশ প্রতিপত্তি লোকটার, (দুর্গাদাস তো আঠার মতো লেপ্টে আছে ওর সঙ্গে) —সে কফি-হাউসে এলে অনেকেই জিলজিল ক'রে ওঠে তার কথা শুনবে ব'লে, বলতেও পারে এঞ্জিনের মতো অনর্গল, কিন্তু এক-একদিন এমনও হয়েছে দু-ঘণ্টা নিঃশব্দে ব'সে থাকার পর নিঃশব্দে উঠে বেরিয়ে গেছে। যাকে বলে অসহ্য! তার বিষয়ে একটা রটনা এই যে সে দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য ইতিহাস কিছুই পড়তে বাকি রাখেনি, কিন্তু রথীন্দ্র এই ভেবে সান্ত্বনা পায় যে শ্রীপতি চার বছর আগে বি. এ. পরীক্ষায় সাধারণ একটা সেকেণ্ড ক্লাশ মাত্র পেয়েছিলো, আর তারপর এম. এ. টাও পড়েনি ; ট্যুশনি ক'রে চালাতে হয় ব'লেই অত বিষয় প'ড়ে নিতে হয়েছে তাকে, আর কতটা তার সত্যিকার বিদ্যে আর কতটা চালিয়াতি আর তার ভক্তবৃন্দের দামামা পেটানো, তা-ই-বা কে জানে। আর তাছাড়া বিদ্যে যতই থাক না, ক্রিয়েটিভ তো নয়, ম'রে গেলে কে ওকে মনে রাখবে? তবু, মাঝে কিছুদিন শ্রীপতিকে তাদের আড্ডার জায়গাগুলোতে দেখা যায়নি ব'লে বেশ শান্তিতে ছিলো রথীন্দ্র—ঠিক আজই আবার কোত্থেকে যে ফুঁড়ে উঠলো। ঐ হতভাগা দুর্গাদাসেরই কাণ্ড।

রথীন্দ্র একবার চোখ তুলে দেখলো দুর্গাটা শ্রীপতির পিঠে খোঁচা দিচ্ছে, আর ঘরে ভাসছে সিগারেটের ধোঁয়া, হাসির শব্দ, খুচরো কথা, কেউ-কেউ রুমাল নেড়ে হাওয়া দিচ্ছে মুখে। বেশ একটা হালকা আবহাওয়া ঘরে, যেন এইমাত্র কোনো হাসির কথা শুনেছে। একটু পরে শ্রীপতিকে দেখা গেলো লম্বা দেহ নিয়ে হেলে দুলে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে। টেবিলটায় হাত চেপে দাঁড়ালো সে, আস্তে-আস্তে ঘর নীরব হ'য়ে এলে বলতে আরম্ভ করলো :

'আমি এখানে আসবো ভাবিনি, এসে কিছু বলবো তা আরো কম ভেবেছিলাম। কিন্তু রথীন্দ্র রায়ের অত্যন্ত সুলিখিত প্রবন্ধটি শুনে আমার মনে দু-একটি চিন্তার উদয় হ'লো, তাই কিছু না-ব'লে পারছি না।

'আমরা প্রথমেই "যুগসন্ধিক্ষণ" কথাটা শুনলাম। কথাটা খুব চেনা আমাদের, বড্ড চেনা। মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই কতবার শুনতে হ'লো! স্বদেশী আমলে যুগসন্ধি, অসহযোগে যুগসন্ধি, হিটলার-স্টালিনের যুদ্ধের সময় যুগসন্ধি, আর এখন, স্বাধীনতার দশ বছর পরে আবার শুনছি যুগসন্ধি। শুধু মহড়াই চলছে, নাটক আর শুরু হয় না। নবযুগ সর্বদাই আসন্ন, কিন্তু কখনোই আগত নয়।

'অবশ্য এক অর্থে যে-কোনো সময়কেই "যুগসন্ধি" বলা যায়, কেননা অতীতের সঙ্গে বর্তমানের বিরামহীন মিলনের নামই ইতিহাস। কিন্তু খুব সম্ভব ইতিহাস আর স্বীকার্য নেই—নয়তো কবিতাকে কী ক'রে এক-একটি দশকের মাপে ভাগ ক'রে নেয়া সম্ভব হ'লো? "তিরিশের কবি," "চল্লিশের কবি", "পঞ্চাশের কবি"—এ-রকম ক'রে বললে মনে হয় যে কবিরা সর্বদাই আঁতুড়ে মৃত্যুলাভ ক'রে থাকেন, অর্থাৎ কবিতা লিখতে আরম্ভ করার কয়েক বছর পরেই তাঁদের কোনো চিহ্ন থাকে না। আর তাহ'লে এই উনিশ-শো সাতান্ন সালে পঞ্চাশের কবিদের আয়ু তো আর তিন বছর মাত্র ; এবং এই সভা, আর সভাস্থলে যা-কিছু বলাবলি হচ্ছে, সবই তাহ'লে অর্থহীন।'

'অন্তত আপনার কথা অর্থহীন!' চড়া গলায় কেউ একজন ব'লে উঠলো। মুহূর্তকাল চুপ ক'রে থেকে আবার বলতে লাগলো শ্রীপতি :

'তবে মানতেই হবে "যুগসন্ধি" কথাটা বেশ সুবিধাজনক। আমাদের পক্ষে তো খুবই। এই আমরা, আমার মতো বা আপনাদের মতো লোকেরা, যাদের প্রতিভা নেই, উদ্যম নেই, ধৈর্য নেই, অথচ আছে নিজের বিষয়ে উচ্চ ধারণা—ঐ "যুগসন্ধি" কথাটা না-থাকলে আমাদের কী মুশকিলই হ'তো ভাবুন দেখি! পরীক্ষায় ফেল করেছি—সমাজের দোষ। ভালো কবিতা লিখতে পারি না, এই দূষিত সমাজ তার জন্য দায়ী। আমার স্ত্রী আমাকে ভালোবাসে না—সেটাও সমাজব্যবস্থারই কুফল। কোনো-এক অস্পষ্ট অনির্ণেয় উপায়ে নবযুগ আসবে, তারপর আমার অর্থের কোনো অভাব থাকবে না, কবিতা লিখে বিখ্যাত হবো, একটি সাধ্বী স্ত্রী ও দশটি রূপসী প্রণয়িনী জুটবে। আমাকে খাওয়াবে সমাজ, পরাবে সমাজ, বুদ্ধি দেবে সমাজ, সুখ দেবে সমাজ, আমার উঠোনের আগাছা সাফ ক'রে দেবে সমাজ, আমার চমৎকার কবিতাগুলি লিখে দেবে সমাজ, নিজের ওপর কোনো দায়িত্বই আর রাখতে হ'লো না। কী আরাম!'

কে যেন হেসে উঠলো ; রথীন্দ্রর মুখ ক্ষণে-ক্ষণে লাল আর ফ্যাকাশে হ'তে লাগলো ; একজন চেঁচিয়ে বললো, 'রথীন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ আমাদের আলোচ্য, তার সঙ্গে আপনার কথার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'নেই কি? আমরা এইমাত্র উপদেশ শুনলাম, "সুখী হও। তাহ'লেই আর-সব হবে।" কিন্তু সুখী হ'তে পারে শুধু তারাই, যারা নিজের ওপর কোনো দায়িত্ব নিতে পারে না—নিতে চায় না। পারে তারাই, যারা শুধু নিজেকে নিয়ে তৃপ্ত, নিজের গণ্ডির বাইরে যাদের চোখ চলে না। যে-পৃথিবীতে রোগ আছে, বঞ্চনা আছে, আছে বিকলাঙ্গ, কুষ্ঠরোগী, পঙ্গু, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, আছে জরার যন্ত্রণা আর আততায়ীর ছুরি, আছে ভয়, লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ, আর সবার ওপরে আছে মৃত্যু—সেই পৃথিবীতে সত্যি কি কেউ সুখী হ'তে পারে? আপনারা রাষ্ট্রিক সুব্যবস্থার দ্বারা দারিদ্র্য দূর করবেন? যত উত্তম ব্যবস্থাই করুন না কেন, কোনো-একজনের তুলনায় অন্য কোনো-একজন কিছু বেশি পাবেই—হয় বুদ্ধির জোরে, নয় চক্রান্ত ক'রে, নয়তো নেহাৎই ভাগ্য ভালো ব'লে। সমাজ চালাতে হ'লে কিছু লোককে কিছু অতিরিক্ত সুবিধে দিতেই হবে, আর তাদের তুলনায় কোটি-কোটি অন্যেরা গরিব থাকবেই—হয় ক্ষমতায়, নয় টাকার অঙ্কে গরিব, আর ও-দুই আসলে একই কথা। আপনারা বিজ্ঞানের বলে সব রোগ নির্মূল করবেন, মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবেন নির্জর দেহে একশো বছর পর্যন্ত? কিন্তু আমরা এখনই দেখছি যে পুরানো রোগের সফল চিকিৎসা নতুন রোগের জন্ম দিচ্ছে ; দেখছি এই বিশল্যকরণী পেনিসিলিনের যুগে পোলিওর উত্থান, ক্যানসারের আতঙ্ক, বজ্রপাতের মতো থ্রম্বসিস। আপনারা হয়তো বলবেন যে সর্বমানবের জন্য কল্যাণসাধনা সবেমাত্র শুরু হয়েছে, যা-কিছু মানুষের পক্ষে গ্লানিকর ও হানিকর তা সবই উচ্ছেদ করতে পারবে মানুষের সুবুদ্ধিপ্রণোদিত বিজ্ঞানের শক্তি। বেশ, তা-ই না-হয় হ'লো , না-হয় এমন দিনের কল্পনা ক'রে নিচ্ছি যখন পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ সব রকম সুযোগ-সুবিধের নিক্তি-মাপা সমান অংশ পাবে, কেউ বুড়ো হবে না, হাঁপানিতে ভুগবে না, দাঁত ব্যথার কষ্টটুকুও পাবে না—মানুষ রোগ আর জরার অর্থ ভুলে যাবে। কিন্তু সেই স্বর্গরাজ্যেও এমন নিশ্চয়তা কোথায় যে আমার প্রতিবেশী আমার চেয়ে বেশি সুশ্রী বা বেশী বিদ্বান বা বেশী বুদ্ধিমান ব'লে আমি হিংসায় জ্ব'লে-জ্ব'লে রোগা হয়ে যাবো না, বা আমি যাকে ভালোবাসি সেও আমাকেই ভালোবাসবে? বিজ্ঞান কি এমন ইঞ্জেকশন আবিষ্কার করবে যার ফলে ঈর্ষাবৃত্তি দূর হ'য়ে যাবে মানুষের, সে যাকে চায় তাকে না-পেলে তক্ষুনি তার বদলে অন্য যে-কোনো একজনকে ভালোবাসতে পারবে—অর্থাৎ কেউ আর অন্য কাউকে ভালোবাসবে না বা ঘৃণা করবে না? কিন্তু তাও যদি সম্ভব হয়, যদি মানুষ তার সুখের জন্য এতদূর পর্যন্ত পরিহার করে তার মনুষ্যত্বকে—তবু তো থাকবে মৃত্যু, আর মৃত্যু থাকলেই ভয় থাকবে, দ্বেষ থাকবে, হিংসা থাকবে, দুঃখ শোক আর্তি আতঙ্ক ঝাঁকে-ঝাঁকে ফিরে আসবে সেই একটি দরজা দিয়ে। এখন আপনারা বলুন, আপনারা কি মৃত্যুকে জয় করবেন, মৃত্যু কি আর থাকবে না?'

একটু থামলো শ্রীপতি। কেমন অদ্ভুত আর বন্য দেখাচ্ছে তাকে, প্রায় হিংস্র, কোনো অবরুদ্ধ বাষ্পে

তার বুকের ভেতরটা ফুলে-ফুলে উঠছে যেন। গায়ের জামাটা আধ-ময়লা, পাজামা কুঁচকোনো, হাতের পাতা দুটো মস্ত, সারা মুখে বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। নড়বড়ে লম্বা শরীর নিয়ে একটু কুঁজো হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তার চোখ দুটো, চোখে শাদা অংশ লালের ফোঁটায় দগদগে। উপস্থিত অনেকেরই মনে হচ্ছে সে একেবারে অবান্তর বিষয়ে কথা বলছে, খিড়কি-দোর দিয়ে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করছে রথীন্দ্রকে, কিন্তু হঠাৎ 'মৃত্যু' কথাটার মুখোমুখি প'ড়ে গিয়ে কেউ তক্ষুনি কোনো উত্তর খুঁজে পেলো না। গালের পেশি শক্ত হ'লো অনেকের, কপালে রেখা পড়লো।

'কথাটা হচ্ছে,' নিশ্বাস নিয়ে আবার বলতে লাগলো শ্রীপতি, 'আমি এই মুহূর্তে সুস্থ আছি ব'লেই কি রোগের অস্তিত্ব ভুলে থাকবো? অটুট আছি ব'লেই ভুলে থাকবো পঙ্গুকে? জীবিত আছি ব'লেই মৃত্যুকে ভুলে থাকবো? না কি, যেহেতু পাখি ডাকে, ফুল ফোটে, শিশুরা খেলা করে, সেই জন্য এই জগৎটাকে এক বাটি পেস্তা-আর-কিশমিশ-মেশানো পায়েস ব'লে কল্পনা করবো, যাব সরের ওপরে একপাল অমর পিঁপড়ের মতো আটকে আছি আমরা? ফুল ফোটে, না-ফুটে পারে না ব'লে , পাখি ডাকে, যেহেতু সে ডাকতে বাধ্য ; এর জন্যে তাদেব বাহবা দেবার কিছু নেই ;—আসলে যাতে এসে যায় তা এই আমি, যে-আমি ফুল আর পাখির গানকে "সুন্দর " ব'লে অনুভব করছি—আমি, একজন মানুষ। মানুষকে বলা হ'য়ে থাকে শ্রেষ্ঠ জীব, কিন্তু মানতেই হবে সে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, কেননা প্রাণীদের মধ্যে শুধু মানুষই জানে যে মৃত্যু অনিবার্য। তাহ'লে প্রশ্ন এই : মানুষ হিশেবে জগতে আমাদের বিশেষ স্থানটি কোথায়।

' "সুখ, শ্রম, বেলফুল, কলমিলতা, স্বাস্থ্যময ঘুম।" অর্থাৎ একটি চাকরি, একটি স্ত্রী, দুটি সন্তান (দুটির বেশি নয়), বছবে কুড়ি টাকা ক'রে বেতনবৃদ্ধি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, বছরে একবার ক'রে ময়ূরভঞ্জ বা রাজগির, বছরে একবার ক'রে শরৎ ঋতুতে কবিতা লেখা—কেননা পুজো-সংখ্যায় কবিতার জন্যেও টাকা দেয। সকলের সঙ্গেই সদ্ভাব রাখা, কেননা কে কখন কাজে লেগে যায় বলা যায় না ; কিন্তু কারো সঙ্গেই ঠিক ঘনিষ্ঠ না-হওয়া —কেননা ঘনিষ্ঠ হ'লেই সে কখনো কিছু দাবি ক'রে বসতে পারে। আমি, আমাব একটি স্ত্রী, আর এই দু-জনেব দুটি সন্তান—শুধু এদেরই জন্য বেঁচে আছি আমি, আব-কিছুতেই আমাব কিছু এসে যায় না। হাঙ্গেরির ব্যাপাব হাঙ্গেবি বুঝবে, তিব্বত-চীন নিজেরা যদি বফা করতে না পারে আমি সেখানে কোন অধিকাবে কিছু বলতে যাবো, আর রুশ-মার্কিনের অস্ত্রসজ্জাকে সেই-সেই দেশের লোক যদি নিন্দে না কবে, আমবা কেন মা-ব চাইতে মাসি বড়ো হ'তে যাই? অন্ততপক্ষে ঝোঁকের মাথায় সকলেব আগে কিছু ব'লে ফেলবো না ; কিছুদিন সবুর ক'রে যেদিকে দলে ভারি দেখবো সেদিকেই হেলবো।-সত্যি তো, প্যারিস মস্কো ন্যুয়র্কে যাবার কোনোই প্রয়োজন নেই আমাদের—ও-সব জায়গা যে বড্ড গোলমেলে, আর আমরা হলাম নির্বিবাদী ভালোমানুষের দল ; দু-শো বছর ধ'রে পশ্চিমী দেশগুলো বাঙালির সাধনাকে যতখানি বিধ্বস্ত করেছে এবার আমরা তাবই সংস্কারক্রিয়ায় লেগে যাচ্ছি—নতুন কিছু গ'ড়ে তোলাও নয়, শুধু মেরামত, চুনকাম, পালিশ কবা, তালি লাগানো। উপার্জন ও মাতব্বরি করবো শহরে, কিন্তু পাচালি গাইবো বটতলা চণ্ডীমণ্ডপের ; পাশ-করা চাকুরে মেয়ে ছাড়া বিয়ে করবো না, কিন্তু ভজনা করবো নাকছাবি আর পাছাপাড়-শাড়ির ; অনাথা বুড়ি পিসিকে একবেলা খেতে দেবো না, কিন্তু তার কুঁচকোনো চামড়ায় বাংলাব অজেয প্রাণশক্তি আবিষ্কার করবো। সন্দেহ নেই, এর চেয়ে সুখের জীবন আর-কিছু হ'তে পারে না।'

কাশির শব্দ হ'লো, তিন-চারজন একসঙ্গে জুতো ঘষলো মেঝেতে। আরতির কাঁধে টোকা দিয়ে গৌতম ফিশফিশ ক'রে বললো, 'শ্রীপতি কী বকম ঘেমেছে দেখছো? ওর পকেটে রুমাল নেই?'

কিন্তু আরতি মুখ ফেরালো না। প্রথম থেকে সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো শ্রীপতির দিকে, নিটোল ঘাড়ের ওপরে তার মাথাটি সাপুড়ের বাঁশির শব্দে সাপের ফণার মতো ঈষৎ দুলছে। জ্বলজ্বল করছে চোখ, ভরপুর ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসি। সেই চোখের ওপর হঠাৎ একবার চোখ পড়ামাত্র দৃষ্টি সরিয়ে নিলো শ্রীপতি।

'আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে বুঝতে পারছি, কিন্তু আমাকে আর দু-মিনিট সময় দিন। আসল কথা,

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ শুনে আমি আজ মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছি ; অমন সরল সত্যভাষণের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ না-জানিয়ে পারছি না। বীর, সন্ন্যাসী ও তপস্বীদের আর চাই না আমরা, আর চাই না কোনোরকম আশ্চর্যকে—এই কথাটা এমন অকপট সাহসের সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশেও আর কে ঘোষণা করতে পারতো? কেন তা চাইবো—আমরা নিজেরা যে এতটুকু আশ্চর্য নই, বিস্মিত হ'তেও ভুলে গেছি আমরা ; আমরা যে সাধারণ, অতি সাধারণের মধ্যেও সাধারণ। আমাদের আগে যাঁরা জন্মেছিলেন এই দেশে—এই রামমোহন বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথের মতো লোকেরা আর কি—তাঁদের কেবলই চেষ্টা ছিলো অসাধারণ হবার—আর অসাধারণ হ'তে পেরেওছিলেন বোধহয় কেউ-কেউ—আর তাঁদের সময়কার সাধারণ লোকেরা নিজেরা সাধারণ ব'লে বোকার মতো বিনীত হ'য়ে ভক্তি করতো অসাধারণকে, বীরপূজা ক'রে ইচ্ছাপূরণ করতো তারা—এমনকি রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখাটি সুদ্ধু নকল করতো। ভাবুন দেখি—কোথায় আমাদের তালপাতার পুঁথির খাড়া-খাড়া খাঁটি বাঙালি হাতের লেখা, আর কোথায় রবীন্দ্রনাথের প্যাঁচানো, গোল আর লীলায়িত ভঙ্গি, যেন এ-বি-সি-ডি-র ছাঁদে ক-খ-গ-ঘ লিখছেন—বাংলার লোকায়ত সাধনার এতবড়ো ক্ষতি কিনা মেনে নিয়েছিলো আমাদের বাবার বয়সি বাঙালিরা! এদিকে আমাদের সুবিধের কথা ভাবুন : আমরা সাধারণ, আর সাধারণ হওয়াটাই গৌরবের বিষয় আমাদের কাছে, অসাধারণত্বই লজ্জার—অসাধারণদের গণ্ডদেশে কেমন নির্বিঘ্নে চুনকালি লেপন করতে পারছি আমরা, আর কেমন নিজেদের সাধারণত্বের গর্বে বছরে পাঁচ পাউণ্ড ক'রে ওজনে বাড়ছি—এমন সুখ, এমন আরাম, এমন নিশ্চিন্ত আত্মপ্রত্যয় আর কি কেউ ভোগ করেছে কোনোদিন? আমরা বাঁচবো—সাধারণ, অতি সাধারণ, সাধারণ, সাধারণের মধ্যে সাধারণ হ'য়ে বাঁচবো—এই আমাদের একমাত্র কথা। বিজ্ঞানের জোরে, আর আত্মা নামক কষ্টদায়ক উপসর্গটাকে উপড়ে ফেলেছি ব'লে, আমরা অনেক, অনেক, অনেকদিন বাঁচবো—বাঁচবো একশো বছর, দেড়শো বছর, দু-শো বছর—মস্ত বুড়ো কোলাব্যাঙের মতো বাঁচবো, মোটা নিরীহ নির্বিষ ঢোঁড়াসাপের মতো, ইঁদুর, টিকটিকি, আরশোলা—আরশোলা—আরশোলা—আরশোলা—' ভাঙা গ্রামোফোন-রেকর্ডের মতো শ্রীপতি হ'য়ে আটকে গেলো এখানে, তার উঁচু কণ্ঠমণিটা কথা বলার চেষ্টায় জোরে ন'ড়ে উঠলো, ঠোঁটের কোণে ফেনা দেখা দিলো, গোল হ'য়ে উঠলো চোখ দুটো, ঘামে-চিকচিকে কপালে চুলের গোছা লুটিয়ে পড়লো। একটু থেমে, ঢোঁক গিলে, গলা নিচু ক'রে আবার বলতে লাগলো—'ক্ষমা করবেন, আপনাদের সকলের হ'য়ে কথা বলার মতো স্পর্ধা আমার নেই, আমি শুধু আমার নিজের কথা বলছি—আমার একটা মজার স্বপ্ন। আপনাদের সঙ্গে ব'সে কফি খেয়ে, ফুচকা খেয়ে, জিলিপি খেয়ে, নানা বিষয়ে আলোচনা ক'রে, বহু পরিশ্রমে গ'ড়ে-তোলা এক-একটি কীর্তিকে হাসির হররায় ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে—তরপর রাত্রে যখন বাড়ি ফিরি, আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ি বিছানায়, আশে-পাশে সব বাড়ির আলো নিবে যায়, কেউ আর আমাকে দেখছে না—তখন আমার মনে হয় আমি একটা আরশোলা হ'য়ে গিয়েছি, তেলতেলে খয়েরি রঙের স্বাস্থ্যবান একটি আরশোলা, বাথরুমের পেছল প্যানে আবামে নেমে গিয়ে—খাচ্ছি আর বেঁচে থাকছি, খুঁটে-খুঁটে খাচ্ছি আব বেঁচে থাকছি, চেটে চেটে খাচ্ছি আর বেঁচে থাকছি। আপনাদের কখনো মনে হয় না এ-রকম?'

শেষের কথাটা—যা শ্রীপতি বললো একেবারে ফিশফিশে গলায়, কিন্তু সকলেই শুনতে পেলো—তা উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে খক ক'রে একবার কাশলো সে, একটি শ্লেষ্মার পিণ্ড উঠে এলো তার মুখের মধ্যে, সেটাকে গিলে ফেলা অসম্ভব মনে হ'লো। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গিয়ে মুখ ধোবার ঘরে ঢুকলো সে, মুখ থেকে যা উগরে তুললো তা টুকটুকে লাল। আবার একটু কেশে যা তুলে আনলো তাও লাল। তৃতীয় বারেও রঙের বদল হ'লো না, লোনা স্বাদে মুখ ভ'রে গেলো। বেসিনটার দিকে প্রায় পুরো এক মিনিট তাকিয়ে রইলো, তারপর জোরে কল ছেড়ে দিলো, সেই লাল রং নিশ্চিহ্ন হ'তে বেশ একটু সময় লাগলো। 'আমার বোধহয় কোনো অ্যান্টিসেপটিক ঢেলে দেয়া উচিত—কিন্তু কিছুই তো নেই এখানে।' হঠাৎ বুঝলো তার মাথা ঘুরছে, সারা শরীর কাঁপছে ভেতরে-ভেতরে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে, আর-কোনো দিকে না-তাকিয়ে, টলতে-টলতে নেমে গেলো সিঁড়ি দিয়ে।

লোকেরা বোঝেইনি যে তার বক্তৃতা ওখানেই শেষ হয়েছে ; ও-রকম হঠাৎ সভা ছেড়ে সে চ'লে যাওয়ায় বড্ড অবাক হ'লো সবাই, রথীন্দ্র ও তার ভক্তরা অপমানিত বোধ করলো শ্রীপতি তার কথার জবাবটা শোনার জন্য অপেক্ষা করলো না ব'লে। অনেক রকম মন্তব্য হ'লো তাকে নিয়ে, তারপর আরো ঘণ্টাখানেক সভা চললো।

৪

'সপ্তর্ষি'র মীটিং তখনও ভাঙেনি, কিন্তু ভিড় পাৎলা হ'য়ে এসেছে, এমন সময় একজন নতুন শ্রোতা ঘরে এসে ঢুকলো। ছোটোখাটো পাৎলা গড়নের একটি মেয়ে, বয়স তেইশ-চব্বিশ, চোখ দুটি ভাসা-ভাসা—খুব শান্ত ধরনের তাকানো। বন্দনা তাকে দেখতে পেয়ে হাত তুলে ডাকলো।

—'অমলা, এই যে।'

অমলা বসলো বন্দনার পাশে, কিছুটা মনোযোগীভাবে সামনের দিকে তাকালো। সেখানে টেবিল ঘিরে ব'সে আছে আরো কয়েকটি যুবকের সঙ্গে রথীন্দ্র আর দুর্গাদাস, তর্ক চলছে এলোপাথাড়িভাবে। হাসির শব্দ, সিগারেটের ধোঁয়া, দুর্গাদাস টেবিলে চাপড় মারছে মাঝে-মাঝে, মন্তব্য ছুঁড়ে দিচ্ছে শ্রোতাদের মধ্যে কেউ-কেউ, কোথাও বা দু-তিনজন আলাদা হ'য়ে নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। তার্কিকদের মধ্যে কেউ-কেউ অমলার চেনা, কিন্তু তারা প্রতিপক্ষের জবাব দিতে এত ব্যস্ত যে তাকে কেউ লক্ষ করলো না।

বন্দনা বললো, 'অমলা, তোমার কী খবর-টবর বলো। অনেকদিন দেখিনি তোমাকে।'

'নতুন কোনো খবর নেই।'

'বি টি পড়ছো শুনলাম?'

'এ-বছর সীট পেলাম না। সামনের বার আবার চেষ্টা করবো।'

দুর্গাদাসের কী-একটা কথা শুনে হিমেন্দু পেছন থেকে নিচু গলায় হেসে উঠলো।

'আহা--শুনতে পেলাম না কথাটা,' বন্দনার গলায় আপশোষ ফুটলো। 'হিমেন্দু, দুর্গাদাস কী বললো বলো না। অমলা, তুমি শুনেছিলে?'

'না, আমি ঠিক—'

বন্দনা একটা ক্লান্তির নিশ্বাস ছেড়ে বললো, 'কী নিয়ে যে এত তর্কাতর্কি তা-ই বোঝা যাচ্ছে না।'—হিমেন্দু, অমলাকে চেনো তো?'

হিমেন্দুর ঠোঁটে লাজুক হাসি ফুটলো। 'দেখেছি মাঝে-মাঝে কফি-হাউসে, ঠিক আলাপ হয়নি।'

'অমলাও নিশ্চয়ই হিমেন্দুর কথা শুনেছো—দুর্গাদাসের কাছে?'

'শুনেছি বইকি।' অমলা আবার সামনের দিকে তাকালো, যেন ওখানে কী কথাবার্তা হচ্ছে তা শুনতে চায়, বা যেন এখানে সে অন্য কোনো দরকারে এসেছে, কোনো তর্কে বা খুচরো আলাপে মন নেই, সভা শেষ হবার জন্যই অপেক্ষা করছে শুধু। আর সত্যিও ঘরের মধ্যে চেয়ার ঠেলার শব্দ হওয়ামাত্র এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালো সে, দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ির ধারে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলো। একটু পরে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তর্ক চালাতে-চালাতে দুর্গাদাস সদলে এগিয়ে এলো সেদিকে।

—'আমি বলি, আরো বেশি অশান্তি এখন দরকার আমাদের। খুব একটা তোলপাড়, নাড়াচাড়া—'

—'থামো, দুর্গাদাস। শ্রীপতির বুলি আর আউড়িয়ো না।'

—'শ্রীপতি সপ্তাহে-সপ্তাহে মত বদলায়—অতএব দুর্গাদাসও।'

—'বাজে বোকো না! কেন মেনে নাও না যে শ্রীপতি অসাধারণ, আর তাই তোমরা—'

'দুর্গাদাস।'

নিচু মেয়েলি গলায় নিজের নাম শুনে দুর্গাদাস থমকে থেমে গেলো। 'আরে—অমলা! তুমি কোত্থেকে?—মানে, বলছিলাম কী, আগে যদি আসতে—' অমলার ঈষৎ ফ্যাকাশে-হ'য়ে-যাওয়া মুখ থেকে দুর্গাদাসের চোখ স'রে গেলো হিমেন্দুর দিকে।—'আশ্চর্য যা হোক! এতক্ষণের মধ্যে তুমি একটা কথা বললে না, হিমেন্দু?'

'সেটা বাহুল্য হ'তো। এখানে আর যা-ই হোক বক্তার অভাব ছিলো না।'

মুখে হাসি টেনে এগিয়ে এলো রথীন্দ্র রায়।

—'অমলা, আপনি কখন এলেন?'

হাসির চেষ্টা ক'রে অমলা জবাব দিলো—'এই খানিকক্ষণ।'

'এত দেরি ক'রে?'

'অন্য একটা কাজ ছিলো, তাই—'

'খুব অন্যায়, খুব অন্যায়—'দু-বার মাথা নাড়লো রথীন্দ্র। 'আমাদের আগের মীটিঙেও আপনি আসেননি মনে হচ্ছে? এ-সব ব্যাপারে আপনার উৎসাহ এত কম কেন বলুন তো?'

আর-একজন বললো, 'আজ দারুণ জমেছিলো, জানেন। রথীন্দ্র যে প্রবন্ধ পড়লো না—চমৎকার! পড়বেন সামনের সংখ্যা ''সপ্তর্ষি''তে।

এই প্রশংসা ঈষৎ সলজ্জভাবে মেনে নিয়ে রথীন্দ্র বললো, 'আমার লেখা আপনি না-পড়লে আমি কিন্তু দুঃখিত হবো না, অমলা দেবী। সাহিত্যের বদলে কোনো ব্যক্তির বিষয়ে উৎসাহ নেয়াই বেশি ভালো মনে হয় আমার,' ব'লে দুর্গাদাসের দিকে বাঁকা চোখে তাকালো রথীন্দ্র, অমলা একটু লাল হ'লো।

হুড়মুড় ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নামলো তরুণের দল, বেরিয়ে এলো রসা রোড আর মনোহরপুকুরের মোড়ে—সেখান থেকে কেউ বাড়িমুখো বাস্ ধরলো, কেউ ছুটলো অন্য আড্ডার সন্ধানে, হিমেন্দু আর বন্দনা একটা বালিগঞ্জের ট্রামে উঠে পড়লো, আর দুর্গাদাস অন্য দুটি ছেলের সঙ্গে উত্তেজিতভাবে কথা বলতে-বলতে ল্যান্সডাউন রোডের দিকে হাঁটতে শুরু করলো। তাদের দ্রুত চলার সঙ্গে তাল রাখতে পারলো না ছোটোখাটো অমলা, পেছিয়ে প'ড়ে-প'ড়ে এক সময় হারিয়েও ফেললো দুর্গাদাসকে, তারপর প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবে তাকে খুঁজে পেলো ল্যান্সডাউন রোডের মোড়ে। একটা পানের দোকানের সামনে একা দাঁড়িয়ে ছিলো দুর্গাদাস, দূর থেকে অমলাকে দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে ডাকলো, 'এই যে! এখানে।'

তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হ'য়ে অমলা এগিয়ে এলো।

'বাঃ, তুমি ছিলে কোথায়? আমি খুঁজছিলাম তোমাকে।'

'আমাকে খুঁজছিলে?' অমলার ঠোঁটে ম্লান হাসি ফুটলো।

'শোনো, আমার পকেট বিলকুল ফাঁকা, সিগারেট কেনার পয়সাটাও নেই। গোটা পাঁচেক টাকা দিতে পারো?'

'পাঁচটা?'

'নেই?' দুর্গাদাস ভুরু কুঁচকালো।

'নেই তা নয়, তবে তা দিয়ে মা-র জন্য একটা ওষুধ কিনতে হবে। তাছাড়া এ-মাসে ট্যুশনির টাকাও পাইনি এখনো—'

'ও।' দুর্গাদাস গম্ভীর হ'য়ে চুল টানতে লাগলো। 'তা তোমার মা-র ওষুধ কাল কিনলে হয় না? আমার যে বড্ড দরকার।'

অমলা চোখ তুলে দুর্গাদাসের দিকে তাকালো একবার, তারপর নিঃশব্দে একটি দশ টাকার নোট বের ক'রে দিলো।

'দ-শ টা-কা! গ্র্যান্ড!' মুহূর্তকাল দেরি না-ক'রে সিগারেট কিনলো দুর্গাদাস, ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে খুশি গলায় বললো, অমলা, তুমি সত্যি আশ্চর্য! কী ক'রে এমন হয় যে তোমার হাতে সব সময় টাকা থাকে, আর আমার হাতে কখনোই কিছু থাকে না?'

এ-কথার কোনো জবাব না-দিয়ে অমলা বললো, 'তুমি কি এখন বাড়ি যাবে?'

'বাড়ি? এক্ষুনি? কী ক'রে ভাবতে পারলে কথাটা!'

অমলা হালকা গলায় বললো, 'তাহ'লে আমাদের ওখানে চলো না।'

'তোমাদের ওখানে? আমি ভাবছিলাম...'

'নয়তো চলো দেশপ্রিয় পার্কে গিয়ে একটু বসি। যাবে?'

'নাঃ, পার্কে যা ভিড় এই গরমের দিনে! বরং—আচ্ছা চলো তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই। ঐ ট্যাক্সিটা ধরা যাক।'

অমলা ত্রস্ত গলায় ব'লে উঠলো, 'ট্যাক্সি দিয়ে কী হবে?'

সে-কথা কর্ণপাত না-ক'রে দুর্গাদাস একটা চলতি ট্যাক্সি থামালো।

'উঠে পড়ো!'

'মিছিমিছি কেন—'

'ওঠো না!'

'কোনো দরকার ছিলো না—'

'সব সময় সিকি-আধুলির হিশেব কোরো না তো!' অমলার পিঠে ঠেলা দিয়ে তাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিলো দুর্গাদাস, নিজে উঠে প'ড়ে বললো 'গল্ফ ক্লাব রোড।'

'আঃ, আরাম।' ট্যাক্সি চলতে শুরু করামাত্র দুর্গাদাস এলিয়ে ব'সে নিশ্বাস ছাড়লো। 'আমি ভাবছি কী জানো, অমলা? একটা চাকরি-ফাকরি পাওয়ামাত্র প্রথমেই একটা স্কুটার কিনবো—বাস্-এর বাদুড়-ঝোলা আর সহ্য হয় না!'

অমলা কথা বললো না। তারও আরাম লাগছিলো—আরো বেশি : এই চলন্ত আধো-অন্ধকারে, দুর্গাদাসের পাশে নিভৃতে ব'সে, তার হাতের খুব কাছাকাছি হাত রেখে, সুখের মতো একটা অনুভূতি হচ্ছিলো তার। ট্যাক্সির জন্য যে, বাজে-খরচ হ'লো, মা-র ওষুধ যে কেনা হ'লো না, আর আজ বিকেল থেকে অন্য যে-সব কথা সে ভাবছিলো, অনেকদিন ধ'রেই ভাবছে বলা যায়—সবই সে ভুলে গেলো তখনকার মতো, মন থেকে সরিয়ে দিলো অন্তত। চেষ্টা করলো খুব গভীরভাবে দুর্গাদাসের উপস্থিতিটুকু অনুভব করতে।...কতদিন—কতদিন হ'য়ে গেলো! আরম্ভ সেই ছেলেবেলায়, শ্যামবাজারে হরি ঘোষ স্ট্রিটের গলিতে, কাছাকাছি বাড়িতে থাকি আমরা, ওর তখনও গোঁফের রেখা পড়েনি, আমি তখনও সাবানের বাক্সে রং-বেরঙের রাংতা জমাই। বিধবা মায়ের এক সন্তান আমি, মা যে-স্কুলটায় পড়ান আমি সেখানকারই ছাত্রী, একসঙ্গে যাওয়া-আসা করি দু-জনে, ভারি শান্তভাবে দিন কাটে আমাদের, কাটছিলো—যতদিন না দুর্গাদাস তার সব দুরন্তপনা নিয়ে ঢুকে পড়লো আমাদের জীবনের মধ্যে। চেনাশোনা, মেলামেশা, ছেলেমানুষি আড়ি আর ভাব, ছেলেমানুষি ফুল, চিঠি, চুমো, তারপর একদিন আমরা বুঝে নিলাম আমাদের বিয়ে হবে। সে কবে, তা যেন আর মনেও পড়ে না। ও আর আমি এক বাড়ির লোক, আমাদের মধ্যে একজনের মা অন্যজনেরও মা, দু-জনে দু-জনের ভালো-মন্দের, সুখ-দুঃখের অংশিদার—এই ধারণাটা ঘিরে রইলো দুটি পরিবারকে, বছরের পর বছর। সেটা এত নিশ্চিত যে তা নিয়ে আর আলাদা ক'রে ভাবতেও হয় না, তা নিয়ে কোনো কথা বলারও দরকার নেই। কত কিছু বদল হ'লো এর মধ্যে—দুর্গাদাসের বাবা হঠাৎ মারা গেলেন, পুঁজিপাটা ভাঙিয়ে মেয়ের বিয়ে দিলেন ওর মা, আমার মা দমদম স্কুল থেকে ছাঁটাই হ'য়ে টালিগঞ্জের একটা স্কুলে কিছুটা কম মাইনেতে চাকরি নিলেন, আমরা উঠে এলাম হরি ঘোষ স্ট্রিট ছেড়ে গল্ফ ক্লাব রোডে, আমি এম. এ. পাশ ক'রে বেরোলাম—আর এখনো সেই ধারণা আঁকড়ে আছে আমাদের, আমাদের দুই মা আর কাউকে ভাবতে পারে না জামাই বা ছেলের-বৌ ব'লে, বড়োমামা মাঝে-মাঝে আমার বিয়ের যে-সব সম্বন্ধ আনেন মা সেগুলো আলগোছে উড়িয়ে দেন। আর আমরা—আমরা নিজেরা?

লেকের ধার দিয়ে ট্যাক্সি চলেছে, মুখে লাগছে হাওয়ার ঝাপট, টালিগঞ্জ ব্রিজ পার হ'লো। 'সব সময় সিকি-আধুলির হিশেব কোরো না তো!' কিন্তু দুর্গাদাস কি জানে না আমার মা কখনো পারতপক্ষে

ট্যাক্সি নেন না, নিজের জন্য অতিরিক্ত কিছু খরচ করতে নারাজ তিনি, সে কি জানে না, সারাদিন স্কুল করার পর এখন আবার আর-একটা জায়গায় পড়াতে গেছে আমার মা? অনেকদিন ধ'রেই সঞ্চয় করা তাঁর অভ্যেস—কেন। মেয়ে, মেয়ের বিয়ে, যার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হবে : এ-ই তো তাঁর জীবনের ধ্যানজ্ঞান। দুর্গাদাসকে বছরে চার বার জামা-কাপড় দেবেন তিনি, তার ফাউন্টেন পেন চুরি গেছে শুনে তক্ষুনি কিনে দেবেন সাত দোকান ঘুরে-ঘুরে পার্কার কলম—আমি মৃদু প্রতিবাদ করি মাঝে-মাঝে, বলি, 'মিছিমিছি কেন—' মা বলেন, 'মিছিমিছি তো নয়।' মা একটু-একটু ক'রে গয়না গড়াচ্ছেন সেই কবে থেকে ; আমি যত বকাঝকা করি সব শুনে একটু হাসেন শুধু কিছু বলেন না। আর মা-কে দেখে-দেখে আমারও যেন আলগা সুখের ইচ্ছেটা ম'রে গিয়েছে ; সুখ বলতে শুধু একটা জিনিশই বুঝি আমি—তা তোমাকে নিয়ে, তোমাকে নিয়েই, দুর্গাদাস।

অমলা আড়চোখে একবার দুর্গাদাসের দিকে তাকালো। গাড়ির কোণে মাথা রেখে পা দুটো ছড়িয়ে দিয়েছে সে, চোখ বোজা, ঝিমুনি এসেছে বোধহয়—যা ঘোরাঘুরি ক'রে সারাদিন! কোনো দোকান থেকে এক ঝলক আলো তার মুখে প'ড়ে তক্ষুনি মিলিয়ে গেলো—অমলার চোখে পড়লো তার ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক হ'য়ে আছে, আবছা হাসির মতো ধরনটা। সুখী আর অনাবিল মনের মানুষ এই দুর্গাদাস—ওর ঠোঁটের গড়ন সুন্দর, হাসলে ভালো দেখায় ওকে। ও সরল, ও সহজ, হো-হো ক'রে হাসতে জানে ও, ওর কোনো বন্ধুর কেউ নিন্দে করলে মারমুখো হ'য়ে উঠতে জানে—তাই ওকে সব মানিয়ে যায়, ওর কোনো দোষ দোষ ব'লে গণ্য হয় না, ওর অবিবেচনা, ওর সাধারণ দায়িত্বজ্ঞানের অভাব—সবই 'মিষ্টি' ব'লে বিখ্যাত হয় ওর বন্ধুমহলে। তা বন্ধুদের পক্ষে ঠিক আছে, কিন্তু আমার কি আরো একটু বেশি পাওনা নেই? বলো না, দুর্গাদাস, কিছু বলো, তোমার ঐ সুন্দর ঠোঁট খুলে কিছু বলো আমাকে—বইয়ের কথা নয়, সাহিত্য নিয়ে তর্ক নয়, 'আমাদের' কথা কিছু বলো। বলো, আমাদের মায়েরা যা ধ'রে ব'সে আছেন, তা কি সত্য? এত বছর ধ'রে আমরা যা জেনে আসছি তা কি সত্য? আর এই আমি যাকে 'আমরা' ব'লে ভাবছি, তার অর্থ কি সেই তুমি আর আমি? না কি...না কি...?

ঠেলে-ওঠা প্রশ্নটাকে চেপে দিয়ে অমলা, আস্তে একবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো। কেন আমি কঠিন হ'তে পারি না, কেন ওকে দেখলেই আমার মনের ভাব বদলে যায়, আমাদের দু-জনের ভালোর জন্যেই যা বলা উচিত তা বলতে গেলে মুখে কথা বেধে যায় কেন? বলো তো, দুর্গাদাস, আড্ডা দিয়ে বেড়ানো ছাড়া আর কী করো তুমি সারাটা দিন? গেলোবার খামকা এম. এ পরীক্ষাটা দিলে না, এবারেও যে তৈরি হচ্ছো তার লক্ষণ নেই। খবর-কাগজে খুচরো লেখা লিখে, মাঝে-মাঝে বিজ্ঞাপনের কপি লিখে, মাঝে-মাঝে মার্কিনী বা রুশ কনসুলেটের জন্য তর্জমার কাজ ক'রে—এ ভাবেই কি কাটবে তোমার সারা জীবন? ভেবো না আমি তোমাকে পাকা পোক্ত চাকুরে দেখতে চাই, ভেবো না আমি তোমাকে ধোপদুরস্ত 'ভদ্রলোক' হ'তে বলছি—কিন্তু তুমি মুখে যা বলো, যে-ভাবে তুমি জীবন কাটাও, তার সঙ্গে কি এটাই মানায় না যে তোমার বিয়ে করার পক্ষে ভালোবাসাই হবে যথেষ্ট, কোনো সাংসারিক চিন্তা তাতে বাধা দেবে না? এসো, দুর্গাদাস, এসো আমরা নতুন জীবন আরম্ভ করি, আমরা বহুদিন ধ'রে যার অপেক্ষা করছি সেই জীবন—আমরা দু-জনে মিলে কাজ করবো, যে ক'রে হোক চ'লে যাবেই। মনে সুখ থাকলে একটু-আধটু বাইরের কষ্টে কী এসে যায়? আমার এখন জানা দরকার, দুর্গাদাস—তুমি কী ভাবছো তা জানা দরকার। কেন আজকাল আমাদের ওখানে এত কম আসো, বলতে পারো? অনেক দূর শ্যামবাজার থেকে টালিগঞ্জ—কিন্তু সেটা কি কোনো কারণ যার জন্য তুমি আমার কাছে আসবে না? আর এমন তো নয় যে দক্ষিণ কলকাতায় অন্য গরজে আসো না তুমি—হ্যাঁ, অন্য গরজেই আসো, প্রায় রোজ। আমি আজকাল কফি-হাউসে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, শ্রীপতিকে ঘিরে যে-'ইন্টেলেকচুয়েল' দল ব'সে থাকে তাদেরই একজন সেজে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই না আমি, আর চাই না অন্য অনেকের সঙ্গে তোমাকে ভাগ ক'রে নিতে—কিন্তু আমার অনুপস্থিতি তুমি কি কখনো লক্ষ করেছো? ঝাঁকে-ঝাঁকে কথা—বলতে শুরু করলে ফুরোবে না, কিন্তু আমি বলি না—কেন, জানো? পাছে তুমি ভাবো আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি না, পাছে ভাবো তোমার বন্ধুদের আমি ঈর্ষা করছি, পাছে তোমার

মনে হয় আমার মন ছোটো, আমি স্বার্থপব। আব বলতে না-পেবে, তোমাব ভুল বোঝাব ভয়ে বলি না ব'লে আমি—মনে কত কষ্ট পাই, কত বাগ কবি নিজেব ওপব, তা কি তুমি ভাবো কখনো? আমাব কথা তুমি কি কখনো ভাবো, দুর্গাদাস? কী কবছি আমি? এম এ পাশ ক'বে চাকবি খুঁজছি, আব চাকবি খুঁজছি, আব চাকবি মানে তো সেই গতানুগতিক স্কুলমাস্টাবি—আমিও কি আমাব বিধবা মা-ব মতো শুধু মাস্টাবি ক'বে-ক'বে বুড়ো হ'যে যাবো? এবই মধ্যে কত ছেলেকে দেখলাম, সত্যি তেমন ক'বে প্রেমে পড়লে বিয়েব জন্য অস্থিব হ'যে ওঠে, কত কাঠখড় পোড়ায তাব জন্য, আব তুমি—তুমি শুধু হবে-হচ্ছে ক'বে সময কাটাচ্ছো, শুধু সময ব'যে যেতে দিচ্ছো— তোমাব মতো টগবগে যুবকেব পক্ষে এই সংযম কি আশ্চর্য নয়? এ-ভাবে আব কতকাল কাটবে, দুর্গাদাস? আব কতকাল তোমাব সব অন্যায আমাকে 'ভালোবাসাব অত্যাচাব' ব'লে মেনে নিতে হবে? ধবো না আজ বিকেলেব কথাই, তুমি বেস্পতিবাব ব'লে গেলে যে আজ পাঁচটায আসবে আমাদেব এখানে, তাবপব চা খেযে আমাকে নিয়ে যাবে 'সপ্তর্ষি'ব মীটিঙে—আমি সাড়ে-চাবটে থেকে অপেক্ষা কবছি, মা তোমাব জন্য মাছেব চপ আব মালপো ভেজে বেখে কাজে বেবোলেন, কিন্তু তুমি এলে না যে এলেই না। এই প্রথম নয অবশ্য, আগে অনেকবাব তুমি কথা দিয়ে কথা বাখোনি, সেটা তোমাব অভ্যেসই নয বলা যায—আমাব হযতো ধ'বে নেয়াই উচিত ছিলো যে আজও তাব ব্যতিক্রম হবে না, কিন্তু আমাব ইচ্ছে কবছিলো—ভীষণ ইচ্ছে কবছিলো যে তুমি আসো, নিবিবিলি কিছুক্ষণ কথা বলি আমবা, আমি তোমাব সঙ্গে বেবোই, তোমাব সঙ্গে ঘুবে বেড়াই। এত প্রবল সেই ইচ্ছে যে বাগ ক'বে ঘবে ব'সে থাকাও সম্ভব হ'লো না আমাব পক্ষে, আমি ছুটে চ'লে এলাম তোমাদেব 'সুনন্দা'য শুধু তোমাব সঙ্গে দেখা হবে ব'লে। এলাম—যেহেতু আমি জানি যে এই ছোটোখাটো ব্যাপাবগুলোতে কিছু এসে যায না, যে আসল ব্যাপাবে তুমি কথা বাখবে—[illegible]ই। বলো দুর্গাদাস—সত্যি না?

এতক্ষণে দুর্গাদাসেব গলাব আওযাজ পাওযা গেলো।—'এলাম নাকি?'

'প্রায। তুমি কি ঘুমুচ্ছিলে?'

'আউফ্!' আড়মোড়া ভেঙে নড়ে-চড়ে ব'সে দুর্গাদাস হঠাৎ বললো, 'আজ কী হ'লো, জানো—দলে প'ড়ে সিনেমায চ'লে গেলাম তিনটেব শো-তে—'

'তা ই নাকি?'

'সেখান থেকে শ্রীপতিব ওখানে গিয়ে এক কাণ্ড।'

কী কাণ্ড, সে বিষযে অমলা কোনো কৌতূহল প্রকাশ কবলো না।

'হ'লো কী—বন্দনাব সঙ্গে গৌতমেব দেখা হ'যে গেলো হঠাৎ। আব তখনি বন্দনা কী-বকম কেঁদে উঠলো ভাবতে পাববে না। বেচাবা! ওব জন্য কষ্ট হয আমাব।'

'তা কেউ কাবো মন থেকে স'বে গেলে কী আব কবা যাবে?' ব'লে দুর্গাদাসেব দিকে আড়চোখে তাকালো অমলা।

'তা হোক—তবু যেটা কষ্টেব সেটা কষ্টেবই। কেমন হ'যে উঠতে-উঠতে ভেঙে গেলো জিনিশটা—অদ্ভুত।'

অমলা ট্যাক্সিওলাকে বললো, 'এবাব বাঁযে যাবেন।' একটু পবে বাড়িব দবজায গাড়ি থামলো।

* * *

দবজা খুলে দিলো অমলাদেব পুবনো ঝি পারুল। তাকে দেখে একগাল হেসে দুর্গাদাস বললো, 'পারুল-দিদি, ভালো আছো?'

আধখানা কপালে ঘোমটা টেনে পারুল জবাব দিলো, 'ভালো আছি, দাদাবাবু। আপনি আজ বিকেলে এলেন না?'

'এই তো এলাম,' দুর্গাদাস ঝুপ ক'বে একটা চেযাবে ব'সে পড়লো। 'শুনেছিলাম তুমি পার্বতীব বিয়ে দিচ্ছো?'

'দাদাবাবুর সব কথা মনে থাকে! তা আপনাদের আশীর্বাদে সব ঠিক হ'য়ে গেছে—এই শ্রাবণ মাসে বিয়ে। একটু চা খাবেন তো, দাদাবাবু?'

'আচ্ছা, দাও।—'তা শোনো, ' পারুল চ'লে যাবার পর দুর্গাদাস বলতে লাগলো, 'ভেবেছিলাম শ্রীপতির সঙ্গে দু-মিনিট দেখা ক'রেই এখানে চলে আসবো, ঐ সব ঝামেলার আটকা প'ড়ে গেলাম।...তা তুমি আর-একটু আগে এলেও পারতে "সুনন্দা"য়।'

অমলা কোনো কথা বললো না।

পারুল সত্যি তাহ'লে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে। একটা দশ বছরের মেয়ে! সুন্দর চোখ-মুখ, মিষ্টি কথা—তেমন আওতায় পড়লে ফিল্ম-স্টারও হ'তে পারতো মেয়েটা। আর এখন কী হবে? শ্বশুরবাড়ির লাথি-ঝাঁটা খেতে-খেতে দু-দিনেই কঙ্কালসার, এক গাদা ছেলেপুলে, অবশেষে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বাসন মাজা। আমি পারুলকে কত ক'রে বুঝিয়েছিলাম—এখনই বিয়ে দিয়ো না, লেখাপড়া শেখাও। স্কুলে ভর্তি ক'রে দাও মেয়েকে, যা খরচ লাগে আমি দেবো। তা এ-সব কথা কানেই ঢোকে না ওদের! .আমি মাঝে-মাঝে ভাবি—বস্তির ছেলেমেয়েদের জন্য একটা স্কুল করবো। না, শুধু বাচ্চাদের জন্যই নয়—বড়োদের জন্যও ক্লাশ হবে রাত্রে। তুমি পড়াবে, আমি পড়াবো, বন্দনা আর হিমেন্দুও রাজি হবে নিশ্চয়ই। আমার মনে হয় এমন ভালো, এমন পবিত্র কাজ আর-কিছু হ'তে পারে না।...কিছু বলছো না যে? রাগ ক'রে আছো?'

'তোমার ওপর আমি কি রাগ করতে পারি? না কি কেউ পারে?'

অমলার সঙ্গে চকিতে চোখাচোখি হ'লো দুর্গাদাসের। চোখ সরিয়ে নিয়ে দুর্গাদাস বললো. 'অমন বড়ো মাপে কিছু হ'য়ে ওঠা সহজ নয়, কিন্তু আমার সত্যি খুব ইচ্ছে ছিলো পারুলের মেয়েকে অ-আ ক-খ- শিখিয়ে দিই।'

'তোমার ইচ্ছে ছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বলেওছিলে বর্ণপরিচয়ে স্লেট পেন্সিল কিনে দেবে। মেয়েটা আশা ক'রেও ছিলো বইয়ের জন্য।'

'আশা ক'রে ছিলো!' দুর্গাদাসের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, 'তাহ'লে দ্যাখো শেখার ইচ্ছে ওদেরও কিছু কম নয়।'

'তুমি চিন্তিত হোয়ো না, পার্বতীর আশা আমি কথঞ্চিৎ পূরণ করতে পেরেছি। ওকে নিয়ে বসতাম মাঝে-মাঝে, দু-খণ্ড বর্ণপরিচয় শেষ করিয়ে দিয়েছি।'

'বাঃ! এটা একটা কাজের মতো কাজ করেছো, অমলা! আর এই পার্বতীর কিনা এক্ষুনি বিয়ে দিচ্ছে ওর মা! তুমি বারণ করতে পারলে না?'

'আমি বারণ করলে শুনবে কেন ওরা? ওদের মধ্যে ও-রকমই চল। আর তাছাড়া—'

'তাছাড়া?'

'আমি কি পার্বতীর সারা জীবনের ভার নিতে পারি যে বারণ করবো?'

হাসলো দুর্গাদাস। 'তাহ'লে তো বিদ্যাসাগরেরও হিন্দু বিধবার বিয়ের জন্য ঘটকালি-আপিশ খোলা উচিত ছিলো।'

'আমি অত-শত বুঝি না, আমি সমাজ-সংস্কারক নই। আমি বুঝি, যে-কথার পেছনে কোনো কাজ নেই তা না-বলাই ভালো।—এই যে, তোমার চা।'

চায়ের ট্রে টেবিলে নামিয়ে পারুল বললো, 'মা আপনার জন্য মালপো ভেজে রেখে গেছেন। আর মাছের চপ। খাবেন কিন্তু।'

'নিশ্চয়ই।' কিছুটা অন্যমনস্কভাবে চামচে দিয়ে একটি মালপো ভেঙে খেলো দুর্গাদাস, তারপর হাতে তুলে নিয়ে দুটি মালপো খেয়ে চুলে হাত মুছে বললো, 'তোফা হয়েছে। অনবদ্য। মাসিমা বাড়ি নেই দেখছি? কোথায় গেছেন?'

'মা গেছেন নিউ আলিপুর ট্যুটরিয়েল হোমে।'

'সেখানে কেন?'

'বলা বাহুল্য, পড়াতে। তোমাকে সেদিন বললাম মনে নেই?'

'ও—হ্যাঁ। তা স্কুলে পড়িয়ে আবার এটা কেন? কী-দরকার ছিলো?'

'চপটা খেলে না?'

'নাঃ, আর পারছি না। আচ্ছা, চেখে দেখি একটু। তা এ-বয়সে ওঁর অত পরিশ্রম করা উচিত নয় কিন্তু। ওঁকে তুমি ভালো ট্যুটরিয়েল হোমটা ছেড়ে দিতে। বোলো, আমি বলেছি।'

'তুমি নিজেই বলো না। ওঁর আসার সময় হ'লো প্রায়।'

'তোমার মা-কে আমার আর-একটা কথা বলার আছে।'

অমলা দুর্গাদাসের চোখে চোখ ফেললো।

'সেদিন জানো, দেবীপদর বোনের বিয়েতে গিয়েছিলাম। সেই যে ইকনমিক্সের দেবীপদ—মনে আছে?—মুন্সেফ হবে ব'লে ল পড়ছে এখন। ওর বোন হিস্ট্রিতে ফার্স্ট ক্লাশ নিয়ে বেরিয়েছে, ঝকঝকে স্মার্ট মেয়ে, তার বিয়ে হ'লো জাতগোত্র কুষ্টি-ঠিকুজি মিলিয়ে (বোধহয় "আনন্দবাজারে" বিজ্ঞাপন দেয়াও হয়েছিলো)—ভাবতে পারো! না-বললেও চলে, পাত্র একজন সেল্স্-ম্যানেজার বা লেবার অফিসার বা ঐ গোছের কিছু—লম্বা মাইনের চাকুরে আরকি। শুনলাম, পাত্রপক্ষ মোটা পণ নিয়েছেন, আনুষঙ্গিকও বিস্তর। আর বিয়েতে কী ধুমধাম—বাপ্‌স্! আমার এমন কুৎসিত লাগছিলো পুরো ব্যাপারটা—'

'কেন, এতে কুৎসিত কী আছে? বিয়ে তো হ'তেই হবে, আর আমাদের দেশে এটাই নিয়ম।'

'তুমি বোধহয় ঠাট্টা করছো আমাকে—যেহেতু আমি একটু বেশি কথা বলি, একটু বেশি উত্তেজিত হই? সত্যি—দেখতে-দেখতে অভ্যেস হ'য়ে গেছে আমাদের, কিছু মনেই হয় না, কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে ব্যাপারটা কুৎসিত ছাড়া আর কী? যে-ভাবে পাকলের মেয়ে পার্বতীর বিয়ে হয়, ঠিক সেইভাবে এম এ তে ফার্স্ট-ক্লাশ-পাওয়া মেয়েরও—সত্যি কথাটা তো এ-ই! আর তাছাড়া, বিয়ে কি একটা ব্যাবসা নাকি যে তাতে টাকা-পয়সার কথা উঠবে? আমি ভাবছিলাম, দেবীপদর বাবা মেয়ের বিয়েতে যা খরচ করলেন, হয়তো তার চেয়েও বেশি উশুল ক'রে ছাড়বেন দেবীপদর বিয়েতে, আর সে—মার্ক্সিস্ট আর এগ্‌জিস্‌টেঁশিয়েলিস্ট বুলি-আওড়ানো দেবীপদ—সেও খালি গায়ে টোপর মাথায় দিয়ে বাঁদর সেজে একদম অচেনা একটি মেয়েকে বিয়ে করতে ব'সে যাবে—টুঁ শব্দটি করবে না।'

'এমনভাবে কথা বলছো যেন তুমি এ-দেশের লোক নও।'

'নিশ্চয়ই আমি এ-দেশের লোক।' দুর্গাদাস গলা চড়ালো— 'আমিও তা-ই, তুমিও তাই। কিন্তু আমরা ও-রকম নই। অনেক কষ্ট আমাদের জীবনে, অনেক রকম সমস্যা, কিন্তু আমাদের গর্ব এটুকু—না, এটা কোনো গর্বের বিষয়ও নয়, আমাদের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক—যে আমরা গড্ডলিকায় গা ভাসাইনি। ভাবতে কি ভালো লাগে না, অমলা, যে তোমার মা-র অন্তত মেয়ের বিয়ের জন্য কোনো ভাবনা নেই, সে-জন্যে একটি পয়সাও তাঁকে খরচ করতে হবে না? ভাবতে কি ভালো লাগে না যে মাঝে মাঝে বাংলাদেশে এমন বিয়েও হয় যেখানে পাত্রপাত্রী পরস্পরকে বেছে নিয়েছে?'

দুর্গাদাসের শেষ কথাগুলি যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেলো অমলার মন থেকে সব দুশ্চিন্তা, দুর্গাদাসের অনেক অমনোযোগ, অনেক দুর্ব্যবহারের স্মৃতি। মুখ নিচু ক'রে এক ঢোক চা খেলো সে, একটু পরে জিগেস করলো, 'তুমি কি শিগগিরই বিয়ের কথা ভাবছো?'

'শিগগিরই মানে—একটা কাজকর্ম কিছু হওয়ামাত্র।'

'চেষ্টা করছো সেজন্যে?'

'ঐ বিজ্ঞাপনের এজেন্সি, যাদের জন্য আমি খুচরো কাজ করি মাঝে মাঝে, তাদের আপিশেই কিছু হ'য়ে যেতে পারে।'

একটু চুপ ক'রে থেকে অমলা বললো, 'আমি আসছে মাস থেকে বেহালার সারদাসুন্দরী স্কুলে কাজ পাচ্ছি—কালকেই জানলাম। তাই ভাবছিলাম—'

'কী ভাবছিলে?'

'মা একটু ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন বোধহয়। স্পষ্ট ক'রে কিছু বলেন না, কিন্তু তুমি তো বেশি আসো না আজকাল—'

'কী মুশকিল! আমাকে কি রোজ হাজিরা দিয়ে প্রমাণ করতে হবে—'

অমলা তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো, 'না, না, প্রমাণের কথা ওঠে কিসে?'

'তবে? তুমি কি ভাবছো আমি অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে—'

'ছি! কী ক'রে মুখে আনতে পারলে কথাটা!'

'আমাকে তুমি অনেকদিন ধ'রে দেখছো, অমলা। আমার স্বভাবটা কিছু এলোমেলো গোছের, যা করা উচিত তা ক'রে উঠতে পারি না সব সময়, যখন যা মনে আসে দুম ক'রে ব'লে ফেলি। সকলের সঙ্গেই আমার এ-রকম—তোমার সঙ্গেও। বরং তোমার সঙ্গে হয়তো হেলাফেলা একটু বেশি হ'য়ে যায়—সে তুমি আমার আপন বলেই, তোমাকে ভালোবাসি ব'লেই। তুমি তা বোঝো না?'

অমলা কথা বলতে পারলো না, তার মনে মস্ত একটা ঢেউ ব'য়ে গেলো ছলছল ক'রে। সুখের, একটু কষ্টেরও ; কেননা হঠাৎ তার মনে হ'লো যেন সে-ই অপরাধী, যেন দুর্গাদাসেরই কিছু জবাবদিহি পাওনা আছে তার কাছে। আর দুর্গাদাস যেন তার নিজের কথায় নিজেই অভিভূত হ'য়ে মুহূর্তের জন্য অনুভব করলো সেই আবেগ, যার চাপে তার ছেলেবেলা-থেকে-চেনা মেয়েটির মধ্যে এককালে সে অফুরন্ত রহস্য দেখতে পেয়েছিলো। সেই অমলা, তার অমলা, এখনো তেমনি, তেমনি আশ্চর্য। কিছুক্ষণের জন্য সে ভুলে গেলো তার বন্ধুদের, ভুলে গেলো দেশের বাল্যবিবাহ, নিরক্ষরতার সমস্যা—কিছুক্ষণের জন্য, অমলার পাশে ব'সে, তার আঙুলে আঙুলে জড়াতে-জড়াতে, তাদের ভাবী জীবনের ছবি আঁকলো সে, আগে অনেকবার যা বলা হ'য়ে গেছে, সেগুলোই যেন নতুন হ'য়ে বেরোতে লাগলো তার মুখ দিয়ে, অমলার কানে নতুন শোনালো। অমলার মা এলেন, দুর্গাদাসকে রাতে না খাইয়ে ছাড়লেন না তিনি ; সে চ'লে যাবার পরে সুখের কোলে, স্বপ্নের কোলে গা এলিয়ে দিলো অমলা, অনেক রাত অবধি ঘুমোতে পারলো না।

*　　　*　　　*

ট্রামে যেতে-যেতে অনেক কথা ভেবে ফেললো দুর্গাদাস। প্রথমে কিছুক্ষণ অমলা তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রইলো ; সেই সব দিন, যখন তারা প্রথম জানলো তারা 'প্রেমে পড়েছে,' তার সুবাস যেন ঘিরে রইলো তাকে ; তারপর মনে হ'লো এখন বিয়ে না-করলে আর চলছে না। নিজের জন্য না হোক, অন্তত অমলার জন্য তাকে বিয়ে করতে হবে—সম্ভব হ'লে খুব শিগগির, সম্ভব হ'লে কালই। তার চাকরি নেই তো কী হয়েছে, তাই ব'লে কিছু উপার্জন নেই তা তো নয়, অমলাও স্কুলে পড়াবে, কিন্তু—কিন্তু চালানো যাবে কি তাতে যা দিনকাল! কিন্তু আগে চাকরি, তারপর বিয়ে—এটা তো বড্ড গতানুগতিক, বড্ড বুর্জোয়া, ভেসে পড়া যাক না, দেখা যাক না কী হয়, হয়তো একটা বাঁধাবাঁধির মধ্যে পড়লে সেও কিছুটা গুছিয়ে নিতে পারবে নিজেকে, হয়তো তার দিক থেকেও বিয়েটা দরকার? নাঃ, আগে একটা চাকরি জোগাড় ক'রে নেয়াই ভালো, এ-সব খুচরো কাজের কিছুই স্থিরতা নেই, সাধ ক'রে কষ্ট ডেকে আনার মানে হয় না। আর সত্যি উঠে-পড়ে লাগলে চাকরি জোটানো এমন শক্ত কী, তার সমবয়সীরা সকলেই বেকার ব'সে আছে তা তো নয়। তার চেনাশোনা লোকেদের মধ্যে কে-কে তাকে ঠিক রাস্তা বাৎলে দিতে পারে, কাকে ধরলে কোন দরজা খুলে যাওয়া সম্ভব, মনে-মনে তার একটা তালিকা তৈরি করলো দুর্গাদাস—কাল থেকে চেষ্টা শুরু ক'রে দেবে, যাকে বলে রীতিমতো ক্যাম্পেন'। দুর্গাদাসের মনে ছবি ভেসে উঠলো—সে আর অমলা নতুন সংসার পেতেছে, রোজ দশটায় আপিসের বাস্ ধরে সে, মাসের শেষে এক তাড়া নোট হাতে পায়, একটি সুখী তরুণ দম্পতি, নিয়মে বাঁধা মসৃণ জীবন। সত্যি, এর চেয়ে ভালো আর কী হ'তে পারে? এই লক্ষ্য সামনে রেখে চলতে হবে তাকে—কাল থেকে, কাল থেকেই। মনে-মনে এ-রকম স্থির করামাত্র অমলা যেন স'রে গেলো তার ভাবনা থেকে, যেন অমলার প্রতি তার কর্তব্য তা এখনই করা হ'য়ে গেছে, অতএব ও নিয়ে আর ভাবার কোনো দরকার

নেই। আব এব পব ট্রাম যত এগোলো, ততই তাব মনে উঁকি দিতে লাগলো অন্য সব কথা আজকেব 'সপ্তর্ষি'ব মীটিং, বথীন্দ্র বাযেব অনাধুনিক মতামত, যা তাব মতে হাস্যকব, আব শ্রীপতিব প্রতিবাদ, যাব সঙ্গে প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোকেব একমত হওযা উচিত। কিন্তু কেমন হঠাৎ থেমে গেলো শ্রীপতি, কাউকে কিছু না ব'লে অদৃশ্য হ'যে গেলো—কোথায গেলো, কী হযেছে ওব? কেমন অদ্ভুত কথা বলছিলো আজ বিকেলে, আব ঐ অসমযে শুযেই বা ছিলো কেন—সত্যি ওব কোনো অসুখ কবেনি তো? একবাব দেখে গেলে হয না? ট্রাম ততক্ষণে বাসবিহাবী অ্যাভিন্যুব মোড ছাডিযেছে, দুর্গাদাস হঠাৎ উঠে দাডালো, তাব আসনে তক্ষুনি ব'সে পডলো আব-একজন, কালিঘাটে একদঙ্গল লোক উঠে দাঁডাবাব জাযগাটুকু ভ'বে দিলো, আব তাবপব হাজবা বোড যেই কাছে এলো, যেন ভিডেব চাপে উত্যক্ত হ'যে ট্রাম পুবোপুবি থামাব আগেই নেমে পডলো সে। বাস্তা থেকে তাকিযে দেখলো শ্রীপতিব ঘবে আলো নেই। অন্ধকাব সিঁডিতে দু তিনবাব ঠোক্কব খেযে উঠে এলো ওপবে—দবজা ভেতব থেকে বন্ধ। দুর্গাদাস কডা নাডলো, 'শ্রীপতি! শ্রীপতি!' ব'লে ডাকলো কযেকবাব, কোনো উত্তব নেই। আশ্চর্য বাত মাত্র এগাবোটা এবই মধ্যে ঘুমিযে পডলো শ্রীপতি! দবজায কান পেতে মনে হ'লো ঘুমন্ত মানুষেব ভাবি নিশ্বাসেব শব্দ শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে হযতো কাশিব শব্দ, বা গোঙানি। আবো কযেকবাব চেষ্টা ক'বেও যখন সাডা পেলো না, তখন অগত্যা আবাব নেমে এলো বাস্তায, শ্রীপতিব জন্য দুশ্চিন্তা নিযে শেষ বাস ধ'বে বাডি ফিবলো।

৫

পবেব দিন বিকেল সাডে পাঁচটা নাগাদ আবতি টেলিফোন তুলে বালিগঞ্জেব একটা নম্বব ঘোবালো।

কে বন্দনা? হ্যা।

বন্দনা, আমি আবতি আবতি মৈত্র।

একটু চুপ ক'বে থেকে বন্দনা বললো 'তা কী বলো?'

তুমি কেন বন্দনা? এখনো বাগ ক'বে আছিস?

বন্দনা চুপ।

'কাল তুই অসুস্থ হ'যে পডেছিলি -'

'না। অসুস্থ হইনি।

'কোনো কাবণে বিচলিত ছিলি। আজ ভালো আছিস?

এব জন্য টেলিফোন?

'আজ সাবাদিন আমাব অনেকবাব মনে পডেছে তোকে, অনেকবাব টেলিফোনেব কাছে এসেও ফিবে গিযেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোকে না ডেকে পাবলাম না।'

কাইন্ড অব ইউ।'

বন্দনা কাল আমি খুব অন্যায কবেছিলাম আমাকে তুই ক্ষমা কবিস।'

বন্দনা চুপ।

'কালকেব ব্যাপাবটা তুই ভুলে যা। কথা দে আমাকে। কিছু বল।

বন্দনা বললো, 'দোষ তো প্রথম আমিই কবেছিলাম কিন্তু—' আবতি বুঝলো বন্দনাব চোখে জল এসেছে, দু-তিন সেকেন্ড দু-পক্ষই চুপ।

'—তুই তো জানিস ওকে দেখলে আমাব মাথাব ঠিক থাকে না। কেমন আছে বে গৌতম?'

'পবে বলছি। তোকে আব একটি অনুবোধ আমাব হিমেন্দুব কাছেও আমি ক্ষমা চাইছি, তাকে বলিস?'

'হিমেন্দু এখানেই ব'সে আছে, তুই নিজেই বল না।'

'...আচ্ছা দে। থাক, পরে হবে। তোর সঙ্গে আরো কথা আছে আমার। কাল ঐ মীটিঙে কতক্ষণ ছিলি?'

'শেষ পর্যন্ত,' অন্য প্রসঙ্গ ওঠা মাত্র বন্দনার গলা স্বাভাবিকতায় ফিরে এলো। 'যত আজে-বাজে তর্ক হ'লো পরে—কোনো মানে হয় না, ও-সবের। তুই কখন পালালি টের পাইনি।'

'শ্রীপতির বক্তৃতা শুনেছিলি?'

'হ্যাঁ—'

'মন দিয়ে শুনেছিলি?'

'তা শুনেছিলাম। চাস তো তার সারাংশ বলতেও পারি।'

'কেমন লাগলো তোর?'

'শ্রীপতির বক্তৃতা? মতামতগুলো বিশ্রী, কিন্তু বললো খুব ভালো। কী অদ্ভুত দেখাচ্ছিলো ওকে!' মিষ্টি গলায় ছোট্ট ক'রে হাসলো বন্দনা।

'আমার ওকে উন্মাদ মনে হ'লো।'

'কী বললি?'

'উন্মাদ। সত্যি পাগল-টাগল হ'য়ে যাচ্ছে না তো? কিছু জানিস?'

'আমি কী ক'রে জানবো।'

'তুই ঠিক বলেছিস। অদ্ভুত দেখাচ্ছিলো ওকে। মুখটা গনগনে লাল, ঠোঁটের কোণে ফেনা উঠছে, আর কেমন "আরশোলা, আরশোলা" বলতে-বলতে হঠাৎ বেরিয়ে গেলো! আমার এমন হাসি পাচ্ছিলো কী বলবো। তোর মনে হয় না কিছু-একটা গোলমাল হয়েছে ওর?' 'তা তো তোরই জানার কথা। শ্রীপতি তোরই তো খুব বন্ধু।'

'আমার বন্ধু কে বা নয় এই কলকাতায়। আমি ভালো না, বন্দনা।'

'কী বললি?'

'কিছু না।'

একটু সময় দু-পক্ষই চুপ।

'তা গৌতমের খবর কিছু শুনবি নাকি?'

'গৌতমের খবর তো চোখে দেখলাম কাল।'

'দেখে যা মনে হয় ঠিক তা নয় কিন্তু। ও সুখে নেই।'

'তা-ই নাকি?' বন্দনার গলায় ব্যঙ্গের সুর লাগলো।

'তোর বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'শুনলাম আই. এ. এস. পরীক্ষা দিচ্ছে?'

'বলছে তো দেবে। কিন্তু কখন যে পড়ে তা তো জানি না।'

'পড়ে না?' ...তোর জন্যেই এ-রকম হচ্ছে বোধহয়?'

'তা হবে। কিন্তু এটা ভালো হচ্ছে না।'

'কার পক্ষে?'

'কারো পক্ষেই না। কী-একটা বিশ্রী ব্যাপার হ'য়ে গেলো কাল—পরে আমার কী যে খারাপ লাগছিলো—'

হঠাৎ বন্দনা বললো, 'আরতি, তোর মনে আছে তোর সঙ্গে আমার বন্ধুতার সেই দিনগুলি? ফেব্রুয়ারি মাসের দশ তারিখে তুই প্রথম এসেছিলি আমাদের বাড়িতে—'

'তারিখটাও মনে আছে তোর?'

'আমার ভাই নুটুর জন্মদিন ছিলো সেদিন। হঠাৎ দুর্গাদাস তোকে নিয়ে এলো। তোকে দেখামাত্র ভালো লাগলো আমার, কথা ব'লে—আরো। দু-দিনেই গভীর বন্ধুতা হ'য়ে গেলো আমাদের।'

'তারপর? বল।'

'তুই প্রায়ই আসিস, গৌতমও আসে, দুর্গাদাস এলে রবীন্দ্র-সংগীত শুনি আমরা, তুই জোর ক'রে আমাকে দিয়েও গান গাওয়াস। সুন্দর একটা দল হয়েছিলো আমাদের—আমরা লেকে বেড়াই, ফুচকা খাই আশ মিটিয়ে—এক-একদিন হেঁটে-হেঁটে জনক রোডে শ্রীপতির ওখানে হানা দিই—আমি শ্রীপতিকে প্রায়ই আসতে বলতাম আমাদের সঙ্গে, কিন্তু সে আসেনি কখনো। কেন রে?'

একটু ক্ষীণস্বরে আরতি বললো, 'আমি কী ক'রে জানবো?'

'কী আনন্দেই কেটেছে সেই সন্ধ্যাগুলি। আর তারপর হঠাৎ একদিন দেখি গৌতম আর আসে না। কল্পনাও করিনি এ-রকম হবে—হ'তে পারে।'

'তুই কি আমাকে দোষী করিস সেজন্য?'

'আরতি, আমি একটা কথা ভাবি—কেন আমরা সকলেই সকলকে ভালোবাসতে পারি না? মনে হয় এর চেয়ে সহজ আর কিছুই নেই, কিন্তু কিছুতেই হয় না কেন?'

'যে সকলকে ভালোবাসে সে হয়তো কাউকেই ভালোবাসে না।—মাপ কর, ঠিক ও কথা বলতে চাইনি।

মুহূর্তকাল ওপারে শব্দ নেই। তারপর বন্দনার গলা ক্ষীণ হ'য়ে ভেসে এলো, 'আরতি, তোর কি হৃদয় ব'লে কিছু আছে?'

'হৃদয়? হালকা হাসলো আরতি। 'তা শোন, আমিও সব অন্য রকম ভেবেছিলাম। কিন্তু কেমন ক'রে কী হ'য়ে গেলো।'

'কেমন ক'রে তুই তা জানিস না?' একটু ঝাঁঝ লাগলো বন্দনার গলায়।

একটু চুপ ক'রে থেকে আরতি বললো, 'বন্দনা, তুই কি বিশ্বাস করবি আমি যদি বলি যে আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। ছেলেরা যদি আমাকে দেখে ভোলে আমি কী করতে পারি?'

দিন বদলে গেছে আরতি। আজকাল মেয়েরাই ছেলেদের পেছনে ছুটছে। ভোলাবার সবুরটুকু সয় না।

'উদাহরণস্বরূপ- আমি? কিন্তু আমার কথা থাক। যে জন্যে তোকে ডাকলাম তা বলি। শুনবি কথাটা?'

'শুনছি, বল।'

'তুই গৌতমের সঙ্গে মিটিয়ে ফ্যাল এবার।'

টেলিফোনেও বন্দনার লম্বা নিশ্বাস শুনতে পেলো আরতি। মুহূর্তকাল অপেক্ষা ক'রে আবার বললো, 'আমার মনে হয় তুই ডাকলেই ও ফিরে যাবে।'

'তুই ব্যবস্থা ক'রে দিবি? আমাকে বলছিস তোর হাত থেকে ওরে ফেরৎ নিতে?'

'তাহ'লেই বা দোষ কী।'

'তোর অরুচি ধ'রে গেছে?'

'তাহ'লেই বা তোর ক্ষতি কী।'

'অন্য কারো সঙ্গে প্রেম করার সাধ হয়েছে তোর?'

'তাতেই বা তোর কী এসে যাচ্ছে? তুই গৌতমকে ভালোবাসিস না—এখনো?

এবার অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকলো বন্দনা, আরতিও অপেক্ষা করলো।

'এখন রাখি, আরতি,' খুব আবছা শোনালো বন্দনার গলা। 'ইচ্ছে হয় তো আসিস একদিন আমার কাছে। নয়তো আমিই যাবো।—'

'হিমেন্দুর সঙ্গে কথা বলবি বলেছিলি?'

'তা—হ্যাঁ—এই হিমেন্দুকে তোর ওখানে দেখেছিলাম দু-একবার তা ই না? বেশি কথাবার্তা বলতো না—লাজুকমতো।'

'ভারি ভালো ছেলে হিমেন্দু। ইংরেজিতে পাশ করেছে আমার আগের বছর। এখন একটা ছোটো কলেজে পড়াচ্ছে। চমৎকার ছেলে।'

'তাহ'লে হিমেন্দু এখন একাই তোর গান শুনছে?'

'কী যা-তা বলছিস!'

'যা-তা কেন? আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম তুই এখনো গান করিস কিনা।'

'আর গান! দুর্গাদাসের কথায় রেডিওতে অডিশন দিয়েছিলাম, পাশ হইনি। অগত্যা দক্ষিণীতে ভর্তি হ'য়ে গেলাম।'

'আবার গানের স্কুলে ভর্তি হলি?'

'কিছু-একটা করতে হবে তো। পাশ করলে চাকরি পাওয়া যায় শুনেছি।'

'চাকরি তোকে মানায় না, বন্দনা।'

'আমি বুঝি সেই রকমের অধম মেয়ে যাকে বিয়ে ছাড়া আর কিছু মানায় না?...ধ'রে থাক, হিমেন্দুকে দিচ্ছি।'

যতক্ষণ টেলিফোনে এই কথা হচ্ছিলো, সেই ঘরেই ব'সে ছিলো হিমেন্দু, জানলার ধারে বেতের চেয়ারে, হাতে একটা বই খোলা। জানলার বাইরে এক সারি গাছ, তার ওপর দিয়ে অনেকখানি আকাশ বেঁকে আছে। হিমেন্দুর চোখ যাতায়াত করছিলো বই থেকে আকাশে, আবার আকাশ থেকে বন্দনার পিঠের দিকে ; কিছু কথা কানে আসছিলো তার, কোনো-কোনো কথায় মনোযোগ দিচ্ছিলো রীতিমতো—অন্য ব্যক্তিটি যা বলছে তাও সহজেই অনুমান করতে পারছিলো। জরুরি কথা হচ্ছে এখানে, গভীর ব্যক্তিগত কথা, একবার ভাবলে উঠে বারান্দায় চ'লে যায়, কিন্তু বন্দনার তো গোপন ব'লে কিছু নেই, সকলেই তার সব কথা জানে, আব সেজন্যেই— সেজন্যেই সে এত ভালো। তাছাড়া, আর-একটা স্বার্থপর কারণেও হিমেন্দু উঠতে পারছিলো না, কথাগুলো একটু কষ্ট দিচ্ছিলো তাকে, কিন্তু সেই কষ্টটাও সুখের, বন্দনার হারানো প্রেমেব গল্প শুনতে-শুনতে একটা অদ্ভুত কষ্ট-মেশানো সুখ ছড়িয়ে পড়ছিলো তার মনের মধ্যে।

'এসো হিমেন্দু,' হাত নেড়ে ডাকলো বন্দনা, 'টেলিফোনে আরতি। কথা শেষ ক'রে ও-ঘরে যেয়ো, মা বোধহয় চা নিয়ে ব'সে আছেন এতক্ষণে।' হালকা পায়ে বন্দনা বেরিয়ে গেলো, আর অত্যন্ত অনিচ্ছায় টেলিফোন তুলে নিলো হিমেন্দু।

'হ্যাঁ, বলুন।'

'আমি আরতি মৈত্র কথা বলছি।'

'বুঝেছি।'

'কালকের ঘটনার জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে।'

যদিও সে জানতো আরতি তাকে কী বলবে, তবু আরতির নিজের গলায় এই কথাটা শুনে হিমেন্দুর হৃৎপিণ্ড একটু দ্রুত হ'লো। একজন মেয়ে ও রকম শাদা ভাষায় ক্ষমা চাইলে কী জবাব দিতে হয় তা তার জানা নেই ; এ-রকম ঘটনা তাব জীবনে শুধু ঘটেনি তা নয়, এ-রকম যে ঘটতে পাবে তাও তার ধারণার বাইরে ছিলো।

অগত্যা বললো, 'আমিও খুব দুঃখিত।'

আরতি এক নিঃসুর কণ্ঠস্বর শুনলো, শক্ত কাঠের মতো আঘাত ক'রেই থেমে যায়। একটু পরে বললো, 'আমি কিন্তু দুঃখিত নই—আপনার সঙ্গে আলাপ হ'লো তো এই সুযোগে। একদিন আমাদের এখানে আসেন তো খুশি হবো—দুর্গাদাস প্রায়ই আসে—ছত্রিশের এক বেণীমাধব মল্লিক রোড—হেদোর পিছনে—মানিকতলা স্ট্রিট দিয়ে ঢুকে বাঁয়ে যেতে হয়। আচ্ছা, নমস্কার।'

হিমেন্দুকে আর কিছু বলার সময় না-দিয়ে আরতি টেলিফোন নামিয়ে রাখলো। ফিরে তাকিয়ে দ্যাখে, তার বাবা গেঞ্জি আর প্যান্ট প'রে পাখার তলায় দাঁড়িয়ে আছেন।

'বাবা! বেশ লোক! এত দেরি ক'রে এলে!'

'আমি অনেকক্ষণ এসেছি, তোরই টেলিফোনে কথা ফুরোয় না।'

'অনেকক্ষণ না হাতি। বড়ো জোর দু-মিনিট। এদিকে আমি সেই কখন থেকে চা না-খেয়ে টাটিয়ে

ব'সে আছি।'

'আজ বুঝি বন্ধুরা কেউ আসেনি এখনো?'

'বন্ধুদের কথা উঠছে কিসে? আজ রোববার না? আর আমি না তোমাকে ব'লে দিয়েছি—'

'কী গরম!' কেশববাবু একটা নিচু চেয়ারে ব'সে প'ড়ে হাঁক দিলেন, 'কার্তিক।'

'কার্তিককে একটু বাইরে পাঠিয়েছি আমি—'

'রাখ্‌।'

'চ্যাঁচাচ্ছো কেন ও রকম? রাখুর অন্য কাজ আছে। কী চাই বলো না। জল তো?' ঝকঝকে কাচের গ্লাশে ঠাণ্ডা জল এনে দিলো আরতি, তার বাবার ছেড়ে ফেলা জুতো আর হাওয়াই শার্ট তুলে নিয়ে বললো, 'এক কথা তোমাকে ক'তবার বলতে হয় বলো তো? এই যে পইপই ক'রে বলি, জামাটা আলমারিতে রাখবে জুতোগুলো যেখানে সেখানে ছুঁড়বে না—কানে ঢোকে না কেন সে-কথা? আর সেদিন তোমাকে ব'লে দিলাম না যে রোববারে পাঁচটার মধ্যে চেম্বার শেষ ক'রে দেবে?'

কেশববাবু ঢকঢক ক'রে জলের গ্লাশটি শেষ ক'রে বললেন 'আঃ।'

'জবাব দাও আমার কথার।'

'ডাক্তারের আবার শনি রোববার কী?'

'কেন? ডাক্তার ঘোষের চেম্বার বন্ধ থাকে না রোববারে?'

'তিনি ডেন্টিস্ট, দাঁতের ব্যথায় সবুর সয়।'

'শনিবার বিকেল পড়লেই ডাক্তার ব্যানার্জিকে কেউ আর খুঁজে পায় না।'

'তিনি হার্ট স্পেশালিস্ট, আমাদের মতো ডাক্তাররা কিছু করতে না-পারলে তবে তাঁর কাছে রোগী যায়। তাকে যা পোষায় আমাকে তা পোষাবে কেন?'

'বাজে বোকো না তো বাবা। সকলের সব রোগীই বেঁচে-ব'র্তে থাকে, শুধু তোমার রোগীদেরই বুঝি নাভিশ্বাস উঠে আছে সব সময়? এমন সরকারি বজরা আর কোথায় পাবে লোকেরা—কাকের মুখে খবর পাঠালে ছুটে যাবে, টাকা দাও ভালো, না দাও তো ডাক্তারই হয়তো ওষুধটাও কিনে দেবেন—সত্যি ক'রে বলো তো, এমনি হেলাফেলা ক'রে মাসে তুমি কত টাকা লোকশান করো?'

'এ সব বাজে কথা কে বলে তোকে?'

'বাজে হবে কেন। আমি কি জানি না মহেশ্বর পাল তার চিকিৎসা বাবদ পুরো টাকা তোমাকে দেয়নি?'

'দিতে পারেনি তো কী হবে।'

'পারেনি—না? এদিকে দমদমে তার আর-একটা বাড়ি উঠছে, খবর রাখো?—ছিঃ, ডাক্তারকে ঠকায়, ঘেন্নাও নেই।'

'রোগী সেরে উঠলেই ডাক্তারের জিৎ,' মৃদু হাসলেন কেশববাবু।

ঈষৎ ছায়া পড়লো আরতির মুখে, মুহূর্তকাল চুপ ক'রে থেকে বললো, 'কিন্তু সত্যি যাদের উপায় নেই এমন লোকের কি অভাব যে মাসে মাসে বৌয়ের গয়না কিনে যারা টাকা জমায় তাদের ওপর দয়া করতে হবে? একে দয়া বলে না বলে বোকামি। নিজের টাকা যেমন খুশি ফ্যালো ছড়াও আমার কিছু বলার নেই কিন্তু জেনে শুনে ঠকবে কেন? তাতে কারো কিছু ভালো হয় না, শুধু জোচ্চুরি প্রশ্রয় পায়।'

'তুই দেখছি মস্ত জ্ঞানী হয়েছিস। কিন্তু টাকার বিষয়ে অতটা টনটনে জ্ঞান কি ভালো?'

'খারাপই বা কী—টাকার জোর থাকলে কত ভালো কাজ করা যায়। ধরো না—চেনাশোনা কারো হয়তো এমন অসুখ করলো এ-দেশে যার ঠিকমতো চিকিৎসা হয় না। হয়তো সুইৎসার্ল্যান্ডে পাঠাতে হবে, হয়তো আমেরিকায়। ইচ্ছে তোমার যতই থাক না, টাকা না-থাকলে কিছুই তুমি করতে পারবে না। কত ভালো লোক চিকিৎসার অভাবে মারা যায়, আর ঐ মহেশ্বর পালেদের লোহার সিন্দুক তেলে সিঁদুরে চিকচিক করে—এ-কথা ভাবলেই আমার এমন রাগ হয়—এমন রাগ হয়—'

হঠাৎ থেমে গিয়ে আরতি বললো, 'ও মা, সন্ধে হ'য়ে গেলো এর মধ্যে। যাও, বাবা এক ছুটে স্নান ক'রে এসো—আর চা না-খেয়ে পারছি না। বাথরুমে তোমার গেঞ্জি তোয়ালে রেখে এসেছি।'

বাবাকে বাথরুমে পাঠিয়ে আরতি বারান্দায় এলো। চওড়া বারান্দা, খাবার টেবিল পাতা হয়েছে সেখানে, তার একপাশে রান্নাঘর, আর-এক পাশে একতলার সিঁড়ি। একতলায় কেশববাবুর চেম্বার, দোতলার খানচারেক ঘরে পরিবারটিব বাসা, তেতলায় একটি ঘব খালি প'ড়ে থাকে। বারান্দায় এসে আরতি দেখলো কার্তিক চা সাজাচ্ছে।

'কার্তিক, গিয়েছিলে?'

'চিঠি দিয়ে এসেছি, দিদিমণি।'

'জবাব নেই কিছু?'

'দাদাবাবু বাড়ি ছিলেন না, তেনার মা-র হাতে দিয়ে এসেছি।'

ঐ এক ছেলে—কখনো যদি বাড়ি থাকে!' দাঁতের ফাঁকে কথাটা ব'লেই আরতি পায়ের শব্দে ফিরে তাকালো।—'ও, তুমি!' তার গলার আওয়াজে যে-কেউ বুঝতো যে সে-মুহূর্তে সে অন্য কারো প্রত্যাশায় ছিলো।

গৌতম বললো, 'হ্যাঁ, আমি। তুমি কার কথা ভাবছিলে?'

'তোমার কথা নিশ্চয়ই নয়।'

'কর্তিক যে-দাদাবাবুটির কথা বললো, সে নিশ্চয়ই দুর্গাদাস?'

'তা দিয়ে তোমার দরকার কী?'

'না, দরকার কিছু না। আমার শুধু অবাক লাগে যে দুর্গাদাসকে তুমি অত পছন্দ করো। তুমি কি জানো ও বন্ধুদের কাছে টাকা ধার নিয়ে ফেরৎ দেয় না?'

'জানি। তেমনি এও জানি যে কোনো বন্ধু কোনো বিপদে পড়লে দুর্গাদাসই ছুটে যাবে সকলের আগে—তুমি নও!'

'ও। তাহ'লে ওর মহত্ত্বের পরিচয় পেতে হ'লে আমাকে কোনো বিপদে পড়তে হবে?'

'চুপ!' আরতির চোখে ফুলকি জ্ব'লে উঠলো। 'দুর্গাদাসের বিষয়ে একটি কথা শুনতে চাই না তোমাব মুখে! তুমি ওকে কত টাকা ধার দিয়েছিলে, বলো—আমি এক্ষুনি ফেরৎ দিচ্ছি।'

'বড্ড রেগে গেছো দেখছি,' গৌতম হালকা ক'রে হাসলো। দেখতে সে ভালোই, গায়েব রং হলদেটে ফর্শার দিকে, পরিষ্কার টেরিকাটা চুল, তরুণ বাংলার চলতি ফ্যাশানকে অগ্রাহ্য ক'রে মাঝে-মাঝে তাঁতের ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জাবি পরে চলাফেরার গাম্ভীর্যের জন্য মনে হয় সে যেন চব্বিশ বছরেই পাকাপোক্ত ভদ্রলোক হ'য়ে উঠেছে। কথা বলে একটু চিবিয়ে-চিবিয়ে মাজা গলায়, যাকে বলছে তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে। আরতির আর একটু কাছে স'রে এসে সে বললো, 'মাথায় থাকুন তোমার দুর্গাদাস, আমি অন্য কথা বলতে এসেছি। পাঁচ মিনিট সময় দেবে আমাকে?'

'মাত্র পাঁচ মিনিট?'

'আপাতত ওর বেশি চাই না। আমি একটি পরিষ্কার প্রশ্ন করবো তোমাকে—তুমি পরিষ্কার জবাব দেবে। রাজি?'

'আরম্ভ করো।'

'আমি এক্ষুনি বিয়ে করতে চাই—সামনের মাসেই—এ-মাসেই। আর অপেক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না আমার পক্ষে।'

'পাত্রী বোধহয় আমি?'

পাৎলা ঠোঁট বেঁকিয়ে গৌতম হাসলো।—'পড়াশুনো কিছুই হচ্ছে না আমার, বই খুলে ব'সে থাকি কিন্তু মাথায় কিছু ঢোকে না—অথচ পড়তে পারলে, দিনে চার ঘণ্টা ক'রেও মন দিতে পারলে—আই. এ.-এস-এ আমি নির্ঘাৎ ওপরের দিকে উৎরে যাবো। দিনগুলো কেমন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে—তোমার সঙ্গে-সঙ্গে বা তোমার পেছন-পেছন ঘুরে বেড়ানো ছাড়া এই ক-মাস আর যে কী

করেছি তা মনেই পড়ে না।'

'সেইজন্যই এখন আমাকে খাঁচায় পুরে নিশ্চিন্ত হ'তে চাও?'

'এটা তো মানবে যে এখন আমরা যে-ভাবে আছি সেটা অস্বাস্থ্যকর?'

'তোমার পক্ষে হয়তো, কিন্তু আমার এ-রকম ভালো লাগে। শোনো গৌতম, এক-একদিন সারা বিকেল আমার সঙ্গে-সঙ্গে থাকো তুমি। অনেক ঘণ্টা নির্জনেও কাটাই আমরা। আমার তো মনে হয় এতদিনে অরুচি ধ'রে যাওয়া উচিত।'

বাঁকা হাসলো গৌতম। 'অরুচি? কার ওপর কার।'

'ধরে নাও আমারই—তোমার ওপর।'

'আমার প্ল্যান অন্যরকম। আমি আরো ঘনিষ্ঠতা চাই।'

'আরো?' আরতি ভুরু টান ক'রে গৌতমের দিকে তাকালো। 'সেজন্যেই বিয়ে? শুধু সেইজন্যে?'

'তাহ'লেই বা দোষ কী? ব্যাপারটা কি খারাপ?'

'তাই ব'লে এক্ষুনি! এ-মুহূর্তে না-হ'লে চলছে না! কিন্তু বিয়ে করলে নতুন বৌ নিয়ে উচ্ছ্বাসে ভেসে যাবে যে—তখন কি আর আই. এ. এস.-এর পড়া হবে?'

'আমার হবে। আরো ভালোভাবে হবে।' গৌতমের এই উত্তরটাতে ঈষৎ গর্বের সুর শোনা গেলো।

'উচ্ছ্বাস হবে না তোমার?'

'হবে না তা নয়—কিন্তু আমি ভেসে যাবো না ; সামলে নিতে পারবো।'

'অর্থাৎ—আমাকে পাশে রেখে সিভিল ল মুখস্থ করবে, আর মাঝে-মাঝে নিজের দরকার মতো ব্যবহার করবে আমাকে? স্বাস্থ্য আর মেজাজ ঠিক রাখতে হ'লে মাঝে-মাঝে যেমন খেয়ে নিতে হয়, এও তেমনি?'

'শাদা কথায় বললে ভালো শোনায় না, কিন্তু খাঁটি বৈজ্ঞানিক তথ্যটা তো তা-ই। ওটাকে আরো উপাদেয় করার জন্য রোমান্টিক রঙে ছুপিয়ে নিতে চাও তো নিতে পারো, কিন্তু আসল সত্যটা জানা থাকলে দোষ কী?'

'ও-সব সত্য-টত্য কিছুই জানি না আমি—কিন্তু এটুকু জানি যে তোমাকে আমি বিয়ে করবো না।'

'করবে, আরতি, করবে।' সহাস্যে বললো গৌতম।

'কিন্তু বিয়ের ছ-মাস পরে যদি ছেড়ে যাই তোমাকে? পালিয়ে যাই অন্য কারো সঙ্গে?'

'I' ll risk it.'

'না কি তুমি নিজেই দুর্বল হ'য়ে পড়ছো ভেতরে-ভেতরে? অন্য একজনের ওপর খুব অন্যায় করেছিলে একবার, এখন তাড়াতাড়ি বিয়ে ক'রে সেটাকে কবর-চাপা দিতে চাচ্ছো?'

কথাটা ব'লে আরতি গৌতমের দিকে তাকালো, কিন্তু গৌতম একটু লালও হ'লো না, অপ্রতিভতার অন্য কোনো লক্ষণও প্রকাশ করলো না। একই রকম ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'আমি কারো ওপর কোনো অন্যায় করিনি, কিন্তু বন্দনা কাল হিস্টিরিয়ার ঝোঁকে একটা সত্য কথা বলেছিলো—তোমার আর আমার এখন বিয়ে করা উচিত।'

'তাহ'লে ঠিক ধরেছি—কাল বন্দনাই এটা ঢুকিয়েছে তোমার মাথায়। "অন্ততপক্ষে ঐ মেয়েটাকে বিয়ে ক'রে ভদ্র হ'তে পারো!" বিয়ে হ'লে কেউ আর ও নিয়ে বলাবলি করবে না, সবাই মেনে নেবে ব্যাপারটা, বন্দনাও অগত্যা শান্ত হবে।—এই তো?'

'বিয়ের কথা অনেকদিন ধ'রেই ভাবছি আমি।'

'সত্যি? কিন্তু আমরা তো অনেক দিন ধ'রে শুনে আসছি যে তোমার সঙ্গে বন্দনার বিয়ের সব ঠিকঠাক।'

'সেবারে ভুল করেছিলাম।'

'আর এবারে নিশ্চিতভাবে জেনেছো যে ভুল করোনি?'

'নিশ্চয়ই। অন্য কাউকে স্ত্রী ব'লে কল্পনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

'আমি কিন্তু মনে-মনে এখনো বন্দনাকেই তোমার স্ত্রী ব'লে ভাবি। তুমি অন্য একজনের স্বামী, তা জেনেই ধীরে-ধীরে আমার দিকে তোমাকে টেনে এনেছিলাম—ভাবতে মজা লেগেছিলো যে এও আমি পারি। তুমি দু-দিন বাদে একটা জেলার হাকিম হবে, আর আমি তোমাকে বাঁদর নাচাচ্ছি এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধিও তোমার নেই?'

'হাঃ!' নাকের ভেতর দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করলো গৌতম।

'কিন্তু সেই মজাটাও এখন ভোঁতা হ'য়ে গেছে— আর আমার দরকার নেই তোমাকে দিয়ে, তুমি তোমার বন্দনার কাছে ফিরে যেতে পারো।'

'কী বলছো তার মাথামুণ্ডু নেই।' আরতির এ-সব রাগি কথা গৌতমের কাছে নতুন নয়, আর যখন সে ও-রকম বলে তখনই তার সবচেয়ে ভালো লাগে আরতিকে, তাকে পাবার জন্য পাগল হ'য়ে যায় ভেতরে-ভেতরে। এ-মুহূর্তেও তা-ই হ'লো, আরতির দিকে তাকিয়ে তার চোখ যেন জ্ব'লে উঠলো দপ ক'রে। হাতের মুঠো পাকিয়ে বললো, 'করবে, আমাকেই বিয়ে করবে তুমি—মুখে যা-ই বলো না।'

'আমি তোমাকে কখনোই বিয়ে করবো না, গৌতম বর্ধন,' গুনগুন গলায় জবাব দিলো আরতি। 'জেনে রাখো, কখনোই না।'

'নিশ্চয়ই করবে!' টেবিলের ওপর একটা বই রাখা ছিলো ; কথার সঙ্গে-সঙ্গে হাতের এমন জোরালো ভঙ্গি করলো গৌতম যে বইটা ছিটকে পড়লো আরতির পায়ের ওপর।

বইটা তক্ষুনি তুলে নিলো আরতি, একবার মাথায় ঠেকিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিলো।

গৌতম ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো, 'ওটা করলে কেন?'

'কী করলাম?'

'বইটা ঠেকালে কেন মাথায়?'

'কেন? জানি না। ছেলেবেলার অভ্যেস বোধহয়। পায়ে বই ঠেকলে আমার গা শিরশির করে।'

'তাই ব'লে মাথায় ঠেকাবে কেন? বইটা একটা জড়বস্তু, কাগজ আর কালি দিয়ে তৈরি। তাকে পুজো করলে তো আর বিদ্যে হবে না তোমার। তুমিও যদি এ-সব ফেটিশে ভোগো, তাহ'লে অন্যদের আর কথা কী!'

'যদি মেঝের ওপর এক সেট "রবীন্দ্র রচনাবলী" ছড়ানো থাকে, তুমি পারবে জুতোসুদ্ধ পায়ে সেটাকে মাড়িয়ে হেঁটে যেতে?'

'বইগুলো নষ্ট হ'তে পারে, তাই আমি ও-কাজ করবো না।'

'আর যদি নষ্ট না হয়? খালি পায়ে একখানা 'রচনাবলী'র ওপর তিন মিনিটের জন্য দাঁড়াতে পারবে?'

'তা কেন পারবো না।?' অনায়াসে জবাব দিলো গৌতম, 'তাতে রবীন্দ্রনাথের কোনো অসম্মান হবে ব'লে আমি মনে করি না। তবে তাঁর পেশাদার ভক্তদের হৃদয়ে যদি আঘাত লাগে, সেটা আলাদা কথা।'

আরতি একটু চুপ ক'রে থাকলো, সন্ধ্যার আবছায়ায় জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো তার চোখ। হঠাৎ উৎসাহের সুরে বললো, 'ঠিক—চমৎকার বলছো—ঠিক কথা! আমি একদিন পরীক্ষা করবো তোমাকে, আর সেই পরীক্ষায় যদি সসম্মানে উত্তীর্ণ হ'তে পারো তাহ'লে তোমাকে বিয়ে করবো—কথা দিচ্ছি।'

'কী পরীক্ষা?'

কিন্তু এ-প্রশ্নের উত্তর শোনা গৌতমের ভাগ্যে ছিলো না সেদিন। সে-মুহূর্তে আলো জ্ব'লে উঠলো, আর কেশববাবুর গলা শোনা গেলো—'কই রে, দিয়েছে নাকি চা?'—কিন্তু পরমুহূর্তেই গৌতমকে দেখে, মেয়েকে আর ঐ ছেলেটিকে খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, কেশববাবু আবার বললেন, 'তা—আমার চা-টা না-হয় ও-ঘরেই পাঠিয়ে দে।'

'না, বাবা, এখানেই বোসো ; সবাই একসঙ্গে খাওয়া যাক। গৌতম, আমার বাবা এখনো লজ্জা পান তোমাকে, তুমি বোসো ; ওঁর সঙ্গে আলাপ করো। বাবা, গৌতম খুব ভালো ছেলে, নামজাদা ছাত্র ছিলো

প্রেসিডেন্সিতে, এখন আই. এ. এস. পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে।'

'বাঃ, খুব ভালো!' কেশববাবু বসলেন, গৌতমকেও বসতে হ'লো, টেবিলে হাজির হ'লো চায়ের সঙ্গে বাড়িতে তৈরি ডিমের শিঙাড়া, পুঁটিরামের সন্দেশ, আর একগোছা লিচু—কিন্তু আলাপ জমলো না একেবারেই। কেশববাবু একটু লাজুক, গৌতম অস্বাভাবিক গম্ভীর ; আরতি যে-প্রসঙ্গই তোলে, একটা-দুটো মন্তব্যের পর কথা এগোয় না। বাবার সঙ্গে ব'সে চা খাওয়াটা (যা খুব কমই ঘটে) আরতি যে-রকম ভেবে রেখেছিলো তার কিছুই হ'লো না ; গৌতমও আজ সন্ধ্যার পরিসমাপ্তি যে-রকম আশা করেছিলো তা ভেস্তে গেলো। নিজের ওপর রাগ হ'লো তার বোকার মতো এখানে ব'সে আছে ব'লে, আর কেশববাবুও ভাবতে লাগলেন কতক্ষণে একটা ভদ্রগোছের ছুতো ক'রে উঠে পড়া যাবে।

একটি সিঙাড়া তুলে কামড় দিতে গিয়ে হঠাৎ আরতি থেমে গেলো। চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো—'ঐ তো দুর্গাদাস!' তার পিঠের এমন একটা ভঙ্গিও হ'লো যেন উঠে এগিয়ে যাবে দুর্গাদাসের দিকে, কিন্তু কী ভেবে সামলে নিলো নিজেকে। দুর্গাদাস কাছে এসে বললো, 'কেন? কী ব্যাপার?' সে আসার সঙ্গে -সঙ্গে ঘরের আবহাওয়া হালকা হ'য়ে গেলো, কেশববাবু স্পষ্টত আরো আরাম ক'রে বসলেন, আর গৌতমও বুঝলো যে এর পরে আর কথার অভাব হবে না। তার ইচ্ছে হ'লো তক্ষুনি উঠে চ'লে যায়, কিন্তু আরতি কেন দুর্গাদাসের জন্য অমন ব্যস্ত ছিলো তা জানার জন্য কৌতূহল অনুভব না-ক'রে পারলো না ; অগত্যা ব'সেই রইলো।

'দুর্গাদাস, কোথায় ছিলে সারাদিন?'

'এই—নানা জায়গায়।'

'আমার চিঠি পেয়েছো?'

'চিঠি? না তো। আমি বাড়ি যাইনি এখনো। কিন্তু চিঠি কেন?'

'কাল এক উন্মাদের প্রলাপ শোনার পর সুস্থ আছো কিনা তা জানার জন্য,' আরতি গম্ভীর চোখে দুর্গাদাসের দিকে তাকালো।

'ও—' মিষ্টি ক'রে হাসলো দুর্গাদাস। 'দাঁড়াও—চা দাও আগে। বাঃ, লিচু! ভারি মিষ্টি তো।'

আরতি দুর্গাদাসের সামনে একটা প্লেট রেখে বললো, 'খোশা এখানে ফেলবে, মেঝেতে না।—জানো বাবা,' কেশববাবুর দিকে এক পলক তাকিয়ে বলতে লাগলো সে, 'কাল তরুণ লেখকদের এক মীটিঙে গিয়েছিলাম—আশ্চর্য সব বক্তৃতা হ'লো সেখানে, আমি ভুলতে পারছি না—বলো না দুর্গাদাস, বাবাকে বলো সংক্ষেপে।'

'ও আবার বলার আর কী আছে।'

'সেই আরশোলার কথাটা!' আরতি আস্তে-আস্তে বললো, 'আমার ভয় হচ্ছিলো বলতে-বলতে একটা স্ট্রোক-ফ্রোক না হ'য়ে যায় বেচারার। আমাকে তুমি বকো, বাবা, আমি রেগে যাই ব'লে—কাল যদি শ্রীপতিকে দেখতে—'

'শ্রীপতি? কোন শ্রীপতি?'

'সেই যে আরতিকে পড়াতো ওর অনার্স পরীক্ষার সময়,' দুর্গাদাস একটু বিশেষ আগ্রহ নিয়ে কেশববাবুর দিকে তাকালো, 'আপনার মনে আছে কাকাবাবু?'

'বাঃ, মনে আছে না! যা বাগীশ্বর ছেলে—ওর সঙ্গে একবার কথা বললে কি আর ভোলা যায়? আমি শুধু ভাবতাম, ঐটুকু বয়সে অত পড়ার সময় পেয়েছিলো কখন? একদিন ডাক্তারি শাস্ত্রের ইতিহাসই সাত কাহন শুনিয়ে গেলো আমাকে—আমি ও-সবের কিছুই জানতাম না! কিন্তু—একটু একসেন্ট্রিক, তা-ই না?'

'হ্যাঁ, ঠিক অন্যদের মতো নয়,' সংক্ষেপে জবাব দিলো দুর্গাদাস। 'ছ-মাস পড়িয়েছিলো অরুকে, কিন্তু দু-মাসের পরে আর টাকা নেয়নি, কিছুতেই দিতে পারিনি ওকে—বললেই বলেছে, "পরে নেবো, আপনার কাছে থাক, আমার দরকারমতো আমি চেয়ে নেবো।" তুই তো টাকা নিয়ে আমাকে অত লম্বা উপদেশ দিলি, অরু—কিন্তু সংসারের সবাই যে মহেশ্বর পাল নয় তাও তো দেখা যাচ্ছে।'

ডাক্তারের এই কথাটিতে ঘরের মধ্যে এক গভীর স্তব্ধতা নামলো, অন্য তিনজন পরস্পরের দিকে তাকালো না। কেশববাবু একটু অবাক হলেন, ভাবলেন এইজন্যই ছোটোদের সঙ্গে বয়স্কদের বেশি মেশা উচিত নয়, হয়তো না-বুঝে এমন-কিছু ব'লে ফেলেছেন যা এদের ভালো লাগেনি। কিন্তু পরমুহূর্তে কী-একটা সত্যের আভাস যেন উঁকি দিলো তাঁর মনের মধ্যে। দুর্গাদাসকে লক্ষ ক'রে বললেন, 'আমার মাঝে-মাঝেই মনে পড়ে সেই টাকাটার কথা ; শ্রীপতিকে তা পাঠিয়ে দেয়া কি উচিত নয় আমার? তুমি কী বলো, দুর্গাদাস?'

'এখন থাক। আমি পরে বলবো আপনাকে।'

'বেশ, তোমরা যা ভালো বোঝো। তা শ্রীপতি ভালো আছে তো? অনেকদিন দেখিনি তাকে।'

এক মুহূর্ত পরে দুর্গাদাস জবাব দিলো, 'না কাকাবাবু, ভালো নেই।'

'ভালো নেই? কোনো অসুখ করেছে?'

'তা-ই তো মনে-হচ্ছে।' যে-কথা বলার জন্য দুর্গাদাস এতক্ষণ ধ'রে মনে-মনে প্রস্তুত হচ্ছিলো, এবার সেটা এক ধাক্কায় বের ক'রে দিলো—'আর অসুখটা বোধহয় ভালোও না। আমি এ-কথা বলার জন্যই আসছিলাম এখানে, আপনাকেও পেয়ে গেলাম, কাকাবাবু—ভালোই হ'লো।'

'কী ব্যাপার বলো তো?'

'ব্যাপার মানে—কী অসুখ তা তো আমি বলতে পারবো না—তবে জ্বর হয়েছে, বেশি জ্বরও না—তবে দুর্বল হয়েছে—আমার সঙ্গে শুয়ে-শুয়েই কথা বললো, বেশি কথাও বললো না।'

আরতি হঠাৎ ঝাঁঝিয়ে উঠে বললো, 'একটু গুছিয়ে বলার চেষ্টা করো, দুর্গাদাস—শুধু আবোলতাবোল বকবে নাকি সারা জীবন? আজ কখন গিয়েছিলে ওর কাছে?'

'এই তো দুপুরবেলায়।'

'কী দেখলে গিয়ে? ভালো ক'রে বলো—বাবা ডাক্তার, শুনলে বুঝবেন।'

'শুয়েই ছিলো, আজকাল ও শুয়েই থাকে প্রায় সারা দিন, ওর মতে শুয়ে থাকাটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ, কেননা—'

'মন্তব্য শুনতে চাই না,' আরতি বাধা দিলে, 'ঘটনাটা বলো।'

'তা, আমাকে দেখে বললো—"আমার কাছে থাকিস না, চ'লে যা। কেউ আমার কাছে থাকলে আমার অসুখ আরো বেড়ে যায়।" গায়ে হাত দিয়ে জ্বর মনে হ'লো, টেবিলে দেখলাম এঁটো চায়ের পেয়ালা আর একটা বিস্কুটের টুকরো—সকাল থেকে প'ড়ে আছে নিশ্চয়ই—জিগেস করলাম দুপুরে কিছু খেয়েছিলো কিনা, বললো "খেয়েছি" ; স্নান করেছে কিনা, বললো, "হ্যাঁ"—কিন্তু বিছানার চাদর-টাদরগুলো—মানে—অনেকদিন কাচানো হয়নি মনে হ'লো—বালিশের তলা থেকে একটা রুমাল টেনে ঘাম মুছলো, সেটাতে খয়েরি রঙের ছোপ-ছোপ দাগ, বললো নাক দিয়ে রক্ত পড়েছে। আর হাতের কাছে কোনো বই-টইও নেই, আমি বইয়ের কথা তুলতে বললো, "বই ভাবতে আমার ঘেন্না করে আজকাল, শুয়ে-শুয়ে সেই দিনের কথা ভাবি যেদিন বোমা প'ড়ে ইউনিভার্সিটিগুলো ধ্বংস হ'য়ে গেছে, ভস্ম হয়েছে সব লাইব্রেরি, লুপ্ত হয়েছে নাম তারিখ ইতিহাস ; আইন আদালত আপিশ ফ্যাক্টরি—কিছুরই কোনো চিহ্ন নেই পৃথিবীতে, যেদিন মানুষ অবশেষে বাঁচতে আরম্ভ করেছে—আমিও সেইদিন পর্যন্ত বাঁচতে চাই।" অদ্ভুত! কাল ঐ মীটিঙে যা বললো ঠিক তার উল্টো কথা না?'

'দুর্গাদাস!'—টেবিলে টোকা দিলো আরতি—'টিপ্পনীগুলো বাদ দাও ;—তারপর?'

'আমি অনেকক্ষণ ব'সে থাকলাম, কিন্তু কোনো কথার মধ্যে ঠিকমতো টানতে পারলাম না ওকে, শুধু মাঝে-মাঝে বলতে লাগলো, "এখানে ব'সে আছিস কেন, চ'লে যা বলছি।" তিনটে নাগাদ ওর একটু তন্দ্রা এলো, আমি ওর হাতের কাছে খাবার জল রেখে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এলাম।'

' "বেরিয়ে এলাম।" বেশ করেছো! চমৎকার!' আরতির হাত নাড়াতে একটা কাচের গ্লাশ উল্টে গেলো, দুর্গাদাস তাড়াতাড়ি ধ'রে ফেললো সেটাকে—'তিনটের সময় বেরিয়েছো সেখান থেকে, আর এখন ক-টা বাজে, শুনি?'

'ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে কাজ ছিলো একটু, আর সেখান থেকে—'

'দেখছো তো বাবা, আজকালকার ছেলেদের নমুনা দেখছো তো! একজন অসুস্থ বন্ধুকে একা ফেলে মনের আনন্দে আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছে। আর ঐ আর-একজন—'চোখ দিয়ে গৌতমেব দিকে ইঙ্গিত করলো সে, 'ফিনফিনে ধোপের পাঞ্জাবি প'রে অবিচলভাবে বন্ধুর অসুখের কথা শুনছে। কফি-হাউসে গুলতানি করার বেশ আর-একটা বিষয় হলো—না, গৌতম?'

'অরু!' কেশববাবু লাল হলেন একটু, 'কী যা-তা সব বলছিস!'

'আমরা কেউ কিছু মনে করিনি,' মুরুব্বিয়ানার সুরে গৌতম বললো, 'আপনাব মেয়েব কথা শুনে অভ্যেস আছে আমাদের।'

কথাটা ভালো লাগলো না কেশববাবুব ; দুর্গাদাসের দিকে ফিবে বললেন, 'কোনো ডাক্তার দেখেছিলো শ্রীপতিকে?'

'জানি না।'

'কোনো চাকরি কবে?'

'ট্যুশনি ক'বে চালায—কিন্তু মাঝে কিছুদিন ট্যুশনিও বোধহয় ছিলো না।'

'কোথায় থাকে?'

'থাকে হাজবা বোডের কাছে একটা গলিতে। হ্যাঁ—সে আর-এক কথা। এক ভদ্রলোক ওকে সাব-লেট কবেছিলেন ঘবটা, তিনি ছুটিতে বাইরে গেছেন, কিন্তু ব'লে গেছেন ফিবে এসে ঐ ঘরটা তাঁর নিজেবই লাগবে। এ-কথাটা আমি আগেই জানতাম, কিন্তু কাল আবার জিগেস করাতে শ্রীপতি কিছুই জবাব দিলো না। তা এদিকে যদি—তাই ভাবছিলাম, কাকাবাবু, আপনি যদি ওকে একবার—'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই যাবো। তা আর বলতে!'

'কাল সকালে এসে আমি নিয়ে যাবো আপনাকে?'

'বেশ তো—ঠিক আটটাব মধ্যে এসো কিন্তু—দেবি কোরো না ; দশটায আমাকে হাসপাতালে যেতে হয়, জানো তো।'

'আজ বাত্রেই গেলে হয় না, বাবা? এখনই গেলে হয না?'

মেযেব মুখের দিকে এক পলক তাকিযে কেশববাবু উঠে দাঁড়ালেন।—'হ্যাঁ তা-ই ভালো। অসুখ-বিসুখে দেবি কবাটা কিছু না।'

তাঁব পেছন-পেছন ঘবে ছুটে এলো আবতি ; ডাক্তাবেব ব্যাগ এগিয়ে দিলো, পকেটে দিলো টাকা সিগাবেট ফাউন্টেন পেন , হঠাৎ একবাব ঘুবে দাঁড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো বাবাকে। কেশববাবু তার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'তুই চল তাহ'লে।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো চারজনে। বাস্তায় এসে দুর্গাদাস বললো, 'কী মেঘ কবেছে দেখছো।'

'অনেক আগে থেকেই তো মেঘ ক'রে আছে,' বললো গৌতম। 'জোলো হাওযাও দিচ্ছে এখন—আজ বৃষ্টি না-হ'যে যায না।'

'হ'লেই ভালো—শহরটা ঠাণ্ডা হবে। উঠে পড়ো সবাই।'

আরতি আর দুর্গাদাস ডাক্তাবেব সঙ্গে পেছনে বসলো , একটু ভেবে গৌতমও উঠে পডলো ড্রাইভাবের পাশে। সে ভাবছিলো একটা সাধারণ ব্যাপারকে বড্ড ফেনিযে তোলা হচ্ছে, কিন্তু প্রেমে পড়লে মানুষের স্বাধীনতা থাকে না।

৬

'সপ্তর্ষি'র মীটিং থেকে যখন বেরোলো তখন শ্রীপতির শরীরে যেন আর ওজন নেই ; মাথার মধ্যে ঘূর্ণি চলছে। বাইরের হাওয়াটা খুব ভালো লাগলো তার, হঠাৎ ইচ্ছে হ'লো কোথাও ঢুকে এক পেয়ালা চা খেয়ে নেয়—কিন্তু না, যে-পেয়ালায় অন্যেরা খাবে তাতে তো আর চুমুক দিতে পারে না সে, ও-সব শেষ হ'য়ে গেছে। কয়েক মিনিটের জন্য সে যেন ভয়ে অসাড় হ'য়ে থাকলো, পাছে অন্যদের ছোঁয়াচ দেয়। আজ বিকেলেই যারা তার ঘরে এসেছিলো তাদের কথা ভাবলো—তার বিছানাতেও ব'সে গেছে ওরা—বন্দনা, দুর্গাদাস, ঐ হিমেন্দু ব'লে ছেলেটি—আর দুর্গাদাস যদি আবার আসে, তাহ'লে? সে চ'লে যাবে, কোথাও তাকে চ'লে যেতেই হবে, অনেক দূরে, নির্জনে, তাকে এড়িয়ে চলাব বা তার জন্য ব্যস্ত হবার মতো কেউ নেই যেখানে। কথাটা ভেবেই তার ভয়ের ভাবটা কেটে গেলো, আস্তে-আস্তে অন্য এক কথা মনে হ'লো। আসলে তাব এখনকার অবস্থাটা চমৎকার, রীতিমতো ঈর্ষাযোগ্য—এতদিন শুধু অন্য কারো জন্য তার দায়িত্ব ছিলো না, এখন থেকে নিজের দিক থেকেও সব দায়িত্ব চলে গেলো। এখন সে যা খুশি তা-ই করতে পারে, একেবারে যা খুশি তা-ই। যে বুড়ো ভিখিরি ফুটপাতে ব'সে আছে, হঠাৎ যদি টুঁটি চেপে মেরে ফ্যালে তাকে—কী হবে তাহ'লে? কিছুই হবে না ; কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তার। একটি মহিলা তাঁর কিশোরী মেয়েকে নিয়ে হেঁটে আসছেন ; যদি মুখোমুখি হওয়ামাত্র এক ধাক্কায় মেয়েকে ফেলে দেয় রাস্তায় আর মা-কে সজোরে জাপটে ধরে, তাহ'লেই বা কী হবে? কিছুই হবে না। রাস্তায় লোকজন জড়ো হ'য়ে মারের চোটে তাব হাড় গুঁড়িয়ে দেবে—কিন্তু কিছুই হবে না। অত মার খেয়েও হা-হা ক'রে হাসতে পারবে সে। কিংবা যদি লেকে যায় এক্ষুনি ; গিয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে, অনেকক্ষণ তারার তলায় শুয়ে থাকার পব, আরামে প্রায় ঘুমিয়ে পড়ার পর , আস্তে গড়িয়ে চ'লে যায় জলের মধ্যে, আব কাল সকালে তার মাছে-ঠোকরানো ফোলা শরীরটা ভেসে ওঠে, তাতেই বা কী—কিছুই না, কিছুই এসে যায় না। কী আশ্চর্য ক্ষমতা আমার এখন, আমি সব পারি, কোথাও কোনো বাধা নেই আমার। এখন কথাটা হচ্ছে · এই ক্ষমতা কোন কাজে লাগাই।

বাড়ি ফিরেই বাথরুমে ঢুকলো, কয়েকবার কেশে থুতু ফেললো, কিন্তু শাদা ছাড়া আর-কিছুই উঠলো না। ওৎ পেতে আছে, খেলা করছে আমার সঙ্গে। মুখে জলের ঝাপটা দিতে গিয়ে ইচ্ছে হ'লো স্নান করে। বিকট ঘেমেছে ঐ মীটিঙে। কিন্তু ঝর্নার নিচে দাঁড়াবার একটু পরেই জল আর ভালো লাগলো না, শীত ক'রে উঠলো, কোনোরকমে আবার কাপড় প'রে নিয়ে বেরিয়ে এসে সোজা শুয়ে পড়লো বিছানায়। সঙ্গে-সঙ্গে এক অকথ্য কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়লো তার শরীরে, দাঁতে-দাঁতে শব্দ হ'লো, হাড়-গোড় সুদ্ধু ঠকঠক করছে যেন—চাদরটার তলায় ঢুকে গিয়ে গোল হ'য়ে প'ড়ে থাকলো, এটুকু সাধ্য হ'লো না যে তোশকের তলা থেকে কম্বলটা টেনে বের করে। এ কিছু না—ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়তো, বা ডেঙ্গু—আজকাল খুব ডেঙ্গু হচ্ছে শহরে—দু-দিন পরে নিজে-নিজেই সেরে যাবে। তবু—একবাব ডাক্তার দেখালে হয় না? না, না—বিশ্রী লাগে ডাক্তার ভাবতে, বিশ্রী লাগে ওদের বুকে-পিঠে টোকা—এই যে, কাঁপুনি ক'মে যাচ্ছে, ঘুম পাচ্ছে আমার, ঘুমোনো যাক।

ঝাপসা ঘুম, এলোমেলো স্বপ্ন, মাঝে-মাঝে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকা—কখনো পায়ের পাতা হিম, কখনো যেন গা পুড়ে যাচ্ছে। টুকরো ছবি ভেসে-ভেসে উঠছে অন্ধকারে—তার বিধবা মা, তাদের গ্রামের বাড়ি, মিষ্টি সোঁদা গন্ধে ভরা ঠাণ্ডা ঠাকুরঘরটা, জষ্টিমাসে ঠাকুমার মুখে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা শোনা, আর সেই যে একটা মেয়ে—কী না নাম?—যার সঙ্গে সে ফুল চুরি করতে বেরোতো সরস্বতী পুজোর শেষরাত্রে, আর তার হৃদয়হীন, সুদখোর, সারা বাড়ির ও প্রায় সারা গ্রামের ডিক্টেটর জ্যাঠামশাই, যাঁর তাড়নায় টিকতে না-পেরে সে কলকাতায় পালিয়ে এসেছিলো। আশ্চর্য—আমারও একটা ছেলেবেলা ছিলো, একজন মা ছিলো—কিন্তু কত দূর, যেন অন্য দেশ, অন্য জগৎ, অন্য কেউ। আমি কেঁদেছিলাম? হয়তো—হ্যাঁ, খুব কেঁদেছিলাম—কিন্তু একজন মানুষের চিরকালের মতো হারিয়ে

যাওয়ার তুলনায় সে-কান্না আর কতটুকু। 'মা, আমাকে ক্ষমা করো, আমি যথেষ্ট কাঁদিনি তোমার জন্য।' শ্রীপতি চেষ্টা করলো শব্দ ক'রে কথাটা বলতে, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোলো না। আর তাছাড়া—কোনো মানে হয় না ও-সবের, কী লাভ? কে কতটুকু কাঁদলো, কেউ কাঁদলো কিনা—কী এসে যায়? মৃত্যু শেষ কথা—তার কোনো উত্তর নেই, ক্ষতিপূরণ নেই, সব কথা সেখানে এসে থেমে যায়। নিঃসঙ্গতা—এক অতল, অনন্ত ও আমাদের পক্ষে ধারণাতীত নিঃসঙ্গতা : তারই নাম মৃত্যু। না, না, আমি তখন যা ভেবেছিলাম তা হ'তেই পারে না। আমি সেরে উঠবো—নিশ্চয়ই—আমার কিছু হয়নি। এই তো আমি শুয়ে আছি আমার ঘরে, চার নম্বর নিমু দত্ত লেনে, আমার নাম শ্রীপতি ভদ্র, বয়স আটাশ, আজ জুন মাসের সতেরো তারিখ। হঠাৎ নিশ্চিন্ত বোধ করলো শ্রীপতি, টের পেলো জানলা দিয়ে ফুরফুর ক'রে হাওয়া আসছে, মনে হ'লো তার শরীরে কোনো কষ্ট নেই, মনে হ'লো গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়বে এবার। আর ঠিক তখনই দেখতে পেলো দরজার সামনে কেউ একজন—একটি মেয়ে, সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে, সোজা তাকিয়ে আছে তার দিকে, অন্ধকারে তারার মতো ঝকঝকে চোখে তাকিয়ে। শ্রীপতি অবাক হ'লো না, নড়লো না, তার দৃষ্টি মিশিয়ে দিলো সেই দৃষ্টিতে, যেন মুগ্ধ, যেন রুদ্ধশ্বাস। চোখে চোখ রেখে কাটলো কয়েকটি মুহূর্ত, তারপর আস্তে-আস্তে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো সেই ঝকঝকে চোখ, সেই সোজা হ'য়ে দাঁড়াবার ভঙ্গি। তখনও শ্রীপতি অবাক হ'লো না—কিন্তু হঠাৎ আনন্দের মতো একটা অনুভূতিতে কেঁপে উঠলো। তার দেরাজে একটি চিঠি লুকোনো আছে—এ কি হ'তে পারে যে তার উত্তর দেবার সে সময় পাবে না? মনে পড়লো একে-একে তার বন্ধুদের, ভালো লাগলো ভাবতে যে অনেককে নিয়ে একসঙ্গে সে বেঁচে আছে এই কলকাতায়। মনে পড়লো সেই ভোরবেলাটি, যখন সে দেশের বাড়ি ছেড়ে, জ্যাঠামশাইয়ের খপ্পর এড়িয়ে, প্রথম হাওড়া স্টেশনে এসে নেমেছিলো।

জ্যাঠা তাকে স্কুল-ফাইনেলটাও পাশ করাতে চাননি, জোর করেছিলেন রায়গঞ্জে তাঁর কাপড়ের আড়তে বসার জন্য। 'বাড়ির ভাত খাবি, পনেরো টাকা ক'রে হাত-খরচ পাবি আপাতত, ব্যাবসাটা জ'মে উঠলে তোকে আর ভাবতে হবে না। পাশ-ফাশ ক'রে কী হবে—জানিস না কত বি. এ. এম. এ. ফ্যা-ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়ায় কলকাতায়!' জ্যাঠার কথার মধ্যে যেটুকু তার ভালো লেগেছিলো, তা ঐ 'কলকাতা' শব্দটা—বাচ্চা বয়সে গিয়েছিলো একবার মা-র সঙ্গে—কী প্রকাণ্ড, কী ডামাডোল সারাক্ষণ, তখন একটু ভয় পেয়েছিলো, কিন্তু এখন তার মন টানে সেখানেই, জ্যাঠার রাজত্ব ছেড়ে সেই বিশালতার মধ্যে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। ট্রেনে মাত্র পাঁচ ঘণ্টার পথ—চ'লে গেলেই তো হয়। জ্যাঠার প্রস্তাবে রাজি হ'য়ে গেলো সে, স্কুল ছেড়ে দিয়ে কাপড়ের আড়তে বসলো, তার কাজে খুশি হ'য়ে মাসের শেষে জ্যাঠা বললেন, 'তোর হবে! এই নে পাঁচ টাকা, আর দশ টাকা তোর নামে পোস্টাপিশে রাখছি। বছরের শেষে একশো-কুড়ি টাকা হয়ে যাবে তোর, তার ওপর সুদ—বুঝেছিস!' আরো দু-মাস আটকে রইলো আড়তে, আরো দু-বার পাঁচ টাকা ক'রে হাতে পেলো, তারপর একদিন একটি ছোট্ট টিনের সুটকেস হাতে ক'রে নামলো এসে হাওড়া স্টেশনে। সন্ধে তখন, শীতকাল। তার পরনে মোটা ধুতি, গায়ে শার্টের ওপর শস্তা আলোয়ান, পায়ে রবারের জুতো, আর দশটি টাকা পকেটে। কলকাতায় মাত্র একজন মানুষের নাম জানে সে : নিবারণ মুখুজ্জে, তাদের গ্রামের স্কুলে পড়াতেন আগে, এখন বেলেঘাটা চিত্তরঞ্জন হাই স্কুলের হেডমাস্টার। হাওড়া স্টেশন থেকে বেলেঘাটায় কী ক'রে পৌঁছতে হয় সেই বিরাট সমস্যার মুখোমুখি হবার মতো সাহস তার তক্ষুনি হ'লো না ; সে-রাতটা হাওড়া স্টেশনেই ঘুমোনো—আলো, আওয়াজ আর লোকজনের মধ্যে নিরাপদ মনে হ'লো নিজেকে। পরের দিন অনেক জনকে অনেক বার জিগেস ক'রে-ক'রে, কয়েকবার ভুল বাস্-উঠে আর কয়েকবার ভুল বাস্-এ ওঠার ভয়ে আবোলতাবোল হেঁটে, প্রায় চার ঘণ্টার চেষ্টায় অবশেষে পৌঁছেছিলো বেলেঘাটার চিত্তরঞ্জন হাই স্কুলে। মাস্টারমশাই প্রথমে তাকে চিনতে পারেনি—বয়সের পক্ষে দেখতে বড্ড বড়ো হ'য়ে গিয়েছিলো সে—কিন্তু তার আর্জি শুনে দয়া করেছিলেন (পুরে কথাটা সে বলেনি অবশ্য), বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলেন কয়েকদিন, এমনও বলেছিলেন যে সে যদি কলকাতায় এসে পড়তে চায় তাঁর স্কুলে তাকে

ফ্রী ক'রে দেবার চেষ্টা করবেন, কিন্তু সবই বলেছিলেন এই ধারণা থেকে যে তার অন্য সব খরচ সে বাড়ি থেকে পাবে। পাছে তিনি টের পেয়ে যান সে বাড়ি থেকে 'পালিয়ে' এসেছে, আর পাছে তার হদিশ পেয়ে জ্যাঠা তাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে আবার চাকর খাটাতে লেগে যান, সেই ভয়ে মাষ্টারমশাইয়ের দয়া থেকেও তাকে পালাতে হ'লো। আর তারপর—

আশ্চর্য এই যে সে ম'রে যায়নি—না রোগে, না অনাহারে, না হঠাৎ একদিন গাড়ি চাপা প'ড়ে। ফেরি করেছে খবর-কাগজ, চায়ের দোকানে বেয়ারার কাজ করেছে, হিশেব লিখেছে বড়োবাজারে মারোয়াড়ির গদিতে—পার্কে ঘুমিয়েছে, বস্তিতে থেকেছে, মাতালের হল্লা আর বেশ্যার খিস্তি শুনে-শুনে কানের চামড়া পুরু হ'য়ে গেছে তার ; কিন্তু সব সত্ত্বেও—শুধু যে ম'রে যায়নি তা নয়, চোদ্দ-পনেরোর মতো সাংঘাতিক বয়সেও উচ্ছন্নে যায়নি, হয়নি পকেটমার বা চোরাই মালের দালাল, বা রণে ভঙ্গ দিয়ে জ্যাঠার আশ্রয়ে ফিরে যাবার কথাও ভাবেনি। সময় পেলেই স্টলে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নানা পত্রিকা পড়েছে, দু-চার টাকা হাতে এলেই হানা দিয়েছে পুরোনো বইয়ের দোকানে—কখনো-কখনো এমন বই পেয়েও গেছে যা খুলে বসলে অন্য সব ভুলে যেতে হয়। যেখানেই থাক, যে কাজই করুক, তার ইচ্ছের ঝোঁক অন্য দিকে, তাছাড়া ভাগ্যও তার সহায় ছিলো নিশ্চয়ই—নয়তো সতেরো বছর বয়সে কলেজ স্ট্রিটের ঐ বইয়ের দোকানটাতেই কাজ জুটে যাবে কেন শেষ পর্যন্ত? বইয়ের পার্সেল প্যাক ক'রে ঠিকানা লেখা তার কাজ, কেউ গর-হাজির হ'লে অন্য ফরমাশও খাটতে হয়, কিন্তু ফাঁকে-ফাঁকে প'ড়েও নিতে পারে কিছু কিছু, বইয়ের গন্ধে ভরা আধো-অন্ধকারে ব'সে থাকতেও ভালো লাগে তার। দোকানের মালিক শিবেশ্বরবাবু তার পড়ার ঝোঁক লক্ষ ক'রে পোকায়-কাটা পুরোনো বই মাঝে মাঝে দিয়ে দেন তাকে, পুজোর সময় আশাতীতভাবে তাকে বোনাসও দিলেন ; পরের বছর প্রাইভেটে স্কুল-ফাইনেল পরীক্ষাটা সে দিতে পারলো। ঐ অবস্থায় পরীক্ষা দিয়েও সে যে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে, এতে শিবেশ্বরবাবু এত খুশি হলেন যে তাঁর নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিলেন তাকে ; সকালে তাঁর দুই নাতি-নাৎনিকে পড়ায়, দুপুরবেলা ক্লাশ করে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে, বিকেলে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে বই বেচে—এমনি ক'রে আই. এ.-র বেড়া টপকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে এলো সে। পেরিয়ে এলো ট্যুশানির অনেকগুলো ধাপ, এখন সে শিবেশ্বরবাবুর জন্য প্রুফ দ্যাখে, 'হেল্প টু দি স্টাডি অব .' পর্যায়ে বইও লিখে দেয়, থাকে মির্জাপুর স্ট্রিটের এক মেস্‌-এ, জামা-কাপড় নিজে না-কেচে লন্ড্রিতে দিতে দ্বিধা করে না।

বিখ্যাত প্রেসিডেন্সি কলেজ, যার সামনের ফুটপাত দিয়ে হাঁটতেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত শ্রদ্ধায় মাথা নিচু হ'য়ে গেছে তার—সেই কলেজের সে এখন অন্যতম সদস্য, এই ধারণাটার সঙ্গে অভ্যস্ত হ'তে মাত্র কয়েকদিন সময় লাগলো তার, কিন্তু বেশিদিন লাগলো না। মাস দুয়েকের মধ্যে সে এমন একটা আবিষ্কার করলো যাতে সে অবাক হ'য়ে গেলো রীতিমতো, কিন্তু সেই অনুভূতিও অজান্তে একদিন উবে গেলো। কী সহজে সবই মেনে নিই আমরা, সব-কিছুকেই ভোঁতা অভ্যেসে অধঃপতিত করি, আর তারপর থেকেই অন্য কিছুর জন্য জ্বলুনি-পুড়ুনি শুরু হ'য়ে যায়। আজ কী এসে যাচ্ছে যে কয়েক বছর আগে প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলো সে—সব ছাত্র যাকে একডাকে চেনে, অধ্যাপকেরাও সমীহ ক'রে চলেন, টেরিলিনের শার্ট-পরা স্কলার্শিপ-পাওয়া ছেলেরা যাকে ঘিরে দাঁড়ায়, আর যাকে সিঁড়িতে দেখলে এমন মেয়ে নেই যে আড়চোখে বা সোজাসুজি দৃষ্টিপাত না করে। ছেলেরা তাকে ছাত্র-সমিতির সেক্রেটারি ক'রে নিতে চাইলো, সাধ্য-সাধনা করলো কলেজ-পত্রিকার সম্পাদক হবার জন্য, প্রোফেসর বললেন সেমিনারের সেক্রেটারি হ'তে—ছাত্র-জীবনের সবচেয়ে লোভনীয় ও মাননীয় এই পদগুলি—কিন্তু প্রত্যেকটাকেই দাম্ভিক বিনয়ের সঙ্গে আলগোছে সরিয়ে দিলো সে। তবু সে-ই যেন কেন্দ্র, তারই চারপাশে কিছু-একটা গ'ড়ে উঠতে চাচ্ছে, যেন একটা নাটক শুরু হ'য়ে গেছে যার পরিচালক সে ছাড়া আর-কেউ হ'তে পারে না, কলেজটা যেন একাধারে তারই কর্মস্থল ও প্রমোদভবন, আর রাস্তার ওপারে কফি-হাউস তার ব্যক্তিগত সাম্রাজ্য। ক্লাশ কামাই করে, মুখে-মুখে তর্ক চালায় প্রোফেসরদের সঙ্গে, যখন যে-মত তার কানে আসে তক্ষুনি প্রতিবাদ করে তার—যদি দু-

দিন আগে সে-কথা সে নিজেই ব'লে থাকে, তবুও ; কিন্তু তাকে যেন সবই মানিয়ে যায়, কেউ কিছু বলে না তাকে, কিংবা একজনের ভ্রূকুটি অন্যদের প্রশ্রয়ে তলিয়ে যায়। অথচ পড়াশুনোর দিক থেকে তাকে 'ভালো ছেলে' বলা অসম্ভব ; টিউটরিয়েলে উঁচু নম্বর সে কখনোই পায় না—যে-সব বইয়ের ওপর দিয়ে তার চোখ আর মন ঝড়ের বেগে ছুটে চ'লে যায় তাতে জগতের জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক-কিছুই থাকে, শুধু থাকে না কলেজের পাঠ্য বই বিষয়ে কোনো উল্লেখ, মাস্টারমশাইদের অনুমোদিত কোনো তথ্য। তার কৌতূহল যেন দাবানলের মতো জ্বলছে ; যে-কোনো একজন মানুষের যাতে আগ্রহ জাগতে পারে তারও তাতে আগ্রহ ; লাইব্রেরিতে যে-বইটার জন্য যায় সেটা বেমালুম ভুলে গিয়ে হয়তো মধ্যযুগের ডাইনি-বিদ্যার মস্ত ইতিহাস শেষ ক'রে ফ্যালে। এমনি ক'রে থার্ড ইয়ারটা কাটলো তার ; নিজের ক্ষমতার বিষয়ে সচেতন হবার পর সেই ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারী ব্যবহার ক'রে। এক-এক সময় এমনকি, তার অতীতের দিকে তাকিয়ে, নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে মনে-মনে বলেছে, 'শাবাশ, শ্রীপতি, শাবাশ। চমৎকার করেছো তুমি!'

ছাত্রদের প্রেমে পড়া, পলিটিক্স করা, বাউণ্ডুলেপনা, যথেচ্ছাচার—এ-সবের মেয়াদ সাধারণত থার্ড ইয়ার পর্যন্ত ; ফোর্থ ইয়ারে উঠেই চাল-চলন বদলে যায় তাদের, ভালো ছেলেরা অন্য সব কাজ মুলতুবি রেখে পরীক্ষার জন্য তৈরি হ'তে থাকে, মাস্টারমশাইদের বাড়িতে যাওয়া-আসা শুরু ক'রে দেয়, বুনো ঘোড়া আস্তাবলের দানাপানির গুণে চোখে ঠুলি পরতে আর আপত্তি করে না। শ্রীপতিরও পরিবর্তন হ'লো এই সময়ে, কিন্তু ঠিক সে-ভাবে হ'লো না। একটি স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার বদলে যে-কোনো লক্ষ্যেরই প্রতি সন্দিগ্ধ হ'লো তার মন। সন্দেহ জাগলো নিজের বিষয়ে, অন্যদের বিষয়ে, জগতের বিষয়ে। 'আসলে,' বিছানায় পাশ ফিরে মনে-মনে বললো শ্রীপতি, 'সেই আমার অসুখের আরম্ভ।'

মাস্টারমশাই জরুরি বিষয় পড়িয়ে চলেছেন, ছেলেরা অন্ধভাবে নোট নিচ্ছে, সে ব'সে-ব'সে ভাবছে ইনি পড়াচ্ছেন কেন? আর আমরাই বা কেন পড়তে এসেছি? ঐ তো আমাদের জগদীশবাবু—কুড়ি বছর ধ'রে শেক্সপীয়র পড়াচ্ছেন—পঁচিশ বছর ধ'রে—বছরের পর বছর এই একই কথা আউড়ে-আউড়ে হাড়গোড়সুদ্ধু চিবিয়ে শেষ ক'রে দিচ্ছেন কবিতাকে—প্রেমিকাকে এত বেশি ভালোবেসেছেন যে তাকে কেটে-কুটে রান্না ক'রে পাড়ার লোক ডেকে পঙ্‌ক্তিভোজে ব'সে গেছেন একেবারে। আর ঐ ছেলেমেয়েগুলো—তারা নোট নিচ্ছে, আর এর পর লাইব্রেরিতে গিয়ে উপুড় হ'য়ে পড়বে—কেন? ভালো চাকরি, ভালো বিয়ে, ইংলন্ড ফ্রান্স আমেরিকায় যাওয়া, নিজের উন্নতি, দেশের উন্নতি। অত খাটছেন কেন আপনি? বি. এ. পাশ করবো, তাই। বি এ. পাশ ক'রে কী হবে? কেম্ব্রিজে যাবো, এম. এ. পড়বো, প্রোফেসরি করবো। তারপর? চাকরি, বিয়ে। তারপর? ছেলেপুলে, তাদের মানুষ ক'রে তোলা। এবার তো মেয়ের বিয়ে দিলেন, ছেলে বড়ো হ'লো, এরপর? বাড়ি আরম্ভ করেছি যোধপুর পার্কে, বুড়ো বয়সে মাথা গোঁজার জায়গা চাই তো একটা। বাড়ি কদ্দুর? হ'য়ে গেছে, কিন্তু এবার ভাবছি তেতলাটাও তুলে ফেলি।... এমনি একের পরে আর, শেষ নেই ; পর-পর যে-সব লক্ষ্য দেখা দেয় মানুষের সামনে, সুকুমার রায়ের আশ্চর্য খুড়োর কলের মতো যা অনবরত ছুটিয়ে বেড়ায় আমাদের—কী তুচ্ছ সেগুলো, কী ময়লা, চিটচিটে, সাধারণ! আমরা কেউ শেক্সপীয়র পড়াচ্ছি, কেউ বিচার করছি মহাত্মা গান্ধীর ছবির তলায় ব'সে, কেউ বা তুবড়ির মতো এডিটরিয়াল লিখে এক দিনের, এক ঘণ্টার, এক মিনিটের উত্তেজনার সৃষ্টি করছি—মহৎ কাজ, দেশের মধ্যে গণ্যমান্য আমরাই—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবই কেন পুরোনো তামার পয়সার মতো চিটচিটে ময়লা হ'য়ে যায়? মজা লাগে ভাবতে, যে চোরেরও বৌ আছে, যাকে গয়না দিয়ে খুশি করার জন্য চুরি করতে বেরোয় সে ; গুণ্ডারও আছে বঙ্কিতা, যাকে নিজের কাছে ধ'রে রাখার চেষ্টায় সে পঞ্চাশ টাকার জন্যে কারো মাথা ফাটিয়ে দেয়। যা সবচেয়ে তুচ্ছ তা-ই সবচেয়ে শক্তিমান ; তারই টানে যে যার নির্দিষ্ট কাজ দৃষ্টিহীনভাবে ক'রে যাচ্ছে, প্রত্যেকে ভাবছে তার কাজটা প্রচণ্ড জরুরি ; একবার কেউ ভেবে দেখছে না যে সে না-থাকলে জগতের কিছু এসে যায় না, কেউ না-থাকলে অন্য কারো কিছু এসে যায় না, যে মানুষ না-থাকলেও পৃথিবীটা থাকতে পারে, এবং পৃথিবী না-থাকলেও সৌরমণ্ডল, সৌরমণ্ডল না-থাকলেও মহাবিশ্ব ;—আর যদি সারা জগৎটারই

সৃষ্টি না-হ'তো তাহ'লেই বা ক্ষতি ছিলো কী।...কিন্তু ঈশ্বরই যদি প্রথম পাপ করলেন এই জগৎটাকে সৃষ্টি ক'রে, তাহ'লে বেচারা মানুষ আর পালাবার পথ পাবে কোথায়? তিনি তো থাকতে পারতেন আড়ালে, উপনিষদের ব্রহ্মের মতো, থাকতে পারতেন তাঁর শুদ্ধতায়, পরমত্বে, নিজের একত্বে ও একাকিত্বে মগ্ন হ'য়ে—কেন সেই পবিত্র শূন্যতা ভেঙে বেরিয়ে আসতে হ'লো তাঁকে, কেন ব্রহ্মাকেও দুই হ'তে হ'লো, প্রকাশিত হ'তে হ'লো লক্ষ-লক্ষ সাধারণের মধ্য দিয়?

আর সেখানেই, শ্রীপতি এখন স্পষ্ট বুঝতে পারলো, সেখানেই তার অসুখের আরম্ভ। পৃথিবীতে কিছু নেই যা করার যোগ্য, কোনো কাজ নেই যা নিষ্পাপ, স্বয়ং ঈশ্বর সৃষ্টি ক'রে আদিপাপ করেছেন। তাহ'লে...কেন?

ছেলেবেলায় নিজের মনে একটা খেলা ছিলো শ্রীপতির : সে ভাবতে চেষ্টা করতো সে নেই, কিন্তু কিছুতেই সেটাকে ধারণার মধ্যে আনতে পারতো না। আমি যদি নেই তাহ'লে কেমন ক'রে জানছি যে আমি নেই? আমি যে নেই তা জানার জন্যেও তো আমাকেই থাকতে হবে। তারপর ভাবতো . ধ'রে নেয়া যাক সব মানুষ ম'রে গেছে, জীবজন্তুরা লুপ্ত, গাছপালা ধোঁয়া হ'য়ে মিলিয়ে গেলো, জল মাটি আকাশ নিয়ে কুঁকড়ে পুড়ে দুমড়ে ভেঙে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেলো পৃথিবী। শূন্য, শুধু শূন্য। শূন্য? ঐ তো সৌরমণ্ডল, একটি গ্রহ খ'সে পড়ায় কী বা এমন ক্ষতি হয়েছে তার, শনির চক্র তেমনি জ্বলজ্বল করছে, বৃহস্পতি তার চাঁদগুলোকে নিয়ে নিশ্চিন্ত—আর তারপর আরো কত বড়ো-বড়ো সৌরমণ্ডল, গ্রহ নক্ষত্র, জ্যোতিষ্ক, ধূমকেতু, নীহারিকাপুঞ্জ, অনন্ত কাল ধ'রে হ'য়ে উঠছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সব যদি একই সঙ্গে লুপ্ত হ'য়ে যায়? কিছুই আর থাকলো না, কিছুই না, কিছুই না—না আলো, না অন্ধকার, না গরম, না ঠাণ্ডা, না গতি , না স্তব্ধতা ;—কিছুই না! সব শূন্য, শুধু শূন্য, শুধু শূন্য, শুধু শূন্য। কিন্তু শূন্যও তো কিছু-একটা ; সেই শূন্যকেও সরিয়ে দিয়ে তবে তো একেবারে কিছু-নাতে পৌঁছনো যাবে? কিন্তু, যত চেষ্টা করেছে, কোনোমতেই সেই অন্তিম ধাপে পৌঁছতে পারেনি, যত ভেঙে ফেলা যাক শেষ পর্যন্ত কোনো-এক নামহীন কিছু থেকেই গেছে, আর তাছাড়া, সব ধ্বংস হ'য়ে গেলেও আমি থাকছি, কেননা আমি না-থাকলে কে জানছে যে সব ধ্বংস হ'লো? এমনি ক'রে, নিজের অস্তিত্বের বোধ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টায় ক্লান্ত হ'য়ে গেছে শ্রীপতি—কিন্তু পারেনি, জগৎটাকে চুরমার ক'রে ফেলেও নিজেকে একচুল সরাতে পারেনি জগতের কেন্দ্র থেকে। আর সেই আমি—হঠাৎ বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে গেছে তার মনে—সেই অমর আমি একদিন থাকবে না।

একটা মোরগের ডাক কানে এলো শ্রীপতির। জানলার বাইরে এখনো অন্ধকার, কিন্তু ভোর হ'তে দেরি নেই। ও-সব বাজে কথা না-ভেবে উঠে বসি বরং, জানলা দিয়ে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখি কেমন ক'রে আলো ফোটে অন্ধকারে। ঐ তো—আবার মোরগের ডাক। দিন, আবার দিন। যে-আলোয় ভয় কেটে যায়, সব জিনিশের বাস্তবতা ফিরে আসে, জগৎটাকে আবার সহনীয় ব'লে মনে হয়—সেই আলো! শ্রীপতি উঠলো বিছানা থেকে, কুঁজো থেকে গড়িয়ে জল খেলো, এগিয়ে গেলো জানলার ধারে ভোর দেখার জন্য, কিন্তু বড়ো ক্লান্ত লাগলো হঠাৎ, যেন নিজের ওপর বশ হারিয়ে ট'লে পড়লো বিছানায়, আর তক্ষুনি গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুম ভেঙে চোখ মেলা মাত্র বেশ ভালো লাগলো তার, যেন অসুখ সেরে গেছে। ঘড়িতে দেখলো সাড়ে-ন'টা। দাড়ি কামালো, স্নান ক'রে পরিষ্কার জামা-কাপড় প'রে চায়ের পট হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলো ; ফিরে এলো চা, টোস্ট, আর খবর-কাগজ নিয়ে। হালদার-কেবিনে ব'লে এলো তাকে যেন একটার মধ্যে ভাত, ডাল আর মাছের ঝোল পাঠিয়ে দেয়। তীব্র খিদে পেয়েছে, কাল কী খেয়েছিলো মনে করতে পারছে না। অনেকদিন ধ'রেই খাওয়াদাওয়ার কোনো নিয়ম নেই তার—সত্যি অন্যায় করেছে শরীর নিয়ে এত হেলাফেলা ক'রে, এখন থেকে সাবধান হ'তে হবে। চা-টোস্ট ভালো লাগলো মুখে, খবর-কাগজটা অনেকক্ষণ ধ'রে উল্টে-পাল্টে দেখলো : হঠাৎ ইচ্ছে হ'লো নিজে কিছু লেখে। বছরখানেক আগে একটা উপন্যাস আরম্ভ করেছিলো ; বেশি দূর এগোয়নি, কিন্তু ভুলেও যায়নি সেটাকে ; মাঝে-মাঝে, থেকে-থেকে মনে পড়ে, কখনো হয়তো মনে-মনে অনেকখানি লিখে ফ্যালে,

কিন্তু কলম নিয়ে বসবে এমন সময়ই যেন হ'য়ে ওঠে না। আজ তার কৌতূহল হ'লো—কী লিখেছিলো, তা দেখার জন্য।

বাইরে রোদ্দুর তখন শাদা আর গরম, ট্রাফিক ফেনিয়ে উঠছে রাস্তায়। আরো নিবিড় হ'য়ে বসার জন্য শ্রীপতি জানলাটা প্রায় পুরো ভেজিয়ে দিলো, ফাঁক দিয়ে একটু যা আলো আসে তা-ই যথেষ্ট। অগোছালো তার দেরাজটা, তবে তাতে যা আছে তার বেশির ভাগই বেদরকারি ব'লে গোছাবার তেমন দরকারও হয় না। হাত ঢোকাতেই তার লেখার খাতাটা উঠে এলো, কিন্তু সেটা খুলতে গিয়ে থমকে গেলো শ্রীপতি। মনে পড়লো অন্য এক কথা—লুকোনো, কিন্তু ভোলা যায় না। স্তব্ধ হ'য়ে রইল একটুক্ষণ, তারপর—যেন কোনো অবৈধ কাজ করতে যাচ্ছে, যেন আড়ি পেতে কোনো গোপন রহস্য দেখে নিচ্ছে, এমনিভাবে খাতা খুলে একখানা চিঠি বের করলো তা থেকে। বড়ো-বড়ো দ্রুত অক্ষরে লেখা একখানা বড়ো, শাদা কাগজ—ওপরে কোনো ঠিকানা নেই, নিচে নেই স্বাক্ষর, শুধু মাস তিনেক আগেকার একটা তারিখ বসানো।

'কতদিন হ'য়ে গেলো তুমি আসো না, তাই এই চিঠি। জানি, এটা লিখে আরো বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছি নিজেকে, হয়তো এই চিঠি পড়ার পর তুমি আর একেবারেই আসবে না—তবু আমাকে লিখতেই হচ্ছে। তোমাকে আর দেখবো না তাতেও আমি রাজি আছি, কিন্তু আমাকে দূরে রেখে তুমি নিশ্চিন্তে থাকবে, এ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না। অন্তত এই চিঠি পড়ার পর তোমার মন অশান্ত হোক, দ্রুত হোক হৃৎপিণ্ড, তোমাকে কুরে-কুরে খাক তোমার বুদ্ধি আর বিবেক আর হৃদয়।

'ভুল বলেছি—নিশ্চিন্ত তুমি নেই, তুমি যে আর আসো না, তাতেই বুঝেছি তুমিও আজ অস্থির।—আরো জ্বলো, আরো অনেকদিন ধ'রে জ্বলো, করাতের ওঠা-নামার মতো হোক তোমার দিন আর রাত্রি।

'কিন্তু—কী হয়েছে? আমি কী-দোষ করেছি? আমি তোমাকে ভালোবাসি, এই অপরাধ? এত অসহ্য আমি তোমার কাছে? কিন্তু তুমিও কি ভালোবাসো না আমাকে—বলো, সত্যি ক'রে বলো, ভালোবাসো না? আমি ছাড়া আর কে আছে তোমার, আমাকে ছাড়া কিসে তোমার প্রয়োজন—আর সেই আমাকে তুমি ছেড়ে চ'লে যাচ্ছো, এত মূঢ় তুমি, আর এত তোমার দম্ভ!

'আমাকে ঘিরে অনেক-কিছু ঘ'টে যাচ্ছে, কিন্তু আমি যেন কিছুরই মধ্যে নেই। অমন ভালো মেয়ে বন্দনা—তাকে দুঃখ দিয়ে হঠাৎ আমারই জন্য খেপে গেছে তোমাদের গৌতম বর্ধন। গৌতম কি ভাবছে বন্দনা ভালো ব'লেই জোলো, আর আমার কিছুটা বদনাম আছে ব'লেই আমি এক আশ্চর্য সামগ্রী? না কি আসল কথাটা তা নয়? না কি আমিই আস্তে-আস্তে ওকে টেনে এনেছিলাম আমার দিকে—যাতে তোমার ঈর্ষা জেগে ওঠে, শুধু সেই জন্য?

'হাসির কথা—তা-ই না? যেন আমি সত্যি ভেবেছিলাম তুমি গৌতমকে কখনো ঈর্ষা করতে পারো, যেন তোমার আর আমার মধ্যে অন্য কেউ এসে দাঁড়াতে পারে কখনো! না, শ্রীপতি, না। আমি জানি কেউ নেই তোমার ঈর্ষার যোগ্য। তুমিও জানো আমি যেখানে একলা, সেখানে তুমি ছাড়া অন্য কেউ নেই।

তোমার সঙ্গে দেখা হ'লো—সেখানেই আমার আরম্ভ। তুমি আমাকে ভালোবাসলে—সেদিন থেকেই আমি আশ্চর্য। তাহ'লে কেন—কেন এই ভান, এই আড়াল, কেন তুমি নিজেকে অমন কষ্ট দিচ্ছো, আর সেই সঙ্গে আমাকেও?'

'আমি মানি এই কষ্টও বৃথা নয়, তাতে আমি আরো সুস্বাদু হ'য়ে উঠছি, আরো ভরপুর। আর তাই চাই তোমার সঙ্গে ভাগ ক'রে নিতে—যা-কিছু আমি হ'য়ে উঠছি, হ'তে পারি। তুমি এসো—আর দেরি কোরো না।'

আগে অনেকবার পড়েছে, চিঠিটা, প্রায় তার মুখস্থ, তবু ক্ষুধিতভাবে প্রতিটি অক্ষর আরো একবার

গ্রাস করলো শ্রীপতি। ইচ্ছে হ'লো কোথাও বেরিয়ে পড়ে—অন্য কোনো কাজে মন দেয়, এমন কোনো কাজ যা শুধু সাধারণ বুদ্ধি আর মনোযোগ দিয়ে করা যায়, যাতে হৃদয়ের কোনো অংশ নেই, আর সেজন্যই আমাদের প্রতিদিনের বাঁচাকে যা সহনীয় ক'রে তোলে, লুকিয়ে রাখে তার ভেতরকার সব ফাঁকি, সব শূন্যতা। মুহূর্তের জন্য তার ঈর্ষা হ'লো সেই সব অগুনতি কলকাতাবাসীকে, যারা এতক্ষণে লেজার বা ফাইল খুলে ব'সে গেছে আপিশে-আপিশে, আজকের পরে কালকের দিন কী-ভাবে কাটবে তা নিয়ে যাদের ভাবতে হয় না। মনে পড়লো তারও দু-একটা সাংসারিক সমস্যা আছে: তার দু-মাসের বাড়িভাড়া বাকি, হালদার-কেবিনের দেনা এবার শোধ করা উচিত, এদিকে শিবেশ্বরবাবু একটা ইংরেজি-বাংলা অভিধান ছাপাবার কথা ভাবছেন, তার সাহায্য চান—কিন্তু সে-ই তেমন গরজ ক'রছে না। এখনই যাই না কেন, শিবেশ্বরবাবুর সঙ্গে কথাটা ঠিক ক'রে আগাম কিছু টাকা নিয়ে আসি—হয়তো ডাক্তার দেখানোই উচিত আমার, এই খুশখুশে কাশিটা পুষে রাখার কোনো মানে হয় না। কিন্তু—থাক না, যাক না কয়েকটা দিন, এক্ষুনি এত ছুটোছুটি করার দরকার কী ; একা, চুপচাপ, কিছু না-ক'রে সময় কাটিয়ে দেবার চাইতে ভালো আর কী হ'তে পারে?

চিঠিটা দেরাজে ঢুকিয়ে ঘরের অন্য জানলাটাও ভেজিয়ে দিলো শ্রীপতি, ঝাপসা আধো আলোয় ডেক-চেয়ারে গা এলিয়ে দিলো। আমাকে চ'লে যেতে হবে কোথাও, আমাকে পালাতে হবে। কাল এসেছিলো আরতি—এ-বাড়িতে এই প্রথম এলো সে—আমি সোজাসুজি তার দিকে তাকাইনি, তবু—তার ঐ তাকাবার ধরন, তারার মতো ঝকঝকে তার চোখ।

এই তো সেদিন—দিন-পনেরো আগে—দুর্গাদাস আমাকে ধ'রে নিয়ে গেলো রোববার সকালে কী-একটা ইটালিয়ান ফিল্ম দেখতে—পৌঁছতে দেরি হয়েছিলো আমাদের ; চোখে অন্ধকার স'য়ে যাওয়া মাত্র দেখলাম ঠিক আমার পাশের চেয়ারে ব'সে আছে আরতি, আর আরতির পাশে গৌতম। গৌতম বললো 'আরে! তোমরা এখানে!' 'বেশি খুশি হয়েছিস ব'লে মনে হচ্ছে না তো!' জবাব দিলো দুর্গাদাস। 'পরশু তোদের দেখলাম ওল্ড বালিগঞ্জ রোড ধ'রে হাঁটছিস সন্ধের পর। ভারি নির্জন রাস্তাটি।' দুর্গাদাসের এ-কথা শুনে অমায়িকভাবে হাসলো গৌতম, আর আরতির চোখ অন্ধকারে জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো। একটি কথা বললো না সে, একবারও শ্রীপতির দিকে চোখ ফেরালো না ; কিন্তু সেই না-তাকানোটা যেন তাকাবার চেয়ে অনেক বেশি ভারি, আর তা বুঝতে পেরে শ্রীপতি স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে ছিলো যেন তাকে কেউ চেয়ারের সঙ্গে পেরেক দিয়ে এঁটে দিয়েছে।

প্রেম! এই কথাটাকে কোথায় নামিয়ে এনেছে আজকালকার ছেলেমেয়েরা। 'জানিস, সুব্রত খাশা এক প্রেমিকা জুটিয়েছে!' 'না, না, ওরা প্রেমিক-প্রেমিকা নয়, অপর্ণার আপন মামা হয় সুকিবণ।' 'বিজয়া তার প্রেমিক বদল করেছে বুধবার থেকে।' —এই ধরনের কথাবার্তা মুখে-মুখে লোফালুফি হচ্ছে অনবরত, হাতে-হাতে ময়লা হ'য়ে যাচ্ছে—টাকার মতো, চাকরির মতো, বৌয়ের মতো, ষাট বছরের পেনশন আর যোধপুর পার্কে বাড়ির মতো—আর কিছুদিন পরে কবিতায় আর থাকবে না ব্যাপারটা, জীবনেও থাকবে না, থাকবে শুধু জিভের ডগায় ঝাল-চাটনি আমসত্ব হ'য়ে। কিন্তু, 'আজকালকার ছেলেমেয়ে' নামে একটা নির্বস্তুক ব্যাপারকে কেন দোষ দিচ্ছি—আমি তো তারাই, আর তারাই তো আমি। আর সেজন্যই তো এটা দরকার হ'লো যে অন্তত একজন প্রতিবাদ করুক, আর সেই একজন আমি আমাকেই বেছে নিলাম।

পরীক্ষায় নিজে ভালো করতে পারেনি, কিন্তু বি. এ. পাশ করার পর থেকেই সে ট্যুশনির উঁচু ধাপে উঠে গিয়েছিলো—প্রায় প্রোফেসরদের সমান তার বাজার-দর। বেছে নেয় কাজ, সপ্তাহে তিন দিন দু-দিন যাই হোক, তার শর্তই মেনে নিতে হয় ছাত্রছাত্রীদের। আরতিকে পড়াতে রাজি হয়েছিলো দুর্গাদাসের সুপারিশে ; কথা ছিলো সপ্তাহে তিনদিন ক'রে যাবে, কিন্তু দ্বিতীয় মাস থেকেই পাঁচ দিন ক'রে যেতে শুরু করলো, তারপর এমন হ'লো যে রোববারও বাদ দেয় না। এই অনিয়মের জন্য কোনোরকম জবাবদিহি করলো না সে, এতটুকু সংকোচ ফুটলো না তার ব্যবহারে—যেন এই রকমই কথা ছিলো, এটা সম্পূর্ণ তার অধিকারভুক্ত, এমনিভাবে ইচ্ছেমতো যাওয়া-আসা করতে লাগলো। শুধু

মাসান্তে যখন কেশববাবু তাকে খামে ভ'বে টাকা দিতে গেলেন, মৃদু হেসে বললো, 'এখন থাক।' টাকা নেয়া অসম্ভব হ'য়ে উঠলো তাব পক্ষে, যদিও কেন নেবে না তাব কাবণ বলা আবো অসম্ভব।—সবই কি ভুল কবছিলো? অন্যায় কবেছিলো? তাব মনেব মধ্যে কী চলেছে এমনি নির্লজ্জেব মতো তাব বিজ্ঞাপন দিয়ে কি ভুল কবেনি? হয়তো তা ই, কিন্তু সে সময়ে আব-কোনো উপায় ছিলো না তাব।

'কী হচ্ছে আমাব মধ্যে?' নিজেকে অনেকবাব জিগেস কবেছে শ্রীপতি, 'সেই গতানুগতিক "প্রেম"?' কথাটাতে মনে-মনে কোটেশন-মার্কা বসাতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভোলেনি সে, যদিও মনেব আবো গভীব স্তবে সেই ঈষৎ ব্যঙ্গেব ভঙ্গি অনেক আগেই মুছে গিয়েছিলো। নিজেকে খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ কবেছিলো এই সময়ে— কেমন সে বদলে যাচ্ছে দিনে দিনে হ'য়ে উঠছে স্বার্থপব রূঢ়--যে-বন্ধুবা তাকে এত ভালোবাসে তাদেবই সে এড়াতে চায় আজকাল, তাব অস্তিত্বেব সবটুকু অর্থ যেন লুকিয়ে আছে শুধু একজন মানুষেব মধ্যে, যেন খুঁজে পেয়েছে অন্য এক জীবন, যাব জন্য সে অপেক্ষা কবছিলো এতদিন -খোলামেলা, অন্যদেব সঙ্গে ভাগ ক'বে নেয়া জীবন নয় গোপন, নেপথ্যচাবী, ক্ষমতাশালী যেন এক অনন্ত যৌবন গর্জন কবছে তাব হৃৎপিণ্ডে অথচ তা অন্য কেউ শুনতে পায় না।

মানতেই হবে যে সব সত্ত্বেও তাব 'কাজে' সে ত্রুটি ঘটতে দেয়নি, যদি না অত্যন্ত বেশি উৎসাহ আব অধ্যবসায়কেই ত্রুটি ব'লে গণ্য কবা হয়। যা পড়াবাব তাব দশগুণ পড়িয়েছে তবে মাত্র পাঠ্যপুস্তকেব সীমাব মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পাবেনি , সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি— যে কোনো বিষয় অবলম্বন ক'বে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নেব মুখোমুখি দাঁড় কবিয়ে দিয়েছে ছাত্রীকে ওগুলো পবীক্ষা পাশেব পক্ষে বাহুল্য হ'লেও জীবনেব পক্ষে বেদবকাবি নয়। মনেব মধ্যে একটা টগবগে বাঘকে পোষ মানিয়ে বেখে সে যে অমন স্বচ্ছন্দে বক্তৃতা ক'বে যেতে পাবছে, তাতে একটা অদ্ভুত আনন্দ হ'তো তাব না কি ঐ বক্তৃতাগুলো তাব মনেব বাঘ-সিঙ্গিদেবই পাইচাবি তা কে বলবে। আবতি সব কথা বুঝতো কিনা তা অবশ্য জানে না সে, শুনতো কিনা তাও জানে না, কিন্তু ক্লান্তিব বা বিবক্তিব কোনো লক্ষণ দেখা যেতো না তাব মধ্যে ববং মনোযোগেব চাপে মুখটি যেন ফ্যাকাশে দেখাতো মাঝে মাঝে। এমনি ক'বে মাসগুলো কেটে গেলো, আব তাবপবেই সেই দিন এলো যখন আবতিব পবীক্ষা শেষ হ'য়ে গেছে, অথচ শ্রীপতি আগেব মতোই আসে যায়, আব বোজ তাব যাবাব সময় আবতি বলে, 'কাল আসবেন? আসবেন তো? কখন আসবেন? বিকেলে, সকালে, দুপুবে?' আব তাবপবে তাও আব বলে না, শুধু চোখে-চোখে তাকায়।

হঠাৎ যেন রূঢ় আঘাতে জেগে উঠলো শ্রীপতি। এতদিন শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলো, নিজেবই মধ্যে মগ্ন ছিলো--এখন বুঝলো এব মধ্যে আব একজন মানুষও জড়িয়ে গেছে, তাব সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুলে উঠেছে আব একজনেব হৃৎপিণ্ড। দেখলো সে বাধ্য এখন, না ব'লাব উপায় নেই তাব, তাব দিকে অবিচলভাবে তাকিয়ে আছে অন্য একজন, তাব ওপব নির্ভব ক'বে আছে। উপায় নেই। কিন্তু নেই কেন? সে ইচ্ছে কবলেই উপায় আছে। মানুষেব জীবনেব সবচেয়ে বড়ো কথা তাব ইচ্ছে। আমাব ইচ্ছে আব আসবো না। আমাব ইচ্ছে --ছেড়ে দেবো। আমাব ইচ্ছে কষ্ট পাবো, কষ্ট দেবো। সত্যি একদিন যাওয়া-আসা বন্ধ ক'বে দিলো।

৭

অবশ্য ছেড়ে দিতে সময় লাগলো একটু। কেননা সে যদি আবতিব কাছে না যায়, তাই ব'লে কলকাতাব বাস্-চলাচল বন্ধ থাকবে তা তো নয়। দুর্গাদাসদেব সঙ্গে দল বেঁধে আবতি চ'লে এসেছে এক-একদিন—তখন জনক বোডে থাকতো সে—তাকে বাড়ি না-পেয়ে বন্দনাব ওখানে অপেক্ষা কবেছে , এক-একদিন বাত দশটায় বাড়ি ফিবে দেখেছে আবতি ব'সে আছে তাব ঘবে। 'তুমি? এত

রাত্রে?' 'কেন, আসতে নেই?' 'একা এসেছো?' 'সব সময় সঙ্গী পাবো কোথায়, আর সঙ্গী দিয়ে হবেই বা কী।' 'চলো তোমাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।' 'আমি এখন বাড়ি যাবো না।' 'রাত হ'য়ে যাচ্ছে।' 'হোক। আমার কথা আছে তোমার সঙ্গে।' এর পর শ্রীপতি আরম্ভ করেছে কথা বলতে—খুব সহজভাবে, প্রায় নিবিড়ভাবে; এক সময়ে আরতিকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়, তাকে বাস্-এ তুলে দিয়েছে। মাঝে-মাঝে সেও গেছে আরতির বাড়িতে, বেশিক্ষণ থাকেনি, আরতিকে বুঝতে দেয়নি তার অভিসন্ধি, শুধু আস্তে-আস্তে বাড়িয়ে চলেছে দেখাশোনার ব্যবধান। তারপর একদিন আরতির ঐ চিঠি এলো, আর তারপর তার বাড়ি যাওয়া একেবারে বন্ধ ক'রে দিলো শ্রীপতি।

আরতি, আমি কি কোনদিন তোমাকে বোঝাতে পারবো, যা করেছি তা কেন করেছি? খুব সহজ কথাটা, অথচ ভারি শক্ত—কোন কথাগুলো এর পক্ষে ঠিক হবে বুঝতে পারছি না। তোমার ঐ চিঠি—তার উত্তরটা এত স্পষ্ট যে তা কাগজে লেখারও দরকার নেই; এর পরেব ধাপটা এত প্রাঞ্জল যে-কেউ তা ব'লে দিতে পারে, বলতে গেলে সেটাই নিয়ম। স্পষ্ট, তা আমিও মানি; প্রাঞ্জল, তা আমিও মানি; হ'তে পারে সেটাই ঠিক, সেটাই ভালো, সেটাই সুখের; কিন্তু নিয়ম তা হ'তে পারে না। নিয়ম আছে জড়ের জগতে, জন্তুর জগতেও আছে বলা যায়; কিন্তু মানুষ তো স্বাধীন, সে তো যোগ-বিয়োগের সংখ্যা নয় যে তাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করলে অমোঘভাবে একই ফলে পৌঁছনো যাবে; হাজার বার, লক্ষ বার, একই ফল বেরোলেও তার পরের বারে কী হবে কেউ বলতে পারে না। মানুষমাত্রেই খাদ্য খোঁজে এটা নিয়ম, কিন্তু এমন মানুষও আছে যারা স্বেচ্ছায় না-খেয়ে থাকে; মানুষমাত্রেই বাঁচতে চায়, কিন্তু ভেবে দ্যাখো কত মানুষ ঘাতকের হাতে তুলে দিয়েছে নিজেকে। বেশি আর কথা কী—অত বড়ো একটা ভয়ংকর নিয়ম যে মৃত্যু, মানুষ তাকেও ভেদ ক'রে অমরতাকে সৃষ্টি ক'রে নিতে সচেষ্ট—এমনি দুর্দান্তরকম স্বাধীন সে। আর সেইজন্যেই জন্তু আর জড়ের প্রতি তার ঈর্ষা অফুরান; তাদের নকল ক'রে সেও তৈরি ক'রে চলে নিয়মের পর নিয়ম, আইনের পর আইন, অনুশাসনের পর অনুশাসন;—ভান করে যে জীবন ব্যাপারটাকেও কতগুলো ছিমছাম ফর্মুলায় তর্জমা ক'রে নেয়া যায়, যে উইপোকা বা ইলেকট্রিসিটির মতো মানুষের 'ব্যবহার'ও কোন অবস্থায় কী-রকম হবে তা পাঠ্যকেতাবে লিখে রাখা সম্ভব, যে 'উচিত', 'অনুচিত', 'ন্যায়', 'অন্যায়' এ-রকম আখ্যাধারী কতগুলো খুঁটিতে বাঁধা হ'য়েই মানুষ নামক গোরুগুলো অনন্তকাল ধ'রে সুখে জাবর কাটবে। মাঝে-মাঝে—ধরো, একশো কি দুশো বছরে একবার—হিশেবে কোনো ভুল ধরা পড়ে; তখন পুরোনো গোয়ালে আগুন ধরিয়ে তকতকে একটি নতুন গোয়াল তৈরি করতে লেগে যায় সবাই, খুঁটিগুলোকে সোনায় বাঁধিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে এবার সত্যি স্বর্ণযুগ এলো। আর ওরকম না-ক'রে উপায়ই বা কী মানুষের, তার আত্মরক্ষার জন্যেই ওগুলো দরকারি; সারা জগতে একমাত্র তারই স্বাধীনতা আছে ব'লে সে সুখের আশায় স্বাধীনতাকে বন্ধক রেখে দেয়।

অথচ, আরতি, অথচ মানুষ অঙ্ক হ'য়ে যেতে পারছে না, যন্ত্র হ'যে যেতে পারছে না, ইঁদুর কিংবা ইলেকট্রিসিটি হ'য়ে যেতে পারছে না—মানুষই থেকে যাচ্ছে। মানুষ এই অর্থে যে তারই মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে অনিয়ম, ব্যতিক্রম, অনাচার। 'আমার ইচ্ছে আমি সুখে থাকবো না,' 'আমার ইচ্ছে নয় আপনারা আমার উপকার করেন—' গোয়াল-ঘরগুলো যতই বড়ো হোক না, যতই পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও সব রকম বীজাণু থেকে মুক্ত, এই কথাগুলো কেউ-না-কেউ বলবেই, হয়তো খুব নিচু গলায় ফিশফিশ ক'রে, মনে-মনে, কিন্তু কোনোরকম আইন বা পরিকল্পনা বা স্লোগানের শক্তি ভাবনাটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না—এ-ই হচ্ছে চিরন্তন কৌতুক। মানুষ সেই প্রাণী যে বাধ্য হ'তে ভালোবাসে না, নিজের ইচ্ছেটাকে কাজে খাটাতে চায়। তাকে জোর ক'রে দুঃখে ফেলে দাও, সে সুখের আশায় হত্যা করবে তোমাকে; তাকে নিয়ম ক'রে সুখে রাখো, সে দু-দিনেই আবার বিরাট চ্যাঁচামেচি শুরু ক'রে দেবে দুঃখের জন্য।

ইচ্ছে—তার মতো একটা আশ্চর্য ব্যাপার আর কী আছে? আমার ইচ্ছে আমাকে যে-পথে চালিয়ে নিচ্ছে, আমার ইচ্ছে নয় আমি সে-পথে যাই। আমি চাই ভালো চাকরি, শারীরিক আরাম, সামাজিক

মর্যাদা—কিন্তু সেই চাওয়াটাকে নাকচ ক'রে দিতেও পারি আমি। চাই...হয়তো চাই...হয়তো উন্মাদভাবে কিছু-একটা চাই—কিন্তু শেষ মুহূর্তে স'রে যাওয়াটাই হয়তো সত্যিকার স্বাধীন কাজ। যেখানে আমার ইচ্ছে সেখানে আমি বাধ্য, কিন্তু নিজের গরজে এগিয়ে গিয়ে যদি বঞ্চনাকে মেনে নিই তাহ'লেই আমি সবচেয়ে বেশি 'আমি' হ'তে পারি।'...আর সেই জন্যেই, আরতি, সেইজন্যেই।

বেলা বাড়লো, গরমও বেড়ে উঠলো সঙ্গে-সঙ্গে। রোদের গরম, নাকি জ্বর এলো আবার? নিজের কপালে হাত রেখে অনুভব করার চেষ্টা করলো শ্রীপতি, কিন্তু তার হাতের পাতাও তপ্ত—কী ক'রে বুঝবে। চোখ জ্বালা করছে, জিভ তেতো, মাথার ভেতরটা ঝাপসা হ'য়ে আসছে ক্রমশ। আরতিকে এতক্ষণ ধ'রে মনে-মনে যা বললো সত্যি কি তার কোনো মানে হয়? আসল কথাটা কি এই নয় যে সে ভিতু আর কপট আর কাপুরুষ ; —নিজেকে নিজে ধাপ্পা দেবার জন্য পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে শুধু কথা বুনছে? অদ্ভুত এক ত্রাস—পাছে সে সুখী হয়, পাছে আর-একজনও সুখী হ'য়ে যায়, তার সঙ্গে—আরতি ঠিক লিখেছে—দম্ভ ছাড়া একে আর কী বলে! কিন্তু...সুখ? কথাটা মনে হবার সঙ্গে -সঙ্গেই ঠোঁট কুঁচকে গেলো তার, মনে পড়লো তার এক ছাত্রের বাবাকে, যিনি নিজেকে সগৌরবে জগতের 'শ্রেষ্ঠ সুখী' ব'লে ঘোষণা করতেন। 'আমি ইন্দ্রের চেয়েও সুখী, কেননা ইন্দ্র কখনো মোটরগাড়ি চড়েননি—'এই আশ্চর্য যুক্তি তিনি একদিন উপস্থিত করেছিলেন শ্রীপতির সামনে। তিনি যে ক্যালকাটা ক্লাবের মেম্বর, এদিকে সাহিত্য-বাসরের প্রেসিডেন্ট, জ্ঞানী গুণী ধনীর মধ্যে যে কেউ নেই তাঁর মার্বেল-মেঝের ড্রয়িংরুমে এসে না বসেছেন, ইচ্ছে করলেই কলকাতার যে-কোনো নামজাদা গাইয়েকে দিয়ে তিনি 'চুটিয়ে' গান গাওয়াতে পারেন তাঁর বাড়িতে, তাঁর মেয়ের বিয়েতে গাড়ির লাইন যে লেডি চ্যাটার্জির নাৎনির বিয়ের গাড়ির লাইনের চেয়ে অল্প একটু মাত্র ছোটো হয়েছিলো—এই সবই, মাত্র দশ মিনিট সময়ের মধ্যে, একদিন তাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন ঐ সুশ্রী নধর, মেদবান ভদ্রলোকটি।...কিন্তু ও ছাড়া আর-কোনো সুখ কি নেই জগতে?

হালদার-কেবিন থেকে খাবার নিয়ে এলো, দেখে কেমন বমি পেলো তার, হাত নেড়ে ফিরিয়ে দিলো। বিশ্রী—নিশ্চয়ই জ্বর বাড়ছে—অসুখটা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে ব'লে আপত্তি করি না, কিন্তু অপমান করছে ব'লে প্রতিবাদ করি। আবার শুয়ে পড়লো সে বিছানায়, টেবিল-ফ্যানের একঘেয়ে গুনগুন শব্দে তন্দ্রা এলো তার। চোখ বুজে দেখলো এক চঞ্চল নানা-রঙের অন্ধকার—লাল, হলদে, বেগনি, ঘুরছে যেন ঢেউয়ের পর ঢেউ তার মগজের মধ্যে, তারপর আস্তে-আস্তে একটি পথ খুলে গেলো তার দৃষ্টির সামনে। চওড়া রাস্তা, দুদিকে বড়ো-বড়ো ঝাউ ডালে-ডালে স্পর্শ ক'রে ঝিকিমিকি সোনালি রোদ্দুর বিছিয়ে দিয়েছে। রাস্তার শেষে একটি আশিতলা বাড়ি—ঋজু, ক্ষীণ, নির্মল একটি প্রার্থনার মতো আকাশের দিকে যেন উঠে গেছে। হীরের মতো ঝকঝক করছে হাজার-হাজার জানলার কাচ, আর সেই কাচের পেছনে মানুষের মুখ—যুবা, নারী, শিশু—সুখী, সুন্দর সুস্থ, আনন্দিত। বাড়িটা যদিও স্কাইস্ক্রেপার, শীতের দেশ নয় সেটা, হয়তো দক্ষিণ আমেরিকা বা ফ্লরিডা বা হনলুলু, হয়তো বুয়েনস এয়ারিস শহর। সময়টা বিকেল, চারদিকে আলো, নীলিমা, স্নিগ্ধতা, শান্তি।

মস্ত বড়ো লিফট তাকে নিঃশব্দে নিয়ে এলো পঁচাত্তর তলায়। দরজা ঠেলে ঢুকলো ; একটি চেয়ারে বসলো, যা উৎসুক স্ত্রীর মতো, তাকে আদর ক'রে আবার একটু বাধাও দেয়। সামনে একটা দরজা অর্ধেক খোলা, ভেতরে বাথরুমের অংশ দেখা যাচ্ছে। সারা ঘরে কিছু নেই—মেঝে, দেয়াল, মেঝের কার্পেট, দরজায় পেতলের হাতল, আসবাবপত্র, বাথরুমে এনামেল-করা সরঞ্জাম—কিছু নেই যা উজ্জ্বল নয়, সংবৃত নয়, নয় উচ্ছ্বাসহীন, অসূয়াহীন অতিথিপরায়ণ হৃদয়ের মতো সুন্দর। দেয়ালের কোণে দুটো জানলা যেখানে মিলেছে, সেই খোপে বাদাম-রঙের লেখার টেবিলটি বসানো—তার স্পর্শ কতো মসৃণ তা দৃষ্টি দিয়েই অনুভব করা যায়—অন্য দিকে দরজার মতো বড়ো আর-একটি জানলার একটিমাত্র কাচের পাল্লা পড়ন্ত রোদে নিস্তাপ কোনো আগুনের মতো জ্বলছে। বাইরে ছড়িয়ে আছে উঁচু-নিচু শহর, ছোটো-বড়ো স্কাইস্ক্রেপারের চুড়ো, ঐ দিকে, ঢালু পাহাড়ের গায়ে-গায়ে, সারি-সারি লাল, মাছরাঙা নীল আর বেগুনি রঙের টালির ছাদ, ধবধবে শাদা বাংলো, মাঝে-মাঝে গুচ্ছ-গুচ্ছ লাল নীল বেগনি

হলুদ ফুল। পাহাড়টির পায়ের কাছে প'ড়ে আছে আধো-চাঁদের আকার নিয়ে নীল সমুদ্র, তার বুকের ঠাণ্ডা তুলে নিয়ে ঝিরিঝিরি হাওয়া ব'য়ে যাচ্ছে। মস্ত শহর, কিন্তু ধুলো নেই, কোলাহল নেই ; যন্ত্রে যানে যেটুকু বা শব্দ হয় বা ধুলো ওড়ে, এত উঁচুতে তার কিছুই পৌঁছয় না। ঐ মুক্ত নীলিমা, যেখানে টুকরো শাদা ফোলা-ফোলা মেঘ এইমাত্র রঙিন হ'য়ে উঠছে, তা এই শহরকে যতটা আলো দিচ্ছে, ততটাই ফিরে পাচ্ছে তার কাছ থেকে ; যে-প্রেরণা প্রতি মুহূর্তে মাটির দিকে পাঠাচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে খুশি হ'য়ে উঠছে তারই প্রতিফলনে। এই ঘর —এই ঘরই যেন আকাশ ; ইচ্ছে হ'লেই পর্দা টেনে দিয়ে নিজের মধ্যে নিবিড় হ'তে পারে সে, কিন্তু তখনও ভুলবে না যে দূর তার ঘরে মধ্যে লুকোনো, যে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেই দিগন্তকে সে হাতের মুঠোয় ধরতে পারে।

চেয়ারের মুখোমুখি খাট, গভীর বিছানা, রুপোলি আর ধূসর সিল্কে কাজ-করা সুজনিতে ঢাকা, একজনের ভার বহন ক'রে গভীরভাবে পরিতৃপ্ত। কে সে? এক নারী. মাজা কাঁসার মতো দেহ তার, স্নিগ্ধ আর সুগোল তার বাহু, একটি জঙঘা থেকে শাড়ি স'রে গিয়ে বিছানাটিকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছে। বালিশের লাল মখমলের ওপর কালো চুল বৃষ্টির মতো ছিটোনো, তার ফাঁকে ঝিলিক দিচ্ছে গ্রীবা, গালের আভা উঁচু হ'য়ে ফুটে আছে। আড় হ'য়ে শুয়ে আছে একটি উষ্ণ, সোনালি, নিশ্বসিত শরীর, দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে, এক তীব্র অথচ উদাসীন প্রত্যাশায় যেন। বাইরে ঐ নগর, ঐ আকাশ আর সমুদ্র, আলো আর স্বচ্ছতা—ঐ সমস্ত কিছুর অংশ যেন এই শরীর, সে না-থাকলে সবই হঠাৎ মিলিয়ে যেতে পারে, অথচ ঐ গভীর সুখ আর শান্তির মধ্যে সে-ই যেন একমাত্র অশান্তির বীজ, ঘরের এই শৃঙ্খলাকে ভেঙে দেবার জন্যই অত কোমল হ'য়ে ওঠাপড়া করছে তার নিশ্বাস। 'কে তুমি?' শ্রীপতি মনে-মনে বললো, 'মুখ ফেরাও, আমি তোমাকে দেখবো। তোমার মুখ আমি দেখতে চাই, তুমি ফিরে তাকাও।' এর উত্তরে ঐ সুন্দর সোনালি শরীরটির ওপর দিয়ে বাসনার একটি সূক্ষ্ম ঢেউ ব'য়ে গেলো, বিদ্যুতের মতো ফুলকি জ্ব'লে উঠলো চুলের পুঞ্জে। 'সন্ধে হ'য়ে এলো, একটু পরেই শহরের লোকেরা সমুদ্রের ধারে জড়ো হবে, খাদ্যে মদে ফুলে ফলে টেবিলগুলো জ্বলজ্বল করবে, বেজে উঠবে বাঁশি আর বেহালা, নাচ হবে, শিশু, বৃদ্ধ, নারী, যুবা কেউ বাকি থাকবে না, চলো তুমি আর আমিও যাই সেখানে। যেখানে সকলেই খুশি, সকলেই সকলকে ভালোবাসছে, সেখানে আমাদের ভালোবাসা কি আরো সুন্দর, আরো সার্থক হবে না?' স্তব্ধ ঘর, স্তব্ধ বিছানা, শুধু উন্মোচিত জঙঘার ওপর একটি নীল শিরা চোখের মতো তাকিয়ে আছে। 'তবে কি চাও এখানেই, এই নির্জন ঘরে, সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা ভালোবাসবো? তবে কি চাও আমি উঠে গিয়ে তোমাকে আমার দিকে ফিরিয়ে দেবো, নিচু হ'য়ে মুখ দেখবো তোমার, খুঁজে নেবো লক্ষ-লক্ষ নামের মধ্যে তোমার নাম, চুমো খেয়ে-খেয়ে সৃষ্টি ক'রে নেবো তোমার মুখ? তবে কি তোমার এখন কোনো মুখ নেই, কোনো নাম নেই? তুমি কি শুধু শরীর, উষ্ণ, নিশ্বসিত, সোনালি একটি শরীর শুধু?...'

হঠাৎ সব কালো হ'য়ে গেলো শ্রীপতির চোখের সামনে, চমকে জেগে উঠলো সে। এই ছবিটা কোথায় পেয়েছিলো? হয়তো কোনো ছবিওলা বিদেশী পত্রিকার বিজ্ঞাপনে, হয়তো কোনো টেকনিকলার সিনেমায়। কিন্তু যেখানেই কুড়িয়ে পেয়ে থাক, এই ছবিটা বারে-বারে তাকে হানা দেয়—ঐ সুন্দর দেশ, আলো আর নীলিমায় মাখা পঁচাত্তর তলার ঘর। কিন্তু সেখানেও ঐ নারী কেন? ঐ একটি কারণে বারে-বারে তার স্বপ্ন ভেঙে যায়, বেশি দূর এগোতে পারে না কল্পনা, যেন আস্তে-আস্তে ভারি হ'য়ে সে নেমে আসে মাটিতে, এই কলকাতায়, যেখানে একটি গলি, একটি বাড়ি, একটি মেয়ে অনবরত তাকে কাছে টানতে চায়।

আমি কি স্বপ্নেও তোমাকে ছাড়াতে পারবো না কোনোদিন?

'কী বলছিস?...এই, শ্রীপতি! বেদম জ্বর হয়েছে দেখছি।'

বড়ো ক'রে চোখ মেলে দুর্গাদাসকে দেখতে পেয়েছিলো। কতক্ষণ ছিলো দুর্গাদাস, কী কথা হয়েছিলো তার সঙ্গে, তা ঠিকমতো উপলব্ধি করার আগেই আবার ; সকাল, দুপুর বিকেল, সবই যেন এক কিংবা কোনোটাই নেই।

আর হঠাৎ সে স্পষ্ট বুঝতে পারলো যে তার অসুখ আর সারবার নয়, সে মরতে চলেছে।

জ্বরের মধ্যে এই ধারণাটিকে সে মগজের মধ্যে গেঁথে ফেললো, যেমন ক'রে ক্লান্ত সাঁতারু সমুদ্রে ডুবে যেতে-যেতেও জলের ওপর মাথা তুলে দিয়ে শেষবার দিনের আলো দেখে নেয়। কয়েক বছর আগেকার একটা স্মৃতি তার মনে জেগে উঠলো। শস্তা বাসার খোঁজে গড়িয়ার দিকে গিয়েছিলো, ফিরছিলো পাঁচ নম্বর বাস-এ যার রাস্তার দু-পাশে তখনও ছড়িয়ে ছিলো ধানখেত বনজঙ্গল—লোকেরা যাকে প্রকৃতি বলে, তা-ই। ভরা বর্ষা তখন, কালো আর ভারি মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে, কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছিলো না। কালো আর ভারি আর স্নিগ্ধ আকাশ, বাতাস ভিজে, বাস্-এ তখনও যাত্রীর ভিড় হয়নি—বাইরে তাকিয়ে-তাকিয়ে অবাক হচ্ছিলো শ্রীপতি। বৃষ্টি পেয়ে গাছপালা যেন জাদুমন্ত্রে বাড়ন্ত ; বাস্ যদি আধ মিনিট দাঁড়ায়, মনে হয় যে ওরই মধ্যে আরো একটু লম্বা হ'য়ে উঠবে ঝোপঝাড়, চোখে দেখা যাবে ঘাস আরো ঘন হ'লো। ঘাস নধর, গাছের পাতাগুলো চিকচিকে, কচি ধানগুলোকে দুলিয়ে দিচ্ছে হাওয়া, মাঝে-মাঝে পুষ্ট ব্যাং লাফিয়ে পড়ছে জলের মধ্যে, একবার একটা মস্ত মোটা হেলে সাপ এঁকে-বেঁকে রাস্তা পার হ'য়ে চ'লে গেলো। কত ছোটো-ছোটো পোকা ঐ ঘাসের মধ্যে, জলে জোঁক, মাটিতে কেঁচো আর কেন্নো, প্রতিটি গাছ যেন পঞ্চাশ হাতে নিশেন তুলে দাঁড়িয়ে আছে—এই বর্ষার দিনে একেবারে ফুর্তির ধুম প'ড়ে গেছে ওদের মধ্যে—মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত নিঃশব্দ ও সমবেত সংগীত উঠছে : 'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ'! তা-ই মনে হয়েছিলো শ্রীপতির, ওরা সবাই নিমন্ত্রিত ও মাননীয়, ঐ জলের ধারে-ধারে গজিয়ে-ওঠা সতেজ শাকপাতা, লাল কেন্নো, ঠাণ্ডা সাপ, ধানের খেতে এক পায়ে দাঁড়িয়ে-থাকা ধবধবে বক—সকলেই আজ উৎসবে উতরোল, বাইরে প'ড়ে আছে শুধু এই বাস্-এর কয়েকটি মানুষ—কেউ তারা বৃদ্ধ ও কদাকার, কেউ মাসিক-পত্রে অভিনেত্রীদের ছবি দেখছে, কেউ এই সকালবেলাতেই ক্লান্ত, কারো দাড়ি-না-কামানো মুখ দুশ্চিন্তায় কুটিল। যাদবপুরে এসে ভিড় হ'লো বাস্-এ, বাঁশঝাড় ধানের খেত মিলিয়ে গেলো, আর হঠাৎ ঠিক সামনে দেখা গেলো নোংরা চেহারার একটা খোলা ভ্যান, মস্ত বড়ো আর অদ্ভুত একটা জিনিশ তাতে তোলা হয়েছে। শ্রীপতি প্রথমে ভেবেছিলো একটা বড়ো বটগাছের গুঁড়ি, কিন্তু আর-একবার তাকিয়েই বুঝতে পারলো যে ওটা একটা ষাঁড়ের মৃতদেহ। বিরাট জন্তু, ম'রে গিয়ে আরো যেন বিরাট দেখাচ্ছে, চারটে পা উঁচু ক'রে একত্রে বাঁধা, মাথাটা ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে, পেট ফোলা, গায়ের চামড়া কর্কশ ও কুৎসিত, তার পরাক্রান্ত পুরুষাঙ্গ পোকার মতো ছোটো হ'য়ে পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে। মুহূর্তের মধ্যে এই সবই লক্ষ করছিলো শ্রীপতি—অশ্লীল ভঙ্গিতে ঝুলিয়ে-রাখা ঐ অক্ষম ও কদর্য মাংসপিণ্ড, যা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মুনিসিপ্যালিটির ভাগাড়ের দিকে, হয়তো শকুনের খাদ্য হবার জন্য। ভ্যান চলেছে বাস্-এর ঠিক আগে-আগে, রাস্তা সরু ব'লে বাস্টা এগিয়ে যেতে পারছে না ; ঐ অদ্ভুত বোঝা যাত্রীদের মধ্যে অনেকেরই চোখে পড়ছে, শোনা যাচ্ছে নানা রকম মন্তব্য—'কী বিশ্রী!' 'জঘন্য!' 'একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই? দরজাটা বন্ধ ক'রেও তো দিতে পারে।'—সুসজ্জিত একটি মহিলা নাকে রুমাল চাপা দিয়ে দৃঢ় চিত্তে অন্য দিকে তাকিয়ে আছেন। তারপর রাস্তা একটু ফাঁকা পেয়ে বাস্ দ্রুত এগিয়ে গেলো, কাছে এলো কলকাতার শহর, মরা ষাঁড় গোলেমালে হারিয়ে গেলো।

মৃত্যুর কোনো মাত্রাভেদ নেই ; ঐ ষাঁড় যতখানি মরেছিলো মানুষকে ঠিক ততটাই মরতে হয় ; তার মৃতদেহকে আরো একটু আড়ম্বর ক'রে নিয়ে যাওয়া হয় ব'লে মৃত্যুর তথ্যে কোনো তফাৎ হয় না। কম মৃত কি বেশি মৃত ব'লে কোনো কথা নেই ; মুমূর্ষু ও মৃতের মধ্যে যতটা দূরত্ব, মৃত ও পূর্ণ স্বাস্থ্যবানের মধ্যেও তা-ই ; প্রাণের ক্ষীণতম স্ফুলিঙ্গটুকু যার মধ্যে জ্বলছে সেও বলতে পারে, 'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।' কী করুণ দেখাচ্ছিলো ঐ মৃত ষাঁড়ের মুখটি, যেন বলতে চাচ্ছে, 'শেষটায় আমাকে এই করলে!' সে জানতো না সে মরবে, তাই নিজের মৃত্যুকে উপলব্ধি করতে পারছে না যেন, চাপা-পড়া কুকুরদের মুখেও ঐ রকম ভাব লক্ষ করেছে শ্রীপতি। জীবিত পশুর মুখে কোনো ভাব নেই, মৃত্যুর মুহূর্তটি প্রথম তাকে দুঃখী হ'তে শেখায়—অন্তত বাইরে থেকে দেখে তা-ই মনে হয়। কিন্তু মানুষ প্রতি মুহূর্তে জানে সে মরবে, তাই জীবন ভ'রে তার মুখে অত রকমের বিচিত্র ভাব খেলা করে, আর

ম'রে গেলেই সব রেখা লুপ্ত হ'য়ে যায়, পাথরের মতো শান্তি নামে মুখে।

...শান্তি? কোনো মানুষ, তিনি যত বড়োই হোন, কোনো মানুষের পক্ষে এই কথাটি মেনে নেয়া কি সম্ভব যে আমি আর থাকবো না? 'আমাকে মেরো না, আমাকে অমর ক'রে দাও,' এই কথাটি খোলাখুলি বলতে নেহাৎই চক্ষুলজ্জায় আটকেছে, কিন্তু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে রবীন্দ্রনাথ কি অসংখ্যবার এই আবেদনই জানিয়ে যাননি—তিনি, দেবতার মতো মানুষ, তিনিও। 'তখন আমায় না-ই বা মনে রাখলে, তারার পানে চেয়ে-চেয়ে না-ই বা আমায় ডাকলে।' তার মানে—আমাকে মনে রেখো, আমাকে ভুলো না, অন্তত তোমাদের স্মরণে যেন অমর হ'তে পারি আমি। 'যখন র'বো না আমি মর্ত্য কায়ায়, তখন স্মরিতে যদি হয় মন—' কী করুণ মিনতি, প্রায় গায়ে প'ড়ে মনে করিয়ে দেয়া যে তিনি স্মরণীয়, ললিত ছন্দের আচ্ছাদনে লুকিয়ে নিজের অস্তিত্বটাকে প্রকাণ্ড ক'রে তোলা—যে-আমিকে আমি কখনো ভুলতে পারছি না তাকে জগতের লোক ভুলে যাবে তা তিনি কিছুতেই হ'তে দেবেন না, সুরে ভুলিয়ে কান্নায় গলিয়ে ছিনিয়ে নেবেন আমাদের মন, জয় ক'রে নেবেন আমাদের মনোযোগ। অথচ—আশ্চর্য এই—এ-সব কিছুরই প্রয়োজন ছিলো না রবীন্দ্রনাথের, তিনি যদি একবারও মুখ ফুটে না-বলতেন তবু আমরা বাধ্য হতাম তাঁকে মনে রাখতে—আর তিনি নিজেও তা জানতেন, জানতেন আমাদের উপায় নেই তাঁকে মনে না-রেখে —আর তবু, কী দুর্বলতা, আমাদের ওপর এই অন্যায় সুবিধেটুকু না-নিয়ে পারলেন না তিনি, নিংড়ে-নিংড়ে কান্না বের করলেন আমাদের—একেবারে শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত।

—কিন্তু আমি তো কিছুই করিনি, আমাকে কেউ মনে রাখবে না, আমাকে মরতে হবে হঠাৎ মাথা-ফাটিয়ে-দেয়া বেড়ালের মতো, গাড়ির তলায় চেপ্টে-যাওয়া কুকুর-ছানার মতো, ভাগাড়ের যাত্রী প্রকাণ্ড, অসহায়, নিষ্প্রয়োজন ষাঁড়ের মতো। তবু ওদের সঙ্গে আমার একটা তফাৎ এই যে আমি যা জেনেছি ওরা তা কখনো জানেনি, আমি জানি আমি মরতে চলেছি, আর সেজন্যই নিজের মনে জিগেস না-ক'রে পারছি না—এর পর? এর পর কী? ধ'রে নেয়া যাক যে মৃত্যু মানে হ'লো কিছু-না, একেবারে কিছুই-না, কিন্তু মানুষ এমনি আশ্চর্য জীব যে ঐ 'কিছু-না'টাও তার মনের মধ্যে 'কিছু-একটা' হ'য়ে ধরা পড়ে ;—মুশকিল এই যে ভাষা ছাড়া চিন্তা করা যায় না, আর ভাষা ব্যবহার করামাত্র কোনো একটা ধারণা জেগে ওঠে, ধারণা থেকে ছবি, ছবি থেকে গল্প—এমনি ক'রে শূন্য থেকে আবার এই সৃষ্টিতে পৌঁছনো যায়। 'তোমার অসীমে প্রাণমন ল'য়ে যত দূরে আমি ধাই—' ঐ 'অসীম' কথাটা আবছা একটা ছবি দিচ্ছে না কি, প্রায় বাস্তব কোনো তথ্যের আভাস দিচ্ছে না? আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে · অসীম কেমন? সে কি গোলাকার না ত্রিকোণ না চতুষ্কোণ? না কি, ডিমের বা ঢোলকের ছাঁদে গড়া? সে কি কোনো আলো-আঁধারে ঘেরা নিস্তরঙ্গ সমুদ্র, যার মধ্যে খুব সহজে, খুব আরামে, বিনা চেষ্টায় টুপ ক'রে ডুবে যাবো আমরা? না কি তাও একটা ঘূর্ণমান আবর্ত, শান্তিহীন, ফুটন্ত কোনো কড়াইয়ের মতো, যার মধ্যে প'ড়ে গিয়ে টগবগ ক'রে ফেনার মতো নাচতে হবে আমাদের? আমরা জানি না, কিছুই জানি না, জানবো না কখনো—আমাদেরই মন-গড়া একটা কল্পনার আমরা নাম দিয়েছি 'অসীম,' কিন্তু ব্যাপারটাকে যে একটা নামের মধ্যে আটকে দিয়েছি তাতেই বোঝা যায় অসীম আমাদের কল্পনার মধ্যে আসে না। তেমনি—'কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হ'তে সংশয়, জয় অজানার জয়।' ঘর অন্ধকার হ'লে যার হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়, সেই ছোটো ছেলে যেমন লোকের সামনে বুক ঠুকে বলে—'আসুক না ভূত, দেখিয়ে দেবো তাকে!' এও সেই রকমের কথা হ'লো। কবিত্ব, বাগাড়ম্বর এর চেয়ে শাদা কথায় ব'লে দেয়া ভালো যে ভয় পেয়েছি। লজ্জা কী তাতে—আমি কি নির্বোধ যে ভয়ের জিনিশকে ভয় পাবো না? যে-কোনো মানুষ—জ্ঞানী, গুণী, কর্মবীর, যা-ই হোক না—শুধু একবার মনে-মনে ভাবুক : আর দশ দিন, কুড়ি দিন, দু-মাস, ছ-মাসের বেশি আমি বাঁচবো না, দু-মিনিট, এক মিনিটের জন্য সত্যি বিশ্বাস করুক কথাটায়, জানুক তার কোনো আশা নেই, কোনো ডাক্তার, কবিরাজ, সন্ন্যাসী তাকে বাঁচাতে পারবে না—তক্ষুনি কি দম আটকে আসবে না তার, চোখে ঝাপসা দেখবে না, লুপ্ত হবে না সব বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রতিভা, এমনকি হঠাৎ হু-হু ক'রে কেঁদে ফেলবে না? 'তোমার অসীম,' 'জয় অজানার জয়'—ও-সব মনোরম কথা আমরা ততক্ষণই শুধু বলতে পারি যতক্ষণ মৃত্যু থাকে আমাদের

কাছে একটা পোশাকি ব্যাপার, সরকারি তথ্য, অথবা নির্বস্তুক ধারণা ;—কিন্তু যদি কখনো মুহূর্তের জন্য নিজেকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করাতে হয়, তাহ'লে আমাদের মুখে আর কোনো কথা ফোটে না। আর সেই দরজাটুকুর ধারে, সেই তথাকথিত অসীমের প্রান্তে আমি আজ দাঁড়িয়ে আছি—এ কি সম্ভব?

—কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই! আমার অনুমতি না-নিয়ে, আমার সঙ্গে পরামর্শ পর্যন্ত না-ক'রে, আমারই বিষয়ে এত বড়ো একটা সিদ্ধান্ত নেয়া হ'লো! আমার স্বাধীনতা—যা নিয়ে এত সব লম্বা-চওড়া বক্তৃতা করা হ'লো, তারই ওপর এই প্রতিকারহীন বলাৎকার সহ্য করতে হবে আমাকে! না—যে উপন্যাসটি শুরু করেছিলাম তা শেষ করার, যে-সব অন্যায় করেছি তার ক্ষতিপূরণের, যাদের ভালোবাসি তাদের ভালোবাসা জানাবার—কিছুই আর স্বাধীনতা নেই আমার—আমি যে এমন অসহায় বন্দী তা এর আগে ভাবিনি কেন কোনোদিন?

—এখনো কি সময় আছে, আরতি? রাগ আর দুঃখ একসঙ্গে ঠেলে উঠলো শ্রীপতির বুকের মধ্যে, সবচেয়ে রাগ তার নিজেরই ওপর, যেহেতু সে এতদিন বোঝেনি জীবন কত মূল্যবান, যেহেতু সে এক ছেলেমানুষি অহংকারে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তার সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত পানপাত্র থেকে। বড্ড তেতে উঠেছে বিছানাটা—এ কি তার রাগের তাপ, না জ্বরের, না কামনার তা কে জানে—কিন্তু হঠাৎ তার মনে হ'লো তার মাথায় যেন হাওয়া করছে কেউ, ঠাণ্ডা হাওয়া, ধুলোর গন্ধ, আর তার পরেই এক সজল ও সুন্দর শব্দ তার তপ্ত চেতনার ওপর ঝ'রে পড়লো। বৃষ্টি—আ, বৃষ্টি—কী ভালো—কী আরাম—আর কতদিন এই বৃষ্টির শব্দ শুনবো কে জানে। নোংরা বালিশে মুখে চেপে শ্রীপতি নিঃসাড় হ'য়ে প'ড়ে রইলো, তার সমস্ত প্রাণশক্তি কানের মধ্যে সংহত ক'রে শুনতে লাগলো বৃষ্টির শব্দ, নিজেকে মিলিয়ে দিতে চাইলো তার মধ্যে, জলের মধ্যে জল হ'য়ে গ'লে যেতে চাইলো। সেই সন্ধ্যায় জল দাঁড়ালো কলকাতার অনেক রাস্তায়, ছুটির দিনের ফুর্তি-বোঝাই ট্রাম-বাস্ নিশ্চল হ'লো, কোনো-কোনো পাড়ায় আলো জ্বললো না, এক দীর্ঘ তপ্ত দিনের পরের একই সঙ্গে সান্ত্বনা ও অসুবিধের বর্ষণ হ'লো আকাশ থেকে, ঝাপসা হ'য়ে-যাওয়া নানা পথ ঘুরে ডাক্তার মৈত্র কোনোরকমে শ্রীপতির আস্তানায় পৌঁছলেন। সে বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছিলো গভীরভাবে, হঠাৎ চোখ মেলে দেখলো আলো জ্বলছে, ঘর-ভরা লোক। মনে হ'লো তাদের মধ্যে আরতিও আছে। চোখ বড়ো ক'রে খুলে তাকিয়ে রইলো শ্রীপতি, যেন সারাটা দিন নিজের অন্তরঙ্গতার মধ্যে কাটাবার পর বাইরের বাস্তবের সঙ্গে নিজেকে ঠিক মেলাতে পারছে না।

৮

আর পরের মুহূর্তেই দুর্গাদাস আর গৌতম এক সঙ্গে কথা বলতে শুরু ক'রে দিলো।

'এই এলাম আমরা,' দুর্গাদাস যেন জবাবদিহি দিলো শ্রীপতির কাছে, 'কাকাবাবুকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলাম।'

'তোমার নাকি অসুখ করেছে, শ্রীপতি?' শ্রীপতির বিছানা থেকে বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে গৌতম বললো, 'আমিও ভাবলাম তোমাকে একবার দেখে যাই। অন্য একটা কথাও আছে তোমার সঙ্গে।'

'তোমার "অন্য কথা"-টথা এখন থাক। তোমার আই. এ. এস. এর পড়া নিয়ে শ্রীপতিকে আর বিরক্ত কোরো না।'

'আমার কথা শুনে শ্রীপতি যদি "বিরক্ত" হয় সেটা তার আর আমার ব্যাপার—তোমার নয়, দুর্গাদাস। আর এও জেনে রাখো যে কোনো পরীক্ষায় পাশ করার জন্য আমি অন্য কারো ওপর নির্ভর করি না কখনো।'

'কী মুশকিল! গৌতম হঠাৎ রেগে যাচ্ছো কেন বলো তো? আমি শুধু বলতে চাচ্ছিলাম যে শ্রীপতি এখন অসুস্থ আছে—'

'অসুস্থ? না তো।' এতক্ষণে যেন চারিদিকের অবস্থাটা উপলব্ধি করলো শ্রীপতি, আগন্তুকদের ঠিকমতো চিনতে পারলো। ব্যস্ত হ'য়ে উঠে ব'সে বললো, 'বলো, গৌতম, কী বলবে, বলো! কাল না দেখা হ'লো তোমার সঙ্গে—কাল?—হ্যাঁ, কালই তো, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কতদিন আগে—কী যেন হয়েছে আমার, ভালো ক'রে মনে পড়ছে না কিছু—বড্ড ঘুমিয়েছি বোধহয় দুপুরে—দুর্গাদাস, তুই কি আজ দুপুরে এসেছিলি একবার? আমার কাছে বেশি ঘন-ঘন আসাটা বোধহয় উচিত হচ্ছে না তোর, তা এসেছিস যখন বল, সব খবর বল শহরের—একটু আগে বৃষ্টি হচ্ছিলো না?—কী কাণ্ড! সব দাঁড়িয়ে কেন—কিন্তু বসতেই বা বলি কোথায়, এই বিছানাটা তেমন পরিষ্কার নয় আবার, আর তাছাড়া—' হঠাৎ একটু থেমে কেশববাবুর দিকে তাকালো শ্রীপতি, আরো দ্রুত স্বরে আবার বললো, 'আপনি বসুন না ঐ চেয়ারটায়—এত দূরে কষ্ট ক'রে আপনার আসার কী দরকার ছিলো—মানে, আমি বলছি আমিই তো যেতে পারতাম, মানে, আমারই যাওয়া উচিত ছিলো—রোগীরই তো ডাক্তারকে দরকার, যদিও আমি নিজেকে ঠিক রোগী ব'লে মানতে পারছি না।' কথা শেষ ক'রে একটু হাসলো শ্রীপতি, তার জ্বোরো মুখ মুহূর্তের জন্য স্বাভাবিক দেখালো।

'তুমি ব্যস্ত হোয়ো না, আমরা ঠিক আছি,' কেশববাবু চেয়ারটি টেনে আনলেন তক্তপোশের কাছে। 'তুমি বরং শুয়ে পড়ো আবার।'

'দুর্গাদাস, বাইরে কি বৃষ্টি হচ্ছে এখনো?'

'তেমন জোরে আর হচ্ছে না।'

'খুব বৃষ্টি হ'য়ে গেলো—না? শুয়ে-শুয়ে শব্দ শুনছিলাম আমি, অদ্ভুত একটা নেশা আছে এই বৃষ্টির শব্দের। তোর মনে আছে, দুর্গা, গেলো বছর এ-রকম দিনে তুই আর আমি লেক-এর ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেমন ভিজেছিলাম? আরক তারপর সূর্যাস্তের আগে বৃষ্টি থেমে গিয়ে মেঘের গা ফেটে কেমন আলো বেরোতে লাগলো? আর কেমন চিকচিক করছিলো ভেজা ঘাসের ডগাগুলো সেই রোদ্দুরে? মনে আছে?'

দুর্গাদাস একটু অবাক হ'য়ে তাকালো শ্রীপতির দিকে। আজ দুপুরে তাকে যে-রকম দেখেছিলো, কাল তাকে যে-রকম দেখেছিলো—তা থেকে এই মুহূর্তে শ্রীপতি যেন আলাদা মানুষ। মনে-মনে দুর্গাদাসের ভয় ছিলো যে শ্রীপতি হয়তো রেগে যাবে তাদের দেখে, কিন্তু তা তো নয়—সে যেন ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়েছে, আর কথা বলছে কী-সব অবাস্তব বিষয়ে—আজ যে বৃষ্টি হয়েছে সেটাই যেন সবচেয়ে জরুরি ঘটনা তার কাছে—এটা কি ওর ঘুমের ঘোর, না জ্বরের ঘোর, না নিজের মনে মানতে চাচ্ছে না ওর অসুখ? আজ দুপুর থেকে দুর্গাদাসের মনে সন্দেহ ঢুকেছে যে শ্রীপতির অসুখটা কিছু উড়িয়ে দেবার মতো নয়; তাই যদিও সে খোলামেলা তরল প্রকৃতির মানুষ, বেশিক্ষণ মন-খারাপ ক'রে থাকতে পারে না— ভেতরে-ভেতরে তার অনবরত অস্বস্তি হচ্ছিলো, কাকাবাবু দেখে কী বলেন তা জানার জন্য ছটফট করছিলো, সত্যি বলতে।

'বৃষ্টির দিন বড়ো ভালো লাগে আমার,' দুর্গাদাসের কাছ থেকে কোনো উত্তর না-পাওয়া সত্ত্বেও আবার বলতে লাগলো শ্রীপতি। 'এক-এক বছর হয় না—দশ দিন, পনেরো দিন ধ'রে আকাশ অনবরত মেঘলা হ'য়ে থাকে—সে-রকম হবে কি এ-বছর? সে-ক'দিন আমি ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে চাই, বাস্-এর দোতলা থেকে দেখতে চাই আকাশ আর মেঘ, আর সন্ধেবেলায় বৃষ্টিতে ভেজা চকচকে কালো চৌরঙ্গি, আর গাড়ির পেছনের আলোর লম্বা লাল ছায়াগুলো রাস্তাকে কেমন রঙিন ক'রে-ক'রে স'রে যায়।—কিন্তু না, সন্ধের চেয়ে দুপুরই বোধহয় ভালো যদি সকালে ঘুম ভেঙেই আধো আলোয় বৃষ্টির শব্দ শুনতে পাই।'

এই কথাগুলো বলতে শ্রীপতির যেটুকু সময় লাগলো তার মধ্যে কেশববাবুর দিকে ঘন-ঘন দৃষ্টিপাত করলো দুর্গাদাস, আর গৌতম প্রশান্তমুখে শ্রীপতির দিকে তাকিয়ে রইলো। হলদে ধরনের ফর্শা রঙের জন্যই হোক, বা দাড়িগোঁফ খুব পাৎলা ব'লেই হোক, গৌতমের মুখে ভাবের অভিব্যক্তি বেশি বোঝা যায় না, প্রায় সব সময় একই রকম গম্ভীর হ'য়ে থাকে সে—ভাবটা এই রকম যে চারদিকের জগৎটা

তার পক্ষে খুব বেশি কৌতূহলের যোগ্য নয়। তার গলার আওয়াজের ওঠা-পড়া বেশি নেই, একটু উঁচু পর্দায় একটানা কথা বলে সে, উচ্চারণ খুব পরিষ্কার—অন্যদের মতো কেঁপে যায় না রাগলে, খুশি হ'লে বা অবাক হ'লে. আর এই জন্যে বন্ধুদের মধ্যে কেউ-কেউ তাকে খুব তারিফ ক'রে থাকে।

শ্রীপতি কথা শেষ করামাত্র গৌতম বললো, 'তোমার বইগুলো আমি একটু ব্যবহার করতে চাই, শ্রীপতি। তোমার আপত্তি নেই তো?'

'আমার বই? আমার আবার বই কোথায়?'

'আরতির কাছে যে-সব বই রেখে দিয়েছিলে সেগুলোর কথা বলছি।'

একটি হালকা ছায়া শ্রীপতির মুখের ওপর দিয়ে ভেসে গেলো।

'বইগুলো তো আরতির কাছেই আছে দেখছি। তোমার কোনো কাজে লাগে না?'

'নাঃ!' খুব নিচু গলায় জবাব দিলো শ্রীপতি, 'বই আমার বিশ্রী লাগে।'

'তাহ'লে বন্ধুদের বিলিয়ে দাও না।'

'তা দিলে হয়। ক্ষতি কী?'

'আমার যেগুলো ইচ্ছে আমি নিয়ে নেবো?'

'বা বে! নিয়ে নেবে কেন?' দুর্গাদাস প্রতিবাদ করলো, 'আজ ওর বিশ্রী লাগছে ব'লে কালকেই যে বইয়ের জন্য পাগল হ'য়ে যাবে না তার কি ঠিক আছে কিছু?'

'তখন আবার আমার কাছ থেকে শ্রীপতি নিতে পারবে।'

শ্রীপতি কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু দুর্গাদাস তাড়াতাড়ি বাধা দিলো তাকে—'থাক গে, সে-সব পরে হবে। কাকাবাবু ওকে একবার দেখবেন নাকি?'

'তুমি একটু শুয়ে পড়ো দেখি,' ডাক্তার মৈত্র ব্যাগ খুলে স্টেথোস্কোপ বের করলেন।

'আমাকে পরীক্ষা করবেন? এখনই? সকলের সামনে?'

'আমরা না-হয় বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি একটু—' গৌতম দ্রুত পায়ে স'রে এলো আরতির কাছে, তার কানের কাছে মৃদু গলায় বললো, 'চলো বাইরে। শ্রীপতিকে বোধহয় গায়ের জামা খুলতে হবে, আর সেটা খুব সুশোভন দৃশ্য হবে না।'

ইস্পাতের মতো ঠাণ্ডা চোখে গৌতমের দিকে একবার তাকালো আরতি। এর আগের দিন সে যেখানটায় দাঁড়িয়ে ছিলো, আজও ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়েছে, অন্যদের থেকে দূরে, তেমনি সোজা হ'য়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে।—'কেন, সুশোভন হবে না কেন?'

'অন্তত পক্ষে তোমার উপস্থিত থাকাটা অশোভন হবে।' আরতিকে নিভৃতে পাবার জন্য অস্থির হ'য়ে উঠছিলো গৌতম, আর শ্রীপতিকে নিয়ে তার মতে এই যে বাড়াবাড়িটা এরা করছে তাতেও তার মেজাজটা খিঁচড়ে ছিলো। 'আমি বাইরে যাচ্ছি, তোমার ইচ্ছে হ'লে আসতে পারো।' কিন্তু কথাটা ব'লে একটু অপেক্ষা করলো সে, আরতি আস্তে-আস্তে তার সঙ্গে নিচে নেমে এলো।

ছোট্ট সরু রোয়াক, রেলিং নেই, সোজা রাস্তা থেকে দুটো সিঁড়ি উঠেছে, দুপুরবেলা ফেরিওয়ালার বিশ্রামের জায়গা, রাত্রে কোনো ভিখিরির ঘুমোবার। গলিটাও সরু, সম্ভ্রান্ত নয়, ফুটপাত নেই, মাঝামাঝি এসে হঠাৎ বস্তিতে পরিণত হয়েছে, দুই দিকে বাড়ির চাপের জন্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না বৃষ্টি এখনো হচ্ছে কি হচ্ছে না। ডাক্তার মৈত্রর পুরানো কালো গাড়িটাকে মস্ত আর বড্ড বেশি ঝকঝকে দেখাচ্ছে এই গলিতে।

বাইরে এসেই গৌতম বললে, 'ইশ! কত সময় নষ্ট হ'লো বলো তো!'

আরতি নিঃশব্দে মলিন গলিটার দিকে তাকিয়ে রইলো।

'কথা বলছো না কেন? গাড়িতেও একটা কথা বলোনি তুমি।'

'আমি চাই তুমিও এখন কথা বলবে না।'

'না-ব'লে পারছি না। তোমাকে একটা কথা জিগেস করেছিলাম ঘণ্টাখানেক আগে—'

'তার উত্তরও পেয়েছো।'

'সে-উত্তর আমার কাছে অগ্রাহ্য।—চলো না তোমাদের গাড়িতে ব'সে কথা বলি।'

'না, এই ভালো।'

'তোমাদের ড্রাইভার ব'সে আছে,' পাৎলা ক'রে হাসলো গৌতম, 'তোমার আশঙ্কার কোনো কারণ নেই।'

'গৌতম, তোমার চেহারাটি তো মন্দ নয়, জামা-কাপড়ও ভালোই পরো, কিন্তু মানুষটা তুমি এত কুৎসিত কেন?'

গলা দিয়ে একটি ছোট্ট, সরু হাসি বের করলো গৌতম। 'শ্রীপতির মতো আলুথালু বেশ বুঝি ভালো লাগে তোমার? তা যা-ই বলো, এর চেয়ে একটা ভালো রাস্তায় শ্রীপতির থাকা উচিত—একা মানুষ, আর উপার্জন তো নেহাৎ কম করে না।'

'শ্রীপতি যদি ভালো রাস্তায় থাকবে তাহ'লে তোমাদের চলবে কেমন ক'রে?'

'তার মানে?'

'তোমাদের কফি-হাউসের দল, "সুনন্দা"র দল—তার মধ্যে এমন কে আছে যে শ্রীপতির কাছে টাকা নেয়নি?'

'এ-সব খবর নিশ্চয়ই দুর্গাদাস তোমাকে সরবরাহ করে?'

'মিথ্যে বলে?'

'কিন্তু এ-কথাটা বলতে ওর মনে থাকে না যে আমি শ্রীপতির কাছে যতবার টাকা নিয়েছি কোনোবারই ফেরৎ দিতে ভুলিনি।'

'কিন্তু সবাই তো তোমার মতো কর্তব্যপরায়ণ নয়—ভাগ্যিশ নয়।'

'আরতি, আজ হঠাৎ আমার ওপর এমন খেপে আছো কেন?'

আরতি জবাব দিলো না।

গৌতম স'রে এসে আরতির গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। শাড়ি-জামার তলায় আরতির সুগঠিত দেহটি তার মনের সামনে ভোজ বিছিয়ে দিলো। চাপা গলায় বললো, 'তোমার হয়েছে কী, আরতি? কী ভাবছো?'

'ভাবছি, ঠিক কী-ধরনের অপমান করলে তোমার মগজের মধ্যে সেটা প্রবিষ্ট হবে।'

নিচু গলায় আবার হাসলো গৌতম।—'এই যে তুমি কথাটা বললে, আমার কানে শোনালো যেন প্রেমালাপ। কোনো আশা নেই, আরতি, আমার ধৈর্য অশেষ। আমাকে তুমি ছাড়াতে পারবে না।'

'ছিনেজোঁকের মতো লেগে থাকবে?'

'সে তুমি যা খুশি তা-ই বলতে পারো, তাতে আমার কিছু এসে যায় না।'

'তুমি ভাবছো আমার কথাগুলো ভান?'

'নিজে যা জানো তা আমাকে আর জিগেস করো কেন? আর এও তুমি জানো যে ভানই আমি ভালোবাসি। ভান যার নেই এমন মেয়ে আমার অসহ্য।'

'আবার বন্দনার কথা ভাবছো বোধহয়?'

'তোমরা বলো বন্দনা খুব ভাল মেয়ে,' হঠাৎ একটু অন্য সুরে কথা বললো গৌতম, 'কিন্তু জানো না বন্দনা তার ভালোত্বের চাপেই পাগল ক'রে দিতে পারে মানুষকে।'

'তোমার পূর্বপ্রণয়ের ইতিহাসে আমার কিছুমাত্র কৌতূহল নেই, গৌতম।'

'নেই বুঝি? কিন্তু বন্দনার কথা আমি তুলিনি, মনে রেখো—তুমিই দু-বার তুললে এই দু-ঘণ্টার মধ্যে।'

একটু স'রে গিয়ে গৌতম একটি সিগারেট ধরালো, ছোট্ট রোয়াকে পাইচারি করতে-করতে ঘন-ঘন টান দিতে লাগলো সিগারেটে। বাইরের ছিমছাম চেহারার আড়ালে তার ভেতরটা যেন অস্থির হ'যে উঠেছে, মনের মধ্যে যে-কথাটা নাড়া দিচ্ছে সেটাকে একটা নিষ্পত্তিতে না-নিয়ে গিয়ে সে ছাড়বে না।—'ইশ!' হাতের একটা ভঙ্গি ক'রে হঠাৎ ব'লে উঠলো সে, 'আবার বৃষ্টি! কী যে হয়েছে আজ!

আর এই বৃষ্টি নিয়ে কত কবিত্ব করছিলো শ্রীপতি। একটু স'রে দাঁড়াও—ভিজে যাবে যে।'

'একটু ভিজি।'

'দেখছো কী-রকম কাদা জ'মে উঠছে গলিটায়। আর ঐ বাড়ির রেলিঙে মেলে-দেয়া কাঁথা-কাপড় আজ আর শুকালো না। ওদিকে ট্রাম বন্ধ, বাস্‌গুলোর অবস্থা ভাবো।'

'তা বৃষ্টির কিছু উপকারিতা নেই কি? তারই জন্য শস্য জন্মায় শুনতে পাই।'

'অতএব দেখছো বৃষ্টিও একজন কাজের লোক, আমাদের মন উদাস ক'রে দেয়া মেঘের উদ্দেশ্য নয়।'

'মেঘ বুঝি তোমার কানে কানে ব'লে গেছে যে পৃথিবীতে শস্য ফলানোই তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য?'

আরতির কানের কাছে মুখ নিয়ে গৌতম বললো, 'খামকা কেন ঝগড়া করছো বলো তো! মুখ ফুটে সেই কথাটি বলো, যা শোনার জন্য আজ সারাদিন আমি ছটফট করছি।'

'আশ্চর্য অহমিকা তোমার! তুমি ছটফট করছো ব'লেই আমাকে তা বলতে হবে?'

'না -শুধু সেজন্যে নয়। ব্যাপারটা স্থির হ'য়ে গেলে তুমিও শান্তি পাবে।'

'আমি শান্তি চাই তা ধ'রে নিচ্ছো কেন?'

'কে না চায়?'

'আমি বরং অন্য একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম তোমাকে—'

'বলো।' আগ্রহে ঝুঁকে পড়লো গৌতম।

'আমি একজনকে ভালোবাসি।'

'বিশ্বাস করি না।'

'অন্ততপক্ষে তোমাকে ভালোবাসি না।'

'তুমি কাউকেই ভালোবাসো না সে-কথা বরং বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় আমার।'

'তাহ'লে? যে-মেয়ে ভালোবাসতেই পারে না তাকে বিয়ে করার জন্য খেপেছো?'

'ভালোবাসা ব'লে সত্যি কিছু আছে নাকি, আরতি?'

'তোমার মতে ওটা বানানো কথা?'

'পুরোপুরি তা নয়। দেহ ব'লে একটা ব্যাপার আছে, আছে সান্নিধ্য, স্বার্থ এক হবার ফলে ঘনিষ্ঠতা আর সবার ওপরে আছে পরম ক্ষমতাশালী অভ্যেস। দেখতে পাচ্ছো, আমি তোমার কাছেও রেখে ঢেকে কথা বলছি না– ইচ্ছে করলে যে একটু আধটু রোমিও সাজতে না পারি তা নয় - তোমার সাহিত্য-পড়া ন্যাকাদের চাইতে ভালোই পারি হয়তো কিন্তু—ঐ আরকি—আমি মানুষটা অনেস্ট, এবং অনেস্টি ভালোবাসি।'

সন্ধে পেরিয়ে গেছে ততক্ষণে, বৃষ্টিতে ঝাপসা হ'য়ে আছে গলি, ল্যাম্পোস্টের গা বেয়ে জলের ধারা নেমে যাচ্ছে চিকচিকে সবু একটা সাপের মতো। মিনিটখানেক এই দৃশ্যটি দেখলো আরতি তারপর হঠাৎ মুখ ফেরালো গৌতমের দিকে।

'আমি দেখছি তুমিই সবচেয়ে বড়ো ন্যাকা, কেননা তুমি যা বলছো সেই অনুসারেই যে-কোনো মেয়েকে বিয়ে করলে তোমার চলতে পারে।'

'না তো! বিয়ের ব্যাপারে পছন্দ অপছন্দের কথা না-উঠেই পারে না। আগেকার দিনে মা-বাবারা পছন্দ করতেন, আজকাল আমরা নিজেরা পছন্দ করছি। ব্যাপারটা একই।'

'আমি কি জানতে পারি তোমার মনোনীতা হবার মতো সৌভাগ্য আমার কী ক'রে হ'লো?'

'আরতি, তোমার চপলতা বোধহয় সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।' গৌতম তার লম্বা চেহারা নিয়ে আরতির মুখের উপর ঝুঁকে পড়লো।

'চপলতা? ' সরু চোখে একবার তাকালো আরতি, নিজের অজান্তেই এক পা পেছনে স'রে গেলো গৌতম।— 'না, আমি সত্যি জানতে চাই। কেননা আমার নিজের ধারণা যে তোমার সঙ্গে আমার কিছু মেলে না—কিছু না।'

'সেজন্যেই ক-মাস ধ'রে অনবরত মেলামেশা করছো আমার সঙ্গে?'

'সেজন্যেই আরো ভালো ক'রে বুঝতে পেরেছি যে মেলে না।'

'ভুল করছো, আরতি—হয়তো জেনে-শুনেই ভুল করছো। তুমি আমারই মতো সুস্থ, আত্মস্থ, সক্ষম—আর আমারই মতো ঠাণ্ডা মাথার মানুষ, যা সত্যি বলতে কোনো মেয়ের পক্ষে অসাধারণ। তোমার আমার বিয়ে হ'লে রোমাঞ্চ-টোমাঞ্চ কী-রকম হবে জানি না, কিন্তু সমাজের পক্ষে সেটা সম্পদ হবে তাতে আমার সন্দেহ নেই।'

শব্দ ক'রে হেসে উঠলো আরতি। গৌতমের স্বল্পলোম গালে আঙুলের টোকা দিয়ে বললে, 'তোমার অনেক গুণ আছে, গৌতম, কিন্তু সত্যি তুমি বড়ো বোকা—বড্ডই বোকা তুমি।'

অন্ধকারে লণ্ঠনের মতো লাল হ'য়ে উঠলো গৌতমের মুখ। তা লক্ষ ক'রে গম্ভীর হ'লো আরতি, মৃদু স্বরে আবার বললো, 'সত্যি কি তোমার এমন সন্দেহ কখনো হয়নি যে তুমি যাকে অনেস্টি ভাবছো সেটা তোমার নির্বুদ্ধিতা? তুমি যেহেতু রং-কানা, সেইজন্য যে লাল রংটা মরীচিকা নয় এ-কথাও কি মাথায় ঢোকে না তোমার?'

একটু তাকিয়ে থাকলো গৌতম, হঠাৎ হাসির মতো ভঙ্গিতে দাঁত দেখিয়ে বললে, 'আমাকে রাগাবার জন্য এই যে তুমি প্রাণপণ চেষ্টা করছো, এটা বেশ ভালো লাগছে আমার।'

'আমি তোমাকে রাগাতে চাচ্ছি না ; আমি শুধু বলতে চাচ্ছি যে আমারই মতো সুস্থ, সক্ষম, ঠাণ্ডা মাথার মেয়ে আরো অনেক আছে এই কলকাতায়। তোমার মা-কে একবার বলো না—তিনি দশ দিনের মধ্যে পঞ্চাশ মেয়ে দেখিয়ে দেবেন তোমাকে। কিংবা—চারদিকে চোখ ফেললে তুমি নিজেই দেখতে পাবে। আমি এখন জিগ্যেস করছি, তুমি যে আর-কোনো মেয়েকে চোখে দেখছো না তার কারণটা কী?'

'তার কারণ— তুমি। সুস্থ হ'তে পারে, ঠাণ্ডা মাথার হ'তে পারে, কিন্তু তোমার মতো আর-একজনকে আমি কোথায় পাবো?'

'আমার মতো আর-কেউ নেই, এটা তোমার মত হ'তে পারে, কিন্তু অন্যেরা মানবে ব'লে কি তোমার মনে হয়?'

'বেশ!' দাঁতের ফাঁকে উচ্চারণ করলো গৌতম, 'না-হয় মানছি আমি তোমাকে ভালোবাসি। হ'লো?'

'এই তো লক্ষ্মী ছেলে!' মিষ্টি ক'রে একটু হাসলো আরতি। 'এখন একটু দাঁড়াও তো এখানে, আমি চট ক'রে দেখে আসি বাবার কদ্দুর হ'লো। না কি, বাড়ি চ'লে যাবে? ইচ্ছে হয় তো গাড়িটা নিয়ে যেতে পারো।'

ওপর থেকে দুর্গাদাসের হাঁক শোনা গেলো, 'আরতি, কাকাবাবু তোমাকে ডাকছেন।'

'তোমরাই নামিয়ে দিয়ো আমাকে। আর আমিও দেখে একবার যাই শ্রীপতি কেমন আছে-টাছে,' ব'লে গৌতমই আগে-আগে ওপরে উঠে এলো। এবার তাকে পাশ কাটিয়ে সোজা এগিয়ে গেলো আরতি। শ্রীপতি মেঝেতে পা ঠেকিয়ে বিছানার ওপর ব'সে আছে, তার মুখের ভাবটি শান্ত, যেমন হয় অসুখের সময় ডাক্তারের কথা শোনার পর। ডাক্তার যদি অভয় না-ও দেন, যদি স্পষ্ট ক'রে না-ও বলেন কিছু, তবু ডাক্তারের উপস্থিতিরই একটা আরাম আছে, অন্তত কয়েক মিনিটের জন্য মন একটু হালকা লাগে, ইচ্ছে হয় উঠে বসতে, কথা বলতে। কিংবা হয়তো সারাদিন আধো ঘুমে আধো জ্বরে কাটাবার পর শ্রীপতির ঘোর এখনো কাটেনি; তার হাতে একটা জলের গ্লাশ ধরা আছে, কিন্তু সেটা নিয়ে কী করবে তা যেন ঠিক বুঝতে পারছে না; হঠাৎ আরতিকে ঠিক তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার মুখে একটি অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠলো, আর পরের মুহূর্তেই সে জলের গ্লাশে চোখ নামিয়ে নিলো।

'কাশি এলেই একটু-একটু ক'রে জল খাবে,' মৈত্র নির্দেশ দিলেন রোগীকে, 'একবারে বেশি খাবে না, বার-বার একটু-একটু ক'রে। আর—হ্যাঁ—তুমি নিজেই নিজের ঠিক ওষুধ বের করেছো : তোমার এখন সবচেয়ে বেশি দরকার বিশ্রাম। ওষুধ আজ বেশি কিছু দিচ্ছি না, কিন্তু জ্বর কখন কত ওঠে তা দেখতে হবে—দুর্গাদাস, যাও তো একটু আমার গাড়িটা নিয়ে—আচ্ছা চলো, আমিও যাই—অরু, তুই কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ?'

'এই তো এখানেই।' বাবার মুখের দিকে স্থির চোখে একটু তাকিয়ে থাকলো আরতি, আর তার পেছন থেকে গৌতম গম্ভীর গলায় জিগেস করলো, 'কী হয়েছে শ্রীপতির?'

'এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কাল আবার দেখতে হবে। আমি এক্ষুনি একটু ঘুরে আসছি, অরু—দুর্গাদাসকে নিয়ে যাচ্ছি—চলো হে।' কেশববাবু একটু ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেলেন।

শ্রীপতির বিছানার কাছে আরো দু-পা এগিয়ে এলো আরতি। শ্রীপতির দেহে কোনো ভঙ্গি হ'লো না; একই ভাবে ব'সে আছে সে, তার মুখের লালচে আভা এখন আরো স্পষ্ট, ঘামে লেপ্টে আছে কপালের ওপর একগোছা চুল, একই সঙ্গে ক্লান্ত আর সুখী দেখাচ্ছে তাকে, উদ্দীপ্ত আর অবসন্ন। আরতি বললো, 'কেমন আছো?'

শ্রীপতি এক ঢোঁক জল খেলো, কোনো জবাব দিলো না।

'কেমন আছো, শ্রীপতি?'

'আমি? আমাকে বলছো? আমি ভালো আছি। তোমরা এসে খুব ভালো করলে।'

'গ্লাশটা ধ'রে আছো কেন সারাক্ষণ? নামিয়ে রাখো না।—দাও।' শ্রীপতির হাত থেকে আরতি জলের গ্লাশ নিয়ে নিলো, চেয়ারে সেটা রেখে চেয়ারটা আরো এগিয়ে দিলো বিছানার কাছে।—এই রইলো।—শোনো, তুমি চোখ নামিয়ে আছো কেন? তাকাতে পারো না?'

মুহূর্তের জন্য চোখ তুলে তাকালো শ্রীপতি, একটি লাজুক, সুন্দর, ছেলেমানুষি হাসি তার মুখে জ্ব'লে উঠেই মিলিয়ে গেলো। হঠাৎ বললো, 'তোমাকে কী-একটা কথা বলবো ভেবেছিলাম—কিন্তু এখন আর মনে পড়ছে না।'

'আমি কাল আবার আসবো।—কিন্তু এখানে তোমার আর থাকা চলবে না, শ্রীপতি।'

'হ্যাঁ—আমিও মাঝে-মাঝে ভাবি অন্য কোথাও চ'লে যাই। পঁচাত্তর তলার কোনো-এক ঘরে।'

'পঁচাত্তর তলা!' গৌতম ভুরু কুঁচকে বললে, 'তার মানে?'

'কী জানি। বাসা-বদলের কথা ভাবলেই আমার পঁচাত্তর তলার একটা ঘর মনে পড়ে। সেখানে আকাশ খুব কাছে। জানলার বাইরে গোল আর গোলাপি মেঘ আস্তে ভেসে-ভেসে বাতাসকে রঙিন ক'রে দিয়ে চ'লে যায়।'

'শ্রীপতি!' নিচু গলায় হেসে উঠলো গৌতম, 'তুমিও আমাকে লজ্জা দেবে দেখছি। তোমাকে কড়া পাকের মানুষ ব'লে জানতাম, কিন্তু তোমারও এই স্বপ্নবিলাস!'

" 'বিলাস" কেন?'

'তুমি জানো ও-রকম কোনো ঘরে তুমি কোনোকালেও থাকবে না।'

'কে বলতে পারে? মানুষের সম্ভাবনা তো অন্তহীন। আর তাছাড়া—'

'ওর সঙ্গে তর্ক কোরো না, শ্রীপতি,' আরতি বাধা দিলো কথায়। 'সব কথা সকলকে বলতে নেই তা কি তুমি জানো না? এখন শোনো—আমার একটা কথা শোনো। আমি একটা প্রশ্ন নিয়ে তোমার কাছে এসেছি।'

'কিন্তু আমারও একটা কথা ছিলো তোমার সঙ্গে। হ্যাঁ—মনে পড়েছে এবার, তোমার চিঠি। সেই চিঠির কোনো উত্তর তুমি পাওনি, কিন্তু তাই ব'লে এ-কথা ভেবো-না যে সে-উত্তর আমি লিখিনি বা লিখছি না বা লিখতে চাই না। রোজই লিখি মনে-মনে, একটু-একটু ক'রে লিখি আর ছিঁড়ে ফেলি—বলতে পারো আমি অনবরত তোমাকে চিঠি লিখে চলেছি, আমার এত কথা আছে যে সে-চিঠি কোনোদিন ফুরোবে না।'

'চিঠি!' ব'লে উঠলো গৌতম। 'চিঠি কিসের? কী নিয়ে লিখেছিলে, আরতি।'

'চিঠির কথা এখন থাক। শোনো, শ্রীপতি। এই যে তোমার বন্ধু গৌতম বর্ধন—এই গৌতমের জেদ আমাকে বিয়ে করবে। রোজ এক কথা ব'লে-ব'লে অস্থির ক'রে দিচ্ছে আমাকে। এখন বলো তো—'

'আরতি, আমি প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি। এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করার আগে তোমার স্থানকালপাত্র ভেবে দেখা উচিত ছিলো।'

'স্থান, কাল, পাত্র? সবই ঠিক আছে। একটু আগে আমাকে তুমি কী বলছিলে ঐ রোয়াকে দাঁড়িয়ে? বদলের মধ্যে এইটুকু হয়েছে যে শ্রীপতি এখন আছে এখানে।—তা ভালোই, আমি এ-বিষয়ে তারই মতটা জানতে চাই। শ্রীপতি, গৌতমের দিকে একবার তাকাও, আমার দিকেও তাকিয়ে দ্যাখো। তুমি গৌতমকে ভালো ক'রেই চেনো, আমাকে চেনো না তাও নয়। এখন বলো—বেশ ভেবে উত্তর দাও—আমি কি ওকে বিয়ে করবো? তুমি যদি বলো, যদি মুখ ফুটে একবারও বলো তুমি, তাহ'লে আমি আর এক মুহূর্ত ভাববো না, তোমার সামনেই কথা দেবো ওকে। চুপ ক'রে আছো কেন—তোমার একটি কথার ওপর সব নির্ভর করছে আমার।'

'অসহ্য!' ছুঁচের মতো তীক্ষ্ণ শোনালো গৌতমের গলা, 'তোমার স্পর্ধা অসহ্য হ'য়ে উঠেছে, আরতি।'

গৌতমের দিকে না-তাকিয়ে আরতি আবার বললো, 'শ্রীপতি, কিছু বলো! আমি তোমার কথা শুনতে চাই। তোমার কি কিছুই বলার নেই আমাকে?'

কিন্তু শ্রীপতির মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরোলো না। স্তব্ধ হ'য়ে সে তাকিয়ে রইলো সামনের দিকে, অন্য দু-জন মানুষের কাউকেই যেন সে দেখতে পাচ্ছে না।

'—আমি আর-একটু বলি, শ্রীপতি, তাহ'লে ব্যাপারটা তুমি আরো ভালো ক'রে বুঝতে পারবে। গৌতম বলে, ভালোবাসা ব'লে কিছু নেই, ওটা মানুষের বানানো কথা। হয়তো তা-ই সত্য, কিন্তু কথাটা হচ্ছে : মানুষকে তা বানাতে হ'লো কেন? আর "বানানো" মানেই বা কী? আমরা কি ধ'রে নিতে পারি না যে মানুষ যা অনবরত বানিয়ে চলে সেটা তার অস্তিত্বের পক্ষেই একটা জরুরি ব্যাপার? আর-এক প্রশ্ন : সত্য কি ক্ষণিক হ'তে পারে না? কিংবা, স্থায়িত্ব দিয়েই কি সত্য-মিথ্যার বিচার করতে হবে? যেহেতু জীবনে প্রতিদিন আমরা ভালোবাসি না, অথচ আমাদের রোজ তিন বার ক'রে নির্ভুলভাবে খিদে পায়, তাই কি প্রমাণ হ'লো যে ভালোবাসার চাইতে খিদে জিনিশটা বেশি সত্য? আর, অনবরত ভালোবাসা, প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে ভালোবাসা—তা কি মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব? তুমি একটু আগে যা বললে তা যদি ঠিক হয়, যদি মানুষের সম্ভাবনার সত্যিই অন্ত না থাকে, তাহ'লে তো কোনো-একদিন এমনও হ'তে পারে যে প্রতিটি মানুষ প্রতি মুহূর্তে ভালোবাসবে, কখনো শুকিয়ে যাবে না, ফুরিয়ে যাবে না, ক্লান্ত হবে না? আর সেই কোনো এক দিন যে আজকের দিনই নয়, তা-ই বা কী ক'রে জানবো আমরা? আমি ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলতে পারছি না, কিন্তু সংক্ষেপে কথাটা এই: যদি ভালোবাসা সত্য হয় তাহ'লে এসো না আমরা এখনই ভালোবাসতে আরম্ভ করি। বলো তুমি, কার কথা আমি বিশ্বাস করবো· তোমার, না গৌতমের? বলো, উত্তর দাও।'

যতক্ষণ এরা নিভৃতে ছিলো আরতির যে-কোনো কথা সহ্য করতে পেরেছিলো গৌতম, এমনকি ধ'রে নিচ্ছিলো ওগুলো সবই তার প্রেমকলার অঙ্গ, কিন্তু শ্রীপতির সামনে আরতির এই নির্লজ্জতায় তার মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্ব'লে উঠলো। তার সংযম ছুটে গেলো এতক্ষণে, যা নিয়ে সে গর্ব ক'রে থাকে সেই 'ঠাণ্ডা মেজাজ' ছারখার হ'লো, কুটিল রেখা পড়লো মুখে, তার সুশ্রী, অমায়িক, নিরুদ্বেগ চেহারাটি কেঁপে-কেঁপে ফুলে উঠতে লাগলো নিজের আর অন্যের ওপর অবিশ্বাসে।—'আরতি, তোমার কি চক্ষুলজ্জাও নেই, সাধারণ একটা ভদ্রতাজ্ঞানও নেই? কিছু মনে কোরো না—তোমার মা নেই, তোমার বাবা স্নেহে অন্ধ, ছেলেবেলা থেকে অত্যন্ত প্রশ্রয় পেয়ে-পেয়ে তুমি উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে গিয়েছো— আজ এর সঙ্গে, কাল ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়াও, ছেলেদের নিয়ে খেলা করা তোমার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে, ভেবে দেখছো না এই খেলার পরিণাম কত খারাপ হ'তে পারে। আমি তোমাকে তোমার নিজের হাত থেকে বাঁচাতে চাচ্ছি—নিয়ে যেতে চাচ্ছি এক সুস্থ, পরিচ্ছন্ন জীবনে—আর তাই তোমার এত আক্রোশ আমার ওপর, তাই অগত্যা ভালোবাসার বুলি কপচাতে শুরু করেছো, এইমাত্র এমনও ভান করলে যে শ্রীপতিকে তুমি ভালোবাসো! ছি! একটা অসুস্থ মানুষ, যাকে কোনো কারণেই উত্তেজিত করা উচিত নয়, এ-মুহূর্তে যার সবচেয়ে বেশি দরকার বিশ্রাম, তার সঙ্গে এ-রকম অভিনয় কি নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে পড়ে না? শ্রীপতি যে তার বন্ধুর কোনো ক্ষতি করতে চাইবে না এ-কথা বোঝার মতো শ্রদ্ধাটুকুও

তাকে করলে না তুমি। আমাকে ভুল বুঝো না, আমি জানি তোমার মধ্যে অনেক গুণ আছে, আমি সেগুলোকে উজ্জ্বল ক'রে ফোটাতে চাই ব'লেই তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করছি। এতেই বুঝবে যে তোমরা যাকে ভালোবাসা বলো তার চেয়ে অনেক বেশি দামি জিনিশ আমার বুদ্ধি, আমার ধৈর্য, আমার বিবেচনা।'

গৌতমের কথা শেষ পর্যন্ত শুনে নিচু গলায় টেনে-টেনে হেসে উঠলো আরতি। ঢেউয়ে-ঢেউয়ে গড়িয়ে গেলো সেই হাসি, তার রেশ ভেসে রইলো বাতাসে।

'অসহ্য!' হাতের মুঠো পাকিয়ে গৌতম ব'লে উঠলো। 'শ্রীপতি, তোমার কি প্রতিবাদ করা উচিত নয়?'

শ্রীপতি উঠে দাঁড়ালো বিছানা ছেড়ে, তার মুখ ফ্যাকাশে, কথা বলতে গিয়ে ঠোঁট কেঁপে উঠলো। 'গৌতম,' প্রায় ফিশফিশ ক'রে বললো সে, 'আমার খুব খারাপ লাগছে—কিন্তু এ-ব্যাপারে কিছুই আমার করার নেই।'

'আচ্ছা, আমিই এর ব্যবস্থা করবো!' দাঁতের ফাঁকে এ-কথা ক-টি ছুঁড়ে দিয়ে গৌতম হনহন ক'রে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

একটু পরে কেশববাবু দুর্গাদাসকে নিয়ে ফিরে এলেন। দুর্গাদাস টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো এক শিশি মিকশ্চার, ওষুধ খাবার গ্লাশ, থার্মোমিটার, এক শিশি ডেটল, এক টিন বিস্কুট, তা ছাড়া কিছু রুটি মাখন ফল মিষ্টি। বাড়িওলার দরোয়ান এসে একখানা ক্যাম্পখাট রেখে গেলো।

'শ্রীপতি, শোনো,' কেশববাবু বলতে লাগলেন 'দুর্গাদাসকে আমি আজ রাত্রে তোমার কাছে থাকতে বলেছি। তুমি আপত্তি কোরো না। ওর মা-কে আমরা খবর দিয়ে যাবো, কাছেই ওর মাসির বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসবে। তুমিও কিছু খেয়ো কিন্তু রাত্রে—যা ইচ্ছে হয় খেয়ো। দুর্গাদাস তোমাকে ওষুধ দেবে, তোমার টেম্পারেচর নেবে। আমি কাল যত শিগগির পারি আসবো, আমি না-আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো, দুর্গাদাস। এখন চলি।'

শ্রীপতি চোখ তুলে তাকালো একবার, কথা বললো না।

আরতি তার চোখে চোখ ফেলে বললো, 'শ্রীপতি, ভালো থেকো। এখন চলি।'

ডাক্তার মৈত্র আর আরতিকে গাড়িতে তুলে দিয়ে দুর্গাদাস ঘরে ফিরে এসে দেখলো শ্রীপতি আবার শুয়ে পড়েছে। চেষ্টা ক'রে গলায় একটু ফুর্তি এনে দুর্গাদাস বললো, 'চা খাবি, শ্রীপতি? নিয়ে আসি দোকান থেকে?'

'আমার বড়ো ক্লান্ত লাগছে,' ব'লে শ্রীপতি দেয়ালের দিকে পাশ ফিরলো।

৯

দিন সাতেক পরে কলেজ স্ট্রিটের এক বইয়ের দোকানে গৌতমের সঙ্গে হিমেন্দুর দেখা হ'য়ে গেলো। হিমেন্দু নানা রকম বই দেখছিলো কাউন্টারে দাঁড়িয়ে, বইয়ের পাতায় প্রায় নাক ঠেকিয়ে, গৌতম যে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তা লক্ষ করেনি—চেনা গলার আওয়াজে চমকে মুখ তুললো।

—'এই যে, ভালো আছেন?'

'আপনি ভালো?' কিছুটা ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলো হিমেন্দু।

'অনেক বই কিনছেন মনে হচ্ছে?

'দেখছিলাম—আমাদের কলেজ-লাইব্রেরির জন্য—'

'অত স্বরলিপি আর রবীন্দ্র-সংগীত বিষয়ে বই? আপনাদের কলেজে গানের ডিপার্টমেন্ট আছে বুঝি?'

'ঠিক তা নয়—' আবছা জবাব দিলো হিমেন্দু। আসলে এগুলো বন্দনার ফরমাশ, একটা বাংলা

সাহিত্যের ইতিহাসও নিতে হবে তার জন্য, তার হঠাৎ খেয়াল হয়েছে বাংলায় এম. এ. দেবে সামনের বছর—আসলে মনস্থির করতে পারছে না কী করবে—বন্দনার এই অস্থির অবস্থার জন্য তার পাশে দাঁড়ানো মানুষটিই দায়ী, এ-কথা হঠাৎ মনে প'ড়ে গেলো হিমেন্দুর। মুহূর্তে নানারকম ভাব খেলে গেলো তার মনের মধ্যে—প্রথমে গতানুগতিকভাবে মনে হ'লো গৌতম অপরাধী, তারপর ভাবলো ঠিক হয়েছে, বন্দনার মতো মেয়ের যোগ্য নয় গৌতম, আর তারপর তার আনন্দ হ'লো এ-কথা ভেবে যে তাকে না-হ'লে বন্দনার প্রায় চলে না আজকাল, ছোটো বড়ো যে-কোনো ব্যাপারে হিমেন্দুর সাহায্য তার চাই।

পেপার-ব্যাকে একটা আধুনিক গণিতের বই কিনে গৌতম একটু অপেক্ষা করলো।—'যাবেন নাকি এখন?'

'হুঁ', যাচ্ছি।' তার নির্বাচিত বইগুলো পর-পর সাজাতে-সাজাতে হিমেন্দু দোকানিকে বললো, 'একখানা দীনেশ সেন জোগাড় ক'রে দিতে পারেন নাকি?'

'ছাপা নেই—পুরোনো বইয়ের দোকানে পেতে পারেন।'

'আপনি হঠাৎ দীনেশ সেন পড়তে চাচ্ছেন?'

'এমনি একটু দেখতে চেয়েছিলাম। আপনার চেনাশোনা কারো আছে নাকি বইটা?'

কথাটা ব'লেই অনুতপ্ত হ'লো হিমেন্দু; গৌতমের সাহায্যে বই জোগাড় ক'রে বন্দনাকে দেবে, এই চিন্তাটা ঘৃণ্য মনে হ'লো তার। কিন্তু গৌতম খুব সহজভাবে উত্তর দিলো—'কারো কাছে কি আর না আছে। খোঁজ নেবো।—তা শ্রীপতির খবর তো শুনেছেন?'

'শ্রীপতি? হ্যাঁ—কী যেন শুনছিলুম—অসুখ করেছে নাকি?'

'কী কাণ্ড! সত্যি একেবারে যক্ষ্মা বাধিয়ে বসেছে শেষ পর্যন্ত।'

'যক্ষ্মা?'

গৌতম মুখ গম্ভীর ক'রে ওপর থেকে নিচে মাথা নাড়লো।—'আমি একটু কফি-হাউসে যাচ্ছি। আপনি আসবেন নাকি?'

মুহূর্তের জন্য দ্বিধা ক'রে হিমেন্দু রাজি হ'লো।—'চলুন।' হঠাৎ গৌতমের দিকে কেমন একটা অস্পষ্ট আকর্ষণ অনুভব করলো সে—যেহেতু গৌতম ছিলো এই সেদিনও বন্দনার সবচেয়ে কাছের মানুষ, তাই যেন তার মধ্য দিয়ে বন্দনার সঙ্গে হিমেন্দুর এক রহস্যময় সম্বন্ধ স্থাপিত হ'য়ে যাচ্ছে।

'—এ-বইগুলো আলাদা ক'রে রাখুন, আমাদের কলেজে পাঠিয়ে দিতে হবে।'

'সবগুলো?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি বিকেলে আবার আসবো।'

রাস্তায় বেরিয়ে গৌতম বললো, 'কলেজের জন্য বই কিনবেন, তা নিয়ে অত ভাববার কী আছে?'

'টাকা অল্প, বই অনেক। বাছা শক্ত।'

'ছোটো-ছোটো ব্যাপার নিয়ে অত যদি ভাবেন তাহ'লে তো মুশকিল।'

হিমেন্দু কোনো জবাব দিলো না।

গৌতম অপাঙ্গে একবার নিরীক্ষণ করলো হিমেন্দুকে। তার চেয়ে লম্বায় প্রায় এক মাথা ছোটো, বিনয় অথবা অস্বাস্থ্যের ফলে এই বয়সেই পিঠ একটু কুঁজো হ'য়ে গেছে, দেখে মনে হয় পড়া আর পড়ানো ছাড়া আর- কোনো কাজেরই সে যোগ্য নয়। এই পুঁথিখেকো সম্প্রদায়কে মনে-মনে বেশ অবজ্ঞা করে গৌতম, কিন্তু এরা কেউ কেউ কথাবার্তা মন্দ বলে না, যেমন ভালো রান্নার জন্য নানা রকম মশলার সঙ্গে শুকনো তেজপাতাটির দরকার হয়, তেমনি একটি উপভোগ্য আড্ডাতেও এদের এক-আধজনকে না-হ'লে ঠিক চলে না। কফি-হাউসে মিনিট চল্লিশ—গৌতম মনে মনে হিশেব করলো—এর সঙ্গে সময়টা হয়তো ভালোই কাটবে, অন্তত গৌতম জোর গলায় কোনো মতামত ঘোষণা করলে এই ছোটোখাটো রোগা মানুষটি প্রতিবাদ করতে পারবে না।

বেলা দুপুর, কলেজগুলোতে গ্রীষ্মের ছুটি চলছে তখনও, কফিহাউসে ভিড় নেই, ঘরের মধ্যিখানে

একটি টেবিলে জন পাঁচেক ছেলে ব'সে চেঁচিয়ে কথা বলছে। সেই দল থেকে দুর্গাদাস তাদের দিকে হাত নাড়লো, অন্যেরাও একেবারে অচেনা নয়, কিন্তু গৌতম তাদের থেকে দূরে একটি টেবিল বেছে নিলো। একটা পরে দুর্গাদাস এসে যোগ দিলো তাদের সঙ্গে।

'এই যে,' দু-জনের দিকে আলাদা ক'রে তাকালো দুর্গাদাস। 'একসঙ্গে কোত্থেকে তোমরা?'

'আকাশ থেকে পড়েছি ধ'রে নে,' গৌতম তার লম্বা শরীরটি চেয়ারের পিঠে এলিয়ে দিয়ে দুর্গাদাসের দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকালো। 'আরম্ভ কর, দুর্গাদাস। দু-একটা নতুন গসিপ শুনিয়ে দে আমাদের।'

'গসিপ হিশেবে আমি বিখ্যাত নাকি? জানতাম না তো।'

'আমি তোকে দোষ দিচ্ছি না, কেননা এই কফি-হাউসের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকেরই তা-ই পেশা।'

'—অবশ্য তুই ছাড়া। তা আমি কোন কথাটা বলেছি যা সত্য নয়?'

'কে কার কাছে টাকা ধার করে সে-বিষয়ে তোর স্মরণশক্তি যদি তীক্ষ্ণ হয় তাহ'লে কে কবে টাকা ফেরৎ দিলো সেটাও মনে রাখা তোর কর্তব্য।'

'তুই কী বলছিস আমি বুঝতে পারছি না।'

'আমাদের দু-জনেরই পরিচিত একজন মহিলাকে তুই কি বলিসনি যে শ্রীপতির কাছে আমি নিয়মিত টাকা ধার নিয়ে থাকি?'

'বাপ্‌স্! একেবারে উকিলের মতো জেরা করছিস যে!' দুর্গাদাস হাসলো। 'হ্যাঁ—বলেছি তো কী হয়েছে? ঠিক কথাই তো। আর কথাটা কিছু গোপনও নয়—আমরা সকলেই টাকা নিই শ্রীপতির কাছে, আর সকলে তা জানেও।'

'কিন্তু সকলের সঙ্গে আমার তফাৎ এই যে তারা অনেকেই ফেরৎ দেয় না, আর আমি দিই।'

'আমি শ্রীপতির অনেক টাকা ফেরৎ দিইনি. এই তো বলতে চাচ্ছিস? কিন্তু ওর সঙ্গে আমি যা পারি, তুই তো তা পারিস না।'

'যুক্তিটা ঠিক বোঝা গেলো না, দুর্গা। তুই যদি কারো কাছ থেকে দান নিতে আপত্তি না করিস সেটা তোর ব্যাপার, আমার নয়। কথাটা হচ্ছে আমার আত্মসম্মানজ্ঞান একটু অন্য রকম, আর তুই কারো কাছে আমার সম্মানহানি ঘটাবি, তা আমি সহ্য করবো না। ভবিষ্যতে একটু সাবধান হ'য়ে কথা বলিস।'

গৌতমের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে দুর্গাদাস ব'লে উঠলো, 'কী বাজে বকছিস! এই যে, তিনটে ঠাণ্ডা কফি এখানে।' হাতের একটা সহৃদয় ভঙ্গি ক'রে আবার বললো, 'ঝগড়াঝাঁটি একটুও ভালোবাসি না আমি। এমনিতেই যা অশান্তিতে আছি এখন।'

'অশান্তি কেন?' এবারে হিমেন্দু একটা কথা বলার সুযোগ পেলো।

'ওই তো পরীক্ষা এসে যাচ্ছে, কিচ্ছু পড়া হয়নি—আর এর মধ্যে শ্রীপতির এই অসুখ!'

'তুই এবার পরীক্ষা দিচ্ছিস তাহ'লে?' হাসলো গৌতম।

'তা-ই তো ভেবেছিলাম মনে-মনে, ফীও জমা দিয়েছিলাম। কিন্তু কে জানে শেষ পর্যন্ত—'

'এবারেও আবার ড্রপ করবি? তুই হাসালি, দুর্গাদাস!'

'বললাম তো, শ্রীপতির অসুখে এমন উদ্‌ভ্রান্ত লাগছে—'

'তা তুই পরীক্ষা না-দিলে শ্রীপতির আরোগ্যের সহায়তা হবে নাকি?'

'তা জানি না, কিন্তু বিশ্রী লাগছে আমার! শুনছি অসুখটা বেশ এগিয়েও গেছে।'

হিমেন্দু জিগেস করলো, 'শ্রীপতিবাবু কি সে-বাড়িতেই আছেন?'

'না, না, এ-অবস্থায় কি সেখানে ফেলে রাখা যায় ওকে? কাকাবাবু ওকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে এসেছেন।'

'কে?' জিগেস করলো গৌতম।

'কেশব মৈত্র। আরতির বাবা।'

'শ্রীপতি এখন তাদের বাড়িতে?'

'সেই যেদিন আমরা সবাই মিলে কাকাবাবুকে শ্রীপতির কাছে নিয়ে গেলাম, তার পরের দিনই এক্স-রে করানো হ'লো, আর এক্স-রে প্লেট দেখে কাকাবাবুর মুখের যা চেহারা হ'লো তা আর কী বলবো। সেই রাত্তিরেই ওঁদের তেতলার ঘরে নিয়ে আসা হ'লো ওকে। তুই জানতিস না?'

খবরটা গৌতমকে অদ্ভুতভাবে বিচলিত করলো। আরতি বা তার বাড়ি সংক্রান্ত এমন ঘটনা সে জানতো না, সেটা তাকে প্রথম দুর্গাদাসের মুখে শুনতে হচ্ছে, এতে তার আত্মাভিমানে আঘাত লাগলো। আসলে, সেদিন শ্রীপতির ঘরে ঐ বচসা হ'য়ে যাবার পর সেও মনে-মনে একটু রেগে গিয়েছিলো, মাঝে এ-ক'দিন দেখা করেনি আরতির সঙ্গে, এমনকি আরতির সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেবার কথাও ভাবেনি তা নয়। কিন্তু শ্রীপতি ঐ বাড়িতেই আছে, এ-খবর শোনামাত্র আরতিকে ছিনিয়ে নেবার, দখল ক'রে নেবার ইচ্ছেটা আবার তীব্র হ'য়ে উঠলো তার মনে। মনে হ'লো, এ-ক'দিন আরতিকে এড়িয়ে থেকে সে বড্ড ভুল করেছে, এক ভীষণ, বিপজ্জনক পথে পা দিয়েছে আরতি, সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারবে শুধু সে, গৌতম—তাই একটু চুপ ক'রে থেকে ভারিক্কি চালে বললো, 'আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম এ-ক'দিন। তা শ্রীপতির কি যক্ষ্মাই 'হয়েছে সত্যি, না কি ডায়াগনসিসে ভুল হয়েছে?'

খুব বিষণ্ণ সুরে দুর্গাদাস বললো, 'একজন স্পেশালিস্ট এসেও দেখে গেছেন। কাকাবাবুর ধরন-ধারণও গম্ভীর।'

'হুঁ, তা-ই নাকি? তা আজকাল তো স্পেসিফিক বেরিয়ে গেছে, খুব একটা দুশ্চিন্তা করবার কিছু নেই। আমার কিন্তু অবাক লাগছে যে শ্রীপতির মতো স্বাধীনচেতা মানুষ অন্য একজনদের বাড়িতে এসে উঠে আপত্তি করলো না।'

'ও আপত্তি করলেই বা শুনছে কে?' বললো দুর্গাদাস। 'অসুখটা কী তা ও নিজেই সন্দেহ করেছিলো নিশ্চয়ই—এখন নিশ্চিত জানার পর একেবারে চুপ ক'রে গেছে, ওর জন্যে যা-কিছু ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তা নিয়ে কোনো কথাই বলছে না।'

'তা ওকে হাসপাতালে সরানো হচ্ছে তো?'

'কলকাতার হাসপাতালের ওপর তেমন আস্থা নেই কাকাবাবুর। ওঁর তেতলার ঘরটিকেই হাসপাতালের কেবিন ক'রে তুলেছেন শ্রীপতির জন্য।'

'সে কী।' গৌতম পিঠ খাড়া ক'রে গলা বাড়িয়ে দিলো দুর্গাদাসের দিকে। 'বলছিস কী তুই? ঐ বাড়িতেই রাখা হবে শ্রীপতিকে? ফ্যানটা-স্টিক্! কেশব মৈত্রর কি মাথা-খারাপ হয়েছে?'

'দেখতে পাচ্ছি কেশব মৈত্র খুবই অন্যায় করেছেন তোর সঙ্গে পরামর্শ না-ক'রে।'

দুর্গাদাসের এই ব্যঙ্গে একটুও অপ্রতিভ হ'লো না গৌতম, একই রকম সুরে বলতে লাগলো, 'আমি কল্পনা করতে পারি না যে ও-রকম সাংঘাতিক ছোঁয়াচে অসুখের রোগীকে—'

'ও—সে-কথা। তা তোর অত ভয় থাকলে তুই না-হয় আর যাস না ও-বাড়িতে—তাহ'লেই হ'লো।'

'তোর বা আমার কথা হচ্ছে না—কিন্তু ও-বাড়িতেই আরো লোক আছে তো।'

'আরতির কথা ভাবছিস? তা আরতি বেশ আনন্দে আছে—'

'আনন্দে! তার মানে?'

'মানে, আরতির ভাবটা এই রকম যেন এতদিনে খুব মনের মতো একটা কাজ পেয়েছে। এই বেরোচ্ছে রোগীর জন্য কিছু কিনতে-টিনতে, এই টেলিফোন করছে, এই তেতলার ঘরের জানলার পর্দা বদলে দিচ্ছে—এখন ঝোঁক চেপেছে ছাতে টব সাজিয়ে বাগান করবে।'

গৌতমের মুখে গাঢ় হ'য়ে ছায়া পড়লো। বিড়বিড় ক'রে বললো, 'তাহ'লে এই ব্যাপার!' তারপর, একটু চুপ ক'রে থেকে, যেন নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে অনেকটা স্বাভাবিক গলায় বললো, 'ব্যাপারটার আর-একটা দিক আছে, তা আমাদের ভাবা উচিত। চিকিৎসার খরচ।'

'তার জন্য তোকে ভাবতে হবে না।'

'তুই বলছিস একা কেশব মৈত্রর ওপর এত বড়ো একটা ভার আমরা চাপিয়ে দেবো?'

'থাম তো তুই—সব ব্যাপারে ফোঁপরদালালি করিস না।'

'আশ্চর্য—আমরা যারা শ্রীপতির বন্ধু, আমাদের কি ওর জন্য কিছু করার নেই? আপনি কী বলেন, হিমেন্দু?'

হিমেন্দু একবার কেশে দ্বিধান্বিতভাবে জবাব দিলো, 'তা—আপনি কী বলেন? কী করা যায়?'

'আমরা চাঁদা তুলতে পারি নিজেদের মধ্যে, কলেজগুলো খুললে একটা চ্যারিটি-শো করতে পারি ওর চিকিৎসার জন্য- -চেষ্টা করতে পারি ওকে ভালো কোনো স্যানাটরিয়মে পাঠাতে—অনেক কিছুই করতে পারি। তোর তো এ-সব হৈ-চৈ বেশ আসে, দুর্গাদাস—লেগে যা না।'

'আমার মনে হয় না এ সবের কোনো দরকার হবে। এ-সব এঁরা পছন্দ করবেন বলেও মনে হয় না।'

'ওঁরা মানে—ঐ মৈত্র পরিবার?'

গৌতমের ভুর কুঁচকে গেলো, চোখের মণি দুটি ছোটো দেখালো একটু, পালিশ-করা বিষাক্ত গলায় সে ব'লে উঠলো, 'কিন্তু আমাদের বন্ধুর জন্য আমরা কী করবো বা না করবো তার জন্য কেশব মৈত্র বা তাঁর কন্যার অনুমতি নিতে আমরা তো বাধ্য নই। শ্রীপতি যেন তাঁদেরই সম্পত্তি, তার ভালো মন্দ সব কিছুর জন্য শুধু তাঁরাই দায়ী, তাঁদের মনের এই ভাবটা আসে কোত্থেকে জানতে পারি কি? শ্রীপতি ও-বাড়ির ছেলেও নয়, আত্মীয়ও নয়, তার জন্য বাড়িসুদ্ধু লোক হৈ-চৈ বাধাবেন—এটাকে আর যা-ই হোক যুক্তিসঙ্গত বলে না।'

'ব্যবস্থা তো ভালো হয়েছে, তাহ'লেই হ'লো। এবার অন্য কথা বল।'

'ব্যবস্থা যে রকমই হোক,' দুর্গাদাসের দিকে এক পলক তাকিয়ে গৌতম বলতে লাগলো, 'সেটা কী ভাবে হচ্ছে তাও দেখতে হবে আমাদের। তাকেই ভালো ব্যবস্থা বলে যার পেছনে আছে মানুষের বুদ্ধি, বিবেচনা, মাত্রাজ্ঞান। কিন্তু তোমরা—তুমি, মৈত্রমশাই, আর তাঁর কন্যা—এই তোমাদের যা ব্যাপার দেখছি তা নেহাৎই সেন্টিমেন্টাল, উচ্ছ্বাসের ফেনা—মাত্রাজ্ঞান দূরে থাক, কোনো কাণ্ডজ্ঞানেরও পরিচয় নেই তাতে। একজনের অসুখ করেছে, শক্ত আর ছোঁয়াচে ব্যামো, রোগীর কিছুই টাকা নেই অথচ চিকিৎসার খরচ অনেক—এ-অবস্থায় তার বন্ধুবান্ধব হিতৈষীদের কর্তব্য কী? এমন কোনো ব্যবস্থা করা যাতে সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা হয়, আর রোগ ছড়াবার আশঙ্কাও না থাকে—অর্থাৎ, হাসপাতাল। চিকিৎসার খরচ অনেকে মিলে ভাগ ক'রে নিলে সকলের পক্ষেই সহজ হয়, আর রোগীকেও বাকি জন্মের মতো আকণ্ঠ ঋণী ক'রে রাখা হয় না শুধু একজনের বা একটি পরিবারের কাছে। এই সবই ভাবা উচিত ছিলো, এখনো নতুন ক'রে ভাবার সময় নেই তা নয়। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে দুর্বলচিত্ত স্ত্রীলোকের মতো বড্ড বেশি অস্থির হচ্ছো তোমরা, বুদ্ধিমান পুরুষমানুষের মতো কাজ করছো না, কোনো বিপদের সময় সবচেয়ে বেশি যা দরকার সেই সংযমে জলাঞ্জলি দিয়েছো, বুদ্ধি তোমাদের এত ঝাপসা হ'য়ে গিয়েছে যে কিসে শ্রীপতির সত্যিকার ভালো হবে তাও বুঝতে পারছো না। এই তো তুমি, দুর্গাদাস, একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক—তুমি বলছো শ্রীপতির অসুখে তুমি এত উদ্‌ভ্রান্ত যে পরীক্ষার পড়া তৈরি করা তোমার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে। একবার ভেবে দেখছো না যে এ-দুটো বিষয়ের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ নেই, যে তুমি রোজ চোদ্দ ঘণ্টা ক'রে পড়লেও ওর অসুখ যেদিন সারবার সেদিনই সারবে, আর যদি না-সারবার হয় তাহ'লে তুমি ব্যাকুল হ'য়ে বুক চাপড়ালেও কোনো সুবিধে হবে না। রোগীর শুশ্রূষার জন্য তোমার ডাক পড়েনি তোমার কিছুই করার নেই এ-ব্যাপারে, অনর্থক তুমি নিজের সময় নষ্ট করছো, নিজের যেটুকু উপকার করতে পারো তারও সুযোগ নিজেকে দিচ্ছো না। তেমনি—ঐ যে বললে আরতি "আনন্দে" আছে, ছুটোছুটি করছে কারণে অকারণে, ছাদে বাগান করার স্বপ্ন দেখছে- এগুলো আমার কানে রীতিমতো শকিং শোনালো, অতি বাজে ধরনের রোমান্টিক—সত্যি-ব্যাপারটা কী, সে-বিষয়ে কোনো ধারণাই এতে দেখা যায় না। একজন অসুস্থ মানুষের ভালো করা নয়--আমরা কারো জন্যে কিছু করছি, আত্মত্যাগ করছি,

সেই ভাবটাই বড়ো হ'য়ে উঠছে, আর এমনিতর ভাবালুতার জন্যই আমাদের দেশের আজ এই অবস্থা।'

'আমার পক্ষে গুরুপাক হ'য়ে যাচ্ছে, গৌতম,' হালকা গলায় হাসলো দুর্গাদাস, 'এক দমকে এতটা উপদেশ হজম হবে না। আমি চলি।—এই যে, দামটা নিয়ে যাও।'

পকেটে হাত দিয়ে গৌতম বললো, 'দামটা আমারই দেবার কথা দুর্গা।'

'একই কথা—' বিল চুকিয়ে দুর্গাদাস উঠে দাঁড়ালো।

হিমেন্দু তাড়াতাড়ি বললো, 'আমাকেও যেতে হবে.' এতক্ষণ নেহাৎ ভদ্রতা ক'রেই ব'সে ছিলো সে উঠে পড়ার সুযোগ পেয়ে খুশি হ'লো। 'দুর্গাদাস কোনদিকে?'

'আমি একটু আরতিদের ওখানে যাচ্ছি। তুমি?'

'আমিও ঐদিকেই যাবো ভাবছিলাম। মানিকতলার মোড়ে যে-পুরোনো বইয়ের দোকানটা আছে—'

'তাহ'লে চলো একসঙ্গে যাই। যদি দশ মিনিট বেণীমাধব মল্লিক রোডে থামতে তোমার আপত্তি না থাকে তাহ'লে আমিও বইয়ের দোকানে তোমার সঙ্গী হ'তে পারি।'

'আমি—আমি ও-বাড়িতে গিয়ে কী করবো? তুমি পরে বরং—'

'আরে চলো না!'

আরতির সঙ্গে সেই টেলিফোনের আলাপ হিমেন্দুর মনে প'ড়ে গেলো। 'একদিন আসেন তো খুশি হবো—আমি ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে।' নেহাৎই ভদ্রতা অবশ্য, কিন্তু মুখ ফুটে অতটাই যখন বলেছিলো তখন একদিন বোধহয় যাওয়াই উচিত। আর সেই সঙ্গে শ্রীপতির খোঁজটাও নিয়ে আসা যায়।

'বড্ড বেলা হ'য়ে গেছে না?' ক্ষীণ আপত্তি করলো হিমেন্দু।

'এই তো মাত্র বারোটা—একটা-দেড়টার আগে খাওয়া হয় না ও-বাড়িতে। গৌতম এখন বাড়ির দিকে?—না কফি-হাউসে বসবে আর-একটু?'

'চল আমিও যাই তোদের সঙ্গে—আরতির সঙ্গে একটু দরকার আছে আমার।'

'ওকে সংশোধন করতে চাস তো? দ্যাখ চেষ্টা ক'রে।'

দুর্গাদাসের এই মন্তব্যটি নিঃশব্দে উপেক্ষা করলো গৌতম, বিপুল গাম্ভীর্য নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ভেবেছিলো আজ বিকেলের দিকে যাবে—কিন্তু আরতিকে বলার কথাগুলো তার মনের মধ্যে এমনভাবে ঠেলে-ঠেলে উঠছে যে অতগুলো ঘণ্টা অপেক্ষা করা অসম্ভব ব'লে মনে হলো সেই মুহূর্তে। এই তো—কয়েকদিন সে একটু আড়ালে ছিলো, আর তার অনুপস্থিতির সুযোগে কী একটা কাণ্ড ক'রে ফেললো আরতি, এক যক্ষ্মারোগীকে নিজের বাড়িতে এনে তুললো। বোকামি! পাগলামি! কিন্তু সে কাছাকাছি থাকলেও এই পাগলামি থেকে বিরত করতে পারতো কি আরতিকে? কথাটা সে যতবার ভাবছে ততবার জ্বালা ক'রে উঠছে মনের মধ্যে। আরতির ওপরে শ্রীপতির প্রভাব যে খুব জোরালো, এই কথাটা সে স্পষ্ট বুঝে নিয়েছিলো সেদিন, আর এও বুঝেছিলো যে শ্রীপতির প্রভাব তার নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে অনুকূল হবে না। ওরা দু-জন যে একই বাড়িতে বাস করছে এই চিন্তা এখন অসহ্য লাগছে তার, মনে হচ্ছে আরতির মনে এখন যে-সব বিকৃত ধারণা জন্ম নিতে পারে তা যক্ষ্মার বীজাণুর চেয়েও ভয়াবহ। এখন তার কর্তব্য—এই 'কর্তব্য' কথাটাকে খুব ভালোবাসে গৌতম—আরতিকে রক্ষা করার জন্য উঠে-প'ড়ে লাগা, এমনকি আত্মাভিমান পর্যন্ত ভুলে গিয়ে আরতির ভালোর জন্য চেষ্টা করা, যাতে নিজেকে নষ্ট না করে সে, শেষ পর্যন্ত সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন জীবন বেছে নেয়। 'নষ্ট', 'সুস্থ', 'পরিচ্ছন্ন'—এই বিশেষণগুলি বার-বার যাওয়া-আসা করছে গৌতমের মনে, যে-বিপদ এতদিন শুধু আনুমানিক ছিলো এখন তা যেন স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো, তার তপ্ত মস্তিষ্কে বেড়ে উঠতে লাগলো মিনিটে-মিনিটে। আজ—এখনই—এখনই এর একটা নিষ্পত্তি তাকে ক'রে ফেলতে হবে।

মিনিট দশেক পরে তিনজনে বাস্ থেকে নামলো হেদোর মোড়ে। তখন তপ্ত বেলা, রোদ্দুর যেন চাবুক মারছে শহরটাকে।

দোতলায় বসার ঘর, জানলা ভেজানো, পাখার হাওয়ায় সুশীতল। এক কোণে নিচু আওয়াজে রেডিও চলছে, আবহাওয়াটি শান্ত ও নিরিবিলি। হাতের মাসিকপত্র নামিয়ে রেখে যে-মেয়েটি এগিয়ে এলো তাকে আরতি ব'লে চিনতে একটু সময় লাগলো হিমেন্দুর। স্নান ক'রে এসেছে একটু আগে, পরনে বেগনি পাড়ের শাদা শাড়ি—আজ যেন ছোটো দেখাচ্ছে তাকে, আকারেও ছোটো, বয়সেও ছেলেমানুষ।

'এই যে, হিমেন্দু এসেছেন। খুব ভালো। আমি কিন্তু বন্দনাকেও আশা করেছিলাম।'

'আমি—আমি হঠাৎ চ'লে এলাম এদের সঙ্গে। শ্রীপতির অসুখ শুনলাম। কেমন আছে?'

'ভালোই,' সংক্ষেপে জবাব দিলো আরতি। 'তা গৌতম, তোমার কী খবর? মাঝে তোমাকে দেখিনি কয়েকদিন?'

ঘরে ঢোকামাত্র আরতিকে অমন শান্ত ও সুখীভাবে ব'সে থাকতে দেখে (রেডিও খুলে, মাসিকপত্র হাতে নিয়ে, যেন দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই!) গৌতমের মেজাজ আরো চ'ড়ে গিয়েছিলো, কিন্তু উদ্যত ক্রোধ চাপা দিয়ে হালকা সুরে বললো, 'শ্রীপতির সঙ্গে একবার দেখা হ'তে পারে কি?'

'নিশ্চয়ই—যদি সকাল ন-টায় আসো কোনোদিন, নয়তো বিকেল পাঁচটা নাগাদ।'

'কড়া হুকুম?'

'ডাক্তারের হুকুম। নড়চড় হবার জো নেই।'

'তোমাদের পক্ষেও না?' বাঁকা হাসলো গৌতম।

'"আমরা" মানে কী? আমি তেতলার ঘরে কমই যাই, কারো অসুখ দেখতে ভালো লাগে না আমার। আর দোহাই তোমাদের—এ-বাড়িতে শ্রীপতি অসুস্থ হ'য়ে আছে ব'লে তোমরাও হাঁড়িমুখ ক'রে থেকো না। বোসো—কথাবার্তা বলা যাক। হিমেন্দু দাঁড়িয়ে কেন?'

দরজার বাইরে করিডরে এক আলমারি বই হিমেন্দুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো, সসংকোচে বললো, 'আপনার বইগুলো একটু দেখতে পারি কি?'

'নিশ্চয়ই। বইগুলো ঠিক আমার নয় অবশ্য—'

'কোনো অসুবিধে হবে না?'

'না, না, অসুবিধে কী—আসুন।' আরতির সঙ্গে করিডরে আসামাত্র হিমেন্দুর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।—'খুব ভালো-ভালো বই দেখছি।'

আলমারি খুলে দিলো আরতি। 'আপনার যেটা ইচ্ছে পড়তে নিতে পারেন। আচ্ছা, আপনি দেখুন—আমরা পাশের ঘরে আছি।'

হিমেন্দু দেখলো, অনেকগুলো বইয়ে শ্রীপতির নাম লেখা, পাশে আরতির, কোনো-কোনোটায় শুধু আরতির নাম, কিন্তু হাতের লেখাটা শ্রীপতির ব'লে মনে হ'লো, কোনো-কোনোটায় আরতি লিখে রেখেছে শ্রীপতির নাম। ঐ লেখাগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে একটা রঙিন গল্প শুনতে পেলো হিমেন্দু, মুহূর্তের জন্য উন্মন হ'লো, মনে হ'লো ভালোবাসবার ও ভালোবাসা পাবার মতো ভালো জিনিশ জীবনে আর-কিছু নেই। কিন্তু একটু পরেই ছাপার অক্ষরের প্রলোভনে তার ব্যক্তিগত ইচ্ছে সে ভুলে গেলো।

ঘরে এসে আরতি দেখলো, দুর্গাদাস আর গৌতম পাশাপাশি সোফায় ব'সে আছে। তাদের মুখোমুখি ব'সে আধো কৌতুকের সুরে আধো গম্ভীরভাবে বললো, 'আমি গৌতমকে একটা কথা বলতে চাই।'

'আমি কি উঠে যাবো এখান থেকে?' হাসলো দুর্গাদাস।

'না, না, তোমার থাকাই ভালো। তোমার সামনেই পরীক্ষাটা হ'য়ে যাক।'

'পরীক্ষা?'

'হ্যাঁ, পরীক্ষা। গৌতমকে নিয়ে।'

গৌতম একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলো আরতির দিকে।

'গৌতম, আমি তোমাকে সেদিন যা বলেছিলাম তা বিশ্বাস করোনি বোধহয়?'

'আমাকে বলছো?' দাঁত দেখিয়ে হাসলো। 'কোনদিন? কী বলেছিলে বলো তো?'

'ও, ভুলে গেছো? আমি মনে করিয়ে দেবো?' আরতি গৌতমের চোখে চোখ রাখলো।

কফি-হাউস থেকে মনের যে-ভাব নিয়ে গৌতম বেরিয়েছিলো, ইতিমধ্যে তার একটু বদল হয়েছে, আরতির সঙ্গে মুখোমুখি আবার ঝগড়া করতে সে চায় না—অন্তত এক্ষুনি নয়, এখানে নয়। তাই সে নরম ক'রে বললো, 'আমি এখন তর্ক করতে আসিনি, শ্রীপতির কথা বলতে এসেছিলাম। আমি ধারণাও করিনি ওর অসুখটা এত সাংঘাতিক—'

'অসুখের কথা থাক,' আরতি বাধা দিলো গৌতমের কথায়। 'আমি যা বলছি শোনো। একটা ছোট্ট পরীক্ষা নিতে চাই তোমার—যদি তাতে উৎরে যাও তাহ'লে তুমি যা বলবে আমি তা-ই করবো। রাজি?'

গৌতম উদাসীনভাবে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লো গোল ক'রে। ভেতরে-ভেতরে কাৎরাচ্ছিলো সে, তাকে হেনস্তা করার জন্য আরতি আবার কী-ফন্দি এঁটেছে তা আড়চোখে বুঝে নেবার চেষ্টা করছিলো, কিন্তু মুখের ভাবটি তার এই রকম যেন এ-সবে তার কিছুই এসে যায় না, তার উদাসীনতা এতই গভীর যে আরতিকে বাধা দেবারও কোনো চেষ্টা করছে না সে। যদি পদে-পদে হিশেব ক'রে চলাটা তার অভ্যেস না হ'তো, তাহ'লে সে এক্ষুনি এ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে সহজভাবে নিশ্বাস নিতে পারতো, কিংবা আরতিকে মনে-মনে যা বলছে তার কিছু অংশ মুখে উচ্চারণ ক'রে মনের ভার লাঘব করতে পারতো—কিন্তু কিছুতেই নিজেকে সে এমন-কিছু করতে দেবে না যাতে মনে হয় সে ভয় পেয়েছে বা রণে ভঙ্গ দিচ্ছে বা নিজের ওপর আর শাসন বজায় রাখতে পারছে না। মুখোমুখি হ'তে পারাটাই তার মনে এক রকমের নৈতিক জয়; সে তাই অনেক আগেই মনে-মনে ঠিক ক'রে নিয়েছিলো যে আরতি যদি নির্লজ্জ হয় সে আরো বেশি নির্লজ্জ হ'য়ে তাকে হারিয়ে দেবে।

উঠে গিয়ে একটি বড়ো ফোটোগ্রাফ নিয়ে এলো আরতি। গৌতমের কাছে দাঁড়িয়ে বললো, 'গৌতম, এই ছবিটা তোমাকে দেখাতে চাই।'

দূর থেকে এক ঝলক দেখেই ছবিটা চিনতে পেরেছিলো গৌতম; শক্ত মুখে অন্য দিকে তাকিয়ে রইলো।

'বাঃ! দ্যাখো না! এদিকে তাকাও। হাতে নিয়ে দ্যাখো। এই সেদিনও এত ভালোবাসতে, আর এখন ছবি দেখলেও মুখ ফিরিয়ে নাও?'

'অসহ্য!' গৌতম লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো, রুমালে একবার মুখ মুছে বললো, 'যদি ভেবে থাকো, আরতি, যে এমনি নির্যাতন ক'রে আমার হাত থেকে রেহাই পাবে তাহ'লে ভুল করেছো। এক এক ধরনের প্রতিশোধ আছে যা পুরুষ কিছুতেই নিতে পারে না, তা জেনেই তুমি এই সুবিধে নিচ্ছো আমার ওপর। ধরো, আমি যদি এর উত্তরে তোমার অতীত ঘাঁটতে শুরু ক'রে দিই, কিংবা তোমার বর্তমানেরই বিশ্লেষণ করি, তাহ'লে তোমার দাঁড়াবার জায়গা কোথায় থাকে? সত্যি কথা, আমি একজনকে ছেড়ে আর একজনের দিকে ছুটেছি, কিন্তু তোমার মতো একসঙ্গে দশজনকে নিয়ে---' হঠাৎ থেমে গেলো গৌতম।

ঝকঝকে চোখে গৌতমের দিকে তাকালো আরতি।—'থামলে কেন? বলো।'

'বলেছিলাম—একজনের হাতে হাত রেখে বেড়ানো, আর একজনকে প্রেমপত্র লেখা—এ-সব অন্তত আমার মাথায় আসে না!'

'প্রেমপত্র আবার কাকে লিখলাম? ও—' আরতি নিচু গলায় হেসে উঠলো, 'শ্রীপতি সেদিন যে-চিঠির কথা বলছিলো সেটা ভোলোনি দেখছি। যেহেতু তুমি চিঠিটা দ্যাখোনি, তাই সেটাকে প্রেমপত্র ব'লে ধ'রে নিলে? বেশ, যদি প্রেমপত্র হয়, তা নিয়েই বা তুমি কথা বলার কে? আমি তো তোমাকে এমন কথা দিইনি যে কাউকে কোনো চিঠি লিখবো না! দেখছো দুর্গাদাস, তোমাদের বন্ধুর ব্যবহার দেখছো? এর হাতে যে-মেয়ে পড়বে তার দুর্দশা ভেবে কি কষ্ট হচ্ছে না তোমার?'

'কী বাজে—!' দুর্গাদাস হাত নাড়লো, 'তোমাদের এ-সব ঝগড়া-ঝাঁটিগুলো লোকের সামনে না ক'রে পারো না? আর যদি এমন হয় যে তোমাদের দেখা হ'লেই ঝগড়া বেধে যায় তাহ'লে তোমরা

বাপু হয় বিয়ে ক'রো ফ্যালো, নয় মুখ-দেখাদেখি বন্ধ ক'রে দাও—আমি সোজা কথা যা বুঝি বললাম। এ-রকম ভাবে ঝুলিয়ে রাখাটা খুব বিশ্রী হচ্ছে।'

'ঠিক।' ছোট্ট তালি দিয়ে আরতি বললো। 'দুর্গাদাস ঠিক কথা বলেছে। এখন কথাটা হচ্ছে কে কাকে ঝুলিয়ে রাখছে? গৌতম, তুমি আমাকে খারাপ ব'লে জেনেও বিয়ে করতে চাচ্ছো কেন তা বলতে পারো কি? না কি এখন আর চাচ্ছো না? যদি এই ক-দিনে তোমার মনের বদল হ'য়ে থাকে তাহ'লে বলো—ব'লে ঐ সিঁড়ি দিয়ে আস্তে-আস্তে নেমে যাও, আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে এই ছবিটাকে আবার দেরাজে তুলে ফেলি। কিন্তু যদি তুমি না যাও, গৌতম, যদি এর পরেও বীরের মতো দাঁড়িয়ে থাকো, তাহ'লে আমি বুঝবো আমার বিষয়ে তোমার অভিপ্রায় একই আছে, আর তাহ'লে তোমাকে ছোট্ট একটা পরীক্ষা ক'রে নেবো—এখনই। কী, কিছু বলছো না?'

বলতে-বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠলো আরতি, গৌতমের ঠিক মুখোমুখি দাঁড়ালো। একটি উষ্ণ আভা ছড়িয়ে পড়েছে তার মুখে, তার ঘন নিশ্বাসের হাওয়া গৌতমকে ছুঁয়ে যাচ্ছে যেন। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার কামনার ঢেউ উঠলো গৌতমের বুকে, মনে হ'লো ঐ শরীরটাকে কাছে পাবার জন্য কিছু নেই যা সে করতে না পারে। দুই হাত বুকের ওপর জোড় ক'রে দৃঢ়তার সঙ্গে বললো, 'বেশ। পরীক্ষা করো। আমি পালাচ্ছি না।'

'রাজি?' খুশিতে জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো আরতি, দুর্গাদাসের দিকে ফিরে বললো, 'এই ছবিটা তুমি আগে দেখেছিলে, দুর্গাদাস?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না, দেখি—' হাত বাড়িয়ে ছবিটা কাছে নিয়ে ঝুঁকে প'ড়ে দেখতে লাগলো দুর্গাদাস - 'বাঃ, বেশ তো! সুন্দর ছবি। না, আগে দেখেছি ব'লে মনে পড়ছে না। ক'বেকার তোলা এটা?'

'আমার সঙ্গে বন্দনার খুব বন্ধুতা ছিলো তখন।'

'বুঝেছি। তা ছবিতে আরো ভালো দেখাচ্ছে বন্দনাকে—তাই না?' হাত বাড়িয়ে ছবিটাকে একটু দূরে ধরলো দুর্গাদাস, আরো ভালো ক'রে দেখবে ব'লে।

দু খানা বই হাতে ক'রে ঘরে এলো হিমেন্দু, থমকে দাঁড়ালো হঠাৎ। ঐ ছবি কেন দুর্গাদাসের হাতে? একটু আগে বন্দনার নাম কানে এলো না? কী হচ্ছিলো এখানে? কী হচ্ছে? আবার কোনো প্রণয়কলহ? ব্যাপারটা বোঝার জন্য একজন থেকে অন্যজনের মুখের দিকে সে তাকালো, আর তারপর আরতিকে যা বলতে শুনলো তা যেন বিদ্যুতের মতো আঘাত করলো তার শরীরে।

—'একটা ছোট্ট কাজ করবে, গৌতম? এই ছবিটাকে মেঝেতে ফেলে তিনবার লাথি মারবে?'

গৌতমের মুখে এমন টকটকে লাল হ'য়ে উঠলো যে তাকে প্রায় কালো দেখালো, আর দুর্গাদাস চেঁচিয়ে উঠলো, 'তুমি বলছো কী, আরতি?'

'বেশি কিছু না—এই ছবিটার ওপর তিনবার লাথি মারবে গৌতম। জানো তো, দুর্গাদাস, গৌতমের কোনো কুসংস্কার নেই, সে জানে এই ছবিটা এক টুকরো কাগজ মাত্র, নিষ্প্রাণ, জড় পদার্থ অতএব ওটাকে মাড়িয়ে দিলে কী-বা এসে যায়। পা দিয়ে ফুটপাত মাড়িয়ে চলি আমরা, মাটির ঢেলা গুঁড়ো ক'রে দিই - তার সঙ্গে এই ছবিটার তো কিছু তফাৎ নেই। কোনো সত্যিকার ক্ষতিও হচ্ছে না—এটা নষ্ট হ'লে আরো অনেক কপি পাওয়া যাবে।- দাও আমাকে,' দুর্গাদাসের হাত থেকে ছবিটা নিয়ে মেঝের ওপর শুইয়ে দিলো আরতি, বন্দনার সুশ্রী মুখটি সীলিঙের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলো 'গৌতম, কোথায়? তিনটি লাথি শুধু আর তারপরেই তুমি রঙিন চিঠি ছাপতে দিতে পারো।'

'কী পাগলামি হচ্ছে, আরতি।' দুর্গাদাস হাত বাড়ালে, ছবিটা তুলে নিতে, কিন্তু আরতি দু হাতে বাধা দিলো -'তোমাদের মতো মুর্গির কলজে নিয়ে গৌতম বর্ধন জন্মায়নি। দ্যাখো না, এখনই সে তার আশ্চর্য পৌরুষের প্রমাণ দেবে তোমাদের সামনে।'

একটু সময় কারো মুখে কথা নেই, ঘর স্তব্ধ। চশমার পেছনে হিমেন্দুর চোখ দুটো বড়ো-বড়ো হ'য়ে উঠেছে, আর সেই চোখ মেঝেতে শোয়ানো বন্দনার ছবি থেকে সে সরাতে পারছে না, তার মনে হচ্ছে

এখনই দম বন্ধ হ'য়ে ম'রে যাবে সে। আর গৌতম দাঁড়িয়ে আছে হাতের মুঠো চেপে, ঘাড় বেয়ে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম নামছে তার জামার তলায়, ব'য়ে যাচ্ছে শিরশির ক'রে মেরুদণ্ডের ওপর দিয়ে, অসহ্য গরমে তার গালের ওপর পিন ফুটছে যেন, তার সারা শরীর পাথরের মতো ভারি, একটি আঙুলও যেন নড়াতে পারছে না। মনে-মনে সে বলছে—'ছী-ছি, শেষটায় এই ফাঁদে আমি ধরা দিলাম!' আবার ভাবছে—'তাতে কী। আমি করবো, তা-ই করবো, আরতি আমাকে বোকা ভাবতে পারে মনে-মনে, কিন্তু এর পরে বিয়ে না-ক'রে তো পারবে না!'—কিন্তু যতবার সে পা তুলতে চেষ্টা করছে ততবার মনে হচ্ছে কে যেন তাকে পেরেক ঠুকে আটকে রেখেছে মেঝেতে।

কোমরে হাত রেখে, মাথাটি একটু পেছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে আরতি বললো, 'গৌতম, এসো। আমাকে লজ্জা দিয়ো না। এগিয়ে এসো। এত বুদ্ধি তোমার, এত যুক্তির তেজ, আব এই সহজ কাজটুকু পারবে না! পা তোলো, বলছি। তোলো পা!'

গৌতমের লম্বা শরীরে হঠাৎ উত্তাল একটা ভঙ্গি হ'লো, চোখ-মুখ হিংস্র হ'য়ে উঠলো তাব, যেন কোনো বন্য জন্তু শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়ছে। শুধু তিনবার নয়, দশবার, কুড়িবার, পঞ্চাশবার লাথি মেরে-মেরে ছবিটাকে থেৎলে দিতে পারতো সে, কিন্তু সেই মুহূর্তে মেঝের ওপর উপুড় হ'য়ে পড়লো হিমেন্দু, ছবিটাকে বুকে চেপে ধ'রে মেঝেতে ব'সে প'ড়ে দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ ঢাকলো। একটা আর্তস্বর বেরোলো তার গলা দিয়ে, কান্নার বেগে ফুলে উঠলো তার শবীব, কয়েক সেকেন্ড বাদ দিয়ে-দিয়ে একটা চাপা কষ্টের শব্দ বেরোতে লাগলো তার গলা দিযে। তাব দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গৌতম হঠাৎ শূন্যে হাত ছুঁড়ে ব'লে উঠলো, 'তুমি আমাকে রক্ষা কবলে, হিমেন্দু! তুমি আমাকে উদ্ধার করলে!' অদ্ভুত শোনালো তার কণ্ঠস্বর, যেন তার বাকযন্ত্রের একটা অংশ বিকল হ'যে গেছে, কিংবা যেন সে পাগল হ'য়ে গেছে এই মুহূর্তে। দাঁতে দাঁত ঘ'ষে আবার বললো, 'ডাইনি!' তোর মুখ আব দেখবো না!' নিচু হ'য়ে দুই হাতে হিমেন্দুকে টেনে তুললো, তাকে হাতে ধ'বে আস্তে নিযে গেলো দবজাব দিকে। দু-জনে আর কোনো দিকে না-তাকিয়ে আস্তে-আস্তে সিঁড়ি দিযে নেমে গেলো।

ঠোঁটের কোণে কৌতুক নিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে বইলো আবতি।

দ্বিতীয় খণ্ড

১

আস্তে চলছিলো সে, স্টিয়ারিং হুইলে আলগোছে হাত রেখে, পিঠ এলিয়ে, মাঝে-মাঝে চোখে বুজে দু-চার সেকেন্ড ঝিমিয়ে নিয়ে—তখন সবেমাত্র ভোর, ছায়া স'রে যাচ্ছে কেঁপে-কেঁপে, আলো-জ্বলা প্রথম ট্রামগুলো যাত্রীহীন, ফুটপাত ফাঁকা, আর রাস্তায় যাদের সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে তারা কাগজের হকার (তারই সমব্যবসায়ী বলা যায়)—সাইকেলে চেপে দিগ্বিদিকে ছুটছে, আজ একটা দিনের মতো দিন তাদের, একটা কাগজও ফেরৎ হবে না। শান্ত প'ড়ে আছে চৌরঙ্গি, তার অ্যাম্বাসেডর যেন হাওয়ায় ভেসে চলছে। একটু আগে জল দিয়ে গেছে রাস্তায়, অ্যাসফল্ট স্নিগ্ধ কালোবরন। ঝাপসা আলোয় রংটা ভালো লাগলো তার, এক ঝাঁক উপমা মগজের মধ্য দিয়ে উড়ে গেলো। মেঘের মতো—হাতির মতো—তালফলের মতো—গর্ভিণীর স্তনের বোঁটা ঘিরে যে-গোল, কালো প্রলেপটি পড়ে, তেমনি। কালিদাসে পড়া—চোখেও দেখেছিলো, ময়না যখন মা হ'তে চলেছে, যখন সে নতুন মা হ'লো। সারারাত ঘুমোয়নি, একটানা আঠারো ঘণ্টা আপিশে—আর এখন এই আলো-আঁধারি ভোর, অঘ্রানের শিরশিরে হাওয়া—খুব হালকা কোনো নেশার মতো। চমৎকার ভান—যেন পৃথিবীটা সুন্দর, যেন নতুন দিন মানুষের জন্য আনন্দ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কতক্ষণ? আর দেড় ঘণ্টা, দু-ঘণ্টা : তারপরেই শহর উতরোল, কর্কশ দিন, গরম তর্ক ঘরে-ঘরে। কিন্তু তার কোনো অংশ নেই ও-সবে ; তার উত্তেজনা সে আপিশে রেখে এসেছে। পশ্চিম-বাংলার মন্ত্রীসভায় সংকট—দল, উপদল, টুকরো-দল, জোড়া দেবার চেষ্টা, ভেঙে দেবার চেষ্টা, ছিঁড়ে যাবার টান—এ-সব নিয়েই ছিলো সে এতক্ষণ, একটানা আঠারো ঘণ্টা—প্রায়। দু-বার বেরিয়েছিলো শুধু একটু আত্মিক উজ্জীবনের জন্য—চট পট একটা-দুটো গিলেই আবার আপিশ : এ-রকম একটা সময়ে, যখন এই ঘটনাময়ী কলকাতাতে আরো একটা বড়ো খবর তৈরি হচ্ছে, তখন সে হাজির না-থাকলে চলবে কেন—কে সাজাবে খবরগুলোকে আরো বেশি চমকপ্রদ ক'রে, কে জোগাবে লঙ্কা-ঝাল-মিষ্টি-মেশানো চাটনি—দু-দিকে বাঁকিয়ে, চারদিক বাঁচিয়ে, দশ দিক বাঁচিয়ে কে লিখবে এডিটরিয়েল—সে ছাড়া—সে, শ্রীপতি ভদ্র, সাংবাদিকতার এক তথাকথিত টেক্কা তাস, 'সুপ্রভাত'-এর বার্তা-সম্পাদক, সাড়ে-চার লক্ষ স্বদেশবাসীর প্রভাতী আফিঙের জোগানদার?

'বার্তা কী?' 'কাল প্রাণীসমূহকে রান্না করছে, রাত্রি দিন তার ইন্ধন, মাস ঋতু তার হাতাখুন্তি। এ-ই বার্তা।' আমরা নিজেরাই নিজেদের আহার করছি।—কিন্তু কোনো আসল খবর কাগজে বেরোয় না, তা লুকিয়ে থাকে আমাদের মনের মধ্যে, বুকের তলায়, যদি না দৈবে ধরা পড়ে কোনো কবিতায়, গানে, উপন্যাসে। কেন একটা উপন্যাস লেখো না, শ্রীপতি, আর-একটা, শেষবারের মতো? খুব সহজে আরম্ভ ক'রে দাও · 'হঠাৎ বহুদিন পরে তার সঙ্গে আমার দেখা হ'য়ে গেলো।' বা—'হঠাৎ বহুদিন পরে দেখা হ'য়ে গেলো জয়ন্তীর সঙ্গে সুব্রতর।' জয়ন্তী? সুব্রত? বড্ড সাধারণ হ'য়ে গেলো না নাম দুটো? তা হ'লোই বা, নাম নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট কোরো না, আরম্ভ ক'রে দাও। প্রথম বাক্য...দ্বিতীয়...তৃতীয়... প্রথম প্যারাগ্রাফ...আস্তে-আস্তে এগিয়ে যাও এমনি ক'রে। অদ্ভুত : আপিশে আমার কলম যেন তুরঙ্গম, কিন্তু অন্য কিছু লিখতে গেলেই তা কচ্ছপের গতি পায়। তা হোক : রোজ তিন—দুই—এক পৃষ্ঠা, তা তো হ'তে পারে? রোজ এক পৃষ্ঠা হ'লেও ছ-মাসে শেষ হ'য়ে যায়—মাত্র ছ-মাস। শুধু মনে একটু জোর আনো, শ্রীপতি, বিশ্বাস আনো নিজের ওপর, নতুন-বিয়ে-হওয়া যুবকের মতো আগে থেকেই ভয় পেয়ো না, ভয় পেলে সমর্থ লোকেরও তাক ফশকে যায়। তাছাড়া, এটা নিয়ে তেমন মুশকিল নেই তোমার, কেননা এর আরম্ভ এখন অতীত, তাই তোমার জানা, আর এর কোথায় শেষ

তাও তোমার অজানা নয়, কেননা এটা তোমার নিজেরই জীবন। অজানা নয় কেন? আমি কি জানি কাল আমার কী হবে? আমি কি জানি আর দু-মিনিট পরে একটা দোতলা বাস্ আমাকে ইঁদুরের মতো থেঁৎলে দেবে না? অন্তত এটুকু জানো যে তুমি এখন শান-বাঁধানো শড়ক দিয়ে চলেছো—এই চৌরঙ্গি রই মতো কোনো রাস্তা ধরা যাক—কোথাও আর এবড়ো খেবড়ো নেই, নেই ডাইনে-বাঁয়ে অলিগলির আবছায়া—মানে, তোমার জীবনে আর নতুন কিছু ঘটবে না। তা-ই লেখো, সেটাও উপন্যাসের বিষয় হ'তে পারে।—কিন্তু, তা-ই যদি তাহ'লে...আবার কেন দেখা হ'লো?

বাঁয়ে বেঁকলো শ্রীপতি, পার্ক স্ট্রিটে পুবের আকাশ লাল, একটি সোনালি তীর হঠাৎ এসে বিঁধলো তার চোখে, তার গাড়ির কাচে ঝিলিক তুলে মিলিয়ে গেলো। এমনি এক মুহূর্তে উপন্যাসটা শুরু হ'তে পারে ; আমার নায়ক (চলতি বুলিতে অপনায়ক) আঠারো ঘণ্টা আপিশে কাটিয়ে এইমাত্র বেরিয়েছে, রাত জেগে হালকা তার শরীর, চোখ অলস, যান্ত্রিক হাতে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছে। আশ্চর্য—তাহ'লে বাড়ি ব'লে কিছু আছে তার, নিজের গাড়িও আছে? সে নয় আর এক অনিশ্চিত, অস্থির যুবক যার সহ্য হচ্ছে না জীবন, অথচ যে মৃত্যুকেও ভয় পায়? তার কি বৌ আছে ঘরে : নাম কী? দেখতে কেমন? ও-সব পরে হবে, আগে আসল ব্যাপারটা ঠিক করা যাক : কখন দেখা হবে নায়িকার সঙ্গে (সে কিন্তু অপনায়িকা নয়)—কোথায় দেখা হবে? ধরা যাক সকাল থেকে অনেক কিছু করলো সে : বাড়িতে বৌয়ের সঙ্গে গতানুগতিক ঘণ্টাখানেক, এক বন্ধুর বাড়িতে গতানুগতিক আড্ডা, আপিশে ব'সে লিখলো একটি গতানুগতিক এডিটরিয়েল, তারপর গতানুগতিক নিউ-ব্রিস্টল—তারপর—সন্ধের পরে—কোথায়?

হঠাৎ আমি তাকে দেখতে পেলাম—অন্তত তা-ই মনে হ'লো আমার, তক্ষুনি ঠিক বিশ্বাস যদিও হ'লো না। ওখানটায় আলো কম, মাঝে-মাঝে আড়াল—কোনো কালো-কোর্তা-আঁটা চওড়া পিঠ, বেনারসিতে বেমানান কোনো শ্বেতাঙ্গিনী। আমি তখন যে-দলটিতে প'ড়ে গেছি সেখানে প্রধান বক্তা অভিজিৎ ঘোষাল, 'ছারখার' নামক কবিতার বই ছেপে টাটকা নামজাদা, দাড়িতে চুলে লাল শার্টে জমকালো—দুটি সরল চেহারার মার্কিনী মেয়েকে সে বোঝাচ্ছে যে রাত বারোটায় নিমতলা ঘাটে গঞ্জিকাসেবনের মতো স্বর্গসুখ এল. এস. ডি.-ও দিতে পারে না—আর, মাত্র কয়েক গজ দূরে, আধো অন্ধকারে, এক বানিয়ে-তোলা অ্যাল্কহলগন্ধী ক্ষণস্থায়ী আন্তর্জাতিক কামারাদেরির মধ্যে : সে।

শ্রীপতির মগজ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেলো একটা ইলেকট্রিক হর্নের তীক্ষ্ণ গিটকিরি, একটা কুৎসিত ইংরিজি গালি ঢিলের মতো পড়লো তার তন্দ্রায়। তাকিয়ে দেখলো, একটা মেরুন রঙের জাগুয়ার তাকে ছাড়িয়ে দূরে চ'লে যাচ্ছে। কী অসভ্য লোকটা! ধাওয়া করবো নাকি পেছনে, কোনো লাল আলোয় ধ'রে ফেলে বুঝিয়ে দেবো, ইংরিজি খিস্তিবুলিতে আমিও কম ওস্তাদ নই? কিন্তু—এটা কোন জায়গা? আরে, ক্যামাক স্ট্রিট-থিয়েটার রোডের মোড়, কী হয়েছিলো আমার, আমি কি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলো শ্রীপতি, বাঁ হাতে লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরালো। আর আট মিনিটে বাড়ি : ঘুম। আমার একটা বাড়ি আছে। আর স্ত্রী। সুখী স্ত্রী। স্বামী নিয়ে গর্বিত। আমার সন্তানের মা। সংসারের কর্ত্রী। আমার শরীর আর উপার্জনের অধিকারিণী। আ—কত বোঝা, কত শেকল, কত পিছু টান! আমি কেটে পড়লাম গঞ্জিকার গুণগান থেকে, আমাকে দেখে হাত বাড়িয়ে দিলো একটি গোল মুখের ছোকরা ইংরেজ—বৃটিশ হাই কমিশনের কোনো চাকুরে ব'লে মনে হ'লো—তার মধ্যস্থতায় আমি পরিচিত হলাম ডক্টর মিস মাইট্রর সঙ্গে। দিশি সাহেব, বিলিতি সাহেব আফ্রিকান সাহেব : মসৃণ চলছে কথাবার্তা। আমার কানের ওপর দিয়ে ভেসে গেলো কিছু সাহিত্য, কিছু সিনেমা, ছিটেফোঁটা প্রান্তিক পলিটিক্স—সেই এক খবুরে-কাগুজে বুকনি (আমার চেনা, আমার ঘেন্না!), কিন্তু আরো জোলো, আরো নিস্বাদ, শুধু বলার জন্যেই বলা, মাঝে-মাঝে বলটা ছুঁড়ে দেয়া হচ্ছে আমারও দিকে, কিন্তু আমি ভদ্রতা ক'রেও কিছু বলতে পারছি না, আমার চোখ স'রে-স'রে যাচ্ছে বার-বার।

আরতি, তুমি?

আরব-ইস্রায়েল, চেক দেশের নতুন সাহিত্য, তারপর হঠাৎ জাপানি ফিল্ম। কী-অর্থ হয় এ-সবের,

কী এসে যায়? ঝ'রে পড়ছে যথাসময়ে যথোচিত মন্তব্য—তার সুন্দর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে, আধো আলোয় শাদা দাঁতেব ঝিলিক ছিটিয়ে, ছিপছিপে হাল আমলের ইংরিজিতে, মার্কিনী-ঘেঁষা অ্যাকসেন্টে—প্রমাণ হচ্ছে যে ককটেল-পার্টির আদবকায়দায় সে দক্ষ, অন্য কারো-কারো মতো (ধরা যাক আমারই মতো) শুধু মদের জন্যই আসেনি। আমার মনে পড়লো হাজরা রোডের গলির মধ্যে দোতলার ঘর, জ্বরে ঘামে শীতে গরমে আমি কাঁপছি, আমার মাথার মধ্যে আবোলতাবোল ঘূর্ণি, বালিশের তলায় একটা রক্তের দাগ-লাগা রুমাল, কেশব মৈত্র নিচু হ'য়ে পরীক্ষা করছেন আমাকে, আমার ক্লান্ত লাগছে, বড্ড—আমার ঘুম পেয়েছে, আমি ঘুমুতে পারছি না। আমি ছিলাম মৃত্যুর মুখে, তুমি আমাকে ফিরিয়ে আনলে : ভাবা যায়? ভাবা কি যায়, আমরা ছিলাম পরস্পরের জীবনের অংশ, দূরে, কাছে, ব্যক্ত, নীরব—যেন একটা টান, যা এড়ানো যায় না ; এক গোপনে-ব'য়ে-চলা সুর, যা শুনতে পায় শুধু-দু-জন? আমি, আর এই আরতি মৈত্র।

সত্যি কি দেখা হয়েছিলো? কবে? কাল? —না, কাল তো সারারাত আপিশে ছিলাম। পর্শু? তার আগের দিন? আরো আগে চ'লে যাও, শ্রীপতি, তলিয়ে যাও তোমার নিজের মধ্যে, থমকে যেয়ো না। কিন্তু না—এখন সময় নেই, আমি ল্যান্সডাউন রোড দিয়ে চলেছি, আর কয়েক মিনিটে বাড়ি। কিন্তু যদি গিয়ে দেখি বাড়িটা নেই, কোনো-আরব্যোপন্যাসেব জিন ওটাকে তুলে নিয়ে গেছে, প'ড়ে আছে শুধু কয়েক কাঠা ফাঁকা জমি পণ্ডিতিয়া রোডে? আনন্দ, যেন হাজার মাইল প্রান্তর-পেরোনো বাতাস, ব'য়ে গেলো তার বুকের মধ্যে মুহূর্তের জন্য। মিনিটখানেক খেলা করলো এই ভাবনাটাকে নিয়ে ; মনে-মনে বললো, 'সে কোথায় থাকে তাও জানা হ'লো না, হঠাৎ যেন মিলিয়ে গেলো।' আর তারপরেই এই রাজনৈতিক তোলপাড, আমার আপিশ আমাকে দখল ক'রে নিয়েছে, আমি নিশ্বাস ফেলার সময় পাচ্ছি না, কিন্তু ফাঁকে-ফাঁকে, থেকে-থেকে, অন্য এক খবর —যেন বুকের ওপর চাপ, যেন ফেটে বেরোতে চায়, সবচেয়ে জরুবি, মন্তব্যহীন, তর্কাতীত। কতবার, রাত-জাগা আঠারো ঘণ্টার মধ্যে কতবার তার মনেব ওপর দিয়ে ভেসে গেছে সেই কয়েকটি মুহূর্ত, যখন আকাশের তলায়, আধো অন্ধকাবে তাবা দাঁড়িয়ে ছিলো, মুখোমুখি, আর চারদিকে ভিড় পাৎলা হ'য়ে আসছে, কাছাকাছি আর-কেউ নেই। টুকবো কথা, টুকরো ছবি, সেই সন্ধ্যার, কখনো কোনো দূর সময়ের, যেন পাশাপাশি অতীত আব এই মুহূর্ত ; যা বলা যায় না এবং যা বলতে হয়, এ-দুটোতে জট পাকিয়ে যাচ্ছে। 'এই যে শ্রীপতি, কেমন আছো?' অদ্ভুত শোনালো তার গলায় আমার নামটা, যেন আমার নয়, অন্য কারো। 'তোমার কী খবর?' 'এই দেখছো।' 'তুমি কি এইমাত্র কোনো স্বাস্থ্যকর ঠাণ্ডা দেশ থেকে ফিরলে?' 'মাসখানেক হ'লো।' 'এখন?' চাকরি করছি—আপাতত।' 'আপাতত? আবার চ'লে যাবে?' দেখি।' আমাদের হুইস্কির গ্লাশ দুটো আবাব ভ'রে নিলাম ভ'রে নিলাম আমরা, আমি তার সিগারেট ধবিয়ে দিলাম। 'হেদোর পেছনে সেই বাড়িটা?' 'ধ'রে নিতে হবে সেটার অস্তিত্ব আছে এখনো।' 'তোমার বাবা?' এর উত্তরে একটি হাত উঁচু ক'রে ওপরের দিকে আঙুল তুললো আরতি, আমার চোখে পডলো আকাশের গায়ে ছিটোনো কয়েকটা তারা—স্থির, অবিচল, অন্তত আমরা তা-ই ভাবি তাদের। আরতিদের তেতলায় সেই একখানা ঘর, আমাব শিয়রের দিকে ছাদ, আমার চোখের সামনে বড়ো-বড়ো দুটো জানলা খোলা—আমার কথা বলা বারণ, বই পড়া বারণ, যতদূর সম্ভব নড়াচড়াও বারণ—আমি শুয়ে আছি অন্ধকারে, স্তব্ধ, জানলা দিয়ে তারার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে কিছু না-ভাবার চেষ্টা করছি। 'সেই বাড়িটা, সে কি মনে রেখেছে আমাদের?' আমি প্রায় শব্দ ক'রে ব'লে ফেলেছিলাম কথাটা, কিন্তু আমার মুখ দিয়ে বেরোলো, 'তুমি কি অনেকদিন বিদেশে ছিলে?' আট বছর—প্রায় সাড়ে-আট।' 'কোন দেশে?' 'ইংলন্ড, আমেরিকা, ক্যানাডা।' 'আমি দু-বার ঘুরে এলাম এর মধ্যে। জানতাম না যে তুমি—' কথাটা শেষ না-ক'রে তক্ষুনি আবার বললাম, 'তুমি কি ডক্টরেট ক'রে এলে?' 'করেছি একটা ছ-বছর ধ'রে টেনে-বুনে।' 'কী-দরকার ছিলো?' 'জানতে চাও?' তার চোখ আমাকে হালকা ক'রে ছুঁয়ে গেলো। আমি নিজেকে আবার দেখতে পেলাম সেই চারদিক খোলা তেতলার ঘরে, জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন আমার জীবন থেমে গেছে হঠাৎ, কিংবা এক বিন্দুতে এসে ঠেকেছে, কী-একটা ইঞ্জেকশন দেয় যার জন্য আচ্ছন্ন হ'য়ে

প'ড়ে থাকি অনেক সময়, কিন্তু মাঝে-মাঝে দেখতে পাই কেশববাবুকে, আমার মুখে থার্মোমিটার দিচ্ছেন, আমার নিশ্বাসের শব্দ শুনছেন স্টেথোস্কোপে—আর মাঝে-মাঝে, স্বপ্নের মতো, আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে আরতি, উজ্জ্বল, যেন আশায় আর আশ্বাসে গড়া এক প্রতিমা। 'তোমার বাবার কী হয়েছিলো?' 'কী-একটা শক্ত নামের অসুখ। মেরুদণ্ডের মজ্জা শুকিয়ে যায়।' 'তুমি—কাছে ছিলে?' 'ছিলাম।' 'মানে—তুমি বিদেশে যাবার আগেই—?' 'ঠিক তা নয়।' 'তিনি কি খুব কষ্ট পেয়েছিলেন?'—কিন্তু এ-কথাটাও আমার গলায় বেধে গেলো, তার বদলে গ্লাশে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বললাম, 'হুইস্কিটা এবার জোলো দিয়েছে।' 'বিদায়ের ইঙ্গিত', ঠোঁটের কোণে হাসলো আরতি। আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেলো, 'প্রায় দশ বছর পর দেখা হ'লো—তা-ই না?' আরতি আমাকে পেরিয়ে সামনের দিকে তাকালো, লম্বা পা ফেলে একটি বলিষ্ঠ পুরুষকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। কী-একটা অস্পষ্ট নাম, উভয় পক্ষের মাথা নোওয়ানো, দু-একটা অর্থহীন কথা, একটু পরে আরতি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, 'চলি তাহ'লে।' 'তোমাকে পৌঁছিয়ে দিতে পারি কি?' 'আমি বাড়ি যাচ্ছি না, একটা ডিনার আছে। আচ্ছা...চলি।' 'আরতি—' নামটা আমার নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এসে রাতের হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো। আর তারপর—এই গাড়ি, এই রাস্তা, ক্যামাক স্ট্রিট, ল্যান্সডাউন রোড, মনোহরপুকুর—বাঁয়ে, ডাইনে আবার বাঁয়ে—বাড়ি। হাওয়া হ'য়ে যায়নি, অটুটভাবে দাঁড়িয়ে আছে, নিচু পাঁচিল-ঘেরা আস্ত একটি একতলা, সামনে ঘাসের জমি, ফুলগাছে রোদ্দুর, কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে টুকটুকে লাল চওড়া বারান্দা, জানলায়-জানলায় চাঁপারঙের পর্দাগুলো শৌখিন—বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় কতই না একটি সুখী পরিবার এখানে বাস করে।

২

গোরুসমেত গয়লার কাছে হরিদাসী টাটকা-দোয়ানো দুধ রাখছে; সামনের বারান্দায়, দিদিমার মুগ্ধ ও সতর্ক দৃষ্টির তত্ত্বাবধানে, ট্রাইসিকল চালাচ্ছে খোকন—তার গায়ে লাল সোয়েটার, গাল দুটো ফুলো-ফুলো গোলাপি, হাতে একটা টিনের ভেঁপু; আর দরজার কাছে পাপোশের ওপর শুয়ে আছে ময়নার পুষ্যি বেশি-খেয়ে-খেয়ে কোঁৎকা-হ'য়ে-যাওয়া শাদা-আর বাদামি বেড়ালটা, কোনো বাদশাজাদির মতো অলস আর গোলগাল। বাবাকে দেখে টিনের ভেঁপুতে জয়ধ্বনি ক'রে উঠলো খোকন, ময়নার মা-ও বোধহয় বললেন কিছু; শ্রীপতি ফিরে তাকালো না, বেড়ালটাকে টপকে ডিঙিয়ে সোজা শোবার ঘরে চ'লে এলো। ঢোকামাত্র একটা গন্ধ—বন্ধ ঘরে ঘুমন্ত মানুষের, সারারাতের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের—বাসি, ঘন, একটু আঠা-আঠা। বাইরে দিন শুরু হ'য়ে গেছে, কিন্তু এ-ঘরে এখনো আটকে আছে ছায়া, খড়খড়িগুলো বন্ধ, খাটের ওপর মশারি ফেলা—পাছে খোকনের ঠাণ্ডা লাগে, ময়নার নিজেরও সর্দির ধাত। আমি রোজ এ-ঘরে ঘুমোই, এই গন্ধ আগে পাইনি। এইমাত্র বাইরে থেকে এলাম, তাই বোধহয়। বা হয়তো রাত জাগলে নাক আরো সূক্ষ্ম হয় আমাদের। ঘুম, যাতে বিশ্রাম, যাতে স্বাস্থ্য, তাও পুরোপুরি ভালো নয়—দাঁতে ছাতা জমে, চোখে পিঁচুটি। পাজামা প'রে নিয়ে বিছানার ধারে এলো শ্রীপতি, মশারি তুলে থমকে দাঁড়ালো। ময়না ঘুমুচ্ছে—কাৎ হ'য়ে, ঈষৎ ঠোঁট খুলে, পরনে একটা ঢিলে নাইলনের শেমিজ—বোধহয় আমিই এনে দিয়েছিলাম লন্ডন থেকে—পায়ের গোড়ালি থেকে কোমর পর্যন্ত চাদর টানা—ঘুমের তলায় গা ছেড়ে দিয়ে জোরে-জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে সে, মাঝে-মাঝে নাকের ভেতর দিয়ে শব্দ ক'রে, কিন্তু তবু যেন তার মুখ থেকে মুছে যায়নি তার সারাদিনের তৃপ্তি—স্বচ্ছল ও নিশ্চিন্ত গৃহিণীর গভীর তৃপ্তি। শোবার ভঙ্গির জন্য মোটা ভাঁজ পড়েছে কাঁধের তলায়, একটা বুক ওর কনুইয়ের খাঁজে চেপ্টে আছে। শ্রীপতি তাকিয়ে রইলো একটুক্ষণ: আমার স্ত্রী, আমি বিবাহিত। তথ্যটাকে কাজে খাটালে কেমন হয়—এক্ষুনি, আঠারো ঘণ্টা পর বাড়িতে পা দেয়ামাত্র? যেন এক রাত্রির বিচ্ছেদে আমি অস্থির, এমনি একটা ভাব আনা যায় না? একটু চেষ্টা করো, শ্রীপতি—ভেবে দ্যাখো, এটাও তোমার কর্তব্য,

এটাই তোমার স্বামিত্বের প্রমাণ। তোমার ইচ্ছে নেই, তোমার লোভ হচ্ছে না—কী এসে যায়? বিনা ইচ্ছা, শুধু কর্তব্যবোধে যে কর্ম করে, তাকেই তো বলে সচ্চরিত্র। নিষ্কাম কর্ম, আক্ষরিক অর্থে নিষ্কাম। শ্রীপতি একটা নিঃশব্দ হাসি গিলে ফেললো, আস্তে উঠে শুয়ে পড়লো স্ত্রীর পাশে, ঘুমের মধ্যে চমকে উঠলো ময়না। 'কে?' প্রায় আর্তনাদ বেরোলো তার গলা দিয়ে, হঠাৎ চমকাবার জন্য কথার সঙ্গে খানিকটা লালা তার কষ বেয়ে নেমে এলো, হাতের উল্টো পিঠে তা মুছে ফেলে বললো, 'ও, তুমি! এই এলে?' শ্রীপতি জবাব দিলো না, আরো স'রে এলো ময়নার দিকে, চুলের তলায় তার ঘাড়ের ওপর মুখ গুঁজলো। ময়না ফিরলো শ্রীপতির দিকে, ক্ষিপ্র আঙুলে শেমিজের গলা টেনে দিলো, সদ্য-ঘুম-ভাঙা ঝাপসা একটু হাসি ফুটলো তার মুখে। 'খোকনকে বাইরে পাঠিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কী দুষ্টু হয়েছে জানো তো, কাকভোরে জেগে উঠবে, আর চোখ মেলে তাকালো কি সাইকেল ছাড়া কথা নেই!' শ্রীপতির গলার একটা পেশি কাঁপলো একবার। খোকন—ন্যাকা নাম—বুড়ো বয়সে অবধি 'খোকন' শুনতে হবে বেচারাকে ; দিদিমা আবার পোশাকি নাম রেখেছেন চন্দনতরু—জঘন্য। কিন্তু আমি কিছু বলিনি —বলবোও না—আমার কী এসে যায়? 'একটু ওঠো—বিছানাটা পাট ক'রে দিই,' ব'লে ময়না উঠে পড়ার মতো ভঙ্গি করলো। 'ঠিক আছে, তুমি উঠো না।' শ্রীপতি ময়নার মাথাটা নামিয়ে আনলো বালিশের ওপর, তার গলার খাঁজে মুখ চেপে ধ'রে নিশ্বাসের সঙ্গে টানতে লাগলো ঐ ঘরের বাসি গন্ধ, ময়নার ঘুমিয়ে-ওঠা শরীরের আর নিশ্বাসের গন্ধের সঙ্গে মিশে যা মুহূর্তে-মুহূর্তে আরো কটু হ'য়ে উঠছে—মশারির তলায় প্রায় দম-আটকানো। একটু চুপ ক'রে রইলো ময়না, শ্রীপতিকে আস্তে ঠেলা দিয়ে বললো, 'আমি উঠি, খোকনের খাওয়ার সময় হ'লো। এখনই যেয়ো না,' ব'লে ময়নার কাঁধের ওপর আস্তে হাত রাখলো শ্রীপতি। 'এই রাত জাগা, আপিশে সাংঘাতিক খাটুনি—তোমার কি ঘুমও পায় না?' একটা ভঙ্গি হ'লো ময়নার শরীরে, নতুন-বৌ ধরনের, আহ্লাদি, তার ঠোঁট খুলে গেলো, এক ঝলক নিশ্বাস মিশলো শ্রীপতির নিশ্বাসে। হঠাৎ বমির মতো কিছু-একটা শ্রীপতির গলা ঠেলে উঠে এলো—অসহ্য—এই বদ্ধ ঘর, এই দুর্গন্ধ, নিশ্বাসে অন্য একজনের নিশ্বাস, শরীরের সঙ্গে শরীরের এই আটকে থাকা—সে মুক্তি চায়, চ'লে যেতে চায় অন্য কোথাও, অন্য কেউ হ'তে চায়। মস্ত একটা ঢোঁক গিললো শ্রীপতি, একটা উগ্র তেতো ঝাঁঝালো বিষ ছড়িয়ে পড়লো তার শরীরে—যেন নিজেকে শাস্তি দিচ্ছে, বলা-যায়-না এমন কোনো অপরাধের জন্য নিজেরই ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে, এমনি ক'রে সেই ঝাঁঝালো বিষ উগবে দিলো। আর তক্ষুনি, এক মুহূর্ত দেরি না-ক'রে, যেন ক্লান্তিতে গ'লে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো সে—ময়নাব শরীরের চাপে কুঁচকে-যাওয়া চাদরে, ময়নার চুলের গন্ধমাখা বালিশে গাল চেপে; টের পেলো না, ময়না কখন উঠলো, প'রে নিলো জামা-কাপড়; মশারি খুলে, শ্রীপতি শুয়ে থাকা সত্ত্বেও যতটা সম্ভব বিছানার চেহারা ফেরালো; ছড়িয়ে দিলো একটি পাট-ভাঙা চাদর তার গায়ের ওপর; জানলাগুলো খুলে দিয়ে ভারি পর্দা টেনে দিলো যাতে ঘরে টাটকা হাওয়া আসে কিন্তু আলোয় তার ঘুম ভেঙে না যায়, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ে, সিঁদুর প'রে নিলো; বেরিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিলো দরজা, তারপর খোকনের জন্য দুধ ডিম আপেল মিষ্টি সাজাতে-সাজাতে বললো, 'ওদিকে গোল কোরো না, সোনামণি, বাবা ঘুমোচ্ছেন।'

ঘণ্টাখানেক ঘুমোলো শ্রীপতি, হয়তো চল্লিশ মিনিট—হঠাৎ কার গলার আওয়াজে জেগে উঠলো। একটা কথা—ঘুমেব মধ্যে শোনা, এখনো একেবারে মিলিযে যায়নি : কী? বালিশে কান পেতে শুনলো সে : কোনো পাখির ডাক, কোনো বাঁশিতে ফুঁ—না কি তার নিজেরই গলা—সে-ই কি কিছু ব'লে উঠছিলো ঘুমের মধ্যে, স্বপ্নে? তাই তো, একটা স্বপ্ন দেখছিলো বোধহয়—কোনো শহর, কোনো ঘর, খুব উঁচুতে, মনে হয় যেন চেনা, যেন সে কখনো ছিলো সেখানে— কোথায়? ন্যুয়র্কের এম্বাসি হোটেল? সান ফ্রানসিস্কোর কার্লটন? কান্? নেপলস? না—অত উঁচুতে সে ঘর পায়নি কোথাও, কোনো জানলা থেকে অমন দৃশ্য দ্যাখেনি। অন্য কোথাও—সাধারণ যাতায়াতের পথে নয়, হয়তো প্যাসিফিকের কোনো দ্বীপ, দক্ষিণ আমেরিকার কোনো রাজধানী। কিন্তু সে তো ও-সব দেশে যায়নি কখনো। শ্রীপতি মনে-মনে বললো, 'আমি এখনো স্বপ্ন দেখছি।' তার বোজা চোখের তলায় অন্ধকার কেঁপে উঠলো। সকালে

একবার বাইরে ঘুরে এসেছে, গাইড-বুক-এর পাতা উল্টেছে কফিখানায় ব'সে ; চোখ বুলিয়েছে একমাত্র স্থানীয় ইংরেজি দৈনিকের পাতায় ; তাই সে জানে, এই শহরে আছে অনেক বড়ো-বড়ো চওড়া রাস্তা; অনেক দোকান বাগান আমোদ-প্রমোদ গির্জে ; অনেক আমেরিকান মোটর-গাড়ি ; অনেক নতুন ধরনের চমক-লাগানো স্থাপত্য: সারি-সারি ঝাউ আর নারকোলগাছ; পথের ধারে-ধারে অজস্র ফুল, মোড়ে-মোড়ে ঘন সবুজ ঘাসের চত্বর, লোকেদের বাড়ির উঠোনে আপেল জবা কমলালেবু পাতাবাহার; অনেক সুখী ও সুস্থ শিশু; হলদে, শাদা, বাদামি রঙের মেয়ে-পুরুষেব বিলাসী ভিড়; অনেক খেলা, মেলা নাচ, সাঁতার, উল্লাস; মুদিখানায় পেঁপে তরমুজ আনারসের স্তূপ, সরাইখানায় সারা পৃথিবীর মদের জোগান। দারিদ্র্যও আছে, বস্তিপাড়ায় এক নতুন ধরনের ছোঁয়াচে জ্বর, মসৃণভাবে লুকিয়ে-রাখা বর্ণবিদ্বেষ, মাত্র দশ মাইল দূরে এক বিরাট জঙ্গি আস্তানা। কিন্তু সে তার জানালা দিয়ে যা দেখতে পাচ্ছে, তাতে কিছু নেই যাকে বলা যা.য় দাগি, ময়লা বা সন্দেহজনক। ছড়িয়ে আছে আধো-চাঁদের আকার নিয়ে উপসাগর, শহরটিকে তিন দিক দিয়ে ঘিরে; সমুদ্রের গায়ে নানা রঙের ফুটকির মতো জেলে-ডিঙির পাল, গাংচিলের শাদা পাখার ঝলক, রাজহাঁসের মতো খেলায়-মেতে-ওঠা মোটরবোটগুলো; আর সৈকতের ঐ বাঁকে পাহাড়—ঘন গাছপালায় সবুজ, ধাপে-ধাপে অর্ধেক লুকোনো বাংলো, ফাঁকে-ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে বেগনি আর তুঁতে আর ম্যাজেন্টা রঙের টালির ছাদ:—আর এই সব-কিছুর ওপর স্থির হ'য়ে আছে এক বিশাল নীল উদ্ভাসিত আকাশ, গোল হ'য়ে নুয়ে পড়েছে দিগন্তে, এক মাইল-মাইল-জোড়া উজ্জ্বল বাঁকা রেখা এঁকে সমুদ্রে মিশে গেছে। বেলা প'ড়ে এলো, সমুদ্রের রং পশ্চিম ঘেঁষে আগুনরঙা, মধ্যিখানে রুপোলি, আর তীরের কাছে আকাশের মতোই নীল;—নরম স্নিগ্ধ অফুরান আলোয় প্লাবিত এই পৃথিবী, কাচ কাঠ পাথর ইস্পাত কংক্রিটে গড়া শহরটা যেন হালকা হ'য়ে যাচ্ছে, বায়বীয়, যেন শূন্যে ঝোলানো। সেই আলোয় তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হ'লো, যেন আকাশ আব সমুদ্রেব মধ্যে আর-কিছু নেই, এক অনন্ত আশা ছড়িয়ে আছে মানুষের জন্য। কিন্তু আশা মানেই অস্বস্তি, পাছে তা পূরণ না হয় সেই আশঙ্কা। কেন সেই চাঞ্চল্য এখানেও—এই শান্ত আকাশের তলায়, এই উচ্ছ্বাসহীন সমুদ্রের তীরে? আস্তে-আস্তে শ্রীপতির মনে একটা উৎকণ্ঠার অনুভূতি ছড়িয়ে পড়লো—ভেবে পেলো না কী ক'রে সে এলো এখানে, এই আশ্চর্য, দূরতম শহরে—কেন এলো? আকাশ-পথে লম্বা পাড়ি দিতে-দিতে বিশ্রামের জন্য? বিজ্ঞাপনে বিখ্যাত কোনো দৃশ্য দেখার জন্য? না কি কথা ছিলো কারো সঙ্গে দেখা হবে? না কি তার অজানা কেউ তাকে দিয়ে কোনো কূট উদ্দেশ্য সাধন ক'বে নিতে চায়?

খুব মৃদু একটা শব্দ শুনে ফিরে তাকালো শ্রীপতি, পা বাড়াতে গিয়ে থমকে গেলো। লাল মখমলে মোড়া ডিভানটায় শুয়ে আছে—কে? দেয়ালের দিকে মুখ ফেরানো, সূর্যমুখী রঙের সিল্কে সুজনিতে গা ঢাকা। শ্রীপতি বেশি অবাক হ'লো না, মন দিয়ে দেখতে লাগলো। একমাথা কুচকুচে কালো চুল, চুলের ফাঁকে গ্রীবার ঝলক, আধখানা কপাল, গালের আভা ঈষৎ উঁচু হ'য়ে ফুটে আছে, মাজা কাঁসার মতো রঙের একটি বাহু, একটি নিশ্বসিত শরীর। এই শহরের একটা বদনাম মনে প'ড়ে গেলো শ্রীপতির, আন্তর্জাতিক চক্রান্তের একটি লীলাভূমি এটা, বিশেষত মেয়ে-গোয়েন্দায় অধ্যুষিত—নানা দেশের ভাষা বলতে পারে তারা, নানা ছদ্মবেশ ধারণ করে, তাদের পক্ষে অসাধ্য নাকি কিছু নেই। টেবিলের ওপর টেলিফোনটার দিকে একবার তাকালো সে: হোটেলের রিসেপশনে জানাবে? পুলিশে? কিন্তু সে—এক দুর্বল দরিদ্র পরনির্ভর দেশের নাগরিক, তার ওপর কেন নজর দেবে কোনো আন্তর্জাতিক মেয়ে-গোয়েন্দা, যারা পৃথিবীর বাঘ-সিঙ্গিদের নিয়ে খেলা ক'রে থাকে? তবে কি কোনো চড়া দামের বেশ্যা—এই শহরে এ-রকমই রেওয়াজ? এই দ্বিতীয় অনুমান নিয়ে কয়েক মুহূর্ত খেলা করলো শ্রীপতি, কল্পনা করলো সুজনির তলায় এক আধা-হিস্পানি বা পলিনেশীয় যুবতীর শরীর; তার লালসা জাগলো না। এই সূর্যাস্তের মুহূর্ত, গোলাপি আলোয় ভ'রে-যাওয়া এই ঘর—এর সঙ্গে ও-সব কিছুকেই খাপ খাওয়ানো যাচ্ছে না, এ যেন জগৎ-সংসারের বাইরে, ঘড়ির কাঁটার বাইরে কোনো মুহূর্ত—যেন কিছু হ'তে যাচ্ছে, হ'য়ে উঠছে, কিন্তু নাও হ'তে পারে—এমনি এক অনিশ্চয়তার মুহূর্ত যেন। মেয়েটির দিকে আর-একবার তাকালো সে, একবার তাকে অন্য রকম দেখলো, সে যেন আকস্মিক নয়, অচেনাও

নয় ; বরং, শ্রীপতি এতক্ষণ যা-কিছু দেখছিলো, তারই গোপন অর্থ ও পরিণাম এই মেয়েটি। তার শুয়ে থাকার ভঙ্গিটা যেন উদাসীন অথচ তীব্র, যেন সূক্ষ্ম একটি অপেক্ষার স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে তার কপাল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত। কে তুমি? এই আলো আর স্বচ্ছতার মধ্যে অশান্তির বীজ, অগাধ সাচ্ছল্যের মধ্যে বিশৃঙ্খলা—তুমি কি তা-ই? নারী, প্রেমিকা, আমার হারানো যৌবন, আমার লুপ্ত প্রেরণা—তা-ই? হঠাৎ—বাইরে ঐ আকাশ যেমন আলোয়, তেমনি আনন্দে ভ'রে গেলো শ্রীপতির শরীর, মন, অন্তরাত্মা; মনে হ'লো এরই জন্য সে এসেছিলো এখানে, এই অতি দূর অবিশ্বাস্য শহরে, এই উঁচু ঘরে, আকাশ আর সমুদ্রের মধ্যখানে। সে আর দ্বিধা করলো না, এগিয়ে গিয়ে ডিভানের ওপর মুখ নিচু করলো, আর তক্ষুনি—যেমন অনেকক্ষণ দম আটকে রাখার পর এক দমকে বেরিয়ে আসে বাতাস, তেমনি তার গলা চিরে একটা আওয়াজ বেরোলো, মিলিয়ে গেলো বায়ুমণ্ডলে ঢেউ তুলে-তুলে—যেন উড়ে চলা কোনো পাখির ডাক, দূর-থেকে-শোনা বাঁশির ফুঁ—এখনো একেবারে মিলিয়ে যায়নি।

—আরতি, তুমি?

একটা কষ্ট নিয়ে জেগে উঠলো শ্রীপতি, মুহূর্তের জন্য চোখ মেলে তাকিয়ে আবার চোখ বুজলো। মনে-মনে বললো, 'স্বপ্ন, ফিরে এসো।' আবার বললো, 'আমি এখনো স্বপ্ন দেখছি।' স্বপ্ন—না সব আমার নিজেরই বানানো, মন-গড়া? না কি শুধু স্মৃতি, অতীতের এক ক্ষণিক পুনরুত্থান—যেমন, কোনো-কোনো মেঘলা সকালে ঘুম ভাঙামাত্র হঠাৎ আমাদের মনে প'ড়ে যায় ছেলেবেলার কোনো ঘটনা, দাঁতের ফাঁকে উনুনে-সেঁকা কাঁঠালবিচির কুড়মুড়ে গরম মাংসালো স্বাদ, বা কুড়ি বছর আগেকার পড়া প্রায়-ভুলে-যাওয়া 'চোখের বালি'র বিশেষ-কোনো অংশ—বইটা যে-ঘরে ব'সে পড়েছিলাম, পড়তে-পড়তে মনে যে-সব আলোড়ন চলছিলো, ছাপার অক্ষরগুলো, কাগজের স্পর্শ, গন্ধ, রং—সব যেমন ঝাপটে ধরে জেগে ওঠার মুহূর্তটিকে (অথচ মনে-মনে জানি আমি আর সেখানে নেই)—তেমনি, শুধু তার চেয়ে অনেক বেশি সুখের ও কষ্টের, এই স্বপ্ন বা স্মৃতি বা যা-ই হোক না। স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন, গর্তের তলায় আরো গর্ত এক স্মৃতি অন্য অনেক স্মৃতিকে টেনে আনে—বড়ো গোলমেলে ব্যাপার, কোনো শৃঙ্খলা নেই, কোনো অর্থ হয় না শেষ পর্যন্ত। আমাদের জীবনটা এ-রকম নয়, সেখানে সাতটার এক ঘণ্টা পরে নির্ভুলভাবে আটটা বাজে, ছোটো ছেলে ট্রাইসিকলে ব'সে বিজয়ীভাবে ভেঁপু বাজায়। শ্রীপতি সাহস ক'রে চোখ মেললো এবার : ভেসে উঠলো দেয়াল, ময়নার ড্রেসিংটেবিল, পাশাপাশি দুটো কাপড়ের আলমারি, জানলা ঘেঁষে সোফা, টেবিলে বাংলা-ইংরেজি পত্রিকার স্তূপ—এই তার বাড়ি, এটা উপস্থিত, কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই এর মধ্যে, কিছুক্ষণ আগে আপিশ থেকে ফিরেছে সে, নিজের বিছানায় শুয়ে আছে। শ্রীপতির বাস্তববোধ ফিরে এলো; তাব মনে পড়লো এই স্বপ্ন, বা এই ধরনের কোনো স্বপ্ন আগে একবাব দেখেছিলো সে। চার নম্বর নিমু দত্ত লেনে, হাজরা রোড থেকে বেরিয়েছে গলিটা—নোংরা, সরু, আঁকাবাঁকা, আধা-বস্তি গোছের ব্যাপার, আমার অসুখ তখন, গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে, আমি ভয় পেয়েছি, কিন্তু ভাব দেখাচ্ছি যেন ওতে কিছুই এসে যায় না আমার। তারপর আরতি এসে আমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেলো, তাব বাবা আমার চিকিৎসা করলেন।

পাশ ফিরে চোখ বুজলো শ্রীপতি, কিন্তু ঘুম আর এলো না।

৩

মনে আছে, শ্রীপতি, তোমার মৃত্যুভয়? কত বক্তৃতা করেছো বন্ধুদের কাছে ; জীবনকে বলেছো ঘৃণ্য, যেহেতু অন্যায় না-ক'রে বেঁচে থাকা যায় না, সমাজকে বলেছো দুর্বলেব বিরুদ্ধে প্রবলের চক্রান্ত; সংসারে যারা স্বাভাবিকভাবে সুখী হবার চেষ্টা করে তাদের বলেছো নর্দমার ব্যাং, বাথরুমের নোংরা-খুঁটে-খাওয়া আরশোলা—আর সেই তুমি যখন মৃত্যুকে মুখোমুখি দেখলে, তোমার কাশির সঙ্গে উঠে-আসা টকটকে লাল রক্তের ঝলকে, এক্স-রে ছবিতে তোমার ফুশফুশের কালো-কালো গর্ত দুটোয়,

তখন—আর-কিছু নয়, ভয়—ভয়ে তুমি কুঁকড়ে গিয়েছিলে; কাপুরুষের মতো, অমানুষের মতো চেয়েছিলে শুধু সেরে উঠতে, বাঁচতে, যে-কোনো উপায়ে যে-কোনো অবস্থায় এই পৃথিবীর বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে শুধু বেঁচে থাকতে! মনে আছে? বিপুল ছিলো মনে-মনে তোমার দম্ভ, যেহেতু তুমি দশ বছর বয়স থেকেই একা ও সত্যিকার অর্থে স্বাধীন; অন্য অনেক ছেলের মতো পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের সব সুবিধে ভোগ ক'রে শুধু শৌখিন ও ক্ষণস্থায়ী বিদ্রোহ করছো না, কলকাতার পথে-পথে ঘুরে অনেক দুঃখে তুমি বড়ো হ'য়ে উঠেছিলে, তোমার বিদ্যেবুদ্ধিকে টাকার অঙ্কে ভাঙিয়ে নিতে রাজি হওনি; যেহেতু তুমি ধরা দিচ্ছো না চিরাচরিত বিয়ে কিংবা চাকরির ফাঁদে, সকলের চাইতে আলাদা হ'য়ে আছো তোমার খামখেয়ালি উচ্ছৃঙ্খল জীবন নিয়ে। কিন্তু সেই তুমি—যখন বুঝলে এঁদো গলিতে একলা প'ড়ে থাকলে তোমার মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত, তখন বিনা প্রতিবাদে উঠে বসলে আরতির বাবার গাড়িতে, উঠে এলে তাদের তেতলায়; মেনে নিলে কেশববাবুর চিকিৎসা, আরতির অবিচল মনোযোগ; তোমার জন্য সেই পরিবারের দুশ্চিন্তা, পরিশ্রম, অর্থব্যয়—সব অনায়াসে গ্রহণ করলে, যেন তুমি যাকে ঘৃণ্য বলো সেই জীবনের কাছে এটা তোমার প্রাপ্যই ছিলো! সুবোধ বালক—ডাক্তারদের কথা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করছো, চার ঘণ্টা পর-পর খাওয়া, রোজ একটি ক'রে ইঞ্জেকশন, এ-বেলা ও-বেলা ওষুধ, বই পড়া বন্ধ, কথা বলা বন্ধ—শুধু শুয়ে থাকা, অন্তহীনভাবে শুয়ে থাকা। অবস্থাটা তোমার মনে হ'তে পারতো অকথ্যরকম দুর্নৈতিক, কিন্তু তুমি ছটফট করোনি, পালিয়ে যাবার চেষ্টা করোনি কখনো। কী ভেবেছিলে শুয়ে শুয়ে? ভগবান—মৃত্যু—অবসানের সৌন্দর্য—অনন্তের মহিমা? না, ঈশ্বর বিষয়ে কিছুমাত্র কৌতূহল তুমি অনুভব করোনি; মৃত্যুকে তোমার মনে হয়নি কোনো করুণাময়ী মাতা বা প্রেমিকার মতো; তুমি চাওনি সমুদ্রের মধ্যে বিন্দুর মতো মিলিয়ে যেতে, অস্তিত্বের ছোট্ট খোলশ ভেঙে কোনো অকল্পনীয় অসীমে বেরিয়ে আসতে চাওনি। যত সুবচন অনেক বইয়ে অনেকবার প'ড়ে তুমি মুগ্ধ হয়েছিলে, সে-সব তখন অর্থহীন হ'য়ে গেছে তোমার কাছে। তোমার মন প'ড়ে আছে থার্মোমিটারে, দু-এক পয়েন্টের সূক্ষ্ম ওঠা-নামায়; তুমি কল্পনা করছো তোমার রক্তের মধ্যে কী-বিরাট যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে বীজাণুর সঙ্গে রাসায়নিক ভেষজ, মনে-মনে নির্বংশ করছো বীজাণুগুলোকে। যাতে মৃত্যুর কথা ভাবতে না হয় তারই জন্য সারাক্ষণ চেষ্টা তোমার: দিনের আলোয় জানলার বাইরে তাকাতেও তোমার ভয়, কারণ তখন বড্ড বেশি বড়ো দেখায় আকাশটাকে, শরতের আলোয় বড়ো বেশি উজ্জ্বল ও গভীর; তোমার মনে হয় তুমি অসতর্ক হ'লে ঐ আকাশ তোমাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে ওপরে, এই পৃথিবী ছাড়িয়ে, চিরকালের মতো। তুমি কিছুটা স্বস্তি পেয়েছো রাত্রে—যখন অন্ধকার মুছে দিয়েছে আকাশটাকে, তুমি শুয়ে-শুয়ে কয়েকটার বেশি তারা দেখতে পাও না, আর তাই অনেক বেশি নিরাপদ মনে হয় তোমার ঘর, তোমার বিছানা, তোমার অস্তিত্ব। স্থির চোখে তুমি তাকিয়ে থেকেছো শাদা দেয়ালটার দিকে; মসৃণ চুনকামের মধ্যে আবিষ্কার করেছো অনেক সূক্ষ্ম রেখা গর্ত উঁচু-নিচু দাগ; তুমি অধ্যয়ন করেছো টিকটিকিগুলোর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, গায়ের রং, ল্যাজের খাঁজ, তাদের ক্ষিপ্রতা ও স্থৈর্য, খাদ্যসংগ্রহ ও বংশবৃদ্ধিতে তৎপরতা; আর কখনো বা কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্যসাধনের জন্য, তোমার খাটের পাশের বহুকোণওলা বর্মি টেবিলটার কারুকার্য তৃপ্তিহীনভাবে বিশ্লেষণ ক'রে সময় কাটিয়েছো। যে-কোনো তুচ্ছ জিনিশ, যা পার্থিব, মানুষের জীবনের সঙ্গে যার সম্পর্ক আছে, নির্দিষ্ট স্থান আছে মানুষের সংসারে—তা-ই তুমি আঁকড়ে ধরেছিলে তখন; মন থেকে সরিয়ে দিয়েছিলে সব কবিতা, সব কল্পনা, সব বিজ্ঞান, সব অনুমান, যা মূর্ত ক'রে তোলে মৃত্যুকে, কিংবা এমন ইঙ্গিত করে যে লোকেরা যাকে বাস্তব বলে সেটাই আমাদের সর্বস্ব নয়।

শ্রীপতির মনের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেলো সেই সব দিন, সপ্তাহ, মাসগুলি—শরতের পরে শীত, তারপর হঠাৎ একদিন কোকিলের ডাক : একটি ঘর, একটি ছাদ, মহাপ্রাণ কেশব মৈত্র (না জানি মৃত্যুর আগে কত কষ্ট পেয়েছিলেন তিনি!), আর একটি মেয়ে—স্বাস্থ্যবতী, চারুযৌবনা, সংশয়হীন, আশ্বাসময়ী, যে সম্প্রতি দখল ক'রে নিয়েছে তাকে, যেন তার ভেতরকার ব্যাধির মতোই অপ্রতিরোধ্য। এক অপ্রত্যাশিত যুদ্ধে তার শরীরের কাছে সে হেরে গিয়েছে, তার প্রতিবাদ করার শক্তি নেই,

অসহায়ভাবে মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই তখনকার মতো। তিন মাস পরে ডাক্তাররা তাকে কিছুটা স্বাধীনতা দিলেন; সে উঠে বসে, ছাদে পাইচারি করে; বাছা-বাছা বন্ধুদের আসতে দেয়া হচ্ছে তার কাছে; কিন্তু ওষুধ পথ্য দশ ঘণ্টা ঘুম তেমনি চলছে নিয়মিত, বাড়ির বাইরে পা বাড়ানো বারণ। সে, জন্ম-বাউণ্ডুলে, যে-কোনোরকম শৃঙ্খলার শত্রু, যে কাটিয়ে দিয়েছে দিনের পর দিন শুধু নিরুদ্দেশভাবে ঘুরে বেড়িয়ে আর অফুরন্তভাবে সকলের সঙ্গে তর্ক ক'রে—এটাও মেনে নিতে আপত্তি করলো না (যদিও সে অনেকটা সুস্থ বোধ করছে তখন)—এতই সে ব্যগ্র ছিলো নিশ্চিন্ত হ'তে যে ছিদ্রানুসন্ধিৎসু মৃত্যু তাকে আপাতত আর খুঁজে পাবে না। তিন মাসের চিকিৎসা ও রোগশয্যায় তার অনেক অভ্যেসও বদলে গিয়েছিলো—আজকাল নির্দিষ্ট সময়ে খিদে পায় তাব, দুপুরে খেয়ে উঠে ঘুম পায়, গরম জলে ছাড়া স্নান করতে পারে না, গা থেকে কখনো সোয়েটার খোলে না পাছে ঠাণ্ডা লাগে, সাবধানে এড়িয়ে চলে বৃষ্টির ছাঁট, উত্তুরে হাওয়া। আরো দু-মাস পরে সে শুনলো সে এখন সম্পূর্ণ রোগমুক্ত, মোটামুটি স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে (যদিও বাত জাগা বা বেশি খাটা-খাটনি চলবে না), কিছুদিন বাদ দিয়ে বিয়ে করারও বাধা নেই। শ্রীপতি টের পেলো নেপথ্যে একটা আয়োজন চলছে এই বাড়িতে—কেশববাবুর মুখে এক নতুন ধরনের প্রফুল্লতা ও লুকিয়ে রাখা কষ্টের চিহ্ন। অবশেষে এক চৈত্রের সন্ধ্যায় ছাদে ব'সে আরতি তাকে বললো, 'বাবা বলছেন তুমি মাস দুয়েক দেবাদূনে কাটিয়ে এলে ভালো হয়, এই সময়টা খুব ভালো ওখানে, তাঁর চেনা একটা স্যানাটরিয়ামও আছে। তারপর আষাঢ় মাসে একটা তারিখ ঠিক করতে চান। তুমি কী বলো?' হঠাৎ লজ্জায় অভিভূত হ'য়ে পড়লো শ্রীপতি, আরতির দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারলো না।

—বিয়ে? পিতার আদরিণী এই মাতৃহীন একমাত্র কন্যার? এই অতি সুখে লালিত, অবিবেচক, একগুঁয়ে, কৌতুকপ্রিয়, আত্মবশ, বহু যুবকেব বাঞ্ছিত ও উপেক্ষাকারিণী এই তরুণীর! আমার সঙ্গে? কিন্তু আমি কে? কফি-হাউসের বাগ্মী, বন্ধুমহলে বীর, ফার্স্ট ইয়ারের বটুকদের কাছে প্রবাদবাক্য (এখনই তা ফিকে হ'য়ে আসছে যদিও, প্রায় প্রতি বছরই একটি নতুন খুদে প্রফেটের আবির্ভাব হয় ছাত্রমহলে), এক অসমাপ্ত, অপ্রকাশিত উপন্যাসের লেখক (যা না-প'ড়েই দুর্গাদাস 'অসাধারণ' ব'লে রটিয়েছে), এক বাক্যচ্ছুরিত অসাধিত বিপ্লবের দার্শনিক—এ-ই তো আমি। বাবা, মা, আত্মীয়-স্বজন—এ-সব কথার অর্থ আমি ভুলে গিয়েছি, আমার পেশা প্রাইভেট ট্যুশানি, ঠিকানা অনির্দিষ্ট, আর তার ওপর—এই অসুখ। কিন্তু না—আরতিব কাছে কিছুতেই কিছু এসে যায় না: সে আমাকে...ভালোবাসে। ভালোবাসা: ঠোঁট নেড়ে নিঃশব্দে কথাটা উচ্চারণ করলো শ্রীপতি—যেন কোনো বিদেশী ভাষার শব্দ, অতি প্রিয় ও সুস্বন, কিন্তু সে অনেক অভিধান ঘেঁটেও যার মর্মোদ্ধার করতে পারেনি। শুধু একটা ভার তার বুকের ওপর, বিরাট ভার, কষ্টের মতো—ঐ শব্দ, তার অনুরণন।

কেটে যাচ্ছে দিন একের পব এক, কেশববাবু দেরাদূনে ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছেন, ঋতু ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে গ্রীষ্মের দিকে। এই সেই সময়, যখন এতদিনের বন্দী অবস্থার কিছুটা ক্ষতিপূরণ ক'রে নিতে পারে শ্রীপতি, ভোগ করতে পাবে স্যান্ডেলেব তলায় কলকাতার ফুটপাতের আশ্বাসদায়ক স্পর্শ; নামহীন ভিড়ের মধ্যে মিশে যাবার বর্ণনাতীত সঙ্গসুখ; বাস্-এর দোতলার ঝাঁকুনি খেতে-খেতে বাস্তার ধারের বারান্দায় বা ঘরের মধ্যে মুহূর্তের জন্য যাদেব চোখে পড়ে, তাদের জীবন নিয়ে মনে-মনে গল্প বানাবার আমোদ; কফি-হাউসে তর্কযুদ্ধে মেতে ওঠাব উত্তেজনা। এই সবই চেষ্টা কবে শ্রীপতি, কিন্তু মনে হয় সারা কলকাতা যেন এ-কয়মাসেই অদ্ভুতভাবে বদলে গেছে। সবই যেন নীরস হ'য়ে গেছে, নিষ্প্রভ—ঐ একটি ঘর, একটি ছাদ, একটি তরুণীর তুলনায়। ঐ ছাদেই সান্ধ্য আড্ডা জমে মাঝে-মাঝে; আসে দুর্গাদাস, হিমেন্দু, বন্দনা, মাঝে-মাঝে অমলাও আসে: সকলেই বলে তাব চেহারা নাকি এত ভালো হয়েছে যে প্রায় চেনাই যায় না; সকলেই জানে, তরুণমহলে এতদিন যা ছিলো বহুবিতর্কিত, বহু জল্পনাকল্পনা ও হার্দ্য জ্বলুনির উপলক্ষ, সেই একটি বিয়ে ঘটতে যাচ্ছে শিগগিরই: একটা উৎসবের সুর লাগে তাদের কথায়; হিমেন্দু তাকে চাকরির খবর দেয়, বন্দনা দেয় ফ্ল্যাট ভাড়ার খোঁজ, কারণে-অকারণে হো-হো ক'রে হেসে ওঠে দুর্গাদাস, বিনা অনুবোধে গান ধরে—নিধুবাবু, বা রামপ্রসাদ, বা চিরকালের

চিরচেনা রবীন্দ্র-সংগীত, যাতে বন্দনাও মাঝে-মাঝে যোগ দেয়। ধরনটা ভিন্ন—সিগারেটের ধোঁয়ায় ঝাপসা কফি-হাউসের চ্যাঁচামেচি নয়, নয় 'সুনন্দা'র তর্কসভার হৈ-চৈ—কিছু নেই কড়া বা তেতো বা উগ্র, যেন চৈত্রের হাওয়ার সঙ্গে মিশে একটা সূক্ষ্ম সুখ ছড়িয়ে পড়ছে, সহজে মিলে যাচ্ছে মনের সঙ্গে মন—কখনো জ্যোছনায়, কখনো বা তারা-ফোটা অন্ধকারে। কিন্তু শ্রীপতি, যার জন্য এই আনন্দ, সে-ই অপেক্ষাকৃত নীরব; কথাবার্তায় তেমন উৎসাহ যেন আর নেই তার; অন্যের মুখ থেকে কথা খ'সে পড়ামাত্র প্রতিবাদ করে না; মাঝে-মাঝে সকলের চোখ এড়িয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে। অন্যেরা চ'লে যাবার পর আরতি তাকে জিগেস করে, 'এত চুপচাপ কেন? কী ভাবছো?' 'আমার অবাক লাগছে।' 'অবাক হবার কী আছে?' খুব সহজে উত্তর দেয় আরতি, 'এ তো হ'তোই—শুধু মাঝখানে অনর্থক তোমার অসুখটা—না, অনর্থক নয়, এরও দরকার ছিলো।' মুখে যা বলে, তার চেয়ে অনেক বেশি বলে তার চোখ, শ্রীপতির মনের ভেতরটা মেঘলা হ'য়ে আসে।

মেঘলা, ধোঁয়াটে, গুমরোনো—রাগ আর বিক্ষোভ ঠেলে উঠছে তার ভেতর থেকে, এই বাড়ির বিরুদ্ধে, আরতির বিরুদ্ধে, সবচেয়ে বেশি তার নিজের বিরুদ্ধে। কেন আমি হ'তে দিয়েছিলাম এটা, কেন নিখোঁজ হ'য়ে যাইনি, শেষ ক'রে দিইনি সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় আমার অস্তিত্বটাকে? লেকের জল, ঘুমের ওষুধ, কোনো তারা-ভরা আকাশের তলায় রেল-লাইনের ওপর মাথা পেতে দেয়া—কত উপায় ছিলো! তার বদলে—ভাগ্যের কাছে নয়, ভগাবনের কাছে নয়, একজন মানুষের কাছে এই অধম আত্ম-সমর্পণ, এই আকণ্ঠ ঋণে ডুবে যাওয়া! সবাই ধ'রে নিয়েছে বিয়েটা হবেই, এটা অনিবার্য এখন, আমার জন্য যা-কিছু এরা করেছেন তারই পরিণাম এটা, শেষ ফলাফল। কে এক শ্রীপতি ভদ্র, তাঁর মেয়েকে পড়িয়েছিলো পরীক্ষার আগে, মেয়ের এক কলেজি বন্ধু ধরা যাক—তার জন্য কেশব মৈত্রব এত যে দরদ, এত যত্ন, পরিচর্যা, অর্থব্যয়., এ কি বিশুদ্ধ মহানুভবতা, না কি সবই করেছিলেন শুধু তাঁর অবুঝ মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে, মেয়ের জেদ না-মেনে তাঁর উপায় নেই ব'লে, বলতে গেলে তাঁর নিজেরই স্বার্থে? আমি যেন একটা বুনো জন্তু, আমাকে পাকড়ানো হ'লো, ভূরিভোজনে নধব ক'রে তোলা হ'লো—এবারে দেবীর কাছে বলি দেয়া হবে। আমি উপকৃত, তাই প্রতিদান দিতে বাধ্য; আমি বিক্রি হ'য়ে গিয়েছি, আমার 'না' বলার আর অধিকার নেই।—ছি! কী কুৎসিত চিন্তা, কী ক'রে মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারলাম? আমি কি জানি না যে ঋণ, প্রতিদান, কৃতজ্ঞতা—এ-সব কোনো কথাই ওঠে না এখানে? দয়া নয়, পরোপকার নয়, মহত্ত্ব নয়—হৃদয়ের সেই বিশুদ্ধ ও দুর্লভ মদ, যার স্পর্শে কবর ফেঁড়ে বেরিয়ে আসে মৃত মানুষ, দেবতা ফিরিয়ে দেন পাশবদ্ধ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ প্রাণপুরুষকে। আমি জানি সব, জেনেছি বহুদিন ধ'রে, কিন্তু তবু—কোথায় যেন নিজেরই কাছে অপমানিত হ'য়ে আছি, যেহেতু আমি আগের মতো আর স্বাধীন নেই। অপমানিত—অপহৃত—যেন আমি নিজের কাছ থেকে নিজেই চুরি হ'য়ে গিয়েছি। মাঝে-মাঝে আমার দম আটকে আসে এই বাড়িতে; কোনো তীব্র সুগন্ধের মতো এই স্নেহ, যাতে বুদ্ধি অসাড় হ'য়ে যায়; অতি রমণীয় এক চোরাবালিতে যেন পা দিয়েছি আমি; প্রবলভাবে আমাকে আকর্ষণ করছে অন্য একজন; আমি তার সঙ্গে ডুবে যেতে চাই, তার মধ্যে হারিয়ে যেতে চাই। না—অসহ্য, এ-ভাবে আর চলতে পারে না; আমাকে চ'লে যেতে হবে!

প্রথমে একটা ঝাপসা কল্পনা—ঝলক দিয়েই মিলিয়ে গেলো, তারপর ফিরে এলো, ছড়িয়ে পড়লো তার চিন্তায় আস্তে-আস্তে, সপক্ষে অনেক যুক্তি জুগিয়ে যেতে লাগলো। সাংসারিক যুক্তি, উত্তম সুবুদ্ধি-প্রণোদিত। ভুল, আরতি, তুমি ভুল করছো; আমি তোমাকে বলছি, শোনো: স্ত্রী, সন্তান, সংসার, এ-সব আমার জন্য নয়। আমি কিছুই করিনি, শুধু রাশি-রাশি বই গিলেছি আর কথা বলেছি। তুমি হয়তো ভাবো আমি অন্যদের চাইতে আলাদা (আমিও তা-ই ভাবি মনে-মনে), কিন্তু তার কোনো প্রমাণ এখনো দিতে পারিনি—অন্যদের কাছে না, নিজের কাছেও না। তুমি তো জানো আমি কী-রকম উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী, তুমি তো জানো যে-কোনোরকম বাঁধন আমার অসহ্য। আর তাছাড়া—এই সাংঘাতিক রোগ, আমার বুকের মধ্যে লুকোনো, সেরে গিয়েও সারে না, কোনো-একদিন আবার ফেটে বেরোয়, হাওয়ায় উড়ে ঢুকে পড়ে অন্যদের মধ্যে। পারি না, আরতি, আমি পারি না এই রুগ্ন শরীর নিয়ে তোমাকে

স্পর্শ করতে; পারি না আমার বিকৃত মনের জঞ্জালগুলোকে চাপাতে তোমার মনের ওপর; আমার ভাঙাচোরা এলোমেলো অনিশ্চিত জীবনের সঙ্গে তোমাকে আমি জড়াতে পারি না। আমাকে তুমি ক্ষমা করো, আরতি আমাকে তুমি ছেড়ে দাও।

এমনি, মনে-মনে, বার-বার-প্রশ্ন, উত্তর, প্রত্যুত্তর: নিজেরই সঙ্গে নিজের এক বিরাট বিসংবাদ। মুখ ফুটে আরতিকে কিছু বলবো, এমন সাহস আমার নেই; কেননা, জানি, সে একবার চোখ তুলে তাকালেই আমাকে হার মানতে হবে। আর তার কাছে কোনো মিথ্যে কথা, কোনো ছলছুতোর আশ্রয়? অসম্ভব। কিন্তু যদি কিছু করতে হয় তো এখনই, এই মুহূর্তে, দেরি করলে আর ফেরার পথ পাবো না। অতএব—সত্যি একদিন চ'লে গেলাম আমি, পালিয়ে, কাউকে কিছু না-ব'লে, নিজেকে কষ্ট দেবার উন্মাদ প্রেরণায়, আমার হৃৎপিণ্ডের শব্দে যা ধ্বনিত হচ্ছে সেই ইচ্ছাকে চেপে গুঁড়ো ক'রে দেবার আগ্রহে—পুষ্ট চেহারা ও কুড়ি পাউন্ড বর্ধিত ওজন নিয়ে একেবারে এক দমকে দিল্লিতে। আর তারপর—এই দেখা হ'লো।

শ্রীপতির কানে এলো কয়েকটা শব্দ—দিনের বেলার, গৃহস্থালির, উপস্থিতের। একটা চেয়ার টানার শব্দ—হরিদাসী খাবার ঘর ঝাঁট দিচ্ছে; পেণ্ডুলামে একটা ঘণ্টা (সাড়ে-সাতটা হ'লো বোধহয়); রেডিওতে নিচু আওয়াজে সেতার। দশ বছর কেটে গেছে মাঝখানে। চ'লে এলাম—পালিয়ে এলাম তাকে ছেড়ে—আশ্চর্য! কবে যেন একদিন শুনলাম সে লন্ডনে পড়তে চ'লে গেছে—খবরটা তেমন দাগ কাটলো না আমার মনে, বরং যেন স্বস্তি বোধ করলাম এই ব্যবধানে। আর এই এতগুলো বছরের মধ্যে—আমি কি কখনো ভেবেছি তার কথা? কই, মনে তো পড়ে না। আত্মরক্ষার জন্য শামুকের যেমন খোলশ, এও তেমনি। শুধু সেই দিল্লিতে তিন বছর—একটা আধা-সরকারি চাকরি করছি, থাকি দরিয়াগঞ্জে একটা শস্তা হোটেলে, আড্ডা খুঁজে বেড়াই না, স্বাস্থ্যের যত্ন নিই, আপিশ থেকে ফিরে সময় কাটাবার জন্য লিখতে বসি। না—সময় কাটানো নয়, কোনো শূন্যতা ভরাবার জন্য, কোনো হাহাকার চাপা দেবার জন্য। আমার ভেতর থেকে উঠে এসেছিলো কথাগুলো—কোনো গোপন উৎস থেকে আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে-বেয়ে ফোঁটা-ফোঁটা জলের মতো। বা যেন এক বিষব্রণ ফেটে গেলো আস্তে-আস্তে, রক্ত পুঁজ দগদগে ঘা কাগজের ওপর কালো-কালো অক্ষরে ছড়িয়ে পড়লো। একটা শো-দেড়েক পৃষ্ঠার উপন্যাস, আট-দশটি ছোটোগল্প। ছাপা হ'লো কলকাতায় মাসিকপত্রে, রোগা দু-খানা বই বেরোলো। আর, যেহেতু লোকেরা সর্বদাই দেখতে চায় ফিল্মের পর্দায় কোনো নতুন মুখ, বইয়ের মলাটে কোনো নতুন নাম, যেহেতু তরুণতম রাজহাঁসটির আশায় পৃথিবীর শিশুরা প্রতি বসন্তে হ্রদের ধারে অপেক্ষা করে মধুমাখা রুটি হাতে নিয়ে, তাই—অন্য অনেকের মতোই—সেও পেলো প্রচুর প্রশংসা, তার প্রাপ্যের চাইতে অনেক বেশি। আর ঠিক তখনই, যখন সে ভাবছে ঐ লেখাই হয়তো কোনো-এক রকম অর্থ দিতে পারবে তার জীবনটাকে, এমনকি হয়তো ওরই মধ্য দিয়ে সে খুঁজে পাবে এতদিন-পর্যন্ত অস্তিত্বহীন তার ভবিষ্যৎকে—ঠিক তখনই কলকাতার 'সুপ্রভাত'-এ তার চাকরি, যা তার দিক থেকে চেষ্টাহীনভাবে উড়ে এসে পড়েছিলো তার কাছে, কিছুটা তার নবলব্ধ সাহিত্যিক খ্যাতির জোরে। আর তারপর এমন একটি ঘটনা ঘটলো, যা তার নিজের পক্ষে প্রায় অবিশ্বাস্য। সে নাকি বলতে গেলে একজন ক্ষণজন্মা সাংবাদিক—এমনি একটা গুজব কানে এলো তার, 'সুপ্রভাত'-এ যোগ দেবার কয়েক মাসের মধ্যেই: ইতিহাস, ভূগোল, সাল-তারিখ, নানা দেশের ও মহাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলি—এ-সব তথ্যের ওপর এমন অনায়াস তাৎক্ষণিক দখল নাকি কমই দেখা যায়; তার স্মরণশক্তি নাকি অসাধারণ; তাছাড়া সহজ চলতি বাংলায়, সকলের পক্ষে বোধগম্য ও উপাদেয় ক'রে, খবর লেখার ও সাজাবার দক্ষতায় তার নাকি জুড়ি নেই। একটা সময়ে সে আবোলতাবোল যত বই পড়েছিলো—কিছু শেখার জন্য নয়, অলস কৌতূহল মেটাতে, আর হয়তো আড্ডায় অন্য সকলের ওপর টেক্কা দেবার হীন উদ্দেশ্য নিয়েও—তাও যে কোনো কাজে লাগতে পারে, তা আবিষ্কার ক'রে অবাক হ'লো সে, মনে-মনে একটু খুশি হ'লো না তাও নয়। দরিয়াগঞ্জের শস্তা হোটেলে নিঃসঙ্গতা ও মনস্তাপে ভরা রাত্রিগুলিতে সে চেষ্টা করেছিলো তার নিজের একটি লেখার স্টাইল গ'ড়ে

তুলতে—সহজ, কিন্তু তরল নয়; চিত্রকল্পগুলি ঘরোয়া, সাধারণ জীবনের তথ্য থেকে সংগৃহীত; চেষ্টা করেছিলো তার চিন্তার কুটিলতাকে একটি প্রতারক সরলতার ছদ্মবেশ পরাতে;—তাও কাজে লেগে গেলো। দ্রুত কেটে যেতে লাগলো বছরগুলি; ধারাবাহিক ঊর্ধ্ব রেখায় এগিয়ে চললো 'সুপ্রভাত'-এর কাটতির অঙ্ক, প্রতিদ্বন্দ্বী 'দৈনিক হরকরা'কে অনেক পেছনে ফেলে; লাফিয়ে-লাফিয়ে তারও উন্নতি সেই সঙ্গে;—হঠাৎ দেখলো, সে একটি বৃহৎ, প্রতিপত্তিশালী দৈনিকপত্রের বার্তা-সম্পাদক, বিবাহিত, একটি পুত্রের পিতা, কলকাতার এক গণ্যমান্য নাগরিক ও সচ্ছল, নিরুদ্বেগ গৃহস্থ।

কেমন ক'রে হ'লো? আমি নিজেও জানি না, আমি নিজেই অবাক হ'য়ে গিয়েছিলাম। আপিশে একদিকে আমার সুনাম, অন্যদিকে আমার প্রতি অনেক সহকর্মীর প্রচ্ছন্ন বা প্রকট ঈর্ষা, মালিকদের মধ্যে দু-একজনের আমার বিষয়ে অনুমোদন, অন্য কারো-কারো সন্দেহ—যা অব্যক্ত থাকলেও অনুভব করা যায়—এই ধরনের একটা আবর্তের মধ্যে প'ড়ে গিয়ে আমি কি চেয়েছিলাম নিজের যোগ্যতা প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণ করতে, একটু অতিরিক্ত উৎসাহ নিয়ে কাজ করেছিলাম? কিন্তু শুধুই উৎসাহ নয় হয়তো—আমি ভুলিনি যে পালে খুব বেশি জোরালো হাওয়া লাগলে নৌকো আবার উল্টে যেতেও পারে—সেই সঙ্গে একটু সতর্কতা, সকলের সঙ্গে মোটামুটি সদ্ভাব বজায় রেখে চলার মতো সুবুদ্ধি। আসলে, যেমন 'সুপ্রভাত'-এর ওপর নিঃসন্দেহে আমার, তেমনি 'সুপ্রভাত'-এরও প্রভাব পড়ছিলো আমার ওপর; আমি তখনকার মতো সর্বসাধারণের উপচেষ্টা ব'নে গিয়েছিলাম; বিশ্বাস করেছিলাম (যাকে কোনোমতেই অসত্য বলা যায় না) যে এই সম্প্রতি স্বাধীন গণতন্ত্রাভিলাষী দেশকে টেনে তোলার পক্ষে একটি মহৎ ও হাতে-হাতে-ফলপ্রসূ উপায় হ'লো মাতৃভাষায় সুসম্পাদিত দৈনিকপত্র। সব-কিছু নিয়ে ঠোঁট-বাঁকানো ব্যঙ্গ তো অনেক হ'লো, এবার কিছু কাজের মতো কাজ করা যাক—এমনি আমার মনের ভাবটা তখন। কিন্তু এই কৃতী হবার চেষ্টা আমার জীবনটাকে এমন বদলে দেবে, তা কল্পনাও করিনি।

বিয়ে কেন করেছিলাম? জানি না, কোনো কারণ ছিলো না। বা হয়তো উন্নতির ফাঁদে পড়লে অমনি হয় মানুষের। হয়তো টাকার চর্বিতে মাথার ঘিলুও ভেজাল হ'য়ে যায়। কথাটা প্রথম তুলেছিলো আমাদের চীফ রিপোর্টার পরমেশ, তার স্ত্রীর একটি পিসতুতো বোনের উল্লেখ করেছিলো—অনুমান করি, তার স্ত্রীর পরামর্শেই প্ররোচিত হ'য়ে। আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম অবশ্য, কিন্তু পরমেশ মাঝে-মাঝেই ফিরে আসে ঐ প্রসঙ্গে, মজা ক'রে বলে—'আমি তোমাকে কথা দিতে পারি, শ্রীপতি, ময়নার মধ্যে অসাধারণ কিছুই নেই—স্বাস্থ্য ভালো, মুখশ্রী মন্দ না, দশাচল বি. এ. পাশ—এর বেশি কিছুই বলার নেই তার বিষয়ে। অর্থাৎ—সে ভালো বৌ হবে।' কোনো দিন বলে, 'তোমার যদি হোটেলই বেশি পছন্দ হয় সে-কথা আলাদা, তবে যদি বাড়ির স্বাদ পেতে চাও তা ময়না হয়তো দিতে পারবে তোমাকে।' আবার কোনোদিন হঠাৎ আমার ঘরে ঢুকে বলে, 'ভয় পেয়ো না, আমি ঘটকালি করতে আসিনি, আমি বুঝে নিয়েছি ময়নার অত ভাগ্য নয় যে তোমার বৌ হ'তে পারবে।' তারপর একদিন পরমেশ বললো, 'সামনের শনিবার তুমি ফাঁকা আছো নাকি, শ্রীপতি? তাহ'লে আমাদের সঙ্গে চৈনিক ভোজে যদি যোগ দাও।' 'তোমরা মানে?' 'আমি, আমার স্ত্রী, আর—' আমি ভুরু বাঁকিয়ে বললাম, 'তোমার শ্যালিকা?' 'তোমার আপত্তি থাকলে অবশ্য—' 'না, না—আপত্তি আর কী আছে? তোমার আর যে-ক'টি শ্যালিকা আছে তাদের সকলকে যদি নিয়ে আসো সে তো আরো ভালো।' ব'লে আমি দরাজ গলায় হাসলাম। 'কোনো উপলক্ষ আছে?' পরমেশ লাজুক হেসে জবাব দিলো, 'না, না—এমনি।'

বেশ ঝরঝরে মেজাজে, কিছুটা কৌতুক আর কিছুটা কৌতূহলের ভাব নিয়েও, গিয়েছিলাম সেদিন পরমেশের নিমন্ত্রণে ক্যান্টন রেস্তোরাঁয়। গিয়ে বুঝলাম, একটা উপলক্ষ আছে সত্যি—পরমেশের বিয়ের তারিখ সেটা—ওদের বিয়ের পাঁচ বছর পুরলো, আর স্পষ্টত ওদের বিয়েটা খুব সুখের হয়েছে। আমরা পাঁচজন ব'সে আছি টেবিলে—আমি, সস্ত্রীক পরমেশ আর তার দুটি শ্যালিকা—ছোটোটি বয়স বছর বারো—উচ্ছল, কিন্তু ইতিমধ্যেই কৈশোর-সচেতন, আর কিছুটা দিদির গরবে গরবিনী, আর দিদিটি—অর্থাৎ ময়না—তার চেহারা সাঁওতালনি ধরনের পুষ্ট, শামলা রং, কথা বলে মেয়েদের পক্ষে

একটু মোটা গলায়, আঁট-ক'রে-পরা নাইলনের শাড়িতে থেকে-থেকে বর্তুল রেখা ঝিলিক দিচ্ছে। পরমেশ আর আমি বিয়ার খাচ্ছি, আর আস্তে-আস্তে আবহাওয়াটা বেশ লাগছে আমার, ময়নাকে একটু ঘন-ঘন লক্ষ করছি, উপভোগ করছি তার আড়চোখে তাকানো, তার লজ্জার ভান, আর মনে-মনে বলছি, 'আমি চিনি তোমাকে—তুমি সেই মেয়েদেরই একজন, যারা ঘ'ষে-ঘ'ষে বি. এ. পাশ ক'রে পথ চেয়ে ব'সে আছে—চাকরি করছে না, যেহেতু বাড়ির অবস্থা ভালো আর নিজেদের সে-রকম যোগ্যতা বা ইচ্ছেও নেই; বিয়ে হয়নি, যেহেতু পরিবারের উচ্চাশামাফিক কোনো স্বর্ণচন্দ্রের উদয় হয়নি এখনো; পঁচিশ বা ছাব্বিশ বছরের টশটশে যৌবন নিয়ে যারা শুধু অপেক্ষা করছে কোনো সমজদারের জন্য।'—কিন্তু তবু, মনে-মনে ব্যাঙ্গের বুলি আওড়ালেও, হঠাৎ ভালো লেগে যাওয়ার আমেজটাকেও কাটাতে পারলাম না—কাটাতে চাইলাম না—যেন নিজের সঙ্গে একটা মজাদার খেলা খেলছি, সেটাকে আরো খানিকদূর গড়াতে দিলেও ক্ষতি নেই, সময় বুঝে কেটে পড়লেই হবে। পরমেশের স্ত্রীও দেখলাম সুরসিকা—আমরা তিন জনে বেশ জমিয়ে তুলেছি হাসিঠাট্টা, খুচরো গল্প; ময়না বেশি কথা বলছে না, শুধু হাসছে মাঝে-মাঝে, তাও বেশি হাসছে না—আমার উদ্দেশে তার জামাইবাবুর কোনো সূক্ষ্ম আদিরস ঘেঁষা রসিকতা শুনে খাবার প্লেটে মুখ নামাচ্ছে—আর ওর সঙ্গে কখনো চোখোচোখি হ'লেই পরমেশের মুখে শোনা 'বৌ' কথাটা যেন শুড়শুড়ি দিচ্ছে আমাকে, মনে হচ্ছে হোটেলের চাইতে 'বাড়ি' সত্যি ভালো কিনা, তা যাচাই ক'রে দেখলে হয়—আবার ও-রকম ভাবছি ব'লে নিজেরই হাসি পাচ্ছে—এমনি আমোদে তরতর ক'রে দু-ঘণ্টা সময় কেটে গেলো। চললো কিছুদিন পাতানো কোর্টশিপের পুতুল-নাচ—একটা ফিল্ম, ময়নার পিত্রালয়ে আমার চায়ের নিমন্ত্রণ (পাত্র-পাত্রীকে 'একা হবার' সুযোগ দিয়ে অন্যেরা অদৃশ্য হলেন) আর-একটা ফিল্ম (সেদিন ময়নাকে পৌঁছিয়ে দিয়েই পরমেশকে অন্য কাজে চ'লে যেতে হ'লো)—আর তারপর, ময়নার দিকে থেকে সর্বদেহমনের আকুলতা ও প্রস্তুতি নিয়ে, আর আমার দিক থেকে কিছুটা খেলাচ্ছলে আর কিছুটা যেন এক অলীক সুখের উশকোনিতে (যেহেতু সেদিন চীনে রেস্তোরাঁয় মুহূর্তের জন্য একটি সুখী দম্পতিকে আমি দেখেছিলাম)—বিয়ে হ'য়ে গেলো। পরে শুনেছিলাম, ময়নার মা-র একটু আপত্তি ছিলো আমার বয়স পঁয়ত্রিশ ব'লে, কিন্তু আমার মাস-মাইনের কাছে তিনি হার মেনেছিলেন।

শ্রীপতির শরীরের মধ্যে স্নায়ুগুলো যেন মুচড়ে উঠলো হঠাৎ, বিছানায় পা ঠুকলো একবার, চাদরটাকে ঠেলে সরিয়ে দিলো গা থেকে। থাক—এ-সব ভেবে কী হবে, এখন উঠে পড়ি, ঘুরে আসি কোথাও। কিন্তু তার মন তাকে রেহাই দিলো না। কী হয়েছিলো? আমাকে কি ভূতে পেয়েছিলো হঠাৎ? কী ক'রে আমি ভুলতে পেরেছিলাম যে আমি একটা পোকায় কাটা মানুষ, দাগি যক্ষ্মা-রোগী—কী ক'রে পেরেছিলাম ঐ কথাটা পরমেশের কাছে গোপন করতে? কী-সহজ ছিলো আমার পক্ষে বিয়ের ফাঁদ এড়িয়ে যাওয়া—শুধু ঐ একটি কথা বলতাম যদি! আর এই আমি একদিন জাঁক ক'রে মনে-মনে বলেছিলাম—'স্ত্রী, সন্তান, সংসাব—ও-সব আমার জন্যে নয়! আমি আলাদা—আমি স্বাধীন।' আর সেই দাপটে পালিয়ে গিয়েছিলাম...তাকে ছেড়ে। দ্যাখো, আমি ছেড়ে দিতেও পারি! কষ্ট দিতে, কষ্ট পেতে আমার ভয় নেই! দ্যাখো, আমার ইচ্ছাশক্তির কী জোর! মিথ্যে—সব মিথ্যে—সবই নিজের সঙ্গে জোচ্চুরি তোমার—কিন্তু এখন আর ছটফট কোরো না; মেনে নাও যে এই চাকরি, এই বাড়ি, এই বিছানা—এ-ই তোমার সত্যিকার স্থান।

শ্রীপতির মনে পড়লো বিয়ের পরে প্রকৃতি ঠাকরুন কেমন সাবলীলভাবে কোলে টেনে নিয়েছিলেন তাকে, কেমন সহজে শুধু শরীর নিয়ে সে বেঁচে ছিলো কয়েকটা মাস, প্রণয়বন্যায় গা ঢেলে দিয়েছিলো। আর সেই ক-মাসের মধ্যেই বার্তা-সম্পাদকের পদ পেলো সে (স্ত্রী-ভাগ্যে ধন!), তার আয়ের অঙ্ক ময়নার পিত্রালয়ের উচ্চাশাকেও ছাড়িয়ে গেলো।—এবং আরো একটি ঘটনা, যাতে হঠাৎ যেন চমকে জেগে উঠলো শ্রীপতি।

ধরাধার্য ঘটনা, রোজ ঘটছে, ঘরে-ঘরে ঘটছে, কিন্তু শ্রীপতির গায়ে যেন কাঁটা দিলো এ-কথা ভেবে যে তারই রোগদুষ্ট বিষাক্ত বীজ থেকে জন্ম নিতে চলেছে অন্য একটা মানুষ। মাস দুই পর্যন্ত সে ব্যাকুল

ভাবে আশা করেছিলো যে অনুমানটা মিথ্যা—তিন আলাদা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলো ময়নাকে, তিনজনেই তাকে পিতৃত্বলাভের আশ্বাস দিয়েছিলেন। তারপর ভাবলো হয়তো দৈবাৎ গর্ভপাত হবে, কিন্তু সে-রকম কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না। কেমন যেন আতঙ্ক হ'লো শ্রীপতির, যখন সে লক্ষ করলো পঞ্চম মাস থেকে ময়নার উদর ও স্তনমণ্ডলের লক্ষণীয় স্ফীতি, বেড়ে-চলা খিদে, তার মুখে এক নতুন ধরনের জান্তব শ্রী, তার হাসিতে এক নতুন লোলুপতা—আর তারপর শুনলো ময়নার পেটের ওপর কান পেতে অজাত মানুষের নির্ভুল হৃৎস্পন্দন। নিজের ওপর কেমন ঘেন্না হ'লো শ্রীপতির, রাগ হ'লো ময়নার ওপর, মনে-মনে সে দোষী করলো ময়নার উৎসুক, গ্রহণ-তৎপর শরীরটাকে, দোষী করলো পরমেশ, পরমেশের স্ত্রী, আর ময়নার বাপের বাড়ির সব লোকেদের—যেন তাদেরই কোনো চক্রান্তের ফল এটা, যেন তাকে তারা পারিবারিক জালে বেঁধে ফেলতে চাচ্ছে—ঐ শিশুটির জন্ম ঘটিয়ে। এমন কি হ'তে পারে না মৃত শিশুর জন্ম দিলো ময়না, বা আঁতুড়েই তার জীবন শেষ হ'লো? এ-রকম কত হয় শোনা যায়। সে হবে এক সুস্থ, সবল শিশুর পিতা—এ কি সম্ভব? কিন্তু ময়না তার মা-বাবাকে আহ্লাদিত ক'রে যে-শিশুটির জন্ম দিলো তার ওজন সাড়ে-আট পাউন্ড, কণ্ঠবাদনে ও অঙ্গবিক্ষেপে প্রচুর স্বাস্থ্য প্রকাশ পাচ্ছে, তার মায়ের বুক থেকে দুধ টেনে নেবার প্রবল শব্দে শ্রীপতি কেঁপে উঠলো। অদৃষ্টের বিদ্রূপ—যে-জীবনকে সে এড়াতে চেয়েছিলো তার প্রতিশোধ!

এই সময় থেকে কয়েকটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটলো শ্রীপতির মনে ও জীবনযাত্রার ধরনে। 'সুপ্রভাত' বিষয়ে সব আগ্রহ সে হারিয়ে ফেললো হঠাৎ; নিজেকে আর মিলিয়ে দিতে পারে না তার চাকরির সঙ্গে, শুধু যান্ত্রিক অভ্যাসবশত আগের মতই নিপুণভাবে কাজ ক'রে যায়। এমনকি চাকরি ছেড়ে দেবার কল্পনা নিয়েও খেলা করে মাঝে-মাঝে, দিল্লির নিঃসঙ্গ সন্ধ্যাগুলির কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে—যেন ইচ্ছে করে সেই তীব্র তেতো দুঃখের স্বাদ আবার ফিরে পেতে। এতদিন পরে তার মনে পড়লো সেই প্রথম দু-খানা বইয়ের পরে সে আর-কিছু লেখেনি—যদিও কলম চালিয়েছে অবিরাম, আর তার সাংবাদিক 'রম্যরচনা'র একটি সংকলন বর্তমানে একটি 'বেস্টসেলার' বলেও গণ্য (এবং শোভাবাজার, ডায়মন্ডহার্বার বা বেহালার বিবিধ সাহিত্য-সমিতির কাছে, আর দুর্গাপুর বা ময়ূরভঞ্জ বা এলাহাবাদের বাঙালিদের কাছেও সে 'হালকা হাওয়া'র লেখক ব'লেই খ্যাতিমান); মনে পড়লো তার প্রথম বই দুটি বহুকাল ছাপা নেই, আর দিল্লিতে ব'সে আরো যে দু-একটা লেখা সে ভেবেছিলো সেগুলি তাকে অনেক আগেই পরিত্যাগ করেছে। সম্প্রতি সে মাঝে-মাঝে চেষ্টা করেছে সেগুলোকে ফিরিয়ে আনতে, বা নতুন কোনো লেখা ভাবতে; কিন্তু তার ভেতরটা যেন শূন্য, নিঃসাড়; সেখানে আর ভেসে ওঠে না কোনো অদৃশ্য রূপ, নিঃশব্দ কোনো সংলাপও শোনা যায় না; তরুণতম রাজহাঁসটি আজ খিড়কি পুকুরের মোটাসোটা পাতিহাঁসে পরিণত হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত নিজের স্বাস্থ্য বিষয়ে মনোযোগী ছিলো সে; কিন্তু এবার তার শরীরটার ওপর কেমন-একটা ঘৃণা জন্মালো তার (জোচ্চোর শরীর, যা তাকে বিয়ের পথে ঠেলে এনেছিলো!)—মনে হ'লো, যে-ফাঁদের মধ্যে সে প'ড়ে গেছে তা থেকে বেরিয়ে আসার একটা সম্ভবপর উপায় হ'তে পারে রোগ—বিশেষত কোনো ছোঁয়াচে রোগ যা মানুষকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেয়; সে যেন মনে-মনে প্রায় ইচ্ছে করলো তার ফুশফুশে আবার বাসা বাঁধুক বীজাণু। তার দৈনন্দিন জীবনকে সে ক'রে তুললো সুচিন্তিতভাবে নিয়মহীন ও উচ্ছৃঙ্খল; সময়মতো খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিলো, আত্মসমর্পণ করলো মদিরা দেবীকে, ক্লান্ত ও প্রেরণাহীন মন নিয়ে যৌবনের উদ্দামতাকে ফিরে পেতে চেষ্টা করলো। তার বাড়ি, ময়নার অতি যত্নে সাজানো পাঁচিল-ঘেরা আস্ত একতলাটি—তা খ'সে পড়লো তার জীবন থেকে, হ'য়ে উঠলো নেহাৎই একটি রাত্রে ঘুমোবার জায়গা, যেখানে কাজে অকাজে ক্লান্ত হ'য়ে, বা মদে বিহ্বল হ'য়ে—অগত্যা সে ফিরে আসে। তার এই পরিবর্তন ময়নার নজর এড়ায়নি অবশ্য; একটা সময়ে কিছুটা অশান্তি হয়েছিলো তার মদের বাড়াবাড়ি নিয়ে; কিন্তু শ্রীপতি খুব সাবধানে এড়িয়ে গেছে ঝগড়াঝাঁটি; বিছানায় এসে সদ্ভাবস্থাপনের বাঁধা উপায়টি অবলম্বন করেছে মাঝে-মাঝে; কোনো সাংসারিক কর্তব্যে ত্রুটি হ'তে দেয়নি; তার নিজের পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হিন্দি ফিল্ম দেখেছে ময়নার পাশে ব'সে; ফেরার পথে হঠাৎ কোনো শো-কেসের সামনে

গাড়ি থামিয়ে বলেছে, 'ঐ শাড়ির রংটা বেশ নতুন ধরনের। দেখবে নাকি?' এমনি ক'রে, ছোটো ছোটো, নির্দোষ কৌশলের সাহায্যে, সে ময়নার মনে এই ধারণা ফিরিয়ে এনেছে যে সে একজন অসাধারণ ভাগ্যবতী স্ত্রী; তাকে সাহায্য করেছে স্বামীর প্রতি ময়নার এক অন্ধ প্রশংসার দৃষ্টি, আর তার নতুন মাতৃত্ব, সন্তানের প্রতি স্নেহের উচ্ছ্বাস, আর তার বাপের বাড়ির লোকেদের কাছে স্বামীকে প্রায় এক 'আদর্শ পুরুষ' হিশেবে উপস্থিত করার চেষ্টা। 'এ-ই আমার জীবন,' মনে-মনে বললো শ্রীপতি, 'বাইরে থেকে দেখতে গেলে চমৎকার, কিন্তু ভেতরে কোনো শাঁস নেই, কেন্দ্র নেই; কাজ করছি, কথা বলছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি নেহাৎই ও-সব করতে হয় ব'লেই; আর চেপে রাখছি, দিনের পর দিন, আমার বিতৃষ্ণা! এ-ই আমার জীবন—আর আমার বয়স মাত্র আটত্রিশ, আরো অনেক লম্বা পাড়ি সামনে প'ড়ে আছে।'

দ্রুত একটা ভঙ্গি হ'লো শ্রীপতির শরীরে, বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। তার শব্দ শুনে ছুটে এলো ময়না। 'এখনই উঠে পড়লে? আরো খানিকটা ঘুমিয়ে নাও!' 'নাঃ!' 'চা দেবো?' 'আগে স্নান ক'রে নিই।' দাঁত মাজা, দাড়ি কামানো, স্নান, খাওয়া—ভাগ্যিশ এগুলো আছে জীবনে, দিনের পর দিন একই রকম সহজে ক'রে ওঠা যায়, কোনো নতুন চেষ্টার দরকার করে না। পাট-ভাঙা ধুতি পাঞ্জাবি প'রে বেরিয়ে এসে দেখলো, খাবার টেবিলে তার জন্য অপেক্ষা করছে ময়না আর ময়নার মা। সে যতক্ষণ চা আর অমলেট আর সন্দেশ খাচ্ছে, ততক্ষণ মহিলা দু-জন একটি ছোটোখাটো রাজনৈতিক তর্ক চালালেন; ময়না কংগ্রেসকে দোষ দিচ্ছে মন্ত্রীসভা ভেঙে যাবার জন্য, আর তার মা বলছেন নিজেদের মধ্যে দলাদলির জন্যই হ'লো এটা। তর্কটা যখন কয়েক মিনিটের মধ্যে রাষ্ট্রপতি-শাসন বনাম গণতন্ত্রে পৌঁছলো, তখন শ্রীপতির গলায় বিষম ঠেকলো হঠাৎ; ময়নার মা তার সামনে এক গ্লাশ জল রেখে বললেন, 'তুমি কী বলো, শ্রীপতি?' এক ঢোক জল গিলে, অমায়িক ভাবে হেসে শ্রীপতি জবাব দিলো, 'আমি ও-সব কিছু বুঝি না।' ময়নার মা একটু অন্যভাবে হেসে বললেন, 'তোমার এডিটরিয়েল চমৎকার হয়েছে আজ। চারটে কাগজ পড়লাম সকাল থেকে, তোমারটাই সবচেয়ে ভালো।' কোনো সুস্থ মানুষ (তার মতো দুর্ভাগা কোনো সাংবাদিক নয়) এক সকালের মধ্যে চারটে খবর কাগজের এডিটরিয়েল পর-পর প'ড়ে উঠতে পারে কেমন ক'রে, শ্রীপতি তা ভেবে পেলো না; খাবার টেবিলের ও-পাশে গুছিয়ে রাখা কাগজগুলোর প্রকাণ্ড হেডলাইনে চোখ পড়ামাত্র চোখ সরিয়ে নিলো সে, চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ময়না জিগেস করলো, 'আবার বেরুচ্ছো নাকি এখনই?' 'ঘুরে আসি একটু।' ময়না প্রতিবাদ করলো না, শ্রীপতির সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে এলো বাইরের বারান্দায়, তারপর নিচু গলায় কথা বলতে-বলতে ফটক পর্যন্ত এলো। 'কখন ফিরবে?' 'দেখি।' 'তাড়াতাড়ি ফিরো—খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিয়ো দুপুরবেলায়—কেমন?' 'হ্যাঁ—নিশ্চয়ই।' 'মা আজ তেল-কই রাঁধবেন তোমার জন্য, আর ইলিশের পাতুরি—এসো কিন্তু সময়মতো।' এর উত্তরে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ করলো শ্রীপতি। 'শোনো—মা আজ তিনদিন ধ'রে এসে আছেন, কালই হয়তো ফিরে যাবেন পাতিপুকুরে, তুমি কিন্তু একদিনও একটু ভালো ক'রে কথা বললে না ওঁর সঙ্গে।' 'কী-রকম কাজের চাপ দেখছো তো।' 'কিন্তু আজ আর আপিশে যাচ্ছো না নিশ্চয়ই?' 'দেখি।' শ্রীপতি রাস্তায় এসে গাড়ির দরজা খুললো, ফটকের ওপাশ থেকে ময়না আর-একবার বললো, 'একটার মধ্যে ফিরবে—ঠিক তো?' শ্রীপতি মনে-মনে বললো, 'আমাকে এখন এমন কোথাও যেতে হবে যেখানে রাজনীতি নিয়ে কেউ কথা বলবে না।' হিমেন্দুকে মনে পড়লো তার।

ডান দিকে কফির পেয়ালা, বাঁ দিকে একটি জ্বলন্ত সিগারেট-সমেত ছাইদান, সামনে একটি ইস্পাত-রঙের পোর্টেবল অলিভেটি (ম্যাডিসন, উইস্কনসিনে কিনেছিলো), টেবিলে আর টেবিলের লাগোয়া শেলফে অনেক বই ছড়ানো, ইংরেজি ভাষার দুটো অভিধান (অক্সফোর্ড আর ওয়েবস্টার), কয়েকটা পত্রিকাও—যেমন 'জর্নাল অব কম্প্যারেটিভ এস্থেটিক্স', 'ইয়েল ফ্রেঞ্চ স্টাডিজ'-এর একটা বিশেষ সংখ্যা (যাতে পেত্রুস বরেলের ওপর নতুন আলোকপাত করা হয়েছে), 'জর্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি'র দুটো ১৯৫৩-র সংখ্যা (যা সে দৈবাৎ ধরমতলার ফুটপাতে পেয়ে গিয়েছিলো), আর কেম্ব্রিজ, ইংলন্ডে ছাপা অধুনালুপ্ত 'ডেডেলাস' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি (ন্যুয়র্কের গথাম বুক মার্ট জোগাড় ক'রে দিয়েছিলো তাকে)—এই সব সহায়সম্বল নিয়ে হিমেন্দু চেষ্টা করছিলো ইংরেজিতে একটি প্রবন্ধ লিখতে। ডিসেম্বর মাসে হায়দ্রাবাদে সর্বভারতীয় ইংরেজি-শিক্ষক-সম্মেলন হবে, তাতে পড়ার জন্য বিদ্বজ্জনশোভন প্রবন্ধ। আনন্দবর্ধনের ধ্বনিবাদের সঙ্গে প্রথমে সিম্বলিস্ট কাব্যদর্শন, তারপর ইঙ্গ-মার্কিনী নিউ ক্রিটিসিজম-এর (এখন আর তা নতুন নেই অবশ্য) তুলনা ও প্রতিতুলনা তার অভিপ্রায়। বিষয়টা তার নিজের বেশ পছন্দ (অন্তত কয়েকদিন আগে পর্যন্ত তা-ই ছিলো), এ নিয়ে সে কিছুটা ভেবেওছিলো এক সময়ে (অন্তত তা-ই ধারণা ছিলো তার): কিন্তু এখন লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে যে ব্যাপারটা তার নিজের কাছেই ঝাপসা; যা-কিছু লিখতে যায় তারই বিরুদ্ধে কোনো না-কোনো যুক্তি মনে প'ড়ে যায় ব'লে তার আঙুল শূন্যে উঠেও টাইপরাইটারের চাবির ওপর নামতে পারে না। সে-মুহূর্তে তার সামনে আয়না থাকলে হিমেন্দু দেখতে পেতো, তার কপালে খুব মোটা হ'য়ে রেখা পড়েছে, পেছনে ছোটো দেখাচ্ছে চোখ, ঠোঁট বেঁকে আছে ব'লে গালের চামড়া কুঁচকে গিয়েছে। পোড়া কাগজের গন্ধ এলো তার নাকে, তাকিয়ে দেখলো জলন্ত সিগারেটটা ছোটো হ'তে-হ'তে অ্যাশট্রে থেকে খ'সে পড়েছে, কালো হ'য়ে গেছে টাইপ-করা একটা পাতার কোণের দিকটা। তাড়াতাড়ি দুমড়ে দিলো আধ-ইঞ্চি-পরিমাণ সিগারেটটাকে, পোড়া কাগজটা টেনে নিয়ে দু-এক লাইন প'ড়েই সরিয়ে রাখলো।—বাজে, অখাদ্য। কেন এই চেষ্টা, কেন ছেড়ে দিই না—আমি এটা না-লিখলে, বা হায়দ্রাবাদে না-গেলে, কী-ক্ষতি হবে জগৎসভ্যতার? হারদ্রাবাদে ঐ সম্মেলন না-হ'লেই বা কী-ক্ষতি হবে? কিছুই না, কোনো কারণ নেই এ-সবের—শুধু সময় কাটানো। কিছু করছি, কিছু হচ্ছে, আমি উপস্থিত আছি, ন'ড়ে-চ'ড়ে বেড়াচ্ছি—শুধু এই অনুভূতিটুকুর জন্য। জানি না অন্যদের কথা, আমার তো তা-ই মনে হয়। কিংবা হয়তো অন্যেরা টের পায় না, আমি পাই। এই যে এক-একটি পঞ্চাশ মিনিটের ক্লাশ নেবার জন্য আমি সারা সকাল বইয়ের ওপর নাক গুঁজে থাকি, সেশন শুরু হবার আগেই ছক কেটে ফেলি কোন ক্লাসে কোন তারিখে কী পড়াবো (যদিও আমাদের দেশের খুচরো ছুটি আর ধর্মঘটের ঝামেলায় নিয়মমাফিক কিছুই হ'য়ে ওঠে না)—সবই সময় কাটাবার জন্য। আসলে আমার কিছু করার নেই, তাই। আমার উইস্কনসিনের মাস্টারমশাইরা আমার মধ্যে 'স্কলার্লি অ্যাক্যুমেন' দেখতে পেয়েছিলেন ; রোমান্টিক সমালোচনা বিষয়ে আমার থীসিসের (পুরো শিরোনামা : '১৭৯৮ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত ইংলন্ডে ও ফ্রান্সে সমালোচনার পদ্ধতি বিষয়ক তুলনামূলক সন্দর্ভ,') প্রশংসা করেছিলেন ডর্সিনি, ভ্যান স্ট্রোম ও লেলিভেল্ডের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপকেরা ; তখন প্রায় বিশ্বাস করেছিলাম তাঁদের কথায়, নিজের বিষয়ে কিছুটা উচ্চতর ধারণা নিয়ে কলকাতায় ফিরেছিলাম। কিন্তু এখন মাত্র দেড় বছর পরে মনে হচ্ছে আমার ঐ নিবন্ধের পেছনে কোনো আবিষ্কারের উত্তেজনা ছিলো না ; ছিলো শুধু তিন-বছরব্যাপী নিয়মিত, নিদ্রাহীন, যান্ত্রিক ও কুৎসিত খাটুনি, শুধু দায়িত্বপালন ক'রে ওঠার নীরস তৃপ্তি ; বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি যে-বৃত্তি পাচ্ছি তার বিনিময়ে অন্তত দৃশ্যত কিছু দিতে পারার নিরানন্দ ও স্বল্পায়ু সুখ। আমার পরীক্ষকেরা কি ধরতে পারেননি যে আমি জমকালো গ্রীক-লাতিন শব্দের ধোঁয়া ছেড়ে লুকিয়ে রেখেছিলাম আমার ধারণার অস্পষ্টতা, দু-শো একান্নটি ফুটনোটের তলায় চাপা দিয়েছিলাম আমার দৃষ্টির অভাব—না কি তাঁরা নিজেরাও তা-ই ক'রে থাকেন, না কি চাকরি বজায়

রাখা ও তাতে উন্নতি করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যায়ামকেই বলে পাণ্ডিত্য? আমি যা লিখেছিলাম আর এখন যা লিখতে যাচ্ছি, তা তো শুধু সমালোচনার সমালোচনা—ভাষ্যের ওপরে ভাষ্য, কোনো আদি টীকার ওপর ছিয়াত্তর নম্বর উপটীকা হয়তো—কী-মূল্য এ-সবের? আর সমালোচনা—তারই বা মূল্য কতটুকু? যাতে সত্যি এসে যায় তা হ'লো কবিতা—না, কবিতাও নয়, জীবন, বেঁচে থাকা, বেঁচে থাকার সহজ আনন্দ। কিন্তু সেই জীবন—কোথায়?

অন্য কোনো সময় হ'লে হিমেন্দু হয়তো ঠিক উল্টো দিক থেকে দেখতো এই ব্যাপারটাকে; ভাবতো (আর সে তা বিশ্বাস করে না তা নয়, এটা প্রচারও করে বন্ধুমহলে)—ভাবতো যে পণ্ডিতেরাই যুগ-যুগ ধ'রে টিকিয়ে রাখেন সাহিত্যকে; যাকে ঐতিহ্য বলে, তাঁরাই সেটাকে চালিয়ে নিয়ে যান এক যুগ থেকে অন্য যুগে; পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি না-থাকলে (যেহেতু জনসাধারণ সর্বদাই মেতে থাকে শুধু সাম্প্রতিক ও সদ্যতনকে নিয়ে) কেউ হয়তো আর কালিদাস পড়তো না আজকের দিনে, শেক্সপীয়রের কোনো নাটক ছাপা থাকতো না, দান্তের নাম অস্পষ্ট একটা জনশ্রুতি হ'য়ে যেতো। যে-সব কবি পাণ্ডিত্য নিয়ে মনোরম বিদ্রূপ করেছেন (যেমন ইয়েটস, জীবনানন্দ) তাঁদের লেখা আজ থেকে একশো বছর পরেও যদি পঠিত ও প্রচারিত হয়, তাও হবে ঐ রক্ষণশীল ও আক্ষরিক অধ্যাপকদের জন্যই। কিন্তু সে-মুহূর্তে তার নিজের পেশার সপক্ষে একটি যুক্তিও মনে পড়লো না হিমেন্দুর; চারদিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেলো না, যা তার অস্তিত্বকে সমর্থন করে। অনেক বই আছে তার ঘরে, কিন্তু প্রাণের চঞ্চলতা নেই; অনেক তথ্য তার মগজে (হয়তো কিঞ্চিৎ চিন্তাশক্তিও), কিন্তু হৃদয় যেন বেকার হ'য়ে প'ড়ে আছে। আসলে হিমেন্দু উন্মন ছিলো তখন, মেজাজটা ঠিক ছিলো না। একটু আগে সুভদ্রা চালিহার চিঠি পেয়েছে; তার ডিনারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে সে. কাল আটটায় আসবে তার বাড়িতে। এই খবরটি হিমেন্দুকে পুলকিত না-ক'রে বরং দুশ্চিন্তায় ডুবিয়ে দিয়েছে। ডিনার—তার মানে হয়তো ঘণ্টা তিনেক কাটাতে হবে সুভদ্রার সঙ্গে—একা—নানাভাবে আপ্যায়ন করতে হবে তাকে; কী কথা বলবে? একবাব (বাংলায় এডওঅর্ড অল্‌বীর একটা নাটকের অভিনয় দেখার পর) তাকে বোঝাতে গিয়েছিলো যে এখন কার পশ্চিমী সাহিত্যে যা-কিছু নতুন ও নতুনতর চেষ্টা হচ্ছে, সেই সবেরই মূল

হ ে চ ছ

কাফকা; কিন্তু মিনিটপাঁচেক পরেই সুভদ্রার মুখে ক্লান্তির ছায়া দেখতে পেয়ে কিছুটা অপ্রস্তুতভাবে থামতে হয়েছিলো তাকে। আর্ট-ফিল্ম, পপ্‌-আর্ট, হিপি-জীবনদর্শন—এই সবই সে চেষ্টা করেছে একে-একে, কিন্তু কোনোটাতেই এগোতে পারেনি। নীরবতার মস্ত-মস্ত খানাখন্দ মাঝে-মঝে গজিয়ে উঠেছে তাদের মধ্যে, যদিও তারা চেনাশোনার এমন একটা স্তরে আছে এখন, যাতে পরস্পরকে বলার মতো অনেক কথা তাদের থাকা স্বাভাবিক। অন্যদের মধ্যে দেখা হ'লে বেশ কেটে যায় সময়টা, দু-পক্ষই বেশ সহজ ও হাসিখুশি; কিন্তু একা হ'লেই বিশ্রী একটা আড়ষ্টতা নামে যেন। কোনো-একটা কথা বোধহয় শুনতে চাচ্ছে সুভদ্রা, হিমেন্দুও বলবে ব'লে ভাবছে—কিন্তু পারে না—আসলে বোধহয় চায় না বলতে। সে এখন বিয়ে করবে ভাবছে, মনস্থির করেছে বলতে গেলে, তার পুরোনো দলের মধ্যে শুধু সে-ই এখনো অবিবাহিত, তার বয়স পঁয়ত্রিশ হ'লো, এর পরে বড্ড দেরি হ'য়ে যাবে হয়তো; তাছাড়া তার বই-পড়া বিদ্যে আর মগজ-ভর্তি তথ্যের নীরসতার একমাত্র প্রতিষেধক হ'লো—নারীর স্পর্শ, শারীরিক অর্থে, অন্য সব অর্থেও—অন্তত তা-ই মনে হচ্ছে হিমেন্দুর। দাম্পত্যের দিকে লক্ষ রেখেই সুভদ্রা চালিহার সঙ্গে মেলামেশা করছে সে (সুভদ্রার দিক থেকেও তা-ই); এবং আরো দুটি মেয়েকেও সম্ভবপর ব'লে মনে হচ্ছে তার—তার এম. এ. ক্লাশের ছাত্রী চটকদার চন্দ্রিকা (মাঝে-মাঝে আসে তার বাড়িতে পড়া বুঝে নিতে, কিন্তু সেটা যে ছুতো তাও বুঝিয়ে দেয়), আর শ্যামলী সেন (একটা নতুন নাটকের দলে অভিনয় করছে, অভ্যেস আছে কবিতা পড়ার, যা মেয়েদের মধ্যে বড়ো-একটা দেখা যায় না)—এদের মধ্যে যে-কোনো একজন তার স্ত্রী হ'তে পারে—যদি শুধু সে একটু এগিয়ে যায়। মেয়ে তিনটিকে মনে-মনে একবার ভেবে গেলো হিমেন্দু: শ্যামলী বোধহয় সবচেয়ে বুদ্ধিমতী এদের মধ্যে, কিন্তু তার আসল চেহারা তেমন ভালো না (যদিও মঞ্চে চমৎকার মানিয়ে যায়); চন্দ্রিকার চোখ

চমৎকার, কিন্তু শরীরের গড়ন একটু মোটার দিকে, আর যা বোঝে না তা নিয়েও হঠাৎ কথা ব'লে ফ্যালে ; সুভদ্রাকে প্রথম দেখে মনে হয়েছিলো প্রায় অজন্তার ছবির মতো—এমন লীলায়িত ও পেলবদর্শন তার শরীর, এমন নবীনস্নিগ্ধ গাত্রবর্ণ, কিন্তু এতদিনে তারও কয়েকটা খুঁত ধরা পড়েছে—দাঁত ভালো না, আর কলকাতায় কলেজে পড়া ও বসবাস সত্ত্বেও তার বাংলা উচ্চারণ থেকে অসমিয়া টান একেবারে দূর হয়নি এখনো।—কী আশ্চর্য, এ-সব কী ভাবছি আমি ; আমার তো মনে হওয়া উচিত ঐ একটু আবছা সুরে বাংলা বলাটাই সবচেয়ে মিষ্টি, দাঁত একটু আঁকাবাঁকা হবার জন্যই আরো সুন্দর দেখায় সুভদ্রাকে ; চন্দ্রিকার চোখের তরলতা দেখে আমার তো মুগ্ধ হ'য়ে যাওয়া উচিত ছিলো ; উচিত ছিলো 'চতুরঙ্গে'র নড়বড়ে নাট্যরূপটায় দামিনীর ভূমিকায় তার অভিনয় দেখার পর শ্যামলীকে আর ভুলতে না-পারা। আমি এত চেষ্টা করছি প্রেমে পড়তে—পারছি না কেন? চেষ্টা ক'রে প্রেম?—হাসি পেলো হিমেন্দুর, ঐ কথা দুটোই তো পরস্পরবিরোধী। কিন্তু তা-ই বা কেন? যদি স্থির ও অনিবার্য কিছু থাকবেই, তাহ'লে কেন এত ভাঙচুর, এত টালমাটাল? ছাত্রবয়স থেকে কম তো দেখিনি আশে-পাশে—প্রেমে পড়া, প্রেম কেটে যাওয়া, তাক-লাগানো সব অদলবদল, বিয়ে, বিয়ে ভাঙা, এই কলকাতাতেই—অন্য দেশের কথা ছেড়েই দিচ্ছি। তবু—এমন কোনো মুহূর্ত কি নেই, যখন চোখের তাকানোয়, বুকের শব্দে, গলার আওয়াজে—কী কারণে, কেমন ক'রে তা কেউ জানে না—কিন্তু হঠাৎ একসঙ্গে দু-জনের মধ্যেই কিছু-একটা ঘ'টে যায়, যাকে বলে মোক্ষম ব্যাপার তেমনি কিছু? তা-ই ভাবতে ভালোবাসি আমরা, কিন্তু আছে কি সত্যি? বোধ হয় নেই, বোধহয় সকলেই সেটা মনে-মনে বানিয়ে নেয়, বিশেষ একটা বয়সে, বিশেষ অবস্থায়, শরীর-মনের বিশেষ কতগুলো তাগিদের ফলে। আমাকেও তা-ই করতে হবে। মনস্থির করো, হিমেন্দু—এখনই, এই মুহূর্তে। কিন্তু— ? না, এর মধ্যে কোনো 'কিন্তু' আর টেনে এনো না, কালই তুমি বলবে সুভদ্রাকে। কালই। আচ্ছা, আচ্ছা, কালকের কথা কাল ভাবা যাবে (আরো দু-একজনকে খেতে বললে হয় না?—তাহ'লে বেশ কেটে যাবে সময়টা)—এখন দেখা যাক এই লেখাটাকে একটু এগিয়ে নেয়া যায় যদি। আজ আমার ক্লাশ নেই, সারাটা দিন ফাঁকা পাচ্ছি—বরং একেবারে প্রথম থেকে নতুন ক'রে শুরু করা যাক।

নিজের বিয়ের আর কালকের অতিথির ভাবনা আপাতত মন থেকে সরাতে পেরে হিমেন্দু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো ; টাইপ-রাইটারে বসানো কাগজটাতে যে-ক'টা শব্দ আধ ঘণ্টা আগে লিখেছিলো তা পড়তে লাগলো মন দিয়ে—এবারে আর তত খারাপ লাগলো না। একটা বাক্যের মাঝখানে কাজ থামিয়েছিলো, বোধহয় কোনো তারিখ দেখে নেবার জন্য। "The discordant schools...?' হঠাৎ খটকা লাগলো হিমেন্দুর ; 'discordant কথাটা ঠিক হলো কি এখানে? 'Dissident?' 'Contentious'? না কি 'contending'? না কি...? অভিধানের জন্য হাত বাড়িয়েছে সে, এমন সময় ধড়াম ক'রে তার ফ্ল্যাটের দরজা খুলে গেলো, আর বন্দনা ঘরে ঢুকে বললো, 'দুর্গাদাস কোথায়?'

৫

'বন্দনা! হঠাৎ এ-সময়ে?' চেয়ারে ঠেলে উঠে দাঁড়ালো হিমেন্দু, তার হাতের ধাক্কায় কফির পেয়ালাটা মেঝেতে প'ড়ে টুং ক'রে ভেঙে গেলো। মুহূর্তের জন্য হিমেন্দু ভেবে পেলো না আগে টুকরোগুলো তুলবে, না বন্দনাকে অভ্যর্থনা জানাবে, কিন্তু বন্দনা ততক্ষণে এগিয়ে এলো ঘরের মধ্যে, কিছু-একটা খোঁজার ধরনে চোখ বুলিয়ে গেলো চারদিকে, তারপর ঠিক একই সুরে আবার বললো 'দুর্গাদাস কোথায়?'

হিমেন্দু টুকরোগুলো তুলে ফেলে দিলো বাজে কাগজের ঝুড়িতে, সোজা হ'য়ে হাত ঝেড়ে বললো, 'আমি—আমি তো ঠিক—'কেমন যেন কাঁচুমাচু হ'লো তার ভঙ্গিটা, নিজের ওপর রাগ হ'লো সেজন্য।

'তাহ'লে তুমিও জানো না?' বন্দনার চোখে আর গলার সুরে স্পষ্ট অভিযোগ ফুটলো। 'তা-ই

তো—তোমাদের কার কী এসে যায়?' যত যাতনা আমার! জ্বালো, কালকের রাত্তিরটা আমার কী-ভাবে কেটেছে? আমি আজ সকাল থেকে কী করেছি তা জানো?'

ফ্ল্যাটের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে হিমেন্দু বললো, 'বোসো, বন্দনা। শান্ত হও।'

' "শান্ত হও!" বললেই হ'লো! আমার একটা মেয়ে আছে না? সংসার আছে না? আমাকে রাঁধতে হয়, বাজারে গিয়ে মাছ তরকারিও আনতে হয়, আবার আমি একটা চাকরি না-করলেও চলে না! আর এই সব-কিছুর ওপর—উঃ! কাল সারাটা রাত কী যে গেছে আমার ওপর দিয়ে! দশটা—এগারোটা—বারোটা—একটা—এলো না তো এলোই না। মেয়েকে নিয়ে আমি একা, অগত্যা পার্বতীকে রেখে দিলাম ব'লে-ক'য়ে (আমাদের ঝিয়ের কথা বলছি)—তা ওর থাকা না-থাকা সমান, ছেলেমানুষ—সন্ধে থেকেই ঘুমে কাদা। আমি একবার ভাবছি পুলিশে খবর দিই, একবার ভাবছি হাসপাতাল—কিন্তু এত রাত্রে টেলিফোনের জন্য তেতলার লোকেদের বিরক্ত করা যায় না, আর স্বামী বাড়ি ফেরেনি এটা লোকেদের জানতে দিতেও তো লজ্জা করে—আমি ছটফট করছি, সারা পাড়া নিঝুম, আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে আসছে, চোখের দু-পাতা এক করতে পারছি না—কী যে অবস্থা! আমার ইচ্ছে করছিলো ধ'রে একেবারে নির্দয় মার দিই দুর্গাদাসকে, ইচ্ছে করছিলো দেয়ালে ঠুকে নিজের মাথাটাই ফাটিয়ে দিই। এদিকে রাত দশটার খবরে বললো মন্ত্রীসভার পতন হয়েছে—কে জানে কোনো গোলমাল হচ্ছে কিনা শহরে, কোনো-একটা ধুয়ো পেলে তো আর কথা নেই আজকাল, অমনি ট্রামে আগুন, বাস্-এ আগুন, লাঠি, বোমা, বন্দুক—কী না? তুমি কিছু জানো, হিমেন্দু, শহরের খবর?'

'না তো। মন্ত্রীসভার খবরও এই প্রথম শুনলাম।'

'এই প্রথম শুনলে?' বাঁকা একটু হাসলো বন্দনা। 'ও—তা-ই তো। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে তুমি একজন এমন উঁচু দরের ইন্টেলেকচুয়েল যে রেডিওতে খবর শোনো না কখনো, সকালে একটা কাগজেও চোখ ফ্যালো না।'

এটা নিঃশব্দে হজম করলো হিমেন্দু, এতে তার অভ্যেস আছে।

'তা জগতের খবর, দেশের খবর কিছু না রাখো, অন্তত বন্ধুবান্ধবের খোঁজ-খবর তো নিতে পারো! চমৎকার বন্ধু তোমরা—যে যার মনে নিশ্চিন্ত সবাই! জানো, আমি সেই সাতটায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, আর এখন—' দেয়াল-তাকে রাখা হিমেন্দুর টাইম-পীসটায় চোখ ফেললো বন্দনা, তারপর অভ্যেসবশত নিজের কব্জি-ঘড়িতে—'তোমার ঘড়ি ফাস্ট যাচ্ছে, হিমেন্দু, এখন ঠিক পৌনে-দশটা—এই তিন ঘণ্টা ধ'রে ঘুরছি। প্রথমে মা-র বাড়িতে, সেখান থেকে আমার গানের স্কুলের প্রিন্সিপালকে চিঠি পাঠিয়ে দিলাম যে আমি আজ স্কুলে যেতে পারছি না ; তারপর যোধপুর পার্ক থেকে খানিকটা সাইক্ল-রিকশ আর খানিকটা টানা-রিকশ ক'রে টালিগঞ্জে শঙ্করের বাড়ি, তারপর বাস্-এ ক'রে পদ্মপুকুরে কমলাক্ষর কাছে, আবার সেখান থেকে বাস্ ধ'রে বিপিন পাল রোডে অর্জুনের বাড়ি, তারপর আবার ট্রামে ক'রে গড়িয়াহাটের মোড়ে, সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে তোমার কাছে বালিগঞ্জ প্লেসে। উঃ, কী বেপাড়াতেই বাড়ি নিয়েছো, হিমেন্দু, পৌঁছতে প্রাণান্ত। তার ওপর আবার তেতলা! আমার এত ক্লান্ত লাগছে—' হাতের উল্টো পিঠে ছোট্ট একটা হাই চাপলো বন্দনা।

হিমেন্দু আর-একবার কথা বলার সুযোগ পেলো, 'বোসো, বন্দনা। অত ব্যস্ত হোয়ো না।'

'ব্যস্ত হ'যেই বা কী করবো, বলো,' বন্দনা সোফায় গা এলিয়ে ব'সে পড়লো। 'আমার মাথা ঘুরছে—আর কোথায় ওকে খুঁজে বেড়াবো ভেবে পাচ্ছি না।'

হিমেন্দু তার লেখার টেবিলে ফিরে গেলো, চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বন্দনার মুখোমুখি ব'সে আস্তে বললো, 'অত ভাবছো কেন? দুর্গাদাস যে এই প্রথম বাইরে রাত কাটালো তা তো নয়।'

'আগে অন্তত একটা ফোন করতো আমাদের তেতলার ফ্ল্যাটে, মিথ্যে ক'রেও একটা ওজুহাত দিতো যা হোক, আর তখন আমার শাশুড়িও ছিলেন—এত বেশি ভয় করতো না আমার। আমার শাশুড়ি বলতেন, "তুমি ঘুমোও, বৌমা, মণ্টু ঠিক চ'লে আসবে।" কোনো উদ্বেগ নেই—বহুদিন ধ'রে দেখে আসছেন তো ছেলেকে! জানো, আমার এত রাগ হয় শাশুড়ির ওপর—উনি ছেলেবেলায় শাসন করতে

পারেননি ব'লেই তো এত অসভ্য হয়েছে দুর্গাদাস। এই কথাটা একদিন বলেছিলাম আমি—খুব রেগেই বলেছিলাম—তারপর এক কথা দু-কথায় এমন লেগে গেলো যে শাশুড়ি গোঁসা ক'রে কাশী চ'লে গেলেন—তা আমার কিছুই এসে যায় না তাতে, কিন্তু—জানো, আমাকেই পত্রদ্বারা কুশল-সংবাদ নিতে হয়, মনি-অর্ডারে টাকাও পাঠাতে হয় আমাকেই—দুর্গাদাসকে জিগেস কোরো তো এক ছত্র পোস্টকার্ড লিখেও মা-র খবর নেয় কিনা কখনো! আমি না হয় বৌ, পরের মেয়ে—কিন্তু বিধবা মা, কত কষ্ট ক'রে মানুষ করেছেন, তাঁর জন্যেও কি দরদ থাকতে নেই? তা কী আর হবে—তোমরা তো আর দশাচল গেরস্ত নও যে মা-কে ভালোবাসবে—তোমরা হ'লে গিয়ে "আউটসাইডার"! আর মা-ও তেমনি—ছেলে যা করে তা-ই ষাট-ষাট, মাতাল হ'য়ে বাড়ি ফিরলেও মুখে টুঁ শব্দটি নেই, না ব'লে-ক'য়ে দমদমে কি নৈহাটিতে বন্ধুর বাড়িতে রাত কাটালেও পরদিন একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করেন না, "কোথায় ছিলি?" একটু থামলো বন্দনা, হঠাৎ তীব্র বেগে খাড়া হ'য়ে ব'সে আবার বলতে লাগলো, 'আর এই এক পাপ জুটেছে আজকাল : মদ। এই যে বাড়ি ফেরে না, তার অর্থ হ'লো মোদো পার্টি বসেছে কোথাও—এ-ই তো? আমি সাহিত্যিক, তাই মদ খাই। আমি আধুনিক, তাই মদ খাই। আমি আলোকপ্রাপ্ত, তাই মদ খাই। যে মদ খায় না, সে একটা গো-টু-হেল্ বাঙাল। এখন আবার শুনছি মদেও শানাচ্ছে না—গাঁজা চাই, চণ্ডু চাই, এল. এস. ডি. চাই। নতুন এক আপদ—' দম নেবার জন্য আবার একটু থামলো বন্দনা, তার নাকে বাঁশি দুটি ফুলে উঠলো উত্তেজনায়, এলোখোঁপা ভেঙে চুল পিঠে খ'সে পড়লো—'নতুন এক আপদ জুটেছে ঐ বীটগুষ্টি—দাড়িওলা নোংরা ভূত কতগুলো, গায়ের দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ানো যায় না—তা তোরা নিজেদের দেশে যত ইচ্ছে রাস্তায় গড়া না, আমাদের এই গরিব দেশের ছেলেগুলোকে বখাতে আসিস কেন? পেটে ভাত নেই, তায় আবাব এল এস. ডি! কিছু বলাও যাবে না—সকলেই পিড়িংপিড়িং পদ্য লেখে, বা কখনো লিখেছিলো, বা পরে লিখবে—তাই সাত খুন মাপ!' জোরে একটা নিশ্বাস ছাড়লো বন্দনা, তারপর রাগের বদলে নৈরাশ্যেব সুরে বললো, 'আর কাকেই বা কী বলবো, চারদিকেই এই চলছে। তোমারও নাকি জিন না-হ'লে সন্ধে কাটে না, হিমেন্দু?'

হিমেন্দুর ঠোঁট কুঁচকে গেলো, মুখের ভাবটা হ'লো হাসির মতো, যদিও তার মনের আশে-পাশে আমোদের ছিটেফোঁটাও ছিলো না। এতক্ষণ ধ'রে বন্দনাকে কিছু বলার জন্য তৈরি হচ্ছিলো সে. মনে-মনে যে-যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতাটি সাজিয়েছিলো তা অনেকটা এই রকম :—'শোনো, বন্দনা, দুর্গাদাস যা-কিছু করে কিংবা করে না তার জন্য দুর্গাদাসের মা-কে, বা তার বন্ধুদের, বা আমেরিকান বীটদের, বা আলবেয়ার কাম্যুকে, বা কলকাতার তরুণ কবি বা অকবিদের দোষী করা তোমার উচিত হচ্ছে না : দুর্গাদাস একজন প্রাপ্তবয়স্ক সাবালক (নেহাৎ ছেলে-ছোকরাও নয়, পঁয়ত্রিশ-পেরোনো ভদ্রলোক রীতিমতো), তার আচার-আচরণের জন্য শুধু তাকেই দায়ী করতে হবে। তুমিও ছেলেমানুষ নও, বন্দনা; তোমার বোঝা উচিত কী নির্বোধের মতো তুমি কথা বলো এক-এক সময়, কী নিষ্ঠুরের মতো কথা বলো। তুমি ধ'রে নিয়েছো আমি কিছু মনে করবো না; কেননা তোমার ওপর আমার দুর্বলতা ছিলো এককালে, এখনো একেবারে নেই তা নয়। আমি তোমাকে বারো বছর ধ'রে চিনি, বন্দনা, যখন তুমি সবেমাত্র কলেজে ঢুকেছো তখন থেকে; তোমার অনেক সুখদুঃখ হাসিকান্না চোখে দেখেছি আমি, কিছু অংশও তাতে নিয়েছিলাম এক সময়ে; যখন তুমি গৌতমের জন্য কেঁদে-কেঁদে ফ্যাকাশে হ'য়ে যাচ্ছিলে তখন তোমাকে সান্ত্বনা দেবারও চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে—যদিও তোমার হৃদয় তোমাকে অনেকবার অনেক দিকে ছুটিয়ে নিয়েছে—তুমি আমাকে একজন সম্ভবপর পাণিপ্রার্থী ব'লে কল্পনাও করোনি কখনো। আর তারপর—আমি আমেরিকায় যাবার দু-মাস আগে যেবার আমরা বর্ষামঙ্গলে শান্তিনিকেতনে গেলাম দল বেঁধে—হঠাৎ, দুর্গাদাসের গান শুনে, তার সঙ্গে একদিন আম্রকুঞ্জে বৃষ্টিতে ভিজে, আর একদিন সূর্যাস্তের সময় সাঁওতাল গ্রামে হেঁটে বেড়িয়ে, তুমি পাগলের মতো তার প্রেমে প'ড়ে গেলে—যে-দুর্গাদাসকে বহুকাল ধ'রে চেনো তুমি, যার গান তুমি আগে অন্তত দু-শো বার শুনেছিলে, যার দোষগুণ কিছুই তোমার অজানা ছিলো না—সুশ্রী, উৎসাহী, সদাপ্রফুল্ল,

বন্ধুবৎসল দুর্গাদাস, কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানের নামগন্ধ যার স্বভাবে নেই, যে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কারো বাড়ি আসবে বললে ধ'রে নেয়া যায় যে শুক্কুরবারের আগে আর দেখা দেবে না, যে তোমাকেই একবার তিনটের সময় কফি-হাউসে হাজির থাকতে ব'লে নিজে এসেছিলো পৌনে-পাঁচটায়, তোমাদের বিয়ের মাত্র এগারোদিন আগে—সেই মনোহরণ দুর্গাদাস। আর দুর্গাদাসও মুহূর্তে ভুলে গেলো তাব বাল্যসখী অমলাকে, যার সঙ্গে পাঁচ বছর ধ'রে তার বিয়ে ঠিক হ'য়ে ছিলো—সেই অমলা, যে কত সময় ট্যুশনি করে তাকে চালিয়েছে, যার মা-র স্নেহযত্ন ছেলেবেলা থেকে সে ভোগ করেছিলো। একেই বলে চোখে-চোখে বিদ্যুৎ, বিখ্যাত প্রেমান্ধতা, বা নিয়তি—বা যা-ই বলো না। আমি বুঝতে পারছি তুমি কষ্ট পাচ্ছো, তোমার জন্য পূর্ণ সহানুভূতি আছে আমার, কিন্তু তুমিই বলো, আমি কী করতে পারি? ভেবে দ্যাখো, আজ সেই তুমি যদি সেই আমাকে খোঁটা দাও—আমি কাগজ পড়ি না ব'লে বা জিন খাই ব'লে—কি এমনভাবে কথা বলো যেন তোমার প্রতি দুর্গাদাসের দুর্ব্যবহারের জন্য আমি কোনো সূক্ষ্মভাবে দায়ী, কি পরোক্ষভাবে আমারও তাতে কোনো হাত আছে—সেটা কি অন্যায় হয় না? তোমার কি একটু সুবিচারবোধও নেই, বন্দনা? তুমি অমলাকেও চিনতে, জানতে পুরো ব্যাপারটা, কিন্তু—অন্য কারো কথা ভাবার মতো মনের অবস্থা তখন ছিলো না তোমার। তা যাকগে, তোমাদের বিয়ে তোমাদেরই ব্যাপার, তা থেকে কোনো সমস্যা যদি দেখা দিয়ে থাকে তাও তোমাদের, তা নিয়ে আমাব সঙ্গে কথা ব'লে লাভ কী? তুমি তো দেখতে পাচ্ছো আমি ব্যস্ত আছি, আমার টাইপরাইটাবে কাগজ চড়ানো, আমি কাজ করছিলাম—এতক্ষণ ধ'রে তোমার বিলাপ শুনেছি তুমি নেহাৎই একজন মহিলা ব'লে, তাছাড়া তোমাক আঘাত দেয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ব'লেও—কিন্তু আর না, এবার তুমি বাড়ি যাও। তুমি হয়তো ধারণা কবতে পাবো না যে আমারও দু-একটা ব্যক্তিগত সমস্যা আছে, অন্য কারো জীবনেব মধ্যে আমি এখন জড়াতে চাই না, এমনকি, বন্দনা, তোমারও নয়।'—মনে-মনে এমনি ভেবেছিলো হিমেন্দু—ভাঁজে-ভাঁজে অনেক যুক্তি সাজিয়েছিলো— কিন্তু তার মুখ দিয়ে যা বেরোলো তা শুধু এই: 'আমার মনে হয় দুর্গাদাস পাইকপাড়ায় পল্লবেব বাড়িতে ছিলো কাল বাত্রে, এতক্ষণে হয়তো এসেও গেছে, তুমি বাড়ি গেলেই তাকে দেখতে পাবে।'

কথাটা শুনে মুহূর্তেব জন্য একটু চঞ্চল হ'লো বন্দনা, ওঠার মতো একটা ভঙ্গি হ'লো তার শরীরে, কিন্তু তক্ষুনি সোফাব পিঠে হেলান দিয়ে বললো, 'আসুক, এসে ঘুরে বেড়াক রাস্তায়-রাস্তায়। বাড়ি ছেড়ে থাকতে অতই যদি সুখ তাহ'লে আর ফেরা কেন? আমি করেছি কী জানো না, ফ্ল্যাটেব দরজায় ডবল-তালা লাগিযে বেবিয়ে এসেছি। কোয়েলিয়াকে রেখে এসেছি মা-র কাছে—'

হিমেন্দু জিগেস না-ক'রে, পারলো না 'মেয়েব নাম না মিতা বেখেছিলে, আবার কোযেলিয়া হ'লো কবে থেকে?'

'ও, তা বুঝি জানো না? দুর্গাদাস কোথায় একদিন শুনে এলো গৌতম তার মেয়ের নাম মিতা রেখেছে—তক্ষুনি ভেবে-ভেবে কোয়েলিয়া নাম বের করলো। মেযে গাইয়ে হবে, এই আশা।'

'তা তো হ'তেই পারে—মা-বাবা দু-জনেই গাইয়ে যখন।'

'আর গাইয়ে! গান দিয়ে এখন রুটি পাকাচ্ছি—এ-ই তো তার পরিণাম। ভালো কি লাগে, বলো, সপ্তাহে পাঁচদিন তিন ঘণ্টা ধ'রে এক দঙ্গল বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে কোরাস গাইতে—ববীন্দ্র-সংগীত নিম-তেতো হ'যে গেলো! কিন্তু উপায় কী—সংসার যে চলে না তা না-হ'লে। জিনিশপত্রের কী দাম রে বাবা—দিনে-দিনে বেড়ে চলেছে তো বেড়েই চলেছে। তুমি বেশ আছো, হিমেন্দু, বিয়ে করোনি, নয়া পয়সা গুনতে হয় না—দিব্যি ঝাড়া-ঝাপটা!'

এ-কথার উত্তরে হিমেন্দু খুব মৃদুভাবে একবার কাশলো।

'না, আমি চাই না আমার মেয়ে গাইয়ে হোক। আমি ভেবেছি কী, জানো—মেয়েকে প্রেম-রোগে ধরার আগেই সাত পাকে বেঁধে ফেলবো। কোনোমতে স্কুল পেরোতে-না-পেরোতেই ঘর-বর দেখে বিয়ে। নিজে ঢের ঢের জ্বালায় জ্বলেছি—কোয়েলিয়ার জন্য আমি চাই সুখের জীবন, সুস্থির জীবন।—তা কোয়েলিয়া নামটা বেশ ভেবেছে দুর্গাদাস—কী বলো? আর কারো ও-নাম শুনিনি।'

হিমেন্দু চুল টেনে বললো, 'সুন্দর নাম। কিন্তু দুর্গাদাস যদি গাইয়ে অর্থে ভেবে থাকে তাহ'লে ভুল করেছে—মেয়ে-কোকিল গান গায় না।'

'উঃ—সবটা নিয়ে গুরুগিরি কোরো না তো—তুমি একটা কী!' কথাটা ব'লেই আশ্চর্য দ্রুত বেগে ভাবান্তর হ'লো বন্দনার, আগের কথার জের টেনে তক্ষুনি আবার বলতে লাগলো, 'তা বাপের সোহাগের দৌড় কত তা তো দেখাই যাচ্ছে—বাঁচলো না মরলো তারই হুঁশ নেই! ছী-ছি, কী লজ্জা, সকাল থেকে লোকেদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ানো—"দুর্গাদাস কোথায় জানো তোমরা? তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো দুর্গাদাসের?" লোকেরা ভাবেই বা কী, আর আমারই বা কেমন লাগে! কিন্তু কী করবো—যত দায় তো আমারই—আর তো কারো কিছু নয়। সত্যি—সত্যি আর সহ্য হচ্ছে না আমার, আমি প্রতিশোধ নেবো, ওকে শাস্তি না-দিয়ে ছাড়বো না! কিন্তু—এই যে ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে এলাম, তাতে আর কী শাস্তি হবে ওর? কোথায় স্ত্রী, কোথায় মেয়ে তা কি ভাববে একবারও? দিব্যি চ'লে যাবে আবার কোনো বন্ধুর বাড়িতে, আর নয়তো—খুব ক্লান্ত থাকে যদি, তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে ধড়াম ক'রে বিছানায় পড়বে। সর্বনাশ—' হঠাৎ চমকে উঠলো বন্দনা, আবার খাড়া হ'য়ে বসলো, 'বিলেতি তালা, মা দিয়েছিলেন আমাকে, ও-রকম আর পাওয়া যায় না আজকাল—ভেঙে ফেললে তো মুশকিল!'

এই সুযোগে হিমেন্দু আর-একবার বললো, 'তুমি বরং বাড়ি যাও, বন্দনা।' তারপর একটা বেফাঁস কথা বেরিয়ে গেলো তার মুখ দিয়ে—'দরজায় তালা দেখে দুর্গাদাস আবার রাগারাগি না করে।'

'করুক! করুক!' মেঝেতে স্যান্ডেল ঠুকে দাঁতের ফাঁকে ফোঁশ ক'রে উঠলো বন্দনা, 'আমার কী এসে যায়? "দুর্গাদাস রাগারাগি করবে!" তুমি, হিমেন্দু—তোমার লজ্জা করলো না কোনো বুড়ি শাশুড়ির মতো আমাকে ও-কথা বলতে? আমি কেউ নই, আমি কিছু নই—আমাকে মুখ বুজে সব মেনে নিতে হবে! কিন্তু না হাজার বার না! দুর্গাদাসের অমলাকেই বিয়ে করা উচিত ছিলো—কাদার তালের মতো মানুষ, মাড়িয়ে গেলেও টুঁ শব্দটি করতো না!'

বন্দনার শেষ কথাটা শুনে হিমেন্দুর শরীর যেন মুচড়ে উঠলো। একটু পরে ঠাণ্ডা গলায় জিগেস করলো, 'অমলার সঙ্গে তোমার দেখা-টেখা হয় নাকি?'

'ওর স্কুল আর আমার গানের স্কুল একই পাড়ায় তো—হঠাৎ মাঝ-মাঝে বাস্ এ দেখা হ'যে যায়। কী চেহারা হয়েছে! চুল পাৎলা, গাল ভাঙা, মুখে যেটুকু লাবণ্য ছিলো তা যেন ডাইনিতে শুষে নিয়েছে। একেবারে সাত বুড়ির এক বুড়ি—টিপিকল্ আদ্যিকালের হেডমাস্টারনি! তা কী আর হবে—ওর নিজেরই বোকামি, মা মারা গেলেন, সময় থাকতে বিয়েও করলো না—কোন একটা অনাথ মেয়েকে পুষ্যি নিয়েছে বোধহয়—হারানো প্রেমের স্মৃতিপূজার এ-ই তো পুরস্কার!'

হিমেন্দু চোখ নামিয়ে নিলো, মুহূর্তের জন্য বন্দনার মুখের দিকে যেন তাকাতে পারলো না। মেঝের দিকে তাকিয়েই আস্তে-আস্তে বলতে লাগলো, 'আমিও একদিন দেখেছিলাম অমলাকে, অমলা ব'লে চিনতে দেরি হয়েছিলো যদিও। গড়িয়াহাট বাজার থেকে বেরিয়ে ফুটপাত ধ'রে হাঁটছিলো—হাতের ব্যাগ থেকে ফুলকপির ডাঁটা বেরিয়ে আছে, আর-এক হাতে কয়েকটা স্কুলের খাতা, একটু বেঁকে গিয়েছে ভারে, আস্তে-আস্তে রাস্তার ভিড় আর কুয়াশার মধ্যে ছায়ার মতো মিলিয়ে গেলো। আমার ইচ্ছে হচ্ছিলো একটু কথা বলি—কিন্তু আমার সঙ্গে তেমন আলাপ তো ছিলো না কখনো—আর তাছাড়া, কী বা বলবো।'

'তা তুমি যত ইচ্ছে দরদ দেখাতে পারো অমলার জন্য, কিন্তু আমি নিজের ভাবনা ভেবেই কূল পাই না। ঐ মেয়েটা—শুধু আমার মেয়েটার জন্যই আটকে আছি আমি, নয়তো কি আর একদিনও থাকতাম দুর্গাদাসের সঙ্গে! ও আমাকে বলে কী, জানো—"আমি তো চাইনি, তুমিই তো যেচে আমাকে বিয়ে করেছিলে!" আর—সেটাই সত্যি! সেটাই সত্যি! আমিই চেয়েছিলাম! হঠাৎ যেন বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছিলো আমার—মনে হয়েছিলো দুর্গাদাসকে পেলেই হাতে স্বর্গ পাবো। কিন্তু হিমেন্দু—তুমি তো ঠাণ্ডা মাথার স্থির বুদ্ধির মানুষ—তুমি তো আমার কাছে ছিলে সারাক্ষণ—কেন তুমি বারণ করোনি

আমাকে, কেন ওর হাত থেকে আমাকে বাঁচাওনি—' বলতে-বলতে বন্দনার চোখ ছাপিয়ে জল এলো, একেবারে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে ভাঙা গলায় ব'লে উঠলো, 'কেন তুমি আমাকে বিয়ে করোনি, হিমেন্দু?'

হিমেন্দুর সারা মুখে একটি গভীর লাল রং ছড়িয়ে পড়লো, মাথা নিচু করলো সে, একগোছা চুল আস্তে-আস্তে জড়াতে লাগলো আঙুলে। পর-পর কয়েকটা ভাবনার ঢেউ তার মনের মধ্যে উথলে উঠলো। 'বন্দনা, তুমি এত হৃদয়হীন, ও-রকম ক'রে কথা বলতে পারো অমলার বিষয়ে—আর আমারও সঙ্গে!' এই অনুচ্চারিত প্রতিবাদের ওপর বেদনার ছায়া নেমে এলো তক্ষুনি : 'ছি, বন্দনা, ও-রকম কথা বলতে হয় না তাও কি জানো না তুমি? মনে-মনে ভাবলেও মুখে আনতে হয় না কখনো। তুমি নিজেকে অত ছোটো করছো কেন, তুমি কি সব ভুলে গিয়েছো?' অনেক পুরোনো সেই দিনগুলি ফিরে এলো হিমেন্দুর মনে—টাটকা এম. এ. পাশ ক'রে বালিগঞ্জে একটা ছোটো, নতুন মেয়ে-কলেজে পড়াচ্ছে তখন—বন্দনার এক পিসতুতো দিদি সেখানে প্রিন্সিপাল—সেই সূত্রেই আলাপ হ'লো প্রথম।—ছিপছিপে ছিলো তখন বন্দনা, কিছুটা এলোমেলো, অসহায়মতো—আস্তে-আস্তে কোনো-কোনো ব্যাপারে তারই ওপর নির্ভর করছে বন্দনা, সে তাকে উৎসাহ দিচ্ছে বাংলায় এম. এ. দেবার জন্য, ঘুরে-ঘুরে বই জোগাড় ক'রে দিচ্ছে তাকে; পড়াবার জন্য নিজে প'ড়ে ফেলেছে দীনেশ সেন, সুকুমার সেন, কবিকঙ্কণ, রবীন্দ্রসংগীত বিষয়েও অনেকগুলো বই প'ড়ে ফেলেছিলো—তারই জন্য। একটা ছোট্ট ঘটনা হিমেন্দুব মনে প'ড়ে গেলো—শ্রীপতির ঘরে হঠাৎ একদিন আরতির সঙ্গে গৌতমকে দেখতে পেয়ে বন্দনা কেমন আকুল হ'য়ে কেঁদেছিলো। হিমেন্দু তখন কিছুটা জড়িয়ে পড়েছিলো এদের ভালোবাসাবাসির ব্যাপারে—সাহায্যকারী বা সান্ত্বনাদাতার ভূমিকায়। তা-ই নিয়ে তৃপ্ত ছিলো সে; মনে-মনে যদি অন্য আশা থেকেও থাকে তা ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয়নি। কিন্তু—সে যতই লুকিয়ে রেখে থাকে, বন্দনা বোঝেনি তা কি সম্ভব? তাহ'লে কী ক'রে—কী ক'রে সে বলতে পারলো, 'তুমি আমাকে বিয়ে করোনি কেন?' হিমেন্দু মনে-মনে বললো, 'বন্দনা, তুমি সংযত হ'তে শেখো; আগে যা ছিলো তোমার মধ্যে মধুর সরলতা, এখন তা-ই বোকামির স্তরে নেমে আসছে: আগে তোমার যে-পরনির্ভরতা তোমাকে আরো প্রিয় ক'রে তুলেছিলো আমার কাছে, এখন সেটা অন্যের প্রতি নিষ্ঠুরতায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।'—একবার তাকালো সে বন্দনার দিকে; সোফার পিঠে এক হাত রেখে মুখ গুঁজে আছে বন্দনা, কান্নার বেগে একটু-একটু কেঁপে উঠছে। কষ্ট পাচ্ছে—ও কষ্ট পাচ্ছে, আমি পাচ্ছি না। একবার একজনকে না-পেয়ে কেঁদেছিলো; যাকে পেলো তাকে নিয়েও এখন কান্নাকাটি—দুর্ভাগ্য, তা ছাড়া আব কী বলা যায়? এদিকে দুর্গাদাস যাকে বিয়ে করলো না সেও দুঃখী, যাকে করলে সেও সুখী নয়—দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী বলা যায়? কিন্তু কেন—যে-আমি ওদের সব তোলপাড়ের বাইরে, সেই আমার ওপর কেন এই করুণার চাপ, কেন আমার হৃদয়বৃত্তির ওপর এই অত্যাচার? বন্দনার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলো সে; না, ঠিক করুণাও নয়, স্নেহের কাছাকাছি একটা আবেগে দুলে উঠলো তার বুকের ভেতরটা। আমি কি উঠে যাবো, ওর পাশে বসবো, ওর কাঁধে হাত রাখবো, হাতে হাত রাখবো, আমি কি ওর চুলে হাত বুলিয়ে বলবো: 'কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।' কিন্তু যদি তার কয়েক ধাপ পরেই অন্য এক কথা বলতে হয়: 'তুমি ছেড়ে দাও দুর্গাদাসকে, আমি তোমাকে বিয়ে করবো, কোয়েলিয়া আমার মেয়ে হবে—'? হিমেন্দুর মনে হ'লো, পরবর্তী কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা জরুরি সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাকে, যা বদলে দেবে তার সমস্ত জীবন। হিমেন্দু চেয়ার ছেড়ে উঠলো, দু-পা এগিয়ে গেলো বন্দনার দিকে, কিন্তু হঠাৎ অন্য একটা চিন্তা থামিয়ে দিলো তার চলার বেগ, অন্য সব-কিছু ছাপিয়ে উঠলো তার সহজাত কাণ্ডজ্ঞান, তার যুক্তিনিষ্ঠা। না—বন্দনা কখনো অত দূর এগোবে না, ও দুর্বল, যুদ্ধ করার মতো সাহস ওর নেই। আর তাছাড়া দুর্গাদাস ওকে নিবাশ করেছে ব'লেই আমার দিকে ওর মন টলেছে বা কখনো টলবে, এমন কোনো কথা তো নেই। বারো বছবেব মধ্যে যা কখনো হয়নি, হঠাৎ আজ ভোজবাজির মতো তা হ'তে যাবে কেন? যদি বন্দনা কখনো দুর্গাদাসকে ছেড়ে চ'লে যায়, তা যাবে অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে, আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই নয়। আর আমি—আমিই কি সত্যি ভালোবাসি বন্দনাকে, এখনকার বন্দনাকে, না কি কখনোই বেসেছিলাম? তেমন যদি জোয়ার আসতো

আমার মধ্যে, তাহ'লে আমি কি ওকে ভাসিয়ে নিতে পারতাম না?...নিজের যুক্তির কাছে সম্পূর্ণ পরাস্ত হ'য়ে মাথা নিচু করলো হিমেন্দু, চেষ্টা করলো সুভদ্রা চালিহার মূর্তিটিকে মনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে, তা দিয়ে চাপা দিতে এ-মুহূর্তে আবেদনময়ী বন্দনাকে। এই আমি মনস্থির করলাম, আমি সুভদ্রাকে ভালোবাসি, আমি সুভদ্রাকে বিয়ে করবো। 'বন্দনা!...বন্দনা।' গম্ভীর গলায় দু-বার ডাকলো হিমেন্দু, বন্দনার দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ শুনলো। 'বন্দনা, বাড়ি যাবে না? চলো আমি তোমাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।' 'তোমাকে আসতে হবে না।' আস্তে-আস্তে মুখ ফিরিয়ে তাকালো বন্দনা, ব্যাগের মুখ খুলে রুমাল বের করলো। 'আমি এখন মা-র বাড়িতে যাচ্ছি। দুর্গাদাসের সঙ্গে দেখা হ'লে বোলো—' কথা শেষ না-ক'রে হঠাৎ উৎকর্ণ হ'লো সে, সিঁড়িতে শোনা গেলো কয়েকটা পায়ের শব্দ, আর দুর্গাদাসের দরাজ গলায় গানের কলি—'শীতের হাওয়ায়—লাগলো নাচন—লাগলো নাচন—' আর সঙ্গে-সঙ্গে চকিত হ'য়ে চোখ-মুখ মুছে বন্দনা গুছিয়ে বসলো, সামনের টেবিলের ওপর প'ড়ে-থাকা বইটা তুলে নিয়ে খুলে ধরলো চোখের সামনে।

৬

'লাগলো নাচন—আমলকির ঐ—ডালে—'

'লজ্জা করে না?' হঠাৎ তালভঙ্গ হ'লো; দুর্গাদাসের দরাজ গলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো বন্দনার ছুঁচোলো চীৎকার—'লজ্জা করে না তোমার—' কিন্তু তক্ষুনি দুর্গাদাসের পেছনে ঝাপসাভাবে অন্যদেব দেখতে পেয়ে বাকি কথাগুলো গিলে ফেললো বন্দনা, ক্ষিপ্র হাতে তার হাত-ব্যাগটি তুলে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলো ঘর ছেড়ে। আব হিমেন্দু সেই অস্বস্তিকর মুহূর্তটাকে চাপা দেবার জন্য দরজার ধাবে ছুটে গেলো : অপ্রতিভ মুখে যথাসাধ্য হাসি টেনে অভ্যর্থনা করলো অন্য দু-জনকে, যাদের মুখ দেখে সে স্থির করতে পারলো না বন্দনার চীৎকারটা তারা শুনেছে কি শোনেনি, বুঝেছে কি বোঝেনি। অগত্যা তা নিয়ে দুশ্চিন্তা ছেড়ে দিয়ে বললো, 'শ্রীপতি! আসুন।' পরমুহূর্তে অপ্রত্যাশিত গৌতমকে চিনতে পেরে একটু দেরি ক'রে, অন্য রকম গলায় বললো, 'আপনি হঠাৎ? আসুন—ভেতরে আসুন।'

গৌতম, সরু টাইসমেত ঝকঝকে স্যুট পরনে, ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি, দু-পা এগিয়ে এসে গম্ভীর গলায় আরম্ভ করলো, 'আমি এখানে আসছিলাম না, দুর্গাদাস আমাকে জোর ক'রে—'

'চ'লে আয় না ভেতরে,' গৌতমের কথায় বাধা দিলো নির্বিকার, নিরুদ্বেগ দুর্গাদাস, এক মুহূর্ত ফাঁক না-দিয়ে তক্ষুনি আবার বলতে লাগলো, 'গৌতমকে চিনতে পেরেছো তো, হিমেন্দু?—আমার সঙ্গে হঠাৎ ওর দেখা হ'য়ে গেলো রাস্তায়, এদিকেই আসছিলো গৌতম, ভাবলাম এই ফাঁকে তোমাকে একবার দেখে যাই। হ'লো কী জানো—আমি একটা টু-বি বাস্-এ ক'রে আসছি, হঠাৎ থিয়েটার রোডের কাছাকাছি এসে আগুন ধ'রে গেলো বাস্টায়—কী অবস্থা হয়েছে স্টেট-বাস্গুলোর, জঘন্য!—তারপর বুঝতেই পারো—চ্যাচামেচি, ঠেলাঠেলি, হুড়মুড় ক'রে নেমে পড়লো সবাই, একটি মহিলার হাত থেকে বটুয়া প'ড়ে গেলো ফুটপাতে, তিনি আর খুঁজে পেলেন না সেটা—"চোর! চোর!" ব'লে রব উঠলো, আমি একটা বাচ্চা ছেলেকে সন্দেহ ক'রে ছুটলাম তার পেছনে, কিন্তু ছোকরাটা বিলকুল হাওয়া হ'য়ে মিলিয়ে গেলো—এই সব গোলমালের মধ্যে—যখন পেছনে আর-একটা বাস্ এসে দাঁড়িয়েছে আর লোকেরা ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে উঠে পড়ছে সেটাতে, হঠাৎ দেখি গৌতম আসছে গাড়ি চালিয়ে। আর কথা কী! চেঁচিয়ে গাড়ি থামিয়ে ঝুপ ক'রে ওর পাশে উঠে পড়লাম—আর ঠিক তোমার বাড়ির সামনে এসে—আমরাও নেমেছি, আর পেছনে শ্রীপতির গাড়িও থামলো। গ্র্যান্ড হ'লো—না? তোফা আড্ডা জমানো যাবে। গৌতম দাঁড়িয়ে আছিস কেন, বোস না।'

'আচ্ছা, ব'সে যাই দু-মিনিট,' দু-হাতের আঙুলে প্যান্টের ভাঁজ উঁচু ক'রে ধ'রে একটু সাবধানে বসলো গৌতম। 'অনেক পুরোনো লোককে দেখতে পাচ্ছি এখানে। তা খবর-টবর সব ভালো

তোমাদের?' ঘরের চারদিকে অস্পষ্টভাবে চোখ চালিয়ে গেলো সে, তারপর শ্রীপতির দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমার অ্যাম্বাসেডরটা নতুন মনে হ'লো, শ্রীপতি। ভালো চলছে?'

এর উত্তরে শ্রীপতি কী বললো তা কেউ শুনতে পেলো না।

'আমি একটা নতুন অ্যাম্বাসেডর পেয়েছিলাম, জানো, কিন্তু হঠাৎ একজন একটা মার্সেডিজ-এর খবর আনলে, সিক্সটি-ফোর মডেল, গলা-কাটা দাম অবশ্য, কিন্তু দেখে লোভ সামলানো গেলো না।' আলগোছে, নিচু গলায় শেষ কথাটা ছেড়ে দিয়ে গৌতম গৃহস্বামীর দিকে চোখ ফেরালো। 'হিমেন্দু ভালো তো? দুর্গাদাস বলছিলো আপনি রীডার হয়েছেন সম্প্রতি? বেশ, বেশ। তুমি ভালো আছো, বন্দনা?' বন্ধুভাবে, কিন্তু কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে, কিছুটা পিঠ-চাপড়ানো ধরনে কথাগুলো ব'লে গেলো গৌতম; তার চেহারা, পোশাক, চুলের ছাঁট, বসার ভঙ্গি, দামি জুতোয় আয়নার মতো পালিশ—সব-কিছু ঘোষণা করলো তার বিত্তশালিতা, আত্মবিশ্বাস, আর জগৎসংসারে নিজের প্রাধান্যবোধ।

বাথরুমে চোখ-মুখ ধুয়ে, চুল আঁচড়ে, খোঁপা মেরামত ক'রে, ঠোঁটে ঈষৎ লিপস্টিক ছুঁইয়ে ভাগ্যিশ ছিলো তার ব্যাগে), একটু আগে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিলো বন্দনা; মুখে একটি মনোহর হাসি ফুটিয়ে হালকা গলায় বললো, 'গৌতম যে। বেশ মোটা হ'য়ে গেছো, মনে হচ্ছে?'

'তোমাকেও তেমন তন্বঙ্গী দেখছি না,' গলার আওয়াজে হাসি মেশালো গৌতম। 'তা এমনি হয় এমনি হয়—এ নিয়ে আর কথা ব'লে কী হবে। আমার গিন্নিটি তো তটস্থ হ'য়ে আছেন সারাক্ষণ—এই বুঝি ওজন বাড়লো, এই বুঝি চর্বি জমলো—কখনো ভাত ছেড়ে দিচ্ছেন, কখনো ডাক্তারের পরামর্শমতো ওষুধ, ব্যায়াম, কত কী—সাড়ে-পাঁচ ফুট উচ্চতা নিয়ে একশো-দশ পাউন্ড ওজন বজায় রাখবেন, এই এক অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা তাঁর।'

'গৌতম, তুই একটা কী।' ফশ ক'রে ব'লে উঠলো দুর্গাদাস। স্ত্রীকে গিন্নি বলিস? ছি!'

গৌতমের চোখ মুহূর্তের জন্য স্থির হ'লো দুর্গাদাসের ওপর।

'তুই দেখছি জীবন ভ'রে ছেলেমানুষ থেকে যাবি, দুর্গাদাস। তা শোন, ও-সব ভাব-ভাব-কদমের-ফুল ধোপে টেকে না জানিস তো। স্ত্রী—সংসার চালাবে, ছেলেপুলে মানুষ করবে, পার্টিতে দেখনশোভা হ'লে আরো ভালো—ব্যাপারটা তো এ ছাড়া আর কিছু নয়। তার পক্ষে "গিন্নি" কথাটাই তো ঠিক—চমৎকার! "গৃহিণী," "ঘরনী," "গিন্নি"—কোমরের মাপ বাইশ হ'লেও তা-ই বত্রিশ হ'লেও তাই, ইয়া মোটা অনন্ত পরলেও তা-ই আর হলিউড-কায়দায় হেয়ার-ডু করলেও তা-ই। কোনো ন্যাকামি নেই ওর মধ্যে, সাফ সত্যি কথাটাই বলা হচ্ছে। তুমি কী বলো শ্রীপতি? আমি ঠিক বলছি না?'

এবারেও শ্রীপতির গলা দিয়ে অস্পষ্ট কী আওয়াজ বেরোলো কেউ বুঝতে পারলো না।

বন্দনা ব'লে উঠলো, 'বিশ্রী! খুব বিশ্রী কথা বলেছো, গৌতম।'

'তা-ই নাকি?' গৌতম দাঁত দেখিয়ে হাসলো, কোনো শিশু হঠাৎ পাকা কথা ব'লে ফেললে বয়স্করা যে-ভাবে হাসেন, তেমনি উদারভাবে। বন্দনা স'রে এসে দুর্গাদাসের পাশে দাঁড়ালো; অন্তরঙ্গ সুরে, কিন্তু সকলকে শুনিয়ে টেনে-টেনে বলতে লাগলো, 'শোনো—তুমি কেমন মানুষ বলো তো? আমি সে—ই ন-টা থেকে এখানে এসে ব'সে আছি, আব তোমার দেখাই নেই!' দুর্গাদাসের মুখে একটা ভঙ্গি হ'লো (শুধু হিমেন্দু লক্ষ কবলো সেটা'), আর বন্দনা তার চোখ দুটিকে ভাসিয়ে দিলো শ্রীপতির দিকে—'শ্রীপতি, আপনার বন্ধুকে একটু শাসন করবেন তো। ও আজ করেছে কী জানেন? সকালে ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়ে গেলো, আমাকে বললো ন-টাব মধ্যে হিমেন্দুর বাড়ি চ'লে যেতে—নতুন পত্রিকার মীটিং বসবে সেখানে—ও মা, ও আপনাকে বলেনি বুঝি? বেশ লোক! নতুন পত্রিকা বের করছো, আর শ্রীপতিকেই বলোনি এখনো?' দুর্গাদাসের কাঁধে মাথা হেলিয়ে তার চুলের ঝুঁটি ধ'রে নেড়ে দিলো বন্দনা, হিমেন্দুর দিকে আধখানা কটাক্ষ ছুঁড়ে দিলো।

একসঙ্গে দুটো শব্দ শুনতে পেলো হিমেন্দু; দুর্গাদাসের গলায় 'হুঃ!' বা 'ধোৎ!' বা ঐ রকম কিছু—খুব অস্পষ্ট, আর তার চেয়েও অস্পষ্ট, খুব নরম, খুব চাপা, শ্রীপতির গলার একটুখানি হাসি। হিমেন্দুর

মাথা নিচু হ'লো; নিজেরই জন্য লজ্জা করলো তার। এই ভান, অভিনয় (বোঝাই যায় শুধু হঠাৎ গৌতম এসে পড়েছে ব'লে)—তারই ঘরে, তারই সময় নষ্ট ক'রে, যখন চারদিকে বইখাতা ছড়িয়ে সে টাইপরাইটারে কাগজ চড়িয়েছে, ঠিক তখনই! আর আমারই বা এত মাথাব্যথা কেন বন্দনাকে নিয়ে! তার বিয়ে টিকে থাক বা ভেঙে যাক, জীবন তাকে সুখ দিক বা যন্ত্রণা দিক—আমার কী এসে যায়? হিমেন্দু আর-একবার চেষ্টা করলো মনের তলায় সুভদ্রা চালিহার মুখটি ফুটিয়ে তুলতে; কাল সুভদ্রা আসবে ভেবে—এতক্ষণ পরে—একটুখানি আনন্দ হ'লো তার।

'আমি কেটে পড়ছি তাহ'লে,' গৌতমকে বলতে শুনলো হিমেন্দু, 'তোমাদের সাহিত্যসভায় আমি আর কী করবো।'

'আরে না, না সাহিত্যসভা-টভা কিছু না, বোস।' দুর্গাদাস সহৃদয়ভাবে হাত রাখলো গৌতমের কাঁধে, গৌতম একটু কুঁকড়ে স'রে গেলো। 'তার চেয়ে বরং মন্ত্রীসভা নিয়ে তর্ক হোক। কাল আপিশে খবরটা শোনামাত্র আমি বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়, এসপ্লানেডে এসেই পল্লব আর বরুণের সঙ্গে দেখা, তারপর ওদের নিয়ে চ'লে গেলাম—' ঠিক সেই মুহূর্তে বন্দনার চোখে চোখ পড়লো তার, একটু থেমে বললো, 'ওঃ, বড্ড খিদে পেয়ে গেছে।' দুর্গাদাস বন্দনার পাশ থেকে স'রে এলো ঘরের অন্য দিকে; এক কোণে একটা বইয়ের শেলফের ওপরে রাখা এক ছড়া মর্তমান কলা থেকে একটি তুলে নিয়ে খেতে খেতে বলতে লাগলো, 'শোনো, শ্রীপতি—কাল একটা বিরাট তর্ক হ'য়ে গেলো আমার সঙ্গে পল্লবের। পল্লব বলছিলো আমাদের পক্ষে মিলিটারি ডিক্টেটরশিপই ভালো, আমরা এখনো গণতন্ত্রের যোগ্য হইনি, আর আমি বলছিলাম—'

'শুনছো?' পাখির মতো গলায় বন্দনা ব'লে উঠলো, 'তোমাদের পত্রিকার মীটিং যদি না-ই হয় তাহ'লে বাড়ি চলো না এখন? তখন কত ক'রে বললাম খেয়ে বেরোও—শুনলে না তো! আমি আবার কোয়েলাকে মা-র কাছে রেখে এসেছি। চলো যাই।'

'হুঁ, যাচ্ছি। গৌতম, তোর মতটা কী, বল। কোন পার্টিকে ভোট দিয়েছিলি এবার?'

'আর পার্টি!' হাত ঘুরিয়ে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলো গৌতম। 'ঢাক ঢোল দামামা তো অনেক শোনা গেলো—ও-সব নিয়ে মাতামাতি করার কোনো মানেই হয় না। কে মন্ত্রী হ'লো বা না হ'লো তাতে কী এসে যায়? রাইটার্স বিল্ডিং চালাচ্ছে তো সেক্রেটারিরাই—সত্যিকার খাটিয়ে লোক শুধু তারাই, যদিও মাইনে বড্ড কম বেচারিদের। এখন দেখছি আই. এ. এস ছেড়ে দিয়ে ভালোই করেছিলাম; আমাদের স্টীল কর্পোরেশনের সীনিয়র এক্সিক্যুটিভদের গ্রেইড যেখানে আরম্ভ, আই.এ.এস.-এ প্রায় সেখানেই শেষ। আর তাছাড়া—' গৌতম তার লম্বা পা দুটি বাড়িয়ে দিলো মেঝেতে, তৃপ্ত মুখে তাকালো তার জুতোর অতি উজ্জ্বল অগ্রভাগের দিকে—'তাছাড়া তোরা যাকে দেশের কাজ বলিস তাও তো আসলে ও-সব জায়গাতেই হচ্ছে কিছু—ময়দানের আগুনখেকো বক্তৃতা দিয়ে তো আর কয়লা ইস্পাত পেট্রল কেরোসিন রেলের এঞ্জিন তৈরি হয় না, বরং তাতে দেশের আরো ক্ষতি করা হয়, ধর্মঘট আর লক্-আউটের চাপে দুর্দশা আরো বেড়ে যায় লোকেদের।'

'গৌতম, তুমি ক-বার ঘেরাও হয়েছিলে বলো না?'

বন্দনার এই প্রশ্নের উত্তরে গৌতমের ঠোঁটে সূক্ষ্ম একটি হাসি ফুটলো।

'তথ্য হিশেবে জানাচ্ছি, ও-সব উৎপাত একবারও ভুগতে হয়নি আমাদের—না নন্দীনগরে, না কলকাতার আপিশে।'

'অমন একটা পেল্লায় চাকরি করিস, আর একবারও ঘেরাও হোসনি? খুব লজ্জার কথা! স্ত্রীর কাছে মুখ দেখাস কী ক'রে?'

দুর্গাদাসের এই কথাটা শুনে বন্দনা খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো, আর গৌতম দাঁত দেখিয়ে বললো, 'এই রসিকতাটা বড্ড প'চে গেছে, দুর্গা—নতুন কিছু ভাবতে পারলি না?'

হঠাৎ বন্দনা যেন চমকে ব'লে উঠলো, 'ও কী, দুর্গাদাস, তোমার পায়ে কী হয়েছে?'

দুর্গাদাস, কলা খেতে-খেতে, কথা বলতে-বলতে, কিছুক্ষণ ধ'রেই পাইচারি করছিলো ঘরের মধ্যে;

অন্য কেউ তার হাঁটায় কোনো ত্রুটি দেখতে পায়নি, কিন্তু বন্দনার সূক্ষ্ম চোখে ধরা পড়লো সে একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছে। 'চোট পেয়েছো নাকি?'

'ও কিছু না—দুর্গাদাস হাত নেড়ে উড়িয়ে দিলো বন্দনার কথাটা—'ঠিক হ'য়ে যাবে এক্ষুনি। শোনো, শ্রীপতি—'

'বলো না! কোথায় চোট পেয়েছিলে? কেমন ক'রে?'

একটু বেশি ব্যাকুল শোনালো বন্দনার গলা, তার ঠোঁট বেঁকলো, ভুরু কুঁচকে গেলো। হিমেন্দু বুঝে নিলো ব্যাপারটা : বন্দনা সন্দেহ করছে দুর্গাদাস কাল রাত্রে মাতাল হ'য়ে প'ড়ে গিয়েছিলো কোথাও, ভেতরে-ভেতরে রাগে ফেটে পড়ছে সে কিন্তু না—গৌতমকে সে কিছুই টের পেতে দেবে না, গৌতমের সামনে তার দাম্পত্য জীবনের একটা রঙিন ছবি তাকে ফোটাতেই হবে, যে ক'রে হোক। ঐ তো সে ছুটে গেলো দুর্গাদাসের কাছে : 'দেখি, দেখি' ব'লে নিচু হ'য়ে তার পায়ের পাতা টিপে-টিপে দেখতে লাগলো—'আঃ, কী হচ্ছে!' ব'লে স'রে গিয়ে গৌতমের পাশে ব'সে পড়লো দুর্গাদাস, সঙ্গে-সঙ্গে বন্দনাও ব'সে পড়লো একেবারে দুর্গাদাসের গা ঘেঁসে, (সোফাটায় ঠিক তিনজনের মতো জায়গা নেই), আধখানা আঁচল তার কোলে এলিয়ে দিয়ে মুখ তুলে তরল চোখে তাকিয়ে বললো, 'ওগো, চলো না এবার বাড়ি যাই।'—মনোমুগ্ধকর ভান, অমানুষিক শাঠ্য। বন্দনা—যার সরলতাকে সে কিছুক্ষণ আগেই বোকামি ব'লে ভাবছিলো—সেও তাহ'লে এত চালাক, এত ধূর্ত? আর-একবার মাথা নিচু হ'লো হিমেন্দুর; মাথার চুল টানতে-টানতে ভাবলো : 'একদিকে বন্দনা আর দুর্গাদাস, আর-একদিকে তার "গিন্নি"কে নিয়ে গৌতম—বিয়ে মানে কি এই?'

'আমাকে এবার উঠতে হচ্ছে,' কোটের হাতা অল্প একটু সরিয়ে তার রোলেক্স ঘড়িতে চোখ ফেললো গৌতম। 'আমি কি তোমাদের কোথাও নামিয়ে দিতে পারি, বন্দনা?'

'আমি একটু পরে যাবো,' এই সুযোগে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালো দুর্গাদাস, জানলার তাকে কনুই রেখে দাঁড়ালো। 'তুইই বা এক্ষুনি উঠছিস কেন, গৌতম? আর-একটু বোস, তোদের স্টীল কর্পোরেশনের গল্প আরো শুনি। এমন সুন্দর দিনটা হয়েছে আজ—একটু বিয়ার-টিয়ার হ'লে দিব্যি আড্ডা জমানো যেতো,' ব'লে শ্রীপতির দিকে আড়চোখে তাকালো দুর্গাদাস।

শ্রীপতি চোখ সরিয়ে নিলো। হিমেন্দুর মতো, সেও ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারছিলো, সেও লজ্জিত হচ্ছিলো মনে-মনে-দুর্গাদাসের জন্য, তার নিজের জন্যেও। লজ্জা করছিলো ভাবতে যে দুর্গাদাস—এককালে তার সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু—সে এখন তারই 'অধীনে' চাকরি করে, সে-ই তাকে 'সুপ্রভাত'-এ ঢুকিয়েছিলো, আর তারই জন্য—অনেক অনিয়ম, কামাই, গাফিলি সত্ত্বেও—চাকরি বজায় আছে তার, যদিও তাকে নিচু পদ থেকে উঁচুতে তুলতে শ্রীপতিও পারেনি—সেজন্য চেষ্টাও করেনি, সত্যি বলতে, তার কোনো উপায় রাখেনি দুর্গাদাস। আর যেহেতু দু-পক্ষই এ-বিষয়ে সচেতন, তাই তাদের মধ্যে পুরোনো বন্ধুতা ঝাপসা হ'য়ে গেছে। পরস্পরকে এখন আর তারা 'তুই' বলে না, অমন ভোলানাথ দুর্গাদাসও আগের মতো খোলামেলা ব্যবহার করতে পারে না তার সঙ্গে। আগে হ'লে বলতো, 'কিছু টাকা ছাড়, শ্রীপতি, বিয়ার খাওয়া যাক!' এখন শুধু আড়চোখে তাকায়।—টাকা জিনিশটা কী নোংরা—চাকরি, সাংসারিক মর্যাদা, অন্য কারো 'অধীন' কি 'উপরিওলা' হওয়া—কী কুৎসিত নোংরা এই ব্যাপারগুলো!

হিমেন্দু লক্ষ করলো 'বিয়ার' কথাটা শোনামাত্র বন্দনার চোখ দুটি ছোটো হ'লো, ঠোঁটের কোণ কামড়ে ধরলো সে।

'আমাকে মাপ করতে হবে, আমার একটা মীটিং আছে গ্র্যান্ড হোটেলে। তারপর লাঞ্চ।'

'তা বেশ তো। তার আগে একটু খিদে ক'রে নে।'

'খিদে জাগাবার উপকরণ ওখানে একটু বেশিই থাকবে—আমাদের ম্যানেজেরিয়েল বোর্ডের লাঞ্চ তো। তা সুখের বিষয় আমার স্বাভাবিক খিদে বলবৎ আছে এখনো, ওটার জন্য সাহায্যের দরকাব হয় না।'

'সে কী রে? অমন একটা বিরাট চাকরি করিস, আর মদ খাস না।'

'মদ খেতে হবে এমন কোনো শর্ত আছে নাকি কোনো চাকরিতে?' (বন্দনার চোখ গৌতমের এই কথাটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করলো, হিমেন্দুর তা নজর এড়ালো না।) 'তবে হ্যাঁ—পার্টির ধুমধাড়াক্কা তো লেগেই আছে, যেতেই হয়, আর একটু কিছু না-নিলেও ভালো দেখায় না। আমি করি কী জানিস—গিয়েই এক গ্লাশ বিয়ার হাতে নিই, সেটাতেই অল্প-অল্প চুমুক দিয়ে কাটিয়ে দিই সারাটা সময়। ভদ্রতাও বজায় থাকে, স্বাস্থ্যেরও কোনো ক্ষতি হয় না।'

'ধুশ্! ওর চেয়ে একদম না-খাওয়া ভালো,' ব'লে শ্রীপতির দিকে এক পলক তাকালো দুর্গাদাস। 'তা নিজে না খাস বন্ধুদের তো খাওয়াতে পারিস মাঝে-মাঝে। একবার নন্দীনগরে একটা হৈ-হৈ উইক-এন্ড ক'রে এলে হয় সবাই মিলে—কী বলো, শ্রীপতি?' শ্রীপতি ক্ষীণস্বরে বললো, 'তা গেলে হয়।' 'হিমেন্দু রাজি আছো? জানো, বন্দনা, গৌতমের বাংলোয় চোদ্দখানা ঘর আর আধবিঘে জোড়া কম্পাউন্ড। পেল্লায় ব্যাপার!'

'ও মা, তা-ই নাকি!' মিহি গলায় বন্দনা ব'লে উঠলো, 'কী করো, গৌতম, অতগুলো ঘর দিয়ে?'

বন্দনার কথার সোজাসুজি কোনো জবাব দিলো না গৌতম, তার মুখের হাসি আর-একটু ব্যাপক হ'লো। 'হ্যাঁ, ব্যবস্থা-ট্যবস্থা ভালোই করেছে ওখানে,' টেনে-টেনে বলতে লাগলো সে, 'নিম্নতম মজুরের জন্যও দু-খানা ঘর আর বারান্দাওলা পাকা বাড়ি, একটু উঠোন, বিনামূল্যে জল আর ইলেকট্রিসিটি, ভাড়া মাত্র সাড়ে-দশটাকা—মানে, কিছুই না! এখন বোধহয় বুঝতে পারছো কেন ওখানে ধর্মঘট হয়নি কখনো? শ্রীপতি একজন রিপোর্টার পাঠিয়ে দিয়ো না কোনো সময়ে—তোমাদের একপাতা-জোড়া ফীচার হ'তে পারে। কিন্তু আমার আর সময় নেই—'

ওঠার ভঙ্গি করলো গৌতম, পরমুহূর্তে আলগোছে বললো, 'হঠাৎ একটা কথা মনে প'ড়ে গেলো, তোমরা হয়তো ইন্ট্রেস্টেড হবে। তোমরা কি কেউ জানো যে আরতি মৈত্র কলকাতায় ফিরে এসেছে?'

একসঙ্গে বন্দনা আর দুর্গাদাসের গলা বেজে উঠলো—'ও মা! তা-ই নাকি? কী মজা!' আর : 'আরতি! ফিরে এসেছে? কই, আমরা তো কিছু শুনিনি।' হিমেন্দু আড়চোখে তাকালো শ্রীপতির ঈষৎ ফ্যাকাশে-হ'য়ে-যাওয়া মুখের দিকে; তার মনে প'ড়ে গেলো আরতিদের তেতলার ছাতে সেই চৈত্রমাসের সন্ধ্যাগুলি, সেই একটা সময়, যখন সকলেরই মনে হয়েছিলো যে সুখ সম্ভব—তখন দুর্গাদাসও কোনো-কোনোদিন তার অমলাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে, আর এমনকি আমিও যেন বন্দনার মন ছুঁতে পেরেছিলাম। আমাদের সকলের মধ্যে শ্রীপতি যেন একটি নতুন ও আশাপ্রদ যোগসূত্র—তার আরোগ্যলাভ, আরতির সঙ্গে তার বিয়ে হবার নিশ্চয়তা—এতে একটি সুন্দর আদর্শের সফলতা যেন দেখতে পেয়েছিলাম আমরা—আর নিজেদের জন্যও মস্ত এক আশ্বাস। কিন্তু হঠাৎ কেমন সব ওলোটপালোট হ'য়ে গেলো।

"শ্রীপতিও জানো না কিছু?" ঠোটের কোণে বাঁকা হাসি নিয়ে শ্রীপতির চোখে চোখ ফেললো গৌতম। 'আমাকে খবরটা দিলে একটি আমেরিকান এঞ্জিনিয়ার—আমাদের নন্দীনগরে নতুন এসেছে দু-বছরের চুক্তিতে, ফ্র্যাঙ্ক মর্গ্যান নাম। আমাকে একদিন কথায়-কথায় বললে, "তোমাদের কলকাতার একটি মেয়েকে আমি অ্যান আর্বরে চিনতাম—আরতি রডম্যান—অসাধারণ মেয়ে!" ব'লে একটু অদ্ভুতভাবে হাসলো ফ্র্যাঙ্ক। আমি জিগেস করলাম, "তার কুমারী-নাম কী ছিলো, জানো?" "দাঁড়াও, মনে করছি। অবশ্য তার "রডম্যান" পদবি অচিরেই চুকে গিয়েছিলো—কেউ তো সত্যি ও-ধরনের স্ত্রী চায় না; ঠকিয়ে টাকাও নেবে, আর তার ওপর আবার—হ্যাঁ, মনে পড়েছে, কুমারী নাম ছিলো "মাইট্র"—Oh, she was great fun! আমি জিগেস করলাম কেমন দেখতে মেয়েটি; ফ্র্যাঙ্ক যা বর্ণনা দিলে তা থেকে মিলিয়ে নিতে কোনো অসুবিধে হ'লো না। "আমি দেশ ছাড়ার আগে দৈবাৎ শুনলাম আরতি কলকাতায় চ'লে গেছে ফেমাস ফ্যাব্রিক্স-এ চাকরি নিয়ে, আর বিয়েও করেনি, আমি ভাবছি কলকাতায় গিয়ে পুরোনো বন্ধুতা ঝালিয়ে নেবো তার সঙ্গে—আশা করি আমাকে তার মনে আছে এখনো," এই ব'লে ফ্র্যাঙ্ক চোখ টিপে হাসলো। আমার খারাপ লাগলো কথাগুলো শুনে; যে-সব

ছাত্রছাত্রী বাইরে যায় তাদের ওপর আমাদের দেশের সুনাম তো নির্ভর করে অনেকটা, তবে আরতি তো বরাবরই একটু—'

'কী যা-তা বলছিস!' প্রচণ্ড আওয়াজে ব'লে উঠলো দুর্গাদাস। 'এ-সব সত্যি নয়—হ'তেই পারে না! আমি থাকলে তোর আমেরিকান এঞ্জিনিয়ারটাকে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিতাম! আর তুই, গৌতম—তোর লজ্জা করলো না আবার আমাদের কাছে এ-সব খবর উগরোতে? তোর মনে নেই—তোব মনে নেই—' উত্তেজনায় কথা শেষ করতে না-পেরে দুর্গাদাস হাঁপাতে লাগলো।

গৌতমের ফর্শা মুখটি একটু লাল হ'লো, লম্বা শরীরে ঝকঝকে পোশাকে উঠে দাঁড়ালো সে। ঈষৎ কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'ওয়েল, সত্যি না-হ'লে আমিও সুখী হবো কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক মর্গ্যান আমাকে আরো যা বলেছিলো তা শুনিয়ে তোদের সুকুমার চিত্তে আঘাত দিতে চাই না। তোরা ইচ্ছে করলে খোঁজ নিতে পারিস কথাগুলো মিথ্যে না সত্যি।'

দুর্গাদাস জিগেস করলো, 'ও কোথায় চাকরি করে বললি?'

'কে, আরতি? ঐ যে ফেমাস ফ্র্যাব্রিক্স—কাগজে যার বড়ো বড়ো বিজ্ঞাপন দেখিস।—চলি, আমার মীটিঙের প্রায় সময় হ'লো,' বলতে-বলতে যেন বিজয়গর্বে স্ফীত হ'য়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলো গৌতম।

কয়েক মুহূর্তে সকলেই চুপ, তারপর শ্রীপতি আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমাকেও যেতে হচ্ছে এবার। আপিসে কাজ আছে।'

*　　　　*　　　　*

ঠাণ্ডা ঘর, কার্পেটে মোড়া মেঝে, দেয়াল-জোড়া কাচের চৌবাচ্চার সবুজ জলে নানা রঙের মাছের খেলা, সিঁদুর-রঙের সীলিং, দরজায় চিকবি-কাটা পাৎলা বাঁশের পর্দা, এ-মুহূর্তে সে ছাড়া আর খদ্দের নেই;—শ্রীপতি ব'সে আছে, গদি-আঁটা আসনে পিঠ এলিয়ে, লাল নীল হলদে সোনালি মাছগুলোর চঞ্চলতাব দিকে তাকিয়ে—এক কৃত্রিম, পলাতক, নিঃশব্দ নিরাপত্তায়, ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট, সামনে এক পাত্র নির্জলা হুইস্কি। আপিশে গিয়েছিলো একবার (সেখানে কেউ তাকে আজ আশা করেনি যদিও), এ-পর্যন্ত যা নতুন খবর এসেছে তাতে চোখ বুলিয়েছে, কালকের কাগজের জন্য লিখে দিয়ে এসেছে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক বিষয়ে এডিটরিয়েল (সে 'কাজের লোক'! সে 'এফিশেন্ট'।)—লেখার মাঝখানে টেলিফোন বেজেছিলো একবাব— ময়না—('আমি আপিশে এসে আটকে গিয়েছি...সন্ধেবেলা...হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!'), তারপর হঠাৎ যেন অসহ্য হ'য়ে উঠলো আপিশ, মনে হ'লো বড্ড খিদে পেয়েছে। এড়িয়ে গেলো তার অভ্যস্ত জায়গাগুলো—সাহিত্যিক-অধ্যুষিত নিউ ব্রিস্টল, সাংবাদিক-পোষিত পাম বীচ—এলো এই চড়া দামের রেজ লোটাস-এ যেখানে দিনের বেলা কখনোই ভিড় থাকে না। সে চায় না এখন মৈত্রী; কোনো জাতির সত্তা, কোনো দেশের সীমান্তরেখা, এমনকি কোনো দেশের নাম—তাও যখন হ'তে পারে দাবাখেলার গুটি, দড়ি-টানা পুতুল; আর ভগবান হ'তে পারেন মানুষের প্রয়োজন-মতো বুদ্ধ, যীশু, কূর্ম, কালী, গণিত অথবা ইতিহাস—তখন মানুষের জীবনের মধ্যে প্রেমকেই কেন স্থায়ী হ'তে হবে? সেটা আশা কবাই অন্যায়, কল্পনা করাও ভুল। যখনকার যা, সেটাই ঠিক, যা হবার তা এই মুহূর্তেই হ'য়ে গেলো—এমনি ক'রেই তৈরি হ'য়ে ওঠে সেই জোড়াতালি-দেয়া অর্থহীন ব্যাপারটা, আমরা যাকে সাধারণত জীবন ব'লে থাকি।

কিন্তু—অন্য কোনো সম্ভাবনা নেই কি? কে বলবে এটাই শেষ কথা? এমনও কি হ'তে পারে না যে আমাদের অবিশ্বাসও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নয়? মাঝে-মাঝে আমাদেব সংশয় বিষয়েই একটু সংশয় পোষণ করা উচিত নয় কি আমাদের? স্থিরতা নেই, কিন্তু হয়তো কিছু আছে যা ফিবে আসে, অন্তত ফিরে আসতে পারে—এই যেমন কিছুক্ষণ আগে, হঠাৎ আশাতীতভাবে হিমেন্দুর ওখানে, আমার হারিয়ে-যাওয়া বছরগুলি যেন উঠে দাঁড়ালো আমার সামনে, আমাকে চমকে দিয়ে, আমাকে আমার নিজের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে। তাহ'লে কেন, কেন আমি চুপ ক'রে থাকবো, কেন আমার এই রক্তমাংসের

দেয়াল ফাটিয়ে চীৎকার বেরোবে না—'আরতি! আমি তোমাকে ভুলিনি।'

কত না উত্তেজিত হয়েছিলো দুর্গাদাস, কী-রকম গর্জন ক'রে বলেছিলো, 'না, সত্যি নয়, হ'তে পারে না!' সে লোক ভালো—নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য সকলেরই প্রতি তার মমত্ববোধ, সহৃদয়তা। কিন্তু ও-সব কথা নিয়ে বিচলিত হবার কী আছে? যদি সব সত্য হয়—কী এসে যায়? নির্ভর করে, মানুষটা কে, তার ওপর। সে দস্তা দিয়ে না সোনা দিয়ে তৈরি, তার ওপর। তার হৃদয় বেঁচে আছে না ম'রে গেছে, তার ওপর। 'পতন' হ'তে পারে শুধু তারই, যে স্বভাবতই উঁচু মহলের অধিবাসী। সে-ই নামতে পারে অন্ধকারে, যে আলোর দিকে ওঠার জন্য ব্যাকুল। আমার সেই আলোর স্বপ্ন, পাঁচাত্তর তলার ঘরের স্বপ্ন—তা আজ বেরিয়ে এসেছে বাইরে; এখন আমি একে নিয়ে কী করি—কী করি—কী করি?

দেয়ালের কোণে মাথা রেখে এলিয়ে বসলো শ্রীপতি, তার চোখ বুজে এলো। আমার ক্লান্ত লাগছে, আমার ঘুম পাচ্ছে। শুনতে পেলো তার মাথার মধ্যে একটা মৃদু, নিয়মিত শব্দ—যেন কোনো পোকার ডাক, কোনো হাত-ঘড়ির টিকটিক।...'হঠাৎ অনেকদিন পরে জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো সুব্রতর।' না—ও-রকম না। ফোঁটা-ফোঁটা জল, বাথরুমের কল থেকে পড়ছে, কেউ শুনছে ভোরবেলা শুয়ে-শুয়ে—ঘুম ভেঙে গেছে, জেগেও ওঠেনি। শুনছে, ভাবছে। ভাবছে, শুনছে। কাউকে কোনো কথা দিয়েছিল—রাখা হয়নি। কোনো জরুরি কাজ ফেলে রেখেছে বহুদিন। কী-কথা কী-কাজ—মনে করতে পারছে না। ফোঁটা-ফোঁটা জলের শব্দ—'মনে আছে? মনে নেই?' লোকটা হয়তো লেখক—এখন আর লিখতে পারছে না, তবু চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে। এ কি তবে নতুন আরম্ভ—এ কি তবে নতুন আরম্ভ—এ কি তারই পাথর ফেটে ঝ'রে পড়ছে ফোঁটা-ফোঁটা জল, সরু স্রোতে, কাগজের ওপর ছোটো-ছোটো অক্ষরের রেখার মতো? আমাকে শুনতে দাও—শুনতে দাও এই জলের শব্দ, আমাকে এখন জানিয়ো না।...

কিন্তু ঘুমিয়ে পড়তে-পড়তেও শ্রীপতি বুঝলো সে ঘুমিয়ে পড়ছে, চোখ রগড়ে জেগে উঠলো একটা সিগারেট ধরালো, রেস্তোরাঁর ঘড়িতে চোখ ফেললো একবার। টেলিফোনের কাছে গিয়ে ফেমাস ফ্যাব্রিক্স-এর নম্বর ঘোরালো।

৭.

ছোটো-ছোটো কামড়ে, অন্যমনস্কভাবে, ঝকঝকে শার্সি-আঁটা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে, আরতি একটা হ্যাম স্যান্ডুইচ খাচ্ছিলো। বাইরে ময়দান, ঘাসের ওপর হলুদ রোদ ছড়ানো, আকাশ হালকা-নীল, দূরে দেখা যাচ্ছে হাওড়া-পুলের মস্ত উঁচু জোরালো ভঙ্গি। কেমন শান্ত মনে হয় শহরটাকে এই দশতলার জানলা থেকে—ট্রাম-বাস্ এর শব্দ পর্যন্ত পৌঁছয় না। মনেই হয় না এই শহর এত বিক্ষুব্ধ, এত উত্তাল। অবাস্তব—বাইরের ঐ দৃশ্য, এই এয়ার-কন্ডিশন্ড দশতলার আপিস, আর এই ঝকঝকে পরিপাটি ঘরটি, যেখানে সপ্তাহে পঁয়তাল্লিশ ঘণ্টা ধ'রে সে ফেমাস ফ্যাব্রিক্স-এর কাটতি বাড়াবার জন্য 'গবেষণা' করে। কিন্তু আমার জীবনটাও তো তা-ই—অবাস্তব। কোত্থেকে কোথায় ঘুরেছি এই এতগুলো বছর ধ'রে, কোথাও বাসা বাঁধিনি, আর এখন আমি যেখানে আমি সেখানকারও নই। বেশ লাগে জেট-প্লেনে লম্বা পাড়ি দিতে, বাইরে অন্ধকার রাত, চলেছি তেত্রিশ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে—যেন জগতের বাইরে চ'লে এসেছি, ডুবে আছি একটা না-ঘুম না-জাগরণের আবছায়ায়। কিন্তু মাঝে-মাঝে নামতেই হয় মাটিতে—ভূমণ্ডলের কোনো-এক বিন্দুতে, যেমন একদিন এখানেও নেমেছিলাম, এক শেষ-বর্ষার গুমোট রাত্তিরে। ব্যাঙ্কক থেকে ছাড়বার পরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, জেগে উঠলাম হস্টেসের ডাকে—একটা নতুন জিনিশ দিয়েছে এবার—মিষ্টি মেশানো পাতিলেবুর রস, গন্ধটা টাটকা, চমৎকার স্বাদ। কলকাতার একটা সাংকেতিক ঘোষণা বোধহয়? আরতি পিঠ খাড়া ক'রে বসলো; প্লেন নামতে শুরু করেছে—গতি ক্রমশ মৃদু, গর্জন বদলে গিয়ে গুঞ্জন হ'লো; কিন্তু এমন-কিছুই সে দেখতে পেলো না যাতে মনে হয় একটা

মহানগর কাছে আসছে, যাতে প্রায়-পৌঁছনো যাত্রীর মনে জাগতে পারে কোনো উৎসাহ বা কৌতূহল। অন্ধকার—শুধু থিকথিকে অন্ধকার বাইবে। আর বেরিয়ে আসামাত্র—আশাতীত। স্যাঁৎসেঁতে মাটি, মিটমিটে আলো, ঝিঁঝির শব্দ, ব্যাঙের ডাক—এক মলিন, বিষণ্ণতাময়, নিদ্রালু মফস্বল। কিন্তু : ওটুকুই যা তফাৎ, তাছাড়া সবই এক—এখানে, না ওখানে, না সেখানে, কী এসে যায়? তার অবাক লাগলো না যে কেউ তার জন্য অপেক্ষা ক'রে নেই এয়ারপোর্টে (যা হনলুলুতে ছিলো, এমনকি টোকিওতেও); অবাক লাগলো না যে তার নিজের মনেও কোনো সাড়া জাগালো না কলকাতা। এলো প্যান-অ্যাম-এর গাড়িতে শহরে, সেখান থেকে ফেমাস ফ্যাব্রিক্স-এর উর্দি-আঁটা একটি বেয়ারা তাকে ট্যাক্সিতে ক'রে নিয়ে এলো তার জন্য ঠিক-ক'রে-রাখা বোর্ডিংহাউসে। কয়েকটা মিনিট কাটালো তার এই নতুনতম বাসস্থলটি পরীক্ষা ক'রে—তা মন্দ না, ভালোই; অর্থাৎ, যে-কোনো জায়গায় যেমন হ'য়ে থাকে, তেমনি—শুধু জৌলুশ কম, আর বাথরুমে একটা নোটিশ টাঙানো যে কলের জল খাওয়ার পক্ষে নিরাপদ নয়—এটা অন্য কোথাও দ্যাখেনি। স্যুটকেস খুলে রাত-পোশাক পরলো, প্লেনে কেনা কন্যাক চাখলো একটু, তারপর ঘুম—পরের দিনটা বাদ দিয়ে আপিশে যোগ দিলো। আর তারপর থেকে—আপিশ আর বোর্ডিংহাউস, আর মাঝে-মাঝে পার্টি, সিনেমা, হিন্দি হাই স্কুলে কোনো ইংরিজি নাটক হয়তো—সবই নিয়মমাফিক। কলকাতার বিদেশী আর অবাঙালি মহলে কিছু চেনাশোনা হয়েছে তার; তাদের মধ্যে দু-জন কিছুটা ঘনিষ্ঠ হবারও চেষ্টা করছে (অর্থাৎ রুটিনে কোথাও ফাঁক নেই); তার চলাফেরার বৃত্ত চৌরঙ্গি-পার্কস্ট্রিট পাড়ায় আবদ্ধ, তার আলাপের ভাষা ইংরিজি;—এইভাবে, অস্তিত্বের সনাতন ও আরামদায়ক একঘেয়েমির মধ্যে ধরা প'ড়ে গিয়ে, প্রায় তিন মাস কাটিয়ে দিয়েছে আরতি। কিন্তু এরই মধ্যে হঠাৎ সেদিন—

জানলা থেকে স'রে এলো সে; চা অপেক্ষা করছে, পট থেকে ঢেলে নিয়ে চুমুক দিলো। চায়ের গন্ধ যেন সূক্ষ্ম একটা বার্তা পৌঁছিয়ে দিলো তাব মগজে, কেমন একটা বাংলাদেশের, বাঙালি বাড়ির গন্ধ—মনে-মনে বললো: এটা কলকাতা, আমি কলকাতায় ফিরেছি। এখানেই আমার জন্ম, এখানেই আমি ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধবেছিলাম, লম্বা হয়েছিলাম, পৌঁচেছিলাম চোদ্দ, ষোলো, উনিশ, একুশ—এই সব বয়সগুলিতে। আমার মুখেব ভাষা, আমার চুল আর চামড়ার রং, সব আদিম ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সব আদিম ভালোমন্দবোধ, রক্তেব মধ্যে মিশে-থাকা আর ব'য়ে-চলা সব ধারণা, আমার মনের সবচেয়ে তলাকার মাটি—এখানেই তৈরি হযেছিলো। জ্যান্ত ছিলো এই শহর একদিন আমাব পক্ষে—ভবপুর, উচ্ছল; জীবন যেন হাজার হাত বাড়িয়ে আমাকে তার স্রোতের মধ্যে টেনে নিয়েছিলো। আমি ছড়িয়ে যাচ্ছি—দূরে, আরো দূরে, আমারই মধ্যে আমার যেন অন্ত নেই : এমনি মনে হ'তো তখন। আর আজ—আবতির ঠোঁট হাসিতে বেঁকে গেলো—আজ আমি ফিরে এসেছি বিদেশীর মতো (যেন ভিতু, যেন লজ্জিত, যেন লুকিয়ে আছি—কিন্তু লজ্জা তো আমার নয়! আমার নয়!), এসে উঠেছি প্রেটরিয়া স্ট্রীটে মিসেস রবিসেব বোর্ডিংহাউসে, যেটার অস্তিত্বও হয়তো জানে না সেই লোকেরা, যারা ট্রামে-বাস্-এ ঘুরে বেড়ায়, থাকে হেদোর পেছনে, বা হাজরা রোড থেকে বেরোনো কোনো সরু গলিব দোতলায়।—কিন্তু ভালো তো, এই জীবনই তো ভালো। দ্রুত বদলে যাচ্ছে জগৎটা; যে-দেশে জন্মেছিলাম সেখানেই জীবন কাটাতে হবে, এ-কথা এখন অর্থহীন হ'য়ে গেছে, এমনকি মানুষের কোনো সুনির্দিষ্ট দেশ থাকা চাই, তাও অনেকে মানছে না আজকাল। দেখেছি গতির আশ্চর্য লীলা—যে-সব দেশে কাটিয়ে এলাম এতদিন, হাত-পা গজানোমাত্র কে কোথায় ছিটকে পড়ে ঠিক নেই, বছর-বছর নতুন গাড়ি, সপ্তাহে-সপ্তাহে মেয়েদেব চুলের নতুন বং, আর স্বামী-স্ত্রীর অদলবদল এমন একটা সাধারণ ব্যাপার যে তা নিয়ে কেউ কথাও বলে না। দৈবে আমিও প'ড়ে গিয়েছিলাম সেই স্রোতের মধ্যে, এখন সেটাই অভ্যেস হ'য়ে গেছে, ছেড়ে যেতে কোনো পিছু টান নেই, পৌঁছতে কোনো উৎসাহ নেই—হালকা ঝরঝরে জীবন।

কিন্তু সেই রাত্রে—প্রথমে ককটেল-পার্টি, তারপর সঞ্জয় মেননের আলিপুরেব ফ্ল্যাটে ডিনার—ফিরতে বেশ রাত হ'লো, কিন্তু আমি তক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়তে পারলাম না। বারান্দায় এসে

বসলাম, একটা অন্ধকার বাগান আমার সামনে, বোর্ডিংহাউসে আমি ছাড়া কেউ জেগে নেই। প্রথমে আমার মনে হ'লো এক নিথর স্তব্ধতা ঘিরে আছে আমাকে, অন্ধকারে বড্ড অচেনা লাগলো চারদিক। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ছোটো-ছোটো সব শব্দ আমার কানে এসে পৌঁছতে লাগলো—কখনো পাখির ডানা-ঝাপটানি, কখনো গাছের পাতার শিরশির, ক্লান্ত কোনো রিকশার টুংটাং। তারপর শুনলাম শিশির ঝ'রে পড়ছে—টপ্, টপ্, টপ্, অন্ধকারেও দেখলাম কুয়াশা নেমে আসছে মাটিতে, বাতাসে যেন ভেজা ঘাসের গন্ধ। আর তারপরেই যেন অন্য দু-একটা গন্ধ পেলাম—বোশেখ মাসে গ'লে-যাওয়া অ্যাস্‌ফল্টের, প্রথম কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির পরে ভেজা ধুলোর, আমাদের স্কুলের সরস্বতীপুজোয় অঞ্জলির পরে জ'মে-ওঠা গাঁদাফুলের খুব ফিকে, পচা-পচা গন্ধ। রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম আমাদের মানিকতলার বাড়িতে ফিরে এসেছি, কিন্তু বাড়িটা অন্যরকম হ'য়ে গেছে, আর আমিও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যেন সাহস পাচ্ছি না, মনে-মনে ভাবছি—এতদিন হ'য়ে গেলো—ন-বছর—কেউ কি চিনতে পাববে আমাকে?

ঠিক ন-বছর নয়; মাঝে একবার এসেছিলাম—বাবাকে শেষ দেখা দেখতে। যে-ভাবে এসেছিলাম তা ভীষণ, ফিরে গিয়ে যা করেছিলাম তা অকথ্য। মিশিগানে পড়ছি আমি তখন, লন্ডন থেকে একটা এম. এ. ক'রে, সদ্য এসেছি আমেরিকায়। অ্যান আর্বরে পৌঁছবার পরের দিন—মস্ত ছড়ানো ক্যাম্পাসের মধ্যে হেঁটে-হেঁটে এ-বাড়ি ও-বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি, মার্কিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকানুন তখনও ঝাপসা আমার কাছে—হঠাৎ ফুটপাত ঘেঁষে একটা গাড়ি থামলো, একটি যুবক নেমে এসে বললো, 'মাপ করবেন, আপনি কি ভারতীয়?' আমি জিগেস করলাম, 'বলতে পারেন কার্কউড হল্‌টা কোনদিকে?' 'কার্কউড হল্? আমি সেদিকেই যাচ্ছি—আপনার আপত্তি না-থাকলে নিয়ে যেতে পারি।' আমি ক্লান্ত ছিলাম, নতুন জায়গায় ভালো ঘুমোতে পারিনি রাত্রে, তার আগের রাতটা গ্রেহাউন্ড বাস্-এ কেটেছিলো—অচেনা যুবকটির সাহায্য পেয়ে কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। যেতে-যেতে সে জিগেস করলে আমার নাম কী, ভারতের কোন শহর থেকে আসছি—ইত্যাদি, তারপর নিজের পরিচয় দিলে—দেখা গেলো সে-ও সাইকলজি বিভাগেরই ছাত্র। আমাকে নিয়ে গেলো বিভাগের চেয়ারম্যানের কাছে, তারপর অন্য কয়েকটা আপিশে, সারাক্ষণ থাকলো আমার সঙ্গে সঙ্গে—একা-একা যা ক'রে উঠতে আমার হয়তো সারাদিন কেটে যেতো, তার সাহায্যে তিন ঘণ্টায় তা হ'য়ে গেলো। আমি তাকে প্রচুর ধন্যবাদ জানালাম, সে বললে এটা তারই সৌভাগ্য, কেননা সে যেটুকু ভারতীয় দর্শন পড়েছে তা খুব নাড়া দিয়েছে তার মনকে, ভারতবর্ষ বিষয়ে সে আরো জানতে চায়।

এমনি ক'রে শুরু হ'লো সেই সম্পর্ক—যা ছিঁড়তে গিয়ে আমি টুকরো হ'য়ে ভেঙে গিয়েছিলাম। আমারই দোষ—বা বোকামি—বা দুর্ভাগ্য। ডন রডম্যান, হার্ভার্ড-গ্র্যাজুয়েট, আমাদের বিভাগের সেরা ছাত্র, চেহারাটিও চোখে পড়ার মতো, কিন্তু ধরন-ধারণ একটু গম্ভীর ব'লে অনেক তাকে ঠাট্টা ক'রে বলে 'বস্টন ব্রাহ্মিন'। সে মেলামেশা করে সকলের সঙ্গেই সহজভাবে, কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের নাচের আসরে হৈ-হল্লায় বড়ো-একটা যোগ দেয় না; তার চুল কপাল ছাপিয়ে উপচে পড়ে, যদিও তখন জোর চলছে কদম-ছাঁটের ফ্যাশন; সে কবে কোন মেয়েকে 'ডেইট' করেছিলো—বা করেছিলো কিনা—সেটা ছাত্রীদের মধ্যে একটা গবেষণার বিষয়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটে—প্রায়ই দেখা হয় ডনের সঙ্গে আমার, প্রতি মঙ্গলবার বিকেলে সেমিনার-ক্লাশে মুখোমুখি ব'সে দু-ঘণ্টা কাটাই আমরা—আমার মনে হয় আমি মুখ ফেরালেই তার চোখ ছুটে আসে আমার দিকে। আমি বুঝতে পারি সে একটু বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছে আমার প্রতি—কাফেটেরিয়ায় সুযোগ পেলেই এক টেবিলে বসে আমার সঙ্গে, লাইব্রেরির স্ট্যাক থেকে বই খুঁজে দেয়, মঙ্গলবারে ক্লাশের পরে আমাকে পৌঁছিয়ে দেয় ডর্মে—কিন্তু সর্বদাই এমন একটি দূরত্ব বজায় রেখে চলে, আর আমি কখনো আপত্তি করলে এমন সহজভাবে বলে 'বাঃ, তাতে কী হয়েছে?'—যে আস্তে-আস্তে তার সঙ্গে আমার এক ধরনের বন্ধুতা গ'ড়ে উঠলো। সময়ে অসময়ে তার সঙ্গে গল্প করতে আমার ভালো লাগে, পড়াশুনোর ব্যাপারে তার সাহায্য নেয়া আমার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেলো; আমি যাই তার সঙ্গে কখনো কোনো আর্ট-ফিল্ম দেখতে, বা জিম্‌স ট্যাভের্নে পিলাউ আর শিশ-কেবাবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করি, একদিন সে তার নিজের অ্যাপার্টমেন্টেও খাওয়ালো

আমাকে—অবশ্য শুধু আমাকেই নয়—সে যে কখনো আমাকে একা বলে না, যে-কোনো ব্যাপারে সঙ্গে আরো কেউ-না-কেউ থাকেই—আমারই জাপানি সহ-পাঠিনী হয়তো, বা সস্ত্রীক তার কোনো বন্ধু, সেজন্য আমি মনে-মনে প্রশংসা করি তাকে, আর তার সঙ্গে মেলামেশায় বেশ আরাম পাই।

তখন নবেম্বর মাস চলছে; একদিন ছাত্রছাত্রীদের চড়ুইভাতি হ'লো শহর থেকে পঁচিশ মাইল দূরে ব্রাউন ফরেস্টে। সেদিন মেঘ রোদ্দুর বাতাসের খেলা চলছিলো সকাল থেকে—গরম রোদ, ঠাণ্ডা হাওয়া, ছাই রঙের মেঘ—আর পথে-পথে হলুদ সিঁদুর লাল রঙের ঝরা পাতা। প্রথমে শক্ত কাঠের বেঞ্চিতে ব'সে ঠাণ্ডা লাঞ্চ—তারপর সবাই এদিক-ওদিক ছিটকে পড়লো, অনেকে জোড়ে-জোড়ে হাতে হাত ধ'রে নির্জনতার খোঁজে, কেউ-কেউ কৃত্রিম হ্রদে নৌকো বাইতে, কেউ-কেউ ব্লু রিজ্-এর চুড়োয় উঠে আশে-পাশের দৃশ্য দেখার জন্য। আমি ঘাসের ওপর একা ব'সে-ব'সে দেখছিলাম টুকটুকে লাল পাতাগুলো কেমন খ'সে পড়ছে ডাল থেকে, উড়ে-উড়ে যাচ্ছে হাওয়ার ধাক্কায়, জমা হচ্ছে কোনো স্তূপের ওপর বা নতুন স্তূপ তৈরি ক'রে তুলছে—হঠাৎ দেখি, কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে ডন এগিয়ে আসছে আমার দিকে। আমি ব'লে উঠলাম, 'আরে, তুমি!' 'কেন, আমি আসতে পারি না?' 'ওরা কে যেন বলছিলো তুমি রাজি হওনি পিকনিকে আসতে।' 'হঠাৎ ইচ্ছে হ'লো—চ'লে এলাম। তুমি বোধহয় এই প্রথম এলে ব্রাউন ফরেস্টে? একটু ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করো কি?' 'আমার এখানেই বেশ লাগছে। তোমাদের হেমন্ত ঋতু বড়ো সুন্দর।' আধো ঠাট্টার ধরনে বললো, 'তুমি কি রাগ করবে যদি বলি তুমিও সুন্দর?' আমি হালকা হেসে বললাম, 'তা-ই নাকি?' 'যদি অনুমতি দাও তোমার একটা ছবি তুলি।—তোমাকে কিছু করতে হবে না, যেমন আছো তেমনি ব'সে থাকো।' ডনের ক্যামেরায় টুক-টুক শব্দ হ'লো অনেকবার, তারপর সে আমার পাশে ব'সে প'ড়ে বললো, 'কী, জানো—একটু আগে তোমার মুখের ভাবটি খুব সুন্দর হয়েছিলো, জানি না সেটা ধরতে পেরেছি কিনা। তা যা-ই হোক, এই রঙিন বনের সঙ্গে তোমার শাড়ির পীকক্-ব্লু চমৎকার ম্যাচ করেছে—ছবি বোধহয় খারাপ হবে না।' একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আর দু-সপ্তাহ পরেই তো থ্যাঙ্কসগিভিং-এর ছুটি—তুমি কোথাও বেড়াতে যাচ্ছো না?' 'আমি আর কোথায় যাবো?' 'আমার খুব ইচ্ছে করে তোমাকে একবার বস্টনে নিয়ে যাই।' 'বস্টনে? আমাকে?' সে ঝুঁকে প'ড়ে বললো, 'আমার মা-বাবা আছেন সেখানে, আর বোন, তোমারই বয়সী, র‍্যাডক্লিফে পড়ে—তোমার কোনো অসুবিধে হবে না। সবাই মিলে একদিন বেড়াতে যাওয়া যাবে ভের্মন্টে—কি নিউ হ্যাম্পশায়ারে—হেমন্ত ঋতু সবচেয়ে সুন্দর ও-দুটো জায়গায়। যাবে?' আমি আবছা গলায় জবাব দিলাম, 'আমি কী ক'রে যাই।' 'কী ক'রে? আমার গাড়িতে যাবে—ফিরে আসবে—স্টীভ আর লিন্ডাও যাচ্ছে আমার গাড়িতে—তোমার খারাপ লাগবে না।' 'আচ্ছা, ভেবে দেখি।' 'তার মানে—তুমি রাজি নও? কেন তোমরা ভারতীয় মেয়েরা অত গুটিয়ে থাকো, বলো তো?' আমি এক ঝলক তাকালাম তার দিকে, আমার চোখে চোখ পড়ামাত্র সে অন্য রকম সুরে বললো, 'কিন্তু না—এই রকমই ভালো।' তারপর সে ভারতবর্ষ বিষয়ে কথা তুললো—সাধারণ মানুষের জীবনে কি গীতার কোনো প্রভাব এখনো? মনুসংহিতার? আমি বললাম, 'একই সঙ্গে গীতা আর মনুসংহিতার নাম কোরো না—মনুসংহিতা জঘন্য বই! "নারী নরকের দ্বার" সেখানেই আছে না?' একটু হেসে ডন উত্তর দিলো, 'না, না, জঘন্য বলা ঠিক হ'লো না তোমার—ওতে অনেক গভীর জ্ঞানের কথাও আছে।'

'এত ক'রে বললাম, তবু এলে না—' 'বস্টন থেকে ডন চিঠি লিখলো আমাকে, আমার ভাবতে খারাপ লাগছে যে এ-দেশের এই উৎসবের সময়ে তুমি একা আছো।'—ছুটির মধ্যে এই চিঠি একদিন পৌঁছলো আমার হাতে, মুহূর্তের জন্য একটু খারাপ লাগলো আমার, মনে হ'লো গেলেই পারতাম, সত্যি বোধহয় বড্ড বেশি গুটিয়ে আছি নিজের মধ্যে—এতে কার কী লাভ হচ্ছে? তারপরেই মনে হ'লো—না, এ-ই তো ঠিক, এই যে আমি একা আছি, এটাই আমার সত্যিকার জীবন, কোনো-এক রহস্যময় কারণে আমার এই একাকিত্ব যেন খুব একটা দামি আর উঁচু দরের জিনিশ। ক্রিসমাসের লম্বা ছুটিতেও (ডনের অনেক পিড়াপিড়ি সত্ত্বেও) এই একাকিত্ব আমি বাজায় রাখলাম—সারা ক্যাম্পাস শুনশান, বরফের জন্য রাস্তায় বেরোনো শক্ত, ডর্মে আছে আমি ছাড়া আর আর দুটিমাত্র থাই

মেয়ে—লম্বা চিঠি লিখি বাবাকে, মোটা-মোটা উপন্যাস পড়ি, রাত্রে শুয়ে-শুয়ে উত্তুরে হাওয়ার চীৎকার শুনি—এমনি ক'রে দিন কাটছে আমার, নিঃসঙ্গতার তেতো-মিষ্টি আস্বাদে ভরা দিনগুলি। একদিন হঠাৎ একটি লোক এসে আমার হাতে দিয়ে গেলো টকটকে লাল গোলাপের এক প্রকাণ্ড তোড়া—সঙ্গের কার্ডটিতে এই শহরেরই এক দোকানের নাম দেখলাম, প্রেরকের নাম ডন রডম্যান। দু-ঘণ্টা পরে এক্সপ্রেস ডাকে ডনের চিঠি এলো। ছ-পাতা জোড়া চিঠি—তার সারমর্ম হ'লো : সে আমাকে ভালোবাসে, আমাকে বিয়ে করতে চায়।

চিঠিখানা আগাগোড়া আমি একবার পড়লাম, দু-বার পড়লাম—একবার তাকালাম জানলা দিয়ে শাদা, ধূসর পৃথিবীর দিকে, আর একবার তাকালাম আমার ঘরের কোণে ফুলদানিতে রাখা টকটকে লাল গোলাপগুলোর দিকে। আমার অবাক লাগলো যে মাত্র চারমাসের চেনাশোনায় একেবারে বিয়ে পর্যন্ত ভেবে ফেলেছে ডন—আর কতদূর পর্যন্ত ভেবেছে, হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় লেখা নয় চিঠিটা, শুধু প্রেমের উচ্ছ্বাসে ভরা নয়, যাকে বলে সুচিন্তিত, তা-ই। এই বিয়ের ফলে যা-কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে তার প্রত্যেকটাই আলোচনা করেছে : আমাকে পুরো দেশত্যাগী হ'তে হবে না, আত্মীয়স্বজনকে ছাড়তে হবে না, দুই দেশের মধ্যে ভাগাভাগি ক'রে সে থাকতে চায়,—সে বাংলা শিখবে, তার ডক্টরেট হ'য়ে গেলে কোনো ফাউণ্ডেশনকে রাজি করাবে তাকে গবেষণার জন্য বাংলাদেশে পাঠাতে, পরে এমন কোনো কাজ নেবে যাতে মাঝে-মাঝে ভারতবর্ষে যেতে হয়, আসামের আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করার একটা প্ল্যান সে করেছে মনে-মনে (আর আমিও যদি সেই কাজে যুক্ত হ'তে চাই সে তো আরো সুখের কথা)—এমনকি—যদিও বাহুল্য ছিলো—এ-কথাও উল্লেখ করতে ভোলেনি যে সে গির্জে-পোষিত খৃষ্টান ধর্মে বিশ্বাসী নয়, তার ধর্ম মানবতা। আমি বুঝলাম সে যা লিখেছে তা তার দিক থেকে খুবই খাঁটি, আমি নিজের কাছে অস্বীকার করতে পারলাম না যে চিঠিখানায় সে নিজেকে একজন উচ্চশিক্ষিত, গভীর স্বভাবের মানুষ ব'লে প্রমাণ করেছে।

ভাবলাম সেদিন সারাদিন ব'সে—না-ঘুমিয়ে অনেক রাত্তির পর্যন্ত। তুমি আমার প্রেমে পড়েছো, ডন? আমাকে বিয়ে করতে চাও? কিন্তু আমি তো তোমার প্রেমে পড়িনি। সত্যি—কেনই বা পড়িনি? তিন মাস কম সময় নয় আসলে, আর এত ঘন-ঘন দেখাশোনা—আর তুমি এত ভালো, দেখতে এত সুশ্রী, আমিই অন্তত দশটি মেয়েকে চিনি তোমার নাম শুনলে যাদের চোখের তারা নেচে ওঠে। আমারও ভালো লাগে তোমাকে—যেমন কুমিতাকে ভালো লাগে, কি লিন্ডাকে, কি আলেসান্দ্রোকে—না, আরো বেশি, কিন্তু ঐ ভালো লাগা পর্যন্তই, তার বেশি আর-কিছু নয়। রাত্রে শুয়ে-শুয়ে নিজেকে জিগেস করলাম, 'তুমি কি পারবে না ডনকে ভালোবাসতে—এখন না হোক, পরে? সে তো অযোগ্য নয়।' কিন্তু আমার এই প্রশ্ন যেন একটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে বার-বাব। আমাব মনের গোপনতম স্তর পর্যন্ত খুঁজে-খুঁজে দেখলাম আমি—নেই, কোথাও কিছু নেই, কেউ জবাব দিচ্ছে না, টু শব্দটি নেই কোথাও। যেন ধ্বংসে গেছে আমার মনের সেই তলাকার জমি, যেখানে ভালোবাসার অঙ্কুর ধরে, ফুল ফোটে—একটা বিরাট গর্ত হাঁ ক'রে আছে সেখানে। আমি উঠে বসলাম, বিছানা থেকে নেমে পাইচারি করতে লাগলাম আলো জ্বেলে, যেন অচেতনভাবে খুঁজতে লাগলাম ডনের বিরুদ্ধে কোনো জোরালো যুক্তি, এই চিঠির পেছনে কোনো অসাধু উদ্দেশ্য টেনে বের করার চেষ্টা করলাম—আর হঠাৎ একটা কথা মনে ক'রে থমকে দাঁড়ালাম মেঝেতে। বুঝেছি, ব্যাপারটা তাহ'লে এ-ই! ডন রডম্যান, তুমি আমার শরীরটাকে চাও—এ-ই তো? জানো, ভারতীয় মেয়েরা সাধারণত অন্য রকম হয়, তোমাদের অবাধ মেলামেশার প্রথায় তারা ধরা দিতে চাইবে না—তাই তুমি কখনো 'ডেইট' চাওনি আমার কাছে, আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার কোনো চেষ্টা করোনি, এমন কোনো ভাব দেখাওনি যে আমার সঙ্গে একা হওয়া তোমার ইচ্ছে—আর এমনি ক'রে আমার মনে বিশ্বাস জাগিয়ে এখন বিয়ের প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছো—বিয়ে, কেননা তুমি বুঝেছো যে আমার শরীরটাকে মুঠোর মধ্যে পেতে হ'লে সেটাই একমাত্র উপায়। চতুর তুমি, ডন রডম্যান, কিন্তু এবার তোমার আসল চেহারাটি আমি দেখতে পেয়েছি, তুমি আর আমাকে ভোলাতে পারবে না। ভাবতে-ভাবতে আমার মাথায় যেন আগুন জ্ব'লে উঠলো, ডনের প্রতি যেটুকু

বন্ধুতার ভাব আমার মনে জ'মে উঠেছিলো সব যেন এক দমকে মুছে গেলো, আমার বিতৃষ্ণা জন্মালো তার ওপর, কেমন নোংরা আর কুৎসিত মনে হ'তে লাগলো তাকে—যে-সব কারণে এতদিন তাকে মনে-মনে প্রশংসা করেছি সেগুলি মরা পাতার মতো খ'সে গেলো, তার নামের সঙ্গে, চেহারার সঙ্গে জড়িয়ে গেলো লোলুপ একটা কামনার ছবি শুধু, যা আমাকে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে পিষে মারার জন্য রুখে উঠেছে। একটা মিষ্টি গন্ধ পেলাম হঠাৎ—চোখে পড়লো সেই গোলাপের গুচ্ছ। আমাকে দেখে হাসলো যেন ফুলগুলি। বড্ড কড়া এই গন্ধ—বিশ্রী—এই গন্ধ আমাকে ঘুমোতে দেবে না রাত্রে, এখনই আমার দম আটকে আসছে। আমি তুলে নিলাম সেই টশটশে তাজা ফুলগুলিকে—করিডরে বেরিয়ে গিয়ে জঞ্জালের ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে এলাম। চিঠিটা ফেললাম না—ওকে ফেরৎ দেবো ব'লে।

ছুটির শেষ দিন সেদিন, ক্যাম্পাস ভ'রে উঠেছে, ডন আমার সঙ্গে ডর্মে দেখা করতে এলো—তখন রাত প্রায় এগারোটা, বাইরে তুমুল বেগে বরফ পড়ছে। কিছুমাত্র ভূমিকা না-ক'রে বললো, 'আমার চিঠি পেয়েছিলে?' 'পেয়েছিলাম।' 'রতি, তোমার আর-কিছু বলার নেই?' এই প্রথম সে 'রতি' ব'লে ডাকলো আমাকে—আমি বুঝলাম সংস্কৃত কথাটার অর্থ সে ভালোই জানে—আমার গা শিউরে উঠলো, তার ঠোঁটের রেখায় যেন উগ্র লোভ দেখতে পেলাম। শোনো, ডন, আমি বুঝতে পারছি তোমার বিয়ে করা দরকার, কিন্তু এই বিশাল ক্যাম্পাসে আর কি মেয়ে নেই? এই বৃহৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর কি মেয়ে নেই?' ক্ষীণ হেসে বললো, 'আছে অনেক, কিন্তু আমার কাছে অস্তিত্ব আছে শুধু একজনের।' ভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আবার বললো, 'আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না, রতি। আমার কোর্স-ওঅর্ক শেষ হ'য়ে এলো, এখন শুধু ডিসার্টেশনটা লেখা বাকি, আমার মাল-মশলা সব তৈরি হ'য়ে আছে, শিগগিরই শুরু ক'রে দেয়া উচিত, কিন্তু আমি মন দিতে পারছি না অন্য কিছুতে, তুমি আমার সব চিন্তা কেড়ে নিয়েছো।' 'তা-ই নাকি?' আমার মনে প'ড়ে গেলো ঠিক এইরকম কথা গৌতম আমাকে বলেছিলো একবার, ডনের মুখের দিকে তাকাতেও যেন ঘেন্না করলো। 'একটু বোসো, এক্ষুনি আসছি,' ব'লে আমি আমার ঘর থেকে তাব চিঠিটা নিয়ে এলাম, সেটাকে খামসুদ্ধ দু-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে তার হাতে দিয়ে বললাম, 'এ-ই আমার উত্তর।' ডনের মুখ আগুনের মতো লাল হ'য়ে উঠলো, মাথা নিচু ক'রে বেবিয়ে গেলো সে। আর তারপর—পিসিমার চিঠি।

'কেশবের শরীবটা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না, তুই কি একবার আসতে পারবি কোনোমতে?' একটা হিম হাওয়া—এ-দেশের বরফ-ঝড়ের চেয়েও নিষ্ঠুর—ব'য়ে গেলো আমার বুকের মধ্যে সেই মুহূর্তে। চিঠিটা পড়লাম কয়েকবার : সব পরিষ্কার হ'য়ে গেলো। লিখেছেন পিসিমা : বোঝাই যায় বাবাকে লুকিয়ে। ছোটো চিঠি, আর বেশি কিছু খবর নেই, টেলিগ্রামের বদলে নিরীহ চেহারার সাধারণ এয়ার-লেটাব : তার মানে, আমাকে উতলা করতে চাননি, অনেক কমিয়ে বলা হয়েছে। '...শরীব ভালো যাচ্ছে না' : অর্থাৎ অনেকদিন ধ'রে অসুখ। 'একেবারেই...' মানে, খুব খারাপ। 'তুই কি একবার আসতে পারবি?' বলতে চাচ্ছেন—এক্ষুনি চ'লে আয়। 'কোনোমতে...' : এর দুটো অর্থ হ'তে পারে;—এক, পড়াশুনো ফেলে আসা সম্ভব কিনা—দুই, টাকার জোগাড় কী ক'বে হবে? শেষেবটাই ঠিক—পারলে কি বাবা আমাকে প্লেনের টিকিট পাঠিয়ে না দিতেন? কিন্তু আমারই জন্য তাঁর হাতে টাকা আজ নেই; ইনশুরেন্স ভাঙিয়ে আমাকে পাঠিয়েছিলেন লন্ডনে, দু-বছর সেখানকাব পড়া-খরচ চালিয়েছিলেন। আর এখন নিশ্চয়ই রোজগারও বন্ধ অসুখের জন্য? তাছাড়া, কী ক'রে আমি আর টাকা নিতে পারি বাবার কাছে; আমার মুখ চেয়ে, শুধু আমার মুখ চেয়ে যা-কিছু তিনি করেছিলেন, তারপব—আবার? অসম্ভব। আমি আছি এখানে স্কলার্শিপ নিয়ে, আমার ব্যাঙ্কে এখন কুড়ি ডলারও নেই; তিন বছর ধ'রে তিলে-তিলে ফেরার টাকা জমিয়ে ফেলবো—এই আমার আশা। অথচ—আমাকে যেতেই হবে। আমার মনে পড়লো বেশ কিছুদিন বাবার চিঠি পাইনি—অথচ সপ্তাহে অন্তত একটা তিনি লেখেনই, আর কী-রকম মন-ভরানো লম্বা চিঠি সব! দেরাজ খুলে বের করলাম বাবার চিঠিগুলো : শেষটাতে চব্বিশ দিন আগেকার একটা তারিখ বসানো। এতদিন—এতদিন হ'য়ে গেছে! প্রায় তিন মাস আগেকার একটা চিঠিতে হঠাৎ চোখ পড়লো : 'মাঝে-মাঝে আমার পিঠে একটা ব্যথা হয় আজকাল, ভাবছি গাড়ি

চালানো ছেড়ে দেবো।' কিন্তু তারপর আর পিঠের ব্যথার কোনো উল্লেখ নেই। মানে : অসুখটা বেড়ে যাচ্ছে, আমার কাছে লুকোচ্ছেন, ভাবছেন কিছু না, সেরে যাবে; এখন শয্যা নিয়েছেন, নিজের হাতে চিঠি লেখারও বোধহয় সাধ্য নেই। আর আমি...আমি এখানে কী করছি?

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরালো আরতি, চেয়ারে হেলান দিলো, নীলচে ধোঁয়া পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠলো তার চুলের ওপর দিয়ে। মনস্থির করতে দেরি হয়নি আমার। টেলিফোনে বলেছিলাম, 'ডন, তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে? একবার দেখা করবে আমার সঙ্গে?' তারপর, শহরের বাইরে হাইওয়ের ওপর একটা নিরিবিলি রেস্তোরাঁয় ব'সে বাকি কথা হ'লো। 'আমি ভুল করেছিলাম, ডন। বা ভাবছিলাম, তুমি ভুল করছো—একটি কালো চামড়ার বিদেশী মেয়েকে বিয়ে করা তোমার ঠিক হবে না। কিন্তু—তুমি যদি সত্যি চাও, তাহ'লে—তা-ই হোক।' 'সত্যি বলছো?' ডন জড়িয়ে ধরলো আমাকে, আমি তার প্রথম চুম্বন উপহার পেলাম। 'কিন্তু বিয়ের আগে একবার কলকাতায় যেতে চাই, ডন। আমার মা নেই, বাবার একমাত্র সন্তান আমি। বাবার সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই। না—সম্মতি নেবার জন্য নয়; আমি জানি, তিনি খুব খুশি হ'য়েই মত দেবেন এতে; তবু—এত বড়ো একটা ঘটনা আমি তাঁকে চিঠিতে জানাতে চাই না (আমাদের দেশের ধরন-ধারন অন্য রকম জানো তো), মুখোমুখি কথা বলতে চাই। তুমি কি এতে রাজি হবে?' ডন একটু ভেবে বললো, 'কবে যেতে চাও? ক-দিনের জন্য?' 'সম্ভব হ'লে কালকেই। যত শিগগির যেতে পারবো, তত শিগগিরই তুমি যা চাও তা হ'তে পারবে।' 'বেশ—ঘুরে এসো।' আমি কিস্তিতে টিকিট কিনবো ভাবছি, তুমি কি আমার গ্যারেন্টার হবে?' বেদনার ছায়া পড়লো ডনের মুখে, আমার হাত জড়িয়ে ধ'রে বললো, 'রতি, এখনো তোমার এত সংকোচ? আর দু-দিন পরে সব দায়িত্ব তো আমারই হবে।' 'কিন্তু—অনেক টাকার ব্যাপার যে।' 'ভেবো না। আমার একুশ বছর বয়স হবার পর বাবা তাঁর কিছু শেয়ার আমার নামে রেখেছিলেন, আমি সহজেই ব্যাঙ্ক থেকে ধার পেতে পারবো।'...দু'ঘণ্টার মধ্যে সব ঠিক হ'য়ে গেলো। ব্যাঙ্ক, গয়নার দোকান, গাড়িতে ব'সে আংটি-বদল, ট্র্যাভেল-এজেন্ট। এক্ষুনি পাকা বুকিং পাবার জন্য ন্যুয়র্কে ফোন করলে ওরা; আমার হাতে এলো ডেট্রয়ট-ন্যুয়র্ক-কলকাতার রাউন্ড-ট্রিপ প্লেনের টিকিট, আর পথ-খরচা বাবদ দু-শো ডলার (আমি নিলাম টাকাটা, বাবার কথা ভেবে); ডেট্রয়ট থেকে প্লেন ধরার আগে তিন রাত কাটালাম ডনের সঙ্গে, ওর অ্যাপার্টমেন্টে, আমি যে ওকে সত্য বলেছি, শরীর দিয়ে তার প্রমাণ দিলাম। ওস্তাদ মেয়ে—ডনকে বুঝতেই দিইনি কী বলছে আমার মনের মধ্যে। কিন্তু—সেই প্রথম রাতটায়—আমি কান্না সামলাতে পারিনি। ডন টের পায়নি অবশ্য, আমি উঠে বাথরুমে গিয়েছিলাম। না—বাবার জন্য নয়, আমি আমার শরীর বিক্রি করেছি ব'লেও নয়; ঠিক জানি না কেন। আজ ভাবতে হাসি পায়—আমি আমার হারানো কুমারীত্বের জন্যে কেঁদেছিলাম। অতটা স্পষ্ট ক'রে বোধহয় ভাবতে পারিনি তখন, কিন্তু ব্যাপারটা তা-ই। চাইনি—এটা আমি চাইনি—এ-রকম কথা ছিলো না কখনো। আমি নোংরা হ'য়ে গিয়েছি, ক্লেদাক্ত। এমন একটা ঘটনা, যার কোনো প্রতিকার নেই; যা একবার হ'য়ে গেলে আর 'না' হয় না কখনো! আমার যেন ভয় হচ্ছিলো যে এর ফলে কোনো কুৎসিত পরিবর্তন হবে আমার—চুল উঠে যাবে হয়তো, বা মুখ ভ'রে গোল-গোল পিন্ডের মতো ব্রণ বেরোবে—বা অমনি কিছু। তখনও তুমি ছেলেমানুষ ছিলে, আরতি, তখনও অনেক-কিছু বাকি ছিলো।

বাবার মৃত্যু, দু-সপ্তাহের জায়গায় দেড় মাস পরে আমার ফিরে আসা ; আবার অনিবারণীয় ডন; তার সমবেদনা, সচুম্বন সান্ত্বনা ; আমরা আইনসম্মতভাবে স্বামী-স্ত্রী হলাম। তার প্রণয়ের উচ্ছ্বাস কিছু বেশি ; এক-এক রাত্রে তিনবারেও সে তৃপ্ত হয় না; আমার মনে হয় সে যেন তার পশুত্বকে আমার মধ্যে নিষ্কাশিত ক'রে দিচ্ছে (যেমন নর্দমা দিয়ে ময়লা বেরিয়ে যায়, তেমনি); তার ডিসার্টেশন লেখার জন্য, বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার জন্য প্রস্তুতির এটাই শেষ ধাপ : আমাকে সর্বাঙ্গে কলুষিত ক'রে সে চাচ্ছে নিজের উন্নতি। সে যখন আমার জন্য কোনো উপহার নিয়ে আসে, আমার মনে হয় কোনো লম্পট তার রক্ষিতাকে খুশি করছে। সে যখন আমার ছেলেবেলার কথা, কলকাতায় আমার জীবনের কথা জানতে চায়, আমার ভয় হয় সে বুঝি আমার অতীতটাকেও গ্রাস করবে এবার। সে যখন আমার 'ব্রাউন বিউটি'র

প্রশস্তি করে, আমি মনে-মনে বলি—'আমি মিথ্যে ভয় পেয়েছিলাম, এতে কেউ কুচ্ছিৎ হ'য়ে যায় না, হ'লে বাঁচা যেতো।' বেমানান—ডন আর আমি, আমি আর বিয়ে : আমার অসহ্য হ'য়ে উঠছে, আমাকে কেটে পড়তে হবে। কিন্তু—যে-ভাবে আমি ওকে বিয়ে করেছি, তারপরে আমার নিষ্কৃতি কোথায়? আমাকে রাগিয়ে দিতে হবে ওকে, আমাকেও অসহ্য হ'য়ে উঠতে হবে ওর কাছে—ওর কাছে যে-দীক্ষা পেয়েছি সেই পথেরই চরমে যেতে হবে। আমার ধরনধারন বদলে গেলো; আমি ভেবে-চিন্তে তা-ই করতে লাগলাম, যা ডন একেবারেই পছন্দ করে না। আমি ঘন-ঘন পার্টি দিচ্ছি বাড়িতে—মদের পার্টি, নাচের পার্টি, শিখে নিচ্ছি টুইস্টের কাৎরানো, ডনকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি ফ্র্যাটার্নিটির হৈ-হল্লার আসরে; সে ডিনারের পরে বই খুলে বসলে বায়না তুলছি আমাকে নিয়ে সিনেমায় যাবার জন্য—আর এই সবই সে মেনে নিচ্ছে হাসিমুখে, হয়তো ভাবছে এগুলো আমার ক্ষণিকের খেয়াল—দু-দিন পরেই কেটে যাবে। অবশেষে এক শনিবারের পার্টিতে, রাত যখন দেড়টা, আর অনেকের চোখেই মদের ঘোর লেগেছে, আমি বাজি রেখে ফ্র্যাঙ্ক মর্গ্যানকে জড়িয়ে ধ'রে চুমু খেলাম, তারপর ফ্র্যাঙ্ক যখন আমাকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি তোমাকে খেয়ে ফেলতে পারি, জানো?' তখন খিলখিল ক'রে হেসে উঠে গা এলিয়ে দিলাম। পরদিন ডন আমাকে বললে, 'তোমার হয়েছে কী, রতি?' 'কী আবার হবে।' 'তুমি ভারতের মেয়ে; তুমি যা, তা-ই তো খুব ভালো। তোমার অন্য রকম হবার দরকার কী' আমি হালকা সুরে বললাম, 'আমি কী, তুমি তার কিছুই জানো না।' এর পর আমাকে অবশ্য আরো কয়েকটা ধাপ এগিয়ে যেতে হ'লো; রূঢ় হাতেই ভেঙে দিতে হ'লো আমার বিষয়ে ডনের 'ভারতবর্ষীয়' স্বপ্ন; আমার স্বেচ্ছাচারিতা এতদূর গড়ালো যে আমাকে না-তাড়ালে—ডিসার্টেশন লেখা দূরে থাক, ডনের আত্ম-সম্মান পর্যন্ত বজায় থাকে না। যুদ্ধে জয় হ'লো আমার; গ্রীষ্মের ছুটির আগেই ডিভোর্স হ'য়ে গেলো। আর তারপর—বছরের পর বছর—শুধু ভেসে বেড়ানো, ভেসে থাকা, ডুবে না-যাওয়া। অ্যান আর্বরে আমার পড়াশুনো বেশি এগোয়নি; আমার স্কলাশিপ কাটা গেছে; নতুন ক'রে শুরু করলাম ক্যানসাসে; খুব অল্প-অল্প কোর্স নিয়ে কোনোমতে ছাত্রীত্বের মেয়াদ বাড়িয়ে চলা (যাতে ভিসা নিয়ে গোলমাল না বাধে); ছোটোখাটো কোনো অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ; লাইব্রেরিতে, বুক-স্টোরে কাজ; একবার গ্রীষ্মে ন্যুয়র্কের এক বীট-কাফেতে ওয়েইট্রেস হ'য়ে বখশিশে বেশ কিছু রোজগার হ'য়ে গেলো (চোখে ঘন সুর্মা টেনে, কুচকুচে কালো আঁটো পাৎলুন আর বডিস প'রে কাজ করতে হ'তো সেখানে); আর্বানায় এসে এক বৃদ্ধদের হোমে চাকরি; হঠাৎ সামার-স্কুলে পড়ানোর কাজ জুটে গেলো;—এমনি ক'রে টাকা জমিয়ে-জমিয়ে আমার পি.-এইচ. ডি.; তারপর ফেমাস ফ্যাব্রিক্স (ভাগ্যে মার্কেটিং রিসার্চে কোর্স নিয়েছিলাম একবার)...প্রথমে ওদের মন্ট্রিয়াল আপিশে, তারপর...কলকাতা।

সেই কয়েকটা মাস—ডনের সঙ্গে বিয়ে, তোমার টেনে-হিঁচড়ে আদায়-করা ডিভোর্স : আরতি, তুমি কোথায় নেমে এসেছিলে? পর-পর আরো কয়েকটা খুচরো ব্যাপার—একমাস মেয়াদ, এক সপ্তাহ, কোনোটা শুধু এক রাতেরই জন্য : তোমার কি মাথার ঠিক ছিলো না? কেন, দোষ কী? কে চায় আবদ্ধ থাকতে, একমেবাদ্বিতীয়মের ভজনা করতে, যদি না অবস্থার চাপে, সমাজের চাপে বাধ্য হয়? সন্তান হবার ভয় তো নেই আর—কী এসে যায়? ভালো বরং;—আমি আদ্যিকালের সব কুসংস্কার কাটিয়ে উঠছি; হ'য়ে উঠছি সেই নতুন পৃথিবীর মানুষ, যেখানে অনেক দীর্ঘ শতাব্দীর পর এতদিনে খ'সে পড়ছে শূদ্রের ও স্ত্রীলোকের শৃঙ্খল, দাসত্ব আর মেনে নিচ্ছে না কেউ, সব মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। ভালো, খুব ভালো; আমি শিক্ষা দিলাম নিজেকে; বুঝে নিলাম ব্যাপারটা কী; আমার মধ্যে যেটুকু পুরোনো বাষ্প জ'মে ছিলো, সব বেরিয়ে গেলো। আমার কাছে কেউ যেন আর প্রেমের কথা বলতে না আসে। আমার বাবা যখন কলকাতায় মারা যাচ্ছেন, আমি তখন অ্যান আর্বরে আলিঙ্গনাবদ্ধ; আমার বাবা যখন শুয়ে-শুয়ে ভাবছেন, কার কাছে ধার ক'রে আমার ফেরার টাকা পাঠানো যায়, আমি তখন নগ্নীকৃত... বিমর্দিত...বিপুষ্পিত হচ্ছি। প্রেম—আরতি ঠোঁট কুঁকড়ে ঐ ছোট্ট কথাটা উচ্চারণ করলো :—ঘেন্না!

টেবিলের ঠাণ্ডা, মসৃণ কাঠের ওপর হাত রেখে চোখ বুজলো সে। কেউ জানে না, আমি ছাড়া কেউ

জানে না আমার কষ্ট। আমার শরীরের যন্ত্রণা, আমার মনের জ্বালা, আমার আত্মার গ্লানি। আমার হতাশা, আমার বিতৃষ্ণা (জগতের ওপর, নিজের ওপর), কতবার আমার আত্মহত্যার সংকল্প। আর সেই নিঃসঙ্গতা, যা নিয়ে গর্ব করা চলে না পর্যন্ত, যা আর মিষ্টি নেই, তেতো কড়া ঝাঁঝালো কিছুই নেই, যা গজিয়ে উঠেছে আমার চামড়ার ওপর আর-এক পল্লা চামড়ার মতো, আমার অস্তিত্বের ওপর অদৃশ্য একটা আবরণ—আমি আর টের পর্যন্ত পাচ্ছি না! শেষ পর্যন্ত যে-একমাত্র অবশিষ্ট মানুষটিকে আমি 'আমার' বলতে পারতাম, সেই বাবাও আর নেই—যা-কিছু আমার ছিলো এককালে (যার জন্য আমি নিজের কাছেই মূল্যবান ছিলাম), সেই সবই এক ঝাপটে হারিয়ে গেলো : আমার যৌবন, আমার স্বাতন্ত্র্য, আমার কলকাতা। আমি উন্মূল, আমি উচ্ছিন্ন, আমি উৎপাটিত; কেন বেঁচে আছি তাহ'লে? আর সেই শুধু বেঁচে থাকাটুকুর জন্য—কী কষ্ট, কী অপমান! কত ঠাণ্ডা ঘরে শীতে কেঁপেছি আমি, বরফের মধ্যে কত মাইলের পর মাইল হেঁটেছি পনেরো সেন্ট বাস্-ভাড়া বাঁচাবার জন্য, ক্লান্ত পায়ে কত চারতলার সিঁড়ি ভেঙে শস্তা ঘরে উঠে এসে তক্ষুনি কালো কফি গিলে পাঠ্যবই খুলে বসেছি—আমি ছাড়া কেউ তা জানে না, আজকের আমাকে দেখে তা কল্পনাও করতে পারবে না কেউ। জয়ী—আমি সব দিক থেকেই জয়ী হয়েছি; তোমরা আমাকে কিছু বলতে এলে আমার তৈরি আছে ছোরার মতো উত্তর।

কিন্তু, আরতি, তুমি কি কখনো ডনের কথা ভাবো? ডন রডম্যান—আদর্শবাদী, হৃদয়বান, বিশ্বাসপরায়ণ, ভারত-ভক্ত বিদেশী যুবক—কী করেছিলে তুমি তার সঙ্গে? আমার তখন মাথার ঠিক ছিলো না, বাবার কথা ভেবে দিশেহারা হ'য়ে পড়েছিলাম। তাহ'লে কেন সরলভাবে বলতে পারোনি, 'আমার বাবা মৃত্যুশয্যায়, আমাকে যেতেই হবে।' চেয়েছিলাম বলতে—কিন্তু কেমন ক'রে সব অন্য রকম হ'য়ে গেলো, কখন কলকাতার প্লেনে উঠবো, এ ছাড়া আর-কিছু ভাবতে পারেনি। কিন্তু তারপর—ডনকে ছেড়ে আসা : তা কি আরো ভদ্রভাবে, শান্তভাবে করা যেতো না? তারই চোখের ওপর, তারই বন্ধুদের সঙ্গে—তোমাকে যে ভালোবেসেছিলো, বিশ্বাস করেছিলো, সেই মানুষকে অমন একটা কুৎসিত আঘাত কি দিতেই হ'লো? আর সেই আবর্তের মধ্যে, তোমার শরীরটাকে লেলিয়ে দিয়ে, অন্য যে-সব পুরুষকে তুমি টেনেছিলে, তারাই বা কী পেয়েছিলো তোমার কাছে? শুধু তাচ্ছিল্য, শুধু বিদ্রূপ, শুধু ঘৃণা। যন্ত্র তারা তোমার হাতে—তোমার বিয়ে ভেঙে দেবার যন্ত্র, নিজেকে নির্যাতন করার যন্ত্র। অবশ্য তাদের কাছেও তা-ই পেয়েছিলে তুমি; তাদের খেলাতে গিয়ে তুমিই হ'য়ে উঠেছিলে এক হাসিঠাট্টার ব্যাপার, যার সঙ্গে, আরো ভালো কিছু করার না-থাকলে, দু-এক ঘণ্টা আমোদপ্রমোদে মন্দ কাটে না। তাদের মধ্যে কেউ ছিলো না যার কাছে অজানা ছিলো তোমার প্রতারণার, তোমার বিশ্বাসভঙ্গের সম্পূর্ণ না হোক আংশিক ইতিহাস।

—প্রতারণা! বিশ্বাসভঙ্গ!—'টেবিলের ওপর আরতির আঙুলগুলো বেঁকে গেলো, এক ঝলক রক্ত উঠে এলো তার মুখে—কে করেছিলো? আমি? না কি...হঠাৎ একটা নিষিদ্ধ কুঠুরির দরজা যেন খুলে গেলো, ভেঙে গেলো অনেক যত্নে তৈরি-করা ও টিকিয়ে রাখা নদীর বাঁধ;—হাওয়ার ঝাপট, ঢেউয়ের ঝাপট, অনুচ্চারণীয় স্মৃতি ও বেদনার আঘাত যেন মুহূর্তেরও জন্য অবশ ক'রে দিলো আরতিকে। আমার পৃথিবী চুরমার হ'য়ে গিয়েছিলো, আমি ম'রে গিয়েছিলাম। 'আরতি, আমি চ'লে যাচ্ছি। পারো তো আমাকে ক্ষমা কোরো।' আমি ঐ টুকরো কাগজটা হাতে নিয়ে মূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম, বিশ্বাস করতে পারিনি। ভাবলাম, খেয়ালি মানুষ—বোধহয় দেরাদুনে যেতে চায় না, এ-বাড়িতেও আর থাকতে চায় না, হয়তো আলাদা বাসা নিয়েছে, বা আপাতত উঠেছে কোনো বন্ধুর কাছে। বাবা অসহায়ভাবে আমার দিকে তাকান, পিসিমা বলেন, 'কী হ'লো রে? মানুষটা কি হাওয়া হ'য়ে গেলো হঠাৎ?' আমি তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বলি, 'বোধহয় হঠাৎ কলকাতার বাইরে চ'লে গেছে কোথাও, অনেকদিন আটক ছিলো তো—যে কোনোদিন চ'লে আসবে।' আমার মন বললো ওর কোনো শারীরিক দুর্ঘটনা হয়নি। ঐ চিঠি—ঐ হাস্যকর কথা, 'চ'লে যাচ্ছি'—হঠাৎ কোনো ঝোঁকের মাথায় লিখেছিলো—ঠিক ফিরে আসবে—কোথায় যাবে সে আমাকে ছেড়ে? এমনি ভাবছিলাম আমি, কিন্তু দুর্গাদাস কিছু জানে না, হিমেন্দু জানে না, অন্য কেউ কিছু জানে না। অনেক ঘোরাঘুরির পর দশ দিন বাদে দুর্গাদাস খবর আনলো—দিল্লি

চ'লে গেছে কী-একটা চাকরি নিয়ে। কফি-হাউসের খবর—দিল্লি থেকে কে যেন কাকে চিঠি লিখেছে কলকাতায়, তাইতে জানা গেছে: কতটা বিশ্বাসযোগ্য কে জানে। আমি কাঁদছি না, ব্যস্ত হচ্ছি না, মনে-মনে বলছি—'এ-সব কিছু না, ওকে আসতেই হবে।' কিন্তু এক মাস, দেড় মাস কেটে গেলো—কোনো খবর নেই। আমাকে দিল্লির একটা আপিশের ঠিকানা এনে দিলো দুর্গাদাস—আমি চিঠি লিখলাম, টেলিগ্রাম করলাম : উত্তর নেই। অবশেষে অবিশ্বাস্যকে সত্য ব'লে মেনে নিতে হ'লো। আর তখন—তখন আমার কান্না, আমার নির্বোধ, নির্লজ্জ চোখের জল, আমার শব্দহীন বুক-ভেঙে-দেয়া চীৎকার—'ফিরে এসো! তুমি না-এলে আমি বাঁচবো না!' আমার বাবা অনেক চেষ্টায় সব ব্যবস্থা করলেন; পাঠিয়ে দিলেন ছ-হাজার মাইল দূরে তাঁর মেয়েকে, যাকে তিনি চোখে হারান, যে তাঁর একমাত্র ভালোবাসার জন, যার জন্য, এই সেদিন, তাঁর পক্ষে অল্প-চেনা এক যক্ষ্মারোগীর সমস্ত ভার নিয়েছিলেন তিনি, আর যে-মেয়েকে শরীর বিক্রি করতে হয়েছিলো, সেই বাবাকে শেষবার চোখে দেখার জন্য। ক্ষমা? এর কি কোনো ক্ষমা আছে? কেউ যেন না ভাবে আমি ক্ষমা করেছিলাম, কেউ যেন না ভাবে আমি ভুলে গিয়েছি। তোমরা কি বোঝো না আমি এরই প্রতিশোধ নিয়েছিলাম; থেৎলে দিয়েছিলাম তাকে—আমার জীবনের জ'মে-ওঠা কাদার মধ্যে? আজ আমি প্রতারণায় তার সমকক্ষ, আজ আমার কোনো অভিযোগ নেই—আজ, এমনকি, ককটেল-পার্টিতে দৈবাৎ দেখা হ'য়ে গেলে ভদ্রভাবে কথাও বলি তার সঙ্গে।

কিন্তু তার পর থেকেই আরতির মনের মধ্যে আস্তে-আস্তে যেন জেগে উঠছে কলকাতা—এই ঝকঝকে ঠাণ্ডা ঘরের বানানো কলকাতা নয়—তার ধুলোর গন্ধ, ফুটপাতের ভিড়, বাস-এর ঝাকুনি, তার বৃষ্টি রোদ চাঞ্চল্য কোলাহল কুশ্রীতা, সব-কিছু নিয়ে প্রাণবন্ত। লক্ষ-লক্ষ জীবন—আমারও যৌবন, তা কি টুকরো হ'য়ে ছড়িয়ে নেই কলকাতার পথে-পথে, ফুটপাতে? হেদোর পেছনে সেই বাড়িটা—আছে এখনো? যেখান থেকে আমি কলেজের ট্রাম ধরতাম, সেখানকার ছোট্ট মনোহারি দোকানটা? কারা পড়ে এখন প্রেসিডেন্সি কলেজে, কারা কফি-হাউসে আড্ডা দেয়? যদি হঠাৎ একদিন সেই গলির মধ্যে দোতলার ঘরটায় গিয়ে উঠি?—না, কেউ তা থাকে না সেখানে। আশ্চর্য—দুর্গাদাস একবার খোঁজ করলো না আমার?—কী মুশকিল, সে তো জানেই না আমি এসেছি। কেমন একটা ঝিমুনি নামলো আরতির মনে, তার সব জ্বালা, সব ঝাঁঝ যেন উবে গেলো, ফিরে এলো অনেক মুহূর্ত, অনেক রাস্তা, অনেক বিকেল সন্ধ্যা মেঘলা দুপুর শীতের সকাল;—যেন অনেক পথ ঘুরে-ঘুরে সে অবশেষে ক্লান্ত হ'য়ে বাড়ি ফিরেছে। কলকাতা, আমাকে চিনতে পেরেছো তাহ'লে? আমাকে ফিরিয়ে নেবে না?—না, বড্ড বেশি ভার, এই স্মৃতি—আমি আর ভাববো না, আমি ধরা দেবো না। এই কলকাতা—তার রাস্তা বাড়ি সকাল বিকেল রোদ বৃষ্টি—এই সব-কিছুর ফাঁকে-ফাঁকে, জলের স্রোতের তলায় ভাঙা-ভাঙা ছায়ার মতো, ভেসে উঠছে, ভেঙে যাচ্ছে, আবার গ'ড়ে উঠছে একজন মানুষ—স্পষ্ট নয়, ঝাপসা; কোনো উপস্থিতি নয়, অনুভূতি; খুব সূক্ষ্ম, অসুখের মধ্যে কোনো শিরা যেন থেকে-থেকে কেঁপে উঠছে। কিন্তু একজন নয়, দু-জন—অন্য এক আমি ছিলো একদিন—আমাকে আজ দাবি করছে সে—আর আশ্চর্য—আমি যেন নিজেরই অজান্তে তাকে মেনেও নিচ্ছি।

—কী-সব আবোলতাবোল ভাবছি! বাজে। আরতি চোখ ফেললো ঘড়িতে, আড়াইটে বাজতে দু-মিনিট মাত্র বাকি, লাঞ্চের ছুটি এখনই শেষ হবে—নিশ্চিন্ত। কাজের জন্য তৈরি হ'য়ে বসলো সে; মনে পড়লো তিনটের সময় ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরে কনফারেন্স আছে, কিন্তু তাকে কেন যেতে হবে সেখানে, তা যেন হঠাৎ মনে করতে পারলো না।—সত্যি, এই 'ছিলো'র চাপ অসহ্য। আমি চ'লে যাবো এখান থেকে, এ-সব অবান্তর বোঝা আমি চাই না, আমি স্বাধীন থাকতে চাই। শুনছি তেহেরানে এদের একটা আপিশ খুলছে, আমি চেষ্টা করলে কি সেখানে বদলি হ'তে পারি না? চ'লে যাবো—ফিরে এসেও চ'লে যাবো আবার? আশ্চর্য—স্মৃতি কি শুধু সুখ আর সুখের কল্পনা দিয়ে তৈরি, আমাদের সব দুঃখকে তা কি শেষ পর্যন্ত গালিয়ে দেয়? না কি যাকে স্মৃতি বলি সেটাও ভুল, আসলে অতীত ব'লে কিছু নেই; প্রতি মুহূর্তেই পরের মুহূর্তে অতীত; আজকের দিনটা যা হ'য়ে উঠছে তারই নাম হ'লো গতকাল—আমরা

সব সময় বেঁচে থাকি শুধু বর্তমানে। কিন্তু—একটা উল্টো টানও কি আসে না এক-এক সময়—যাকে মৃত ব'লে জানি তা যেন প্রাণ ফিরে পায়, জুলুম করে আমাদের ওপর—না কি তা কখনো মরে না, ছেড়ে যায় না আমাদের, সঙ্গে থাকে, লুকিয়ে থাকে—তারপর হঠাৎ একদিন বেরিয়ে এসে আমাদের আত্মস্থতা নষ্ট ক'রে দেয়।...ঠিক, ঠিক, কলকাতায় আর নয়, আমাকে কেটে পড়তে হবে।

টাইপিস্ট একতাড়া চিঠি রেখে গেলো তার টেবিলে, প্রচার-বিভাগ থেকে একটা মোটা ফাইল পৌঁছলো। নিজের নিরাপদ লাগলো আরতির; মনে প'ড়ে গেলো আজ বিকেলে কনফারেন্সে আলোচ্য বিষয় কী; সেখানে কী বলবে তা একটা কাগজে নোট ক'রে নিচ্ছে, এমন সময় টেলিফোন বাজলো। 'হ্যালো।' এক মুহূর্ত নীরবতার পর ওপার থেকে আওয়াজ পৌঁছলো—'আরতি, তুমি?' আরতি বললো, 'শ্রীপতি?'

৮

দু-ঘণ্টা আগে আমি তোমাকে পাশে নিয়ে দমদমের দিকে যাচ্ছিলাম, এক ঘণ্টা আগে ফিরে আসছিলাম একই গাড়িতে একই রাস্তা দিয়ে—কিন্তু তুমি পাশে ছিলে না—আর এখন এই ঘর, আমার তথাকথিত বাড়ি, পাশে ঘরে মাতা-পুত্র ঘুমন্ত, সারা পাড়া নিঝুম, টেবল-ল্যাম্পের আলো আমার সামনে, আর সারা ঘরে ছায়া, শুধু আলো পড়েছে এই শাদা কাগজটার ওপর, আমার চোখের সামনে তুমি নেই, রাত্রিও নেই—আছে শুধু টেবিলের কাঠ, দেয়ালের শাদা, কাগজের শাদা, কিন্তু তবু তুমি আছো আমার সঙ্গে, কুয়াশায় আর জ্যোছনায় মাখা এই মস্ত বড়ো ঠাণ্ডা উষ্ণ রাত্রির মধ্যে এখনো আছি তুমি আর আমি। কী আশ্চর্য এই রাত্রি, আরতি, কী আশ্চর্য আজকের এই রাত্রি—বলছি 'আজকের', কিন্তু এখনই হয়তো 'আজ' আর নেই, তবু রাত্রি আছে এখনো—বাইরে, আমার ঘরের বাইরে, তোমার এরোপ্লেনেব জানলার বাইরে আকাশে, আকাশ জুড়ে, জগৎ জুড়ে—বিশাল। মনে আছে কেমন বেরিযে এলো আস্তে-আস্তে, শহর ছাড়িয়ে যেই আমরা হাইওয়েতে পৌঁছলাম? নতুন-ওঠা বড়ো-বড়ো ফ্ল্যাটবাড়িগুলো ঝাপসা; মাঠ, বন, গাছপালা, লবণ-হ্রদের খাল-কাটা জল, পথের ধারে-ধারে বিজ্ঞাপনের প্ল্যাকার্ডগুলো—সব ঝাপসা; জ্যেছনা-মাখা কুয়াশায় যেন তলিয়ে গেছে সব—শুধু ভেসে আছে একটি চলন্ত গাড়ি, আর সেই গাড়ির মধ্যে দুটি জ্যান্ত প্রাণ, দুটি অনুভূতির পিণ্ড—যেন ঐ দুটি মানুষকে লুকিয়ে রাখার জন্যই এই রাত্রি এত বড়ো, এত ঠাণ্ডা. এত উষ্ণ, এত নিবিড়। শীতের ঠাণ্ডা, কলকাতার জানুয়ারি-হিম, কিন্তু এ যদি হ'তো সাইবেরিয়া, হ'তো উত্তর মেরু, হ'তো শূন্যের নিচে চুয়ান্ন ডিগ্রি, তবু আমরা থাকতাম উষ্ণ হ'য়ে, পরস্পরের রক্তের তাপে, হৃদয়ের তাপে—তুমি আর আমি, আরতি।...না, আমি কেটে দেবো না ঐ কথাটাকে, থাক ঐ অসম্ভব অতিকথন—আজ পারবো না আমি সম্ভবপরতার মাপজোকের মধ্যে আটকে থাকতে, যখন প্রতিটি মিনিট খেয়ে নিচ্ছে রাস্তাটাকে, আর চাঁদ স'রে-স'রে যাচ্ছে ডাইনে থেকে বাঁয়ে থেকে সামনে—ঠাণ্ডা হলুদ চ্যাপ্টা চাঁদ—আর কুয়াশা কখনো হালকা-নীল জমাট, আর কখনো গাড়ির হেডলাইটের আলোয় গুঁড়ো-গুঁড়ো ধোঁয়া-রঙের—আর কখনো কোনো প্লেনের শব্দে, বা এয়ারপোর্টের উঁচু মিনারে লাল আর সবুজ আলোর বিন্দু দেখতে পেয়ে, যখন আমাদের মনে প'ড়ে যাচ্ছে যে সময় নেই, আর সময় নেই।

'এসো তাহ'লে—আর-একবার—শেষবারের মতো—' আমি ব'লে উঠেছিলাম, 'না, না, শেষবার নয়—"শেষ" বোলো না!' তোমার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটলো আমার কথায়। 'এখনো তো আছি আমরা একসঙ্গে—আরো চার ঘণ্টা, দু-শো চল্লিশ মিনিট—অনেক সময়, অনেক সময়—' এই ব'লে তুমি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে, আমরা অন্ধকারে ডুবে গেলাম। স্পর্শে আর স্বাদে ভরা অন্ধকার, চুম্বনে আর চোখের জলে গ'লে যাচ্ছি আমরা, টের পাচ্ছি নোনতা স্বাদ আমাদের জিহ্বায়, জীবনের নোনতা স্বাদ শরীরে—কখনো আমরা আঁকড়ে আছি পরস্পরকে যেন বন্যার মুখে ভেসে-যাওয়া দুটো

প্রাণী; কখনো আমি স'রে এসে দেখছি তোমাকে, তোমার শরীর যেন অন্ধকারে এক ঝলক জল; কখনো শুনি নিশ্বাস যেন জলের ওপর দিয়ে বাতাস ব'য়ে যায়; কখনো চোখে চোখ রেখে অন্ধকারে তারা ফোটাই আমরা; আর কখনো দুটি দেবশিশুর মতো শান্ত শুয়ে থাকি পাশাপাশি, না-ছুঁয়ে, কিন্তু পরস্পরের অস্তিত্বে ভরপুর; আবার কয়েক মুহূর্ত পরেই ঢেউয়ের মধ্যে ঢেউয়ের মতো মিশে যাই—এমনি বার-বার, বার-বার—তারপর তুমি নিশ্বাসের স্বরে উচ্চারণ করলে, 'সময় হ'লো বোধহয়।'—সময়, সময়! আছে নেই, আসে, চ'লে যায়—দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, বোঝা যায় না, কিন্তু তা-ই সব। আমরা মেনে নিয়েছি সময়কে, আমরা তৈরি; বোর্ডিংহাউসে তোমার ঘরটিও তৈরি কাল থেকে অন্য বাসিন্দা নেবার জন্য; আমার হাতে তোমার স্যুটকেস, হাতের ভাঁজে তোমার ওভারকোট, তুমি হাতব্যাগে দুটো বই ভ'রে নিলে। দরজায় আমাদের বিদায় দিলো সেই ঘণ্টাগুলি, যা একসঙ্গে এই ঘরে আমরা কাটিয়েছিলাম; সিঁড়িতে আমাদের বিদায় দিলো আমাদের পায়ের শব্দ, যা এখানে আর শোনা যাবে না কোনোদিন; আর রাস্তায় আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে রইলো নিশুতি-রাত, শান্ত শহর, আর দু-মাস ধ'রে যত স্মৃতি আমরা ছিটিয়েছিলাম এই কলকাতার পথে-পথে। এয়ারপোর্টের ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতেই শুনলাম তোমার প্লেনের যাত্রীদের কাস্টম্‌স্‌-এ ডাকা হচ্ছে—হঠাৎ একেবারে অন্য এক জগৎ, কড়কড়ে আলো, অনেক লোক, ব্যস্ততা—আমি চ'লে এলাম তোমার সঙ্গে শেষ রেলিং পর্যন্ত, দিগন্ত-ছোঁয়া বিমানপ্রান্তরের সামনে। আবার এক অন্য জগৎ—বিদায়ে ভরা, শূন্যতায় ভরা, বিষণ্ণ। দূরে তোমার আলো-জ্বলা প্লেন, প্রকাণ্ড মাঠ চাঁদের আলোয় ফ্যাকাশে, আকাশ কুয়াশায় ম্লান, ঠিক মাথার ওপর ঠাণ্ডা শাদা একলা চাঁদ—চেয়ে-চেয়ে এই সব দেখছি আমরা, কিন্তু কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছি না, দু-জনেই নির্বাক। যখন প্লেনে নিয়ে যাবার জন্য বাস্‌ এসে দাঁড়ালো তখনও তুমি নড়লে না, অন্য যাত্রীরা উঠে যাবার পর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালে, আমার কাঁধে হাত রেখে, খুব হালকা ক'রে গালে একবার গাল ছুঁইয়ে বললে, 'ভালো থেকো—চলি।' আমার হাতে তখনও ঝুলছিলো তোমার ওভারকোট, একবার সেই নরম পশমে গভীর নিশ্বাস নিয়ে তোমার হাতে দিলাম। আর সঙ্গে-সঙ্গে যেন ভোজবাজির মতো হারিয়ে গেলে তুমি, আমার চোখের খিদে ছুটলো তোমার পেছনে, আমি দেখলাম কয়েকটি ছায়ামূর্তি প্লেনের সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, কিন্তু এত দূর, এত ঝাপসা, তোমাকে ঠিক চিনতে পারলাম না। আর তখন আমার চোখের লক্ষ্য হ'লো মস্ত বড়ো এরোপ্লেনটা, এখনো মাটির ওপর দিয়ে চলছে, খুব আস্তে, যেন চ'লে যাবার ইচ্ছে নেই, তারপর কয়েকবার এঁকে-বেঁকে মোড় ফিরে একেবারে যেন দিগন্ত ঘেঁষে—থেমে গেলো, না আমার চোখের সীমা ছাড়িয়ে গেলো ঠিক বুঝলাম না। তবু আমি দাঁড়িয়ে রইলাম একইভাবে, সেই অনির্ণেয় দূরের দিকে তাকিয়ে—তারপর হঠাৎ শুনলাম বিরাট এক শব্দ আকাশে, চাঁদের তলায় মুহূর্তের জন্য ঝলক দিয়ে মিলিয়ে গেলো তোমার প্লেন—গর্জনে আমার বুকের দেয়াল ফাটিয়ে দিয়ে।

'বুকের দেয়াল ফাটিয়ে দিয়ে'!—কথার কথা, উপমামাত্র, শব্দালংকার—কিন্তু ও ছাড়া আর ভাষাও নেই। আমার এই মুহূর্তের মনের অবস্থা—তা বলার ভাষা আমি জানি না, তবু আমাকে বলতেই হবে, আরতি, আমার পক্ষে চুপ ক'রে থাকা অসম্ভব।—তুমি চ'লে গেছো, তুমি চ'লে গেছো। কিন্তু কই, আমি তো স্থির আছি, ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যাইনি, গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছি মসৃণভাবে—কুয়াশা-মাখা রাত্রির মধ্য দিয়ে। কষ্ট, এই কষ্ট পাবার আনন্দ; অভাব, এই অভাববোধের তীব্রতা;—এ-ই তো আমি চেয়েছিলাম, আরতি—বেদনা, আঘাত, জাগরণ—কখনো আবার পাবো তা ভাবিনি। মনে হচ্ছে আমি আগে কখনো এত বেশি জীবিত ছিলাম না, এমন তীক্ষ্ণ অনুভূতি নিয়ে কখনো বাঁচিনি এই পৃথিবীতে। আমি যেন এই রাত্রির খুব ঘনিষ্ঠ কেউ, আকাশ যেন নুয়ে আছে তোমার আর আমার মধ্যে সাঁকোর মতো—গাড়ির কাচ নামিয়ে ফুশফুশ ভ'রে নিশ্বাস নিচ্ছি, আবছা একটা গন্ধ পাচ্ছি বাতাসে—তা কি কুয়াশার, না শিশিরে ভেজা ঘাসের না কি তোমার চুলের গন্ধ, আরতি, না কি তোমার ওভারকোটের পশমি নরম তোমাতে মাখা গন্ধ? আর এখন দ্যাখো—এই ঘরে ব'সে আছি আমি, রাত্রি প'ড়ে আছে বাইরে, আমার চোখের সামনে আলো-জ্বলা একটি কাগজ শুধু—তবু আমি দেখছি তোমাকে, শুনছি তোমাকে, ছুঁয়ে আছি তোমাকে—তোমার গালের সব কোমলতা, বুকের সব উষ্ণতা, আর তোমার চোখের হাসি, ঠোঁটের

খুলে যাওয়া, দাঁতের ঝলক—এখনো, এখনো আমাকে ঘিরে আছে। আমার প্রতিটি স্নায়ু টান হ'য়ে আছে, আরতি, আমার আঙুলের ডগাগুলো জ্বলছে, আমার নিশ্বাস অনবরত বলছে তোমার নাম, আমি কিছু ভাবতে পারছি না যা তুমি নও। আমার ফিরে পাওয়া যৌবন, আমার আনন্দ, আমার নতুন জীবন : তুমি।

নতুন জীবন—কেমন ক'রে তা আরম্ভ হ'লো, কবে থেকে? একটু দাঁড়াও, ভেবে দেখি, আমাকে মনে করার জন্য কয়েক মুহূর্ত সময় দাও। সেই সব দিন, যখন পর্যন্ত দেখা হয়নি তোমার সঙ্গে, তোমাকে আবার দেখবো ব'লেও ভাবিনি—তা যেন বড্ড দূর ব'লে মনে হচ্ছে আমার—দূর, আর কিছুটা অবাস্তব। আর দেখা হবার পরেও প্রথম কয়েকদিন—মনে আছে?—আমরা আড়াল ভেঙে বেরোতে পারিনি, কথা বলেছি নেহাৎই দু-জন 'ভদ্রলোক' আর 'ভদ্রমহিলা'র মতো। সেই যেদিন প্রথম তোমাকে টেলিফোন করলাম তোমার ফেমাস ফ্যাব্রিক্স-এর আপিশে—আমি কেঁপে উঠেছিলাম তোমার গলায় আমার নাম শুনে, শোনামাত্র আমার গলার আওয়াজ চিনতে পারবে আশা করিনি। কিন্তু পর মুহূর্তেই কেজো শোনালো তোমার গলা; আমি যখন জিগ্যেস করলাম আপিশের পরে আমার সঙ্গে চা খাবার সময় তোমার হবে কিনা, তখন আমার উৎসাহে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে অত্যন্ত বেশি সামাজিক সুরে রাজি হ'লে, 'থ্যাঙ্কিউ'টাও আওড়াতে ভুললে না। আর ট্রিঙ্কাতে ব'সে চা খেতে-খেতেও আমার মনে হ'লো যেন সেই ককটেল-পার্টির সদ্যপরিচিতার সঙ্গেই কথা বলছি। কত ভান আমরা ক'রে থাকি, আরতি, কত ছেলে মানুষি কপটতা—আর কত সময় নষ্ট করি এমনি ক'রে। মাঝে দু-দিন দেখা হ'লো না তোমার সঙ্গে, আমি কয়েকবার টেলিফোন তুলেও নামিয়ে রাখলাম, তারপর এক রোববার দুপুরে দুর্গাদাসের বাড়িতে ভোজ—তোমারই জন্য, তোমারই উপলক্ষে। সুখাদ্য ছিলো প্রচুর, পানীয়েরও অভাব ছিলো না (আমি ছ-বোতল বিয়ার নিয়ে গিয়েছিলাম, বন্দনাও সদয় হ'য়ে একটু চেখেছিলো সেদিন), খুব আগ্রহ ছিলো বন্দনা আর দুর্গাদাসের দিক থেকে; কিন্তু পুনর্মিলনের ঠিক সুরটি যেন লাগলো না তবু—কোথায় যেন বাধা, অস্বস্তি। মার্কিনী শিক্ষাপদ্ধতি (যেহেতু হিমেন্দু আর তুমি দু-জনেই সে-দেশের ডিগ্রি নিয়েছো); রবীন্দ্র-সংগীত (যেহেতু সেটা বন্দনার 'লাইন'); কলকাতার পৌর সমস্যা (যেহেতু দুর্গাদাস তা নিয়ে একটা সীরিজ লিখছে 'সুপ্রভাত'-এ); আর অবশ্য দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক হালচাল (যেহেতু আমি একজন সাংবাদিক)—ঘুরে-ফিরে এই সব কথা ভেসে উঠছে আর ডুবে যাচ্ছে, আর দুর্গাদাস মাঝে-মাঝে ঝোঁকে ব'লে উঠছে, 'এ-সব থাক—তোমার খবর বলো, আরতি!'—কিন্তু ঠিক কোন খবর সে জানতে চায় তা স্পষ্ট হচ্ছে না একবারও। আমি টের পাচ্ছিলাম মুশকিলটা কোথায়; ওরা ভুলতে পারছে না গৌতম যা সোল্লাসে শুনিয়ে গিয়েছিলো (যার বিন্দুবিসর্গ তুমি জানো না তখন), তোমার মুখে শুনতে চায় তা কতদূর সত্য, শুনতে চায় তার সব কথা মিথ্যে। আর তাছাড়া, আমি উপস্থিত—আমার সামনে খোলাখুলি কথা বলতেও ওদের সংকোচ, মাঝে-মাঝে ওদের আড়চোখের তাকানো আমি ধ'রে ফেলেছি। তবু, ওরা সামলাতে পারছিলো না নিজেদের, হঠাৎ দুর্গাদাস এক ফাঁকে জিগেস ক'রে ফেললো, 'আরতি, তুমি আমেরিকায় ফ্র্যাঙ্ক মর্গ্যান নামে কাউকে চিনতে?' 'ফ্র্যাঙ্ক মর্গ্যান?...ও, হ্যাঁ, চিনতাম একজনকে—এটুকু ব'লেই চুপ করলে তুমি, ঐ নামটা দুর্গাদাস কী ক'রে শুনলো তাও জানতে চাইলে না। আর তারপর বন্দনা তার পক্ষে যতটা সম্ভব তির্যকভাবে বললো, 'আরতি, তুই এতকাল বিদেশে কাটালি, কেউ তোকে বিয়ে করতে চায়নি সেখানে?' 'চেয়েছিলো—করেওছিলাম—টিকলো না।'—এমন শান্ত গলায় তক্ষুনি জবাব দিলে তুমি, এমন নির্লিপ্তভাবে, যে বন্দনার মতো ছলছলে মানুষের মুখেও আর কথা জোগালো না, আর সেই ফাঁকে বুদ্ধিমান হিমেন্দু তোমাকে জিগেস করলে (যেন আগের কথাটা সে শুনতেই পায়নি, এমনিভাবে) তুমি কখনো ভেনিসে গিয়েছিলে কিনা। মোট কথা, সেদিন দুর্গাদাসের বাড়িতে তুমি ছিলে আত্মস্থ—একটু বেশি আত্মস্থ হয়তো; বেশ গুছিয়ে কথা বলছিলে যখন যে-প্রসঙ্গ উঠছে তা-ই নিয়ে—একটু বেশি গুছিয়ে হয়তো; তোমার ব্যক্তিগত জীবন ঘেঁষে কোনো কথা উঠলে আলগোছে তা অন্য খাদে বেঁকিয়ে দিচ্ছিলে;—তোমার ভাবটা ছিলো এইরকম যেন সাধারণ অর্থে এখানকার সকলেরই বন্ধু তুমি, সব

বিষয়েই মোটামুটি 'ইন্ট্রেরেস্টেড', কিন্তু কারো জন্য বা কোনো-কিছুর জন্য তোমার তেমন কোনো আগ্রহ নেই—তুমি একজন 'বাইরের লোক'। সেদিন নিরাশ হয়েছিলো দুর্গাদাস আর বন্দনা—এতদূর পর্যন্ত, যে তুমি যখন খাওয়ার পরে ভদ্রতামাফিক মিনিট কুড়ি ব্যবধান দিয়ে উঠতে চাইলে, তখন ওরা তোমাকে আর-একটু বসার জন্য পিড়াপিড়ি করলো না, 'আবার আসিস' কথাটা আবছা শোনালো বন্দনার গলায়, আর দুর্গাদাস আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমার গাড়িতে আরতিকে পৌঁছিয়ে দিতে পারবে?'

বাইরে ছিলো প্রথম শীতের ঝকঝকে দিন—রোদ্দুরে তাত, কিন্তু উত্তুরে হাওয়ায় শীতের কামড়। তুমি গাড়িতে উঠে একটা কালো চশমা প'রে নিয়েছিলে—মস্ত গোল ঠুলির মতো তার কাচ দুটো—আমি ডোভার লেন থেকে বেরোতে-বেরোতে বললাম, 'এই ফ্যাশানটা ভারি অদ্ভুত কিন্তু—চোখ ঢেকে রাখা। চোখ বাদ দিলে মুখের আর রইলো কী?' তুমি জবাব দিলে, 'সব ফ্যাশানই অদ্ভুত।' স্টোর রোডে প'ড়ে আমি বললাম, 'তোমার বোধহয় বেশি ভালো লাগলো না ওখানে?' 'ভালো কেন লাগবে না?'—যেন আরো কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলে তুমি, একটু পরে হঠাৎ বললে, 'অমলার খবর কিছু জানো নাকি?' 'অমলা?' 'তাকে মনে আছে তোমার?' 'ছিলো না—কিন্তু মনে প'ড়ে গেলো। ও কেমন আছে জানো নাকি?' 'বোধহয় ভালোই। কোন স্কুলের হেডমিস্ট্রেস যেন—' 'বিয়ে করেনি?' 'কোথায় আর! ওর মা থাকলে হয়তো—কিন্তু অমলা নিজে তো তেমন—' 'না, অমলাকে আর যা-ই হোক "স্মার্ট" বলা যায় না।—ওর মা-ও মারা গেছেন তাহ'লে!' আর-কিছু বললে না তুমি, শেষ পথটুকু চুপচাপ কাটলো। গাড়ি থামলো তোমার বোর্ডিংহাউসের সামনে, তুমি তোমার কালো চশমাটা খুলে নিলে, গাড়ি থেকে নামার আগে আমার দিকে ঈষৎ মুখ ফিরিয়ে বললে, 'মুহূর্তের জন্য আসবে নাকি ওপরে?'...সেখানেই, সেখানেই আরম্ভ।

তেতলার ঘর; জানলা ঘেঁষে সোফায় আমরা ব'সে আছি; বাইরে রোদালো নীল আকাশ, খোলা জানলায় হাওয়ার শিরশিরানি। তুমি আবার অমলার কথা তুললে। 'কেউ-কেউ যেন হেরে যাবার জন্যই জন্মায়—তা-ই না? কেউ মনে রাখে না—কেউ গণ্য করে না তাদের। আমরাও করিনি, আমরাও আমাদেব নিজেদেরই কাজে দুর্গাদাসকে খাটিয়ে নিতাম, ভাবতাম না তার ওপর অমলারই দাবি সবচেয়ে বড়ো। আজ দুর্গাদাসের ওখানে ব'সে-ব'সে আমার মনে পড়ছিলো তাকে—বোকা, লাজুক, ভালোমানুষ, অসুখী অমলা। ওর জীবনটা যে এ-রকম হ'য়ে গেলো, তাতে কি আমাদেরও কিছুটা হাত ছিলো না?' আমি চমকে উঠলাম তোমার কথা শুনে, তোমার মুখের 'আমরা' কথাটা আমাকে ভাবিয়ে তুললো—তাহ'লে তুমি কি অতীতের জমিতে পা ফেলছো, আরতি, ভুলে কি যাচ্ছো তা কত বিপজ্জনক? সাবধানে, হালকা সুরে আমি জবাব দিলাম, 'অসুখী কে বা নয়—কেউ তা লুকিয়ে রাখতে পারে, কেউ পারে না, আর অনেকে তা বোঝেই না—এইটুকু যা তফাৎ। তাছাড়া, যে যেমন মানুষ তেমনি ঘটে তার জীবনে—অন্য কেউ দায়ী নয় সেজন্য।' 'হয়তো তা-ই, হয়তো তা-ই। তবু তো আমরা জড়িয়েও যাই অন্যের জীবনের মধ্যে—মাঝে-মাঝে—ভালো নয় এই খেলা, তবু খেলতেই হয় আমাদের।' আমার বুকের মধ্যে টান পড়লো এবার, প্রায় ভয় হ'লো পাছে তুমি আরো এগিয়ে যাও, সীমা ছাড়িয়ে যাও—আমি তোমার মুখ থেকে মনের ভাব বুঝে নিতে চাইলাম, কিন্তু তুমি বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলে। তারপর আমি যখন মনে-মনে ভাবছি এবার বেশ ভদ্রভাবে উঠে পড়লে হয়, তখন বাইরে থেকে চোখ সরিয়ে এনে নিচু গলায় বললে, 'জানো, একটু আগে কী মনে হচ্ছিলো আমার? যেন আজকের এই দিনটা অন্য কোনো দিন। যেন আগে একবার এই দিন—ঠিক এই মুহূর্তটি আমি কাটিয়েছিলাম। ঠিক এই রকম আকাশ—এই রকম রোদ—এমনি একটি বিকেল। ভাবছিলাম তা কবে—তা কোথায়।'

আর সেই মুহূর্তে ভেঙে গেলো আড়াল, পর্দা উঠলো অন্য এক মঞ্চে, অন্য এক দৃশ্যে, তুমি তোমার প্রচ্ছদ থেকে বেরিয়ে এলে, আমি তোমার চেহারা পর্যন্ত অন্য রকম দেখলাম। আবার সেই তেতলার ঘর তোমাদের, হাজরা রোডের গলিতে আমার ঘর, আর তার আগে, আরো আগে—যা-কিছু ছিলো, যা-কিছু আমরা হারিয়েছিলাম—কিন্তু না—হারাইনি, এই তো ফিরে পাচ্ছি সব, ফিরে পেয়েছি, খুঁজে

পেয়েছি পরস্পরকে। কেমন ক'রে তা হ'তে পেরেছিলো—এই যে ধরা দিলো আমাদের মুঠোর মধ্যে এক অসম্ভব, অতি সহজে, আমাদের সুবিধের জন্য খুব ছোটো হ'য়ে যেন; বার-বার নিজেকে জিগেস করি: আমি কি যোগ্য ছিলাম? আমি কি এর যোগ্য ছিলাম? না, আরতি—প্রতিবাদ কোরো না, আমাকে বলতে দাও এ তোমারই সৃষ্টি, তুমিই একে ডাক দিয়েছিলে, জাগিয়ে তুলেছিলে, ফুটিয়ে তুলেছিলে—আমি প'ড়ে ছিলাম রাস্তায় একটা মরচে-পড়া তামার পয়সা—তুমি তা নিচু হ'য়ে কুড়িয়ে নিলে, আরতি, নিচু হ'তে দ্বিধা করলে না, ধুলো দেখে পেছিয়ে গেলে না; আর তোমার হাতে আমি হ'য়ে উঠলাম—অন্য কিছু, অন্য একজন। আমি ভুলতে পারি না সেই মুহূর্ত, যখন এক আশ্চর্য সোনালি পাখির মতো তুমি ছিনিয়ে নিলে আমাকে—অনেক দূরে এক অন্য জগতে, দিলে চুরমার ক'রে আমার সব লজ্জা আর ভয়, তোমার সুন্দর ক্ষমার আবরণের তলায় আমাকে দিলে নিরাপত্তা, নিজে প্রথমে ভালোবেসে আমাকে ভালোবাসতে শেখালে। আমাকে মানতেই হবে ভালোবাসার শক্তিতে আমার চাইতে অনেক বড়ো তুমি।

অনেক কথা আমরা বলেছিলাম দিনের পর দিন—যত কষ্ট তুমি পেয়েছিলে, যত অত্যাচার তুমি করেছিলে নিজের ওপর—আর আমার সব প্রতারণা—নিজের সঙ্গে, অন্যদের সঙ্গে—মাঝখানকার দশ বছরের প্রতিটি পাতা যেন প'ড়ে নিয়েছিলাম দু-জনে, যেন কোনো তুচ্ছ কথা অজানা থাকলেও এই সময়ের খাদ পুরোপুরি পেরোনো যাবে না। কিন্তু, হাজার হোক, কতটুকুই বা সময় পেয়েছিলাম কথা বলার? আর বেশি বলার প্রয়োজনই বা কী ছিলো—যখন চোখে এত ভাষা, স্পর্শে এত ভাষা, আর রাত্রির হৃদয় এত উদার? আমি ব'সে-ব'সে মনে করার চেষ্টা করছি কী-কথা হয়েছিলো তোমার আর আমার মধ্যে, মনে হচ্ছে যেন যথেষ্ট বলা হয়নি। সেই যে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম তোমাকে ছেড়ে—কেন, তা কি বলেছিলাম? নিঃসাড় ছিলাম তোমার চিঠিতে, টেলিগ্রামে; নিজেকে লোপাট ক'রে দিয়েছিলাম—কেন, তা কি বলেছিলাম তোমাকে? ভয়, আরতি, স্রেফ কাপুরুষ ভয়! অসুখের ক-মাস শুয়ে-শুয়ে যেমন মৃত্যুর ভয়ে কেঁপেছিলাম, তেমনি তখন জীবনের ভয় আমাকে পেয়ে বসেছিলো। জীবনের ভয়, সুখী হবার ভয়, আমি তখন যাকে বলতাম আমার স্বাধীনতা, তা হারাবার ভয়। অর্থাৎ, দম্ভ—আমি অসাধারণ, আমি অন্যদের মতো নই! তারই প্রতিফল—আমার বিয়ের ফাঁস, আমার চাকরির বেড়াজাল। পাকেচক্রে এমন হ'লো যে যখন এক দূর, ঠাণ্ডা দেশে তোমাকে গরম রাখছে শুধু যন্ত্রণা, আমি তখন 'সুপ্রভাত'-এ ধাপে-ধাপে উন্নতি করছি। এমন হ'লো যে তুমি যখন সাঁৎরে-সাঁৎরে কূল পাচ্ছো না কোথাও, আমি তখন হ'য়ে উঠছি কলকাতার এক বিশিষ্ট নাগরিক, আর তার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছি সব সময়, মদে ভুলিয়ে রাখতে চাচ্ছি নিজেকে।—ছেলেমানুষি, বোকামি! তবু বলি : এরও প্রয়োজন ছিলো, যদি এই সব পেরিয়ে আমরা না-আসতাম, তাহ'লে কি জন্ম নিতে পারতো আমাদের মধ্যে এই অদ্ভুত ভালোবাসা—যৌবনের উচ্ছ্বাস নয়, সামাজিক চুক্তি নয়, প্রকৃতির নির্দেশ নয়—উদ্দেশ্যহীন, স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ংসম্পূর্ণ—যেমন কেউ-কেউ হঠাৎ কখনো অবিশ্বাস্যভাবে ভগবানের দেখা পায়, তেমনি? এর পরে কী ক'রে আমি আর ঘৃণা করতে পারি নিজেকে—এর পরেও, তুমি আমার জন্য যা করলে, তার পরেও? কী ক'রে তাকে আর খারাপ ব'লে ভাবি, তুমি যাকে ভালোবেসেছো? আমার সব মনস্তাপ ধুয়ে দিলে তুমি; আমি এখন পারবো নিজেকে সহ্য করতে, পারবো সাহসী হ'য়ে বেঁচে থাকতে—সব সীমা, সব অভাব মেনে নিয়ে।

একটা কথা কখনো আমরা বলিনি—চোখে-চোখে ভেসে উঠলেও চেপে দিয়েছি—তা হ'লো : এর পর কী? এর পর আমাদের কী হবে? কিন্তু দু-জনেই মনে-মনে জেনেছি এটা স্থায়ী নয়, হ'তে পারে না; কোনো-না-কোনোদিন এর অবসান নিশ্চিত, তার বেশি দেরিও নেই। এ বড়ো বেশি আশ্চর্য, বড়ো বেশি তীব্র—মানুষের ভাগ্যে তা জুটতে পারে শুধু ক্ষণিকের জন্য, শুধু ক্ষণিকের জন্য মানুষ এটা সহ্য করতে পারে। আ—ভালোবাসা! তার ছোঁওয়ায় সবই পবিত্র হ'য়ে ওঠে, কিন্তু আর কী আছে তার মতো বেআইনি, বিদ্রোহী, বিশৃঙ্খল, সময়ের চোর, জগতের ডাকাত, আর কী আছে যা এমনভাবে ছাড়িয়ে নেয় মানুষকে শুধু একজন ছাড়া অন্য সকলের কাছ থেকে? স্বার্থপর নয় কি, শুধু দু-জন

মানুষের মধ্যে গ'ড়ে-ওঠা এই সম্পূর্ণ সুখ, এই গোপন স্বর্গ—যখন জগৎ ভ'রে এত যুদ্ধ, এত দুঃখ, এত কান্না, এত হাহাকার? এ কি অন্যায় নয় যে আমরা লুকিয়ে আছি রাত্রির কন্দরে, মাতৃগর্ভে দুই যমজ শিশুর মতো নিরাপদ, যখন সূর্যের আলোয় সংগ্রাম চলছে অবিরাম—মানুষের সঙ্গে মানুষের? যেন জেল ভেঙে পালিয়ে এসেছি দুই কয়েদি, কিন্তু কোটি-কোটি মানুষ যখন বন্দী, তখন আমরাও কি ধরা পড়বো না একদিন? আমি তাই অবাক হইনি তুমি যেদিন বললে তোমার আপিশ তোমাকে বদলি করেছে তেহেরানে, সামনের মাসে যেতে হবে। শুধু জিগেস করেছিলাম, 'তুমি কি বদলি চেয়েছিলে?' 'চেয়েছিলাম।' 'আমার সঙ্গে দেখা হবার পর?' 'হ্যাঁ, তা-ই।' তারপর আমার হাত ধ'রে বলেছিলে—'এ-ই ভালো, শ্রীপতি, এই রকমই ভালো, এইরকমই সবচেয়ে ভালো।' আমি মানি তোমার কথা, আরতি এই রকমই ভালো : আঘাত, বেদনা, জাগরণ—বছরের পর বছর ধ'রে আমি যা চেয়েছিলাম—এই বিচ্ছেদে তা সম্পূর্ণ হ'লো। কোথাও কোনো ভাঙচুর হ'লো না, কোনো বিজ্ঞাপনে মলিন হ'লো না এই ভালোবাসা; তুমি শান্তভাবে মিলিয়ে গেলে আমার দিগন্ত থেকে, আর আমি রইলাম লোকের চোখে ঠিক তেমনি, যেমন ছিলাম এতকাল। হ্যাঁ, লোকের চোখে তা-ই কিন্তু ভেতরে-ভেতরে সব বদলে গেছে, অন্য কেউ তা জানে না। কী করি আমি এখন—আমার সদ্য-পাওয়া, সদ্য-হারানো তোমাকে নিয়ে আমি কী করি, কেমন ক'রে সহ্য করি, ব্যবহার করি সেই উষ্ণতা, যা আমার সারা শরীরে দপদপ করছে এই মুহূর্তে?

ব্যবহার! কী বিশ্রী কথা—বেনেদের মতো, সুদখোরের মতো! হেসো না, আরতি, আমার কথা গোপন কথা বলি তোমাকে? তোমার সঙ্গে প্রথম যেদিন দেখা হ'লো, তখন থেকে আমি ভাবছি—ভাবছিলাম—একটা লেখা ভাবছিলাম মনে-মনে। 'হঠাৎ অনেকদিন পর জয়ন্তীর সঙ্গে সুব্রতর দেখা হ'য়ে গেলো—' এই ধরনের আরম্ভ। কিন্তু হয়তো ও-রকম নয়, হয়তো আরো বেঁকিয়ে না-বললে বলা যাবে না। হয়তো আরম্ভ হবে ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়ার শব্দে, কেউ একজন ভোরবেলা শুনছে শুয়ে-শুয়ে, ঘুম ভেঙে গেছে, কিন্তু জেগেও ওঠেনি, শুনছে আর ভাবছে, শুনছে আর মনে করার চেষ্টা করছে। লোকটা হয়তো লেখক—যে এখন আর লিখতে পারছে না, তবু চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে—লিখে-লিখে শুধু কেটে দিচ্ছে আর ছিঁড়ে ফেলছে, তারই স্বগতোক্তি থেকে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে আসবে তথাকথিত জয়ন্তী আর সুব্রতর গল্পটা—সেটাই হবে সেই গল্প, লেখকটি যা শেষ পর্যন্ত লিখে উঠলো, কিন্তু কোনটা লেখকের জবানবন্দি আর কোনটা তার বানানো গল্প সেই তফাৎটুকু স্পষ্ট হবে না—এমনি নানাভাবে ভাবছিলাম আমি, তোমাকে যখন প্রথম টেলিফোন করলাম, তার ঠিক আগের মুহূর্তেও, হয়তো ঐ উপায়ে নিজের অতীত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলাম। জানতাম না তখন, ভাবতে পারিনি—আমার অতীত হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর, দেবে গুঁড়িয়ে আমার সেই না-লেখা গল্পটাকে, লুটিয়ে দেবে ধুলোয় আমার তখন পর্যন্ত ভুলতে-না-পারা উচ্চাশা। হ্যাঁ—উচ্চাশা ছিলো আমার, আমি চেয়েছিলাম লেখক হ'তে, কিছু লিখেও ছিলাম এককালে—বলতে গেলে তোমারই জন্য—কিন্তু তুমি তো পড়োনি—ভাগ্যে পড়োনি। তুমি যা দিয়েছিলে আমাকে, সেই জীবন—প্রাণহীন, ঈশ্বরহীন শূন্যের মধ্যে হঠাৎ এক হৃৎপিণ্ডের মতো জীবন—আমি এমন কী লিখতে পারি যা তার তুলনায় তুচ্ছ নয়, নয় এক ম্লান বিকল্প, পাংশু প্রতিনিধিমাত্র? না, আরতি, আমি আর লেখক হ'তে চাই না, হ'তে পারিনি ব'লে আমার আর আক্ষেপ নেই; তুমি আমাকে যেমন রেখে গেলে তেমনিভাবে বাঁচতে চাই আমি।

তেমনিভাবে—তা কী ক'রে হয়? এই যে আমার রক্তকণায় এখন ব'য়ে যাচ্ছো তুমি, আঁট হ'য়ে আছো বুকের মধ্যে যেন তোমার পক্ষে যথেষ্ট জায়গা নেই—এর রেশ আর কতদিন, কতদিন? কয়েক সপ্তাহ, কয়েক মাস, হয়তো এক বছর : কিন্তু তারপর? তারপরেও তো বাঁচতে হবে বহুকাল—যৌবন একেবারে ফুরিয়ে যাবার পরেও, কে জানে হয়তো মরন্ত, হিম বার্ধক্য পর্যন্ত। জানি, এই চিঠির তুমি উত্তর দেবে, আমি আবার লিখবো, কিছুদিন চলবে চিঠিপত্র, তারপর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন আবার স্বাভাবিক হবে, ফুরিয়ে যাবে বলার কথা; আমরা কিছুদিন পর্যন্ত আশা ক'রে থাকবো আবার দেখা হবে

ব'লে, এমনকি ছোটোখাটো প্ল্যানও করবো সেজন্য, তারপর তুমি বদলি হ'য়ে যাবে ম্যানিলা কি ফিলাডেলফিয়ায়, হয়তো অবশেষে কোনো দূর উত্তর-দেশেই বাসা বাঁধবে—তখন আর দেখা হবে না। আর এই পতনের রেখা আরম্ভ হবে কাল থেকেই। কাল থেকেই আবার সাধারণ—আমার নিতান্ত গতানুগতিক অস্তিত্ব।—কিন্তু কী এসে যায়, যদি এর পরে আমাকে বাঁচতে হয় অতি সাধারণ একজন মানুষ হ'য়ে, স্ত্রী নিয়ে, সন্তান নিয়ে, চাকরি নিয়ে—বরং তা-ই তো ভালো; আমি যাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় তাদের আমি কাজে লাগতে পারবো, যে-সব ছোটোখাটো কাজে আমার কিছুটা দক্ষতা আছে তা-ই করবো মন দিয়ে—মেনে নেবো আমি সাধারণ, অসংখ্যের মধ্যে একজন মাত্র, আর সেই ধূসর নিয়মের খাঁজে ঘুরতে-ঘুরতে, প্রতিবাদহীন বাধ্যতার বোঝা ব'য়ে-ব'য়ে, হয়তো শেষ পর্যন্ত এটুকু সান্ত্বনা খুঁজে পাবে যে অমনি ক'রেই আমি তোমার ভালোবাসার মূল্য দিয়ে যাচ্ছি। আর তারপর যখন সেই দিন আসবে যখন আমাকে দিয়ে কারো কোনো প্রয়োজনও আর থাকবে না, যখন বার্ধক্য আমাকে মৃদু হাতে সরিয়ে দেবে জীবন থেকে, সব মানুষ অচেনা হ'য়ে যাবে, সব কথা অর্থহীন—হয়তো তখনও, কোনো মেঘলা সন্ধ্যায়, বা কোনো গ্রীষ্মের ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরে বাইরের দিকে তাকিয়ে, আমার মনে ফিরে আসবে আজকের এই রাত্রি, কুয়াশা আর জোছনায় মাখা সেই পথ—আমার পাশে তুমি, পাশে তুমি নেই, কোথাও তুমি নেই তবু আছো আমার বুকের মধ্যে, রক্তের স্রোতে—ঠিক এই মুহূর্তের অনুভূতি আবার হয়তো কাঁপিয়ে দিয়ে যাবে আমাকে। মনে-মনে বলবো, 'আশ্চর্য! এখনো ভুলিনি!' আবার বলবো, 'এর বেশি আর কী চাইবার থাকতে পারে মানুষের?'
